প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

একাদশ ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩১৮ সাল, কার্ত্তিক—চৈত্র।

প্রবাসী কার্য্যালয়,

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

প্রবাসী ১৩১৮ কার্ত্তিক—চৈত্র,

১১শ ভাগ ২য় খণ্ড,

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচী

লেখকের নাম ও তাঁহাদের রচনা

চিত্রসূচী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১১শ ভাগ
য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩১৮

১ম সংখ্যা

জীবন-স্মৃতি

বাহিরে যাত্রা।

একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম।

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্ব্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারা বনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মত পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কি অপূর্ব্ব খবর পাওয়া যাইবে! পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার ভাঁটার আসাযাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গী, সেই পেয়ারা গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্য্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিত-প্লাবন। এক এক দিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে। ওপারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপ্‌সা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায়গ্রহণ করে, নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুসি-তাই করিয়া বেড়ায়।

কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিষকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল। সকাল বেলায় এখো-গুড় দিয়া যে বাসি লুচি খাইতাম নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্র যে অমৃত খাইয়া থাকেন তাহার সঙ্গে তার স্বাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কারণ, অমৃত জিনিষটা রসের মধ্যে নাই রসবোধের মধ্যেই আছে—এই জন্য যাহারা সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পায়ই না।

যেখানে আমরা বসিতাম তাহার পিছনে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ঘাটবাধানো একটা খিড়কির পুকুর—ঘাটের পাশেই একটা মস্ত জামরুল গাছ; চারিধারেই বড় বড় ফলের গাছ ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার আড়ালে পুষ্করিণীটির আব্রু রচনা করিয়া আছে। এই ঢাকা, ঘেরা, ছায়া-করা, সঙ্কুচিত একটুখানি খিড়কির বাগানের ঘোমটাপরা সৌন্দর্য্য আমার কাছে ভারি মনোহর ছিল। সম্মুখের উদার গঙ্গাতীরের সঙ্গে এর কতই তফাৎ। এ ঘরের বধূ। কোণের আড়ালে, নিজের হাতের লতাপাতা-আঁকা সবুজ রঙের কাঁথাটি মেলিয়া দিয়া মধ্যাহ্নের নিভৃত অবকাশে মনের কথাটিকে মৃদুগুঞ্জনে ব্যক্ত করিতেছে। সেই মধ্যাহ্নেই অনেক দিন জামরুল গাছের ছায়ায় ঘাটে একলা বসিয়া

পুকুরের গভীর তলাটার মধ্যে যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করিয়াছি।

বাংলা দেশের পাড়াগাঁটাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধূলা হাটমাঠ, জীবন-যাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল—কিন্তু সেখানে আমাদের নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।

এক দিন আমার অভিভাবকের মধ্যে দুই জনে সকালে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি কৌতূহলের আবেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া তাঁহাদের অগোচরে পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়াছিলাম। গ্রামের গলিতে ঘন বনের ছায়ায় সেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানা-পুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড় আনন্দে এই ছবি আমি মনের মধ্যে আঁকিয়া আঁকিয়া লইতেছিলাম। একজন লোক অত বেলায় পুকুরের ধারে খোলা গায়ে দাঁতন করিতেছিল, তাহা আজও আমার মনে রহিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে আমার অগ্রবর্ত্তীরা হঠাৎ টের পাইলেন আমি পিছনে আছি। তখনই ভৎর্সনা করিয়া উঠিলেন, যাও, যাও, এখনি ফিরে যাও!—তাঁহাদের মনে হইয়াছিল বাহির হইবার মত সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্য কোন ভদ্র আচ্ছাদন নাই—ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোষাক-পরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না, সুতরাং কেবল সেই দিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর এক দিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।

সেই পিছনে আমার বাধা রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত ভূগোলে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

সে হয়ত আজ চল্লিশ বছরের কথা। তারপরে সে বাগানের পুষ্পিত চাঁপাতলার স্নানের ঘাটে আর এক দিনের জন্যও পদার্পণ করি নাই। সেই গাছপালা, সেই বাড়িঘর নিশ্চয়ই এখনো আছে—কিন্তু জানি সে বাগান আর নাই—কেননা বাগান ত গাছপালা দিয়া তৈরি নয় একটি বালকের নববিস্ময়ের আনন্দ দিয়া সে গড়া—সেই নববিস্ময়টি এখন কোথায় পাওয়া যাইবে?

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আবার ফিরিলাম। আমার দিনের পর দিন নর্ম্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মত প্রবেশ করিতে লাগিল।

কাব্যরচনাচর্চ্চা।

সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরু মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মত ভরিয়া উঠিতে চলিল বালকের আগ্রহপূর্ণ চঞ্চল হাতের পীড়নে প্রথমে তাহা কুঞ্চিত হইয়া গেল। ক্রমে তাহার ধারগুলি ছিঁড়িয়া কতকগুলি আঙুলের মত হইয়া ভিতরের লেখাগুলাকে যেন মুঠা করিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিল। সেই নীল ফুল্‌স্ক্যাপের খাতাটি লইয়া করুণাময়ী বিলুপ্তিদেবী কবে বৈতরণী কোন্ ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না। আহা তাহার ভবভয় আর নাই। মুদ্রাযন্ত্রের জঠরযন্ত্রণার হাত সে এড়াইল!

আমি কবিতা লিখি এ খবর যাহাতে রটিয়া যায় নিশ্চয় সে সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য ছিল না। সাতকড়ি দত্ত মহাশয় যদিচ আমাদের ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না তবু আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ছিল। তিনি "প্রাণি-বৃত্তান্ত" নামে একখানা বই লিখিয়াছিলেন। আশা করি কোনো সুদক্ষ পরিহাস-রসিক ব্যক্তি সেই গ্রন্থলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্নেহের কারণ নির্ণয় করিবেন না। তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি না কি কবিতা লিখিয়া থাক?—লিখিয়া যে থাকি সে কথা গোপন করি নাই। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই এক

পদ কবিতা দিয়া তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে:—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

আমার সেকালের কবিতাকে কোনোমতেই যে দুর্ব্বোধ বলা চলে না তাহারই প্রমাণস্বরূপে লাইন দুটোকে এই সুযোগে এখানেই দলিলভুক্ত করিয়া রাখিলাম:—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

ইহার মধ্যে যেটুকু গভীরতা আছে তাহা সরোবরসংক্রান্ত —অত্যন্তই স্বচ্ছ।

আর একটি কোনো ব্যক্তিগত বর্ণনা হইতে চার লাইন উদ্ধৃত করি আশা করি ইহার ভাষা ও ভাব অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রাঞ্জল বলিয়া গণ্য হইবে:—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

আমাদের ইস্কুলের গোবিন্দ বাবু ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষ। ইনি ছিলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্। কালো চাপকান পরিয়া দোতলায় তাঁহার আপিসঘরে খাতাপত্র লইয়া লেখাপড়া করিতেন। ইঁহাকে আমরা ভয় করিতাম। ইনিই ছিলেন বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক। একদিন অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে ইঁহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আসামী ছিল পাঁচ ছয় জন বড় বড় ছেলে, আমার পক্ষে সাক্ষী কেহই ছিল না। সাক্ষীর মধ্যে ছিল আমার অশ্রুজল। সেই ফৌজদারীতে আমি জিতিয়াছিলাম এবং সেই পরিচয়ের পর হইতে গোবিন্দ বাবু আমাকে করুণার চক্ষে দেখিতেন।

একদিন ছুটির সময় তাঁহার ঘরে আমার হঠাৎ ডাক পড়িল। আমি ভীতচিত্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি না কি কবিতা লেখ? কবুল করিতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করিলাম না। মনে নাই কি একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে তিনি আমাকে কবিতা লিখিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দ বাবুর মত ভীষণ গম্ভীর লোকের মুখ হইতে কবিতা লেখার এই আদেশ যে কিরূপ অদ্ভুত সুললিত তাহা যাঁহারা তাঁহার ছাত্র নহেন তাঁহারা বুঝিবেন না। পরদিন লিখিয়া যখন তাঁহাকে দেখাইলাম তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন। বলিলেন, পড়িয়া শোনাও। আমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া গেলাম।

এই নীতি কবিতাটির প্রশংসা করিবার একটিমাত্র বিষয় আছে—এটি সকাল সকাল হারাইয়া গেছে। ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ইহার নৈতিক ফল যাহা দেখা গেল তাহা আশাপ্রদ নহে। অন্তত এই কবিতার দ্বারায় শ্রোতাদের মনে কারর প্রতি কিছুমাত্র সদ্ভাব সঞ্চার হয় নাই। অধিকাংশ ছেলেই আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল এ লেখা নিশ্চয়ই আমার নিজের রচনা নহে। একজন বলিল, যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে। কেহই তাহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না। বিশ্বাস করাই তাহাদের আবশ্যক—প্রমাণ করিতে গেলে তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে। ইহার পরে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাহারা যে পথ অবলম্বন করিল তাহা নৈতিক উন্নতির প্রশস্ত পথ নহে।

এখনকার দিনে ছোটছেলের কবিতা লেখা কিছুমাত্র বিরল নহে। আজকাল কবিতার গুমর একেবারে ফাঁস হইয়া গিয়াছে। মনে আছে, তখন দৈবাৎ যে দুই একজন মাত্র স্ত্রীলোক কবিতা লিখিতেন তাঁহাদিগকে বিধাতার আশ্চর্য্য সৃষ্টি বলিয়া সকলে গণ্য করিত। এখন যদি শুনি কোনো স্ত্রীলোক কবিতা লেখেন না তবে সেইটেই এমন অসম্ভব বোধ হয় যে, সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। কবিত্বের অঙ্কুর এখনকার কালে উৎসাহের অনাবৃষ্টিতেও ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের অনেক পূর্ব্বেই মাথা তুলিয়া উঠে। অতএব বালকের যে কীর্ত্তিকাহিনী এখানে উদ্ঘাটিত করিলাম তাহাতে বর্ত্তমান কালের কোনো গোবিন্দ বাবু বিস্মিত হইবেন না।

শ্রীকণ্ঠবাবু।

এই সময়ে একটি শ্রোতালাভ করিয়াছিলাম—এমন শ্রোতা আর পাইব না। ভাল লাগিবার শক্তি ইঁহার

এতই অসাধারণ যে মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচক-পদলাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য। বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মত—অম্লরসের আভাসমাত্র বর্জ্জিত—তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশও ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোফদাড়ি-কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখবিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না, বড় বড় দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের পার্সিপড়া রসিক মানুষ, ইংরেজির কোনো ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্য-সঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্ব্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।

পরিচয় থাক্ আর নাই থাক্ স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষ মাত্রেরই প্রতি তাঁহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না। বেশ মনে পড়ে তিনি একদিন আমাদের লইয়া একজন ইংরেজ ছবিওয়ালার দোকানে ছবি তুলিতে গিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে হিন্দীতে বাংলাতে তিনি এমনি আলাপ জমাইয়া তুলিলেন—অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের মত তাহাকে এমন জোর করিয়া বলিলেন, ছবি তোলার জন্য অত বেশি দাম আমি কোনোমতেই দিতে পারিব না, আমি গরীব মানুষ,—না, না, সাহেব সে কিছুতেই হইতে পারিবে না—যে, সাহেব হাসিয়া সস্তায় তাঁহার ছবি তুলিয়া দিল। কড়া ইংরেজের দোকানে তাঁহার মুখে এমনতর অসঙ্গত অনুরোধ যে কিছুমাত্র অশোভন শোনাইল না তাহার কারণ সকল মানুষের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধটি স্বভাবত নিষ্কণ্টক ছিল—তিনি কাহারো সম্বন্ধেই সঙ্কোচ রাখিতেন না, কেননা, তাঁহার মনের মধ্যে সঙ্কোচের কারণই ছিল না।

তিনি এক একদিন আমাকে সঙ্গে করিয়া একজন য়ুরোপীয় মিশনরির বাড়িতে যাইতেন। সেখানে গিয়া তিনি গান গাহিয়া, সেতার বাজাইয়া, মিশনরির মেয়েদের আদর করিয়া, তাহাদের বুটপরা ছোট দুইটি পায়ের অজস্র স্তুতিবাদ করিয়া এমন করিয়া সভা জমাইয়া তুলিতেন তাহা আর কাহারো দ্বারা কখনই সাধ্য হইত না। আর কেহ এমনতর ব্যাপার করিলে নিশ্চয়ই তাহা উপদ্রব বলিয়া গণ্য হইত কিন্তু শ্রীকণ্ঠবাবুর পক্ষে ইহা আতিশয্যই নহে এই জন্য সকলেই তাঁহাকে লইয়া হাসিত, খুসি হইত।

আবার তাঁহাকে কোনো অত্যাচারকারী দুর্ব্বৃত্ত আঘাত করিতে পারিত না। অপমানের চেষ্টা তাঁহার উপরে অপমানরূপে আসিয়া পড়িত না। আমাদের বাড়িতে এক সময়ে একজন বিখ্যাত গায়ক কিছুদিন ছিলেন। তিনি মত্ত অবস্থায় শ্রীকণ্ঠবাবুকে যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। শ্রীকণ্ঠবাবু প্রসন্ন মুখে সমস্তই মানিয়া লইতেন, লেশমাত্র প্রতিবাদ করিতেন না। অবশেষে তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য সেই গায়কটিকে আমাদের বাড়ি হইতে বিদায় করাই স্থির হইল। ইহাতে শ্রীকণ্ঠবাবু ব্যাকুল হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। বারবার করিয়া বলিলেন, ও ত কিছুই করে নাই, মদে করিয়াছে।

কেহ দুঃখ পায় ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না। ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এই জন্য বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস বা শকুন্তলা হইতে কোনো একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত মেলিয়া নিষেধ করিয়া অনুনয় করিয়া কোনো মতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

এই বৃদ্ধটি যেমন আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলেরই সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত কবিতা শোনাইবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মেলে না। ঝরণার ধারা যেমন এক-টুকরা নুড়ি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া মাৎ করিয়া দেয় তিনিও তেমনি যে-কোনো একটা উপলক্ষ্য পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেন। দুইটি ঈশ্বরস্তব রচনা করিয়াছিলাম। তাহাতে যথারীতি সংসারের দুঃখ কষ্ট ও ভবযন্ত্রণার উল্লেখ করিতে ছাড়ি নাই। শ্রীকণ্ঠবাবু মনে করিলেন এমন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ

পারমার্থিক কবিতা আমার পিতাকে শুনাইলে নিশ্চয়ই তিনি ভারি খুসি হইবেন। মহা উৎসাহে কবিতা শুনাইতে লইয়া গেলেন। ভাগ্যক্রমে আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম না—কিন্তু খবর পাইলাম যে, সংসারের দুঃসহ দাবদাহ এত সকাল সকালই যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, পয়ারচ্ছন্দে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি খুব হাসিয়াছিলেন বিষয়ের গাম্ভীর্য্যে তাঁহাকে কিছুমাত্র অভিভূত করিতে পারে নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ গোবিন্দবাবু হইলে সে কবিতা দুটির আদর বুঝিতেন।

গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল "ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী।" ঐ গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝঙ্কার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক "ময় ছোড়োঁ," সেই খানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভাল লাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।

ইনি আমার পিতার ভক্ত বন্ধু ছিলেন। ইঁহারই দেওয়া হিন্দী গান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসঙ্গীত আছে—"অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে—ভুলোনারে তায়।" এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝঙ্কার দিয়া একবার বলিতেন অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে—আবার পাল্টাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন "অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে।"

এই বৃদ্ধ যেদিন আমার পিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন পিতৃদেব চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারের বাগানে ছিলেন। শ্রীকণ্ঠবাবু তখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত, তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, চোখের পাতা আঙুল দিয়া তুলিয়া চোখ মেলিতে হইত। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার কন্যার শুশ্রূষাধীনে বীরভূমের রায়পুর হইতে চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন। বহু কষ্টে একবারমাত্র পিতৃদেবের পদধূলি লইয়া চুঁচুড়ার বাসায় ফিরিয়া আসেন ও অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যার কাছে শুনিতে পাই আসন্ন মৃত্যুর সময়েও "কি মধুর তব করুণা প্রভো" গানটি গাহিয়া তিনি চিরনীরবতা লাভ করেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাপাঠ

(অনুবৃত্তি)

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই দেশকালপাত্রে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহা ত্রিগুণাত্মক, আর সমষ্টিসত্তা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহার অন্তর্ভূত সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দ রজস্তমোগুণ দ্বারা কলুষিত বা বাধিত হইতে পারে না। তবেই হইতেছে যে সমষ্টিসত্তা শুদ্ধসত্ত্বের, কিনা পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান এবং আনন্দের, আলয়। এককথায় সমষ্টি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা; আর সেইজন্য পরমাত্মার সচ্চিদানন্দ নাম আমাদের দেশের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রে সমস্বরে উদ্গীত হইয়াছে। ফলে, রজস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত পরমোৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ যে ঈশ্বরের বিশেষত্বের নিদান এ বিষয়ে পাতঞ্জল এবং বেদান্তদর্শনের মত-সাদৃশ্য অতীব সুস্পষ্ট। পাতঞ্জল-দর্শনের প্রথম পাদের ২৪ সূত্রে ঈশ্বর-শব্দের সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন করা হইয়াছে এইরূপ :—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

ইহার অর্থ এই :—

যিনি ক্লেশ এবং কর্ম্মবিপাকাশয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট সেই বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত পুরুষই ঈশ্বর-শব্দের বাচ্য।

ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো পুরুষই নিত্যকাল ক্লেশ এবং কর্ম্মবিপাকাশয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট নহে। কর্ম্মবিপাকাশয় যে কাহাকে বলে তাহা ভোজকৃত টীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে এইরূপ :—

"বিপচ্যন্তে ইতি বিপাকাঃ কর্ম্ম-ফলানি"—কর্ম্মফল যথাকালে পাকিয়া ওঠে এই অর্থে কর্ম্মবিপাক। "আফল-বিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেরতে ইত্যাশয়াঃ বাসনাখ্যাঃ

সংস্কারাঃ" —বাসনাখ্য সংস্কারগুলির যাবৎ পর্য্যন্ত না ফল-বিপাক হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সেগুলি চিত্তভূমিতে শয়ান থাকে (অর্থাৎ প্রসুপ্তভাবে নিলীন থাকে) এই অর্থে আশয়।

ভোজরাজ-কৃত এই পরিষ্কার সূত্র-ব্যাখ্যা হইতে আমরা পাইতেছি এই যে, কর্ম্মফলের প্রসুপ্ত বীজস্বরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কারের নামই কর্ম্মবিপাকাশয়। কথাটা আর কিছু না—আমরা যেরূপ যেরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি সেই সেই কর্ম্মের সংস্কার আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়, আর, তাহার পরে সেই সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কার হইতে সেই সেই কর্ম্মের ফলাফল যথাযথ সময়ে ফুটিয়া বাহির হয়। এই সকল কর্ম্মফলের বীজভূত সংস্কারের নাম বাসনা। এই রকমের যত সব বাসনা আমাদের মনের মধ্যে প্রগাঢ় অন্ধকারে নিলীন রহিয়াছে তাহাদের ভিতরে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি চলে না বলিয়া তাহারা সবসুদ্ধ ধরিয়া মোটের উপর অদৃষ্ট নামে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, সেই যে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাসনাখ্য সংস্কার-সমষ্টি—কর্ম্মবিপাকাশয়, যাহার আর এক নাম অদৃষ্ট, তাহার ভিতরে মূলেই যখন আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি চলে না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তাহা তমোগুণেরই আর এক নাম; তা ছাড়া, ক্লেশ যে রজোগুণের আর এক নাম তাহা পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি। তবেই হইতেছে যে, ক্লেশ এবং কর্ম্মবিপাকাশয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট বলাও যা, আর, রজস্তমোগুণ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট বলাও তা, একই কথা। সূত্রকার কোন্ দুই গুণ ঈশ্বরেতে নাই তাহা ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন—পরন্তু টীকাকার তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া কোন্ গুণ ঈশ্বরেতে সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাহা খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলিতে ত্রুটি করেন নাই। টীকাকার বলিতেছেন:—"যদ্যপি সর্ব্বেষাং আত্মনাং ক্লেশাদিসংস্পর্শো নাস্তি তথাপি চিত্তগত স্তেষাং উপচর্য্যতে। যথা যোদ্ধৃগতৌ জয়পরাজয়ৌ স্বামিনঃ। অস্য তু ত্রিষ্বপি কালেষু তথাবিধোঽপি ক্লেশাদি-পরামর্শো নাস্তি। অতঃ স বিলক্ষণ এব ভগবান ঈশ্বরঃ। তস্য চ তথাবিধং ঐশ্বর্য্যং সত্ত্বোৎকর্ষাৎ।"

ইহার অর্থ এই:—

"জীবাত্মাকে যদি তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় তবে জীবাত্মাতেও ক্লেশাদির সংস্পর্শ নাই" এ কথা সত্য হইলেও দেখিতে হইবে এই যে, রাজা যেমন তাঁহার সৈন্যবর্গের জয়পরাজয় আপনার গায়ে মাখিয়া ল'ন জীবাত্মা তেমনি তাঁহার অন্তঃকরণের ক্লেশাদি আপনার গায়ে মাখিয়া ল'ন; ঈশ্বরেতে কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালের কোনো কালেই সে রকম গায়ে মাখিয়া লওয়া ক্লেশাদিরও সংস্পর্শ নাই—এইজন্য ভগবান ঈশ্বর জীব হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। এইরূপ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোনো কালেই ক্লেশাদি দ্বারা স্বল্পমাত্রও সংস্পৃষ্ট-না-হওয়া-ব্যাপারটি সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের পরিচায়ক। অতএব সত্ত্বগুণের উৎকর্ষই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অর্থাৎ ঈশ্বরত্বের গোড়ার কথা। ভাব এই যে, ঈশ্বরেতে ঐরূপ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ আছে বলিয়াই তিনি ঈশ্বর। আমরা একটু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি সে কথাটি, অর্থাৎ "রজস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত পরমোৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের বিশেষত্বের কিনা ঈশ্বরত্বের নিদান" এই কথাটি শুধু যে কেবল পাতঞ্জলদর্শনের কথা তাহা নহে—বেদান্তদর্শনেও ঐ কথা বিধিমতে সমর্থিত হইয়াছে; প্রভেদ কেবল এই যে, পাতঞ্জলদর্শনের মতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের ঐশী প্রকৃতি, বেদান্তদর্শনের মতে উহা ঈশ্বরের মায়া-সংজ্ঞক উপাধি। তার সাক্ষী, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রণীত সর্ব্ববেদান্ত-সারসংগ্রহ গ্রন্থে ঈশ্বর-শব্দের সংজ্ঞানির্ব্বাচন উপলক্ষে তাঁহার বক্তব্য কথাটি আরম্ভ করিতেছেন এইরূপে:—

"মায়োপহিত চৈতন্যং সাভাসং সত্ত্ব-বৃংহিতং * * * ঈশ ইত্যপি গীয়তে।"

ইহার অর্থ এই:—

যে চৈতন্য মায়া উপাধিতে উপহিত, প্রতিবিম্ব সহ বর্ত্তমান, এবং সত্ত্বগুণ দ্বারা পরিপুষ্ট, তিনি ঈশ নামে অভিহিত হ'ন। "প্রতিবিম্ব সহ বর্ত্তমান" এ কথাটির ভাবার্থ এই যে, ঈশ্বর চৈতন্য উপাধিতে বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত হ'ন। পাতঞ্জলদর্শনের মতেও দ্রষ্টা পুরুষ সত্ত্বগুণপ্রধান বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হ'ন—আর শেষোক্ত দর্শনে ঐরূপ প্রতিবিম্বিত হওনের নাম দেওয়া হইয়াছে চিচ্ছায়াসংক্রান্তি।

পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থে মায়াশব্দের সহিত একযোগে ঈশ্বর-শব্দের সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন করা হইয়াছে এইরূপ ঃ—

"চিদানন্দময়ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতি দ্বিবিধা চ সা।
সত্ত্বশুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে॥
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যঃ * * ॥"

ইহার অর্থ এই ঃ—

"চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বসমন্বিতা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী এবং তাহা দুই প্রকার—শুদ্ধসত্ত্বরূপিনী ও মলিনসত্ত্বরূপিনী। শুদ্ধসত্ত্বরূপিনী প্রকৃতির নাম মায়া, আর, মলিনসত্ত্বরূপিনী প্রকৃতির নাম অবিদ্যা। যিনি সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপিনী মায়াকে বশীভূত করিয়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত হ'ন তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বলিয়া অবধারিতব্য; আর, সেই যে মলিনসত্ত্বরূপিনী প্রকৃতি অবিদ্যা—ঈশ্বর ব্যতীত আর সকলেই সেই অবিদ্যার বশতাপন্ন।" মলিনসত্ত্ব-শব্দের অর্থ যে রজস্তমোগুণ দ্বারা বাধাগ্রস্ত সত্ত্বগুণ তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে।

এখানটিতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে সহজেই একটি প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে এই যে, গোড়া'র সেই যে শুদ্ধসত্ত্বময়ী সমষ্টিসত্তা তাহা সমস্তেরই গোড়া'র কথা ইহা কেহই অস্বীকার করেনও না করিতে পারেনও না, অথচ আমাদের চর্ম্মচক্ষের বা মনশ্চক্ষের সম্মুখে যখন যে-কোনো সত্তা উপস্থিত হয় সমস্তই যে ত্রিগুণাত্মক ব্যষ্টিসত্তা এ কথাটি আমাদের আটপহুরিয়া দেখা কথা; তার সাক্ষী—এই যে একটি বৃত্তান্ত—যে, আমার সত্তা স্বতন্ত্র, তোমার সত্তা স্বতন্ত্র, এবং তৃতীয় যে-কোনো ব্যক্তির নাম করিবে তাহার সত্তা স্বতন্ত্র;—প্রত্যেক মনুষ্যের, প্রত্যেক জীবের, প্রত্যেক জড়পরমাণুর সত্তা স্বতন্ত্র—এ বৃত্তান্তটি পৃথিবীসুদ্ধ আপামর সাধারণ সমস্ত লোকই অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, ঐ সর্ব্ববাদিসম্মত গোড়া'র কথাটির সঙ্গে শেষের এই দেখা কথাটি থাপ খাইবে কিরূপে? গোড়া'র সেই শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন অপরিচ্ছিন্ন মহাসত্তাই সর্ব্বেসর্ব্বা ইহাতে যখন ভুল নাই, তখন শেষের এই ত্রিগুণাত্মক ব্যষ্টিসত্তার দলবল বসিবার স্থান পাইবেই বা কোথায়, আসিবেই বা কোথা হইতে? এই দুরূহ প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে হইলে বেদান্ত-দর্শন এবং পাতঞ্জল-দর্শনের মধ্যে ঈশ্বর বিষয়ে যে স্থানটিতে সম্পূর্ণ ঐকমত্য আছে সেই স্থানটি বিধিমতে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। সে স্থানটি আমি যথাবৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—প্রণিধান কর ঃ—

পাতঞ্জল-দর্শনের প্রথম পাদের ২৪ সূত্রের ভোজরাজকৃত টীকার যতখানি অংশ আমরা একটু পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, টীকাকার তাহার অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন—

"তস্য চ তথাবিধং ঐশ্বর্য্যং অনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ; সত্ত্বোৎকর্ষশ্চ প্রকৃষ্ট জ্ঞানাদেব। ন চানয়োঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্যয়োঃ ইতরেতরাশ্রয়ত্বং, পরস্পরানপেক্ষত্বাৎ।"

ইহার অর্থ এই ঃ—

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অর্থাৎ ঈশ্বরত্বের গোড়া'র কথা হ'চ্চে অনাদি সত্ত্বোৎকর্ষ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ, এবং সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের গোড়া'র কথা হ'চ্চে প্রকৃষ্ট জ্ঞান। এইরূপ আমরা দুইটি বিষয় পাইতেছি; একটি বিষয় হ'চ্চে জ্ঞান, আর একটি বিষয় হ'চ্চে ঐশ্বর্য্য দুইই একাধারে বর্ত্তমান, তথাপি ও দুইটি পৃথক্ থাকের বিষয়, কেন না উভয়ে পরস্পরকে অপেক্ষা করে না। ভোজরাজের এ কথাটির তাৎপর্য্য যে কি তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি তাহা এই ঃ—

সেশ্বর এবং নিরীশ্বর উভয়বিধ সাংখ্যের মতেই দ্রষ্টা পুরুষ স্বতই জ্ঞানস্বরূপ; তবেই হইতেছে যে দ্রষ্টাপুরুষের জ্ঞান অপর কিছুকে অপেক্ষা করে না। তেমনি আবার প্রকৃতির সত্ত্বগুণ প্রকৃতির নিজস্ব সম্পত্তি, সুতরাং সত্ত্বগুণের জন্য প্রকৃতি অপর কাহারো নিকটে ঋণী নহে। সাধারণ সাংখ্য-দর্শনের মতে দ্রষ্টাপুরুষ মাত্রেই জ্ঞানস্বরূপ; তাহার মধ্যে পাতঞ্জল সাংখ্যদর্শনের বিশেষ একটি কথা এই যে, ঈশ্বর যদি চ জীবেরই ন্যায় দ্রষ্টাপুরুষ—কিন্তু তথাপি একটি বিষয়ে কোন জীবেরই তাহার সহিত তুলনা হয় না; সে বিষয়টি হ'চ্চে এই যে, নিত্যকাল প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশের সহিত ঈশ্বরের একাত্মভাব যাহা ঈশ্বর ব্যতীত অপর কোনো দ্রষ্টাপুরুষেরই অধিকারায়ত্ত নহে। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে একদিকে দ্রষ্টাপুরুষ

স্বয়ং জ্ঞানের নিদান, এবং আর এক দিকে প্রকৃতি সার-ভূত বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ শক্তির বা ঐশ্বর্য্যের নিদান; এই দুই দিকের ঐ যে দুই সার বস্তু অর্থাৎ পুরুষের দিকের সারবস্তু জ্ঞান এবং প্রকৃতির দিকের সারবস্তু বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ যাহার আর এক নাম মহাশক্তি বা মহৈশ্বর্য্য এই দুই সারবস্তুর অনাদি একাত্মভাবই পাতঞ্জল-দর্শনের মতে ঈশ্বরতত্ত্বের নিদান। ফল-কথা এই যে, পাতঞ্জলদর্শনের মতে দুইটি অনন্যসাধারণ গুণ ঈশ্বরেতে একাধারে বর্ত্তমান—একটি হ'চ্চে অপরিসীম জ্ঞান এবং আরেকটি হ'চ্চে অপরিসীম শক্তি। বেদান্তদর্শনের মতেও তাই; তার সাক্ষী শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"সর্ব্বশক্তিগুণোপেতঃ সর্ব্বজ্ঞানাবভাসকঃ।
স্বতন্ত্রঃ সত্যসংকল্পঃ সত্যকামঃ স ঈশ্বরঃ॥
তস্যৈতস্য মহাবিষ্ণো মহাশক্তি র্মহীয়সঃ।
সর্ব্বজ্ঞত্বেশ্বরত্বাদিকারণত্বান্মনীষিণঃ।
কারণং বপুরিত্যাহুঃ সমষ্টিং সত্ত্বরংহিতম॥"

ইহার অর্থ এই:—

যিনি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ স্বতন্ত্র সত্যসংকল্প এবং সত্যকাম তিনিই ঈশ্বর। সেই মহাবিষ্ণু মহীয়ান পরমেশ্বরের যে এক মহতীশক্তি আছে, যাহার আর এক নাম সমষ্টিভূত সত্ত্বগুণ, সেই মহাশক্তি যেহেতু সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং ঈশ্বরত্বাদির কারণ এই জন্য মনীষীরা সেই সত্ত্বগুণের সমষ্টিরূপা মহতী-শক্তির নাম দিয়াছেন কারণশরীর। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জল এবং বেদান্ত উভয় দর্শনেরই মতে মহাশক্তি এবং মহৈশ্বর্য্যের নিদান-ভূত বাধাবিহীন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞান দুইই একাধারে বিদ্যমান।

প্রকাশ এবং আনন্দ যে সত্ত্বগুণের ডা'ন হাত বাঁ হাত—এ বিষয়টি আমি পূর্ব্বে বিধিমতে বিবৃত করিয়া বলিয়াছি; কিন্তু সাত্ত্বিক আনন্দের সঙ্গে যে একটি শক্তির ব্যাপার মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে সে বিষয়টির সম্বন্ধে আমি এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত মূলেই কোনো কথার উচ্চবাচ্য করি নাই। অথচ আমাদের দেশের বেদ পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্রেরই একটি প্রধান মন্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতি পুরুষের সহযোগ ব্যতিরেকে অথবা যাহা একই কথা—জ্ঞান এবং শক্তির সহযোগ ব্যতিরেকে জগৎকার্য্যের প্রবাহ তো চলিতে পারেই না, তা ছাড়া—জগৎ বলিয়া একটা পদার্থ হইতেই পারে না; এমন কি নব্যতম যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতেও বিশ্বভুবনে শক্তির বিকাশ এবং জ্ঞানের প্রকাশ জোড়ে মিলিয়া এক সঙ্গে উন্নতিপথে অগ্রসর হয়। এক্ষণে সেই কথাটি অর্থাৎ সাত্ত্বিক আনন্দের সহিত একটি মৌলিক ধাঁচার শক্তি একত্রে বাস করিতেছে এই কথাটি শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টিক্ষেত্রে আনিয়া দাঁড় করাইবার সময় উপস্থিত, এই জন্য তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, "আমি ভূতকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটির প্রকাশ যেমন আমার মনের মধ্যে ক্রমাগতই লাগিয়া আছে, তেমনি সেই প্রকাশের সঙ্গে ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছে আর সেই সঙ্গে এটাও বলিয়াছি যে, সেই যে ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা তাহার গোড়ার কথা হ'চ্চে আত্মসত্তা'র রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞানবান্ জীবের মর্ম্মাধিষ্ঠিত সেই যে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা, সে ইচ্ছাটি কি বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইবার ন্যায় কেবল ইচ্ছামাত্রেই পর্য্যবসিত? সত্তার রসবোধ যখন সত্তার প্রকাশের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সেই রসবোধজনিত আনন্দ হইতে যখন বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রসূত হইয়াছে, তখন সেই ইচ্ছার মূলে তাহাকে ফলবতী করিতে পারিবার মতো কোনো সহায়-সামর্থ্য কি বিদ্যমান নাই—শক্তি বিদ্যমান নাই? প্রকৃত কথা এই যে, অভীষ্ট-সাধনে সাধকের শক্তি আছে কি না তাহা কার্য্যাভিব্যক্তির পূর্ব্বে জানা যাইতে পারে না; কেবল "ফলেন পরিচীয়তে" এই চির-কেলে প্রবাদটিই শক্তি পরীক্ষার একমাত্র কষ্টিপাথর। বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা তো জ্ঞানবান্ মনুষ্যমাত্রেরই আছে; কিন্তু ইচ্ছা যেমন আছে, তেমনি মনুষ্য-জাতির বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তি আছে কি না তাহা ফলেন পরিচীয়তে'র কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখা যা'ক্। সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকেরা মনুষ্য অপেক্ষা শতগুণ বলবান্, তা ছাড়া তাহারা যেরূপ দুর্ভেদ্য চর্ম্মবর্ম্মে এবং আশুকার্য্যদর্শী দন্তনখাস্ত্রে সুসজ্জিত, মনুষ্য তাহার তুলনায় নিতান্তই অসম্পূর্ণ জীব; কেন না বর্ত্তিয়া থাকিবার জন্য যে সকল সাধনোপকরণ

তাহার পক্ষে আশু প্রয়োজনীয়, প্রকৃতিমাতা তাহাকে তাহার শতাংশের একাংশও দে'ন নাই; অথচ ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, সেই সহায়সম্পত্তিবিহীন অসম্পূর্ণ জীবের দোর্দণ্ড প্রতাপে পশুরাজ্যের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত থরহরি কম্পমান। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে যে বাধাবিঘ্নের প্রতিকূলে বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তি মনুষ্যের ভিতরে যেমন আছে এমন আর কোনো জীবের ভিতরেই নাই। তা ছাড়া, আর একটি কথা আছে সে কথাটি সবিশেষ দ্রষ্টব্য। সে কথা এই যে, মনুষ্যের বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তি যে, পশ্বাদি জন্তুদিগের ঐরূপ শক্তি অপেক্ষা মাত্রায় শুধু বেশী তাহা নহে, পরন্তু মনুষ্যের আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত পশ্বাদি জন্তুদিগের প্রাকৃত শক্তির তুলনাই হয় না। পূর্ব্বে এই যে একটি কথা আমি বলিয়াছি যে, বাধার অনুভূতিই—দুঃখই—রজোগুণই, বিশেষতঃ দুইটি মূর্ত্তিমান রজোগুণ কাম এবং ক্রোধ জীবজন্তুদিগের জীবনসংগ্রামের প্রধান সেনাপতি, এ কথা মনুষ্যের পক্ষে খাটে না। মনুষ্যের কার্য্য-কলাপের প্রতি একটু স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মনুষ্যের জীবনসংগ্রামে বাধানুভূতি সেনাপতি অপেক্ষা অনেক নিম্নপদবীস্থ যোদ্ধা; এই উচ্চ শ্রেণীর জীবনসংগ্রামে সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দই প্রধান সেনাপতি-পদের যোগ্য পাত্র। মনুষ্যের এই বিশেষত্বটি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক; কেন না বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ের সম্বন্ধে উহার গুরুত্ব অপরিমেয়। একটি লোকপ্রসিদ্ধ ইংরাজি প্রবাদ এই যে, Necessity is the mother of invention, বাধানুভূতিই কার্য্যকৌশলের জননী। মানিলাম যে, কার্য্যকৌশলের জননী বাধানুভূতি, কিন্তু তাহার জনক কে? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, তাহার জনক হ'চ্চে সত্তার রসবোধজনিত আনন্দ। যদি প্রমাণ চাও তবে মনুষ্যের নীচের থাকের জীবজন্তুদিগের স্বভাবচরিত্র এবং আচার ব্যবহারের প্রতি একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেই অনায়াসে তাহা তুমি পাইতে পার। তাহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ তোমাকে আমি দেখাইতেছি—প্রণিধান কর। একটা বলবান্ গরিল্লা যদি কোনো মনুষ্যের হস্তের লগুড় দ্বারা আহত হয়, তবে খুব সম্ভব যে, গরিল্লাটা বাধানুভূতিজনিত ক্রোধের উত্তেজনায় সেই লগুড়টা প্রহারকের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহা ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। বাধানুভূতির বিস্তার দৌড় ঐ পর্য্যন্ত; তা বই, বাধানুভূতি যে, গুরুর আসনে উপবিষ্ট হইয়া গরিল্লাকে গাছের একটা লম্বাচওড়া গোচের ডাল ভাঙিয়া ভীমের গদার ন্যায় একগাছি আশুফলপ্রদ লগুড় নির্ম্মাণ করিতে শিখাইবে, তাহার সে কোনো অংশেই যোগ্য পাত্র নহে। আদিম মনুষ্যেরাও এক সময়ে নদী কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে সাঁতার দিয়া নদী পার হইত। কিন্তু সে প্রকার বাধার অনুভূতি কোন জন্মেই মনুষ্যকে নৌকা নির্ম্মাণ করিতে শেখায় নাই ইহা বেদবাক্য। মনুষ্যের নৌকা-নির্ম্মাণ-বিদ্যার আদিগুরু তবে কে? মনুষ্য-নাবিকের আদিগুরু যে কে তাহা নৌকার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। নৌকার গঠন দেখিলেই জহরী লোকের চক্ষে এ কথা ঢাকা থাকে না যে নৌকা এক-প্রকার কাঠের হাঁস। আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, আদিম মনুষ্য-নাবিককে সর্ব্বপ্রথমে হাল-বর্জ্জিত দু-দেড়ে ডিঙিতে ভর করিয়া নদনদী-সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় ঘোরাফেরা করিতে শিখাইয়াছিল হংসাচার্য্য এমন কি, উত্তর মেরুপ্রদেশীয় এস্কুইমো জাতীয় নাবিকেরা এখনো পর্য্যন্ত ঐ ধাঁচার ডিঙিতে ভর করিয়া সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় ঘোরাফেরা করে। তাহার অনেক শতাব্দী পরে মনুষ্য-নাবিককে হালওয়ালা চারদেড়ে নৌকায় ভর করিয়া জলপথে ভ্রমণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিল মৎস্যাচার্য্য। তাহার কতিপয় শতাব্দী পরে মনুষ্য-নাবিককে মাঝসমুদ্র দিয়া পা'ল-ভরে জাহাজ চালাইতে শিক্ষা দিয়াছিল নাবিক-নামক (অর্থাৎ Nautilus নামক) একপ্রকার ভূমধ্যসাগর-নিবাসী জলজন্তু। এ তো গেল মনুষ্য-নাবিকের সামান্য-শ্রেণীর গুরুপরম্পরা। কিন্তু পিতা গুরুর গুরু—যেহেতু পিতারাই বালকদিগকে উপযুক্ত গুরুগণের নিকটে প্রেরণ করিয়া তাহাদের জ্ঞানোদ্দীপনের পথ প্রমুক্ত করিয়া দ্যান। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে আদিম নাবিকদিগের পিতৃ-তুল্য গুরুর গুরু কে? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে,

আদিম নাবিকদিগের গুরুর গুরু হ'চ্চেন সেই মহাপুরুষ যাঁহাকে আমি বলিতেছি সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। আদিম নাবিক যে খুব একজন ভাবুক লোক ছিলেন—কবি ছিলেন—তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। তিনি যখন ভাবে গদ্‌গদ হইয়া, হংসমিথুন কিম্বা হংসযূথ অপূর্ব্ব সুন্দর ঠামে সরোবরবক্ষে গা ভাসাইয়া জল কাটিয়া চলিতেছে দেখিতেন তখন তাহা তিনি এরূপ কায়মনঃপ্রাণে দেখিতেন যে সেই হংসযূথের জলতরণের অপূর্ব্ব ভাবসৌন্দর্য্যে তিনি তাঁহার অন্তর্নিগূঢ় বিমল আনন্দকে চক্ষের সম্মুখে যেন প্রত্যক্ষবৎ মূর্ত্তিমান দেখিতেন। এই থেকে সুরু করিয়া হংসযূথের অনুপম ঢঙের সন্তরণলীলা তাঁহার মনকে এরূপ পাইয়া বসিল যে, অবশেষে তিনি তাঁহার অন্তরের ভাবটিকে দারুখণ্ডে মূর্ত্তিমান না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। ইতিহাসে তো স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যজাতীয় মনুষ্যমণ্ডলীর আদি-গুরুরা বিশিষ্ট রকমের কবি ছিলেন, আর সেই সঙ্গে এটাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যেরা গুরুপরম্পরাগত কবিত্বরসাভিষিক্ত প্রাণ-ঘ্যাঁসা জ্ঞানের পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে বহুকালের পরে সাধন-ঘ্যাঁসা বিজ্ঞান-পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তার সাক্ষী—আগে বেদ, পরে বেদান্ত। বেদশাস্ত্র আদিম কবিদিগের অন্তর্নিগূঢ় আনন্দের, অথবা যাহা একই কথা, সত্ত্বগুণপ্রধান প্রকৃতির, অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস বলিয়া আমাদের দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী বেদশাস্ত্রের উপরে অপৌরুষেয় বিশেষণ আরোপ করিয়া থাকেন। আমি তাই বলিতেছি যে, নৌকানির্ম্মাণ, মন্দিরনির্ম্মাণ, কাব্য-রচনা প্রভৃতি মানবীয় কার্য্যকৌশলে জননী যেমন বাধানুভূতি, জনক তেমনি সেই মহাপুরুষ যাহাকে আমি বলিতেছি সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ। আমরা এইরূপ ফলেন-পরিচীয়তের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এই শুভ বার্ত্তাটির সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইলাম যে, সত্ত্বগুণের আনন্দ-অবয়বটির সহিত মনুষ্যের বিশ্ববিজয়ী সাধনীশক্তি মাথামাথিভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ঐ কষ্টিপাথরের প্রামাণিকতায় ভর করিয়া এতক্ষণের পরে আমরা যে একটী সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহা এই যে, জ্ঞানবান্ জীবমাত্রেরই অন্তঃকরণে যেমন বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা আছে তেমনি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তিও তাহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে; আর মনুষ্যের সেই যে বিশ্ববিজয়ী শক্তি তাহার গোড়া'র কথা হ'চ্চে সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ। আগামী বারে সমষ্টিসত্তা এবং ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে কিরূপ শক্তিঘটিত সম্বন্ধ তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে—আজ আর পুঁথি বাড়াইব না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দিবা স্বপ্ন

(অলিভ শ্রীনার হইতে)

বাহিরে ছেলেরা খেলিতেছে; ঘরে খোলা জানালায় উঁহাদের মা বসিয়া আছেন। জানালা দিয়া অপরাহ্নের তপ্ত হাওয়ার হল্কার সঙ্গে ছেলেদের কলরব আসিতেছে। কয়েকটা ভোম্‌রা ফুলের পরাগে একেবারে হলুদ বর্ণ হইয়া ক্রমাগত ঘরের ভিতর দিয়া শিরীষবনে আনাগোনা করিতেছে। তাহাদের গুঞ্জনের আর বিশ্রাম নাই।

স্ত্রীলোকটি একখানি নীচু চৌকীর উপর বসিয়া সেলাই করিতেছেন; সম্মুখে সেলাইয়ের বাক্স। হাঁটুর উপরে একখানি বই,—খানিকটা সেলাইকরা কাপড়ে প্রায় ঢাকা পড়িবার মত হইয়াছে।

ছুঁচসুতার ডুব সাঁতার দেখিতে দেখিতে স্ত্রীলোকটির চোখ ঢুলিয়া আসিতে লাগিল; হাত আর চলে না। শেষে ভোম্‌রার গুঞ্জনে এবং ছেলেদের কলরবে এম্‌নি গোল পাকাইয়া গেল যে তাঁহাকে চোখ দুটা বুজিতেই হইল। তিনি সেলাই রাখিয়া দিয়া হাতের উপর মাথা রাখিলেন। কয়েকটা ভোম্‌রা আসিয়া তাঁহার কানের কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া গুন গুন করিতে আরম্ভ করিল। ছেলেদের আওয়াজ কখনো দূরে কখনো কাছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল; ঠিক যেন স্বপ্নের মত! তারপর সেই গুঞ্জন-কলরব হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল; আর ঠিক সেই সময়ে, স্ত্রীলোকটি তাঁহার গর্ভশায়ী অষ্টম সন্তানটিকে যেন বুকের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলেন। তন্দ্রার ঘোরে, এম্‌নি করিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে

এক অদ্ভুত নাট্যলীলা জমিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন, ভোম্‌রাগুলা ক্রমশ লম্বা হইতে হইতে শেষে মানুষের মত মস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে একটা আবার তাঁহার কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল, "তোমার বুকের যে জায়গাটিতে তোমার শিশু ঘুমাইতেছে সেইখানটিতে আমায় হাত রাখিতে অনুমতি কর; আমি উহাকে ছুঁইলে ও ঠিক আমারি মত হইবে।"

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে বাছা?" সে বলিল "আমি স্বাস্থ্য; আমি যাহাকে স্পর্শ করি তাহার শিরা-উপশিরায় রক্তের অরুণধারা নৃত্য করিয়া ফিরে; সে ক্লান্তি জানিতে পায় না, বেদনা বুঝিতে পারে না; জীবনযাপন তাহার পক্ষে আনন্দ-হাস্যের মত সহজ হইয়া ওঠে।"

আরেকজন বলিল "উঁহুঁ, অমন কাজও করিয়ো না। বরং, আমাকে ছুঁইতে দাও: আমি হইতেছি ঐশ্বর্য্য! আমি যাহাকে স্পর্শ করি, ঘৃত-লবণ-তৈল তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধনের ভাবনা তাহাকে আর ভাবিতে হয় না। ইচ্ছা থাকিলে, সে অনেক দরিদ্রের অস্থি-মজ্জা পেষণ করিয়া অনায়াসে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইয়া লইতে পারে। দুই চক্ষু যাহা চায়, দুর্লভ হইলেও, আমার অনুগ্রহে দুই হস্ত তাহা পাইবেই। অভাবের কষ্ট সে জানিতেও পারে না।"

গর্ভস্থ শিশু পাথরের মত নিথর হইয়া রহিল।

আর একজন বলিল "দাও, দাও, আমায় ছুঁইতে দাও, আমার নাম কীর্ত্তি। আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহাকে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় বসাই—যাহাতে সকলে তাহাকে দেখিতে পায়। মৃত্যু তাহার পক্ষে বিস্মৃতির বৈতরণী নয়। যুগে যুগে তাহার নাম মুখে মুখে ফিরিতে থাকে। একবার ভাবিয়া দেখ—চিরস্মরণীয়!"

নিদ্রিতা নারীর নিশ্বাস প্রশ্বাস একভাবেই পড়িতে লাগিল; স্বপ্ন কিন্তু ক্রমশঃই ঘনাইতে লাগিল।

এই সময়ে একজন বলিয়া উঠিল "দাও, দাও, ওগো আমায় ছুঁইতে দাও, একটিবার আমায় ছুঁইতে দাও, আমার নাম ভালবাসা। আমি যাহাকে ছুঁই জীবনে সে কখনো অসহায় থাকে না; অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়াইলে সে অন্ততঃ আর একখানি হাতের স্পর্শ পায়। জগৎ যদি বাকিয়া দাঁড়ায়, তবুও, এমন একজন তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেই, যে, জোর করিয়া বলিতে পারে, 'তুমি আছ আর আমি আছি!'"

গর্ভশায়ী পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সকলকে ঠেলিয়া, এমন সময়ে একজন খুব ঘেঁষিয়া আসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল "আমি ছুঁইব, আমার নাম নৈপুণ্য। যে সমস্ত কাজ পূর্ব্বে কেহ করিয়াছে সে সমস্তই আমি অনায়াসে করিতে পারি। আমি যে যোদ্ধাকে ছুঁই সে 'মেডেল্' পায়; যে বিদ্যার্থীকে ছুঁই সে 'ডিগ্রি' পায়; যে পণ্ডিতকে ছুঁই সে বড় মানুষ হয়, পাকা বাড়ী করে, গাড়ী চড়ে। সিদ্ধিলাভ তাহার অবশ্যম্ভাবী। আর যে লেখককে আমি অনুগ্রহ করি সে বর্ত্তমান ভাব ও রুচির উপরে উঠিতে পারে না বটে, নীচেও কিন্তু নামে না। আমি ছুঁইলে নিষ্ফলতার জন্য কাঁদিতে হয় না।"

ভোম্‌রাগুলা উড়িয়া উড়িয়া নিদ্রিতা জননীর অলক-স্পর্শ করিতেছিল। স্বপ্নের ঘোর এখনো ভাঙে নাই। তাঁহার মনে হইতেছিল, ঘরের অন্ধকার কোণের দিক হইতে আরও একজন যেন তাঁহার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। উহার চেহারা শীর্ণ, চক্ষু উজ্জ্বল, মুখ হাস্য-স্পন্দিত অথচ পাণ্ডুর। সে হাত বাড়াইল। স্ত্রীলোকটি সঙ্কুচিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "কে তুমি?" সে উত্তর দিল না। তখন তিনি তাহার চোখের দিকে দৃঢ়ভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমার ছেলেকে কী দিবে? স্বাস্থ্য?" সে বলিল "আমি যাহাকে স্পর্শ করি তাহার রক্ত জ্বরের জ্বালার মত দুঃসহ তাপে জ্বলিতে থাকে। আমি যে জ্বালা দিয়া যাই তাহা চিতার জ্বলনের সঙ্গে একেবারেই নির্ব্বাপিত হয়!"

"তুমি ঐশ্বর্য্য?" সে মাথা নাড়িল, বলিল "না, আমি যাহাকে ছুঁই সে নীচে দেখে সোনা, উপরে দেখে জ্যোতি! জ্যোতির জন্য সে ঊর্দ্ধে চায়; হাতের সোনা খসিয়া পড়ে, পথের লোকে কুড়াইয়া লয়!"

"কীর্ত্তি?" সে বলিল "খুব সম্ভব তাহার উল্টা। আমি যাহাকে ছুঁই সে অনুর্ব্বর মরু প্রান্তরের মধ্যেও, অদৃশ্য অঙ্গুলির নির্দ্দেশে, সুপথের চিহ্ন দেখিতে পায়, সে পথ

অন্যের অগোচর। তাহার গতি কিন্তু ঐ পথেই। সে পথ পাহাড়ের উপরেও তোলে, আবার, খদের তলেও ফেলিয়া দেয়।"

"ভালবাসা?" "ভালবাসা সে চাহিবে, দুর্ভিক্ষের লোক যেমন করিয়া ভিক্ষামুষ্টি চায় ঠিক তেমনি আগ্রহেই চাহিবে; কিন্তু, পাইবে কি না সন্দেহ। সে প্রাণপণে ভালবাসিবে, ঈপ্সিতের দিকে অন্তরের বাহু প্রসারিত করিয়া দিবে; কিন্তু নাগাল পাইতে না পাইতে দিগন্তের কোলে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইবে! মুগ্ধ সে বিদ্যুতের দিকেই ছুটিবে। এবার তাহাকে একাই যাইতে হইবে; কারণ, যাহাকে সে ভালবাসে সে পাগলের সঙ্গে দুর্গম পথে চলিতে রাজী হইবে না। যখনি সে 'আমার' বলিয়া নিজের তপ্ত বক্ষে কাহাকেও নিবিড় করিয়া ধরিবে তখনি সে শুনিবে, কে যেন বলিতেছে 'বর্জ্জন কর, বর্জ্জন কর; ও তো তোমার বাঞ্ছিত নয়! ভুল করিও না; তোমার গ্রহণীয় উহা নয়'।"

"তবে? সার্থকতা?" "না,—বরং ব্যর্থতা। আমি যাহাকে ছুঁই, তাহার কামনার ধন অন্যে লাভ করিবে; কারণ, অশরীরী বাণী তাহাকে আহ্বান করিবে। দিকে দিকে তাহাকে ছুটিতে হইবে। অলখ্ আলোক তাহাকে ইঙ্গিত করিবে, সে সংসার পাতিয়া এক জায়গায় বসিতে পারিবে না। তাহাকে ঐ বাণী শুনিতে হইবে, ঐ ইঙ্গিতের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, সে পথের মাঝখানে দল-ছাড়া হইয়া পড়িবে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, সাধারণ লোকে, যে তপ্ত বালুকা-বিস্তারকে মরুভূমি বলিয়াই জানে, সে তাহারি মাঝখানে, একখানি নীলার মত, স্নিগ্ধ নীল সাগরের দর্শন পাইবে। সাগরের মধ্যে দ্বীপ, দ্বীপের উপর পাহাড়, সেই পাহাড়ের চূড়া সে সোনায় মণ্ডিত দেখিবে!"

জননী জিজ্ঞাসা করিলেন "সোনার পাহাড়ে পৌঁছিতে পারিবে?" পাংশু মূর্ত্তির মুখ অপূর্ব্ব কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রসূতি আবার বলিলেন "সে কি যথার্থ সোনা?" সে কহিল "যথার্থ আবার কী?" প্রসূতি তাহার অর্দ্ধ নিমিলিত চক্ষের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "ছুঁইয়া যাও!"

সে নত হইয়া নিদ্রিতাকে স্পর্শ করিল, এবং মৃদুস্বরে বলিল, "এই তোমার পুরস্কার, ধ্যানের বস্তুই তোমার কাছে সকলের চেয়ে বাস্তব হইয়া উঠিবে।"

গর্ভশায়ী শিশু আবার পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল। জননীর সুষুপ্তি গভীরতর হইয়া আসিল, স্বপ্ন তলাইয়া গেল। কিন্তু, তাঁহার গর্ভে যে অজাত শিশুটি শায়িত ছিল, সেও এক স্বপ্ন দেখিতেছিল। যে চক্ষে এখনো আলোকের সাড়া জাগে নাই, যে মস্তিষ্ক আজিও পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাহার মধ্যে আলোকের অনুভূতি বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। যাহা এ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করে নাই—সেই আলোক! হয় তো সে যাহা কখনও দেখিবে না—সেই আলোক! যাহা অন্যত্র বাস্তব—সেই আলোক।

ইহার মধ্যেই সে ধন্য হইয়া গেল, অজানা ধ্যানের বস্তু তাহার কাছে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জয়মতী

আসামের ইতিহাস অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলে, নারী চরিত্রের একটী উচ্চ ও সুমহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে প্রতিভাসিত হয়। শিবসাগর জেলার প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী জয়মতী সপ্তদশ শতাব্দীতে সহিষ্ণুতার ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অমরধামে গমন করিয়াছিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। জয়মতী রাণীর অপূর্ব্ব কাহিনী অতীতযুগের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি সতীর পতিপ্রেমের কথা স্মৃতিপটে জাগরূক করিয়া দেয়, এবং আসামেরও এক অতীত গৌরবের দিনের ছায়া হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেয়।

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজা চক্রধ্বজ সিংহ আহোম রাজ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। ইনি সাত বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত রাজত্ব করিয়া ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হয়েন। তারপরে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আসাম রাজ্যের ভয়ানক দুর্দ্দিন গিয়াছে। উপযুক্ত তেজস্বী ও ক্ষমতাশালী পুরুষের অভাবে রাজশক্তির অপলাপ হওয়াতে মন্ত্রিবর্গের প্রাধান্য

কিছুকাল আসামে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করে। রাজা চক্রধ্বজ সিংহের পরে তদীয় ভ্রাতা উদয়াদিত্য ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। মাত্র দুই বৎসরকাল রাজত্ব করার পরে উঁহাকে মন্ত্রিগণ বিষপান করাইয়া হত্যা করে। তারপরে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসরের ভিতরে ক্রমান্বয়ে পাঁচজন রাজা আহোম রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ইহার মধ্যে তিনজনকে মন্ত্রিগণ হত্যা করে, একজন নিজে আত্মঘাতী হন ও অপর একজন রোগগ্রস্ত হইয়া স্বর্গগত হন। বস্তুতঃ সেই সময় রাজা একটা ক্রীড়নক মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং এই ক্রীড়নক লইয়া মন্ত্রিগণ ও রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারিগণ মধ্যে লীলাখেলা চলিত। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে পর্ব্বতীয়া বংশের চুদৈকা রাজা হত হওয়ার পরে, মন্ত্রিগণ চামগুরীয়া রাজবংশের চুলিক্ফা নামে রাজাকে আহোম রাজসিংহাসনে স্থাপিত করেন। চুলিক্ফা অল্পবয়স্ক ও ক্ষীণকায় ব্যক্তি ছিলেন, সেই জন্য তাহাকে সকলে 'লরা রাজা' বলিত। আসামী ভাষায় 'লরা' শব্দের অর্থ বালক বা শিশু। বয়সে প্রবীণ না হইলেও লরা-রাজা বুদ্ধিতে অতি বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি দেশের তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাহার নিজের জীবন নিরাপদ নহে, মন্ত্রীরা যে-কোন সময় অন্য কোন রাজবংশের রাজকুমারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে। সেই জন্য তিনি রাজা হওয়ার উপযুক্ত যত রাজকুমার ছিল গুপ্তঘাতকদের দ্বারা সেই সকল রাজকুমারদিগের অঙ্গক্ষত বা তাহাদিগকে বধ করাইতে মনস্থ করিলেন এবং তদনুসারে নৃশংস কার্য্যও চলিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের অনেকগুলি রাজকুমারদের অঙ্গক্ষত করা হইল, কোন কোন রাজকুমারকে বধ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত করা হইল। দুর্ব্বল রাজা স্বভাবতঃই ভীরু, কাপুরুষ ও অত্যাচারী হন, লরা-রাজা নিজে দুর্ব্বল ছিলেন, সেই জন্যই এই প্রকার কাপুরুষতার ও নৃশংসতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করিবেন এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিলেন।

তুঙ্গখুঙ্গীয়া বংশের গোবর রাজার পুত্র গদাপাণি নামে এক রাজকুমার ছিলেন, তাঁহার দেবতুল্য তেজস্বী দেহ, বাহুর অসাধারণ বল, হৃদয়ের অসীম সাহস ও তেজ লরা-রাজার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিল। গদাপাণি এরূপ বলশালী ছিলেন যে একদা তিনি একটী মত্ত হস্তীকে দাঁতে ধরিয়া আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন। দুই চারিজন গুপ্তঘাতক দ্বারা ঈদৃশ পুরুষসিংহের অঙ্গক্ষত করা অসম্ভব বিবেচনায়, তাঁহার বধের নিমিত্ত লরা-রাজা বিপুল আয়োজন করিলেন। এই সংবাদ যথাসময়ে গদাপাণির কর্ণগোচর হইল, কিন্তু তাঁহার সাহসী হৃদয় ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। গদাপাণির সহধর্ম্মিণী রাণী জয়মতী কিন্তু এই সংবাদে স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে পলাইয়া যাইতে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। গদাপাণি পত্নীর প্রস্তাবে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না, তিনি বলিলেন "আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, তোমাকে ও শিশুসন্তান সোনার লাই ও লেচাই দুটীকে ফেলিয়া আমি পলাইয়া যাইতে পারিব না।" জয়মতী কাতরকণ্ঠে উত্তর দিলেন "নাথ, আপনার বীরহৃদয় মৃত্যু-ভয়ে কম্পিত নয়, আপনি মৃত্যুভয় তুচ্ছ করেন তাহা আমি বেশ বুঝি, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন আপনাকে ধরিয়া নিয়া বধ করিলে আমাদের কি উপায় হইবে। আপনার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে, আপনার এই দাসীর জীবন এক মুহূর্ত্ত থাকিবে না, সোনার বালক দুটীরই বা তখন কি উপায় হইবে। অতএব আমার মিনতি এই যে, আপনি এ পাপরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল গোপনে থাকুন, কিছুদিন পরে জগদীশ্বরের অনুগ্রহে শুভদিন হইলে ও ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তন হইলে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। আপনার জীবন অমূল্য, ইহা রক্ষা করিবার সবিশেষ উপায় অবশ্য কর্ত্তব্য।" গদাপাণি পত্নীর কাতর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, ছদ্মবেশে নাগা পর্ব্বতে পলাইয়া গেলেন। এদিকে গদাপাণিকে ধরিয়া আনিবার জন্য লরা-রাজা অনেক সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করিলেন, সৈন্য সকল ফিরিয়া গিয়া রাজার নিকট গদাপাণির পলায়ন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিল। দুর্ব্বল-হৃদয়, কাপুরুষ লরা-রাজা গদাপাণির পলায়নে শঙ্কিত হইয়া তাঁহার সন্ধান জানিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার পত্নী জয়মতীর নিকট দূত পাঠাইয়া গদাপাণির সন্ধান জিজ্ঞাসা করাইলেন, কিন্তু জয়মতী স্বামী সম্বন্ধে কোন খবরই দিলেন না। তিনি দূতকে বলিয়া পাঠাইলেন যে স্বামীর সন্ধান তাঁহার দ্বারা কখনও বাহির হইবে না। লরা রাজা দূতপ্রমুখাৎ এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইলেন ও জয়মতীকে তাঁহার সাক্ষাতে বন্দিনী করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র রাজানুচরগণ জয়মতীকে বন্দিনী অবস্থায় রাজসকাশে আনয়ন করিল। লরা রাজা জয়মতীকে বলিলেন "তোমার স্বামী কোথায় লুকাইয়া আছে সত্বর বলিয়া দাও, না বলিলে কঠিন বেত্রাঘাতে তোমার প্রাণদণ্ড করিব।" জয়মতী দৃঢ়স্বরে সদর্পে উত্তর দিলেন "আমার স্বামীর সন্ধান আমি কখনও বলিব না ইহা পূর্ব্বে দূতমুখেই জানাইয়া দিয়াছি, বৃথা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা। আমার প্রতিজ্ঞা অচল, অটল, আপনি আমার শরীরের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার করিতে পারেন, কিন্তু আমার মনের উপর আমারই সম্পূর্ণ অধিকার, আর কাহারও কোন অধিকার নাই। এই নশ্বর দেহ চিরস্থায়ী নহে ইহা আমি বেশ জানি, আমার মুখ হইতে স্বামীর সন্ধান কখনও বাহির হইবে না নিশ্চয় জানিবেন।" লরা-রাজা ক্রোধে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া অনুচরদিগকে হুকুম দিলেন "জয়মতীকে লইয়া যাও, ইহাকে রাজবাটীর সম্মুখে বাঁধিয়া অনবরত বেত্রাঘাত করিতে থাক, একেবারে প্রাণে মারিও না, বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া যন্ত্রণা দাও। যত দিন পর্য্যন্ত স্বামীর সন্ধান না বলিবে ততদিন পর্য্যন্ত এই ভাবে শাস্তি দিবে; অশেষভাবে যন্ত্রণা দিয়া ইহার নিকট হইতে গদাপাণির সন্ধান বাহির কর।"

মূঢ় রাজা তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল পশুহৃদয়ের আদর্শে জগতের মানবহৃদয় কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে জয়মতী বেত্রাঘাতের যন্ত্রণায় স্বামীর সন্ধান বলিয়া দিবেন, কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, জয়মতী অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করিয়াও গদাপাণির সম্বন্ধে কোন সন্ধানই দিলেন না। দেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা রাজার পৈশাচিক অত্যাচার দেখিয়া নীরবে জয়মতীর জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। দেশে শক্তিশালী পুরুষ নাই, মন্ত্রিগণও আত্মকলহে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং রাজার অত্যাচার নিবারিত হইল না।

জয়মতীর উপর অত্যাচারের কথা ক্রমে নাগাপর্ব্বতে গদাপাণির কর্ণগোচর হইল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, লরা-রাজার পাপপুরীতে ছদ্মবেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়মতীর নিকটে আসিয়া গদাপাণি বলিলেন "ওগো রাজকুমারী, কেন বৃথা এত কষ্ট সহ্য করিতেছ? স্বামীর সন্ধান বলিয়া দিয়া কেন মুক্তিলাভ কর না?" জয়মতী তখন চক্ষুমুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরধ্যান ও স্বামীর চরণধ্যান করিতে করিতে নীরবে বেত্রাঘাত সহ্য করিতেছিলেন, গদাপাণির কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। পাছে কেহ সন্দেহ করে এই ভাবিয়া গদাপাণি অধিকক্ষণ অবস্থান না করিয়া তখন চলিয়া গেলেন। অন্য আর এক সময় গদাপাণি পুনরায় জয়মতীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন "ওগো দেবী, স্বামীর খবর বলিয়া দিয়া কেন মুক্ত হও না? বৃথা কষ্ট পাইয়া কি ফল?" এবার জয়মতী গদাপাণিকে দেখিলেন, দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং চিনিতে পারিয়াই বিশেষ শঙ্কান্বিতা হইলেন। যা'র জন্য এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছেন, যা'র জীবনরক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সে যদি এখন নিজেই ধরা দেয় তবে সমস্তই বৃথা। জয়মতীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, অসহনীয় অত্যাচারে ও পীড়নে যাঁহার শান্তি নষ্ট হয় নাই, ঘোরতর বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াও যিনি প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বামীর শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া দিন কাটাইতেছেন, তাঁহার এবার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তাঁহার সমস্ত উদ্দেশ্যই বিফল হয় দেখিয়া তিনি অস্থির হইলেন, গদাপাণিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "আমার স্বামীর সন্ধান আমি কখনই বলিব না, এই লোকটা কেন আমাকে বৃথা বিরক্ত করিতেছে? কেন সে এখান হইতে এখনও চলিয়া যাইতেছে না? সতী নারী স্বামীর জন্য সব সহ্য করিতে পারে, স্বামীর মঙ্গলের জন্য প্রাণদানই সতীনারীর কর্ত্তব্য।" এই কথাগুলি বলার সময় অতি কাতর দৃষ্টিতে জয়মতী গদাপাণির দিকে চাহিয়া তাঁহাকে সে স্থান হইতে সত্বর

জয়দোল, শিবসাগর।

চলিয়া যাইবার জন্য সকরুণ প্রার্থনা জানাইলেন। গদাপাণি সতীর সকরুণ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, চলিয়া গেলেন। জয়মতীর উপর অত্যাচার চলিতে লাগিল।

গদাপাণি চলিয়া যাওয়ার পরে আরও ১৪।১৫ দিন লরা-রাজার পাষণ্ড অনুচরগণ জয়মতীকে বেত্রাঘাতে যন্ত্রণা দিয়াছিল। সাধ্বী রক্তাক্তদেহ হইয়াও যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া মোট ২১।২২ দিন অসহনীয় অত্যাচার প্রশান্তচিত্তে সহ্য করিয়া শেষে এই নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিলেন। জগতে অতুলনীয় সহিষ্ণুতা ও পতিপ্রাণতার উদাহরণ দেখাইয়া, চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া জয়মতী সতী অমরধামে গিয়া সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর সহ মিলিত হইলেন।

সাধ্বী পত্নীর স্বর্গারোহণের সংবাদ গদাপাণির কর্ণগোচর হইল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া লরা-রাজার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিবার মানসে সৈন্যসামন্ত যোগাড় করিলেন এবং লরা-রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিজে রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। তৎপরে লরা-রাজার প্রাণনাশ করিয়া তাহার পাপের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। গদাপাণি গদাধর সিংহ নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসর সুখ্যাতির সহিত রাজ্য শাসন করিয়া গদাধর সিংহ স্বর্গগত হয়েন। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র লাই রাজসিংহাসন অধিকার করেন। এই লাই আসামের সুপ্রসিদ্ধ রাজা রুদ্র সিংহ। ইনি মাতার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে স্থানে জয়মতীকে বাঁধিয়া অত্যাচার করা হইয়াছিল, সেই স্থানে 'জয়-সাগর' নামে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া ও তাহার সন্নিকটে 'জয়দোল' নামে সুদৃশ্য একটী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া নিজ মাতৃভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি শিবসাগর জেলায় জয়সাগরের স্বচ্ছ বারিরাশি বায়ুভরে উদ্বেলিত হইয়া নাচিয়া নাচিয়া জয়মতীর কীর্ত্তিকাহিনী, রুদ্র সিংহের মাতৃভক্তি ও আসামের অতীত গৌরব প্রচার করিতেছে।

শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার।

প্রাচীন ভারত

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ অলবেরুণী ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় ভারতীয়গণ হিন্দু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অলবেরুণী হিন্দুধর্ম্ম ও চতুর্ব্বর্ণের বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তদীয় গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের বিবরণ অতি সামান্য; তাহাও ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ। ফলতঃ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল।

অলবেরুণীর সময়ে ভারতীয়গণের ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

হিন্দুগণের পরমেশ্বর এক এবং অনন্তকালস্থায়ী, তাঁহার আরম্ভও নাই, শেষও নাই। তিনি আপন ইচ্ছামত

কর্ম্মশীল, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞানবান, জীবন্ত, জীবনপ্রদ, শাসক, পালনকর্ত্তা; তাঁহার রাজশক্তি অসাধারণ ও সমস্ত সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্যের অতীত; তিনি কোন পদার্থের সদৃশ নহেন, অথবা কোন পদার্থও তাঁহার সদৃশ নহে।

হিন্দুগণ দেবোপাসক; তাহাদের শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। এই সকল দেবতায় মানবসুলভ আহার বিহার এবং মৃত্যু আরোপিত হইয়াছে। এই দেবগণের অন্তস্তলে তিনটি মূলশক্তি বিদ্যমান, —ব্রহ্মা, নারায়ণ এবং রুদ্র। এই তিন শক্তির মিলিত নাম বিষ্ণু। ব্রহ্মা আদিকারণ, নারায়ণ পালনকর্ত্তা এবং রুদ্র বা শঙ্কর সংহারকর্ত্তা। হিন্দুগণের বিশ্বাস যে, তীর্থ দর্শন করিলে পুণ্যসঞ্চয় ও আত্মার সদ্গতি লাভ হয়। এই কারণ তাহারা পুণ্যভূমিদর্শন, দেবমূর্ত্তির পূজা অর্চ্চনা এবং পুণ্যতোয়া নদীতে অবগাহন করিবার উদ্দেশ্যে তীর্থস্থানে গমন করে। হিন্দুগণ উপবাস এবং নানাপ্রকার ধর্ম্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকে।

বৌদ্ধকালের পরবর্ত্তী হিন্দুধর্ম্মের দুইটি প্রধান অঙ্গ বর্ণভেদ ও মূর্ত্তিউপাসনার মধ্যে মূর্ত্তিউপাসনা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে, আর বর্ণভেদ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনেও উহা নিমজ্জিত হয় নাই।

ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য ছিল। গৌরবর্ণ আর্য্যগণ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া এই কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আপনাদের গৌরবর্ণের জন্য গৌরব অনুভব করিয়া তৎরক্ষার্থ সাতিশয় অবহিত হইয়াছিলেন। এই ভাবেই প্রথমে ভারতবর্ষে মানুষে মানুষে ভেদ জন্মিয়াছিল এবং সে ভেদের নাম বর্ণভেদ প্রদত্ত হইয়াছিল। তারপর কার্য্যভেদে গৌরবর্ণ আর্য্যগণও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমতঃ এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণে গৃহীত হইতে পারিত; এক বর্ণীয় লোকের সঙ্গে অন্য বর্ণীয় লোকের আহার ব্যবহার বাধাহীন ছিল; এক বর্ণীয় লোকে অন্য বর্ণ হইতে পত্নী গ্রহণ করিত। ক্রমে ক্রমে এই সকল প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ক প্রমাণের আভাষ গ্রীক ও চৈনিক লেখকগণের বৃত্তান্ত হইতেও পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিসের আগমনের বহু পূর্ব্বেই কার্য্যভেদে বর্ণভেদ জন্মিয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতীয়গণ সাত বর্ণে বিভক্ত ছিলেন। "যথা, ধর্ম্ম ও বিদ্যা ব্যবসায়ী, রাজপারিষদ ও কর্ম্মচারী, চর বা দূত, যোদ্ধা, গোমেষ-রক্ষক, কৃষক এবং নানাবিধ শিল্প ব্যবসায়ী লোক। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উপরি উক্ত সাতটি বর্ণ শাস্ত্রবর্ণিত চারি বর্ণের রূপান্তর মাত্র। ধর্ম্ম ও বিদ্যা ব্যবসায়ী, রাজপারিষদ ও কর্ম্মচারিগণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ নহে; তবে কতক ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম ও বিদ্যা অনুশীলন করিতেন, কেহ কেহ রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন; সুতরাং বিদেশীয় দর্শক দুই সম্প্রদায়কে দুই বর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যোদ্ধাগণ ক্ষত্রিয়। গোমেষ-রক্ষক, কৃষক, ও শিল্প ব্যবসায়িগণ বৈশ্য ও শূদ্র হইবে। গুপ্তচর ও দূতদিগকে গ্রীকগণ ভ্রমক্রমে একটি ভিন্ন বর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপরি উক্ত গ্রীক-বিবরণে দাসের নামোল্লেখমাত্র নাই, এবং এরিয়ন স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে দাস নাই, সকলেই স্বাধীন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিন শতাব্দী পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে শূদ্রগণ আর দাস ছিল না; তাহারা নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিত।"(১)

হিউএনথ্ সঙ্গের গ্রন্থে ভারতীয়গণের চতুর্ব্বর্ণের বিষয় সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। হিন্দু জাতি চারি বর্ণে বিভক্ত। প্রথম ব্রাহ্মণ;-ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধচরিত্র, ধর্ম্মই তাঁহাদের রক্ষক, তাঁহারা সদাচারসম্পন্ন এবং সুনীতিপরায়ণ। দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়;—ক্ষত্রিয়গণ রাজজাতীয়; বহুকাল হইতে তাঁহারা দেশ শাসন করিয়া আসিতেছেন; তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ এবং দয়াশীল। তৃতীয় বৈশ্য;—বৈশ্যগণ বাণিজ্যব্যবসায়ী; ইঁহারা দেশে বিদেশে বাণিজ্যে নিযুক্ত আছেন। চতুর্থ শূদ্র;—শূদ্রগণ কৃষিব্যবসায়ী। এই চতুর্ব্বর্ণে জাতীয় বিশুদ্ধতা বা অবিশুদ্ধতা অনুসারেই পদমর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বিবাহকালে নূতন

(১) ৺রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস।

কুটম্বের পদমর্য্যাদা অনুসারে তাঁহাদের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ণভেদ অধিকতর প্রসারিত ও দৃঢ় হইয়াছিল। এই প্রথা নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে হীন ও অস্পৃশ্য করিয়া তুলিতেছিল। অলবেরুণী লিখিয়াছেন, এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে তাহার অপরাধ হইয়া থাকে। এই অপরাধ চৌর্য্যাপরাধের প্রায় তুল্য। যদি ব্রাহ্মণ ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হন, অথবা শূদ্র ভূমিকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে, তবে ঐরূপ অপরাধ হয়। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বিবরণ অন্তে অলবেরুণী অন্ত্যজ জাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে তদংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। শূদ্র অপেক্ষা নিম্ন পর্য্যায়ভুক্ত হিন্দুরা অন্ত্যজ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহারা আট শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদের গৃহীত ব্যবসায় অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। যথা, (১) চর্ম্মকার, (২) রজক, (৩) বাজিকর, (৪) নাবিক, (৫) ধীবর, (৬) শিকারী, (৭) তন্তুবায় এবং (৮) বাঁশকর। তন্মধ্যে রজক, চর্ম্মকার এবং তন্তুবায় ব্যতীত আর পাঁচ শ্রেণীতে পরস্পরে বিবাহের নিয়ম আছে। প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের সহিত এই সকল অন্ত্যজ জাতীয় লোকদের একত্র বাস করিবার প্রথা নাই। তাহারা নগর বা গ্রামের বহির্ভাগে অদূরে বাস কর।(১)

হাড়ি, ডোম এবং চণ্ডাল নামে বহুসংখ্যক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা হিন্দু জাতির বর্ণ ও শ্রেণীর বহির্ভূত। এই সকল লোক নগর বা গ্রামের ময়লা পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত আছে। হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল সঙ্কর জাতি নামে পরিচিত।

আলেকজণ্ডারের সহচর লেখকগণ ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, উভয় প্রকার শাসনপ্রণালী দেখিয়াছিলেন। আলেকজণ্ডারের পরবর্ত্তী মেগাস্থেনীস-প্রমুখ গ্রীক-লেখকগণ ভারতীয় রাজ্যশাসন-ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

মেগাস্থেনীস লিখিয়াছেন, রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে কাহারও প্রতি বাণিজ্য বিভাগের, কাহারও প্রতি নাগরিক বিভাগের, কাহারও প্রতি সৈনিক বিভাগের ভার ন্যস্ত আছে। কেহ বা নদ নদী এবং ভূমি পরিমাপের কার্য্য পরিদর্শন করেন। শিকারীদিগের তত্ত্বাবধান করিবার এবং তাহাদের দোষ গুণ বিচার করিয়া দোষ গুণানুযায়ী শাস্তি পুরস্কার দিবার ভারও এই সকল কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। ইহারা কর আদায় করেন এবং কাঠুরিয়া, সূত্রধর, লৌহকর্ম্মকার এবং খনিজপদার্থ-উত্তোলনকারীদিগের কার্য্য পরিদর্শন করেন। ইহারা পথনির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন।

যাহাদের প্রতি নাগরিক কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে, তাহারা ছয় দলে বিভক্ত এবং প্রত্যেক দলে পাঁচজন করিয়া কর্ম্মচারী। প্রথম দলের কর্ম্মচারী সাধারণতঃ দেশীয় শিল্পের পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। দ্বিতীয় দলের কর্ম্মচারী প্রধানতঃ বিদেশীয়দের আদর অভ্যর্থনাদি কার্য্য পরিদর্শন এবং তাহাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের যোগে তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দলের কর্ম্মচারী সমস্ত অধিবাসীদের জন্ম মৃত্যুর তালিকা সংগ্রহ করেন। চতুর্থ দল ব্যবসায় বাণিজ্যের বিষয় পরিদর্শন করেন। পঞ্চম দল কলকারখানায় নির্ম্মিত সমস্ত বস্তু সাধারণের জ্ঞাতসারে বিক্রয় করেন। ষষ্ঠদল, যত জিনিস বিক্রয় হয়, তাহার মূল্যের দশম ভাগ রাজার অংশরূপে আদায় করেন। এই সমস্ত দল উপরি উক্ত কার্য্যসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে সম্পন্ন করেন। প্রত্যেক দলের উপর পৃথক পৃথক কার্য্যভার ন্যস্ত রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত যে সকল বিষয়ের উপর সাধারণের হিতাহিত নির্ভর করে, তাহা সকলেরই দেখিতে হয়, যথা সরকারি দালানাদির উপযুক্ত সংস্কার, জিনিস পত্রের উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ এবং বাজার বন্দর ও মন্দিরের তত্ত্বাবধান। সৈন্য বিভাগের কার্য্য পরিচালন জন্য এক

(১) হিউএনথ সঙ্গের গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালে ধীবর, মাংসবিক্রেতা, নর্ত্তক নর্ত্তকী এবং সম্মার্জ্জক প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীরা নগর বা পল্লীর বহির্ভাগে বাস করিত। কিন্তু হিউ-এনথ সঙ্গের বর্ণনার সঙ্গে অলবেরুণীর বর্ণনা তুলনায় পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে যে, নগরের বা পল্লীর পরিচ্ছন্নতা রক্ষার উদ্দেশ্যে যে বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা জাতিমূলক, প্রসারিত ও সাতিশয় কঠোর হইয়া দাঁড়ায়।

শ্রেণীর শাসনকর্ত্তা আছেন, ইঁহারাও ছয় দলে বিভক্ত। পাঁচ পাঁচজন কর্ম্মচারী লইয়া এক একটি দল। এক দলের কর্ম্মচারিগণ নৌসেনার তত্ত্বাবধান করেন; দ্বিতীয় দলের কর্ম্মচারিগণ অস্ত্র শস্ত্র, সৈনিক পুরুষ ও যুদ্ধে নিয়োজিত পশ্বাদির খাদ্য এবং যুদ্ধের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহনোপযোগী গোযানাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই দলের লোক যুদ্ধের সময় ঢাক ও ঘণ্টা বাজাইবার জন্য পরিচারক ও রণতুরঙ্গের জন্য সহিস এবং যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য শিল্পী সংগ্রহ করিয়া দেন। তৃতীয় দল পদাতিকগণের তত্ত্ব লইবার জন্য নিযুক্ত হন। চতুর্থ দল যুদ্ধ-তুরঙ্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকেন। পঞ্চম দল যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্যে এবং ষষ্ঠ দল রণকুঞ্জরের তত্ত্বাবধানে সময় অতিবাহিত করেন।

ঈদৃশ সুব্যবস্থিত শাসনপ্রণালী ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া অনুমান করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে; সমস্ত রাজা একই প্রণালীতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এরূপ অনুমান করিবার কোন হেতু নাই। তৎকালের শ্রেষ্ঠ নরপতি চন্দ্রগুপ্তের শাসিত দেশে যে প্রকার শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল, মেগাস্থেনীস কেবল তাহাই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তাঁহার বর্ণনা হইতে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী কীদৃশ ছিল, তাহার আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

গ্রীক-লেখকগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত ভারতীয় শাসনপ্রণালী ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউএনথ্ সঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে বহু বৎসর বাস করিয়া প্রায় সমস্ত রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনিও ভারতবর্ষের সুব্যবস্থিত শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বগ্রন্থে রাজা কর্ত্তৃক প্রজাপীড়নের বিষয় কিঞ্চিৎ মাত্রও উল্লেখ করেন নাই; তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে আমাদের এইরূপ প্রতীতি জন্মে যে, রাজশাসন-গুণে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রকৃতিপুঞ্জ সমৃদ্ধ, সন্তুষ্ট এবং রাজানুরাগী ছিল। হিউএনথ্ সঙ্গ ভারতীয় শাসনপ্রণালীর যে বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনোজ্ঞ; আমরা তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ভারতবর্ষের রাজনীতি প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলজনক বলিয়া শাসনকার্য্য সহজ। রাজা প্রজাবর্গকে বলপূর্ব্বক শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বিরত রহিয়াছেন। রাজন্যবর্গের নিজস্ব ভূম্যধিকার প্রধান চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের লভ্য দ্বারা রাজকীয় কার্য্য এবং পূজা অর্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়, দ্বিতীয় অংশের লভ্য মন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর অর্থানুকূল্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তৃতীয় অংশের লভ্য দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ গুণবান ব্যক্তিগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়, চতুর্থ অংশের লভ্য ধর্ম্মসভা ও ধর্ম্মক্ষেত্র প্রভৃতিতে দান করিয়া সুবৃত্তি সকলের অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকে। এই হেতু প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক দেয় রাজকরের পরিমাণ অল্প; এতদ্ব্যতীত যে সময়ের জন্য তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে হয় তাহার পরিমাণও অপরিমিত নহে। প্রত্যেকেই শান্তিতে স্ব স্ব ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে। সকলেই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ভূমিকর্ষণ করিয়া থাকে। যে সকল বণিক বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিরত রহিয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন জন্য স্ব স্ব ইচ্ছামত গমনাগমন করেন। যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান করিলেই জল ও স্থলপথ সমূহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য আবশ্যক হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ কাজ করিয়া দিতে বাধ্য হয়; কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিবার নিয়ম আছে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ কাজ করে, তাহাকে ঠিক সেই পরিমাণে অর্থ প্রদত্ত হয়।

সৈনিকগণ সীমান্ত স্থান সমূহ রক্ষা করে, অথবা আবশ্যক মত অবাধ্যদিগকে শাস্তি দিবার জন্য বহির্গত হয়। সৈনিকগণ রাত্রিকালে অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পাহারা দেয়। প্রয়োজনমত সৈন্য সংগৃহীত হইয়া থাকে; এই সৈন্যসংগ্রহের কার্য্য সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে নিষ্পন্ন হয়। তৎকালে রাজপুরুষগণ নবনিযুক্ত সৈন্যদিগকে পারিশ্রমিক প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন। শাসনকর্ত্তা, মন্ত্রী, নগরপাল এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থে ভূমিলাভ করেন। জনমণ্ডলী মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, তাহারাই কেবল সৈনিকের পদে নিয়োজিত হয়। এই সকল সৈন্য রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ শিবিরে বাস করে।

ভারতীয় সৈন্য চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ এবং হস্তী। সারথি আদেশ প্রদান করে, তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বস্থিত পরিচারকগণ রথ পরিচালনা করে। রথ পরিচালনের জন্য অশ্ব চতুষ্টয় নিযুক্ত হয়। সেনাপতি উপবিষ্ট থাকেন; রক্ষী সৈন্য তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রথচক্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া গমন করে। পদাতিক সৈন্য শত্রুর গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যূহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় এবং পরাজিত হইলে আদেশ লইয়া ইতস্ততঃ গমন করে। অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতগতিতে যুদ্ধের সাহায্য করে। শারীরিক বল ও সাহসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অশ্বারোহী সৈন্য নির্ব্বাচিত হয়।

প্রাচীন ভারতের রাজন্যবৃন্দ প্রজার হিতকর প্রণালীতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজার নিজব্যয় ও শাসনকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রজাবর্গের নিকট হইতে কর গৃহীত হইত। কিন্তু সে করের পরিমাণ অত্যধিক ছিল না। মেগাস্থেনীস লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভূমির উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ রাজা গ্রহণ করিতেন। আমরা হিউএনথ্ সঙ্গের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ঐ ভূমিকর এক ষষ্ঠাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কৃষক, শ্রমজীবী ও বণিক এই তিন শ্রেণী হইতে কর আদায় হইত। এতৎ সম্বন্ধে অলবেরুণী লিখিয়াছেন—গবাদি পশু এবং শস্য হইতে যে অর্থ লাভ হয়, তাহার একাংশ রাজকররূপে দিতে হয়। গোচারণ-ভূমি এবং শস্য-ভূমির জন্য এই কর। এতদ্ব্যতীত ধনসম্পত্তি এবং পরিবার পরিজনের রক্ষার জন্য রাজা প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে তাহার উপার্জ্জিত ধনের এক ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন। যাহারা কৃষক এবং পশুপালক তাহাদিগকেও এই কর দিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে, তাহারা শুল্ক প্রদান করে। ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে রাজকর গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই।

স্বয়ং রাজা এবং তদীয় কর্ম্মচারিগণ বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজা দিবসে নিদ্রা যাইতেন না, বিচারগৃহে থাকিয়া সমস্ত দিন বিচার করিতেন। ভারতীয় বিচারপ্রণালী অতি সরল ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষ, কি সদোষ তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা করিবার নিয়ম ছিল। এইরূপ পরীক্ষাপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ বিদেশীয় লেখকবর্গের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বিচারকগণ বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত বিষয় ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতেন। কোন প্রকার দুষ্কার্য্যের অনুসন্ধান কালে সাক্ষীকে বেত্র বা লগুড়দ্বারা পীড়িত করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ ছিল। বৈদেশিক পর্য্যাটক মাত্রেই ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধি কঠোরতাবর্জ্জিত ছিল। কিন্তু কোন কোন অপরাধে অপরাধীকে বিকলাঙ্গ করিবার নিয়ম ছিল। হিউএনথ্ সঙ্গ লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে সশ্রম দণ্ডবিধানের নিয়ম ছিল না। অপরাধীর যৎকিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড হইত। অলবেরুণী ভারতীয় দণ্ড-ব্যবস্থার প্রসঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশ (এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অন্য গণ্ড আঘাতকারীর সম্মুখে আনয়ন করিবে) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ব্যভিচার অতি গুরুতর অপরাধরূপে পরিগণিত ছিল। তাদৃশ অপরাধের দণ্ডও অতীব কঠোর ছিল। অলবেরুণীর গ্রন্থ পাঠ করিলে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, বর্ণভেদানুসারে দণ্ডের তারতম্য হইত। মেগাস্থেনীসপ্রমুখ গ্রীক-লেখকবৃন্দ লিখিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুগণ এরূপ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে, তাঁহারা রাজদ্বারে গমন করিতেন না।

আলেকজণ্ডারীয় যুগে হিন্দু রাজন্যবৃন্দ সুরাপানে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ যজ্ঞের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে মদ স্পর্শও করিত না। ইহার পরবর্ত্তীকালে সুরাপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। যাহারা সুরাপান করিয়া আপনাদের চরিত্র কলুষিত করিত, তাহারা হিন্দুসমাজে সাতিশয় তিরস্কৃত হইত। কোন রাজার সুরাপান দোষ জন্মিলে তাঁহাকে রাজ্য শাসনের অযোগ্য বলিয়া রাজ্যচ্যুত করা হইত।

ভারতীয় রাজন্যগণ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত ছিলেন; কদাচিৎ কোন স্থানে অন্য বর্ণীয় নরপতি দেখিতে পাওয়া যাইত। ব্রাহ্মণগণ রাজকার্য্যের সহায়তা করিতেন। কিন্তু সাধারণতঃ পার্থিব বিষয় তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইত; নিন্দা বা প্রশংসায় তাঁহাদের চিত্তের কোন প্রকার বিকার

উপস্থিত হইত না। তাঁহারা কেবল আত্মবলে নির্ভর করিয়া জ্ঞানান্বেষণে নিরত থাকিতেন। দেশাধিপতি তাঁহাদের গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। জনমণ্ডলী তাঁহাদের যশোরাশি বর্দ্ধিত করিয়া তুলিত এবং অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহাদের নিকট অবনত হইত।

বিদেশীয়গণের গ্রন্থসমূহে যে কেবল ব্রাহ্মণকুলের প্রশংসাবাদ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে; সাধারণতঃ ভারতবাসীমাত্রেই চরিত্রগুণে গরীয়ান ছিল; বিদেশীয় লেখকগণ মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা ন্যায়পরায়ণ এবং অপকার্য্যবিমুখ ছিল। তাহাদের ব্যবহার প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতাশূন্য ছিল। তাহারা পরকালের ভয়ে বিচলিত হইত। ইহারা কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া চুক্তি করিত। ইহাদের মধ্যে চৌর্য্য অতি বিরল ছিল, লোকের সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থায় থাকিত। মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। কেহ প্রতারিত হইলে স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াই পরিতৃপ্ত হইত। ভারতীয়গণ মিতাচারী ছিল। তাহারা অনেক সময় পার্থিব বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিত। তাহাদের বাক্যে ও কার্য্যে সত্য ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত।

অলবেরুণীর সময়ে (খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে) ভারতবাসীর তাদৃশ উন্নত চরিত্র কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

(সমাপ্ত)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

বৃক্ষের উপকারিতা*

কোন দেশের অরণ্য সমূহ বিনাশ করিবার পর দেখা যায় যে সে দেশে আর ভালরূপ বৃষ্টিপাত হয় না। এই কারণে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই বনরক্ষণের ব্যবস্থা হইতেছে। ভারতবর্ষেও এক্ষণে বনবিভাগ সৃষ্ট হইয়াছে। যাহাতে লোকে ইচ্ছামত গাছগুলিকে কাটিয়া বনের ক্ষতি করিতে না পারে সর্ব্বত্রই তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে।

অরণ্যের সহিত বৃষ্টিপাতের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে কি তাহা সাধারণ পাঠকগণ ত অবগত নহেনই এমন কি বিশেষজ্ঞগণও এবিষয়ের সুমীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই প্রবন্ধে আমরা একটী কিয়ৎ পরিমাণে নূতন মত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সেই দেশের বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে যদি হিমালয় ও খাশিয়া পর্ব্বতমালা না থাকিত কিম্বা বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর যদি ভারতবর্ষ হইতে কয়েক সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত হইত এবং ভারতবর্ষ ও সেই ভূভাগের মধ্যে যদি এক পর্ব্বতমালা থাকিত তাহা হইলে বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের বহুস্থান মরুভূমিতে পরিণত হইত।

দেশের বায়ুপ্রবাহ কোন্ দিক হইতে বহে তদনুসারেও দেশের বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি নিরূপিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের বায়ুপ্রবাহগুলি যদি শুধু উত্তর ও পশ্চিমদিক হইতেই প্রবাহিত হইত তাহা হইলেও বঙ্গদেশ বৃষ্টিহীন দেশ হইত।

বিষুবরেখার সমীপবর্ত্তী বলিয়া উত্তপ্তসূর্য্যকিরণে-বাষ্পীভূত বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে প্রচুর জলকণারাশি দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহগুলির দ্বারা বঙ্গদেশের মধ্যে আনীত হয়। খাশিয়া ও হিমালয় পর্ব্বতমালা ভারতবর্ষের উত্তর ও পূর্ব্বদিক রোধ করিয়া দণ্ডায়মান না থাকিলে ঐ বাষ্পরাশি এদেশ ছাড়িয়া অন্যদিকে গমন করিত। ঐ সকল পর্ব্বতমালার শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া বাষ্পরাশি জমিয়া মেঘ এবং মেঘ জমিয়া বৃষ্টিতে পরিণত হয়।

যদি কোনও কারণে দেশমধ্যে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমিয়া যায় তাহা হইলে দেশের বৃষ্টিও কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ভূমণ্ডল ও আকাশের মধ্যে জলসঞ্চারণ-ক্রিয়া বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। পৃথিবী হইতে আকাশ যে জল পায় সেই জলই বৃষ্টির আকারে পৃথিবীকে দিতে পারে। পৃথিবীও আকাশ হইতে যে জল পায় আকাশকে পুনরায় সেই জলই দিতে পারে। জল আকাশ হইতে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী

* ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

হইতে আকাশে যাইবার সময়ই বিশ্ববাসিগণের হিতসাধন করিয়া থাকে।

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে পতিত বৃষ্টির জলের কিয়দংশ নদী প্রভৃতি বহিয়া সাগরে উপনীত হয়। কিয়দংশ পুষ্করিণী ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ে গিয়া সঞ্চিত হয়। কিয়দংশ মৃত্তিকার স্তর সমূহের উপরিভাগকে আর্দ্র করিয়া অবস্থিত থাকে। অপর কিয়দংশ মৃত্তিকার ভিতর গমন করিয়া ভূপৃষ্ঠের নিম্নতর স্তর সমূহের মধ্যে গিয়া সঞ্চিত হয়। ভূপৃষ্ঠের উপরিদেশে অবস্থিত জল, তাহা সাগরেই থাকুক, নদীতেই থাকুক, অন্য জলাশয়ে থাকুক বা মৃত্তিকা আর্দ্র করিয়াই থাকুক, সহজেই সূর্য্যতাপে বাষ্পীভূত হইয়া, আকাশে উঠিয়া মেঘ নির্ম্মাণে সহায়তা করে। কিন্তু ভূগর্ভের মধ্যে যে জলভাগ প্রবেশ করে তাহা কি উপায়ে পুনরায় বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হইতে পারে? কূপ বা প্রস্রবণের দ্বারা এই জলের কিয়দংশ সঞ্চালিত জলরাশির সহিত যোগ দিতে পারে। কিন্তু ঐ দুই উপায়ে ভূগর্ভস্থ জলের অতি সামান্য মাত্র অংশই বৃষ্টি পাত কার্য্যের সহায়তা করিতে পারে।

উপরে যে জলসঞ্চারণ সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল তাহাতে সহজেই বুঝা যাইবে যে দেশের ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটিলে (অবশ্য এরূপ পরিবর্ত্তন সহজে সংঘটিত হয় না) নিম্নলিখিত দুইটী কারণে দেশ মধ্যে বৃষ্টিপাতের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে :—

(১ম) দেশ মধ্যে পর্য্যাপ্ত মাত্রায় বাষ্প আনীত বা উৎপন্ন হয় নাই।

(২য়) দেশ মধ্যে প্রচুর বাষ্প আছে কিন্তু তাহা কোনও কারণে জমিয়া মেঘ বা বৃষ্টিতে পরিণত হইতেছে না।

বৃক্ষসমূহ ঐ দ্বিবিধ উপায়েই দেশমধ্যে বৃষ্টি উৎপাদনের সহায়তা করে।

দিবাভাগে বৃক্ষসমূহের সবুজ পত্রাবলীর মধ্যে অনেক রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে। উদ্ভিদের সবুজ কণাসমূহ সূর্য্যতাপের কিয়দংশ অপহরণ করিয়া অপর কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতেছে। অপহৃত সূর্য্যতাপের কিয়দংশই আমাদের খাদ্য ও কাষ্ঠাদির মধ্যে সঞ্চিত স্থিরীভূত শক্তি (Potential energy)। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে উদ্ভিদের দ্বারা দেশের সূর্য্যতাপের যে ঐরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে উহার ফলে বায়ুমণ্ডলের বৈদ্যুতিক পরিবর্ত্তনও ঘটিতেছে। ঐ পরিবর্ত্তন কোনও উপায়ে দেশমধ্যস্থ বাষ্পরাশিকে ঘনীভূত করিয়া মেঘে এবং মেঘকে ঘনীভূত করিয়া বৃষ্টিতে পরিণত করিবার পক্ষে সহায়তা করে। বর্ত্তমান সময়ে বায়ুমণ্ডলের ঐরূপ বৈদ্যুতিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু এ বিষয়ের এখনও কোনও সঠিক মীমাংসা হয় নাই। তবে ইউরোপে কতিপয় স্থলে দেখা গিয়াছে যে বিলাতী ঝাউ বিশিষ্ট অরণ্যে অন্য অরণ্য অপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। বিলাতী ঝাউয়ের বন যে অন্য বৃক্ষের বন অপেক্ষা বায়ুমণ্ডলে অধিকমাত্রায় বাষ্প দিতে পারে এমন নহে, কিন্তু ঐ ঝাউগুলির পত্রসমূহ সূক্ষ্মাগ্র ও দোদুল্যমান। ইহাতে অনুমান হয় যে ঐ সূক্ষ্মাগ্র পত্রগুলির দ্বারা পৃথিবী হইতে বায়ুমণ্ডলে অথবা বায়ুমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে তড়িৎ বিনিময়ের কোনও সাহায্য হইয়া থাকে বলিয়া উক্ত স্থানে বৃষ্টিপাতের সুবিধা হয়। আমাদের দেশীয় দোদুল্যমান ও সূক্ষ্মাগ্র পত্রযুক্ত বৃক্ষগুলির মধ্যে অশ্বত্থ প্রধান। উহার পত্রসংখ্যাও বহু। তাল খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষের সূক্ষ্মাগ্র পত্র আছে কিন্তু পত্রসংখ্যা সামান্য। দেবদারুর পত্র দোদুল্যমান ও সূক্ষ্মাগ্র এবং উহা বসন্তাগমে নবপত্রবাস পরিধান করিয়া থাকে ও উহার উচ্চতাও যথেষ্ট।

উদ্ভিদদেহে অবস্থিত সবুজ কণাগুলি সূর্য্যতাপের কিয়দংশ অপহরণ করার ফলে দেশের বায়ুমণ্ডলের তাপ যে অনেকটা কম পড়িবে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বায়ুমণ্ডলের এই শৈত্যও বৃষ্টিজননে কিরূপ সহায়তা করে তদ্বিষয়েও সম্যক আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু বৃক্ষ সমূহ দেশের বাষ্পরাশিকে জমাইয়া বৃষ্টিতে পরিণত করিবার পক্ষে যে কতদূর সাহায্য করে তাহা ভালরূপে নির্ণয় করা না যাইলেও উহারা যে দেশের বাষ্পরাশির পরিমাণ বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

যে জলরাশি পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত তাহা যে সহজেই বাষ্পীভূত হইয়া বৃষ্টিজননে সহায়তা করে তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু বৃষ্টির জলের যে ভাগ

ভূগর্ভে প্রবেশ করে তাহার যে অতি অল্পমাত্র অংশই কূপ বা প্রস্রবণের আকারে পুনরায় বৃষ্টি নির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। ভূগর্ভস্থিত *জলের কিয়দংশ যে স্থায়ীভাবেই সেখানে সঞ্চিত থাকিবে* তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃক্ষাবলীর সহায়তায় এই সঞ্চিত জলের কিয়দংশ বাষ্পাকারে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে নীত হইয়া বৃষ্টি-জনন-কার্য্যের সহায়তা করে।

বৃক্ষসমূহের মূল শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ভূমির মধ্যে প্রবেশ করে। ছোট ছোট ঘাসের মূল দুই এক ইঞ্চির অধিক গভীর মৃত্তিকাস্তর মধ্যে যাইতে সমর্থ নহে। প্রায়শঃ যে বৃক্ষ যত দীর্ঘ তাহার মূল তত নিম্নে প্রবেশ করে। অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বিরাটকায় উদ্ভিদের মূল বিবিধ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া চারিদিকে যেমন ছড়াইয়া পড়িতে পারে তেমনি ১৫।২০ হাত মৃত্তিকার নিম্নদেশ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। মূলের পুরাতন অংশগুলি বৃক্ষটাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত রাখে। আর উহার কচি কচি অগ্রভাগগুলি বৃক্ষের জন্য ভূমি হইতে রস সংগ্রহ করে। মূলাগ্রভাগগুলির মস্তকদেশ নিতান্ত নরম বলিয়া একপ্রকার টোপরের (মূলত্রাণ বা Root hair) দ্বারা আবৃত। এই টোপরের কিঞ্চিৎ নিম্নদেশ মূলের সহিত লম্বভাবে অবস্থিত ছোট ছোট শ্বেতবর্ণের শুঁয়ার দ্বারা আবৃত। শুঁয়াগুলি কুমড়ার ডগার বা বিছুটীর শুঁয়ার মত। শুঁয়াগুলিই ভূমি হইতে জল আকর্ষণ করে।

শুঁয়াগুলির চারিদিক মৃত্তিকাকণা সমূহের দ্বারা আবৃত। আবার প্রত্যেক মৃত্তিকাকণার চারিদিক অতি সূক্ষ্ম এক জলীয় আবরণের দ্বারা আবৃত (Hygroscopic water)। খানিকটা মাটীকে যখন অত্যন্ত শুষ্ক বলিয়া আপাততঃ মনে হয় তখনও সেই মৃত্তিকাকণা সমূহের গাত্রে উক্তরূপ জলীয় আবরণ থাকে। সাধারণ উপায়ে মৃত্তিকাকণাসংলগ্ন উক্ত জলভাগ বাহির করা যায় না। তীব্রতাপ প্রয়োগের আবশ্যক। কিন্তু মূলজাত শুঁয়াগুলি কণাগুলির নিকট হইতে অনায়াসেই ঐ জল বাহির করিয়া লইতে পারে। এক একটী গাছ হইতে গড়ে এক সের পরিমিত জল বাহির হইয়া থাকে। বড় গাছ হইলে ৩।৪ সের পরিমিত জল বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই জল কিরূপে কাণ্ডের মধ্য দিয়া গমন করিয়া পরে পত্রের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন, এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতেছে। ঐ হিসাবে দেখা যাইতেছে যে এক একটা গাছের দ্বারা বৎসরে গড়ে দশ হইতে পনের মণ পর্য্যন্ত ভূগর্ভস্থ জল বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হয় ও মেঘনির্ম্মাণে সহায়তা করে।

যদি সমগ্র ভারতবর্ষের বৃক্ষসমূহের সংখ্যা নিরূপণের কোনও সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে দেখা যাইত কি প্রকাণ্ড জলরাশিই না বৃক্ষগুলির সাহায্যে ভূগর্ভ হইতে সংগৃহীত হইয়া বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়! দেশের বৃক্ষরাশির সংখ্যা কমাইয়া দিলে দেশের বাষ্পের পরিমাণও যে কমিয়া যাইবে—কাজেই বৃষ্টির পরিমাণও যে কমিয়া যাইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সকল বৃক্ষের বৃষ্টি-উৎপাদনে সহায়তা করিবার ক্ষমতা সমান নহে। ছোট গাছের অপেক্ষা বড় গাছের উক্ত ক্ষমতা যে অধিক তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। বড় বৃক্ষ সমূহের মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষের ঐ ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বৃক্ষসমূহ নিজ নিজ পত্রসমূহ দ্বারাই বায়ুমণ্ডলে বাষ্প নিক্ষেপ করিয়া থাকে। নূতন পত্রসমূহেরই এইরূপ বাষ্পনিক্ষেপ-ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শীতকালে আমাদের দেশে 'উত্তুরে বায়ু' বহিতে থাকে। এই বায়ু মধ্য এসিয়ার শুষ্ক-প্রদেশ হইতে প্রবাহিত বলিয়া জলীয়বাষ্পশূন্য, কাজেই উহা বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলে বৃষ্টি-উৎপাদন-বিষয়ে কিছুমাত্রও সহায়তা করিতে পারে না। বরং যে সকল বৃক্ষ এই সময়ে পত্রযুক্ত থাকিয়া বায়ুমণ্ডলে যে বাষ্পরাশি নিক্ষেপ করে ঐ বায়ু তাহাও এদেশ হইতে একবারে বাহির করিয়া লইয়া যায়। ঐ সকল বাষ্প, এবং ঐ বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া চলিবার সময়ে যে বাষ্পরাশি আহরণ করে তাহা, দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব উপকূলে এবং সিংহল দ্বীপে উপস্থিত হইয়া সেখানে বৃষ্টি উৎপাদন করে। অতএব চির-হরিৎ বৃক্ষগুলি দেশের অনেক জল বিদেশে রপ্তানি করিয়া দিয়া দেশের কতকটা ক্ষতিও করে।

কিন্তু অশ্বত্থ প্রভৃতি কতিপয় বৃক্ষের পত্রাবলী শীতকালে অকর্ম্মণ্য হইয়া ক্রমশঃ গাছ হইতে একবারেই ঝরিয়া পড়ে।

কাজেই তাহারা দেশের জলরাশিকে বিদেশে রপ্তানী করিয়া দিবার পক্ষে কোনও রূপ সহায়তা করে না। শুধু তাহাই নহে, তাহারা দেশের বর্ষাকাল আনয়ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট পরিশ্রম করে। তাহাদের কার্য্য চারুপাঠোক্ত বর্ষণবৃক্ষের কার্য্য অপেক্ষা কম অদ্ভুত নহে। বসন্তাগমে দেশের উপর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমের বায়ুপ্রবাহ বহিয়া যাইতে আরম্ভ হইবার পর হইতে অশ্বত্থবৃক্ষগুলি নবপল্লবিত হইতে আরম্ভ করে। এবং বৈশাখ মাসের পূর্ব্বেই পত্রগুলি পূর্ণায়তন পাইয়া নিজেদের পত্রজীবনের কার্য্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হয়। পত্রজীবনের উদ্দেশ্য—সূর্য্যকিরণের কিয়দংশ এবং মৃত্তিকা হইতে সংগৃহীত রসের কিয়দংশ সংমিশ্রিত করিয়া উদ্ভিদের জন্য খাদ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করা। সেই খাদ্য উদ্ভিদের ফল ও বীজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যয়িত হইবে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে অশ্বত্থের পাতাগুলিকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। কারণ ঐ দুই মাসের মধ্যেই তাহাদিগকে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ফলগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কল্পনায় একবার অনুমান করা যাক জ্যৈষ্ঠ মাসে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থের সমুদয় ফল ও পত্রগুলিকে সংগ্রহ করিয়া স্তূপীকৃত করা হইয়াছে। ফাল্গুনের প্রথমে গাছে একটীও পত্র বা ফল ছিল না কাজেই এগুলি সমস্তই ঐ কয় মাসের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে। এই স্তূপীকৃত কাঁচা পত্র ও ফল রাশির মধ্যে যে অনেকটা জল আছে তাহা বুঝা শক্ত নহে। কিন্তু অশ্বত্থের মূলগুলি, পত্র ও ফলগুলিকে প্রস্তুত করিবার জন্য যে জলরাশি মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া পত্রের মধ্য দিয়া বায়ুমণ্ডলে বাহির করিয়া দিয়াছে, সে জলের পরিমাণ পত্র ও ফলে সঞ্চিত জলের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। অর্থাৎ অশ্বত্থবৃক্ষ বর্ষাকালের অব্যবহিত পূর্ব্বেই দেশের বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প দান করিয়াছে। এই বাষ্পরাশি ঐ সকল বৃক্ষের সহায়তা ব্যতীত বায়ুমণ্ডলে আসিতে পারিত না। সেই বাষ্পরাশি দেশের বাহিরে যাইতে পারে না। তাহা হয় দেশেই থাকিয়া সেখানে বৃষ্টি উৎপাদন করে, কি বড়জোর দক্ষিণ-পশ্চিমের বায়ুপ্রবাহ দ্বারা বাহিত হইয়া হিমালয় বা খাশিয়া পাহাড়ের গাত্রসংলগ্ন হইয়া, সেখানে বৃষ্টি উৎপাদন করিয়া আমাদের নদীগুলিকে পরিপুষ্ট করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সকল বৃক্ষ শীতকালে পত্রহীন থাকে ও বসন্তাগমে নবপল্লবিত হইয়া গ্রীষ্মকালে ফলোৎপাদন করে তাহারা দেশের বৃষ্টি উৎপাদন করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

অল্প সময়ের মধ্যেই যাহাতে অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণ বাষ্প নিষ্কাশিত হইতে পারে প্রকৃতি তাহারও সুব্যবস্থা করিয়াছেন। অশ্বত্থপত্রের বৃন্ত দীর্ঘ এবং সরু—উহা পত্রটিকে শাখার সহিত নিশ্চল ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে না। পত্রটী অতি সহজেই দুলিতে পারে। অশ্বত্থ পত্রের একটী লেজ আছে সেটীও এই দোলন কার্য্যের বিশেষ সহায়ক। লেজটীর দ্বারা একটী পত্র আর একটী পত্রের গাত্র স্পর্শ করিতে পারে। কাজেই কোন কারণে একটী পত্র দুলিলে সেটী আর-একটী পত্রকেও দুলাইয়া দেয়। একটী অশ্বত্থ ও একটী অন্য কোন গাছকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে অতি সামান্য মাত্র বায়ুপ্রবাহের দ্বারাও অশ্বত্থপত্রগুলি ঝর ঝর করিয়া দুলিতে থাকে কিন্তু সে সময়ে অন্য বৃক্ষটীর পত্রগুলি হয়ত নিশ্চল থাকে। সিম্পার (Schimper) এবং অন্যান্য কতিপয় উদ্ভিদবিৎ পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে অশ্বত্থপত্রের লেজের অন্য উদ্দেশ্য আছে। তাঁহারা বলেন যে লেজের সাহায্যে বৃষ্টির জল অশ্বত্থ বৃক্ষের তলদেশ হইতে বৃক্ষের প্রান্তদেশে নীত হয়, কারণ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ভূমির চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু আমি এই মত অপেক্ষা উপরি লিখিত মতকে সমীচীন বিবেচনা করি। কারণ বৃষ্টির জল ভূমির সমতা অনুসারেই বৃক্ষকাণ্ডের নিকটে বা তাহা হইতে দূরে সঞ্চিত হয়। আর অশ্বত্থের স্বজাতীয় এবং উহারই ন্যায় চতুর্দ্দিক বিস্তৃত-মূলশালী অন্য বৃক্ষের পত্রেও বৃষ্টিজলকে বৃক্ষকাণ্ডের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইবার কোনও রূপ ব্যবস্থা নাই। যাহা হউক অশ্বত্থপত্রগুলির পূর্ব্বোক্তরূপ দোলনের জন্য যে তাহাদিগের মধ্য হইতে সহজেই বাষ্প নিষ্কাশিত হইতে পারে তাহা বুঝিতে কোনও কষ্ট নাই। সকলেই অবগত আছে যে একখানি ভিজা কাপড় নাড়াইতে থাকিলে উহা সত্বর শুকাইয়া যায়। কাপড়ের গাত্রসংলগ্ন বায়ু কাপড় হইতে জলকণা সংগ্রহ করিয়া অত্যন্ত আর্দ্র হইয়া পড়ে—উহার আর অধিক জলশোষণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। এজন্য উহাকে সরাইয়া দিয়া উহার স্থানে

খানিকটা নূতন ও শুষ্ক বায়ু আনিতে পারিলে সেই শুষ্ক বায়ু আর খানিকটা বাষ্প বস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। পরে সেই নূতন আর্দ্র বায়ুকেও পুনরায় সরাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আর্দ্র বস্ত্রকে নাড়াইয়া উহার সন্নিকটে পুনঃ পুনঃ নূতন শুষ্ক বায়ু আনিয়া বাষ্প সমূহকে বায়ুরাশিতে চালাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। বৃক্ষের পত্রগুলি নড়িবার ফলেও ঠিক ঐরূপই ঘটিয়া থাকে।

বৃক্ষগুলি ভূমির নিম্নস্তরে সঞ্চিত জল শোষণ করিয়া বায়ুমণ্ডলে বাহির করিয়া দেয় বলিয়া উহাদিগের দ্বারা আমাদের দেশের আর এক মহোপকার সাধন করা যাইতে পারে। ইউরোপে কোন কোন স্থলে ম্যালেরিয়াজননী স্যাঁতা ভূমির বা জলা ভূমির নিকটে বৃক্ষ রোপণ করাতে সেই স্যাঁতা ভূমিগুলি ক্রমশ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। বৃক্ষগুলি ভূমির নিম্ন স্তরে অবস্থিত আবদ্ধ জল বাহির করিয়া লওয়ায় ঐ মহোপকার সংসাধিত হইয়াছে। এদেশেও যাহাতে বৃক্ষের দ্বারা ঐ কার্য্য করান যায় তাহার সম্যক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বৃষ্টি উৎপাদনে সহায়তা করা ব্যতীতও বৃক্ষগুলি আমাদের আর এক পরম উপকার সংসাধন করিয়া থাকে। তাহারা দেশের ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। আমাদের পূর্ব্বকথিত জ্যৈষ্ঠ মাসে সংগৃহীত অশ্বত্থ গাছটীর স্তূপীকৃত পাতা ও ফলগুলির কথা আর একবার ভাবা যাক। সেগুলিতে যে প্রচুর জল সঞ্চিত আছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সেগুলিকে ভস্মীভূত করিলে প্রচুর ধূম উৎপন্ন হইবে। ধূমে আমোনিয়া ও জল আছে। পাতা ও ফলগুলি সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া গেলে উহাদের ভস্ম অবশিষ্ট থাকিবে। এই সকল ভস্ম সোডিয়াম, পোটাসিয়ম, ফসফরাস, ক্যালসিয়ম্ ও ম্যাগনেসিয়ম প্রভৃতি উদ্ভিদজীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক পদার্থ সমূহে নির্ম্মিত। আমোনিয়া নাইট্রোজেনযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ। ঐ সমুদায় পদার্থের অভাবে উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না—যেমন আমরা খাদ্যের অভাবে বাঁচিতে পারি না। যে জমিতে ঐ সকল পদার্থের অভাব ঘটে সে জমির উর্ব্বরতা কমিয়া যায়। সে জমিতে উক্ত পদার্থ সমূহ অন্যত্র হইতে আনাইয়া প্রদান না করিলে জমিতে আর ফসল ভাল হইবে না, উহার উর্ব্বরতা শক্তি দিন দিন কমিয়া যাইতে থাকিবে।

অশ্বত্থ গাছের পাতা ও ফলগুলি চিরকাল গাছেই থাকে না, উহারা কিছুকাল পরে ভূপতিত হয়। পাতা ও ফলগুলি পক্ব বা শুষ্ক হইয়া পশু পক্ষী বা বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া দেশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বর্ষাকালে সেই সকল পত্র বা ফলের অংশ সমুদয় বৃষ্টি পাইয়া ভিজিয়া যায় ও পরে পচিতে থাকে। জৈব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থকে পোড়াইলে উহার যে পরিণাম হয় পচিতে দিলেও উহার সেই পরিণাম হয়। পচা পত্রের পোটাসিয়ম, সোডিয়াম, ফসফরাস, নাইট্রোজেন প্রভৃতি অংশ ভূমির উপরিভাগের সহিত মিশ্রিত হইয়া তত্রত্য মৃত্তিকার উর্ব্বরতা সাধন করে। এইরূপে আমাদের পরম প্রয়োজনীয় ধান্য গোধূমাদি উদ্ভিদগুলি পরিণামে উপকৃত হইতে পারে। অশ্বত্থপত্র ও ফলে পূর্ব্বোক্ত উপাদানগুলি জমির নিম্নতর স্তর সমূহের মধ্য হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। ধান্যাদি ছোট উদ্ভিদের মূল অত গভীরদেশে গমন করিয়া ঐ সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিত না।

উপরে যাহা অশ্বত্থ গাছের সম্বন্ধে বলা হইল, তাহা অন্যান্য ফলবান গাছের সম্বন্ধেও খাটে। তাহারা সকলেই গভীরতর দেশের মৃত্তিকা হইতে বিবিধ সার আহরণ করিয়া উপরের জমিকে উর্ব্বর করিতেছে।

একটী বৃক্ষ যে স্থানে অবস্থিত উহা যে কেবল সেই স্থানের জমির নিম্নস্তরের মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ লবণাক্ত পদার্থ আকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু নিকটবর্ত্তী কোনও তৃণাচ্ছাদিত বা গৃহাচ্ছাদিত ভূমির নিম্নস্তর হইতে কিছুই লইতে পারে না এমন নহে। প্রত্যক্ষভাবে ঐ ভূমি হইতে কিছু লইতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে পারে। আমাদের দৃষ্টান্তের অশ্বত্থ বৃক্ষটী বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে নিজে যে জমিতে অবস্থিত তাহা হইতে অনেক লবণাক্ত পদার্থ (পূর্ব্বোক্ত নাইট্রোজেন পোটাসিয়ম প্রভৃতি মূলপদার্থযুক্ত দ্রব্য) বাহির করিয়া লইয়া নিজের পত্রে সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে ঐ জমির লবণ পদার্থের পরিমাণ যে নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষহীন জমির লবণ পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষা কম হইবে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু বর্ষাকালে যখন সমস্ত জমি বৃষ্টির জলের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে, তখন সেই জলের মধ্য দিয়া প্রচুরলবণযুক্ত জমির লবণ স্বল্পলবণযুক্ত জমির মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। এবং যতক্ষণ না উভয় জমির লবণ-পরিমাণ সমান হয় ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে এই লবণ বিনিময় চলিতে থাকে। বাঙ্গালা দেশের ধান্যক্ষেত্রগুলির মাঝে মাঝে যে দুই একটী অশ্বত্থবৃক্ষ দেখা যায় তাহারা যে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে ধান্যক্ষেত্রের তলদেশের সার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জমিগুলির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অশ্বত্থ বৃক্ষের ফলগুলি ক্ষুদ্র এবং পক্ষীদিগের খাদ্য; এ কারণ তাহারা সহজেই দেশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। যে সময় পাখীদিগের শাবক হয় ঠিক সেই সময়েই এ দেশের অনেক গাছের ফল ধরে। এইরূপে দেশের অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা দেশের পাখীদিগের থাকিবার স্থান ও খাইবার দ্রব্যের প্রাচুর্য্য বশতঃ দেশের পাখীর সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতে পারে। পাখীদের দ্বারা দেশের স্বাস্থ্যের কিরূপ উন্নতি হয় তাহা সবিশেষ আলোচিত হওয়া আবশ্যক। পাখীরা দেশের প্রকৃতির খাস মিউনিসিপালিটীর লোক। তাহারা দেশের অনেক ময়লা ও অনেক পতঙ্গ খাইয়া ফেলে। বর্ষার পর দেশ মধ্যে বহুসংখ্যক পতঙ্গ জন্মে—সম্ভবতঃ তাহাদের দ্বারা দেশের ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিস্তারের সুবিধা হইয়া থাকে। দেশে গ্রীষ্মকালে উপযুক্ত সংখ্যক পক্ষী জন্মিলে দেশের ম্যালেরিয়াও অনেকটা কমিতে পারে।

বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা হিন্দুশাস্ত্রের একটী প্রধান পূণ্যজনক পূর্ত্তকার্য্য। কি কারণে শাস্ত্রে অশ্বত্থ বৃক্ষের বিশেষরূপ মর্য্যাদা করা হইয়াছে তাহা এখন সঠিক বলা অসম্ভব। পল্লীগ্রামে এখনও মাঝে মাঝে অশ্বত্থ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতি বর্ষে আরও অধিক সংখ্যক অশ্বত্থ প্রতিষ্ঠা হইত। গীতাতেও অশ্বত্থকে সমস্ত বৃক্ষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে। এখনও লোকে নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও অশ্বত্থবৃক্ষ ছেদন করিতে সম্মত হয় না।

অশ্বত্থ বটের মত বিরাটকায় বৃক্ষ নহে। উহার ফলের সহিত আম, কাঁঠাল ও লিচুর কোন তুলনাই হইতে পারে না—উহা একেবারেই অভক্ষ্য। উহার কাঠে শিশু প্রভৃতি বিশালকায় বৃক্ষের কাঠের ন্যায় কোনওরূপ গড়নই হইতে পারে না। অশ্বত্থের ফুল এমনই নগণ্য যে উহা বকুল অশোক বা কদম্বের মনোহর ফুলের কাছে একেবারে দাঁড়াইতেই পারে না। তবে কোন্ গুণে হিন্দুশাস্ত্রে উহার এত উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে? শাস্ত্রকারগণ কি অশ্বত্থ বৃক্ষের মোহন শ্যামল ও গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখিয়াই ভুলিয়া গিয়াছিলেন? অথবা তাঁহারা ভূয়োদর্শনের ফলে এই আপাতনির্গুণ বৃক্ষটীর উপকারের কথা বুঝিতে পারিয়া, সাধারণ লোকের হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য এবং ইহার বংশ বিস্তারের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন?

সদৃশ সাহিত্য উদ্দেশ (Bibliography).

1. Schimper—Plant Geography.

2. Indian Forester No. I. 1902, Vol. XXVIII, (also Vol. XXX, 1904). The Effect of Forests on the circulation of water at the surface of continents. Derived principally from an article by M. E. Henry in the Revue des Eaux et Forets.

3. Plains, Forests and underground waters —Revue des Eaux et Forets (March and April numbers 1903), by M. E. Henry.

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দুর্ব্বাসা

কোথা যাজ্ঞিক আজি আনমনে ভুলেছ নিত্য যাগ,
কোথা ঋত্বিক করনি সাধন আপন কর্ম্ম ভাগ,
কোথায় শিষ্য ভুলিয়াছ পাঠ গৃহের বারতা স্মরি,
দুর্ব্বাসা আসে অবহিত হও উঠ জাগো ত্বরা করি।
কোথা ঋষিবালা পুষিছ হৃদয়ে তাপস-বিরোধী ভাব,
অতিথি আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে হয়নি সংজ্ঞা লাভ,
তরুলতাগুলি পায়নি সলিল, হরিণী শষ্পদল,
দুর্ব্বাসা আসে ভাঙো ভাঙো ধ্যান আনগো পাদ্য জল।

কোথা নরপতি বাসনাসক্ত অন্তঃপুরের মাঝে,
লালসা বিলাসে যাপিছ জীবন হেলা করি রাজকাজে,
কোথায় যোদ্ধা ভুলেছ সমর প্রেমিকার কর ধরি,
দুর্ব্বাসা আসে ভাঙো ভঙো মোহ জাগো জাগো ত্বরা করি।
দেবদ্বিজ-পূজা, অতিথির সেবা, পিতা-দেব-ঋষি-ঋণ,
ভুলি, কোথা গৃহী, ভোগ বিলাসেতে কাটাতেছ নিশিদিন,
গৃহকাজ কোথা ভুলেছ রমণী বিরহের বেদনায়,
দুর্ব্বাসা আসে জাগো জাগো সবে নিজ নিজ সাধনায়।
আসে বিধাতার শাসনদণ্ড ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে,
শিরে জটাভার, নয়নে বহ্নি, শ্মশ্রু শোভিত বুকে।
সদা কাজভার সাধো আপনার প্রলোভন মোহ নাশি,
জাগ্রত রহ, দুর্ব্বাসা কবে কখন পড়িবে আসি'।

শ্রীকালিদাস রায়।

পেঙ্গুইন পক্ষী

পেঙ্গুইন পক্ষী।

সুদূর দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে এক দ্বীপে একপ্রকার অসংখ্য কুৎসিত পক্ষী দেখা যায়। ভীষণসাগরপরিবেষ্টিত এই ভয়সঙ্কুল দ্বীপেই তাহাদের নিবাস, এই স্থলেই তাহাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হয়।

দ্বীপটীর নাম Macquarie Islands। ইহা ৫৫° দক্ষিণ নিরক্ষবৃত্ত ও ১৫৫° পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। বহুবচনে উক্ত হইলেও দ্বীপসংখ্যা একটী মাত্র। দ্বীপটী পর্ব্বতময়, পার্শ্বদেশে বন্যতৃণাচ্ছাদিত, মধ্যে তুষারহ্রদ-শোভিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল, প্রস্থে ৩ হইতে ৭ মাইল। প্রত্যেক সীমার কিছু দূরে সমুদ্র মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরময় পর্ব্বতশ্রেণী—তজ্জন্যই নাম হইয়াছে Macquarie Islands।

দ্বীপটীর অসুবিধা এই যে ইহার চারিদিকে জাহাজ লাগাইবার কোনও উপযুক্ত স্থান নাই। পর্ব্বতগুলি সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত নিমগ্ন রহিয়াছে; অল্প বাতাস হইলেই তরঙ্গমালা ভীষণবেগে উহাদিগের উপর আপতিত হইতে থাকে; জাহাজকে এই সকল পর্ব্বতের সীমা ছাড়াইয়া লঙ্গর করিতে হয়। আবহাওয়া বেশী খারাপ হইলে লঙ্গর তুলিয়া জাহাজ সমুদ্রে ছাড়িয়া দিতে হয়। কারণ সমুদ্রের তলদেশ একরূপ বালুকাময় হওয়ায়, কোন জাহাজ লঙ্গর করা থাকিলেও ভাসিয়া পাহাড়ের গায়ে ঠেকার সম্ভাবনা। কাজেকাজেই এই দ্বীপে গমনাগমন বিপদজনক সন্দেহ নাই।

সাধারণ পেঙ্গুইন জানুয়ারী মাসে এই দ্বীপে পালক পরিত্যাগের জন্য আসিতে আরম্ভ করে। সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বরের প্রথম ভাগ উহাদের ডিম্ব প্রসবের সময়। প্রথম আগমনকালে পেঙ্গুইনদিগের শরীরে এত অধিক চর্ব্বি থাকে যে উহাদের চলিতে কষ্ট হয়, কোন ক্রমে আড্ডাপর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে মাত্র। পক্ষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আসায় পালক পরিত্যাগ কার্য্য প্রায় তিন মাস ধরিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু একটী পেঙ্গুইনের পালক পরিত্যাগে তিন সপ্তাহের বেশী লাগে না। এই সুদীর্ঘ কাল উহারা কিছুই আহার করে না, নিজ দেহস্থ চর্ব্বি পরিপাক করিতে থাকে।

পুরাতন আবরণ পরিত্যাগ করিয়া নূতন আচ্ছাদনে আবৃত হইলে পেঙ্গুইনকে বড় সুন্দর দেখায়, কিন্তু বেচারা তখন এত শীর্ণ হইয়া পড়ে যে দেখিলে বোধ হয়, উহার বক্ষাস্থি চর্ম্মভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

যেরূপ বুদ্ধিবলে ইহারা ভীষণ তরঙ্গসত্ত্বেও দ্বীপে আসিয়া পৌছে তাহা সত্যই অতিশয় বিস্ময়কর। তরঙ্গ শতধা বিভক্ত হওয়ার ঠিক পূর্ব্বেই ইহারা উহার সম্মুখীন হইয়া নীচে ডুবিয়া যায়, এবং কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় উত্থিত হয়। ক্রমে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ উপস্থিত হইলে ইহারা নিজদেহ গুটাইয়া গোলাকার ধারণ করে, এবং ভীষণ তরঙ্গবেগে তীরে প্রক্ষিপ্ত হয়; এই বেগে তাহাদের কোনই ক্ষতি হয় না। তাহারা তীরে গড়াইতে থাকে, অবশেষে ঢেউ সরিয়া গেলে পুনরায় দেহ বিস্তার করিয়া পালক ঝাড়িয়া শুষ্ক তৃণের উপর দিয়া হেলিতে দুলিতে মরালগমনে অগ্রসর হয়।

সকল পেঙ্গুইনই দম্পতীবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহারা আড্ডার খাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ শ্বেত রেখায় তীর হইতে দুইটী দুইটী করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। খালের নিকটে ভূমি অতিশয় অসমান ও সঙ্কীর্ণ হওয়ায় উহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক হইতে হয়। একটী কিছু দূর অগ্রসর হইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে চারিদিক চাহিয়া দেখে, অপরটী পশ্চাতে আসিতেছে কি না। পথ পুনরায় প্রশস্ত হইলেই দম্পতী মিলিত হইয়া পাশাপাশি চলিতে থাকে।

আড্ডার পক্ষিগণ আপনাপন প্রণয়ীর সহিত সোজা হইয়া দাড়াইয়া থাকে। দিন দিন পালকগুলি অপরিষ্কার হইতে থাকে, এবং পক্ষিগণের আকার পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে পালকগুলি খসিয়া পড়ে।

আড্ডাগুলি পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত। যে সকল পেঙ্গুইন সকলের উপরে থাকে, পালকবর্জ্জন সমাপ্ত হইলে তাহাদের বড়ই বেগ পাইতে হয়। সমগ্র আড্ডার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে সমুদ্রে নামিতে হয়। সুতরাং গমনকালে প্রত্যেক পক্ষীই তাহাদিগকে ঠোকরায়। তাহাদের অবতরণপ্রণালী এইরূপ;—যথাসাধ্য ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া উহারা বেগে ধাবিত হয়,—এবং অন্যান্য পক্ষীর চঞ্চু হইতে নিরাপদ কোন স্থানে উপস্থিত হইলে বিশ্রাম করে। সময়ে সময়ে দম্পতীর মধ্যে একটী মাত্র প্রথমে তলদেশে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ জলে না নামিয়া সঙ্গীর জন্য ধীর ভাবে অপেক্ষা করে, সঙ্গী আসিলে একত্রে হেলিতে দুলিতে সলিলাভিমুখে যাত্রা করে। দীর্ঘ উপবাসে উভয়ের শরীরই দুর্ব্বল, তথাপি জলে নামিবার আগ্রহ কিছু মাত্র কম নহে। জলের ধারে পৌছাইলে তাহাদের গতি দ্রুততর হয়, এবং উভয়েই দৌড়াইয়া জলে পড়িয়া কিছুক্ষণ তরঙ্গ মধ্যে সাঁতার কাটিতে ও ডুব দিতে থাকে, তৎপরে পুনরায় ডাঙ্গায় উঠিয়া ডানা ঝাড়িয়া পালকগুলি সাবধানে পরিষ্কার করে। এই প্রথম সন্তরণের অল্পকাল পরেই তাহারা দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

পেঙ্গুইনদিগের ডিম্ব প্রসবের সময় সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হয়। তাহারা একবারে কেবল একটী করিয়া ডিম পাড়ে; পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই পর্য্যায়ক্রমে ডিমে তা দিতে থাকে, এবং শাবক স্বকীয় আহার সংগ্রহে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত উহাকে খাদ্য আনিয়া দেয়। ডিমে তা দেওয়ার সময় ডিমটি মাটিতে রাখিয়া পিতামাতা পালাক্রমে উহার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকে। ডিম ফুটিতে একমাস লাগে।

ইহাদের গিরি আরোহণের ক্ষমতা অসাধারণ; তীক্ষ্ণ বক্র নখর সাহায্যে ইহারা ২।১ শত ফুট উচ্চ পর্ব্বত আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।

ইহাদের মধ্যে রাজ-জাতীয় পেঙ্গুইনই অধিক কৌতুকাবহ। ইহারা পেঙ্গুইনদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, প্রায় ৩½ ফুট। গ্রীবাদেশের নমনীয়তাবশতঃ উহাদের উচ্চতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সংখ্যার অল্পতাবশতঃ সমগ্র ম্যাকোয়ারি দ্বীপে ইহাদের একটী মাত্র ডিম্বপ্রসবের স্থান আছে। প্রায় পক্ষীই অক্টোবর মাসে ডিম পাড়ে, কিন্তু মার্চ্চমাসেও কোন কোন পক্ষীকে ডিম পাড়িতে দেখা যায়। ইহাদের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে মার্চ্চমাসই প্রশস্ত সময়।

ইহারাও প্রতিবারে একটী মাত্র করিয়া ডিম্ব প্রসব করে। দুই পায়ের উপর ডিম্বটী রাখিয়া ইহারা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া বক্ষচর্ম্ম শিথিল করিয়া দেয়, ইহাতে ঐ চর্ম্ম ডিম্বটী সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ব্যাগের মত ঝুলিয়া পড়ে। এই উপায়ে ডিম্বটী কখনও শীতল প্রস্তরের সংস্পর্শে আইসে না, এবং সর্ব্বদাই গরম থাকে। যত দিন শাবক

খুব ছোট থাকে, ততদিন উহা সর্ব্বদাই এই স্থলীতে রক্ষিত হয়। কিন্তু উহারা ক্রমে বড় হইয়া শীতল বায়ুর সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত হয়, এবং পূর্ব্বতন আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, সে সময় পিতামাতার মধ্যে কেহ সম্মুখে থাকিয়া বাতাস হইতে কিয়ৎপরিমাণে উহাদিগকে রক্ষা করে।

শাবক প্রায় ৯।১০ মাস পিতামাতার নিকটে থাকে, কারণ পালক সম্পূর্ণরূপে না উঠিলে উহারা সমুদ্রে যাইতে পারে না; তজ্জন্য শাবকপালন ইহাদের পক্ষে সহজ নহে। পিতামাতা উভয়ে পর্য্যায়ক্রমে এই কার্য্য সম্পাদন করে; একে সমুদ্রে যাইয়া মৎস্য সংগ্রহ করে, অপরে গৃহে থাকিয়া শিশুটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকে।

আড্ডায় পক্ষীরা পরস্পর হইতে কিঞ্চিদ্দূরে দাঁড়াইয়া থাকে; যদি একটা পক্ষী সরিয়া অন্য পক্ষীর নিকটে আইসে, তবে তন্মুহূর্ত্তেই দুইটীতে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া যায়। যুদ্ধকালে ইহারা কেবল পক্ষেরই ব্যবহার করিয়া থাকে, চঞ্চুর প্রয়োগ অতি বিরল।

আড্ডায় শাবকগুলি হারাইয়া যাইবার কোনও ভয় নাই। নিকটে আসিলে অপর পক্ষী নষ্ট শাবকটীকে ঠোক্‌রাইতে থাকে, সুতরাং দায়ে পড়িয়া বেচারা শীঘ্রই বুঝিতে পারে যে মাতৃক্রোড়ের ন্যায় পৃথিবীতে আর নিরাপদ স্থান নাই।

শাবক আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেই পিতামাতা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৎস্য শিকারার্থ সমুদ্রে গমন করে, এবং পালক পরিত্যাগের তিন সপ্তাহ অনশনে থাকিবার উপযুক্ত পরিপুষ্ট হয়। কারণ পালক পরিবর্ত্তনকালে উহারা মৎস্য শিকারে অক্ষম হইয়া পড়ে।

একবর্ষ বয়স্ক হইলে উহাদের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ হয়, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত চক্ষুর রং কমলানেবুর ন্যায় হইতে থাকে। শিশুগুলির পা তেমন ঠিক থাকে না, দৌড়াইতে হইলে উপুড় হইয়া পড়িয়া নৌকার দাঁড়ের ন্যায় পক্ষ সঞ্চালন করিতে থাকে। পূর্ণবয়স্ক পক্ষীকে প্রায়ই সোজা হইয়া থাকিতে দেখা যায়, এমন কি, নিদ্রাকালেও উহারা শুইয়া থাকে না।

জোরে বাতাস বহিলে তাহারা ভ্রমণকালে পক্ষযুগল বিস্তার করে, কিন্তু বায়ুর বেগ একটু কমিলেই, কিম্বা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় পক্ষযুগল পার্শ্বদেশে নামাইয়া রাখে।

সারাদিন পেঙ্গুইনরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্রতীরে বিচরণ করে, বা ইতস্ততঃ দাঁড়াইয়া থাকে; কখনও বা অপর একটী পক্ষী আসিয়া দলের সহিত মিলিত হয়, এবং কিয়ৎকাল বাক্যালাপের পর প্রস্থান করে। পিতামাতা পেঙ্গুইন ধীর ভাবে তীরদেশে বিচরণ করিতে থাকে, কখনও থামে না বা চারিদিকে তাকায় না, বরাবর সোজা চলিয়া যায়। প্রত্যাগমনকালেও তাহাদের ঠিক এই ভাব, কেবল তখন মৎস্যের ভারবশতঃ তাহাদের পদবিক্ষেপ চঞ্চল, এবং শাবকের ক্ষুধার বিষয় মনে হওয়াতে গতি ত্বরিত।

পেঙ্গুইনরা শুশুকের ন্যায় সাঁতার দেয়, অর্থাৎ জলে কিছু দূর ডুবিয়া গিয়া শূন্যে লম্ফ প্রদান করে, আবার ডুব দেয়, এইরূপে অগ্রসর হইতে থাকে।

ইহাদের ভয় একেবারে নাই বলিলেই হয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন গুপ্ত।

বিশ্বজয়

"আজি রুদ্র বৈশাখের কঠোর নয়ন হ'তে
খসি' পড়ে কটাক্ষ দারুণ;
তাহার নিশ্বাস-বায়ে দূর দিগ্‌দিগন্তরে
স্রোতোমুখে ছুটেছে আগুন!
ধড়ফড় করে প্রাণ, কিছুই লাগেনা ভাল,
চল যাই উদেন-ভবনে;
সুগত আছেন তথা; পাইব, পাইব শান্তি
পড়ি যদি তাঁহার চরণে।"—
আনন্দ কহিলা ডাকি' —শ্রমণ, শ্রমণাগণ
ধীরে তাঁরে ঘিরিল আসিয়া;
অনাথপিণ্ডিক আদি সবাই চলিল মিলি'
প্রাণভরা উল্লাসে মাতিয়া!
তথাগত বসি একা, উদার নয়ন মেলি'—
দৃষ্টি তাঁর দূর দিগন্তরে।

বনবাসে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ।

কাংড়া-রাজপুত চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিঅনুসারে অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে)

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

সমগ্র ধরণীতল স্নিগ্ধ করি' যেন তাঁর
দৃষ্টি হ'তে সুধারাশি ঝরে !
তাঁহার নয়ন যেন ভবিষ্যের যবনিকা
ভেদ করি' গেছে বহুদূর,
যেথা ত্রিভুবন যুড়ি নিখিলের জীবস্রোত
এক ছন্দে তুলে এক সুর !
যেথায় মানব-আত্মা আত্ম-পর ভুলি গিয়া
কোন দিন করেনি গাহন ;
মহা-মানবের চিত্ত মাখেনি হৃদয়ে মনে
সনাতন প্রেমের চন্দন !
সেই রাজ্যে সুগতের প্রাণের নির্ম্মল গতি
ছেয়েছিল সর্ব্ব চরাচর,
সমাধি-প্রজ্ঞার দীপ্ত সুবিজন অন্তঃপুরে
উৎসারিয়া আনন্দ-নির্ঝর !
অনাথপিণ্ডিক আদি ভিক্ষুরা বিনম্র শিরে
সুগতেরে করি' প্রদক্ষিণ,
প্রণমি সম্ভ্রমে সবে জানু পাতি বসে ভূমে।
ঝিম্ ঝিম্ করে মধ্যদিন !
বুদ্ধ কহিলেন, "ওগো, শ্রমণ, শ্রমণাগণ,
হেরিতেছি হয়েছে সময় ;
কর আয়োজন সবে, বাহিরিতে হবে ত্বরা
করিবারে পৃথিবী-বিজয়।"
আত্রেয়ী আনত মুখে কহে ধীরে কহে চুপে,—
নেত্রে তার বিপুল বিস্ময়,
উদার ললাটতলে প্রশান্ত তপের জ্যোতি,
বাক্যে তার মধুর বিনয় !
"কিরূপে হে ভগবন্, অপার ধরণীতল
অনায়াসে হইবে বিজিত ?
কত অস্ত্রে, সৈন্যবলে হবে পৃথ্বী একচ্ছত্রী ?
সর্ব্বধরা হবে অধিকৃত ?"
"অস্ত্রে শস্ত্রে চাও বৎসে বিজিতে নিখিল বিশ্ব ?
স্বস্তি ! স্বস্তি !" কহে তথাগত।
সকলে স্তম্ভিত রহে ; তাঁর অশ্রুধারা বহে
গলিত প্রাণের রেখা মত !
"এই যে রয়েছে হেথা বিনীত, মুণ্ডিতশির
ব্রহ্মচারী শ্রমণ শ্রমণা
অমুদ্ধত প্রাণতলে যাদের সংযম নিষ্ঠা
হোমানল করেছে রচনা,—
তা'রাই আমার সেনা,— তা'রাই করিবে জয়,
এই বিশ্ব—ওই দেবলোক ;
তাহাদের প্রাণবলে ধূলি হ'য়ে যাবে উড়ে'
যত দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, দুঃখ, শোক !
শত রুদ্র সম্রাটের কোটি চতুরঙ্গ সেনা,
অস্ত্রে শস্ত্রে উন্মাদ ঝঞ্ঝনা,
হইবে স্থগিত-গতি, সত্যের নিশ্বাসে শুভ,
যাবে উড়ে' যেন ধূলিকণা।
কত শক্তি মানবের অপ্রমেয়, অকল্পিত
আছে গুপ্ত হৃদয়-গুহায়,
তাহার ইঙ্গিতে শুভে, সম্রাট-উষ্ণীষ শত
দীনহীন ধূলায় লোটায়।"
এত কহি' রহিলেন সুগত নীরব, মৌন,
মন্দিরের বৃদ্ধ বটচ্ছায়ে।
দুটি রক্ত বটফল ঝরি' পড়ে কোলে তাঁর
মধ্যাহ্নের তীব্র তপ্ত-বায়ে।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

প্রাচ্য প্রাচীন যন্ত্রবিদ্যা ও পাশ্চাত্য নব্য যন্ত্রবিজ্ঞান

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের দ্বারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য মনীষিগণ অদ্ভুত বিজ্ঞানবলে যে সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত করিতেছেন তাহাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নূতন স্বষ্টি অলীক কল্পনা বলিয়া কখনও মনে হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রখর রশ্মিজাল যতই আমাদের মধ্যে বিকীরিত হইতেছে ততই ভারতের বিলুপ্ত রত্নরাজি নব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য নববিজ্ঞান এই প্রকারে প্রাচ্য জ্ঞানরাজ্যে আলোক-বর্ত্তিকার কার্য্য করিতেছে। ভারত অধোগতির গভীর গহ্বরে নিপতিত হইলে ইহার জ্ঞান-রত্ন-রাজি অজ্ঞান-ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়—পাশ্চাত্য

জ্ঞানালোকে সেই তিমিরাবরণ অপসারিত হইয়া ইহাদের বিমলপ্রভা পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতেছে। পাশ্চাত্য জ্ঞানের সাহায্যে কিরূপে আমরা প্রাচ্যজ্ঞানের মহিমা সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা আমরা এখানে করিতে প্রয়াস পাইব।

উপরে আমরা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নূতন সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সৃষ্টি এরূপ ঐশ্বরিক নিয়মে সংসাধিত হইয়াছে যে তাহা নিত্য বিশ্বসৃষ্টিরই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। বিশ্বামিত্রের নূতন সৃষ্টির সীমায় যাইতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আরও অনেক যুগ অতিবাহিত হইবে। সুতরাং বিশ্বামিত্রের কথা না বলিয়া আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সমতলবর্ত্তী অন্য কোন প্রাচ্য উদ্ভাবয়িতার কীর্ত্তিকাহিনী এখানে বর্ণনা করিব। প্রাচ্যদিগের মধ্যে ময়দানবের ন্যায় উদ্ভাবনীশক্তি আর কাহারও দৃষ্ট হয় না। পুরাণাদিতে আমরা তাঁহাকে অদ্বিতীয় কারু বলিয়াই জানি কিন্তু তিনি যে একজন অদ্বিতীয় যন্ত্রশিল্পী তাহার খবর আমরা কমই রাখি। তদীয় এই যন্ত্রশিল্পের পরিচয় প্রদান করিতেই আমরা উপস্থিত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ কথাগ্রন্থ কথাসরিৎসাগর হইতে আমরা এই বিবরণ প্রধানতঃ সঙ্কলিত করিলাম। কথাসরিৎসাগরে ময় যন্ত্রশিল্পের প্রথম উদ্ভাবয়িতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। 'সূর্য্যপ্রভলম্বকের' ১ম তরঙ্গে চন্দ্রপ্রভ নৃপতির পুত্র সূর্য্যপ্রভের যন্ত্রবিদ্যা-শিক্ষা ময়ের দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়। যথাঃ—

"এবং ময়েনাভিহিতে রাজা চন্দ্রপ্রভোঽব্রবীৎ।
ধন্যাঃস্মঃ পুণ্যবানেষ যথেচ্ছং নীয়তামিতি ॥ ৩৩
ততস্তমামন্ত্র্য নৃপং তদনুজ্ঞানমাশুতম্
সূর্য্যপ্রভং স সামাত্যং পাতালং নীতবান্ ময়ঃ ॥ ৩৪
তত্রোপদিষ্টবাংস্তস্মৈ স তপাংসি তথাতথা।
রাজপুত্রঃ স সামাত্যো বিদ্যাঃ শীঘ্রমসাধয়ৎ ॥ ৩৫
বিমানসাধনং তস্মৈ তথৈবোপদিদেশ সঃ।
যেন ভূতাসনং নাম স বিমানমুপার্জ্জয়ৎ ॥ ৩৬
তদ্বিমানাধিরূঢ়ং তং সিদ্ধবিদ্যং সমন্ত্রিকম্।
সূর্য্যপ্রভং স পাতালাম্ময়ঃ স্বপুরমানয়ৎ ॥" ৩৭

কথাসরিৎসাগরে ময়ের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি প্রথমে অনার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে অনার্য্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্য্যদিগের শরণাগত হন ও তাঁহাদিগের দ্বারায় উৎসাহিত হইয়া ইন্দ্রের সভা নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে অনার্য্যগণ আর্য্যপক্ষাবলম্বী বলিয়া তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হন। তাঁহাদের ভয়ে ময় বিন্ধ্যপর্ব্বতে অনার্য্যদিগের দুর্ভেদ্য বিচিত্র চাতুর্য্য-ঘটিত ভূগর্ভে একটী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন; তাহাই উপরে পাতাল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ময়ের পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস এইখানে উদ্ধৃত হইলঃ—

"অস্তি ত্রিজগতি খ্যাতো ময়ো নাম মহাসুরঃ।
আসুরং ভাবমুৎসৃজ্য শৌরিং স শরণংশ্রিতঃ ॥ ১২
তেন দত্তাভয়শ্চক্রে সচ বজ্রভৃতঃ সভাম্।
দৈত্যাশ্চ দেবপক্ষোঽয়মিতি তং প্রতিচুক্রুধুঃ ॥ ১৩
তদ্ভয়াত্তেনবিন্ধ্যাদ্রৌ মায়াবিবর মন্দিরম্।
অগম্যমাসুরেন্দ্রানাং বহ্বাশ্চর্য্যময়ং কৃতম্ ॥" ১৪
কথাসরিৎসাগর,—মদনমঞ্চুকালম্বক,—৩য় তরঙ্গ ॥

কথাসরিৎসাগরের পূর্ব্বোক্ত মদন-মঞ্চুকালম্বকে যেখানে ময়দুহিতা সোমপ্রভা কর্ত্তৃক কলিঙ্গসেনার নিকট কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রপুত্তলিকা সকল প্রদর্শিত হয় সেইখানেই আমরা প্রথম ময়ের আশ্চর্য্য যন্ত্র-শিল্পপারদর্শিতার পরিচয় প্রাপ্ত হই। এখানে আমরা সেই কৌতুককর বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছিঃ—

"ইত্যুক্ত্বা দর্শয়ত্তস্যাঃ প্রোদ্ঘাট্য বহুকৌতুকাঃ।
সোমপ্রভা কাষ্ঠময়ীঃ স্বমায়াযন্ত্রপুত্রিকাঃ ॥ ১৮
কীলিকাহতি মাত্রেণ কাচিদ্গত্বা বিহায়সা।
তদাজ্ঞয়া পুষ্পমালামাদায় দ্রুতমাযযৌ ॥ ১৯
কাচিত্তথৈব পানীয়মানিনায় যদৃচ্ছয়া।
কাচিন্ননর্ত্ত কাচিচ্চ কথালাপমথাকরোৎ ॥" ২০
কথাসরিৎসাগর—মদনমঞ্চুকালম্বক—৩য় তরঙ্গ।

"সোমপ্রভা এই কথা বলিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রপুত্তলিকা (কলের পুতুল) সকল বাহির করতঃ তাহাদের নানাপ্রকার কৌতুক প্রদর্শন করিতে লাগিলেন—কোন পুত্তলিকা কীলকে আঘাত করিলেই আকাশ-মার্গে গমন করতঃ তাহার আজ্ঞানুসারে পুষ্পমালা লইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিল—কোনটী বা যদৃচ্ছাক্রমে জল লইয়া আসিল—কোনটী নাচিতে লাগিল—কোনটী বা কথা বলিতে লাগিল।"

ইহার পর আরও আশ্চর্য্যজনক বর্ণনা পাওয়া যায়, যথাঃ—

"ততঃ সোমপ্রভাবাদীদ্রাজন্নেতান্যনেকধা।
মায়াযন্ত্রাদি শিল্পানি পিত্রা সৃষ্টানি মে পুরা ॥ ৪২
যথাচেদং জগদ্যন্ত্রং পঞ্চভূতাত্মকং তথা।
যন্ত্রাণ্যেতানি সর্ব্বাণি শৃণু তানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৩
পৃথ্বীপ্রধানং যন্ত্রং যদ্দ্বারাদি পিদধাতিতৎ।
পিহিতং তেন শক্নোতি নচোদ্ঘাটয়িতুং পরঃ ॥ ৪৪
আকারস্তোয়যন্ত্রোত্থঃ সজীব ইব দৃশ্যতে।
তেজোময়ন্তু যন্ত্রন্তং তজ্জ্বালাঃ পরিমুঞ্চতি ॥ ৪৫
বাত-যন্ত্রংচ কুরুতে চেষ্টাগত্যাগমাদিকাঃ।
ব্যক্তী করোতি চালাপং যন্ত্রমাকাশসম্ভবম্ ॥ ৪৬

ময়াচৈতাস্তুবাপ্তানি তাতাৎ কিন্তুমৃতস্রাবৎ।
রক্ষকং চক্রযন্ত্রং তত্তাতো জানাতি নাপরঃ॥" ৪৭
কথাসরিৎসাগর—মদনমঞ্চুকালম্বক—৩য় তরঙ্গ।

"তারপর সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার পিতা কলিঙ্গদত্ত রাজাকে বলিলেন রাজন্! এই সমস্ত বহুবিধ কৌশলবিরচিত যন্ত্রশিল্প আমার পিতা-কর্তৃক বহুকাল হইল উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই পৃথিবীরূপ প্রাকৃতিক যন্ত্র যেমন পঞ্চভূতাত্মক—তদ্রূপ এই সমস্ত যন্ত্রও পঞ্চভূতের গুণযুক্ত। তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ শ্রবণ করুন্। যে যন্ত্রটী প্রধানভাবে পৃথিবীর গুণযুক্ত তাহা দ্বারপ্রভৃতিতে সন্নিবেশিত হইলে তৎসমস্ত অন্যের খুলিবার সামর্থ্য থাকে না। জলযন্ত্রটীকে আকৃতিতে সজীব বলিয়া বোধ হয়। তেজোময় যন্ত্রটী অগ্নিশিখা উদ্গিরণ করে। বাতযন্ত্র গতি প্রভৃতি কার্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। আকাশযন্ত্র বাক্যকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। আমি এই সমস্ত পিতা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি কিন্তু অমৃতের আধার যে চক্রযন্ত্র তাহা এক পিতা ব্যতীত আর কেহই জ্ঞাত নহে।"

এস্থলে 'জল যন্ত্র' মূর্ত্তিযুক্ত ফোয়ারার কল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, 'তেজোময়' যন্ত্র আধুনিক গ্যাস্ ও ইলেক্‌ট্রিক লাইটের (Gas and Electric light) কলের অনুরূপ বলিয়াই বোধ হয়, 'বাত-যন্ত্র' বর্ত্তমান সাইকল্ ও মোটরকার (Cycle, Motor Car) প্রভৃতির ন্যায় বায়ুপরিচালিত যন্ত্রবিশেষ বলিয়াই অনুমিত হয় এবং 'আকাশযন্ত্র' নবাবিষ্কৃত ফনোগ্রাফের ন্যায় কল বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। শেষোক্ত 'চক্রযন্ত্রটী' যে কিরূপ যন্ত্র তাহা পরিষ্কার বুঝা না গেলেও ইহা যে একটী চাকাবিশিষ্ট কল (wheeled machine) তাহা অবশ্যই উপলব্ধি হয়; ইহা বর্ত্তমান ইলেক্‌ট্রিক বা গেল্‌ভেনিক্ ব্যাটারির ন্যায় (Electric or Galvanic battery) নিত্য নবশক্তি-সঞ্চারক তাড়িতাধার যন্ত্র বলিয়াই মনে হয়।

কথাসরিৎসাগরে বিমান যন্ত্রের অর্থাৎ ব্যোমযানের যেরূপ বিস্তারিত বর্ণনা ও বহুল উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে একসময়ে এই যন্ত্রবিদ্যার যে সম্যক্ চর্চ্চা হইত ও এই যন্ত্রের যে সবিশেষ প্রচলন হইয়াছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণই পাওয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে আমরা কয়েকটী স্থল কথাসরিৎসাগর হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি তাহা হইতে আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবেঃ—

"গত্বা তং যন্ত্রতক্ষাণং বদ প্রাণধরং মহৎ।
ব্যোমগামি বিমানং নঃ প্রস্থানায়োপকল্পয়॥ ২২৩
কথাসরিৎসাগর—রত্নপ্রভালম্বক—৯ম তরঙ্গ।

"যাইয়া সেই যন্ত্রশিল্পী প্রাণধরকে বল যে আমোদে যাওয়ার জন্য একটী বৃহৎ আকাশগামী ব্যোমযান প্রস্তুত করে।"

উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে 'বিমানযন্ত্র' কোনরূপ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার ছিল না—কিন্তু ইহা উচ্চ অঙ্গের একটী শিল্প ছিল এবং ইহাতে রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া পারদর্শী লোক সকল বর্ত্তমানকালের মিকেনিক্‌দিগের (mechanic) ন্যায় 'যন্ত্রতক্ষ' অর্থাৎ 'যন্ত্রশিল্পী' নামে কথিত হইত।

এই 'বিমানযন্ত্র' কি উপায়ে পরিচালিত হইত ও ইহার বেগই বা কিরূপ ছিল নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্টীকৃত হইবেঃ—

"বাতযন্ত্রবিমানং চ তন্ময়াস্তীহ মঙ্ক্ষুষৎ।
যোজনাষ্টশতীং যাতি সকৃৎপ্রহত কীলিকম্॥" ৩৮
"আরুহ্য স্বকৃতেঽস্মিন্ বাতযন্ত্রবিমানকে।
দ্রুতং ততো গতোঽভূবং যোজনানাং শতদ্বয়ম্॥" ৪৪
কথাসরিৎসাগর—রত্নপ্রভালম্বক ৯ম তরঙ্গ।

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে বিমানযানের যন্ত্র বায়ু দ্বারাই পরিচালিত হইত, তাহাতেই 'বাতযন্ত্রবিমান' নামে ইহা অভিহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বেলুনযন্ত্র (balloon) যেমন উত্তপ্ত বায়ু বা লঘুবাষ্প (heated air, or light gas) পূরিত হইয়া উড্ডীয়মান হয় 'বাতবিমান যন্ত্র'ও এই প্রকারেই উড্ডীয়মান হইত বলিয়া বোধ হয়। স্ক্রু প্রভৃতি ঘুরাইয়া যেমন কলের কার্য্য নিয়মিত হয়—বিমানযন্ত্রের কীলকের দ্বারাও তদ্রূপ কার্য্যই সম্পাদিত হইত। একবারের গতির বেগ দুই শত যোজন হইতে আট শত যোজনও হইত। এবংবিধ বেগ-ক্রম সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতে প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। যথাঃ—

"প্রেরিতেন পুনস্তেন বিমানেন খগামিনা।
ততোঽপি যোজনশতদ্বয়মল্পদগামহম্॥ ৪৫
কথাসরিৎসাগর—রত্নপ্রভালম্বক—৯ম তরঙ্গ।

"পুনর্ব্বার আকাশগামী বিমানযানে বেগ প্রদান হইলে আমি আরও দুইশত যোজন চলিয়া গেলাম।"

বিমানের আয়তন সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে একজন হইতে হাজার জন পর্য্যন্ত চড়িবার উপযুক্ত যান প্রস্তুত হইত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়ঃ—

"ব্যাজিজ্ঞপচ্চ সুমহদ্বিমানং কৃতমস্তি মে।
যন্মানুষসহস্রাণি বহত্যাচ্ছাবহেলয়া॥" ২২৮
কথাসরিৎসাগর—রত্নপ্রভালম্বক—৯ম তরঙ্গ।

"যন্ত্রতক্ষা রাজার নিকট জ্ঞাপন করিল আমার একটী সুবৃহৎ ব্যোমযান প্রস্তুত আছে তাহা অদ্যই সহস্র মনুষ্য অনায়াসে বহন করিবে।"

বিমানযন্ত্রের উড্ডয়নের কথা আমরা বলিয়াছি। উড্ডয়ন যেমন ইচ্ছামত নিয়মিত হইত অবতরণও যে ইচ্ছামত নিয়মিত হইত তাহারও প্রমাণ আমরা কথাসরিৎসাগরেই প্রাপ্ত হই। পূর্ব্বোক্ত সুবৃহৎ ব্যোমযানটীর অবতরণ-বর্ণনা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তত্রাম্বরাদশঙ্কিতমবতীর্ণং বর-বিমান-বহনং তম্।
সানুচরং নববধ্বা যুক্তং দৃষ্ট্বা বিসিস্মিয়ে জনতা॥" ২৪২
কথাসরিৎসাগর—রত্নপ্রভালম্বক—৯ম তরঙ্গ।

এরূপ বৃহৎ ব্যোমযানটী আরোহীসজ্ঞ সমন্বিত হইয়া অবতীর্ণ হইলেও যে কাহারও মনে বিপৎপাতের কোন আশঙ্কার উদয় হয় নাই—ইহাতে, অবতরণ কৌশলটী যে সুনিশ্চিত বলিয়াই তাহাতে লোকের দৃঢ় আস্থা সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহা, স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে।

এই প্রকারের প্রকাণ্ড বিমানযান যে বর্ত্তমান airshipএর ন্যায় রাজশক্তিকে বায়ুরাজ্যের নবসমৃদ্ধিলাভের আশায় সমুৎসাহিত করিয়াছিল তাহাও কথাসরিৎসাগরে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হইয়াছে :—

"দৃষ্ট্বা বিমানবাহন সূচিত ভবিতব্য খচর-সাম্রাজ্যম্।
তং সোঽভ্যনন্দত সুতং রাজা চরণানতং বধূসহিতম্॥" ২৪৪
কথাসরিৎসাগর—রত্নপ্রভালম্বক—৯ম তরঙ্গ।

বস্তুতঃ স্বয়ং ময় হইতে লব্ধ অলৌকিক অব্যর্থ দীক্ষা প্রভাবে বিমানযন্ত্র সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত সূর্য্যপ্রভ যে আকাশ-রাজ্যে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন এবং বিমানযোগে দিগ্বিজয়াভিযানে চীনদেশ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে গমন করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বিবরণ কথাসরিৎসাগরের সূর্য্যপ্রভলম্বকের ১ম তরঙ্গে আমরা দেখিতে পাই। এখানে তাহা হইতে কিঞ্চিদংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল :—

"এতস্য পরিপন্থীহি কায়োঽস্মিন্ খেচরেশ্বরঃ।
বিদ্যতে শ্রুতশর্ম্মাখ্যঃ সোঽপি শক্রেণ নির্ম্মিতঃ॥ ৩১
সিদ্ধবিদ্যাপ্রভাবস্ত সহাস্মাভির্ব্বিজিত্য তম্।
এষ বিদ্যাধরাধীশ চক্রবর্ত্তীত্বমাপ্স্যতি॥" ৩২
"সোঽথ সূর্য্যপ্রভো বিদ্যাপ্রভাবাৎ সচিবৈঃ সহ।
নানাদেশান্ বিমানেন সদা বভ্রাম লীলয়া॥" ৪০
"অন্যেদ্যুশ্চ বিমানেন সহ সূর্য্যপ্রভো যযুঃ।
চন্দ্রপ্রভাদ্যাঃ সর্ব্বে তে চীনদেশং সপৌরবাঃ॥" ১৭৫

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের airshipএর সহিত প্রাগুক্ত "বর-বিমানবহনে"র নামগত, আয়তনগত, উদ্দেশ্যগত ও কার্য্যগত সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের স্বদেশীয়গণ যে নিরতিশয় চমৎকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ না। বিশেষতঃ যখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ অসাধারণ উ ও উদ্যোগ সত্ত্বেও airshipএর এখনও পূর্ণতা সা করিতে সমর্থ হন নাই, সেস্থলে প্রাচ্যদিগের দ্বারা তাহ পূর্ণতা সাধিত হইয়া তাহা যে সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী হই ছিল তাহা মনে করিয়া যে তাঁহারা বিশেষ গর্ব্বিত হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই সমস্ত বিমানযন্ত্র কে রাজদিগের দ্বারা নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইত বলিয়াই যে হয়, সুতরাং বর্ত্তমান airship প্রভৃতির ন্যায় এই সকল বিশেষ ব্যয়-সাধ্য ছিল তাহা অনায়াসেই মনে করা যাই পারে।

এক্ষণে আমরা প্রাচ্য যন্ত্রবিদ্যার কৃতকার্য্যতা সম্ব একটী অদ্ভুত বিবরণ প্রদান করিব। নরবাহনদত্ত রা কন্যা কর্পূরিকার পরিণয়াভিলাষী হইয়া তাহার অনুসন্ধা কর্পূরসম্ভব নগরে সন্ধান করিতে করিতে সমুদ্রতী এক আশ্চর্য্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানটী তাঁহার নিকট একটী সমৃদ্ধ নগর বলিয়া প্রতীয়ম হইলেও, তথাকার সমস্ত অধিবাসীই কাষ্ঠযন্ত্রে নি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ইহাদের সজীবের ন্যায় ব্যবহ দেখিয়া তিনি একান্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি বিপ পথে যাইতে যাইতে কাষ্ঠময় বাণিজ্যকারিণী ও নাগরিক দেখিলেন। কেবল নিঃশব্দ বলিয়াই ইহারা নির্জীব বলি বিবেচিত হইল—নতুবা ইহাদিগকে নির্জীব বলিয়া বুঝিব অন্য কোন উপায় ছিল না। তারপর ইহাঁরা রাজপুরী নিকটবর্ত্তী হইয়া হস্ত্যশ্বাদিও তদ্রূপ কাষ্ঠময়ই দেখি পাইলেন। অনন্তর পুর মধ্যে প্রবেশ করতঃ তাহা য নির্ম্মিত দ্বার-রক্ষক ও বারনারী সমন্বিত দেখিলেন ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাতারূপে চৈতন্যের ন্যায় তথাক জড়মূর্ত্তি সকলের স্পন্দনকারণ একজন শিষ্টাচারসম্প পুরুষকে তাঁহারা রত্ন সিংহাসনে আসীন দেখিলেন এই পুরুষটী কাঞ্চী নগরীর ময়শাস্ত্রপারদর্শী একজ বিচক্ষণ শিল্পী। তথাকার রাজ-কোপ হইতে নিজে পরিত্রাণ করিবার জন্য বিমানযানে তথা হইতে উক্ত স্থা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তথাকার নির্জ্জন বস্থানের কষ্টের মধ্যে আত্মবিনোদনের জন্য তিনি পূর্ব্বো

যন্ত্র-কাষ্ঠপুত্তলিকা সকল নির্ম্মাণ করতঃ তাহাদের মধ্যে রাজার লীলা করিয়া নিজের রাজধর-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। নরবাহন অমাত্য ও পরিজনবর্গ সহ তাঁহার অতিথিরূপে সমাগত হইলে তিনি যেরূপে তাঁহাদের আহার ও পরিচর্য্যা সংবিধান করিলেন তাহা অদ্ভুতেরও অদ্ভুত। উত্তম উপাদেয় আহার্য্য সামগ্রী সকল চিন্তামাত্রই আপনা আপনি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। আহার শেষ হইলে আহারস্থল পরিমার্জ্জিত হইয়া গেল অথচ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। তৎপর তাম্বুলাদিও এই প্রকারেই যোগান হইল :—

"প্রবিশ্য তত্র বিপণী-মার্গেন স দদর্শ চ।
কাষ্ঠ-যন্ত্রময়ং সর্ব্বং চেষ্টমানং সজীববৎ ॥ ১০
বণিগ্বিলাসিনী পৌরজনং জনিতবিস্ময়ম্।
বিজ্ঞায়মানং নির্জীব ইতি বাগ্বিরহাৎ পরম্ ॥ ১১
ক্রমাচ্চ গোমুখসখঃ সোঽস্তিকং রাজবেশ্মনঃ।
প্রাপ তাদৃশমেবাত্র হস্ত্যশ্বাদি বিলোকয়ন্ ॥ ১২
বিবেশ চাস্য সৌবর্ণপুর মস্তকশোভিনঃ।
অভ্যন্তরং সসচিবঃ সাশ্চর্য্যো রাজসদ্মনঃ ॥ ১৩
তত্র যন্ত্রপ্রতীহার বারনারী-পরিশ্রিতম্।
জড়ানাং স্পন্দনে হেতুং তেষাং চেতনমেককম্ ॥ ১৪
ইন্দ্রিয়ানামিবাত্মানমধিষ্ঠাতৃতয়া স্থিতম্।
রত্নসিংহাসনাসীনং ভব্যং পুরুষমৈক্ষত ॥ ১৫
* * * * * *
ভার্য্যাপরিচ্ছদো বামে চিন্তিতস্তু ন তিষ্ঠতি।
তেন যন্ত্রময়োঽত্রায়ং জনঃ সর্ব্বঃ কৃতো ময়া ॥ ৫৮
ইতীহাগত্য তস্থাপি দেবৈকাকী করোম্যহম্।
রাজ্ঞোলীলায়িতং রাজ্যধরো নাম বিধের্ব্বশাৎ ॥ ৫৯
তদ্দেব নির্ম্মিতেঽমুস্মিন্ ভবস্তোঽদ্য পুরে দিনম্।
বিশ্রাম্যন্তু যথাশক্তি পরিচর্য্যাপরে ময়ি ॥ ৬০

বুভুজে তত্র চাহারান্ ধ্যাতোপস্থিতাঞ্শুভান্।
তেন রাজ্যধরেণাগ্রস্থিতেন স সমন্ত্রিকঃ ॥ ৬৩
ততঃ কেনাপ্যদৃষ্টেন প্রমৃষ্টাহারভূমিকঃ।
অমৃতাম্বুলভোগং স তস্থৌ পীতাসবঃ সুখম্ ॥" ৬৩

যে কৌশলে রাজ্যধর যন্ত্রকাষ্ঠপুত্তলিকা সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই কৌশলেরই উন্নত প্রয়োগের দ্বারা তিনি পূর্ব্বোক্ত অদৃশ্যকর্ত্তৃসংযোগকার্য্য সকল নিষ্পাদিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা আমাদিগের নিকট বৈদ্যুতিক যন্ত্রেরই ক্রিয়া বলিয়া বোধ হয়। বৈদ্যুতিক উপায়ে* লোকের সম্পর্ক ছাড়া ভোজনপাত্র সকল যথাক্রমে একে একে স্বতঃই ভোজনকারীদিগের সম্মুখে স্থাপিত এবং প্রত্যেকটীর কার্য্য শেষ হইলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে তাহা অপসারিত হওয়া—এইরূপে সম্পূর্ণ কলে পরিবেষণের পরীক্ষা সম্প্রতি আমেরিকাতে হইয়া গিয়াছে ও তৎবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের মুদ্রণ, সেলাই, বাঁধাই প্রভৃতি কার্য্য যে হস্ত সংস্পর্শ ব্যতীত সম্পূর্ণ কলের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে তাহা বোধ হয় অনেকেরই নিকট সুবিদিত। সুতরাং রাজ্যধরের কৌশলে যে তেমন অসম্ভাব্য কিছু নাই তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

* Automatic Machine.

রাজ্যধরকে আমরা ময়-শাস্ত্রপারদর্শী বলিয়াছি। রাজ্যধরের ভ্রাতা প্রাণধরও একজন সুবিচক্ষণ শিল্পী। এই প্রাণধরই পূর্ব্ববর্ণিত সুবৃহৎ বিমানযন্ত্রের নির্ম্মাতা। এই উভয় ভ্রাতাই ময়কৃত যন্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ হইয়াছিলেন :—

"তস্য রাষ্ট্রে নৃপস্যাবাং তক্ষাণৌ ভ্রাতরাবুভৌ।
ময়প্রণীতদার্ব্বাদি মায়াযন্ত্রবিচক্ষণৌ ॥" ১২

কথাসরিৎসাগর--রত্নপ্রভালম্বক—৯ম তরঙ্গ।

যুধিষ্ঠিরের মহাসভা নির্ম্মাণে ময়ের অপর একটী অদ্ভুত কৃতিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সুবিস্তৃত সভাস্থল নির্ম্মিত করিলেও তাঁহার অলৌকিক কৌশলবলে উহা সহজেই অন্যত্র সঞ্চালিত হইতে পারিত :—"ময়দানবের আদেশানুসারে গগনচর মহাঘোর মহাকায় রক্তনেত্র শুক্তি-কর্ণ আয়ুধধারী অষ্টসহস্র কিঙ্কর ও রাক্ষস ঐ রমণীয় সভার রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং আবশ্যকমত বহন করিয়া উহাকে স্থানান্তরেও লইয়া যাইত।"—মহাভারত সভাপর্ব্ব কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

বর্ত্তমান সময়ে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদি স্বস্থান হইতে উৎপাটিত হইয়া স্থানান্তরে স্থাপিত হওয়ার যে যন্ত্র* উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহাতে সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে। ময় সেইরূপ কোন যন্ত্রযোগেই যদৃচ্ছাক্রমে তন্নির্ম্মিত সভাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিতেন বলিয়া বোধ হয়।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা হইতে আমরা ময়কেই যন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত প্রবর্ত্তক বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। ইঁহাকে আমরা প্রাচ্যজগতের এডিসন্ (Edison) বলিতে পারি।

উপসংহারে আমরা এই যন্ত্রবিদ্যার প্রাদুর্ভাবকাল

* Hydraulic Machine.

সম্বন্ধে একটী কথার উল্লেখ করিব। ময়-কন্যা সোমপ্রভা কর্ত্তৃক বৌদ্ধদেবগণের পূজা সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ—

"ততো যন্ত্রময়ং যক্ষং গৃহীত্বা প্রাহিণোত্তদা।
সোমপ্রভা স্বপ্রয়োগাদ্ বুদ্ধার্চ্চানয়নায় সা॥ ৩৮
স যক্ষো নভসা গত্বা দূরমধ্বানমাযযৌ।
আদায় মুক্তাসদ্রত্ন হেমাম্বুরুহসঞ্চয়ম্॥ ৩৯
তেনাভিপূজ্য সুগতান্ ভাসয়ামাস তত্র সা।
সোমপ্রভা স বিলয়ান্ সর্ব্বাশ্চর্য্যপ্রদায়িণী॥" ৪০

কথাসরিৎসাগর—মদনমঞ্চুকালম্ব। —৩য় তরঙ্গ।

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বৌদ্ধযুগে যন্ত্র বিদ্যার উৎপত্তি না হইলেও তৎকালে ইহার বিশেষরূপই অনুশীলন ছিল। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বৌদ্ধযুগেই যে হিন্দুরসায়নের উৎপত্তি হয় তাহা বিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন—তৎকালে বিজ্ঞানের যন্ত্রবিদ্যা-শাখারও শ্রীবৃদ্ধি হওয়া তবে সম্পূর্ণ সম্ভবপরই বোধ হয়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রাও স্বাস্থ্যনিবাস

গত আষাঢ় মাসে আমরা প্রবাসীর পাঠকপাঠিকাদিগকে ধরমপুর স্বাস্থ্যনিবাস সম্বন্ধে সংবাদ দিবার সময় বলিয়াছিলাম যে যক্ষ্মার ন্যায় কঠিন ব্যাধির বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার একটিমাত্র স্বাস্থ্যনিবাস ধরমপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এরূপ আশ্রম প্রদেশে প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। সুখের বিষয় এত অল্প দিনের মধ্যেই আমরা আর একটি স্বাস্থ্যনিবাসের সংবাদ দিতে সমর্থ হইতেছি।

এই স্বাস্থ্যনিবাসটি মধ্যভারতের রাও নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত। এই স্থান রাজপুতানা-মালোয়া রেলপথের ইন্দোর ও মৌ ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী ও মহারাজা হোলকার ইন্দোরাধিপতির এলাকার মধ্যে। স্বাস্থ্যনিবাসটি রেল ষ্টেসন হইতে দশ মিনিটের পথ; ২২০০ ফুট উঁচু একটি ছোট ত্রিকোণ পর্ব্বতচূড়ায় অধিষ্ঠিত। এই আশ্রমটি ইন্দোর রাজসরকারের চিকিৎসক ডাক্তার জি, আর, টাম্বে, এম. এ., বি. এস্‌সি., এল. এম. এস. মহোদয়ের যত্নে ও ইন্দোরাধিপতি মহারাজা হোলকারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ডাক্তার জি, আর, টাম্বে।

ডাক্তার টাম্বের জনহিতৈষণা স্বাভাবিক গুণ। তিনি রাজসরকারে ৯।১০ বৎসর কর্ম্ম করিতেছেন; তাঁহার হাসপাতাল মধ্যভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভারতের শ্রেষ্ঠ হাসপাতালের মধ্যে গণ্য। তিনি নরসেবায় প্রচুর আনন্দলাভ করেন এবং তাহাতে কখনো শ্রান্ত বা কাতর হন না। তিনি ক্ষয় ও যক্ষ্মা রোগের বিশেষজ্ঞ। এক বৎসর হইল তিনি ইন্দোরের প্রধান ডাক্তার লেফটেনাণ্ট কর্ণেল জে, আর, রবার্টস্, এম. বি., আই. এম. এস. মহোদয়ের সহযোগে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার শুভ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন আরম্ভ করেন।

ইন্দোরের আব-হাওয়া নাতিতীব্র; শীত বা গ্রীষ্ম, কিছুই অত্যধিক নহে। এজন্য ইন্দোরের নিকটে খোলা ময়দানে পাহাড়ের মাথায় স্বাস্থ্যনিবাসের উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচিত হয়। এবং মহারাজা হোলকার এই শুভকার্য্যের সূচনা জানিবামাত্র সেই স্থান স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন। এক্ষণে স্বাস্থ্যনিবাসের গৃহনির্ম্মাণকার্য্য
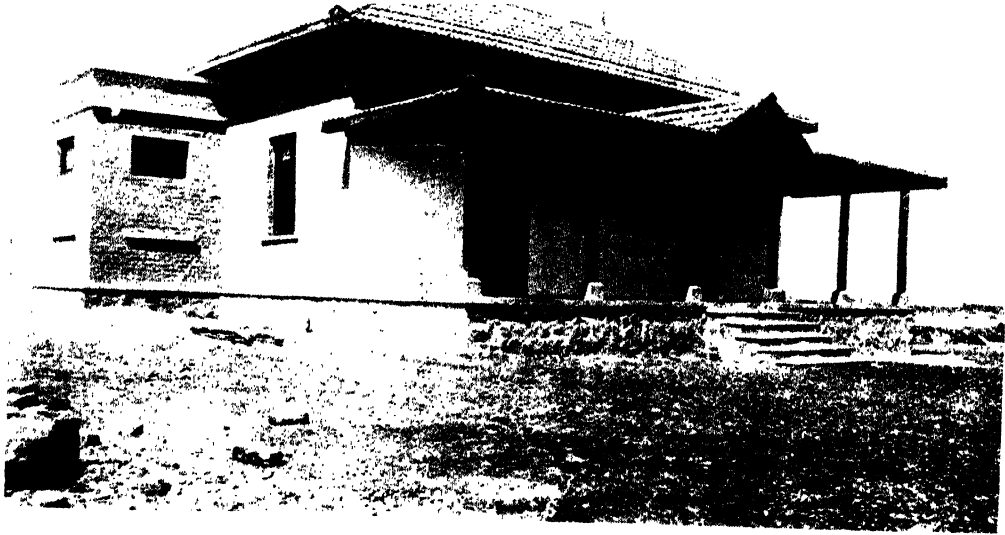
সুন্দরা বাঈ গৃহচত্বর — রাও স্বাস্থ্যনিবাস।

আরম্ভ হইয়াছে। দুইটি গৃহচত্বর শেষ হইয়াছে; তৃতীয় নির্ম্মিত হইতেছে; চতুর্থের ভিত্তিপত্তন হইয়াছে। কূপ প্রস্তুত— উহার জল প্রচুর ও উত্তম। পথ পাতা হইয়াছে। রোগীদিগকে আনন্দ ও মুক্ত বায়ু সেবনের সুবিধা দান করিবার জন্য একটি উদ্যানের মধ্যে ব্যাণ্ড ষ্টাণ্ড বা নহবতখানা গঠিত হইতেছে- ইহার খরচ লাগিবে ২০০০৲ টাকা -ইহা একজন সদাশয় ব্যক্তির দান -তিনি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। ডাক্তার টাম্বে এই স্বাস্থ্যনিবাসটি সস্তায় গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন; তবু ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যাবধারণ হইয়াছে।

স্বাস্থ্যনিবাসের গৃহ এরূপভাবে নির্ম্মিত হইতেছে যাহাতে সর্ব্বধর্ম্মের লোক নিজেদের শুচিতার সংস্কার বাঁচাইয়া ও পরস্পরের সংক্রামকতা এড়াইয়া বাস করিতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় গৃহচত্বর মহারাজা হোলকার বাহাদুরের শ্রীপতি সর্দ্দার বোলিয়া সাহেবের দান; তৃতীয় গৃহচত্বর উজ্জয়িনীর বোহ্‌রা সওদাগর শ্রীযুক্ত শেঠ নজরআলির দান; চতুর্থ চত্বরটি মৌ নিবাসী পার্সীসওদাগর শ্রীযুক্ত খাঁ বাহাদুর রতনজী পারেখ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইতেছে। বোহ্‌রা সাহেবের চত্বরটির আকার ১৫০ ফুট ও ৬০ ফুট এবং ১৪ জন রোগীর বাসযোগ্য; ইহার দুটি অংশ — একটি পুরুষদের ও অপরটি স্ত্রীলোকদের জন্য। ইহার নির্ম্মাণে অন্ততপক্ষে ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। প্রত্যেক গৃহচত্বরের সংলগ্ন পাকশালা প্রভৃতি আছে।

এই আশ্রম যাহাতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল নরনারীর অধিগম্য হয় তাহার আয়োজন হইতেছে। অন্ততপক্ষে ১৫০ জন রোগীর স্থান করা প্রতিষ্ঠাতার সঙ্কল্প। ২০ জন রোগীর স্থান হইলেই আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ হইবে। পর্দ্দানশিন মহিলা, য়ুরোপীয়ান, হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর রোগীই আশ্রমে থাকিতে পারিবে; এবং কোন রোগী যদি সপরিবারে থাকিতে চায় তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে। এই স্বাস্থ্যনিবাসের আর একটি বিশেষ সুবিধা এই করা হইবে যে, যে সকল ডাক্তার

তাঁহাদের রোগীদের এখানে পাঠাইয়া দিবেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এখানেও সেই সব রোগীর চিকিৎসা নিজে নিজেরাই করিতে পারিবেন, কেবল আশ্রমের চিকিৎসক তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন।

ডাক্তার টাম্বে আশ্রমের সহিত একটি রাসায়নিক পরীক্ষাগৃহ, একটি দাবাইখানা, একটি অস্ত্রোপচার কক্ষ, বিশ্রামকক্ষ প্রভৃতির আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন। প্রত্যেক রোগীকে আলাদা আলাদা ঘরে রাখা হইবে এবং প্রত্যেক ঘরে মুক্তবায়ুর প্রবেশের ব্যবস্থা থাকিবে অথচ রোগীকে বাতাসের স্রোতের মুখ হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইবে। প্রত্যেক গৃহে ১৫০০ ঘনফুট শুদ্ধ বাতাসের ব্যবস্থা হইতেছে। আশ্রমের সহিত ধোপাখানা ও গোশালাও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

আশ্রমের পরিচালনভার থাকিবে একটি পরিষদের উপর—পারিষদ হইবেন আশ্রমের হিতৈষী ও দানকর্ত্তারা এবং ইন্দোর রাজসরকারের ডাক্তার হইবেন আশ্রমকর্ত্তা।

ডাক্তার টাম্বের এই অনুষ্ঠান ভারতের অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সাহায্য ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে। মহারাজা হোলকার দয়া করিয়া এই আশ্রমের বার্ষিক ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং একজন চিকিৎসক নিয়োগেরও ব্যবস্থা করিবেন। মধ্যভারত, রাজপুতানা, খান্দেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের জনসাধারণও এই অনুষ্ঠানে আনন্দের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। তথাপি অর্থের সচ্ছলতা হয় নাই।

মানবদুঃখমোচনের এইরূপ শুভ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত করিয়া তোলা প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা বাঙালী জমিদার, সওদাগর, ধনী প্রভৃতির মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি,—তাঁহাদের প্রিয় ও ভক্তিভাজন আত্মীয়গণের পারলৌকিক কল্যাণ ও ইহলৌকিক স্মৃতিরক্ষার চমৎকার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারা ঈপ্সিত নামে স্বাস্থ্যনিবাসে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া দুঃস্থ নরনারীর আশীর্ব্বাদ ও উদ্যোক্তার ধন্যবাদ লাভ করিতে পারিবেন। স্বার্থশূন্য এমন শুভকর্ম্মে সাধারণেরও সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়। যৎসামান্য দানও সাদরে গৃহীত হইবে। দান পাঠাইবার ঠিকানা—

ডাক্তার জি, আর, টাম্বে, ইন্দোর।

মধুকরী

জ্ঞান ও শিক্ষালাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণের উপনয়ন-সংস্কার হইলেই তাহাদিগকে গুরুগৃহে যাইয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইত। গুরু বিদ্যাদান করিতেন, শিষ্যকে তৎপরিবর্ত্তে গুরুর গৃহকর্ম্ম করিয়া দিতে হইত, ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া গুরুপত্নীর হস্তে সমর্পণ করিতে হইত। ইহাই ভারতের সনাতন প্রথা। বিদ্যালাভের জন্য ব্রাহ্মণের ন্যায় উচ্চবর্ণের শিক্ষার্থীও স্বহস্তে সামান্যতম কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লজ্জা বা অপমান বোধ করিত না; গুরুর গোচারণ, ক্ষেত্রকর্ষণ, ইন্ধন আহরণ প্রভৃতি কর্ম্ম শিষ্যের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। এই দারিদ্র্যবরণ এককালে ব্রাহ্মণত্বের গৌরবের বিষয় মনে করা যাইত।

এক্ষণে ভারতের সেই প্রাচীন গুরুগৃহ আর নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন প্রথায় পরিচালিত সংস্কৃত টোলে এই ভাব ঈষৎ দেখা যায়; কিন্তু তাহাও এখন প্রাচীন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণসন্তানের উপনয়ন-সংস্কারের পর ভিক্ষাগ্রহণ এখন একটা অর্থহীন অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের দেশের যেসকল ছাত্র বিদেশে গিয়া স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন তাঁহারা কতক অংশে ভারতেরই প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন বলিতে হইবে। এইরূপ স্বাবলম্বনশীল বহুছাত্রের পরিচয় আমরা প্রবাসীতে দিয়াছি।

ভারতের একপ্রান্তে, মহারাষ্ট্রদেশে, এই আদর্শ এখনও যে কিয়ৎপরিমাণে জীবিত আছে তাহার সংবাদ আমরা কিন্তু রাখিনা। সেখানে বহু দরিদ্র ছাত্র ভিক্ষা করিয়া আপনাদের পাঠের খরচ সংগ্রহ করিয়া থাকে। দরিদ্র ছাত্রগণ ঝুলি হাতে করিয়া দ্বারে দ্বারে গৃহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলে "ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি।" গৃহিণীও তাড়াতাড়ি রাঁধা খাদ্য, রুটি ভাত তরকারী প্রভৃতি, আনিয়া ছাত্রকে ভিক্ষা দেন; ব্রাহ্মণ ছাত্র অব্রাহ্মণ গৃহিণীর পাককরা অন্ন গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না; কারণ ছাত্রাণাং

মধুকরী।

অধ্যয়নং তপঃ, সেই তপস্যার অপেক্ষা জাতিবিচার কখনোই বড় নহে। ছাত্র প্রসন্নমুখে আপনার ঝুলিটি মাটিতে পাতিয়া ধরে, আর গৃহিণী নিজের সাধ্য ও প্রকৃতি অনুসারে এক টুকরা বাজরা বা জোয়ারার রুটি, কদাচিৎ গমের আটার রুটি, সযত্নে প্রসারিত ঝুলিতে ভিক্ষা দেন। কখনো কখনো একগ্রাস ভাতের উপর এক ফোঁটা ডালই এক গৃহস্থবাড়ীর যথেষ্ট ভিক্ষা; কদাচিৎ কখনো তাহার সঙ্গে এক চিমটি তরকারীও মিলে। করুণাময়ী কোনো গৃহিণী তরকারীর ঝোল ভিক্ষা দিলে লইবার জন্য মধুকরী ছাত্রের নিকট একটি পিতলের বাটি বা মগ থাকে; শুভাদৃষ্ট সে ছাত্রের যাহার বাটিতে ঝোলের শুভ পদার্পণ ঘটে।

এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তিকে মধুকরী বলে। এই নামটি আমাদের দেশের বৈষ্ণবগণের অপরিচিত নহে; অনেক বৈষ্ণব সাধক বৃন্দাবনে গিয়া এই মধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করেন। মধুকর যেমন পুষ্প পুষ্পান্তর হইতে বিন্দু বিন্দু মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র পূর্ণ করে তেমনি এই ভিক্ষা বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে মধুকরী।

একখানি চৌকা কাপড়ের খুঁট চারিটি একত্র বাঁধিলেই ঝুলি হয়; তাহার খোলের মধ্যে একখানি গভীর ছোট থালা বসাইয়া মহারাষ্ট্র ছাত্র অন্ন সংগ্রহ করে; সঙ্গে আরো থাকে একটি বাটি ও একটি লোটা।

প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া ঝুলি হাতে ছাত্র ভিক্ষায় নির্গত হয়। অন্ততঃ ত্রিশ ঘর না ঘুরিলে দুবেলার মতো খাদ্য সংগ্রহ হয় না, এবং এই ভিক্ষা কার্য্যে তাহার প্রত্যহ দেড়ঘণ্টারও বেশি সময় ব্যয় হয়। এখন এক পুনা সহরেই শতাধিক ব্রাহ্মণ ছাত্র এই মধুকরী দ্বারা আত্মভরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

যে বালকটির চিত্র এতৎসঙ্গে প্রকাশিত হইল সেও ব্রাহ্মণ; বয়স ১৩ বৎসর; ইংরাজী-মারাঠী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। ১৯০২ সালের প্লেগে তাহার পিতার মৃত্যু হয়; তাহার মাতা কোনো পরিবারে দাসীর কর্ম্ম করেন এবং নিজের সামান্য বেতন হইতে পুত্রকে বই, কাপড় ইত্যাদি কিনিয়া দেন, পুত্রকে খাইতে দিবার সাধ্য তাঁহার হয় না; সেই হেতু বালক মধুকরী করিয়া আত্মভরণ ও বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। বালকটি বেশ মেধাবী ও মনোযোগী সুশীল ছাত্র।

আমাদের বাংলা দেশেও দরিদ্র ছাত্রের অভাব নাই। দেশে বিদেশে আমাদেরই জ্ঞাতি ভাইয়েরা যেরূপ কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে তাহা বাঙালী ছাত্রের আদর্শ হওয়া উচিত। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের কাছে জাতটাই জগতে সকলের চেয়ে বড়; ইহারা দুর্ভিক্ষে না খাইয়া প্রাণ হারাইবে তবু অপর জাতের ছোঁওয়া অন্ন খাইয়া জাত খোয়াইবে না। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের যে আক্ষেপ,

তাহা সকলেরই পড়িয়া দেখিবার মতো জিনিষ। তিনি বলিয়াছিলেন যে আমরা মুখে বলি জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ, *কিন্তু আচরণে আমরা ছুতমার্গ ছাড়াইয়া চলিতে পারি না।* এই কথাগুলি বাঙালী ছাত্রের বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে; দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে তাহাদের উপর;—দেশে যে পরিমাণ শিক্ষা বিস্তার হইবে, দেশ যে পরিমাণ কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবে, দেশের উন্নতিও হইবে সেই পরিমাণে।

আমার চীনপ্রবাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে চীনজাতি পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। ইহাতে প্রায়ই উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতল গৃহ কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ছাঁতের ভিতরদিকে কোন আচ্ছাদন নাই। ইষ্টকগুলি এক এক করিয়া গণিয়া লওয়া যায়। পাকা ছাত অতি কম। গৃহের দেওয়াল সুরঞ্জিত কাগজ দ্বারা মণ্ডিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহে ধূম নির্গমের পথ বা চিমনি রাখিতে হয়। এখানে (উত্তর চীনে) যেমন ভীষণ শীত তেমনি ভয়ানক গ্রীষ্ম। শীতকালে (ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে) তাপমান যন্ত্রে পারদ দ্বাদশ ডিগ্রি পর্য্যন্ত নীচে নামিয়া থাকে। আবার গ্রীষ্মকালে ১১৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। এমন শীতগ্রীষ্মের আধিক্য বোধ হয় ভারতের কোন স্থানে হয় না। এই জন্য উত্তর চীন চিলি প্রভিন্স (Chilly Province) বা শীতল প্রদেশ নামে খ্যাত। সাংসারিক জিনিষের মধ্যে লৌহ যেমন না হইলে চলে না, বাঁশ চীনজাতির নিকট ঠিক তদ্রূপ, এমন কোন জিনিষ নাই যাহা বাঁশে তৈয়ারী হইতে পারে না।

চীনজাতির কোন চার্টার্ড (Chartered) ব্যাঙ্ক নাই। ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অনেক আছে। তাম্রমুদ্রা বা চীনা ক্যাশ বহুদূর লইয়া যাওয়ায় অসুবিধা ঘটে, তন্নিবারণের জন্য চীনজাতি প্রায় ৮০০ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্কনোট প্রচলিত করে। বিলাতের যাদুঘরে চীনজাতির একখানি পুরাতন ব্যাঙ্কনোট আছে, সেখানি তথাকার ষ্টকহলম্ (Stockholm) ব্যাঙ্ক হইতে প্রথম নোট বাহির হইবার তিন শত বৎসর পূর্ব্বের।

চীনজাতি আতসবাজীর আবিষ্কর্ত্তা, কিন্তু কতিপয় শতাব্দী গত হইল উক্ত শিল্পবিদ্যা ইহাদিগের নিকট এক ভাবেই আছে। ইউরোপ এখান হইতে উক্ত শিল্প-গ্রহণ করিয়া অনেক উন্নতি করিয়াছে ইউরোপ শিল্প বিজ্ঞানে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশই যে আসিয়া খণ্ড হইতে গৃহীত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

কতিপয় চীন লেখকের মুখে শুনিলাম বৃক্ষপত্র জলে ভাসিতে দেখিয়া প্রথমে নৌকা গঠনের ধারণা জন্মে। কেহ কেহ বলেন আদিম কাঠের যাড় বা কাঠ ভাসিতে দেখিয়া নৌকা প্রস্তুতের ভাব প্রথমে মনে উদয় হয়। অনেক রকম নৌকা চীন দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। বহুসংখ্যক লোক আছে তাহারা নৌকাতেই বাস করিয়া থাকে। এরূপ কথিত আছে চীনদেশের নৌকার সংখ্যা অবশিষ্ট পৃথিবীর নৌকা অপেক্ষা অনেক বেশি। মধ্যবর্ত্তী সময়ে বড় বড় জাহাজের সাহায্যে চীনজাতি ভারতবর্ষ এবং আরও দূর দূরান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইত। ঐ সমস্ত নৌকা শুধু তিন হইতে দশ কিম্বা বার পালের সাহায্যে চলিত। চীনের বড় নৌকাগুলি এক অভিনব পদার্থ, দেখিলে বোধ হয় প্রলয়ের পূর্ব্ব হইতে একই ভাবে চলিয়া আসি-তেছে। চীনদিগের দিক্‌নিরুপণ যন্ত্র সর্ব্বদাই দক্ষিণ দিকে থাকে। তাহারা পশ্চিমোত্তর, পূর্ব্বোত্তর, পূর্ব্ব-দক্ষিণ এবং পশ্চিম-দক্ষিণ বলিয়া থাকে। নৌকায় রন্ধনকার্য্য পশ্চাৎভাগে সম্পাদিত হয়।

বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে চা চীনদেশে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। তন্মধ্যে গ্রিন টি অতিশয় বিখ্যাত। চীনের রেশম পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

খাদ্যের মধ্যে চীন জাতি শূকরের মাংস অত্যন্ত ভালবাসে। কুক্কুটও উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হয়। গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত আছে। কোন কোন স্থানে নিম্নশ্রেণীর লোকে কুকুর, বিড়াল এবং ইঁদুর খাইয়া থাকে। কোন কোন প্রদেশে নীচ জাতীয় লোক সর্প পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে। গুটিপোকা চীনেদের একটী উপাদেয় খাদ্য।

ঈাঙ্গরের ডানা, মাছের নাড়ী ইত্যাদিও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এজগতে এমন কোন জান্তব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ নাই যাহা তাহাদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত না হয়। চীনেরা প্রধানতঃ দুই বার খাইয়া থাকে, একবার সকালে আট কিম্বা দশটার সময়, আর একবার সন্ধ্যা পাঁচ কিম্বা ছয়টার সময়। চীনের সকল লোকেরই এরূপ পরিমিত আহার যে কাহারই মাসে দুই ডলারের বেশি খরচ লাগে না। মধ্যাহ্নে ২।৪ খানি পিষ্টক বা চীনা মিষ্টান্ন অনেকে খাইয়া থাকে। জন মজুরের মধ্যে নৌকার মাঝি প্রভৃতি দিনের মধ্যে ৪।৫ বার খাইয়া থাকে। ঘুস অত্যধিক ব্যবহৃত হয়। প্রায় সকল রকম ফলমূল শাক সব্জী চীনদেশে পাওয়া যায়। চীনজাতির মধ্যে ভোজের প্রথা অতিমাত্রায় প্রচলিত।

পিতামাতা দ্বারা নিযুক্ত ঘটক দ্বারা বিবাহ স্থির হয়। চীনজাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে তিনটী সর্ত্ত এবং ছয়টী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তিনটী সর্ত্ত যথা;— (১) বিবাহ চুক্তি, (২) বিবাহ সম্বন্ধীয় টাকার রসিদ, (৩) পাত্রী অর্পণের দানপত্র। ছয়টী ক্রিয়া বা আচার;— (১) সামান্য যৌতুক, (২) পাত্রীর নাম জিজ্ঞাসা, (৩) বিবাহের টাকা প্রদান, (৪) শুভদিন নির্দ্ধারণের প্রার্থনা, (৫) রাজহংস প্রেরণ, (৬) পাত্রী আনয়ন।

বিবাহের উপঢৌকনকে "চা লাই" বা চা-দান-প্রক্রিয়া বলে। বরের বাড়ী হইতে চা, সুপারি, পিষ্টক এবং টাকা কন্যার বাড়ী পাঠান হয়। চীনেরা ইহাকে "সিক ইয়ান চা.লাই" বলে অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া ব্যবহৃত হওয়াতে বিবাহ সম্বন্ধ পাকারূপে স্থির হইল। বিবাহের পূর্ব্বে বর ক'নেকে কোন মতেই দেখিতে পায় না। বিবাহ স্থির হইলে ক'নেকে নির্জ্জনে থাকিতে হয়, এবং অতি সাবধানে পরিবারস্থ সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হয়। চীন জাতির মধ্যে একাধিক বিবাহ করার রীতি প্রচলিত নাই। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে যে কেহ উপপত্নীকে গৃহে রাখিতে পারে। অনেক সময়ে স্ত্রীর সহিত উপপত্নী এক গৃহে বাস করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা কেশরচনা করে না। নিবিড় কৃষ্ণ কেশদাম পৃষ্ঠোপরি দোদুল্যমান থাকে। বিবাহ দিলে কেশবিন্যাস করা হয়। চীনদেশে অবরোধপ্রথা প্রচলিত নাই। বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত, এবং কোন কোন স্থলে আইনতঃ নিষিদ্ধ। কখন কখন চীনেরা কন্যা ক্রয় করিয়া গৃহে পালন করে, পরিশেষে নিজ সন্তানের সহিত বিবাহ দিয়া থাকে।

চীন জাতির মধ্যে শবদাহ প্রথা প্রচলিত নাই। তাহাদের বিশ্বাস যদি সমুদয় শরীর যথাযথ পরকালে না যায় তাহা হইলে পরজন্মে সম্পূর্ণ শরীর হইবে না। এজন্য তাহারা মৃত শরীর মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করে। আর, যদি মৃত শরীর কবর দেওয়া না হয় তাহা হইলে আত্মা যাইতে পারে না, তাহাকে কুকুরের সহিত উপমা দেওয়া হইয়া থাকে। অনেকে আত্মার রূপান্তরিত হওয়া বিশ্বাস করে। অনেকের সাধারণ বিশ্বাস এই যদি যথাবিহিত ঔর্দ্ধদেহিক সম্মান মৃতব্যক্তিকে প্রদর্শিত হয় তাহা হইলে আত্মা দেহত্যাগ করিয়া তিন দিন পরে পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত মিলিত হয়।

সপ্তাহান্তে একবার করিয়া উনপঞ্চাশ দিনে সাতবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। চীনজাতি শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া শোক প্রকাশ করে। শোক প্রকাশের নির্দ্দিষ্ট কাল তিন বৎসর। কেহ কেহ ঐ কাল কমাইয়া সপ্তবিংশতি মাস স্থির করিয়াছেন।

বাতুলতা এবং এইরূপ অন্যান্য রোগকে চীনজাতি ভূতে পাওয়া বলিয়া মনে করে।

চীন দেশে কোন ভৃত্য কার্য্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে বদলি লোক দিয়া ছুটী লইয়া গৃহে যায় এবং আর ফিরিয়া আইসে না। কোন বিষয়ে পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করিলে নিজে না আসিয়া কোন বন্ধুকে প্রেরণ করে, এবং প্রায় সকল কাজই একজন মধ্যস্থ রাখিয়া সম্পাদিত হয়। ভগ্নাংশে অধিক সংখ্যা প্রথমে বলিয়া পরে অল্প সংখ্যা বলা হয়, যেমন দুই তৃতীয়াংশ (⅔) না বলিয়া তৃতীয়াংশ দুই বলা হয়। তারিখ লিখিতে প্রথমে বৎসর, পরে মাস এবং সর্ব্বশেষে দিন লেখা হয়। ভারবাহী পশুর কার্য্য অনেক স্থলে মনুষ্য দ্বারা সাধিত হয়। যন্ত্রণা দিয়া দোষ স্বীকার করান চীনে অত্যন্ত ভীষণ।

চীনকে ঘুড়ির দেশ বলা যাইতে পারে। এমন অদ্ভুত

আকারের ঘুড়ি আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্য, পাখী, মাছ, প্রজাপতি, এক জোড়া চস্‌মা এবং আরও নানা রকমের ঘুড়ি প্রস্তুত করিয়া বালক হইতে যুবক এবং প্রৌঢ় পর্য্যন্ত এই খেলায় মত্ত হইয়া থাকে। এমন সুন্দর নির্ম্মাণকৌশল যে দেখিতে ঠিক প্রকৃত জিনিষ বলিয়া ভ্রম জন্মে। নবম চন্দ্রের নবম দিনের পর্ব্বোপলক্ষে এই খেলা চীন দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। শতরঞ্চ ক্রীড়া চীনাদিগের অতি প্রাচীন খেলা। কথিত আছে চাউ রাজবংশের প্রথম সম্রাট উওয়াং (Wuwang) ১১২০ খৃঃ পূঃ এই খেলা আবিষ্কার করেন। ভারতবর্ষে প্রবাদ লঙ্কাধিপতি রাবণ এই খেলার প্রবর্ত্তক। তাসখেলার প্রচলন আছে, তাসগুলি আকারে খুব ছোট।

সঙ্গীত চীন দেশে বহু পুরাতন। সম্রাট ফুছি কর্ত্তৃক ২৮৫২ খ্রীঃ পূঃ সঙ্গীত আবিষ্কৃত হয় এরূপ কথিত আছে। স্বর্গ মর্ত্ত এবং মনুষ্যের মধ্যে ইহা শান্তিনিদর্শন। চীন জাতি তজ্জন্য এই কলাকে অত্যন্ত আদর করিয়া থাকে। তাহাদের সঙ্গীত অধিকাংশই করুণরসমিশ্রিত।

চীন বার্নিস, বার্নিস বৃক্ষ হইতে জন্মিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার ধুনার ন্যায় আঠা। চীন এবং জাপানে ইহার চাষ হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের পত্র এবং ত্বক পাঁশুটে রং বিশিষ্ট। ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ। সাত বৎসর পরে নির্য্যাসরূপে বার্নিস পাওয়া যায়। চীন দেশের ফুকিয়েন এবং কোং টুং প্রদেশে কর্পূর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কিয়াংজি, হুপে এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশেও বড় বড় কর্পূর বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষ অতি বৃহৎ, পঞ্চাশ ফুট উচ্চ, পরিধি প্রায় বিশ ফুট, বড় বড় ডাল পালা সমন্বিত। এই বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা বাক্স, সিন্দুক, দেরাজ ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অত্যধিক কর্পূরের গন্ধ বিশিষ্ট এই কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তুতে কোন প্রকার কীটাদি লাগিতে পারে না। কারণ ইহা কীট-প্রতিষেধক। কখন কখন নৌকাও এই কাষ্ঠ দ্বারা তৈয়ারী হয়। ঔষধার্থে কর্পূর ব্যবহার ব্যতীত চীন জাতি বার্নিস পাতলা করিতেও ইহা ব্যবহার করে। কর্পূর-প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ,— শাখা মূল এবং পত্র হইতে নির্য্যাস গ্রহণ করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে উক্ত নির্য্যাস গলিয়া গেলে অল্প অল্প অগ্নুত্তাপ দিতে হয়। খড় দ্বারা শুণ্ডাকৃতি নল তৈয়ারি করিয়া কর্পূর উঠাইতে হয়। অপরিষ্কৃত দানা দেখিতে ময়লা চিনির ন্যায়। জাপানী কর্পূর এই কর্পূর হইতে অনেক নির্ম্মল এবং মূল্যবান্।

পক্ষিনীড়ের সূপ বা ঝোল চীনজাতির ভিতর বিলাসিতার চরম বলিয়া গণ্য। প্রথমতঃ কথাটা শুনিয়া অবাক হইতে হয়। পাখীর বাসা মানুষে খায় কি করিয়া। খড় কুটা দিয়া যে বাসা প্রস্তুত তাহার মধ্যে এমন লোভনীয় বস্তু কি আছে যাহার জন্য লোকে এমন প্রলুব্ধ হইতে পারে? কথাটা একবার অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা পাখীর বাসা যে হিসাবে জানি, এই পাখীর কুলায় আদৌ সেরূপ নয়, ইহা একরূপ আঠাবৎ লালা পদার্থ হইতে প্রস্তুত। দেখিতে শ্বেত বর্ণ, নরম এবং তেলা। পাখী নিজ মুখ হইতে এই পদার্থ বাহির করিয়া সমুদ্রতীরে গুহার মধ্যে বাসা নির্ম্মাণ করে। মালয় এবং সিংহল দ্বীপে এই পাখীর বাসা পাওয়া যায়। গোমাণ্টি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পক্ষিনীড়ের গুহা। ইহা হইতে বার্ষিক আয় প্রায় সাড়ে বাইশ হাজার টাকা। এই বাসা সংগ্রহ করা অতি দুরূহ এবং বিপদজনক ব্যাপার। বিপদসঙ্কুল বলিয়াই বোধ হয় ইহার মূল্য এত অধিক। উৎকৃষ্ট নীড় তিন ডলার (এক ডলার দেড় টাকার সমান) হইতে ত্রিশ ডলার পর্য্যন্ত প্রতি পাউণ্ড বা অর্দ্ধ সের বিক্রয় হয়। নীরস জিনিসের মধ্যে অল্পবিস্তর খড় কুটা সংযোজিত থাকে। চীনজাতি এই জিনিষকে বলকারক, উত্তেজক এবং উপাদেয় মনে করে, এবং সমস্ত বড় বড় ভোজেই প্রথমে প্রদত্ত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ রায়।

জ্যোতিষিক যৎকিঞ্চিৎ

সৌরজগতের গতি।

সূর্য্য নিশ্চল না থাকিয়া পৃথিবী, শুক্র, ও ধূমকেতু প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া যে, মহাকাশের এক নির্দ্দিষ্ট দিকে ছুটিতেছে, এই নূতন তথ্যটিকে আধুনিক জ্যোতিষের

একটি মহাবিষ্কার বলা যাইতে পারে। সূর্য্য এবং অতি দূরের নক্ষত্রগণ নিশ্চল, আর আমাদের পৃথিবী চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ উপগ্রহগণ সচল, এই বিশ্বাস সৃষ্টির একতার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ আনিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ এখন কোন জিনিসকে আর নিশ্চল বলিতে চাহেন না। যে মহাপর্ব্বত পৃথিবীর শৈশবকাল হইতে উচ্চশিরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার প্রত্যেক অণু দ্রুতবেগে কম্পিত হইতেছে। তা'র পর সেই অণুগুলি যে সকল পরমাণু ও অতি পরমাণু (Corpuscles) মিলনে উৎপন্ন, তাহারাও গতিশীল। সূচ্যগ্রপ্রমাণ স্থানে কোটি কোটি পরমাণু, অতি-পরমাণু মিলিয়া যে কত ঘূর্ণী, কত আবর্ত্তের রচনা করিতেছে, এবং কত পরমাণু যে নিজের বেগ হারাইয়া অপরকে গতিশীল করিতেছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। জড় বা জীবের ক্ষুদ্র দেহের অতি সংকীর্ণ স্থানে যে লীলা চলিতেছে, বড় বড় জ্যোতিষ্কগণ মহাকাশ জুড়িয়া তাহাকেই বড় করিয়া দেখাইতেছে। এই পরম সত্যটি বিজ্ঞানকে সত্যই মহিমাময় করিয়া তুলিয়াছে।

সৌরজগৎ যে গতিবিশিষ্ট, এই কথাটা একেবারে নূতন নয়। প্রায় দেড়-শত বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ জ্যোতিষী রাইট্ সাহেব (Thomas Wright) সর্ব্বপ্রথমে ইহার আভাস দিয়াছিলেন। তা'র পর জর্ম্মান্ পণ্ডিত ম্যাড্‌লার (Madler) সাহেব, সেই অনুমানটিকেই মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইনি জানিতেন, কেবল আমাদের সূর্য্যই গতিশীল নয়; আকাশে যে কোটি কোটি মহাসূর্য্য নক্ষত্রাকারে দীপ্তি পাইতেছে, তাহাদেরও গতি আছে; এবং সকলেই কৃত্তিকা-রাশিস্থ (Pleides) এক মহাসূর্য্যকে (Alcyone) মাঝে রাখিয়া ঘুরিতেছে। কিন্তু রাইট্ বা ম্যাড্‌লার কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। কাজেই পরবর্ত্তী জ্যোতিষিগণ মতবাদটিকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ সরল পথ দিয়া যখন পথিক চলিতে থাকে, তখন তাহার মনে হয় যেন অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পথের দুই ধারের বৃক্ষশ্রেণী ফাঁক হইয়া আসিতেছে। আমাদের সৌরজগৎ যে, স্থির না থাকিয়া একটা দিক্ ধরিয়া চলিতেছে, তাহা সম্মুখের নক্ষত্রগুলির ঐপ্রকার বিচলন দেখিয়া ধরা যাইতেছে। মহারণ্যের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তবে চারিদিকের বৃক্ষগুলির অবস্থানের কোন পরিবর্ত্তনই দেখা যায় না; চলিতে সুরু করিলেই সম্মুখের নিবিড় অরণ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গোটা গোটা বৃক্ষের আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে। আমাদের সৌরজগতে চারিদিকের আকাশকে জুড়িয়া যে সকল নক্ষত্র রহিয়াছে তাহা মহারণ্যের বৃক্ষগুলির ন্যায়ই বিন্যস্ত। এখন যদি ইহাদেরই কতকগুলিকে নিয়মিতভাবে ফাঁক হইতে দেখা যায়, তবে আমাদের জগৎ সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেই হয়। জ্যোতিষিগণ আকাশের একদিকের কতকগুলি নক্ষত্রের ঠিক এই প্রকার বিচলন লক্ষ্য করিয়া সৌরজগতকে গতিশীল বলিতেছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে সন্ধ্যার পর পূর্ব্ব-উত্তর গগনে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। ইহাকে ইংরাজিতে Vega বলে। আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাকেই অভিজিৎ নক্ষত্র নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতিষিগণ দীর্ঘকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, এই নক্ষত্রটিরই নিকটবর্ত্তী ছোট বড় তারাগুলি যেন ক্রমেই দূরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং আমাদের সূর্য্য তাহার গ্রহ উপগ্রহে পরিবৃত হইয়া যে ঐ অভিজিৎ নক্ষত্রের দিকে চলিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইতেছে।

গতির বর্ত্তমান দিক্‌নির্ণয় করিলেই যথেষ্ট হয় না। যে পথ অবলম্বন করিয়া সূর্য্য অগ্রসর হইতেছে, তাহা সরল কি বক্র স্থির করা আবশ্যক। তা ছাড়া গতির পরিমাণ জানা চাই। এই সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য জ্যোতিষিগণ আজকাল যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু কোন্ মহাসূর্য্যের আকর্ষণে আমাদের সূর্য্যটি সপরিবারে মহাকাশ ভেদ করিয়া চলিতেছে তাহা স্থির হয় নাই। পৃথিবী ও শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণ কোন্ পথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, আমরা তাহা এখন নির্দ্দেশ করিতে পারি, এবং ইহাদের বিচরণ ক্ষেত্রের সহিতও আমাদের বেশ পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্য যে পথের পথিক তাহার শেষ

কোথায় এবং তাহা সরল কি বক্র, তাহা আজও নির্দ্দেশ করা যাইতেছে না। আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছি, এই সকল অনাবিষ্কৃত তত্ত্ব আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এগুলির মীমাংসা না হইলে, নক্ষত্রজগতের গঠন এবং দূরদূরান্তরের নক্ষত্রদিগের পরস্পর সম্বন্ধ কখনই জানা যাইবে না।

যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি অমীমাংসিত থাকিলেও, সৌরজগৎ কি প্রকার বেগে চলিতেছে, তাহা মোটামুটি স্থির করা হইয়াছে। আমরা সকল নক্ষত্রের দূরত্ব জানি না। ইহাদের অনেকেই এতদূরে অবস্থিত যে, প্রতি সেকেণ্ডে কুড়ি পঁচিশ মাইল বেগে ভ্রমণ করা সত্বেও, দূর হইতে তাহাদিগকে আমরা নিশ্চলই দেখি। যাহারা অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী, দেড় শত বা দুই শত বৎসরের ধারাবাহিক পর্য্যবেক্ষণে কেবল তাহাদেরই একটু আধটু বিচলন ধরা পড়ে। সূর্য্যের পথবর্ত্তী এই সকল নিকট নক্ষত্র স্বকীয় গতি দ্বারা কতটা বিচলিত হইতেছে, এবং সূর্য্যের গতি কতটা স্থানচ্যুতি ঘটাইতেছে, গণনা করিয়া সৌরজগতের বেগ নির্ণয় করা হইতেছে। এই হিসাবে দেখা যায়, আমরা সূর্য্যের সহযাত্রী হইয়া প্রতি সেকেণ্ডে বারো মাইল অর্থাৎ বৎসরে ত্রিশ কোটি মাইল বেগে সেই অভিজিৎ নক্ষত্রের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। এই যাত্রা কবে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তাহা কবে শেষ হইবে, তাহার স্থিরতা নাই।

গণনাতীত কাল হইতে এই প্রচণ্ড বেগে মহাকাশে চলিয়াও, পথিমধ্যে সূর্য্য অদ্যাপি অপর কোন নক্ষত্রের সাক্ষাৎ লাভ করে নাই,—ইহা আর এক আশ্চর্য্যের কথা। কিছুদিন হইতে কয়েকজন জ্যোতিষী এই প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। কাহার আকর্ষণে এবং কোন্ নিয়মে নক্ষত্রগুলি বিচরণ করিতেছে, এবং নক্ষত্রজগৎ কত দূর প্রসারিত, এ সম্বন্ধে আমাদের একটুও জ্ঞান নাই। কাজেই জ্যোতিষিগণ যে রহস্যের মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা কখনই সহজে আত্মপ্রকাশ করিবে না। তবে ইহা হইতে নক্ষত্রজগতের বিশালতার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। কোন গণনাতীত আদি কাল হইতে সেকেণ্ডে বারো মাইল বেগে চলিয়া যে পথিক এই অসংখ্য জ্যোতিষ্কখচিত আকাশে একটি নক্ষত্রেরও দেখা পায় নাই, তুলনায় তাহার গতি যে কত মন্থর এবং বিচরণ ক্ষেত্র যে কত বৃহৎ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী অধ্যাপক কাপ্তেন্ (Kaptyen) নক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি নূতন সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, আকাশের দুই বিপরীত অংশ দিয়া দুইটা পাখীর ঝাঁক সমান্তরাল পথে বিপরীতমুখী হইয়া উড়িতে থাকিলে, দুই দলের পাখীর মিলন যেমন অসম্ভব, নক্ষত্রদিগের মিলনও ঠিক্ সেই কারণে অসম্ভব। ইনি বলিতেছেন, যে সকল নক্ষত্রকে আমরা এলোমেলোভাবে আকাশে বিন্যস্ত দেখি, মূলে তাহাদের বিন্যাসে খুব শৃঙ্খলা আছে। উদাহরণের পাখীর ঝাঁকের মত সমস্ত নক্ষত্রই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া সমান্তরাল পথে বিপরীত দিকে ছুটিতেছে। এই জন্য কোন নক্ষত্রের সহিত অপরের সহসা সংঘর্ষণ বা সাক্ষাৎ হয় না।

নীহারিকা।

হার্সেল্ সাহেব স্বহস্তনির্ম্মিত দূরবীণে নীহারিকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের কতকগুলিতে ঘনসন্নিবিষ্ট নক্ষত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন স্থির হইয়াছিল, আকাশের স্থানে স্থানে অবস্থিত উজ্জ্বল মেঘের ন্যায় যেসকল জ্যোতিষ্ককে আমরা নীহারিকা বলি, তাহারা অতি দূরের তারকাপুঞ্জ। হার্সেল্ আশা করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে ভাল বড় দূরবীণ নির্ম্মিত হইলে, সকল নীহারিকাতেই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়িবে। তাঁহার মৃত্যুর পর এখন খুব ভাল দূরবীণ দিয়াই নীহারিকা পর্য্যবেক্ষণ চলিতেছে, কিন্তু দুই চারিটি ছাড়া কোনটাতেই তারকাপুঞ্জ দেখা যায় নাই।

রশ্মি-নির্ব্বাচন-যন্ত্র (Spectroscope) আজকাল দূর জ্যোতিষ্কের উপাদান নিরূপণে যে সাহায্য করিতেছে, তাহা বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠকের অবিদিত থাকিতে পারে না। এই অদ্ভুত ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের কেবল ক্ষীণালোক বিশ্লেষ করিয়া সেটি কোন্ কোন্ পদার্থ দিয়া গঠিত তাহা জানা যাইতেছে এবং সেই

সকল পদার্থ কঠিন কি বাষ্পাকারে আছে তাহাও অনায়াসে নির্ণীত হইতেছে। কঠিন উজ্জ্বল পদার্থের আলোক বিশ্লেষ করিলে লোহিত, পীত প্রভৃতি মূল আলোকগুলিকে বর্ণচ্ছত্রে (Spectrum) একবারে গায়ে গায়ে লাগানো দেখা যায়। নীহারিকার মৃদু আলোক বিশ্লেষ করিয়া এপ্রকার অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায় না; বায়বীয় পদার্থ পুড়িবার সময় বর্ণচ্ছত্রে যে বিচ্ছিন্ন বর্ণরেখার পাত করে, এস্থলে তাহাই দেখা যাইতেছে। সুতরাং এই পরীক্ষাতেও নীহারিকাগুলিকে ঘনবিন্যস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ বলা যাইতেছে না। জ্বলন্ত বায়ব পদার্থের বিশাল স্তূপকেই যে আমরা দূর হইতে নীহারিকার আকারে দেখি, এখন তাহাই সকলে স্বীকার করিতেছেন।

নীহারিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ কিছুই বলিতে পারিতেন না। সম্প্রতি সুইডেনের বিখ্যাত পণ্ডিত আরেনিয়স্ সাহেব এপ্রসঙ্গে যে কয়েকটি নূতন কথা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য মনে হইতেছে। আমাদের স্থূলদৃষ্টি যেসকল দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্ককে দেখিতে পায় না, দূরবীণে তাহারা ধরা দেয়। আবার দূরবীণেও যাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না, ফোটোগ্রাফের ছবিতে তাহারা আত্মপরিচয় প্রদান করে। ফোটোগ্রাফ্ ছবির সাহায্যে আজকাল যে কত নূতন জ্যোতিষিক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতেছে, সত্যই তাহার ইয়ত্তা হয় না। যাহা হউক এখন উন্নত পদ্ধতিতে আকাশের যে সকল ছবি তোলা হইতেছে,তাহার প্রত্যেকটিতেই একপ্রকার তরল কুহেলিকার চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া আরেনিয়স্ সাহেব বলিতেছেন, আকাশের যেসকল অংশে অধিক নক্ষত্র অবস্থান করে, সেখানে সত্যই একপ্রকার ধূলিময় কুজ্ঝটিকা আছে। এই ধূলিকণা যখন জমাট বাঁধিয়া ঘন হইয়া দাঁড়ায়, আমরা তখনি দূর হইতে উহাদিগকে নীহারিকার আকারে দেখি।

ধূলির উৎপত্তি প্রসঙ্গেও আরেনিয়স্ সাহেব একটি নূতন কথা বলিয়াছেন। সূর্য্য ও নক্ষত্র প্রভৃতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের যেমন আকর্ষণ ধর্ম্ম আছে, তেমন বিকর্ষণ করিবারও যে একটা শক্তি আছে, তাহা নানাপ্রকারে নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে। ইহারা নিয়তই যে তাপালোক বিকীরণ করে, তাহারি চাপে (Radiation pressure) দেহের অতিসূক্ষ্ম কণাগুলি অবিরাম চারিদিকের আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতটি এই নূতন তত্ত্বটিকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, ছায়াপথ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কবহুল স্থানের নক্ষত্রগুলি নিজেদের দেহ হইতে যে অতি লঘু সূক্ষ্ম জড়কণা নির্গত করিতেছে, তাহাই নীহারিকার মূল উপাদান। নক্ষত্রদিগের তাপালোকের চাপে তাড়িত হইয়া এগুলিই যখন দূরদেশে গিয়া জমাট বাঁধে, আমরা তখনি উহাদিগকে নীহারিকার আকারে দেখি।

আকাশের যে সকল অংশ নক্ষত্রবহুল প্রায়ই তথায় নীহারিকা দেখা যায় না। আধুনিক জ্যোতির্ষীদিগের নিকট এই ব্যাপারটাও একটা সমস্যা স্বরূপ হইয়াছিল। তাপালোকের চাপের সাহায্যে ইহারও একটি ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে। খরস্রোতা নদীর জলে, যে তৃণপল্লব ভাসিয়া চলে, তাহারা একত্র হইয়া জোট্ বাঁধিবার সুবিধা পায় না। নদীর যে অংশে স্রোত নাই, কোন গতিকে সেখানে পৌঁছিলে তাহারা একত্র হয়। নক্ষত্রদেহচ্যুত জড়কণিকাগুলির অবস্থাকে কতকটা ঐ তৃণপল্লবের মত বলা যাইতে পারে। চারিদিকের নক্ষত্রের তাপালোকের ধাক্কায় সেগুলি কোনক্রমে জন্মভূমিতে থাকিতে পারে না। কাজেই ভাসিতে ভাসিতে দূরদেশে চলিয়া না গেলে উহারা জমাট বাঁধিবার সুবিধা পায় না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

জাপানের প্রসিদ্ধ বিচারক

১। নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ।

ক্যুগোরো (Kyugoro) নামক এক জাপানী বণিক একদিন তাঁহার দোকান হইতে পঞ্চাশটি মুদ্রা হারাইয়াছিলেন। ঘরের প্রত্যেক স্থান তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, পরিবারস্থ প্রত্যেক জনকে সুধাইলেন, তথাপি মুদ্রা কয়েকটির সন্ধান পাইলেন না। চুসুকে এই বণিকের কেরাণী, কি কারণে তাহার উপর বণিকের সন্দেহ হইল

সেকথা বলা শক্ত। ক্যাগোরো প্রকাশ্যেই তাহাকে চোর বলিয়া ভৎসনা করিলেন। বেচারা চুসুকে দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, তিনি মুদ্রার বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁহার প্রভু ক্যাগোরো সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি তাঁহার অধীন কেরাণীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থাপন করিলেন। তিনি বিচারক মহাশয়কে জানাইলেন—"এই ব্যক্তি যে চোর সেবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই—কিন্তু এই লোকটি কিছুতেই সত্যকথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছে না—এই কারণে আমি আপনার সমীপে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি।"

বিচারক ও-ওকা (O-Oka) অভিযোগকারীর সমস্ত বক্তব্য শুনিয়া লইলেন; কিন্তু কেরাণীকে অপরাধী করিবার পক্ষে কোনো বিশিষ্ট কারণ না দেখিতে পাইয়া কহিলেন—"অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কোনো প্রমাণ দেখিতেছি না; একমাত্র আপনি সন্দেহ করেন যে এই লোকই আপনার মুদ্রা হরণ করিয়াছে, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি তাহা স্বীকার না করে তাহা হইলে আমি কেমন করিয়া তাহাকে দণ্ড দিব জানি না। আমি ইহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিতে পারিব কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে আপনি ইহার প্রভু স্বরূপে যদি এই মর্ম্মে একখানি দলিল দাখিল করিতে পারেন যে এই লোকই আপনার মুদ্রা হরণ করিয়াছে তাহা হইলে আপনার সেই দলিলের বলে ইহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে।"

ক্যাগোরো বিচারপতির আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন, অবিলম্বে আপনার আফিসের মোহরাঙ্কিত একখানি দলিল বিচারকের হস্তে অর্পণ করিলেন।

কয়েকদিন পরে ক্যাগোরো ও তাঁহার পরিজনবর্গের আদালতে ডাক পড়িল। বিচারপতি ও-ওকা তাঁহার সহজ গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"কয়েক দিন হইল ক্যাগোরো আমার সমীপে অভিযোগ করিয়াছেন যে চুসুকে কয়েকটি মুদ্রা অপহরণ করিয়াছে; নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়াও সে নিজেকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করে নাই। ক্যাগোরো যে দলিলখানি পেশ করিয়াছিলেন একমাত্র সেই দলিলের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিতেছি।"

কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পরে, সহসা আবার একদা বিচারক মহোদয় ক্যাগোরো ও তাহার পরিজনদিগকে আদালতে আহ্বান করিলেন, বিচারপতি ধীরভাবে কহিলেন—"আমি কিছুদিন পূর্ব্বে চুসুকে নামক এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিয়াছি—আপনারা তাহাকে অসন্দিগ্ধভাবে দৃঢ়তার সহিত চোর বলিয়া নির্দ্দেশ করায় আমি উক্ত দণ্ড দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তি ঐ মুদ্রা অপহরণ করিয়াছে বলিয়া আমার কাছে আপনার দোষ স্বীকার করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আপনারা এক নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণনাশের জন্য অকারণ চক্রান্ত করিয়াছিলেন। এই গুরুতর অপরাধের জন্য আমি আপনাদের প্রাণদণ্ড করিব। আদালতের ন্যায়বিধান আপনাদিগকে মানিতেই হইবে।

ক্যাগোরো ও তাহার পরিজনবর্গ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন—তাহাদের মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিচারক মহোদয়ের পদমূলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আমরা না বুঝিয়া এক নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ করিয়া ভীষণ অনুতাপ ভোগ করিতেছি।"

বিচারপতি উত্তর করিলেন—"আমি আপনাদের জন্য হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেছি, কিন্তু ন্যায়ের অমোঘ বিধান হইতে আমি রেখামাত্র বিচ্যুত হইতে পারি না। তবে আপনারা যদি প্রভূত অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হন, আমি মৃত চুসুকেকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আপনাদিগকে ক্ষমা করিতে পারি।"

উক্ত আশার বাণী শুনিবামাত্র ক্যাগোরো ও তাহার পরিজনবর্গ উল্লসিত হইলেন এবং বিচারক মহাশয়কে আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

ক্যাগোরোর সম্মতি পাইয়া বিচারক মহাশয় সুকৌশলে অনতিবিলম্বে চুসুকেকে বিচারগৃহে সর্ব্বজন সমক্ষে উপস্থিত করিয়া কহিলেন—"যে হেতু ক্যাগোরো ও তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ বিনা কারণে এই নিরপরাধ ব্যক্তিকে দারুণ ক্লেশ দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আদেশ করিতেছি যে তাহারা এই ব্যক্তিকে এমন পরিমাণ অর্থ দান করিবেন যদ্দ্বারা ইহার জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে।"

২। সেনাধ্যক্ষ ও বিচারপতি।

একদিন বিচারপতি ও-ওকা সৈন্যবিভাগের অধ্যক্ষ যোসিমনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ দিন সেনাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট একটি জটিল মোকদ্দমা বিচারার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বিচার্য্য বিষয়ের তথ্য নিরূপণ করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন। সহসা সুবিখ্যাত বিচারপতি ও-ওকাকে স্বীয় ভবনে পাইয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন—"মহাশয়, আপনার সমতুল্য জ্ঞানী আজকাল দুর্লভ, আমি চিরদিন আপনার বিচারপ্রণালীর প্রশংসা করিয়া থাকি। সংপ্রতি একটি মোকদ্দমার রহস্যোদ্ভেদে অসমর্থ হইয়া আমি নিতান্ত চিন্তিত আছি। আপনি আমার হইয়া এই বিষয়টির সুমীমাংসা করিয়া দিলে আমি পরম উপকৃত হইব।"

ও-ওকা একান্ত বিনীত ভাবে কহিলেন- "আমি নিতান্ত হীনবুদ্ধি হইলেও আপনি যে বিচার-সমস্যায় পতিত হইয়াছেন তাহা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিব, আশা করি।" "অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাকে তাহা করিতে হইবে" এই বলিয়া সেনাধ্যক্ষ বিচারপতি মহাশয়ের হস্তে একখানি আবেদনপত্র অর্পণ করিলেন। ও-ওকা পত্রখানি পরীক্ষা করিয়া সহসা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না, তথাপি কহিলেন "আমি আপনার সম্মুখেই বিচার সম্পন্ন করিব।"

বিচারপতি মহাশয়ের এই ক্ষিপ্র উত্তরে চমৎকৃত হইয়া সেনাধ্যক্ষ মহাশয় কহিলেন—"আচ্ছা, আপনি এই গৃহকেই বিচারালয়, আমাকে বাদী এবং এই ওকুবোকে প্রতিবাদী মনে করিয়া এখনই অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিচারকার্য্য আরম্ভ করুন।"

বিচারপতি মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন—"আমি আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম; কিন্তু আমার সবিনয় অনুরোধ আপনি বাদী সুতরাং আপনাকে ঐ উচ্চ আসন হইতে নামিয়া নীচের আসনে উপবেশন করিতে হইবে—আমি বিচারক রূপে ঐ আসন হইতে আমার ক্ষমতা চালনা করিব।"

"আপনার যুক্তিযুক্ত আদেশ অবশ্য প্রতিপাল্য" এই বলিয়া সেনাধ্যক্ষ মহাশয় নিম্ন আসন গ্রহণ করিলেন।

উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়াই বিচারপতি বাদীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"তোমার কি স্পর্দ্ধা! তুমি অতি সামান্য লোক হইয়া এমন একটা মোকদ্দমা স্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছ?" সেনাধ্যক্ষ মহাশয় এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না করায় বিচারপতি মহাশয় তাঁহার কণ্ঠ আরো উচ্চে চড়াইয়া তীব্রস্বরে কহিলেন—"তুমি কি অভদ্র, সম্রাটের বিচারালয়ে তুমি অমন অশিষ্টভাবে হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া বসিয়া আছ? নামাও তোমার হাত, এই মুহূর্ত্তেই নামাও।" সেনাধ্যক্ষ মহাশয় এই আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

অতঃপর বিচারক মহাশয় বাদীকে তাহার নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেনাধ্যক্ষ মহাশয় উত্তরে কহিলেন—"আমি জেদো নগরের জনৈক অধিবাসী।" এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া বিরক্তিসহকারে বিচারপতি কহিলেন—"আমি তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমি কেন আবেদন পত্রে নামের উল্লেখ কর নাই?" সেনাধ্যক্ষ মহাশয় কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হইলেন। বিচারক মহাশয় সহজে ছাড়িবার লোক নহেন, তিনি আবার জিদ করিয়া কহিলেন—"বল, বল, অবিলম্বে তোমার নাম বলিয়া ফেল।" বিচারপতি মহাশয়ের তাড়ায় সেনাধ্যক্ষ হতভম্ব হইয়া গেলেন।

ও-ওকা অবিচলিতকণ্ঠে বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য তুমি একজন নগণ্য নাগরিক হইয়া সেনাধ্যক্ষ মহাশয়ের পারিবারিক শিরোভূষণ ও মূল্যবান্ গরদের পোষাক পরিধান করিয়াছ? আমি মনে করি তোমাকে অবিলম্বে কারারুদ্ধ করা উচিত। যা'ক আমি তোমাকে কিছুকালের জন্য ছাড়িয়া দিতেছি, পুনর্ব্বার শীঘ্রই তোমাকে আদালতে আহ্বান করা হইবে।" এই বলিয়া বিচারপতি মহাশয় উচ্চ আসন হইতে অবতরণ করিয়া নতজানু হইয়া কহিলেন—"আমি বড়ই ভীত হইয়াছি।"

সেনাধ্যক্ষ মহাশয় বলিলেন—"আপনি তো আমার মোকদ্দমার কোনো মীমাংসাই করিলেন না।" ও-ওকা সবিনয় নিবেদন করিলেন—"আমি সময়ে সময়ে এইরূপ

সমস্যাপূর্ণ মোকদ্দমা বিচারার্থ পাইয়া থাকি। হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে বাদীর বাহ্য ত্রুটীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকি। বর্ত্তমানক্ষেত্রে তাহাই করিয়াছি। এইরূপ করিয়া আমি যে সময় পাইয়াছি তন্মধ্যে আমি আপনার মোকদ্দমার রহস্যোদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছি।"

সেনাধ্যক্ষ মহাশয় প্রীত হইয়া বলিলেন—"আপনি একজন মহাজ্ঞানী। আমরা আখ্যানে পুরাকালের সুপ্রসিদ্ধ বিচারক ফুজিৎসুনার (Fujitusna) নাম শুনিয়াছি—আপনি দেখিতেছি কোন অংশে তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন।"

শ্রীশরৎকুমার রায়।

দু দিনের ভ্রমণ

৬ই এপ্রিল ভোর ৪ ৭০ টার মান্দ্রাজ মেল ট্রেনে আমরা কটক হইতে কয়েকজন বন্ধু চিল্কা হ্রদ দর্শনোদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। আমাদের ডাকগাড়ীখানি ষ্টেসন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বনামখ্যাত মহানদীর শাখা প্রশাখা অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রসিদ্ধ তীর্থ ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইল। তখন নিশার বিদায় সময়; চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ; আকাশে দুই একটি মাত্র নক্ষত্র মিটি মিটি জলিতেছিল; তখনও পশ্চিমাকাশে ম্লান শশধর শোভা পাইতেছিল।

কটক হইতে ভুবনেশ্বর ষ্টেসনের মধ্যে রেলওয়ে লাইনের উপর দিয়া ট্রেনগুলি খুব সাবধানে চালাইতে হয়; কারণ লাইন এখানে খুব আঁকিয়া বাকিয়া গিয়াছে; এরূপ বাঁক (curves) আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। "It is the most difficult piece of Riverine Engineering to be seen anywhere in India."

যখন আমরা খুরদা রোড জংসনে পহুঁছিলাম তখন বেশ ফর্সা হইয়াছে; ষ্টেসনের চারিদিকেই কত সুন্দর ছোট ছোট পাহাড়।

খুরদা রোড পরিত্যক্ত হইবামাত্রই পূর্ব্ব ঘাটের পর্ব্বতমালা আমাদের নয়নপথে পতিত হইল; লাইনের দুই পার্শ্বেই ছোট খাট জঙ্গল, এবং দূরে ধূসর বর্ণের পর্ব্বত সমূহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বসন্তকাল; কেবলমাত্র প্রভাত হইয়াছে; পিকরাজ মধুর কণ্ঠে প্রকৃতি রাণীর "আবাহন গীতি" গাহিতেছে; পাপিয়া স্বীয় কণ্ঠস্বর-লহরীতে তাবৎ বনস্থলী মুখরিত করিতেছে; ঝোপে ঝাপে বিবিধ বর্ণের সদ্যপ্রস্ফুটিত বনজকুসুমগুলি প্রভাত-বায়ু-হিল্লোলে মৃদুমন্দ দুলিতেছে। মধ্যে একটি ক্ষীণ-কায়া স্বল্প-সলিলা পার্ব্বত্য নদী বন্ধুর উপত্যকাভূমি ভেদ করিয়া খরতর বেগে প্রবাহিতা। ক্রমেই আমরা পর্ব্বতের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম; মধ্যে মধ্যে শিখরীর পাদদেশ বহিয়া চলিতেছি; সময়ে সময়ে আমাদের গাড়ী পর্ব্বতদেহ ভেদ করিয়া (cuttings এর মধ্য দিয়া) চলিতে লাগিল। এখন চতুর্দ্দিকেই সুবিশাল পর্ব্বতমালা মস্তক উত্তোলন করিয়া নীরব গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান। শ্যামল উদ্ভিদ দ্বারা উহাদের সমস্ত গাত্র আচ্ছাদিত; কোন কোনটির মেঘাবৃত সমুচ্চ শিখরাবলী নীল গগন ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। শুভ্র-জলদ-মণ্ডিত শৃঙ্গনিচয়ে প্রভাতকিরণ সম্পাতিত হওয়ায় তাহার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য আরও শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কোনও কোনও পর্ব্বতের উপর দু একটি প্রাচীনকালের ধর্ম্মমন্দির এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমরা ভুষণ্ডপুর (Bhusandpur) পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছি এমন সময়ে সকলেই মিলিতস্বরে 'Lake' 'Lake' বলিয়া উঠিলাম। সে এক অপূর্ব্ব অভিনব দৃশ্য; তাহার পর প্রায় এক ঘণ্টা মধ্যেই আমরা বলগাঁও ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। ইহাই বঙ্গদেশের শেষ সীমা; মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রথম ষ্টেশন খালিকোটা (Khalikota) হইতে রম্ভা সাত মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী। মেইল ট্রেনে বার মিনিটের অধিক সময় লাগে না। বাস্তবিক এই পবিত্র স্থানের অসীম সৌন্দর্য্য ও চিরলগ্ন শোভা দেখিয়া মনে হয় যে এ প্রকৃতিদেবীর সাধের উপবন—বিলাসিনীর কুঞ্জ-কাননের নিকট শত পরীরাজ্য, সহস্র কল্পনাস্রোত ভাসিয়া যায়।

যথা সময়ে আমরা রম্ভায় (Rambha) পঁহুছিয়া বেলা ১০ ঘটিকার সময় নিকটস্থ সাবিলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম। রম্ভায় চিল্কা হ্রদের উপর খালিকোটা রাজার একটি সুন্দর প্রাসাদ আছে। হ্রদতটে আমরা একটি

সুস্নিগ্ধ ছায়াবিশিষ্ট আম্রকাননে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। বাস্তবিক তাহা অতি মনোরম স্থান; সম্মুখেই দিগন্তপ্রসারী নীল হ্রদ। হ্রদের জল লোনা (কিন্তু সমুদ্র জলের মত নহে) এবং কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।

সন্ধ্যা হইতে এখনও প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব আছে; ইতিমধ্যে আমরা নিকটস্থ দুই একটি পাহাড়ে বেশ বেড়াইয়া আসিতে পারি এই কথা আমাদের মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। দুই একটি ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র পাহাড় বেড়াইয়া অবশেষে আমরা একটি বৃহৎ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পর্ব্বতটি খুব খাড়া (Steep) এবং বৃক্ষলতাদির অল্পতা হেতু ও বিশেষ কোনও পথ না থাকায় আমাদের উঠিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। ছুটা পাথরসকল ক্রমাগতই নীচে গড়াইয়া পড়িতেছিল।

উপরে উঠিয়া যে মহান গম্ভীর দৃশ্য দেখিলাম তাহা অতি সুন্দর অতি মনোরম; বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। তখন সায়ংকাল। উর্দ্ধে—অনন্ত উর্দ্ধে সুনীল গগনপ্রাঙ্গনে নিশাপতি চন্দ্রদেবকে বেষ্টন করিয়া শত শত উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্বলিতেছে; আর নিম্নে—বহু নিম্নে ঘুমন্ত চিল্কা-বক্ষে তাহার সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি প্রতিফলিত হইয়া সেই জ্যোৎস্নামাখা হিল্লোলিত উর্ম্মিশিশুগুলি নিয়ত তটস্থ তালীকুঞ্জের চরণ বিধৌত করিতেছে। হ্রদ মধ্যে ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র নির্জ্জন দ্বীপাবলী ক্রমেই মলিন হইয়া আসিতেছে। হরিৎ ভূখণ্ডসকল, শ্রেণীবদ্ধ বিটপীসহ রাজপথ, পর্ব্বত-পাদদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনসমূহ কি সুন্দর দৃষ্ট হইতেছে; ঠিক যেন একখানি চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। মৃদুল এবং সুস্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছে।

তদনন্তর সাবিলিয়া গ্রামে আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে (Primary School) আশ্রয় লইলাম। আহারাদি সমাপনান্তে সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আমরা গাত্রোত্থান করতঃ সূর্য্যোদয় দেখিবার মানসে হ্রদপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম।

ভোর ৬টার সময় আমরা নৌকাযোগে হ্রদে বিহারার্থ বাহির হইলাম। আমরা দূরে অগ্রসর হইতেছি আর তীরভূমি ক্রমেই মিশিয়া আসিতেছে। অবশেষে সাবিলিয়া গ্রাম, তাহার পবিত্র দেবালয়, ক্ষুদ্র কুটীর সমূহ, তীরস্থ তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষাবলী সবই একে একে অদৃশ্য হইয়া গেল; কেবল হ্রদের তীরে একটি সূক্ষ্ম সবুজ রেখা পড়িয়া রহিল, আর দূরে রেলওয়ে ষ্টেশন, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি উন্নত ভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় অস্পষ্ট অস্পষ্ট ভাবে ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল। মরি মরি সে দৃশ্য কি সুন্দর!

প্রথমেই আমরা হ্রদ মধ্যস্থ গৃহে যাইবার জন্য মাঝিদিগকে ইঙ্গিত করিলাম। এ গৃহ (কক্ষ), তদসংলগ্ন ক্ষুদ্র বারাণ্ডা এবং একটি পতাকা-স্তম্ভ তীরভূমি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। ঘরে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ দেওয়ালে পেন্সিলে লিখিত দর্শকবৃন্দের নিজ নিজ নাম ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহাদের অনুকরণে আমরাও স্বীয় স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া দেওয়ালের শুভ্রতা ঘুচাইবার সাহায্য করিলাম। বাস্তবিক ঘরটি বড়ই সুন্দর এবং নির্জ্জন; চারিদিকের দৃশ্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী। চিল্কা, নীল স্বচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ তুলিয়া সেই সিঁড়িতে আঘাত করিয়া আপন মনে কত খেলাই করিতেছে!

তথা হইতে আমরা চিল্কার মধ্যে আর একটি পর্ব্বতের পাদদেশে নৌকা রাখিয়া কূলে অবতরণ করিলাম। সে পর্ব্বতটি বিলক্ষণ উচ্চ; পর্ব্বতশৃঙ্খলের মধ্যে ইহারই চূড়া সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, দূর হইতে ইহা ঠিক বেগুনিয়া রংএর দেখায়। বাঁশ এবং কাঁটা গাছই ইহার প্রধান আভরণ। মাঝিরা আমাদিগকে পাহাড়ে সাপের ভয় দেখাইল; কিন্তু আমরা কোনরূপ পথ না পাইয়াই উহার চূড়া দখলে ক্ষান্ত হইলাম। পাহাড়ের নীচে জেলেরা ছোট ছোট বোটে করিয়া বড় বড় মাছ ধরিতেছে। এখানে মাছ এবং কাঁকড়া অতিরিক্ত সস্তা এবং অতীব সুস্বাদু।

তাহার পর আমরা শেষ দ্বীপটির উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। উহা তীরভূমি হইতে প্রায় ৪॥০ মাইল দূরে অবস্থিত; সাবিলিয়া হইতে দেখিলে উহা একটি সামান্য প্রস্তরখণ্ড মাত্র জল মধ্য হইতে উঁকি মারিতেছে বলিয়া বোধ হয়। ধীরে ধীরে আমাদের সুবৃহৎ নৌকাখানি নৃত্য করিতে

করিতে ‘পারাকুদি’ পাহাড়ের নীচে একটি পাথরের পাশে নোঙর করিল। ইহার অতি নিকটে আর কোনও প্রতিবেশী পাহাড় বা দ্বীপ নাই; সুতরাং ইহা সুনীল জলরাশি ভেদ করিয়া নিরাপদে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান।

আমরা একটি পাথর হইতে আর একটি পাথর অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। সেই পাহাড়ে উঠিয়া দেখিলাম, পাথরের উপর লতার পাশে, ঝোপের মাঝে, ঘাসের আড়ালে সহস্র সহস্র গাং-চিল (Sea-gull বলিয়াই বোধ হইল) ছোট ছোট কাঠ কুটা খড় প্রভৃতি দিয়া সুন্দর সুন্দর বাসা বাঁধিয়া সবুজ সবুজ ডিম পড়িয়া রাখিয়াছে। বড় বড় পাখীগুলি আপনাপন সন্তানগুলিকে সযত্নে ডানা দিয়া ঢাকিয়া বসিয়া আছে; আমাদিগকে দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল; শাবকগুলি কাতরভাবে চিঁ চিঁ করিয়া ডাকিতেছে, আর ডিমগুলি চুপ চাপ। এ করুণ দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় গলিয়া গেল।

তদনন্তর ধীরে ধীরে আমরা শিখরীর শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গে উপনীত হইয়া প্রকৃতির এ বিরাট ঐশ্বর্য্য—অসীম সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ নয়নে স্তব্ধ প্রাণে একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম। নিম্নে শৈল-প্রান্তে ফেনিল লহরীরাশি অবিরাম কঠিন পাদমূল চুম্বন করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। দূরে বিহঙ্গম-সমাকুল, বিটপী-শোভিত, কুঞ্জ-মণ্ডিত, হরিৎ দ্বীপাবলী এবং তরঙ্গবেষ্টিত নির্জ্জন গিরিকুল নীল জলে অহরহ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। দূরে—আরও দূরে চিল্কার প্রান্তদেশে অসীম গগনভেদী উন্নত গিরিশ্রেণী অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে অবস্থিত হইয়া দর্শককে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেছে। আরও দেখিলাম যেন পৃথিবীর পর পারে, কোনও স্বপ্নময় রাজ্যে, রবিকর-প্রতিফলিত বেলান্তে অসীম নীলাম্বর বিচিত্র ক্রীড়া; আর তাহার অস্ফুট মৃদু কলধ্বনিও যেন শ্রবণে প্রবেশ করিল।

বাস্তবিক, চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিলে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়; দেখিতে দেখিতে অজ্ঞান, আত্মহারা হইয়া সেই সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে প্রাণ উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করে। এ শান্তিকুঞ্জ ছাড়িয়া, সাধনার পবিত্র আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দ্বেষ-হিংসা-বিজড়িত স্বার্থময় জগতে প্রবেশ করিতে মন আর চাহে না।

বেলা প্রায় ১২টার সময় আমরা নৌকা ভাসাইয়া তীরাভিমুখী হইলাম। পশ্চাতে চাহিয়া ‘পারাকুদির’ নিকট একবার শেষ বিদায় ভিক্ষা করিলাম, তখন মনে হইল—

—"Such a holy calm
Would over-spread my Soul that bodily eyes
Were utterly forgotten; and what I saw
Appeared like something in myself, a dream,
A prospect of the mind."

বাঁশের চেঁচাইয়ের পাইল-ভরা বায়ু লইয়া আমাদের নৌকা দ্রুতবেগে ছুটিল। আহারাদি সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় ম্যাডরাজ প্যাসেঞ্জার যোগে আমরা পুরী যাত্রা করিলাম।

শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত।

আলোক ও স্বাস্থ্য

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জীববস্তুর (protoplasm)-এর সহিত আলোকের সর্ব্বত্র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিতে দেখা যায়। উদ্ভিদের উপর আলোকের প্রভাব একরূপ প্রত্যক্ষগোচর বলিলেই হয়। সবুজ উদ্ভিদ সূর্য্যালোক ভিন্ন বেশি দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আমাদের যেমন রক্ত—সবুজ উদ্ভিদের সবুজবর্ণ কণিকাগুলিও কতকটা তাহাই। এই বর্ণ-কণিকাগুলিকে উদ্ভিদের ক্লোরোফীল্ (chlorophyll) বলে। ইহাদের সাহায্যে উদ্ভিদ বাহির হইতে আপনার দেহের পোষণ উপযোগী পদার্থ সমূহ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দেহসাৎ করিয়া, পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ হয়। সূর্য্যালোক ভিন্ন ইহা হইতে পারে না। সূর্য্যালোকে ক্লোরোফীল্ বায়ু হইতে অঙ্গারাম্ল বাষ্প (carbonic acid gas) টানিয়া লইয়া, তাহার বিশ্লেষণ ঘটাইয়া, অঙ্গার (carbon)কে উদ্ভিদের দেহভূত ও অম্লজান (oxygen)কে বাতাসে ছাড়িয়া দেয়। আলোক ব্যতিরেকে উদ্ভিত প্রকৃতভাবে বর্দ্ধিত হইতে পায় না—আলোক ভিন্ন ইহাদের জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পায় না। সবুজ উদ্ভিদের যাহা প্রাণ বলিলেই হয়—সেই সবুজবর্ণ-কণিকা (ক্লোরোফীল্)গুলিও সূর্য্যরশ্মি না পাইলে জন্মাইতে পারে না। একটা সবুজ চারাগাছের গায়ে আলোক লাগিতে না দিলে, তাহার স্বাভাবিক

হরিৎশ্রী নষ্ট হইয়া যায়; তরুটি ফিকে পীত অথবা একবারে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে এবং সরু সরু, লম্বা লম্বা শাখা ছাড়িয়া, কিয়দ্দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সবুজ উদ্ভিদের দেহের গঠন, পরিপোষণ প্রভৃতির সহিত সূর্য্যালোকের নিয়ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—একথা আর অস্বীকার করিবার যো নাই। আলোক না হইলে ক্লোরোফীলের উৎপত্তি হইতে পারে না; আলোক না হইলে উদ্ভিদ্‌-গাত্রে ক্লোরোফীল্ থাকিতে পারে না; আর আলোক না হইলে, উদ্ভিদ্ মৃত্তিকা হইতে রস ও রসের সহিত খনিজ পদার্থ, মূল দ্বারা টানিয়া লইয়া আপনার শরীরের কাজে লাগাইতে পারিত না।

বায়ু হইতে কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ (অঙ্গারাম্ল বাষ্প) গ্রহণ ও তাহার বিশ্লেষণ কাজটি সূর্য্যালোকেই সম্ভব। আর এক কথা এই যে, অধিক আলোকে কাজটি অধিক হয়; অল্প আলোকে কম হয়। যে দেশে আলোক বেশি, সে দেশে,উদ্ভিদের সংখ্যাও বেশি।

উদ্ভিদের উপর আলোকের প্রভাব যতটা স্পষ্টতঃ বোধগম্য, জীবের উপর ততটা নয়। কতকগুলি জীব ত অন্ধকারেই বসবাস করে—তাহারা আলোকের কোন ধারই ধারে না। সে যাহাই হউক, অধিকাংশ জীবই যে আলোক-প্রিয়—আলোক না হইলে ইহাদের শক্তি সামর্থ্য রক্ষিত হয় না—এ কথায় বোধ করি, কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

জলে, স্থলে, সর্ব্বত্রই আলোকের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সাগরজলে, উদ্ভিদ ও জীব একান্ত বিরল না হইলেও, ভূতলের তুলনায়, উহাদের সংখ্যা খুবই অল্প বলিতে হয়। সমুদ্রগর্ভের যতই নিম্নে যাওয়া যায়, ইহাদের সংখ্যার ততই হ্রাস হইতে দেখা যায়। সমুদ্রের একবারে তলদেশে—যেখানে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশের কোনই সম্ভাবনা নাই—সেখানে কৃত্রিম আলোকের প্রচলন থাকিতে দেখা যায়।

সামুদ্রিক জীবের জীবনে কৃত্রিম আলোকের একান্ত আবশ্যক। সাধারণতঃ ইহাদের গাত্রবর্ণ হয় লাল, নয় পিঙ্গল। এই দুটি রঙ্ হইতে খুব অন্ধকারে, কিঞ্চিৎ আলোক বিকীর্ণ হইতে পারে। আবার কতকগুলি সামুদ্রিক জীবের দেহে bull's eye lantern-এর মত একরূপ "আঁধারি" লণ্ঠন থাকিতে দেখা যায়,—ইচ্ছা করিলে, ইহা হইতে তাহারা আলোকের উদ্ভব করিতে পারে।

সূর্য্যালোকের অভাববশতঃ গভীর জলতলে, উদ্ভিদের কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্রহণ, আর তাহার বিশ্লেষণ কাজটি তেমন ভালরূপে হইতে পারে না। আবার ভূতলবিহারী, দিবাচর জীব অন্ধকারে শ্রীভ্রষ্ট হয়—তাহার দেহের কোনরূপ বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। মানুষকে অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, কয়েক দিবসের মধ্যেই তাহার দেহের ওজন ও শক্তি কমিতে দেখা যায়। তাহার গায়ের উজ্জ্বল বর্ণ মলিনাভ হয়। ইহার দশাটা অনেকাংশেই আলোকবঞ্চিত গাছের মতই হয়।

যাহারা পল্লীগ্রামে বাস করিয়া, উন্মুক্ত নীলাকাশতলে কাজ করিয়া, জীবন-যাপন করে, আর যাহারা জনতা-বহুল মহানগরীতে, সঙ্কীর্ণ রাজপথে, আলোক-দুর্গম গৃহে বাস করিয়া, অল্পালোকিত দোকানে কিম্বা কলকারখানায় মজুরী করিয়া দিনপাত করে—এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তি-দিগের প্রতি চাহিলেই আলোক যে স্বাস্থ্যের কতই অনুকূল, আর অন্ধকার যে কতই প্রতিকূল, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পল্লীগ্রামে আলোক সুলভ, আর নগরে তাহা দুর্লভ—শুধু এই একটি মাত্র কারণের উপর যে, পল্লীবাসী কৃষকের ও নগরবাসী মজুরের স্বাস্থ্যের তারতম্য নির্ভর করে, আমরা অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না। ইহা অন্যতম কারণ এবং প্রধান কারণও বটে। এতদ্ব্যতীত আরও অসংখ্য কারণ থাকিতে পারে। নগরের বায়ু পল্লীগ্রামের বায়ুর মত বিশুদ্ধ নহে। পল্লীগ্রামে যেমন অবাধে বায়ু চলাচল সম্ভব, নগরে তাহা সম্ভব নয়। নগরে যত লোকের ভিড়, পল্লীগ্রামে তাহা নহে। পল্লীগ্রামের তুলনায়, নগরে রোগোৎপাদক জীবাণু (bacteria)র সংখ্যা খুবই বেশি। ইহা ছাড়া, নগরবাসীর জীবন-যাপনের ধরণ-ধারণ পল্লবাসীর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—পল্লীবাসীকে খোলা জায়গায় কাজ করিতে হয়, নগরবাসীকে বদ্ধঘরে কাজ করিতে হয়। নগরবাসীকে যে সকল খাদ্য খাইতে হয়, তাহাদের অধিকাংশই স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর, আর গ্রামবাসী টাটকা খাঁটি জিনিস খাইয়া জীবন ধারণ করে।

এ সকলের উপর, পল্লী-জীবনে যে শান্তি ও পবিত্রতা থাকিতে দেখা যায়, নগরে তাহা একবারেই অসম্ভব।

সে যাহাই হউক, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সকল বাহ্যিক অবস্থার সমন্বয়ের উপর বিশুদ্ধ স্বাস্থ্য নির্ভর করে, তাহাদের মধ্যে সূর্য্যালোক বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য।

মানবশরীরে সূর্য্যালোক কর্ত্তৃক যে সকল ক্রিয়া হয়, তাহাদের মধ্যে গাত্রবর্ণের পরিবর্ত্তন ব্যাপারটিই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অত্যধিক শৈত্যবশতঃও গায়ের রঙের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন স্বাস্থ্যজ্ঞাপক নহে—সূর্য্যরশ্মিপাতে গায়ের রঙের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহাই স্বাস্থ্যের পরিচায়ক।

যাহাদের গাত্রে কোনরূপ রঙ্ নাই—একবারে সাদা—তাহারা সাধারণতঃ দুর্ব্বল হয়। সাদা বিড়াল অনেক সময় বধির হয়, সাদা ঘোড়া প্রায়ই দূরের জিনিষ ভাল দেখিতে পায় না।

যাহারা নীরোগ ও সবল, সূর্য্যালোকে অতি শীঘ্রই তাহাদের গায়ের রঙের পরিবর্ত্তন হয়; দুর্ব্বল ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগের তাহা হয় না। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি খোলা গায়ে, দীপ্তালোকে, যদি সারাদিন বাস করে, তবুও তাহার গায়ের রঙের তেমন পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় না—যে পাণ্ডুবর্ণ, সেই পাণ্ডুবর্ণই থাকিয়া যায়। গায়ের রঙের পরিবর্ত্তন হইতে দেখিলে, বুঝিতে হইবে যে, যক্ষ্মারোগীর উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে।

কেহ যেন এমন ধারণা না করিয়া বসেন যে সূর্য্যরশ্মি আমাদের ত্বক্ অবধিই প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার অধিক পারে না। সূর্য্যালোকে আমাদের দেহে রক্তসঞ্চলন ভাল হয়, অক্সিডেশন্ (oxydation) অধিক হয়, দেহের সাধারণ উন্নতি হয়, সর্ব্বোপরি প্রত্যেক অবয়ব ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গটির পুষ্টি সাধিত হয়।

এখানে একটি কথা উঠিতে পারে, সূর্য্যালোক যে আমাদের দেহের এতদূর উন্নতিসাধক, তাহা কি করিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে? অবশ্য এমন যদি হইতে পারিত যে, আমরা নগ্নগাত্রে সারাটা দিন মুক্তালোকে বাস করিতাম, তাহা হইলে, হয় ত বৃক্ষের ক্লোরোফীল্ যেমন সূর্য্যরশ্মি হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া বৃক্ষদেহের পোষণ বিষয়ে সাহায্য করে—আমাদের ত্বকের রক্তকণিকাসমূহ তেমনি সূর্য্যালোক হইতে শক্তি ও তেজ আহরণ করিয়া এবং আমাদের চর্ম্মস্থ স্নায়ুগুলি উদ্দীপ্ত হইয়া, আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দেহের পরিপোষণ বিষয়ে সহায়তা করিতে পারিত।

কিন্তু আমরা ত প্রকৃত পক্ষে, একরূপ অন্ধকারের জীব বলিলেই হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ ঘণ্টাকাল ত আমাদিগকে নিশীথের অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিতে হয়। বাকি ১৬ ঘণ্টার অধিক অংশই আমরা ঘরের মধ্যে কাটাই। ইহার উপরে আমাদের মস্তকে কেশ আছে—গায়ে লোম আছে—আর প্রায় সর্ব্বশরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে। সুতরাং আমাদের শরীরে আলোক প্রবেশের খুব যে সুবিধা আছে এমন কথা আর কি করিয়া বলা যায়?

ইহার উত্তরে, আমরা জীবের অভিব্যক্তির কথাটা একবার স্মরণ করিতে বলি। অভিব্যক্তির নিয়মে জীব যত উচ্চে উঠে, রূপরসগন্ধশব্দাদির অনুভূতির জন্য বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয়। খুব নিম্নশ্রেণীর জীবের এসব কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় থাকে না। ইহারা সমস্ত গাত্রটার দ্বারা ঐ সব উদ্দেশ্য সাধিত করে। শৈত্য, উত্তাপ বেদনা, স্পর্শ প্রভৃতি ব্যাপার যদিচ আমরা সাধারণভাবে এক ত্বক্ দ্বারায় টের পাই, কিন্তু রূপরসগন্ধশব্দ বিষয়ে আমাদের শরীরে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিতে দেখা যায়। আমরা চক্ষু দ্বারা আলোক অনুভব করি, কর্ণ দ্বারা ধ্বনি বুঝিতে পারি, জিহ্বা দ্বারা রস বোধ করি, আর নাসিকা দ্বারা গন্ধ টের পাই।

কেহ যখন কথা কয়, সে সময় তাহার কণ্ঠের মধ্যে যে স্পন্দন ও কম্পন হয়, তাহার তরঙ্গ আসিয়া আমাদের গায়ে লাগে বটে, কিন্তু সে তরঙ্গ এত সামান্য, এত ক্ষীণ যে, আমরা ত্বক দ্বারা তাহা টেরই পাই না। কিন্তু আমাদের কর্ণ নামক শ্রবণেন্দ্রিয় থাকায়, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। সেইরূপ উদ্ভিদ ও খুব নিম্নশ্রেণীস্থ জীবের বেলায়, আলোকের তরঙ্গ সমস্ত দেহ দ্বারা অনুভূত হইতে থাকিলেও, আমাদের পক্ষে তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। আমরা চক্ষুর রেটিনা (retina) এবং তাহার

সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কাংশ দ্বারায় কেবল আলোকের অস্তিত্ব টের পাই।

আলোক অনুভব করিবার শক্তিটি যেকালে ত্বক হইতে চক্ষু নামক দর্শনেন্দ্রিয়ে স্থানান্তরিত হইল, সে সময়, তাহার সহিত, আলোকের যে পোষণ-শক্তিটি আছে, সেটিও যে অনেকাংশে না গেল, একথা বলা যাইতে পারে না। এই কারণে আলোকচ্ছটা গায়ে লাগিয়া আমাদের দেহস্থিত কোটি কোটি কোষের উপর ক্রিয়া হইবার অধিক সুবিধা ও সুযোগ না থাকিলেও, মস্তিষ্ককেন্দ্রের (brain centre) সাহায্যে গৌণভাবে, প্রকারান্তরে আলোকের দ্বারা একই কাজ হইতে পারে ; একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আলোকরশ্মি চক্ষুর রেটিনায় পড়িয়া, সেখানে পদার্থের একটি প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে, দর্শনস্নায়ু (optic nerve) দ্বারা সেই প্রতিবিম্বের কথাটি যেই মস্তিষ্কে নীত হয়, অমনি আমাদের দৃষ্টিজ্ঞান হয়। কিন্তু আলোকরশ্মির শুধু এই একটি মাত্র কাজ নয়—ইহা অবশ্য তাহার সর্ব্ব-প্রধান কাজ—এতদ্ব্যতীত ইহার আরও অনেক গৌণ কাজ আছে। তাহাদের মধ্যে দেহের পোষণকার্য্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আলোকরশ্মির প্রভাব মস্তিষ্কের দর্শনক্ষেত্র নামক স্থানটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। মস্তিষ্কে যে সকল পোষণকেন্দ্র (trophic centres) আছে, আলোকরশ্মি ততদূর পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। এই সকল কেন্দ্রের দ্বারা মস্তিষ্ক দেহের গঠনভঞ্জন (metabolism) ব্যাপারটি ও শরীরের রক্তবাহিনী নাড়ীগুলির প্রসারণ-সংকুঞ্চন (dilatation-contraction) কাজটির অনুশাসন করে।

ইহা হইতে কেহ যেন এমন ধারণা না করেন, আলোকরশ্মি চক্ষু ও মস্তিষ্ক পর্য্যন্তই যাইতে পারে, তাহার অধিক পারে না। দেহে যতই বস্ত্র থাকুক না কেন আলোকরশ্মি শরীরের সর্ব্বত্র গমন করে—কোন স্থানই বাদ পড়ে না। মানুষের শরীরে ইহার প্রমাণ দেখান খুবই শক্ত, তবে এমন অনেক জন্তু আছে, যাহাদের শরীরে ইহার সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বেঙ, গিরগিটি, বহুরূপী প্রভৃতি জন্তুর নাম করিতে পারা যায়। ইহাদের শরীরে আলোক-রশ্মির সাক্ষাৎ ও গৌণ উভয়বিধ ক্রিয়াই পাশাপাশি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব জন্তুর চর্ম্ম নগ্ন অর্থাৎ লোমদ্বারা আবৃত নহে, ইহাদের ত্বক আলোকে সহজে সাড়া দেয়। এ ছাড়া ইহাদের তীক্ষ্ণ চক্ষু আছে। ইহাদের গায়ে কতকগুলি চঞ্চল (moveable) বর্ণকণিকা (pigments) আছে। এই বর্ণকণিকাগুলি অতি সহজে সাড়া দেয়—এই কারণে ইহাদের গাত্রবর্ণ একরূপ না থাকিয়া সময়ে সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

বর্ণকণিকার কতকগুলি কালো, কতকগুলি লোহিত, কতকগুলি পীত, কতকগুলি আবার হরিৎবর্ণের। ইহারা ক্রোমোফোর্‌স্ (chromophores) নামক বর্ণকোষ সমূহের মধ্যে অবস্থিতি করে। বর্ণকোষগুলি আবার জন্তুটির ত্বকের স্বচ্ছ বাহ্যস্তবকের (epidermis) নিম্নে থাকে। বর্ণ-কোষগুলি যে সময় সঙ্কুচিত হয়, সে সময় বর্ণকণিকা সমূহ কোষের কেন্দ্রের দিকে একত্র জড় হয়—আর জন্তুটি মলিনাভ হয়—আবার এই কোষগুলি প্রসারিত হইবার কালে, বর্ণকণিকাগুলি বাহিরের দিকে আসে, এবং সে সময় জন্তুটির গায়ের রঙ ঘোরাল হয়।

বর্ণকোষগুলির সংকুঞ্চন প্রসারণ ব্যাপারের সহিত স্থায়ী (fixed) শ্বেতবর্ণ কণিকা ও আলোকরশ্মির মধ্য-বর্ত্তিতা বশতঃ নীল ও বেগুনিয়া রঙের উৎপত্তি হইতে পারায়, এই সব জন্তু, বিশেষতঃ "গেছো" বেঙ্ ও বহুরূপী নামক জন্তু, নিজেদের খেয়ালানুসারে এবং পারি-পার্শ্বিক অবস্থার গুণে কতরকমের বিচিত্র বেশ ধারণ করিতে পারে, তাহার ঠিক ঠিকানা নাই।

বর্ণপরিবর্ত্তনের প্রধানতম উদ্দেশ্য, অবশ্য আত্মগোপন করা—শত্রুকে ফাঁকি দেওয়া। বেঙ্ যতক্ষণ সবুজ ঘাসের উপর বসে, ততক্ষণ তাহার গায়ের রঙ্ ঘাসেরই মত সবুজ থাকে—অন্ধকার জলা জমিতে বাস করিবার কালে উহার গায়ের রঙ্ পিঙ্গল অর্থাৎ নীল পীত মিশ্রিত হয়।

ত্বকের উপর সূর্য্যালোক পড়ায়, এবং বাহ্য পদার্থের প্রভাব বশতঃ বেঙের গায়ের রঙের পূর্ব্বোক্তরূপ পরিবর্ত্তন হয়। Lord Lister (লর্ড লিষ্টার) প্রমাণ করেন যে আরও এক উপায়ে বেঙের রঙের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ইহারও কারণ আলোকরশ্মি—কিন্তু ইহা সাক্ষাৎভাবে

ত্বকের উপর ক্রিয়া দ্বারা নয়—রেটিনা (retina) ও দর্শনের স্নায়ুর (optic nerve) উপর আলোকরশ্মির ক্রিয়া দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয়। আর এক কথা এই যে শেষোক্ত উপায়ে যত শীঘ্র রঙের পরিবর্ত্তন হয়, পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তাহা হইতে পারে না।

কালো রঙের একটা বেঙকে যখনই আলোতে আনা যায়, অমনি সে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে; কিন্তু উহার চোক দুটি বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া আলোকে আনিলে, কোনরূপই পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় না—যে কালো সেই কালোই থাকিয়া যায়; কিন্তু যেমনি উহার চক্ষুর আবরণটি সরাইয়া লওয়া হয়, সেই মুহূর্ত্তেই বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়। এস্থলে, এই যে বর্ণপরিবর্ত্তন, ইহা ত্বকের উপর সূর্য্যরশ্মির সাক্ষাৎ ক্রিয়াবশতঃ বলা যাইতে পারে না, রেটিনার উপর ক্রিয়া প্রযুক্ত বলিতে হয়।

মাংসপেশীর সংকুঞ্চন জন্য বিশেষ বিশেষ স্নায়ু নির্দ্দিষ্ট থাকিতে দেখা যায়। বর্ণকোষ (chromophore) গুলির সংকুঞ্চন জন্যও কি সেইরূপ বিশেষ স্নায়ুর ব্যবস্থা আছে? আলোকরশ্মি চক্ষু দ্বারা প্রবেশ লাভ করিয়া মস্তিষ্কের মধ্যে যেই উত্তেজনাটি উপস্থিত করে সেই উত্তেজনাটি কি বিশেষ কোন একটা স্নায়ু দ্বারা বর্ণকোষে গিয়া বর্ণকোষের সংকুঞ্চন ঘটায়? লর্ড লিষ্টার্ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহার জন্য বিশেষ স্নায়ু নাই। খুব সম্ভব, দেহের পরিপোষণ কাজটির জন্যও বিশেষ স্নায়ু নাই। মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া, যে সকল স্নায়ু শরীরের নানা স্থানে গিয়াছে, তাহাদের সকলেরই মধ্যে কতকগুলি করিয়া পোষণতন্তু থাকিতে পারে।

আলোকে বেঙ্ ও গির্‌গিটি প্রভৃতি জন্তুর বর্ণকোষগুলি সঙ্কুচিত হয়—বর্ণকোষের গাত্র হইতে যে সকল সরু সরু শাখা বাহির হয়, সেগুলি গুটাইয়া কোষগাত্রে বিলীন হইয়া যায়; আর বর্ণকণিকাগুলি কেন্দ্রের দিকে একত্র জড় হয়। ইহার ফলে জন্তুটির গাত্র বিবর্ণ হয়। ঘুম হইতে জাগরিত হইবার কালে, আমাদের মস্তিষ্ককোষগুলিরও কতকটা ঐরূপ অবস্থা হয়। বর্ত্তমান কালের অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ শারীরবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের মত এই যে, নিদ্রাকালে মস্তিষ্কের কোষ হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাখা ও অঙ্কুর নির্গত হয়—আর ঘুম ভাঙ্গিবার সময় এই সকল শাখা ও অঙ্কুরগুলি গুটাইয়া কোষগাত্রে মিশাইয়া যায়। বাহিরের যে সকল উত্তেজনায় এই পরিবর্ত্তনটি সম্ভব, তাহাদের মধ্যে সূর্য্যালোক অপেক্ষা অধিক শক্তি আর কাহার থাকিতে পারে?

স্নায়বীয় উত্তেজনায় বর্ণকোষের সঙ্কুঞ্চন সম্ভব—কথাটায় অনেকে হয় ত বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। স্নায়বীয় উত্তেজনায় চোকে জল ও সর্ব্বগাত্রে ঘর্ম্ম দেখা দিতে পারে ইহা কে না জানেন? উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা লাগিয়া, রেটিনার সহসা অত্যধিক উত্তেজনা বশতঃ চোক দিয়া জল ও গা দিয়া ঘাম পড়িতে পারে, ইহাও বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই। প্লেটেন্ (Platen) পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, একটা খরগোসকে আলোকে রাখিলে, সে যতটা কার্ব্বনিক এসিড্ নিষ্ক্রান্ত করে, অন্ধকারে রাখিলে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প নির্গত করে। আবার তাহার চক্ষু দুইটি বন্ধ করিয়া যদি আলোকে রাখা যায়, তাহা হইলে, কার্ব্বনিক্ এসিড্ নিষ্ক্রমণের কোনই তারতম্য হয় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আলোকরশ্মি আমাদের চর্ম্মে লাগিয়া সাক্ষাৎভাবে শরীরের পরিবর্ত্তন করিতে পারে। আদিম অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বস্ত্রব্যবহার প্রচলিত হয় নাই—তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে উলঙ্গ অবস্থায় কালাতিপাত করে, সুতরাং তাহাদের গাত্রে সাক্ষাৎভাবে আলোক লাগিবার খুবই সুবিধা। এই কারণে, ইহাদের সাধারণ স্বাস্থ্য সভ্য জাতিদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত। রোগবিশেষে সভ্য জাতিদিগের মধ্যেও নগ্নগাত্রে আলোক লাগাইয়া চিকিৎসা করা যে না হয়, এমন নয়।

অষ্ট্রিয়া দেশে ভেল্‌ডিস্ (Veldis) নামক একটি স্থান আছে,—সেখানে আলোক দ্বারা চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা থাকিতে দেখা যায়। এখানে যে সকল রোগী চিকিৎসার জন্য আসে, তাহাদের গাত্র হইতে বস্ত্রাদি একবারে খুলিয়া ফেলিয়া প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ইহাদিগকে বিমুক্ত সূর্য্যালোকে রাখা হয়। এরূপ করায়, অতি অল্পকাল মধ্যে অতি আশ্চর্য্যজনক ফল হইতে দেখা যায়।

এই চিকিৎসায়, রোগীর যে উপকার হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই; তবে ইহার কতটাই বা সূর্য্যালোক বশতঃ, কতকটাই বা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন বশতঃ, আর কতটাই বা নিয়ম পূর্ব্বক স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করা প্রযুক্ত, তাহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। সে যাহাই হউক কতকগুলি স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য (nervous prostration) ও রক্তাল্পতা (anaemia) রোগে, সূর্য্যালোক যে, বিশেষ উপকারক, ইহা রোগী, চিকিৎসক উভয়েই স্বীকার করেন।

নিউইয়র্ক্ নগরে অবস্থিতিকালে, সার্ লডার্ ব্রান্টন্ (Sir Lauder Brunton) রুস্‌ভেল্ট হাঁসপাতালে (Roosevelt Hospital) একটি ঘর দেখিয়াছিলেন। এই ঘরটির তিন দিকের প্রাচীর কাচ দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায়, ঘরটিতে অবাধে প্রভূত আলোক প্রবেশ করিতে পারে। এই ঘরটির নাম "সূর্য্যালোক-স্নানাগার।" তরুণ রোগ হইতে আরোগ্যমুখে, এবং দুরূহ অস্ত্র চিকিৎসার পর, রোগীকে উলঙ্গ করিয়া, এই ঘরটিতে রাখা হয়। ব্রান্টন্ শুনিয়াছেন—যে সকল রোগীকে এই ঘরটিতে রাখা হয়, তাহারা হাঁসপাতালের অন্যান্য রোগীর তুলনায়, খুবই অল্পকাল মধ্যে স্বাস্থ্য সামর্থ্যাদি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

কয়েকপ্রকার শারীরিক অবসন্নতা রোগে, এবং ক্ষয় রোগে, রোগীর কেমন একরকম সূর্য্যালোকভোগবাসনা থাকিতে দেখা যায়। নিদাঘমধ্যাহ্নে, সাধারণ লোক যে সময় ঘরের বাহির হইতে ভয় পায়, বাতুলাশ্রমে, বাতুলদিগের মধ্যে, কাহাকে কাহাকে হয় ত হৃষ্টমনে রৌদ্র উপভোগ করিতে দেখা যায়। এস্থলে এমন বলা বোধ করি কেহই সঙ্গত মনে করিতে পারেন না যে, উত্তাপ ভোগ করিবার জন্যই তাহারা রৌদ্রে আসিয়া বসে। উত্তাপ ভোগ করাই যদি তাহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, আগুনের নিকট বসিয়া, ঘরের মধ্যে থাকিয়াই, তাহারা সে উদ্দেশ্য সাধিত করিতে পারিত।

সূর্য্যরশ্মি ত্বক দ্বারা প্রবেশ করিয়া, শরীরের উপকার করিতে পারে, আবার চক্ষু দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়াও উপকার করিতে পারে। আমাদের বেলায়, দ্বিতীয়টির তুলনায়, প্রথমটির স্থান ও সুযোগ খুবই অল্প। চক্ষু দ্বারা প্রবেশলাভ করিয়া, আলোক দ্বারা আমাদের শরীরের মধ্যে কত কি হইতে পারে, সে সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান ও ধারণা অতি সামান্যই বলিতে হয়। আমরা মনে করি চক্ষুর দর্শন ব্যতিরেকে আর কোন কাজ নাই। দর্শন চক্ষুর সর্ব্বপ্রধান কাজ বটে; কিন্তু ইহার কতকগুলি অবান্তর কাজও আছে; তাহার মধ্যে, শরীরপোষণ বিষয়ে সাহায্য করা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

চক্ষু, মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জার সাহায্যে, আলোকরশ্মি আমাদের দেহে বলকারক ঔষধের ন্যায়ই কাজ করিয়া থাকে। আলোক দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য ও বল বৃদ্ধি হয়—রোগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার শক্তিটিও সম্যক পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়।

অন্ধরা প্রায় রুগ্নকায় হয়। ইহাদের দেহের রক্তের পরিমাণ সাধারণ ব্যক্তির অপেক্ষা অনেক অল্প। অন্ধ ব্যক্তিরা যত সহজে রোগাক্রান্ত হইতে পারে, এমন আর কেহ নয়।

আজকাল যক্ষ্মারোগগ্রস্তদিগকে মুক্ত বায়ুতে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। ইহাতে ফলও খুবই সন্তোষজনক হইতে দেখা যায়। শুধু বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে এমন হয়, কেহ যেন এমন মনে না করিয়া বসেন। এ বিষয়টিতে সূর্য্যালোকেরও বড় কম হাত নাই। অবশ্য আমরা এমন বলিতেছি না, সূর্য্যরশ্মি ক্ষয়কাশের জীবাণু (tubercle bacillus) গুলিকে সাক্ষাৎভাবে বিনষ্ট করে। ইহারা যথায় বাস করে, সূর্য্যরশ্মির হয় ত সেখানে প্রবেশই সম্ভব নয়। তবে যে, উপকার হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ সূর্য্যরশ্মি ভেগাস্ (vagus) স্নায়ুটির উত্তেজনা ঘটায়। সেই কারণে, ফুস্‌ফুসের পোষণ কাজটি ভাল হয়। ইহার ফলে ফুস্‌ফুস্ যক্ষ্মারোগের জীবাণুর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়।

আমরা জানি, কোন জন্তুর ভেগাস্ স্নায়ু কাটিয়া দিলে, অবিলম্বে নিউমোনিয়া নামক রোগ দেখা দেয়, আর ফুস্‌ফুস্‌টি পচিয়া যায়।

ইহার কারণ এই যে, ভেগাস্ স্নায়ুর অসংখ্য কাজের মধ্যে, ফুস্‌ফুসের পরিপোষণ কাজটি অন্যতম। ইহাকে ছিন্ন করিলে ফুস্‌ফুসের পোষণকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়—

এ অবস্থায় রোগাক্রান্ত হওয়া খুবই সহজ। ফুস্ফুস্কে ভেগাস্ স্নায়ু যদি যথেষ্ট পরিপোষক শক্তি যোগাইতে পারে, তাহা হইলে উহার বল বৃদ্ধি হয়—এবং রোগের হস্ত হইতে অতি সহজেই সে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। সূর্য্যরশ্মি চক্ষু দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া, ভেগাস্ স্নায়ুর উদ্দীপনা করে বলিয়াই, যক্ষ্মারোগী মুক্ত বায়ুতে বাস করিয়া, রোগ-মুক্ত হইতে সমর্থ হয়।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যায় যে, ব্যক্তি ও সমষ্টি জনের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে, সূর্য্যালোক একটি প্রধান অবলম্বন বলিলেই হয়। স্বাস্থ্যসাধন ও তাহার রক্ষণ বিষয়ে যতগুলি উপায় আছে, তাহাদের মধ্যে সূর্য্যালোক প্রথম শ্রেণীরই অন্তর্গত। সূর্য্যালোক যাহাতে দুর্গম ও কলুষিত না হইতে পারে—এবং ইহার সম্যক প্রসারণ হইতে পারে, স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তাগণের সেদিকে নিয়ত সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।*

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল্-এম্ এস্।

নব শিক্ষা-পদ্ধতি

আমেরিকায় একটি অভিনব শিক্ষাদানপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নব পদ্ধতির শিক্ষায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শিশুগণের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে কোনো ক্ষতিও হয় না। এই প্রণালীর মূলের কথা শিশুদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইয়া আপন বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা নিজের প্রশ্নের মীমাংসা নিজেই করিয়া লইবার চেষ্টায় উৎসাহিত করা। বুদ্ধি-বৃত্তির এই স্বাধীন অনুশীলনে তাহা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে।

শ্রীযুক্ত আডিংটন্ ব্রুস্ সম্প্রতি "আমেরিকান্ ম্যাগাজিন্" নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন, যে সকল বালকবালিকা যথেষ্ট পরিমাণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতি লাভ করে, তাহাদের পিতা মাতা শৈশবের শিক্ষাকেই এই আশ্চর্য্য বুদ্ধিবিকাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ডাক্তার বোরিস্ সিডিসের পুত্র একাদশ-বর্ষ বয়সে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া হার্বার্ড কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। সংবাদপত্রে এবং ডাঃ সিডিসের লিখিত একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁহার অনুমান-গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। আরো কোনো কোনো পিতা মাতা এই প্রণালীতে সন্তানদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। ডাঃ ব্রুস্ কয়েকটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়া দেখিয়াছেন যে ডাঃ সিডিসের অনুমানগুলি সত্য।

অনেকে মনে করেন অপ্রাপ্ত বয়সে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণে শিশুদিগের স্বাস্থ্য এবং মনের আনন্দ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই প্রণালীর শিক্ষায় এরূপ কুফল কোথাও দেখা যায় নাই। এই প্রণালীতে শিশুদিগের মনোবৃত্তিগুলি যথোচিতরূপে বিকশিত হইয়া উঠে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা এ শিক্ষা সন্তানদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের অধিকতর উপযোগী হয়, অনেক পিতামাতাই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

যে সকল পিতামাতা সন্তানদিগকে দ্বিতীয় একজন মিল্ কি মেকলে করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, কি উপায়ে এরূপ শিক্ষাদান করা যাইতে পারে। অধ্যাপক লিয়ো উইনার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার পুত্র নোর্বার্ট চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে টাফ্‌ট্‌স্ কলেজ হইতে উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার অন্যান্য সন্তানগণও এ বিষয়ে নোর্বার্টের প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। অধ্যাপক লিয়ো বলিয়াছেন, "আমি যে কি প্রণালীতে শিক্ষাদান করিয়াছি তাহা এক কথায় বলা কঠিন। আমার বিশ্বাস পিতামাতা যতদূর মনে করেন শিশুরা স্বভাবতই তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের এই স্বাভাবিক শক্তিকে সুকৌশলে পরিচালিত করিলে তাহারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রচলিত শিক্ষায় শিশুদের এই স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহা না করিয়া সেগুলির পরিচালনার ভার কতকটা তাহাদেরই উপর দিলে সুফলই ফলে। আপনাদের সম্বন্ধে তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে দেওয়া উচিত

* উইণ্ডসর ম্যাগাজিনে সার্ ক্রিকটন্-ব্রাউন্, এম্-ডি, এল্-এল্-ডি, এফ-আর্-এস্ লিখিত প্রবন্ধ হইতে।

এবং বুদ্ধিমত্তায় তাহারা যাহাতে পিতামাতার সমকক্ষ হইয়া উঠিবার জন্য প্রয়াসশীল হয় সেজন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করা উচিত।

"এইরূপে শিক্ষাদান করা যত কঠিন মনে হয় বাস্তবিক তত কঠিন নয়। তবে এই প্রণালীতে সন্তানদিগের চতুর্দ্দিকে তাহাদের জ্ঞানপিপাসা বাড়াইয়া তুলিবার উপকরণ দেখিতে পায়। ইঙ্গিতমাত্র লাভ করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায় সুন্দর শিক্ষা হয়। শিশুদিগকে ইঙ্গিতের এইরূপ ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।"

অধ্যাপক লিয়ো উইনার আরো বলেন যে প্রত্যেক শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতা কিরূপ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা অত্যাবশ্যক। তাঁহার পুত্র নোর্বার্ট দেড় বৎসর বয়সে অক্ষর শিখিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করে এবং দুই দিনের মধ্যেই তাহার অক্ষর পরিচয় হয়। তাহার স্বাভাবিক শক্তি ইহার অনুকূল ছিল। তিন বৎসর বয়সে সে পাঠ করিতে শিক্ষা করে এবং ছয় বৎসরের সময় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের পাঠ সমাপন করে।

নোর্বার্ট উইনার।
দেড় বৎসর মাত্র বয়সে বর্ণমালার প্রতি ইঁহার আগ্রহ দেখা যায় এবং দুইদিনে ইঁহার অক্ষর পরিচয় হয়।

লিনা রাইট্ বার্লি।
ইনি তিন বৎসর বয়সে ইংরাজি, ল্যাটিন্, গ্রীক্ ও হিব্রু এই কয় ভাষায় প্রার্থনা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন।

নোর্বার্টের পিতা তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"সে যাহা পাঠ করিত তাহাই সে বুঝিতে পারিবে আমি এরূপ আশা করি নাই, কিন্তু সে যাহা বুঝিত না তাহা যাহাতে সে আমার নিকট হইতে বুঝিয়া লয় সেজন্য তাহাকে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতাম। কোনো কঠিন কথা বুঝাইয়া দিবার সময় আমি তাহাকে জানিতে দিতাম যে, সে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া চেষ্টা করিলেই অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেই তাহা বুঝিতে পারিত। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এ বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়াছি। একদিকে যেমন তাহার সকল কার্য্য ও চেষ্টার প্রতি একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি, অপরদিকে তাহাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে উৎসাহিত করিয়াছি। সাধারণ বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার ত্রুটিসকল যাহাতে তাহার শিক্ষায় প্রবেশলাভ না করিতে পারে সে বিষয়ে সর্ব্বদাই সাবধান হইতাম।

প্রত্যেক কথা ও কার্য্যের প্রতি পিতামাতার সতর্ক দৃষ্টি রাখার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শিশুদের সম্মুখে তাঁহাদের সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা উচিত, প্রয়োজনীয় বিষয়ে সদাসর্ব্বদা যে সমস্ত আলোচনা হয় তাহাতে কোনোপ্রকার অসামঞ্জস্য থাকা উচিত নয় এবং প্রত্যেক আলোচনা যাহাতে যুক্তিসঙ্গত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শিশুদের নিকটে যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় সেগুলি তাহাদের বোধগম্য হইবে, তাহাদের পিতামাতা যে এইরূপ বিবেচনা করেন ইহা তাহাদিগকে বুঝিতে দেওয়া আবশ্যক। সঙ্ক্ষেপে বলা যাইতে পারে, প্রথম হইতেই শিশুরা যেন আপনার

আজ কাল বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিশুদের স্মরণ-শক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা হয়। যে বালকের স্মরণশক্তি অধিক সেই-ই উন্নতিলাভ করে, কিন্তু বুদ্ধিমান চিন্তাশীল বালকের কোনো পুরস্কার নাই। ইহার ফলে অনুশীলনের অভাবে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া যায়।" হয় না, স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কেবলই বাহির হইতে তাহাদের অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে শিশুরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি একেবারে হারায়, সামান্য প্রশ্নের মীমাংসার জন্যও পরমুখাপেক্ষী হয়, এবং এই হেতু, অর্থপুস্তকের জন্য লালায়িত হওয়া ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর থাকে না।

এই নূতন পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান করিতে হইলে প্রথমটা পিতা মাতাকে যথেষ্ট কৌশল পূর্ব্বক চলিতে হয়। সুকৌশলে শিশুকে আপনা আপনি কঠিন বিষয়ের মীমাংসা করিতে যত্নবান করিয়া তুলিলে সফলতাজনিত আনন্দই তাহাকে আরো অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করে।

ডাঃ এ, এ, বার্লির চারিটি সন্তান এইরূপ গৃহশিক্ষা হইতে আশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছে। তাঁহার সন্তানগণের অসাধারণ বুদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "যে-কোনো শিশুকে যদি প্রথম হইতেই যথোচিতরূপে শিক্ষাদান করা হয় এবং যদি সে জ্ঞানলাভ করা যে কত কৌতূহলের বিষয় তাহা অনুভব করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি এই প্রকার আশ্চর্য্য রূপেই বিকাশলাভ করিবে।"

উইনিফ্রেড্ ষ্টোনার।

ইনি তিন বৎসর মাত্র বয়সে কবিতা পাঠ ও কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং টাইপ্‌রাইটারে কাজ করিতে শেখেন। এখন ৯ বৎসর বয়সে পাঁচটি ভাষায় কথা বলিতে শিখিয়াছেন।

এডল্‌ফ্ বার্লি।

ইনি তের বৎসর ছয় মাস বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিখ্যাত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের তর্কসভায় যোগদান করেন। এখন বিশেষভাবে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি অধ্যয়ন করিতেছেন।

ইনি বলিতে চান এই যে, চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়াই শিশুশিক্ষার প্রধান কথা। তাহার শিক্ষার ভিত্তিমূল চিন্তাশক্তির উপর গঠিত হইলে সে যে-কোনো বিষয় লইয়াই আলোচনা করুক না কেন তাহাতেই এই শক্তি নিয়োজিত করিয়া উন্নতিলাভ করিবে। কিন্তু সাধারণ বিদ্যালয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে এইরূপে ভিতর হইতে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা

কুমারী উইনিফ্রেড্ ষ্টোনার একটি সুশিক্ষিতা গুণবতী বালিকা। ইনি জন্মগ্রহণের পর হইতেই যেরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার বিবরণ বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। মিঃ ক্রস্ ইহার বিষয়ে লিখিয়াছেন, "উইনিফ্রেডের জননী মিসেস্ ষ্টোনার শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে ডাঃ সিডিসের অনুরূপ

মত পোষণ করেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে নরফোকে তাঁহাদের গৃহে তিনি শিশুর জন্য একটি প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ঘরখানি বিখ্যাত শিল্পীগণের চিত্রে ও খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তিতে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন; তাঁহার নবজাত শিশু প্রথম হইতে জগতের সুন্দর পদার্থ সকলের পরিচয় পাইবে এইজন্য। শিশুর ধাত্রী যখন তাহাকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন তখন তিনি প্রচলিত ছেলে-ভুলানো ছড়া না বলিয়া ভার্জিল্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থকারগণের উৎকৃষ্ট কবিতা আবৃত্তি করিতেন। মিসেস্ ষ্টোনারও দিবাভাগে তাহার নিকট প্রসিদ্ধ কাব্য সকল হইতে কোনো কোনো অংশ শুনাইতেন।

"যতদিন না উইনিফ্রেড্ কথা কহিতে শিখে ততদিন পর্য্যন্ত তাহার শিক্ষা এইরূপে চলিল। পরে যখন তাহার মুখে কথা ফুটিল তখন তাহার মাতা দেখিলেন, যে সমস্ত কবিতা তাহাকে শুনানো হইয়াছে তাঁহার শিশু সেই সকল কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে। ইহার পর হইতে মিসেস্ ষ্টোনার তাহাকে লেখা ও পড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তিন বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শিশু উত্তমরূপে বর্ণশিক্ষা ও পাঠাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। তিন বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে উইনিফ্রেড্ টাইপ্‌রাইটিং শিখিতে আরম্ভ করে এবং শীঘ্রই এই যন্ত্রচালনায় দক্ষতা লাভ করে।"

অতি আশ্চর্য্যভাবে এই বালিকার শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। তিন বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে, তখন কেবল মাত্র কবিতার আবৃত্তিতেই সন্তোষ লাভ না করিয়া সে নিজে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করে। পাঁচ বৎসর বয়সে "Aunt Diana's Musicale" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটক রচনা করে এবং স্বয়ং নাটকের সর্ব্বপ্রধান চরিত্রটির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কতকগুলি বালক বালিকার সহিত তাহা অভিনয় করে।

এই সময় তাহার পিতামাতা নরফোক্ হইতে ইভান্‌ভিন্ নামক স্থানে গমন করেন; তখন সেখানকার স্থানীয় সংবাদপত্রে উইনিফ্রেডের কবিতা প্রকাশিত হয়। সাত বৎসর বয়সে উইনিফ্রেড্ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারদিগের সমিতির (Author's Club) সভ্য হইবার যোগ্যতা লাভ করে। এই পুস্তকে তাহার রচিত প্রায় একশত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার নাম রাখা হইয়াছিল "Jingle"। তাহার সেই ছোট্ট হৃদয়খানি যে কল্পনা, ভাব ও রসে পূর্ণ ছিল, এই পুস্তক হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল কবিতা অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত লেখকের লঘুভাবের কবিতার সম্পূর্ণ সমকক্ষ। লিটারারি ডাইজেষ্ট পত্রিকায় যে কবিতাটী উদ্ধৃত হইয়াছে সেটি এখানেও উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা কোনোমতেই সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"One day I saw a bumble-bee
bumbling on a rose,
And as I stood admiring him
he stung me on the nose;
My nose in pain, it swelled so large
it looked like a potato,
So Daddy said, tho mother thought
'twas more like a tomato.
And now, dear children, this advice
I hope you'll take from me,
And when you see a bumble bee,
just let that bumble be."

এই সকল অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুরা ভবিষ্যতে আশানুযায়ী ফল প্রদর্শন করিবে, কি, তাহাদের উজ্জ্বল প্রতিভা ব্যর্থ হইয়া পরিণাম শোচনীয় হইবে, একথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এ প্রশ্নের উত্তরে লর্ড কেল্‌ভিন্ এবং জনষ্টুয়ার্ট মিলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া লেখক বলেন, এই সকল বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, আমেরিকায় এই যে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাতে শিশুদিগের ভবিষ্যৎ জীবনে কোন প্রকার কুফল ফলিবার কোনো কারণই দেখা যায় না।

এই সকল বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, সন্তানের শিক্ষা কতটা পরিমাণে পিতামাতার উপর নির্ভর করে। মনুষ্যসন্তান বুদ্ধি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে; তাহার সেই বুদ্ধিবৃত্তি যদি শিক্ষাদ্বারা বিকশিত না হয় কিম্বা যদি কুশিক্ষায় তাহা কুপথে চালিত হয় তাহা হইলে শিশুর পালন-কর্ত্তাই ইহার জন্য দায়ী এবং ভগবানের দান ব্যর্থ করার যে অপরাধ তাহাও সেই পালন-কর্ত্তারই। সকল

পিতামাতারই একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাঁহাদের প্রত্যেক সন্তানেরই বুদ্ধিমান হইয়া গড়িয়া উঠিবার শক্তি আছে, অপেক্ষা কেবল তাঁহাদের যথোচিত চেষ্টার দ্বারা শিশুর সেই সুপ্ত বুদ্ধির লালনের। সন্তানের পিতামাতা হওয়ার যে অতিগুরু দায়িত্ব, তাহার প্রতি দৃষ্টি না থাকায় অনেক পিতামাতারই শিশু তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি স্ফুরণের সুবিধা লাভ করে না। প্রত্যেক পিতামাতার গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত তাঁহারা সন্তানকে ভাবী জীবনের কর্ত্তব্যসকল পালনে সহায়তা করিবার উপযোগী শিক্ষা দিতেছেন কি না; তাহার প্রতি সকল কর্ত্তব্যগুলি সুনিষ্পন্ন হইতেছে কি না। সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেই শিক্ষাবিষয়ে তাহার সম্বন্ধে পিতামাতার কর্ত্তব্য ফুরাইল,—এ কথা মুখে কেহই স্বীকার করিবেন না, কিন্তু অনেকেরই কাজে ইহাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। পুত্রকন্যার শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রচলিত প্রণালীর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া না থাকিয়া এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। আপন আপন সন্তানের শিক্ষাবিষয়ক বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনগুলি সতর্ক পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা জানিয়া লইয়া তদনুসারে সাবধানতার সহিত শিক্ষাদানকার্য্য পরিচালিত করিলে তবেই তাহাদের স্বাভাবিক শক্তিগুলি যথোচিতরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে এবং যে শক্তি লইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা ব্যর্থ হইবে না, এরূপ আশা করিতে পারা যায়। শ্রীশোভনা রক্ষিত।

জন্ম দুঃখী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মেয়ে কুলি।

রাজধানীর গলিঘুঁজিতে, আবর্জ্জনার মধ্যে যে সমস্ত ছেলে মেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে, সংসারে তাহাদের যে কি গতি হয় তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারে না।

বেশীর ভাগ যায় মারাত্মক ব্যাধির কবলে। যাহারা টিকিয়া যায় তাহাদের মধ্যে কতক হয় কুলি, কতক ফিরিওয়ালা মুটিয়া, কতক নিষ্কর্ম্মা ভিক্ষুক; কতক গাঁট-কাটা, কতক নেশাখোর, কতক বা গুণ্ডা। ইহাদের বিশ্রামের স্থান হয় কয়েদখানা নয় দাওয়াইখানা। আজকাল আবার বড় বড় কারখানাগুলাও ইহাদের আশ্রয় দিতেছে;—এখন একেবারে হাজার দরজা খোলা।

যে সমস্ত ভদ্রলোক ধর্ম্মতঃ ইহাদের ভরণপোষণের দায়ী তাঁহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন; ঘাড়ের বোঝা অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। খাটিয়া খাইবার পথ এখন মুক্ত, -হতভাগারা খাটিয়া খাক্। তাহার উপর, কারখানার বাঁধাবাঁধিটাকে নৈতিক শাসনের স্থলাভিষিক্ত করিয়া এই দুর্ভাগাদের গুপ্ত মুরুব্বিরা এখন একেবারে লম্বা ছুটি লইয়া বসিয়াছেন।

কৌঁসুলী ভীর্গ্যাণ্ডের একটা কারখানাও ছিল। এই কারখানায় সহরের অনেক অসহায় ছেলে মেয়ে কুলির কাজ করিত।

এই কারখানার একটা ঘরে লেনা, ষ্টিনা, ক্রিষ্টোফা, জোসেফা প্রভৃতি অনেকগুলি মেয়ে কুলি সার বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছে। ইহাদের বাপ মার কোনো খবর ইহারা জানে না, জিজ্ঞাসা করিলেও ভাল করিয়া জবাব দেয় না।

কল চলিতেছে; হাজার হাজার চরকা ঘুরিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে গল্পও চলিতেছে। এঞ্জিনের স্পন্দনে সমস্ত বাড়ীটা কাঁপিয়া উঠিতেছে।

মেয়ে কুলিদের বয়স ষোল হইতে কুড়ির মধ্যে; ইহাদের ভিতর অনেকেই নবাগত, শিক্ষানবীশ; এখনো ভাল করিয়া কাজের 'বাগ্' বুঝিতে পারে নাই। হলম্যানের মেয়ে সিলা এখন এই দলের।

সিলা ক্রমাগত কাশিতেছে, তাই বলিয়া কথা একদণ্ডও বন্ধ নাই। অল্প পরিশ্রমেই বেচারা হাঁপাইতেছে।

জোসেফার নূতন ফুলদার জ্যাকেট লইয়া আজ মেয়ে-কুলিমহলে তুমুল তর্ক। জ্যাকেট যে উহার 'দাদী' দিয়াছে এ কথা উহারা কেহই বিশ্বাস করে না, লেনাও না, ষ্টিনাও না, জ্যাকোবিনাও না। ঠিক এই সময়ে ক্রিষ্টোফা গত রবিবারের কাহিনী জুড়িয়া দিল। সে যে কেমন করিয়া ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাদের বনভোজনে জুটিয়া গিয়াছিল তাহারি একটা আজগবি বৃত্তান্ত। দুঃখের বিষয় ক্রিষ্টোফার এই সমস্ত বৃত্তান্ত যে পরিমাণে শ্রুতিসুখকর সে পরিমাণে সত্য নহে।

ক্রিষ্টোফার বর্ণনা শেষ হইলে আগামী রবিবারে

লেট্‌ভিগুে যে নাচ হইবে তাহারি জল্পনা চলিতে লাগিল; সিলা একেবারে উৎকর্ণ। কে ভালো নাচে, কাহার পোষাক ভালো, কে পোষাক ধার করিয়া পরিয়া আসে, আর কেবা ভালো খাওয়ায় এই আলোচনাই ঘণ্টাখানেক ধরিয়া চলিল। নাচের সঙ্গে যে এবার বেহালারও বন্দোবস্ত হইয়াছে একথা একা ক্রিষ্টোফাই বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছে। এবার-কার নাচে জাহাজের কর্ম্মচারীরা তো আসিবেই, তা'ছাড়া কলেজের ছেলেরাও আসিবে।

এই সময়ে কয়েকজন বাহিরের লোক কারখানা দেখিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা ঘরে ঢুকিতেই মেয়েরা একমনে নিজের নিজের চরকায় তেল দিতে আরম্ভ করিল।

বড় বড় জানালা দিয়া শুদ্ধ রৌদ্র আসিয়া কলের চরকীতে, কাপড়ের গাটে ও কুলিদের পিঠে পড়িয়াছে। বেলা প্রায় বারটা। শেষ ঘণ্টাটা আর কাটিতে চায় না; তেলের গন্ধ এবং এঞ্জিনের গরম দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে।

এখনো কয় মিনিট বাকী। চারিদিকেই উস্‌খুস্‌। অবশেষে টিফিনের ঘণ্টা পড়িল।

চক্ষের নিমেষে চুল ঠিক করিয়া ফিট্‌ফাট্‌ হইয়া মেয়ের দল টিনের পাত্র হাতে টিফিনের জন্য নীচে নামিয়া পড়িল। বাহিরে বসন্তের নির্ম্মল বাতাসে বেচারারা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বেড়ার উপরে যে বরফ জমিয়াছিল সিলা তাহাই একটু ভাঙিয়া মুখে দিল। ক্রিষ্টোফার নাচের বৃত্তান্ত তাহার মাথার মধ্যে এখনো ঘুরিতেছে।

কারখানার সাম্‌নের রাস্তাটা খুব চওড়া নয়, কাজেই সেখানে অল্পেই ভিড় জমিয়া ওঠে।

"ছাখ্‌, ছাখ্‌ ক্রিষ্টোফা! ভীর্গ্যাং!—ফিরে এসেছে; এরি মধ্যে ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেছে!" সোৎসুক মেয়ের দল গা টেপাটিপি করিতে লাগিল। "নূতন ওভারকোট! ফিঁকে—ফিঁকে খাকী!"

"হুঁঃ! কাল যখন জাহাজ থেকে ও নাম্‌ছিল আমি তখনি দেখেছি; সঙ্গে কতকগুলো ইংরেজ; সব খাকী-রঙের পোষাক। খাকীরঙেরি কত রকম! কাল আমি প্রায় সাত আটটা রকম গুণেছিলুম।" যে মেয়েটি জিহ্বা ছুটাইতেছিল সে আগে দর্জ্জির দোকানে কাজ করিত, সে জোসেফা।

"এবারে কারখানায় এলে ও পোষাকে ওঁকে খুব সাবধানে চল্‌তে হ'বে, নইলে যদি তেলকালি কি চর্ব্বি লাগে"—মেয়েরা হাসিয়া উঠিল।

ক্রিষ্টোফা বলিল "ছাখ্‌ সিলা ছাখ্‌, কেমন চেহারা! কি চমৎকার মুখ, ভাই! বুক পকেটে আবার কি সুন্দর রুমাল,—লাল টুক্‌টুক্‌ করছে!" মেয়েরা কারখানার বেড়ার কাছে ভেড়ার দলের মত একেবারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

লাড্‌ভিগ্‌ ভীর্গ্যাং বুক ফুলাইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল। মেয়ের দল মুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল, দুই একজন কটাক্ষ করিতেও ভুলিল না। লোকটা স্যামন্‌ মাছের মত অবলীলায় জনতার ঢেউ দু'ফাঁক করিয়া চলিয়া গেল।

"মাথার পিছনে আবার সিঁথে!"…"নূতন ফ্যাসান"…

"আহা অত জোরে নিশ্বাস ফেল না, বেচারা যে রোগা!"

…"ঠিক বাপের মতন হ'য়ে উঠ্‌ছে"…"কি দেমাক্‌! কোনো দিকে চাওয়া নেই!"

উহাদের সকলেরি দৃষ্টি লাড্‌ভিগের দিকে।

"যেমন গম্ভীর দেখ্‌ছ, লোকটি ঠিক অত গম্ভীর নয়। কারখানাতেই গম্ভীর। সেদিন ইস্ত্রি-ঘরের জোহানা বল্‌ছিল, যে, সে নাকি মেলায় এক মুখোস পরা নাচের মজলিসে ওকে চিনে ফেলেছিল। জোহানা আমাকে নিজে বলেছে।"

জ্যাকোবিনা বলিয়া উঠিল "কত বড়লোকই যে মেলায় আসে তার ঠিকানা নেই; মুখোস্‌-পরা যার সঙ্গে নাচা যাচ্ছে, মনে ভাবা যাচ্ছে, সে বুঝি একজন যে-সে, কিন্তু মুখের কাপড় সরে গেলেই বুঝ্‌তে পারবে যে লোকটা নিতান্ত কেওকেটা নয়। মুখোস্‌ না খুল্‌লেও,—অমনিও চেনা যায়, একটু নজর ক'রে দেখ্‌লেই ধরতে পারা যায়, জামার কলারে, এসেন্সের গন্ধে, নাচের ভঙ্গীতে—প্রতি পদেই চিন্‌তে পারা যায়।"

"আমাদের দিকে আবার ফিরে ফিরে দেখা হচ্ছিল;—তা' দেখেছ?" সিলা একটু থতমত খাইয়া কহিল "হ্যাঁ, আমাকে ও চেনে কি না"—একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল "এই বাচ্চা কাকটাও ডাক্‌তে শিখেছে নাকি?"

বাচ্চা কাকটার শরীর আগুন হইয়া উঠিল, সে কোনো উত্তর করিল না। সিলা বেশ জানিত যে লাড্‌ভিগ্‌ তাহাকে চেনে। সে মায়ের সঙ্গে অনেকবার উহাদের বাড়ী গিয়াছে।

এই সেদিনও কারখানায় কাজের জন্য দরখাস্ত লইয়া কৌন্সলি সাহেবের কাছে যখন যায় তখন ঐ লাড্ভিগ্ও যে আফিস্ঘরে ছিল।

এই সময়ে সকল কারখানারই ছুটি। আর একদল মেয়ে মজুর আসিয়া সিলাদের দলে মিশিয়া দল ভারি করিয়া সহরের নানা বিচিত্র গলি ঘুঁজির ভিতর দিয়া বস্তির দিকে চলিল। বস্তির কতক ঘর কাঠের, কতক স্লেটের, কতক খোলার।

সিলা একটা স্যাঁৎসেতে সরু গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। উহারা যে ঘরে থাকে তাহার নর্দ্দমা দিয়া গরম ক্ষারজলের ধোঁয়া অল্প অল্প বাহির হইতেছে। ঘরে ঢুকিবার আগেই, সিলা, শ্রীমতী হল্ম্যানের নীরস কণ্ঠের ওজন-করা কথা শুনিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। ভয়েভয়ে আস্তে আস্তে দুয়ার খুলিয়াই দেখে অ্যাণ্ডার্সনদের ঝি কাপড়ের তাগাদায় আসিয়া রাগে আগুন হইয়া উঠিয়াছে; তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। এদিকে সিলার মা গরম জলের টবের কাছে দাঁড়াইয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে কাপড় নিংড়াইতেছে, উত্তেজনার চিহ্ন মাত্রও নাই।

"অ্যাণ্ডার্সন-গিন্নিকে বোলো তুমি, যে, এই সব ছেঁড়া গলা কাপড় এক হপ্তায় তৈরী হ'তে পারে না। অসম্ভব। আমরা যে এত গরীব, আমরাও কখনো, ছেঁড়া ফুটা না সেরে কাপড় ধোপার বাড়ী দিইনে। এই সব কাপড়,—এ স্বোয়ামী পুত্তুরকে মানুষে পরতে দ্যায় কি করে?...তর্ক করনা বাছা; তর্ক করবার আমার সময় নেই;...আমি বাজে কথা কইনে, খাঁটি কথা কই। দেখ দেখি মোজার ছিরি!...গোড়ালির কাছটা ছিঁড়ে হাঁ হ'য়ে গেছে, তা' একটা টোনের দড়ি দিয়ে আটকে রাখা হ'য়েছে। ছি! ছি! এমন জিনিস হাতে ক'রে কাচতেও লজ্জা করে; বলে—

শাল দোশালা যেই যা' পরে,
ছাপা সে নেই ধোপার ঘরে।"

অপর পক্ষকে নির্ব্বাক, হতভম্ব, দেখিয়া হল্ম্যানগৃহিণী সিলার উপর পড়িলেন—"একটু আগে যদি আস্তিস্ সিলা, তা হ'লে, আমার একটু কাজের সাহায্য হ'ত; সে দিকে খেয়ালই নেই! আমি এখন মলেই ভালো। কর্ত্তা গিয়ে অবধি আমারও আর বেঁচে থাক্বার সাধ নেই, মলেই নিষ্কৃতি।"

"আমি সব নিংড়ে টাঙিয়ে দিচ্ছি, মা!"

"থাক্ না, রাখ, এখন সব হ'য়ে গেল কি না, এখন এলেন কাজ দেখাতে। কারখানার ছুঁড়ীদের সঙ্গে গল্পটা একটু কমিয়ে, একটু সকাল সকাল এলেই তো হয়! এই যে একটা মানুষ এক্লা সকাল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেটে মরছে, ধম্ম ভেবেও তো তার মুখ চাইতে হয়। এমন, মানুষে পরেরও করে থাকে।"

সিলা চুপ করিয়া রহিল। ঠিক এই সময়ে হতবাক অ্যাণ্ডার্সন্-বাড়ীর ঝি বলিয়া উঠিল, "তা' বেশ বাছা, আমাদের কাপড় আর তোমায় কাচ্তে হ'বে না; আমরা নিতান্ত সাধারণ লোক, আমাদের সাদাসিধে কাপড়, তোমার মতন অসাধারণ ধোপানীর হাতে না পড়লেও বেশ ফর্শা হ'বে। বলি, জিভে তো এদিকে ক্ষুরের ধার, তবে ক্ষারে কেন ময়লা কাটে না?"

উত্তরের অবসর না দিয়াই দাসী চলিয়া গেল।

হল্ম্যান-গৃহিণীর চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব এই যে সে অন্যের অন্যায় একেবারেই দেখিতে পারিত না। অদৃষ্টের গুণে তাহার নিজের ঘর কেহ কখনো অপরিচ্ছন্ন থাকিতে দেখে নাই। বিধিবিধানের উৎসর্গ এবং অপবাদ দুই যাহার নিজের হাতে, সুবিধা তাহার চতুর্দ্দিকে।

সময় সকলেরই ফেরে; হল্ম্যান্ ছুতারেরও ফিরিয়া ছিল—মরিয়া! হল্ম্যানের মৃত্যুর পর হইতে হল্ম্যান্-গৃহিণী লোকটার যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মোট কথাটা এই, যে, গরীব গৃহস্থের ঘরে একজন পুরুষ মানুষের একটা বাঁধা রোজগার থাকা এবং না থাকা,—এই দু'য়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইহার উপর আবার সেল্ভিগের দোকানের দেনা। হল্ম্যান্ নিজে প্রতি সপ্তাহে হাত খরচের জন্য টাকা আলাদা রাখিয়াও, কেন যে এত দেনা করিতে গেল ইহা শ্রীমতী হল্ম্যান্ কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না।

যেদিন দেখিলেন খাটিয়া খাওয়া, না হয় উপবাস, ছাড়া সংসারে তাঁহাদের অন্য উপায় নাই, সেদিন শ্রীমতী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন।

স্বামীর রোজগারের টাকা কেমন করিয়া খরচপত্র করিয়া ফুরাইয়া দিতে হয় ইহাই এত দিন তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল। এতদিন তিনি পরের কাঁধে চড়িয়া বসিয়া ছিলেন, এখন নিজের কাঁধে বোঝা বহিতে হইবে।

এই রকম দুরবস্থায় পড়িয়া, হল্‌ম্যানগৃহিণী ভাবিলেন, খাটিতে হয় তো এই তাহার ঠিক সময়,—অথচ কে যে খাটিবে সেটা তেমন স্পষ্ট করিয়া বলা হইল না। সুতরাং বিলম্ব না করিয়া পূর্ব্ব পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া সিলাকে কারখানায় ভর্ত্তি করিবার জন্য কৌঁসুলি সাহেবের কাছে গিয়া হাজির হইলেন।

সমর্থ মেয়ের বসিয়া থাকাটা ভাল নয়। সিলা কারখানায় কাজ করুক, সিলার মাও বসিয়া থাকিবেন না। তিনিও বাড়ী বসিয়া পাড়ার লোকের কাপড় রিফু করিবেন, এমন কি কাচাই ইস্ত্রিও কিছু কিছু করিবেন। ইহার পরেও যদি লোকে তাঁহার নিন্দা করে তবে সেটা কেবল লোকের স্বভাবের দোষ।

হল্‌ম্যানগৃহিণী কন্যার নাকে দড়ি দিয়া দুই জনের খাটুনি খাটাইয়া কর্ত্তব্য-পালন করিতেছিলেন। কারখানায় পূরাদমে খাটিয়া আসিয়াও সিলার নিস্তার ছিল না। সমর্থ মেয়ের বসিয়া থাকিতে নাই। সমস্ত সন্ধ্যাটায় কেবল সেলাই আর তালি, তালি আর সেলাই; এম্‌নি করিয়াই তো মানুষ ধীর শান্ত হয়, নহিলে ঘোড়ার মত লাফাইয়া বেড়ানো কি ভাল?

টিম্‌টিমে তেলের আলোয় যতক্ষণ বেচারা সেলাই ফোঁড় করিত ততক্ষণই, কেবল, কারখানার মেয়েদের বন-ভোজনের আর নাচের গল্প ছায়াবাজীর ছবির মত তাহার মনের ভিতরে ঘুরিতে থাকিত। তাহার মনে হইত এসব যেন তাহার নিজের জীবনের ঘটনা; তাহার মন ভরিয়া উঠিত, বুদ্‌বুদের পর বুদ্‌বুদ,—আহ্লাদের আতিশয্যে সিলা এক একবার মায়ের সম্মুখেই হাসিয়া ফেলিত। ময়লা একটা মোজার মধ্যে মজাটা যে কোথায়, এবং এত হাসিই বা কোথা হইতে আসে, হল্‌ম্যানগৃহিণী অনেক মাথা ঘামাইয়াও কোনো মতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

(De La Mazeliere-র নবপ্রকাশিত ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি

১

হিন্দুধর্ম্ম।—হিন্দুদেবতা। ত্রিমূর্ত্তি।—ব্রহ্মা।—বিষ্ণু ও বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার; কৃষ্ণপূজার প্রাধান্য।—শিব।—দেবীগণ। হিন্দুধর্ম্মের পূজা-পদ্ধতি।—হিন্দুধর্ম্মের নীতি।—হিন্দুধর্ম্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মন্তব্য।

এই নবীন সভ্যতার মূলভিত্তি—হিন্দুধর্ম্ম। জন্মান্তরবাদই হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য ধর্ম্মমত। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মানব, জীব-জন্তু, বৃক্ষলতা, পঞ্চভূত, আত্মা—সমস্তই এই যোনিভ্রমণের অসীম পথ অনুসরণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলই উহাদের ইহজন্মের হেতু; এই জন্মকাল মানুষের পক্ষে কিয়ৎবৎসরব্যাপী, কিন্তু দেবগণের পক্ষে ইহা দশ লক্ষ, এমন কি, কোটি বৎসরব্যাপী।

এই দেবতাদিগের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু আকৃতি খাস হিন্দুধরণের। এই সকল দেবতা—পুরুষ, স্ত্রী, নপুংসক, বহুচক্ষুবিশিষ্ট, বহুবাহুবিশিষ্ট, বহুপাদবিশিষ্ট, বহুমস্তকবিশিষ্ট, অথবা অর্দ্ধ-মনুষ্য, অর্দ্ধ-পশু।* যে সকল দেবী বিলাসিতার বিগ্রহ তাহারা তন্বী ও পৃথু নিতম্ববতী; উহাদের পদদ্বয় আড়ভাবে স্থাপিত, উহারা পদ্মের উপর অধিষ্ঠিতা; রক্ষকেরা উহাদিগকে ময়ূরের পাখায় বীজন করিতেছে; হস্তীরা মাথার উপর সুরভিত জলের কলস ধরিয়া আছে। যে সকল দেবতা নিষ্ঠুরতার বিগ্রহ তাহারা মস্তকে মুকুট ও কণ্ঠে ছিন্ন বাহুর কণ্ঠহার ধারণ করিয়া আছে; উহারা করোটী করিয়া রক্তপান করিতেছে, শবসমূহের উপর বিচরণ করিতেছে, অথবা অস্থিনির্ম্মিত বংশী ও ভেরী প্রভৃতি নারকী বাদ্যধ্বনি-সহকারে জগতের ধ্বংসাবশেষের উপর নৃত্য করিতেছে। যাহারা গুহ্যতন্ত্রের দেবতা তাহারা হস্তের দ্বারা স্বকীয় মস্তক ধরিয়া আছে এবং স্বকণ্ঠনিঃসৃত উষ্ণ শোণিত পান করিতেছে। সর্ব্ব-শেষে, যোগীদিগের গুরু যোগীন্দ্র মহাদেব, পাণ্ডুবর্ণ, ভস্মাচ্ছন্ন; তাঁহার কটিদেশ সর্পের দ্বারা বেষ্টিত।

---

* এইরূপ বিকটাকৃতি দেবতার কথা ঋগ্বেদেও আছে। (Urana) অরুণের ৯৯ বাহু [II, ১৪, (২০৫ , ৪]

এই নূতন ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি ছিল, পুরোহিত ছিল। কতকগুলি মন্দির নির্ম্মিত হইল, এবং সেই সকল মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপিত হইল। উহাদিগকে খাওয়াইতে হইত, কাপড় পরাইতে হইত, কাপড় ছাড়াইতে হইত, কোমল শয্যায় শোয়াইতে হইত। শাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও, নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এই অভিনব পৌরোহিত্যে প্রভূত পরিমাণে যোগ দিয়াছিল। ফলত সকল বর্ণের লোকই ইহার মধ্যে ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্ম সাধারণ লোকদিগের ধর্ম্ম হইয়া রহিল।

এই নূতন ধর্ম্মে একটা নীতির দিক্‌ও ছিল। বৌদ্ধদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে অনেক নীতি-উপদেশ গৃহীত হয়। মাংসাহার, বিশেষত গোমাংসাহার নিষিদ্ধ হইল; জুয়াখেলা ও সুরাপান নিষিদ্ধ হইল। ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রের অনেক উপদেশই বহুকাল হইতে সম্যক্‌রূপে প্রতিপালিত হইতেছিল না।

বর্ণসমূহের নির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহার ধর্ম্মসংহিতায় স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ হইল; এই সকল শাস্ত্রীয় আদেশ কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিত না—লঙ্ঘন করিলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। বাস্তবপক্ষে হিন্দুধর্ম্মের কোন বিশেষ ধর্ম্মমত নাই। যে সকল মত ও বিশ্বাস ব্রাহ্মণদিগের রুচিবিরুদ্ধ, সেই সকল মত ও বিশ্বাস গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদের উপর এক একটা রূপকাত্মক অর্থ আরোপ করিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, বিভিন্ন জাতি, এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের স্থানীয় দেবতাদিগকে শিব বিষ্ণু ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু এই ভারতীয় সভ্যতার আচার ব্যবহার স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ হওয়ায় হিন্দুধর্ম্ম সভ্যতার প্রকৃত প্রচারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ণভেদ ব্যবস্থা অনতিক্রমণীয়; যে ব্যক্তি কোন এক বর্ণের অন্তর্ভূত নহে, সে হিন্দুধর্ম্মেরও অন্তর্ভূত নহে। স্বকীয় কৌলিক বর্ণ হইতে কেহই বাহির হইতে পারে না। বর্ণের উচ্চ নীচতার সোপানপরম্পরাও অনতিক্রমণীয়। কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত কেহ একত্র ভোজন করিতে পারে না। কোন ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও হীনবর্ণ লোকের পক্ষে একটা মহাপরাধ। বর্ণভেদসম্বন্ধীয় সমস্ত আচার ব্যবহারই অনতিক্রমণীয়। বেদবিহিত গার্হস্থ্য যজ্ঞাদি, গৃহের পূজানুষ্ঠান পদ্ধতি—সমস্তই অনতিক্রমণীয়। কি রকম করিয়া গৃহে বাস করিতে হইবে, বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে; শান্তির সময়, যুদ্ধের সময়, সমুদ্র যাত্রার সময়, কিরূপ আহার করিতে হইবে, সমস্তই শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে, তাহার তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইবার জো নাই।

এইরূপে, ভারতীয় সভ্যতা, সাক্ষাৎ নীতিধর্ম্মে পরিণত হইল। তাহা সত্ত্বেও এই সভ্যতা স্বকীয় ক্রমবিকাশের পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ক্রমে কতকগুলি নূতন আচার-ব্যবহার পুরাতনের সহিত সংযোজিত হইল। আবার অনেক সময়, পুরাতন প্রথা নূতন প্রথার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। নূতন নূতন বর্ণ গঠিত হইতে লাগিল; তাহাদের জন্য বিশেষ নিয়ম ও বিশেষ আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইল। ইতিপূর্ব্বেই পৌরাণিক যুগে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ শাস্ত্রীয় বিধির দ্বারা রহিত হইয়া যায়।

***

ইহাই হিন্দুধর্ম্ম। ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে, এই হিন্দুধর্ম্ম, সভ্যতার একটা বিশেষ অবস্থা পরিচিহ্নিত করে।

ধর্ম্মতত্ত্ব ও দর্শনসম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তার এইরূপ ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয়:—প্রথমে দেখা যায়, কতকগুলি মানবীকৃত দেবতাকে স্তবস্তুতির দ্বারা, মন্ত্রের দ্বারা, প্রসন্ন করা হইতেছে। দেবতার মন্ত্রাদি দেবতা অপেক্ষাও শক্তিশালী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বিবিধ সূক্তি সমষ্টীভূত হইয়া মন্ত্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মন্ত্র, নিশ্বাসরূপে, প্রাণরূপে, বিশ্বাত্মারূপে পূজিত। এই মন্ত্র, এই ব্রহ্ম, এই বিশ্বাত্মা—শিব কিংবা বিষ্ণুর ন্যায় কোন সগুণ দেবতার আকারে অভিব্যক্ত হয়। এই সগুণ দেবতা অবতার হইয়া মানবদেহ ধারণ করেন। এই সকল অবতার প্রথমে মন্ত্রের দ্বারা, আরও কিছুকাল পরে, বিবিধ গুহ্য তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের দ্বারা, এবং সর্ব্বশেষে কলুষিত বীভৎস উৎসব-আমোদের দ্বারা পূজিত হইলেন।

ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয়। আর্য্যগণ আদিমবাসীদিগকে প্রথমে পশু জ্ঞান করিত, পরে দাস জ্ঞান করিত; তাহার পর, এমন এক নিকৃষ্টশ্রেণীর

অন্তর্ভূত বলিয়া মনে করিত,—যাহাদের ব্যবসায় অতীব জঘন্য ও কষ্টসাধ্য। আদিমবাসীদিগের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আর্য্যগণ পাপ বলিয়া, প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিত। আরও কিছুকাল পরে, সমস্ত বর্ণের মধ্যে কঠোর পার্থক্য সংস্থাপিত হইল; প্রত্যেক বর্ণের পৃথক আচার, পৃথক পূজাপদ্ধতি, পৃথক অধিকার। যে ধর্ম্ম আদিমবাসীদিগের বর্ণসমূহকে নিন্দা করিত সেই ধর্ম্মই আবার তাহাদের সংগঠনে সচেষ্ট হইল।

অতএব, দেখা যাইতেছে, যে সময়ে হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপিত হয় সেই সময়ে ভারতের জাতিগত সমস্ত উপাদান, এক সভ্যতার মধ্যে মিশিয়া যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। আধুনিকযুগের আরম্ভ হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সভ্যতার যেরূপ ক্রমবিকাশ হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, এই সভ্যতার দ্রুত অবনতি হইয়াছে; উচ্চবর্ণসমূহ ক্রমশঃ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং যে সকল জাতি অপেক্ষাকৃত স্থূলরুচি ও রূঢ়প্রকৃতি তাহাদের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের অসভ্য জাতি

ব্রহ্মদেশের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপ্রান্তস্থ এবং চীনদেশের পশ্চিমপ্রান্তস্থ ইউনান, গোয়েজো, ছিজুয়ান প্রদেশ সকলের পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তর সীমানা এবং তীব্বতের পূর্ব্ব-দক্ষিণ-প্রান্ত পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত অঞ্চলে বহুসংখ্যক অসভ্য ও বর্ব্বর-জাতির বাস। এই সকল জাতির মধ্যে কোন কোন অসভ্যজাতি অদ্যাপিও সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাহারা কোন প্রকারে কোন সভ্য গবর্ণমেণ্টের অধীন নহে। এই সকল জাতির মধ্যে কাচিন, লিছ, লোল, মিয়াওজে প্রভৃতি জাতীয় লোকের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরি উল্লিখিত অসভ্য জাতিসকল ভিন্ন শান নামে এক সভ্যজাতির বাস এই অঞ্চলের বিবরণে উল্লেখযোগ্য। এই শানজাতি এককালে এক শক্তিশালী রাজ্য শাসন করিত এবং তাহারা একসময়ে ব্রহ্মদেশ ও আসামদেশ পর্য্যন্ত জয়পতাকা উড়াইয়াছিল।

যে সকল বিদেশী ভ্রমণকারিগণ এই সকল দুরারোহ পার্ব্বত্য অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া তদ্দেশবাসিগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার এণ্ডারসন, এম. ডি., সার জর্জ্জ স্কট, প্রিন্স হেনরী অব অরলিয়ান, মেজর ডেবিস, মিঃ আর. জনষ্টন্, মিঃ টি. ডবলিউ. কিংসমিল, মিঃ গিল, মিঃ বেবার, মিঃ আরচীবল্ড রোজ, এবং মিঃ কগজিন ব্রাউন প্রভৃতি প্রধান। ইহা ভিন্ন ভিনিশদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কো পোলোর (Marco-Polo) নাম অনেক ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে এতদঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এমন অবগত হওয়া যায়।

পাঠকগণের অবগতির জন্য উপরোক্ত ব্যক্তিসকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করিলাম।

১। ডাক্তার এণ্ডারসন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৬৮খৃঃ এবং ১৮৭৫খৃঃ যথাক্রমে মেজর স্লাডেন ও মেজর ব্রাউনের সঙ্গে পশ্চিম চীনের ইউনান প্রদেশে যে বাণিজ্য অভিযান প্রেরিত হয়, সেই অভিযানের সঙ্গে প্রধান চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব-আবিষ্কারকরূপে তিনি ঐ প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহার কৃত "মাণ্ডালে হইতে মোমিন" নামক গ্রন্থে এই সকল জাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২। সার জর্জ্জ স্কট ব্রহ্মদেশের সীমান্তপ্রদেশের কোন রাজনৈতিক কর্ম্মচারী। ইঁহার কৃত "আপার বর্ম্মা গেজেটিয়ার" নামক গ্রন্থে এই সকল জাতির অনেক কথা লিখিত হইয়াছে।

৩। মেজর ডেবিস ছদ্মবেশে এতদঞ্চল ভ্রমণ করিয়া তাঁহার কৃত "ইউনান" নামক গ্রন্থে এই সকল পার্ব্বত্য জাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৪। মিঃ জনষ্টন্ কর্ত্তৃক "পেকিন হইতে মাণ্ডালে" নামক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

৫। মিঃ টি. ডবলিউ. কিংসমিল কর্ত্তৃক পশ্চিম চীনের জাতিসকলের জাতিতত্ত্ব তাঁহার গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন।

৬। ই. সি. ইয়াং কর্ত্তৃক রচিত "ইউনান হইতে আসামভ্রমণ" নামক গ্রন্থে এই সকল জাতির বিশেষ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

৭। মিঃ আরচীবল্ড রোজ এবং মিঃ কগজিন ব্রাউন

স্যালউইন নদীর উপর দড়ির পুল।

বর্ম্মা-চীন সীমান্তপ্রদেশের লিছ জাতির সচিত্র বিবরণ এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিঃ রোজ এখানকার কন্‌সাল্‌ ছিলেন, সম্প্রতি কিছুদিন হইল এখান হইতে মধ্য এসিয়া হইয়া ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। মিঃ কগজিন ব্রাউন ইউনান প্রদেশের আকরিক পদার্থসকল আবিষ্কার এবং সেই সেই স্থানের অবস্থা অধ্যয়ন করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সর্ব্বাগ্রে লিছ জাতির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। পরে কাচিন ও শানজাতির সম্বন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। যাহা লিপিবদ্ধ হইল তাহা নিজের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা হইতে, এবং উপরোক্ত কোন কোন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

লিছদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—শ্বেত লিছ, রঞ্জিত বা Flowery লিছ এবং কৃষ্ণবর্ণ লিছ।

নানা প্রকার গ্রন্থ হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে লিছ জাতি অতি প্রাচীনকালে তীব্বতের দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তে বাস করিত। তথা হইতে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী তীব্বতীয়-গণকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ক্রমে চীন-ব্রহ্ম-সীমান্ত প্রদেশস্থ দুরারোহ পার্ব্বত্য অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

স্যালউইন নদীর উৎপত্তিস্থানে দুর্গম পর্ব্বতশিখরে স্বাধীন লিছ জাতির বাস। তাহাদের আচার ব্যবহার ও সামাজিক অবস্থায় চীন জাতির সভ্যতার দ্বারা যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এমন বোধ হয় না। তবে দক্ষিণ ও পূর্ব্বপ্রান্তে যে সকল লিছ বাস করে তাহারা প্রবল চীন জাতির সংঘর্ষে বিবাহসূত্রেই হউক বা অধীনস্থ প্রজাভাবেই হউক, নানা পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকে আপনা-দিগকে চীনা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং গর্ব্বের সহিত ইহাও প্রকাশ করে যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চীন দেশের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসিয়া-ছিলেন।

জাতীয় আকৃতি।

লিছজাতীয় লোকেরা প্রায়ই মধ্যমাকৃতি এবং তাহাদের অঙ্গের গঠন সুদৃঢ় ও সুডৌল, চক্ষুর্দ্বয় সরল ও কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকা উন্নত এবং শরীরের বর্ণ সচরাচর মলিন। লিছগণ মস্তকের অধিকাংশ মুণ্ডিত করিয়া চীনাদের ধরণে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে একটী বেণীর সৃষ্টি করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানের লিছরমণীগণ মস্তকের সম্মুখভাগ মুণ্ডিত করিয়া পশ্চাদ্ভাগের কেশ দ্বারা বেণী প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা কবরী রচনা করিয়া থাকে।

পরিচ্ছদ।

লিছপুরুষগণ গায়ে লম্বা কোট, পরিধানে খাটো অথচ ঢিলা পাজামা, পায়ে পটি এবং মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত বর্ব্বর ও স্বাধীন লিছগণ মাথায় চর্ম্মনির্ম্মিত টুপি বা হ্যাট ব্যবহার করে। যে সকল লিছগণের সর্ব্বদা চীনাদিগের সঙ্গে সংস্রব রাখিতে হয় তাহারা তাহাদের সাধারণ পরিচ্ছদের সঙ্গে বোতামশূন্য লম্বা একটী চোগা পরিধান করে। এই কারণে তাহাদের পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের হইয়া থাকে। অতি অসভ্যগণ কর্ণে ও গলদেশে ফলের বীজ, কড়ি, হাড়ের মালা প্রভৃতি সংলগ্ন করিয়া অপূর্ব্ব আভরণে ভূষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল লিছগণই কর্ণাভরণ ব্যবহার করে না।

লিছরমণীগণ অপেক্ষাকৃত ছোট কোট ও পাজামা পরিয়া থাকে। ইহারাও পায়ে পটি বাঁধে এবং মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের উষ্ণীষের বিশেষত্ব আছে।

লিছুজাতীয় পুরুষ।—সম্মুখস্থ ব্যক্তি ধনু (cross bow) হইতে বাণ নিক্ষেপ করিতেছে।

লিছুজাতীয় রমণী।

তাহাতে নানা কারুকার্য্যযুক্ত ঝালর, কড়ি, বোতাম প্রভৃতি অতি যত্নে গ্রথিত করিয়া দিয়া তাহার শোভা-বর্দ্ধন করিয়া থাকে। কর্ণে রৌপ্যনির্ম্মিত বৃত্ত ও নল এবং গলদেশে পুতিরমালা ধারণ করে। কোটের আস্তিনে, পৃষ্ঠদেশে ও স্কন্ধদেশে নানা চাকচিক্যশালী দ্রব্য গ্রথিত করিয়া রাখায় অতিসুন্দর দেখায়।

গ্রাম ও গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালী

ইহারা পর্ব্বতের আড়ালে এক কোণে গ্রাম নির্ম্মাণ করে। বাঁশ ও খড় দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে বাঁশ দ্বারা ঘরের মেজে নির্ম্মাণ এবং তাহার নিম্নে শূকর গরু ঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থানের লোক মৃত্তিকা পিটাইয়া সমান করিয়া ঘরের মেজে প্রস্তুত করে। এক একখানি গৃহ কয়েকটি কক্ষে বিভক্ত হইয়া থাকে। মধ্য কক্ষে বৈঠকখানা, তাহাতে অগ্নিকুণ্ড রক্ষিত হইয়া থাকে। দিনান্তে সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই অগ্নির পার্শ্বে উপবেশন করতঃ নানা-প্রকার গল্প করিতে করিতে সুরাপান করিয়া দিনের ক্লান্তি দূর করে। সেই গৃহের এক প্রান্তে শয়নকক্ষ, অপর প্রান্তে রন্ধনশালা প্রভৃতি। প্রত্যেক বাটীতেই আঙ্গিনা আছে। তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে।

গ্রামগুলি পর্ব্বতের এক প্রান্তে ও কতকটা আড়ালে এমনভাবে নির্ম্মিত যে দূর হইতে সহসা তাহা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এক এক গ্রামে বহু ঘর লোকের বাস থাকে না।

ধর্ম্ম।

নাট্ বা উপদেবতা উপাসনা করাই ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম। নানা পর্ব্বতে নানা প্রকার নাটের প্রাদুর্ভাব বলিয়া

ইহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং সেই সকল অপদেবতাগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাহারা সেই সেই পর্ব্বতের উপর বাঁশের মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি কুক্কুটমাংস ও বরাহ-মাংসযুক্ত ভোগ নিবেদন করিয়া দেয়। পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মাদিগকে ইহারা পূজা করিয়া থাকে। এবং সেই পূজায় নানা মাংসযুক্ত খাদ্য-দ্রব্য ও মদ্য প্রদান করিয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার পূজার জন্য প্রত্যেক বাটীতেই নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। সুসভ্য চীন ও হিন্দুগণও এই প্রকারে আপন-আপন পূর্ব্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধ বা পূজা করিয়া থাকেন। অতি বর্ব্বর জাতীয় লিছগণ কোন ঔষধে বড় বিশ্বাস করে না; তাহারা মনে করে যে যত ব্যাধি জন্মে তাহা কোন না কোন নাটের কোপে।

লিছদিগের তৃতীয় মাসিক উৎসব ও দেবমূর্ত্তি বহনের মিছিল।

অরলীন্সের প্রিন্স হেনরী তাঁহার ইউনান-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এক বৃদ্ধা লিছ রমণীর রোগমুক্ত হওয়ার পর কি ভাবে সে নাট পূজা করিয়া আপন কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। "রোগিণীর গৃহের দরজার সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র কৃত্রিম গৃহ নির্ম্মিত হইল। কিছু পিষ্টক, মদ্য, ভোজ্যস্বরূপ একপাত্র চাল, প্রভৃতি তাহার মধ্যে রক্ষিত হইল। সেই কৃত্রিম গৃহের মধ্যে মাটীর দ্বারা প্রস্তুত নাটের এক মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সূতা দ্বারা গৃহের মধ্যে বেড় দেওয়া হইল। এক টুকরিতে কতকগুলি তৃণ এবং তিনখানি আলম্ব কাষ্ঠ তথায় নীত হইল। এক বৃদ্ধ টংপা বা পুরোহিত বৃক্ষপল্লব লইয়া সুরা ও জলের মধ্যে তাহা ডুবাইয়া মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিল এবং সেই মন্ত্রের সঙ্গে নাটকে আসিয়া পূজা গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতে লাগিল। অতঃপর একটা মোরগের গলনালী ছিন্ন করিয়া, সেই স্থাপিত মূর্ত্তির গাত্রে তাহার রক্ত লেপন করিল এবং মোরগটার গাত্র হইতে কতকগুলি পালক নাটের গাত্রে স্থাপন করিল। তারপর মোরগটার গাত্র পরিষ্কার করিয়া রন্ধনপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া তাহা দ্বারা দেবতার ভোগ প্রস্তুত হইল। পুরোহিত আপন দক্ষিণাস্বরূপ চাউলসহ ভোজ্যপাত্রটা গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।"

এ যে দেখিতেছি আমাদেরই কালীপূজার প্রথম সংস্করণ। আমাদিগের দেশেও কেহ পীড়িত হইলে কালীপূজা মানস করে। রোগ আরোগ্য হইলে কালীমূর্ত্তি প্রস্তুত হয়। একখানি কৃত্রিম গৃহ বা ছাপড়া নির্ম্মিত হইয়া তাহার মধ্যে উক্ত কালীমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। নানা মিষ্টান্ন, নৈবেদ্য, ভোজ্যপাত্র এবং কোন কোন পূজায় গৃহজাত সুরাও প্রদত্ত হইয়া থাকে। পুরোহিত আচমন করিয়া তণ্ডুল ও জল ছিটাইয়া মন্ত্র পাঠ করতঃ মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতঃ পূজা গ্রহণ করিতে দেবীকে আহ্বান করেন। অবশেষে একটা ছাগ শিশুর মুণ্ডপাত করিয়া তাহার মুণ্ড ও রক্ত দেবীকে প্রদান করা হয়। পরে ছাগটার ছাল ছাড়াইয়া রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তদ্দ্বারা দেবীর ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। পুরোহিতও সেইপ্রকার তণ্ডুলযুক্ত ভোজ্যপাত্র ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া থাকেন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন লিছদিগের মত ছিলেন, আমার বোধ হয় সেই সময় হইতেই বা এইপ্রকার পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। লেখক শিশুকালে বড় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। পিতামাতা মা কালীর নিকট মানস করিয়া-

ছিলেন যে যদি মা কালী ছেলের প্রাণরক্ষা করেন তাহা হইলে জোড়া পাঁঠা দিয়া কালীপূজা করিবেন। রোগ আরোগ্য হইলে, কালীপূজা করা হইয়াছিল এবং সেই হইতে অদ্যাপি তাঁহার বাটীতে কালীপূজা হইয়া থাকে। সে আজ ৪৫ বৎসরের উপর হইল। চীনারাও আমাদিগের মত অসংখ্য দেবতা ও উপদেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহারাও দেবতার কোপে নানা পীড়া জন্মে বলিয়া বিশ্বাস করে। ধর্ম্ম ও অনেকগুলি সামাজিক নিয়মে চীনা ও আমাদিগের মধ্যে যেমন মিল লক্ষিত হয়, আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী বর্ম্মাদের সঙ্গে ইহার কোন বিষয়েই এত মিল লক্ষিত হয় না। ইহার কারণ কি চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধধর্ম্মই বা এ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ হইবে।

নিম্নলিখিত নাটগণ প্রধান :—

মিসি —বনদেবতা (আমাদিগের বন-দুর্গা)।

মাইনা—বসুন্ধরা।

চাইনী —ভিষকদেব বা বৈদ্যনাথ।

মিহি—বায়ুর দেবতা বা পবন।

মা কোয়া —স্বর্গের দেবতা বা নারায়ণ।

মুহু—বজ্রের দেবতা বা ইন্দ্র।

মিসা —কমলের দেবতা (বা লক্ষ্মীদেবী)। চাষের সময় ইঁহার নিকট মানস করে যে ভাল ফসল হইলে দেবীকে পূজা দিবে।

হিনী—বাস্তুপুরুষ বা বাস্তুদেব। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে বাস্তুপুরুষের পূজা করিয়া থাকে। আমাদেরই মত।

বিবাহ।

ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত শান রাজ্যস্থ কেং-টং নামক স্থানের পাহাড়স্থ লিছগণের বিবাহপদ্ধতি এই প্রকার :—প্রথমে বর, কন্যাকে তাহার পিত্রালয় হইতে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া দুইএকদিন পর্ব্বতের কোন নিভৃত স্থানে বাস করে। তারপর তাহারা গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই উপলক্ষে এক ভোজের আয়োজন হয় এবং বরপক্ষ হইতে অবস্থানুসারে কন্যার পিতাকে কিছু পণ দেওয়া হয়। সেই পণের পরিমাণ একশত কি দেড়শত টাকার অধিক নহে। এই প্রকারে বর কর্ত্তৃক কন্যা অপহৃত হইলে কন্যার পক্ষ হইতে প্রায়ই বিবাহের সম্মতি প্রদান করা হইয়া থাকে।

স্যালউইন নদীর উত্তরাংশের লিছদিগের মধ্যে আর এক প্রকার বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে। বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়া ভোজ ও আমোদ আহ্লাদের পর রাত্রিকালে কন্যা তাহার পিতামাতার সহিত জঙ্গলে পলায়ন করে। তাহার পর বর তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিলে, কন্যার পিতামাতা তথা হইতে সরিয়া পড়ে এবং বরকন্যা উভয়েই সমস্ত রাত্রি জঙ্গলে যাপন করে। প্রাতঃকালে ঘরে ফিরিয়া আইসে।

কুজং-কাই নামক স্থানের লিছদিগের বিবাহপ্রণালী অন্য প্রকার। ইহাদের বিবাহের সম্বন্ধ একজন মধ্যবর্ত্তী বা ঘটক দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিবার কালে বরপক্ষ হইতে কন্যাপক্ষকে ২০।২৫ ভরি রূপা প্রদান করা হয় এবং তাহার দ্বারাই সম্বন্ধ পাকাপাকি স্থির হইয়া থাকে। বিবাহের দিন কন্যা একটী সহচরী, পিতা মাতা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধব সহ বরের বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হয়। সেই সঙ্গে ঘটক কন্যার কয়েক প্রস্থ পোষাক আনয়ন করে।

বরপক্ষীয় লোক নিজের দরজায় কন্যাযাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তখন বন্দুক আওয়াজ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে কন্যার আগমনবার্ত্তা জানান হয় এবং ভূত প্রেতদিগকে দূরে তাড়ান হয়। তথায় উভয় পক্ষের লোকে পরস্পরের প্রদত্ত সুরাপান দ্বারা পরস্পরের প্রতি সৌহৃদ্য জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ইহার পর পাত্রী বরের বাটীর ভিতর প্রবেশ করে। বরের বাটীতে তিন দিন যাবত সুরাপান ও নৃত্য গীতাদিতে উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু এযাবৎ বর কন্যায় একত্র মিলনের প্রথা নাই। পূর্ব্ব হইতেই চারিটী বড় জালায় মদ সঞ্চিত হইয়া থাকে। উক্ত মদ নিঃশেষ না হইলে উৎসব ভঙ্গ হইতে পারে না। উৎসবের পর আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ চলিয়া গেলে বরকন্যার মিলন হইয়া থাকে। লিছদিগের মধ্যে স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার নিয়ম নাই। স্ত্রীকে পসন্দ না করিলে বা তাহার সঙ্গে অনৈক্য হইলে, অথবা তাহাকে ভরণ পোষণে অসমর্থ হইলে সেই স্ত্রীকে অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে পারে।

ব্রহ্ম দেশের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে মিচিনা জেলার সীমান্ত ও স্যাডন নামক স্থানের পার্ব্বত্য অঞ্চলের লিছুদিগের বিবাহ-প্রথা আর এক প্রকার। ইহাদের মধ্যে বালিকার নৈতিক চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। বিবাহের পূর্ব্বে কোন বালিকার সন্তান-সম্ভাবনা হইলে সমাজে তাহার বড় নিন্দা হয় এবং যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ বালিকার গর্ভ সঞ্চার হয়, সমাজের লোকে জোর করিয়া ঐ ব্যক্তিকে সেই বালিকাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করে। এই সকল লিছু-দিগের মধ্যেও ঘটক দ্বারা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে।

বিবাহের দিবস বরপক্ষ হইতে কতকগুলি যুবক প্রস্তুত হয় এবং তাহাদিগকে সুরাপান করিতে দেওয়া হয়। সুরাপান শেষ হইলে সকলে কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে পাত্রী আনিবার জন্য যাত্রা করে। পাত্রীকে যুবকগণ জোর করিয়া ধরিয়া আনিবার সময় সে তাহাদিগকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। যখন তাহাকে বরের গ্রামের সীমানায় উপস্থিত করা হয়, তখন হইতে সে আর আপত্তি না করিয়া নিজেই স্বেচ্ছায় হাঁটিয়া চলিতে থাকে।

পাত্রী বরের বাটীর দরজায় উপস্থিত হইলে, একটী মোরগ হত্যা করিয়া তাহার পশ্চাৎ দিকে নিক্ষেপ করিয়া পথে জল ছিটাইয়া দেওয়া হয়। কোন ভূতপ্রেত বা নাট কোন প্রকার অমঙ্গল না ঘটায় এই জন্য হত মোরগ নিক্ষিপ্ত ও জল ছিটান হইয়া থাকে। বন্দুক আওয়াজ করিয়া কন্যার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করা হইয়া থাকে। ভোজের আয়োজন হইলে গ্রাম্য মোড়ল বর কন্যা উভয় পক্ষের পিতৃপুরুষদিগকে তথায় উপস্থিত হইতে আহ্বান করে। এবং তাহারা উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া কন্যার পিতা বরকে বলে যে, "আমার কন্যাকে তোমার হাতে অর্পণ করিলাম, তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া রক্ষা কর এবং প্রতিপালন কর। অদ্য হইতে তুমি আমার কুটুম্ব হইলে।" ইহার পর ঘটকচূড়ামণি সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বরকে সম্বোধন করিয়া বলে যে, "আমি তোমার জন্য দৃঢ়কায় সুগঠিত সুন্দরী স্ত্রী আনিয়াছি। ইহার সহিত সদয় ব্যবহার করিও।" ইহার পর বর দণ্ডায়মান হইয়া কন্যাকর্ত্তা ও ঘটককে সম্বোধন করিয়া বলে যে "আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে আমার স্ত্রীকে আমি রক্ষা ও প্রতিপালন করিব।" অতঃপর পূর্ব্বপুরুষের আত্মা-দিগকে অন্ন ব্যঞ্জন ও সুরা দ্বারা পূজা করিয়া তিন দিন উৎসবের পর বিবাহআমোদ সাঙ্গ হয়।

লিছুদিগের এ বিবাহপ্রণালীর সঙ্গেও আমাদের বিবাহপ্রণালীর কতকটা মিল লক্ষিত হয়। কন্যাকর্ত্তা বরকে বলেন "মম কন্যাং গৃহ্যতাং," বর বলেন "গৃহ্ণামি।" আবার আমাদের বিবাহের দিন যে "বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ" করা হয় তাহারও অর্থ বরকন্যার পূর্ব্বপুরুষকে আহ্বান করিয়া অন্ন জল প্রদান করা। ঘটক ইহাদেরও আছে, আমা-দিগেরও আছে।

জন্ম মৃত্যু।

গর্ভাবস্থায় রমণীগণ যথা তথা যাইতে পারে এবং যাহা খুসী আহার করিতে পারে। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে সন্তানের পিতা তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রেতনাম বা স্বর্গীয় নাম ধরিয়া আহ্বান করিয়া বলিতে থাকে, "আপনারা আসিয়া এই সন্তান গ্রহণ করুন এবং ইহাকে রক্ষা করুন।" সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে দুইটী নাম প্রদান করে। সেই দুইটী নামের একটী পার্থিব এবং অপরটী তাহার ভাবী স্বর্গীয় বা প্রেতাত্মার নাম। এই শেষোক্ত নাম ধরিয়া তাহার জীবিত কালে ডাকিবার নিয়ম নাই। তাহার মৃত্যুর পর সেই প্রেতনাম উচ্চারণ করিয়া তাহাকে ডাকিয়া থাকে। মৃত্যুকালে পুরোহিত মুমুর্ষু ব্যক্তির প্রেত নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের আত্মার নিকট যাইতে বলে। ইহাদের এই প্রেতনাম কতকটা আমাদের রাশিনামের অনুরূপ।

সন্তান প্রসবের দশম, বিংশ এবং ত্রিংশ দিবসে প্রসূতি ও সন্তান উভয়কেই স্নান করাইয়া দেয়। এই সময়ের মধ্যে প্রসূতিকে, টক্, লঙ্কা, সুরা এবং কচি বাঁশের মূল পচাইয়া যে অম্লরসযুক্ত খাদ্য ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া থাকে তাহা খাইতে নিষেধ। মাস পূর্ণ হইলে একটী কুক্কুটের শিরশ্ছেদ করতঃ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট ভোগ দিয়া সন্তান ও প্রসূতির মঙ্গল কামনা করিয়া ভাব

ঘর বা আঁতুড় ঘর হইতে তাহাকে বাহির হইতে দেওয়া হয়। আমাদিগের দেশেও এই নিয়ম —"নয়ের কামান, মাসকে কামান" না গেলে প্রসূতি অন্যত্র যাইতে পারে না—এবং যাহা ইচ্ছা তাহা আহার করিতে পারে না। ষষ্ঠী পূজা করিয়া সন্তানের মঙ্গলকামনা করা হইয়া থাকে। লিছুগণও ত্রিশ দিন যাবত অশৌচ পালন করিয়া থাকে। অর্থাৎ এই ত্রিশ দিনের মধ্যে তাহার বস্ত্র পরিবর্ত্তন, বা বিছানা পরিবর্ত্তন করে না এবং কেহ তাহাকে স্পর্শ করে না। ত্রিশ দিন পরে বিছানা ও বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া শুদ্ধ হয়।

কোন কোন স্থানের লিছুদিগের নির্দ্দিষ্ট সমাধিস্থান নাই। তাহারা মৃতদেহকে দূরস্থ কোন পাহাড়ে সমাধি দেয়। লোকের মৃত্যু হইলে তাহার দেহটী শবাধারে পূরিয়া আঙ্গিনার মধ্যে বাঁশের বেড়া দ্বারা ঘেরিয়া রাখে। পরে পুরোহিত নাটগণের অনুমতি লইয়া কোন্ দিনে তাহার সমাধি হইবে তাহা নির্ণয় করে। সেই অনুসারে পর্ব্বতের কোন নিভৃত স্থানে সমাধিকার্য্য সম্পন্ন হয়। সমাধিস্থানে কোনপ্রকার চিহ্ণ রাখা হয় না। অরলিন্সের প্রিন্স বলেন যে শ্বেতলিছুগণ সমাধিস্থানের উপর মৃত ব্যক্তির অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া দেয় এবং মৃত ব্যক্তির মুখের মধ্যে কিঞ্চিৎ রূপা বা অর্থ রাখে। তাহা বোধ করি রাহাখরচ বা খেয়াপার হওয়ার পারাণি কড়ি। ঠিক আমাদের যেমন বৈতরণী নদী পার হইবার জন্য কড়ি ও বৎসতরী উৎসর্গ করা হইয়া থাকে।

আপার স্যালউইন নদী তীরস্থ ও তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বতীয় অঞ্চলের লিছুগণ মুমূর্ষু ও মৃতদেহের প্রতি বড় যত্ন করে। আসন্নকাল উপস্থিত হইলে নয়টী ধান এবং ক্ষুদ্র নয় খণ্ড রৌপ্য মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গলাধঃকরণ করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকগণকে মৃত্যুকালে সাতটী ধান ও সাতখানি রৌপ্য দেওয়া নিয়ম। মৃত্যু হইলে যাহারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাহাদের মধ্য হইতে দুই জন লোকে মৃত ব্যক্তির দুই খানি হাত ধরিয়া তাহার প্রেতনাম ধরিয়া ডাকিয়া তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট যাইতে বলে এবং তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয় যে পথিমধ্যে শত্রু কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া যেন পথভ্রষ্ট না হয়। মৃত্যু হইলে বন্দুক আওয়াজ করিয়া তাহার মৃত্যু ঘোষণা করা হয় এবং তাহার দ্বারা অন্য ভূতপ্রেতদিগকে দূরে তাড়ান হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর মৃত দেহটী স্নান করাইয়া শবাধারের মধ্যে শয়ান করান হয় এবং তাহার পান ও ভোজনপাত্র এবং কিঞ্চিৎ সুরা তাহার মধ্যে স্থাপন করে। শব বহনকালে তিনটী কড়ি এবং একখণ্ড রৌপ্য নিকটবর্ত্তী কোন নদী বা নালায় নিক্ষেপ করিয়া তাহার বৈতরণী নদী পার হইবার খরচ দিয়া থাকে। লিছুদিগের বিশ্বাস এই যে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে স্বর্গে যাইতে হইলে নয়টী নদী, নয়টী পর্ব্বত এবং নয়টী সুদীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পথি মধ্যে শূকর বা অন্য

তিব্বতী সর্দ্দার।

কিছু কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া পথভ্রষ্ট না হইতে হয় তজ্জন্য সাবধান করিয়া দিয়া পুরোহিত উচ্চরবে চীৎকার করিয়া মৃত ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষগণকে আহ্বান করিয়া বলে যে "তোমাদের সন্তান যাইতেছে তাহাকে গ্রহণ কর এবং রক্ষা কর।"

কবরের উপর মৃত ব্যক্তির ধনুর্ব্বাণ তরবারী বর্শা

কুজংকাই জাতীয় তিব্বতী সর্দ্দারের স্ত্রী।

প্রভৃতি রক্ষিত হয় এবং কবরের মধ্যে তাহার জন্য খাদ্যদ্রব্য এবং জলপানপাত্র দিয়া থাকে। তিন বৎসর যাবৎ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ বৎসরে একবার করিয়া তথায় খাদ্যদ্রব্য ও সুরা প্রদান করিয়া আসে। আমরাও আত্মীয়ের মৃত্যুর এক বৎসর পরে বাৎসরিক সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ এবং প্রতি বৎসর মৃত্যুতিথিতে শ্রাদ্ধ করিয়া অন্ন জল প্রদান করিয়া থাকি।

কৃষিকার্য্য ও শস্য।

ইহারা পর্ব্বতের গাত্রস্থ জঙ্গল কাটিয়া চাষ করে বা কোদালির দ্বারা ভূমি আবাদ করে। তাহাতে ভুট্টা, গম, জোয়ারী, তামাক, আফিং ও নানাবিধ শাক-শবজীর চাষ করিয়া থাকে। স্যালউইন নদীর উত্তরাংশের লিছগণ ধান কাহাকে বলে অদ্যাপি চেনে না বলিয়া শুনা যায়। ইহারা প্রচুর পরিমাণে বন্য মধুর চাষ করিয়া থাকে অর্থাৎ মাছি পালন করিয়া মধু সঞ্চয় করে

শাসনকার্য্য।

স্যালউইন নদীর উত্তরাংশের লিছগণ অদ্যাপি তাহাদের বংশানুক্রমিক মোড়ল দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। তাহাদের গ্রামগুলির পরস্পরের মধ্যে মিল নাই। এক গ্রামের লোকের সঙ্গে অপর গ্রামের প্রায়ই বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে। মেকং নদীর তীরস্থ ডুয়েচি স্থানের লিছগণ তিব্বত-সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক শাসিত হয়। টিয়েন-টাং, মিং-কোয়াং এবং কুজং-কাইয়ের লিছগণ চীনবংশসম্ভূত বংশানুক্রমিক সুবাদার দ্বারা শাসিত হয়। এবং টেঙ্গিয়ের নিকটবর্ত্তী লিছগণ চীন রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া থাকে। শানদেশের নিকটস্থ পাহাড়ের লিছগণকে শান সুব্বাদার শাসন করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণবর্ণ লিছগণের মধ্যে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথা সুসভ্য চীন জাতির মধ্যে অদ্যাপিও প্রচলিত দেখা যায়। লিছগণ বলপূর্ব্বক অন্য কোন জাতীয় লোক সকল ধৃত করিয়া তাহাকে দাসত্বে নিযুক্ত করে এবং সকল কার্য্য তাহার দ্বারা সম্পন্ন করায়। এই দাসগণ বিবাহ করিতে পারে এবং তাহাদের সন্তানগণ স্বাধীন অর্থাৎ দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়। ইহারা কখন কখন স্ত্রীলোকদিগকে অপরের নিকট বন্ধক রাখিয়া থাকে।

ভাষা।

ইহাদের কোন লিখিত ভাষা নাই। চীনজাতির সংস্পর্শে থাকিয়াও ইহারা লেখা অভ্যাস করিতে সমর্থ হয় নাই। সমস্তই ইহাদের মুখস্থ রাখিতে হয়। ইহাদের ভাষার সঙ্গে কাচিন জাতির ভাষার অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

টেঙ্গিয়ে, চীন। শ্রীরামলাল সরকার।

তারেই

(গেয়ান দাস বঘেলি)

কেন হুড়াহুড়ি দুই হাত ছুড়ি'?
কেন তাড়া এত উপরে যেতে?
"মোর নৌকারে ডুবালে যে,—তারে
প্রতি নিশাসেই চাই যে পেতে!"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

অশ্বের মনস্তত্ত্ব

শিশুকাল হইতে অশ্ব সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়জনক গল্প শুনিয়া আসিয়াছি। বড় হইয়া যখন দেখিতাম সার্কাসে ঘোড়া নানারূপ বাজি করে, কানে কানে কথা বলে, এমন কি অঙ্ক কসে, তখন অশ্ব জীবটাকে নিতান্ত চতুষ্পদ বলিয়া অবজ্ঞা করিতে আর প্রবৃত্তি হইত না। কতদিন মনে হইয়াছে মানুষের সহিত ঘোড়ার বুদ্ধিবৃত্তির প্রভেদ খুব বেশী নহে। মনে আছে কোনো সার্কাস হইতে ফিরিবার সময় আমার এক বন্ধু বলিয়াছিলেন বর্ণপরিচয় করাইয়া দিলে খুব সম্ভবতঃ ঘোড়ারা কবিতা লিখিতে পারে। আমার বন্ধুটি নিজে কথনো কবিতা লেখেন নাই, এ জন্য এ সম্বন্ধে তাঁহার মতের বিশেষ কিছু মূল্য নাই—অতএব কবিগণ দুঃখিত হইবেন না।

বস্তুতঃ অশ্বের বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য সম্বন্ধে যে সকল গালগল্প সকল দেশের সাহিত্যেই স্থান পাইয়াছে, আংশিকভাবেও তাহা সত্য হইলে অশ্বকে আমরা কোনো কাজেই লাগাইতে পারিতাম না। প্রকৃতি দেবী সৌভাগ্যক্রমে অশ্বকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেন নাই, তাই আমাদের উদ্দেশ্য এত সহজে তাহার কাছে গোপন থাকে এবং লাগামের মত এমন একটি ক্ষীণ উপকরণের সাহায্যেও আমরা তাহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লইতে পারি।

গল্পের ঘোড়া প্রভুর কাজ খুব আনন্দিত হইয়াই করে, কিন্তু বাস্তব ঘোড়াকে এরূপ করিতে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। বারম্বার তাহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইয়া কাজকরাটা মানুষ তাহার অভ্যাসগত একটা ব্যাপারে পরিণত করিয়া দিয়াছে। সে মানুষের আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গিয়া দেখিয়াছে, কখনও তাহার চেষ্টা সফল হয় না। তাহার ন্যায় অন্যায় সকল প্রকার আপত্তির উপর নিজের প্রাধান্যকে মানুষ এতবার এমন নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করিয়াছে যে মানুষের প্রভুত্বকে অস্বীকার করার কল্পনাও আর অশ্বের মনে আসে না। এই জন্যই চালকের ইচ্ছানুসারে যাহা কিছু তাহার পক্ষে সম্ভবপর ঘোড়া সবই সম্পন্ন করিয়া থাকে;—কর্ম্মানুষ্ঠানে আনন্দ অথবা কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণাবশতই যে করে তাহা নহে—না করিয়া উপায় নাই বলিয়া সমস্তই মানিয়া যায়। দুই একবার মাত্রও তাহার নিজের খেয়াল অনুসারে ঘোড়াকে চলিতে দিয়া তাহার মাথায় কোনোক্রমে যদি একবার এই ভাবটি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় যে একটা কোনো নির্দ্দিষ্ট কাজ তাহার এক আধ বার না করিলেও চলে, তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেও প্রমাণ করিতে বসিবে যে, কোনো কাজ না করাটাই তাহার পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী। ইহার পর নিয়মিতভাবে, অথবা হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া,—লাফাইয়া উঠিয়া, পিছু হটিয়া, চালক যে দিকে লইয়া যাইতে চাহে তাহার বিপরীত দিকে হঠাৎ ফিরিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়া—সহস্র প্রকারে সে বিদ্রোহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে।

এই হইল সাধারণ ঘোড়ার স্বভাব। অসাধারণ ঘোড়া দুই একটি জগতে যে জন্মায় নাই তাহা নহে—কিন্তু ঘোড়া লইয়া সচরাচর যাহাদের কারবার করিতে হয়, নিজের ঘোড়াগুলিকে সেই অসাধারণদের একজন বলিয়া কল্পনা না করাই তাহাদের পক্ষে নিরাপদ।

বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তির বহুদিনের পরীক্ষা এবং বীক্ষণপরতায় অশ্ব সম্বন্ধে আজ আমরা যাহা জানিতে পারিতেছি তাহা প্রচলিত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং অধিকাংশ স্থলেই আপাতদৃষ্টিতে তাহা হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়।

ইঁহাদের মতে—প্রথমতঃ অশ্বজাতি নির্ব্বোধ; দ্বিতীয়তঃ তাহারা ভীরু, "কাপুরুষ;" তৃতীয়তঃ অধিকাংশ কাপুরুষেরই যে দশা হইয়া থাকে, অর্থাৎ সাহসের মিথ্যা আস্ফালন করিয়া তাহারা যেমন ভীরু মানুষকে ভয় লাগাইয়া দিতে চায়, ইহাদেরও সেইরূপ। প্রকৃতি তাহাকে এমন করিয়া না গড়িলে মানুষ তাহাকে নিজের কাজে লাগাইতে পারিত না। সে নির্ব্বোধ বলিয়া সহজেই তাহাকে প্রতারিত করা চলে, এবং ভীরু বলিয়াই এত সহজে সে মানুষের বশীভূত হয়, বিরুদ্ধাচরণ একবার নিষ্ফল বলিয়া জানিলে বিদ্রোহ করিবার প্রবৃত্তিও তাহার আর থাকে না। শৈশব হইতেই সে অন্যকে ভয় দেখাইতে ভালবাসে এবং বড় হইয়াও দেখা যায় সে ক্রমাগত আস্ফালন করিয়া চেষ্টা দেখিতেছে কতদূর পর্য্যন্ত হুকুম না মানিলেও চলে। বাধা না পাইলে প্রতিদিনই

সে শাসনের সীমা লঙ্ঘন করিতে থাকে এবং ক্রমে সে এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়, যে, তাহাকে লইয়া কাজ করিতে হইলে জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে।

এই নির্ব্বুদ্ধিতা এবং ভীরুতা একদিকে যেমন সুবিধা-জনক, অন্যদিকে তেমনি তাহার গুরুতর অসুবিধাও আছে। কখন কখনও অশ্ব-স্বভাবের সাধারণ বুদ্ধিহীনতা, তাহার স্বাভাবিক ভীরুতায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া, অশ্বের মনে উৎকট ত্রাসের সৃষ্টি করে, এবং তাহার ফল ভয়াবহ হইয়া থাকে।

ঘোড়ার মন এক সময়ে একটি মাত্র ভাবকে গ্রহণ করিতে পারে। ইহারও সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। বিদ্রোহ নিষ্ফল, এই কথাটি তাহার মনে একবার মুদ্রিত করিয়া দিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা বিনা আয়াসে আমরা তাহাকে দিয়া হুকুম তামিল করাইতে পারি। কিন্তু ঘরে যখন আগুন লাগে তখন তাহাকে ঘর হইতে টানিয়া বাহিরে আনিবার পরেও ছাড়া পাইলেই সে ছুটিয়া জ্বলন্ত গৃহে গিয়া প্রবেশ করে। কারণ তখনও একটিমাত্র চিন্তা তাহার মনে জাগিয়া থাকে, যে,—যে আস্তাবল এতদিন তাহাকে শ্রান্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছে, আজিকার বিপদেও সেই রক্ষা করিবে—সেখানে যদি আশ্রয় না থাকে তবে আর কোথাও নাই!—সে কম্পমান গৃহতলে, পতনশীল প্রাচীরের মধ্যে অগ্নিশিখা ভেদ করিয়া গিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার ভয়ের আর কোনো কারণ নাই, এই দৃঢ়প্রত্যয় লইয়া বেচারা সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পুড়িয়া মরে।

ঠিক এই জন্যই কাপড় দিয়া চোখ বাঁধিয়া দিলে জ্বলন্ত গৃহ হইতে অশ্বকে অন্যত্র লইয়া যাইতে কষ্ট পাইতে হয় না—দৃষ্টির এই আকস্মিক অভাব তাহার পূর্ব্বের ধারণাকে মন হইতে তাড়াইয়া দেয় এবং তাহার স্থানে অন্য আর একটি ধারণা আসিয়া জুড়িয়া বসে। দেখা গিয়াছে বারম্বার চেষ্টা করিয়াও যে ঘোড়াকে প্রজ্বলিত গৃহ হইতে টানিয়া বাহিরে আনা যায় নাই, তাহার একটা পা, একটু উঁচু করিয়া বাঁধিয়া দিতেই সে বেশ সহজে তিন পায়ে লাফাইতে লাফাইতে বাহিরে আসিয়াছে। তাহার নাকে একটা লোহার নথ অথবা তাহার গলায় গোটা দুই মুর্গী ঝুলাইয়া দিলেও ঠিক এই ফলই হয়—কেননা এইরূপ একটা অনভ্যস্ত ব্যাপারের দ্বারা তাহার প্রচলিত ধারণাকে নাড়া দিয়া লইয়া তাহাকে নূতন চেষ্টায় প্রবৃত্ত করানো সহজ হয়। ঘোড়া যখন চমক লাগিয়া হঠাৎ পিছু হটিতে থাকে, কোনো ক্রমে তখন যদি গাড়ী সুদ্ধ তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া পিছু হটান যায় ত সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখে চলিতে থাকিবে। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়—বিরুদ্ধাচরণের একটা ভাব এতক্ষণ তাহাকে পিছু হটাইতেছিল; অতএব তাহাকে পিছু হঠাইবার চেষ্টা করিবামাত্র সেই বিরুদ্ধতাই তাহাকে সম্মুখের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে।

অশ্বের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত স্থায়ী এবং আপনার বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে পত্রবাহক পারাবতের মতই তাহার অসামান্য পটুতা আছে। পূর্ব্বপরিচিত স্বর তাহার খুব মনে থাকে—কিন্তু দেখা গিয়াছে কথা না বলিলে খুব পরিচিত লোককেও দর্শন স্পর্শন অথবা ঘ্রাণের সাহায্যে সে চিনিতে পারে না। কথা তাহার কাছে অর্থহীন, হাত পায়ের নড়চড়, চাবুকের আঘাত অথবা আদরের হাতবুলানি প্রভৃতির স্মৃতির সহিত যুক্ত যে শব্দ তাহাই সে বুঝিতে পারে, শুধু কথার কোনো মূল্য তাহার কাছে নাই। একবার কোথাও গেলে অশ্ব প্রায় আর তাহা কখনও ভুলে না,—পথ যতই জটিল আঁকা বাঁকা অসাধারণ রকম হৌক না, সমস্তই তাহার ঠিক ঠিক মনে থাকে। এই স্মৃতিশক্তির জন্যই তাহাকে নানাবিধ বিস্ময়কর কৌশল শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় এবং ইহারই সহায়তায় অশ্বকে আমরা বিশেষ বিশেষ কাজে লাগাইতে পারি। কিন্তু আবার, এই স্মৃতির জন্যই অতীত দুর্ঘটনার কথা সে ভুলিতে পারে না, এবং কবে, কোন্ দিন বিদ্রোহ করিয়া সে জয়লাভ করিয়াছিল চিরদিন তাহা তাহার মনে থাকে। বস্তুতপক্ষে এই স্মৃতির জন্যই অশ্বের সহিত সকল প্রকার ব্যবহারেই আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কোন্ দিন সে তোমাকে পিঠে লইয়া তুর্কি নাচন নাচাইয়াছিল সে কথা সে জীবনে কখনও ভুলে না—এরূপ ঘটনা খুব কদাচিৎ ঘটে বলিয়াই তাহা তাহার মনে আরও উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত থাকে।

অশ্ব জীবটি "মহদাশয়" নহে এবং "কর্ত্তব্যবুদ্ধির"

লেশমাত্রও তাহার মধ্যে আছে এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। বহুবার এমন ঘটিয়াছে বটে যে চলিতে চলিতে যতক্ষণ না তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেছে, ততক্ষণ সে পথে কোথাও থামে নাই। কিন্তু ইহাতে তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধির কিছুমাত্র প্রমাণ হয় না। পথের মধ্যে থামিতে গেলেই আবহমানকাল হইতে তাহাকে প্রহার সহ্য করিতে হইয়াছে এবং গাড়ী যোজনা ও জিন সওয়ারির চলার সঙ্গে এই একটি ভাব তাহার মনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া আছে যে তাহাকে চলিতেই হইবে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠস্থিত দ্বিপদ জন্তুটি তাহাকে ইঙ্গিতে না জানাইতেছে "বাস্, যথেষ্ট হইয়াছে" ততক্ষণ তাহাকে চলিতে হইবেই হইবে। ইহার উপর অতীতের অভিজ্ঞতায় সে জানিয়াছে, যাত্রার শেষে তাহার জন্য আশ্রয় এবং পানাহার প্রতীক্ষা করিয়া আছে—এই সমস্ত মিলিয়া তাহাকে ক্রমাগতই অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিতে থাকে। শ্রান্তি আসিয়া যখন তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলে, তখনও শাস্তির ভয় তাহাকে থামিতে দেয় না। বন্য অথবা অল্পবয়স্ক অশিক্ষিত ঘোড়ার স্মৃতি অতীতের আদর ও শাস্তির সহিত কোনরূপে জড়িত নহে বলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে আর কোনরূপেই চালান যায় না।

এমন যেন কেহ মনে না করেন যে অশ্বের হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ভাল কিছুই নাই। সদ্‌গুণ তাহার যথেষ্ট আছে, কিন্তু যে তীক্ষ্ণতা ও দূরদর্শিতার মিথ্যা পরিচ্ছদে আমরা তাহাকে সাজাইয়াছি তাহা হইতে অশ্ব বেচারিকে মুক্ত না করিলে তাহারও বিপদ। কাল্পনিক সদ্‌গুণরাশিতে বিভূষিত করিয়া মানুষ আজ পর্য্যন্ত তাহাকে অনর্থক অনেক যন্ত্রণা দিয়াছে এবং তাহাকে স্নেহশীল প্রভুভক্ত প্রভৃতি মনে করিয়া কতবার যে নিজের ও প্রিয়জনদের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

প্রভু, প্রভুর ভৃত্য—এমন কি মনুষ্যমাত্রই তাহার কাছে ঘৃণ্য—তোমার শরীরের গন্ধ পর্য্যন্ত তাহাকে পীড়িত করে। তোমার দ্বারা আহার পাওয়া যায়, তুমি তাহাকে হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাও, তোমাকে তাহার দরকার, এইজন্য তোমার অস্তিত্ব পীড়াজনক হইলেও তোমাকে তাহার সহ্য করিতে হয়। বিদ্রোহ করিয়া সে অনেকবার দেখিয়াছে, তোমার সহিত পারিয়া উঠা সম্ভব নহে, এবং তাহার অচল ধারণাবিশিষ্ট মনে এই কথাটি মুদ্রিত হইয়া আছে, যে, তোমাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—তাই তুমি তাহার প্রভু। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অনেক ফার্ম্মে দেখা যায় ডাকিলে ঘোড়া কাছে আসে—ডাকিয়া খাবার প্রভৃতি দিয়া তাহাদের এই অভ্যাসটি কেহ কেহ বদ্ধমূল করার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু খুব "পোষমানা" ঘোড়াও অন্য কিছু করিবার যখন না থাকে শুধু তখনই ডাক শুনে—এবং বন্ধনমুক্ত হইয়া ছুটিয়া একবার বাহির হইয়া পড়িলে হাজার ডাকাডাকিতেও তাহাদিগকে কিছুমাত্র বিচলিত হইতে দেখা যায় না। আমেরিকার দিগন্তপ্রসারিত বহুমাইলবিস্তৃত 'ক্যাট্‌ল্ র‍্যাঞ্চে' জনশূন্য মাঠের মাঝে জিন-আঁটা একটি অশ্ব একাকী ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রভুর প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—এ দৃশ্য বিরল নহে। প্রথম যখন ইহা দেখিয়াছিলাম তখন অশ্বের প্রভুভক্তির কথা ভাবিয়া বিস্ময়ে আমার মন অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল বন্য অশ্বকে যেখানে সেখানে যখন তখন দাঁড়াইয়া থাকিতে শিক্ষা দিবার প্রণালী তখনও আমার জানা ছিল না। তীক্ষ্ণ এবং বাঁকান বড় বড় কাঁটা দেওয়া একপ্রকারের লাগাম ("curb bit") নূতন ঘোড়ার মুখে পরাইয়া দেওয়া হয় এবং লাগামের চামড়া তাহার পায়ের সম্মুখে মাটিতে লুটাইয়া একটা ঘেরা জায়গায় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এদিক ওদিকে ঘুরিতে ফিরিতে গেলেই লাগামের দোদুল্যমান চামড়ার উপর অশ্বের পা পড়ে এবং তাহার ফলে বেচারির চোয়াল মাথা হইতে প্রায় ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম করে। লাগাম-পরা অবস্থায়, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাই যে এই ভীষণ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায় তাহা বুঝিতে কাজেই তাহার বিলম্ব হয় না। লাগাম খুলিয়া লইলে এই সকল বন্য অশ্ব কোনো মানুষকেই কাছে ঘেঁসিতে দেয় না—কিন্তু যেমন তেমন একটা লাগাম মাথার উপর দিয়া তাহার সম্মুখে ঝুলাইয়া দিলেই হইল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিন, অনাহারে সে তোমার প্রতীক্ষায় একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

গৃহের প্রতি অশ্বের আশ্চর্য্য আসক্তি আছে—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গেলে সে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে—পুরাতন পরিচিত প্রাঙ্গণ এবং আস্তাবলের জন্য তাহার মন যেমন ভাঙ্গিয়া পড়ে, অন্য কোনো জন্তুরই তেমন হয় না। নূতন কোথাও আসিলে কুকুরও খুব কষ্ট পায়—কিন্তু মানুষের সঙ্গ হইতে সে যে সান্ত্বনা পায়—অশ্ব বেচারির সে সুযোগও নাই। অনেক ভাল ঘোড়া নূতন স্থানে আসিয়াই পানাহার একেবারে ছাড়িয়া দেয় এবং দিনের পর দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকে। মন-কেমন-করাই ইহার একমাত্র কারণ—কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সমস্তই আপনা-আপনি সারিয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নূতন মালিক ভীত হইয়া অশ্বকে নানাবিধ ব্যয়সাধ্য ঔষধ খাওয়াইতে থাকেন। যথাসময়ে নূতন স্থানের নূতনত্ব সহিয়া গেলে অশ্ব আপনিই পানাহারে মন দেয় কিন্তু জয়জয়কার পড়িয়া যায় ঔষধের।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অশ্বের স্মরণশক্তির সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে—স্মরণশক্তির অভাব থাকিলে অশ্বকে পরিচালনা করা কখনও সম্ভবপর হইত না। "হাও!"—এই শব্দটি উচ্চারণ করিলেই সদ্বংশজাত সুশিক্ষিত অশ্বমাত্রেই যে স্থির হইয়া দাঁড়ায় তাহার কারণ পুরুষানুক্রমে এই শব্দটির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবারই তাহার লাগামে কঠিন হ্যাঁচ্‌কাটান পড়িয়াছে এবং প্রত্যেক বারই অন্য কোনো আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে বলিয়া এই কথাটির সহিত থামিবার স্মৃতি তাহার মনে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গেছে। "হাও" শব্দটি উচ্চারিত হইবামাত্র তাহার অচল ধারণাবিশিষ্ট মন হইতে ক্রমশঃ তাহার চলিবার চেষ্টাশক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়।

দেখা গিয়াছে দ্রুতবেগে পাহাড়ে রাস্তা বাহিয়া নীচে নামিবার সময়েও যদি এই শব্দটি ভুলক্রমে উচ্চারণ করা যায় তবে অশ্ব তৎক্ষণাৎ স্থান কাল ভুলিয়া সেখানেই স্থির হইয়া দাঁড়াইবে—ইহার জন্য যদি তাহাকে গড়াইয়া পাহাড়ের নীচে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে হয়, তাহাও স্বীকার! পূর্ব্বে সে অনেক বড় বড় বোঝাই গাড়ী টানিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত লইয়া গেছে—এই স্মৃতির জোরে সে অসম্ভবরূপ ভারি বোঝাও বুকের হাড় ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া টানিবে। তোমার দুর্ভাগ্যক্রমে একবার যদি সে বোঝা না নড়ে, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সে যে বোঝা নাড়িতে পারে নাই এ কথা সে আর জীবনে ভুলিবে না। চেষ্টা করা এবং না করা, ইহার মধ্যে চেষ্টা না করাটাই যে সুবিধাজনক এ বোধ তাহার বেশ আছে। বোঝা না টানিয়া তাহার নিস্তার নাই এবং যথেষ্ট টান দিলে বোঝা নড়ানো যাইতে পারে এ বোধ তাহার মনে আবার যতদিন না ভাল করিয়া মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইতেছে ততদিন আর সে ভাল করিয়া বোঝা কিছুতেই টানিবে না।

অশ্বকে ভাল করিয়া চালনা করিতে হইলে তাহার মানসিক ও শারীরিক শক্তির সীমা ও পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। ভাল সাপুড়িয়া বিষাক্ত গোখুরাকে বাজনার তালে তালে নাচাইতে পারে—কিন্তু স্বয়ং মনসাদেবী চেষ্টা করিলেও তাহাকে পাখীর মত পড়াইতে পারেন না। অশ্বের শক্তির সীমাকে আমাদের সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বুদ্ধিহীনতা, ভীরুতা, অক্ষমের নিকট আস্ফালনের প্রবৃত্তি, ধারণার অবিচলত্ব, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি, কথা বুঝিবার অক্ষমতা, শব্দ বুঝিবার সামর্থ্য—(বিশেষতঃ যদি সে শব্দ বাহিরের আকার ইঙ্গিতের সহিত সংযুক্ত থাকে)—তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি, প্রখরদৃষ্টি ইত্যাদিই অশ্বের বিশেষত্ব। কম বেশী পরিমাণে সকল অশ্বেরই এই লক্ষণগুলি আছে এবং অশ্বপ্রকৃতির এই দিকে একটু দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে অনেক গোলযোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

লোকশিক্ষার প্রণালী

আমাদের সকলেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে আমরা মনে করি আমরাই দেশের লোক। সংবাদপত্রে আমরা কোন একটি মন্তব্য প্রকাশ করি, এবং তাহাতে দেশের সহানুভূতি থাকুক বা না থাকুক—বলি 'ইহাই দেশের

মত'। দেশের মত অগ্রাহ্য করা অতীব অন্যায়, অথচ আমরাই এইরূপ নানা বিষয়ে দেশের লোকের মত অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের মতকে দেশের মত বলিয়া ঘোষণা করিতে লজ্জাবোধ করি না। বাস্তবিক পক্ষে, দেশের লোক কাহারা? উকীল, হাকিম, মুনসিফ, মোক্তার, ছাত্র, কেরাণী, এরা কয় জন, এরা দেশের লোক? না, দেশের লোক বলিলে বুঝিতে হইবে যাহাদিগকে আমরা রাস্তায় ঘাটে, হাটবাজারে সদা সর্ব্বদাই দেখি; রামা নাপিত, মধো ধোবা, হরে গয়লা, কেলো বাগদী, এরাই ত দেশের লোক। আমরা বক্তৃতা দিই, শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির মূল ভিত্তি, কিন্তু কই আমাদিগের দেশের শিক্ষা ত দেশের লোকের কাছেও পৌঁছায় না। আমরা ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, আবার এদেশের শিক্ষায় অসন্তুষ্ট হইয়া দেশ-বিদেশে গমন করি, আমেরিকা, জাপানে যাইয়া চাষের বিদ্যা পড়িয়া আসি এবং দেশে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খুলি, কিন্তু দেশের ইহাতে ত কিছুই আসে যায় না। রামধন চাষী ত ঠিক সেই মান্ধাতার আমলের লাঙ্গল এবং সার লইয়া চাষ করিতেছে। রামধন জমিতে কি প্রকার সার দেয়, তাহার লাঙ্গল ভাল কি মন্দ, তাহা জাপান-প্রত্যাগত চাষের বিশেষজ্ঞ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। গ্রামের ঘানি-গাছ "কোঁ" "কোঁ" শব্দে সমস্ত গ্রামকে মুখর করিয়া ঘুরিতেছে, আর তেলী সমস্ত দিনই গরু তাড়াইতেছে, কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়া তাহার কৃত আয় হয় উহাতে তাহার দুই বেলা অন্ন জুটে কি না, তাহা আমরা ত একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমাদিগের সহিত ইহাদিগের ভাবের আদান-প্রদান নাই, কোটী কোটী লোক একেবারে অশিক্ষিত, মূঢ়, মূক—অসাড়।

কিন্তু চিরকালই যে এদেশের লোকশিক্ষার অভাব ছিল এমন নহে।

"লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্ম্মের কূটতর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র করে। সেই কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে, গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দিগ্বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম্ম শিখাইলেন—লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সেদিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি,—সেদিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদীপীঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস নুদুস কালো কথক, সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া অপামরসাধারণসমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে, ধর্ম্ম নিত্য, যে, ধর্ম্ম দৈব, যে, আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে, পরের জন্য জীবন, যে, ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন, বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে, পাপপুণ্য আছে, যে, পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে, জন্ম আপনার জন্য নহে পরের জন্য, যে, অহিংসা পরমধর্ম্ম, যে, লোকহিত পরম কার্য্য। সে শিক্ষা কোথায়, সে কথক কোথায়। কথকতা লোপ পাইল। লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।"

—বঙ্কিমচন্দ্র।

আমাদিগের এমন একদিন ছিল যখন যাহার অক্ষর বোধ মাত্র হইয়াছে সেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত লইয়া সুর করিত, যে পড়িতে জানিত না সে অন্যের মুখ হইতে শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিত। প্রত্যেক সপ্তাহেই গ্রামের হরিসভার অধিবেশন হইত, যে নিরক্ষর সেও সেখানে যাইয়া প্রেমের পূর্ণমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যের জগাইমাধাই-উদ্ধারকথা অথবা নীলাচললীলা শুনিয়া চক্ষে জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিত না। সভার পর যখন কীর্ত্তন হইত, তখন ছোট বড় ধনী নির্ধন বিষয়ী উদাসীন সকলে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া হরিনাম করিত—ভক্তির অমৃতধারায় অভিষিঞ্চিত হইয়া সকলেই সানন্দচিত্তে আপনাপন গৃহে ফিরিয়া যাইত। চণ্ডীমণ্ডপে তখন প্রায়ই ভাগবতের ব্যাখ্যা হইত, ধ্রুব-প্রহ্লাদের উপাখ্যানের প্রেমরসপূর্ণ মধুর ভাবগুলি শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। শান্তিময় জীবনে যখন মৃত্যু এবং বিষাদের বিভীষিকা আসিয়া উপস্থিত হইত, সেই ঘোর দুর্দ্দিনে তাহারা বিপদে আপদে নিত্য ত্রাণকর্ত্রী সর্ব্বদুঃখহরা চণ্ডীর শরণ লইত। ভক্ত কালকেতু বিপদে পড়িয়া বনে মাকে ডাকিয়াছিল, মা অমনি তাহাকে অভয়দান করিলেন; শ্রীমন্ত মশানে কাতরভাবে মাকে ডাকিয়াছিল, মা কমলেকামিনী তাহাকে কোল দিলেন :—এই সব আগ্রহের সহিত তাহারা শুনিত,

শুনিয়া তাহারাও মাকে ডাকিতে শিখিত। তখন সব দুঃখ সব শোকবিপদ কোথায় চলিয়া যাইত। তখন বাংলার গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে মৃদঙ্গ মন্দিরার সহিত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যের লীলা গীত হইত, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস যদুনন্দন প্রভৃতি ভক্ত কবির সুমধুর পদলহরী ভাবুকের হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ উপস্থিত করিত, চাষী চাষ করিতে করিতে বাস্তব জীবন ভুলিয়া যাইত, ভাবের রাজ্যে আসিয়া রামপ্রসাদী গান ধরিত, "মন-তুমি কৃষি কাজ জান না, এমন মানব জনম রইল পড়ে আবাদ করলে ফলতো সোনা।" রামপ্রসাদের পদাবলী এবং রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল এক অপূর্ব্ব ভাবময় জীবনের সৃষ্টি করিত। তাহার পর আমাদিগের হরগৌরী এবং রামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গান ও ছড়াগুলি,—ইহারাই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ, ইহারাই লোকশিক্ষার শ্রেষ্ঠ আকর, সমাজের নিম্নতম স্তরের মধ্যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে।

হরগৌরীর কথা প্রত্যেক বাঙালী পরিবারের একটি দুঃসহ বেদনার কথা। এ দেশে কয়জন পরিবার কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিয়া অসুখী না হইয়াছেন? আবার কন্যার বিবাহ দিলে তাহার সহিত হয়ত চিরদিনের বিদায়—সেই জন্য কত অনুতাপ, কত অশ্রুপাত! প্রতি বৎসর শরৎকালে যখন "মাঠে মাঠে ধান ধরেনাক আর", বাংলামায়ের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, প্রাতঃসমীরণ যখন শিশিরসিক্ত হইয়া হৃদয়কে শুভ্র মেঘের মতন কোন স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যায়, বাংলামায়ের স্বপ্নের ধন মা আনন্দময়ী সেই সময়ে—শরতের সপ্তমীর দিনে মাতৃগৃহে আসেন। তখন আগমনী গানে বাংলাদেশের সুনীল আকাশ মুখরিত হইয়া উঠে, এক অপূর্ব্ব আনন্দের স্রোতে সমস্ত বাংলাদেশ ভাসিয়া যায়। কিন্তু দুর্গোৎসবের মিলনান্দ কেবল চার-দিনের মাত্র। বিজয়া দশমীর দিনে ভিখারিণী মায়ের অন্নপূর্ণা কন্যা স্বামীগৃহে ফিরিয়া যান, শরতের শেফালীর মত ক্ষণিকের আনন্দ অচিরেই ঝরিয়া যায়, তখন জলে স্থলে আকাশে একটি দুঃসহ বেদনার সুর বাজিয়া উঠে, বাঙালী পরিবারের চোখ জলে ভরিয়া যায়—এ বিচ্ছেদ-বেদনা সমস্ত বৎসরেও আর ভুলিতে পারে না। হরগৌরীর গান-গুলি এই বেদনাকে ফুটাইয়া দিয়া বাংলার পল্লীসমাজের নিকট দুইটি খুব উন্নত আদর্শ উপস্থিত করিয়াছে।

ভারতবর্ষের কবিগণ চিরকালই বৈরাগ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া দারিদ্র্যের গৌরব দৃঢ় করিয়াছেন। হিন্দুর প্রাচীন সন্ন্যাস সেদিনও যে তরুণ মনীষীর মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল সেই স্বামী বিবেকানন্দও পাশ্চাত্য সভ্যতার বুকের উপর দাঁড়াইয়া সদর্পে বলিয়াছেন যে জগতে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে দারিদ্র্যের অর্থ পাপ বা কলঙ্ক নহে। বাংলামায়ের জামাতা মহাদেব দরিদ্র, তিনি শ্মশানচারী। কিন্তু বাঙালী কবিরা দেখাইয়াছেন যে দারিদ্র্যই তাঁহার ভূষণ, তিনি ভিখারী কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহার পূজা করেন, কুবের তাঁহার ভাণ্ডারী, গৃহিণী তাঁহার অন্নপূর্ণা, তিনি মহাদেব, তিনি শিব শঙ্কর। দরিদ্রসমাজের নিকট এমন একটি উচ্চ আদর্শ, সংসারের ভাবের সহিত উচ্চ ধর্ম্মভাবের এমন মধুর সমন্বয় জগতে আর কোনখানে দেখা যায় না। আবার ভূতনাথ যখন তাঁহার অনুচরবর্গ লইয়া বিবাহ করিতে আসিলেন, সকলে দেখিল, তাঁহার রূপ নাই, যৌবন নাই, অঙ্গে ভূষণ নাই; সকলেই নিন্দা করিল, মেনকাও জামাতাকে দেখিয়া আক্ষেপ করিলেন—

> "মর মর হেমন্ত তোমারে কব কি।
> এ বুড়া পাগল বরে দিলা হেন ঝি॥
> কহিলেন নন্দী শুন দেব শূলপাণি।
> মদনমোহনরূপ ধরুন আপনি॥
> এতেক নন্দীর বাক্য শুনি ত্রিলোচন।
> দেখিতে দেখিতে হৈল ভুবনমোহন॥"—(কবিকঙ্কণ)।

নন্দীর বাক্যে নহে, উমার আন্তরিক প্রীতিভক্তিতেই ভিখারী উমানাথ ধনরত্নশালী ভুবনমোহন হইয়া উঠিলেন।

স্ত্রীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আর নাই। ইহাই বাংলার পল্লীতে পল্লীতে গ্রামের ভিক্ষুক দ্বারে দ্বারে যাইয়া শিখাইয়া বেড়াইত। অতিথিসেবা, ভিক্ষুককে ভিক্ষা-দান, তখন আমাদিগের একটি অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল, ভিক্ষুককে এক মুষ্টি অন্ন দিয়া আমরা তাহার নিকট হইতে যাহা চিরকালের জিনিষ, মনের অন্ন, লাভ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতাম।

হরগৌরীর গান বাংলার গৃহে গৃহে চরিত্রগঠনের যে এক অপরূপ সম্পদ ছিল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলি

সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না সত্য। ইহাদিগের মধ্যে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব আছে তাহা সাধারণে বুঝিতে পারে না, কিন্তু বৈরাগী যখন "হরেকৃষ্ণ" বলিয়া দ্বারে উপস্থিত হইয়া গান গাহিত, তখন সে বাঙালীর চিত্তকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও ভাবের রাজত্বে লইয়া যাইত, বৃন্দাবনের সেই শ্রীদাম সুদাম সুবল কানাইয়ের রাজ্য, সংসার হইতে অনেক দূরে, এখানে শোক-দুঃখ পরিতাপ-অনুতাপ প্রবেশ করিতে পারে নাই,—এখানে শুধু অনাবিল প্রেম ও ভাবের স্রোতে সমস্ত আগমনী-বিজয়া গানের বিক্ষেপ ভাসিয়া গিয়াছে। এইরূপে কত শতাব্দী ধরিয়া, বৈরাগী ভিক্ষুক বাংলার দ্বারে দ্বারে যাইয়া একটি অপরূপ সৌন্দর্য্যময় ভাব-জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সৌন্দর্য্যরস গভীর এবং অক্ষয়, অথচ সমাজের নিম্নতম স্তরেরও উপভোগ্য।

শিক্ষার জন্য মানুষের কেবল মাত্র ভাবের গভীরতাই প্রয়োজন তাহা নহে। মানুষ অবকাশ চাহে, অবসর সময়ে সে হাস্যরসাত্মক, কৌতুকোদ্দীপক গানে আনন্দ অনুভব করে। শিক্ষাবিধানের জন্য এই কারণে দাশুরায়ের পাঁচালীর মত লঘু কবিতাও আবশ্যক। দাশুরায়ের গানগুলি এমন রহস্যোদ্দীপক এবং ইহাদিগের ভাষা এত সরল যে জনসাধারণেও ইহাদিগের রস সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে এমন লোক খুব কম ছিল যে দাশুরায়ের পাঁচালীর দুই একটি গান গাহিতে না পারিত। পাঁচালীর মত, যাত্রা এবং কবির গানও সাধারণের বোধগম্য এবং মনোরঞ্জক,—এগুলিও বাংলাদেশে জনসাধারণের শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।

বাস্তবিক পক্ষে আমাদিগের দেশে লোকশিক্ষার যে বিরাট আয়োজন ছিল ইহার তুলনা অন্য কোথাও আর পাওয়া যায় না। আনন্দের ভিতর দিয়া শিক্ষা, প্রেয় এবং শ্রেয়ের এমন মধুর সমন্বয় অন্য কোন দেশ ভাবিতে পারে নাই। আমাদিগের দরিদ্র দেশের কৃষককে সমস্ত দিনই ক্ষেতে থাকিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়,—প্রত্যূষে সে গৃহ হইতে চলিয়া যায়, মধ্যাহ্নে গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় পায় না, মাঠেই সামান্য অন্নব্যঞ্জনে উদর পূর্ণ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করে, তবেই তাহার অন্নসংস্থান হয়। কৃষক-বালকেরাও গৃহে থাকে না, তাহারা ক্ষেতে যাইয়া পিতার কার্য্যে সহায়তা করে অথবা মাঠে মাঠে যাইয়া সমস্ত দিনই গরু চরায়। সন্ধ্যার পর কৃষক ক্লান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে, এবং আঙিনায় আসিয়া বিশ্রাম করে। এই সময়েই তাহার দিনের মধ্যে যাহা কিছু অবসর, তাহার শিক্ষার একমাত্র অবকাশ—এই সময়ে কৃষক তাহার ক্লান্ত হৃদয়কে উৎফুল্ল করিয়া দেয়, যাত্রা এবং কবির দল এই সুযোগ পাইয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী হয়। আমাদিগের দেশে লোকশিক্ষা চিরকাল এই সময়েই হইত—দরিদ্র শ্রমজীবিগণের পক্ষে ইহাই শিক্ষার একমাত্র সময়।

কিন্তু লোকশিক্ষা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। লোকশিক্ষার এই অবনতির জন্য আমাদিগের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই অধিক দায়ী। আজকাল যাহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তাহারা রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলির আদর করে না,—একটা ঝোঁকের মাথায় তাহারা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাদিগের যাহা অন্তরের সামগ্রী যাহা নানারকমে, গানে, কাব্যে, সাহিত্যে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে দেশের কবিগণ তাহাদিগকে দেখাইতেছিলেন তাহা না খুঁজিয়া, দেশের চিন্তা ও আদর্শের মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া তাহারা কোন অচেনা দিকে ক্রমশঃ দূরেই যাইতেছে। যাঁহারা তাহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা আপন, রাম, সীতা, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, শ্রীমন্ত, কালকেতু, চৈতন্য, নিত্যানন্দ তাঁহারাই তাহাদিগের কাছে অপরিচিত হইয়া উঠিতেছেন। কথকেরা ইহাঁদিগের পরিচয় দিতে আসেন, কিন্তু তাহারা এখন উন্মত্ত, কথকের কথা শুনিতে চাহে না। উৎসাহের অভাবে কথকের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। আমাদিগের দেশে যেমন কথকতা লোপ পাইতেছে ডেনমার্কে ইহার ঠিক বিপরীত দেখা যায়। সেখানে আজকাল কথকতার দ্বারা একটি বিপুল আন্দোলন সাধিত হইতেছে। বহুকাল পূর্ব্বে ক্রিষ্টেন কল্‌ভ নামক একজন মহানুভব ব্যক্তি তাঁহার বিদ্যালয়ে কৃষকদিগকে মুখে মুখে কথাচ্ছলে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার আদর্শে অনেকগুলি কৃষিবিদ্যালয় ঐদেশে স্থাপিত হইল। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আমাদিগের দেশের কথকের মত বই কাগজ ইত্যাদির সাহায্য না লইয়া নানা বিষয় সম্বন্ধে

বক্তৃতা দেয়, ছাত্রেরা কেবল শুনিয়া যায় এবং মাঝে মাঝে ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবি দেখে। এইরূপে মুখে মুখেই তাহারা ইতিহাস, ভূগোল, ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। এই শিক্ষাপ্রণালাই ডেনমার্কের আধুনিক কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির একমাত্র কারণ। ইউরোপ, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে কথকতাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সমাজের কল্যাণসাধনের একটি বিরাট আয়োজনের সূচনা হইয়াছে।—আমরা কিন্তু এমন একটি অনুষ্ঠান যাহা কত শতাব্দী ধরিয়া আমাদিগের পল্লীসমাজে প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছে হেলায় হারাইতেছি!

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সেকালে, ৮০,৯০ বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ লোকে কিরূপে দৈনিক জীবন যাপন করিতেন তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

"জীবনোপায়ের সুলভতা প্রযুক্ত তাঁহারা দলাদলি, ক্রীড়া কৌতুক ও কথকতা শ্রবণে কালযাপন করিতেন। কথকতা অতি শ্রবণযোগ্য ব্যাপার। ভাল ভাল কথকের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখা গিয়াছে। বড় বড় তাঁতকাটা এজুকে (educated) রামধন ও শ্রীধর কথকের কথা শুনিয়া অশ্রুপাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছে। ইউরোপে স্কুলে বাগ্মিতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদিগের মধ্যে পূর্ব্বে কথকতা শিখিলেই বাগ্মিতা শিখা হইত। কথকতা প্রকৃত বাগ্মিতার কার্য্য। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কথকতার ক্রমে লোপ হইতেছে। কথকতার রীতি স্থিরতর থাকিয়া তাহার বিষয় ও প্রণালীতে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।"

বেশী নহে, ৮০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা মনে করিলে আমরা আমাদিগের দেশে আধুনিক লোকশিক্ষার অবনতির পরিমাণ অনেকটা বুঝিতে পারি। রামপ্রসাদের সরল গানগুলি সে সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে গীত হইত, নিধু বাবু, রাম বসু, কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং রাজা রামকৃষ্ণের শ্যামা বিষয়ক গানগুলি পল্লীসমাজে তখন যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। কবি, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি তখনকার প্রধান আমোদ ছিল, তাহার মধ্যে কবি প্রধান। কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালার নাম শুনিলে আমরা তখনকার শিক্ষার বিস্তৃতির বিশেষ পরিচয় পাই। কৃষ্ণকর্ম্মকার, পরাণ দাস, উদয় দাস, নীলু পাটুনী, ভোলা ময়রা, চিন্তা ময়রা প্রভৃতি আসরে বসিয়া সমাজের গণ্যমান্য লোকদিগের নিকট হইতেও সম্মান পাইতেন। কবিগানে পৌরাণিক পাণ্ডিত্য যথেষ্ট দেখান হইত, এইজন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও আগ্রহের সহিত ইহাদিগের গান শুনিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় নিতে বৈষ্ণব কবিওয়ালা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"ধনী লোক মাত্রেই কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রে নিতাই দাসকে বায়না দিতেন; ইঁহার সহিত ভবানী বেনের সঙ্গীতযুদ্ধ ভাল হইত। যথা—প্রচলিত কথা—'নিতে বৈষ্ণবের লড়াই'। এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল নিতে ভবানের লড়াই শুনিতে আসিত। নিত্যানন্দের গোঁড়া কত লোক ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাশডাঙ্গা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতাইয়ের নামে ও ভাবে গদগদ হইতেন।...নিতাইয়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল যে ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।"

কবিওয়ালারা কেবল আমোদজনক কবিতা গান করিতেন এমন নহে, কবি গাহিবার সময় পরমার্থভাব-পূরিত সঙ্গীতও গাহিতেন গুরু ঠাকুরের রচিত এইরূপ একটি গান আছে,—

হরিনাম লইতে অলস করো না রসনা, যা হবার তাই হবে।
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে বলে কি ঢেউ দেখে না ডুবাবে॥

অনেকেই মুগ্ধ হইয়া আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্রস্থল কলিকাতার ভিক্ষুকের মুখে সন্ধ্যার সময়ে এই সুন্দর গানটি শুনিয়া থাকিবেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"কি মনোহর কি মনোহর, শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন মাত্রেই অশ্রু পতন ও রোমাঞ্চ হইতে থাকে। অতি মূঢ় ও পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় আর্দ্র হয়। যেখানে যে বাঙ্গালী মহাশয় বিরাজ করিতেছেন, তিনি সেইখানেই বিশেষ বিবেকের অবস্থায় ঐ নাম সঙ্কীর্ত্তন কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কি ইতর, কি ভদ্র তাবতেই এতৎগানে প্রেমিক হইয়া থাকেন।"

এইরূপে দেশের জনসাধারণও এই সকল গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িত। কবিওয়ালাদিগের গানের মত জগা সেকরা ও তৎপুত্র রাজনারায়ণ এবং সোনা ঢুলের রামপ্রসাদী ও কমলাকান্তী সম্বলিত চণ্ডী গান দেশের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ ধর্ম্মভাব বহুলপরিমাণে প্রচার করিত।

তাহার পর আমাদিগের যাত্রার দল। যাত্রার দলওয়ালারাও তখনকার বিশেষ প্রতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। চণ্ডীযাত্রা এবং কৃষ্ণযাত্রার দ্বারা এই সময়ে দেশে যথেষ্ট ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হইত। রামমঙ্গল গানে, হরি নাম এবং গৌর নিত্যানন্দ নাম কীর্ত্তনেও সকলেরই হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের উদয় হইত। বাংলার পল্লীসমাজ এইরূপে অনেক দিন চলিয়াছিল, কিন্তু এখন ইহার কি পরিবর্ত্তন!

যাত্রা এবং কবির দলের সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে গোপাল উড়ের অথবা কৈলাস বারুইয়ের বিদ্যাসুন্দর এবং বদন অধিকারীর কালীয়দমন, এন্‌টুনী ফিরিঙ্গী এবং হরু ঠাকুরের কবিগান লোকে কিরূপ উৎসাহ এবং আনন্দের সহিত শুনিত তাহা এখনকার শিক্ষিতসম্প্রদায় ভাবিতেই পারে না। শিক্ষিত লোকদিগের রুচি এবং প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হওয়াতে যাত্রার আদর কমিয়া গিয়াছে, গোবিন্দ অধিকারী, মতিরায় অথবা নীলকণ্ঠের যাত্রার দল অপেক্ষা লোকের থিয়েটারের উপর বেশী ঝোঁক পড়িয়াছে। শ্রোতা এবং অভিনেতাদিগের অধিকাংশই অশিক্ষিত লোক বলিয়া যাত্রা এবং কবিরদলের গানগুলিতে ভাষা এবং ভাবের ইতরতা দেখা গিয়াছে। বাংলাদেশে ত অনেক নাটককার আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন যদি যাত্রার পালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া জনসাধারণের সহিত একত্রে শ্রোতা হন, তাহা হইলে অচিরকালেই যাত্রাগুলি হইতে রূঢ়তা এবং অশ্লীলতার দোষ দূর হইবে, সাধারণের মধ্যেও রুচির উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তখন ইহারা সমাজে আমাদিগের দেশের চিরন্তন আদর্শগুলি প্রতিষ্ঠা করিবার উপযোগী হইবে। যে থিয়েটারের মোহে আমরা এখন মাতিয়া উঠিয়াছি, তাহাই বা কোন এমন ভদ্র, ভব্য এবং সুরুচিসম্পন্ন? কিন্তু সে কথা এখন শুনে কে? এ সময় জাতীয় জীবনের খুব অবনতির দিন। আমরা যাহারা শিক্ষিত বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিই, আমরা নিজেরাই এই আদর্শগুলি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, যাঁহারা এগুলি অন্বেষণ করিয়া আমাদিগের নিজস্ব করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আমরা আপনাদের লোক বলিয়া চিনিতে পারিতেছি না, মায়ামন্ত্রে বশীভূত হইয়া কোন আলেয়ার পানে লুব্ধ হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছি, আমাদিগের যাহা আন্তরিক যাহা স্বাভাবিক তাহা ফেলিয়া যাহা বাহিরের যাহা কৃত্রিম তাহাই লইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।

হে বাংলার চিন্তাজীবনের অধিষ্ঠাত্রি দেবি! কোন অতীত কালের মধ্যাহ্নে তমসানদীর তীরে মহাকবির কণ্ঠ দিয়া তুমি যে গীত উচ্চারণ করিয়াছিলে, তাহার সুর, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল, আরো ত গভীর হইয়া উঠিতেছিল, এ সুরে বাংলাদেশের মানসপ্রকৃতিতে কত অভিনব পুষ্প পুলকে ফুটিয়া উঠিতেছিল, কত পাষাণহৃদয় গলিয়া গিয়া প্রেমের নদীতে পরিণত হইয়াছিল, সে সুর আজ হঠাৎ ম্রিয়মাণ হইতেছে কেন? জাগাও দেবি! জাগাও আবার সেই সম্মোহন সুর, যে সুরে নারদ শুক্লরজনীর শুভ্র চন্দ্রালোকে হরিনাম গান করিয়া ধ্রুব প্রহ্লাদকে মাতাইয়াছিলেন, স্বয়ং ব্রহ্মাকে মুগ্ধ করিয়া মর্ত্তে পতিতপাবনী ভাগীরথীকে আনয়ন করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জে মুরলীরবে বাজিয়া উঠিয়া যে সুর যমুনার প্রবাহ রোধ করিয়াছিল, ভাগীরথীতটে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর কণ্ঠে মুরজমন্দ্রে উত্থিত হইয়া জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিল, কত ভক্ত কত কবি মহাপাপীরও কণ্ঠে হরিনাম গান ধ্বনিত হইয়া সমস্ত বাংলাদেশকে ভক্তির প্লাবনে প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। শিখাও দেবি এতদিন যেমন কৃত্তিবাস কাশীরামদাসের কণ্ঠ দিয়া শেখাইতেছিলে তেমনি বাঙ্গালার প্রত্যেক পরিবারকে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া আবার শিখাও সেই উন্নত এবং পবিত্র গৃহধর্ম্ম যাহার জন্য রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজত্ব ছাড়িয়াছিলেন, লক্ষ্মণ ভ্রাতার জন্য সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সীতা পতির কল্যাণের জন্য চির-জীবনই দুঃখে কাটাইয়াছিলেন। হে দেবী! বাংলার নারী-গণকে তুমি কত শতাব্দী ধরিয়া সীতা সাবিত্রী দ্রৌপদী দম-য়ন্তীর পাতিব্রত্যের কথা শুনাইতেছিলে বলিয়া বাঙালীর ঘরের কন্যা বেহুলা সতীস্ত্রীর স্বর্গীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া জগতের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছেন,—স্ত্রীশিক্ষার এমন আদর্শ এবং শিক্ষার এমন ফলের তুলনা জগতে আর নাই! তোমারই ত ধ্রুব প্রহ্লাদ বাঙালীর ঘরে ঘরে ভক্ত কালকেতু ও শ্রীমন্তের চরিত্রগঠন করিয়াছে, নিমাইকে সন্ন্যাসী ও রামপ্রসাদকে সাধকের মধ্যে অগ্রণী করিয়াছে। হে দেবী! তুমি ত ভারতবাসীকে সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের উপাসনা করিতে শিখাইয়াছিলে। ভারতবাসী কখনও ত ধনীর নিকট কিছু শিখে নাই, ভারতবাসী যাহা শিখিয়াছে তাহা কাঙাল ভিখারীর কাছে,—একদিন রাজপুত্রের কাছে শিক্ষা

গ্রহণ করিয়াছিল যখন তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। ওগো বাংলার ভিক্ষুক ভিক্ষুণী! তোমরাও ত বাংলার পল্লীসমাজকে চিরকালই শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলে, তোমরা আবার তোমাদিগের ভিক্ষার ঝুলি লইয়া অন্তঃপুরের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াও, দরিদ্র বাঙালীর ঘরে দাশুরায়ের "ঠাকরুণবিষয়" গাহিয়া শিখাও, যে, দারিদ্র্যে লজ্জা নাই, উমানাথের যে দারিদ্র্য তাহা ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা লক্ষগুণে মহৎ। বাংলার ঘরের গৃহকর্ত্রী এবং অবগুণ্ঠিতা বধূগণ তোমার গান শুনুক এবং এক মুষ্টি ভিক্ষার বদলে তাহারা আমাদিগের সেই চিরন্তন দৃঢ় বৈরাগ্যের আদর্শ ঘরে ঘরে ফিরিয়া আসুক। হে বৈষ্ণবীগণ! তোমরাও "জয় রাধে" বলিয়া "সখী-সংবাদ" গাও, দুঃখী বাঙালীর চিত্তে একটি সুন্দর পবিত্র এবং আনন্দের ছবি আঁকিয়া দিয়া তোমরাও তোমাদিগের বৃত্তি সার্থক কর। আমরা যেন তোমাদিগের নিকট হইতে আমাদিগের যাহা চিরন্তনকালের আদর্শ তাহা পুনরায় ফিরিয়া পাই। হে দেবী! তোমার সেই অতীতের অমোঘ বাণী আবার ধ্বনিয়া উঠিয়া আমাদিগের যাহা চিরদিনের জিনিষ, আধুনিক সভ্যতা যাহাকে কৃত্রিম আবরণের মধ্যে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিক্। আমরা তোমার অবোধ সন্তান, আপনাদিগের চিরদিনের জিনিষটি হারাইয়া কৃত্রিম জিনিষ লইয়া অনায়াসে ভুলিয়া আছি, তুমি আমাদিগকে জ্ঞান দাও, আমরা যেন দেশের চিন্তাকে ফিরিয়া পাই, দেশের মৃতশিক্ষাকে প্রাণ দিয়া ইহার আদর্শগুলি সমাজে আবার প্রতিষ্ঠা করিতে পারি।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

নবীন সন্ন্যাসী

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শত্রুদমন।

প্রভাতে উঠিয়া গদাইপাল হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া একখানি তসরের ধূতি পরিধান করিল। খড়ম পায়ে দিয়া, সাজি হস্তে বাগানে পূজার্থ পুষ্পচয়ন করিতে বাহির হইল।

অগ্রহায়ণের প্রারম্ভ। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। কোঁচাটি খুলিয়া গদাই গায়ে জড়াইল। গাছের পাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে। ফুলে ফুলে বুকভরা শিশির। একটি একটি গাছের ডাল ধরিয়া, বেশ করিয়া নাড়া দিয়া ফুল হইতে শিশির ঝাড়িয়া গদাই চয়ন করিতে লাগিল। শ্বেত ও রক্ত করবী, কৃষ্ণকলি, টগর, জবা প্রভৃতি নানা ফুলে গদাধরের সাজি ভরিয়া উঠিল। ফুল তুলিতে তুলিতে গদাই মাঝে মাঝে সতৃষ্ণ নয়নে পথের পানে চাহিতেছে। বৃক্ষ লতা গুল্মে গ্রামপথ সমাকীর্ণ, অধিক দূর দৃষ্টি চলে না। তথাপি গদাই বারম্বার পথপানে চাহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে, গাছপালার অন্তরাল হইতে কাহার যেন আর্ত্তনাদ শ্রুতি-গোচর হইল। গদাই উৎকর্ণ হইয়া রহিল। শব্দটা কাছে আসিলে বুঝা গেল, কে যেন বলিতেছে—"ওরে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে রে!—আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে রে!"—শুনিয়া গদাধরের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

শব্দ ক্রমে নিকটতর হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া আশপাশের গৃহস্থগণ ঔৎসুক্যবশে বাহির হইয়া আসিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, বাঁশ ঝাড়ের আড়াল হইতে কেনারাম গোপ বাহির হইল। সে বুক চাপড়াইতেছে ও বলিতেছে—"সর্ব্বস্ব গেল রে—সর্ব্বস্ব গেল।"—তাহার সঙ্গে সঙ্গে একপাল ছেলে—দুই চারিজন বয়স্ক লোকও আছে।

গদাইপালকে দেখিবামাত্র কেনারাম বলিতে লাগিল—"ওগো নায়েবমশাই গো, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে গো!"

গদাই সাজি হস্তে দ্রুতপদে বাগানের প্রান্তদেশে অগ্রসর হইয়া বলিল—"কেন ঘোষের পো?—কি হয়েছে?"

"সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। আমার সর্ব্বস্বটা নিয়ে গেছে গো, সর্ব্বস্বটা নিয়ে গেছে নায়েব মশাই।"

"কে নিয়ে গেছে?"

"চোর গো নায়েব মশাই।"

"চুরি হয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি করে চুরি হল রে?"

"আজ্ঞে আমার বাড়ীর পিছনে, বক্সীদের আমবাগান আছে, সেই আমবাগানে বসে আমার বড়ঘরে সিঁদ কেটেছে।"

সমবেত অনেকে বলিয়া উঠিল—"অ্যাঁ! সিঁদ কেটেছে?"

"বল্লে না পিত্যয় যাবে মশাই, পেল্লায় এতখানি সিঁধ।"

গদাই বলিল—"তোরা কোন ঘরে ছিলি?"

"আমি আর আমার ইস্তিরী সেই ঘরেই শুয়েছিলাম নায়েব মশাই। আমার ছেলে দুটো আমার ভাইবউয়ের কাছে ছোট ঘরে শুয়েছিল।"

গদাই দুই মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল—"ঘরে সিঁধ কাটলে, চুরি করলে, ঘুম ভাঙ্গল না?"

"কিছু জানতে পারিনি নায়েব মশাই—কিছু জান্‌তে পারিনি। সকাল হলে ঘুম ভেঙ্গে দেখি, সিঁধের পথে ঘরে আলো আসছে। দেখেই আমার প্রাণটা চমকে উঠল। গা ঠেলে আমার ইস্তিরীকে বল্লাম—খোকার মা, ও খোকার মা, উঠে দেখ দেখি দেওয়ালে ফুটো হল কেন?—আমার ইস্তিরী উঠে, সিঁধ দেখে, বুক চাপড়াতে লাগলো। তারপর দুয়োর খুলে দেখলাম, ঘরে থালা ঘটি বাসন যা ছিল সব নিয়ে গেছে। বেতের ঝাঁপিতে বারো আনা পয়সা ছিল, ছোট বউয়ের হাতের একযোড়া পৈঁচে ছিল, খোকার কোমরের পাটা ছিল, সব নিয়ে গেছে নায়েব মশাই সব নিয়ে গেছে। আমায় ফকির করে গেছে গো—হো হো হো।"—বলিয়া কেনারাম কাঁদিতে লাগিল।

উপস্থিত সকলেই কেনারামের দুঃখে বিগলিত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। গদাই বলিল—"যা, এখনি থানায় গিয়ে এজেহার লিখিয়ে দিয়ে আয়।"

কেনারাম বলিল—"এজেহার লেখালে আমার জিনিষগুলি পাব নায়েব মশাই?"

"তা এখন কি করে বলব? পুলিসের লোকেরা যদি চোর ধরতে পারে, মাল আস্কারা করতে পারে, তবে অবিশ্যি পাবি। যে ঘরে চুরি হয়েছে সেখানে যা যেমন আছে তেমনি রেখে থানায় যা। একটি জিনিষ এদিক ওদিক না হয়। দারোগা এসে সব দেখবে। চল বরং আমি এইবেলা সরে জমিনে গিয়ে দেখে আসি। কি জানি যদি সাক্ষীই দিতে হয়। চলহে—তোমরাও সব চল।"

ইহা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ ত্রস্তভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ভাবিল, দেখিতে গিয়া শেষে কি ফৌজদারী মোকর্দ্দমার সাক্ষীর ফেসাদে পড়িয়া যাইতে হইবে!—তাই কেহ বলিল—"আপনি এগুন নায়েব মশাই—আমি মুখ হাত ধুয়েই আসছি।"—কেহ বলিল—"ছেলেটার বড় জ্বর, একবার বদ্যিবাড়ী যেতে হবে।"—কেহ বা বলিল—"আমার এখনও গাই দোওয়া হয়নি, গাই দুয়েই আসছি।"—এইরূপ নানাপ্রকার অছিলা করিয়া সকলে সরিয়া পড়িল।

সমস্ত পথ গদাই নীরব গম্ভীরমুখে কেনারামের সঙ্গে সঙ্গে গেল। অঙ্গনে প্রবেশ করিবামাত্র একমুখ হাসিয়া কেনারামের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"সাবাস কেনারাম, সাবাস ভাই। আজ তুই যা নকল করেছিস, একবারে আসল বীররস,—কলকাতায় থিয়েটারে গিয়ে যদি একটোরো চাকবি নিস ত তোর এখনি ত্রিশটাকা মাইনে হয়।"

কেনারাম হাস্যমুখে বলিল—"সে কি নায়েব মশাই?—ছিয়াচার কি?"

"থিয়েটার জানিস নে?—এই যাত্রা শুনেছিস ত? কলকাতায় আজকাল সেই রকম থিয়েটার হয়েছে। বিলিতী যাত্রা আর কি! সেখানে যত সব একটোরো আছে—যে যত বেশী চেঁচাতে পারে তার তত কদর। একটোরো সেজে বীররসের সং দেয়।"

বলিতে বলিতে উভয়ে বড়ঘরের বারান্দায় আসিয়া উঠিল। গদাই পালকে দেখিয়া গঙ্গামণি ঘোমটা দিয়া গোহাল ঘরে ঢুকিয়া পড়িল; বড়বউ আধঘোমটা দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সিঁধ দেখিয়া গদাই বলিয়া উঠিল—"এই বুঝি তোর বুদ্ধি!—ভাগিস আমি এসেছিলাম—নইলে এখনি ত মোকর্দ্দমা ফেঁসে যেত!"

কেনারাম ভীত হইয়া বলিল—"কেন নায়েব মশাই?"

"কেন নায়েব মশাই! ওরে গন্ধব—চোর বাইরে বসে সিঁদ কাটলে, আর মাটী সব তোর ঘরের মেঝেতে এসে জমলো কি করে? এ যে দেখবে সেই বলবে ঘরের মধ্যে বসে সিঁধ কাটা হয়েছে। সরা সরা—মাটী সরা এই বেলা। পায়ে করে ঠেলে ঠেলে সিঁধের পথে মাটী গুনো বাইরে ফেল।"

কেনারাম তাহাই করিতে লাগিল। শেষ হইলে গদাই বলিল—"আমি কাছারি চল্লাম। তুই শাগ্‌গীর জল খেয়ে নে, নিয়ে কাছারিতে আয়। একজন কাউকে সঙ্গে দিয়ে তোকে থানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

যথাসময়ে কেনারাম থানায় গিয়া এজেহার করিল। পাছে কেনারাম সব কথা গুছাইয়া বলিতে না পারে, বাসন মেরামতের চিহ্ন, মেরামতকারী কাঁসারির নাম ইত্যাদি বলিতে ভুলিয়া যায়, তাই এজেহারের একটা মুসবিদা গদাই পাল স্বয়ং লিখিয়া কেনারামের হাতে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

এজেহার লইয়া দারোগা প্রথম তিন চারিদিন এলাকার সমস্ত কারামুক্ত দাগী চোরের বাড়ী খানাতল্লাসী করিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না।

চতুর্থ দিনে গদাই হুকুমনামা দেখাইয়া, সদর কাছারি হইতে ১০০০৲ টাকা লইয়া আসিল। থানায় গিয়া দারোগাকে ২০০৲ দিয়া বলিল—"হুজুরের পান খাবার জন্যে এই ২০০৲ এনেছি। বাবু মশায় এ মোকর্দ্দমার জন্যে ৪০০৲ ছ্যাঁকসেন করেছেন। ১০০৲ সেদিন দাখিল করেছিলাম, এই ২০০৲ নিয়ে ৩০০৲ হল, বাবু বলেছেন, আসামীর যে দিন জেলের হুকুম হবে সেই দিন বাকী ১০০৲ দেবেন।"

দারোগা টাকা লইয়া বলিল—"মোটে ৪০০৲। তোমার বাবু ত বড় কৃপণ হে! ৫০০৲ পূরাপূরি দেওয়াতে পারলে না?"

"আজ্ঞে অনেক চেষ্টা করেছিলাম। বাবু বলেন, দারোগা সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বোলো যে একদিনের ত কারবার নয়, তাঁর সঙ্গে যখন হিদ্যতা হল, পাচবার পাঁচটা কাজ নিতে হবে। প্রথম কাজটা কেমন হয় দেখাই যাক।"

দারোগা কমিসনের ৩০৲ গদাই পালকে গণিয়া দিয়া বলিল—"আচ্ছা বেশ—বাবু দেখুন আমার কি রকম হাত সাফাই। কিন্তু খুসী করতে পারলে শুধু ১০০৲ টাকায় হবে না। বাবুকে গিয়ে বোলো।"

"বলব বৈকি। আমি কি বলতে কসুর করি দারোগা সাহেব? অবিশ্যি বলব। বাসনগুলো এখন কি উপায়ে—"

কথা শেষ হইতে না দিয়া দারোগা বলিয়া উঠিল—"দারোগার আবার উপায়ের ভাবনা? আজ রাতেই বাসনগুলো রমণ ঘোষের বাড়ীতে পৌঁছে যাবে। আমার পাল্লায় কত চোর বদমায়েস আছে জান?—তাদের দুজনকে ঠিক করে রেখেছি। তারা গিয়ে রমণ ঘোষের বাড়ী দেখেও এসেছে। তার গোয়ালের পিছনদিকটার পাঁচিল খানিক ভাঙ্গা আছে। সেইখান দিয়ে ঢুকে, খড়ের পাঁজার ভিতরে বাসনগুলো লুকিয়ে রেখে আসবে। কাল বেলা ৮টার সময় আমি গিয়ে, খানাতল্লাসী করে সে বাসন বের করে ফেলব। তারপর, ঘোষের পোর দুই হাত পিঠের দিকে টেনে বেঁধে, রুলের গুঁতো মারতে মারতে থানায় নিয়ে আসব। তারপর ৪১১ ধারায় চালান। একটি বছর ত বটেই—বেশী যা হয়।"

রমণ ঘোষের বন্ধনদশার ছবিখানি কল্পনানেত্রে অবলোকন করিয়া, গদাই পালের অন্তরাত্মা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলিল—"দারোগা সাহেব—রুলের গুঁতো ছাড়া আর কিছু হবে না? থানায় এনে ঘা কতক বেশ করে উত্তম মধ্যম দিলে ভাল হয়।"

দারোগা বলিল—"দিতে আর কতক্ষণ? কিন্তু ও টাকায় হয় না। দুধে যত চিনি দেবে তত মিষ্টি হবে—কথাই ত আছে জান।"

গদাই দারোগার হাত দুইটি ধরিয়া বলিল—"দারোগা সাহেব—বেটাকে যদি থানায় এনে কসে জলবিছুটি লাগাতে পারেন, তবে বাবুর কাছথেকে আরও ৫০৲ আমি আদায় করে দেব।"

"বেশ, তাই হবে।"—বলিয়া দারোগা কার্য্যান্তরে গেল। গদাই পাল মনের আনন্দে কাছারিতে ফিরিয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাকি পাঁচ শও রুপৈয়া

১

আবার এসেছে পূজা; দশভূজা হাসিছে!
জিনি হরিদ্রার বর্ণ, জিনি অতসীর স্বর্ণ,
বদনে বালেন্দু আভা উথলিয়া পড়িছে!

হেরিয়া মায়ের মুখ, সবারি ভরিল বুক ;
মোহিনী রাগিণী কত প্রাণে আজি জাগিছে !
ভক্ত সন্তানের পানে, বিকশিত-দুনয়ানে,
অপাঙ্গে করুণা-ধারা, মা অভয়া চাহিছে !
বিশ্ব আজি হাস্যময়,—উমাশশী হাসিছে !

২

বহে প্রীতি-পারাবার, যেন এক পরিবার
সারা বঙ্গ !—মুক্তাবলা বদ্ধ এক বাঁধনে !
আমি মাত্র এক্-ঘরে, একাকিনী আছি পড়ে ;
তুষাগ্নি হৃদয়-মাঝে, কালিমা এ আননে !

৩

মোরো গৃহে, একদিন, বাজিত আনন্দ-বীণ !
উথলিত হৃদিকুঞ্জে, পিককুল-কাকলী !
সেই প্রমোদের পটে, প্রীতি যমুনার তটে,
বাজিত গো নিশিদিন মধুময় মুরলী !

৪

মুখরিত অলিপুঞ্জে, শিখীময় হৃদিকুঞ্জে,
জাগিত শ্যামার শিস্, দোয়েলের লহরী !
কদম্ব উঠিত ফুটি, হরিণী আসিত ছুটি,
প্রাণ-বৃন্দাবনে যবে বাজিত রে বাঁশরী !

৫

ছিলাম সৌভাগ্যবতী ; কতই বাসিত পতি !
হৈমবতী সম ছিনু পতি-অঙ্গভাগিনী,
নয়নের মণি জিনি, আদরিণী, সোহাগিনী,
ছিল গো দুহিতা-রত্ন, মহানন্দদায়িনী !

৬

কোথা সে মুখর অলি? কোথা সে চাঁপার কলি?
কোথা সে গোলাপবালা, ঢল ঢল শিশিরে ?
কোথা শুক্লা চিরানন্দা ? এযে অমানিশা অন্ধা !
মোর চক্ষে বসুন্ধরা ঢাকা ঘোর তিমিরে !

৭

এসেছেন সারাৎসারা, একি আনন্দের ধারা !
বাল বৃদ্ধ, নরনারী, সকলেই নাচিল !
আমি মাত্র অভাগিনী, বসে আছি একাকিনী !
একটি মলিন হাসি অধরে না জাগিল !

৮

বয়ঃস্থা হইল কন্যা, রূপেতে গুণেতে ধন্যা,
তবুও অনূঢ়া রহে আমাদের ঝিয়ারি !
আমরা করিনু পণ,— হবে পাত্র অতুলন,
তবেই অর্পিব তারে এ অপূর্ব্ব কুমারী !

৯

করি বহু অন্বেষণ, এম এ, পাশ অতুলন,
দুহিতার যোগ্য পাত্র অবশেষে জুটিল !
কিন্তু তবু হোলো ক্ষোভ, একি সর্ব্বনাশা লোভ,
দশটি সহস্র মুদ্রা পিতা তার চাহিল !

১০

কে শুনিবে অনুরোধ ? একেবারে কর্ণ রোধ !
বঙ্গের বেয়াই, তব নাহি বুঝি কান গো ?
হাত পা পাষাণে গড়া, হে মুরতি মনোহরা,
হে বেয়াই, প্রাণে তব নাহি বুঝি সান গো ?

১১

একি সর্ব্বনাশা পণ ? হে বঙ্গের দুর্য্যোধন !
সূচ্যগ্র সমান ভূমি কভু নাহি ছাড়িবে !
হে অপূর্ব্ব কুম্ভকর্ণ, এ বিশ্বের যত স্বর্ণ,
নিদ্রাভঙ্গে, লীলারঙ্গে, উদরে কি ঢালিবে ?

১২

তবু সে সোনার চাঁদ, জামাই পাইতে সাধ,
আগ্রহ-আকুল মোরা হইলাম উভয়ে !
বাধা দিয়া ঘর বাড়ি আনিলেন তাড়াতাড়ি
রৌপ্যরাশি স্বামী মোর প্রফুল্লিত হৃদয়ে !

১৩

বিবাহ হইল যবে, নরনারী বলে সবে
"ধন্য বর," "ধন্য বধূ",—দুই মনোলোভা রে !
এ বলে "আমারে হের," ও বলে "আমারে হের,"
মণি কাঞ্চনের যোগে হয়েছে কি শোভা রে !

১৪

বিবাহান্তে কন্যা যবে কাঁদিয়া আকুল রবে
চলি গেল, আমি যেন ধনে প্রাণে মজিলাম !
"কেঁদ না—দুদিন পরে আবার আসিবে ঘরে"
তার চক্ষু মুছাইয়া নিজ চক্ষু মুছিলাম !

১৫

তিন চারি দিন পরে, আসিবারে পিতৃঘরে,
হইল ব্যাকুলা যবে আমার সে সরলা।
আনিবারে গেল দাসী, বেয়াই কহিল হাসি,
"বাকি পাঁচশত কই? এত কেন উতলা!"

১৬

শুনে কথা অকস্মাৎ, শিরে হোলো বজ্রাঘাত,
বঙ্গের বেয়াই তব লৌহভীম কায়া গো!
কিছুতে না হয় ভেদ, কিছুতে না হয় ছেদ,
বঙ্গের বেয়াই তুমি অশরীরী ছায়া গো!

১৭

বল, বল, হে ধার্ম্মিক, তব কথা শুনি ঠিক্,
অলীক স্বপন বুঝি, বেদান্তের মায়া গো!
দিয়াছিলে সাতদিন শোধিবারে এই ঋণ;
বঙ্গের বেয়াই তুমি বেহদ্দ বেহায়া গো!

১৮

পাইয়া জামাতা-রত্ন, দুদিন সুখের স্বপ্ন
দেখিলাম, মোহ-মুগ্ধ, দিবসেও জাগিয়া!
একদিন তারপর, বহিল তুমুল ঝড়,
কল্পনার অট্টালিকা গেল, হায়, ভাঙ্গিয়া!

১৯

জন্মজন্মান্তর পাপে, নিয়তির অভিশাপে,
একি হোলো? ঘটিলরে অঘটন-ঘটনা!
অকস্মাৎ মৃত্যু আসি, নাথেরে ফেলিল গ্রাসি,
মাথায় পড়িল গদা,—হারাইনু চেতনা!

২০

ঘুচে গেল সর্ব্ব সাধ! একি হোলো পরমাদ!
বাণবিদ্ধ পাখী সম পড়িলাম ভূমিতে!
গরজে নিরাশা-সিন্ধু! কোথা তুমি দীনবন্ধু!
তুমি ছাড়া অভাগীর বন্ধু নাহি মহীতে!

২১

দারুণ সংবাদ পেয়ে, মূর্চ্ছিতা হইল মেয়ে!
রক্তকমলিনী, আহা, হয়ে গেল শ্বেত গো!
তবু চাও "পাঁচশত"! একি তব কথামৃত?
বঙ্গের বেয়াই, তুমি মানুষ না প্রেত গো?

২২

পড়েছি বিষম ঘোরে, আটকি রেখনা ওরে!
বঙ্গের বেয়াই, তুমি, কি প্রশান্ত স্থির গো!
ঐ যে দেয়াল খাড়া, উহাও গো দেয় সাড়া!
বঙ্গের বেয়াই, তুমি অবাক্ বধির গো!

২৩

"মা" "মা" করে' নিশিদিন, কারাগারে হোলো ক্ষীণ!
কে শুনিবে কথা তার? কে বুঝিবে ব্যথা রে?
গিরি-নির্ঝরিণী পারা কেঁদে কেঁদে হোলো সারা,
ঘুমায় তেত্রিশ কোটী স্বর্গের দেবতা রে!

২৪

সকল রোগের অরি, তুমি ওগো ধন্বন্তরী!
মৃতেরে বাঁচাও তুমি, জগতে প্রচার গো!
অসাধ্য এ কর্ণরোগ? একি তব কর্ম্মভোগ!
বঙ্গে এসে, অবশেষে, মেনে গেলে হার গো!

২৫

এইরূপে এগাগত, বহু মাস হোলো গত,
এইরূপে একদিন মহাষ্টমী-দিবসে,
বসে আছি চুপ করি, গণ্ডে অশ্রু পড়ে ঝরি,
কি ছিলাম, কি হয়েছি, ভাবিতেছি মানসে!

২৬

হেনকালে ত্বরা আসি, বেয়াইর বুড়ি দাসী,
কহিল "মা ঠাকুরাণী, কন্যা তব বাঁচে না!"
উঠিলাম শিহরিয়া, বক্ষ গেল বিদরিয়া,
দিনু পত্র, হেন ভাবে ভিখারীও যাচে না!

২৭

উত্তরে আইল পত্র, কথামৃত দুটি ছত্র
"এস নিজে, পাঁচশত সঙ্গে যেন আসে গো!"
পাঠান্তে ভাবিনু মনে "রাক্ষস মরেনি রণে;
ভারতের বুড়া ঋষি মিথ্যাকথা ভাষে গো!"

২৮

ছিল সোনা গাত্র যুড়ে, গেছে তা বিক্রমপুরে;
বাকি ছিল কয়গাছা স্বর্ণচুড়ি দুকরে,
আর ছিল স্বর্ণহার স্মরি মুখ দুহিতার,
বিনিময়ে পাঁচশত বাঁধিলাম আঁচরে!

২৯

আর কিগো যায় থাকা ?　　লয়ে সেই বাকি টাকা,
　বেয়াই-বেয়ান-গৃহে উপনীত হইলাম !
পেয়ে শুভ্র রৌপ্যরাশি,　　বেয়াইর একি হাসি !
　আমি দুহিতারে হেরি, উচ্চরোলে কাঁদিলাম !

৩০

পাইয়া আমার দেখা,　　উষার তারকা-রেখা,
　ম্লান হাসি, দিল দেখা দুহিতার অধরে !
চুম্বিয়া আমার মুখ,　　আনন্দে কাঁপিল বুক ;
　জন্মশোধ শুইল সে মোর বক্ষ-উপরে !

৩১

অকাল হেমন্ত আসি,　　লয়ে পাণ্ডু হিমরাশি,
　তুষারে ডুবায়ে দিল সে কনক-নলিনী !
অকাল নিদাঘ আসি,　　লয়ে খর রৌদ্ররাশি,
　নিঃশেষে শুষিয়া নিল সে রজত তটিনী !

৩২

বিজয়া দশমী দিনে,　　কাঁদাইয়া ভক্তদীনে,
　সোনার প্রতিমা উমা চলি গেল কৈলাসে !
আমারে' সে উমাধন,　　হইল রে বিসর্জ্জন ;
　বুকে লয়ে চিতানল ফিরিলাম আবাসে !

৩৩

　আবার এসেছে পূজা ; দশভুজা হাসিছে !
জিনি হরিদ্রার বর্ণ,　　জিনি অতসীর স্বর্ণ,
　বদনে বালেন্দু-আভা উথলিয়া পড়িছে !
হেরিয়া মায়ের মুখ,　　সবারি ভরিল বুক ;
　আমারি নয়নে শুধু অশ্রুধারা ঝরিছে !
আমি হেরি দিবা রাতি, —আগ্রহে দু হাত পাতি'
　বিকট রাক্ষস এক অবিশ্রান্ত বলিছে,—
"বাকি পাঁচ শত চাই,— বাকি পাঁচ শত চাই"—
　হের, ওর জঠরাগ্নি দাউ দাউ জ্বলিছে !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ।

দিব্যদৃষ্টি

[১]

শৈলশিখরে কেবলই তুষার। তুষাররাশির উপর শূন্য-দৃষ্টি পথিক একা। দুর্দ্দিনে ব্যথার ব্যথী ত মিলে না।

শোকে রুদ্ধকণ্ঠ, অশ্রুকণা আঁখিপ্রান্তে টলটল। পুত্র-শোকাকুল পিতা নামসঙ্কীর্ত্তনে হৃদয়বেদনা শান্ত করিতে প্রয়াসী। সহসা বায়ু আসিয়া সুরতান কোন্ অজানা দেশে উড়াইয়া লইয়া যায়!—অতীতস্মৃতি তরুণ হইয়া ছায়ালোকে ভাসিয়া উঠে।

মহাপুরুষ কহিলেন—"কে তুমি ?"

"পুত্রশোকাতুর পথিক।"

"সুখ দুঃখের সমন্বয় এখানে। হর্ষ বিষাদের মিলন-মন্দির এই তুষারশীতল গিরিশৃঙ্গ। শোক জয় কর।"

"পারি কৈ ? দেব ! সেই কমকান্তি, জ্যোৎস্নাভাস্বর লাবণ্য, মধুকণ্ঠের সেই অর্দ্ধবিজড়িত মধুর বাণী,—ভুলিব যদি কি লইয়া রহিব ? শোক জয়ের বল নাই দেব, ভিন্ন পথে মতি ফিরাইয়া দাও।"

"উন্মাদ, প্রলাপ বকিতেছ ! ভুলিতে চাহ না ?—যাহা ভুলিতে নাই তাহাতো ভুলিয়াছ ! অতীত সৌভাগ্য মনে পড়ে কৈ ? শিশু গিয়াছে ?—ক্ষুদ্র জীবনে আনন্দ উল্লাস যেটুকু বিলাইয়াছে তাহা ত সঙ্গে লইয়া যায় নাই ! তাহাকে পাইয়াছিলে—পাইয়া ক্ষণেকের জন্যও সুখের শ্যামল ছায়া উপভোগ করিয়াছিলে ইহাই যে পরম লাভ তাহা বুঝ না কেন, বুঝিয়া আশ্বস্ত হইতে না পার কেন ? তাহার সঙ্গ সহবাসে প্রাণে যে সুধার ধারা বর্ষিয়াছে তাহা ধ্রুব ; তাহাকে হারাইয়া যে আনন্দে বঞ্চিত হইলে ভাবিতেছ তাহা অনির্দ্দিষ্ট। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অপেক্ষা নিশ্চিত অতীতের স্মরণে সান্ত্বনা অবশ্যম্ভাবী।"

"হইতে পারে ; কিন্তু কাহার পক্ষে ? মনের উপর যাহার শাসন আছে তাহারই নয় কি ? দুর্ব্বল, উচ্ছৃঙ্খল,—সে শাসন অধীনের কৈ ? শাসনে সংযম, সংযমে শিক্ষা সাধনা চাই। সাধনা ত করি নাই,—সাধনার প্রয়োজন কখন ঘটে নাই। ভিখারী পর্ণকুটীরে নয়নপুতলী শিশু লইয়া মনের সুখে ছিল। অকস্মাৎ অশনিপাত !—তাহারই উপর !—অপর কাহারও উপর নহে কেন ?"

"নাস্তিক, গালি পাড়িতেছ কাহাকে? মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল রচনা!"

"মঙ্গল অমঙ্গল যে বুঝে বুঝুক্। সে জ্ঞানের অধিকারে আমার কাজ নাই। নিখিলের অধিপতি যিনি—অভাব তাঁহার কিসের?—লইতে লইলেন দরিদ্রের সম্বল! হা অদৃষ্ট!"

"মূঢ়, বিপ্লব রটাইতেছ! কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে আসিয়া রৌদ্রে ভয় পাও, গোধূলির আধ আলো আধ ছায়ায় শুধুই থাকিতে চাও?"

"কূট তর্কে কোথায় যাইতেছি! ক্রটী লইও না, দেব। মন বশে নাই, শোকে মুহ্যমান; কি বলিতে কি বলিয়া ফেলি! আনন্দের উৎস শিশু—কোথায় এখন? চোখের দেখা বারেক দেখিতে চাহি—পাইব না কি?"

"যে গিয়াছে সেত ফিরিয়া আসিতে যায় নাই। যে-পথে গিয়াছে সেত চিরপুরাতন। সে-পথের যাত্রী নহে কে? তবে অগ্রপশ্চাৎ। দেবমন্দিরে যে অগ্রে পৌঁছিল সেই ধন্য। সেই পুত্রের পিতা তুমি, তুমিও হয়ত ধন্য।"

"চোখে যে আর কিছু দেখিতে পাই না দেব। প্রাণ শূন্য, হৃদয় অবসন্ন, ধরণী ধূমাকার। তুষাররাশির উপর দাঁড়াইয়া তুষারমণ্ডিত হইয়া সেই পথে যাইতে চাহি—পারি না কেন?"

"পারিবে সময়ে। নিয়তি গণ্ডি দিয়া রাখিয়াছে। অকালে গণ্ডির বাহির হইবার তুমি কে?"

"কেহ নই?—শুধুই জড়পিণ্ড? সুখে অধিকার নাই—না থাক্; দুঃখের কবল হইতে নিস্তার নাই কেন? এ কি অসামঞ্জস্য!"

"শোক জয়ের শক্তি নাই; সৃষ্টিরহস্য ভেদ করিতে চাও! কি স্পর্দ্ধা! সুখ দুঃখ দুই সত্তা যে বলে সে অজ্ঞান। কায়া এক, মোহবশে মানুষ দুই ছায়ামূর্ত্তি কল্পনা করে।"

"তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী নই—ক্ষুদ্রশক্তি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি। বল দাও, প্রভু; দুর্ব্বল হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার কর। শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণিপাত।"

মহাপুরুষ অঙ্গুলি চালনা করিলেন।

নিমিষে পান্থ সুষুপ্তির স্নেহময় ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত, চৈতন্য কিন্তু পূর্ণ প্রকট।

[২]

মহাপুরুষ কহিলেন—"কি দেখিলে?"

"কি উত্তর দিব, দেব? মূর্ত্তিমতী রাগিনী সে যে—ভাষায় ধরা দেয় কৈ? দেখিলাম—রম্য কাননে অসংখ্য অযুত শিশু চিত্রারোহিনীর মধুর আলোকে নীহারপানে নিরত। শিশুর কলহাস্যে পুষ্পের সুরভি লীন হইতেছে, চাঁদিনীর রূপতরঙ্গ উছলিয়া পড়িতেছে।"

মহাপুরুষ একদৃষ্টে শোকাতুরের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কি দেখিতেছ?"

"সুন্দর দৃশ্য, প্রভু,—অপূর্ব্ব, মনোহর। দলে দলে যত শিশু এক ক্ষুদ্র শিশুকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া অবিশ্রান্ত নাচিতেছে। মধ্যবর্ত্তী শিশু পূর্ণানন্দে শুধুই হাসিতেছে।"

"চিনিলে,—কে ঐ শিশু?"

"দেখাইলে যদি দেখিতে দাও দেব, নয়ন ভরিয়া দেখি। চিনিয়াছি, এইবার চিনিয়াছি। শিশু আর কেহ নয়—আমারই হারানিধি, নয়নের তারা, হৃদয়ের পঞ্জর। কি শ্রী, কি লাবণ্য, কি অপূর্ব্ব জ্যোতি! তবে কি—"

"মূঢ়, আবেগ রোধ কর। কি বুঝিলে, বল।"

"কি বুঝিলাম,—কি জানি! মনে হয় ঐ অগণ্য শিশু—শিশু নয়, শিশিরবিন্দু, দূর্ব্বাদলে মুক্তাফল, হাসির কুচি, পুলককণা—মেঘের নীলিমায় ভাসিয়া আসে, রবির হুতাশে হাওয়ায় মিলে। এক ফোঁটা সোনালি রং শুধুই ছিটাইয়া যায়!"

"সুবর্ণলেখায় রঙিন হইয়া যাইতে শিখ না কেন?"

"শিখাইলে শিখি।"

মহাপুরুষ আবার অঙ্গুলি চালনা করিলেন।

"কোন্ যাদুকর কুহেলিকার কি কুহক রচনা করিল, প্রভু! আমার হারানিধি—কৈ সে? নাই? কোলে তুলিয়া বুকে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। হায়! হায়!"

মহাপুরুষ উদ্‌ভ্রান্তশিরে পদ্মহস্ত বুলাইলেন।

"একি দেব! দিক্‌দিগন্তে যেদিকে চাহি সেই শিশু—একে সহস্র, লক্ষ, কোটি, অযুত, অর্ব্বুদ! নীল আকাশে যত মেঘ সব এক, ফেনিল সাগরে যত ঢেউ সব এক, বিশাল ধরায় যত শিশু সেই এক—গোলাপের একটী কুঁড়ি ফুটিয়া শত পাপড়িতে ভুবন যে ভরিয়া দিল!"

দেখিতে দেখিতে তুষাররাশি দ্রব হইয়া মহানদীর সৃষ্টি করিল!

শ্রীকালীচরণ মিত্র।
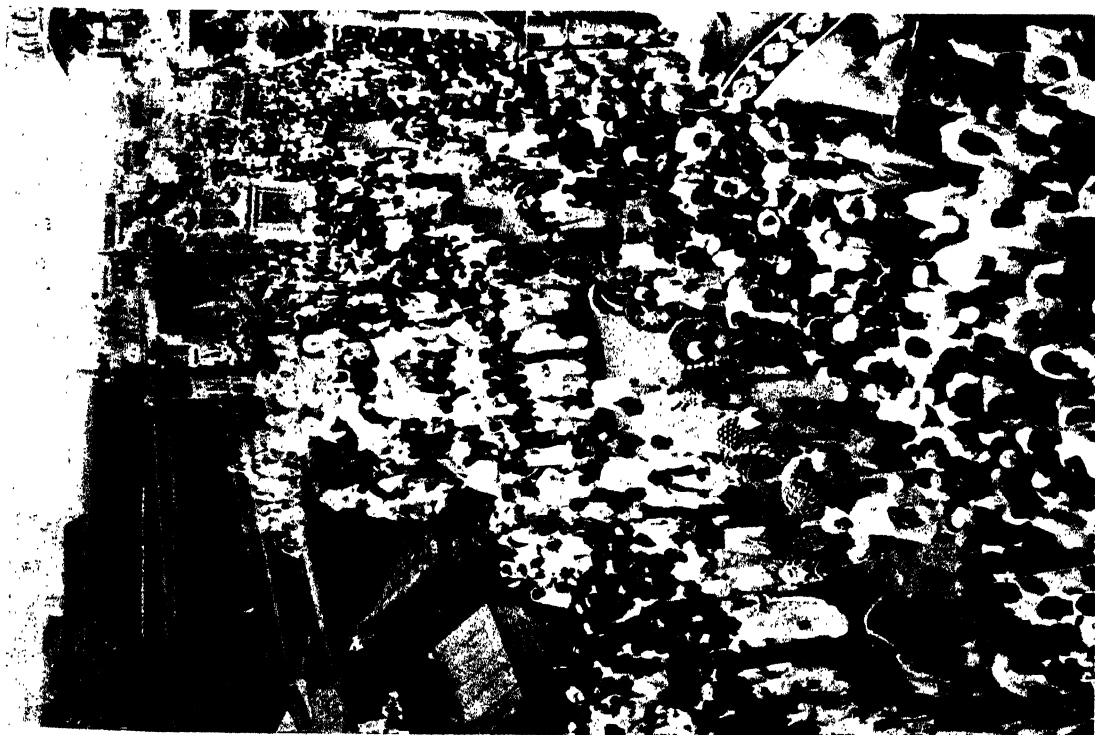
ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল।

ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল।

ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল

শিশুকাল হইতে ঢাকার মিছিলের কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। কখনও দেখার সুবিধা হয় নাই। এবার মিছিলের বাহার দেখিবার জন্য কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের গণ্যমান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, এবং ভারতসম্রাটের দৃষ্টি ও তুষ্টির জন্য এই মিছিল কলিকাতাতেও প্রদর্শিত হইবে এমত কথা রাষ্ট্র হওয়ায় মিছিল দেখার জন্য ঢাকায় এবার বহুতর লোকের সমাগম হইয়াছিল। তাই এই অভিনব ব্যাপার দেখিতে গেলাম। যাহা দেখিলাম তাহার বর্ণনা করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অসাধ্য। তবে কয়েকখানা ফটোগ্রাফ পাঠাইতেছি তাহার দ্বারা যতদূর সাধ্য পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। এ মিছিল ব্যাপারে অনেক টাকা খরচ হয়—এবং মিছিলে লক্ষ লক্ষ টাকার সরঞ্জাম থাকে। সোনা রূপার চৌকি (প্রায়ই দেবতার আসন) ১০।১২ খানা বাহির হয় এবং এই সব বহুমূল্যের জিনিষে ঢাকার কারুকার্য্য ও শিল্প নিপুণতার আদর্শ প্রদর্শিত হয়। এমত বিরাট মিছিল ঢাকাতেই একমাত্র সম্ভব। ইহা ব্যতীত হাতি ঘোড়া, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা দ্রষ্টব্য জিনিষ, বহুল পরিমাণে বাহির করা হয়। ঐ সব যে ধনবান ব্যক্তিগণের সঞ্চিত ও আদরের সামগ্রী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। "All that glitters is not gold" ইহা পাশ্চাত্য বাক্য, কিন্তু এ মিছিলে প্রায়ই ছিল "All that glitters is gold." ঢাকার নকাসি জগৎপ্রসিদ্ধ এবং শিল্পজগতে অতি আদরের জিনিষ। সোনা ও রূপার চৌকিতে এই নকাসি কার্য্য অতি আশ্চর্য্য রকমের ছিল। দুঃখের বিষয় দূরতা প্রযুক্ত ফটোগ্রাফে তাহার প্রতিকৃতি উত্তম উঠাইবার সুবিধা হয় নাই। যদি খণ্ড খণ্ড ভাবে ছবি উঠান হইত তাহা হইলে কতক সুবিধা হইত, কিন্তু জনতার দরুণ তাহার সুবিধা পাওয়া যায় নাই। মিছিলে যে সব সং (অর্থাৎ পৌরাণিক ও সামাজিক অভিনয়) ছিল তাহাও অতি সুন্দর হইয়াছিল। নবাবপুর ও ইসলামপুর হইতে দুই দফা দুই দিন মিছিল বাহির করে। এ বৎসর পালা ক্রমে নবাবপুরের মিছিল প্রথম বাহির হয়—পরদিন (৬ই শ্রাবণ) ইসলামপুরের মিছিল বাহির হয়। আমরা দলাদলির ধার ধারি না—আমরা উভয় মিছিলের বাহারে এমনই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম যে কোনটিকে প্রশংসা করিতে যাইয়া কোনটিকে খাট করিব সে জ্ঞান আমাদের ছিল না। এ মিছিল সম্রাটের সমক্ষে একদলেই পরিণত হইয়া বাহির হইবার সম্ভব। তখন কলিকাতাবাসিগণ, যাঁহারা এ দৃশ্য কখনও দেখেন নাই তাঁহারা, অবশ্য অধিকতর তৃপ্ত হইবেন, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্রাটের চিত্তবিনোদন হইবে কি না জানিনা, তবে দেশের একটি সুন্দর দৃশ্য এ মিছিলে থাকিবে একথা সত্য। মানুষ মাত্রেই দোষানুসন্ধানী। এ মিছিলে দোষ কি ছিল তাহা বলা কিন্তু দোষানুসন্ধানীরও কষ্টসাধ্য, ইহা বেশ বলিতে পারি। ঢাকার কারিকরগণ কারুকার্য্যে সিদ্ধহস্ত —তবে ভাল পরিকল্পনাপটুর (designer) অধীনে এ মিছিল প্রস্তুত হইলে মণিকাঞ্চন যোগ হইবে সন্দেহ নাই। ঢাকার রাজপথগুলি অতি সংকীর্ণ, এজন্য মিছিলের মহিমা দর্শকগণের সম্যক ও যথাযথ অনুভব করিতে অসুবিধা হইয়াছিল; কলিকাতার সুপ্রশস্ত রাজপথে ইহার মহিমা পূর্ণ মাত্রায় বিকাশিত হইবে ইহাও অন্যতম মহৎ সুবিধার কথা। অল্পদিন পর যে দৃশ্যমহিমা সর্ব্বজন-সমক্ষে ও সম্রাটচক্ষুর নিকট প্রকাশ পাইবে তাহার আর বাহুল্য বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।*

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

বাংলা বহুবচন

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "গোটা" শব্দের অর্থ সমগ্র। বাংলায় যেখানে বলে "একটা" উড়িয়া ভাষায় সেখানে বলে গোটা। এবং এই গোটা শব্দের টা অংশই বাংলা বিশেষ বিশেষ্যে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে ইহার প্রথম অংশটুকু ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে "চৌকিটা", পূর্ব্ববঙ্গে "চৌকি গুয়া।"

ভাষায় অন্যত্র ইহার নজির আছে। একদা "কর"শব্দ সম্বন্ধকারকের চিহ্ন ছিল—যথা তোমাকর, তাকর।—এখন পশ্চিমভারতে ইহার "ক"অংশ এবং পূর্ব্বভারতে "র"অংশ

* ফটোগ্রাফগুলি ঢাকার প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার Mr. F. Kapp কর্ত্তৃক উঠান—তাহার অনুমত্যনুসারে এই সব ছবি প্রকাশিত হইল। এজন্য লেখক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।
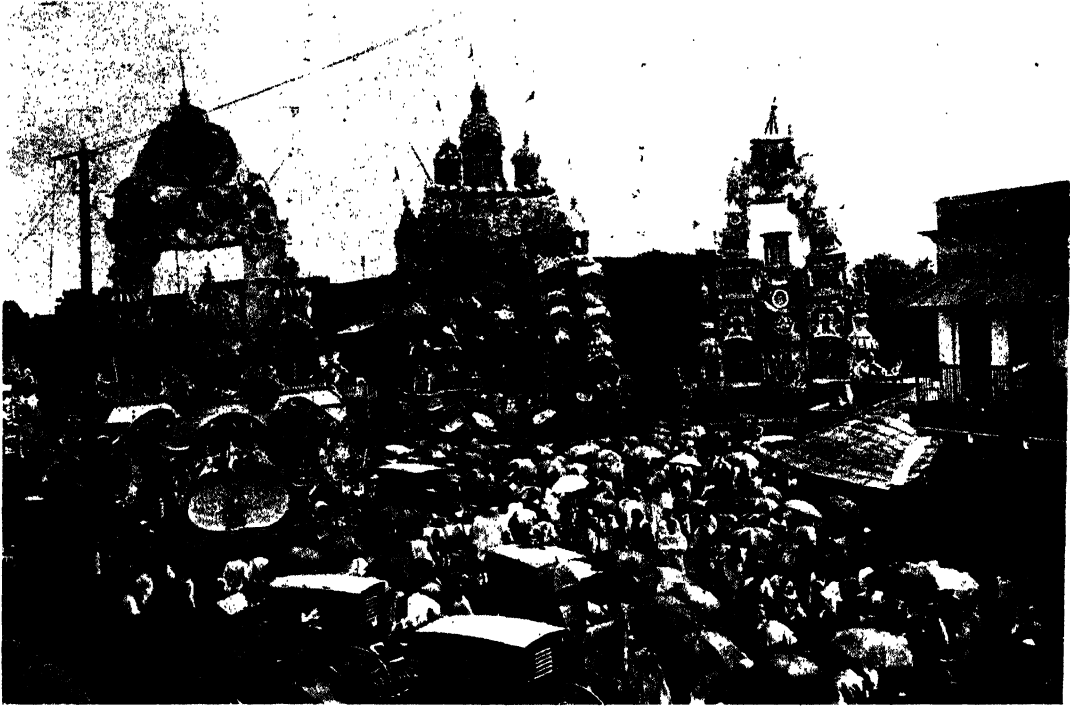
ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল।

ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল।

সম্বন্ধ চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দি হম্‌কা, বাংলা আমার।

একবচনে যেমন গোটা, বহুবচনে তেমনি গুলা। (মানুষগোটা), মানুষটা একবচন, মানুষগুলা বহুবচন। উড়িয়া ভাষায় এইরূপ বহুবচনার্থে "গুড়িয়ে" শব্দের ব্যবহার আছে।

এই "গোটা"রই বহুবচনরূপ গুলা, তাহার প্রমাণ এই, যে, "টা" সংযোগে যেমন বিশেষ্যশব্দ তাহার সামান্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে—গুলা গুলির দ্বারাও সেইরূপ ঘটে। যেমন "টেবিলগুলা বাঁকা"—অর্থাৎ বিশেষ কয়েকটি টেবিল বাঁকা, সামান্যত টেবিল বাঁকা নহে। কাক শাদা বলা চলে না, কিন্তু কাকগুলো শাদা বলা চলে, কারণ, বিশেষ কয়েকটা কাক শাদা হওয়া অসম্ভব নহে।

এই "গুলা" শব্দযোগে বহুবচনরূপ নিষ্পন্ন করাই বাংলার সাধারণ নিয়ম। বিশেষস্থলে বিকল্পে শব্দের সহিত "রা" ও "এরা" যোগ হয়। যেমন, মানুষেরা, কেরাণীরা ইত্যাদি।

এই "রা" ও "এরা" জীববাচক বিশেষ্যপদ ছাড়া অন্যত্র ব্যবহৃত হয় না।

হলন্ত শব্দের সঙ্গে "এরা" এবং অন্য স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে "রা" যুক্ত হয়। যেমন বালকেরা, বধূরা। বালকগুলি, বধূগুলি ইত্যাদিও হয়।

কথিতভাষায় এই "এরা" চিহ্নের "এ" প্রায়ই লুপ্ত হইয়া থাকে—আমরা বলি বালকরা, ছাত্ররা, ইত্যাদি।

ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যপদেরও বহুবচনরূপ হইয়া থাকে। যথা রামেরা—অর্থাৎ রাম এবং আনুষঙ্গিক অন্য সকলে। এরূপস্থলে কদাপি গুলা গুলির প্রয়োগ হয় না। কারণ রামগুলি বলিলে প্রত্যেকটিরই রাম হওয়া আবশ্যক হয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে এই "এরা" বহুবচন সম্বন্ধকারকরূপ হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ রামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যাহারা তাহারাই "রামেরা"। যেমন তির্য্যক্‌রূপে "জন" শব্দকে জোর দিয়া হইয়াছে "জনা", সেইরূপ "রামের" শব্দকে জোর দিয়া হইয়াছে রামেরা।

"সব", "সকল" ও "সমুদায়" শব্দ বিশেষ্যশব্দের পূর্ব্বে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়া বহুত্ব অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু বস্তুত এই বিশেষণগুলি সমষ্টিবাচক। "সব লোক" এবং "লোকগুলি"র মধ্যে অর্থভেদ আছে। "সব লোক" ইংরেজিতে all men এবং লোকগুলি the men।

লিখিত বাংলায়, "সকল" ও "সমুদয়" শব্দ বিশেষ্যপদের পরে বসে—কিন্তু কথিত বাংলায় কখনই তাহা হয় না। সকল গোরু বলি, গোরু সকল বলি না। বাংলাভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এইরূপ প্রয়োগ সম্ভবত আধুনিককালে গদ্য-রচনা সৃষ্টির সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। লিখিত ভাষায় "সকল" যখন কোনো শব্দের পরে বসে তখন তাহা তাহার মূল অর্থ ত্যাগ করিয়া শব্দটিকে বহুবচনের ভাব দান করে। লোকগুলি এবং লোক সকল একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রাচীন লিখিত ভাষায় "সব" শব্দ বিশেষ্যপদের পরে যুক্ত হইত। এখন সে রীতি উঠিয়া গেছে, এখন কেবল পূর্ব্বেই তাহার ব্যবহার আছে। কেবল বর্ত্তমান কাব্যসাহিত্যে এখনো ইহার প্রয়োগ দেখা যায়—যথা "পাখী সব করে রব।" বর্ত্তমানে, বিশেষ্যপদের পরে "সব" শব্দ বসাইতে হইলে বিশেষ্য বহুবচনরূপ গ্রহণ করে। যথা পাখীরা সব, ছেলেরা সব অথবা ছেলেরা সবাই। বলা বাহুল্য জীব-বাচক শব্দ ব্যতীত অন্যত্র বহুবচনে এই "রা" ও "এরা" চিহ্ন বসে না। বানরগুলা সব, ঘোড়াগুলা সব, টেবিল-গুলা সব, দোয়াতগুলা সব—এইরূপ, গুলাযোগে সচেতন অচেতন সকল পদার্থ সম্বন্ধেই "সব" শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে।

"অনেক" বিশেষণ শব্দ যখন বিশেষ্যপদের পূর্ব্বে বসে তখন স্বভাবতই তদ্দ্বারা বিশেষ্যের বহুত্ব বুঝায়। কিন্তু এই "অনেক" বিশেষণের সংস্রবে বিশেষ্যপদ পুনশ্চ বহুবচন-রূপ গ্রহণ করে না। ইংরেজিতে many বিশেষণ সত্ত্বেও man শব্দ বহুবচনরূপ গ্রহণ করিয়া men হয়—সংস্কৃতে হয় অনেকা লোকাঃ, কিন্তু বাংলায় অনেক লোকগুলি হয় না।

অথচ "সকল" বিশেষণের যোগে বিশেষ্যপদ বিকল্পে বহুবচনরূপও গ্রহণ করে। আমরা বলিয়া থাকি, সকল সভ্যেরাই এসেছেন—সকল সভ্যই এসেছেন এরূপও বলা যায়। কিন্তু অনেক সভ্যেরা এসেছেন কোনো মতেই

বলা চলে না। "সব" শব্দও "সকল" শব্দের ন্যায়। "সব পালোয়ানরাই সমান" এবং "সব পালোয়ানই সমান" দুই চলে।

"বিস্তর" শব্দ "অনেক" শব্দের ন্যায়। অর্থাৎ এই বিশেষণ পূর্ব্বে থাকিলে বিশেষ্যপদ আর বহুবচনরূপ গ্রহণ করে না—"বিস্তর লোকেরা" বলা চলে না।

এইরূপ আর একটি শব্দ আছে তাহা লিখিত বাংলায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না—কিন্তু কথিত বাংলায় তাহারই ব্যবহার অধিক, সেটি "ঢের"। ইহার নিয়ম "বিস্তর" ও "অনেক" শব্দের ন্যায়ই। "গুচ্ছার" শব্দও প্রাকৃত বাংলায় প্রচলিত। ইহা প্রায়ই বিরক্তিপ্রকাশক। যখন বলি গুচ্ছার লোক জমেছে তখন বুঝিতে হইবে সেই লোক-সমাগম প্রীতিকর নহে। ইহা সম্ভবত গোটাচার শব্দ হইতে উদ্ভূত।

সংখ্যাবাচক বিশেষণ পূর্ব্বে যুক্ত হইলে বিশেষ্যপদ বহুবচনরূপ গ্রহণ করে না। যেমন, চার দিন, তিন জন, দুটো আম।

গণ, দল, সমূহ, বৃন্দ, বর্গ, কুল, চয়, মালা, শ্রেণী, পংক্তি প্রভৃতি শব্দযোগে বিশেষ্যপদ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহা সংস্কৃত রীতি। এইজন্য অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্যত্র ইহার ব্যবহার নাই। বস্তুত ইহাদিগকে বহুবচনের চিহ্ন বলাই চলে না। কারণ ইহাদের সম্বন্ধেও বহুবচনরূপের প্রয়োগ হইতে পারে—যেমন সৈন্যগণেরা, পদাতিকদলেরা, ইত্যাদি। ইহারা সমষ্টিবোধক।

ইহাদের মধ্যে "গণ" শব্দ প্রাকৃত বাংলার অন্তর্গত হইয়াছে। এইজন্য "পদাতিকগণ" এবং "পাইকগণ" দুই বলা চলে। কিন্তু "লাঠিয়ালবৃন্দ" "কলুকুল" বা "গোয়ালাচয়" বলা চলে না।

গণ, মালা, শ্রেণী ও পংক্তি শব্দ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে পারে না। গণ ও দল কেবল প্রাণীবাচক শব্দের সহিতই চলে। কখন কখন রূপকভাবে মেঘদল তরঙ্গদল বৃক্ষদল প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মালা, শ্রেণী ও পংক্তি শব্দের অর্থ অনুসারেই তাহার ব্যবহার, একথা বলা বাহুল্য।

প্রাকৃত বাংলায় এইরূপ অর্থবোধক শব্দ ঝাঁক, গোচ্ছা, আঁটি, গ্রাস। কিন্তু এগুলি সমাসরূপে শব্দের সহিত সংযুক্ত হয় না। আমরা বলি পাখীর ঝাঁক, চাবির গোচ্ছা, ধানের আঁটি, ভাতের গ্রাস, অথবা দুই ঝাঁক পাখী, এক গোচ্ছা চাবি, চার আঁটি ধান, দুই গ্রাস ভাত।

"পত্র" শব্দযোগে বাংলায় কতকগুলি শব্দ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু সেই বিশেষ কয়েকটি শব্দ ছাড়া অন্য শব্দের সহিত উহার ব্যবহার চলে না। গহনাপত্র, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, জিনিষপত্র, বিছানাপত্র, ঔষধপত্র, খরচপত্র, দেনাপত্র, চিঠিপত্র, খাতাপত্র, চোতাপত্র, হিসাবপত্র, নিকাশপত্র, দলিলপত্র, পুঁথিপত্র, বিষয়পত্র, জিজ্ঞাসাপত্র।

পরিমাণসম্বন্ধীয় বহুত্ব বোঝাইবার জন্য বাংলায় শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে; যেমন, বস্তাবস্তা, ঝুড়িঝুড়ি, মুঠামুঠা, বাক্সবাক্স, কল্‌সি-কল্‌সি, বাটিবাটি। এগুলি কেবলমাত্র আধারবাচক শব্দ সম্বন্ধেই খাটে; মাপ বা ওজন সম্বন্ধে খাটে না—গজ-গজ বা সের-সের বলা চলে না।

সময় সম্বন্ধেও বহুত্ব অর্থে শব্দদ্বৈত ঘটে—বার বার, দিন দিন, মাস মাস, ঘড়ি ঘড়ি। বহুত্ব বুঝাইবার জন্য সমার্থক দুই শব্দের যুগ্মতা ব্যবহৃত হয়, যেমন:—লোকজন, কাজকর্ম্ম, ছেলেপুলে, পাখীপাখালী, জন্তুজানোয়ার, কাঙালগরীব, রাজারাজড়া, বাজনাবাদ্য। এইসকল যুগ্ম শব্দের দুই অংশের এক অর্থ নহে কিন্তু কাছাকাছি অর্থ এমন দৃষ্টান্তও আছে;—দোকানহাট, শাকসবজি, বনজঙ্গল, মুটেমজুর, হাঁড়িকুঁড়ি। এরূপ স্থলে বহুত্বের সঙ্গে কতকটা বৈচিত্র্য বুঝায়। যুগ্মশব্দের একাংশের কোনো অর্থ নাই এমনো আছে। যেমন, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, চাকরবাকর। এস্থলেও কতকটা বৈচিত্র্য অর্থ দেখা যায়।

কথিত বাংলায় "ট" অক্ষরের সাহায্যে একপ্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত আছে। যেমন, জিনিষটিনিষ, ঘোড়াটোড়া। ইহাতে প্রভৃতি শব্দের ভাবটা বুঝায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোচনা

[কোনো বিষয়ের আলোচনা যে মাসে মূল বিষয় প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, ঠিক তাহার পরবর্ত্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত না হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। আলোচনার পর মূল বিষয়ের লেখকের উত্তর পত্রস্থ হইলে, আর সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা চলিতে পারিবে না। লেখকগণ আলোচনা যথাসাধ্য সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবেন: দীর্ঘ আলোচনা ছাপা আমাদের পক্ষে দুষ্কর। —প্রবাসী সম্পাদক।]

"পালি" ভাষা নাম

গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় পালি-ভাষার "পালি" নাম হইবার কারণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমিও "পালি" নামোৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিলাম।

পালি নামোৎপত্তির প্রথম ও প্রধান কারণ পালি নামক একটী প্রাচীন নগর। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিয়েন সাং লিখিয়াছেন যে, এই স্থানে যুবরাজ সুদান, পিতার হস্তী ব্রাহ্মণগণকে দান করায়, তিরস্কৃত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। নগরের নিকটে একটি সংঘারাম আছে। তাহাতে ৫৫ জন বৌদ্ধ পুরোহিত বাস করে এবং তাহারা সকলেই হীনযান মতাবলম্বী। এই স্থানে রাজা অশোক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানটি হর্দোই জেলার সাহাবাদ তহশীলের অধীন পালি পরগণার অন্তর্গত একটি নগর, এবং পালি পরগণার সদর।

বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্তুও এই পরগণার অন্তর্গত কোন স্থানে হইবে। সম্ভবত বুদ্ধদেবের জন্মসময়ে গ্রামের বিশুদ্ধ নাম কপিলবস্তু এবং গ্রাম্য নাম পালি ছিল। এই পালি নগরে বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল সুতরাং তিনি জন্মভূমির গ্রাম্যভাষাতেই কথা বলিতেন এবং নিজ মত প্রচার করিতেন। এই জন্য এই ভাষাই তাঁহার মাতৃভাষা। এই পালি গ্রামের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রচলিত পল্লী গ্রাম্য ভাষাকে তিনি ব্যাকরণ যোগে উন্নত এবং পালন বা রক্ষা করিয়াছেন, তাই এই ভাষার নাম "পালি" হইয়াছে। বুদ্ধদেব যে ভাষায় নানাস্থানে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, উহা কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া দুর্ব্বোধ্য হইতে পারে আশঙ্কায় তিনি স্বয়ংই তাঁহার শিষ্য কাত্যায়নকে ঐ ভাষার রীতি ও নিয়ম সমূহ সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া একখানি ব্যাকরণ লিখিতে আদেশ করেন। এই কাত্যায়ন বা কচ্চায়ন প্রণীত সুগন্ধিকল্প ব্যাকরণই প্রাচীনতম।

বিধুবাবু বলেন পালি অর্থ পঙ্‌ক্তি, এই পংক্তি হইতে যেমন পাঁতি শব্দ হইয়াছে, তেমনি পালি নামও হইয়াছে। পালি শব্দ যে পংক্তি অর্থে পালি ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রমাণও তিনি দিয়াছেন, কিন্তু এইরূপে নামকরণ হওয়া কালসাপেক্ষ। তিনিও তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধদেব যে ভাষায় ব্যাকরণ প্রস্তুত করাইয়া ভাষা গঠন করাইয়াছেন তাহার নামকরণ তখনই হইয়াছে। ভাষা গঠিত হইলে নামকরণ হইতে কালের অপেক্ষা থাকে না।

অতএব আটগাঁ ও বেলপুখুর প্রভৃতির বিশুদ্ধ নাম যেমন অষ্টগ্রাম ও বিল্বপুষ্করিণী, পালি গ্রামও তেমনি ক-পিল-বস্তুর গ্রাম্য নাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এই "পালি" গ্রামের নামানুসারে তদ্দেশপ্রচলিত এই গ্রাম্য ভাষার নামও "পালি" হইয়া থাকিবে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

পাঞ্জাবে বাঙ্গালী

মহাশয়,—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার অষ্টাদশ ভাগ প্রথম সংখ্যার ১১১, ১১২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যে বক্তৃতা বাহির হইয়াছে তাহাতে অনেক ভুল আছে। কালীবাবু ইংরাজী, পাঞ্জাবী ও উর্দ্দু ভাষায় বেশ লিখিতে ও বলিতে পারেন। তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় যে গুটিকতক স্বদেশী সংগীত রচনা করিয়াছেন তাহা বেশ সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু কালীবাবু ঐতিহাসিক গবেষণা বা অনুসন্ধানের জন্য কোন দিন প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ তাঁহাকে পঞ্জাবে বাঙ্গালী-কীর্ত্তির সঙ্কলনভার লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাকে এই ভার দেওয়া আমার বিবেচনায় ঠিক হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় বহুবৎসর হইতে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেছেন। তাঁহাকে এই কার্য্যের ভার দিলে বঙ্গীয় সাহিত্যের যে উন্নতিসাধন হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় বৎসরের প্রবাসীতে জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পঞ্জাবে বাঙ্গালী নামক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে কালী বাবুর বক্তৃতায় যে সকল ভুল আছে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

কালীবাবুর পঞ্জাবে জন্ম ও কর্ম্ম। তিনি কখন জ্ঞানেন্দ্র বাবুর মত বাঙ্গলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। এই সকল কারণে পরিষদ যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার পুনর্বিচার করা উচিত।

জনৈক পুরাতন পঞ্জাব-প্রবাসী
বাঙ্গালী।

দধি

ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে দধি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। প্রবন্ধটি বেশ যুক্তিপূর্ণ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদিগের অভিমতপূর্ণ। ইহাতে দধি ব্যবহারের উপকারিতা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ও বর্ত্তমানে দধি ব্যবহার যেরূপভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে তাহা অবগত হইয়া মনে উদয় হইল দেখা যাক আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র দধির বিষয় কি বলিয়াছেন।

সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে "দধি তু মধুরমম্লমত্যম্লঞ্চেতি। তৎ কষায়ানুরসং স্নিগ্ধমুষ্ণং পীনস-বিষমজ্বরাতিসারারোচক-মূত্রকৃচ্ছ্র কার্শ্যাপহং বৃষ্যং প্রাণকরং মাঙ্গল্যঞ্চ।" (পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়, ৫৮ শ্লোক)।

দধি মধুর, অম্ল ও অত্যম্ল হইয়া থাকে ইহা সকলেই অবগত আছেন। ইহার কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। কেহ বা মধুর, কেহ বা অম্ল, কেহ বা অত্যম্ল দধি পছন্দ করেন। এক দধিই অধিকক্ষণ পরে অম্ল ও ক্রমে অত্যম্ল হইয়া উঠে। কিম্বা যদি সাঁজা বেশী পরিমাণে দেওয়া যায় তাহা হইলেও দধি অম্ল হইতে পারে। যেমন বীজানুরূপ বৃক্ষ হয় সেইরূপ সাঁজাও হইতেছে দধি প্রস্তুতের বীজ, সুতরাং সাঁজানুযায়ী দধি হইবে তাহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। তারপর দধির প্রকারভেদে দোষগুণ ও উপকারিতা জানা আবশ্যক। প্রধানতঃ সুশ্রুত সংহিতার মতে দধি কষায়ানুরস, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, এবং পীনস, বিষমজ্বর, অতিসার, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও কৃশতানাশক, বৃষ্য (ধাতু পোষক), প্রাণকর (জীবনিশক্তি বৃদ্ধিকারক ও বলকারক) এবং মাঙ্গল্য। তৎপর প্রকার ভেদে গুণ বলিতেছেন যথা—মধুর দধি কফ ও মেদের বর্দ্ধক। অম্ল দধি কফপিত্তকারক। অত্যম্ল

দধি রক্তদূষক। সমস্ত মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না, যাঁহারা আবশ্যক মনে করেন মূল গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

গব্য দধি স্নিগ্ধ, পাকে মধুর, দীপক, বলবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, পবিত্র (স্বাস্তিক) ও রুচিপ্রদ। ছাগ দধি কফপিত্তনাশক, লঘু, বায়ুনাশক ও ক্ষয়নাশক এবং অর্শ, শ্বাস ও কাশে হিতকর ও অগ্নিদীপক। মাহিষ দধি বিপাকে মধুর, বৃষ্য, বাতপিত্তপ্রসাদন, বিশেষতঃ শ্লেষ্মাবর্দ্ধক ও স্নিগ্ধ। এইরূপ অন্যান্য জন্তুর দুগ্ধে জাত দধির দোষগুণ উল্লিখিত হইয়াছে। প্রায় সকলেই অবগত আছেন বিভিন্ন বিভিন্ন প্রাণীর দুগ্ধের বিভিন্ন বিভিন্ন গুণ। সেইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন প্রাণীর দুগ্ধে জাত দধিও বিভিন্ন বিভিন্ন গুণযুক্ত। মনে করুন এক ব্যক্তির অতিসার বা ক্ষয়রোগ হইয়াছে তাহার পক্ষে গোদুগ্ধের পরিবর্ত্তে ছাগদুগ্ধ যেমন হিতকর সেইরূপ ব্যাধি বিশেষে বা প্রকৃতি বিশেষে কখন গব্যদধি কখন ছাগদধি কখন বা মাহিষদধি হিতকর। কফপ্রধান লোকের পক্ষে মহিষদধি ব্যবহার উচিত নয়। পক (অর্থাৎ জাল দেওয়া) দুগ্ধ হইতে যে দধি উৎপন্ন হয় তাহাই গুণকারক, রুচিকারক এবং অগ্নি ও বলের বর্দ্ধক। দধির সর গুরু, বৃষ্য, বায়ুনাশক, অগ্নিকারক এবং কফশুক্র বিবর্দ্ধক। তাই সাধারণ লোকে বলে—

দৈএর মাথা, ঘোলের শেষ।
কচি পাঁঠা, বুড় মেষ॥

"হেমন্তে শিশিরে চৈব বর্ষাসু দধি শস্যতে"—হেমন্তে, শীতকালে ও বর্ষা ঋতুতে দধি প্রশস্ত।

"দধীমুক্তানি যানীহ গব্যাদীনি পৃথক্ পৃথক্।
বিজ্ঞেয়মেষু সর্ব্বেষু গব্যমেব গুণোত্তরম্॥"

এই শ্লোকের মতে গব্যদধি গুণে শ্রেষ্ঠ।

দধির বিষয় এইখানে সমাপ্তি করিয়া দধি হইতে অন্য যে সব প্রকারান্তর দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার আলোচনা করা যাউক। জল-মিশ্রিত হইয়া দধি মন্থিত হইলে তাহাকে সাধারণ লোকে ঘোল বলে। ঘোল সংস্কৃত শব্দ। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ মতে ঘোল চারি প্রকার, যথা—

"তক্রং পাদজলং প্রোক্তং উদশ্বিৎ চার্দ্ধবারিকং
সসরং নির্জলং ঘোলং ছচ্ছিকা সরহীনাস্তাৎ অচ্ছা প্রচুরবারিকা।"

দধির সহিত একভাগ জল মিশ্রিত করিলে তাহাকে তক্র বলে। অর্দ্ধভাগ জল মিশ্রিত করিলে উদশ্বিদ কহে। সরযুক্ত দধি নির্জল মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল কহে। আর যে দধিতে প্রচুর পরিমাণে জল মিশ্রিত করা হইয়াছে এবং সারহীন অর্থাৎ যাহা হইতে নবনীত উদ্ধার করা (মাখন তোলা) হইয়াছে তাহাকে ছাছিকা কহে। পশ্চিম দেশে কোন কোন স্থানে এই ছাছিকাকে ছাঁছ কহে এবং ঘোলকে মাঠ্‌ঠা বলে। তক্র ব্যবহারের কি উপকারিতা তৎসম্বন্ধে চরক সংহিতা বলিতেছেন—

"শোথার্শো গ্রহণীদোষ মূত্রকৃচ্ছ্রো দরারুচি।
স্নেহব্যাপদি পাণ্ডুত্বে তক্রং দদ্যাদ্‌গরেষু চ॥"

শোথ, অর্শ, গ্রহণীদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদর, অরুচি, স্নেহবিপত্তি, পাণ্ডুরোগ ও গরদোষে তক্র প্রযোজ্য।

উল্লিখিত প্রমাণাদি হইতে বুঝা যাইতেছে যদিও দধি ও তক্র বিশেষ উপকারী কিন্তু সকল অবস্থায় বা ব্যারামে সেবন করা যাইতে পারে না, আবার কোন কোন স্থলে বিশেষদ্রব্যসংযোগে ব্যবহারবিধিও দৃষ্ট হয়। সে সম্বন্ধে প্রয়োজন মত চিকিৎসকের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। রাত্রিতে দধি ভোজন আমাদের দেশে নিষিদ্ধ—"রাত্রৌ দধি ন ভুঞ্জীত।" কিন্তু "সঘৃতশর্করং সমুদ্গসূপং সক্ষৌদ্রং উষ্ণং সামলকং ভুঞ্জীত", এই বচনানুসারে ব্যবহার হইতে পারে।

পশ্চিম দেশে অনেক তরকারিতে দধি দিবার ব্যবস্থা অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়। "কড়ি" নামে বেসন ও দধি মিশ্রিত এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়, ইহাতে ফুলরিও দেওয়া যায়, বড়ই সুস্বাদু। আয়ুর্ব্বেদেও তক্র হইতে এক প্রকার খরযূস নামে সুস্বাদু পেয়দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মুগের দাউলের যূষ, ঘোল, লেবুর রস, আমরুলের রস প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ও কিঞ্চিৎ লবণ ও হরিদ্রাচূর্ণ দিয়া পাক করিলে নাতিতরল এই দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহার সঙ্গে তিক্তমূলের কিঞ্চিৎ রস দিলে অগ্নিমান্দ্যের বিশেষ উপকার হয়। রসালা এক প্রকার দধির পানা বিশেষ। কিঞ্চিৎ লবণ, শর্করা, জল ও সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। যখন তক্র ও দধি বহু প্রকারে ব্যবহার হইতেছে তখন যে এসব দ্রব্য উপকারী তাহাতে লেশমাত্র ভুল নাই। যদি আমরা আয়ুর্ব্বেদ আলোচনা করি দেখিতে পাইব তাহাতে কত শিক্ষার বিষয় রহিয়াছে। আমি নিজে দেখিয়াছি একজন মৈথিল ব্রাহ্মণ প্রতিদিন দধি সেবন করিয়া আমাশয় রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাই আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিৎ
ন তক্রদগ্ধা প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা মরাণাং অমৃতং সুখায়
তথা নরানাং ভুবি তক্রমাহুঃ॥

এদিকে যেমন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দধিসেবন প্রশস্ত তেমনি ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় প্রত্যেক পূজাতেই ও শ্রাদ্ধাদিতে দধি ও দুগ্ধ ব্যবহারের বিধি আছে। পঞ্চামৃত পঞ্চগব্য না হইলে বিশেষ পূজাই হয় না।

উপসংহারে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে গাভীগণ হইতে দধি দুগ্ধ প্রভৃতি প্রাপ্ত হই তাহাদের উন্নতিকল্পে ভারতবাসী বড়ই উদাসীন।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

"বাংলা নির্দ্দেশক" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

গত আশ্বিনের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'বাংলা নির্দ্দেশক' সম্বন্ধে 'কয়েকটি কথা'র আলোচনা।

১। 'টা' 'টি'কে নির্দ্দেশক রূপে বোঝাই প্রকৃষ্ট; ইংরাজীতে যাহাকে Article বলে। যেমন The Sky, বাঙ্গালায় 'আকাশটা' বা 'ঐ আকাশ' বলিলেও তাহাই বুঝি; The man একটি নির্দ্দিষ্ট মনুষ্য, তখন মানুষটা। কিন্তু ইংরাজীতে Article যোগে যেমন আবার একটি জাতি বা সমাজ বুঝায়, আমাদের বাঙ্গালা নির্দ্দেশকে তাহা বুঝায় না। তবেই 'টা' বা 'টি'কে "গোটা" শব্দের অপভ্রংশ বলা কতদূর সঙ্গত হয় বলিতে পারিলাম না। "গোটা" একটি বিশেষণ, অর্থ—পূর্ণ বা অখণ্ড। যেমন একখানা গোটা কাপড়। কিন্তু কাপড়ের যখন খণ্ডমূর্ত্তি ন্যাকড়া বুঝায় তখন আর গোটা ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু 'টা,' বা 'টি' 'খানি' বা 'খানা' তখন অনায়াসেই ব্যবহৃত হয়। তবেই টা, টি, খানি, খানা, এগুলি যেমন নির্দ্দেশক গোটা তেমন নয়। হরিণটা, টেবিলটা, মাঠটা-তে টা প্রয়োগে নির্দ্দেশ করিতেছে—কিন্তু অখণ্ড বুঝাইতেছে না। অতএব গোটা হইতে টা-র উৎপত্তি কেমন অসঙ্গত মনে হইতেছে না কি?

২। 'খানা' বা 'খানি'র সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহা অপেক্ষা অধিক বক্তব্য কিছুই নাই। খানি-খানা-শব্দান্ত কথায় খণ্ড বা অখণ্ড কিছুই মনে আসে না, আসে শুধু একটি বস্তুবিশেষের প্রতিচ্ছায়া। কাগজখানা, শ্লেটখানা, হরিণটা, টেবিলটা, মাঠটাতে বিশেষ্যগুলিকেই

নির্দ্দিষ্টরূপে মনে পড়ে, তাহাদের খণ্ড অখণ্ডের কথা মনে আদৌ আসে না। সহজে এবং শীঘ্র যাহা বোধগম্য হয় তাহার উপরেই ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যাকরণ-জননী ভাষাও সেই সূত্রে কোন্ অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে যাহাদ্বারা ভাব প্রকাশ করা যায় (এবং যাহাকে সহজে বোঝে) তাহাই ভাষা। ব্যাকরণের সময়েও তবে কেন আমরা দূরানীত একটি অর্থ ধরিতে যাইব?

৩। অরূপ পদার্থ সম্বন্ধে 'খানি খানা'র ব্যবহার নাই কিন্তু যখন সেই পদার্থকে একটি মূর্ত্তি দেওয়া হয় (অর্থাৎ Personify করা হয়) তখন ব্যবহার হয়; তাহা হইলে "ব্যাপার খানা" কি? এখানে ব্যাপারটিকে কি বুঝিব?

৪। অনেকখানি জল হয় কিন্তু 'খানা' হয় না—অথচ বর্দ্ধমান, নদীয়া অঞ্চলে অনেকখানা দুধ, অনেকখানা জল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

৫। 'গাছা' ও 'গাছির' সহিত 'টি' ও 'টা' যুক্ত হইলে অন্তস্থিত 'আ' ও 'ই'কারের লোপ হয়, এবং আরও একস্থলে হয়, যখন সংখ্যা-বাচক শব্দের সঙ্গে যোগ হয়, যেমন একগাছ লাঠি, দশগাছ ছড়ি।

৬। সরু জিনিষ লম্বায় ছোট হইলে গাছা ব্যবহৃত হয় না। এ সূত্রটি ঠিক নয়। দড়ি গাছা বা দড়ি গাছি বলিলে ছোট বড়'র কোন প্রসঙ্গই উঠেনা। 'খানি' ও 'খানা' ঠিক 'টি' ও 'টা'র মতই অর্থ প্রকাশক। "চুলগাছি" বলিলে লম্বা চুল বুঝায় ছোট চুল বুঝায় না, এ একবারেই নয়। চুলগাছি ও চুলগাছা উভয়ই সমার্থবাচক। 'গাছি' ও 'গাছা'রই সমার্থবাচক খি' শব্দ সরু বস্তুর নির্দ্দেশক রূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন একখি চুল, পাঁচখি সূতা—ইহাতে লম্বায় ছোট বা বড় কিছুই বুঝায়না, বুঝায় সরু এবং লম্বাকার কোনও বস্তু।

৭। 'টুকু' বা 'টুক্' নির্দ্দেশকরূপে ব্যবহৃত হয় বটে কিন্তু প্রকৃত ইহারা নির্দ্দেশক নয়। এ শুধু একটি বিশেষণ—অংশ বা পরিমাণ-বাচক একটি প্রত্যয়। সজীব পদার্থের সহিত ইহা ব্যবহৃত যে হয় না কেন, বা পথটুকু এয়ারিংটুকুও যে হয় না কেন তাহার সম্বন্ধে একটি সূত্র করা যাইতে পারে। যেমন যে সকল পদার্থের অংশ স্বতন্ত্র আংশিক অবস্থাতেও সেই পদার্থেরই পরিচায়ক তাহাদের পরেই টুকু বসে, এবং যে বস্তুর অংশ সে প্রধান বস্তু হইতে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হয় বা যে বস্তুর অংশ হইতে পারেনা তাহাদের পর টুকু ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণ—এয়ারিং একটি বস্তু তাহার অংশ একটি এয়ারিং নহে (সেটি সোনা) কাজেই এয়ারিংটুকু হয় না; কিন্তু সোনার অংশও সোনার পরিচায়ক, এরূপ আংশিক অবস্থাতেও সে সোনা ভিন্ন কিছুই নয়, এই জন্য সোনাটুকু ব্যবহৃত হয়। মানুষের অংশ হয় না এই জন্য টুকুরও প্রত্যয় হয় না। কাপড়টুকু কাগজটুকু শ্লেটটুকু সবই হয়, কাপড়, কাগজ ও শ্লেটের অংশ এবং সেটুকুও কাপড় কাগজ ও শ্লেট,—এই অর্থে।

লেখক মহাশয়ের "স্বল্পতা বাচক" শব্দটি হইতে "পরিমাণ বা অংশ বাচক" শব্দ যেন অধিকতর প্রযুজ্য বলিয়া মনে হয়। 'টুকু' ক্ষুদ্রার্থকও হয়, কিন্তু সেও অংশেরই স্পষ্ট ভাব।

'একটুখানা' হয় না তাহা নয়, একটুখানাও হয়।

এই স্থলে আমার আর একটি বক্তব্য আছে, এইটি বলিয়াই আমি উপসংহার করিব। বঙ্গভাষার নির্দ্দেশকগুলি সম্বন্ধে একটি সাধারণ সূত্র করিতে চাই। যথা—এই নির্দ্দেশকগুলি (টি, টা, খানি, খানা, গাছি, গাছা, টুকু, টুক্, খি প্রভৃতি) নির্দ্দেশক এবং বিশেষণ উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। নির্দ্দেশক হইলে বিশেষ্যের অব্যবহিত পরে বসিবে, যেমন ঘরখানি, ঘরটি ইত্যাদি। বিশেষণ হইলে সর্ব্বনাম বা সংখ্যা-বাচক শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া বিশেষ্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে বসে, যেমন, অনেকখানি জল, একটি বাড়ী, যতগাছি চুল। নির্দ্দেশকগুলি বিশিষ্ট (Definite article) ও অবশিষ্ট নির্দ্দেশক (Indefinite article) রূপেও ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত রূপেই বিশেষণ হয়। যেমন বাড়ীটা বিশিষ্ট নির্দ্দেশক ও একটা বাড়ী অবিশিষ্ট নির্দ্দেশক। অবিশিষ্ট নির্দ্দেশক রূপে ব্যতিক্রমও হয়, যেমন "হরির কলকাতায় যে একখানি বাড়ী আছে সেখানি বড় সুন্দর"। স্থূলতঃ নির্দ্দেশকগুলির পরিবর্ত্তন বা বিকল্প ব্যবহার সম্বন্ধে ঠিক কোন নিয়মই করা যাইতে পারে না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দিবাভাগে নক্ষত্র দর্শন

দিবাভাগে নক্ষত্র দর্শন কথাটা অনেকে আশ্চর্য্য মনে করিতে পারেন বটে; কিন্তু ইহা বাস্তবিক, অসার কল্পনা নহে। কয়েক বৎসর গত হইল, বিভূতিবিদ্যা নামক পুস্তকে পড়িয়াছিলাম অগস্ত্যপুষ্প অথবা শ্বেত কলমীর রস চক্ষে দিয়া দর্শন করিলে দিবাভাগেও তারকাসকল দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই; কেন না, তাহার অনুকূলে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা কারণ ছিল না; আর এই বিজ্ঞান-চর্চ্চার দিনে কারণ বা যুক্তি প্রদর্শিত না হইলে কেহই কোন কথা বিশ্বাস করিতে চাহে না। তাই উক্ত বাক্যের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় লইলাম। বিজ্ঞান বলিল অতি সামান্য উপায়ে নক্ষত্রসকল আমা-দিগের নগ্নচক্ষেও প্রতিভাত হইতে পারে। আলোক ব্যতীত আমরা কোন বস্তুই দর্শন করিতে পারি না। আবার যেটা আমাদের দ্রষ্টব্য পদার্থ, কেবল তাহা-রই প্রতিফলিত আলোকে আমরা সেই পদার্থকে কখনই দৃষ্টিগোচর করিতে পারি না; বিক্ষিপ্ত আলোক (Diffused light) প্রভাবেই আমরা যাবতীয় পদার্থ দর্শন করিতে পাই। সূর্য্যালোকে বায়ুমণ্ডলের প্রতি পরমাণুই আলোক প্রতিফলিত করে। সেই আলোক চতুর্দ্দিক হইতে আমা-দের চক্ষে আসিয়া পড়ে। কিন্তু ঐ আলোকসমষ্টি নক্ষত্রের ক্ষীণ রশ্মি অপেক্ষা অতি প্রবলতর বলিয়া নক্ষত্র-নিচয় আমাদের নয়নে প্রতিভাত হয় না। যদি কোন অবস্থায় এই বিক্ষিপ্ত আলোকসমষ্টি নক্ষত্ররশ্মি হইতে ক্ষীণতর হয়, তাহা হইলে তারকারাজি অবশ্যই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। দিবাভাগে কেহ গভীর

কূপাভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইলে বায়ুমণ্ডল-প্রতিফলিত কেবল লম্ব রশ্মিই (Perpendicular rays) তাহার নয়নে পতিত হয়, চতুঃপার্শ্বস্থ বিক্ষিপ্ত কিরণমালা তাহার নয়নমণি স্পর্শ করিতে পারে না। এই অবস্থায় এই বিক্ষিপ্ত আলোকসমষ্টি নক্ষত্রের ক্ষীণ জ্যোতি হইতেও ক্ষীণতর হওয়াতে নক্ষত্রসমূহ দিবাভাগেও তাহার নয়নপথে পতিত হয়। ইহা প্রমাণিত।

শ্রীহরিতোষ দত্ত।

পেচক ও হংস

গর্ব্বিত ভাবে করি পরিহাস
পেচক কহিল হংসে,
"তব উদ্ভব, কহ, কলরব!
কোন্ বিজ্ঞের বংশে?
যারে ভজ তুমি, তার পদ চুমি,
কেনহে নিঃস্ব বিশ্বে?
মম ঈশ্বরী নরবর করি
রাখেন আপন শিষ্যে।"
কহিল মরাল, "দূর্ জঞ্জাল,
কথা তুলে হ'লি জব্দ,
কি বুঝিবি জড়, লক্ষ্মীর চর!
বাণীর বীণার শব্দ?—
অনুকরি তাহা শিখিয়াছি যাহা,
গাহি তা' ললিত ছন্দে,
আকাশে-অনিলে মুক্ত সলিলে
বিহরি মন্দে মন্দে।
প্রাণে শত আশা, বেঁধেছিস্ বাসা
কমলার পদপ্রান্তে,
তথাপি আহার ইঁদুরাদি ছার,
তাও ঘটে দিবসান্তে।"

শ্রীরঘুনাথ সুকুল।

পুস্তক পরিচয়

বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য-প্রণালী—

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ প্রণীত চতুর্থ সংস্করণ। সূর্য্যনারায়ণ বাবু ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব কেমিক্যাল এসিষ্টেণ্ট ছিলেন। এই পুস্তকখানি ছাড়াও তিনি অন্য অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। সকলগুলিই প্রায় সহজ ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখিত। এখানিও "বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালী"। এই কয় বৎসরে যে পুস্তকের এত সংস্করণ হইল তাহাতেই বুঝা যায় গ্রন্থখানি লোকের কতই প্রিয় হইয়াছে। তবে বিষয়টিও বড় মুখরোচক ও আবশ্যকীয়। এসম্বন্ধে সকলেরই কিছু কিছু জানা উচিত। অনেকগুলি আবশ্যকীয় সারগর্ভ কথা সরল ভাষায় বলা আছে। সকল নরনারীরই এ পুস্তকখানি পড়িলে অনেক উপকার হইবে। কিন্তু "বৈজ্ঞানিক" কথার সঙ্গে সঙ্গে অনেক অনেক অবৈজ্ঞানিক কথাও আছে। সেগুলি অত্যধিক কল্পনাপ্রসূত। পুস্তকের গোড়ার পাতগুলিতেই "পুন্নাম নরকের" একটি ছবি আছে। সেটি বড়ই অবৈজ্ঞানিক হইয়াছে। তার চারি ধারের শ্লোকগুলি আরও বিজ্ঞানের অনুচিত। এরূপ অন্যান্য স্থান বাদ দিলে এপুস্তকখানি অৰ্দ্ধেক পাতে লেখা যায়। কল্পনাপ্রসূত এই জল্পনাগুলি বাদ দিয়া লিখিলে এপুস্তকখানি আরও আদরের হইত।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

প্রথমশিক্ষা শারীরক্রিয়া ও স্বাস্থ্যবিধি—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল, এম, এস, প্রণীত, ডাক্তার শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত। প্রকাশক Twentieth Century Publishing Company, ২৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৭৬ পৃষ্ঠা, শক্ত বোর্ডের মলাট। বহু চিত্র সম্বলিত। মূল্য আট আনা। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং—শরীরটা আগে তারপর আর সমস্ত। এই শরীরযন্ত্রের কোথায় কোন কল কব্জা আছে, এবং কখন কোনটা কিরূপে বিগড়াইতে পারে তাহা জানা থাকিলে অনেকটা সামলাইয়া চলা যায় এবং কখনো অল্পস্বল্প বিগড়াইয়া গেলেও নিজেই অনায়াসে মেরামত করিয়া লওয়া সহজ হয়, ফিহাতে ফি হাতে ডাক্তারের দ্বারে দৌড়িবার আবশ্যক থাকে না। কোনো বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান শৈশবে আয়ত্ত হইলে তাহা যেমন সহজ হইয়া উঠে এমন বয়সকালের শিক্ষায় হয় না; এজন্য আজকাল বিশিষ্ট অধ্যাপকদের মত যে শৈশবেই সকলবিধ বিষয়ের রসাস্বাদ করাইয়া দেওয়াই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং বয়সকালে যার যাহা বিশেষ ভালো লাগিবে সে তাহাই বিশেষভাবে আয়ত্ত করিবে। সমালোচ্য পুস্তকখানি শিশুশিক্ষার উপযোগী করিয়া সহজ ঘরের কথায় চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া বুঝাইয়া লেখা হইয়াছে। ইহা শিশুদের স্কুলে ও গৃহে পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবার উপযুক্ত। চলিত ভাষার মধ্যে মধ্যে লিখিত ভাষার সংমিশ্রণ হওয়াতে ভাষার অনাহত ছন্দ নষ্ট হইয়াছে, এই একটি মাত্র সামান্য ত্রুটি পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করা শক্ত হইবে না।

অভিষেক—

শ্রীজীবানন্দ মল্লিক কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত। মূল্য লেখা নাই। রচনা পদ্যে। বিষয় ভারতসম্রাটের দিল্লিতে অভিষেক।

গল্পলহরী—

সরযূবালা প্রণীত। প্রকাশক সিটিবুক সোসাইটি। মূল্য চার আনা। ৭৫ পৃষ্ঠা। ছাপা পরিষ্কার। মলাটে সোনালি অক্ষরের নামটি সুন্দর। এখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক; গল্পচ্ছলে নীতি উপদেশ।

ভাষা সরল ও শুদ্ধ, গল্পগুলিও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু সকল গল্পই বিদেশী ঘটনার। সে একদিন ছিল যখন আমাদের দেশী সৎকর্ম্মের দৃষ্টান্ত এক পৌরাণিক ভাণ্ডার ছাড়া অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিল; কিন্তু এখনও সে দিন আছে বলা যায় না; বহুল সংবাদপত্র প্রচলনে দেশের সামান্য খবরটিও আমাদের দ্বারে আসিয়া হাজির হইতেছে; একটু চেষ্টা থাকিলেই তাহা হইতে বাছিয়া একটি মনোজ্ঞ গল্পলহরী সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বিদেশী গল্পই ছেলে বেলা হইতে পড়িলে ছেলেদের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে যতকিছু ভালো সব বিদেশে, ভালো বলিয়া কিছু নিজের দেশে নাই। এভাবের জন্য তাঁহারা দায়ী যাঁহারা শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। এখন আর ইংরাজি বই খুলিয়া অনুবাদ করিলে চলিবে না, খাঁটি স্বদেশী সাহিত্য সৃষ্টি করিবার দিন আসিয়াছে, এজন্য শ্রম স্বীকার করিয়া ঘরের খবর সংগ্রহ করিতে হইবে।

কল্পকথা—

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। মূল্য আট আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহা নিজগুণে সমাদৃত হইয়াছে; ইহার নুতন পরিচয় অনাবশ্যক। যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের জন্য বক্তব্য যে এখানি জাপানি গল্পের ভাব লইয়া রচিত গল্পের বই, রচনা সরস।

খৃষ্ট—

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, মূল্য চার আনা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত। ভূমিকায় ভগবান ঈশার জীবনের বিশেষত্ব ও তাঁহার নিকট সমগ্র মানব সমাজের ঋণ চমৎকারভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। গ্রন্থভাগেও মহাত্মা যিশুর মহৎজীবন বিশ্বমানবের সম্পত্তি-রূপেই আলোচিত ও তাঁহার জীবনকেন্দ্রের বিশেষত্বটি উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ বালক ছাত্রদিগকে পড়াইলে তাহাদের মন অসাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষভাবে সতেজ হইয়া গঠিত হইবে এবং তাহা হইলে তাহারা সকল কালের সকল দেশের মহাপুরুষদিগকে নিজেদেরই গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবে। গ্রন্থের রচনাভঙ্গীটি অনেক স্থলে অত্যন্ত জটিল, দীর্ঘপদবহুল ও mannerism-দুষ্ট হইয়াছে।

বহুরূপী—

একতা-সম্পাদক প্রণীত। ১৯ নীলমণি মল্লিকের লেন, হাবড়া। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ২০৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠরূপ সোনার ছাঁচে পাঁক ছাপিয়া তোলা হইয়াছে। যেমন বা ভাষা, তেমন বা প্লট।

শান্তি—

নির্ব্বাণ-রচয়িত্রী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ। ৭১ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৴০ আনা। কবিতা-পুস্তক। ছন্দ ও ভাব কাঁচা। মধ্যে মধ্যে এক একটি কবিজনোচিত ভাবব্যঞ্জনা আছে।

ভক্তি ও উপাসনা—

কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ। বিনামূল্যে বিতরিত।

হিন্দী শিক্ষাসোপান—

প্রকাশক কাশী যোগাশ্রম। বাঙালীর হিন্দী শিক্ষার সাহায্য হইতে পারে। ভাষার ধাত বুঝিয়া বেশ প্রণালীসঙ্গত উপায়ে হিন্দীর ব্যাকরণ ও প্রকৃতি মোটামুটি বুঝানো হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণানন্দ স্বামীর হিন্দী রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু বিদেশীর লেখা কোনো রচনা বিশুদ্ধ রীতির দৃষ্টান্ত বলিয়া উপস্থিত করা যুক্তিসঙ্গত বা নিরাপদ নহে। আতিশয্য ভক্তিরও খারাপ।

আনন্দময়ী—

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ দে প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। ডঃ ফুলস্ক্যাপ ১৬ অংশিত ৭৩ পৃষ্ঠা মূল্য ৸০ আনা মূল্য অত্যন্ত বেশি খরচের হিসাবে; গুণের হিসাবে আরো বেশি। ইহাতে গ্রন্থকার ভ্রমণে বাহির হইয়া এক অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন গুরু লাভ করিয়া অনেক অলৌকিক ঘটনা পার হইবার পর কেমন করিয়া কৈলাসে সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণার কোলে সশরীরে উঠিয়াছিলেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এমন আজগুবী কথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, তাহার কারণ লেখকের মতে আমাদের অবিদ্যা নষ্ট হয় নাই। গ্রন্থের মুখপত্র রূপে পরমহংস বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামীর প্রতিকৃতি আছে; পরমহংস কিন্তু উপবীতী। ইনিই বোধ হয় আনন্দময়ীর পাণ্ডা।

ঠাকুর দয়ানন্দ—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবিপুলানন্দ সরস্বতী, অরুণাচল আশ্রম, শিলচর। ১৭৯ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। অরুণাচল আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর দয়ানন্দ দেবের লীলাকাহিনী। এ লীলা অতিপ্রাকৃত বলিয়া এই বৈজ্ঞানিক যুগে সহজে কেহ স্বীকার করিবে না। কিন্তু গ্রন্থকার একজন এম-এ, বি-এসসি, হইয়াও অগাধ বিশ্বাসের সহিত সমস্ত বর্ণনা করিয়াছেন। ঠাকুরের অসংখ্য অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে প্রকৃতি ভাবে উপাসনা করিতে করিতে দেহে পর্য্যন্ত স্ত্রীলক্ষণ প্রকাশ নিতান্ত অবিশ্বাস্য। ঠাকুরের রচিত গান ও কবিতা লেখকের মতে বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়, এমন আর নাই—কিন্তু নমুনা দেখিয়া মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলা গ্রন্থকারের বিচারশক্তি কিছুমাত্র গঠিত করে নাই। সহজজ্ঞান বা common sense কি জগতে এতই uncommon? ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে অনেক ভালো কথা অবশ্য আছে—কিন্তু তাহাও অসাধারণ বা নিতান্ত নুতন নহে।

মনোহরা—

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। ৩২।৭ বিডন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। ৯৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র। মূল্য আট আনা। শিশুদের উপযোগী গল্প-পুস্তক। গল্পগুলির ৮টি ইংরাজী Grimm's Fairy Tales হইতে দেশী ভাবে রূপান্তরিত, ২টি গ্রন্থকারের স্বরচিত। রচনার ভাষা ও ভঙ্গী গল্পের আখ্যানের সহিত ঠিক খাপ খায় নাই এবং যাহাদের জন্য উদ্দিষ্ট তাহাদের পক্ষে ভাষাও বিশেষ সহজ হয় নাই।

শাক্যসিংহ—

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ বিরচিত। প্রকাশক শ্রীমণিভূষণ নাথ, ৪ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা। ৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৴০ আনা। ইহাতে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের কাহিনী পণ্ডিতীভাষায় জটিল আড়ম্বরের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার অভিমত ও বৌদ্ধযুগের সংস্কারের প্রতি সশ্রদ্ধ ভাবটুকুই ইহার উপভোগ্য।

মণিভদ্র—

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ বিরচিত। প্রকাশক নববিভাকর যন্ত্র। ৯৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। এখানিতেও বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ঘটনা কথাচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনার মধ্যে একটু রোমান্টিক ভাব ছিল, কিন্তু লেখক তাহা ফুটাইতে বা জমাইতে পারেন নাই। জটিল সমাসবহুল আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা ও সেকেলে পণ্ডিতীধরণ প্রধান

অন্তরায় হইয়াছে। কিন্তু ইহারও মধ্যে লেখকের উদারতা ও সংস্কারে শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহাই উপভোগ্য।

আত্মোৎকর্ষ—

শ্রীগোপাল চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক উইলকিন্স প্রেস, মূল্য ৷৵০ আনা। এখানি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ব্লাকীর Self Culture নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ছাত্রদিগের জন্য উদ্দিষ্ট।

ভক্তিযোগ—

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী প্রণীত। মূল্য ।০ আনা।

কণা—

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক বরিশাল ন্যাশনাল এজেন্সি। মূল্য আট আনা। রবিবাবুর কণিকার ধরণের কবিতাকণার পুস্তক। দীর্ঘ কবিতাও আছে। এরূপ কবিতা হীরককণার মতো স্বচ্ছ নির্ম্মল না হইলে কোনো সার্থকতা নাই; ভাবুকতা ও তত্ত্বই কবিতা হয় না।

শান্তি—

শ্রীসতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, চাঁদপুর, ত্রিপুরা। মূল্য চার আনা। এখানি গানের বই। কিন্তু লেখক স্বীকার করিয়াছেন "আমি কবিও নহি, গায়কও নহি।" একথার সমস্তটাই বিনয় নহে।

সংক্ষিপ্ত ভূদেব-জীবনী—

চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। এখানি ঠিক জীবনচরিত নহে; ইহাতে ভূদেব বাবুর জীবন সম্বন্ধে গুটিকয়েক মোটামুটি সঙ্কেত লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতেই আসল মানুষটিকে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ভূদেব বাবুর অন্তরের প্রধান বিশেষত্ব ছিল স্বদেশপ্রেম, এবং ইহা মনে রাখিলেই তাঁহাকে বুঝিতে পারা সহজ হয়, নতুবা তাঁহার আচার উক্তি বিসদৃশ ঠেকিতে পারে। তিনি দেশকে ভালো বাসিতেন বলিয়া কখনো দেশের আচার আচরণ, দেশের অধিবাসী, দেশের শিল্প, দেশের ভাষা, দেশের কিছুই অবহেলা করেন নাই। তিনি এক দিকে যেমন নিষ্ঠাবান হিন্দু অপর দিকে তেমনি ভিন্নধর্ম্মী মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, এবং কোল ভিল সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্য অন্ত্যজ জাতিদিগকে পর্য্যন্ত শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা উন্নত করিয়া জলাচরণীয় হিন্দুশ্রেণীতে গণ্য করিবার পক্ষপাতী। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সমশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রচলন ও সার্ব্বদেশিক একভাষা হিন্দি প্রচলনের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের কত দিন আগে এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ প্রাচীন ঋষির ন্যায় যে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা এখনো পালন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই একটি খাঁটি মানুষ, যাঁহাকে হিন্দুরা নিজেদের পাণ্ডা বলিয়া গর্ব্ব করেন, কেমন সরল নির্ভীক ভাবে যাহা সত্য ও কল্যাণ তাহাই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই পুস্তকপাঠে বেশ জানা যায়। এ পুস্তক গোঁড়া হিন্দুর পড়া উচিত; সংস্কারপ্রার্থী হিন্দুমুসলমানের পড়া উচিত; গোঁড়া মুসলমানের পড়া উচিত। হিন্দু কাহাকে বলে এবং হিন্দুমুসলমানের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কেমন হওয়া উচিত তাহা ভূদেব বাবুর জীবনে ব্যক্ত দেখা যায়।

পুস্তকের ছাপা, কাগজ, কালি, টাইপ, ভালো নয়। ভাষাও প্রশংসার যোগ্য নয়। এই দুই দোষ পরিহার করিয়া একটি সুলিখিত সুগঠিত জীবনচরিত প্রকাশ করিলে বাঙালীর উপকার করা হইবে।

পতিব্রতা, পূর্ব্বভাগ—

মাইকেল মধুসূদনদত্তের জীবনচরিত-লেখক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক—সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরী, ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩১৮। মূল্য সাধারণ সংস্করণ একটাকা; রাজসংস্করণ দেড় টাকা। ১৯৬ পৃষ্ঠা। ছয়খানি ছবি। বাঁধাই জাঁকাল ও মূল্যবান্। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

এই পুস্তকে সতী, সুনীতি, গান্ধারী, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও শকুন্তলা এই ছয় জন পুণ্যবতী পতিব্রতার আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা বিশুদ্ধ, সুললিত ও সুখপাঠ্য। পুস্তকখানি পাঠ করিলে নারীগণ যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন ও নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কষ্টিপাথর

আর্য্যাবর্ত্ত (ভাদ্র)—

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার "দ্রবময়ী চণ্ডালিনী" নাম্নী একটি বীরনারীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। ৩০।৪০ বৎসর আগেকার কথা। এই নারী হুগলি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের বড় সাহেবের সম্মুখে লাঠি খেলার অদ্ভুত শক্তি দেখাইয়া তাহার মৃত স্বামীর চৌকীদারী পদ প্রাপ্ত হয়। দুই জন পুরুষ একসঙ্গে আক্রমণ করিয়াও দ্রবময়ীর গায়ে একটি আঘাতও করিতে পারে নাই। উপসংহারে সরকার মহাশয় বলিয়াছেন "দ্রবময়ী এখন স্বর্গের চণ্ডাল-লোকে।" স্বর্গেও তাহা হইলে ভয়ানক জাতিভেদ এবং ছুতের ভয়!

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এবারকার "পুরাতন প্রসঙ্গে" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট শ্রুত পুরাতন থিয়েটারের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহেন্দ্র বাবু কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। মহারাজা ঠাকুরের বাড়ীতে প্রথম অভিনয় হয়। তাহার পূর্ব্বে লক্ষ টাকা ব্যয়ে একজন ধনী বিদ্যাসুন্দর অভিনয় করান, তখন মহেন্দ্র বাবুর জন্ম হয় নাই। দ্বিতীয় অভিনয় ছাতু বাবুর বাড়ীতে। অভিনয় হয় শকুন্তলার; শরৎ বাবু বিশ হাজার টাকার অলঙ্কার পরিয়া শকুন্তলা সাজিয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তারপর পাইকপাড়ার রাজাদের বাড়ীতে রত্নাবলী ও শর্ম্মিষ্ঠা নাটক অভিনীত হয়। কবিচন্দ্র নামে খ্যাত এক ব্যক্তি, ধীরাজের সমসাময়িক, নাটকের গান বাঁধিয়া দিতেন। ছাতু বাবুর বাড়ীতে ৩।৪ বৎসর পরে আবার মহাশ্বেতা অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে অভিনীত হয় বেণীসংহার; ভানুমতীর রূপ ও সজ্জা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আনন্দে হাততালি দিয়াছিলেন; এমন বাহবা আর কেহ কখনো পায় নাই। তাহার পর সিঁদুরিয়াপটিতে মেট্রোপলিটন কালেজে বিধবাবিবাহ নাটক ও গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে রামনারায়ণ পণ্ডিতের মালবিকাগ্নিমিত্র অভিনীত হয়। মহারাজা ঠাকুরের বাড়ীতে মহারাজার রচিত বিদ্যাসুন্দর নাটক, রুক্মিণী হরণ, মালতীমাধব, উভয় সঙ্কট, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, বুঝলে কিনা, প্রভৃতি অভিনীত হয়। বুঝলে কিনা মহারাজার রচিত কৌতুকনাট্য; ইহাকে লক্ষ্য করিয়া একজন এক নাটক লিখে কিছু কিছু বুঝি। মহারাজের বাগানে মালতীমাধব অভিনয় দেখিতে লর্ড নর্থব্রুক আসিয়াছিলেন। লাটসাহেব মহেন্দ্র বাবুর অভিনয়ে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান; তখনো ইঁহার অভিনয়ের বেশ; সেই বেশেই দেখা করিতে চলিলেন; মহারাজা শিখাইয়া দিলেন লাটসাহেবকে My Lord বলিবেন, খবরদার Sir বলিবেন না। মাইকেল মধু কানে কানে বলিয়া দিলেন সাবধান,

My Lord. লাটসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—Were you the hero when I came to his residence? কম্পিতকণ্ঠে উত্তর হইল—Yes sir. মহারাজা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—Yes my Lord; there were two heroes, he was one of them. যখন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী সান্ন্যালদিগের বাড়ীতে পেশাদারি থিয়েটার খুলিলেন তখন ইঁহারা retire করিলেন। তখনও পেশাদারি থিয়েটারে পুরুষে স্ত্রীলোক সাজিত। মহেন্দ্র বাবু ১৪ বৎসর বয়সে চার এয়ারের তীর্থ-যাত্রা নামে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। মহেন্দ্র বাবু second best বিদূষক বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন; কেশব গাঙ্গুলি তখনকার দিনের সেরা বিদূষক ছিলেন।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'রামায়ণ ও মহাভারত' কবে বিরচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া অন্তর ও বাহ্য প্রমাণ হইতে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে মহাভারত প্রায় ৫০০০ বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ।

শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায় 'রাজা মটুক রায়' সম্বন্ধে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। পাঠান শক্তির অবক্রান্তি ও মোগল শক্তির আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণে যে সকল হিন্দু নৃপতি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন রাজা মটুক রায় তাঁহাদের অন্যতম। যশোহর জেলার ঝিকরগাছার সন্নিকটে লাউজিনি গ্রামে ইঁহার রাজধানীর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

মানসী (আশ্বিন)—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যৌবন রচনা 'প্রকাশ' নামক কবিতার পাঠান্তর 'ধরাপড়া' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

কোহিনূর (আশ্বিন)—

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র "অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই—

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে মাসিডন-অধিপতি ফিলিপ তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল অবরোধ করেন। একদা নিশাকালে গোপনে অন্ধকারে তাঁহার সৈন্যগণ প্রাচীর ভগ্ন করিতেছিল। সেই সময় সতারকা চন্দ্রকলা উদিত হওয়াতে দুর্গপ্রহরিগণ শত্রুর কার্য্য দেখিতে পায় এবং সেই সময় হইতে সতারকা চন্দ্রকলা তুরস্করাজ স্বকীয় রাজশক্তির চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করেন, বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। মতান্তরে বলে যে, প্রাচীন তুর্কিগণ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে রোমসম্রাট কনস্তানটিন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া আসিয়া-মাইনরে পলায়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে ওসমান নামে এক বীর্য্যবুদ্ধিসম্পন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া তুর্কিদের অধিনায়ক হন। এবং তিনি তুরস্ক জয় করিয়া আসিয়া-মাইনরে একাধিপত্য সংস্থাপিত করেন। তদ্বংশীয় সুলতান মোহাম্মদ ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে রোমকদিগের নিকট হইতে ইস্তাম্বুল জয় করিয়া তাহাতে তুরস্কের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। আসিয়া-মাইনর অধিকারের পূর্ব্বে ওসমান স্বপ্নে দেখেন একটি সতারকা চন্দ্রকলা ক্রমশ উভয় শীর্ষ বৰ্দ্ধিত করিয়া পূর্ব্বপশ্চিমের সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। ইহা ইসলামের ধর্ম্মশক্তি ও রাজশক্তি বিস্তারের ঐশ্বরিক ইঙ্গিত মনে করিয়া তিনি ঐ চিহ্ন স্বীয় পতাকায় গ্রহণ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ঐ চিহ্ন হজরত মহম্মদের সমসাময়িক; ভগবান ঈশার আবির্ভাবের পর যে তমসা ঘনীভূত হইয়াছিল তাহা দূর করিয়া প্রতিপদের চন্দ্ররূপে মহম্মদের আবির্ভাব সূচনা করিবার জন্যই ঐ চিহ্ন। হজরত মহম্মদের সময়ে জাতীয় পতাকায় একটি সর্প চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। ইসলামধর্ম্মরূপী আজদ্দহা নামক এক অজগর সর্প পবিত্র হেজাজের মক্কানগররূপ বিবর হইতে বাহির হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিবে এই সংকেত। কিছুকাল পরে এই চিহ্ন পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

ভারতমহিলা (আশ্বিন)—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন বলেন যে "ভারতনারীর চিত্রবিদ্যা" শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে নারীগণ তখন এই বিদ্যার ও সঙ্গীতের বিশেষ চর্চ্চা করিতেন। এক্ষণে পুনরায় এই দুই বিদ্যায় নারীর অধিকার জন্মিলে পরিবার সমাজ দেশ শান্তি শ্রী কল্যাণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রতিভা (ভাদ্র)—

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "লক্ষ্মণ সেন" বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বিজিত হন নাই; মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের অন্তত '৩০ বৎসর' পূর্ব্বে তাঁহার দেহাবসান হইয়াছিল। কতকগুলি নবাবিষ্কৃত শিলালিপি এই মতের পোষকতা করিতেছে।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সেন "রসায়ন-বিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ" ধারাবাহিক ইতিহাস দিবার প্রয়াস করিয়াছেন। বহু পণ্ডিত অবিসংবাদিত প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষেই প্রথম রসায়নবিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। বৈদিক সাহিত্যে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম পঞ্চভূতের তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটল ঐ সকল ভূতের নাম গ্রহণ করেন, কেবল তিনি পঞ্চম ভূত ব্যোম স্বীকার করেন নাই। আরিষ্টটল আর একটি মতবাদ প্রচার করেন যে প্রত্যেক নিকৃষ্ট ধাতুকে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করা যাইতে পারে। এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া সকল দেশে লোহাকে সোনায় পরিণত করিবার দুশ্চেষ্টা আরম্ভ হয়, এবং তাহার ফলে রসায়ন-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হইতে থাকে। মিশর দেশে এই বিদ্যার নাম হয় কিমিয়া বা গুপ্তবিদ্যা; আরবেরা উহা গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভাষার নির্দ্দেশক যোগ করিয়া নাম করেন অলকেমি। আরব-দিগের মধ্যে জেবের নামক এক পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রচার করেন যে ধাতুসকল পারদ ও গন্ধক এই মূল উপাদানে গঠিত যৌগিক পদার্থ; যে ধাতুতে গন্ধক যত অধিক তাহা তত নিকৃষ্ট, তাহা অগ্নিতে নষ্ট হয়। তিনি সোনা গলাইবার মহাদ্রাবক আবিষ্কার করেন। স্পেনের উন্নতি সময়ে এই বিদ্যা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক তথায় নীত হয়। ১৩শ শতাব্দীতে য়ুরোপে ইহার চর্চ্চা বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। সেবিল ভেলেণ্টাইন নামক এক পণ্ডিত প্রচার করেন যে ধাতুসকলের উপাদান কেবল মাত্র পারদ ও গন্ধক নহে, উহাদের মধ্যে লবণও আছে। ভান হেলমণ্ট ১৬শ শতাব্দীতে অগ্নির ভৌতিক অস্তিত্ব ও মাটীর মৌলিকত্ব অস্বীকার করিলেন। রবার্ট বয়েল ১৭শ শতাব্দীতে বহু মূল পদার্থ আছে বলিয়া প্রথম প্রচার করেন। ষ্টল পরে প্রচার করিলেন যে সকল দাহ্য পদার্থই যৌগিক। ১৭৬৩ সালে ব্লাক ক্ষারবদ্ধ বায়ুর অস্তিত্ব এবং Latent heat ও specific heat আবিষ্কার করেন। আবদ্ধ বায়ু আবিষ্কারের পর বায়বীয় পদার্থের দিকে লোকের নজর পড়ে। প্রিষ্টলি ১৭৭৪ সালে অক্সিজেন এমোনিয়া প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। ১৭৭২ সালে রাদারফোর্ড যবক্ষারজান গ্যাসের সন্ধান পান। প্রিষ্টলিও স্বতন্ত্র ভাবে উহা ঐ বৎসরেই আবিষ্কার করেন। ক্যাভেণ্ডিস প্রথম পরিমাণমূলক পরীক্ষার সূত্রপাত করেন। তিনি জল ও বায়ুর উপাদান, ধাতুর উপর দ্রাবকের ক্রিয়া প্রভৃতি নির্ণয় করেন। সুইডেন-বাসী সিলি স্বতন্ত্রভাবে অক্সিজেন ও পরে ক্লোরিন গ্যাস আবিষ্কার করেন। গ্লিসরিন ইঁহারই অমূল্য আবিষ্কার। ফরাসী লাভোয়াসিয়ে তুলাদণ্ডের আবিষ্কার দ্বারা প্রচার করিলেন যে পদার্থ অবিনশ্বর। ১৮০৪ সালে ডাল্টন পরমাণুবাদ প্রচার করেন; এই পরমাণুতত্ত্ব কনাদ মুনি খৃষ্ট জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছিলেন। সুইডেনবাসী বারজিলিয়স এই পরমাণুবাদ পরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮১১ সালে

ইতালীয় এভোগাড্রো অণু ও পরমাণুর পার্থক্য প্রকাশ করেন। এক্ষণে টমসন প্রমাণ করিয়াছেন যে পরমাণুই পদার্থের চরম বিভাগ নয়, পরমাণুও বিভাজ্য; পরমাণু সূক্ষ্মাণুর সমষ্টি, তড়িৎশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট বিকৃষ্ট হইয়া থাকে। রামজে ও সডি প্রচার করিয়াছেন যে রেডিয়াম ধাতু হইতে হেলিয়ম ধাতু তৈরি হইতেছে এবং চাই কি অপেক্ষা করিলে প্রত্যেক ধাতুকে অপর কোনো ধাতুতে পরিণত হইতে দেখা যাইতে পারে। আবার সেই কিমিয়াবাদীদের স্পর্শমণির স্বপ্ন এবার বুঝিবা সত্যে পরিণত হয়।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'গায়ক পাখী' শিরোনামে এবার বৌ কথা কও পাখীর পরিচয় দিয়াছেন। ইহা চৈত্র মাসে দেখা দিয়া ৪।৫ মাস থাকে; চৈত্র মাসে দেখা যায় বলিয়া কোনো কোনো স্থানে ইহাকে চৈতার বৌ বলে। এই নামের সঙ্গে একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। এই পাখী আকারে কোকিলের মতো, পাখা পুরু ও খাটো, এজন্য উড়িবার সময় দ্রুত পক্ষ সঞ্চালন করে। পাখার রং ধূসর, স্থানে স্থানে শাদার দু একটি ছিটা ফোঁটা থাকে। মাথা ও ঠোঁট কোকিলেরই অনুরূপ; বুকের পালক শাদার উপর কালোর লম্বা ছিট (ডোরা নহে)। লেজের পালক ডানার পালক অপেক্ষা লম্বা। ইহারা কোকিলের ন্যায় পরপুষ্ট; ফিঙার বাসায় ডিম পাড়িয়া ফিঙাকে দিয়া ডিম ফুটাইয়া লয়।

বঙ্গদর্শন (ভাদ্র)—

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় আধুনিক কালে "রসায়নী বিদ্যার উন্নতি" কতদূর হইয়াছে তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। রসায়নের অসাধ্য-সাধনের মধ্যে এইগুলি প্রধান—(১) রেডিয়ম আবিষ্কার ও বিশুদ্ধ রেডিয়াম প্রস্তুত, (২) তরল বায়ু ও তরল হাইড্রোজেন, (৩) বায়ুর অকেজো নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রিক এসিড, কৃত্রিম সোরা, আমোনিয়া প্রস্তুত, (৪) খনিজ মিশ্র অবিশুদ্ধ ধাতুর বিদ্যুৎ সাহায্যে পরিশোধন, (৫) কয়লা প্রভৃতির তাপে বা জলপ্রপাতের স্রোতে কল চলে—ইহা সৌরশক্তিরই রূপান্তর, কয়লার জলে নিহিত সৌরশক্তি; কয়লা বা জলপ্রপাতের সাহায্যে কল চালাইতে শক্তির অনেক অপচয় ও কারখানা অনাবশ্যক গরম হইয়া যায়; সুতরাং খাঁটি সৌরশক্তিকে কাজে লাগাইলে অনেক সুবিধা; রসায়ন এই অসাধ্যসাধনে অগ্রসর হইতেছে। (৬) জৈব রসায়নেও কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম শর্করা, কৃত্রিম রং ও গন্ধদ্রব্য, প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতী (আশ্বিন)—

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্টের "দুই দিক" তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে—Ideailst ও Realist দুজনেই আর্টিষ্ট বা নিপুণ কৌশলী। Ideal artist যেন সৃষ্টিকর্ত্তা ও Ideal art সৃষ্টি কৌশল। এইটিই সকল আর্টিষ্টের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে তাহার সৃজনী শক্তি লাভ হইবে। Realistএর মন্ত্র যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং, আর Idealistএর মন্ত্র যন্মনসানুভূতং তল্লিখিতং। Ruskin ও Theodorechild ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। এই কথাটিকে দুটি প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিলিপি দ্বারা চমৎকার প্রমাণিত করা হইয়াছে। একটি realistic সম্ভবপর আকৃতির, অপরটি idealistic সম্ভবপর প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি।

এই সংখ্যায় 'বঙ্কিম যুগের কথা' আরম্ভ হইয়াছে। এবারে বঙ্কিমবন্ধু জগদীশনাথ রায় ও প্রসঙ্গক্রমে কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে যে সমস্ত আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা মনোরঞ্জক।

অনেককাল পরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "রাসমণির ছেলে" নামক একটি গল্প লিখিয়াছেন।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (আশ্বিন)—

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' মোকদ্দমায় আধা ডিক্রি আধা ডিসমিস করিয়াছেন। তাঁহার রায়ের চুম্বক এই—ইংরাজি শিক্ষার প্রথম হিড়িক একটু মন্দা পড়িলে ইংরাজি-নবিশগণ বাংলা রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; সমগ্র দেশের বিদ্বৎসমাজে পঠিত হইবে বলিয়া ইংরাজিনবিশেরা ইংরাজিতে ও প্রাচীন তন্ত্রের লেখকগণ সংস্কৃতে রচনা করিতেন; শেষে উভয় দলই বাংলার আসরে নামিলেন। তখন সবরকম রচনাই চলিত—শব্দাড়ম্বর-ময় সংস্কৃতপ্রায় রচনা বা আলালী বা হুতোমী ভাষা। এক্ষণে কিন্তু যা-তা চলিবার দিন আর নাই; একটা মীমাংসা চাই। কিন্তু কোনো পক্ষ সাধুভাষার ও কোনো পক্ষ চলিত ভাষার পক্ষপাতী, অনেকে মধ্যপন্থী। ভাষার সুবিধা ও আর্টের দুই দিক হইতে পক্ষদিগের মামলা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। সাধুভাষার সপক্ষে যুক্তি—ভাষা ভাবের পরিচ্ছদ, তাহার আটপৌরে ও পোষাকী প্রভেদ থাকা উচিত,—এটা আর্টের দিকের কথা। সুবিধার দিককার যুক্তি এই যে বাংলা ভাষা যতই সংস্কৃতানুগ ও প্রাদেশিকতাবর্জ্জিত হইবে ততই তাহা বাংলাদেশ ও সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর বুঝিবার উপযোগী হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ বঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ চালাইয়াছেন বলিয়া বঙ্গের অপর প্রদেশের লেখকেরাও স্ব স্ব প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করিতেছেন; ইহার ফলে ভাষা দুর্বোধ ও ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে; প্রাদেশিক শব্দ ত সকল দেশেই সমান নহে এবং বাংলা এমন অভিধান নাই যাহা দেখিয়া অর্থগ্রহ সহজ হইতে পারে; উচ্চারণ-বৈষম্যেও জানা কথা অজানা হইয়া উঠিতে পারে। সাধুভাষার বিরুদ্ধে ও চলিত ভাষার সপক্ষে যুক্তি—চিরকাল দেখা যাইতেছে ভাষা অতি মাত্রায় সাধু হইয়া উঠিলেই অপেক্ষাকৃত সরল ভাষার সৃষ্টি হয়; ভাষার উদ্দেশ্য যখন লোকশিক্ষা তখন যাহা অনেকে বুঝে সেইরূপ ভাবেই ভাষা গঠিত ও চালিত হওয়া উচিত। ভাষা অতিরিক্ত সংস্কৃতানুগ হইলে মুসলমানদের আপত্তি হইবে। লোকশিক্ষার সাহিত্যে চলিত ভাষা না চালাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। শিশুসাহিত্যে দংষ্ট্রাবিদারী শব্দ ব্যবহার করিলে চলিবে না, এই গেল সুবিধার দিককার কথা। আর্টের দিক হইতে চলিত ভাষার সপক্ষে বলিবার এই আছে যে, চিত্র, নাটকনভেলের কথোপকথন, রসরঙ্গ প্রভৃতি সাধুভাষায় অশোভন। চলিত শব্দ ব্যবহার না করিলে ঠিক ছবিটি ফুটানো যায় না। লেখকের মীমাংসা—বঙ্কিমচন্দ্র যে মিশ্র রচনারীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, [illegible] প্রকৃষ্ট রীতি। নিরবচ্ছিন্ন সাধুভাষা বা চলিতভাষা চালাইতে গেলেই এক শ্রেণীর লেখক ও পাঠককে হারাইবার আশঙ্কা আছে। দেশকাল পাত্র বুঝিয়া সাধু বা চলিত ভাষার প্রয়োগের উপযোগিতা স্থির করিতে হইবে। কোন কথাটি কোথায় লাগসই হইবে তাহা বুঝা কতক শিক্ষা ও কতক প্রতিভাসাপেক্ষ। আদর্শ বাংলা রচনায় সংস্কৃত অপেক্ষা চলিত শব্দেরই প্রাধান্য হওয়া উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন এইরূপই রায় দিয়াছেন। বাংলা ভাষায় অনেক চলিত শব্দ আরবী, ফারসী, ইংরাজি প্রভৃতি ভিন্ন ভাষা হইতে আসিয়াছে; যে শব্দগুলি বহুকাল ব্যবহারে ভাষার ধাতের সঙ্গে মজ্জাগত হইয়া মিশিয়া গিয়াছে, সেগুলির সংস্কৃত প্রতিশব্দ মজুদ বা স্বল্পায়াসে গঠনীয় হইলেও, সেগুলি অপরিহার্য্য, কারণ বাংলা ভাষা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেরই ভাষা। ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে হইলে নূতন নূতন ভাবপ্রকাশের জন্য, নূতন নূতন বস্তু নির্দ্দেশের জন্য, নূতন নূতন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে শব্দ সংগ্রহ আবশ্যক। যার-পর-নাই দেবভাষা সংস্কৃতও ম্লেচ্ছসংস্পর্শে

দুষ্ট। কিন্তু কোনো শব্দের অযথা ব্যবহার পরিবর্জ্জনীয়। অবশ্য অনেক সময় বিদেশী ভাবদ্যোতক শব্দ দেশী ভাষায় অনুবাদ করা যায় না; সে সব উঁচুদরের ভাবদ্যোতক রচনা অবশ্য সকলের জন্য নহে; সাহিত্যক্ষেত্রেও অধিকারী ভেদ আছে ও থাকিবে। সুকুমার সাহিত্য সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইতে পারে না, কলাবিদ্‌গণেরই উপভোগ্য হয়।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন" প্রবন্ধে এবার স্বর্ণ তৈয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। য়ুরোপে Philosopher's stone ও আমাদের দেশের স্পর্শমণির স্বপ্ন চিরকাল মানবচিত্ত ক্ষুব্ধ করিতেছে। সামান্য ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার দুশ্চেষ্টা অতি পুরাতন। অন্য ধাতুকে স্বর্ণের বর্ণ দেওয়া হয়ত সহজ কিন্তু স্বর্ণে পরিণত করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন হিন্দু-রসায়নের রৌপ্য ও তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করিবার কয়েকটি প্রক্রিয়া অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হিন্দুরসায়নের ইতিহাসে সংগৃহীত হইয়াছে।

সুপ্রভাত (ভাদ্র)—

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় "ভারতশিল্পের রহস্য" উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন—আর্টের আদর্শ দেশে

বজ্রযক্ষ – জাপানী বজ্রের দেবতা।

কালে ভিন্ন। কাহারো মতে যাহাতে সৌন্দর্য্য আছে তাহাই আর্ট। সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা লইয়াও সকলে একমত নহেন। সৌন্দর্য্য কি তাহাই যাহা চক্ষুকে তৃপ্ত করে? কেহ বলেন, না, যাহা সত্য তাহাই সুন্দর। কেহ বলেন, ভালো মন্দের আদর্শে সৌন্দর্য্যের নিরিখ নহে, যাহা চিত্তকে আনন্দ দেয় তাহাই সুন্দর, তাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত। কেহ বলেন, মনের অনুভূতিকে স্থায়িত্ব দিবার ও অপরের বোধগম্য করিবার যে কামনা তাহাই আর্টের জননী। পণ্ডিতগণ এখন অনুমান করিতেছেন যে গ্রীক শিল্পের যে আদর্শ, দৃশ্য বস্তুর হুবহু প্রতিকৃতি, তাহা উচ্চ শিল্প ত নহেই, তাহা আসলে ভ্রান্তিমূলক। শিল্পের লক্ষ্য অব্যক্তকে ব্যক্ত করা, অদৃশ্যকে দৃশ্য করা। বহিরাবরণের অন্তরালে যে অন্তরের ইঙ্গিত তাহাই চক্ষুগোচর করা শ্রেষ্ঠ শিল্পের চেষ্টা।

জিয়ুস্—গ্রীক বজ্রের দেবতা।

প্রাকৃতিক দৃশ্যও নিখুঁত প্রতিরূপে প্রতিভাত হইলে আর্ট হয় না, মানুষের মন প্রকৃতির মনের মধ্যে যেটুকু সাড়া পাইয়াছে আর্ট তাহারই প্রকাশ। গ্রীক শিল্প আকারগত বাহিক সৌন্দর্য্যের সাধনায় সুন্দর অসুন্দর ভেদকল্পনা দ্বারা সৌন্দর্য্যের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপের উপলব্ধির অন্তরায় সৃজন করিয়াছে। প্রকৃতির অখণ্ড শক্তির পরিপূর্ণ উপলব্ধিই সৌন্দর্য্য-বোধ। জগতের এই আনন্দলীলাকে যতই পূর্ণতর রূপে জানি ততই জানি যে আর্টের "হাসি কান্না হীরাপান্না দোলে ভালে, কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে, নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে।" যেখানেই মহান ও বিরাট প্রকাশ সেখানেই রূপ ও সৌন্দর্য্য; যাহা খণ্ড ও ক্ষুদ্র তাহাই বিরূপ বিশ্রী। এই জন্য ভারতের আর্টে কমলাসনা লক্ষ্মী, ময়ূরবাহন কার্ত্তিক প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডমালিনী কালী ও শ্মশানচারী মহাদেব সাধনার সামগ্রী। ভারতের দেবমূর্ত্তি যেরূপে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সমস্ত বিশ্বের রূপ-ডোবানো রূপ। ভারত আর্টের ঠিক লক্ষ্য রসসৃষ্টি—রসের ইংরাজি প্রতিশব্দ নাই। এজন্য বিশ্বের মূল শক্তি উপনিষদে রস নামে অভিহিত। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমস্ত মহিমার অন্তঃপুরে যে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন তিনি নবরসের জননী; এই মূল কারণকে বৈষ্ণব দর্শন বলিয়াছেন নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি। সুন্দর ও ভয়ানক একই ভাবে যে উৎকৃষ্ট শিল্পের বর্ণনীয় হইতে পারে তাহা প্রাচ্য দেশেই সম্যক উপলব্ধ হইয়াছিল। যে দুইটি চিত্রদ্বারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভয়ানক রসের পরিকল্পনার পার্থক্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা আমরা এখানে সুপ্রভাত হইতে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগ-সংবাদে আমরা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। ইউরোপীয়বংশসম্ভূত যত লোকের কথা আমরা অবগত আছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহই
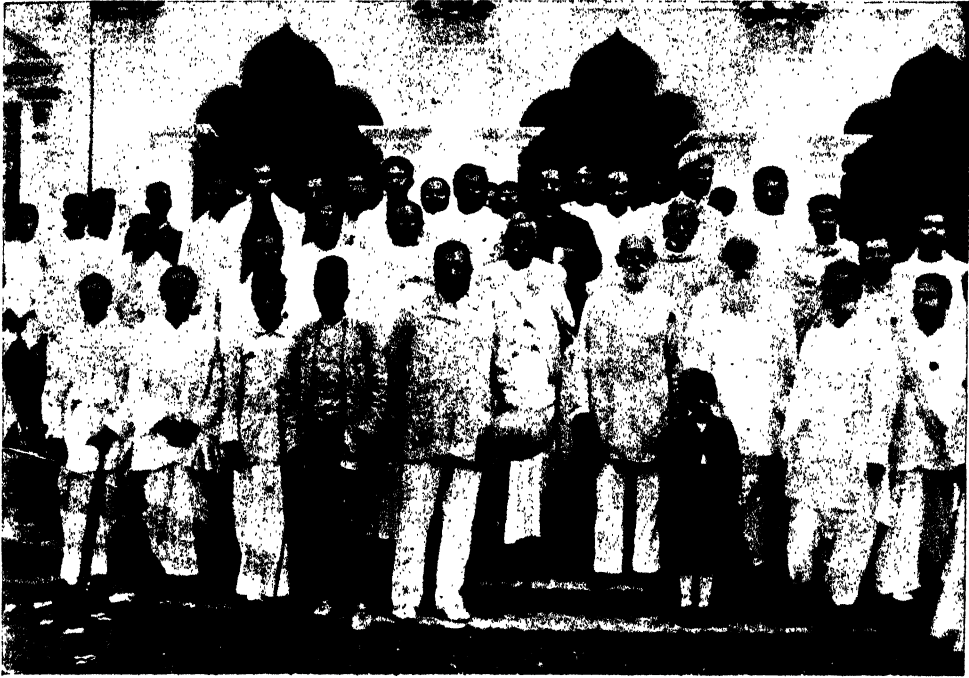
প্রাদেশিক সমিতির প্রধান প্রধান প্রতিনিধি।

ভারতবর্ষকে ভগিনী নিবেদিতা অপেক্ষা অধিক প্রীতি ও ভক্তি করিতেন না। তিনি ভারতভূমিকেই নিজ মাতৃভূমিস্থানে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি বিবেকানন্দ স্বামীর শিষ্যা ছিলেন। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিতেন। ভারতবাসীরা সর্ব্বপ্রকারে উন্নত, একজাতিত্বসূত্রে বদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে উচ্চ আসন লাভ করে, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। এই ইচ্ছা ফলবতী করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। নারীর শিক্ষা ও জনসাধারণের শিক্ষা ভারতবর্ষের মঙ্গলকর সকল চেষ্টার ভিত্তি বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি স্বাধীনচিত্ত, প্রতিভাশালিনী ও শক্তিশালিনী লেখিকা ছিলেন। অনেক বিধবা ও অনাথ বালকবালিকাকে তিনি পালন করিতেন। অনেককে শিক্ষা দিতেন। বিশ্বজননী তাঁহাকে শক্তি ও শান্তি প্রদান করুন।

বিভক্ত বঙ্গ আবার রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করিবে কি না, জানি না; কিন্তু বাঙ্গালীর আন্তরিক একপ্রাণতা যেন নষ্ট না হয়। সাহিত্য জাতীয় একতার একটি প্রধান কারণ ও ফল। বাঙ্গলাভাষী ব্যক্তিসমূহের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই প্রধান বিভাগ। ইঁহাদের মধ্যে যাহাতে সাহিত্যিক সদ্ভাব ও সহযোগিতা রক্ষা হয়, তজ্জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দেশহিতকর অন্যান্য সমুদয় কার্য্যেও আমাদের একপ্রাণতার প্রয়োজন। আমরা রাখীবন্ধনের দিনে "ভাই ভাই একঠাঁই" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকি। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহিত আমাদের সর্ব্ববিধ ব্যবহারে ইহাই প্রমাণিত হউক যে মন্ত্রটি কথার কথা নয়, অন্তরের কথা।

এবার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। বরিশালে সেই যে অনেক প্রতিনিধি ও যুবক লাঠির দ্বারা আহত হইয়াছিলেন, তাহার পর পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন। ইহাতে অনেক মুসলমানও যোগ দিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা বেশ সারবান্ হইয়াছিল। ফরিদপুরে সামাজিক সমিতিরও

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে "অস্পৃশ্য" জাতিসকলের উন্নতি, বিধবাদিগের দুঃখ নিবারণের উপায়, স্ত্রীশিক্ষা, প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছিল।

উত্তর আমেরিকার কানাডা প্রদেশে প্রায় ৬০০০ হিন্দু আছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী; সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করেন। ইহাঁদের অস্তিত্ব তথাকার শ্বেত শ্রমজীবীদের সহ্য হয় না। ইহাঁদিগকে ঐ দেশ হইতে তাড়াইবার কোন উপায় এখনও করা হয় নাই। কিন্তু আর অধিক ভারতবাসী যাহাতে তথায় যাইতে না পারে, তাহার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ আইন হইয়াছে যে যদি কেহ নিজের জন্মভূমি হইতে জাহাজ বদল না করিয়া একায়িক কানাডায় আসে তাহা হইলেই তাহাকে ঐ দেশে নামিতে দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষের কোন বন্দর হইতে একেবারে কানাডা পর্য্যন্ত কোন জাহাজ যায় না। সুতরাং ভারতবাসীর যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কৌশল দ্বারা কানাডাপ্রবাসী ভারতবাসীদের ক্রমিক লোপপ্রাপ্তিরও উপায় হইয়াছে। দু তিন জন ছাড়া তাঁহারা প্রায় সকলেই পুরুষ। পূর্ব্বোক্ত আইন দ্বারা তাঁহাদের স্ত্রী কন্যা মাতা প্রভৃতির কানাডা গমন নিবারিত হইয়াছে। তা ছাড়া

ডাক্তার সুন্দর সিং।

আরও অদ্ভুত কথা এই যে কানাডা দেশের "সুনীতি রক্ষার জন্য" ভারত নারীর সে দেশে গমন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সতী সাবিত্রী সীতার দেশের এত অপমান! নিজ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেহ চিরজীবন থাকিতে পারে না। সুতরাং কানাডার লোকেরা আশা করে যে এই কারণে হয় ভারতবাসীরা পলাইয়া আসিবে, নতুবা যদি সেখানে থাকে তাহা হইলেও তাঁহাদের বংশ ক্রমে লোপ পাইবে। ভারতবাসীদের প্রতি আরও অনেক অন্যায় ব্যবহার করা হয়। যেমন, জাপানী বা চীনবাসীর নিকট ৫০ ডলার বা ১৫০ টাকা থাকিলেই তাহাকে কানাডায় নামিতে দেওয়া হয়, কিন্তু ভারতবাসীর নিকট ২০০ ডলার বা ৬০০ টাকা থাকা চাই, এইরূপ আইন করা হইয়াছে। কানাডাপ্রবাসী বা কানাডাগমনেচ্ছু ভারতবাসীদিগের এইরূপ নানা অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তথায় একটি হিন্দুস্থানী সমিতি আছে। ডাক্তার সুন্দর সিং তাহার সম্পাদক।

তিনি অক্লান্তভাবে ও আশাপূর্ণ হৃদয়ে সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতেছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ দেখা যায় যে প্রবল জাতিরা দুর্ব্বল জাতির দেশ বা অপর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক অধিকার ও

মামুদ শফকেৎ পাশা।

অপহরণ করে। সকল দেশে ও সকল যুগেই এইরূপ ঘটিয়াছে। সুতরাং ইটালী তুরস্কের অধীন ত্রিপলি দেশ দখল করিয়া যে অসাধারণ রকমের একটা ডাকাইতি করিয়াছে, তাহা নয়। কিন্তু অসাধারণ না হইলেও ইহা যে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সকল প্রবল জাতি কোন পাপ কার্য্য করিয়াছে বা এখনও করিতেছে বলিয়া ধর্ম্মের বিচারে তাহা বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

দিনে ডাকাইতির বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তটির নিন্দা করিবার অনেক কারণ আছে। একটি কারণ এই যে ইউরোপের লোকেরা আপনাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা

আন্‌বর্ বে।

শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করেন। তাঁহারা বলেন যে তাঁহারা এমন সভ্য যে আর কেহ কখনও তেমন সভ্য হয় নাই। তাঁহারা ইহাও বলেন যে খৃষ্টধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; ইহার প্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশুখৃষ্ট ধরাধামে শান্তি আনয়ন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহারা এই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। অতএব এহেন শ্রেষ্ঠ যে ইউরোপবাসী মানবসকল, তাঁহাদের কাছে জগদ্বাসী ডাকাইতির পরিবর্ত্তে

সাধুব্যবহারেরই প্রত্যাশা করে। ইটালী কিন্তু তাহা দেখাইতে পারে নাই। ইটালী বলিতেছে "আমরা আফ্রিকাকে সভ্য করিবার কার্য্যে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির সহিত যোগ দিতেছি।" লোকের দেশ ও সম্পত্তি হরণ করিয়া, তাহাদিগকে প্রধানতঃ মদ্য আদি জঘন্য দ্রব্য বিক্রয় করা, সভ্যতাবৃদ্ধি বই কি? তুরস্ককে জলযুদ্ধে অসমর্থ জানিয়া ডাকাইতি করিয়াছ, তাহার উপর আবার ভণ্ডামি কেন? ইটালী ত্রিপলির লোকদের কাছে এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন যে আমরা তোমাদিগকে তোমাদের উৎপীড়ক তুর্কিদের হাত হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি; এখন তোমাদের স্বদেশী সর্দারেরাই দেশ শাসন করিবেন; ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল কেবল তাঁহাদের মুরুব্বি থাকিবেন মাত্র। ঠিক্, ঠিক্। পঞ্চতন্ত্রে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন মহাপঙ্কে নিপতিত ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিয়াছিল, ইহাও সেই প্রকার উদ্ধার।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম রাজমন্ত্রী হাল্‌ডেন্ সাহেব বলিয়াছেন, "ইটালী অন্যান্য কোন কোন ইউরোপীয় জাতির ন্যায় রাজ্য বিস্তারের সুযোগ পান নাই। তাহা তাঁহার পাওয়া উচিত।" ইহা ধর্ম্মসঙ্গত কথা নয়;—তবে ইহার মধ্যে কোন ভণ্ডামি বা বকধার্ম্মিকত্ব নাই, এই যা।

তুরস্ক সমুদ্রে দুর্ব্বল হইলেও স্থলযুদ্ধে খুব নিপুণ। তুর্কিদের যুদ্ধবিভাগের প্রধান ব্যক্তি মামুদ শফকেৎ পাশা। যে সকল যোদ্ধা সুলতান আবদুল হামিদকে পদচ্যুত করিয়া তুরস্ককে নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর অধীন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। তিনি তুরস্ক সেনাদলকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে অন্যতম বিখ্যাত তুর্কি যোদ্ধা অন্‌বর্ বে মিশর দেশ হইয়া ত্রিপলি গিয়া তথায় ইটালীয়দিগের বিরুদ্ধে খণ্ডযুদ্ধ চালাইবার আয়োজন করিতেছেন।

বঙ্গীয় মুসলমানেরা আপনাদের মধ্যে বাঙ্গালার চর্চ্চা বাড়াইবার জন্য একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, ইহা অতীব সুখের বিষয়। দিনাজপুরের উকীল মৌলবী য়াকীন্ উদ্দীন সাহেবের সভাপতিত্বে এই সমিতির এক অধিবেশন হয়। তাঁহার দুইটি প্রস্তাব বেশ ভাল:—(১) মুসলমানগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিতে গেলে যে সকল আরবী ও ফার্সী শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, সেইগুলির অর্থসহ একটি তালিকা প্রকাশ। (২) বটতলার ছাপা মুসলমানী বহিসকল সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে অশ্লীলতাবর্জ্জিত ও সংশোধিত করিয়া প্রকাশ।

চিত্রপরিচয়

মুখপত্র রূপে মুদ্রিত রঙিন চিত্রখানি সাবিত্রীর। সাবিত্রী মৃতপতির সন্ধানে ব্যাকুল হৃদয়ে মৃত্যুর অনুসরণ করিতেছেন, এই ভাবটি চিত্রের বিষয়। সাবিত্রীর মুখভাবে শোক ও মনের বল, একাগ্র আগ্রহ ও অকুতোভয়তা চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় চিত্রখানি রাম বনবাসের সর্ব্বজনবিদিত বিষয় লইয়া অঙ্কিত। ইহা একখানি প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি। ভারতীয় প্রাচীন চিত্রের বিশেষত্ব চিত্রবর্ণিত ভাবদ্যোতকতায় ও বিষয়ের খুঁটিনাটি চিত্রণে। এ চিত্রেও সেই বিশেষত্বের অসদ্ভাব নাই।

ভ্রম সংশোধন

আমার লিখিত গত ভাদ্রমাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত "সর্ব্বপ্রথম বিলাতযাত্রী বঙ্গনারী" স্থলে "সর্ব্বপ্রথম বিলাতযাত্রী হিন্দু-নারী" হইবে। বঙ্গদেশ হইতে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ-কুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাত গমন করেন; ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টান-কুমারী তরু দত্ত বিলাত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুনারীর মধ্যে রাজকুমারীই সর্ব্বপ্রথম বিলাতযাত্রী মহিলা। শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল।

বর্ত্তমান সংখ্যার গীতাপাঠ প্রবন্ধ, ৫ম পৃষ্ঠা ৭ম পংক্তি—সমষ্টি সচ্চিদানন্দ স্থানে সমষ্টি-সৎ চিদানন্দ হইবে। ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ২য় কলম নীচে হইতে ৫ম ও ৪র্থ পংক্তি ঈশ্বর চৈতন্য উপাধিতে স্থানে ঈশ্বর-চৈতন্য মায়া উপাধিতে হইবে।

৮ম পৃষ্ঠা ১ম কলম ১ম পংক্তি প্রকৃতি স্থানে প্রকৃতির হইবে।

গত আশ্বিন সংখ্যার পুস্তকপরিচয়ে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের মূল্য ৩৲ টাকার স্থলে ৮৲ আট টাকা হইবে।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রবাসী

" সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।"

" নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১১শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩১৮

২য় সংখ্যা

জীবনস্মৃতি

বাংলাশিক্ষার অবসান।

আমরা ইস্কুলে তখন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে বাংলা পড়িতেছি। বাড়িতে আমরা সে ক্লাসের বাংলা পাঠ্য ছাড়াইয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছি। বাড়িতে আমরা অক্ষয়কুমার দত্তর পদার্থবিদ্যা শেষ করিয়াছি, মেঘনাদবধও পড়া হইয়া গিয়াছে। পদার্থ বদ্যা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু পদার্থের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, কেবল পুঁথির পড়া—বিদ্যাও তদনুরূপ হইয়াছিল। সে সময়টা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল। আমার ত মনে হয় নষ্ট হওয়ার চেয়ে বেশি; কারণ, কিছু না করিয়া যে সময়টা নষ্ট হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশি লোকসান করি কিছু করিয়া যে সময়টা নষ্ট করা যায়। মেঘনাদবধ কাব্যটিও আমাদের পক্ষে আরামের জিনিষ ছিল না। যে জিনিষটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য ভাল কাব্য পড়াইলে তরবারী দিয়া ক্ষৌরী করাইবার মত হয়—তরবারীর ত অমর্য্যাদা হয়ই, গণ্ডদেশেরও বড় দুর্গতি ঘটে। কাব্য জিনিষটাকে রসের দিক হইতে পুরাপুরি কাব্য হিসাবেই পড়ানো উচিত, তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।

এই সময়ে আমাদের নর্ম্মাল স্কুলের পালা হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। তাহার একটু ইতিহাস আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের কোনো একজন শিক্ষক কিশোরীমোহন মিত্রের রচিত আমার পিতামহের ইংরেজি জীবনী পড়িতে চাহিয়াছিলেন। আমার সহপাঠী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ সাহসে ভর করিয়া পিতৃদেবের নিকট হইতে সেই বইখানি চাহিতে গিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সচরাচর যে প্রাকৃত বাংলায় কথা কহিয়া থাকি সেটা তাঁহার কাছে চলিবে না। সেইজন্য সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল যে পিতা বুঝিলেন আমাদের বাংলাভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে। পরদিন সকালে যখন যথানিয়মে দক্ষিণের বারান্দায় টেবিল পাতিয়া দেয়ালে কালো বোর্ড ঝুলাইয়া নীলকমল বাবুর কাছে পড়িতে বসিয়াছি এমন সময় পিতার তেতালার ঘরে আমাদের তিনজনের ডাক পড়িল। তিনি কহিলেন, আজ হইতে তোমাদের আর বাংলা পড়িবার দরকার নাই। খুসিতে আমাদের মন নাচিতে লাগিল।

তখনো নীচে বসিয়া আছেন আমাদের নীলকমল পণ্ডিত মশায়; বাংলা জ্যামিতির বইখানা তখনো খোলা এবং মেঘনাদবধ কাব্যখানা বোধ করি পুনরাবৃত্তির সঙ্কল্প চলিতেছে। কিন্তু মৃত্যুকালে পরিপূর্ণ ঘরকন্নার বিচিত্র আয়োজন মানুষের কাছে যেমন মিথ্যা প্রতিভাত হয়, আমাদের কাছেও পণ্ডিত মশায় হইতে আরম্ভ করিয়া আর ঐ বোর্ড টাঙাইবার পেরেকটা পর্য্যন্ত তেমনি এক মুহূর্ত্তে মায়া মরীচিকার মত শূন্য হইয়া গিয়াছে। কামনা করি,

উপরের তলা হইতে সংসারের গুরু মহাশয়ের নিকট ছুটি লইবার হুকুম যে দিন আসিবে সেদিনও মনে যেন এই রকম মুক্তির আনন্দই আসে। কি রকম করিয়া যথোচিত গাম্ভীর্য্য রাখিয়া পণ্ডিত মশায়কে আমাদের নিষ্কৃতির খবরটা দিব সেই এক মুস্কিল হইল। সংযতভাবেই সংবাদটা জানাইলাম। দেয়ালে টাঙানো কালো বোর্ডের উপরে জ্যামিতির বিচিত্র রেখাগুলা আমাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল;—যে মেঘনাদবধের প্রত্যেক অক্ষরটিই আমাদের কাছে অমিত্র ছিল সে আজ এতই নিরীহভাবে টেবিলের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিল যে তাহাকে আজ মিত্র বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভব ছিল না।

বিদায় লইবার সময় পণ্ডিতমশায় কহিলেন—কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমাদের প্রতি অনেক সময় অনেক কঠোর ব্যবহার করিয়াছি সেকথা মনে রাখিয়োনা। তোমাদের যাহা শিখাইয়াছি ভবিষ্যতে তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে।

মূল্য বুঝিতে পারিয়াছি। ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা জিনিষটা যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মত হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়—পেট ভরিবার পূর্ব্ব হইতেই পেটটি খুসি হইয়া জাগিয়া উঠে—তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে—মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তার পরে সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে পাক করা মোদক বস্তু তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অর্দ্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মান্দ্য পড়িয়া যায়। যখন চারদিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

নর্ম্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া আমরা বেঙ্গল একাডেমি নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। ইহাতে আমাদের গৌরব কিছু বাড়িল। মনে হইল আমরা অনেকখানি বড় হইয়াছি—অন্তত স্বাধীনতার প্রথম তলাটাতে উঠিয়াছি। বস্তুত এ বিদ্যালয়ে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়াছিলাম সে কেবলমাত্র ঐ স্বাধীনতার দিকে। সেখানে কি যে পড়িতেছি তাহা কিছুই বুঝিতাম না, পড়াশুনা করিবার কোনো চেষ্টাই করিতাম না, না করিলেও বিশেষ কেহ লক্ষ্য করিত না। এখানকার ছেলেরা ছিল দুর্ব্বৃত্ত, কিন্তু ঘৃণ্য ছিল না, সেইটে অনুভব করিয়া খুব আরাম পাইয়াছিলাম। তাহারা হাতের তেলোয় উল্টা করিয়া ass লিখিয়া "হেলো" বলিয়া যেন আদর করিয়া পিঠে চাপড় মারিত, তাহাতে জনসমাজে অবজ্ঞাভাজন উক্ত চতুষ্পদের নামাঙ্কটি পিঠের কাপড়ে অঙ্কিত হইয়া যাইত; হয় ত বা হঠাৎ চলিতে চলিতে মাথার উপরে খানিকটা কলা থেঁতলাইয়া দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইত ঠিকানা পাওয়া যাইত না; কখনো বা ধাঁ করিয়া মারিয়া অত্যন্ত নিরীহ ভাল মানুষটির মত অন্যদিকে মুখ করিয়া থাকিত, দেখিয়া পরম সাধু বলিয়া বোধ হইত। এ সকল উৎপীড়ন গায়েই লাগে মনে ছাপ দেয় না,—এ সমস্তই উৎপাত মাত্র, অপমান নহে। তাই আমার মনে হইল এ যেন পাঁকের থেকে উঠিয়া পাথরে পা দিলাম—তাহাতে পা কাটিয়া যায় সেও ভাল, কিন্তু মলিনতা হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। এই বিদ্যালয়ে আমার মত ছেলের একটা মস্ত সুবিধা এই ছিল যে, আমরা যে লেখাপড়া করিয়া উন্নতি লাভ করিব সেই অসম্ভব দুরাশা আমাদের সম্বন্ধে কাহারো মনে ছিল না। ছোট স্কুল, আয় অল্প, স্কুলের অধ্যক্ষ আমাদের একটি সদ্‌গুণে মুগ্ধ ছিলেন—আমরা মাসে মাসে নিয়মিত বেতন চুকাইয়া দিতাম। এইজন্য ল্যাটিন ব্যাকরণ আমাদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠে নাই এবং পাঠচর্চ্চার গুরুতর ত্রুটিতেও আমাদের পৃষ্ঠদেশ অনাহত ছিল। বোধ করি বিদ্যালয়ের

যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এ সম্বন্ধে শিক্ষকদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন—আমাদের প্রতি মমতাই তাহার কারণ নহে।

এই ইস্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্ম্মম, ইহার দেয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মত,—ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই—ইহা খোপওয়ালা একটা বড় বাক্স। কোথাও কোনও সজ্জা নাই, ছবি নাই, রং নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভাল মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে বিদ্যালয় হইতে সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্ব্বাসিত। সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সঙ্কীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত—অতএব ইস্কুলের সঙ্গে আমার সেই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।

পলায়নের একটি সহায় পাইয়াছিলাম। দাদারা একজনের কাছে পার্সি পড়িতেন—তাঁহাকে সকলে মুন্সী বলিত—নামটা কি ভুলিয়াছি। লোকটি প্রৌঢ়—অস্থিচর্ম্মসার। তাঁহার কঙ্কালটাকে যেন একখানা কালো মোমজামা দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে রস নাই, চর্ব্বি নাই। পার্সি হয় ত তিনি ভালই জানিতেন, এবং ইংরেজিও তাঁর চলনসই রকম জানা ছিল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে যশোলাভ করিবার চেষ্টা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল লাঠি খেলায় তাঁহার যেমন আশ্চর্য্য নৈপুণ্য, সঙ্গীতবিদ্যায় সেইরূপ অসামান্য পারদর্শিতা। আমাদের উঠানে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া তিনি নানা অদ্ভুত ভঙ্গীতে লাঠি খেলিতেন—নিজের ছায়া ছিল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। বলা বাহুল্য তাঁহার ছায়া কোনো দিন তাঁহার সঙ্গে জিতিতে পারিত না—এবং হুহুঙ্কারে তাহার উপরে বাড়ি মারিয়া যখন তিনি জয়গর্ব্বে ঈষৎ হাস্য করিতেন তখন ছায়া ম্লান হইয়া তাঁহার পায়ের কাছে নীরবে পড়িয়া থাকিত। তাঁহার নাকী বেসুরের গান প্রেতলোকের রাগিণীর মত শুনাইত—তাহা প্রলাপে বিলাপে মিশ্রিত একটা বিভীষিকা ছিল। আমাদের গায়ক বিষ্ণু মাঝে মাঝে তাঁহাকে বলিতেন, মুন্সীজী, আপনি আমার রুটি মারিলেন।—কোনো উত্তর না দিয়া তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া হাসিতেন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন মুন্সিকে খুসি করা শক্ত ছিল না। আমরা তাঁহাকে ধরিলেই তিনি আমাদের ছুটির প্রয়োজন জানাইয়া স্কুলের অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া দিতেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এরূপ পত্র লইয়া অধিক বিচার বিতর্ক করিতেন না-কারণ তাঁহার নিশ্চয় জানা ছিল যে আমরা ইস্কুলে যাই বা না যাই তাহাতে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ ঘটিবে না।

এখন আমার নিজের একটি স্কুল আছে এবং সেখানে ছাত্রেরা নানাপ্রকার অপরাধ করিয়া থাকে—কারণ, অপরাধ করা ছাত্রদের, এবং ক্ষমা না করা শিক্ষকদের ধর্ম্ম। শিক্ষকগণ তাহাদের ব্যবহারে যখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া বিদ্যালয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় অসহিষ্ণু হন ও তাহাদিগকে সদ্যই কঠিন শাস্তি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন, তখন আমার নিজের ছাত্র অবস্থার সমস্ত পাপ সারি সারি দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে; তাই শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে শাস্তি সম্বন্ধেও আমার মতের মিল হয় না এবং আশঙ্কাতেও আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া দেয় না। আমি বেশ বুঝিতে পারি, ছেলেদের অপরাধকে তাঁহারা বড়দের মাপকাঠিতে মাপিয়া থাকেন, ভুলিয়া যান যে, ছোট ছেলেরা নির্ঝরের মত বেগে চলে;—সে জলে দোষ যদি স্পর্শ করে তবে হতাশ হইবার কারণ নাই, কেন না সচলতার মধ্যে সকল দোষের সহজ প্রতিকার আছে; বেগ যেখানে থামিয়াছে সেইখানেই বিপদ,—সেইখানেই সাবধান হওয়া চাই। এইজন্য শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয় ছাত্রদের তত নহে। কিন্তু শাস্তির ভার বড়দেরই হাতে এবং শাস্তি দিবার প্রবৃত্তিই একটা ভয়ানক জিনিষ।

জাত বাঁচাইবার জন্য বাঙালী ছাত্রদের একটি স্বতন্ত্র জলখাবারের ঘর ছিল। এই ঘরে দুই একটি ছাত্রের সঙ্গে আমাদের আলাপ হইল। তাহাদের সকলেই আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাহাদের মধ্যে একজন

কাফি রাগিণীটা খুব ভাল বাসিত এবং তাহার চেয়ে ভালবাসিত শ্বশুর বাড়ির কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তিকে—সেই জন্য সে ঐ রাগিণীটা প্রায়ই আলাপ করিত এবং তাহার অন্য আলাপটারও বিরাম ছিল না।

আর একটি ছাত্র সম্বন্ধে কিছু বিস্তার করিয়া বলা চলিবে। তাহার বিশেষত্ব এই যে, ম্যাজিকের সখ তাহার অত্যন্ত বেশি। এমন কি, ম্যাজিক সম্বন্ধে একখানি চটি বই বাহির করিয়া সে আপনাকে প্রোফেসর উপাধি দিয়া প্রচার করিয়াছিল। ছাপার বইয়ে নাম বাহির করিয়াছে এমন ছাত্রকে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো দেখি নাই। এজন্য অন্তত ম্যাজিকবিদ্যা সম্বন্ধে তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর ছিল। কারণ, ছাপা অক্ষরের খাড়া লাইনের মধ্যে কোনোরূপ মিথ্যা চালানো যায় ইহা আমি মনেই করিতে পারিতাম না। এ পর্য্যন্ত ছাপার অক্ষর আমাদের উপর গুরুমহাশয়গিরি করিয়া আসিয়াছে এইজন্য তাহার প্রতি আমার বিশেষ সম্ভ্রম ছিল। যে কালী মোছে না, সেই কালীতে নিজের রচনা লেখা—এ কি কম কথা! কোথাও তার আড়াল নাই, কিছুই তার গোপন করিবার জো নাই—জগতের সম্মুখে সার বাঁধিয়া সীধা দাঁড়াইয়া তাহাকে আত্মপরিচয় দিতে হইবে—পলায়নের রাস্তা একেবারেই বন্ধ, এতবড় অবিচলিত আত্মবিশ্বাসকে বিশ্বাস না করাই যে কঠিন। বেশ মনে আছে ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানা অথবা আর কোথাও হইতে একবার নিজের নামের দুই একটা ছাপার অক্ষর পাইয়াছিলাম। তাহাতে কালী মাখাইয়া কাগজের উপর টিপিয়া ধরিতেই যখন ছাপ পড়িতে লাগিল তখন সেটাকে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে হইল।

সেই সহপাঠী গ্রন্থকার বন্ধুকে রোজ আমরা গাড়ী করিয়া ইস্কুলে লইয়া যাইতাম। এই উপলক্ষ্যে সর্ব্বদাই আমাদের বাড়িতে তাহার যাওয়াআসা ঘটিতে লাগিল। নাটকঅভিনয় সম্বন্ধেও তাহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাহার সাহায্যে আমাদের কুস্তির আখড়ায় একবার আমরা গোটাকত বাঁখারি পুঁতিয়া তাহার উপর কাগজ মারিয়া নানা রঙের চিত্র আঁকিয়া একটা ষ্টেজ খাড়া করিয়াছিলাম। বোধ করি উপরের নিষেধে সে ষ্টেজে অভিনয় ঘটিতে পারে নাই।

কিন্তু বিনা ষ্টেজেই একদা একটা প্রহসন অভিনয় হইয়াছিল। তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে ভ্রান্তিবিলাস। যিনি সেই প্রহসনের রচনাকর্ত্তা পাঠকেরা তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বেই কিছু কিছু পাইয়াছেন।

তিনি আমার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। তাঁহার ইদানীন্তন শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কল্পনা করিতে পারিবেন না বাল্যকালে কৌতুকচ্ছলে তিনি সকল প্রকার অঘটন ঘটাইবার কিরূপ ওস্তাদ ছিলেন।

যে সময়ের কথা লিখিতেছিলাম ঘটনাটি তার পরবর্ত্তী কালের। তখন আমার বয়স বোধ করি বারো তেরো হইবে। আমাদের সেই বন্ধু সর্ব্বদা দ্রব্যগুণসম্বন্ধে এমন সকল আশ্চর্য্য কথা বলিত যাহা শুনিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম—পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আমার এত ঔৎসুক্য জন্মিত যে আমাকে অধীর করিয়া তুলিত। কিন্তু দ্রব্যগুলি প্রায়ই এমন দুর্লভ ছিল যে সিন্ধবাদ নাবিকের অনুসরণ না করিলে তাহা পাইবার কোনো উপায় ছিল না। একবার, নিশ্চয়ই অসতর্কতা বশত, প্রোফেসর কোনো একটি অসাধ্য-সাধনের অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা বলিয়া ফেলাতে আমি সেটাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। মনসাসিজের আটা একুশবার বীজের গায়ে মাখাইয়া শুকাইয়া লইলেই যে সে বীজ হইতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছ বাহির হইয়া ফল ধরিতে পারে এ কথা কে জানিত। কিন্তু যে প্রোফেসর ছাপার বই বাহির করিয়াছে তাহার কথা একেবারে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

আমরা আমাদের বাগানের মালীকে দিয়া কিছুদিন ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণে মনসাসিজের আটা সংগ্রহ করিলাম এবং একটা আমের আঁটির উপর পরীক্ষা করিবার জন্য রবিবার ছুটির দিনে আমাদের নিভৃত রহস্য-নিকেতনে তেতালার ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি ত এক মনে আঁটিতে আঠা লাগাইয়া কেবলি রৌদ্রে শুকাইতে লাগিলাম—তাহাতে যে কিরূপ ফল ধরিয়াছিল নিশ্চয়ই জানি বয়স্ক পাঠকেরা সে সম্বন্ধে কোনো

প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু সত্য তেতালার কোন্ একটা কোণে এক ঘণ্টার মধ্যেই ডালপালাসমেত একটা অদ্ভুত মায়াতরু যে জাগাইয়া তুলিয়াছে আমি তাহার কোনো খবরই জানিতাম না। তাহার ফলও বড় বিচিত্র হইল।

তাহার পর হইতে প্রোফেসর যে আমার সংস্রব সসঙ্কোচে পরিহার করিয়া চলিতেছে তাহা আমি অনেকদিন লক্ষ্যই করি নাই। গাড়িতে সে আমার পাশে আর বসে না, সর্ব্বত্রই সে আমার নিকট হইতে কিছু যেন দূরে দূরে চলে।

একদিন হঠাৎ আমাদের পড়িবার ঘরে মধ্যাহ্নে সে প্রস্তাব করিল, এস, এই বেঞ্চের উপর হইতে লাফাইয়া দেখা যাক্ কাহার কিরূপ লাফাইবার প্রণালী। আমি ভাবিলাম সৃষ্টির অনেক রহস্যই প্রোফেসরের বিদিত, বোধ করি লাফানো সম্বন্ধেও কোনো একটা গূঢ়তত্ত্ব তাহার জানা আছে। সকলেই লাফাইল আমিও লাফাইলাম। প্রোফেসর একটি অন্তররুদ্ধ অব্যক্ত হুঁ বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। অনেক অনুনয়েও তাহার কাছ হইতে ইহা অপেক্ষা স্ফুটতর কোনো বাণী বাহির করা গেল না।

একদিন যাদুকর বলিল, কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে চায় একবার তাহাদের বাড়ি যাইতে হইবে। অভিভাবকেরা আপত্তির কারণ কিছুই দেখিলেন না, আমরাও সেখানে গেলাম।

কৌতূহলীর দলে ঘর ভর্ত্তি হইয়া গেল। সকলেই আমার গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি দুই একটা গান গাহিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, কণ্ঠস্বরও সিংহগর্জ্জনের মত সুগম্ভীর ছিল না। অনেকেই মাথা নাড়িয়া বলিল—তাই ত, ভারি মিষ্ট গলা!

তাহার পরে যখন খাইতে গেলাম তখনো সকলে ঘিরিয়া বসিয়া আহারপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তৎপূর্ব্বে বাহিরের লোকের সঙ্গে নিতান্ত অল্পই মিশিয়াছি, সুতরাং স্বভাবটা সলজ্জ ছিল। তাহা ছাড়া পূর্ব্বেই জানাইয়াছি আমাদের ঈশ্বর চাকরের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে খাইতে খাইতে অল্প খাওয়াই আমার চিরকালের মত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সেদিন আমার আহারে সঙ্কোচ দেখিয়া দর্শকেরা সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেদিন সকলে নিমন্ত্রিত বালকের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তাহা যদি স্থায়ী এবং ব্যাপক হইত তাহা হইলে বাংলা দেশে প্রাণীবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হইতে পারিত।

ইহার অনতিকাল পরে পঞ্চমাঙ্কে যাদুকরের নিকট হইতে দুই একখানা অদ্ভুত পত্র পাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। ইহার পরে যবনিকাপতন।

সত্যর কাছে শোনা গেল একদিন আমের আঁটির মধ্যে যাদু প্রয়োগ করিবার সময় সে প্রোফেসরকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার জন্য আমার অভিভাবকেরা আমাকে বালকবেশে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছিলেন কিন্তু ওটা আমার ছদ্মবেশ। যাহারা স্বকপোলকল্পিত বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কৌতূহলী তাঁহাদিগকে একথা বলিয়া রাখা উচিত, লাফানোর পরীক্ষায় আমি বাঁ পা আগে বাড়াইয়াছিলাম সেই পদক্ষেপটা যে আমার কত বড় ভুল হইয়াছিল তাহা সেদিন জানিতেই পারি নাই।

পিতৃদেব।

আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমার পিতা প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে তিনি কখনো হঠাৎ বাড়ি আসিতেন; সঙ্গে বিদেশী চাকর লইয়া আসিতেন, তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার জন্য আমার মনে ভারি ঔৎসুক্য হইত। একবার লেনু বলিয়া অল্পবয়স্ক একটি পাঞ্জাবী চাকর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আমাদের কাছে যে সমাদরটা পাইয়াছিল তাহা স্বয়ং রণজিত সিংহের পক্ষেও কম হইত না। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জাবী —ইহাতেই আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। পুরাণে ভীমার্জ্জুনের প্রতি যে রকম শ্রদ্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবী জাতের প্রতিও মনে সেই প্রকারের একটা সম্ভ্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা—ইহারা কোনো কোনো লড়াইয়ে হারিয়াছে বটে কিন্তু সেটাকেও ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়া আমরা গণ্য করিয়াছি। সেই জাতের লেনুকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একটা স্ফীতি অনুভব

করিয়াছিলাম। বৌঠাকুরাণীর ঘরে একটা কাচাবরণে ঢাকা খেলার জাহাজ ছিল, তাহাতে দম দিলেই রং-করা কাপড়ের ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত এবং জাহাজটা আর্গিন বাদ্যের সঙ্গে দুলিতে থাকিত। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এই আশ্চর্য্য সামগ্রীটি বৌঠাকুরাণীর কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া প্রায় মাঝে মাঝে এই পাঞ্জাবীকে চমৎকৃত করিয়া দিতাম। ঘরের খাঁচায় বদ্ধ ছিলাম বলিয়া যাহা কিছু বিদেশের যাহা কিছু দূর দেশের তাহাই আমার মনকে অত্যন্ত টানিয়া লইত। তাই লেন্নুকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এই কারণেই গাব্রিয়েল বলিয়া একটি য়িহুদি তাহার ঘুণ্টি দেওয়া য়িহুদি পোষাক পরিয়া যখন আতর বেচিতে আসিত আমার মনে ভারি একটা নাড়া দিত, এবং ঝোলাঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পায়জামাপরা বিপুলকায় কাবুলিওয়ালাও আমার পক্ষে ভীতিমিশ্রিত রহস্যের সামগ্রী ছিল।

যাহা হউক, পিতা যখন আসিতেন আমরা কেবল আশপাশ হইতে দূরে দূরে তাঁহার চাকরবাকরদের মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌতূহল মিটাইতাম। তাঁহার কাছে পৌছানো ঘটিয়া উঠিত না।

বেশ মনে আছে আমাদের ছেলেবেলায় কোনো এক সময়ে ইংরেজ গবর্মেণ্টের চিরন্তন জুজু রাশিয়ান কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন্ একটা ছিদ্রপথ দিয়া যে রুশীয়েরা সহসা ধূমকেতুর মত প্রকাশ পাইবে তাহা ত বলা যায় না। এই জন্য মার মনে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তালাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন—"রাশিয়ানদের খবর দিয়া কর্ত্তাকে একখানা চিঠি লেখ ত!" মাতার উদ্বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয় কি করিতে হয় কিছুই জানি না। দফ্তরখানায় মহানন্দ মুন্সীর শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাটাতে জমিদারী সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিতা লিখিয়াছিলেন—ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাশিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাশিয়ানভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না—কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর হইতে রোজই আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য মহানন্দের দফ্তরে হাজির হইতে লাগিলাম। বালকের উপদ্রবে অস্থির হইয়া কয়েক দিন মহানন্দ খসড়া করিয়া দিল। কিন্তু মাশুলের সঙ্গতি ত নাই। মনে ধারণা ছিল মহানন্দের হাতে চিঠি সমর্পণ করিয়া দিলেই বাকি দায়িত্বের কথা আমাকে আর চিন্তা করিতেই হইবে না—চিঠি অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিবে। বলা বাহুল্য মহানন্দের বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং এ চিঠিগুলি হিমাচলের শিখর পর্য্যন্ত পৌছে নাই।

বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্ গম্ করিতে থাকিত। দেখিতাম গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোনো ত্রুটি হয় এই জন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তকমাওয়ালা পাগ্ড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি এজন্য পূর্ব্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।

একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিন জনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সঙ্কলন

করিয়া লইলেন। অনেক দিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারাম বাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধরীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল। মাথা মুড়াইয়া বীরবৌলি পরিয়া আমরা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম। সে আমাদের ভারি মজা লাগিল। পরস্পরের কানের কুণ্ডল ধরিয়া আমরা টানাটানি বাধাইয়া দিলাম। একটা বাঁয়া ঘরের কোণে পড়িয়াছিল—বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম নীচের তলা দিয়া কোনো চাকর চলিয়া যাইতেছে ধপাধপ শব্দে আওয়াজ করিতে থাকিতাম—তাহারা উপরে মুখ তুলিয়াই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করিয়া অপরাধ আশঙ্কায় ছুটিয়া পালাইয়া যাইত। বস্তুত গুরুগৃহে ঋষিবালকদের যে ভাবে কঠোর সংযমে দিন কাটিবার কথা আমাদের ঠিক সে ভাবে কাটে নাই। আমার বিশ্বাস, সাবেক কালের তপোবন অন্বেষণ করিলে আমাদের মত ছেলে যে মিলিত না তাহা নহে, তাহারা খুব যে বেশি ভালমানুষ ছিল তাহার প্রমাণ নাই। শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ বারো ছিল তখন তাঁহারা কেবলি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতিদান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন এ কথা যদি কোনো পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই কারণ শিশুচরিত্র নামক পুরাণটি সকল পুরাণের অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মত প্রামাণিক শাস্ত্র কোনো প্রাচীন ভাষায় লিখিত হয় নাই।

নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে এক মনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে বয়সে উহার তাৎপর্য্য আমি ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে আমি "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কি বুঝিতাম কি ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে জিনিষটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে সেটা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষী কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি; যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান তাঁহারা এই জিনিষটার কোনো খবর রাখেন না। আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিষ বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দআবেগপূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ছেলেবেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছুই জানিতাম না তখন প্রচুরছবিওয়ালা একখানি Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই—নিতান্ত আবছায়া গোছের কী একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম,—পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই—কিন্তু আমার পক্ষে সে পড়া তত বড় শূন্য হয় নাই। একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট্ উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মত এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভাল জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিষটা গাঁথা

হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে "নিভৃত নিকুঞ্জগৃহংগত যা নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং" এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্য্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝঙ্কারের মুখে "নিভৃত নিকুঞ্জগৃহং" এই একটি মাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্য-রীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড় আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি—অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহন-বহনেন বহুদূষণং—এই পদটি ঠিক মত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম সেদিন কতই খুসি হইয়াছিলাম! জয়দেব সম্পূর্ণত বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্য্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। আরো একটু বড় বয়সে কুমারসম্ভবের—

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত দেবদারুঃ
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ
রাসেব্যতে ভিন্ন শিখণ্ডিবর্হঃ—

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল "মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর" এবং "কম্পিত দেবদারু" এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিত মহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগঅন্বেষণতৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ূরপুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়ই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম।

নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভাল করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন—সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড় বড় কানভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমা খরচ খতাইয়া বিচার করেন তাঁহারাই অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন যাহা দেওয়া গেল তাহা বুঝা গেল কি না। বালকেরা, এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে তাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়—সেই স্বর্গ হইতে যখন পতন হয় তখন বুঝিয়া পাইবার দুঃখের দিন আসে। কিন্তু একথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জগতে, না বুঝিয়া পাইবার রাস্তাই সকলের চেয়ে বড় রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাট-বাজার বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে না, পর্ব্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।

তাই বলিতেছিলাম, গায়ত্রী মন্ত্রের কোনো তাৎপর্য্য আমি সে বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে। কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাধান মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলি জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না। অতএব কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মত এমন কোনো একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ

(গল্প)

(জাপান ম্যাগাজিন হইতে)

তখন জাপানের মধ্যে বকুদেনের মতো নিপুণ তরোয়ালবাজ কেহ ছিল না। দেশবিদেশ হইতে দলে দলে ছাত্রেরা

এই বিখ্যাত ওস্তাদের নিকট তরোয়াল খেলা শিখিতে আসিত।

একদিন সকালে ওস্তাদজি নদী পার হইয়া স্থানান্তরে যাইতেছেন,—নৌকা পরিপূর্ণ—তিলধারণের স্থান নাই—ঘেঁসাঘেঁসি, ঠেসাঠেসি করিয়া লোক বসিয়াছে। যাত্রী যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের সকলেই প্রায় ব্যবসাদার—কেবল একটি মাত্র যুবক ছিল সে সামুরাই। তাহার পরিধানে যোদ্ধার বেশ—কোমরে তরোয়াল। ভিড়ের মধ্যে একজন যাত্রী যেমন দাঁড়াইয়া উঠিতে গেছে অমনি তাহার পা সামুরাই যুবকের তরোয়ালের উপর হঠাৎ ঠেকিয়া গেল। যুবক চটিয়া আগুন। সে সামুরাই; অস্ত্র তাহার কাছে দেবতার মতো পবিত্র -সেই অস্ত্রে হীনবংশীয় এক ব্যবসায়ীর পা ঠেকিয়াছে। সে তাহা সহ্য করিতে পারিল না। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া কহিল—"এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার তরোয়ালে পা!"

ব্যবসায়ীর মুখ শুকাইয়া গেল। সে ভয়কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"অপরাধ মার্জ্জনা করুন। দোষ আমার ইচ্ছাকৃত নয়—হঠাৎ ঘটিয়া গেছে।"

এই কাতর উক্তিতে যুবকের উত্তপ্ততা কিছুমাত্র কমিল না;—সে উত্তরোত্তর চটিয়া উঠিতে লাগিল। ব্যবসায়ী নতজানু হইয়া বারম্বার ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল—কিন্তু যুবক তাহাতে কর্ণপাত করিল না। সে দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—"ক্ষমা নাই। যতক্ষণ না তোর দেহের রক্তে তরোয়ালের মালিন্য ঘুচাইতে পারি—ততক্ষণ ক্ষমা নাই!"

ব্যাপার যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন বকুদেন স্থির থাকিতে পারিলেন না। এতক্ষণ তিনি নীরবে যুবকের ঔদ্ধত্য কত দূর উঠিতে পারে তাহাই দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, নৌকার মধ্যে সমস্ত যাত্রী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যুবকের ব্যবহারে কেহ কোনোরূপ আপত্তি করিতে পারিতেছে না। তিনি তখন অগ্রসর হইয়া যুবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন-"এ কী তোমার ব্যবহার! যে অপরাধ ইচ্ছাকৃত নয় তা তুমি ক্ষমা করিবেনা!"

বকুদেনকে ব্যবসায়ীর পক্ষ লইতে দেখিয়া যুবকের চিত্ত আগুনে ঘৃতাহুতির মতো জ্বলিয়া উঠিল। সে বকুদেনকে বিস্তর গালি পাড়িতে লাগিল। বকুদেন কোনো কথা না কহিয়া নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। তারপর যখন যুবক অস্ত্র লইয়া ব্যবসায়ীকে আক্রমণ করিতে গেল তখন তিনি বুক পাতিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"আগে আমার সহিত অস্ত্রবিচার হইয়া যাক তারপর যাহা হয় করিও।"

তখনই ঠিক হইয়া গেল যুবকের সহিত বকুদেনের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইবে। কিন্তু নৌকার মধ্যে এত ভিড়ে তো যুদ্ধ চলেনা, সেই হুকুম হইল নৌকা ভিড়াও। যতদূর চক্ষু যায় তীরের কোনো চিহ্ন নাই—অনতিদূরে একটা চড়া ছিল সেইখানেই নৌকা বাঁধিবার জন্য মাঝিরা নৌকার মুখ ফিরাইল। যুবক আস্তিন গুটাইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। বকুদেন কিন্তু নদীর জলের পানে চাহিয়া নীরব নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বকুদেনের এই গাম্ভীর্য্য উদ্ধত যুবককে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছিল। সে বারম্বার কটুবাক্য দ্বারা বকুদেনকে আঘাত করিতেছিল কিন্তু তাহাতেও যেন তাহার মনের রোষ দূর হইতেছিল না। সে বকুদেনকে নিতান্ত হীন ঠাওরাইয়া নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আস্ফালন করিতেছিল। সে একবার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"জানো তুমি, আমার শিক্ষা কাহার কাছে! জাপানের মধ্যে যাঁহার সন্ধান অব্যর্থ তিনিই আমার গুরু! তোমার শিক্ষা কাহার কাছে শুনি!"

বকুদেন একটু হাসিয়া বলিলেন—"জাপানের মধ্যে বিনা অস্ত্রে যিনি যুদ্ধ করেন তিনিই আমার গুরু।"

বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ! কথাটাকে শ্লেষ ভাবিয়া যুবক আগুন হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে নৌকা চড়ার কিনারায় আসিয়া ঠেকিল। যুবকের আর বিলম্ব সহিতেছিল না, সে একলাফে নৌকা হইতে নামিয়া পড়িল। এবং ডাক দিয়া বকুদেনকে নামিতে বলিল। বকুদেন নৌকা হইতে একটা কাঠ উঠাইয়া লইয়া চড়ার গায়ে এক ধাক্কা মারিয়া নৌকাকে পিছাইয়া দিলেন, তারপর মাঝিদের ডাকিয়া ধীরভাবে কহিলেন—"নৌকা ফিরাও।"

দেখিতে দেখিতে নৌকা অগাধ জলে আসিয়া পড়িল। যুবক উত্তেজনার আতিশয্যে কিছুই বুঝিতে পারিল না। বকুদেন যখন হাঁক দিয়া কহিলেন—"একেই বলে বিনা অস্ত্রে

যুদ্ধ!" তখন তাহার জ্ঞান হইল। সে চাহিয়া দেখে নৌকা পালভরে দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে—চড়ার উপর কেহ কোথাও নাই—তীর দেখা যায় না- চারিদিকে কেবল অসীম জলরাশি—প্রতিমুহূর্ত্তে ফেনিল জলোচ্ছ্বাস চড়ার সীমারেখা আত্মসাৎ করিতেছে!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

আফ্রিকায় ইস্‌লাম ধর্ম্ম*

বর্ত্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের অর্দ্ধাংশ মুসলমানধর্ম্ম সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছে। অপর অর্দ্ধাংশেরও এক চতুর্থাংশ ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাবগ্রস্ত। এবং অবশিষ্ট অংশও ক্রমশঃ ইস্‌লামধর্ম্মের অধিকারের মধ্যে আসিবে এমন সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য, দুর্ব্যবহৃত ও পশ্চাদ্বর্ত্তী মহাদেশটীতে যে-ধর্ম্ম এরূপ দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে সে ধর্ম্মেরই বা প্রকৃতি কি এবং সে দেশের অধিবাসীদের মধ্যে উহা যে পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে তাহারই বা প্রকৃতি কি এ প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইবে।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে আমরা সচরাচর ঐ ধর্ম্মকে যে নাম দিয়া থাকি তাহা তাহার প্রকৃত নাম নহে। একজন নিষ্ঠাবান ক্যাথলিককে খৃষ্টান না বলিয়া পোপতন্ত্রী বলিলে তাহাকে যেরূপ অপমান করা হয় একজন মুসলমানকে মহম্মদতন্ত্রী বলিলেও তাহাকে ঠিক সেইরূপ অপমান করা হয়। শোক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রচণ্ড ওমর যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে কোন দুঃসাহসিক বলিবে যে মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে তিনি তাহার শিরশ্ছেদন করিবেন—কারণ মহম্মদের মৃত্যু কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তখন সে কথা শুনিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ একান্ত শ্রদ্ধাবান আবুবকর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে "মহম্মদ কাহার পূজা করিতে তোমাকে শিখাইয়াছেন, মহম্মদের না মহম্মদের ঈশ্বরের?" বস্তুতঃ এই ধর্ম্মমত মহম্মদতন্ত্র নহে—ইহা ইস্‌লাম। ইস্‌লাম শব্দের ধাতুমূলক অর্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ। যে কেহ এই মতকে স্বীকার করে সে আপনাকে মহম্মদতন্ত্রী বলে না "মস্‌লিম" বলে। মস্‌লিম ও ইস্‌লাম শব্দ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন।

"আল্লাহো আকবর" "ঈশ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা মহান্, আর কেহ নহে," ইহাই মুসলমানের ধর্ম্মমত এবং ইস্‌লাম অর্থাৎ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও তাহাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ অনুভব করাই মুসলমানের জীবন। মহম্মদ বলেন যে তিনি ঐশীবাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ—এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বার্ত্তা দুইটী অবিশ্বাসীদের নিকট ঘোষণা করিবার জন্য তিনি বিশেষভাবে আদিষ্ট। এই দুইটী মতই মুসলমান প্রচারকগণ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া থাকেন, এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বহুদেববাদী ও নিকৃষ্টতম পৌত্তলিকতায় নিমগ্ন কাফ্রিগণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই দুটী মতকেই স্বীকার করে। কোরাণের একটী বিশেষ অধ্যায় হইতে দুইটী অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, ইহা মহম্মদের শেষ জীবনের লেখা, অতএব ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব ও চরিত্রনীতি সম্বন্ধে তাঁহার মতের সার কথাটী পাওয়া যাইবে।

"ঈশ্বর প্রাণময় অসীম, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। তন্দ্রা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, নিদ্রাও নহে। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার। এমন কে আছে যে তাঁহার নিকট মধ্যস্থতা করিতে পারে যদি সে তাঁহার অনুমতি না পায়। তিনি জানেন কোনটা অতীত ও কোনটা মানবের ভাবী, এবং তিনি যাহা জানিতে না দেন তাহা কেহ জানিতে পারে না। দ্যুলোকে ও ভূলোকে তাঁহার সিংহাসন বিস্তৃত, ইহাদিগকে তিনি ধারণ করিয়া আছেন কিন্তু ইহারা তাঁহার পক্ষে ভারস্বরূপ নহে। তিনি সর্ব্বোচ্চ এবং ভূমা।"

ইহাই কোরানের ধর্ম্মতত্ত্ব। এক্ষণে নীতির কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি।

"উপাসনাকালে পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে মুখ ফিরাইলেই মানুষ ধার্ম্মিক হয় না। কিন্তু তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক যিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন ও শেষ বিচারের দিন, দেবদূত ও ধর্ম্মশাস্ত্র এবং প্রেরিত পুরুষদের প্রতি যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বশত আপন ধনসম্পত্তি যিনি জ্ঞাতি কুটুম্ব, দরিদ্র, অনাথ ও পথিকদের অভাব-মোচনের জন্য ও দস্যুকর্ত্তৃক বন্দীদিগকে উদ্ধারের জন্য ব্যয় করেন, যিনি যথাবিধি দান করেন ও নিয়মিত প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আপন ব্যবসায়ে যিনি বিশ্বাসী, যিনি কর্ম্মসহিষ্ণু ও দুঃখে ধৈর্য্যশীল এবং যিনি ন্যায়বান ও ধর্ম্মভীরু তিনিই ধার্ম্মিক।"

যে সকল কাফ্রি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি, চরিত্রনীতি, সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইবে। কোন

* রেভারেণ্ড বস্‌ওয়র্থ্‌ স্মিথ্‌ রচিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।

জাতি নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্ব্ব আচার অনুষ্ঠান সমস্তই একেবারে পরিত্যাগ করিবে এ কথনই সম্ভবপর হইতে পারে না। বস্তুতঃ এরূপ বিপ্লব যদি বা ঘটিত তবে তাহা স্থায়ী ও সত্য হইত না। কিন্তু মুসলমান কাফ্রিগণের নৈতিক জীবন যে অন্যান্য কাফ্রিদের অপেক্ষা অনেক উন্নত তাহা আফ্রিকাবাসী খ্রীষ্টান মিশনরীগণ, ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারী এবং ভ্রমণকারীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

এক কালে প্রায় সমস্ত আফ্রিকাখণ্ডেই নরমাংসভোজন, নরবলি ও জীবিত শিশুসন্তানগণকে সমাধিস্থ করিয়া ফেলা প্রচলিত ছিল, এবং এখনো এই সকল নিদারুণ প্রথা উক্ত মহাদেশের অনেক স্থলেই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু মুসলমান কাফ্রিগণের মধ্যে তাহা একেবারে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহারা উলঙ্গ অবস্থায় থাকিত তাহারা বস্ত্র পরিতে শিখিয়াছে, যাহারা পূর্ব্বে কখনো স্নান করিত না শাস্ত্রবিধি অনুসারে এখন তাহারা সর্ব্বদা স্নান করে। পূর্ব্বে তাহাদের সমস্ত অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র জাতির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই বদ্ধ ছিল এখন তাহা বৃহৎ অধিকারের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন খণ্ড খণ্ড জাতি মহাজাতিতে এবং মহাজাতিগুলি জ্ঞান ও শক্তির উন্নতি অনুসারে বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে। সুদান ও সুদানের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দেশগুলির গত শত বৎসরের ইতিহাস হইতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে বিখ্যাত ভ্রমণকারী মঙ্গো পার্ক যেরূপ পাঠশালার কথা বর্ণনা করিয়াছেন সেইরূপ অনেক পাঠশালা সে দেশে স্থাপিত হইয়াছে, এবং যদিও ছাত্রদের সেখানে কেবল মাত্র কোরান আবৃত্তি করিতেই শিক্ষা দেওয়া হয় তথাপি ক্রমে তাহাদের উন্নতির সম্ভাবনা আছে। পূর্ব্বে সেখানে ভীষণদর্শন পুত্তলিকা অথবা "জুজু" পূজার-গৃহ ছিল ; এখন সেখানে, সুনির্ম্মিত সুপরিচ্ছন্ন মসজিদগুলি সমস্ত গ্রামের কেন্দ্ররূপে গ্রামবাসীদিগকে প্রাত্যহিক ও সাপ্তাহিক নমাজে আহ্বান করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রসকল যে আরব ভাষায় লিখিত আছে তাহার ভাষার সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য অসামান্য এবং সে ভাষা আফ্রিকাখণ্ডের অর্দ্ধেক জাতির পরিচিত সাধারণ ভাষা। এই ভাষা দ্বারা একটি সাহিত্যের সহিত পরিচয় লাভ ঘটে—বস্তুত এই ধর্ম্মশাস্ত্রই একটী বৃহৎ সাহিত্য।

একজন শাসনকর্ত্তার অব্যবস্থিত ইচ্ছার স্থানে মুসলমান শাস্ত্রের লিপিবদ্ধ বিধিগুলিও ইহাদের মধ্যে সভ্যতার উন্নতি সাধনে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে। পূর্ব্বে কড়ি, বারুদ, তামাক, মদ প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদানেই এ দেশের ব্যবসায় সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে বাণিজ্য বহুবিস্তৃত ও নিয়মবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ বাণিজ্যের প্রভাবে এবং মুসলমান ধর্ম্মবিহিত নিয়মবদ্ধ শাসনতন্ত্রের ফলে এই আফ্রিকাখণ্ডে অনেক বড় বড় নগরের উদ্ভব হইয়াছে। উৎসাহ, মর্য্যাদাবোধ, আত্মনির্ভর, আত্মসম্মান, ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়েই মুসলমান কাফ্রিগণ, পৌত্তলিক ও খৃষ্টান কাফ্রিদের অপেক্ষা উন্নত, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

ইহা ছাড়াও মুসলমান প্রভাবে আফ্রিকায় আর একটী মহদুপকার সাধিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা যেখানেই গিয়াছেন মদের বোতলটি সঙ্গে লইয়াছেন। তাঁহারা নিজেরাও মদ্যপান করেন এবং স্বার্থাভিসন্ধিতে দেশবাসিগণকেও মদ্যপানে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। এই মত্ততার দারুণ প্লাবনে দেশের লোক দ্রুতবেগে বিনাশের অভিমুখে ভাসিয়া চলে। য়ুরোপীয় বণিকগণ এইরূপে আফ্রিকায় একটি দুশ্চেদ্য পাপ ও তাহার আনুষঙ্গিক বহুতর দুঃখ ও অকল্যাণ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। মহম্মদ বলিয়াছেন—

হে প্রকৃত বিশ্ববাসীগণ নিশ্চয় জানিও যে, মদ্যপান, জুয়াখেলা, প্রতিমা নির্ম্মাণ ও ভাগ্য নির্ণয়ার্থে তীরক্ষেপরীতি বিশেষ নিন্দনীয় ও শয়তানের কার্য্য। অতএব আপন কল্যানের জন্য এ সকলকে পরিত্যাগ করিও। মদ্যপান ও জুয়াখেলা দ্বারা শয়তান তোমাদের মধ্যে বিবাদ বিদ্বেষের বীজ বপন করিবার পথ খোঁজে এবং ঈশ্বর-চিন্তা ও প্রার্থনা হইতে তোমাদের বিচ্যুতি ঘটায়। অতএব তোমরা কি এ সকল হইতে নিবৃত্ত হইবে না।

শাস্ত্রের ঐকান্তিক নিষেধাজ্ঞার দ্বারা মুসলমান ধর্ম্ম, আপন অধিকৃত দেশ সকল হইতে মদ্যপান ও জুয়াখেলার সম্পর্ক চিরদিনের মত নিরস্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে আফ্রিকাখণ্ডে কি কি অনিষ্ট ঘটিয়াছে এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইবে। প্রথমেই এ কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে মুসলমান সভ্যতা য়ুরোপীয়

সভ্যতা হইতে এতই বিভিন্ন যে তাহার ক্রটি সম্বন্ধে কঠোর-ভাবে বিচার করা আমাদের পক্ষে খুবই সহজ এবং মুসলমান জাতি কর্ত্তৃক যে সকল অপকার্য্য সাধিত হইয়াছে তাহারই অনুরূপ দুষ্কৃতির পরিচয় যে অনতিপূর্ব্বে য়ুরোপীয় জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় তাহা বিস্মৃত হওয়াও আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রথম, দাসব্যবসায়প্রথা মুসলমানদিগের সাহায্যে অদ্যাবধি আফ্রিকায় প্রচলিত রহিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিগণও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক নহে। এ কথাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে খৃষ্টান ধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হইয়াও এবং মুসলমানের অপেক্ষা য়ুরোপীয় খৃষ্টানের প্রলোভনের কারণ অনেক গুণে অল্প সত্ত্বেও খৃষ্টান য়ুরোপ এ সম্বন্ধে যে অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া অপরকে নিন্দাবাদকালে তীব্র আত্মধিক্কার তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। অবশ্য দাসব্যবসায়প্রথা খৃষ্টান জাতি মাত্রেই এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যে কোন ব্যক্তি আপনাকে খৃষ্টান নামে অভিহিত করে তাহারই নিকট ইহা বিশেষ-ভাবে ঘৃণিত। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে মহম্মদ বলিয়াছেন "মনুষ্যবিক্রয়কারী ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা নীচ", কিন্তু কোন মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্য বা শাসনকর্ত্তা অদ্যাবধি এই ব্যবসায়ের প্রতিবিধানের জন্য সমবেত ভাবে কোন উদ্যোগ করেন নাই। আমার বিশ্বাস, মুসলমানেরা মনে করে যে অবিশ্বাসীদিগকে দাস করিয়া লইয়া তাহারা দুই পক্ষেরই কল্যাণ করিয়া থাকে ও তাহাতে মহম্মদের বিধিই পালন করা হয়। বর্ব্বরগণ গ্রীকদের দাসত্ব করিবার জন্যই প্রকৃতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, গ্রীক দার্শনিকদের মনে এই বিশ্বাস যেমন দৃঢ় ছিল, পৌত্তলিক ও খৃষ্টানগণও বিধাতার ব্যবস্থায় মুসলমানের দাস হইবার জন্যই জন্মিয়াছে এ বিশ্বাসও মুসলমানের মনে সেইরূপ প্রবল।

দাস ব্যবসায়ের ফলে মনুষ্যের জীবন যে কত নষ্ট হয়, মনুষ্যের শক্তির যে কত অপব্যয় ঘটে এবং সমস্ত জড়াইয়া মনুষ্যের দুঃখ যে কিরূপ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে তাহা লিভিংষ্টোন ও অপরাপর যেসকল ভ্রমণকারী এই ব্যবসায়ীদলের অনুসরণ করিয়া সমস্ত তথ্য অবগত হইয়াছেন তাঁহাদের রচনা পাঠ করিলে সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, ইহাই বিশেষ সন্তোষের বিষয় যে আফ্রিকায় ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দাস-সংগ্রহের যোগ্য স্থানের পরিধি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, কারণ মুসলমানদিগকে দাসত্বে বদ্ধ করা মুসলমান শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে খৃষ্টানরাজ্যে দাসগণকে যেরূপ আচরণ সহ্য করিতে হইত মুসলমানরাজ্যে সেরূপ হয় না। এসম্বন্ধে মহম্মদের উপদেশ এই "তোমরা নিজে যাহা খাও তাহাদিগকেও তাহাই খাইতে দিবে এবং নিজে যেরূপ কাপড় পর তাহাদিগকেও সেইরূপ পরিতে দিবে, কারণ তাহারাও প্রভু ঈশ্বরের সেবক, তাহাদিগকে যেন যন্ত্রণা দেওয়া না হয়।" মহম্মদের একজন অনুবর্ত্তী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "একজন দাস আমাকে বিরক্ত করিলে দিনে কতবার তাহাকে আমার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য?" মহম্মদ উত্তর করিয়াছিলেন "দিনে সত্তর বার।"

দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য লোকদের ন্যায় মুসলমানদেরও সংগুণ অনেক সময় দোষের কারণ হয়। একজন কাফ্রি মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পূর্ব্বকথিতরূপে আত্মমর্য্যাদা ও আত্মসম্মান বোধ লাভ করে তেমনি সে যে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী-গণকে পদধূলির মত হেয় জ্ঞান করে তাহাতে কোন ভুল নাই। একেশ্বরবাদীরা বহুদেববাদীদিগকে যেরূপ দারুণ ঘৃণা করিয়া থাকে এমন বিরাট ঘৃণা আর কোথাও দেখা যায় না এবং এরূপ হৃদয়শোষণকর মানববিদ্বেষও আর কোথাও নাই।

তৃতীয়তঃ ধর্ম্মযুদ্ধ। তরবারির সাহায্যে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করা ধর্ম্মসঙ্গত, এই মত হইতে জগতের ইতিহাসে ভয়ঙ্কর যুদ্ধসকল সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টান জাতিরা এসম্বন্ধেও মুসলমানদের প্রতি কটাক্ষপাত করিবার অধিকারী নহেন। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই উভয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য আছে,—মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এরূপ যুদ্ধের সুস্পষ্ট অনুমোদন করিয়াছেন এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ইহাকে সুস্পষ্ট ভাবেই নিন্দা করিয়াছেন। মহম্মদ নিঃসন্দেহই এরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে যুদ্ধকার্য্য যদি বা অন্যায় হয় তথাপি যে সকল অমঙ্গল ইহা দ্বারা দূরীভূত হইবে তাহা অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব সামান্য।

এবং যে সকল যোদ্ধৃ-স্বভাব-সম্পন্ন ধর্ম্মপ্রচারকগণকে মুসলমান সমাজ তাহার বিকৃতির অবস্থায় ও উন্নতির অবস্থায় নিয়ত জন্মদান করিয়াছে তাহাদের পক্ষেও এইরূপ যুক্তি অনুসরণ করা স্বাভাবিক। মিঃ গিবন একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে ধর্ম্মের সদ্ব্যবহারই হৌক আর অসৎ ব্যবহারই হৌক তাহা জাতির স্বভাবগত আচরণকে অপ্রতিহতভাবে প্রবল করিয়া তুলিতে যেরূপ সক্ষম তাহার গতিরোধ করিতে সেরূপ নহে। যুদ্ধপিপাসা, লুণ্ঠন লোলুপতা প্রভৃতি আরব জাতির প্রবৃত্তির অন্তত কতকগুলিকে মহম্মদ ধর্ম্মশাস্ত্রমূলক সম্মতি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি শতাব্দীকাল পরে পোপেরাও য়ুরোপের খৃষ্টান ক্ষত্রিয়দিগকে তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্টানের পুণ্যভূমিতে এই সশস্ত্র তীর্থযাত্রা তাঁহাদের পক্ষে আমোদমাত্র ছিল, তাহাকে তাঁহারা শাস্তি বলিয়া গণ্য করেন নাই। ইহার ফলে কি মুসলমান কি খৃষ্টান উভয় সমাজে জাতিগত যে এক বিরাট উদ্দীপনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কোন তত্ত্বজ্ঞানী পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিয়া কদাচ নির্ণয় করিতে পারিতেন না এবং তৎকালপ্রচলিত কোন যুদ্ধপ্রণালী এই প্রচণ্ড বেগকে বাধা দিতে পারিত না। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, সমস্ত খৃষ্টান জাতি এক্ষণে এই ধর্ম্মযুদ্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু সমগ্র মুসলমান জাতির নিকট এখনো ইহা ধর্ম্মসঙ্গত মত বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং অনুকূল অবস্থা পাইয়া এখনো আফ্রিকার ন্যায় দেশে এই মত কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

চতুর্থতঃ, বহুবিবাহ ও তাহার আনুষঙ্গিক অকল্যাণ সমূহ। মহম্মদ স্ত্রীলোকদের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু তাহা অধিক নহে। প্রত্যেক পুরুষের চারিটি করিয়া বৈধ পত্নী গ্রহণের নিয়ম থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহাতেই তাহার শেষ নহে, কারণ ইচ্ছামত স্ত্রী ত্যাগের অধিকার মুসলমানের আছে এবং মুসলমান বিধি অনুসারে ক্রীতদাসীগণ মুসলমান প্রভুর ভোগের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বহুবিবাহ সমাজের মূল উৎসকেই আবিল করিয়া দেয়। সর্ব্বপ্রকার কোমলবৃত্তি সাধুবৃত্তি ও পরার্থপরতা শিক্ষার কেন্দ্র যে পরিবার তাহাই যদি এইরূপে দূষিত হয় তবে সমাজ কিরূপে বিশুদ্ধ থাকিতে পারে?

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তবে কেন খৃষ্টান ধর্ম্ম আফ্রিকায় ব্যর্থ হইল? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ খৃষ্টানধর্ম্ম কাফ্রিদের নিকট বিজাতীয় পরিচ্ছদে উপস্থিত হইয়াছে। মুসলমানধর্ম্ম যদিও তরবারির সাহায্যেই প্রচারিত হইয়াছিল তথাপি কাফ্রিরা এই ধর্ম্ম স্বদেশে স্বাধীন থাকিয়া আপনাদের চিরপরিচিত পরিবেষ্টনের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। এই ধর্ম্ম আফ্রিকার জলবায়ুর সহিত আপনার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া যখন সেখানকার মাটিতে মূলবিস্তার করিল তখনই প্রধানতঃ সেখানকার দেশবাসীদের সাহায্যেই তাহা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যে-কেহ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে এই ধর্ম্ম তাহাকে কি রাষ্ট্রব্যাপারে, কি সমাজে, কি চরিত্রনীতিতে, কি ভগবদ্ভক্তিতে সর্ব্বত্রই উন্নতির অভিমুখেই আহ্বান করে। এইরূপে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিরা তাহাদের চারিপাশের অবস্থা হইতে উপরে উঠিয়া যায় এবং ক্রমে তাহাদের চতুষ্পার্শ্বকেও উন্নত করিয়া তোলে।

পক্ষান্তরে, আমেরিকায় খৃষ্টানধর্ম্ম যখন প্রথম কাফ্রির নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বিদেশে ক্রীতদাস মাত্র। এবং ইহা তাহার নিকট হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বা আত্মীয়ের ধর্ম্ম রূপে নহে পরন্তু অত্যাচারী প্রভুর মত স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহার ধর্ম্মশিক্ষকগণ আকার বর্ণ শিক্ষা ও সভ্যতা সকল বিষয়েই তাহা হইতে পৃথক। উভয়ের মধ্যে অপরিমেয় ব্যবধান। এইসকল খৃষ্টান উপদেষ্টার অভিপ্রায় যতই কেন সৎ হৌক না তথাপি বর্ণগত বিদ্বেষ হইতে তাঁহারা মনকে নির্ম্মল করিতে পারেন নাই। এই বর্ণবিদ্বেষ য়ুরোপীয়ের মনে এতদূর বদ্ধমূল যে যাঁহারা দাসপ্রথার একান্ত বিরোধী তাঁহাদের মধ্যেও ইহা প্রকাশ পাইত এবং যেখানেই কৃষ্ণকায়গণ শ্বেতকায়দের সংস্রবে আসিয়াছে সেইখানেই ইহার পীড়াকর দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, খৃষ্টানধর্ম্ম নিগ্রোর জীবনের ভিতর হইতে না জাগিয়া বাহির হইতে তাহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে। শ্বেতকায়দের ধর্ম্ম তাহাদের সভ্যতারই একটি অঙ্গ, ইহাদের ধর্ম্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সভ্যতাকেও

যথাসম্ভব গলাধঃকরণ করিতে হয় এবং এইজন্যই, যেখানেই খৃষ্টানদেশে কাফ্রিরা আছে সেখানেই তাহারা কেবল অনুকরণকারী, ক্রীড়াপুত্তল ও ক্রীতদাসেরই সামিল হইয়া রহিয়াছে। কাফ্রিগণ য়ুরোপীয় খৃষ্টানের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রুচিকেও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিগত বিশেষত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং ইহাতে তাহাদিগকে আনন্দশূন্য উন্নতিহীন জীব করিয়া তুলিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মিঃ ব্লাইডন একবার একজন খৃষ্টান নিগ্রোকে একটি উপাসনাসভায় দেবতার উদ্দেশে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছিলেন যে "সেবকগণের প্রতি তুমি তোমার লিলিপুষ্পের ন্যায় শ্বেতহস্ত বাড়াইয়া দাও"। এবং অন্য আর একজনকে এই বলিয়া বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলেন যে "হে ভ্রাতাগণ, আমাদের উপাস্যকে তোমরা নীলচক্ষু, আরক্তকপোল, পিঙ্গলকেশ, সুন্দর একটি শ্বেত মনুষ্যের ন্যায় কল্পনা কর, আমাদিগকে তাঁহারই মত হইতে হইবে।"

বিভিন্ন জাতির প্রকৃতিগত বিভিন্নতাগুলিকে যদি মনুষ্যজীবনের বহুমূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য করিতে হয়, সেগুলি যদি বিশেষ সাবধানে ও যত্নে রক্ষা করিবার সামগ্রী হয়, এবং যদি একথা সত্য হয় যে স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া বরঞ্চ জীবসম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণীভুক্ত হইয়াও খাঁটি থাকা ভাল তথাপি উচ্চতর শ্রেণীর অনুকরণের ব্যর্থতা ও অস্থায়িত্ব কদাচই শ্রেয় নহে, তবে পাশ্চাত্যদেশে এ পর্য্যন্ত খৃষ্টানধর্ম্মকে যে প্রণালীতে নিগ্রোদের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা মূলতই ভুল। মিঃ ব্লাইডন বলেন—

"খৃষ্টান নিগ্রো তাহার প্রতিদিনের শিক্ষা হইতে অজ্ঞাতসারে এই বিশ্বাসই গ্রহণ করে যে সৎলোক হইতে গেলেই শ্বেত মনুষ্য হইতে হইবে। যোগ্য হইলেও তাহাকে শ্বেত মনুষ্যের সঙ্গী, সমকক্ষ ও সহযোগী হইবার মত করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয় না, কেবল অনুকরণ-কারী করিয়া তোলা হয় মাত্র। সে দেশে নিগ্রো যদি খাঁটি নিগ্রো হইতে চেষ্টা করে তবে তাহাকে পদে পদে উপহাসাস্পদ ও নিতান্ত অবজ্ঞেয় হইতে হয়। যথাসম্ভব শ্বেত মনুষ্যের ন্যায় হওয়া, তাহাদের বাহ্য রীতিনীতি, চাল চলন, সাজ সজ্জা ও হাব ভাবের অনুকরণ করাই খৃষ্টান নিগ্রোর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য। খৃষ্টান নিগ্রো তাহার অবস্থার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র পরাশ্রিত জীবের গুণ সমূহই লাভ করিয়া থাকে। অনুকরণ যথার্থ শিষ্যত্ব নহে। একজন খৃষ্টান নিগ্রো যেরূপ খৃষ্টান তাহা অপেক্ষা একজন মুসলমান নিগ্রো অনেক গুণে ভালো মুসল-মান। কারণ শিক্ষার্থী মুসলমান প্রকৃত শিষ্য, সে অনুকরণকারী মাত্র নহে। গুরুর পরিচালনসূত্র ছিন্ন করিয়া শিষ্য স্বাধীন হইলে স্বয়ংই একজন উদ্ভাবক হইয়া উঠে, কিন্তু অনুকরণকারী বাহির হইতে যোজনা দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। উপার্জ্জিত বিদ্যা শিষ্যকে শক্তিদান করে, অনুকরণে মানুষ যেটুকু শেখে কেবল সেইটুকুর মধ্যে সে বদ্ধ থাকে। মুসলমান নিগ্রো ও খৃষ্টান নিগ্রোর মধ্যে ইহাই প্রভেদ।

তৃতীয়তঃ খৃষ্টান গুরুগণের অপরাধ ও ত্রুটির দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়াই এ পর্য্যন্ত খৃষ্টানধর্ম্ম নিগ্রোদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। পশ্চিমআফ্রিকাবাসী নিগ্রোদের মত একটি জাতির নিকট একদিকে অজস্র মদ্য ও বারুদ যোগাইয়া অন্যদিকে তাহাদিগকে খৃষ্টানধর্ম্ম দিবার চেষ্টা যে কিরূপ অসঙ্গত তাহা বলাই বাহুল্য। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে, য়ুরোপের সকল জাতীয় বালকদিগেরই ব্যবহার স্বার্থপর নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিপূর্ণ। তিনশত বৎসরেরও অধিক-কাল ধরিয়া পোর্ত্তুগীজরা আফ্রিকার দুই উপকূলে শত শত ক্রোশ ভূমি জুড়িয়া বাস করিতেছে, কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের উন্নতির জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই। লিভিংষ্টোন বলেন দাসব্যবসায় কার্য্যেও পোর্ত্তুগীজরা আরবদের অপেক্ষা অনেক অধিকপরিমাণে হৃদয়হীনতা ও পাশবিকতার পরিচয় দিয়াছে। কালই যদি তাহাদিগকে আফ্রিকা হইতে সরিতে হয় তবে কতকগুলি ইমারত ছাড়া এই সুদীর্ঘ শাসনকালের আর কোন কীর্ত্তিই তাহারা পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে পারিবে না। ভারতবর্ষ, চীন, দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ ও নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি সকল দেশেই খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে খৃষ্টানগণের জীবনযাত্রার দৃষ্টান্তই সাংঘাতিক বিঘ্ন এবং আফ্রিকার উপকূলে ইহার মাত্রা আরো অধিক। খৃষ্টান ইতালি এখন এই দেশকে সভ্য করিবার জন্য মুসলমান তুর্কীর সহিত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

স্ত্রীলিঙ্গ

ভারতবর্ষের অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষায় শব্দগুলি অনেকস্থলে বিনা কারণেই স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দিতে ভোঁ (ভ্রূ), মৃত্যু, আগ (অগ্নি), ধূপ শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। সোনা, রূপা, হীরা, প্রেম, লোভ, পুংলিঙ্গ। বাংলা শব্দে এরূপ অকারণ, কাল্পনিক, বা উচ্চারণমূলক স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। এমন কি অনেক সময় স্বাভাবিক স্ত্রীবাচক শব্দও স্ত্রীলিঙ্গসূচক কোনো প্রত্যয় গ্রহণ করে না।

সেরূপ স্থলে বিশেষভাবে স্ত্রীজাতীয়ত্ব বুঝাইতে হইলে বিশেষণের প্রয়োজন হয়। কুকুর, বিড়াল, উট, মহিষ প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দের নিয়মে ব্যবহার কালে লিখিত ভাষায় কুক্কুরী, বিড়ালী, উষ্ট্রী, মহিষী হইয়া থাকে কিন্তু কথিত ভাষায় এরূপ ব্যবহার হাস্যকর।

সাধারণত ই প্রত্যয় ও নি প্রত্যয় যোগে বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয়। ই প্রত্যয়ঃ—ছোঁড়া, ছুঁড়ি, ছোকরা ছুকরি, খুড়া খুড়ি, কাকা কাকি, মামা মামি, পাগ্‌লা পাগ্‌লি, জেঠা জেঠি জেঠাই, বেটা বেটি, খুড়া খুড়ি, দাদা দিদি, মেসো মাসি, পিসে পিসি, পাঁঠা পাঁঠি, ভেড়া ভেড়ি, ঘোড়া ঘুড়ি, বুড়া বুড়ি, বামন বাম্‌নি, খোকা খুকি, শ্যালা শ্যালি। অভাগা অভাগী, হতভাগা হতভাগী, বোষ্টম বোষ্টমী, নেড়া নেড়ি।

নি প্রত্যয়ঃ—কলু কলুনি, তেলি তেলিনি, গয়লা গয়লানি, বাঘ বাঘিনি, মালি মালিনি, ধোবা ধোবানি, নাপিত নাপিতানি (নাপ্‌তিনি), কামার কামারনি, চামার চামারনি, পুরুৎ পুরুৎনি, মেতর মেতরানি, তাঁতি তাঁতিনি, মজুর মজুরনি, ঠাকুর ঠাকুরানি (ঠাকুরুন), চাকর চাকরানি, হাড়ি হাড়িনি, সাপ সাপিনি, পাগল পাগলিনি, উড়ে উড়েনি, কায়েৎ কায়েৎনি, খোট্টা খোট্টানি, চৌধুরী চৌধুরাণী, মোগল মোগলানি, মুসলমান মুসলমাননি, জেলে জেলেনি, রাজপুৎ রাজপুৎনি, বেয়াই বেয়ান।

এই প্রত্যয় যোগের নিয়ম কি তাহা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ এ প্রত্যয় কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দেই আবদ্ধ, তাহার বাহিরে প্রয়োজন হইলেও ব্যবহার হয় না। পাঞ্জাবি সম্বন্ধে পাঞ্জাবিনি, মারাঠা সম্বন্ধে মারাঠ্‌নি, গুজরাটি সম্বন্ধে গুজরাট্‌নি প্রয়োগ নাই। উড়েনি আছে কিন্তু শিখ্‌নি মগ্‌নি মান্দ্রাজিনী নাই।

ময়ূর জাতির স্ত্রী পুরুষের মধ্যে দৃশ্যতঃ বিশেষ পার্থক্য থাকাতে ভাষায় ময়ূর ময়ুরী উভয়ই ব্যবহৃত হয় কিন্তু চিল সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহার নাই।

পুরুষ মেয়ে, অথবা পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষ, স্বামী স্ত্রী, ভাই বোন্‌, বাপ মা, ছেলে মেয়ে, মদ্দা মাদী, ষাঁড় গাই, বর কনে, জামাই বউ, (বউ শব্দটি পুত্রবধূ ও স্ত্রী উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়)। সাহেব বিবি বা মেম, কর্ত্তা গিন্নি (গৃহিণী), ভূত পেত্নী, প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ আছে যাহার স্ত্রীলিঙ্গবাচক ও পুংলিঙ্গবাচক রূপ স্বতন্ত্র।

সংস্কৃত ভাষার মত বাংলা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। বাংলায় লিখিত বা কথিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কালে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে কখনো কখনো স্ত্রীলিঙ্গরূপ ব্যবহার হয়—কিন্তু ক্রমশ ভাষা যতই সহজ হইতেছে ততই ইহা কমিয়া আসিতেছে। বিষমা বিপদ, পরমা সম্পদ বা মধুরা ভাষা পরম পণ্ডিতেও বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেন না। বিশেষত বিশেষণ যখন বিশেষ্যের পরে ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় তখন তাহা বর্ত্তমান বাংলায় কখনই স্ত্রীলিঙ্গ হয় না - অতিক্রান্তা রজনী বলা যাইতে পারে কিন্তু রজনী অতিক্রান্তা' হইল আজ কালকার দিনে কেহই লেখে না।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উচ্চারণমতে কতকগুলি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কালে আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানি কিন্তু আধুনিক ভাষায় দেশ সম্বন্ধে তাহা খাটে না। ভারতবর্ষ বা ভারত, সংস্কৃত ভাষায় কখনই স্ত্রী শ্রেণীয় শব্দ হইতে পারে না কিন্তু আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে তাহাকে ভারতমাতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। বঙ্গও সেইরূপ বঙ্গমাতা। দেশকে মাতৃভাবে চিন্তা করাই প্রচলিত হওয়াতে দেশের নামকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে মানা হয় না।

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় গ্রহণ কালে সংস্কৃত নিয়ম রক্ষা করে না। যেমন, সিংহিনী (সিংহী), গৃধিনী (গৃধ্রী, গৃধ্র শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না), অধীনী (অধীনা,) হংসিনী (হংসী), সুকেশিনী (সুকেশী) মাতঙ্গিনী (মাতঙ্গী), কুরঙ্গিনী (কুরঙ্গী), বিহঙ্গিনী (বিহঙ্গী), ভুজঙ্গিনী (ভুজঙ্গী), হেমাঙ্গিনী (হেমাঙ্গী)।

বিশেষণ শব্দ বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় প্রাপ্ত হয় না কিন্তু বিশেষণ পদ বিশেষ্য অর্থ গ্রহণ করিলে এ নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে না। খেঁদী, নেকী।

ইয়া প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ইয়া প্রত্যয় ত্যাগ করিয়া ই প্রত্যয় গ্রহণ করে। ঘরভাঙানিয়া (ভাঙানে) ঘরভাঙানী, মনমাতানিয়া মনমাতানী, পাড়াকুঁদুলিয়া পাড়া-কুঁদুলি, কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তনী।

হিন্দিতে ক্ষুদ্রতা ও সৌকুমার্য্যবোধক ই প্রত্যয়যুক্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়—পুং গাড়া স্ত্রীং গাড়ি, পুং রস্‌সা, স্ত্রীং রস্‌সী।

বাংলায় বৃহত্ত্ব অর্থে আ ও ক্ষুদ্রত্ব অর্থে ই প্রত্যয় প্রয়োগ হইয়া থাকে, অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার দৃষ্টান্ত অনুসারে ইহাদিগকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

রসা রসি, দড়া দড়ি, ঘড়া ঘটি, বড়া বড়ি, ঝোল্‌া ঝুলি, নোড়া নুড়ি, গোলা গুলি, হাঁড়া হাঁড়ি, ছোরা ছুরি, ঘুষা ঘুষি, কুপা কুপি, কড়া কড়ি, ঝোড়া ঝুড়ি, কলস কল্‌সি, জোড়া জুড়ি, ছাতা ছাতি।

কোনো কোনো স্থলে এই প্রকার রূপান্তরে কেবল ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ব ভেদ বুঝায় না একেবারে দ্রব্যভেদ বুঝায়। যথা কোঁড়া (বাঁশের) কুঁড়ি (ফুলের), জাঁতা জাঁতি, বাটা (পানের) বাটি।

কিন্তু একথা বলা আবশ্যক টা ও টি, গুলা ও গুলি, স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ উভয় প্রকার শব্দেই ব্যবহৃত হয়। মেয়েগুলো ছেলেগুলি, বউটা জামাইটি ইত্যাদি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ত্রিপুরা রাজবাড়ীর "কের"

কের ত্রিপুরা রাজবাড়ীর একটি প্রসিদ্ধ উৎসব। বৎসরে একবার এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাবণ মাসের প্রথম দিনে রাত্রি দশটায় কের আরম্ভ হইয়া তরা ঊষা ছয়টায় ছাড়িয়া যায়। এতদুপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জামা জুতা ছাতা প্রভৃতি ব্যবহার, আমোদপ্রমোদ নৃত্যগীতবাদ্য, রাস্তায় লোক চলাচল, গৃহে অগ্নিপ্রজ্বলন এবং জনন-মরণ নিষিদ্ধ থাকে। কোথাও কাহারো মৃত্যু কিংবা কোনো স্ত্রীলোকের প্রসব সম্ভাবনা থাকিলে পূর্ব্বেই তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখে। জনন-মরণ ঘটিলে পূজা নষ্ট হইয়া যায় এবং তজ্জন্য গৃহস্বামীর প্রতি দণ্ডাদেশ হয়। উপরিউক্ত যে কোনো একটি নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য স্বয়ং মহারাজাও নাকি দণ্ডবিধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। অবশ্য তিনি যথাসাধ্য নিয়ম মানিয়াই চলেন; তবে রাজার পক্ষে সকল নিয়মের অধীন হইয়া চলা সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহাকে শাস্তিস্বরূপ অর্থদণ্ড দিতে হয়।

চন্তাই বা মহান্ত এই অর্থের অধিকারী। এই দেড়-দিনের জন্য চন্তাইকে সকলে রাজা বলিয়া মানে। যাহাতে কোথাও কোনো নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিতে না পারে তজ্জন্য মহান্তের অনুচরগণ সুদীর্ঘ সবল যষ্টি হস্তে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া পাহারা দেয় এবং দোষী পাইলে গ্রেপ্তার করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড আদায় করিয়া লয়।

আমি তখন সবে নূতন ত্রিপুরায় গিয়াছি, কের উৎসব ও তাহার নিয়ম সম্বন্ধে আমি একেবারে অনভিজ্ঞ। বাসায় বসিয়া আমি একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছি। এমন সময় পাঁচ ছয় জন চন্তাইসৈনিক সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ ফটকের নিকটে গতি থামাইয়া আমার প্রতি তীব্রদৃষ্টি হানিয়া কি বলাবলি করিতে লাগিল। আমি ত হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলাম; মনে হইল, এখানে নূতন আসিয়াছি, বুঝিবা না জানিয়া কোন্ অপরাধই করিয়া বসিয়াছি। যাহা হউক খানিক পরে তাহারা (জানি না কি ভাবিয়া) আমাকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিয়া প্রস্থান করিল।

সকাল ও সন্ধ্যা ছয়টায় তোপধ্বনি করিয়া সর্ব্বসাধারণকে ঘরের বাহিরে চলাফেরা ও কাজকর্ম্ম করিবার অবসর দেওয়া হয় এবং দশটা পর্য্যন্ত সকলে এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু তখনো বাহিরের লোক কেরের সীমানায় কিংবা সীমানার লোক বাহিরে যাইতে পারে না। দশটার সময় আবার তোপ দ্বারা সকলকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। এই দিন চতুর্দ্দশ দেবতার বাড়ীতে মহা সমারোহের সহিত পূজা হইয়া থাকে। দেবতাবাড়ী রাজধানী হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত চন্তাই তথাকার মহান্ত। মন্দিরের দেবতার চতুর্দ্দশটি মস্তকমূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে ত্রয়োদশটি স্বর্ণনির্ম্মিত ও একটি রৌপ্যের। দেবতার নাম যথা—

হরো মা হরী মা বাণী কুমারো গণকো বিধিঃ
ক্ষ্মাব্ধি গঙ্গা শিখী কামঃ হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশঃ।

এই দেবতাদিগকে প্রত্যক্ষ মানিয়া স্থানীয় অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থও ছাগ, মেষ প্রভৃতি মানস করিয়া থাকে।

দেবতাবাড়ী ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও চন্তাই শ্রেণীর পুরোহিতগণ সেই দিনের জন্য বাঁশ রোপিয়া পূজা দেয়। সন্ধ্যাবেলা পূজাক্ষেত্রে দলে দলে লোক মিলিয়া বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে এবং এই অগ্নি পবিত্রজ্ঞানে সকলে সযত্নে ঘরে ঘরে লইয়া যায়।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

ভক্ত কবি তুলসীদাস

হিন্দি রামায়ণ লেখক, সাধু ভক্তগণের অগ্রগণ্য, তুলসীদাসের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ দু একটী কবিতাও হয়ত অনেকে জানেন। কিন্তু তাঁহার জীবনী সকলে বিদিত নহেন। সেই ভক্তিমাখা চরিত্র ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার না থাকিলেও তাঁহার জীবনের কিছু আভাস পাঠকগণকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভবিষ্যতে তাঁহার রামায়ণ বিষয়ে পাঠকগণকে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

গোস্বামী তুলসীদাস ব্রাহ্মণকুলে রাজপুর জেলায় যমুনাতীরস্থিত বান্দা গ্রামে ৩৮৭ বৎসর পূর্ব্বে (১৫৮১ সম্বতে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম ত্রিবেদী। তিনি পরাশর গোত্রজ ছিলেন। শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করায় তাঁহার স্বভাব অতি কোমল ছিল। দীনবন্ধু পাঠকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ভবিষ্যতে তাঁহার যে ভাগবত প্রেম ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিবে, যৌবনকালেও সেই প্রেম অন্য আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি বিবাহ করিলেন, বিবাহ করিয়া স্ত্রীর প্রতি এতদুর আসক্ত হইলেন যে স্ত্রীকে ছাড়িয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না, যেখানে যান স্ত্রীর গুণের প্রশংসাই করেন; স্ত্রীর কথা ছাড়া আর কথা নাই; অহরহঃ স্ত্রীকে দর্শন করিয়াই তৃপ্তি। স্ত্রীর প্রতি এরূপ অসাধারণ ভালবাসা সচরাচর দেখা যায় না। তুলসীদাসের অনন্ত প্রেম অনন্তের দিকে যাইবে; কিন্তু তখনও তিনি সেই প্রাণারাম হরির আস্বাদ পান নাই। বিবাহ করিলেন, স্ত্রীর ভালবাসা পাইলেন, সেই ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার ভালবাসার স্রোত স্ত্রীকেই পরিবেষ্টন করিয়া চলিতে লাগিল।

মহাপুরুষদিগের জীবন যেরূপ উপায়ে গঠিত হইবে, তাহার আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই হইয়া থাকে। ভগবৎকৃপায় আপনাআপনি ক্রমে ক্রমে অনুকূল অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়,—আত্মোন্নতির পথ আপনা হইতে পরিষ্কার হইয়া আসে।

তুলসীদাস এক মুহূর্ত্তও স্ত্রীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহার শ্যালক তাঁহার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন। পূর্ব্বে কএকবার পিত্রালয়ে যাইবার কথা হয়, কিন্তু তুলসীদাস যাইতে দেন নাই। এবারে বিশেষ পীড়াপীড়ি। কিন্তু তুলসীদাস কোন মতে যাইতে দিবেন না। একদিন যখন তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, সেই অবসরে তাঁহার শ্যালক আপন ভগ্নীকে লইয়া নিজ বাটীতে চলিলেন। তুলসীদাস বাটী ফিরিয়া দেখেন, ঘরে স্ত্রী নাই। শুনিলেন স্ত্রী পিত্রালয়ে যাত্রা করিয়াছেন। প্রাণ উদাস হইয়া গেল, আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না, শ্বশুরালয়ের পথে উদ্ধশ্বাসে চলিলেন; লজ্জা নাই, বাহিরের জ্ঞান নাই, ছুটিয়া যাইতেছেন। অবশেষে ডুলির নিকট উপস্থিত হইলেন, ডুলির দরজা খুলিয়া স্ত্রীকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। স্ত্রীর সহিত আলাপের অভিলাষে ডুলির সহিত দৌড়িতে লাগিলেন। তাঁহার এই ব্যবহারে স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্রোধে অধীর হইলেন। সেই ক্রোধের অবস্থাতেও সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় এই কথা বলিয়া ভৎর্সনা করিলেন—"হে প্রাণপ্রিয়, তোমাকে ধিক্ শতধিক্। তুমি আমার প্রতি এত আকৃষ্ট; যদি ভগবান রামচন্দ্রে তোমার মন এইরূপ আকৃষ্ট হইত তাহা হইলে তোমার সকল কামনা সিদ্ধ হইত—তুমি ইহলোক ও পরলোকে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতে।"

স্ত্রীর মুখ হইতে এই উপদেশ বাক্য নির্গত হইবামাত্র তাহা তুলসীদাসের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ স্পর্শ করিয়া অন্তরনিহিত সুপ্ত বৈরাগ্যকে জাগাইয়া দিল। সেই মুহূর্ত্তেই তুলসীদাস যেন অন্য তুলসীদাস হইয়া গেলেন, তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। প্রগাঢ়

দাম্পত্য প্রেমে প্রতিঘাত পাইয়া সেই প্রেম যেন কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার হৃদয়ে বিলীন হইয়া গেল। সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। আপনার বলিতে যেন আর এ সংসারে কেহ নাই। মনের এই অবস্থা আসিলেই বৈরাগ্যের উদয় হয়; বৈরাগ্য হইলেই সত্যস্বরূপের দিকে মন যায়; তখন মানব সাধক হইবার উপযুক্ত হয়।

তুলসীদাস তখনই সেখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আর গৃহে গেলেন না। জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি হওয়ায় গৃহ সংসারের বাসনা ত্যাগ করিয়া কাশীধামের দিকে অগ্রসর হইলেন। কাশীধামে উপস্থিত হইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গেলেন, বিশ্বেশ্বরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন "যেন রামভক্তি লাভ করিতে পারি।" বিশ্বেশ্বর তখনও তাঁহার নিকট পাষাণময়, কোন উত্তর তুলসীদাস পাইলেন না।

সুকর ক্ষেত্রে নরসিংহদাস নামক এক সাধু বাস করিতেন। তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও ভক্ত ছিলেন। তুলসীদাস তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ করিয়া অনুরাগের সহিত সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। রামায়ণ কথকতা শ্রবণে তুলসীদাসের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কাশীধামে যেখানেই রামায়ণ কথকতা হইত, তিনি যত্ন সহকারে সেখানে গিয়া রামায়ণ শ্রবণ করিতেন।

তিনি প্রতিদিন নগরের বহির্ভাগে শৌচকার্য্যের জন্য যাইতেন এবং শৌচকার্য্য সমাধা করিয়া একটী বদরী বৃক্ষতলে অবশিষ্ট জলদ্বারা পদধৌত করিতেন। সেই বৃক্ষে একটী প্রেত থাকিত। সাধুর পদধৌত জল স্পর্শে পবিত্রতা লাভ করিয়া প্রেত স্বর্গে যাইবার উপযুক্ত হইল। তখন সে তুলসীদাসের সম্মুখে প্রকাশ হইয়া বলিল, "আমি আপনার উপকার করিতে ইচ্ছুক, আমার দ্বারা আপনার কি কার্য্য হইতে পারে বলুন, আমি তাহাই করিব।" তুলসীদাস বলিলেন, "আপনি প্রেত, আপনার দ্বারা আমার কোন কার্য্যের সম্ভাবনা নাই।" প্রেত বলিল, "আপনি যাহা বলিবেন, আপনার জন্য আমি তাহাই করিব।" তুলসী তখন বলিলেন, "হে প্রেত, আমি ভগবান রামচন্দ্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষী, আমার আর কোন অভিলাষ নাই।" প্রেত বলিল, "রামচন্দ্রকে দর্শন করাইবার ক্ষমতা আমার নাই; তবে এক উপায় আপনাকে বলিতেছি—ভক্তের সহায় ব্যতীত ভগবানের দর্শন দুর্লভ; আপনি যেখানে রামায়ণ শুনিতে যান, সেই স্থানে সকলের পশ্চাদ্ভাগে অবধূত বেশে একটী সাধুকে দেখিতে পাইবেন। তিনি কথকতার স্থান হইতে সকলের শেষে উঠিয়া যান। তিনিই রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হনুমান। তাঁহার সাহায্যেই আপনি ভগবানের দর্শন লাভ করিবেন।" প্রেত এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিল।

তুলসীদাস প্রেতের কথা শুনিয়া হৃষ্টমনে সেই দিবস কথকতা শুনিতে গেলেন। সেখানে গিয়া কথকতার দিকে আর তাঁহার মন নাই, কেবল সকলকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন, হনুমানের সাক্ষাৎ পান কি না। অবশেষে দেখিলেন, সকলের পশ্চাতে একটী সাধু বসিয়া আছেন, যাঁহার আকার প্রকার প্রেতের কথিত মত। কথা সমাপ্তে সকলে কথকতার স্থান হইতে চলিয়া গেলে তুলসীদাস হনুমানের পদতলে পড়িয়া বলিলেন, "যদি কৃপা করিয়া দেখা দিলেন, তবে যাহাতে ভগবান রামচন্দ্রের দর্শন পাই তাহাই করুন।" হনুমান বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে প্রতিদিন লক্ষ্য করি; তোমার সাধনা পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, শীঘ্রই তোমার কামনা পূর্ণ হইবে।" অনন্তর তাঁহাকে শিবমন্ত্রে উপদেশ দিয়া বলিলেন, "ছয় মাস কাল তুমি দৃঢ় সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, তৎপরে চিত্রকূটে আসিও, সেখানে তুমি ভগবানের দর্শন লাভ করিবে।" তুলসীদাসকে এই কথা বলিয়া হনুমান অন্তর্দ্ধান করিলেন।

তুলসী হনুমানের উপদেশানুযায়ী একান্তে সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। এক দিন বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া বিশ্বনাথ দর্শনের সাতিশয় অভিলাষ জন্মিল। কিন্তু সেখানে গিয়া প্রস্তরের বিশ্বনাথ দর্শনে তাঁহার মন তৃপ্ত হইল না, আসল বিশ্বনাথকে দেখিতে না পাইয়া ভগ্ন মনে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর মনের আবেগে, হনুমানের কথা স্মরণ করিয়া চিত্রকূটাভিমুখে গমন করিলেন। কাশীধাম ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, এমন সময় নগরের বাহিরে এক গৌরবর্ণ পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কাশী ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ?"

তুলসী বলিলেন, "আমি এখানে বিশ্বনাথের অনেক আরাধনা করিলাম, কিন্তু তিনি আমার প্রতি কৃপা করিলেন না; এখন আমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চিত্রকূটে হনুমানের স্মরণ লইবার জন্য যাইতেছি, যাহাতে ভগবান রামচন্দ্রের দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটে।" তখন তিনি বলিলেন "আমিই মহাদেব, আমি তোমার সাধনায় প্রীত হইয়াছি; তুমি অচিরেই সিদ্ধিলাভ করিয়া জগদ্‌গুরু রামচন্দ্রের দর্শন পাইবে।" অনন্তর মহাদেব তুলসীদাসকে নিজরূপ দেখাইলেন। তুলসী কৃতার্থ হইয়া করজোড়ে প্রণত হইলেন। মহাদেব অন্তর্দ্ধান করিলে, তুলসী আশা-পূর্ণ অন্তঃকরণে চিত্রকূটাভিমুখে গমন করিলেন।

চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ বনের অতুল শোভা দেখিয়া তুলসীর পথক্লান্তি দূর হইয়া গেল। তিনি বনমধ্যে একটী প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া ভগবৎচিন্তায় মগ্ন হইলেন। বিশ্বনাথ এবং হনুমানের বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি মনোমধ্যে আশা পোষণ করিতেছিলেন যে ভগবদ্দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে। তিনি সেই নির্জ্জন মনোরম স্থানে তাঁহার ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতেছেন, এমন সময় অশ্বের খুরশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন—দুইটী অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালী বালক অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন। কোন রাজপুত্র মৃগয়া করিতে যাইতেছেন, এই ভাবিয়া তুলসী সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে কিয়ৎক্ষণ পরেই হনুমান সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ইষ্ট দেবতা রামলক্ষ্মণের দর্শন পাইয়াছ ত?" তুলসী তখন বুঝিলেন তাঁহার প্রভু তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। নিজের দুষ্কৃত ভাবিয়া তাঁহার আর অনুতাপের সীমা রহিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

> লোচন রহে বৈরী হোয়।
> জান বুঝ অকাজ কীন্‌হো গয়ে ভূমে গোয়।
> অবগতি যো তেরি গতি ন জান্‌যো রহো জাগত সোয়।
> সবৈ ছবিকী তবধিমে হৈ নিকস গয়ে ঢিং হোয়।
> কর্ম্মহীনমে পায় হীরা দয়ো পলমে খোয়।
> দাস তুলসী রাম বিছুরে কহো কৈসী হোয়।

চক্ষুই শত্রু হইল। জানিয়া শুনিয়া অকাজ করিলাম; সুসময় হেলায় হারাইলাম। আমার কি গতি হইবে, যখন তোমার গতি জানিতে পারিলাম না, আমি জাগিয়াও নিদ্রায় ছিলাম! সকল সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা যে তুমি, আমার নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছ। যেমন কর্ম্মহীন ব্যক্তি হীরা পাইলে অল্পক্ষণেই তাহা হারাইয়া ফেলে, সেইরূপ আমি রামচন্দ্রকে হারাইয়াছি। বল এখন কিরূপে পাই।

হনুমান তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"অধীর হইও না, অনুরাগ থাকিলে সকলই ক্রমে ক্রমে যথাসময়ে পাইবে। কল্য রামঘাটে বসিয়া সাধনা করিও, পুনরায় তোমাকে ভগবান কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন।"

তুলসী হনুমানের কথামত পরদিন প্রত্যূষে রামঘাটে উপস্থিত হইয়া স্নান সমাপন করিয়া ঘাটের উপর বসিলেন, এবং ভগবৎপূজার অভিলাষে চন্দন ঘষিতে লাগিলেন। ভাবিলেন আজ যদি রামলক্ষ্মণের দর্শন পাই তাহা হইলে আর মূঢ়ের ন্যায় তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। এমন সময় দেখিলেন দুইটী অলৌকিক রূপবান বালক তাঁহার নিকট আসিতেছেন। তাঁহারা তুলসীর নিকট আসিয়া বলিলেন—"আমাদিগকে চন্দন পরাইয়া দিবে?" তুলসী বলিলেন—"তোমরা কি রামলক্ষ্মণ?" বালক দুইটী বলি-লেন—"হে সাধু, তুমি রামলক্ষ্মণকে বাহিরে দেখিতে চাও, রামলক্ষ্মণ ত তোমার মধ্যেও রহিয়াছেন।" তুলসী তখন তাঁহাদিগকে মনের সাধে চন্দন পরাইয়া দিলেন। কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহারাই রামলক্ষ্মণ কি না। বালকদ্বয় চলিয়া গেলে হনুমান সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রামলক্ষ্মণের দর্শন পাইলে ত?" তুলসী জোড় হস্তে বলিলেন—"আপনার কৃপায় প্রভুর দর্শন বাহিরে পাইলাম; এখন মনের এই বাসনা যে তাঁহার যুগলমূর্ত্তি অন্তরে বাহিরে দেখিতে পাই।" হনুমান বলিলেন—"তাঁহার সেরূপ দর্শন অতি দুর্লভ; কিন্তু তুমি তাঁহার ভক্ত, তোমার সাধনা পরিপুষ্ট হইয়াছে, তিনি তোমাকে কৃপা করিবেন। নির্জ্জনে তাঁহার জন্য আশাপথ চাহিয়া থাক।" তুলসী হনুমানের কথামত নিভৃত স্থানে গিয়া আসন করিয়া বসিলেন এবং ভগবৎভাবনায় রত হইলেন। তখন তাঁহার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল, দেখিলেন আনন্দঘন, সচ্চিদানন্দরূপ তাঁহার অন্তরে

বাহিরে। যাহা দেখিলেন তাহা ভাষার অতীত! মানব জন্ম সার্থক হইল। তিনি সিদ্ধ হইলেন।

ঈশ্বরের দিকে মন অতি অল্প লোকেরই যায়। আবার সেই অল্প সংখ্যকের মধ্যে অতি অল্প লোকেই তাঁহার দর্শন লাভ করে। তীব্র বৈরাগ্য এবং একান্ত অনুরাগ না হইলে মনুষ্য ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারে না। "হচ্চে হবে" এরূপ করিলে যেমন জগতের কোন কাজই সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ ভগবদারাধনাও, মনের এরূপ অবস্থায়, সম্পূর্ণ হয় না। নানক বলিয়াছেন—"জগতে অনেকেই তাঁহাকে অন্বেষণ করে, কিন্তু কদাচিৎ কেহ তাঁহাকে পায়।" তুলসী সেই তীব্র বৈরাগ্য ও একান্ত অনুরাগ লইয়া ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাই তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। স্ত্রী, সাধু নরসিংহদাস, প্রেত, হনুমান এবং স্বয়ং মহাদেব, তাঁহার অনুরাগ ও সুকৃতির বলে, যথাসময়ে সকলেই তাঁহাকে সেই নিত্যধামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন।

তুলসীদাস পূর্ণমনোরথ হইয়া চিত্রকূট হইতে কাশীধামে প্রত্যাগমন করিলেন। সেখানে কিছু দিন বাস করিয়া তৎপরে তিনি অযোধ্যায় গমন করেন। অযোধ্যায় সাধু-সঙ্গে এবং রামকথায় নিশিদিন বিভোর হইয়া থাকিতেন।

একদিন তুলসীদাস স্বপ্নে দেখিলেন, রামচন্দ্র তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া বলিতেছেন, "তুমি ভাষায় রামায়ণ রচনা কর।" এই আজ্ঞা পাইয়া তিনি ১৬৩১ সম্বৎ রামনবমী দিবসে রামায়ণ রচনা আরম্ভ করিলেন। বালকাণ্ড রচনা শেষ হইলে তিনি অযোধ্যা হইতে কাশীধামে চলিয়া আসেন এবং অসিঘাটের নিকট বাস করিতে থাকেন। কাশীধামে রামায়ণের অবশিষ্ট অংশের রচনা সমাপ্ত হয়।

কাশীর পণ্ডিতেরা ভাষারামায়ণের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কথা উত্থাপন করায় সেখানকার পণ্ডিতাগ্রগণ্য মধুসূদনাচার্য্য দণ্ডী বলিয়াছিলেন—

পরমানন্দপত্রোঽয়ং জঙ্গমস্তুলসী তরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমরভূষিতঃ॥

"এই জঙ্গম তুলসীবৃক্ষ পরমআনন্দস্বরূপ-পত্র-শোভিত ও কবিতারূপ মঞ্জরীযুক্ত ও রামরূপ-ভ্রমর-ভূষিত।"

তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া কাশীস্থ সকল পণ্ডিতেরা তুলসীদাসকে সম্মান করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাসের রামায়ণ ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। পশ্চিম অঞ্চলের সাধুভক্তেরা ভাগবতের ন্যায় এই রামায়ণের আদর করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের যে যে স্থানে হিন্দি ভাষা প্রচলিত, সর্ব্বত্রই তুলসীদাসের রামায়ণ যত্ন করিয়া লোকে পাঠ করিয়া থাকেন। এই একখানি পুস্তকে ধর্ম্মভাব যেরূপ সর্ব্বত্র জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে, এরূপ ধর্ম্মভাবসমন্বিত দ্বিতীয় পুস্তক আর দেখা যায় না।

কাশীধামে অসিসঙ্গমের নিকট তুলসীদাসের প্রতিষ্ঠিত মহাবীরের মূর্ত্তি এবং সীতারামের বিগ্রহ এখনও বর্ত্তমান আছে। এক দিন কোন গোহত্যাকারী রাম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভিক্ষার জন্য গোস্বামী তুলসীদাসের নিকট উপস্থিত হইল। গোস্বামী তাহাকে স্নান করাইয়া এক পংক্তিতে বসাইয়া ভোজন করাইলেন। ইহা শুনিয়া কাশীস্থ পণ্ডিতেরা নানা গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। গোস্বামী বলিলেন, তোমরা পুস্তক পড়িয়া পড়িয়া বুদ্ধি হারাইয়াছ; রাম নামের মাহাত্ম্য কিছুই জান না। একবার রাম নাম করিলে সকল পাপ ক্ষয় হয়; এই ব্যক্তি যখন রাম নামে শরণ লইয়াছে তখন ইহার পাপ কোথায়! কথিত আছে পণ্ডিতেরা বলিলেন, ইহার কোন প্রমাণ না পাইলে আমরা বিশ্বাস করিব না। তখন তুলসী সেই ব্যক্তির হস্তে ভোগ প্রস্তুত করাইয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন; এবং পণ্ডিতেরা দেখিলেন, বিশ্বনাথের মন্দিরের প্রস্তরনির্ম্মিত ষণ্ড তাহা ভক্ষণ করিতেছে। পণ্ডিতেরা তখন তুলসীদাসের পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এক সময় একটী সাধু "অলখ অলখ" বলিতে বলিতে (অলখ শব্দের অর্থ অলক্ষ্য, যাহা দেখা যায় না) গোস্বামীর নিকট ভিক্ষার জন্য আসিল। গোস্বামী কোন কথা না বলায় সে তাঁহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। তখন গোস্বামী বলিলেন—

হম্ লখ হমহিঁ হমার লখ, হম হমারকে বীচ।
তুলসী অলখহি কা লখৈ, রাম নাম জপু নীচ॥

নিজকে দেখ, আপনাকে আপনার মধ্যে দেখ। আমি

রাগিণী মল্লার।

(রাজপুত চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিঅনুসারে অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে।)

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

আমার মধ্যে। তুলসী অলক্ষ্য আর কি দেখিবে? বিনীত হইয়া রাম নাম জপ কর।

এই দোঁহা শুনিয়া সেই সাধু লজ্জিত হইলেন ও তাঁহার চরণে পতিত হইলেন।

এক সময় বৈদান্তিক এবং বৈষ্ণবে বিবাদ হওয়ায় বৈদান্তিকগণ কাশীর সুবেদারের সাহায্য লইয়া বৈষ্ণবদের কণ্ঠীমালা কাড়িয়া লইয়া এবং তিলক মুছিয়া দিয়া অবমানিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কাশীর অসংখ্য বৈষ্ণবের এই দশা হইতে লাগিল। অতঃপর তাঁহারা যখন বৈষ্ণব তুলসীদাসের নিকট ঐ ব্যাপারের জন্য উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার তেজ দেখিয়া তাহাদের আর সেরূপ কার্য্য করিতে সাহস হইল না। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা অন্যান্য বৈষ্ণবগণের নিকটও মালা ফেরত দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এক দিন কোন ধনীব্যক্তি গোস্বামীর নিকট তাঁহার সেবার জন্য অনেক প্রকার দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলেন। সেইসকল দ্রব্যের লোভে রাত্রিতে চোর তাঁহার গৃহে প্রবেশের চেষ্টা করে। তাঁহার গৃহের নিকট আসিয়া চোরেরা দেখিতে পাইল একটী শ্যামবর্ণের পুরুষ ধনুর্ব্বাণ লইয়া গোস্বামীর গৃহ রক্ষা করিতেছেন। তাহারা ইহা দেখিয়া ভয়ে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। প্রাতঃকালে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার গৃহে রাত্রিতে শ্যামবর্ণ এক পুরুষ কে পাহারা দেন? তুলসী ধ্যানে জানিতে পারিলেন, তাঁহার ইষ্টদেবতা রাত্রিতে তাঁহার গৃহে পাহারা দিয়াছিলেন। তুলসী তখন বলিলেন—এমন ধন রাখিয়া কি লাভ, যাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রভু এত কষ্ট করিয়া গৃহে পাহারা দেন। তখনই গৃহে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত দরিদ্রদিগকে দান করিয়া দিলেন। এই কথা প্রচার হইলে সেই সমস্ত চোরেরা আসিয়া তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। তুলসী বলিলেন—তোমরাই ধন্য যে ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছ।

এক সময় কোন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী সহমরণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সহমরণে যাইবার পূর্ব্বে তিনি গোস্বামীর পদধূলি লইবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "সৌভাগ্যবতী হও।" সেই রমণী তখন কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"যখন স্বামীকে হারাইয়াছি, তখন সৌভাগ্যবতী কিরূপে হইতে পারি? আপনার পদধূলি লইয়া আমি এখন সহমরণে যাই।" তুলসী বলিলেন—"সহমরণে কেন যাইবে?" রমণী উত্তর দিলেন, "স্বামীর সহিত স্বর্গে যাইতে পারিব।" গোস্বামী বলিলেন—"স্বর্গে গিয়া কি হইবে, তাহারও ত শেষ আছে।" রমণী উত্তর করিলেন "যখন শেষ হইবে তখন হইবে, কিন্তু এখন ত স্বামীর সঙ্গে থাকিব।" তুলসী বলিলেন—"হে রমণী, তুমি যদি রাম ভজনা কর তাহা হইলে রামকেও পাইবে এবং তাঁহার মধ্যে স্বামীকেও পাইতে পার।" রামভক্তি বিষয়ে নানা প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের কথা তাহার নিকট বলায় সেই স্ত্রীলোক তখনই তাঁহার শিষ্যা হইলেন এবং ইহজীবনে রাম ভজনের অভিলাষিণী হইয়া সহমরণে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। অনন্তর রাম নাম করিতে করিতে স্বামীর সৎকারের জন্য যখন শবদেহের নিকট সেই রমণী উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন তাহার স্বামী জীবিত রহিয়াছেন। উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে আরও ঘন ঘন রাম নাম করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার স্বামীও রাম নাম উচ্চারণ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। অতঃপর তাঁহার স্বামীও তুলসীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, উভয়ে রাম ভজনা করিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর যশ চারিদিকে প্রচার হওয়ায় দিল্লির বাদশাহ একবার তাঁহাকে লইয়া যান এবং কোন প্রকার আশ্চর্য্য কার্য্য দেখাইতে বলেন। গোস্বামী বলিলেন, আমি রাম নাম মাত্র জানি, আশ্চর্য্য কার্য্য কিছু আমার দ্বারা সম্ভবে না; সে সমস্তই রামচন্দ্রের কার্য্য। তখন বাদশাহ বলিলেন, তবে আমাকে রামকে দেখাও। গোস্বামী বলিলেন, তিনি কৃপা না করিলে আমার ক্ষমতা নাই যে আপনাকে তাঁহার দর্শন করাই। এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তিনি কারারুদ্ধ হইলে অসংখ্য বানর আসিয়া রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে ও সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া

তুলে। বাদশাহের একটী বৃদ্ধ কর্ম্মচারী তাঁহাকে বলিল, সেই সাধুকে বন্দী করায় এইসকল উপদ্রব হইতেছে। বাদশাহ তাহা সত্য বুঝিয়া গোস্বামীকে ছাড়িয়া দিলেন। কথিত আছে বাদশাহ শাজাহান তুলসীদাসের কথানুযায়ী পুরাতন দিল্লি শহর পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান দিল্লি শহর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বাদশাহের একটী মন্ত্রীপুত্র তুলসীদাসকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। এক দিন কথাপ্রসঙ্গে তুলসী তাঁহাকে বলিলেন—দেখ স্ত্রীলোকেরা কতই গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে, অথচ পুত্রের কামনা করে। মন্ত্রীপুত্র উত্তর দিলেন—তুলসীর ন্যায় ভগবদ্ভক্ত পুত্র পাইলে গর্ভ সার্থক হইবে এই আশা করিয়াই নারীগণ এই কষ্ট স্বীকার করে।

দিল্লি হইতে গোস্বামী বৃন্দাবন গমন করেন। সেখানে পরম সাধু নাভাজীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। নাভাজী ভক্তমাল গ্রন্থের প্রণেতা। তুলসীর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া নাভাজী তাঁহার ভক্তমাল গ্রন্থে তাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বৃন্দাবনে এক দিন রামভক্ত তুলসী মদনগোপালকে দর্শন করিতে যান। দেখিলেন, মদনগোপালের বংশী ধনুর্ব্বাণ হইয়া গেল, মাথার চূড়া মুকুট হইয়া গেল, রামরূপে তিনি তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইলেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভক্তের বাসনা এইরূপে পূর্ণ করেন।

এক দিন মাঘ মাসের প্রত্যূষে গোস্বামী কাশীধামে গঙ্গাতে কটিপর্য্যন্ত ডুবাইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। একটী বেশ্যা তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া বলিল,—এই ব্যক্তি শরীরকে অনর্থক কতই কষ্ট দিতেছে। গোস্বামী তাহা শুনিতে পাইলেন এবং বেশ্যার অজ্ঞতা জানিয়া তাহার প্রতি তাঁহার দয়া হইল। গোস্বামী যখন উঠিয়া যাইতে-ছেন, তাঁহার পায়ের জল বেশ্যাটির গায়ে ছিটা লাগায় তাহার দিব্যদৃষ্টি হইল এবং সে তখনই স্বর্গ ও নরক দেখিতে পাইল,—দেখিল নরকে লোক পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতেছে। পাপের ফল এইরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়া, সে নিজের দুরবস্থা বুঝিতে পারিল এবং তখনই সে তুলসীদাসের চরণে পতিত হইয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিল। সেই বেশ্যা তুলসীদাসের শিষ্যা হইয়া ধর্ম্মজীবনে অতীব উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

রামায়ণ ব্যতীত তুলসীদাস আরও কএকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যথা—১। গীতাবলী, ২। দোহাঁ-বলী, ৩। বিনয়পত্রিকা, ৪। রামসতসই, ৫। কৃষ্ণাবলী, ৬। রামলতা, ৭। নহছু, ৮। বৈরাগ্য-সন্দীপনী, ৯। বরবা রামায়ণ, ১০। পার্ব্বতীমঙ্গল, ১১। জানকী-মঙ্গল, ১২। রামশকুনাবলী, ১৩। চৌপাই রামায়ণ, ১৪। শঙ্কটমোচন, ১৫। হনুমানবাহুক, ১৬। রাম-শলাকা, ১৭। কুন্তলী রামায়ণ, ১৮। কড়কা রামায়ণ, ১৯। রোলা রামায়ণ, এবং ২০। ঝুলন রামায়ণ।

তুলসী দাস মীরাবাইয়ের সমসাময়িক। মীরাবাই রাজরাণী ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন—"জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই"। ভগবৎপ্রেম ভিন্ন তাঁহার মনে শান্তি নাই, কিসে সেই প্রেম লাভ হয় এই তাঁহার সতত চিন্তা। তুলসীদাসকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ হইবে। তুলসীদাস একটী মাত্র সঙ্গীত লিখিয়া তাহার উত্তর দিলেন—

> জিন্‌কে প্রিয় না রাম বৈদেহী,
> ত্যজিয়ে তাহে কোটি-বৈরীসম, যদ্যপি পরম সনেহি।
> ত্যজো পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মাতারী,
> বলি গুরু ত্যজো, কাগ ব্রজবনিতা, ভয়ে জগন্মঙ্গলকারী।
> না তো নেহ রাম সোঁ কিজে সীল সনেহ যাঁহালো
> অঞ্জন কহা আঁখি যো ফুটে বহুতক কহালোঁ।
> সেইহি তোমার প্রাণ পুজতো প্যারো
> যা সংগ বঢ়ত সনেহ রামপদ, তুলসী মত হামারো।

যে রামবৈদেহীকে প্রিয় বলিয়া জানেনা, পরম স্নেহের পাত্র হইলেও তাহাকে কোটী শত্রুর সমান ভাবিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। প্রহ্লাদ পিতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, বিভীষণ ভাই বন্ধু ত্যাগ করিয়াছিলেন, ভরত মাতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, বলি গুরু ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ব্রজবনিতা পতি ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের এইরূপ ত্যাগ জগতের মঙ্গলের হেতু হইয়াছিল। রামের সহিত যে প্রেম করিলনা, তাহার সহিত ব্যবহারই বা কি? সে অঞ্জনে কি কাজ যাহাতে চক্ষুর যন্ত্রণা হয়। সেই তোমার প্রাণপুজ্য প্রিয়, যাঁহার সঙ্গে তোমার রামপদে

ভক্তি দৃঢ় হইবে—তুলসী বলিতেছেন, ইহাই আমার মত।

এই উত্তর পাইয়া মীরার সন্দেহ দূর হইল। তিনি রাজরাণী হইয়াও স্বামী এবং সকল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, প্রেমময় হরির উদ্দেশে বৃন্দাবনে গেলেন।

তুলসীদাস অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কাশীধামে শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী ১৬৮০ সম্বতে দেহ ত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি সাধুবৃন্দকে বলিয়াছিলেন, যে, তিনি ইহধাম ত্যাগ করিবেন, সকলে যেন তাঁহার পুস্তকের উপদেশ অনুযায়ী চলেন।

তুলসীদাসের জীবনকথা কালক্রমে অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ঘটনায় জড়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তুলসী-চরিত্রের আসল মাধুর্য্যটুকু কোথাও আচ্ছন্ন হয় নাই। অলৌকিকত্ব বিশ্বাস না করাই উচিত। কিন্তু সেই সকল কথা যে তুলসীদাসের দৃঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠা, এবং অন্তরবাহিরে ভগবদ্দর্শনের পরিচায়ক তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

(De La Mazeliere-র নব প্রকাশিত ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি

২

হিন্দু সাহিত্যে ক্রমবিকাশ।—বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থ।—মহাভারত।—পুরাণ।—তন্ত্র।—রামায়ণ।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাকাব্য।—গল্প।

ভারতে যে বিপুল মানসিক ও নৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহার মূল-ভিত্তি হিন্দুধর্ম্ম। ইহা নিছক ব্রাহ্মণ্যিক আন্দোলন। পৌরোহিতশ্রেণী বিদ্বজ্জনশ্রেণীতে পরিণত হওয়ায় উহারা পুরাতন অধিকারগুলির ন্যায় নূতন অধিকারগুলিকেও খুব সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতে লাগিল। যত লেখক, যত পণ্ডিত সকলেই ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের নিজস্ব ভাষা—সংস্কৃত। এই ভাষাটি একেবারেই 'ঘর-গড়া' কৃত্রিম ভাষা; আবার লিপিপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর উহা আরও কৃত্রিম হইয়া উঠে। উহারা একটা জটিল বর্ণমালা উদ্ভাবন করে; ঐ বর্ণগুলির আকার দেব-দত্ত বলিয়া তাহাদের নিকট প্রতীয়মান হয় (দেবনাগরী।১) এই সংস্কৃত ভাষায় পদরচনা অতীব কূট ধরণের। উহা একপ্রকার বর্ণলোপের পদ্ধতি, এক প্রকার দীর্ঘ সমাসের পদ্ধতি। সংস্কৃত ভাষা একপ্রকার সাংকেতিক ভাষা। সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলির এক একটি শব্দে, একটী সমগ্র ভাবার্থ—গ্রন্থোল্লিখিত একটি সমগ্র বচনের, এক একটি সমগ্র অংশের অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এমন কি পারিভাষিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের রচনাতেও, চলিত গদ্যের পরিবর্ত্তে, পদ্য কিংবা ছন্দোবদ্ধ গদ্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন যুগের তৃতীয় শতাব্দীতে, বৈয়াকরণ পাণিনি, বিশ্লেষণ করিয়া শব্দ সমূহকে কতকগুলি মূল ধাতুতে, কতকগুলি বৃদ্ধিতে, কতকগুলি অন্ত্যে পরিণত করেন। এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি সংস্কৃত ধাতুর একটা তালিকাও প্রদান করেন।

তারপর বিজ্ঞান। কতকগুলি জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণের জন্যও আমরা ভারতবাসীদিগের নিকট ঋণী। উহারা সংখ্যাঙ্কের উদ্ভাবক—পরে ঐ সংখ্যাঙ্ক আরবগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। উহারা দশক-গণনাপদ্ধতিরও প্রবর্ত্তক। উহারা জ্যামিতি শাস্ত্রেও প্রভূত উন্নতিলাভ করে; পরে, জ্যামিতি ছাড়িয়া উহারা বীজগণিতের অনুশীলন আরম্ভ করে।

ধর্ম্মশাস্ত্র বা আইন। পূর্ব্ব হইতেই সূত্রাদির মধ্যে অনুশাসনবিধি ও ব্যবহারাদি লিপিবদ্ধ ছিল। পরে উহার সংহিতা পদ্যে রচিত হয়। দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে, মনুর গ্রন্থকে আর আইনের সংহিতা বলা চলে না; পরন্তু উহা একপ্রকার ধর্ম্মঘটিত কাব্য, যাহাতে ব্রাহ্মণের

---

(১) মেগাসথিনিস বলেন, ভারতবাসীরা লিখিতে জানিত না। পক্ষান্তরে Arrien কর্ত্তৃক উদ্ধৃত Nearque-কৃত Periple নামক গ্রন্থের একটা খণ্ডাংশ পাঠ করিয়া জানা যায়, ভারতবাসীরা লিখিতে জানিত। ইহা হইতে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়,—ভারতবাসীরা যে লিপিপদ্ধতি পারসিকদিগের নিকট শিখিয়াছিল, উহা তৃতীয় শতাব্দীতে কেবল পঞ্জাবেই ব্যবহৃত হইত। সাধারণত এইরূপ স্বীকৃত হইয়া থাকে যে, ভারতীয় বর্ণমালা, ফিনিসীয় বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন। অশোকের উৎকীর্ণ-লিপিতে দুই প্রকার অক্ষরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকারের অক্ষর, দক্ষিণ হইতে বাম দিক ধরিয়া এবং অন্য প্রকারের অক্ষর বাম হইতে দক্ষিণ দিক ধরিয়া পাঠ করিতে হয়। এই শেষোক্ত অক্ষর হইতে দেবনাগরী লিপি উৎপন্ন হইয়াছে। এই লিপি বর্ণাত্মক। আর একটা দ্রুত লিখিবার লিপিপদ্ধতিও আছে।

মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণের উচ্চাধিকার সমর্থিত হইয়াছে।(২)

কাব্যের আরম্ভে, যিনি সকল মানবের জনক সেই মনু নামক কাল্পনিক পুরুষের নিকট মহর্ষিগণ আগমন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন:—

"ভগবন্, বর্ণচতুষ্টয়ের ও সংকীর্ণ জাতিগণের সমুদয় ধর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হয়।"

মনু উত্তর করিলেন:—

"এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল…পরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান প্রকাশিত হন। তিনি অন্ধকার অপসারিত করিয়া জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ করিলেন। অর্পিত বীজ সুবর্ণবর্ণোপম সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটি অণ্ডে পরিণত হইল। ঐ অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।"

এই সুবিভক্ত গ্রন্থের প্রথম ছয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সকল বিবৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের জীবন চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, দ্বিতীয় গার্হস্থ্যাশ্রম, তৃতীয় বানপ্রস্থাশ্রম, চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রম। সপ্তম অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম, অষ্টম অধ্যায়ে ব্যবহার নিয়ম ও রাজদণ্ডের নিয়মাদি, নবম অধ্যায়ে, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্ত্তব্য, দশম অধ্যায়ে, সঙ্করজাতিদিগের কর্ত্তব্য, একাদশ অধ্যায়ে, প্রায়শ্চিত্তবিধি বিবৃত হইয়াছে। যেরূপ আরম্ভে সেইরূপ উপসংহারেও গ্রন্থখানি ধর্ম্মঘটিত কাব্যরূপে শেষ হইয়াছে। শেষ অধ্যায়টিতে মোক্ষলাভের সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শীঘ্রই বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের আগ্রহ কমিয়া আসিল। যে বিবর্ত্তনের প্রভাবে উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বসমূহের স্থান হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক কাহিনীসকল অধিকার করে, সেই বিবর্ত্তনের প্রভাবেই সাহিত্যে যুক্তিমূলক রচনাগুলির স্থান কল্পনাপ্রসূত রচনাগুলি আসিয়া অধিকার করিল।

***

এই সময়ে মহাকাব্য আবির্ভূত হয়। বহু শতাব্দীব্যাপী সমবেত চেষ্টার দ্বারা ব্রাহ্মণেরা, প্রাচীন গাথাগুলিকে মহাভারত নামক দুই লক্ষ শ্লোকবিশিষ্ট একটি সমগ্র কাব্যের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে। (প্রাচীন যুগের দ্বিতীয় শতাব্দী এবং আধুনিকযুগের তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী—এই দুয়ের মধ্যে কোন এক সময়)। তৎকালীন জ্ঞানের বিশ্বকোষ ও ধর্ম্মতত্ত্বের আধার স্বরূপ এই মহাকাব্যটিকে ব্রাহ্মণেরা তাহাদের নবধর্ম্মের শাস্ত্রগ্রন্থ করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কেবল ব্রাহ্মণদিগেরই ধর্ম্ম ছিল। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, বৈদিক সূত্র—এই সমস্ত যাহা শ্রুতির অন্তর্গত, তাহা পাঠ করা শূদ্রদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের এই শাস্ত্রগ্রন্থখানি সকলের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইল। নৃপতিগণ ও উচ্চবর্ণের রমণীগণ মূল গ্রন্থ পাঠ করিত বা শ্রবণ করিত; ইতর সাধারণ, চলিত ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থ হইতে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিত।

যে সময় আর্য্যেরা যমুনাধৌত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সময় দুইটি রাজবংশের মধ্যে যুদ্ধ বাধে; এই যুদ্ধই মহাভারতের মুখ্য বিষয়। একটা সন্ধির দ্বারা, কুরু ও পাণ্ডু এই দুই রাজকুলের অধিকৃত রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হয়। পাণ্ডবেরা দ্যূত ক্রীড়ায় স্বকীয় রাজ্য হইতে বিচ্যুত হয়, এবং দ্বাদশ বৎসর তাহাদিগকে বনবাস স্বীকার করিতে হয়। বনবাসের সময় অতীত হইলে, উভয় পক্ষ বল সংগ্রহ করিয়া পরস্পরকে হত্যা করে।

এই সাদাসিধা গল্পের মধ্যে আদর্শ চরিত্র এইগুলি:—ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির; নির্ভীক অর্জ্জুন; মহাকায় ভীম; সুশীলা ও পতিব্রতা দ্রৌপদী। উহাতে কতকগুলি জ্বলন্ত বর্ণনা আছে। ভারতের বাহ্য প্রকৃতি:—হিমালয়, তুষারস্তূপ, পর্ব্বতের ভৃগুদেশ, অরণ্য, তরঙ্গসঙ্কুল নদনদী; গঙ্গা, গাঙ্গেয় প্রদেশের উর্ব্বরা ক্ষেত্রভূমি; বনজঙ্গল, বহুবিধ জীবজন্তু। প্রাচীন যুগের শেষ শতাব্দীসমূহে ভারতবাসীর জীবনযাত্রা প্রণালী:—রাজদরবার, অভিযান, সমারোহযাত্রায় হস্তিশ্রেণী, নর্ত্তকীবৃন্দের নৃত্য। সেই সকল উদ্ভট

---

(২) মনুর রচনা সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ আছে। পূর্ব্বে, উহার রচনাকাল খৃ-পূ পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়; কিন্তু পরে, মনুর বর্ণিত সমাজ ও জাতক-গ্রন্থের বর্ণিত সমাজ—এই দুইয়ের তুলনা করিয়া, উহার উৎপত্তিকাল আরও আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তথাপি, মনুর গ্রন্থে হিন্দুদেবদেবীর উল্লেখ নাই। বোধ হয়, বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। যাহাই হউক, মনুর গ্রন্থে যে সকল বচন সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন যুগের।

ধরণের চিত্রাবলী যাহা প্রাচ্যবাসীর কল্পনাকে পরিতৃপ্ত করে; যথা, স্বর্ণ-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত নগরাদি; স্বর্ণপরিচ্ছদে বিভূষিতা বীরাঙ্গনা; নাগ; মানুষের অর্দ্ধকায়বিশিষ্ট না'গনী; ইহারা অতুল রূপসী। এই নাগকন্যারা শুক্তিময় কুঞ্জ-কুটীরে বাস করে—যেখানে মুক্তাবলী হইতে অপূর্ব্ব প্রভা বিকীর্ণ হয়। বিশেষতঃ সেই সব নিরঙ্কুশ কল্পনাপ্রসূত হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক কাহিনী:—সেই সব সৃষ্টিছাড়া বিকটাকার দেবতা যাহারা জগৎকে লইয়া লীলাখেলা করে, সমুদ্রকে পান করিয়া ফেলে, তারার কণ্ঠহার রচনা করে।

একটি প্রসিদ্ধ উপাখ্যান। অর্জ্জুন হিমালয়ে যাত্রা করিলেন। তপস্যার প্রভাবে তিনি কতকগুলি দৈব অস্ত্র লাভ করিলেন। বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন; পশুপক্ষীরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে:—ব্যাঘ্র, সিংহ, ময়ূর, হস্তী, বানর। জলদ-বাহনে আরূঢ় হইয়া দেবতারা আকাশপথে তাড়াতাড়ি চলিয়াছেন। ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া একজন দৈত্য বন-বরাহের রূপ ধারণ করিয়া, তপস্যানিরত অর্জ্জুনকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিল। অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ লইয়া ঐ দৈত্যকে বধ করিলেন। সেই সময়ে আর একটি প্রক্ষিপ্ত তীর হইতে 'সন্-সন্' শব্দ হইল। একজন ব্যাধ আসিয়া বলিল:—আমি এই বরাহকে মারিয়াছি। অর্জ্জুন তূণ হইতে একটি তীর বাহির করিয়া উত্তর করিলেন,—"তুই মিথ্যা কথা বলিতেছিস।" ব্যাধ মৃদু হাস্য করিল। আবার এক তীর, পরে দশ, পরে একশো, পরে হাজার তীর অর্জ্জুন তাহার উপর বর্ষণ করিলেন। ব্যাধ তখনও মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। অর্জ্জুনের অক্ষয় তূণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে সমস্ত তীরই নিঃশেষ হইয়া গেল। ক্রোধে অধীর হইয়া, অর্জ্জুন ব্যাধের উপর শিলা ও বৃক্ষাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শিলা ও বৃক্ষ ব্যাধের পদতলে আসিয়া চূর্ণ হইয়া পড়িল। অর্জ্জুন এক লম্ফে তাহার উপর পড়িয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন। অর্জ্জুন মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে চৈতন্য লাভ করিয়া, একটা মাটির শিবলিঙ্গ গড়িলেন। "হিমাচলের দেবতা শিব তুমি আমাকে রক্ষা কর।" অর্জ্জুন পুষ্পাঞ্জলি দিয়া লিঙ্গটিকে আচ্ছন্ন করিলেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, ঐ সকল পুষ্প ব্যাধের কণ্ঠে রহিয়াছে দেখা গেল। অর্জ্জুন শিবকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। (৩)

ভগবদ্ গীতা আর একটি উপাখ্যান। কৌরবদিগের সহিত শেষ-যুদ্ধে, কৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনের সারথী হইতে ইচ্ছা করিলেন। যুদ্ধের আরম্ভে, অর্জ্জুন অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন:—"হত্যা করা! ভয়ানক ব্যাপার! মানুষের কি হত্যা করিবার অধিকার আছে?"

কৃষ্ণ উত্তর করিলেন:—

"নিত্য অবিনাশী ও অপরিচ্ছন্ন আত্মার এই দেহসকল নশ্বর বলিয়া কথিত হয়। যে ব্যক্তি ইহাকে হন্তা মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই জানে না। ইনি হত্যা করেন না, এবং হতও হয়েন না।…যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।"

কৃষ্ণই ব্রহ্ম, আবার কৃষ্ণই সগুণ দেবতা যিনি প্রেমের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ভগবান বলিলেন, "আমার এই যে সুতুর্দ্দর্শ রূপ দেখিলে দেবগণও সদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী।…তুমি চিত্তদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও। মচ্চিত্ত হইলে তুমি আমার প্রসাদে সমুদায় সাংসারিক দুঃখ উত্তীর্ণ হইবে। সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই আশ্রয় লও, আমি তোমায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি মদ্গতচিত্ত, মদ্ভক্ত এবং আমার উপাসক হও; আমাকেই নমস্কার কর; মৎপরায়ণ হইয়া এইরূপ মনকে আমাতে সমাহিত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।" (৪)

***

মহাভারতের পর, মহাকাব্য পাশাপাশি দুইটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি পুরাণ নামক ধর্ম্ম-কাব্য। হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ এই সকল পুরাণে, মহাকাব্যোচিত বর্ণনার স্থলে ধর্ম্ম-তত্ত্ব সকল বিবৃত হইয়াছে। পুরাণে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রূপকাত্মক।

(৩) (কিরাতপর্ব্ব) বনপর্ব্বের xxxix।

(৪) ভীষ্ম পর্ব্বের অন্তর্গত ভগবদ্-গীতা পর্ব্ব।

অধিকাংশ পুরাণই বৈষ্ণব পুরাণ এবং কৃষ্ণই উহাদের নায়ক।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়, সেই বিষয়টি বিষ্ণুসম্বন্ধীয় একটি উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ যিনি কোন রাজবংশের উত্তরাধিকারী, সেই কৃষ্ণের রূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। একজন জোর-দখলকারী রাজার নিষ্ঠুরতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, শিশু কৃষ্ণকে গোপগণের গৃহে লুকাইয়া রাখা হয়; ক্রমে কৃষ্ণ বড় হইয়া গোপীদিগের মন হরণ করিলেন।

কৃষ্ণ বড় হইয়া অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার সাধন করিয়াছিলেন। দেবতাদিগের একজন শত্রুকে বধ করেন, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু তিনি সবংশে ধ্বংস হইবেন এইরূপ একটা ভবিষ্যদ্‌বাণী হয়।

কৃষ্ণ যখন দেখিলেন তাঁহার সমস্ত আত্মীয় স্বজন, তাঁহার সমস্ত বন্ধুবান্ধব বিনষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি বলিলেন, এইবার নিয়তির কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

তাঁহার রথ টানিয়া লইয়া ঘোটকেরা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত-রাগে রঞ্জিত হইয়া সমুদ্র কৃষ্ণের দৈব অস্ত্রাদি, গদা, ধনু ও তূণ ভাসাইয়া লইয়া গেল। কৃষ্ণের ভ্রাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার অন্তরাত্মা বিকটাকার সর্পের আকারে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল। বাহির হইয়া সেই সর্প, অন্যান্য নাগ ও মুনিঋষির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, সমুদ্রগর্ভে অন্তর্হিত হইল।

তদনন্তর কৃষ্ণ চিত্তকে একাগ্র করিয়া, ব্রহ্মেতে বিলীন হইলেন। বাম জানুর উপর দক্ষিণ চরণ স্থাপন করিয়া যখন তিনি সমাধিমগ্ন ছিলেন, একজন ব্যাধ তাঁহাকে মৃগ মনে করিয়া, একটা বিষদিগ্ধ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই হত্যাকারী, চতুর্ভুজ বিষ্ণু বলিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ভগবান বলিলেন,—"ব্যাধ, কেন তুমি ভয়ে কাঁপিতেছ? আমার প্রসাদে তুমি স্বর্গলাভ করিবে।" একটা ত্রিদিব-রথ আসিয়া ব্যাধকে স্বর্গে লইয়া গেল...তখন কৃষ্ণ, বিশুদ্ধ, অমূর্ত্ত, অক্ষয়, অগ্রাহ্য, বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত, তাঁহার আত্মাকে সংযুক্ত করিলেন,—যাহা অনাদি, অনন্ত নির্ব্বিকার; এই প্রকার যোগের দ্বারা তিনি মর্ত্ত্য দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। (৫)

পুরাণের পর তন্ত্র। তন্ত্র—দেবী-পূজার শাস্ত্র-গ্রন্থ। ক্রমবিকাশের ইতিহাসে, ভারতীয় তত্ত্বচিন্তা একটা নূতন পথে প্রবেশ করিল।

অতিসূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বসকল—অর্থ-হীন সূত্রে, ও ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে পর্য্যবসিত হইল, এবং অদ্ভুত বর্ণনাসকল, বীভৎস ও অশ্লীল বর্ণনার মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

মৃত্যুর দেবতা কালী এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেন—"জয় দেবি কালীকে! মুক্তকেশী, করালবদনা, নৃমুণ্ডমালিনী, অসুরঘাতিনী, জলদবরণা, চতুর্ভুজা, অট্টহাসিনী, লোলজিহ্বা, বিকটদশনা, ভয়ঙ্করী।"(৬) (ক্রমশ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইউন-সী-খাই এবং সম্রাট কোয়াংশুর চরমপত্র

(চীনের কথা)

বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে চীনের প্রসিদ্ধ ইউন-সী-খাইয়ের নাম প্রায় সকলেই অবগত আছেন। বিখ্যাত লি-হুং-চাংর শিষ্য ইনি, এবং ইহাঁকে বুদ্ধি, বিদ্যা ও ক্ষমতাতে দ্বিতীয় লি-হুং-চাং বলা যাইতে পারে। ইনি সান্টুং ও চিলি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং আধুনিক বিদেশী ধরণে শিক্ষিত বহু সহস্র সৈন্য ইহাঁর অধীনে ছিল। ইনি এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু রাজ্যের কোন ক্ষমতা ইহাঁর হস্তে এখন আর নাই।

সম্রাট কোয়াংশু, মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস, শয্যায় শায়িত অবস্থায়, অতি কষ্টে নিজ হস্তে একখানি কাগজে কিছু লিখিয়া সম্রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত পত্রখানি সম্রাজ্ঞী সম্রাটের ভ্রাতা প্রিন্স

---

(৫) বিষ্ণু পুরাণ V, ৩৭।

(৬) Sir Monier Williams প্রণীত "ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত।

ছুনের হস্তে প্রদান করেন। পত্রখানি অতি অস্পষ্ট ভাবে লিখিত, কারণ তখন সম্রাট এত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা ছিল না। সেই পত্রের মর্ম্ম এই :—

"আমরা* প্রিন্স ছুনের দ্বিতীয় পুত্র। বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী আমাদিগকে সম্রাট নির্ব্বাচন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করান। তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদাই ঘৃণা করিতেন। কিন্তু গত দশ বৎসর কাল আমরা যে দুঃখ ভোগ করিয়াছি তাহার প্রধান কারণই ইউন-সী-খাই এবং…(আর এক জনের নাম অস্পষ্ট। বোধ হয় সেই নাম জুংলু হইবে)। যখন সময় বা সুযোগ উপস্থিত হইবে তখনই সরাসরি মতে ইউন-সী-খাইর শিরশ্ছেদ করিতে হইবে।"

উপরোক্ত চরমপত্রে যে প্রিন্স ছুনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি সম্রাটের পিতা ছিলেন এবং তৎকালে সপ্তম প্রিন্স নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার বিষয় প্রবাসীতে "পেকিন রাজপুরী" নামক প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যে প্রিন্স ছুনের কথা উল্লেখ করিয়াছি তিনি সম্রাট কোয়াংশুর ভ্রাতা এবং নাবালক সম্রাট সুয়ান টুংর অভিভাবক (Regent)। বর্ত্তমান রাজমাতা (Empress Dowager) লুং-ইউ।

ইউন-সী-খাই বর্ত্তমান রিজেন্ট প্রিন্স ছুনের পরম শত্রু। সুতরাং কোয়াংশুর মৃত্যুর পর তিনি নিজ হস্তে ক্ষমতা পাইবামাত্র ইউন-সী-খাইকে চিলি প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ হইতে অপসৃত করান। সেই জন্য ইউন-সী-খাই প্রাণের ভয়ে নিজ জন্মভূমি সান্টুং প্রদেশে বাস করিতেছেন। অনেকে আশা করেন যে ইনি পুনর্ব্বার পূর্ব্বপদ পাইবেন, যদিও সম্রাটের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বেও তিনি সম্রাটের শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন। রিজেন্ট প্রিন্স ছুন ইউন-সী-খাইকে কেমন ঘৃণা করেন তাহা নিম্নের একটী ঘটনা দ্বারা প্রকাশ পাইবে।

১৯০৮ খৃঃ ইউন-সী-খাইয়ের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে পেকিনে বড় ধুমধাম হইয়াছিল। বৃদ্ধা রাণী বহুমুল্যবান উপহার প্রদান করেন এবং পেকিনস্থ সমস্ত ছোট বড় রাজকর্ম্মচারিগণ নানাপ্রকার উপহার প্রেরণ করেন। যত বড় বড় কর্ম্মচারী এবং রাজবংশের কুমারগণ তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। কেবল প্রিন্স অনুপস্থিত। তিনি এই উৎসবের পূর্ব্বে রাজপুরী হইতে কোন ছুতায় বাহিরে গিয়া অবস্থান করিতেছিলেন এবং কোন প্রকার উপহারও প্রেরণ করেন নাই। এই ব্যবহার সামাজিক নীতির বিরুদ্ধ।

চীনাদিগের উৎসবে বা বড়দিনে নানাপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ বড় বড় অক্ষরে লিখিত হইয়া পট্টাকারে সদর দরজায় ও প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন করিয়া রাখা হয়। আবার জন্মোৎসব বা মৃতসংকারাদি ব্যাপারে বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তি ও সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ উৎকৃষ্ট ভাষায় লিখিত পটসকল প্রেরিত হইয়া থাকে এবং উৎসবে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য ঐসকল পট প্রাচীরগাত্রে রক্ষিত হয়। ইউন-সা-খাইয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে যত পট প্রেরিত হইয়াছিল এবং যাহা প্রাচীরগাত্রে লগ্ন ছিল তাহার মধ্যে দুইখানি পট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার একখানিতে লিখিত ছিল যে "উ-সেন সনের (অষ্টম চান্দ্রমাসের) পঞ্চম দিবসে" অর্থাৎ যে সনে ইউন-সী-খাই রাজ্যসংস্কারকদলের ষড়যন্ত্র ও গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ করেন। অপরখানিতে লেখা ছিল যে "সম্রাট দশ হাজার বৎসর জীবিত থাকুন এবং গবর্ণর জেনেরাল (ইউন-সী-খাই) দশ হাজার বৎসর জীবিত থাকুন।" চীনা ভাষায় দশ হাজার বৎসরকে "ওয়ান সুই" বলে। এই "ওয়ান সুই" শব্দের আর এক গুঢ় অর্থ করা হইয়াছিল যে "সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।" ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইউন-সী-খাইয়ের কোন শত্রু দ্বারা ঐ পটদ্বয় প্রেরিত হইয়াছিল, এবং ইউন-সা-খাই যে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন সেই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই উহার উদ্দেশ্য। পরে তাড়াতাড়ি ঐসকল পট প্রাচীরগাত্র হইতে অন্তর্হিত করা হইয়াছিল। সম্রাটের ও বৃদ্ধারাণীর মৃত্যুর পর যখন ইউন-সী-খাইয়ের কার্য্য হইতে জবাব হইল তখন ইহার গুঢ় অর্থ লোকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিল। ইহাকে প্রাণে মারিবার সাহস হয় নাই, কারণ বিদেশী বহু লোক ইহার বন্ধু, তজ্জন্য ইনি ক্ষমতাশালী।

সম্রাট কোয়াংশু দুর্ব্বল শাসনকর্ত্তা হইলেও তিনি ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে চীন সাম্রাজ্যের

* এস্থলে গৌরবে বহুবচন বুঝিতে হইবে।

শাসন ও শিক্ষাপ্রণালীর এবং সামাজিক কুরীতির সংস্কার না করিতে পারিলে এ রাজ্যের মঙ্গল নাই। তৎকালীন সংস্কারকদলের অগ্রণী খাং ইউ-উই সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এবং তাঁহারই পরামর্শানুযায়ী তিনি সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই সংস্কারকার্য্যের পরামর্শ ও নানা বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য সম্রাট কএকবার ইউন-সী-খাইকে আহ্বান করেন। সম্রাট তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে এই সকল সংস্কারকার্য্যের পক্ষপাতী এবং ইহাতে যে তাঁহার সম্যক মত আছে তাহা তিনি সম্রাটকে জ্ঞাত করেন। এবং সম্রাটও ইউন-সী-খাইয়ের মত ক্ষমতাশালী লোকের সহানুভূতি পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। সেই সময়ে পেকিন গেজেটে এই সকল বিষয়ে কোন কোন রাজাদেশ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধা রাণী এই কার্য্যে সম্পূর্ণ অসম্মত ছিলেন। বৃদ্ধা রাণী এই কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলে সংস্কারকদলের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না মনে করিয়া খাং-ইউ-উই সম্রাটকে পরামর্শ দিলেন যে যাহাতে বৃদ্ধারাণীকে বন্দী করিয়া শীতাবাসের সন্নিকট হ্রদমধ্যস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহার চেষ্টা করা হউক। সম্রাট এই মন্ত্রণায় সম্মতি দিলেন। আরো কথা হইল যে বৃদ্ধারাণীকে বন্দী করিবার পূর্ব্বে চিলির শাসনকর্ত্তা জুং-লুকে হত্যা করা প্রয়োজন। কারণ জুং-লুর অধীনে বিদেশী-রণ-কৌশলে শিক্ষিত বহু সৈন্য ছিল এবং জুং-লু বৃদ্ধারাণীর পক্ষে। জুং-লুকে হত্যা করিতে না পারিলে পুরাতন ধরণের সৈন্য দ্বারা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব করা অসম্ভব হইবে। এইরূপ পরামর্শ করিয়া যাহাতে জুং-লুকে হত্যা করা যায় সম্রাট তাহার চেষ্টায় রহিলেন, এবং এই কার্য্য ইউন-সী-খাইয়ের দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে স্থির করিলেন।

এই অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য কোয়াংশু ইউন-সী-খাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইউন-সী-খাই তখন চিলির জুডিশিয়াল কমিশনার বা ন্যায়ধীশ। ইউন-সী-খাই সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে কহিলেন যে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে যাহাতে রাজ্যের সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হয় সে চেষ্টা তিনি প্রাণপণে করিবেন; এক্ষণে ইউন-সী-খাই সম্রাটকে রাজভক্ত প্রজা ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরূপে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? সম্রাট কোয়াংশুর প্রস্তাবের উত্তরে ইউন-সী-খাই কহিলেন "আমি আপনার ভৃত্য, আপনা হইতে যত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব। যদিও আমার গুণ অতি সামান্য, সমুদ্রের মধ্যে এক বিন্দু জল বা মরুভূমিতে একটী বালুকণার সমান, তথাপি এই কার্য্য করিতে একটা কুকুর বা ঘোড়া তাহার প্রভুর আজ্ঞা যেমন ভাবে পালন করে তেমনি ভাবে চেষ্টা করিব।" ইউনের এই প্রকার প্রতিজ্ঞা, বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির পরিচয় পাইয়া সম্রাট তাঁহাকে কহিলেন যে, এই কার্য্যে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি তাঁহাকে সংস্কারক সমিতির সহকারী নেতা নিযুক্ত করিবেন এবং চিলি প্রদেশের সমস্ত সৈন্যের সেনাপতিত্বে তাঁহাকে বরণ করিবেন।

সম্রাটের গ্রীষ্মাবাসে এই মন্ত্রণা হইতেছিল। ইউন-সী-খাই কোয়াংশুর প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই বৃদ্ধা রাণী সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইউন-সী-খাইকে তিনি নিজ কক্ষ মধ্যে লইয়া গিয়া ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধাকে তিনি সমস্ত কথা বলিয়া দিলেন। সম্রাজ্ঞী শুনিয়া কহিলেন "সম্রাট অতি দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমার সন্দেহ হইতেছে যে কোন গূঢ় ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইতেছে। তুমি পুনরায় সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পরে আমার আদেশ গ্রহণ করিবে।"

ইহার পর "বৃদ্ধ বুদ্ধ" বৃদ্ধা রাণী ইউন-সী-খাইকে বিদায় দিয়া সম্রাটকে ডাকিলেন। সম্রাট তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কহিলেন যে "তুমি খাং-ইউ-উইকে সত্বর বন্দী কর, কেন না সে আমার চরিত্র সম্বন্ধে নানা কুৎসা রটনা করিয়াছে।" বৃদ্ধা রাণীর এই কথায় দুর্ব্বলপ্রকৃতি কোয়াংশু থতমত খাইয়া অগত্যা খাং-ইউ-উইকে বন্দী করিতে স্বীকার করিলেন এবং সেই দিনই খাং-ইউ-উইকে নিজহস্তে লিখিত এক আদেশ পত্র পাঠাইলেন যে "তুমি অবিলম্বে সাংহাই

গিয়া সহকারী মুদ্রা বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ কর।” খাং তখন টিনসিনে ছিলেন। তিনি এই আদেশের মর্ম্ম হইতে ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি আদেশ পাইবা মাত্র অবিলম্বে প্রথম ষ্টিমারেই সাংহাই যাত্রা করিলেন। সেই হইতে তিনি আর পেকিনে আসিতে পারেন নাই এবং সেই জন্য তিনি এ যাবত জীবিত আছেন। তিনি নাকি বর্ত্তমানে জাপানে বাস করিতেছেন।

এই ঘটনার তিন দিনের পর সম্রাট পুনর্ব্বার ইউন-সী-খাইকে ডাকাইলেন। ইউন-সী-খাই উপস্থিত হইলে সম্রাট অতি সতর্কতার সহিত তাঁহাকে শেষ আদেশ দিলেন। কারণ সম্রাটের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য বৃদ্ধা রাণীর খোজা গুপ্তচরেরা সর্ব্বদা সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সম্রাট আদেশ করিলেন “তোমাকে প্রথমে জুং-লুকে হত্যা করিতে হইবে এবং তাহার পর জুং-লুর অধীনস্থ সৈন্যের সেনাপতি হইয়া পেকিন যাত্রা করিয়া বৃদ্ধা রাণীকে বন্দী করিতে হইবে।” সম্রাট তাঁহার রাজাজ্ঞার নিদর্শন স্বরূপ ইউন-সী-খাইকে ক্ষুদ্র একটী তীর প্রদান করিলেন এবং বিশেষ করিয়া কহিলেন যে “অবিলম্বে টিনসিন গিয়া রাজপ্রতিনিধি জুং-লুকে তোমার ইয়ামিনে ডাকিয়া আনিয়া তথায় তাহার শিরশ্ছেদ করিবে।”

সম্রাট কোয়াংশুর পেকিন রাজ সিংহাসনে এই শেষ উপবেশন এবং এই তাঁহার শেষ রাজাজ্ঞা। কারণ তাহার পর তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন আর সিংহাসনে উপবেশন করিতে পান নাই, বৃদ্ধা রাণী সিংহাসনে উপবেশন করিতেন এবং কোয়াংশু তাঁহার আসনের পার্শ্বে একখানি নিম্ন আসনে উপবেশন করিতেন।

ইউন-সী-খাই বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সম্রাটের আদেশের নিদর্শন তীর লইয়া অন্য কাহারো সহিত বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সরাসর টিনসিনে গমন করিলেন এবং তথায় গিয়া একেবারে রাজপ্রতিনিধি জুং-লুর ইয়ামিনে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন “আপনি আমাকে সহোদর ভ্রাতার মত মনে করেন কি না।” তাহাতে জুং-লু উত্তর করিলেন “নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সহোদর ভ্রাতার সমান মনে করি।” তখন ইউন-সী-খাই কহিলেন “বেশ! এই দেখুন আপনার শিরশ্ছেদ করিবার জন্য সম্রাটের আদেশ আমার হস্তে। আপনাকে হত্যা করিয়া বৃদ্ধা রাণীকে বন্দী করিতে হইবে এই আদেশ পত্রে লেখা দেখুন। আমি বৃদ্ধা রাণীর অনুগত ভৃত্য এবং আপনার বন্ধু। সুতরাং আপনাদিগের বিরুদ্ধে সম্রাটের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দিলাম।” এই কথা প্রকাশের পর জুং-লু ধীরভাবে কহিলেন “আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে বৃদ্ধ বৃদ্ধ এখনও এইসকল ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারেন নাই। আমি এখনই তাঁহার সমীপে যাইতেছি।” এই বলিয়া তিনি অবিলম্বে পেকিন অভিমুখে স্পেসেল ট্রেনে যাত্রা করিলেন।

জুং-লু ইউন-সী-খাই হইতে রাজাজ্ঞা ও তাহার চিহ্ন স্বরূপ তীর লইয়া সরাসরি রাজপুরীতে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃদ্ধা রাণীর হ্রদমধ্যস্থ আবাসে বিনা সংবাদে প্রবেশ করিলেন। ইহা নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য। তথায় গিয়া তিনবার “খঠৌ” বা অবনত মস্তকে অভিবাদন করতঃ বৃদ্ধা রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “মহারাণী আমাকে রক্ষা করুন।” তদুত্তরে রাণী কহিলেন “এখানে তোমার অনিষ্ট করিতে পারে কাহার সাধ্য? কিন্তু এই গুপ্ত স্থানে আসিবারও তোমার অধিকার নাই।” তখন জুং-লু তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার স্বাভাবিক তেজস্বিতার সহিত দুই ঘণ্টার মধ্যে মহা সভার (Grand Council) সভ্যগণকে, মাঞ্চুরাজবংশীয় কুমারগণকে এবং অন্যান্য বড় বড় কর্ম্মচারিগণকে ডাকাইয়া একত্র সমবেত করিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত অমাত্যবর্গ বৃদ্ধা রাণীকে পুনরায় নিজ হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে এবং বর্ব্বর পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই মন্ত্রণাসভায় স্থির হইল যে জুং-লুর নিজের সৈন্যের দ্বারা রাজপুরী রক্ষা করিতে হইবে এবং জুং-লু নিজে টিনসিনে গিয়া দ্বিতীয় আদেশের জন্য অপেক্ষা করিবেন। এই গুপ্তমন্ত্রণার সভা রাত্রি

দ্বিপ্রহরের সময় ভঙ্গ হইল। প্রাতঃকালে পাঁচ ঘটিকার সময় সম্রাট যখন শরৎকালীন দেবোপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন রাজপুরীর সৈন্য ও খোজাগণ কর্তৃক ধৃত হইলেন। কোয়াংশু ধৃত হইয়া হ্রদমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র দ্বীপে নীত হইয়া তথায় বন্দী ভাবে প্রায় দুই বৎসর ছিলেন। হতভাগ্য কোয়াংশুর এক রাণী ভিন্ন তথায় আর কাহারো যাইবার অধিকার ছিল না। কেবল মাত্র গুপ্তচর রূপে লুং-উই নাম্নী এক মহিলা যাইতে পারিতেন। বৃদ্ধা রাণী কোয়াংশুকে কহিলেন "তোমার এই উপযুক্ত শাস্তি। তোমাকে প্রাণে মারিব না। এবং সম্রাট নামও তোমার রহিল।"

য়ুরোপীয়েরা ইহাকেই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের Coup d'etat বা মস্ত কৌশলের চাল বলে। কোয়াংশু জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইউন-সী-খাইকে দোষী মনে করিয়াছিলেন। ইহার পর কোয়াংশু কখনই ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে কথা বলেন নাই। ইউন-সী-খাই তাঁহার নিকট ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া তন্মুহূর্ত্তে সম্রাটের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ভয়ানক অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছিলেন। তবে জুং-লু ও বৃদ্ধা রাণী তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছিলেন তাহাও সমর্থন-যোগ্য, কেননা সম্রাট তাঁহাদের বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। চীন রাজকর্ম্মচারিগণের ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করার কোন মূল্য নাই। কেননা মিথ্যা প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাসঘাতকতাই তাহাদের অঙ্গের ভূষণ।

চীনদেশে শীঘ্রই রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইবে এমন বোধ হইতেছে। কারণ নানা স্থানের গুপ্ত সমিতির লোকেরা বর্ত্তমান রাজবংশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বিস্তার করিতেছে। ইহারা সাধারণ তন্ত্র স্থাপন করিতে অথবা মিং রাজবংশীয় কোন বংশধরকে পেকিনের সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছুক। এই মিং রাজবংশের শেষ রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া মাঞ্চুগণ পেকিনের সিংহাসন অধিকার করে। রাজা যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সপরিবারে আত্মহত্যা করেন। সে আজ আড়াইশত বৎসরের কথা।

পেকিন অঞ্চলে White Lily, Red Lamp প্রভৃতি চিহ্ন ও নামধারী গুপ্ত সমিতি অতি প্রবল বলিয়া শুনা যায়।*

টেঙ্গিয়ে, চীন। শ্রীরামলাল সরকার।

শান্তশীলা

হেন মূর্ত্তি নাই রে নিখিলে!
কে রে তুই অয়ি শান্তশীলে?
কে রে তুই দেবকান্তি?
কে রে মূর্ত্তিমতী শান্তি?
অকস্মাৎ দরশন দিয়ে,
প্রাণ মোর দিলি জুড়াইয়ে!
মুমূর্ষু পুত্রের যথা জীবন আইলে ফিরে,
স্নেহময়ী মা তাহার ভাসেন আনন্দ-নীরে!
ভেঙ্গেচূরে যায় তাঁর হৃদয়ের বাঁধ,
এমনি সে দুরন্ত আহ্লাদ!
তুই বুঝি পূর্ব্বজন্মে ছিলি মোর কন্যা?
তাই আজি নর্ম্মদার প্রপাতের বন্যা,
শত শুভ্র ঊর্ম্মিমালা-সাজে,
ছুটিয়াছে হৃদয়ের মাঝে!
আনন্দের বাষ্পে আজি আকুলিত দু আঁখি আমার,
একি রে বিচিত্র ধূমধার!
চারিধারে আনন্দ-হিল্লোল।
চারি ধারে আনন্দ-কল্লোল!
তোরে হেরি অয়ি কন্যা, অয়ি অপরূপে,
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে আর মধুপে মধুপে,
ভরি গেল কল্পনার নন্দন-কানন!
আমি যেন হেরিতেছি ফুলের স্বপন!
চারিধারে কুসুমের বাস,
চারিধারে কুসুমের হাস!

---

* সম্প্রতি চীনে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। জনসাধারণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজসরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। এই বিদ্রোহে বিপর্য্যস্ত হইয়া চীন রাজসরকার বৃদ্ধ ইউন-সী-খাইকেই বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং স্থলসৈন্য ও নৌযুদ্ধবিভাগ উভয়েরই তিনি নেতা। —প্রবাসী সম্পাদক।

হাসিতেছে কবির তুলালি,
গন্ধরাজ, গোলাপ, শেফালি!
এ যেন রে মহোৎসব!—এ যেন রে ফুলের দেয়ালি!

* * * *

তাপসের শুভ্র চিন্তা সম
তোর এ মূরতি অনুপম!
একি শান্তি বদনে, নয়ানে,
একি শান্তি যূথী-শুভ্র প্রাণে!
নাহি হেথা বৈশাখী ঝটিকা,
নাহি হেথা, নাহি হেথা সাহারার বহ্নিময়ী শিখা!
নাহি হেথা কম্বনাদী অম্বু-কোলাহল!
এ যে চির প্রশান্ত, শীতল,
ফুলময়ী অলকা-নগরী!
নহে ইহা ভীমকান্ত হিমাচল, ধবল-শরীরী!
হেথা সুধু মলয়-বাতাস;
মুচকি মুচকি সুধু তরুকোলে কুসুমের হাস!
হেথা নাই স্বার্থভরা ক্রূর অভিমান:
এগো সুধু বিশ্বের কল্যাণ!
এগো নহে পাষাণ জমাট,
চিরবক্র, চিরবদ্ধ যার রুদ্ধ অন্তর-কপাট!
উছলে না উৎস কভু যার শিলা-দেহে,
হাসে না জোৎস্না কভু যার অন্ধ গেহে!
এ নহে, এ নহে!
এ যে শুধু সুধা ঢল ঢল,
কল কল ছল ছল চারিধারে নির্ঝরের জল!
আপনা বিলায়ে আর আপনা বিকায়ে,
ভাঙিয়া মেঘের কারা,
এ যেন রে শ্রাবণের সুধাময়ী ধারা,
করুণার অশ্রুরাশি-মুকুতা ছড়ায়ে,
তরল চন্দন-লেপে ধরারে জুড়ায়ে!

* * * *

চারি ধারে নিঝুম্, নিঝুম্,
নীল কালিন্দীর নীরে এযে ফুল্ল জোছনার ঘুম!
বশীকরণের মন্ত্রে শান্ত করি ধরণী আকাশ,
শারদীয়া যামিনীর প্রশান্ত এ কৌমুদী-বিকাশ!
সদা জ্বলে দাউ দাউ চুলি,
শতধারে শতহস্ত তুলি,
শতস্কন্ধা আকাঙ্ক্ষার এগো নহে আকুলি ব্যাকুলি!
তুফানের চির অবসান,
বাসনার এ মহানির্ব্বাণ!
চিরশান্তি, চিরতৃপ্তি,
স্থির সৌদামিনী-দীপ্তি,
যোগীর এ মহাযোগ,—এ মহাপ্রয়াণ!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

করঞ্জা বৃক্ষ ও করঞ্জা তৈল

গত বৎসর শ্রাবণ মাসের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত মোজাফ্ফর আহমদ মহাশয় "সন্দ্বীপের পুন্নাল বৃক্ষ ও পুন্নাল তৈল" সম্বন্ধে একটী ও পৌষমাসের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়-চৌধুরী মহাশয় "রণাবৃক্ষ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রত্নপ্রসবিনী বঙ্গভূমির বনে জঙ্গলে এই প্রকার যে কত আয়কর ও প্রয়োজনীয় বনজাত সামগ্রী হতাদরে বিনষ্ট হইতেছে, বাস্তবিকই তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। বাঙ্গালীর অভাববিমোচনের উপযোগী জিনিষ বাঙ্গালার যথা তথা ছড়ান রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী এমনি মোহান্ধ যে নিজের দেশের জিনিষের প্রতি না চাহিয়া, দিন দিন বিদেশী জিনিষের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আজ আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিব, সেই করঞ্জা বৃক্ষ, তাহাদের মধ্যে অন্যতম। করঞ্জা বৃক্ষ দুই প্রকার। তজ্জন্য এক জাতীয় "করঞ্জা" নামে ও অপর জাতীয় "গো করঞ্জা" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। করঞ্জা গাছগুলি ছোট এবং ইহার ফল লোকে খাইয়া থাকে; ফলগুলি অত্যন্ত অম্ল। আমাদের বর্ণনীয় গো করঞ্জা।

রাজসাহী জেলার বনে, জঙ্গলে এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। লোকে কেরোসিনের পরিবর্ত্তে ইহার তৈল জ্বালাইয়া থাকে। কিন্তু আজকাল সস্তা কেরোসিন তৈলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইহার প্রচলন প্রায় লোপ পাইয়াছে। তথাপি অনেক দুঃস্থ গৃহস্থ গাছ হইতে করঞ্জাবীজ সংগ্রহ করিয়া, কলুর ঘানিতে ভাঙ্গাইয়া লইয়া সম্বৎসরের পোড়ানর

জন্য তৈলের সংস্থান করিয়া রাখে। কোন কোন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থও কেরোসিনের অনিষ্টকারিতা বঝিতে পারিয়া এবং ধূমের হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত করঞ্জা তৈল জ্বালাইয়া থাকে। কেরোসিনের ন্যায় এই তৈল জ্বালাইলে ধম নির্গত হয় না। পোড়েও বেশ ধীরে ধীরে। ইহার আলোও উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ।

করঞ্জা গাছ আম কাঁঠাল গাছের ন্যায় বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট এবং উচ্চতায়ও তদনুরূপ। ইহার পত্রাবলী গাঢ় সবুজবর্ণ. আকৃতিতে অনেকটা অশ্বত্থ পত্রের সদৃশ। এক একটী ডাঁটায় অনেকগুলি করিয়া পত্র থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে করঞ্জা ফুল প্রস্ফুটিত হয়। ফুলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং রক্তাভ শাদা। করঞ্জা ফুল হইতে মৌমাছি মধু আহরণ করিয়া মৌচাকে সঞ্চয় করিয়া থাকে। এই ফুল হইতে এক প্রকার ফল হয়। ফলগুলি ঝিনুকের আবরণের ন্যায় একপ্রকার কঠিন আবরণ বিশিষ্ট। ফাল্গুন চৈত্রমাসে ফলগুলি পাকিতে আরম্ভ করে। বসন্ত সমাগমে করঞ্জাপত্রগুলি বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়িয়া গেলে বৃক্ষময় শুধু ফল রহিয়া যায়। তখন ফলগুলি আঁকশি দিয়া পাড়িয়া লইতে হয়। ফলগুলি পাড়িয়াই রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হয়। রৌদ্রে শুকাইয়া ফলের কঠিন আবরণের জোড়ার মুখ একটু আলগা হইলে, কিছু দিয়া সামান্য আঘাত করিলেই জোড়া খুলিয়া গিয়া লালবর্ণের বীচি বাহির হয়। বীচির এই লাল জিনিষটা একটা পাতলা আবরণ। আবরণের মধ্যে যে শাঁস থাকে তাহার বর্ণ শাদা। এই শাঁসগুলির অধিকাংশই মাকড়সার ডিমের ন্যায় গোলাকৃতি। প্রত্যেক ফলে এক একটী করিয়া বীচি থাকে। কদাচিৎ কোনও কোনও ফলে দুইটি বীচিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পুনরায় বীচিগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া ঢেঁকিতে গুঁড়া করিতে হয়। এখন এই গুঁড়াগুলি ঘানিতে পিষিয়া লইলেই করঞ্জা তৈল পাওয়া যায়। এক মণ করঞ্জা বীচি হইতে সাধারণতঃ দশ সের তৈল নির্গত হয়। অবশিষ্ট খৈলগুলি রন্ধনকার্য্যে জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। করঞ্জা খৈল গো মহিষাদির অখাদ্য।

করঞ্জার চারা আপনাআপনিই জন্মিয়া থাকে। গো, ছাগাদিতে ইহার পাতা খায় না, তজ্জন্য চারাগুলি বর্দ্ধিত করিতে বিশেষ কোন যত্ন করিতে হয় না। ৫।৭ বৎসরেই চারাগুলি বর্দ্ধিত হইয়া ফুল ও ফল ধরিতে আরম্ভ করে। করঞ্জাবৃক্ষের জ্বালানি উৎকৃষ্ট। সামান্য রস থাকিলেও বেশ জ্বলে।

এখন এই করঞ্জাবৃক্ষ যদি রীতিমত চাষ আবাদ করিয়া তৈল উৎপন্ন করা যায় তাহা হইলে নিজেও লাভবান হওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও কিঞ্চিৎ অভাব পূরণ হয়। বাঙ্গালার বনে জঙ্গলে এইপ্রকার বহু বনজাত সামগ্রী অনাদরে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালীর সে দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই। যতদিন না বাঙ্গালীর তত্ত্বানুসন্ধান-স্পৃহা জাগিয়া উঠিবে, যতদিন না বাঙ্গালী স্বদেশী দ্রব্যের আদর করিতে শিখিবে, ততদিন বাঙ্গালার উন্নতির আশা সুদুর পরাহত। কতদিনে বাঙ্গালার সে সুদিন ফিরিয়া আসিবে?

শ্রীশরৎচন্দ্র সান্যাল।

ব্রাউনিং

আমরা গত বৎসরের কার্ত্তিক মাসে প্রবাসীতে ব্রাউনিং ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু উক্ত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সকল কথা যথোচিত ভাবে আলোচনা করা হয় নাই। সুতরাং উক্ত অসম্পূর্ণ প্রবন্ধের সম্পূর্ণতার অনুরোধে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হইতেছে। বলা বাহুল্য বিষয়ের সম্পূর্ণতা ও সর্ব্বাঙ্গীনতা এখনও সুদূর-পরাহত। মাসিক পত্রের ক্ষুদ্র কলেবরে কোন কবির বিস্তারিত সমালোচনা সম্ভবে না—বিশেষতঃ ব্রাউনিংএর মত দুরূহ কবির জটিল আবরণ ভেদ করা অল্প-আয়াস-সাপেক্ষ নহে। এই প্রবন্ধে তাঁহার সুদীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট *The Ring and the Book, The Inn Album* প্রভৃতি কবিতার আলোচনা থাকিবে না। কারণ উহার এক একটি কবিতার জন্য স্বতন্ত্র এক একটি প্রবন্ধ আবশ্যক। যাঁহারা ঐ সব কবিতার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা Mrs. S. Orr অথবা Symonsএর *Handbook to Browning's Works,* ডাক্তার বার্ড়োর *Browning Cyclopædia* পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

ব্রাউনিংএর প্রতিভা এত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগেই তিনি এত অধিক পরিমাণে সূক্ষ্মদর্শিতা ও অভিনবত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যে উহার জন্য অনেকে তাঁহাকে সেক্ষপীয়রের অব্যবহিত নিম্নস্থানেই আসন প্রদান করেন। অবশ্য এ প্রশংসা কিয়দংশে অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে ব্রাউনিংএর নাটকীয় ক্ষমতা ইংরাজী সাহিত্যে প্রায় অতুলনীয় ছিল। তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবিধ কবিতাবলী হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্ব বিলোপ, চরিত্রাঙ্কণে নিপুণতা, মানবের অন্তরস্থ পরস্পর-বিসংবাদী ভাব ও স্বার্থ সমূহের ঘাত প্রতিঘাত, একটি সামান্য ঘটনার সহযোগিতায় বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় সমস্ত হৃদয়কন্দর প্রতিভাসিত করা—ইহাই প্রকৃত নাটকীয় প্রতিভা। ইহা ব্রাউনিংএ যে পরিমাণে বিদ্যমান ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদেশী আর কোন লেখকে সে পরিমাণে ছিল না।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে প্রেম, ললিতকলা প্রভৃতি কয়েকটি কবিজনোচিত বিষয়ে ব্রাউনিংএর সংস্কার ও অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে আমরা তাঁহার আর দুএকটি কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া আর দুএকটি বিষয়ের আলোচনা করিব। *Paracelsus* ব্রাউনিংএর একখানি সর্ব্বজনপঠিত কাব্য-গ্রন্থ। ইহা তাঁহার তরুণ বয়সে রচিত হইলেও ইহাতে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয়। অধ্যাপক Hugh Walker ইহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য সমূহের অন্যতম বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রশংসা অনুচিত হয় নাই। ইহার কল্পনার বিশালতা, ভাবগাম্ভীর্য্য এবং উচ্চ নৈতিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া হর্ণ ইহাকে গেটের ফাউষ্টের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন*। এই কাব্যে জীবনের সুগভীর তত্ত্ব-সমূহ কি অসাধারণ শক্তিমত্তা ও শিল্পনৈপুণ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ইহাতে একদিকে তাঁহার মানবজীবন সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম সমালোচনার শক্তি ও অন্য দিকে উন্নত কবিজনোচিত কলা-কোবিদত্ব প্রকটিত হইয়াছে। এই কবিতার প্রকৃত শিক্ষা এই যে মানবজীবনরূপ মহাসৌধনির্ম্মাণে শক্তি ও সৌন্দর্য্য এবং জ্ঞান ও প্রেম উভয়েরই সমান উপযোগিতা আছে—ইহার একটিও পরিহার্য্য নহে, যে কোন একটিকে ত্যাগ করিলেই সমগ্র সৌধ বিকলাঙ্গ হইবে। পারাসেলসাস জ্ঞানপিপাসু সাধক, তিনি জগৎ ও জীবনের অন্তর্নিহিত জটিল রহস্যনিচয় আবিষ্কার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া শান্তি ও প্রেমের মোহ বিসর্জ্জন দিয়া তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির পরিশোধের' সন্ন্যাসীর ন্যায় তিনিও জ্ঞানোপার্জ্জনের দৃপ্ত অহমিকায় অন্ধীভূত হইয়া জনসাধারণের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন এবং একাকী নিঃসহায় অবস্থায় মানবমণ্ডলীর সমবেত-চেষ্টাসাধ্য মহাসত্য অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না—ফেষ্টাস তাঁহাকে বারংবার বুঝাইয়া দিলেও তাঁহার বোধগম্য হইল না—যে তিনি যে পুণ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাহার উদ্‌যাপনে ব্যক্তিগত চেষ্টা সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ নগণ্য এবং নিষ্ফল, সে সাধনায় সিদ্ধকাম হইতে হইলে যুগ হইতে যুগান্তর পর্য্যন্ত সমগ্র মানবজাতির অক্লান্ত গবেষণা আবশ্যক। তিনি বুঝিতে পারিলেন না এ মহাসাধনায় অসংহত চেষ্টাতে সিদ্ধিলাভ দুর্ঘট। তাঁহার উদ্দেশ্য খুব বিশাল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা তাদৃশ মহৎ ছিল না। তিনি নিজের অপরিমেয় জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু জানিতেন না যে হৃদয়ের পিপাসা যতদিন অতৃপ্ত থাকিবে ততদিন জগতের অতুল জ্ঞানসম্পত্তি লাভ করিলেও তিনি সুখী হইতে পারিবেন না। হইয়াছিলও তাহাই। যখন প্রেমিক কবি এপ্রিলের সঙ্গে কঠোর বৈজ্ঞানিক পারাসেলসাসের সাক্ষাৎ হইল তখন এপ্রিলের কোমল, মনোমোহন, প্রেমময়, রক্তরাগরঞ্জিত জীবনপটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মোহমুগ্ধ নেত্রযুগল হইতে তন্দ্রার আবেশ ছুটিয়া গেল, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নহে। যাহা দ্বারা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—সেই প্রেম, বিশ্বাস, আশা এবং আশঙ্কা তিনি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে—তিনি অনুভব করিতেছেন—

* See Harne's *A New Spirit of the Age.*

'Time fleets, youth fades, life is an empty dream ;
This is the echo of Time.'

মহাকালের এই দিগন্তনিনাদী প্রতিধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাই শেষমুহূর্ত্তে সতৃষ্ণ নয়নে এপ্রিলের দিকে তাকাইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তিনি কহিতে লাগিলেন —

'Love me henceforth, Aprille, while I learn
To love ; and merciful God, forgive us both!
We wake at last from weary dreams; but both
Have slept in fairy land : though dark and drear
Appears the world before us, we no less
Wake with our wrists and ankles jewelled still.
I too have sought to *know* as thou to *love*—
Excluding love as thou refusedst knowledge.
Still thou hast beauty and I power. We wake :
What penance canst devise for both of us?'

এইরূপে জ্ঞানী প্রেমিকের নিকট এবং প্রেমিক জ্ঞানীর নিকট জীবনের মহাসত্য শিক্ষা করিলেন।

ব্রাউনিংএর আর একটি কবিতা আছে *James Lie's Wife*; উহা কাব্য সাহিত্যে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ডাক্তার টডহাণ্টার লিখিয়াছেন যে 'mystery and melancholy of change' অর্থাৎ হৃদয়ের বিষাদময় পরিবর্ত্তন-রহস্যই এই কবিতার উদ্দীপনা। সত্যও তাহাই। ইহাতে বাহ্য ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে একটি নারীচরিত্রের আভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। একটি কোমলহৃদয়া রমণী জেম্‌স্ লী নামক একজন তরল-প্রকৃতি যুবকের সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধা হইয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় উভয়ের প্রেম উভয়ের উপরে সংন্যস্ত ছিল। কিন্তু কালচক্র-আবর্ত্তনে নবপ্রেমের মোহময় ইন্দ্রজাল অপসৃত হইলে চপলমতি যুবকের হৃদয় ক্রমেই তাঁহার পত্নী হইতে দূরগামী হইতে লাগিল, পত্নীর ঐকান্তিক প্রেমবিহ্বলতা তখন আর তাঁহার প্রেমতৃপ্ত অন্তঃকরণে মধুধারা বর্ষণ করিত না, বরং উহা তাঁহার নিকট বিরক্তি-জনক বলিয়াই বোধ হইত। একজন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন—

'অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা
স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা।'
(নৈষধ ৩।৯৩)—

নিবৃত্ততৃষ্ণ তৃপ্তহৃদয় পুরুষের নিকট তুষারশীতল সুবাসিত বারিধারাও উপাদেয় বলিয়া মনে হয় না। যতক্ষণ তৃষ্ণা, ততক্ষণ মাধুর্য্য—তৃষ্ণা অপগত হইলে মাধুর্য্যও বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য প্রকৃত ভালবাসা সম্বন্ধে এ কথা প্রযুজ্য নহে, প্রকৃত ভালবাসার আদর্শ অনেক উন্নত, অনেক মহান্, অনেক বিশাল। উহাতে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে সঞ্চরণশীল মধুকরের অযথা চটুলতা নাই, উহাতে বহুবেশধারী বহুরূপীর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব ভাবে রূপান্তর পরিগ্রহণ নাই—উহা "অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু," উহা স্থির গম্ভীর শান্ত অচঞ্চল। কালরূপ মহাসমুদ্রের সংক্ষুব্ধ বীচিমালা উহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু উহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—উহাকেই টেনিসন বলিয়াছেন 'whirlwind's heart of peace' এবং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন জগৎঘূর্ণীর মাঝে স্থির স্বর্ণকমলে ভুবনলক্ষ্মী প্রেমের বাস। প্রকৃত ভালবাসা, সৌন্দর্য্য অথবা প্রতিভার ন্যায়, 'নিত্য নব নবোন্মেষশালিনী'। কিন্তু প্রেমের এ উচ্চতম আদর্শ—চণ্ডীদাস অথবা জ্ঞানদাসের এ উধাও কল্পনা—যুবকের চঞ্চল অন্তঃকরণে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। যতই দিবস অতীত হইতে লাগিল ততই তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছলিত রসপ্রবাহ বিশুষ্ক হইতে লাগিল, তাঁহার অন্তঃকরণের সুধাময়ী প্রেমমন্দাকিনী উৎসমুখেই অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, স্ফুটনোন্মুখ মন্দারকুসুম কোরকাবস্থাতেই বিশীর্ণ হইতে লাগিল। রোহিণীর সংস্পর্শে আসিয়া ভ্রমরের প্রতি—নিরপরাধা, অনন্যনিষ্ঠা, বালিকা ভ্রমরের প্রতি—গোবিন্দলালের হৃদয়ের যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, নির্দ্দোষা অনন্যচারিণী প্রেমাকুলা পত্নীর প্রতি যুবক লীরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। কিন্তু ইহা বুঝিতে রমণীর অধিক বিলম্ব হইল না। বাতায়নসন্নিধানে, অগ্নিকুণ্ডে, দ্বারদেশে, সৈকত-পুলিনে, গিরিশিখরে ও অন্যান্য স্থানে স্বামীর সহিত তাঁহার যে সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন হইয়াছে তাহা হইতে তাঁহার মানসিক জীবনের একখানি ক্রমপরিবর্ত্তমান ধারাবাহিক ইতিহাস সংগৃহীত হইতে পারে। যখন গবাক্ষ সমীপে স্বামীর সহিত তাঁহার প্রথম সন্দর্শন হয় তখন তাঁহার প্রিয়তমের অন্তরের ন্যায় বাহ্য জগতেও

একটা পরিবর্ত্তনের আভাস পরিস্ফুট হইতেছে। শরৎকালের প্রসন্ন নীলাকাশ, মধুর সূর্য্যালোক, বিকসিত শেফালিকাপুঞ্জ, আসন্ন শিশিরের কুহেলিকারাশিতে ম্লান ও মন্দীভূত হইয়া যাইতেছে। হিমানীপাতে নবোদ্‌গত কমলের ন্যায়, রবিকিরসম্পাতে কেতকীকুসুমের পত্রপুটের ন্যায়, তাঁহার হৃদয়নিহিত বিশ্বাসকুসুম অঙ্কুরেই বিদলিত হইতে লাগিল। স্বামী যে তাঁহার প্রতি বিগত-স্নেহ এ আশঙ্কা তাঁহার মনে স্থান লাভ করিয়াছে। কবিতার পরবর্ত্তী অংশে এ আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়াছে, কিন্তু এখনও বিশ্বাস একেবারে দূরীভূত হয় নাই। প্রচণ্ড শীত সমাগতপ্রায়, মুক্তবাসা ধরণীর নগ্নশোভা চতুর্দ্দিকে প্রকটিত, কিন্তু তিনি ভাবিলেন তাহাতে তাঁহাদের কোনই কষ্টের কারণ নাই—তাঁহাদের বাহিরে জীবনযাত্রার উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, অন্তর প্রেমালোকে উদ্ভাসিত। বাহিরে শীত ও অন্ধকার, ভয় কি? অন্তরে প্রেমের প্রদীপ জ্বলিতেছে। অন্তরের দীপ বাহিরের অন্ধকার বিদূরিত করিবে, অন্তরের তাপ বাহিরের শৈত্য নিবারণ করিবে। ইহাই ত ঈশ্বরের অভিপ্রায়। ভয় কি? কিন্তু—বলিলে কি হইবে—তবু ত ভয় আসিল, যে আশঙ্কা একবার হৃদয়ক্ষেত্রে প্ররূঢ় হইয়াছে তাহা উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য রূপ বারিবর্ষণে সিক্ত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—ইহা এখন আর সে দোলাচল চিত্তবৃত্তি নহে, ইহা স্থিরতর অবিশ্বাস। ইহার পরে যখন আমরা এই দম্পতীকে সমুদ্র সৈকতে বিচরণ করিতে দেখিলাম তখন রমণীর জীবনের সন্ধিমুহূর্ত্ত,—কার্লাইলের ভাষার অনুকরণে বলিতে গেলে বলা যায় ইহা meeting-ground of 'Everlasting Yea and Everlasting Nay'—ইহা বিসর্জ্জন ও প্রতিষ্ঠার সন্ধিস্থল, ইহা উন্নত ও অবনত প্রেমের সন্ধিস্থল, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলনক্ষেত্র। তিনি স্বামীকে বলিতে লাগিলেন—

"এ পরিবর্ত্তন কেন, নাথ? তোমার হৃদয়ের করুণ আহ্বানে আমার হৃদয় সাড়া দিয়াছিল, তুমি যাহা চাহিয়াছিলে আমি ত তাহা দিয়াছিলাম, এ দরিদ্র ভাণ্ডারের সকল ঐশ্বর্য্য ভক্তিভরে তোমারই চরণপ্রান্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। তুমি ত সবই গ্রহণ করিয়াছ, তবু এ অসন্তোষ কেন, এ ঘৃণা কেন, এ উপেক্ষা কেন? তোমার সকল দোষ, সকল অসম্পূর্ণতা দেখিয়াও তোমার প্রতি আমার ভক্তি ন্যূন হয় নাই। কারণ আমি জানি যাহা সৎ, যাহা মহৎ তাহা যথাসময়ে বিকশিত হইবে, আর তাহারই প্রভাবে যাহা অসৎ, যাহা নীচ তাহার শক্তি ক্ষীণ হইয়া যাইবে। তুমি নিন্দাযোগ্য কি প্রশংসাযোগ্য সে বিচার আমি করি নাই, আমি মনে করিয়াছি দোষগুণ-নির্ব্বিশেষে—

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।

কিন্তু তোমার অন্তরে এ ঘোর পরিবর্ত্তন কেন, নাথ?"

এই ভাব আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহার পরে আমরা দেখিতে পাই পর্ব্বতের পাদমূলে বসিয়া রমণী একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। তখন তাঁহার মন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তিনি বুঝিয়াছেন নিরাশা ও বিকার সংসারের নিয়ম এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়। যে গ্রন্থ তিনি পাঠ করিতেছিলেন তাহাতে বিষাদচঞ্চল পবনের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখিত ছিল। সমীরণ সন্ সন্ রবে বহিয়া যাইতেছিল, কবি উহাকে কোনও অজ্ঞাতকারণে-উপজাত অন্তর্নিহিত দুঃখের তপ্তশ্বাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রমণী এই কবিতা পড়িয়া মনে করিলেন যে কবি যৌবনসুলভ অনভিজ্ঞতাবশতঃ এখনও দুঃখের শিক্ষার দিক্‌টা দেখিতে পান নাই, কেবলমাত্র নিরাশার দিক্‌টাই তাঁহার নিকটে প্রত্যক্ষ। পবনের এই নিশ্বাসধ্বনি প্রকৃতপক্ষে দুঃখের বার্ত্তা নহে, পরন্তু আশার বাণী। কিন্তু ইহা তাঁহার মনের কথা, প্রাণের মধ্যে এখনও সব সময়ে ইহার সাড়া পান না। জগতের এই অনন্তপ্রকার পরিবর্ত্তনপ্রবাহের মধ্যে তাঁহার হৃদয় অজ্ঞাত-বেদনা-ভরে একএকবার কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, তাঁহার হৃদয়ে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত আশা ও নিরাশার সংগ্রাম উপস্থিত হইল, পরে আশা জয়ী হইল—নিরাশা পরাভূত হইল। এইবার তাঁহার জীবনের প্রকৃত পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। এবার একদিন নির্ম্মল শারদপ্রাতে যখন আমরা তাঁহাকে শৈলান্তরালে দেখিতে পাইলাম তখন তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে—অবসাদ-কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে, হৃদয়ের মলিনতা ধৌত হইয়াছে—আত্মবিস্মৃতি, উন্নত প্রেম, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ক্ষুদ্রপ্রেমের স্থান অধিকার করিয়াছে, প্রতিদানস্পৃহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। তারপর শেষ অবস্থা—আত্মবিসর্জ্জন। তিনি প্রিয়তমের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত—বড় কষ্টে নয়নের উদ্গত অশ্রু সংবরণ করিয়া, অসাধারণ আত্মসংযমের সহিত—

সোৎসুকনেত্রে একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রিয়তমের সান্নিধ্য চিরজীবনের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। মর্ত্তলোক স্বর্গধামে পরিণত হইল, আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্মবিসর্জ্জনে বিলীন হইল, উন্নত প্রেমের জয়পতাকা উড্ডীন হইল।

আমরা আর তাঁহার কবিতার বিশ্লেষণ করিতে ইচ্ছা করি না। সমালোচক ডসন বলেন যে ইংলণ্ডের গত শতাব্দীর সাহিত্যিক ইতিহাসে কার্লাইল ও রাস্কিনের ন্যায় ব্রাউনিং একজন মহাশিক্ষকরূপে জগতের অর্চ্চনালাভের যোগ্য। রাস্কিনের সহিত অনেক বিষয়ে তাঁহার বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু কার্লাইলের সঙ্গে তাঁহার অনেক সারূপ্য অনুভূত হয়। তন্মধ্যে প্রধান সাদৃশ্য এই যে উভয়েই মনে করেন মানবাত্মার ক্রমবিকাশ যাহাতে প্রকাশিত হয় নাই তাহার মূল্য অত্যল্প এবং তাহা প্রণিধানের অযোগ্য। সাংসারিক সাফল্যের প্রতি উভয়েরই সমান ঔদাস্য ছিল। কার্লাইল ত কখনও সফলতার দিকে ভুলিয়াও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। ব্রাউনিংও প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছেন। *Heroes and Heroworship* নামক গ্রন্থে কার্লাইল যে দুই জন প্রতিভাবান্ মহাত্মাকে বিদ্যাবীর (men of letter) বলিয়া উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া হৃদয়ের যত্নসঞ্চিত সমুদায় ভক্তিসম্ভার অর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদের কেহই সাংসারিক কৃতকার্য্যতা লাভ করেন নাই, বীরের ন্যায় তাঁহারা আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন—দারিদ্র্যের সহিত, দুঃখের সহিত, হীনতার সহিত অনবরত তাঁহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে,—সিদ্ধিলাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। গেটে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাই তাঁহার প্রকৃত বীরত্বের নিদর্শন নহে, রণাঙ্গনে পরাজিত হইলেও তাঁহার বীরত্বের মাত্রা ন্যূন হইত না। ব্রাউনিংও তাহাই মনে করেন। তাঁহার *Rabbi Ben Ezra* নামক কবিতাটি এই ভাবের প্রকাশক। অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখনও মনুষ্যের চরিত্রগৌরব অথবা নিগূঢ় মহত্ত্বের একমাত্র অনুমাপক নহে। তিনি বলেন—

> All I could never be,
> All, men ignored in me
> This, I was worth to God, whose wheel the pitcher shaped.

এই ভীষণ জীবনসংগ্রামের দিনে যখন পদে পদে নিরাশা আসিয়া আক্রমণ করে, যখন সিদ্ধি দূরগামী বলিয়া মনে হয়, যখন জীবনের স্তূপীকৃত বিফলতা হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিয়া জীবনকে নীরস ও উৎসাহহীন করিয়া ফেলে, তখন ব্যর্থমনোরথ সাধকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আশার বাণী, ইহা অপেক্ষা মধুরতর আশ্বাসের বর আর কি হইতে পারে? কত নিরুদ্যম হতাশ যুবকের ছায়াচ্ছন্ন হৃদয়ে এই সান্ত্বনাপ্রদ গভীর বাণীতে আশার আলোক উদ্ভাসিত হইবে, কত নিশ্চেষ্ট যাত্রী এই মন্ত্রের অনুপ্রাণনায় নববলে বলীয়ান্ ও নব আশায় উৎসাহিত হইয়া দুস্তর তরঙ্গসঙ্কুল সংসার-পারাবার উত্তীর্ণ হইতে প্রয়াস করিবে। এই রূপে দুঃখী ও নিরাশের জন্য সর্ব্বত্রই ভাববিভোর কবির সন্তপ্ত নেত্র হইতে অবিরলবাহী অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছে। তিনি ও কার্লাইল উভয়েই শিখাইয়াছেন জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাহিরে কর্ত্তব্য কর্ম্মের সংসাধন এবং হৃদয়ে উন্নত ভাবরাশির পরিপোষণ—সিদ্ধি অথবা সফলতা জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা" গীতার এই মহতী উক্তি উভয়েরই প্রচারিত সত্যের একমাত্র আদর্শ। বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির মানসিক অবস্থার পর্য্যালোচনা উপলক্ষে কার্লাইল লিখিয়াছেন—

> 'What is it, if you pierce through his Cants, his oft-repeated Hearsays, what he calls his Worship and so forth,—what is it that the modern English soul does, in very truth, dread infinitely, and contemplate with entire despair? What *is* his Hell, after all these reputable oft-repeated Hearsays, what is it? With hesitation, with astonishment, I pronounce it to be: *The Terror of not succeeding.*'*

কামনা অথবা সফলতার আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ মানবের মনে প্রবল থাকিবে ততক্ষণ সুখ তাহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে দুরধিগম্য। কারণ প্রাপ্তিতে সুখ নাই, সুখ চেষ্টা এবং সংগ্রামে; ভোগে সুখ নাই, সুখ ত্যাগে। প্রাপ্তি এবং ভোগে একটা অবসাদ আসে মাত্র, তাহা কখনই মনুষ্যের কাম্যবস্তু নহে। সুখ—মনের যে ভাবকে সাধারণতঃ সুখ নামে আখ্যাত করা হইয়া থাকে, তাহা—কখনই মানব-

* See his *Past and Present*, p. 125.

জীবনের উদ্দেশ্য নহে। বিখ্যাত লেখক R. L. Stevenson বলেন—

"Nor is happiness, eternal or temporal, the reward that mankind seeks. Happinesses are his wayside campings; his soul is in the journey; he was born for the struggle, and only tastes his life in effort and on the condition that he is opposed.*

কবিবর রবীন্দ্রনাথও প্রকারান্তরে তাহাই বলিয়াছেন—

অহিফেন-জড় সুখ, কে চায় ইহাকে?
মানবত্ব এ নয় এ নয়,
রাহুর মতন সুখ গ্রাস করে রাখে
মানবের মানবহৃদয়।
মানবেরে বল দেয় সহস্র বিপদ,
প্রাণ দেয় সহস্র ভাবনা,
দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।

ব্রাউনিংএর প্রতিকবিতায় আমাদের কবিবরের এই মহতী বাণী চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

পাপ সম্বন্ধেও কার্লাইল ও ব্রাউনিংএর শিক্ষা প্রায় তুল্যভাবাপন্ন এবং এই বিষয়ে উভয়েই নিউমানের ঘোরতর বিরোধী। নিউমান পাপের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন সমগ্র জগৎ প্রলয়প্লাবনে প্লাবিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহাও শ্রেষ্ঠ, নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় তাহাও স্বীকার্য্য, তথাপি যেন ভ্রমেও পাপের প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। তাঁহার চক্ষে পাপ সর্ব্বদা এবং সর্ব্বথাই ঘৃণিত—মোহন বেশে সজ্জিত থাকিলেও ঘৃণিত, পরিণামে শুভের নিদান হইলেও ঘৃণিত। যাহা বস্তুগত্যা অশুভ তাহা হইতে কখনই প্রকৃত শুভের উৎপত্তি হইতে পারে না, আর হইলেও তাহাতে অশুভের হেয়ত্ব তিরোহিত হয় না। নিউমানের এই শিক্ষা টেনিসন অকুতোভয়ে কিয়দংশে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ইন্দ্রজালিক লিপিশক্তির সহায়তায় জগৎসমক্ষে প্রচারিত করিয়াছেন। এই পাপের সংস্পর্শেই আর্থারের বীর সম্প্রদায়ের (Round Table) মহান্ উদ্দেশ্য বিফল হইল। মানবজাতি অথবা ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃত উন্নতি পাপের দ্বারা কখনই সংসাধিত হইতে পারে না—এই তত্ত্ব উজ্জ্বল বর্ণে তাঁহার 'Idylls of the King'এ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু নিউমানের এই মত তাঁহার সমসাময়িক সকল সুধীবৃন্দের নিকট সমাদৃত হয় নাই। কার্লাইল বজ্রগম্ভীরস্বরে ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ব্রাউনিং এবং হথর্ণ (Hawthorne) ইহার বিরুদ্ধমত মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কার্লাইল বলেন—

'ভুল, ভ্রান্তি অথবা পাপের অসদ্ভাব হইতে মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিবার চেষ্টা করিও না। এরূপ ক্ষুদ্র মানদণ্ড দ্বারা মনুষ্যত্বের নির্ণয় অসম্ভব। কাহার মধ্যে কোন্ কোন দোষের অভাব আছে তাহা হইতে নহে, কাহার মধ্যে কোন্ কোন্ গুণের সমাবেশ আছে তাহা হইতেই মানুষের আভ্যন্তরীণ মহত্ত্বের সহিত আমাদের পরিচয় সংঘটিত হয়।'

বলা বাহুল্য, ব্রাউনিংএর শিক্ষাও ঐরূপ। তিনি শিখাইয়াছেন মঙ্গলের বিকাশের জন্যই অমঙ্গলের উপযোগিতা, পাপ পরিণামে পুণ্যের সহায়তা করে। নতুবা মঙ্গলময় ভগবানের বিশ্বরচনায় অমঙ্গল অথবা পাপের আর কোন অর্থ নাই। ইহাকেই তিনি 'blessedness of evil' বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

This world's no blot for us,
Nor blank: it means intensely and means good.

ব্রাউনিংএর দার্শনিকতা ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার আলোচনা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে ধর্ম্মান্দোলন এবং ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সমালোচনা সমগ্র য়ুরোপ খণ্ডকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল তাহার প্রভাব ব্রাউনিং একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার কবিতার কোন কোন স্থলে সমসাময়িক বিবিধ আন্দোলনের স্পন্দন স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারা যায়। ইহাতে সন্দেহ এবং বিশ্বাস, জ্ঞান এবং ভক্তি প্রভৃতি অন্যোন্যবিরুদ্ধ ভাব সমূহের সমাবেশ আছে এবং পরিণামে প্রেম এবং বিশ্বাসের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত অনেকের নিকট একটু অভিনব বলিয়া মনে হইতে পারে, বর্ত্তমান ভাবুকগণের নিকট তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত সমভাবে গ্রাহ্য না হইতে পারে, কিন্তু অনাগত ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষাকে উচ্চাঙ্গের শিক্ষা বলিয়া সম্মান করিবে ইহাতে লেশমাত্রও

* See his letter to Edmund Gosse in "*Letters to his family and friends*", Vol. II, pp. 13 14.

সংশয় নাই। তাঁহার মানবচরিত্রাভিজ্ঞতা, মনোবিজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, নির্ভীক চিন্তাশীলতা এত অসাধারণ যে বিদেশে একমাত্র Balzac ও স্বদেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এ বিষয়ে আধুনিক যুগে তাঁহার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। জটিল মানবান্তঃকরণের ছায়ালোক ও সদসৎপ্রবৃত্তির ক্রীড়া এত সুকৌশলে, এরূপ নিপুণ তুলিকাস্পর্শে তিনি ব্যতীত আর কয় জনে দেখাইতে পারিয়াছে? তাঁহার কবিতা সমগ্রজীবনের বিভিন্ন অঙ্গের দর্পণস্বরূপ ইহাতে সৌন্দর্য্য-তটিনীর বিচিত্র তরঙ্গলীলা ভাবকৌমুদীর কোমলস্পর্শে কিরূপ বিলাসভঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কবির কল্পনা ও চিত্রকরের তুলিকা উভয়েরই উপভোগযোগ্য। কাব্যরস-পিপাসু পাঠকবর্গ উহা অনুভব করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ।

হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়*

আজকালকার দিনে পৃথিবী জুড়িয়া আনাগোনা মেলামেশা চলিতেছে। মানুষের নানা জাতি নানা উপলক্ষ্যে পরস্পরের পরিচয় লাভ করিতেছে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়া গিয়া পরস্পর মিলিয়া যাইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে একথা মনে করা যাইতে পারিত।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, বাহিরের দিকে দরজা যতই খুলিতেছে, প্রাচীর যতই ভাঙিতেছে, মানুষের জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ ততই যেন আরো প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এক সময় মনে হইত মিলিবার উপায় ছিল না বলিয়াই মানুষেরা পৃথক হইয়া আছে কিন্তু এখন মিলিবার বাধা সকল যথাসম্ভব দূর হইয়াও দেখা যাইতেছে পার্থক্য দূর হইতেছে না।

* চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষে রিপন কলেজ হলে, ২৯শে অক্টোবর তারিখে পঠিত।

য়ুরোপের যেসকল রাজ্যে খণ্ড খণ্ড জাতিরা একপ্রকার মিলিয়া ছিল এখন তাহারা প্রত্যেকেই আপন স্বতন্ত্র আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। নরোয়ে সুইডেনে ভাগ হইয়া গিয়াছে। আয়র্লণ্ড আপন স্বতন্ত্র অধিকার লাভের জন্য বহু দিন হইতে অশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। এমন কি, আপনার বিশেষ ভাষা, বিশেষ সাহিত্যকে আইরিষরা জাগাইয়া তুলিবার প্রস্তাব করিতেছে। ওয়েল্‌স্‌বাসীদের মধ্যেও সে চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বেল্‌জিয়মে এতদিন একমাত্র ফরাসী ভাষার প্রাধান্য প্রবল ছিল। আজ ফ্লেমিশরা নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে জয়ী করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে। অষ্ট্রীয়া রাজ্যে বহুবিধ ছোট ছোট জাতি একসঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে—তাহাদিগকে এক করিয়া মিলাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আজ স্পষ্টই দূরপরাহত হইয়াছে। রুষিয়া আজ ফিন্‌দিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য বিপুল বল প্রয়োগ করিতেছে বটে কিন্তু দেখিতেছে গেলা যত সহজ পরিপাক করা তত সহজ নহে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে নানা জাতি বাস করিতেছে বহু রক্তপাতেও তাহাদের ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে চাহিতেছে না।

ইংলণ্ডে হঠাৎ একটা ইম্পিরীয়ালিজমের ঢেউ উঠিয়াছিল। সমুদ্রপারের সমুদয় উপনিবেশগুলিকে এক সাম্রাজ্যতন্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিয়া একটা বিরাট কলেবর ধারণ করিবার প্রলোভন ইংলণ্ডের চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এবারে উপনিবেশগুলির কর্ত্তৃপক্ষেরা মিলিয়া ইংলণ্ডে যে এক মহাসমিতি বসিয়াছিল তাহাতে যতগুলি বন্ধনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার কোনোটাই টিঁকিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যকে এককেন্দ্রগত করিবার খাতিরে যেখানেই উপনিবেশগুলির স্বাতন্ত্র্য হানি হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা দেখা দিয়াছে সেইখানেই প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে।

একান্ত মিলনেই যে বল এবং বৃহৎ হইলেই যে মহৎ হওয়া যায় একথা এখনকার কথা নহে। আসল কথা, পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে, বড় দল বাঁধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না। চাপা-দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎক্ষেপক পদার্থ,

তাহা কোনো না কোনো সময়ে ধাক্কা পাইলে হঠাৎ ফাটিয়া এবং ফাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। যাহারা বস্তুতই পৃথক, তাহাদের পার্থক্যকে সম্মান করাই মিলন রক্ষার সদুপায়।

আপনার পার্থক্য যখন মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তখনি সে বড় হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। আপনার পার্থক্যের প্রতি যাহার কোনো মমতা নাই সেই হাল ছাড়িয়া দিয়া দশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। নিদ্রিত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না—জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে। বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ। বীজের মধ্যে বৈচিত্র্য নাই। কুঁড়ির মধ্যে সমস্ত পাপ্‌ড়ি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া এক হইয়া থাকে—যখন তাহাদের ভেদ ঘটে তখনি ফুল বিকশিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক পাপ্‌ড়ি ভিন্ন ভিন্ন মুখে আপন পথে আপনাকে যখন পূর্ণ করিয়া তোলে তখনি ফুল সার্থক হয়। আজ পরস্পরের সংঘাতে সমস্ত পৃথিবীতেই একটা জাগরণ সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া বিকাশের অনিবার্য্য নিয়মে মনুষ্য-সমাজের স্বাভাবিক পার্থক্যগুলি আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গিয়া যে বড় হওয়া তাহাকে কোনো জাগ্রৎসত্তা বড় হওয়া মনে করিতেই পারে না। যে ছোট সেও যখনি আপন সত্যকার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তখনি সেটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ করে—ইহাই প্রাণের ধর্ম্ম। বস্তুত সে ছোট হইয়াও বাঁচিতে চায়, বড় হইয়া মরিতে চায় না।

ফিন্‌রা যদি কোনো ক্রমে রুষ হইয়া যাইতে পারে তবে অনেক উৎপাত হইতে তাহারা পরিত্রাণ পায়—তবে একটি বড় জাতির সামিল হইয়া গিয়া ছোটত্বর সমস্ত দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যায়। কোনো একটা নেশনের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বিধা থাকিলেই তাহাতে বলক্ষয় করে এই আশঙ্কায় ফিন্‌ল্যাণ্ডকে রাশিয়ার সঙ্গে বলপূর্ব্বক অভিন্ন করিয়া দেওয়াই রুষের অভিপ্রায়। কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভিন্নতা যে একটা সত্যপদার্থ; রাশিয়ার সুবিধার কাছে সে আপনাকে বলি দিতে চায় না। এই ভিন্নতাকে যথোচিত উপায়ে বশ করিতে চেষ্টা করা চলে, এক করিতে চেষ্টা করা হত্যা করার মত অন্যায়। আয়র্লণ্ডকে লইয়াও ইংলণ্ডের সেই সঙ্কট। সেখানে সুবিধার সঙ্গে সত্যের লড়াই চলিতেছে। আজ পৃথিবীর নানা স্থানেই যে এই সমস্যা দেখা যাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ সমস্ত পৃথিবীতেই একটা প্রাণের বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে।

আমাদের বাংলা দেশের সমাজের মধ্যে সম্প্রতি যে ছোটখাট একটি বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহারও মূল কথাটি সেই একই। ইতিপূর্ব্বে এ দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই মোটা ভাগ ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল উপরে, আর সকলেই ছিল তলায় পড়িয়া।

কিন্তু যখনি নানা কারণে আমাদের দেশের মধ্যে একটা উদ্বোধন উপস্থিত হইল তখনি অব্রাহ্মণ জাতিরা শূদ্র শ্রেণীর একসমতল হীনতার মধ্যে একাকার হইয়া থাকিতে রাজি হইল না। কায়স্থ আপনার যে একটি বিশেষত্ব অনুভব করিতেছে তাহাতে সে আপনাকে শূদ্রত্বের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। তাহার হীনতা সত্য নহে। সুতরাং সামাজিক শ্রেণীবন্ধনের অতি প্রাচীন সুবিধাকে সে চিরকাল মানিবে কেমন করিয়া? ইহাতে দেশাচার যদি বিরুদ্ধ হয় তবে দেশাচারকে পরাভূত হইতেই হইবে। আমাদের দেশের সকল জাতির মধ্যেই এই বিপ্লব ব্যাপ্ত হইবে। কেন না, মূর্চ্ছাবস্থা ঘুচিলেই মানুষ সত্যকে অনুভব করে; সত্যকে অনুভব করিবামাত্র সে কোনো কৃত্রিম সুবিধার দাসত্ববন্ধন স্বীকার করিতে পারে না, বরঞ্চ সে অসুবিধা ও অশান্তিকেও বরণ করিয়া লইতে রাজি হয়।

ইহার ফল কি? ইহার ফল এই যে, স্বাতন্ত্র্যের গৌরব-বোধ জন্মিলেই মানুষ দুঃখ স্বীকার করিয়াও আপনাকে বড় করিয়া তুলিতে চাহিবে। বড় হইয়া উঠিলে তখনি পরস্পরের মিলন সত্যকার সামগ্রী হইবে। দীনতার মিলন, অধীনতার মিলন, এবং দায়ে পড়িয়া মিলন গোঁজামিলন মাত্র।

মনে আছে আমারই কোনো ব্যাকরণঘটিত প্রবন্ধ লইয়া একবার সাহিত্যপরিষৎ সভায় এমন একটি আলোচনা উঠিয়াছিল যে, বাংলা ভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃতের মত করিয়া তোলা উচিত—কারণ, তাহা হইলে গুজরাটি মারাঠা সকলেরই পক্ষে বাংলা ভাষা সুগম হইবে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে বাংলা ভাষার যে একটি নিজত্ব আছে অন্য দেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা বুঝিবার সেইটেই প্রধান বাধা। অথচ বাংলা ভাষার যাহা কিছু শক্তি যাহা কিছু সৌন্দর্য্য সমস্তই তাহার সেই নিজত্ব লইয়া। আজ ভারতের পশ্চিমতমপ্রান্তবাসী গুজরাটি বাংলা পড়িয়া বাংলা সাহিত্য নিজের ভাষায় অনুবাদ করিতেছে। ইহার কারণ এ নয় যে বাংলা ভাষাটা সংস্কৃতের কৃত্রিম ছাঁচে ঢালা সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জ্জিত সহজ ভাষা। সাঁওতাল যদি বাঙালী পাঠকের কাছে তাহার লেখা চলিত হইবে আশা করিয়া নিজের ভাষা হইতে সমস্ত সাঁওতালিত্ব বর্জ্জন করে তবেই কি তাহার সাহিত্য আমাদের কাছে আদর পাইবে? কেবল ঐ বাধাটুকু দূর করার পথ চাহিয়াই কি আমাদের মিলন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে?

অতএব, বাঙালী বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দিভাষীদের সঙ্গে তাহার বড় রকমের মিলন হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে অনেকদিন পূর্ব্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতিলাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কাম্‌ড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্যসাধনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা। অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে। সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই যে জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা, বিশেষত্ব বিসর্জ্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দু'দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনি প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনি নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উদ্রেক হইল তখনি আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজনসাধনের আগ্রহবশত সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুইপক্ষের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতদিন বাহিরের কোনো বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র থাকা আবশ্যক হয়,—সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগবাটোয়ারার বেলায় উভয় পক্ষেই ফাঁকি চলিতে থাকে।

মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশি হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশি হইবে কি না, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের এ কথা বলা অসঙ্গত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড় হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।

কিছুকাল পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এমন এক রকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম যে আমাদের মধ্যেকার ভিন্নতাটা চখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাবমাত্র, ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ ছিল বলিয়াই যে ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন ছিলাম তাহা নহে—আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনতায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপ চাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুসি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানী মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ, সেখানে কোনো প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন-সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান করা কষ্টকর;—মানুষ যখন আপনাকে বড় করে তখনি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যত দিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধ। ততদিন যদি সে আর কাহারো সঙ্গে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে—সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোট বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড় হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করাটাই শ্রেয়।

আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ মান শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।

বস্তুত বাহির হইতে যেটুকু পাওয়া যাইতে পারে, যাহা অন্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাওয়া যায় তাহার একটা সীমা আছেই। সে সীমা হিন্দু মুসলমানের কাছে প্রায় সমান। সেই সীমায় যতদিন পর্য্যন্ত না পৌঁছানো যায় ততদিন মনে একটা আশা থাকে বুঝি সীমা নাই, বুঝি এই পথেই পরমার্থ লাভ করা যায়। তখনই সেই পথের পাথেয় কার একটু বেশি জুটিয়াছে কার একটু কম তাই লইয়া পরস্পর ঘোরতর ঈর্ষা বিরোধ ঘটিতে থাকে।

কিন্তু খানিকটা দূরে গিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে নিজের গুণে ও শক্তিতেই আমরা নিজের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে পারি। যোগ্যতা লাভ ছাড়া অধিকার লাভের অন্য কোনো পথ নাই। এই কথাটা বুঝিবার সময় যত অবিলম্বে ঘটে ততই শ্রেয়। অতএব অন্যের আনুকূল্য-লাভের যদি কোনো স্বতন্ত্র সীধা রাস্তা মুসলমান আবিষ্কার করিয়া থাকে তবে সে পথে তাহাদের গতি অব্যাহত হউক্। সেখানে তাহাদের প্রাপ্যের ভাগ আমাদের চেয়ে পরিমাণে বেশি হইতেছে বলিয়া অহরহ কলহ করিবার ক্ষুদ্রতা যেন আমাদের না থাকে। পদ মানের রাস্তা মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সুগম হওয়াই উচিত—সে রাস্তার শেষ গম্যস্থানে পৌঁছিতে তাহাদের কোনো বিলম্ব না হয় ইহাই যেন আমরা প্রসন্ন মনে কামনা করি।

কিন্তু এই যে বাহ্য অবস্থার বৈষম্য ইহার 'পরে আমি বেশি ঝোঁক দিতে চাই না—ইহা ঘুচিয়া যাওয়া কিছুই শক্ত নহে। যে কথা লইয়া এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি তাহা সত্যকার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান।

আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।

এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে প্রথমে একটা ভয় হয়। মনে হয় স্বাতন্ত্র্যের যে যে অংশে আজ বিরুদ্ধতা দেখিতেছি সেইগুলাই প্রশ্রয় পাইয়া অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ঙ্কর উগ্র হইয়া উঠিবে।

একদা সেই আশঙ্কার কাল ছিল। তখন এক এক জাতি আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া চলিত। সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত।

এখন সেরূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা প্রত্যেক মানুষই সকল মানুষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড় কোণ কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেনা, যেখানে অসঙ্গতরূপে অবাধে একঝোঁকা রকম বাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ঘটিতে পারে।

এখনকার কালের যে দীক্ষা তাহাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল জাতিরই যোগ আছে। কেবল নিজের শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইবার আশা কেহ করিতে পারে না। অন্তত এই দিকেই মানুষের চেষ্টার গতি দেখা যাইতেছে। বিদ্যা এখন জ্ঞানের একটি বিশ্বযজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে—সে সমস্ত মানুষের চিত্ত-সম্মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

মানুষের এই বৃহৎ চেষ্টাই আজ মুসলমানের দ্বারে এবং হিন্দুর দ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা এতদিন পুরাপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইতেছিলাম। এ শিক্ষা যখন এদেশে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল তখন সকল প্রকার প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি তাহার অবজ্ঞা ছিল। আজ পর্য্যন্ত সেই অবজ্ঞার মধ্যে আমরাও বাড়িয়া উঠিয়াছি। তাহাতে মাতা সরস্বতীর ঘরে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বমহলের সন্তানেরা পশ্চিম মহলের দিকের জানলা বন্ধ করিয়াছে এবং পশ্চিম মহলের সন্তানেরা পুবে হাওয়াকে জঙ্গলের অস্বাস্থ্যকর হাওয়া জ্ঞান করিয়া তাহার একটু আভাসেই কান পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ক্রমশই সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রাচ্যবিদ্যার অনাদর দূর হইতেছে। মানবের জ্ঞানের বিকাশে তাহারও প্রয়োজন সামান্য নহে সে পরিচয় প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে।

অথচ, আমাদের বিদ্যাশিক্ষার বরাদ্দ সেই পূর্ব্বের মতই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আমাদেরই বিদ্যার উপযুক্ত স্থান নাই। হিন্দুমুসলমান-শাস্ত্রঅধ্যয়নে একজন জর্ম্মান ছাত্রের যে সুবিধা আছে আমাদের সে সুবিধা নাই। এরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষা লাভে আমাদের ক্ষতি করিতেছে সে বোধ যে আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনকারই কালের ধর্ম্ম-বশতঃ। আমরা যদি কেবল পশ্চিমের পড়া পাখী হইয়া শেখা বুলি আওড়াই তবে তাহাতে রাস্তার লোকের ক্ষণকালীন বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করিবে মাত্র, পৃথিবীর তাহাতে কোনো লাভ নাই। আমরা নিজের বাণীকে লাভ করিব, সমস্ত মানব আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা করিতেছে।

সেই প্রত্যাশা যদি পূর্ণ করিতে না পারি তবে মানুষের কাছে আমাদের কোনো সম্মান নাই। এই সম্মানলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার আহ্বান আসিতেছে। তাহারই আয়োজন করিবার উদ্যোগ আমাদিগকে করিতে হইবে।

অল্পদিন হইতে আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্ত্তনের যে চেষ্টা চলিতেছে সেই চেষ্টার মূলে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। চেষ্টা যে ভাল করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারিতেছেনা তাহারও মূল কারণ আমাদের এতকালের অসম্পূর্ণ শিক্ষা। আমরা যাহা ঠিকমত পাই নাই তাহা দিতে চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিতেছিনা।

আমাদের স্বজাতির এমন কোনো একটি বিশিষ্টতা আছে যাহা মূল্যবান, একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করেন এমন লোকও আছেন, তাঁহাদের কথা আমি একেবারেই ছাড়িয়া দিতেছি।

এই বিশিষ্টতাকে স্বীকার করেন অথচ ব্যবহারের বেলায় তাহাকে ন্যূনাধিক অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন এমন

লোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয় ত আহ্নিক তর্পণও করেন এবং শাস্ত্রালাপেও পটু কিন্তু জাতীয় আদর্শকে তাঁহারা অত্যন্ত আংশিকভাবে গ্রহণ করেন এবং মুখে যতটা করেন কাজে ততটা করেন না। ইঁহারা নিজেরা যে-বিদ্যালয়ে পড়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে ভরসা করেন না।

আর একদল আছেন তাঁহারা স্বজাতির বিশিষ্টতা লইয়া গৌরব করেন কিন্তু এই বিশিষ্টতাকে তাঁহারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। যাহা প্রচলিত তাহাকেই তাঁহারা বড় আসন দেন, যাহা চিরন্তন তাহাকে নহে। আমাদের দুর্গতির দিনে যে বিকৃতিগুলি অসঙ্গত হইয়া উঠিয়া সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ঘটাইয়াছে, খণ্ড খণ্ড করিয়া আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়াছে, এবং ইতিহাসে বারবার করিয়া কেবলি আমাদের মাথা হেঁট করিয়া দিতেছে, তাঁহারা তাহাদিগকেই আমাদের বিশেষত্ব বলিয়া তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার কাল্পনিক গুণের আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা কালের আবর্জ্জনাকেই স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় মনে করিয়া তাহাকেই যে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিবেন এবং দূষিত বাষ্পের আলেয়া-আলোককেই চন্দ্রসূর্য্যের চেয়ে সনাতন বলিয়া সম্মান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে ভয় করেন তাঁহাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে, যে শিক্ষার মধ্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল বিদ্যারই সমাবেশ হইতেছে সে শিক্ষা কখনই চিরদিন কোনো একান্ত আতিশয্যের দিকে প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। নিজের ঘরে বসিয়া ইচ্ছামত যিনি যতবড় খুসি নিজের আসন প্রস্তুত করিতে পারেন, কিন্তু পাঁচজনের সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলে স্বতই নিজের উপযুক্ত আসনটি স্থির হইয়া যায়। হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতেই বস্তুত স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে।

এপর্য্যন্ত আমরা পাশ্চাত্য শাস্ত্রসকলকে যে প্রকার বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও যুক্তিমূলক প্রণালীর দ্বারা বিচার করিয়া আসিতেছি নিজেদের শাস্ত্রগুলিকে সেরূপ করিতেছি না। যেন জগতে আর সর্ব্বত্রই অভিব্যক্তির নিয়ম কাজ করিয়া আসিয়াছে কেবল ভারতবর্ষেই সে প্রবেশ করিতে পারে নাই—এখানে সমস্তই অনাদি এবং ইতিহাসের অতীত। এখানে কোনো দেবতা ব্যাকরণ, কোনো দেবতা রসায়ন, কোনো দেবতা আয়ুর্ব্বেদ আস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন—কোনো দেবতার মুখ হস্ত পদ হইতে একেবারেই চারি বর্ণ বাহির হইয়া আসিয়াছে—সমস্তই ঋষি ও দেবতায় মিলিয়া এক মুহূর্ত্তেই খাড়া করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপরে আর কাহারো কোনো কথা চলিতেই পারে না। সেই জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অদ্ভুত অনৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনায় আমাদের লেখনীর লজ্জা বোধ হয় না—শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ইহার পরিচয় প্রতিদিনই পাওয়া যায়। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারেও বুদ্ধিবিচারের কোনো অধিকার নাই—কেন আমরা একটা কিছু করি বা করি না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাই অসঙ্গত। কেননা কার্য্যকারণের নিয়ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই খাটিবে না—সকল কারণ শাস্ত্রবচনের মধ্যে নিহিত। এইজন্য সমুদ্রযাত্রা ভাল কি মন্দ শাস্ত্র খুলিয়া তাহার নির্ণয় হইবে, এবং কোন্ ব্যক্তি ঘরে ঢুকিলে হুকার জল ফেলিতে হইবে পণ্ডিতমশায় তাহার বিধান দিবেন। কেন যে একজনের ছোঁয়া দুধ বা খেজুর রস বা গুড় খাইলে অপরাধ নাই, জল খাইলেই অপরাধ—কেন যে যবনের প্রস্তুত মদ খাইলে জাত যায় না, অন্ন খাইলেই জাত যায়, এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়াই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

শিক্ষিত সমাজেও যে এমন অদ্ভুত অসঙ্গত ব্যবহার চলিতেছে তাহার একটা কারণ আমার এই মনে হয়, পাশ্চাত্যশাস্ত্র আমরা বিদ্যালয়ে শিখিয়া থাকি এবং প্রাচ্য-শাস্ত্র আমরা ইস্কুলের কাপড় ছাড়িয়া অন্যত্র অন্য অবস্থার মধ্যে শিক্ষা করি। এইজন্য উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের

স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।

এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে প্রথমে একটা ভয় হয়। মনে হয় স্বাতন্ত্র্যের যে যে অংশে আজ বিরুদ্ধতা দেখিতেছি সেইগুলাই প্রশ্রয় পাইয়া অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ঙ্কর উগ্র হইয়া উঠিবে।

একদা সেই আশঙ্কার কাল ছিল। তখন এক এক জাতি আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া চলিত। সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত।

এখন সেরূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা প্রত্যেক মানুষই সকল মানুষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড় কোণ কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেনা, যেখানে অসঙ্গতরূপে অবাধে একঝোঁকা রকম বাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ঘটিতে পারে।

এখনকার কালের যে দীক্ষা তাহাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল জাতিরই যোগ আছে। কেবল নিজের শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইবার আশা কেহ করিতে পারে না। অন্তত এই দিকেই মানুষের চেষ্টার গতি দেখা যাইতেছে। বিদ্যা এখন জ্ঞানের একটি বিশ্বযজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে—সে সমস্ত মানুষের চিত্ত-সম্মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

মানুষের এই বৃহৎ চেষ্টাই আজ মুসলমানের দ্বারে এবং হিন্দুর দ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা এতদিন পূরাপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইতেছিলাম। এ শিক্ষা যখন এদেশে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল তখন সকল প্রকার প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি তাহার অবজ্ঞা ছিল। আজ পর্য্যন্ত সেই অবজ্ঞার মধ্যে আমরাও বাড়িয়া উঠিয়াছি। তাহাতে মাতা সরস্বতীর ঘরে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বমহলের সন্তানেরা পশ্চিম মহলের দিকের জানলা বন্ধ করিয়াছে এবং পশ্চিম মহলের সন্তানেরা পূবে হাওয়াকে জঙ্গলের অস্বাস্থ্যকর হাওয়া জ্ঞান করিয়া তাহার একটু আভাসেই কান পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ক্রমশই সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রাচ্যবিদ্যার অনাদর দূর হইতেছে। মানবের জ্ঞানের বিকাশে তাহারও প্রয়োজন সামান্য নহে সে পরিচয় প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে।

অথচ, আমাদের বিদ্যাশিক্ষার বরাদ্দ সেই পূর্ব্বের মতই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আমাদেরই বিদ্যার উপযুক্ত স্থান নাই। হিন্দুমুসলমান-শাস্ত্রঅধ্যয়নে একজন জর্ম্মান ছাত্রের যে সুবিধা আছে আমাদের সে সুবিধা নাই। এরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষা লাভে আমাদের ক্ষতি করিতেছে সে বোধ যে আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনকারই কালের ধর্ম্ম-বশতঃ। আমরা যদি কেবল পশ্চিমের পড়া পাখী হইয়া শেখা বুলি আওড়াই তবে তাহাতে রাস্তার লোকের ক্ষণকালীন বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করিবে মাত্র, পৃথিবীর তাহাতে কোনো লাভ নাই। আমরা নিজের বাণীকে লাভ করিব, সমস্ত মানব আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা করিতেছে।

সেই প্রত্যাশা যদি পূর্ণ করিতে না পারি তবে মানুষের কাছে আমাদের কোনো সম্মান নাই। এই সম্মানলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার আহ্বান আসিতেছে। তাহারই আয়োজন করিবার উদ্যোগ আমাদিগকে করিতে হইবে।

অল্পদিন হইতে আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্ত্তনের যে চেষ্টা চলিতেছে সেই চেষ্টার মূলে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। চেষ্টা যে ভাল করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারিতেছেনা তাহারও মূল কারণ আমাদের এতকালের অসম্পূর্ণ শিক্ষা। আমরা যাহা ঠিকমত পাই নাই তাহা দিতে চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিতেছিনা।

আমাদের স্বজাতির এমন কোনো একটি বিশিষ্টতা আছে যাহা মূল্যবান, একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করেন এমন লোকও আছেন, তাঁহাদের কথা আমি একেবারেই ছাড়িয়া দিতেছি।

এই বিশিষ্টতাকে স্বীকার করেন অথচ ব্যবহারের বেলায় তাহাকে ন্যূনাধিক অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন এমন

লোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয় ত আহ্নিক তর্পণও করেন এবং শাস্ত্রালাপেও পটু কিন্তু জাতীয় আদর্শকে তাঁহারা অত্যন্ত আংশিকভাবে গ্রহণ করেন এবং মুখে যতটা করেন কাজে ততটা করেন না। ইঁহারা নিজেরা যে-বিদ্যালয়ে পড়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে ভরসা করেন না।

আর একদল আছেন তাঁহারা স্বজাতির বিশিষ্টতা লইয়া গৌরব করেন কিন্তু এই বিশিষ্টতাকে তাঁহারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। যাহা প্রচলিত তাহাকেই তাঁহারা বড় আসন দেন, যাহা চিরন্তন তাহাকে নহে। আমাদের দুর্গতির দিনে যে বিকৃতিগুলি অসঙ্গত হইয়া উঠিয়া সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ঘটাইয়াছে, খণ্ড খণ্ড করিয়া আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়াছে, এবং ইতিহাসে বারবার করিয়া কেবলি আমাদের মাথা হেঁট করিয়া দিতেছে, তাঁহারা তাহাদিগকেই আমাদের বিশেষত্ব বলিয়া তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার কাল্পনিক গুণের আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা কালের আবর্জ্জনাকেই স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় মনে করিয়া তাহাকেই যে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিবেন এবং দূষিত বাষ্পের আলেয়া-আলোককেই চন্দ্রসূর্য্যের চেয়ে সনাতন বলিয়া সম্মান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে ভয় করেন তাঁহাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে, যে শিক্ষার মধ্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল বিদ্যারই সমাবেশ হইতেছে সে শিক্ষা কখনই চিরদিন কোনো একান্ত আতিশয্যের দিকে প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। নিজের ঘরে বসিয়া ইচ্ছামত যিনি যতবড় খুসি নিজের আসন প্রস্তুত করিতে পারেন, কিন্তু পাঁচজনের সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলে স্বতই নিজের উপযুক্ত আসনটি স্থির হইয়া যায়। হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতেই বস্তুত স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে।

এপর্য্যন্ত আমরা পাশ্চাত্য শাস্ত্রসকলকে যে প্রকার বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও যুক্তিমূলক প্রণালীর দ্বারা বিচার করিয়া আসিতেছি নিজেদের শাস্ত্রগুলিকে সেরূপ করিতেছি না। যেন জগতে আর সর্ব্বত্রই অভিব্যক্তির নিয়ম কাজ করিয়া আসিয়াছে কেবল ভারতবর্ষেই সে প্রবেশ করিতে পারে নাই—এখানে সমস্তই অনাদি এবং ইতিহাসের অতীত। এখানে কোনো দেবতা ব্যাকরণ, কোনো দেবতা রসায়ন, কোনো দেবতা আয়ুর্ব্বেদ আস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন—কোনো দেবতার মুখ হস্ত পদ হইতে একেবারেই চারি বর্ণ বাহির হইয়া আসিয়াছে—সমস্তই ঋষি ও দেবতায় মিলিয়া এক মুহূর্ত্তেই খাড়া করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপরে আর কাহারো কোনো কথা চলিতেই পারে না। সেই জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অদ্ভুত অনৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনায় আমাদের লেখনীর লজ্জা বোধ হয় না—শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ইহার পরিচয় প্রতিদিনই পাওয়া যায়। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারেও বুদ্ধিবিচারের কোনো অধিকার নাই—কেন আমরা একটা কিছু করি বা করি না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাই অসঙ্গত। কেননা কার্য্যকারণের নিয়ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই খাটিবে না—সকল কারণ শাস্ত্রবচনের মধ্যে নিহিত। এইজন্য সমুদ্রযাত্রা ভাল কি মন্দ শাস্ত্র খুলিয়া তাহার নির্ণয় হইবে, এবং কোন্ ব্যক্তি ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে পণ্ডিতমশায় তাহার বিধান দিবেন। কেন যে একজনের ছোঁয়া দুধ বা খেজুর রস বা গুড় খাইলে অপরাধ নাই, জল খাইলেই অপরাধ—কেন যে যবনের প্রস্তুত মদ খাইলে জাত যায় না, অন্ন খাইলেই জাত যায়, এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়াই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

শিক্ষিত সমাজেও যে এমন অদ্ভুত অসঙ্গত ব্যবহার চলিতেছে তাহার একটা কারণ আমার এই মনে হয়, পাশ্চাত্যশাস্ত্র আমরা বিদ্যালয়ে শিখিয়া থাকি এবং প্রাচ্য-শাস্ত্র আমরা ইস্কুলের কাপড় ছাড়িয়া অন্যত্র অন্য অবস্থার মধ্যে শিক্ষা করি। এইজন্য উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের

মনের ভাবের একটা ভেদ ঘটিয়া যায়—অনায়াসেই মনে করিতে পারি বুদ্ধির নিয়ম কেবল এক জায়গায় খাটে—অন্য জায়গায় বড় জোর কেবল ব্যাকরণের নিয়মই খাটিতে পারে। উভয়কেই এক বিদ্যামন্দিরে এক শিক্ষার অঙ্গ করিয়া দেখিলে আমাদের এই মোহ কাটিয়া যাইবার উপায় হইবে।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজেই এই ভাবটা বাড়িয়া উঠিতেছে কেন, এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়। শিক্ষা পাইলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মে বলিয়াই যে এমনটা ঘটে তাহা আমি মনে করি না। আমি পূর্ব্বেই ইহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের স্বাতন্ত্র্য-অভিমানটা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই অভিমানের প্রথম জোয়ারে বড় একটা বিচার থাকে না, কেবল জোরই থাকে। বিশেষতঃ এতদিন আমরা আমাদের যাহা কিছু সমস্তকেই নির্ব্বিচারে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি—আজ তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় আমরা মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভাণ করি, কিন্তু তাহা নির্ব্বিচারেরও বাড়া।

এই তীব্র অভিমানের আবিলতা কখনই চিরদিন টিকিতে পারে না—কেবলি এই প্রতিক্রিয়ার ঘাত প্রতিঘাত শান্ত হইয়া আসিবেই—তখন ঘর হইতে এবং বাহির হইতে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

হিন্দুসমাজের পূর্ণ বিকাশের মূর্ত্তি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার নহে। সুতরাং হিন্দু কি করিয়াছে ও কি করিতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দুর্ব্বল ও অস্পষ্ট। এখন আমরা যেটাকে চোখে দেখিতেছি সেইটেই আমাদের কাছে প্রবল। তাহা যে নানারূপে হিন্দুর যথার্থ প্রকৃতি ও শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতেছে একথা মনে করা আমাদের পক্ষে কঠিন। পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায় আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মূর্ত্তিটা সেই রকম। সে কেবলি যেন স্নান করিতেছে, জপ করিতেছে, এবং ব্রত উপবাসে কৃশ হইয়া জগতের সমস্ত কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দুসভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্‌বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে; তখন তাহার শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, তাহার কর্ম্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল; তখন তাহার ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান, সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের স্থান ছিল; তখন তাহার স্ত্রীসমাজেও বীরত্ব, বিদ্যা ও তপস্যা ছিল; তখন তাহার আচার ব্যবহার যে চিরকালের মত লোহার ছাঁচে ঢালাই করা ছিল না মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৃহৎ বিচিত্র, জীবনের-বেগে-চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দুসমাজ—যে সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল; পরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়া সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল; যাহা শ্লোকসংহিতার জটিল রজ্জুতে বাঁধা কলের পুত্তলীর মত একই নির্জ্জীব নাট্য প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিতেছিল না;—বৌদ্ধ যে সমাজের অঙ্গ, জৈন যে সমাজের অংশ; মুসলমান ও খৃষ্টানেরা যে সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিত; যে সমাজের এক মহাপুরুষ একদা অনার্য্যদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক মহাপুরুষ কর্ম্মের আদর্শকে বৈদিক যাগযজ্ঞের সঙ্কীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া উদার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে মুক্তিদান করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মকে বাহ্য অনুষ্ঠানের বিধি নিষেধের মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া তাহাকে ভক্তি ও জ্ঞানের প্রশস্ত পথে সর্ব্বলোকের সুগম করিয়া দিয়াছিলেন; সেই সমাজকে আজ আমরা হিন্দু-সমাজ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাই না;—যাহা চলিতেছে না তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ বলি;—প্রাণের ধর্ম্মকে আমরা হিন্দুসমাজের ধর্ম্ম বলিয়া মানিই না, কারণ, প্রাণের ধর্ম্ম বিকাশের ধর্ম্ম, পরিবর্ত্তনের ধর্ম্ম, তাহা নিয়ত গ্রহণ বর্জ্জনের ধর্ম্ম।

এই জন্যই মনে আশঙ্কা হয় যাঁহারা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগী, তাঁহারা কিরূপ হিন্দুত্বের ধারণা লইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত? কিন্তু সেই আশঙ্কা মাত্রেই নিরস্ত হওয়াকে আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না। কারণ, হিন্দুত্বের ধারণাকে ত আমরা নষ্ট করিতে চাই না, হিন্দুত্বের ধারণাকে আমরা বড় করিয়া তুলিতে চাই। তাহাকে

চালনা করিতে দিলে আপনি সে বড় হইবার দিকে যাইবেই —তাহাকে গর্ত্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলেই তাহার ক্ষুদ্রতা ও বিকৃতি অনিবার্য্য। বিশ্ববিদ্যালয় সে চালনার ক্ষেত্র— কারণ সেখানে বুদ্ধিরই ক্রিয়া, সেখানে চিত্তকে সচেতন করারই আয়োজন। সেই চেতনার স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলে আপনিই তাহা ধীরে ধীরে জড় সংস্কারের সঙ্কীর্ণতাকে ক্ষয় করিয়া আপনাকে প্রশস্ত করিয়া তুলিবেই। মানুষের মনের উপর আমি পূরা বিশ্বাস রাখি;—ভুল লইয়াও যদি আরম্ভ করিতে হয় সেও ভাল, কিন্তু আরম্ভ করিতেই হইবে, নতুবা ভুল কাটিবে না। সে ছাড়া পাইলে চলিবেই। এই জন্য যে সমাজ অচলতাকেই পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করে সে সমাজ অচেতনতাকেই আপনার সহায় জানে এবং সর্ব্বাগ্রে মানুষের মন জিনিষকেই অহিফেন খাওয়াইয়া বিহ্বল করিয়া রাখে। সে এমন সকল ব্যবস্থা করে যাহাতে মন কোথাও বাহির হইতে পায় না, বাধা নিয়মে একেবারে বদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ করিতে ভয় করে, চিন্তা করিতেই ভুলিয়া যায়। কিন্তু কোনো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যেমনই হোক্ সে মনকে ত বাঁধিয়া ফেলিতে পারিবে না, কারণ, মনকে চলিতে দেওয়াই তাহার কাজ। অতএব যদি হিন্দু সত্যই মনে করে শাস্ত্রশ্লোকের দ্বারা চিরকালের মত দৃঢ়বদ্ধ জড়নিশ্চলতাই হিন্দুর প্রকৃত বিশেষত্ব—তবে সেই বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বতোভাবে দূরে পরিহার করাই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে। বিচারহীন আচারকে মানুষ করিবার ভার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেওয়া হয় তবে ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করা হইবে।

কিন্তু যাঁহারা সত্যই বিশ্বাস করেন, হিন্দুত্বের মধ্যে কোনো গতিবিধি নাই—তাহা স্থাবর পদার্থ—বর্ত্তমানকালের প্রবল আঘাতে পাছে সে লেশমাত্র বিচলিত হয়, পাছে তাহার স্থাবরধর্ম্মের তিলমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় এই জন্য তাহাকে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়া রাখাই হিন্দুসন্তানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—তাঁহারা মানুষের চিত্তকে প্রাচীর ঘেরিয়া বন্দী-শালায় পরিণত করিবার প্রস্তাব না করিয়া বিশ্ববিদ্যার হাওয়া বহিবার জন্য তাহার চারিদিকে বড় বড় দরজা ফুটাই-বার উদ্যোগ যে করিতেছেন ইহা ভ্রমক্রমে অবিবেচনাবশতই করিতেছেন, তাহা সত্য নহে। আসল কথা, মানুষ মুখে যাহা বলে তাহাই যে তাহার সত্য বিশ্বাস তাহা সকল সময়ে ঠিক নহে। তাহার অন্তরতম সহজবোধের মধ্যে অনেক সময় এই বাহ্যবিশ্বাসের একটা প্রতিবাদ বাস করে। বিশেষতঃ যে সময়ে দেশে প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে নূতন উপলব্ধির দ্বন্দ্ব চলিতেছে সেই ঋতুপরিবর্ত্তনের সন্ধিকালে আমরা মুখে যাহা বলি সেটাকেই আমাদের অন্তরের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। ফাল্গুন মাসে মাঝে মাঝে বসন্তের চেহারা বদল হইয়া গিয়া হঠাৎ উত্তরে হাওয়া বহিতে থাকে, তখন পৌষ মাস ফিরিয়া আসিল বলিয়া ভ্রম হয়, তবু একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে উত্তরে হাওয়া ফাল্গুনের অন্তরের হাওয়া নহে। আমের যে বোল ধরিয়াছে, নব কিশলয়ে যে চিক্কণ তরুণতা দেখিতেছি, তাহাতেই ভিতরকার সত্য সংবাদটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদেরও দেশের মধ্যে প্রাণের হাওয়াই বহিয়াছে—এই হাওয়া বহিয়াছে বলিয়াই আমাদের জড়তা ভাঙিয়াছে এবং গলা ছাড়িয়া বলিতেছি যাহা আছে তাহাকে রাখিয়া দিব। এ কথা ভুলিতেছি যাহা যেখানে যেমন আছে তাহাকে সেখানে তেমনি করিয়া ফেলিয়া রাখিতে যদি চাই তবে কোন চেষ্টা না করাই তাহার পন্থা। ক্ষেতের মধ্যে আগাছাকে প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য কেহ চাষ করিয়া মই চালাইবার কথা বলে না। চেষ্টা করিতে গেলেই সেই নাড়াচাড়াতেই ক্ষয়ের কার্য্য পরিবর্ত্তনের কার্য্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবেই। নিজের মধ্যে যে সঞ্জীবনী শক্তি অনুভব করিতেছি, মনে করিতেছি সেই সঞ্জীবনীশক্তি প্রয়োগ করিয়াই মৃতকে রক্ষা করিব। কিন্তু জীবনীশক্তির ধর্ম্মই এই তাহা মৃতকে প্রবলবেগে মারিতে থাকে এবং যেখানে জীবনের কোনো আভাস আছে সেইখানেই আপনাকে প্রয়োগ করে। কোনো জিনিষকে স্থির করিয়া রাখা তাহার কাজ নহে—যে জিনিষ বাড়িতে পারে তাহাকে সে বাড়াইয়া তুলিবে, আর যাহার বাড় ফুরাইয়াছে তাহাকে সে ধ্বংস করিয়া অপসারিত করিয়া দিবে। কিছুকেই সে স্থির রাখিবে না। তাই বলিতেছিলাম আমাদের মধ্যে জীবনী-শক্তির আবির্ভাব হইয়া আমাদিগকে নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত করিতেছে—এই কথাই এখনকার দিনের সকলের চেয়ে বড়

সত্য—তাহা মৃত্যুকে চিরস্থায়ী করিবার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাই বড় কথা নহে—ইহা তাহার একটা ক্ষণিক লীলা মাত্র।

শ্রীযুক্ত গোখলের প্রাথমিক শিক্ষার অবশ্যপ্রবর্ত্তনের বিল সম্বন্ধে কোনো কোনো শিক্ষিত লোক এমন কথা বলিতেছেন যে আধুনিক শিক্ষায় আমাদের ত মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে আবার দেশের জনসাধারণেরও কি বিপদ ঘটাইব? যাঁহারা এই কথা বলিতেছেন তাঁহারা নিজের ছেলেকে আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না। এরূপ অদ্ভুত আত্মবিরোধ কেন দেখিতেছি? ইহা যে কপটাচার তাহা নহে। ইহা আর কিছু নয়,—অন্তরে নব বিশ্বাসের বসন্ত আসিয়াছে, মুখে পুরাতন সংস্কারের হাওয়া মরে নাই। সেই জন্য, আমরা যাহা করিবার তাহা করিতে বসিয়াছি অথচ বলিতেছি আর এক কালের কথা। আধুনিক শিক্ষায় যে চঞ্চলতা আনিয়াছে সেই চঞ্চলতা সত্ত্বেও তাহার মঙ্গলকে আমরা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছি। তাহাতে যে বিপদ আছে সেই বিপদকেও আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। নিরাপদ মৃত্যুকে আর আমরা বরণ করিতে রাজি নই, সেইজন্য জীবনের সমস্ত দায় সমস্ত পীড়াকেও মাথায় করিয়া লইবার জন্য আজ আমরা বীরের মত প্রস্তুত হইতেছি। জানি উলটপালট হইবে, জানি বিস্তর ভুল করিব, জানি কোনো পুরাতন ব্যবস্থাকে নাড়া দিতে গেলেই প্রথমে দীর্ঘকাল বিশৃঙ্খলতার নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে—চিরসঞ্চিত ধূলার হাত হইতে ঘরকে মুক্ত করিবার জন্য ঝাঁট দিতে গেলে প্রথমটা সেই ধূলাই খুব প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে হইবে—এই সমস্ত অসুবিধা ও দুঃখ বিপদের আশঙ্কা নিশ্চয় জানি তথাপি আমাদের অন্তরের ভিতরকার নূতন প্রাণের আবেগ আমাদিগকে ত স্থির থাকিতে দিতেছে না। আমরা বাঁচিব, আমরা অচল হইয়া পড়িয়া থাকিব না,—এই ভিতরের কথাটাই আমাদের মুখের সমস্ত কথাকে বারম্বার সবেগে ছাপাইয়া উঠিতেছে।

জাগরণের প্রথম মুহূর্ত্তে আমরা আপনাকে অনুভব করি, পরক্ষণেই চারিদিকের সমস্তকে অনুভব করিতে থাকি। আমাদের জাতীয় উদ্বোধনের প্রথম আরম্ভেই আমরা যদি নিজেদের পার্থক্যকেই প্রবলভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তবে ভয়ের কারণ নাই—সেই জাগরণই চারিদিকের বৃহৎ উপলব্ধিকেও উন্মেষিত করিয়া তুলিবে। আমরা নিজেকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিব।

আজ সমস্ত পৃথিবীতেই একদিকে যেমন দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কোনো মতেই অন্য জাতির সঙ্গে বিলীন হইতে চাহিতেছে না, তেমনি দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে আপনার যোগ অনুভব করিতেছে। সেই অনুভূতির বলে সকল জাতিই আজ নিজেদের সেই সকল বিকট বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিতেছে—যাহা অসঙ্গত অদ্ভুতরূপে তাহার একান্ত নিজের—যাহা সমস্ত মানুষের বুদ্ধিকে রুচিকে ধর্ম্মকে আঘাত করে—যাহা কারাগারের প্রাচীরের মত, বিশ্বের দিকে যাহার বাহির হইবার বা প্রবেশ করিবার কোনো প্রকার পথই নাই। আজ প্রত্যেক জাতিই তাহার নিজের সমস্ত সম্পদকে বিশ্বের বাজারে যাচাই করিবার জন্য আনিতেছে। তাহার নিজত্বকে কেবল তাহার নিজের কাছে চোখ বুজিয়া বড় করিয়া তুলিয়া তাহার কোনো তৃপ্তি নাই, তাহার নিজত্বকে কেবল নিজের ঘরে ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করিয়া তাহার কোনো গৌরব নাই—তাহার নিজত্বকে সমস্ত জগতের অলঙ্কার করিয়া তুলিবে তাহার অন্তরের মধ্যে এই প্রেরণা আসিয়াছে। আজ যে দিন আসিয়াছে আজ আমরা কেহই গ্রাম্যতাকেই জাতীয়তা বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিব না। আমাদের যেসকল আচার ব্যবহার সংস্কার আমাদিগকে ক্ষুদ্র করিয়া পৃথক করিয়াছে, যেসকল সংস্কার থাকাতে কেবলি আমাদের সকলদিকে বাধাই বাড়িয়া উঠিয়াছে, ভ্রমণে বাধা, গ্রহণে বাধা, দানে বাধা, চিন্তায় বাধা, কর্ম্মে বাধা,—সেই সমস্ত কৃত্রিম বিঘ্ন ব্যাঘাতকে দূর করিতেই হইবে—নহিলে মানবের রাজধানীতে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। একথা আমরা মুখে স্বীকার করি আর না করি, অন্তরের মধ্যে ইহা আমরা বুঝিয়াছি। আমাদের সেই জিনিষকেই আমরা নানা উপায়ে খুঁজিতেছি যাহা বিশ্বের আদরের ধন যাহা কেবলমাত্র ঘরগড়া আচার অনুষ্ঠান নহে। সেইটেকেই লাভ করিলেই আমরা

যথার্থভাবে রক্ষা পাইব—কারণ, তখন সমস্ত জগৎ নিজের গরজে আমাদিগকে রক্ষা করিবে। এই ইচ্ছা আমাদের অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা আর কোণে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ আমরা যেসকল প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতেছি তাহার মধ্যে একই কালে আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিশ্ববোধ দুই প্রকাশ পাইতেছে। নতুবা আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনাও আমাদের কাছে নিতান্ত অদ্ভুত বোধ হইত। এখনো একদল লোক আছেন যাঁহাদের কাছে ইহার অসঙ্গতি পীড়াজনক বলিয়া ঠেকে। তাঁহারা এই মনে করিয়া গৌরব বোধ করেন যে হিন্দু এবং বিশ্বের মধ্যে বিরোধ আছে—তাই হিন্দু নানাপ্রকারে আটঘাট বাঁধিয়া অহোরাত্র বিশ্বের সংস্রব ঠেকাইয়া রাখিতেই চায়; অতএব হিন্দু টোল হইতে পারে, হিন্দু চতুষ্পাঠী হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই পারে না—তাহা সোনার পাথরবাটি। কিন্তু এই দল যে কেবল কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে, ইঁহাদেরও নিজেদের ঘরের আচরণ দেখিলে বোঝা যায় ইঁহারা যেকথাকে বিশ্বাস করিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, গভীরভাবে, এমন কি, নিজের অগোচরে তাহাকে বিশ্বাস করেন না।

যেমন করিয়াই হউক আমাদের দেশের মর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমরা চিরকাল মন্দিরের অন্ধকার কোণে বসাইয়া রাখিতে পারিব না। আজ রথযাত্রার দিন আসিয়াছে—বিশ্বের রাজপথে, মানুষের সুখদুঃখ ও আদানপ্রদানের পণ্যবীথিকায় তিনি বাহির হইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার রথ নিজেদের সাধ্য অনুসারে যে যেমন করিয়াই তৈরি করি না—কেহবা বেশি মূল্যের উপাদান দিয়া, কেহ বা অল্প মূল্যের—কাহারো বা রথ চলিতে চলিতে পথের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়ে, কাহারো বা বৎসরের পর বৎসর টিঁকিয়া থাকে—কিন্তু আসল কথাটা এই যে শুভলগ্নে রথের সময় আসিয়াছে। কোন্ রথ কোন্ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে তাহা আগে থাকিতে হিসাব করিয়া বলিতে পারি না—কিন্তু আমাদের বড়দিন আসিয়াছে—আমাদের সকলের চেয়ে যাহা মূল্যবান পদার্থ তাহা আজ আর কেবলমাত্র পুরোহিতের বিধি নিষেধের আড়ালে ধূপদীপের ঘনঘোর বাষ্পের মধ্যে গোপন থাকিবে না—আজ বিশ্বের আলোকে আমাদের যিনি বরেণ্য তিনি বিশ্বের বরেণ্য রূপে সকলের কাছে গোচর হইবেন। তাহারি একটি রথনির্ম্মাণের কথা আজ আলোচনা করিয়াছি; ইহার পরিণাম কি তাহা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু ইহার মধ্যে সকলের চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, এই রথ বিশ্বের পথে চলিয়াছে, প্রকাশের পথে বাহির হইয়াছে,—সেই আনন্দের আবেগেই আমরা সকলে মিলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া ইহার দড়ি ধরিতে ছুটিয়াছি।

কিন্তু আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি যাহারা কাজের লোক তাঁহারা এই সমস্ত ভাবের কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নাম ধরিয়া যে জিনিষটা তৈরি হইয়া উঠিতেছে কাজের দিক দিয়া তাহাকে বিচার করিয়া দেখ। হিন্দু নাম দিলেই হিন্দুত্বের গৌরব হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয় নামেই চারিদিকে বিশ্ববিদ্যার ফোয়ারা খুলিয়া যায় না। বিদ্যার দৌড় এখনো আমাদের যতটা আছে তখনো তাহার চেয়ে যে বেশি দূর হইবে এপর্য্যন্ত তাহার ত কোনো প্রমাণ দেখি না; তাহার পরে কমিটি ও নিয়মাবলীর শান-বাঁধানো মেজের কোন্ ছিদ্র দিয়া যে হিন্দুর হিন্দুত্ব-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহাও অনুমান করা কঠিন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কুম্ভকার মূর্ত্তি গড়িবার আরম্ভে কাদা লইয়া যে তালটা পাকায় সেটাকে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলে চলিবে না। একেবারেই একমুহূর্ত্তেই আমাদের মনের মত কিছুই হইবে না। এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখা দরকার যে, মনের মত কিছু যে হয় না, তাহার প্রধান দোষ মনেরই, উপকরণের নহে। যে অক্ষম সে মনে করে সুযোগ পায় না বলিয়াই সে অক্ষম। কিন্তু বাহিরের সুযোগ যখন জোটে তখন সে দেখিতে পায় পূর্ণ শক্তিতে ইচ্ছা করিতে পারে না বলিয়াই সে অক্ষম। যাহার ইচ্ছার জোর আছে সে অল্প একটু সূত্র পাইলেই নিজের ইচ্ছাকে সার্থক করিয়া তোলে। আমাদের হতভাগ্য দেশেই আমরা প্রতিদিন এই কথা শুনিতে পাই, এই জায়গাটাতে আমার মতের সঙ্গে মিলিল না অতএব আমি ইহাকে

ত্যাগ করিব—এই খানটাতে আমার মনের মত হয় নাই অতএব আমি ইহার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিব না। বিধাতার আদুরে ছেলে হইয়া, আমরা একেবারেই ষোলো আনা সুবিধা এবং রেখায় রেখায় মনের মিল দাবী করিয়া থাকি—তাহার কিছু ব্যত্যয় হইলেই অভিমানের অন্ত থাকে না। ইচ্ছাশক্তি যাহার দুর্ব্বল ও সংকল্প যাহার অপরিস্ফুট তাহারি দুর্দ্দশা। যখন যেটুকু সুযোগ পাই তাহাকেই ইচ্ছার জোরে সম্পূর্ণ করিব, নিজের মন দিয়া মনের মত করিয়া তুলিব—একদিনে না হয় বহুদিনে, একলা না হয় দল বাঁধিয়া, জীবনে না হয় জীবনের অন্তে—এই কথা বলিবার জোর নাই বলিয়াই আমরা সকল উদ্যোগের আরম্ভেই কেবল খুঁৎ খুঁৎ করিতে বসিয়া যাই, নিজের অন্তরের দুর্ব্বলতার পাপকে বাহিরের ঘাড়ে চাপাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ভারি একটা শ্রেষ্ঠতার বড়াই করিয়া থাকি। যে টুকু পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট, বাকি সমস্তই আমার নিজের হাতে, ইহাই পুরুষের কথা। যদি ইহাই নিশ্চয় জানি যে আমার মতই সত্য মত তবে সেই মত গোড়াতেই গ্রাহ্য হয় নাই বলিয়া তখনি গোসা-ঘরে গিয়া দ্বার রোধ করিয়া বসিব না—সেই মতকে জয়ী করিয়া তুলিবই বলিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। এ কথা নিশ্চয় সত্য, কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই আমরা পরমার্থ লাভ করিব না—কেননা কলে মানুষ তৈরি হয় না। আমাদের মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবেই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমাদের মনোরথ সিদ্ধি হইবে। হিন্দুর হিন্দুত্বকে যদি আমরা স্পষ্ট করিয়া না বুঝি তবে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় হইলেই বুঝিব তাহা নহে—যদি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝি তবে বাহিরে তাহার প্রতিকূলতা যত প্রবলই থাক সমস্ত ভেদ করিয়া আমাদের সেই উপলব্ধি আমাদের কাজের মধ্যে আকার ধারণ করিবেই। এই জন্যই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কি ভাবে আরম্ভ হইতেছে, কিরূপে দেহ ধারণ করিতেছে, সে সম্বন্ধে মনে কোনো প্রকার সংশয় রাখিতে চাহি না। সংশয় যদি থাকে তবে সে যেন নিজের সম্বন্ধেই থাকে; সাবধান যদি হইতে হয় তবে নিজের অন্তরের দিকেই হইতে হইবে। কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই। কেননা আলাদিনের প্রদীপ পাইয়াছি বলিয়া আমি উল্লাস করিতেছি না, রাতারাতি একটা মস্ত ফল লাভ করিব বলিয়াও আশা করি না। আমি দেখিতেছি আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের সেই চিত্তকে আমি বিশ্বাস করি—সে ভুল করিলেও নির্ভুল যন্ত্রের চেয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের সেই জাগ্রত চিত্ত যে-কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে সেই আমাদের যথার্থ কাজ—চিত্তের বিকাশ যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে কাজের বিকাশও ততই সত্য হইয়া উঠিবে। সেই সমস্ত কাজই আমাদের জীবনের সঙ্গী—আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাড়িয়া চলিবে—তাহাদের সংশোধন হইবে, তাহাদের বিস্তার হইবে; বাধার ভিতর দিয়াই তাহারা প্রবল হইবে, সঙ্কোচের ভিতর দিয়াই তাহারা পরিস্ফূর্ত্ত হইবে এবং ভ্রমের ভিতর দিয়াই তাহারা সত্যের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাধি-উদ্যান

সমাধি-উদ্যান সম এ দেহ সুন্দর,
সুসজ্জিত ফুল ফলে লতায় পাতায়,
মনোহর স্তম্ভদীপে। উজ্জ্বল অক্ষর
খোদিত ললাটে কিবা গুণের গাথায়।
উভয়ের অন্তরেতে কঙ্কালের রাশি
পাংশুম্লান করিয়াছে সব শোভা সুখ।
নীরক্ত, পরাণহীন মুখে শুধু হাসি,
দীর্ঘশ্বাস রুদ্ধ থাকে স্ফীত করি বুক।

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রকৃতি-পরিচয় *

বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন যে পাশ্চাত্য জাতিগণের নিকট হইতে দর্শন ও ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের অতি অল্পই শিখিবার আছে—তাঁহাদের নিকট হইতে প্রধান শিক্ষিতব্য বিষয় হইতেছে সায়েন্স বা বিজ্ঞান। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দর্শন ও পাশ্চাত্য সাহিত্যই প্রথমে প্রবেশ লাভ করে—অতি অল্পদিন হইল বিজ্ঞান ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে পাশ্চাত্য চিন্তাসমূহ দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া এদেশের বর্ত্তমান সাহিত্যকে নিয়মিত করিয়াছে এবং লোকের চিন্তাস্রোতকে নূতন পথে ধাবিত করিয়াছে। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের কোনও বিশেষ কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হই নাই।

যখন দেশে বিজ্ঞানের যথোপযুক্ত শিক্ষা ও আলোচনা নাই, তখন সাহিত্যেই বা তাহার কতটুকু স্থান থাকিবে এবং লোকেই বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করিতে ব্যগ্র হইবে কেন? তবে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের উপর লোকের শ্রদ্ধা বাড়িতেছে এবং বাড়িবে ইহা একরূপ নিশ্চিত।

যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লেখক বঙ্গ ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে জগদানন্দ বাবুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদিন ধরিয়া তাহার যেসকল উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নানা মাসিক পত্রের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে এইবার পুস্তকাকারে একত্র দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির নাম, ঈথর, বিদ্যুতের উৎপত্তি, জড় কি অক্ষয়? প্রভৃতি। বিষয়গুলি অতি কঠিন, বড় বড় বৈজ্ঞানিক এখনও এসকল বিষয় সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতেছেন অথচ কোনও সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। কাজেই সাধারণ পাঠক যে গোটা-কয়েক প্রবন্ধ পড়িয়াই সেইসব বিষয় চট্ করিয়া বুঝিয়া ফেলিবে তাহার আশা অতি কম। যাঁহারা অন্ততঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই একখানা প্রথম পাঠ না পড়িয়াছেন তাহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ পাঠ একরূপ অসাধ্যসাধন করিবার প্রয়াস। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে ক্ষমতাশালী লেখক তাঁহার প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষার সাহায্যে এই জটিল সমস্যাগুলিকে যথাসম্ভব সরল ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন।

অবৈজ্ঞানিক পাঠকের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার বিপদ অনেক। কারণ বিজ্ঞান একটা হাতে কলমে শিখিবার জিনিস—যন্ত্রাদির সাহায্যে কতকগুলি পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ না করিলে ইহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায় না। যাঁহারা জীবনে কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখেন নাই, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অদ্ভুত রকম ধারণা করিয়া বসেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া একজন সাধারণ পাঠক বলিয়া উঠিলেন জীব জন্তুর ন্যায় "ইট কাঠেরও প্রাণ আছে।" কিন্তু এখানে প্রাণটা কিরূপ এবং কিরূপ পরীক্ষার দ্বারা ইটকাঠের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ হইল সে সকল কথা তিনি কিছুই বুঝিলেন না।

আর একবার দেখিয়াছিলাম একটী বাংলা মাসিক পত্রে একজন লেখক এমিবা (amaeba) সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু যিনি অণুবীক্ষণের সাহায্যে 'এমিবা' না দেখিয়াছেন তিনি তাহার কি বুঝিবেন?

আলোচ্য গ্রন্থের একস্থলে আছে—"কাঠ কয়লা প্রভৃতি দাহ্য পদার্থে প্রচুর অঙ্গার মিশ্রিত আছে"। এখন একজন অবৈজ্ঞানিককে অর্থাৎ একেবারে বিজ্ঞান পড়েন নাই এমন একজনকে* এই কথাটী বুঝাইতে হইলে পদার্থের আণবিক গঠন সম্বন্ধে কিছু শিখাইতে হইবে, পরে চিনি প্রভৃতির উপর গন্ধকদ্রাবক ঢালিয়া বা উত্তাপ সহকারে ঝলসাইয়া একটী পরীক্ষা দ্বারা দেখাইতে হইবে যে চিনি প্রভৃতি দগ্ধ হইলে কয়লা বাহির হইয়া পড়ে এবং শেষে পরমাণুবাদের ভাষায় পরীক্ষাটীর ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অন্যথা তিনি কিছুই বুঝিবেন না।

এইসকল বিপত্তির কথা ভাবিয়াই অনেক বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক-গণের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে সম্মত হন না। তবে অনেকে বলিবেন আমাদের কৌতূহলোদ্দীপক নানা বিষয়ে নব্য বিজ্ঞান কি কি সিদ্ধান্ত করেন তাহা জানিবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা হইয়া থাকে; কাজেই তাহাদের আংশিক তৃপ্তির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা বাঞ্ছনীয়। একেবারে মাতুল না থাকা অপেক্ষা অন্ধ মাতুল থাকাও ভাল।

পাশ্চাত্য দেশে সাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অপেক্ষা সাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার চলনই অধিক, কেননা বক্তা কতকগুলি পরীক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিষয়টাকে স্পষ্টীকৃত করিতে পারেন। প্রবন্ধ-লেখকের সে সুবিধা নাই। তবে সেখানে কেহ কেহ নিজের বাড়ীতে কতকগুলি যন্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্য রাখিয়া কিছু কিছু পরীক্ষা করেন। কাজেই প্রবন্ধ-লেখক কোনও একটী সহজ পরীক্ষার বর্ণনা প্রদান করিলে পাঠক তাহার ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য যন্ত্রাগারে তাহা সম্পাদন করিতে পারেন।

আজকাল বিজ্ঞান মানবজীবনের উপর স্বকীয় প্রভাব যেরূপ বিস্তৃত করিতেছে, তাহাতে জ্ঞানপিপাসু কোনও লোকের পক্ষে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা চলে না। যাঁহাদের ভাগ্যে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষা লাভ ঘটে নাই, তাঁহাদের উচিত যে নিজেদের বাড়ীতেই একটা সামান্য রকমের যন্ত্রাগার প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং পুস্তকের সাহায্যে নিজ হস্তে কতকগুলি পরীক্ষা সম্পাদন করেন, এবং তখনই তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠের সম্যক ফললাভ করিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে।

অভিজ্ঞের নিকট পরামর্শ লইলে আমি যেরূপ যন্ত্রাগারের কথা বলিতেছি তাহাতে বেশী খরচ পড়ে না। আচার্য্য টিণ্ডাল দেখাইয়া-ছিলেন অল্প টাকার মধ্যে একটা চলনসই পদার্থ-বিজ্ঞান-বিষয়ক যন্ত্রাগার স্থাপন করা যায়। রাসায়নিক যন্ত্রাগারের ব্যয় তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প, -গোটাকয়েক কাচের বাসন, একটা নিক্তি এবং এসিড প্রভৃতি কয়েকটা রাসায়নিক দ্রব্য হইলেই প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে যথেষ্ট। একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র (মূল্য এক শত টাকা) থাকিলেই জীবতত্ত্বের অধিকাংশ পরীক্ষা সম্পন্ন করা যায়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থখানি বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। যাঁহারা গল্প ও কবিতার চর্ব্বিতচর্ব্বণ পড়িয়া পড়িয়া জ্বালাতন হইয়াছেন তাঁহারা এই পুস্তকে অভিনব বৈজ্ঞানিক কল্পনার একটু আস্বাদ পাইয়া প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই। এবং যাঁহারা বঙ্গভাষাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন তাঁহারা লেখকের এই সাধু উদ্যমের নিশ্চয়ই সহায়তা করিবেন। শ্রদ্ধাস্পদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাহার লিখিত ভূমিকাতে অতি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন—"তিনি (জগদানন্দ বাবু) কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে অবৈজ্ঞানিক পাঠকসমাজের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের জন্য যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন

* শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। অতুল লাইব্রেরী, ঢাকা, হইতে প্রকাশিত মূল্য (কাপড়ে বাঁধাই) ১।০।

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধান অনুসারে অনেক যুবক বিজ্ঞানের কোনও ধার না ধারিয়া গ্রাজুয়েট হইতেছেন।

তজ্জন্য বঙ্গসাহিত্য তাহার নিকট ঋণী। কেননা বাঙ্গলা সাহিত্য এ বিষয়ে নিতান্ত দরিদ্র। এই গ্রন্থে সেই দারিদ্র্যের কতকটা মোচন হইবে।"

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভক্ত ও তাঁহার নেশা

ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—"মন-মাতালে মেতেছে আমার, মদ-মাতালে মাতাল বলে।"

ভক্ত বলিতেছেন, আমার মন-মাতালে মেতেছে, অর্থাৎ, আমি সম্পূর্ণ সজাগ রহিয়াছি, আমার ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, আমি ইচ্ছা করিয়া, জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া আমার মন-রূপ অশ্বের বল্গা ছাড়িয়া দিয়াছি, তাই সে মত্তভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমিই আমার মনের জ্ঞানবান পরিচালক, কর্ত্তা। মদের মাতালের "আমি" কিন্তু সজাগ নাই, স্ববশে নাই, তাহার ইচ্ছাশক্তির জ্ঞানবান পরিচালক সে নহে,—তাহার "আমি"র পিঠে চাপিয়া, চোখ বাঁধিয়া আর একজন জোর করিয়া তাহাকে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। নিদ্রিতাবস্থায় একজনকে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া, আর জাগ্রতাবস্থায় জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া, ইচ্ছা করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়া যাওয়ায় যে প্রভেদ, মদের মাতালের মত্ততায় ও ভক্তের মত্ততায় সেই প্রভেদ।

ভক্তের মত্ততায় ও মদের মাতালের মত্ততায় আরও একটু প্রভেদ আছে :—

১। ভক্তের মত্ততার বস্তু এক, একমেবাদ্বিতীয়ং; মদের মাতালের মত্ততার বস্তু এক নহে, বিভিন্ন। মদের মাতালের বস্তুবিচার নাই, তাহাকে হুইস্কিই দাও, ব্র্যাণ্ডিই দাও, রম্‌ই দাও, কিংবা সুরাসারের পরিবর্ত্তে এমন কিছু একটা নূতন জিনিস দাও যাহাতে একইরূপ নেশা হয়, কিছুতেই তাহার আপত্তি নাই,—সে অতি আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিবে; কিন্তু ভক্ত যাহাতে তাঁহার প্রিয়বস্তু একের সত্তা অনুভব না করেন, সেই এক গন্ধরাজের গন্ধ না পান, তাহা তিনি স্পর্শও করেন না। ভক্তের জ্ঞান, ধ্যান, চিন্তা একে—সারাবিশ্বে এমন কিছুই নাই যাহা সেই একের স্থান অধিকার করিতে পারে, সেই একের অভাব পূরণ করিতে পারে।

২। মদের মাতাল নেশার জন্য নেশা করে, ভক্ত নেশার জন্য নেশা করেন না;—তাঁহার নেশা প্রিয়বস্তুকে পাইবার জন্য, দেখিবার জন্য, আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ এক করিয়া লইবার জন্য।

৩। মদের মাতালের বেচালে পা পড়ে, ভক্তের কখনও বেচালে পা পড়ে না। মদের মাতালের মত্ততা দুঃখ-অবসাদময়, ভক্তের মত্ততা অম্লান চিরআনন্দময়।

বিজ্ঞান প্রমাণ দিয়াছে—শক্তি যেখানে যত সংহত, তাহার প্রখরতা তেজও সেখানে তত বেশী। সূর্য্যরশ্মিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার দাহিকা শক্তি এতদূর বৃদ্ধি করা যায় যে, তাহাতে বস্তুকে দগ্ধ করা, এমন কি রন্ধনকার্য্যও অনায়াসে সম্পন্ন করা যায়। হৃদয়ের কোমল বৃত্তি—স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতির শক্তিও এই নিয়মের অন্তর্গত; এই বৃত্তিগুলির স্ফূরণ যেখানে যত সংহত, পুঞ্জীভূত, তাহাদের শক্তিও সেখানে তত প্রখর, তাহাদের বহিঃপ্রকাশও তত উজ্জ্বল, দীপ্যমান।

দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সহজে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে এমন কাহাকেও নয়; মায়ের চোখেমুখে, বাক্যে কার্য্যে, সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এই স্নেহ ভালবাসা উচ্ছলিত। ছেলেকে যদি আর কেহ ভালবাসে, মায়ের ভালবাসা তাহার প্রতিও ধাবিত হয়; এই ভালবাসার মাঝখানে তাহার ছেলে রহিয়াছে, সেই এক রহিয়াছে,—তাহার ছেলেকে ভালবাসে বলিয়াই মা অন্যকেও ভালবাসে। এই একে সংহত বলিয়াই ছেলের প্রতি মা'র ভালবাসার এত প্রখরতা, এত প্রবলতা।

ভক্ত সম্বন্ধেও ঠিক্ এই কথাই খাটে। ভক্তের সমস্ত প্রেম ভালবাসা এই একেই সংহত; ভক্ত এক ছাড়া আর কাহাকেও জানেন না, এক ছাড়া কাহাকেও বুঝেন না, এক ছাড়া কাহাকেও দেখেন না,—এই একই তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের লীলাক্ষেত্র, বেষ্টনপরিধি, মিলন-কেন্দ্র। ভক্ত গাছকেও ভালবাসেন, কেন না, তাহাতে তাঁহার প্রিয় একেরই প্রকাশ; ফুলকেও ভালবাসেন, কেন না, তাহাতে সেই একেরই প্রকাশ; ধূলাকেও ভালবাসেন,

কেন না, তাহাতেও তাঁহার চিরোজ্জ্বল সোনা একেরই প্রকাশ। ভক্তের প্রেম একে সংহত লিয়াই এত প্রখর, এত প্রবল, এত প্রতাপান্বিত, এত জয়যুক্ত; এই প্রেম তাঁহার জ্ঞানে ধ্যানে, বচনে মননে, প্রত্যেক কর্ম্মে, চিন্তায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশমান।

ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গণিকাকে দেখিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেন না, তিনি সেই গণিকামূর্ত্তিতেও এক বিশ্বমাতৃরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন; চৈতন্যদেব বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, কেন না, তিনি সেই বৃক্ষে তাঁহার এক প্রিয়তমেরই সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন; নানক পিতৃ-আজ্ঞায় শস্যক্ষেত্রে পাহারা দিতে গিয়া নিজেই ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেন না, তিনি সেই হরিৎক্ষেত্রে এক শ্রীহরিরই শ্রীমুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ভক্তের ভগবান আর সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, আড়াল করিয়া রাখেন,—ভগবানই ভক্তের নিকট একমাত্র প্রকাশমান। এইজন্য, প্রকৃত ভক্তের লজ্জা, ভয়, মান অপমান, ভেদাভেদ জ্ঞান কিছুই নাই। কথায়ও তাই বলে, লজ্জা, ভয়, মান এই তিন থাকিতে ভগবানকে লাভ করা যায় না। ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, যাহার লক্ষ্য একে তাহার আর কোনও দিকে লক্ষ্য থাকিতে পারে না। যাহার লক্ষ্য সম্মুখে, তাহার দক্ষিণে বামে পশ্চাতে লক্ষ্য থাকিতে পারে না। দ্রৌপদীর যতক্ষণ দৈহিক অভিমান - সামান্য অহংজ্ঞানটুকু ছিল, ততক্ষণ তিনি লক্ষ্যভ্রষ্টা ছিলেন, ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারেন নাই। চৈতন্যদেব শাস্ত্রজ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন, তখনকার পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার্ব্বভৌমকেও ইচ্ছা করিলে তর্কে পরাস্ত বিধ্বস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য সেদিকে ছিল না, তিনি লক্ষ্যচ্যুত না হইয়া একমাত্র প্রেমে তাঁহার আরাধ্যদেবের চরণে মাথা নত করিয়া আর সকলেরও মাথা নত করাইয়াছিলেন।

গীতা "অনন্যমনসো," "নিত্যাভিযুক্তানাং", "মদ্গতেনান্তরাত্মনা" প্রভৃতি বাক্যে প্রকৃত ভক্ত, যোগীর যে লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত প্রচলিত প্রবাদবাক্যটি উহাদেরই একই ভাবব্যঞ্জক সহজ ভাঙ্গা-কথা। গীতায় আছে :—

> যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
> শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

যোগীদিগের মধ্যে যিনি মদ্গতচিত্ত হইয়া কেবলমাত্র আমাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন, তিনি সকল অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ।

ইহাই প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ।

মসগুল হইয়া থাকা, মজিয়া থাকা, ভরপুর হইয়া থাকা, অনন্যচিন্ত একচিত্ত হইয়া থাকার নামই নেশা। ধ্যাননিরত, আত্মস্থ যোগীতে আমরা যেরূপ এই ভাব দেখি, আবিষ্ট বিহ্বল, ভগবদ্‌প্রেমের পাগলেও আমরা সেইরূপ এই ভাবই দেখি,—কেবল ধরণ বিভিন্ন। উভয়েই একচিত্ত, একনিষ্ঠ, একলক্ষ্য, আনন্দবিহ্বল। যে হিমালয় বিরাট মস্তক উত্তোলন করিয়া স্থির নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান, তাহাতে যে গাম্ভীর্য্য, ধ্যানপরায়ণতা, আনন্দঘন ভাব বিদ্যমান, নানারঙ্গে তরঙ্গভঙ্গে উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত বিশাল সমুদ্রেও সেই গাম্ভীর্য্য, ধ্যানপরায়ণতা, আনন্দঘন ভাব বিদ্যমান কেবল রূপ বিভিন্ন। উভয়েই আমাদিগকে ভাবে অভিভূত করিয়া ফেলে; কে বড়, কে ছোট, তাহা বিচার করিবার আমাদের ক্ষমতা নাই।

ভক্তের যে ভাবই আমরা দেখি না কেন, তাহাতে আমরা ঈশ্বরেরই প্রকাশ দেখি। শিশুর প্রত্যেক কর্ম্মের অন্তরালে যেমন মা রহেন, ভক্তের অন্তরের অন্তরেও তেমনি ভগবান রহেন। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা আশা, প্রেম ভালবাসা, ধ্যান ধারণা, অন্বেষণ কখনও ব্যর্থ হয় না। ভগবান ভক্তের ডাকে সাড়া দেন, তাঁহার আশা পূর্ণ করেন, আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেন, নিজে ইচ্ছা করিয়া ভক্তের হৃৎপদ্মে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন; তাই ভক্তের মুখে আমরা ঈশ্বরেরই সৌন্দর্য্য দেখি, ভক্তের বাণীতে আমরা ঈশ্বরেরই বাণী শ্রবণ করি, ভক্তের অঙ্গে আমরা ঈশ্বরেরই প্রেম-সৌরভ আঘ্রাণ করি। সেই স্পর্শমণির স্পর্শেই ভক্তের এত মাহাত্ম্য! ভগবানকে অন্তরে ধারণ করিয়াই ভক্ত এত বড়, এত বলী, এত জয়ী,—বিপদ্ সঙ্কট মরণকেও অনায়াসে তুচ্ছ করেন, রাজরাজেশ্বরের

মাথার মুকুটও নিজের চরণতলে আনিয়া ধূলায় লুটাইয়া দেন!

খৃষ্টান ভক্তপ্রবর জজ্জ মূলারের জীবনচরিতে আমরা পাঠ করি, মূলার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের অনাথ বালক-বালিকাদিগের জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করিতেন, আর অস্বাস্থ্যকর পূবে হাওয়া বদ্‌লাইয়া ভাল হাওয়া বহিত, দারুণ অভাবের সময় কোথা হইতে যে অজস্র টাকা আসিয়া পড়িত, তাহার ঠিক ছিল না। ইহা মূলারের নিজশক্তি নহে, ভক্তের মধ্য দিয়া ভগবানের শক্তিরই প্রকাশ। তেমন করিয়া যদি ভগবানকে ধরিয়া থাকিতে পারা যায়, তেমন করিয়া ডাকার মত যদি ডাকিতে পারা যায়, একান্ত নির্ভরশীল শিশুর মত হওয়া যায়, ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ভক্তের মধ্য দিয়া অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ, অসাধ্যসাধন করেন।

বৈজ্ঞানিক বলেন, অসীম-অনন্তকে মানব ভাবিতে পারে না; ভক্ত তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেন, অসীম-অনন্তকে মানব যে কেবল ভাবিতে পারে তাহা নহে, ধরিয়া রাখিতেও পারে। যে অসীম-অনন্ত বৈজ্ঞানিকের নিকট একেবারে জ্ঞানের অগোচর, ধ্যান ধারণার অতীত, অধ্যাত্মযোগে সেই অনন্ত সান্তের নিকট করতলন্যস্ত আমলকবৎ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান, ধারণযোগ্য। ইহা মানবশক্তিতে নয়, ভগবদ্‌কৃপাতেই সম্ভবপর হয়; অসীম দয়া করিয়া নিজে আসিয়া সসীমকে দেখা দেন, ধরা দেন, তাহার অন্তরে আসিয়া বাস করেন। যে ধূলামাটি সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নে চরণতলে রহে, সমুন্নত তরু তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সারসামগ্রী পুষ্পফল তাহাকেই অর্পণ করে।

উপনিষদে এই কথাই বলা হইয়াছে :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য, স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

বেদাধ্যয়ন, মেধা, বহুরূপ শ্রবণ দ্বারাও এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, যাঁহাকে এই আত্মা বরণ করেন, তিনিই ইহাঁকে লাভ করিতে পারেন, এবং তাঁহারই নিকটে এই পরমাত্মা নিজের তনুকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

ইহাই সসীমে অসীমের প্রকাশ—ইহাই ভগবদ্‌কৃপা।

প্রেমের বিচিত্রলীলা জড়বিজ্ঞানের নিকটেই ধারণাতীত। বড় কেমন করিয়া ছোটর মধ্যে প্রবেশ করে, ছোটর মধ্যে গিয়া বাস করে, জড়বিজ্ঞানের সাধ্য নাই যে, এ রহস্য বুঝে; ইহা স্বতন্ত্র রাজ্য প্রেমরাজ্যের কথা। অশেষ মেধাবী, প্রতিভাবান রাজনীতিজ্ঞ, বিশাল সাম্রাজ্যের কর্ণধার গ্লাড্‌ষ্টোনের সমুন্নত দেহ ন্যুব্জ হইয়া তাঁহার নাতির কাছে কেমন করিয়া ঘোটকরূপে পরিণত হইত, জড়বিজ্ঞান তাহার উত্তর দিতে পারে না, একমাত্র স্নেহবৎসল বৃদ্ধ পিতামহরাই ইহার সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন।

প্রেমই ছোটকে বড় করে, বড়কে ছোট করে, সকল ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দেয়, সকলকে এক করে, অসাধ্য সাধন করে। প্রেমের মাহাত্ম্য আমরা ভক্তের জীবনেই দেখিতে পাই। যিনি এত বড়, এত মহান, অসীম, প্রেম তাঁহার সহিত যুক্ত করিয়া মানবজীবনকে এত সুন্দর, এত নির্ম্মল, পবিত্র, সোনা করিয়া দেয় একি কম কথা!

ঈশ্বর অসীম প্রেমময় দয়াময়, সকলকেই তিনি প্রেম বিলাইতেছেন, তাঁহার অমৃতময়ী স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় সকলের জন্যই প্রসারিত রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু যে সন্তান অহর্নিশ ধর্ম্মপরায়ণা মা'র কাছাকাছি থাকে, মা'র কথামত চলে, মা'কে ভক্তি করে, তাহার জীবন যেমন মহত্তর, সুন্দরতর, উজ্জ্বলতর হয়, ভগবানের সহবাসে সংস্পর্শে তাঁহার সৌন্দর্য্য, নির্ম্মলতা, বিভূতির অংশ লাভ করিয়া ভক্তও তেমনি এত ঐশ্বর্য্যবান, জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান।

প্রকৃত কথা, ভক্তকে আমরা যেরূপ যে ভাবেই দেখি না কেন, ভক্তমাত্রেই আমাদের নমস্য। ভক্তের দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, বিপদ আছে, রোগ আছে, মৃত্যু আছে, সকলই আছে, কিন্তু এই দুঃখপঙ্ক সঙ্কটকণ্টকের ঊর্দ্ধে তাহার প্রাণের মৃণালে যে সোনার কমলটি ফুটিয়া আছে, তাহা অনন্যদুর্লভ। ইহারই সৌন্দর্য্য, অমৃত পরিমল, ভক্তের সকল দুঃখদৈন্যকে ঢাকিয়া ফেলে, মৃত্যুকেও আনন্দরূপ অমৃতে পরিণত করে।

ভক্তপ্রবর টমাস্ কেম্পিসের কথায় বলি, ভক্তের প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা বলী, সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ উচ্চ, সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল বিস্তৃত; পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গে এই প্রেমের অপেক্ষা আনন্দদায়ক আর কিছুই নাই, কারণ,

এই প্রেম ভগবৎসম্ভূত, সমস্ত সৃষ্টিকে প্লাবিত করিয়া এই প্রেম একমাত্র ভগবানেই আশ্রয় লাভ করে।

হে বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক! ভক্তের মাহাত্ম্য, প্রেমের লীলা তুমি কি বুঝিবে! তুমি হাস, আর অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত কর, তাহাতে কিছুই আসে যায় না; ইহা সত্য, ভক্তের যে বল তাহার কণামাত্র বল তোমার নাই, ভক্ত যে চরম সত্য লাভ করিয়াছেন, তুমি তাহার অংশমাত্রও লাভ করিতে পার নাই, ভক্তের যে মান তাহার অনুপরিমাণ মানও তোমার নাই; তাই জগতসুদ্ধ লোক তোমাকে ছাড়িয়া ভক্তেরই অনুসরণ করিতেছে, ভক্তকে পূজা করিতেছে, প্রাণমন সমর্পণ করিতেছে, ভক্তের চরণধূলি মাথায় লইতেছে, তাই ধ্রুব, প্রহ্লাদ, যীশু, মহম্মদ, নানক, কবীর, রামকৃষ্ণ প্রভৃতিরই জয়—পৃথিবীতে ভক্তেরই সর্ব্বত্র জয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতপাঠ*

(আবহমান)

শ্রোতৃবর্গের মনে সহজে এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গীতাপাঠ উপলক্ষে ত্রিগুণতত্ত্বের এরূপ ব্যাখ্যাবাহুল্যের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, গীতাশাস্ত্রের আদ্যোপান্ত জুড়িয়া গুণ শব্দ নানা কথাপ্রসঙ্গে, নানা স্থলে, নানা ছলে, পদে পদে ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহা কোনো গীতাপাঠকের চক্ষে ঢাকা থাকিতে পারে না। এইজন্য ত্রিগুণ যে পদার্থটা কি, আর, তাহার ভিতরে আমাদের দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের সার কথাগুলি কেমন আশ্চর্য্য-রূপে আগলাইয়া রাখা হইয়াছে, ইহা বিবৃত করিয়া দেখানো গীতাশ্রাবয়িতার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায় আমি এই দুরূহ ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার স্বপক্ষ সমর্থন এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট; অতএব শেষোক্ত বাজে কাজে অনর্থক কালবিলম্ব না করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যা'ক।

ত্রিগুণের ভিতরের কথার অন্বেষণে বাহির হইয়া আমরা কোন্ পথ দিয়া কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যা'ক।

আমরা দেখিয়াছি যে, সত্তা কাহারো একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সত্তা তোমারও আছে, আমারও আছে, পশু-পক্ষীরও আছে, ধাতু-প্রস্তরেরও আছে। সত্তা যখন সকলেরই আছে, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সত্তার প্রকাশও সকলেতেই আছে। কেন না, সত্তার প্রকাশ না হইলে সত্তার কোনো নিদর্শন থাকে না; সত্তার কোনো নিদর্শন না থাকিলে—"সত্তা আছে" এ কথা একেবারেই ভূমিসাৎ হইয়া যায়। অতএব যখন তুমিও বলিতেছ, আমিও বলিতেছি এবং সকলেই একবাক্যে বলিতেছে যে, সত্তা সকলেরই আছে, তখন তাহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সত্তার প্রকাশও সকলেতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে; অথবা, যাহা একই কথা—সকলেরই সত্তার সঙ্গে চেতনা ন্যূনাধিক পরিমাণে লাগিয়া রহিয়াছে। তবেই হইতেছে যে, সকলেরই সত্তা আত্মসত্তা। তোমার সত্তাও তোমার আত্মসত্তা, আমার সত্তাও আমার আত্মসত্তা, গোমহিষের সত্তাও গোমহিষের আত্মসত্তা, ধাতুপ্রস্তরের সত্তাও ধাতুপ্রস্তরের আত্মসত্তা। প্রভেদ কেবল এই যে, আত্মসত্তার প্রকাশ সত্ত্বপ্রধান মনুষ্যের মধ্যে সুপরিস্ফুট, রজঃপ্রধান মূঢ় জীবদিগের মধ্যে অর্দ্ধস্ফুট বা মুকুলিত, তমঃপ্রধান জড় বস্তুর মধ্যে প্রসুপ্ত বা বীজভাবাপন্ন। আবার, মনুষ্যের মধ্যেও আত্মসত্তার প্রকাশ জাগরিতাবস্থায় সুপরিস্ফুট হয়, স্বপ্নাবস্থায় অর্দ্ধস্ফুট বা মুকুলিত ভাব ধারণ করে, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় সুপ্তি-সাগরে নিমগ্ন হয়। এটাও আমরা দেখিয়াছি যে "আমি ভূতকাল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি যেখানে যখন প্রকাশ পায়, সেই খানেই ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা আপনা হইতেই আসিয়া যোটে। তবেই হইতেছে যে, বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা আত্মসত্তার প্রকাশের সঙ্গের সঙ্গী। ইহা হইতে আমরা পাইতেছি এই যে, আত্মসত্তার প্রকাশ যখন সকলেতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে, তখন বর্ত্তিয়া থাকি-বার ইচ্ছাও সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে। বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা যখন সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আত্মসত্তা সকলেরই আনন্দের আস্পদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে যে,

* শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রবন্ধ-পাঠ সভায় পঠিত।

তত্ত্বজ্ঞানের কথাপ্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনক রাজাকে বলিয়াছিলেন—

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

ইহার অর্থ :—

ব্রহ্মরসামৃতপানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণে যেরূপ ভরপূর আনন্দ বিরাজ করে, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদবিন্দুর বলে অন্যান্য জীবেরা জীবন ধারণ করে :—ভাব এই যে, স্থির সমুদ্রে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার নিজমূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়, সত্ত্বপ্রধান মনুষ্যের শাস্ত-সমাহিত চিত্তে তেমনি আত্মসত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ পরিষ্কার নিজমূর্ত্তি ধারণ করে; আবার, তরঙ্গিত নদীস্রোতে চন্দ্রের প্রতিমা যেমন শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাঙা ভাঙা ভাবে প্রকাশ পায়, পশ্বাদি জন্তুদিগের রজঃপ্রধান অন্তঃকরণে তেমনি গোড়ার সেই অখণ্ড আনন্দের আভাস শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষণভঙ্গুর বিষয়সুখে পর্য্যবসিত হয়।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্ত্বগুণের যে দুইটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ—প্রকাশ এবং আনন্দ, তাহা কি জ্ঞানবান মনুষ্য, কি পশ্বাদি মূঢ় জীব, কি ধাতুপ্রস্তরাদি জড়বস্তু—সকলেরই মধ্যে ন্যূনাধিক মাত্রায় বিদ্যমান আছে।

সত্ত্বগুণের এই যে দুইটি প্রধান পরিচয়লক্ষণ—কিনা সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ, এ দুইটি ছাড়া সত্ত্বগুণের আর একটি পরিচয়লক্ষণ আছে; সেটাও দেখা চাই; সেটি হচ্চে সত্তার আত্মসমর্থনী শক্তি। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে আনন্দ সত্ত্বগুণের হৃদয়, প্রকাশ সত্ত্বগুণের বাম হস্ত, আত্মসমর্থনী-শক্তি (সংক্ষেপে আত্মশক্তি) সত্ত্বগুণের দক্ষিণ হস্ত। এই স্থানটিতে সত্ত্বগুণের গোড়ার বৃত্তান্তটি আর একবার ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সত্তার প্রকাশেই সত্তার আত্ম-সমর্থন হয়; কেন না প্রকাশ ব্যতিরেকে সত্তা সত্তাই হয় না। তবেই হইতেছে যে, সত্তার প্রকাশের মধ্যেই সত্তার আত্মসমর্থনী শক্তি সম্ভৃত রহিয়াছে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, সত্তার প্রকাশের সঙ্গে যে পর্য্যন্ত না সত্তার আত্মসমর্থনী শক্তি একযোগে প্রকাশ পায়, সে পর্য্যন্ত প্রকাশের মাত্রা পূর্ণ হয় না। ফল কথা এই যে, "আমি ভূতকাল হইতে এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি যখন দ্রষ্টা পুরুষের জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তখন সে-যে প্রকাশ তাহা প্রকাশের নবোন্মেষ মাত্র—অরুণোদয় মাত্র; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বৃত্তান্ত যখন প্রকাশ পায়,—এটাও যখন প্রকাশ পায় যে, যে প্রকারে আত্মশক্তি খাটাইয়া আমি ভূতকালের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানে দণ্ডায়মান হইয়াছি সেই প্রকারে আত্মশক্তি খাটাইয়া ভবিষ্যতে দণ্ডায়-মান হইতে পারা আমার অধিকারায়ত্ত; এইরূপে যখন সত্তার সঙ্গে শক্তি একযোগে প্রকাশ পায়, তখন সত্তা এবং শক্তির সেই যে সমবেত প্রকাশ, তাহাতেই প্রকাশের মাত্রা পূরণ হয়, আর, সেই সঙ্গে আনন্দেরও মাত্রা পূরণ হয়। "আনন্দেরও মাত্রা পূরণ হয়" বলিতেছি এই জন্য, যেহেতু আধপেটা অন্ন ভোজনে যেমন ক্ষুধিত ব্যক্তির উদর পূরণ হয় না, তেমনি "আমি ভূতকাল হইতে এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই অর্দ্ধ-বৃত্তান্তটিতে আনন্দের মাত্রা পূরণ হয় না; আনন্দের মনের কথা এই যে, আত্ম-সত্তা যেমন ভূতকাল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছে—ভবিষ্যতেও তেমনি তাহা চিরজীবী হইয়া বর্ত্তিয়া থাকুক্ এইজন্য আত্মসত্তার সঙ্গে যখন ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার যোগ্যতা বা আত্মসমর্থনী শক্তি একযোগে প্রকাশ পায়, তখন আনন্দের অর্দ্ধমাত্রা পূর্ণমাত্রায় পদ-নিক্ষেপ করে। এই স্থানটির সহিত ডারুইনের মুখ্য সিদ্ধান্তটি দিব্য সংলগ্ন হয়। সে সিদ্ধান্ত এই যে, জীব-জগতে ভূতকালের জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সত্তা যখন যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহা দীনহীন সত্তা নহে, পরন্তু তাহা যোগ্যতম সত্তা; সত্তার উদ্বর্ত্তন যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন (survival of the fittest)। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ডারুইনের মতে সত্তার উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-সমর্থনের যোগ্যতার অভ্যুদয় হয়—আত্মসমর্থনী শক্তির অভ্যুদয় হয়। ডারুইনের প্রদর্শিত এই যে এক মহা-নাট্য—কি না সত্তার উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্থনী শক্তির উদ্বোধন—এ নাট্য অভিনীত হয় জীবজগতের সর্ব্বত্রই; কিন্তু পশ্বাদি জন্তুরা এই পরমাশ্চর্য্য নাট্যলীলার রসাস্বাদনে একেবারেই বঞ্চিত—এ নাট্যলীলার দর্শক

পৃথিবীস্থ সারারাজ্যের জীবদিগের মধ্যে অ্যাকা কেবল মনুষ্য। কেননা মনুষ্যই সত্ত্বগুণপ্রধান জীব, আর, প্রকাশ সত্ত্বগুণেরই ধর্ম্ম। মনুষ্যের ন্যায় সত্ত্বগুণপ্রধান জীবের অন্তঃকরণেই আত্মসত্তা এবং আত্মসত্তার প্রিয়সখী আত্মসমর্থনী শক্তি উভয়েই পরিষ্কার জ্ঞানালোকে বিভ্রাজমানা। পক্ষান্তরে, পশ্বাদি জন্তুদিগের রজঃপ্রধান অন্তঃকরণে আত্মসত্তা এরূপ ঝাপ্‌সা আলোকে প্রকাশ পায় যে, তাহা প্রকাশ না পাওয়ারই মধ্যে। অর্থাৎ মনুষ্যের সজ্ঞান অবস্থার চিৎপ্রকাশ বলিতে যেরূপ চিৎপ্রকাশ বুঝায়, পশ্বাদি জন্তুদিগের অন্তঃকরণস্থিত চিৎপ্রকাশ সেরূপ জাগ্রত ভাবের চিৎপ্রকাশ নহে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কোনো প্রকার বাধানুভূতির উত্তেজনায় যখন পশ্বাদি জন্তুদিগের অন্তঃকরণে চিদাভাস উদ্দীপ্ত হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মচেষ্টায় প্রবর্ত্তিত করে, তখন উপস্থিত বাধার প্রতিবিধানকার্য্যেই তাহাদের সমস্ত চিৎপ্রকাশ গ্রস্ত হইয়া যায়; তা বই, সুখদুঃখের ছায়াবাজির পর্দার ওপিঠে, প্রকাশ এবং আনন্দের যে এক বাঁধা বোসনাই রহিয়াছে, তাহা তাহাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে ধরা ছায় না।

ডারুইনের প্রদর্শিত ঐ যে মহানাট্য উহা বহির্জগতের আমদরবারে অভিনীত হয়, আর সেই জন্য অধুনাতন কালের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা উহার সবিশেষ মর্য্যাদাভিজ্ঞ। তা ছাড়া, আর এক নাট্য যাহা মনুষ্যের অন্তর্জগতের খাসদরবারে অভিনীত হয় তাহা কম মহানাট্য নহে;—আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই দ্বিতীয় মহানাট্যের সবিশেষ মর্য্যাদাভিজ্ঞ ছিলেন ইহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বোক্ত মহানাট্যে বাহ্য প্রকৃতির অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া কিরূপে জড়রাজ্যের বিদেশ হইতে মনুষ্য-রাজ্যের স্বদেশে উপনীত হয়, এই বৃহদ্ব্যাপারটির অভিনয় হয়। শেষোক্ত মহানাট্যে মনুষ্যের অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্নময় কোষের প্রবাস হইতে আনন্দময় কোষের নিবাসে উপনীত হয়, এই নিগূঢ় রহস্যটির অভিনয় হয়। বর্ত্তমান স্থলে শেষোক্ত মহানাট্যের মর্ম্মস্থানীয় ব্যাপারগুলি পরিষ্কাররূপে বিবৃত করিয়া দেখানোই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য;—তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

বলিলাম যে, আত্মসত্তার প্রকাশের সঙ্গে আত্মশক্তির প্রকাশ হইলে—তবেই আনন্দের মাত্রা পূর্ণ হয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সত্তার প্রকাশ হয় জ্ঞানযোগে—শক্তির প্রকাশ হয় কর্ম্মযোগে। আত্মসত্তা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পরিষ্কার জ্ঞানালোকে অভ্যুত্থান করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন আত্মসত্তার প্রকাশ সম্যক্ পর্য্যাপ্তি লাভ করে না, আত্মশক্তি তেমনি যতক্ষণ না মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা বিরাট রাজার অন্তঃপুরচারী বৃহন্নলার ন্যায় অপরিজ্ঞাত থাকে। পক্ষান্তরে, বৃহন্নলা সারথি যেমন কুরুসেনা জয় করিয়া—তিনি যে কিরূপ অজেয় সারথি তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তেমনি মনুষ্যের আত্মশক্তি অন্তরের রিপুজয় করিয়া—সে যে কিরূপ অজেয় শক্তি তাহার পরিচয় প্রদান করে। উপস্থিত বাধার প্রতিবিধানকার্য্য—কি মনুষ্য কি পশ্বাদি জন্তু-সকল জীবকেই বাধ্য হইয়া করিতে হয়; কাজেই সেরূপ কার্য্য জীবের অশক্তিরই পরিজ্ঞাপক। পক্ষান্তরে, মনুষ্য যখন মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তরতম আনন্দের নিগূঢ় অভিপ্রায় সমর্থন করে, তখন সে-যাহা সে করে তাহা ভিতর হইতে করে; তা বই, বাহিরের কোনোকিছু দ্বারা বাধ্য হইয়া করে না। এইরূপ কার্য্যই মনুষ্যের স্বশক্তির পরিচায়ক—আত্মশক্তির পরিচায়ক। দিবালোক অবশ্য সূর্য্য হইতেই আসে, তা বই, তাহা মনুষ্যের আত্মশক্তি হইতে আসে না; কিন্তু তা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, গৃহবাসী যতক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তপদ পরিচালনা করিয়া ঘরের জাল্‌না-দরজা উদ্ঘাটন না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দিবালোক তাহার ভোগে আসে না। প্রকৃত কথা এই যে, দুই হাত নহিলে তালি বাজে না;—এটা যেমন সত্য যে, দিবালোক প্রেরণ করা সূর্য্যের কার্য্য, এটাও তেমনি সত্য যে, দিবালোকের বাধা অপসারিত করা গৃহবাসীর কার্য্য।

দিবালোকের প্রেরণকর্ত্তা যেমন সূর্য্য, সত্ত্বগুণের প্রেরণকর্ত্তা তেমনি পরমাত্মা। পার্থিব অগ্নির আলোকের

মূলাধার যে সূর্য্যের আলোক ইহা বিজ্ঞানের একটি নবতম সিদ্ধান্ত। কিন্তু সূর্য্যের আলোক যেমন পরম পরিশুদ্ধ আলোক, পার্থিব অগ্নির আলোক সেরূপ নহে, পার্থিব অগ্নির আলোকে ইন্ধনের দোষগুণ কোনো-না-কোনো আকারে দেখা দিতে ছাড়ে না। মনুষ্যের অন্তঃকরণে তেমনি সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধায় আক্রান্ত, আর আত্মশক্তির কার্য্য হ'চ্চে সেই সকল বাধা অপসারিত করিয়া দেবপ্রসাদের আগমন পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। আত্মপ্রভাবের সহিত দেবপ্রসাদের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সেইটি এখানে বিশেষ মতে প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কর্ষিত ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়; আর, সেই কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জলের গুণে উপ্ত ধান্যবীজ যথাসময়ে অঙ্কুরিত হয় -ইহা খুবই সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও তেমনি সত্য যে, সেই কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জলের মধ্য হইতে মেঘনির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধ জল কোথাও পলাইয়া যায় না; পলাইয়া যাওয়া দূরে থাকুক—তাহা সেই কর্দ্দমাক্ত ঘোলাজলের জলত্ব-সাধন কার্য্যে ক্ষণকালের জন্যও ক্ষান্ত থাকে না। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বৃক্ষের উৎপাদনে ঘোলা-জলের যেরূপ কার্য্যকারিতা—মঙ্গল-কার্য্যের উৎপাদনে আত্মপ্রভাবের সেইরূপ কার্য্যকারিতা; আর, ঘোলাজলের জলত্ব-সাধনে বিশুদ্ধ জলের যেরূপ কার্য্যকারিতা, আত্মপ্রভাবের সামর্থ্য-সাধনে দেবপ্রসাদের সেইরূপ কার্য্যকারিতা অতীব সুস্পষ্ট। প্রথমে, দেবপ্রসাদে মনুষ্যের অন্তঃকরণে আত্মসত্তা প্রকাশিত হয়। তাহার পরে তাহার সঙ্গে আত্মসত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ আসিয়া যোটে। তাহার পরে সেই আনন্দের সঙ্গে আত্মসত্তার প্রকাশকে মোহমেঘ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিবার ইচ্ছা আসিয়া যোটে। তাহার পরে আত্মশক্তি মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার প্রভাব পরিস্ফুট করিয়া আনন্দের অন্তরের অভিলাষকে পূরণ করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্তার প্রকাশ হয় জ্ঞানযোগে, শক্তির প্রকাশ হয় কর্ম্মযোগে। "কর্ম্মযোগে" অর্থাৎ মঙ্গল-কার্য্যের অনুষ্ঠানে। মঙ্গল-কার্য্যের পথপ্রদর্শক হচ্চে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক আনন্দ। যে কার্য্য সেই অন্তর্নিহিত বিমল আনন্দের অনুমোদিত, সংক্ষেপে অন্তরাত্মার অনুমোদিত, তাহাই মঙ্গলকার্য্য - বা আত্ম-শক্তির কার্য্য; আর, তাহার বিপরীত শ্রেণীর কার্য্যই অমঙ্গল কার্য্য—বা অশক্তির কার্য্য। মহাভারতের বনপর্ব্বের ২০৬ অধ্যায়ে আছে

"মূঢ়ানাং অবলিপ্তানাং অসারং ভাবিতং ভবেৎ।
দর্শয়ত্যন্তরাত্মা তং দিবারূপমিবাংশুমান।"

ইহার অর্থ :-

মূঢ় গর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের মনের যত কিছু ভাবনা-চিন্তা সমস্তই অসার; সূর্য্য যেমন দিবসের রূপ প্রদর্শন করে (অর্থাৎ দৃশ্যবিষয় সকল প্রদর্শন করে) অন্তরাত্মা তেমনি তাহাদের সেই সকল ভাবনা-চিন্তার অসারতা প্রদর্শন করে। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—

"যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎপ্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতং তু বর্জ্জয়েৎ॥"

ইহার অর্থ:—

যে কর্ম্ম করিলে সাধকের অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হয়, তিনি সেই কর্ম্ম প্রযত্ন সহকারে করিবেন, তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

আমাদের দেশের পূর্ব্বতন কালের আচার্য্যেরা স্বভাষী ছিলেন, তাই তাঁহারা বলিয়াছেন—"অন্তরাত্মা মঙ্গল কার্য্যের পথপ্রদর্শক"; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নব্য আচার্য্যেরা নিতান্তই পরভাষী (অর্থাৎ পরের বুলি বোল্‌নেওয়ালা)। এই জন্য, যদি বলা যায় যে, মঙ্গল-কার্য্যের পথপ্রদর্শক conscience, তবে শেষোক্ত শ্রেণীর আচার্য্যেরা বলিবেন "খুব ঠিক!" কিন্তু যদি বলা যায় যে মঙ্গল-কার্য্যের পথপ্রদর্শক মনুষ্যের অন্তরাত্মা, তবে তাঁহারা হয় তো বলিবেন "অন্তরাত্মা বলিতেছ কাহাকে? আমরা তো জানি conscience শব্দের দেশীয় প্রতি-শব্দ বিবেক।" ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, তাহা তাঁহারা যেমন জানেন, তেমনি এটাও তাঁহাদের জানা উচিত যে, আমাদের দেশের স্বভাষী আচার্য্যগণের অভিধানে বিবেক-শব্দের অর্থ মূলেই conscience নহে। আমাদের দেশের পুরাতন শাস্ত্রকারদিগের মতে ত্রিগুণাত্মক তত্ত্বের সংস্পর্শ হইতে ত্রিগুণাতীত তত্ত্ব বিবিক্ত

করিয়া লওয়াই বিবেকের মুখ্যতম কার্য্য। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বিবেকের লক্ষ্য পাপপুণ্যের অধিকার-বহির্ভূত ত্রিগুণাতীত প্রদেশের প্রতিই নিবিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে conscienceএর লক্ষ্য পুণ্য পাপের অধিকারায়ত্ত প্রদেশে ভিতরেই নিয়ত আবদ্ধ থাকে, তাহার ঊর্দ্ধে যায় না। দুয়ের মধ্যে যখন এইরূপ মর্ম্মান্তিক প্রভেদ, তখন বিবেককে conscience-এর প্রতিশব্দ করিয়া দাঁড় করানোও যা, আর কোনো যোগী মহাপুরুষকে ধরিয়াবাঁধিয়া ইংরাজ সাজানোও তা—একই কথা Kant প্রজ্ঞাকে (Reason কে) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন—Practical (অর্থাৎ Ethical) এবং Speculative (অর্থাৎ Theoretical)। এখন দ্রষ্টব্য এই যে পাশ্চাত্য ভাষায় consciousness শব্দ দার্শনিক জ্ঞানের (theoretical reason-এর) যে স্থান অধিকার করে, conscience শব্দ ব্যবহারিক জ্ঞানের (practical reason-এর) বা নৈতিক জ্ঞানের (ethical reason-এর) অবিকল সেই স্থান অধিকার করে। Consciousness সাংখ্যের দ্রষ্টা পুরুষের ন্যায় উদাসীন সাক্ষী ; তাহার চক্ষে ধর্ম্মও যেমন, অধর্ম্মও তেমনি, দুইই জ্ঞেয় বিষয় মাত্র—তাহার অধিক আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে, conscience পাপপুণ্যের সেরূপ উদাসীন সাক্ষী নহে। Conscience-এর চক্ষে পুণ্য অনুরাগভাজন ; পাপ বিরাগভাজন। Consciousness কেবল মাত্র দ্রষ্টা তাহা নিছক জ্ঞান। পরন্তু conscience দ্রষ্টা ভোক্তা এবং নিয়ন্তা তিনই একাধারে ; conscience পাপপুণ্যের দ্রষ্টা এই অর্থে সাক্ষী পুরুষ, পাপপুণ্যের ভোক্তা তাই পুণ্যের প্রতি সুপ্রসন্ন এবং পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ; conscience পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা এবং পাপের শাস্তা এই অর্থে অন্তর্য্যামী পুরুষ ; conscience আত্মপ্রকাশ, আত্মানন্দ, এবং আত্মশক্তি তিনই একাধারে, এই অর্থে অন্তরাত্মা। তাই আমাদের স্বদেশীয় ভাষার অন্তরাত্মা শব্দে conscience-এর মর্ম্মগত ভাবার্থটি যেমন খোলে এমন আর কোনো দেশীয় ভাষার কোনো শব্দে নহে। ইহা সত্ত্বেও আমাদের দেশের নব্য আচার্য্যেরা যে স্বভাষার অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যের প্রতি ইচ্ছা করিয়া অন্ধ হইয়া পরভাষিত্ব ব্রত অবলম্বন করেন, ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে। আমরা একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আনন্দ সত্ত্বগুণের হৃদয়, প্রকাশ সত্ত্বগুণের বাম হস্ত এবং আত্মশক্তি সত্ত্বগুণের দক্ষিণ হস্ত। এখন বলিতে চাই এই যে, সত্ত্বগুণের সেই যে হৃদয়—কি না আত্মসত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ, তাহাই অন্তরাত্মার বসতিস্থান। মঙ্গলের অনুষ্ঠানে আত্মশক্তির কিরূপ কার্য্যকারিতা তাহার সন্ধান পাইতে হইলে, এই স্থানটির আদ্যোপান্ত বিশেষমতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। আগামীবারে তাহারই চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনরি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইঁহার ধর্ম্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি, এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিষটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভাল বোধ হয় না।

মোটের উপর তাঁহার এই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্ব্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসঙ্গত

হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় ত জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা ত সাধারণ শিক্ষকের কর্ম্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটারকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয়—তাহাতে অনেক ঢেলার অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মত চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতর পাইকারীভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্ব্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ আপনার নিজের প্রণালীমতই কাজ করিবেন, আমি কোনো প্রকার ফরমাস করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে। বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন—সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনরির মত মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।

তাহার পরে মাঝে মাঝে নানাদিক্ দিয়া তাঁহার পরিচয়লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিষ ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

আজ এই কথা আমি অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।

নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্ব্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কি, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্ব্ব প্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিষটা যে কত বড় তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন;—তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই;—প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি

স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা
From a Crayon Sketch.

দান করিয়াছেন, সে জন্য মানুষ যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন—নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছু না—ভয় না, সঙ্কোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।

এই যে এতবড় আত্মবিসর্জ্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জ্জনকে অত্যন্ত অসঙ্কোচে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড় একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কি বুদ্ধি, কি হৃদয়, কি ত্যাগ, প্রতিভার কি জ্যোতির্ম্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের গর্ব্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনো আমরা গর্ব্ব করিতেছি। তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সেদিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা সে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, যে পরিমাণে এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড় কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই ধর্ম্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড় করিয়া লইতেছি তাঁহার দিকের দানকে ততই খর্ব্ব করিতেছি।

বস্তুত তিনি কি পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে—অর্থাৎ আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন একথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন—তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্ত্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্ত্তমানকালে যাহাকে সর্ব্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড় করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নির্ব্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।

যেমনি হোক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেইদিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষে পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কর্ম্মী ছিলেন। কর্ম্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই—কেন না তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিষটা অক্ষুণ্ণ অক্ষত। এই জন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্ম্মকে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া থাকে। তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজো লোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্ম্মের কাছ হইতে খুব বড় জিনিষ দাবি করে না বলিয়া কর্ম্মের কোনো অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, যেখানে তাহা সত্য, এবং কর্ম্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনামাত্র নহে, যেখানে তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড় হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্য্যের বর্ণচ্ছটার মত কিরূপ সৌন্দর্য্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম্ম যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা যেসকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনটারই আয়তন বড় ছিল না, তাহার সকল-গুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড় আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে

তাহা একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড় করিয়া দেখাইতে হইলে যেসকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয় তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

এইজন্যই এই একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার এমন অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে যে কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন তাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মত একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ। তাঁহার এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনোদিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহারও নিকট হইতে কোনোদিন ইহার জন্য তিনি অর্থ সাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।

তাঁহার শক্তি অল্প বলিয়াই যে তাঁহার অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র ইহা সত্য নহে।

একথা মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতার যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার যে-কোনো স্বদেশীয়ের নিকটসংস্রবে তিনি আসিয়াছেন সকলেই তাঁহার প্রবল চিত্তশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট যে খ্যাতি তিনি জয় করিয়া লইতে পারিতেন সেদিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই।

তাহার পর এদেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এখানেও তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করে নাই। অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারত-বর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। কিন্তু শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয়।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। অথচ নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্ব্বেই এ কথার আভাস দিয়াছি তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দ্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার এই পাশ্চাত্যস্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোন অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না—কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু—তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজে লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতর-কার সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এদেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।

অথচ তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহার মধ্যে রুচিগত বা বুদ্ধিগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল;—তিনি জন-সাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্য উমেদারী করেন নাই তাহা নহে। জন-সাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিষ

তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত—এসম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্ত্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই "পীপ্‌ল্‌"কে এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্ত্তি ত ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখি নাই। এসম্বন্ধে পুরুষের যে কর্ত্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটি ত লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয় ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকট করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ঐরূপ কোনো একটা সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহার কারণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ ব্যাপক সত্তাকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়া দেখি না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক্ দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমানরমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে—কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি শিল্পসাহিত্য তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়া নয় আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নিত্য পদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটি গভীর মাতৃস্নেহ বশতই তিনি এই ভালটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। এই আগ্রহের বেগে কখনও তিনি ভুল করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু শ্রদ্ধার গুণে তিনি যে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন সমস্ত ভুল তাহার কাছে তুচ্ছ। যাঁহারা ভাল শিক্ষক তাঁহারা সকলেই জানেন শিশুর স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃতি একটি শিক্ষা করিবার সহজ প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; শিশুদের চঞ্চলতা, অস্থির কৌতূহল, তাহাদের খেলা ধূলা সমস্তই প্রাকৃতিক শিক্ষাপ্রণালী; জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রকারের একটি শিশুত্ব আছে। এইজন্য জনসাধারণ নিজেকে শিক্ষা দিবার ও সান্ত্বনা দিবার নানাপ্রকার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। ছেলেদের ছেলেমানুষী যেমন নিরর্থক নহে তেমনি জনসাধারণের নানাপ্রকার সংস্কার ও প্রথা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা নহে—তাহা আপনাকে নানা প্রকারে শিক্ষা দিবার জন্য জনসাধারণের অন্তর্নিহিত চেষ্টা—তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক

শিক্ষার পথ। মাতৃহৃদয়া নিবেদিতা জনসাধারণের এইসমস্ত আচারব্যবহারকে সেইদিক হইতে দেখিতেন। এইজন্য সেইসকলের প্রতি তাঁহার ভারি একটা স্নেহ ছিল। তাহার সমস্ত বাহ্যরূঢ়তা ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির চিরন্তন গূঢ় অভিপ্রায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা একদিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর একদিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মত প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্ম্মম-ভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না—অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছ হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্যলোকের অসঙ্গত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন; কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এইসকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার "পীপল্"দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভাল তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধাদৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহা-দিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন। তাহার কারণ এ নয় যে সত্য গোপন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার কারণ এই যে তিনি জানিতেন, অশ্রদ্ধার দ্বারা ইহাদিগকে অপমান করা অত্যন্ত সহজ এবং স্থূলদৃষ্টি লোকের পক্ষে তাহাই সম্ভব—কিন্তু ইহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে যেখানে লক্ষ্মী বাস করিতেছেন সেখানে ত এই সকল শ্রদ্ধাহীন লোকের প্রবেশের অধিকার নাই—এইজন্যই তিনি এই সকল বিদেশীয় দিঙনাগদের "স্থূলহস্তাবলেপ" হইতে তাঁহার এই আপন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, এবং আমাদের দেশের যেসকল লোক বিদেশীর কাছে এই দীনতা জানাইতে যায় যে, আমাদের কিছুই নাই এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার তীব্ররোষের বজ্রশিখার দ্বারা বিদ্ধ করিতে চাহিতেন।

এমন যুরোপীয়ের কথা শোনা যায় যাঁহারা আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া, বেদান্ত আলোচনা করিয়া, আমাদের কোনো সাধুসজ্জনের চরিত্রে বা আলাপে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন; অবশেষে দিনে দিনে সেই ভক্তি বিসর্জ্জন দিয়া রিক্ত হস্তে দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্রে যাহা পড়িয়াছেন সাধুচরিতে যাহা দেখিয়াছেন সমস্ত দেশের দৈন্য ও অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের যে ভক্তি সে মোহমাত্র, সেই মোহ অন্ধকারেই টিঁকিয়া থাকে, আলোকে আসিলে মরিতে বিলম্ব করে না।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহা সত্যপদার্থ, তাহা মোহ নহে—তাহা মানুষের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিত না, তাহা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থানে পৌঁছিয়া একেবারে মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত। এই জন্য অত্যন্ত দীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশকে দেখিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সমস্ত দৈন্যই তাঁহার স্নেহকে উদ্বোধিত করিয়াছে, অবজ্ঞাকে নহে। আমাদের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, বেশভূষা, আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ একজন য়ুরোপীয়কে যে কিরূপ অসহ্যভাবে আঘাত করে তাহা আমরা ঠিকমত বুঝিতেই পারি না, এই জন্য আমাদের প্রতি তাহাদের রূঢ়তাকে আমরা সম্পূর্ণই অহেতুক বলিয়া মনে করি। কিন্তু ছোট ছোট রুচি, অভ্যাস ও সংস্কারের বাধা যে কত বড় বাধা তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, কারণ, নিজেদের দেশের ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে আমাদের মনেও সেটা অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে। বেড়ার বাধার চেয়ে ছোট ছোট কাঁটার বাধা বড় কম নহে। অতএব এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালীপাড়ার এক গলিতে একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন তাহার দিনে রাত্রে প্রতি মুহূর্ত্তে বিচিত্র বেদনার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল। এক প্রকার স্থূলরুচির মানুষ আছে তাহাদিগকে অল্প কিছুতেই

স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা

(উদ্বোধন কার্য্যালয়ের ব্লক হইতে)

স্পর্শ করে না—তাহাদের অচেতনতাই তাহাদিগকে অনেক আঘাত হইতে রক্ষা করে। ভগিনী নিবেদিতা একেবারেই তেমন মানুষ ছিলেন না। সকল দিকেই তাঁহার বোধশক্তি সূক্ষ্ম এবং প্রবল ছিল; রুচির বেদনা তাঁহার পক্ষে অল্প বেদনা নহে; ঘরে বাহিরে আমাদের অসাড়তা, শৈথিল্য, অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল প্রকার চেষ্টার অভাব, যাহা পদে পদে আমাদের তামসিকতার পরিচয় দেয় তাহা প্রত্যহই তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেই-খানেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই যে প্রতিমুহূর্ত্তের পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।

শিবের প্রতিই সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্দ্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতীও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্দ্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য:ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মত এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?

একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণা সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বি, তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিতেছ তিনি কি তোমার মত রূপসীর এত কৃচ্ছ্রসাধনের যোগ্য? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, তাঁহার যে আচার অদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া-ছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি তাঁহারি মধ্যে আমার সমস্ত মন "ভাবৈকরস" হইয়া স্থিত রহিয়াছে।

শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল। এই জন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাঁহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর করিয়া দেয়—যেন এই কথাটিকে নিঃসংশয় সত্যরূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব আছেন, দরিদ্রের জীর্ণকুটীরে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও তাঁহার দেবলোক প্রসারিত—এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিরূপতা ও কদাচারের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া এই পরমৈশ্বর্য্যময় পরমসুন্দরকে ভাবের দিব্য দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন তিনি মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং যাহা কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন।* তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্ত্তকালের জন্য দৃক্‌পাতমাত্র করেন না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

আমার চীন-প্রবাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তিয়েনসিন হইতে চীন-রাজকীয় রেলপথে চীনদেশের রাজধানী পিকিন রওনা হই। জলপথে চীনাবোটেও পিকিন যাওয়া যায়। বোটে যাইতে হইলে তিয়েনসিন হইতে টাংচাউ যাইয়া খচ্চরবাহিত গাড়ীতে পিকিন যাইতে হয়। তিয়েনসিন হইতে পিকিন ৮৪ মাইল। পিকিন রাজধানী দুই খণ্ডে বিভক্ত। একটি তাতার বা মাঞ্চু-নিবাস, অপর খণ্ডে চীনাদিগের বাস। এই দুই খণ্ড চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। কুড়ি মাইলেরও অধিক হইবে। মাঞ্চুগণ জয়লাভের সময় হইতে উল্লিখিত দুই ভাগ পৃথক করিয়া আর একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করে। তাতারদিগের থাকিবার স্থান আকারে চতুষ্কোণ এবং চীনাদিগের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। উহা রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। চীনগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ কুবলাই খাঁর বংশধরগণ চীনরাজসিংহাসনে আরোহণের সময়ে চীনরাজধানীর যেরূপ অবস্থা ছিল এখনও প্রায় তদ্রূপই আছে।

তাতার শহরেও সেই উচ্চ প্রাচীর, দ্বিগুণিত নবদ্বার সংযুক্ত, সেই স্তম্ভপরিখা দ্বারা সুদৃঢ়ীকৃত। পিকিনের মধ্যভাগের দরজার একটী চিত্র পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিক স্থায়ী মাঞ্চু-সেনানিবাস দ্বারা সুরক্ষিত। এই প্রধান শহরের প্রাচীন প্রাকার সত্যসত্যই বিস্ময়োৎপাদক। ইহা মনুষ্যক্ষমতার এক বিপুল কীর্ত্তিস্তম্ভ। প্রাচীরের ভিত্তিস্থল প্রায় ৬০ ফুট। উপরের প্রশস্ততা প্রায় ৪০ ফুট। এবং উচ্চতায়ও ৪০ ফুটের কম নয়। অধুনা যুদ্ধবিদ্যার যেসকল উপকরণাদি প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে এই অত্যদ্ভুত প্রাচীর বাধাদানের পক্ষে বড় একটা কার্য্যকর বলিয়া বোধ হইল না। দরজার নিকট ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত মরিচাধরা কতকগুলি কামান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এই যে উচ্চ প্রাকার ইহার উপরিভাগে কামানাদি কিছুই ছিল না। চতুর্দ্দিকের পরিখাও অনেকস্থলে ভরাট হইয়া শুষ্কপ্রায় হইয়াছে। কোনকালে যে জীর্ণসংস্কার হইয়াছে এমত বলিয়া বো[ধ] হইল না। চীনগবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সীমান্তপ্রদেশ এব[ং] সমুদ্রতীর সুরক্ষার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু এদিকে রাজধানীর [এ]ই অবস্থা।

পিকিনে প্রশস্ত রাজপথ এবং সুন্দর সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী নয়নপথে পতিত হইল। কিন্তু উক্ত রাজপথগুলি অত্যন্ত শোচনীয় দশায় পরিণত হইয়াছে। বৃষ্টি হইলে রাস্তার মাঝে কোনস্থলে কর্দ্দম, কোন স্থানে পাগাড়া; আবার রৌদ্র হইলে পথ ধূলায় পরিপূর্ণ। তবে মোটের উপর যদি ধূলি কর্দ্দম না থাকিত তাহা হইলে পিকিনের রাস্তাগুলির দৃশ্য অতি সুন্দর। রাস্তার দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ দোকানপসার। এইসমস্ত বিপণীতে চীনদেশের উৎপন্ন প্রত্যেক জিনিষই পাওয়া যায়। দোকানের পরেই ফুটপাথ বা লোক চলিবার রাস্তা। এইসব দোকানগুলি সমস্তই চীনাদের। তাতার জাতি আমাদের বাঙ্গালীর ন্যায় ব্যবসায় করিতে বড়ই নারাজ। পয়সা থাকিতেও তাহারা ব্যবসায় বাণিজ্য করা অপমানের কাজ মনে করে। সুতরাং তাহাদের অবস্থা চীনজাতি অপেক্ষা যে হীন হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তাতার শহরেও চীনারাই দোকানপাট করে। পিকিনের বিপণীশ্রেণী চিত্তাকর্ষক। অনেকগুলির সম্মুখভাগ এমন সুন্দরভাবে চিত্রিত, কারুকার্য্যখচিত, স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত যে সেগুলি কাচের আলমারির মধ্যে রাখিবার উপযুক্ত। দোকানের মধ্যভাগ ততোধিক মনোহর। চীনব্যবসায়ীদিগকে দেখিয়া খুব সুখী বলিয়া মনে হইল। ফুটপাথের উপর অনেক ফেরিওয়ালাও সময় সময় বসিয়া জিনিস বিক্রয় করে। তাছাড়া যাদুকর, ভাট, গল্পকথক, কুৎসিত ছবিওয়ালা আছে। তাহারা কতকঅংশ ফুটপাথ অধিকার করিয়া স্ব স্ব ব্যবসা চালাইতেছে। উঁকি মারিয়া ছবি দেখা (peep-show) আমাদের দেশে এক পয়সায় দিল্লী, লাহোর দেখার মত, কিন্তু সেই ছবিগুলি অতি কুৎসিত। প্রকাশ্যভাবে রাজপথে যে এরূপ কুৎসিত চিত্র ইত্যাদি দেখাইতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না। সেগুলি এত কদর্য্য যে দেখিলে নিজেরই লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু

যে দেখাইতেছে তাহার মুখে লজ্জার লেশমাত্রও নাই। পুতুল নাচও দেখান হইয়া থাকে।

রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিক প্রাচীরবেষ্টিত। মধ্যে তিনটী আঙ্গিনা,—বহির্ভাগ রাজকীয় দাসদাসীদের জন্য, মধ্যভাগ রাজসভা ইত্যাদির জন্য, এবং অন্তঃপুর রাজপরিবারের জন্য।
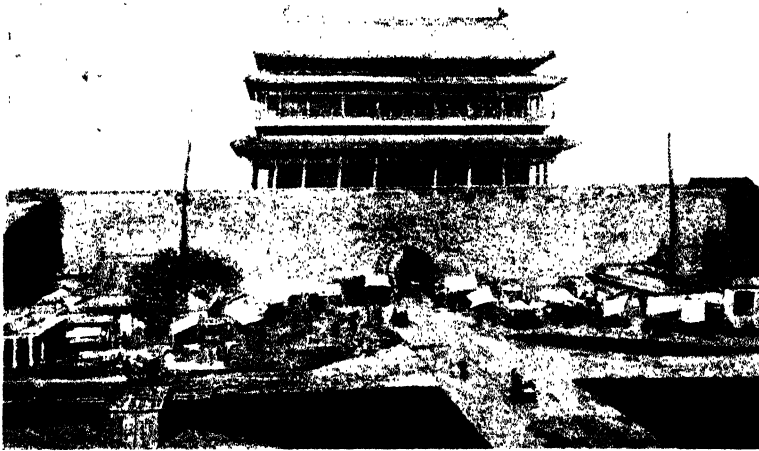
পিকিনের শহর মধ্যস্থ একটি প্রাচীর।

পিকিন শহরের তাতার অংশ প্রায় সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবসম্পন্ন অবস্থায় রাখা হইয়াছে। পবিত্র শহর মধ্যস্থলে অবস্থিত। তিনটী প্রধান রাস্তা উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটী রাজপ্রাসাদের ফটক পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে। অপর দুইটী দুই দিক হইতে প্রায় সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। অন্যান্য অনেক ছোটখাট রাস্তা আছে।

রাজপ্রাসাদ, লামামন্দির, স্বর্গমন্দির, চিফুরাজপ্রাসাদ এবং রাজকীয় উচ্চকর্ম্মচারীর ইয়ামেন ব্যতীত সাধারণের বাসভবন এক রকম বাঁধাবাঁধি ধরণে উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে, কারণ আইন দ্বারা ঐরূপ বাঁধাবাঁধি হিসাব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণের চক্ষুর অগোচর রাখার জন্যই এইরূপ নিয়ম। পিকিন শহরের উত্তরপূর্ব্ব দিকে বিখ্যাত ইয়াং-হো-কুঙ লামা-সরাই। তাতার শহরের পূর্ব্বভাগে মানমন্দির। কনফুসিয়েন মন্দিরও প্রাসাদাদির ন্যায় প্রাকারবেষ্টিত। সদর দরজা দিয়া শেষোক্ত পবিত্র মন্দিরে ঢুকিতে বৃক্ষাবলী পরিশোভিত পথ অতিক্রম করিতে হয় (চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই দরজা পার হইয়া একটা প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড স্তম্ভ বর্ত্তমান দেখা যায়, ইহা প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার চতুর্দ্দিক শিলালিপির দ্বারা উৎকীর্ণ। খোদিত মার্ব্বেল দ্বারা তিন স্তর করিয়া রেলিং-দেওয়া স্তম্ভশ্রেণী। কনফুসিয়েন মন্দিরের নিকটে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা কো-জি-কিন অবস্থিত। পি-ইয়াং-কুং বা সর্ব্বোত্তম গ্রন্থনিচয়ের দালানের চতুর্দ্দিকে প্রায় দুইশত প্রস্তরনির্ম্মিত ফলক (tablet)। নয়খানি পবিত্র গ্রন্থের সম্পূর্ণ মূল বচন তাহাতে উৎকীর্ণ। কাশীধামের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ বাপুদেব শাস্ত্রী যেমন তথাকার মানমন্দিরের জন্য প্রস্তর দ্বারা কতকগুলি যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিয়াছিলেন, সেইরূপ চীন দেশের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ কো-সো-কিংও অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্যাসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিয়া ঐ দেশে চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

চীনসম্রাজ্ঞী (ডাউয়েজার) এক অসাধারণ রমণী। এরূপ রমণীরত্ন পৃথিবীর কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কোমলে কর্কশ, পরুষে সরস, স্নেহ নির্ম্মমতার একত্র সমাবেশ এই রমণীতেই শুধু দৃষ্ট হয়। ইনি অদ্ভুতকর্ম্ম কুশলা, অসাধারণ তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী, অসামান্য রূপলাবণ্যবতী রমণী। এই অসাধারণ শক্তিসম্পন্না রমণীর ঈষৎ অঙ্গুলি-হেলনে আজ অষ্টবজ্র একত্রিত, বিচলিত, সংক্ষুব্ধ! ইনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মাঞ্চুজাতীয় ইহোনালা বংশীয় এক সাধারণ গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি লোকললামভূত সৌন্দর্য্যপ্রভাবে রাজপ্রাসাদ আলোকিত করিয়া স্বকীয় ক্ষমতা পরিচালনে সমর্থা হইয়াছিলেন। বংশনামানুসারে বাল্যকাল হইতেই ইহাকে ইহোনালা নামে অভিহিত

কন্‌ফুসিয়েন মন্দির।

দেখিয়া থাকে। পিকিনের নয়টী প্রধান দরজা। সম্রাট সমক্ষে গিয়া নয়বার অবনতজানু হইয়া সম্মান দেখাইতে হয়। স্বর্গমন্দিরে পর পর তিনটী ছাদ। মার্ব্বেল বেদীতে তিনটী স্তর, এবং ইহার প্রত্যেক বস্তুই তিন বা নয় দ্বারা চিহ্নিত। যতগুলি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মন্দির আছে তন্মধ্যে স্বর্গমন্দিরের পবিত্রতা চীন জাতির চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (মন্দিরের চিত্র দ্রষ্টব্য)। তথায় সম্রাট শীত-কালের সৌরমাসে ধূপ ধূনা জ্বালাইয়া বলি প্রদান করেন। এই স্থানে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে তিন বার বলি প্রদত্ত হয়। ঐগুলিকে তা-জি অর্থাৎ প্রধান বলি, চুং-জি বা মধ্য বলি, এবং সিয়ন-জি বা ক্ষুদ্র বলিরূপে পৃথক করা হয়। সূর্য্য মন্দিরেও এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বলি প্রদত্ত হয় (চিত্র দ্রষ্টব্য).

করা হয়, এবং চীন সাম্রাজ্যেও রাজ্ঞী ইহোনালা নামেই সমধিক পরিচিতা। চীনের রাজকীয় পুস্তকে এই রাজ্ঞীর অশেষ গুণের বর্ণনা আছে। ইনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইহার জন্ম ও মৃত্যু একই মাসে সংঘটিত হয়। এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

পিকিনের উত্তরপশ্চিমে আট মাইল দূরে সম্রাটের গ্রীষ্ম প্রাসাদ। ঐ স্থানের নাম ইয়েন মিং-ইয়েন। পদ্মহ্রদতীরে এই নন্দনকাননোপম সুরম্য প্রাসাদ অবস্থিত। কথিত হ্রদের উপর সতেরটি খিলানের একটী মার্ব্বেল পাথরের নির্ম্মিত মনোরম পুল আছে। একখানি সুবৃহৎ মার্ব্বেল বোট হ্রদতীরে জলমধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার কারুকার্য্য এবং গঠনপ্রণালী অতীব মনোহর। গ্রীষ্মপ্রাসাদে ও-ফো-জি বা ধ্যানস্তিমিতলোচন বুদ্ধের একটী মঠ আছে। ইহা ছাড়া আরও বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের অনেক মূর্ত্তি সেই মঠে ছিল, কিন্তু অনেকগুলি বিদেশীয়ের হস্তে স্থানচ্যুত এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। পিকিনের এক মাইল দূরে উত্তরদিকে হোয়াং-সি মঠ। এই স্থানে স্বর্ণচূড় মার্ব্বেল স্মৃতিস্তম্ভ তিব্বতের বানজিন লামার পরিচ্ছদ এবং দেহাবশেষের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার কারুকার্য্য অত্যন্ত সুদৃশ্য, নয়নমনোহারী।

চীনেরা তিন এবং নয় সংখ্যাকে খুব সম্মানের চক্ষে

পিকিনের লামামন্দির একটী দর্শনীয় স্থান। মন্দিরে অনেক লামা পুরোহিত বাস করিয়া থাকে। এই মন্দিরে পিত্তল নির্ম্মিত অনেক তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। একখানি তারামূর্ত্তি দেখিলাম তাহার ছয় হাত, আর সমস্তই কালী মূর্ত্তির মত,—সেই করালবদনা লোলজিহ্বা, গলদেশে নৃমুণ্ডমালা, কটিদেশ রিপুকরপরিশোভিত, খর্পরহস্তা বরাভয়দায়িনী। আর দেখিলাম পালিভাষায় লিখিত অনেক হস্তলিখিত পুঁথি। মন্দির মধ্যে শাক্য বা চম্পামুনির এক অতি বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। তাহার উচ্চতা ৪০ ফুট, এক হস্তে পদ্ম, অপর হস্তে পুঁথি, মূর্ত্তির নিম্নে লেখা 'মনি, পদ্মে, হুম'। এত বড় মূর্ত্তি জীবনে আর কখনও দেখি নাই। দেখিলে বোধ হয় দুই এক বৎসরের তৈয়ারী, এমনই রং ফলান, এমনই চক্‌চকে। পিকিনে অতি সুন্দর ইনামেলের কাজ হইয়া থাকে। কারুকার্য্য-খচিত চীনে মাটির এবং ধাতুনির্ম্মিত এক প্রকার মূল্যবান পাত্র চীনদেশে প্রস্তুত হয়, তাহাকে ইংরাজীতে Chinese vase বলে। এগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি মনোরম।

স্বর্গমন্দির।

সূর্য্যমন্দির।

কেহ খুন করিলে কিম্বা ঘরে আগুন দিলে চীনে এক প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা আছে, সেটা কিছু নূতন ধরণের। এই শাস্তিগৃহ চিফু রাজপ্রাসাদে আছে। এই যন্ত্রণাগার আয়তনে ছোট। প্রায় আট ফুট লম্বা। গৃহের একটী মাত্র দরজা। মেজে ফাঁপা, একখানি লৌহশলাকা নির্ম্মিত ঝাঁঝরা দ্বারা আবৃত। পাঠক কয়লার উনানের ধারণা করিয়া লইলেই ইহার আকৃতি বুঝিতে পারিবেন। যে ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হইবে তাহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া উক্ত শলাকানির্ম্মিত বিছানায় শয়ন করাইয়া হস্তপদ লৌহতার দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বেই ঘরের নীচের ফাঁকা স্থান কাষ্ঠ দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখা হয়, পরে এক ব্যক্তি তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেয়। হস্তপদবদ্ধ ব্যক্তির অবস্থা তখন কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়। ক্রমে অগ্নিতাপে হতভাগা ঝলসিয়া প্রাণত্যাগ করে। কখন কখন এই প্রক্রিয়া ২৪ ঘণ্টাও চলিয়া থাকে। কি ভীষণ শাস্তি! কি নৃশংসতা! মানুষ মানুষের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারে ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। চীন দেশের আর এক প্রকার শাস্তি মাথা কাটিয়া ফেলা। যাহাদের শিরশ্ছেদের হুকুম হয়, তাহাদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া বধ্যভূমিতে আনা হয়। কাটিবার পূর্ব্বে চক্ষুদ্বয় কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া রাখা হয়। ঘাতক তরবারি বা একখানা বড় দার আঘাতে হতভাগাকে সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করে। কখনও কখনও অপরাধীকে আত্মহত্যা করিবার সুযোগ দেওয়া হয়।
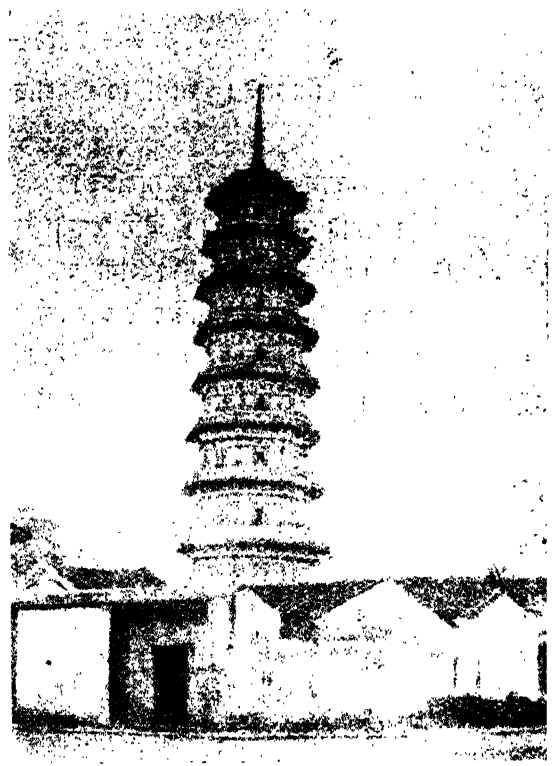
পিকিনে অনেকগুলি সাধারণ স্নানাগার আছে। একই গৃহের একাংশ স্ত্রীলোকদের জন্য, অপর অংশ পুরুষের জন্য নির্দ্দিষ্ট, মধ্যস্থলে পরদা দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত। সেখানে টব ভরিয়া ঠাণ্ডা এবং গরম জল, তোয়ালে, সাবান মজুদ থাকে। পাঁচ সেণ্ট দিয়া স্নান করিতে হয়। উলঙ্গ হইয়া স্নানের ব্যবস্থা। আমরা ৩।৪ দিন ঐরূপ একটী

স্নানাগারে গিয়াছিলাম। যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন পাইয়াছিলাম। কিন্তু অনভ্যাস বশতঃ কখনও উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করিতে পারি নাই। জাপানেও শুনিয়াছি এইরূপ নিয়ম।

চীনদেশে মঙ্গোল রাজবংশ সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই রাজবংশের প্রথম সম্রাট কুবলাই খাঁ। ইনি সেনাপতি হইতে সম্রাট হন্। ইনিই পিকিন রাজধানী স্থাপিত করেন। প্রায় ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পিকিনেই রাজধানী। এই রাজবংশ ৮৯ বৎসর রাজত্বের পর মিং রাজবংশের দ্বারা বিতাড়িত হয়। পিকিনকে চীনেরা পাইচিং বলে, ইহার অর্থ উত্তর রাজধানী। নানকিং কোন সময়ে চীনের দক্ষিণ রাজধানী ছিল। পূর্ব্বে বার্ত্তাবাহক দ্বারা ডাক প্রেরিত হইত। ডাকের ঘোড়া স্থানে স্থানে বদল করিয়া দিনের মধ্যে দুইশত মাইল ডাক যাইত।

চীনের রাজ্যশাসন স্বেচ্ছাচারপ্রণালীতে। সম্রাটের দুইটী কৌন্সিল বা সভা আছে। একটীকে 'লুইকো' বা কেবিনেট বলে, অপরটীকে সাধারণ সভা বলে। ইহার অধীনে আবার ছয়টী শাখা সভা বা 'লুকপো' আছে। এই সভা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্পাদিত হয়।

ইয়াও রাজের সময়ে (২৩৫৬ পূঃ খৃঃ) চীনদেশে প্রথম আইন প্রণয়ন হয়। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিকোয়াই প্রথম ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধ করেন। ছয় ভাগে ইহা বিভক্ত।

চীনের উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে মাণ্ডারিন (Mandarin) বা 'কুন' বলে। পর্ত্তুগিজ মান্দার শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। যাহাদের হুকুম চলে তাহারাই উক্ত আখ্যায় পরিচিত। সামান্য রাজকর্ম্মচারীকে মাণ্ডারিন বলা যায় না। ইঁহাদিগের পরিচ্ছদ নানাবিধ পশুপক্ষীর চিত্রে অঙ্কিত থাকে। ভিন্ন রংয়ের বোতাম এবং ময়ূর-পুচ্ছে পদমর্য্যাদা জ্ঞাপিত হয়। পীতবস্ত্র ধারণও সম্মান-জ্ঞাপক। স্ফটিকমালা ধারণও রাজকর্ম্মচারীর চিহ্ন। চীন-সম্রাট কোন ব্যক্তিকে পদমর্য্যাদা দান করিয়া কোন কারণে উক্ত ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে পুনর্ব্বার সেই মর্য্যাদা কাড়িয়া লইতে পারেন। বিখ্যাত লি-হং-চংয়ের অদৃষ্টে জাপান-যুদ্ধের সময়ে ঐরূপ ঘটিয়াছিল, কিন্তু সে অল্প-কালের জন্য।

লি-হং-চং একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবেত্তা, প্রধান সেনাপতি এবং শাসনকর্ত্তা। পৃথিবীর মধ্যে সাড়ে তিন জন রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তি ছিলেন এইরূপ কথিত আছে। গ্লাডষ্টোন, প্রিন্স বিসমার্ক, লি-হং-চং এবং আমীর আবদুর রহমান। প্রথমোক্ত তিনজন সম্যক রাজনীতিজ্ঞ এবং শেষোক্ত অর্দ্ধনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। লি-হং-চং ক্রোড়পতি ছিলেন বলিয়া বিখ্যাত।

চীনদেশে সম্ভ্রান্ত এবং ধনী ব্যক্তিদিগের মধ্যে পাঁচটী পদবী আছে, যথা,—কুং, হাউ, পাক, টজ এবং নাম। আমাদের দেশের মহারাজা, রাজা, জমীদার, তালুকদার এবং জোতদারদিগের সহিত কতকাংশে উহাদের তুলনা হইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল পদবী ফাঁকা রাজা, মহারাজা হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। চীন গবর্ণমেণ্ট নিজে জমিবিলি করেন। জমির খাজানা পঁচিশ সেণ্ট বা প্রায় ছয় আনা প্রতি একর। এক একর প্রায় ৩ বিঘা।

ড্রেগন বা কাল্পনিক পক্ষবিশিষ্ট সরীসৃপ রাজকীয় চিহ্ন, ও রাজশক্তির প্রতিরূপ। সম্রাট সম্বন্ধে যাহা কিছু এই চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাপিত হয়। সম্রাটের শরীরকে ড্রেগন শরীর, মুখকে ড্রেগনের মুখ, চক্ষুকে ড্রেগনের চক্ষু, সন্তান-গণকে ড্রেগন-সন্তান ইত্যাদি বলিতে হয়। সিংহাসন ড্রেগনের বসিবার স্থান, সিংহাসনারোহণকে ড্রেগনের আকাশ-পথে গমন বলে। সম্রাটের মৃত্যু হইলে 'ড্রেগনের উপর চড়িয়া পরমেশ্বরের অতিথি হইতে গিয়াছেন' বলা হয়। প্রাসাদস্থিত সকল বস্তু ড্রেগন চিহ্নে চিহ্নিত করা হয়। এই অদ্ভুত জীবকে পঞ্চনখরযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কোনও চীন গ্রন্থকার উক্ত জীবকে এইরূপ বর্ণনা করিয়া-ছেন, 'উষ্ট্রের মস্তকের ন্যায় মস্তক, হরিণের ন্যায় শৃঙ্গ, শশকের ন্যায় চক্ষু, ষাঁড়ের ন্যায় কর্ণ, সর্পের ন্যায় গণ্ডদেশ, অজগরের ন্যায় উদর, মৎস্যের ন্যায় আঁইস, ঈগল পক্ষীর ন্যায় নখর এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় থাবা। নয় শ্রেণীতে নয়খানি করিয়া ৮১খানা আঁইস। ইহার স্বর ঢাক বাদ্যের ন্যায়। মুখের উভয় পার্শ্ব রোমশ। চিবুকের নিম্নে একখানা উজ্জ্বল মুক্তা আছে। নিশ্বাস মেঘরূপে নির্গত

হয়, ইহাই কখন বৃষ্টি এবং কখন অগ্নিতে পরিণত হয়।' *ইচ্ছানুসারে এই অদ্ভুত জীব নিজ দেহ সঙ্কুচিত এবং* প্রসারিত করিতে পারে। আধুনিক চীন জাতি ইহাকে বরুণদেবের আসন প্রদান করিয়াছে। ইহার নাকি সমুদ্রতলে মুক্তাময় প্রাসাদ আছে, এবং ইনিই জল ও বৃষ্টি প্রদান করিয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করেন।

ইংরাজী জানুয়ারী এবং কখন ফেব্রুয়ারী মাসে চীন জাতির নববর্ষ আরম্ভ হয়। এই সময়ে দোকান পাট পনর দিন বন্ধ থাকে। হিসাব নিকাশ এবং দেনা পাওনা পরিষ্কার হয়। জুন কিম্বা জুলাই মাসের পঞ্চম চন্দ্রের পঞ্চম দিনে ড্রেগনের নৌকা উৎসব হইয়া থাকে, কেহ কেহ এই সময়েও হিসাব নিকাশ করিয়া থাকে। সেপ্টেম্বর কিম্বা অক্টোবর মাসে অষ্টমচন্দ্রের পঞ্চদশ দিবসে চান্দ্রোৎসব সম্পন্ন হয়। নবেম্বর কিম্বা ডিসেম্বর মাসের একাদশ চন্দ্রে সৌর-উৎসব হইয়া থাকে।

মাঞ্চুগণ আদৌ চীনের বিজেতা বলিয়া চীনেরা সম্প্রতি মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং মাঞ্চুদিগের ড্রেগন-চিহ্নাঙ্কিত নিশান ত্যাগ করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা ও উন্নতি জ্ঞাপক নূতন নিশান প্রস্তুত করিয়াছে। লাল জমির উপরের এক কোণে নীল চতুষ্কোণের মধ্যে শুভ্র তারকা চিহ্ন চীনেরা নিজেদের নূতন নিশানে ব্যবহার করিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ রায়।

সন্ধ্যায়

সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল আঁধার-আলো-মাখা,
নদীর ধারে রাঙা আকাশ কালো গাছে ঢাকা ;
ভাসিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধমধুর লঘু মেঘের তরী,
বিলিয়ে দিতে এসেছিলে শান্তি—দুহাত ভরি' ;
হৃদয় দিয়ে তখন তোমায় বেসেছিলাম ভালো,—
প্রিয় আমার, প্রভু আমার, আমার জীবন আলো !

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

নবীন-সন্ন্যাসী

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়িতা।

গুরুদাস বাবুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বনভোজন সম্পন্ন করিয়া সকলে যখন নৌকাযোগে গৃহে ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গৃহে পৌঁছিয়া, সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া সকলে সেই বসিবার ঘরখানিতে চা পান করিবার জন্য সমবেত হইলেন। গুরুদাস বাবু আজ একটু গম্ভীর—গল্পার্ণবের গল্পতরঙ্গ আজ প্রশান্ত। সারাদিন আমোদ উৎসবে তাঁহাকে একটু শ্রান্ত করিয়াছে। আজ সন্ধ্যায় মনে হইতেছে, তাঁহার জীবনের সন্ধ্যাও সন্নিকট। আত্মীয় পরিজনের একান্ত কামনা সত্ত্বেও, তাঁহার জন্মদিন আর অধিক বার ফিরিয়া আসিবে না।

কিয়ৎক্ষণ পরে চিনি সকলের জন্য চা আনিল। প্রথমে পিতাকে দিয়া, তাহার পর মোহিতের কাছে এক পেয়ালা ধরিল। মোহিত বলিল—"থাক।"

চিনি বলিল—"কেন, ওবেলা ত খেলেন! বল্লেন, চমৎকার লাগছে। নিন।"

"সে কেবল এঁর জন্মদিন বলে এক পেয়ালা খেয়েছিলাম।"

"বাবার জন্মদিন এখনও রয়েছে। ধরুন।"

মোহিত হাসিয়া বলিল—"তোমার বউদিদি ছাড়েন নি—তাই খেয়েছিলাম।"

চিনি ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—"বউদিদির অনুরোধে খেতে পারেন আর আমার অনুরোধে পারেন না ?"

গুরুদাস বাবু ও তাঁহার পত্নী, প্রমথ ও সুশীলা, বসিয়া এই তামাসা দেখিয়া আমোদ অনুভব করিতেছিলেন। মোহিত, চিনির মুখপানে চাহিয়া বুঝিল, চা গ্রহণ না করিলে বালিকা বাস্তবিকই দুঃখিত হইবে। তখন মৃদুহাস্যের সহিত হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল—"আচ্ছা, দাও।"

চা দিয়া, চিনি তাহার বাম হস্ত সুশীলার দিকে বাড়াইয়া বলিল—"বউদিদি—টাকা দাও।"

গৃহিণী বলিলেন—"টাকা কিসের ?"

চিনি বলিল—"বাজির টাকা। বউদিদি বলেছিলেন,

আমি ওবেলা মোহিত বাবুকে চা খাইয়েছি বলে কি তুই পারবি? কথ্‌খনো পারবিনে। আমি বলেছিলাম, আমি নিশ্চয় পারব,—নিশ্চয়। চার টাকা বাজি হয়েছিল। যে বাজি জিতবে সে বাজার থেকে ঐ টাকার বাজি কিনে আনিয়ে পোড়াবে। দাও বউদিদি—টাকা দাও।"

সুশীলা হাসিতে হাসিতে অঞ্চল হইতে চারিটি টাকা খুলিয়া চিনির হাতে দিলেন।

চিনি টাকা কয়টি প্রমথ বাবুকে দিয়া বলিল—"দাদা, বাজি আনিয়ে দাও।"

গৃহিণী বলিলেন—"এখন বাজি কোথায় পাবি? এ কি কলকাতার শহর?"

চিনি বলিল—"বাজারে পাওয়া যাবে। কালীপূজোর সময় দোকানে যে সব বাজি এসেছিল—তার অনেক এখনও আছে। বসন্ত আমায় বলেছে।"

বসন্ত একথার সমর্থণ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ মা, অনেক বাজি আছে। ছুঁচোবাজি, হাউই, চরকিবাজি, তুবড়ী, রঙমশাল—"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"বাজি পুড়িয়ে কেন টাকা নষ্ট করা!"

চিনি বলিল—"মহারাণীর জুবিলীর সময় কেন তবে বাজি পুড়েছিল? আপনার জন্মদিনেও আমরা বাজি পোড়াব।"

গুরুদাস বাবু কন্যাকে নিকটে টানিয়া সস্নেহে বলিলেন—"আচ্ছা তবে বাজির টাকা বাজিতেই পুড়ুক।"

সকলের চা পান শেষ হইলে, কিয়ৎক্ষণ বসিয়া গল্প গুজব করিতে করিতে, দুই ঝুড়ি বাজি আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্তঃপুরের পশ্চাতে বারান্দার নিম্নে পুষ্করিণী আছে—তাহারই তীরে বাজি পুড়িবে। পরিবারস্থ সকলে গিয়া সেই বারান্দায় উপবেশন করিলেন। অত্যন্ত আমোদের মধ্যে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া বাজি পুড়িল।

রাত্রে শয়ন করিয়া, যতক্ষণ নিদ্রা না আসিল, ততক্ষণ মোহিতের মনে কাহার একখানি সুন্দর সুকুমার মুখ বারম্বার দেখা দিয়া দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কৌতুক-হাস্যে সমুজ্জ্বল দুইটি বড় বড় চঞ্চল চক্ষু - তাহাতে আবেশের লেশ মাত্র নাই। সেই মুখখানি ও চক্ষু দুইটিকে মোহিত কিছুতেই মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিল না। আজ সারাদিন ধরিয়া চিনি তাহার পরিজনগণের কাছে যত দুষ্টামি করিয়াছে, যত মিষ্ট কথা বলিয়াছে, সেই দৃশ্যগুলি, মোহিতের মনে পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইতে লাগিল। ক্রমে যখন নিদ্রার আবেশ তাহাকে অল্পে অল্পে বিহ্বল করিয়া ফেলিল, মোহিত তখন মনে মনে বলিল—"মেয়েটি বেশ মিষ্টি। যার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, সে সুখী হবে।"

এইরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া মোহিত ঘুমাইয়া পড়িল। আজ সমস্ত দিন মুক্ত বায়ুতে যাপন করিয়াছে, নিদ্রা বেশ গভীর হইল। রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিল, যেন সে বরবেশে সজ্জিত হইয়া বিবাহমণ্ডপে অবতীর্ণ। চারিদিকে লোকসমাগম—বিস্তর আলো জ্বলিতেছে—বাহিরে সানাই বাজিতেছে। যেন স্ত্রীআচার আরম্ভ হইল। শুভদৃষ্টির জন্য বর ও কন্যার মস্তকের উপর বস্ত্রাবরণ পড়িল। মোহিত দেখিল, কন্যা আর কেহ নহে—চিনি।

ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথম কয়েকমুহূর্ত্ত মোহিতের মনে হইল, সে যেন সুখের সরোবরে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। সুপ্তি-জড়িমা তিরোহিত হইলে সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষে শয্যার উপর মোহিত উঠিয়া বসিল। ভাবিল, এ কি স্বপ্ন দেখিলাম! এই আমার পরিণাম না কি? বিবাহ করিয়া, সংসারজালে জড়ীভূত হইয়া, বাসনাতৃপ্তি ও অর্থোপার্জ্জনই জীবনের সারভূত করিব না কি? স্বপ্নের কথা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া নিজের প্রতি একটু রাগও হইল। স্বপ্ন দেখা না দেখা অবশ্য কাহারও ইচ্ছাধীন নহে। কিন্তু স্বপ্নে তাহার মন কেন আনন্দলাভ করিল? আনন্দের ত কথা নহে—বিরক্ত হইবার—ঘৃণাবোধ করিবার কথা। মননশক্তি নিদ্রিত ছিল, প্রভুর অনুপস্থিতিতে ভৃত্য হৃদয় সংযম হারাইয়া নিষিদ্ধ পথে বিচরণ করিয়াছে। এমন ভৃত্য ত ভাল নয়। যতক্ষণ প্রভুর চক্ষুর সম্মুখে রহিল, ততক্ষণই সুবোধ শিষ্ট আজ্ঞাবহ?—চোখের আড়াল হইলেই যথেচ্ছাচরণ? হৃদয়ের প্রতি চক্ষু রাঙাইয়া মোহিত তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিল।

প্রভাতে উঠিয়া মোহিত শুনিল, চিনির জ্বর হইয়াছে। গত কল্য বনভোজনে গিয়া, নদীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিয়াছিল, ইহা তাহারই প্রতিফল। সামান্য জ্বর—

কোনও চিন্তার কারণ নাই। সন্ধ্যার্চ্চনা সারিয়া মোহিত ভিতরে যখন জলযোগ করিতে গেল, তখন তাহার চক্ষু চিনিকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল। জ্বর ত বেশী হয় নাই—হয়ত এখনি দেখা যাইবে র‍্যাপার গায়ে দিয়া চিনি বেড়াইতেছে। কিন্তু চিনিকে কোথাও দেখা গেল না। উষাকালের তক্জন সত্ত্বেও তাহার হৃদয় নিরাশ হইল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, চা পানের সময়, চিনি নিশ্চয় আসিবে মোহিতের মন সারাদিন এইরূপ আশা করিতে লাগিল। কিন্তু সে আশাও বিফল হইল। সুশীলা ও প্রমথ বাবুর অনুরোধসত্ত্বেও সে আজ চা পান করিল না। আজ এই সন্ধ্যাসভা যেন তাহার কাছে নিরানন্দ—অঙ্গহীন। যেন বাগান আছে, ফুল নাই। আকাশ আছে, জ্যোৎস্না নাই।

রাত্রে শয্যাগ্রহণ করিয়া মোহিত চিন্তা করিতে লাগিল রোগে ধরিবার পূর্ব্বলক্ষণগুলি তাহাতে বেশ স্পষ্টই দেখা দিয়াছে। উপন্যাসাদিতে যেরূপ পাঠ করা যায়, অবিকল সেইরূপ। এমনি করিয়াই অবোধ মানুষ এক পা এক পা অগ্রসর হয়—ক্রমে অগাধ জলে গিয়া পড়ে—শেষে ভাসিয়া যায়। না, এরূপ হইলে ত চলিবে না। সে যে এমন দুর্ব্বল, পূর্ব্বে মোহিত তাহা জানিত না। চিনি—চিনি—চিনি—তাহার মন কেন সারাদিন চিনি চিনি করিতেছে? কি আছে সে বালিকার যাহাতে এত আকর্ষণ? কি জানে সে? দর্শন জানে না, বিজ্ঞান জানে না, শাস্ত্রচর্চ্চা করে নাই; গীতা, উপনিষদ্ তাহার অনধীত।• মূর্খ, বিচারশক্তিবিহীন ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা! তাহার মুখখানি বেশ সুন্দর, চক্ষু দুইটি বড় স্বচ্ছ, ওষ্ঠযুগলে দুষ্টামির হাসিটুকু নিয়তই নৃত্য করিতেছে,—কণ্ঠস্বরে সঙ্গীতের কমনীয়তা—এই ত তাহার সম্পত্তি। তাহাতেই কি মোহিত পাগল হইবে? মোহিত?—না না—ইহা কল্পনার অতীত—নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা।

কিয়ৎক্ষণ আত্মানুসন্ধানের পর তাহার মনে হইল—তর্ক করিলে কি হইবে? পাগল হইতে কি বাকী আছে না কি? স্বপ্ন যেন বড় অপরাধ করিয়াছিল! আজ সারাদিনের এ জাগরণ? চিনিকে একটিবার দেখিবার জন্য তাহার মন কি পিপাসায় ছটফট করে নাই? আত্ম-প্রবঞ্চনা করিলেই ত হয় না। রোগে ধরিবার পূর্ব্বলক্ষণ বৈকি! এ ত স্বয়ং রোগেরই লক্ষণ জাজ্বল্যমান। একেবারে পূর্ণমাত্রা। তবে? তবে এখন উপায়? উপায় পলায়ন ছাড়া আর কি হইতে পারে? কল্যই ইহাঁদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে যাইতে হইবে। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল।

সে রাত্রে মোহিত আর চিনিকে স্বপ্ন দেখিল না। ভোরে উঠিয়া তাহার মনের ভাবটা বিজয়ী বীরের মত হইল। ভাবিল, রোগের অঙ্কুর একটুখানি মাথা তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু সে তাহার সবল পদতলে সেটুকু মাড়াইয়া চাপিয়া পিষিয়া ফেলিয়াছে। সে কি আর কেহ? সে যে মোহিত! সংসারসুখ, মায়াবিনী মোহিনীমূর্ত্তি ধরিয়া কাহাকে ভুলাইতে আসিয়াছিল? মানুষ চেনে না?

প্রভাতে শুনিল, গতরাত্রে চিনির জ্বর বাড়িয়াছিল। সারারাত্রি ছটফট্ করিয়াছে। শুনিবামাত্র মোহিতের বক্ষে বেদনা বাজিয়া উঠিল। প্রমথকে জিজ্ঞাসা করিল—"কত ডিগ্রী জ্বর?"

"রাত্রে ১০৫ উঠেছিল—এখন ১০৪।"

"ডাক্তার কে?"

"এখানকার নেটিভ ডাক্তারটি রাত্রে এসেছিলেন। আবার এখন তাঁকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছি। ত্রিশ ঘণ্টার উপর হয়ে গেল, জ্বর এখনও ছাড়ল না—বিকারে না দাঁড়ালে বাঁচি।"

সেদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় মোহিত ভাল করিয়া মন দিতে পারিল না। একাকী বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিল। প্রমথ, গুরুদাস বাবু ভিতরে। সংবাদ না পাইয়া তাহার চিত্ত আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দুই একজন দাস দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা ভাল করিয়া কিছু বলিতে পারিল না। কেবল বলিল—"খুব কাতর।"

এইরূপে অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত কাটিল, মোহিতের বড় অসহ্য হইয়া উঠিল। ভাবিল, যাই, অন্তঃপুরে গিয়া দেখি চিনি কেমন আছে। বাড়ীর মেয়েরা সকলেই ত আমার সাক্ষাতে বাহির হন, তবে আর সঙ্কোচ কিসের?

এই সিদ্ধান্ত করিয়া মোহিত অন্তঃপুরে চলিল। তাহার

ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—"বড় যে টান দেখিতেছি! জ্বর কাহারও হয় না নাকি?" মোহিত মনকে উত্তর দিল—"আমার বন্ধুর ভগ্নী পীড়িত—উৎকণ্ঠিত হইব না?—আমার যদি ভগ্নী থাকিত এবং তাহারই যদি এইরূপ পীড়া হইত!"

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গনে সুশীলাকে দেখিতে পাইল। জিজ্ঞাসা করিল—"চিনি কেমন আছে?"

"খুব জ্বর। ১০৬ উঠেছে। মাথায় ওডিকলনের পটি দেওয়া হয়েছে। আসুন না—দেখবেন?"—বলিয়া সুশীলা মোহিতকে উপরে লইয়া গেল।

চিনি পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছে। চক্ষু মুদ্রিত। মোহিতের পদশব্দে একবার চক্ষু খুলিয়া চাহিল কিন্তু মানুষ চিনিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। তাহার পিতামাতা, ভ্রাতা উদ্বিগ্ন চিত্তে শয্যার নিকট বসিয়া।

চিনির রোগতপ্ত মলিন মুখখানি দেখিয়া মোহিতের যেন কান্না আসিতে লাগিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে আবার বাহিরে চলিয়া আসিল।

রাত্রে মোহিত আহারে বসিল মাত্র—কিছুই খাইতে পারিল না। সারারাত্রি ঘোর দুশ্চিন্তায় কাটিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঠাকুরঘরের দ্বারের নিকট সুশীলা দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। দেখিয়াই মোহিতের মন চমকিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছে?"

সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"এখনও ত আছে। কিন্তু রাখতে যে পারি এমন আশা কম।"

মোহিতের চক্ষু দিয়াও জল পড়িতে লাগিল—কিছুতেই বাধা মানিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"একজন ভাল ডাক্তার খুলনা থেকে আনালে হত না?"

সুশীলা বলিলেন—"রাত্রি তিনটার সময় পাল্কী বেয়ারা নিয়ে সিভিল সার্জনকে আনতে লোক গেছে।"

অবনত শিরে মোহিত বাহিরে চলিয়া গেল।

বেলা নয়টার সময় সিভিল সার্জ্জন আসিয়া পৌছিলেন। সারাদিন চিকিৎসা চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর জ্বর কমিতে আরম্ভ হইল।

সন্ধ্যা হইতে মোহিত চিনির শয়ন কক্ষের বাহিরেই বসিয়া ছিল। রাত্রি দশটা বাজিলে গুরুদাস বাবু বলিলেন—"বাবা—তুমি কেন কষ্ট করছ?—অনেক রাত্রি হল—যা হোক কিছু জলটল খেয়ে শোও গে।"

মোহিত বলিল—শুশ্রূষার জন্য পালাক্রমে যে রাত্রি জাগার বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার একটা পাহারা সে জাগিতে চায়।

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"যদি আজ রাত্রি কাটে, তবে কাল থেকে তোমাকেও একটা পাহারা দেব। আজ আর আবশ্যক হবে না। যাও বাবা কষ্ট কোরোনা।"

"ডাক্তার সাহেব কি বলেছেন?"

"বলেছেন, আজ সারারাত্রির মধ্যে জ্বর ত্যাগ হবে। কিন্তু রোগিণীর দেহ এত দুর্ব্বল যে ভোরের দিকটায় নাড়ী না ছেড়ে যায়। রাত্রি তিনটে থেকে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সব চেয়ে সাংঘাতিক সময়। সেইটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলে আর ভাবনা নেই। নইলে—"

গুরুদাস বাবুর কথা অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল। মোহিত উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। কিছু জলযোগ করিবার জন্য সুশীলা অনুরোধ করিয়াছিলেন—কিন্তু মোহিত কিছুতেই সম্মত হইল না।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মোহিতের গৃহত্যাগ।

শয্যাকক্ষে প্রবেশ করিয়া মোহিত শয়ন করিল না। একখানি চেয়ারে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। আহা এমন সুন্দর পবিত্র ফুলটি, চিরদিনের মত ইহজগৎ হইতে অপসৃত হইবে? মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল, ভোর বেলা যেন অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। সে যেন ছুটিয়া ভিতরে গেল। যেন চিনিকে বাহির করিয়া বারান্দায় নামানো হইয়াছে। যেন আত্মীয় পরিজন পরিবৃত হইয়া চিনি এই পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিতেছে। এই কল্পনা করিতে করিতে মোহিতের চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিল, মোহিত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। ঘড়িতে দেখিল, বারোটা বাজিতে আর বিলম্ব

নাই। দ্বার খুলিয়া, বারান্দায় দাঁড়াইয়া, অন্তঃপুরের দ্বিতলস্থ কক্ষগুলির পানে চাহিয়া রহিল। দুইটি কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। একটিতে চিনি আছে—অপরটিতে ডাক্তার সাহেব শয়ন করিয়া আছেন। মোহিত বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অন্তঃপুরের সেই আলোকিত কক্ষ দুইটির পানে চাহিতেছে। ভাবিল, আমি যদি কেবল মাত্র বন্ধু না হইয়া আত্মীয় হইতাম, তাহা হইলে গুরুদাস বাবু আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করিতেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া মোহিত পায়চারি করিল। ক্রমে একটা বাজিল। তখন সে ভিতরে আসিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আলো নিবাইয়া শয্যায় প্রবেশ করিল।

কিন্তু যাহার মন এমন চিন্তাপীড়িত, তাহার চক্ষে নিদ্রা সহজে আসিবে কেন? অনেকক্ষণ ধরিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে একটু লঘু তন্দ্রা আসিল।

কিয়ৎকাল পরে তন্দ্রাবেশে যেন শুনিল, অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। দুরু দুরু বুকে উঠিয়া পড়িল। কান পাতিয়া শুনিল—কৈ না, কিছু ত শুনা যায় না। ওটা বোধ হয় স্বপ্নে শুনিয়াছিল মাত্র।

আলো জ্বালিয়া ঘড়ি দেখিল, দুইটা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে। দুয়ার খুলিয়া আবার বাহিরের বারান্দায় গেল। সেই কক্ষ দুইটিতে এখনও আলো জ্বলিতেছে। অন্তঃপুর নিস্তব্ধ। না, এখনও তবে কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই।

বারান্দায় কিয়ৎক্ষণ পায়চারি করিতে করিতে তাহার মনে প্রবল বাসনা হইল, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, উপরে গিয়া, চিনির রোগশয্যার নিকট একবার দণ্ডায়মান হয়। কি জানি, আর যদি দেখিতে না পায়,—একবার শেষ দেখা দেখিয়া আসিবে না? তিনটা বাজিতে ত আর বেশী বিলম্ব নাই।

তখন আবার মনে হইল—আমি তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কি করিব? গুরুদাস বাবু, প্রমথ প্রভৃতি রহিয়াছেন।

আবার মনে হইল, তাঁহারাই বা কি করিবেন? যদি যায়—তবে কি ধরিয়া রাখিতে পারিবেন?

তখন ভাবিল—ডাক্তার সাহেব রহিয়াছেন। কিন্তু তিনিই বা কি করিবেন? হাঁ একজন আছেন, যিনি করিতে পারেন বটে। যিনি এই পৃথিবী, এই নক্ষত্রখচিত আকাশ, এই অনন্ত বিশ্বজগৎ স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন, তিনি তাহাকে ফিরাইতে পারেন বটে। আমি আজ তাঁহাকে ডাকিব—প্রাণপণে প্রার্থনা করিব—চিনির জীবন তাঁহার কাছে ভিক্ষা মাগিয়া লইব।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব হইল না। একথা যে এতক্ষণ মনে পড়ে নাই—ইহাই মোহিতের আশ্চর্য্য বোধ হইল। সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়াছে—এই সমস্ত সময়টা বৃথায় গিয়াছে। এতক্ষণ সে ভগবানের পদে মন সমর্পণ করিয়া আপনার আকুল প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইতে পারিত। আর বিলম্ব নয়।

মোহিত তৎক্ষণাৎ পাদুকা ত্যাগ করিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিল। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। শয়ন কক্ষের এক কোণে তাহার সন্ধ্যা করিবার কুশাসন, গঙ্গাজল প্রভৃতি ছিল। কেবল আসনখানি লইল। কোষাকুষি, গঙ্গাজল, কিছুই লইল না। আজ তাহার চক্ষু দিয়া যে পুণ্যধারা বহিতেছে—তাহা ভগবানের নিকট গঙ্গাজল অপেক্ষাও পবিত্রতর। আসনখানি লইয়া পশ্চাতের বারান্দায় গিয়া বসিল। সেই বারান্দারই নিম্নে অনতিদূরে নদী প্রবাহিত। মনে পড়িল, কয়েকদিন পূর্ব্বে এই বারান্দায় বসিয়া সে উপনিষদ্ পড়িতেছিল, সেই সময় শালুর টুকরাখানি হাতে করিয়া চিনি তাহারই কাছে অক্ষর লেখাইতে আসিয়াছিল।

আসন পাতিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া, যুক্তকরে মুদ্রিতনেত্রে মোহিত প্রার্থনা করিতে লাগিল। ঘড়িতে তিনটা বাজিল। বাহিরে বিষম অন্ধকার। নদীটি অদৃশ্য—কেবল তীরভূমির কঙ্করগুলিতে ঢেউ লাগিয়া মৃদু মৃদু শব্দ শুনা যাইতেছে। আর কোথাও কোন শব্দ নাই। মোহিত এক একবার অস্পষ্টস্বরে প্রার্থনার ভাষা উচ্চারণ করিতেছে—আবার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিতেছে।

চারিটা বাজিল। অন্ধকার কমিয়া আসিতেছে। আকাশের তারার আর তেমন জ্যোতি নাই। মোহিত এক একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিতেছে—রাত্রি আর কত বাকী। আবার চক্ষু মুদিয়া গভীর প্রার্থনায় মগ্ন হইতেছে।

রাত্রি আর নাই। পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়া আসিল। দুই একটা পক্ষীর কলরব শুনা যাইতেছে। নদীর দিক হইতে মৃদুমন্দ উষাসমীরণ বহিতে আরম্ভ করিল। মোহিত ক্ষণমাত্র পূর্ব্বাকাশ পানে চাহিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পূর্ব্বদিক লোহিতাভ হইয়া উঠিয়াছে। সহস্র পক্ষীর কলকূজনে নদীতীর মুখরিত। ক্রমে সে রক্তাভা গাঢ়তর—গাঢ়তম হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নবোদিত সূর্য্যের একটি কনকরশ্মি, ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত ছুটিয়া আসিয়া ধ্যানরত মোহিতের ললাটদেশ স্পর্শ করিল। মোহিত তখন চক্ষু খুলিয়া, গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল।

কুশাসনখানি শয়নকক্ষে রাখিয়া, দ্রুতপদে মোহিত অন্তঃপুর অভিমুখে ছুটিল। ক্রন্দনের রোল ত উঠে নাই। অন্তঃপুর নিস্তব্ধ।

অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহিণী দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন, চিনি ভাল আছে, জ্বর গিয়াছে, কথা কহিয়াছে। এখন সে নিদ্রিত। বলিতে বলিতে গৃহিণী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মোহিতের পানে চাহিলেন। তখন মোহিতের স্মরণ হইল, চক্ষু ও কপাল হইতে অশ্রুচিহ্ন মুছিয়া আসিতে তাহার মনে ছিল না। অবনত মস্তকে বাহির হইয়া গেল। গিয়া আবার পূজায় বসিল।

* * * *

চিনি ভাল হইয়াছে, কিন্তু এখনও সে অত্যন্ত দুর্ব্বল। উপরেই থাকে—মোহিত এ তিনদিন তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

চিনির প্রতি তাহার মনের ভাব যে কি জাতীয় তাহা মোহিত এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে। এ কয়দিন সে লক্ষ্য করিয়াছে, কেহ কথাপ্রসঙ্গে তাহার সমক্ষে চিনির নামোল্লেখ মাত্র করিলে তাহার কানে যেন বীণার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে। ইহার জন্য সে মনে মনে লজ্জিত—কিন্তু কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। নিজ চিত্তদৌর্ব্বল্য সে ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছে। এই কারণে স্থির করিয়াছে, সংসারাশ্রম তাহার পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে। দাদার কথা সর্ব্বদাই মনে পড়িতেছে—"তুমি যদি সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে সে অন্য কথা ছিল। গৃহস্থাশ্রমে থেকে তার নিয়ম প্রতিপালন করবে না—এর কুফল অবশ্যম্ভাবী।"—দাদা অবশ্য অন্য ভাবে বলিয়াছিলেন—কিন্তু কথাটা খুবই পাকা বলিয়া মোহিতের মনে হইতে লাগিল। তাহার উপস্থিত মনের অবস্থাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এইরূপ নানাদিক পর্য্যালোচনা করিয়া মোহিত স্থির করিয়াছে, সংসারাশ্রমে আর তাহার থাকা নয়। এবার সে রীতিমত সন্ন্যাসী হইবে। সংসারাশ্রমে থাকিলে নিজের সাধনভজনের পদে পদে বিঘ্ন। নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে হইলে উপযুক্ত গুরুরও আবশ্যক। বাহির হইয়া না পড়িলে সে গুরুই বা মিলিবে কোথা? যথাসম্ভব শীঘ্র এখান হইতে বাড়ী গিয়া, গৈরিক বসন ধারণ করিয়া, লোটা কম্বল লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িবে। আঃ—সে কি আত্মগ্লানিশূন্য স্বাধীনতার জীবন! অখণ্ড অবসর—লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া একমনে একধ্যানে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইবে। এখানে বন্ধুর আতিথ্যে সপ্তাহের অধিক অতিবাহিত হইল। বিদায়গ্রহণে আর বিলম্ব কি? একটুমাত্র বিলম্ব আছে। চিনি নামিলে, তাহাকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া, চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে। এখন আর তাহার মনে আত্মপ্রবঞ্চনা নাই। হৃদয়ের চাপল্যকে এখন সে ক্ষমার চক্ষে দেখিতেছে—হৃদয়কে এ কয়দিন ছুটি দিয়াছে। হৃদয়ও দিবানিশি প্রিয়চিন্তায় নিমগ্ন আছে। থাকুক—আর দুদিন বৈ ত নয়।

দুইদিন পরে, বৈকালে চিনি উপর হইতে নামিল। জলযোগ করিবার সময় অন্তঃপুরে গিয়া মোহিত তাহাকে দেখিতে পাইল। তাহার পাণ্ডুর বিশীর্ণ মুখখানি দেখিয়া মোহিতের হৃদয় ভাবাবেগে উথলিয়া উঠিল। একখানি ফিরোজা রঙের পাতলা শাল গায়ে দিয়া বারান্দায় চিনি বেড়াইতেছিল। মোহিত তাহার কাছে গিয়া কহিল—"কেমন আছ চিনি?"

"ভাল আছি। আচ্ছা, আমি এত শীগ্গির কি করে ভাল হলাম বলুন দেখি মোহিত বাবু?"

"জানিনা ত। কি করে?"

"একটা ভারি মজা হয়েছে। দাদা আপনাকে বলেন নি?"

"কৈ না।"

"অসুখের সময় আমার ডিলিরিয়ম হয়েছিল—আমি আবোল তাবোল বক্‌ছিলাম—তা শোনেন নি?"

"শুনেছি।"

"সে সময় আমি বলেছিলাম—আমি ত জানিনে, সবাই বল্লেন—আমি খালি খালি বলেছিলাম, মা আমার গ্র্যামোফোনটা কোথা গেল?—মা আমার গ্র্যামোফোন কৈ?—তাই আমি যখন একটু ভাল হলাম তখন দাদা আমায় বল্লেন—তুমি শীগ্‌গির ভাল হও দিদি, আমি তোমায় গ্র্যামোফোন আনিয়ে দিচ্ছি। সেই গ্র্যামোফোনের লোভে লোভে আমি এত শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠেছি।"

এই সময় সুশীলা সেখানে আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"গ্র্যামোফোন গ্র্যামোফোন করে চিনির আর ঘুম হচ্ছে না।"

জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়া মোহিত গুরুদাস বাবুর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাকে আরও দুই চারিদিন থাকিবার জন্য সস্নেহ অনুরোধ করিলেন—কিন্তু মোহিত মিনতি করিয়া তাহা কাটাইয়া দিল।

সন্ধ্যার পর চা পানের জন্য সকলে সমবেত হইলে চিনি বলিল—"মোহিত বাবু কাল নাকি আপনি চলে যাচ্ছেন?"

"হাঁ।"

"না মোহিত বাবু—কাল যাবেন না। আমার গ্র্যামোফোনটা আসুক আগে। শুনে যাবেন।"

মোহিত সস্মিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল অত বিলম্ব করিলে তাহার কোনমতেই চলিবে না। কল্য তাহাকে যাইতেই হইবে।

চিনি তখন পিতাকে বলিল—"বাবা—মোহিত বাবুকে থাকতে বলুন না। তিন চার দিনেই ত আমার গ্র্যামোফোন এসে যাবে।"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"আমি ত মোহিতকে অনেক বলেছি মা—উনি শুনছেন কৈ।"

মোহিত বলিল—"আচ্ছা তোমার গ্র্যামোফোন আসুক। এবার যখন আসব তখন শুনব।"

চিনি ইহাতে স্পষ্টই একটু নিরাশ হইল। ক্রমে গুরুদাস বাবু বলিলেন—"যাও মা, দেখ, চায়ের জলটা হ'ল কি না।"

"যাই"—বলিয়া চিনি মোহিতের দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিল। বলিল—"আপনার জন্যেও একপেয়ালা আনি?"

কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া মোহিত বলিল—"আচ্ছা এন।"—গ্র্যামোফোন আসা পর্য্যন্ত থাকিতে মোহিত অস্বীকার করিয়া চিনির মনে দুঃখ দিয়াছে। চা অস্বীকার করিয়া আর দুঃখ দিতে তাহার মন সরিল না। ইহাও সে ভাবিল—"আজই ত শেষ দিন। সব রকম অসংযম, আত্মপরায়ণতার আজ শেষ।"

পরদিন আহারাদি করিয়া, গৃহিণীর নিকট মোহিত বিদায় লইতে গেল। তিনি তখন একা ছিলেন। মোহিত বসিলে, দুই চারিটি স্নেহগর্ভ কথার পর তিনি বলিলেন—"বাবা—তোমায় একটি কথা বলব মনে করেছি কিন্তু বলতে কিছু সঙ্কোচ হচ্ছে।"

মোহিত বলিল—"কি কথা মা? প্রমথ যেমন আপনার ছেলে, আমাকেও তেমনি মনে করুন। যা বলতে ইচ্ছে করেন বলুন—তার জন্যে সঙ্কোচ কেন?"

ইতিপূর্ব্বে মোহিত আর কখনও অন্যের মাকে মা বলে নাই।

গৃহিণী উত্তর করিলেন "প্রমথ যেমন আমার ছেলে, বাস্তবিক পক্ষে তুমিও আমার সন্তানস্থানীয় হও, এই আমার আকিঞ্চন। আমার বড় ইচ্ছা, চিনির সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই। তোমার মা নেই—আমি তোমার মা হই এই আমার মনের সাধ।"

মোহিত কিয়ৎক্ষণ নতশিরে নীরব থাকিয়া বলিল—"মা, তা হবার যো নেই। আমার জীবনের গতি আমি অন্য পথে স্থির করে রেখেছি। গৃহস্থাশ্রম আমার জন্যে নয়। আমি সন্ন্যাসী হব।"

"সে কি কথা বাবা? এই কি তোমার সন্ন্যাসী হবার বয়স? অমন কথা বোলো না। আমার মেয়েকে তুমি বিবাহ না কর, না করবে কিন্তু সন্ন্যাসী হবার কথা মুখে এন না। যদি অন্য কোথাও একটি সৎপাত্রী দেখে বিবাহ করেও সংসারী হও—তাতেও আমি সুখী হব।"

মোহিত বলিল —"মা —আমি যদি বিবাহ করতাম, তা হ'লে আপনাকে মাতৃপদে বরণ করবার গৌরব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতাম না।"

গৃহিণী প্রায় মিনতির স্বরে বলিলেন —"তবে বাবা অমত কোরো না। ওঁকে বলি, তোমার দাদাকে চিঠি লিখুন; এই মাঘ মাসে ভাল দিন আছে—শুভকর্ম্ম হয়ে যাক্।"

মোহিতের চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া সে বলিল -"মা, আমায় প্রলোভনে ফেলবেন না।"—বলিয়া, গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদধূলি লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

গৃহে পৌঁছিয়া, দুই দিন থাকিয়া, তৃতীয় দিন উষা-কালে গৈরিক বসনে, লোটা কম্বল লইয়া, কপর্দ্দকবিহীন অবস্থায় মোহিত গৃহত্যাগ করিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ

সুনির্ম্মল শারদীয় গগনমণ্ডল রাত্রিকালে সর্ব্বদাই সুন্দর। সম্প্রতি শনি ও মঙ্গল গ্রহদ্বয় কৃত্তিকা রোহিণীর নিকটস্থ হইয়া নৈশাকাশের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সুযোগে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে এবং সাধারণ পাঠকবর্গকে একবার প্রত্যুষে সাড়ে চারিটায় (standard) ও সন্ধ্যার পর আকাশপটে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের কয়েকটি বিশেষ চিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুরোধ করি। এরূপ স্বর্ণসুযোগ সর্ব্বদা ঘটে না।

১ (ক)। উষালোকে পূর্ব্বাকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। ঐ দেখুন মধ্যস্থলে মনোহর শুকতারা (শুক্র-গ্রহ, Venus) শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার শশিকলা হইতেও সমুজ্জ্বল স্থিরপ্রভা বিস্তার করিয়া দীপ্তি পাইতেছে। উত্তরপূর্ব্ব আকাশে বিশালবপু ঋক্ষমণ্ডল (Great Bear, সপ্তর্ষিমণ্ডল) জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্নের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই সপ্তর্ষির সর্ব্বনিম্ন তারকা (Alkaid) ও শুক্রগ্রহের সংযোজক রেখা আরও দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের নিকট দিয়া গিয়াছে। ইহাদের দক্ষিণেরটী সিংহ রাশিস্থ উত্তরফল্গুনি (Denebola, সিংহের লাঙ্গুল)। সম্প্রতি নূতন ধূম-কেতুটী বরাবর এই রেখার কিঞ্চিৎ নিম্নস্থান দিয়া প্রায় সমান্তরভাবে দক্ষিণমুখে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ শুক্রের নিম্নপ্রদেশে আসিতেছে। শুক্রও স্বীয় গতিতে ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে চলিয়া নীচে নামিতেছে। (সেপ্টেম্বরের শেষ-ভাগে এই জ্যোতিষ্কটিই ঐ সপ্তর্ষির নিম্নপ্রদেশ দিয়া সন্ধ্যার সময় উত্তরপশ্চিমগগনে চলিতে দেখা গিয়াছিল)। ঋক্ষ-মণ্ডলের মস্তকের উদ্ধতম দুইটী তারকার সংযোজক রেখা দক্ষিণদিকে বর্দ্ধিত করিলে উহা ছয়টী উজ্জ্বল তারকার অর্দ্ধবৃত্ত ক্ষেত্রের নিম্ন দিয়া যাইবে; উহাই মঘা নক্ষত্র (Regulas, সিংহের মুখমণ্ডল); ইহার আকৃতি অধিক বক্র কাস্তের ন্যায়; অত্যুজ্জ্বল মঘা ইহার বাঁট। আবার ঐ সংযোজক রেখাটি বামদিকে বর্দ্ধিত করিলেই উত্তর-গগনের যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের নিকট দিয়া উহা যাইবে তাহাই ধ্রুবতারা (Pole star)। অনন্তকাল ঐটি একাকী একই স্থানে স্থির থাকিয়া অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে যেন কি এক স্থিরত্বের প্রচার করিতেছে। ঐ দেখুন সুন্দর ছায়াপথটি (Milky way) বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া দৃশ্যমান গগনার্দ্ধকে কোণাকোণি ভাবে সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে।

(খ)। এখন একবার পশ্চিমাকাশে দৃষ্টিপাত করুন। ঐ দেখুন বায়ুকোণে ঐ ছায়াপথের উপরে একটি ডব্লিউ (W) শোভা পাইতেছে; এই তারকাপুঞ্জের নাম Cassiopia (কাশ্যপেয়)। ধ্রুবের পূর্ব্বদিকে যেরূপ সপ্তর্ষিমণ্ডল, পশ্চিম দিকে সেইরূপ এই কাশ্যপেয়; ঠিক যেন পূর্ব্বমুখ করিয়া একটী চেয়ার বসান রহিয়াছে। পশ্চিমগগনের ঠিক মধ্যস্থলে কৃত্তিকা নক্ষত্র (Pleiades)। এই সপ্ত কৃত্তিকাকে কে না চেনেন? ইহারা সংখ্যায় অনেক হইলেও তন্মধ্যে সাতটিই উজ্জ্বল, এজন্য ইহারা শিশুগণের নিকটও সাত ভাই (বা সাত বোন) বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইহার অল্প উপরেই রোহিণী নক্ষত্র (Aldebaran) "হলদি-বরণ" একটি তারকা সহ সুন্দর সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকারে বিরাজমান। কৃত্তিকার দক্ষিণপশ্চিমে উজ্জ্বল শনি মহাশয় (Saturn) মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান। (এই পাগড়ি—Belt of Saturn দূরবীনে দ্রষ্টব্য)। আবার

ঐ যে রোহিণীর সন্নিকটে কষিত-কাঞ্চন-কান্তি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটী দেখিতেছেন ইনিই মঙ্গলগ্রহ (Mars)। এই রক্তোজ্জ্বল মঙ্গল ঠাকুর ঐ প্রদেশে আসিয়া শনি মহাশয়ের অমিত তেজঃপুঞ্জকেও যেন নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছেন। কৃত্তিকার আরও পশ্চিমে ছয় সাতটী অল্পোজ্জ্বল তারকাতে সুগঠিত একটী অশ্বমুখ দেখিবেন; এইটী রাশি চক্রের প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী (Hamal)। ইহাকে এখন উল্টা দেখিবেন; কিন্তু সন্ধ্যার পর পূর্ব্বাকাশে কৃত্তিকার উর্দ্ধে সোজা ভাবে উত্তরদিকে চাহিয়া রহিয়াছে এরূপ স্পষ্ট দেখিবেন।

(গ) পূর্ব্ব ও পশ্চিম আকাশ পরিত্যাগ করিয়া এখন একবার মধ্যগগন পর্য্যবেক্ষণ করুন। ঐ যে ঠিক মস্তকোপরি উজ্জ্বল তারকাযুগল দেখিতেছেন ইহারা মিথুন রাশিস্থ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র (Castor—Pallux)। এই মিথুন রাশিই রাশিচক্রের সর্ব্বোত্তর সীমা। (সূর্য্যদেব আষাঢ় মাসে এইস্থানে থাকিয়া আমাদিগকে লম্বভাবে কিরণ দান করেন বলিয়া তখন আমাদের গ্রীষ্মকাল)। ইহার ঠিক দক্ষিণে স্ফটিকবৎ নক্ষত্রটি Procyon (প্রভাস)। ইহার অল্প দক্ষিণপশ্চিমে ঐ যে প্রায় শুক্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবৃহৎ তারকাটি দেখিতেছেন ওটী তারকাকুলের রাজা; উহার ন্যায় উজ্জ্বল স্থির নক্ষত্র আর নাই; ইহার নাম লুব্ধক বা মৃগব্যাধ (Serius, Dogstar)। ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ ত্রিভুজাকারে রহিয়াছে; এই ত্রিভুজটী এক বৃহৎ কুকুরের পশ্চাৎদেশ; এবং লুব্ধক এই কুকুরের সম্মুখভাগে অবস্থিত। এই সুবৃহৎ কুকুরটী (Canis Major, Great dog) পশ্চিমাস্য হইয়া দণ্ডায়মান পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন। ইহার উত্তরপশ্চিমে প্রকাণ্ডকায় কালপুরুষ (Orion, Mighty Hunter) ঐ দেখুন হস্ত পদ প্রসারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান। উহার কটিতে তিনটী উজ্জ্বল তারকা ঝক্ ঝক্ করিতেছে; এবং তথা হইতে একটী নক্ষত্ররেখা তরবারির ন্যায় নিম্নদিকে ঝুলিতেছে। দক্ষিণ বাহুতে অত্যুজ্জ্বল রক্তাভ Betelgeux ও বাম বাহুতে Bellatrix, ইহারা এবং আরও কতকগুলি উর্দ্ধস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র লইয়াই বৃষরাশিস্থ মৃগশিরা নক্ষত্রপুঞ্জ (?); বাম উরুতে সুন্দর নীলাভ বাণরাজ (Rigel) শোভা পাইতেছে। ঐ যে ঠিক দক্ষিণাকাশে অতি নিম্নে বৃহৎ তারকাটী টল্‌টল্ করিতেছে ইনি অগস্ত্যদেব (Canopus); এটী গগনমণ্ডলের দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে ৫০° পঞ্চাশ ডিগ্রী মাত্র উত্তরে অবস্থিত এবং দক্ষিণাকাশের ঐ অঞ্চলের একমাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র। আবার উত্তর গগনে ঐ দেখুন রোহিণী নক্ষত্রের উত্তরে ছায়াপথের উপরে একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র একটী হীনপ্রভ ক্ষুদ্র সমকোণ ত্রিভুজ লইয়া কতই শোভা পাইতেছে; ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের নাম Capella (Goat, ছাগ)। আবার ঐ দেখুন ধ্রুবের উত্তরপূর্ব্বদিকে দুইটী নক্ষত্র উপরি উপরি রহিয়াছে, উহারা ক্ষুদ্রভল্লুকের (Little Bear) সম্মুখভাগ, ধ্রুবতারা ইহার লাঙ্গুলের অগ্রভাগ, এবং মধ্যবর্ত্তী কয়েকটী ক্ষুদ্র তারকা ইহার মধ্যশরীর। এই নক্ষত্রপুঞ্জ ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার করিয়া আবর্ত্তন করিতেছে। ইহারা কেন্দ্রের অতি নিকট বলিয়া (বিশ ডিগ্রী মধ্যে) কখনই আমাদের উত্তর দিক্‌বলয়ের (Horizon অন্তরালে যায় না, কারণ আমরা ২৩°—২৪° ডিগ্রী উঃ নিরক্ষান্তরে (latitude) আছি; সুতরাং ধ্রুবের প্রায় ঐ পরিমাণ নিম্নপ্রদেশ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই ক্ষুদ্রভল্লুকের সাময়িক অবস্থান ও গতিবিধি যিনি কিছুদিন পর্য্যালোচনা করিবেন তিনি দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইবেন এটী বিশ্বরচয়িতার সুকৌশলপূর্ণ কি সুন্দর সময়প্রদর্শক ঘটিকা যন্ত্র।

২। প্রত্যূষে আমাদের আকাশ পর্য্যবেক্ষণের পশ্চিম সীমা মেষ রাশিস্থ অশ্বিনী এবং পূর্ব্বসীমা সিংহ রাশিস্থ উত্তরফল্গুনি। এই অংশের পূর্ব্বাঞ্চলের কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক রাশিস্থ ও তাহাদের উত্তর ও দক্ষিণাকাশের জ্যোতিষ্ক সমূহ এখন দেখিবার বিশেষ সুবিধা নাই। সম্প্রতি সূর্য্যদেব তুলারাশিতে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় অমিত জ্যোতিতে ঐসকল জ্যোতিষ্ককে নিষ্প্রভ ও অদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং সন্ধ্যার পর আমাদের আকাশ পর্য্যালোচনা পশ্চিমে ধনুরাশি হইতেই আরব্ধ হইবে। অস্তাগত সূর্য্যালোক সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গেলে Standard সাড়ে সাতটার সময় একবার শারদাকাশে দৃষ্টিপাত করুন। ঐ দেখুন ছায়াপথের বর্ত্তমান অংশ বিভিন্নরূপে বিন্যস্ত;

প্রত্যুষের বায়ু—অগ্নিকোণ পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যায় ঈশান-নৈঋত সংযোগে কি সুন্দরভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। এই ছায়াপথের নৈঋতসীমায় ঠিক পূর্ব্বপার্শ্বে ঐ যে অল্পোজ্জ্বল তারকাপুঞ্জ দেখিতেছেন উহাই ধনুরাশিস্থ মুলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। এইটিই রাশিচক্রের সর্ব্বদক্ষিণ সীমা। সূর্য্যদেব পৌষমাসে এই রাশিতে থাকিয়া অতি তির্য্যগ্‌ভাবে আমাদিগকে কিরণ দান করেন বলিয়া আমরা তখন তাপের অল্পতা বশতঃ অত্যন্ত শীত অনুভব করি। ইহার অল্প উর্দ্ধে ছায়াপথের উপরে ঐ যে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রটী বামে ও দক্ষিণে দুইটী ক্ষুদ্র সহচর লইয়া শোভা পাইতেছে ঐটী মকর রাশিস্থ শ্রবণা নক্ষত্র (Altair)। আর উহারই প্রায় সমসূত্রে ছায়াপথের উত্তর পারে কয়েকটী ক্ষুদ্র তারকাসহ যে সুবৃহৎ নক্ষত্রটী ঝক্‌ঝক্ করিতেছে ওটী অভিজিৎ (Vega, Lyre, বীণা)। অনেকের মতে এই তারকাপুঞ্জও মকর রাশির অন্তর্গত। বর্ত্তমান সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আমাদের সূর্য্য স্বীয় গ্রহ উপগ্রহ ও ধূমকেতু প্রভৃতি সহচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া (সৌরজগৎ, Solar System) ভীষণ বেগে ঐ অভিজিতের দিকে অনবরত ছুটিতেছে। এই গতির কবে আরম্ভ হইয়াছে ও কবে শেষ হইবে এবং ইহার পরিণামই বা কি কে বলিতে পারে? শ্রবণার অল্প উর্দ্ধে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাতে পর পর দুইটী প্রায়বৃত্তাকার নক্ষত্রপুঞ্জ; ইহারা কুম্ভ রাশিস্থ ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্র। তারপর ঠিক মস্তকোপরি ঐ যে একটী প্রকাণ্ড বর্গক্ষেত্র দেখিতেছেন উহাতেই ভাদ্রপদ নক্ষত্রদ্বয়। ইহার পূর্ব্বদিকেই উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত সুন্দর মৃদঙ্গাকারে সজ্জিত ঐ যে অল্পোজ্জ্বল তারকাপুঞ্জ শোভা পাইতেছে ঐটিই রাশিচক্রের সর্ব্বশেষ মীন রাশিস্থ রেবতী নক্ষত্র। ইহার ঠিক পূর্ব্বদিকেই অশ্বিনী উত্তরাস্য হইয়া শোভা পাইতেছে, তৎপর শনি-মঙ্গল-শোভিত কৃত্তিকা-রোহিণীর সুন্দর সমাবেশ, যাহা প্রত্যূষে পশ্চিমাকাশে দেখিয়াছিলেন, ঘুরিয়া আসিয়া তাহাই আবার পূর্ব্বাকাশে উন্টা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ দেখুন যে ত্রিভুজ-শোভিত সুন্দর Capella প্রত্যূষে বায়ুকোণে দেখিয়াছেন, তাহা এখন উন্টাভাবে ঈশান কোণ অধিকার করিয়াছে, ত্রিভুজটী তখন ইহার পশ্চিমে ছিল, এখন ইহার পূর্ব্বপ্রান্তে উন্টান রহিয়াছে। আর যে Cassiopia চেয়ার তখন বায়ুকোণে সোজাভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, ঐ দেখুন তাহা এখন ধ্রুবের দক্ষিণপূর্ব্বে উর্দ্ধগগনে সেই ছায়াপথেই উন্টিয়া পড়িয়াছে। কাশ্যপেয় ও ধ্রুবের সংযোজক রেখা ধ্রুবের দিকে বর্দ্ধিত করিলে সপ্তর্ষির মধ্য দিয়া যাইবে; কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডল এখন চক্রবালের (horizon) নিম্নে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছে। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল ও কাশ্যপেয় যেমন ধ্রুবতারার দুই বিপরীত দিকে অবস্থিত, সেইরূপ অভিজিৎ ও ত্রিভুজযুক্ত Capella ধ্রুবের অপর দুই বিপরীত দিক অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

৩। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কেবল চন্দ্রেরই হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া থাকি; কিন্তু সূর্য্যালোকে আলোকিত বলিয়া গ্রহগণেরও ঐরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে; তাহা আবার অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা শুক্র গ্রহেই সুন্দর পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি শুক্র যেন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া এরূপ জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে যে ইহার আলোর নিকট মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সমুজ্জ্বল বিক্ষিপ্ত আলোকরাশিও (Diffused light) ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছে। তাই দ্বিপ্রহরের দিবালোকেও শুকতারা সূর্য্যদেবের ৪১ ডিগ্রী পরিমাণ পশ্চিমে একটি চন্দনের ফোঁটার মত পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। আশা করি সকলেই স্থিরভাবে দৃষ্টি করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন।

৪। সম্প্রতি শনি মঙ্গলের কৌতুকজনক আপেক্ষিক গতিবিধির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবার মঙ্গল ঠাকুরের শুভাগমনে যেন শনি মহাশয়কে বড়ই বিব্রত হইতে হইতেছে। শনি মহাশয় এক একটি নক্ষত্রপরিবারে সাধারণতঃ বর্ষাধিক কাল বসতি করিয়া রাশিচক্রের অন্য পরিবারে প্রস্থান করেন। কিন্তু এবার ইনি শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাস মাত্র কৃত্তিকা পরিবারে পর্য্যটনের অধিকার পাইয়াছিলেন। মঙ্গল ঠাকুর পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে (৩রা) এই পরিবারে প্রবেশ করেন; এবং দ্বিতীয় সপ্তাহেই (১১ই ভাদ্র) ইনি শনি ঠাকুরের অগ্রবর্ত্তী হইয়া স্বীয় অসাধারণ তেজঃপুঞ্জে ইহাকে যেন অপ্রতিভ করিয়া তুলেন। এই

স্বর্ণোজ্জ্বল মাঙ্গলিক প্রভা সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন শনি ঠাকুর অগৌণে (১৮ই ভাদ্র) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। ঐ তারিখ হইতে শনি বক্রী হইয়া ধীর গতিতে পশ্চাৎ পশ্চিম দিকে চলিতেছেন।

মঙ্গলদেব ইতিমধ্যেই কৃত্তিকা পরিবারে মাসাধিক থাকিয়া ১০ই আশ্বিন রোহিণী পরিবারে প্রবেশ করেন; কিন্তু ১লা কার্ত্তিক হইতে ইনিও ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছেন (বক্রী) এবং পুনরায় শনির পশ্চাতে ছুটিয়াছেন। এই বক্রগতিতে মঙ্গল ৮ই পৌষ পর্য্যন্ত পশ্চিম দিকে চলিবেন এবং কৃত্তিকা পরিবার হইতে বক্রগতি ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া মাঘ মাসের শেষ ভাগে পুনরায় এই রোহিণী নক্ষত্রে প্রবেশ করিবেন। শনিও পৌষ সংক্রান্তিতে বক্রগতি ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। আকাশের এই নির্দ্দিষ্ট অংশে কয়েকমাস ধরিয়া শনি মঙ্গলের এই অগ্র পশ্চাৎ গতিবিধিটীর পর্য্যবেক্ষণ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

৫। আমরা প্রতিদিন এক ডিগ্রী করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতেছি বলিয়া নক্ষত্রাদি (ও সূর্য্য) দৈনিক ঐ পরিমাণ পশ্চিমে সরিয়া আসিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইরূপে একবৎসরে আবর্ত্তন শেষ করিয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে পুনর্ব্বার প্রকাশিত হয়। সৃষ্টিকর্ত্তার এইসমস্ত সৃষ্টি-কৌশল পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার অপরিসীম মহিমা-গৌরবে আত্ম-বিস্মৃত হইতে হয়।

শ্রীগিরিশচন্দ্র দে।

নব্য তুরস্কের জাতীয় সঙ্গীত

(কামিল্ বে)

দেশ-ভকতের ভস্মের ভিতে
নিরমিত শত দুর্গ আজ!
নিবেদিত চিত-চেষ্টা-চরিত
সাধিবারে প্রিয় দেশের কাজ।
জীবনে মরণে আমরা তুর্ক,
চিহ্ন মোদের 'সূর্থ' তাজ;
হ'ব জয়ী, নহে হইব 'সহিদ্',—
মৃত্যু সহিয়া যুদ্ধ মাঝ।

(কোরাস্) সহিদ্ হইব মৃত্যু সহিয়া,
সমরক্ষেত্রে সঁপিব প্রাণ;
তুর্ক আমরা কীর্ত্তির তরে
অকাতরে করি জীবন-দান।

শোণিত-সিক্ত মুক্ত কৃপাণ,
নিশানে তরুণ শশী উদয়!
আমাদের দেশে নাহিক নিরাশা,
পশেনা এদেশে মরণ-ভয়।
ভালবাসি মোরা অস্ত্রের খেলা,
ভালবাসি মোরা যোদ্ধৃ সাজ;
তুর্ক-পুরের তোরণে তোরণে
সিংহ সজাগ করে বিরাজ।

(কোরাস্) সহিদ্ হইব মৃত্যু সহিয়া
সমর-ক্ষেত্রে সঁপিব প্রাণ,
তুর্ক আমরা কীর্ত্তির তরে
অকাতরে করি জীবন-দান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কাশ্মীর ও কাশ্মীরী

(মডার্ণ রিভিয়ু হইতে সঙ্কলিত)

মুখবন্ধ।

ভারতবর্ষের যেসকল জনপদ নিসর্গ-সুন্দরীর লীলা-নিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, সামন্তরাজ্য কাশ্মীর তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। অরণ্য-লীন পার্ব্বত্য শোভার কমনীয়তা, স্বচ্ছ তটিনীর মৃদু নর্ত্তনের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য, বিচিত্রদেহ বন-বিহগের অবিরাম কূজন-মাধুরী— সমগ্র রাজ্যখানিকে অনন্যদুর্লভ অপরূপ জয়শ্রীতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। দৃশ্য-মহিমায় এই স্থানকে যেসকল লেখক "ভূস্বর্গ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং অদৃশ্য পরীরাজ্যের স্বরূপ-কল্পনায় যেসকল আখ্যায়ক এই প্রদেশের নামোল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অতি-রঞ্জনের অপরাধ করেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বস্তুতঃ, এই রাজ্যে যিনি একবার পদার্পণ করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে শোভাসৌন্দর্য্যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের তুল্য মনে না করিয়া থাকিতে পারেন না।

কাশ্মীরী পণ্ডিতের ঝিলাম নদে আহ্নিক।

আসামের কামরূপ-কামাখ্যার ন্যায় সিন্ধুতীরবর্ত্তী কাশ্মীর প্রদেশও বহুপ্রচলিত নানা জনশ্রুতির সহিত সংপৃক্ত। এই জনবাদ কোন কোন স্থলে কাশ্মীরকে দ্বিতীয় নাগলোক বলিয়া পরিচিত করিতেও ছাড়ে নাই। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের পণ্ডিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে এইরূপ একটী কাহিনী অমৃতসরে প্রচলিত আছে যে, তাঁহারা সন্ধ্যা-উপাসনার ভাণে, মৎস্য ধরিবার আশায়, বকের মত প্রত্যহ নদীতীরে বসিয়া থাকেন, আর নদীর মধ্যে মাছ দেখিলেই হাত বাড়াইয়া তুলিয়া ল'ন। বলা বাহুল্য, নদীতটে আহ্নিকরত নিরীহ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের উদ্দেশেই এই অদ্ভুত কাহিনীর সৃষ্টি। কামরূপ-কামাখ্যায় পদার্পণমাত্রেই মানবকুলের মেষত্ব-প্রাপ্তি-বিষয়ক কিংবদন্তী যেরূপ অমূলক, কাশ্মীর-সম্বন্ধীয় উল্লিখিত প্রবাদগুলিও তদ্রূপ ভিত্তিহীন।

পথের বিবরণ।

পঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি কাশ্মীর-পথের শেষ রেলওয়ে ষ্টেসন। এই স্থান হইতে শ্রীনগরের দূরত্ব ১৯৮ মাইল। জম্মু হইয়া ভিন্ন এক পথেও কাশ্মীর পঁহুছা যায়; কিন্তু সে পথ অত্যন্ত দুর্গম। অবশ্য, পিরপঞ্জাল-পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক জম্বুর পথে কাশ্মীরগমন অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিরাপদ। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগরে যাইবার পক্ষে ধঞ্জীভাই নামক জনৈক ব্যক্তির দুই ঘোড়ার টোঙ্গা, কিংবা এক ঘোড়ার সাধারণ টোঙ্গা, অথবা একাগাড়ীই সচরাচর অবলম্বনীয়। এতদ্ব্যতীত, ডাক-টোঙ্গায়ও সময়ে সময়ে যাতায়াতের সুযোগ হইতে পারে। ডাকটোঙ্গা ৩৬ ঘণ্টায় শ্রীনগর পঁহুছে।

ধঞ্জিভাইর টোঙ্গায় মালপত্রসহ তিন জন আরোহীর স্থান হইতে পারে। ইহার অশ্ব প্রতি ৫।৬ মাইল অন্তর পরিবর্ত্তিত হয় এবং ইহাতে অন্যূন দুই দিন ও অনূর্দ্ধ পাঁচ-দিনে শ্রীনগরে পঁহুছা যায়। এই টোঙ্গার ভাড়া আরোহী-প্রতি ৪১৲ টাকা। সাধারণ টোঙ্গার অশ্ব মধ্যবর্ত্তী কোন স্থলে পরিবর্ত্তিত হয় না। ইহাতে ৫ কি ৫½ দিনে শ্রীনগর পঁহুছা যায়। ইহার ভাড়া ১৫৲ মাত্র। রাওলপিণ্ডি হইতে একাগাড়ীতে শ্রীনগর-যাত্রা মহা অসুবিধাজনক। এই গাড়ী প্রধানতঃ মালপত্রের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইহার অশ্বগুলি বিশেষ বলিষ্ঠ ও শ্রমসহিষ্ণু। ইহার ভাড়া ১০৲

টোঙ্গা—ঝিলামের পুল পার হইয়া কোহালায় পৌছিয়াছে।

টোঙ্গায় বসিবার স্থান।

কোন কোন স্থলে উৎকৃষ্ট খাবারও পাওয়া যায়। ইংরেজ ও ভারতীয় যাত্রীর বিশ্রামস্থলস্বরূপে যেসকল ডাকবাংলা এই পথে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার মূলগৃহ সর্ব্বত্রই ইংরেজদের জন্য নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং তাঁহাদেরই দ্বারা অধিকৃত। ঐ মূল গৃহের সংলগ্ন একখানি ক্ষুদ্র কুটীর মাত্র ভারতবাসীর (natives) উদ্দেশ্যে রচিত হইয়া রক্ষিত থাকে। দুইখানি শয্যার উপযুক্ত স্থানই উহার আয়তন, এবং একখানি চারপায়া,—অতিরিক্ত স্থলে কোথাও বা একটা ভগ্ন কেদারাই—উহার আসবাব! অথচ উহারই দ্বারদেশে মোটা মোটা অক্ষরে একটা নোটীশ লিখিত আছে—'ভাড়া ইহার সাহেবী ডাকবাংলার সমান'! ভারতের একটা প্রধান সামন্ত রাজ্যে ভারতবাসিগণের অভ্যর্থনার উপযুক্ত ব্যবস্থাই বটে! যাহা হউক, প্রসিদ্ধ বিশ্রামস্থানসমূহের অনেকস্থলেই গৃহস্থের বাড়ীতে অল্পমূল্যে থাকিবার জায়গা ও চারপায়া ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে। ভারতীয় যাত্রিগণের পক্ষে ঐরূপ গৃহে আশ্রয় লওয়াই শ্রেয়ঃ।

যাত্রিগণের জন্য প্রায় প্রত্যেক চটীতেই সর্ব্বদা আহার্য্য প্রস্তুত থাকে। যাঁহাদের বুভুক্ষা জাতি-

টাকা। একা ও সাধারণ টোঙ্গায় প্রত্যেক যাত্রীর পক্ষে ত্রিশ সের মাল লওয়ার বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু ধঞ্জীভাড়ার টোঙ্গায় বিশ সেরের অধিক মাল লওয়া যায় না।

রাওলপিণ্ডি ও শ্রীনগরের মধ্যবর্ত্তী পথে অনেকস্থলেই বিশ্রামাগার বা চটী আছে। এইসকল চটীর নিকটে

প্রথার শাসন না মানিয়া তৃপ্ত হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইচ্ছামত যে-কোন স্থলে উদরপূর্ত্তি করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা সে শাসনের অপেক্ষা রাখেন, স্বহস্তে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে তাঁহাদিগকে মহা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

খাবারের দোকান—শ্রীনগরের পথে।

রাজাদের দেশ—কোহালার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানসমূহ।

রাওলপিণ্ডি হইতে কতকদূর অগ্রসর হইলেই বামভাগে মরী-শৈলাবাস দৃষ্ট হয়। ইহারই অনতিদূরে কোহালা। কোহালার প্রান্তস্থ ঝিলাম নদের সেতু পার হইলেই কাশ্মীর রাজ্য আরম্ভ। এই স্থান হইতে শ্রীনগরের দূরত্ব ১৩৪ মাইল। এই পর্য্যন্ত এবং ইহার পরেও আরো কতকদূর পর্য্যন্ত, কোন স্থলেই কাশ্মীর প্রদেশের স্বাভাবিক নিসর্গ-শোভার চারুনিদর্শন দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ, মূল কাশ্মীরের দৃশ্যমহিমা পটান্তরালে আবৃত রখিবার জন্যই যেন প্রকৃতি-রাণী ইহার সম্মুখে শোভাহীন বন্ধুর দৃশ্যের যবনিকা টানিয়া রাখিয়াছেন!

কোহালার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসিগণ নিতান্ত নির্ব্বোধ ও নীরসপ্রকৃতিবিশিষ্ট। ধর্ম্মে ইহারা মুসলমান, কিন্তু ইহাদের মধ্যে মুসলমানোচিত ধর্ম্মভাবের যথেষ্টই অভাব। প্রধানতঃ ইহারা কৃষিজীবী হইলেও অনেকে গোরুরগাড়ী চালাইয়া কিংবা মজুরী খাটিয়াও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। পর্ব্বতের পিচ্ছলস্থানসমূহ ইহাদের কৃষি-ক্ষেত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের পুরুষগণের আকৃতি পাঠানদের ন্যায় বলিষ্ঠ ও তেজোব্যঞ্জক; প্রকৃতিতেও ইহারা অতিশয় দুর্দ্দান্ত এবং কর্ম্মক্ষেত্রে অসমসাহসী। এই সম্প্রদায়ের জাতিগত উপাধি 'রাজা'। রাজা সীতারাম কি রাজা টোডরমল্ল কাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রযুক্ত ইহারা এই সম্মানিত উপাধি লাভ করিয়াছে ইতিহাসের প্রমাণে তাহা স্থিরীকৃত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, পথ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য টোঙ্গাচালকগণের 'রাজাজি' সম্বোধন সহ কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ইহারা যখন রাজোচিত গাম্ভীর্য্য অবলম্বনে বিশেষভাবে পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, তখন ইহাদের রাজ-প্রভাব অমান্য করার উপায় থাকে না। তবে টোঙ্গার আরোহী শ্বেতাঙ্গ হইলে চাবুকের চোটে সে প্রভাব বিকাশেই বিলয় পায়।

পোষাক পরিচ্ছদে 'রাজা'দের আড়ম্বর কিছুমাত্র অসাধারণ নহে—একটী ঢিলা পাজামা, একটী লম্বা শার্ট এবং একটী ক্ষুদ্র পাগড়িই এক্ষেত্রে যথাসর্ব্বস্ব। পুরুষগণ সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদই ব্যবহার করে। রমণীগণ গাঢ় নীলবর্ণের প্রতি অনুরক্ত—হয় ত কৃষিকার্য্যের পক্ষে উপযোগী বলিয়াই ইহারা ঐ বর্ণের ভক্ত। পরিচারিকা ও বয়স্থা স্ত্রীলোক কৃষ্ণ বা নীলবর্ণের পরিচ্ছদে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া থাকে। ইহারাও শার্ট, পাজামা ও ক্ষুদ্র ওড়নার অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে। যুবতীগণ রক্তবর্ণ পরিচ্ছদের অনুরাগিণী।

রাজা সম্প্রদায়ের কৃষি ও গৃহকর্ম্মের ভার রমণীগণের উপরেই ন্যস্ত। কার্য্য করিতে করিতে গান গাওয়া ইহাদের অভ্যাস। কাশ্মীর গমন-পথে কর্ম্মব্যাপৃতা রমণীগণের কণ্ঠনিসৃত ভাটিয়াল সুরের গান অনেক সময়ে পথিকের কর্ণে সুধাবর্ষণ করে।

রমণীগণের অধিকাংশই বেঁটে কিন্তু বলিষ্ঠা। ইহারা বেণীবন্ধন পূর্ব্বক কেশ রচনা করে। প্রসাধন বিষয়েও সময়ে সময়ে ইহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ দৃষ্ট হয়।

রাজাদের দেশে পথিমধ্যে শিশুরাজগণের ব্যবহার বিশেষ আমোদজনক। ইহারা দল বাঁধিয়া এক এক স্থলে

রাস্তার পার্শ্বে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং যাত্রীর গাড়ী দেখিলেই এক প্রকার অস্পষ্ট গানের সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকাইয়া সেলাম করিতে করিতে বক্‌সিসের আশায় গাড়ীর পশ্চাৎ ছুটিয়া যায়। পথিমধ্যে যাত্রীর গাড়ী ধরিয়া ঐ ভাবে বক্‌সিস আদায় করাই ইহাদের ব্যবসায়। এই ব্যবসায় ইহাদিগকে সংসারের প্রয়োজনীয় সমস্ত কর্ম্ম হইতে অপসারিত করিয়া উৎসন্নের পথে বসাইয়াছে। অনেক সময়ে তামাসা দেখিবার উদ্দেশ্যে সাহেবগণই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

রাজাদের গৃহসজ্জা নিতান্ত সামান্য ও নিকৃষ্ট। গৃহগুলি প্রায়শঃই একতালা, তাহারও একটী দ্বার ও একটীমাত্র প্রকোষ্ঠ। গৃহের দেওয়াল মৃত্তিকা বা প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং ছাদ খড় কুটার সংমিশ্রণে মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত।

অধিবাসীগণের বর্ণ গৌর ও মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি। কুৎসিত না হইলেও ইহাদের দেহ লাবণ্যবর্জ্জিত। মোট কথা, ইহাদের আকৃতিপ্রকৃতি, আচারব্যবহার, চালচলন, বসবাস সমস্তই বিশ্রী।

কোহালা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত

স্থানসমূহের দৃশ্য।

কোহালার পরবর্ত্তী কয়েক মাইল স্থান সম্পূর্ণ লোকালয়বর্জ্জিত। এই স্থান দিয়া সর্ব্বদা অনেক 'লালপাগড়িওয়ালা'কে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। 'লালপাগড়িওয়ালা' বলিয়া এইসকল লোককে ভয় করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। ইহারা সি. আই. ডি. বিভাগের সহিত একেবারে সম্পর্কশূন্য এবং সেই বিভাগের মুষলমুদ্গরের সহিতও ইহাদের কোন সংস্রব নাই। পাগড়ির লালিমাটুকু শুধুমাত্র ইহাদের পাব্‌লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচায়ক।

দামেল।

'লালপাগড়িওয়ালা'দের রাজ্যের পরবর্ত্তী স্থানের নাম—দামেল। শ্রীনগর হইতে এই স্থান ১১১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে একটী সুবৃহৎ বিশ্রামালয় বা চটী আছে। কৃষ্ণা নদী ইহারই মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঝিলামের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এইস্থানে ঝিলামের উপর একটী মনোরম সেতু আছে। ঐ সেতু পার হইয়া মজঃফরাবাদে যাওয়া যায়। মজঃফরাবাদই স্থানীয় জেলার কেন্দ্রস্থল এবং আবটাবাদ ইহারই সংলগ্ন।

কৃষ্ণানদীর অপর পারে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কাশ্মীর যাইবার পথে বিশ্রামাগার স্বরূপে ঐ দুর্গটী ১৭০৭ সম্বতে সম্রাট শাজাহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গের বিপরীতভাগে শিখগুরু হররাজের নামে উৎসর্গীকৃত একটী মন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যস্থ একখানি প্রস্তরের উপর সম্রাটের সহযাত্রী হররাজ বিশ্রাম করিতেন বলিয়া শুনা যায়। প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে দেখিয়া হররাজকে শাজাহান একটী বিরামমন্দির প্রস্তুতের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু হররাজ এই বলিয়া সেই মন্দির নির্ম্মাণে বিরত থাকেন যে সম্রাটের দুর্গ বা ঐ মন্দির অল্পদিনেই নষ্ট হইয়া যাইবে; কিন্তু শত যুগযুগান্তেও প্রস্তরখণ্ডের ক্ষয় হইবে না। বর্ত্তমান মন্দিরটী সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর পরবর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে প্রত্যেক বৎসর বৈশাখ মাসে একটী বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়।

গঢ়ী।

গঢ়ী কোহালা হইতে ৩০ মাইল ও শ্রীনগর হইতে ১০০ মাইল দূরবর্ত্তী। একটী পুরাতন গড়ের নামানুসারেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই স্থানে সাহেবদের জন্য একটী বৃহৎ ডাকবাংলা ও দরিদ্র ভারতবাসীর আশ্রয়স্থল কয়েকখানি দোকান আছে। একখানি দোকানে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ হিন্দু আহার্য্য প্রস্তুত পাওয়া যায়। মুসলমানদের বিশ্রামের সুচারু বন্দোবস্ত সর্ব্বত্রই আছে।

গঢ়ী-প্রান্তস্থ ঝিলাম নদের পরপারেই একটী বৃহৎ কাশ্মীরী পল্লী। খাঁটী কাশ্মীরী শোভা সেই স্থান হইতেই আরম্ভ। ঝিলাম নদ পার হইয়া উক্ত পল্লীতে যাইবার জন্য একটী বৃহৎ দড়ীর সেতু বা এক গাছা দড়ীর সেতু আছে। এক গাছা দড়ী দ্বারা রচিত সেতু কাশ্মীর প্রদেশের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়।

ঝিলামের পরপারবর্ত্তী উল্লিখিত গ্রামে খাঁটী কাশ্মীরী
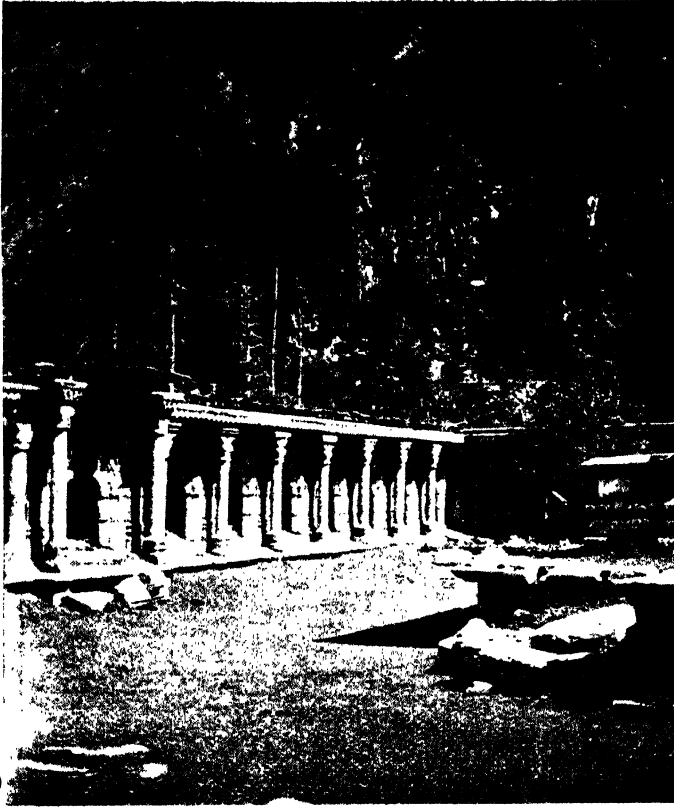
প্রাচীন বুনিয়ার মন্দিরের চত্বর।

ও শিখদের বাস। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে শ্রীনগরের ৩৯ মাইল দূরবর্ত্তী বরামূলা নামক স্থান হইতেই খাঁটা কাশ্মীরীদের বাসস্থান আরম্ভ। বরামূলার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানসমূহ খাঁটা কাশ্মীরীদের চক্ষে 'সাত সমুদ্র তের নদীর পারে'র দেশের সমান। বক্ষ্যমাণ কাশ্মীর-পল্লীটাকে খাঁটা কাশ্মীরীর উপনিবেশস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। এই পল্লীটা কাশ্মীরপথের সংলগ্ন না হইলেও দূর হইতেই গৃহস্থদের কাঠের দরজার কারুকার্য্য দৃষ্টে ইহাকে কাশ্মীরী পল্লী বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

উরী।

উরী শ্রীনগর হইতে ৪১ মাইল দূরবর্ত্তী। এই স্থান হইতে শ্রীনগর একদিনে পহুঁছা যায়। এই নগরীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার। স্থানীয় তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণীর ধবল শোভা অতি দূর হইতেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বনানীবেষ্টিত মুক্তপ্রান্তরের সবুজ দৃশ্য প্রকৃতই এস্থানটীকে প্রকৃতির উদ্যান স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থানে গৃহস্থদের গৃহদ্বারে কাশ্মীরী কারুকার্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সামান্য কিছু ভাড়ায় ঐরূপ গৃহে বিশ্রাম লাভেরও সুযোগ হইতে পারে। নগরীর মধ্যে সাহেবদিগের জন্য একটা সুরম্য ডাকবাংলা আছে। এই স্থানে জনৈক মুসলমানের দোকানে প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী কুল্‌চা ও অপরবিধ নানা সুখাদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশ্মীরী জনসাধারণের আকৃতিপ্রকৃতির পরিচয় লইবার পক্ষে এই স্থান বিশেষ উপযুক্ত।

প্রাচীন বুনিয়ার-মন্দির।

উরী হইতে শ্রীনগরের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায়, কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য ততই রম্য হইতে রম্যতর রূপে দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। এই পথে বুনিয়ার নামক স্থানের শোভা সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়। "উজ্জ্বলে মধুরের" দৃশ্য এই স্থানেই পূর্ণাবয়বে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের প্রান্তভাগে অতি রম্য স্থলে একটা শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের পশ্চাতে দেবদারুবেষ্টিত কঙ্করময় অধিত্যকা, সম্মুখে কলকলনাদী ঝিলামপ্রবাহ, চতুর্দ্দিক ঘন বৃক্ষচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন—প্রকৃতিরাণী হৃদয়ের সমস্ত গাম্ভীর্য্য দিয়া যেন এই স্থানটি মন্দিরের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন! মন্দিরটী চতুষ্কোণ, প্রস্তর-নির্ম্মিত ও সুবৃহৎ। কাশ্মীরের সমস্ত মন্দিরের গঠন-প্রণালীই ঐরূপ।

আপাতদৃষ্টিতে কাশ্মীরী হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য সহজে অনুভূত হয় না। উভয় সম্প্রদায়েরই পোষাকপরিচ্ছদ একরূপ। জাতিগত হিসাবেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই, কারণ মুসলমানগণও অধিকাংশ স্থলে হিন্দু-আচার-সম্পন্ন।

কাশ্মীরীগণ চা-পানে বিশেষ অভ্যস্ত। দিনের মধ্যে অন্ততঃ চারিবার প্রত্যেকের চা-পান করা আবশ্যক।

গৃহ—সমস্তই যেন কাশ্মীরী সৌন্দর্য্যের ভরা পসরা লইয়া পথিকের আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

বরামুলা কাশ্মীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর; আয়তনেও ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কাশ্মীর-রাজ্যের সমস্ত সুখসমৃদ্ধি এই নগরেই সঞ্চিত। শ্রীনগর, রাজ্যের রাজধানীমাত্র। নগরের শ্রী বাস্তবিকই রাজধানীর যোগ্য। শ্রীনগরের মধ্য দিয়া ঝিলাম-নদ প্রবাহিত; উভয় তীরের স্থানসমূহের সংযোগসাধন নিমিত্ত নদের উপর সাতটী বৃহৎ সেতু বর্ত্তমান।

বরামুলাও ঝিলামনদের তীরে অবস্থিত। এই নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৮০০০ হাজার। এতন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৯০ জন; অবশিষ্ট সমস্তই হিন্দু। কাশ্মীরী পণ্ডিত, ক্ষেত্রী বা বোরা, শিখ ও বাণিজ্যব্যবসায়ী পঞ্জাবী দ্বারাই হিন্দুসমাজ গঠিত।

বরামুলা প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ নগর। বেদেও ইহার নাম উল্লিখিত আছে। প্রবাদ, এই নগরই কাশ্মীর হ্রদের মুখ। পুরাকালে কাশ্মীর যে একটী হ্রদ ছিল, বর্ত্তমান উলার ও দল নামক হ্রদ দুইটীর আকৃতি প্রকৃতির বিচারেও তাহা উপলব্ধ হয়।

কাশ্মীরের প্রাচীন মন্দির।

ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিতগণের প্রত্যেকেই সঙ্গে সঙ্গে একটী চা-পাত্র বহন করেন। উহার মধ্যে সর্ব্বদা "গরম চা" সঞ্চিত থাকে। পুরোহিতগণের এই চা-পাত্রকে "সামবার" বলে।

বুনিয়াম্বের পর নাসারা পর্য্যন্ত সমস্ত পথ প্রাকৃতিক শোভায় নয়নরঞ্জক। নাসারার সন্নিহিত কাঁচুয়া ও সেরীর মধ্যবর্ত্তীস্থলের দৃশ্য অতুলনীয়—হরিৎ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে ধীরপ্রবাহী ঝিলাম নদ, অনতিদূরে তুষারশুভ্র গিরিশৃঙ্গ, তাহার পাদদেশে ঘন দেবদারুকুঞ্জ যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় সেই দিকেই প্রকৃতির লীলানিকেতন—এ হেন রমণীয় দৃশ্য! সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যে এ দৃশ্যের তুলনা নাই!

নাসারাপল্লীই মূল কাশ্মীর রাজ্যের একদিকের প্রান্তসীমা। এইস্থান হইতে পল্লীর পর পল্লী, গৃহের পর

বরামুলা নগরের সংস্থানও ইহাকে কাশ্মীরহ্রদের মুখ বলিয়া প্রমাণিত করে। নগরপ্রান্তের পর্ব্বত দুইটীর ব্যবধানমুখ এরূপ সামঞ্জস্যের সহিত সংস্থিত যে ইহা কাশ্মীররাজ্যের সিংহদ্বারস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। ভবিষ্যৎ জলপ্লাবনের আশঙ্কা নিবারণার্থ উলার হ্রদ হইতে জল নিষ্কাষণ করিয়া ঝিলামে প্রবাহিত করিবার উদ্দেশ্যে একটী যন্ত্রের সাহায্যে বরামুলায় ঝিলামের বিস্তৃতিসাধন করা হয়। এই যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক্তিবলে পরিচালিত হইয়া থাকে।

বরামুলা হইতে নৌকায় বা গাড়ীতে শ্রীনগর যাইতে হয়। পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া থাকিলে বরামুলায় বজরা বা নৌগৃহেরও বন্দোবস্ত হইতে পারে। বজরা বা নৌগৃহ শ্রীনগরের একটী প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। শ্রীনগরে যাত্রিগণের বাসের পক্ষে ইহাই উপযুক্ত স্থল।

বরামুলা শহর।
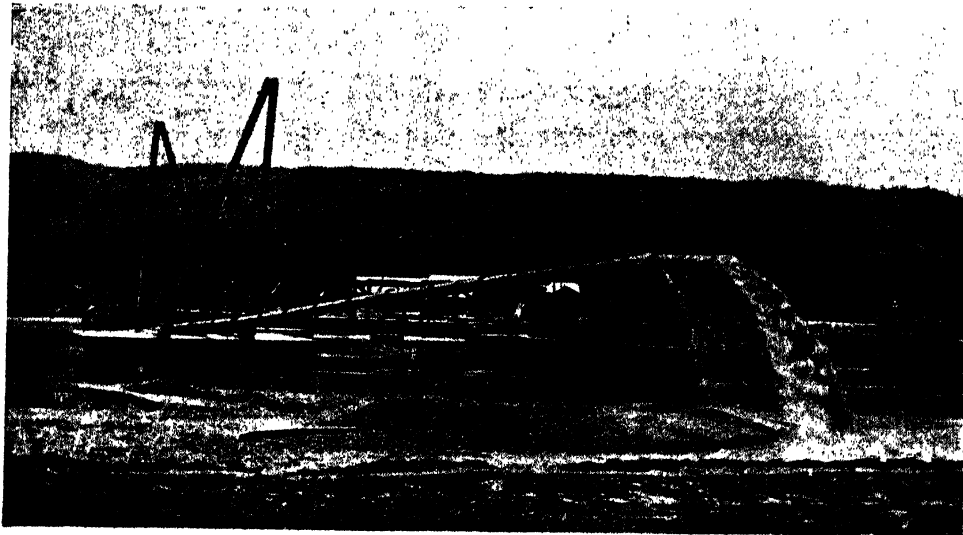
নদী প্রশস্ত করিবার যন্ত্র।

বরামুলা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত ৩৪ মাইল পথের উভয় পার্শ্বই সুরম্য ঝাউকুঞ্জে শোভিত। এই কুঞ্জপথে ভ্রমণ বড়ই আরামজনক। পত্তনের চটী ও ডাকবাংলার সন্নিহিতস্থলে তিনটী প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে।
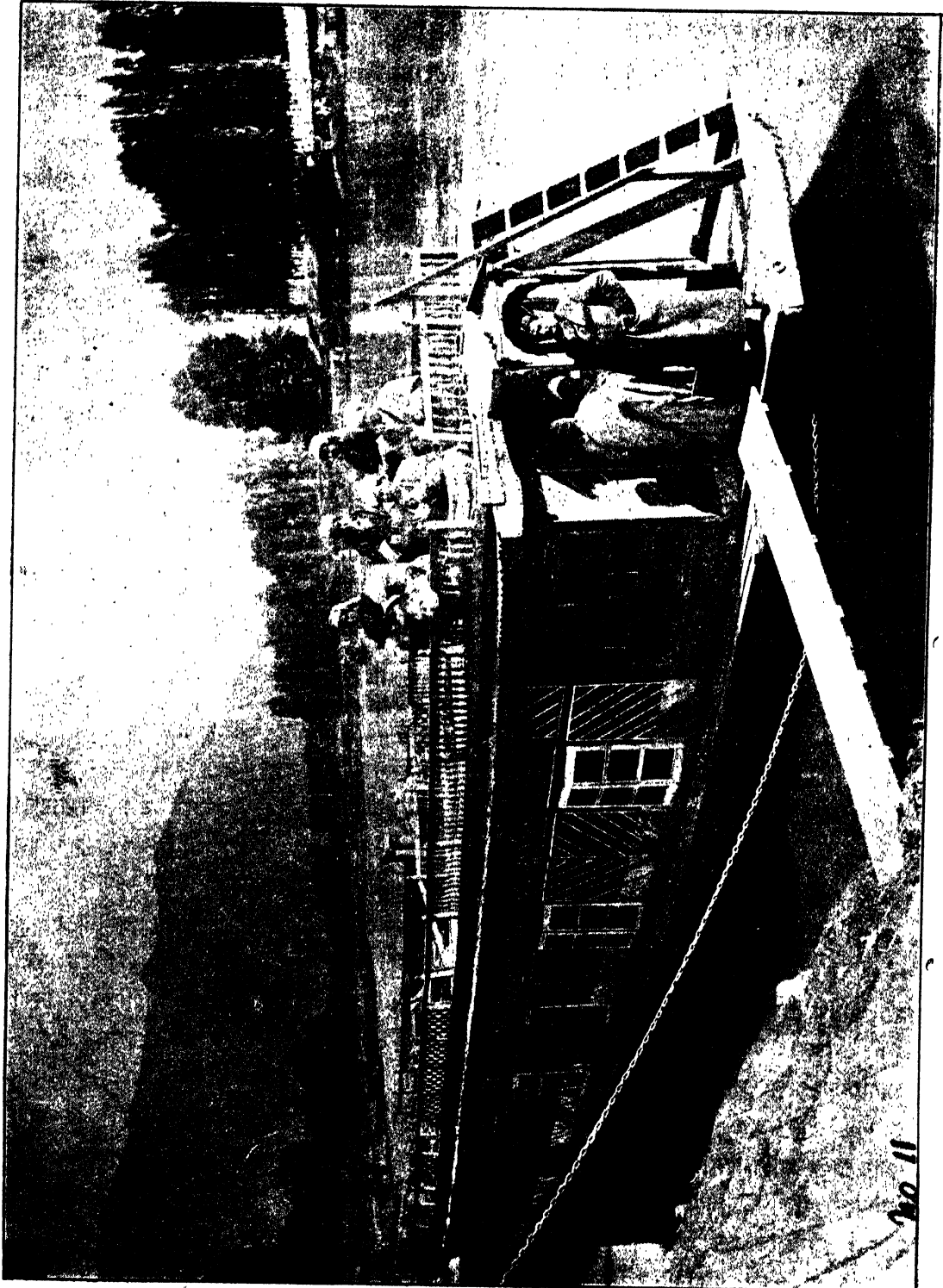
শ্রীনগরে বজরা বা নৌগৃহ—দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা প্রবাসী কাশ্মীরী এবং ছাদের লোকেরা কাশ্মীরী পণ্ডিত জাতীয়।

বরামুলা হইতেই প্রকৃত কাশ্মীর নগর আরম্ভ। এই নগরের শেষ প্রান্ত—৮২ মাইল দূরবর্ত্তী গণেশপুর পল্লী।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

জন্মদুঃখী

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রূপার বঁড়শী।

হীগ্‌বার্গের লোহার কারখানায় এবার 'ফাঁকা সোমবারের' উপর 'ভ্যাস্তা মঙ্গলবার' হইতে চলিয়াছে। রবিবারের বন্দের পর মিস্ত্রি মজুর কাহারও দেখা নাই। অতবড় কারখানায় মোটে একটি ছোকরা হাজির।

নূতন ডকের দরুণ রাশীকৃত কোদাল, গাঁতি, কুড়ুল প্রভৃতি শানাইবার অপেক্ষায় পড়িয়া আছে। সেগুলার উপর প্রায় এক আঙুল পুরু ধূলা। হীগ্‌বার্গ তো রাগে আগুন। ভাল লোক আর পাইবার জো নাই, সব হতভাগা। শিক্ষানবীশ ছোকরাদের সব সে তাড়াইয়া দিবে। মিস্ত্রিদেরও জবাব দিতে ছাড়িবে না। ইহা যদি না করে তবে তাহার নাম হীগ্‌বার্গ নয়।

যে ছোকরাটি আজ কাজে আসিয়াছে, সে ছুটির দিনেও কাজে আসে। সে চট্‌পট্‌ মিস্ত্রি হইতে চায়। দুনিয়ার গতিকই এই; কেহ বা এক সপ্তাহের রোজগার একদিনে উড়াইয়া দেয়,—মদ গিলিয়া কাজ কামাই করে; আর, কেহ বা ছুটির দিনে খাটিয়া,—পেটে না খাইয়া, একটি একটি করিয়া পয়সা জমাইয়া গৃহস্থালীর গোড়া-পত্তন করে। ছোকরাটি কাজের লোক বটে,—যদি পুলিশের ফ্যাসাদে না পড়িত তাহা হইলে কোনো কথাই বলিবার ছিল না। হাঁ,···তবে···পুলিশের হাতেও ছোকরা বেকসুর খালাস পাইয়া আসিয়াছে। সে যে দোষী, এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।

যাহার কথা হীগ্‌বার্গ আলোচনা করিতেছিল সে নিকোলা। নিকোলা আবার কামারের কাজে ভর্ত্তি হইয়াছে। এবার সে ওস্তাদ না হইয়া ছাড়িবে না।

এতক্ষণে! গদাই-লস্করী চালে দুইজন কারিগর কারখানায় আসিয়া হাজির হইল।

হীগ্‌বার্গ দেখিয়াও দেখিল না; সে হাপর একখানা গরম গাঁতি টানিয়া লইয়া হাতুড়ির আগুনবৃষ্টি করিতে লাগিল।

ওস্তাদ হইয়া চুল পাকাইয়া হীগ্‌বার্গ আজ কাজ করিতেছে! কারিগর দুইজন ইহাতে মনে মনে লজ্জা বোধ করিতেছিল। তীব্র তিরস্কারেও উহা লজ্জিত হইত কি না সন্দেহ।

কারিগরেরা ক্রমশঃ দুই একজন করিয়া কা আসিয়া জুটিতে লাগিল। কাহারও মুখ অত্যন্ত কাহারও একেবারে ফ্যাকাশে; কাহারও চোখের কালশিরা; কাহারও নাকের উপর ন্যাকড়ার পটি সকলেরি গলা ভাঙা। সকলেই আস্তে আস্তে বসিয়া গেল। এত কাজ জমিয়া গিয়াছে যে হা খাটুনি না খাটিলে সমস্ত দিনেও তাহা সাবাড় সম্ভাবনা নাই।

সমস্ত দুপুরবেলাটা নীরবে কাজ চলিল। বৈ দিকে কাজ অনেকটা হাল্কা হইয়া আসিয়াছে হীগ্‌বার্গ তাগাদায় বাহির হইয়া গেল।

এই সময়ে ঘর্ম্মাক্ত কারিগরদের মধ্যে একজন ও করিয়া গান ধরিল জন দুই অলস ভাবে আড় দিয়া হাই তুলিল। কামাইয়ের দিনটা কে যে কেমন কাটাইয়াছে প্রত্যেকের মুখে এখন তাহারই বর্ণনা।

একা নিকোলা উহাদের গল্পে যোগ দেয় নাই কতকগুলা কব্জায় ইস্ক্রুপ পরাইবার জন্য বিঁধ্‌ করিতে সমস্ত সপ্তাহে তাহার হাতের কাজ সারা হইবে সন্দেহ। গল্পে যোগ দিবার সময় তাহার নাই।

মিস্ত্রিরা বহ্নি উৎসবের গল্প করিতেছিল। কে পুরাণো আলকাৎরার পিপা পুড়াইয়াছে, পকেট করিয়া সমস্ত পয়সা মদে উড়াইয়াছে,—তাহারি কাহিনী। জান পিটার আবার, নৌকায় চড়িয়া জলটু গিয়াছিল, পাহাড়ের কত জায়গায় বন পোড়ার আগু দেখিয়া আসিয়াছে।

এত গল্প গুজবের মধ্যে নিকোলার ছোট হাতুড়িটির শব্দ মুহূর্ত্তের জন্যও বন্ধ নাই।

জান্ পিটারের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে আর একজন লোক গল্পের আসর জমাইয়া তুলিল। "গ্রীফ্‌সেন পাহাড়ে একরকম বিনামূল্যেই কাল মদ বিতরণ হয়েছিল। মদের ঝরণা ঝরছিল বল্‌লেই হয়! ভীর্গ্যাং সাহেবের ছেলে কলের মেয়ে মজুরদের সকলকে একেবারে খুসী করে ছেড়ে দিয়েছে। তারা আস্ত একখানা পুরোণো নৌকা প্রায় আধ পিপা আলকাৎরা দিয়ে পুড়িয়েছে। সমস্ত রাত গান বাজনা। আজ বেলা আটটার পর সেখান থেকে নেমে আসা গেছে।"

হাতুড়ি নীরব হইয়া গেল। "ভীর্গ্যাং সাহেবের ছেলে! কলের মেয়ে মজুর!" নিকোলা কান খাড়া করিয়া রহিল। যে লোকটা গল্প জুড়িয়াছিল তাহার বর্ণনা শেষ না হইতেই, হাত মুখ ধুইয়া নিকোলা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

* * * *

সিলা গোয়ালবাড়ী হইতে দুধ কিনিয়া বাহির হইতেছে, এমন সময়, দরজার কাছে নিকোলার সঙ্গে সাক্ষাৎ। সিলা বেশ বুঝিত নিকোলা উহারি সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, নিকোলা কিন্তু বলিল অন্যরূপ। সে বলিল "গোয়ালাবাড়ীতে তোমায় ঢুক্‌তে দেখলুম, তাই দাঁড়িয়ে আছি।"

"কাল যে কি মজাই হ'য়েছিল তা' আর তোমায় কী বল্‌ব নিকোলা!" সিলা দুধের পাত্র মাটিতে নামাইয়া বলিতে লাগিল "এমন মচ্ছব আমি জন্মে দেখি নি।"

"গ্রীফ্‌সেন পাহাড়ে?"

"তুমি জান্‌লে কি ক'রে? তুমি কি ক'রে জান্‌লে? অ্যাঁ! বল, তুমি জান্‌লে কি ক'রে?"

"আমি,—আমাদের একজন কারিগর,—সেও গিয়েছিল,—সেই বল্‌লে। আচ্ছা তুমি তোমার মার কাছ থেকে ছাড় পেলে কেমন ক'রে?"

সিলা চকিতের মত একবার চরিদিক দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিল "সেও ভারি মজা! মা গিয়েছিল মামার বাড়ী সেণ্ট্‌জনের প্রসাদ খেতে। আমায় বলে গেল 'বাড়ী আগ্‌লে থাকিস্, আর কাপড়গুলো ইস্ত্রি ক'রে রাখিস্।' নটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তে আমিও খেলা দেখ্‌তে বেরিয়ে গেলুম।" সিলা হাসিতে লাগিল। "বেলা পর্য্যন্ত আমায় ঘুমুতে দেখে, মাসীর বাড়ী থেকে সকালে ফিরে এসেই মা খুব খানিক আমায় বকে দিলে।...আমরা আবার রাত্রে কেমন সরবৎ খেয়েছিলুম, তা' শুনেছ?"

"খাওয়ালে কে?"

"বল্‌ব? আচ্ছা, তোমায় বল্‌ছি, কিন্তু, কাউকে বল না। খাইয়েছিল একজন—লোক"

"বটে!"

"সে বড় যে-সে নয়,—ভীর্গ্যাং সাহেবের ছেলে,—সেও বন-পোড়া দেখ্‌তে এসেছিল।"

"সে তোমাদের সরবৎ খাইয়েছে?—তোমাকেও খাইয়েছে?"

"হ্যাঁ! আমায় দেখিয়ে দোকানীকে বল্‌লে 'ওই যার কালো চোখ।' ওকে ভাল ক'রে সরবৎ তৈরী করে দাও!"

"আগে থেকেই আলাপ হয়েছে বোধ হয়?"

"হাঁ! সে জানে আমার নাম সিলা, তবুও বল্‌ছিল 'ওই যার কালো চোখ'। ওর সঙ্গে আমার রোজই দেখা হয়, তা বুঝি জান না?"

"বটে!" নিকোলার মুখ কালি হইয়া উঠিল।

"শনিবারে মাহিনা দেবার সময়, সে আমার হিসাবে দু'শিলিং বেশী জমা ক'রে ফেলেছে। শেষে আর কি হ'বে? হিসাব তো কাটাকুটি করা চলে না,—তাই বল্‌লে "ও দু'শিলিং তোমায় আলাদা দিয়ে দেব; তুমি কেক্ টেক্ কিনে খেয়ো।"

"হাঃ! হাঃ! তাই বল্‌লে নাকি? খুব তো তার দয়া। কসাইদেরও খুব দয়া! কাট্‌বার আগে মুরগীর সামনে মটর ছড়িয়ে দেয়, নইলে যে মুরগী ধরাই দেয় না।"

নিকোলা যতক্ষণ কথা কহিতেছিল ততক্ষণই সে সিলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। সিলা ক্রমশ কী সুন্দরীই হইয়া উঠিতেছে! যেমন মুখ তেমনি গড়ন! নিকোলা বলিয়া উঠিল "কী বোকা মেয়ে! নিজে যে সুন্দরী সে কথাটাও নিজে জানে না।"

সিলার ঠোঁট ফুলিয়া উঠিল। সে, যে বোবা এ কথাটা সে মোটেই আমল দিতে চায় না।

"একখানা রুমাল, একখানা কেক পেলেই খুসী, বোকা মুরগীর মত গলা বাড়িয়ে দেয়, যে খুসী ছুরি চালাতে পারে। এত দেখ শোনো, এটুকু বুদ্ধি তোমার হওয়া উচিত, সিলা। যে মেয়েদের সঙ্গে তুমি বেড়াও, ওদের আচরণ কি তোমার ভাল লাগে? ওদের একজনকেও কি কোনো ভদ্র রকমের কারিগর বিয়ে করতে চাইবে? না, ওরা তার উপযুক্ত? দু'দিন ফূর্ত্তি,—ব্যস্, তার পর সব ফরসা। কোনো ভদ্র পরিবারে ওদের বস্‌তেও জায়গা দেবে না। আর ঐ যে ভীর্গ্যাং সাহেবের ছেলে—ওকে আমার ভাল মনে হয় না সিলা। ও তোমার জন্যে ঠিক্ 'ওৎ' পেতে আছে। আমিও ওর জন্যে 'ওৎ' পেতে আছি।"—নিকোলার মুখ আবার ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

"তুমি কী বল্‌ছ নিকোলা?··· কি ঠাউরেছ মনে মনে·· বল দেখি?...আমি তোমার ভাব কিছু বুঝ্‌তে পারিনে। কী যে বল তার ঠিক নেই।"

"কি যে মনে করছি তা' তুমিই বুঝে দেখ। তোমাকে বাঘ ভালুকের মুখের সাম্‌নে ছেড়ে দিয়ে সারাটা দিন কেবল হাতুড়ি পিট্‌ব আর উখো ঘষ্‌ব—এতে সুখও নেই স্বস্তিও নেই। আমার আজন্ম ঐ রকমই চল্‌ছে।—আমার ভাগ্যে সবই উল্টো।"

সিলা মাথা হেঁট করিয়া রহিল। নিকোলার এই সব কথা তাহার মোটেই ভাল লাগিল না।

নিকোলা কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল "আমরা দুজনে, সিলা, বল্‌তে গেলে, একসঙ্গে মানুষ হ'য়েছি। আর যে হাঙ্গামার মধ্যে মানুষ হ'য়েছি তা' তোমার সবই জানা আছে। আমি বেটাছেলে, আমার পক্ষে বিগ্‌ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী ছিল না, কেননা, অত্যাচারে আমি দমে যেতুম না, আমার মনের জোর ছিল, জবাব দিতে পারতুম। কিন্তু তুমি দুর্ব্বল, তোমার পক্ষে বিগ্‌ড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। অনেক মিথ্যা তোমায় মাথা পেতে মেনে নিতে হয়েছে; অনেক কষ্টে মন পরিষ্কার রাখ্‌তে হয়েছে। সেই জন্যে—সেই জন্যে ভেবেছিলুম—যখন বরাবর আমরা পরস্পর পরস্পরের দোষ ঢেকে এসেছি, বরাবর পরস্পরকে সাহায্য করেছি—তখন আমাদের উচিত হ'চ্ছে চিরকাল একত্র থাকা, পরস্পরের হাত ধরে সংসারের বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়ে পরস্পরকে বাঁচিয়ে চলা। আমাদের উচিত হচ্ছে একটা সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া··বিয়ে করা। তোমার যদি আপত্তি না হয়, তবে"—

সিলা চুপ করিয়া রহিল। উহাকে মৌন দেখিয়া নিকোলা কতকটা সাহস পাইল। সে আবার বলিতে লাগিল—

"এখন আর আমি এক পয়সাও বাজে খরচ করিনে। জলপানির হিসাবে যা পাই সব এখন থেকে জমিয়ে রাখছি। অল্পদিনের মধ্যেই আমি একজন কারিগর হয়ে উঠ্‌ব। তখন, চাই কি, তোমাকে আর কলে গিয়ে কালিঝুলিও মাখ্‌তে হবে না, বড়ীতে মার কাছে বকুনিও খেতে হবে না;—তখন সিলা, তুমি হবে কারিগরের স্ত্রী। তোমাকে কেউ কখন যত্ন করেনি, আমি তোমায় যত্ন করব,—খুব যত্ন করব। ছেলেবেলায় যেমন করতুম ঠিক তেমনি। তাছাড়া আমি কখনো মা বাপের আদর যত্ন পাই নি, তাদের ভালবাসবারও অবসর পাই নি। সঙ্গী?—তাও পুলিসের হাঙ্গামার পর থেকে বড় বেশী নেই।"—নিকোলা একবার থামিল। "তুমি, সিলা, কারিগরের স্ত্রী হ'লে ভারি চমৎকার হবে। কামারের মনের মতন চোখ্ যদি কারো থাকে,—সে তোমার! চোখ্ নয়তো যেন হাপরের আগুনের ফুল্‌কি! কাজ থেকে যখন ঘরে ফিরে আস্‌বো দরজায় না ঢুক্‌তেই তোমার মুখ দেখ্‌তে পাব! সে কেমন হ'বে! চিরকাল কুকুরের মত থেকেছি,—কুকুরের অধম চোরের মত হ'য়ে থেকেছি—এখন যদি শুধু তোমায় পাই তো সেসব দুঃখ ভুলে যাব, খুব সুখে দিন কাটবে। জাহাজী গোরাদের সঙ্গে আর ছোকরা বাবুদের সঙ্গে নেচে বেড়ানোর চেয়ে, নিজের সিন্দুকে তালা লাগিয়ে নিজের ঘরে জোরের সঙ্গে থাকা ঢের ভালো, সিলা, সে ঢের ভালো।"

শেষ কয়টা কথা না বলিলেই ভাল ছিল। সিলা ভিজিয়াছিল; নিকোলার শেষ কয়টা কথায় সে আবার

গরম হইয়া উঠিল, সে বেশ একটু চটিয়া উঠিল; সিলা বলিল—

"তুমিও আমায় হেসেখেলে বেড়াতে দেবে না? আমি কোথাও যাব না, কারো সঙ্গে কথা কইব না?—এই কি তোমার ইচ্ছে? ছেলেবেলা থেকে মা যেমন ক'রে খাঁচায় পুরে রেখেছে তুমিও তেম্নি রাখ্‌বে?" সিলা কাঁদিয়া ফেলিল। "নিকোলা তুমি এম্‌নি ক'রে আমায় সুখী করবে? তোমার এইসব কথায় আমার মন ভারি খারাপ হ'য়ে যায়। এইসব কথা শুন্‌লে তোমাকেও আমার কেমন ভয় করে।"

"আমাকে ভয় করে? সিলা!"

"কলের মেয়েরা সবাই আমায় ঠাট্টা করে—বলে, খুকী মায়ের আঁচল ধরে বেড়াওগে। তুমিও এখন মায়ের দিকে হ'লে। বেশ! বেশ! খুব ভাল! সবাই মিলে আমায় জব্দ করে রাখ। যতদিন মার অধীন আছি, মা জব্দ করে রাখুক। যখন তোমার হাতে পড়ব তখন তুমিও তাই কোরো। এরকম কিন্তু ভাল নয় নিকোলা। এ আমি কিছু চিরদিন সইব না।" সিলা রাগে, দুঃখে, অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"আচ্ছা, কাঁদ, আমি কিছু বল্‌ব না, বল্‌তে চাইও না। এখন তোমায় সান্ত্বনা দেবার আরো ঢের লোক হ'য়েছে।"

সিলা, সহসা, চোখ্‌ মুছিয়া নিকোলার কাছে গিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল এবং আর্দ্র চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল "তোমায় ছাড়া আমি আর কাউকেই তো বিয়ে করব না, এ কথা কি তুমি জান না? ··নিকোলা!" সিলার চোখে আবার জল ভরিয়া উঠিতেছিল।

"সে তো বেশ কথা, সিলা! সে তো ভাল কথা। আমিও দেখাব যত্ন কাকে বলে। ভাল বাস্‌লে লোকে যে কতদূর পর্য্যন্ত কাজের লোক হয়, তাও তোমার অগোচর থাকবে না।"

"কিন্তু নিকোলা, মাকে আমার ভারি ভয়। যদি জান্‌তে পারে লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করি তা হ'লে রক্ষে থাকবে না। কোনো কাজের অছিলায় বাইরে দেরী হ'লে মা এম্‌নি ক'রে চায় যে আমার বুক শুকিয়ে যায়। সন্ধ্যা বেলা যখন রোজ ছেঁড়া কাপড় সেলাই করি, তখন একএকদিন মনে হয় তুমি যেন বড় লোক হ'য়েছ।—হীগ্‌বার্গের কামারশালার মালিক হ'য়ে আমাদের বাড়াতে এসেছ। এ যদি হয়, তা হ'লে আর মা অমত করতে পারবে না।"

"না, না! সত্যি? তুমি এই সব ভাব? সিলা! আস্‌ব, নিশ্চয় আস্‌ব। বড় লোক হ'য়ে না হ'ক পাকা কারিগর হ'য়ে তোমাদের বাড়ী আস্‌ব। তা হ'লেও তোমার মা আর অমত করতে পারবে না।"

একি! পড়ন্ত রৌদ্র আজ এমন উজ্জ্বল হইল কি করিয়া? উদ্ভিন্ন পল্লবের ভারে গাছের শাখা যে ভরিয়া উঠিল! পুলের তলে জলের কল্লোল আজ ঠিক কলহাস্যের মতই শুনাইতেছে। নিকোলা তো নেশা করে নাই! মধ্য নিদাঘের প্রশান্ত সন্ধ্যা সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল যে!

সিলা দুধের পাত্র হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে দূরে চলিয়া গেল। নিকোলার দিকে চাহিতে চাহিতে সে বাড়ীর অরণ্যে হারাইয়া গেল।

মোটের উপর দুনিয়াটা জায়গা নেহাৎ মন্দ নয়। কুলুপের কলের মত মাঝে মাঝে খারাপ হইয়া যায় বটে, কিন্তু মোটের উপর, খতাইয়া দেখিলে ইহাকে নিতান্ত খারাপ বলা চলে না। আর কল বিগ্‌ড়াইলেই বা এমন কী ক্ষতি? একটু হাত দুরস্ত হইলে, একটু ধৈর্য্য থাকিলে, সব ঠিক হইয়া আসে।

না, দুনিয়া বেশ জায়গা, খাঁটি জায়গা। একটু ভিতরে প্রবেশ করিলেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাহিরে পুলিশ পাহারা, ওস্তাদ-উপরওয়ালা; তাও ঐ কুলুপের কলটা ঠিক রাখিবার জন্য।

* * * *

নিকোলা এইবার পাকা মিস্ত্রি হইল। সার্টিফিকেট পাইল। পৃথিবী তাহার কাছে গোলাপী রঙে রঙীন্‌ হইয়া উঠিল। সংসারের সঙ্গে আজকাল যে তাহার বেশ বনি-বনাও হইতেছে, সে যে বেশ মানাইয়া চলিতে শিখিয়াছে সে কথা তখন তাহার উজ্জ্বল প্রশস্ত মুখের পরতে পরতে লেখা। এখন সে সকল কাজই বেশ সহজ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারে।

মিস্ত্রি হইয়া তাহার মাহিনা বাড়িয়া গেল। পাশ বহিতে প্রতি সপ্তাহেই বেশ কিছু জমিতে লাগিল। শ্রীমতী হল্‌ম্যানের ভয়ে সে এখনও সিলাকে কোনো জিনিস উপহার দিতে পারে না, সুতরাং বাজে খরচ একটি পয়সাও নাই। যে পয়সাটা বাঁচানো যায় সেইটাই লাভ; আর, আজই হোক, দুই দিন পরেই হোক, এ সবই তো সিলার।

শনিবারের বৈকালে, কারখানার ছুটি হইয়া গেলে, সে কাজের সাজে সিলাদের পাড়ার দিকেই যাইত; যেন কাজের খোঁজে চলিয়াছে; যাইবার সময় হাতুড়ি সাঁড়াশি কিম্বা একটা কুলুপ হাতে লইতে ভুলিত না। মনের কথাটা সিলার সঙ্গে দেখা করা; নির্ভর দৈবের উপর।

দেখা হইত দৈবাৎ। এক একবার সিলার বদলে সিলার মার সঙ্গেও চোখোচোখি হইয়া যাইত। দেখা না হওয়া বরং সহ্য হয় কিন্তু অন্য মেয়ে মজুরদের সঙ্গে সিলাকে একত্র দেখা নিকোলার পক্ষে একেবারে অসহ্য।

ওই হতভাগা মেয়েগুলোর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা বেড়াইবার কী দরকার? সিলার মত মেয়ের একি ভাল দেখায়? বেচারীর বয়স কম, বুদ্ধিও কাঁচা, এদের সঙ্গে মিশিবার যে কী পরিণাম তাহা সে বোঝে না। ভদ্রলোকের ছেলেদের ভদ্রতার যে কী মর্ম্ম তাহা সিলা এখনো বোঝে নাই। উহাদের শিষ্টতা যে শুধু সুন্দর মুখেরই জন্য তাহা সে এখনো জানে না। আমোদ আহ্লাদ করিতে চায়। করুক। ঘানিতে পড়িলে গুঁড়া হইয়াই বাহির হইতে হইবে।

নাঃ! সিলাকে এই সুদুস্তর পঙ্ক হইতে তুলিতেই হইবে।

নিকোলা এখন চোখ কান বুজিয়া কেবল হাতুড়ি পিটুক, উখো ঘষুক, পয়সা জমাক। রূপার বঁড়শীটা বেশ একটু বড় না হইলে সিলাকে গাঁথিয়া তোলা মুস্কিল,—ভারি মুস্কিল। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কষ্টিপাথর

ভারতী (কার্ত্তিক)—

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় "জগন্নাথ" পুরীর ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দেখাইয়াছেন যে—শ্রীক্ষেত্রে প্রথমে বৌদ্ধ রাজত্ব ছিল। সেই বৌদ্ধযুগে বুদ্ধদন্তের স্মৃতির উপরে জগন্নাথের সৃষ্টি হয়; একথা বিশ্বকোষে কিন্তু অস্বীকৃত। ইতিহাসে জগন্নাথের প্রথম উল্লেখ ৩১৮ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে রক্তবাহু নামক গ্রীসীয় বাক্ট্রিয় দস্যু পুরী আক্রমণ করে; পুরীর রাজা জগন্নাথমূর্ত্তি ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়া নিজে দেবতার ধনরত্ন লইয়া পলায়ন করেন; সেই সময় সাগরোচ্ছ্বাসে রক্তবাহুর সৈন্যধ্বংসে ও চিল্কা হ্রদের সৃষ্টি হয়। রক্তবাহু দ্বিতীয়বার পুরী আক্রমণ করিয়া পুরীর রাজা হয়। রক্তবাহুর বংশের পর প্রসিদ্ধ শৈব কেশরী বংশ পুরীর রাজা। যযাতিকেশরীর সময় (৪৭৬—৫২৬) হইতে জগন্নাথমন্দিরে রোজনামচা "মাদলা-পঞ্জী" লিখিত হইতে লাগিল—ইহাই উৎকলের প্রকৃত প্রামাণ্য ইতিহাস। যযাতিকেশরী চিল্কা হ্রদের তটভূমি হইতে জগন্নাথমূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ, দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদান ও পূজাপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করেন। এখন পর্য্যন্ত সেই রীতিতেই জগন্নাথ মন্দিরের কার্য্য হয়। ৪২ জন কেশরীবংশীয় রাজার পর ১১৩৪ খৃষ্টাব্দে কেশরীবংশের পতন হয়। তাহার পর বৈষ্ণব গঙ্গাবংশের আবির্ভাব। গঙ্গামুকুন্দ দেবের রাজত্বকালে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে) কালাপাহাড় জগন্নাথমূর্ত্তি নষ্ট করে। রামচন্দ্র দেবের সময় (১৫৯২-১৬২৪) উৎকলে মোগলশাসনের আরম্ভ। বীরকিশোর দেবের সময় (১৭৩৭—১৭৭৯) মহারাষ্ট্রশাসন আরম্ভ। এই সময় মন্দিরের পশ্চিম তোরণ, প্রস্তর প্রাচীর ও নরেন্দ্র সরোবরের সোপানাবলী নির্ম্মিত হয়; কণারকের অরুণস্তম্ভ পুরীতে আনীত হয়। মুকুন্দদেবের সময়ে (১৭৯৪—১৮১৭) উৎকলে ইংরাজশাসন আরম্ভ। ১২১১ খৃষ্টাব্দ হইতে মুসলমানদের সহিত জগন্নাথ বিগ্রহ লইয়া অনেকবার হিন্দুরাজার বিগ্রহ উপস্থিত হয়। কালাপাহাড় জগন্নাথমূর্ত্তি দখল করিয়া গঙ্গাতীরে আনিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলেন। দগ্ধাবশিষ্ট মূর্ত্তি বেসরমহান্তী জাহ্নবীর স্রোতে ভাসাইয়া পুনরায় দেশে লইয়া যান। ১৫৮০ সালে রামচন্দ্র দেব দারুব্রহ্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরেও অনেকবার অনেক উপদ্রব ও বিধর্ম্মী স্বধর্ম্মীর আক্রমণ উৎকলে হইয়াছে, কিন্তু জগন্নাথের ভাগ্যে আর কোনো বিপদ ঘটে নাই।

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিতে চান যে "পালিভদ্র" বা পালিবোথরা পাটলিপুত্র বা পাটনা নহে, উহা আধুনিক প্রয়াগ।

লেখক স্বীয় নাম প্রচ্ছন্ন রাখিয়া "বঙ্কিম যুগের কথা" লিখিতেছেন এবং তিনি এমন সব কথা বলিতেছেন যাহা প্রমাণ ও সাক্ষীর অপেক্ষা রাখিতেছে। বঙ্কিমের "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে একটি ও "কৃষ্ণকান্তের উইলে" তিন চারিটি পরিচ্ছেদ বঙ্কিমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণ বাবুর লেখা। এবং সেই পরিচ্ছেদগুলি বঙ্কিমের উপন্যাসের খুব উজ্জ্বল পরিচ্ছেদ। গতবারেও লেখক বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিম জগদীশনাথ রায়ের পরামর্শে ও সহায়তায় উপন্যাস লিখিতেন।

প্রতিভা (আশ্বিন ও কার্ত্তিক)—

শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় "কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" কোন স্থান অধিকার করেন ও তাঁহার কোন উপন্যাস কিরূপ তাহার বিচার করিতে বসিয়া বলিয়াছেন—বঙ্গসাহিত্য-রাজ্যের দুজন রাজা—বঙ্কিম ও রবীন্দ্র। একজনকে আমরা অবিসংবাদীভাবে বরণ করিয়া লইয়াছি, অপরজন সম্বন্ধে দ্বিধা এখনো ঘুচে নাই। লেখক বাহিরে বঙ্কিমকে রাজা মানিলেও রবীন্দ্রকেই অন্তরের রাজা বলিয়া মাল্য দিতে চাহেন। আমাদের দেশের সহিত যখন বিশ্বের যোগ হইল তখন বিশ্ববাণীর প্রকাশ হইয়াছিল রামমোহনে, বিকাশ বঙ্কিমচন্দ্রে, এবং পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। বিশ্বের সহিত হঠাৎ সংযোগে দেশে যে কর্ম্মচাঞ্চল্য জাগ্রত হইয়াছিল তাহার পরিচয় বঙ্কিমের ঘটনাবহুল রোমান্সে। এই রোমান্স বাঙালীকে সজাগ করিয়া তুলিল বটে কিন্তু আপনার নিকটে আপনাকে পরিচিত করিয়া তুলিতে পারিল না। বঙ্কিমের রোমান্সে কর্ম্মের অন্তরালে হৃদয় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। যাহা বা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রাজাবাদশা, রাণীবেগমের হৃদয়, সাধারণের

নহে। এই অভাব পূরণ করিতেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার প্রথম উপন্যাস বৌঠাকুরাণীর হাটে তিনি বঙ্কিমের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই; ইহাতে রোমান্সের উগ্রতা আছে। রাজর্ষিতে সে উগ্রতা মৃদু হইয়াছে মাত্র, একেবারে যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব সংসারের মধ্যে রাখিয়া সংসারবিমুক্ত আধ্যাত্মিক ভাবের চিত্র অঙ্কনের ক্ষমতায়।—সেই বিশেষত্ব রাজর্ষিতে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে প্রথম দেখা দিয়াছে। প্রেমকবি যুবক রবীন্দ্রনাথে আধ্যাত্মিক রবীন্দ্রনাথের নিহিত বীজের নিদর্শন। রাজর্ষির আর একটি বিশেষত্ব যে ইহা মামুলি নায়ক-নায়িকার প্রণয়ব্যাপারবর্জ্জিত; হৃদয়ভাবই ইহার কেন্দ্র; এবং শিশুচিত্র ইহার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। এসব জিনিষ বঙ্কিমে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিশুগুলি চিরন্তন শিশু, তাহারা আনন্দ দেয় মাত্র, কিন্তু তাহাদের প্রবহমান জীবনের সহিত পাঠকের সুখদুঃখ জড়িত হইবার অবসর ঘটে না। বঙ্কিমের রোমান্সে যাহা গুণের, রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনায় সেইসব কর্ম্মপ্রবাহের প্রবর্ত্তন দোষের হইয়াছে,—কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাববিশ্লেষণ ঘটনাবাহুল্যের গতির সহিত খাপ খাইবার নহে। তা ছাড়া প্রথম রচনায় সব চরিত্রগুলি তেমন ফুটে নাই। ভাষার বাহুল্যও একটা দোষ, কবিহৃদয়ের sentimentalityর বাক্যজাল চরিত্রসৃষ্টি ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। বাস্তবতার অভাবও একটা দোষ। প্রচুর হৃদয়সম্পদবিশিষ্ট মানব গড়া রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষত্ব—এই বিশেষত্ব তাঁহার প্রাথমিক রচনায় আছে কিন্তু অপরিণত অবস্থায়। এই পুস্তক দুইখানির করুণ চিত্রগুলি হাস্যরসের অবলম্বন না পাইয়া sentimental ধাঁচের হইয়া গিয়াছে। এ দুখানি উপন্যাসে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, খণ্ড সৌন্দর্য্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু মোটের উপর গঠননৈপুণ্যের অভাব আছে। ইহাদের তুলনায় চিরকুমার সভা (প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ) বা নষ্টনীড় দেখিলেই বুঝা যায় যে করুণরস ফুটাইতে হইলে তাহার পাশে হাস্যরসের বিশেষ আবশ্যক।

সাহিত্য (কার্ত্তিক)—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার "বঙ্কিমচন্দ্র" সম্বন্ধে তাঁহার জীবনী লেখকদের ভ্রম ও অতথ্যপূর্ণ উক্তি সকল নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন।

আর্য্যাবর্ত্ত (আশ্বিন)—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জবানী শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গুপ্ত "পুরাতন প্রসঙ্গে" লিখিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় could not bear a brother near the throne. এই দুর্ব্বলতা তাঁহার ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পাঠ করিতে বড় ভালো বাসিতেন। তাঁহার ছাপাখানার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক অন্নদামঙ্গল। মদনমোহনের গদ্যপদ্য রচনার খুব শক্তি ছিল; তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মে ব্যাপৃত না হইলে সাহিত্যসৃষ্টির প্রশংসা বিদ্যাসাগরের সহিত ভাগ করিয়া তাঁহাকেও হয়ত দিতে হইত। বিদ্যাবুদ্ধিতে দুজনে প্রায় সমকক্ষ, কিন্তু চরিত্রে আশমান জমিন প্রভেদ ছিল; মদনমোহনের চরিত্রের মেরুদণ্ড ছিল না। বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়নদিগকে বিদ্যাসুন্দর পড়াইতে বড় লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইতেন। এক একজন য়ুরোপীয় তাঁহাদের সাহিত্যের সদৃশ রচনার উল্লেখ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রবোধ দিতেন যে সাহিত্যক্ষেত্রে বাছবিচার করিলে চলে না। বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইলেও লোকচরিতজ্ঞ ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মতের স্থিরতা নাই দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে ল্যাজকাটা ও টিকিদাস বলিয়া উপহাস করিতেন। বিদ্যাসাগরের দেহ বেশ মজবুত ছিল; তিনি খুব হাঁটিতে পারিতেন; দেশীধরণে কুস্তি করিতেন। জীবহিংসা পরিহারের জন্য তিনি কিছুকাল মৎস্য মাংস ত্যাগ করিয়াছিলেন; বাছুরকে বঞ্চিত করিতে হয় বলিয়া দুগ্ধও ছাড়িয়াছিলেন। কোমতের মতে জীবহিংসা ব্যতীত যে মানবের পরিপুষ্টি হয় না ইহা সৃষ্টিকাণ্ডের অসম্পূর্ণতা এবং সৃষ্টিকর্ত্তার করুণাময়ত্বের বিরুদ্ধ। মানুষের যখন জীবমাংস আবশ্যক, তখন মানুষ খাদ্য জীবেদের সযত্নে পালন ও অল্প কষ্ট দিয়া বধ করিবে ছাড়া আর কিছু করিতে পারে না। সুরাপানে মানবত্বের বিকার ঘটে বলিয়া কোমৎ সুরাপানের বিরোধী এবং মহম্মদ মুসলমানের সুরাপান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া কোমৎ মহম্মদকে বলিয়াছেন The incomparable Mahammad. কোমতের যৌনসম্বন্ধের মত অনেকটা ম্যালথসের অনুরূপ। মানুষ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে জগতের দুঃখ দারিদ্র্য অকালমৃত্যু ঘুচিয়া যাইবে, মনুষ্যসৃষ্টি বা মৃত্যুরোধের উপায় করিবে বিজ্ঞান এবং ইহাই তাহার ভবিষ্য সাধনা হইবে। সাধারণের ধর্ম্মনীতির উন্নতি আবশ্যক। আহার কমাইলে রিপুরও দমন হয়। কোমৎ টমাস কেম্পিসের Imitation of Christ নামক পুস্তক বড় ভালো বাসিতেন, কেবল ভগবানের নামের বদলে তিনি মনুষ্যত্ব (humanity) পাঠ করিতেন। কেম্পিস যেমন ভগবানে বিভোর, সুইডেনবর্গ যেমন God-intoxicated man বা ভগবান লইয়া মাতোয়ারা ছিলেন, কোমৎও তদ্রূপ humanity বা মানবত্ব লইয়া মাতোয়ারা ছিলেন,—তিনি আহার, আচ্ছাদন, বাড়ী, ঘর, আইন, আদালত, হাঁসপাতাল, স্কুল সর্ব্বত্র মানবশক্তির পরিচয় দেখিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইতেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় "কবিকঙ্কণের যুগের সমাজ" সম্বন্ধে পরিচয় দিয়াছেন—তাঁহার কাব্যে কেবল রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণের বসতিস্থানকে কুলস্থান বলিত। গ্রামযাজী ব্রাহ্মণেরা হীন বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ঘটক ব্রাহ্মণেরাও তথৈবচ; কিন্তু তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট না রাখিলে তাঁহারা কুলপঞ্জীতে নিন্দা জুড়িয়া প্রতিশোধ লইতেন। গ্রহবিপ্রগণ নগরের এক পার্শ্বে মঠে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা নিষ্কর ভূমি পাইতেন। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে রাজপুতেরাই কেবল মল্লচর্চ্চা করিতেন। বৈশ্যগণ সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন ও কৃষি বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তখনকার বাণিজ্যদ্রব্য—শঙ্খ, চামর, চন্দন, সগল্লাদ বস্ত্র প্রভৃতি। বৈদ্যগণ মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া পুঁথি কাঁখে বাড়ী বাড়ী রোগী খুঁজিয়া বেড়াইতেন এবং অগ্রদানীদের সহিত তাঁহাদের বড় সদ্ভাব ছিল। বৈদ্য ও অগ্রদানীরা কুসস্থানে থাকিতেন। কায়স্থরা নগরের দক্ষিণে থাকিতেন; তাঁহারা সকলেই লেখাপড়া জানিতেন; এবং পেয়াদা মুহুরীর কার্য্য হইতে উচ্চ রাজকার্য্য পর্য্যন্ত করিতেন। বণিকগোপেরা ধার্ম্মিক ও সরল ছিল, কৃষিকর্ম্ম করিত। পল্লবগোপ ভার কাঁধে করিয়া ফসল বেচিত। তেলিদের মধ্যে কেহ বা চাষ করিত, কেহ বা ঘানি চালাইত। বারুইরা পানের বরজ করিয়া পানের চাষ করিত; তাম্বুলীরা পানের বীড়া বিক্রয় করিত। তাঁতিরা ভূনী শাড়ী, ধুতি, খাদি, গড়া তৈরি করিত। সূক্ষ্ম বস্ত্র সরাক জাতি বয়ন করিত। কুমারেরা হাঁড়ি ও মৃদঙ্গ প্রভৃতির খোল গড়িত। মালীরা ফুলের ও সোলার মালা ও খেলনা তৈরি করিত। মোদকেরা গুড় হইতে চিনি করিত; তখনকার শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন ছিল খণ্ড বা খাঁড় গুড়। বণিক পাঁচ শ্রেণীর ছিল—শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, মণিবণিক, কাংসবণিক ও সুবর্ণবণিক। ইহারা সকলে নগরের একদিকে বাস করিত; ইহাদের সহিত কামার, নাপিত প্রভৃতিও থাকিত। দুই শ্রেণীর ইতর জাতি দাস নামে উল্লিখিত হইয়াছে—এক শ্রেণী মাছ বেচিত ও অপর শ্রেণী চাষ করিত। কলু ও ভাট ইতর জাতির মধ্যে। বাইতি উৎসবে দোলা জোগাইত। বাগ্দীরা লাঠিয়াল পাইকের কাজ

করিত। ডোমেরাও স্ত্রী পুরুষে লাঠি তীরধনু চালাইতে জানিত। ডোমেরা বয়ণী, চালুনী, ঝাঁটা, টোকা, ছাতা নির্ম্মাণ করিত ও মজুরী করিত। সিউলীরা খেজুর রস সংগ্রহ করিয়া গুড় জ্বাল দিত। ছুতার কাঠের কাজ ভিন্ন চিড়া খই করিত। চণ্ডাল লবণ, পানিফল, কেশুর বিক্রয় করিত। চূনারি, মাঝি, কোরাঙ্গা, ভরদ্বাজী, মাল, কোয়ালি, মারাটা ও কোল নীচ জাতি—নগরের বাহিরে বাস করিত। মারাটারা প্লীহা ছানি কাটিত। কোয়ালিরা জায়জীবী (?) ছিল। হাড়ি ঘাস কাটিয়া বিক্রয় করিত; চামার মোজা, জুতা, জীন তৈরি করিত; ইহারা নগরের বাহিরে বাস করিত। মাছুয়া, কোচ ও দরজী নগরের মধ্যে থাকিত। নগরের পশ্চিমদিকে মুসলমানেরা থাকিত—সেই অংশকে হাসনহাটী বলিত। তাহারা মসজিদে লোহিত পাটী বিছাইয়া পাঁচবার নমাজ পড়িত; ছিলিমিলি মালায় পীর পগম্বরের নাম জপিত; পীরের মোকামে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিত; কোনো বিচার দশজনে মিলিয়া কোরানের অনুসারে করিত; কেহ কেহ সন্ধ্যার পর হাটে বাজনা বাজাইয়া নিশান পুতিয়া পীরের শিরনি বাঁটিত; ইহারা দানিশমন্দ ছিল এবং যাহা ভালো বুঝিত তাহা এবং রোজা প্রাণ গেলেও ত্যাগ করিত না। ইহারা টুপি ইজার পরিত; খালিমাথা লোকদিগকে ঘৃণা করিত; কুকুড়া ও বকরি জবাই করিত। ব্যবসায় অনুসারে মুসলমানের মধ্যেও জাতিবিভাগ ছিল। যাহারা রোজা নামাজ না করিত তাহারা গোলা; তাঁতির কাজ করিত জোলা; বলদে দ্রব্যাদি বহিত মুকেরি; পিঠা বেচিত পিঠারী; মাছ বেচিত কাবারি; কাবারিরা নিরন্তর মিথ্যা বলিত ও দাড়ি রাখিত না। হিন্দুরা মুসলমান হইলে হইত গয়সাল; যাহারা সানা বাঁধিত তাহারা সানাকর; যাহারা তীর করিত তাহারা তীরকর; কাগজ কুটিত কাগজি; পথে পথে ঘুরিত কলন্দর (ফকির)। কাপড় রং করিত রঙ্গরেজ; গোমাংস বেচিত কসাই; কাটা কাপড় সেলাই করিত দরজী; নানাবর্ণের ফিতা বা নেয়াল বুনিত বেনটা। হিন্দু মুসলমানে তখন পরস্পরের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া প্রায় মিলিয়া মিশিয়া সদ্ভাবে ছিল।

সেবক (কার্ত্তিক)—

"আচার্য্য মোক্ষমূলর ও ব্রাহ্মসমাজ" প্রবন্ধে আচার্য্যের প্রাচ্য শাস্ত্রের ও প্রাচ্য ধর্ম্মের সহিত পরিচয়ের কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে—মোক্ষমূলার লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহাধ্যায়ীদের অপেক্ষা একটা নূতন কিছু শিখিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ব্রকহাউসের কাছে সংস্কৃত শিখেন এবং পরে ঋগ্বেদের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৮৪৪ সালে হিতোপদেশ ও মেঘদূত অনুবাদ করেন। তখন বয়স উনিশ। ইহার পরে তিনি বার্লিনে অধ্যাপক বপ প্রভৃতির নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপক বর্ণুফের সাহায্যে সংস্কৃতে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য প্যারিসে গমন করেন। তখন তাঁহার বয়স বাইশ। বর্ণুফের উপদেশে তিনি ঋগ্বেদের তর্জ্জমায় নিযুক্ত হন। এই সময় সংস্কৃত পুথি নকল করিয়া বিক্রয় দ্বারা তিনি জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। ১৮৪৭ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সভাষ্য ঋগ্বেদ প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৬ সালে এই সূত্রে তিনি ইংলণ্ডে যান এবং জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত সেই দেশেই বাস করেন।

১৮৪৫ সালে প্যারিসে তিনি সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন। দ্বারকানাথ ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভ্যর্থনা-কক্ষটি কাশ্মীরী শালে আচ্ছাদিত করেন এবং সেই সকল শাল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে দিয়া বিদায় করেন। সেই নিমন্ত্রণ-সভায় আচার্য্য মোক্ষমূলর উপস্থিত ছিলেন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হন। মোক্ষমূলর আশা করিতেন যে ব্রাহ্মসমাজ কালক্রমে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে সহায় হইবে। এই জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী ছিলেন।

মোক্ষমূলর রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করিতেন; কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল।

কুমারী কলেট সম্পাদিত Brahmo Year Book ও মোক্ষমূলর-পত্নী কর্ত্তৃক সম্পাদিত আচার্য্যের জীবন-চরিতে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের সহিত শ্রদ্ধার সম্পর্কের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

পুস্তক-পরিচয়

কোরানের উপাখ্যান—

শ্রীআবদুল লতিফ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ১২ রয়েড ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নুর লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ডঃ ক্রাউন ১৬ অংশিত ৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য মাত্র দেড় আনা। কোরান শরিফের সহিত বালকবালিকা বা ভিন্নধর্ম্মীদিগের পরিচয়সাধনের উপযোগী করিয়া কোরানের মূল সূত্র ও উপাখ্যানগুলি খণ্ড খণ্ড নিবন্ধ আকারে লেখা হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। রচনাগুলি সুখপাঠ্য, ভাষা ভালো; যাঁহারা কোরান শরিফের মোটামুটি পরিচয় পাইতে চান তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে উপকৃত ও প্রীত হইবেন।

বিধবা-বিবাহ সমালোচনা—

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কৃত। ডিমাই ৮ অংশিত ৯৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৶০ আনা। "হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র, যুক্তি এবং বিজ্ঞানের অননুমোদিত বিধায় তন্নিষেধ বিষয়ক প্রস্তাব।" এ প্রস্তাব এই অগ্রসর যুগে কেহ গ্রাহ্য করিবে না, তা মিত্র মহাশয় যতই কেন বাক্য ও ঘরের পয়সা খরচ করুন। আদর্শের হিসাবে বিধবা বিবাহ ও বিপত্নীক বিবাহ নিশ্চয়ই উচিত নয়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উভয়েরই আবশ্যকতা যে আছে তাহা প্রত্যেক গ্রাম ও পরিবার হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে, এবং বিপত্নীক ও সপত্নীক পুরুষের যখন অবাধ বিবাহ চলিতেছে তখন বিধবার বিবাহ যে নিতান্তই অন্যায় ইহা বলা শোভা পায় না। এক আপত্তি নারী সন্তানের জননী, তাঁহার বিশুদ্ধি রক্ষা আবশ্যক; নিঃসন্তান বালবিধবার পক্ষে ত এ আপত্তিও টেঁকে না। সমাজে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা যতদিন সুপ্রচলিত না হইবে ততদিন সমাজ বিবিধ পাপে পঙ্কিল হইয়াই থাকিবে এবং ইহা অস্বীকার করা সত্যের অপলাপ।

নলদময়ন্তী—

শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ অংশিত ১০৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷০ আনা। নলদময়ন্তীর কাহিনী সংস্কৃত-প্রায় প্রাচীন রচনারীতিতে বিবৃত হইয়াছে। এরূপ ভাষা ও রচনারীতি আধুনিক কালের ঠিক উপযোগী নহে।

বাল্যবিনোদ—

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্। মূল্য এক আনা। ১৩১৮। ইহা কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে বর্ণপরিচয়ের পুস্তক।

তারিণী-তত্ত্ব-সঙ্গীত—

শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী বিরচিত। মূল্য এক টাকা। ইহাতে শ্যামাবিষয়ক বহু সঙ্গীত আছে। কিন্তু সঙ্গীতগুলির সাহিত্য হিসাবে কোনো বিশেষত্ব নাই। মুদ্রারাক্ষস।

মরক্কোর প্রতি।
"সমাশ্বসিহি! সমাশ্বসিহি। আমরা সকলে কেবলমাত্র এক এক টুকরা লইব।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

রয়টারের তারের খবরে দেখা যাইতেছে যে মরক্কো সম্বন্ধে সন্তোষজনক বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার মানে এ নয় যে বন্দোবস্তটা মরক্কোর রাজা বা অধিবাসীদের পক্ষে সন্তোষজনক হইয়াছে;—ইহার অর্থ এই যে ইউরোপ মহাদেশের যে সকল জাতি মরক্কো ভাগ বাঁটোয়ারা ক'রয়া লইতে ব্যগ্র, বন্দোবস্তটা তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছে। বিদ্রূপাত্মক ছবিতে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় নব্য তুরস্কের জাতীয় সঙ্গীতের যে অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছি, তাহা হইতে তুর্কদের সাহস ও তলোয়ার চালাইবার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। যুদ্ধে কৌশলপূর্ব্বক সৈন্য পরিচালনের ক্ষমতাও তাহাদের আছে। বাস্তবিক তুর্কদের রণদক্ষতা না থাকিলে তাহারা ইউরোপের এক অংশ জয় করিয়া তথায় এতদিন স্বাধীনভাবে বসবাস করিতে পারিত না। কিন্তু কেবল তলোয়ার, সাহস ও সেনাপতিত্বের উপর নির্ভর করাই তুর্কদের প্রধান ভুল হইয়াছে। তাহারা যদি প্রথম হইতে তাহাদের সাম্রাজ্যের সমুদয় প্রজাকে শাসনকার্য্যে অংশী করিত, এবং নিজেরা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিত ও সাম্রাজ্যের অপর প্রজাদিগকেও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনের সুযোগ দিত, তাহা হইলে, তাহাদের সাম্রাজ্য হইতে একে একে এতগুলি দেশ বাহির হইয়া স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইত না এবং ইটালাও তাহাদিগের সাম্রাজ্যের কোন অংশ অনায়াসে আক্রমণ করিতে পারিত না;—করিলেও পরাজিত হইত। বর্ত্তমান সময়েও যুদ্ধে সাহস চাই, দুইপক্ষ পরস্পরের খুব নিকটে পৌছিলে তলোয়ারও ব্যবহার করা চলে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত যুদ্ধজাহাজ ও টর্পেডো

ত্রিপলি ও ইতালি।
ইতালি—মা, ভৈঃ বন্ধু, মা ভৈঃ। আমি তোমাকে তুর্কদস্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছি।

যথেষ্ট সংখ্যক না থাকিলে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী কোন দেশ রক্ষা করা অসম্ভব। স্থলযুদ্ধেও, আকাশযান

দ্বারা আকাশে উঠিয়া ইটালীয়েরা যেরূপ উপর হইতে শত্রুদের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিতেছে, বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া আকাশযান নির্ম্মাণে পটু না হইলে, তুর্কেরা কিরূপে তদ্রূপ রণকৌশল প্রদর্শন করিবে? সুতরাং আজকাল তুর্কের সবল বাহু, তীক্ষ্ণ কৃপাণ, ও সাহস, বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত, পুরাকালের ন্যায় ফলপ্রদ হইবে না।

ইটালীয়েরা বলিয়াছিল বটে যে তাহারা ত্রিপলির লোকদিগকে তুর্কদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছে; কিন্তু তাহারা যেরূপ নির্ব্বিচারে যোদ্ধা অযোদ্ধা, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নরনারী, সকলকেই বধ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য স্পষ্টতর হইতেছে;—এবং সে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম হইতেই কাহারও সন্দেহ ছিল না। তাহা ইউরোপীয় একখানি কাগজ হইতে গৃহীত ছবিখানিতে সূচিত হইয়াছে।

সম্রাট্‌ পঞ্চমজর্জ্জের ভারতবর্ষে রাজমুকুট ধারণ উপলক্ষে অনেকে অনেক প্রকার আশা করিতেছেন। কাহারও কোন আশা পূর্ণ হইবে কি না বলা যায় না। সম্রাট্‌ কোন্‌ বর দান করিলে ভারতবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তবে ইহা নিশ্চয় যে সমুদয় বাঙ্গালীকে আবার এক শাসনকর্ত্তার অধীনে আনিলে অন্ততঃ অ-মুসলমান সমুদয় বাঙ্গালী সুখী হইবে;—মুসলমান বাঙ্গালীরাও অনেকে সন্তুষ্ট হইবে, অনেকে হইবে না। সমগ্র ভারতবাসী সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট কিসে হইবে বলা যায় না বটে; কিন্তু ভারতবাসীর উপকার সর্ব্বাপেক্ষা কিসে হইবে তাহা বলা যায়। একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (তাহা পঁচিশ বৎসরের অধিক না হইলেই ভাল হয়) ভারতবাসীরা নিজের দেশের সমুদয় আভ্যন্তরীন রাষ্ট্রীয় কার্য্য আপনাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-সভা দ্বারা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা পায়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হয়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর আর হইতে পারে না। প্রত্যেক বালক ও বালিকা বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পাইবে এই বর দ্বিতীয় স্থানীয়।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছে। সাধারণ তন্ত্রের দ্বারাই হউক, আর সম্রাটের শক্তিনিয়ামক প্রতিনিধি-সভা দ্বারাই হউক, কোনও প্রকারে চীনসাম্রাজ্যের লোকেরা নিজের হিতের জন্য নিজের দেশ শাসন করিবার ক্ষমতা পাইলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে। তাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে, এবং বিদেশী বণিক্‌দের বাণিজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

এখানে যে একটি অন্ধ ভিখারীর ছবি দেওয়া গেল তাহা শ্রীমান্‌ মুকুলচন্দ্র দে নামক একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রের আঁকা। ভিখারীর মুখের ভাব দেখিলেই বুঝা যায় যে সে অন্ধ ও তাহার মন বাহ্যজগতে নিবিষ্ট নহে।

অন্ধ ভিক্ষুক।

স্থানাভাবে প্রতিমাসেই অনেক লেখা প্রেসে পাঠাইয়াও, কখন কখন কম্পোজ করাইয়াও, আমরা প্রকাশ করিতে পারি না। অনেক প্রবন্ধ বৎসরাধিক কাল আমাদের নিকট রহিয়াছে। এইরূপ বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। এ অবস্থায় কেহ প্রবন্ধ ফেরত চাহিলে আমরা যথাসম্ভব শীঘ্র ফেরত দিয়া থাকি।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১১শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩১৮

৩য় সংখ্যা

জীবনস্মৃতি

হিমালয় যাত্রা।

পৈতা উপলক্ষ্যে মাথা মুড়াইয়া মহা ভাবনা হইল ইস্কুল যাইব কি করিয়া। গো জাতির প্রতি ফিরিঙ্গির ছেলের আন্তরিক আকর্ষণ যেমনি থাক্ ব্রাহ্মণের প্রতি ত তাহাদের ভক্তি নাই। অতএব নেড়ামাথার উপরে তাহারা আর কোনো শক্ত জিনিষ বর্ষণ যদি নাও করে তবে হাস্যবর্ষণ ত করিবেই।

এমন দুশ্চিন্তার সময়ে একদিন তেতালার ঘরে ডাক পড়িল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন আমি তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে চাই কি না। "চাই" এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় বেঙ্গল একাডেমী, আর কোথায় হিমালয়!

বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার সময় পিতা তাঁহার চিররীতি অনুসারে বাড়ির সকলকে দালানে লইয়া উপাসনা করিলেন। গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া পিতার সঙ্গে গাড়িতে চড়িলাম। আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোষাক তৈরি হইয়াছে। কি রংয়ের কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাথার জন্য একটা জরির-কাজ-করা গোল মকমলের টুপি হইয়াছিল। সেটা আমার হাতে ছিল, কারণ নেড়ামাথার উপর টুপি পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, মাথায় পর। পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত মস্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটু সুযোগ বুঝিলেই টুপিটা খুলিয়া রাখিতাম। কিন্তু পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। তখনি সেটাকে স্বস্থানে তুলিতে হইত।

ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিষ ঝাপ্‌সা রাখিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার কাজেও যেমন-তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না। তাঁহার প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি তাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্য অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। আমাদের জাতিগত স্বভাবটা যথেষ্ট ঢিলাঢালা। অল্প স্বল্প এদিক ওদিক হওয়াকে আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করি না। সেইজন্য তাঁহার সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের সকলকেই অত্যন্ত ভীত ও সতর্ক থাকিতে হইতে। উনিশ বিশ হইলে হয়ত কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যবস্থার যে লেশমাত্র নড়চড় ঘটে সেইখানে তিনি আঘাত পাইতেন। তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন। এইজন্য কোনো ক্রিয়াকর্ম্মে কোন্ জিনিষটা ঠিক্ কোথায় থাকিবে, কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন্ কাজের কতটুকু ভার থাকিবে সমস্তই তিনি আগাগোড়া মনের মধ্যে ঠিক্ করিয়া লইতেন এবং কিছুতেই কোনো অংশে তাহার

অন্যথা হইতে দিতেন না। তাহার পরে সে কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলে নানা লোকের কাছে তাহার বিবরণ শুনিতেন। প্রত্যেকের বর্ণনা মিলাইয়া লইয়া এবং মনের মধ্যে জোড়া দিয়া ঘটনাটি তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেন। এই সম্বন্ধে আমাদের দেশের জাতিগত ধর্ম্ম তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাঁহার সঙ্কল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না। এই জন্য হিমালয় যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম একদিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। যেখানে তিনি ছুটি দিতেন সেখানে তিনি কোনো কারণে কোনো বাধাই দিতেন না, যেখানে তিনি নিয়ম বাঁধিতেন সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখিতেন না।

যাত্রার আরম্ভে প্রথমে কিছুদিন বোলপুরে গিয়া থাকিবার কথা। কিছুকাল পূর্ব্বে পিতামাতার সঙ্গে সত্য সেখানে গিয়াছিল। তাহার কাছে এমন-বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছিলাম ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো ভদ্রঘরের শিশু তাহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিত না। কিন্তু আমাদের সেকালে সম্ভব অসম্ভবের মাঝখানে সীমা-রেখাটা যে কোথায় তাহা ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিতে শিখি নাই। কৃত্তিবাস কাশীরামদাস এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো সাহায্য করেন নাই। রংকরা ছেলেদের বই এবং ছবি-দেওয়া ছেলেদের কাগজ সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে আমাদিগকে আগেভাগে সাবধান করিয়া দেয় নাই। জগতে যে একটা কড়া নিয়মের উপসর্গ আছে সেটা আমাদিগকে নিজে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে।

সত্য বলিয়াছিল বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেলগাড়ীতে চড়া এক ভয়ঙ্কর সঙ্কট—পা ফস্‌কাইয়া গেলেই আর রক্ষা নাই। তারপর গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করে, তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে, মানুষ কে কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া মনের মধ্যে বেশ একটু ভয় ভয় করিতেছিল। কিন্তু গাড়িতে এত সহজেই উঠিলাম যে মনে সন্দেহ হইল এখনো হয়ত গাড়ি ওঠার আসল অঙ্গটাই বাকি আছে। তাহার পরে যখন অত্যন্ত সহজে গাড়ি ছাড়িয়া দিল তখন কোথাও বিপদের একটুও আভাস না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌঁছিলাম। পাল্কীতে চড়িয়া চোখ বুজিলাম। একেবারে কাল সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় আমার জাগ্রত চোখের সম্মুখে খুলিয়া যাইবে এই আমার ইচ্ছা—সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে কিছু কিছু আভাস যদি পাই তবে কালকের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হইবে।

ভোরে উঠিয়া বুক দুরু দুরু করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রমণকারী আমাকে বলিয়াছিল পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বোলপুরের একটা বিষয়ে প্রভেদ এই ছিল যে, কুঠিবাড়ি হইতে রান্নাঘরে যাইবার পথে যদিও কোনো প্রকার আবরণ নাই তবু গায়ে রৌদ্র বৃষ্টি কিছুই লাগে না। এই আশ্চর্য্য রাস্তাটা খুঁজিতে বাহির হইলাম। পাঠকেরা, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না, যে, আজ পর্য্যন্ত তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

আমরা সহরের ছেলে, কোনো কালে ধানের ক্ষেত দেখি নাই এবং রাখাল বালকের কথা বইয়ে পড়িয়া তাহাদিগকে খুব মনোহর করিয়া কল্পনার পটে আঁকিয়া ছিলাম। সত্যর কাছে শুনিয়াছিলাম, বোলপুরের মাঠে চারি দিকেই ধান ফলিয়া আছে এবং সেখানে রাখাল বালকদের সঙ্গে খেলা প্রতিদিনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ধানক্ষেত হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিয়া রাখালদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাওয়া এই খেলার একটা প্রধান অঙ্গ।

ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে চাহিলাম। হায়রে, মরুপ্রান্তরের মধ্যে কোথায় ধানের ক্ষেত! রাখাল বালক হয়ত বা মাঠের কোথাও ছিল কিন্তু তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া রাখাল বালক বলিয়া চিনিবার কোনো উপায় ছিল না।

যাহা দেখিলাম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না—যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্‌চক্রবালে একটিমাত্র নীল রেখার গণ্ডি আঁকিয়া রাখিয়া-

ছিলেন, তাহাতে আমার অবাধ সঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।

যদিচ আমি নিতান্ত ছোট ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছবিহারে নিষেধ করিতেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষইয়া গিয়া প্রান্তরতল হইতে নিম্নে লাল কাঁকর ও নানা প্রকার পাথরে খচিত ছোট ছোট শৈলমালা, গুহা গহ্বর, নদী উপনদী রচনা করিয়া বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া আমার পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনো উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন—কি চমৎকার! এ সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে! আমি বলিতাম "এমন আরো কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।" তিনি বলিতেন "সে হইলে ত বেশ হয়। ঐ পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।"

একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত কঠিন মাটি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই অসমাপ্ত গর্ত্তের মাটি তুলিয়া দক্ষিণধারে পাহাড়ের অনুকরণে একটি উচ্চ স্তূপ তৈরি হইয়াছিল। সেখানে প্রভাতে আমার পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বদিকের প্রান্তর-সীমায় সূর্য্যোদয় হইত। এই পাহাড়টাই পাথর দিয়া খচিত করিবার জন্য তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন।

খোয়াইয়ের মধ্যে এক জায়গায় মাটি চুঁইয়া একটা গভীর গর্ত্তের মধ্যে জল জমা হইত। এই জলসঞ্চার আপন বেষ্টন ছাপাইয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া বালির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। অতি ছোট ছোট মাছ সেই জলকুণ্ডের মুখের কাছে স্রোতের উজানে সন্তরণের স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিত। আমি পিতাকে গিয়া বলিলাম—"ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখিয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে আমাদের স্নানের ও পানের জল আনিলে বেশ হয়!" তিনি আমার উৎসাহে যোগ দিয়া বলিলেন "তাইত, সে ত বেশ হইবে" এবং আবিষ্কারকর্ত্তাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য সেইখান হইতেই জল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমি যখন-তখন এই খোয়াইয়ের উপত্যকা অধিত্যকার মধ্যে অভূতপূর্ব্ব কোনো একটা কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংষ্টোন। এটা যেন একটা দূরবীণের উল্টা দিকের দেশ। নদীপাহাড়গুলোও যেমন ছোট ছোট, মাঝে মাঝে ইতস্তত: বুনো জাম, বুনো খেজুরগুলোও তেমনি বেঁটে খাটো। আমার আবিষ্কৃত ছোট নদীটির মাছগুলিও তেমনি, আর আবিষ্কারকর্ত্তাটির ত কথাই নাই।

পিতা বোধ করি আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য আমার কাছে দুই চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন হিসাব রাখিতে হইবে; এবং আমার প্রতি তাঁহার দামী সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে চিন্তা তিনি করিলেন না, আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন। অবশেষে তাঁহার কাছে জমা খরচ মেলাইবার সময় কিছুতেই মিলিত না। এক দিন ত তহবিল বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তোমাকেই দেখিতেছি আমার ক্যাশিয়ার রাখিতে হইবে, তোমার হাতে আমার টাকা বাড়িয়া উঠে।" তাঁহার ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম। যত্ন কিছু প্রবল বেগেই করিতাম; ঘড়িটা অনতি-কালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল।

বড় বয়সে কাজের ভার পাইয়া যখন তাঁহার কাছে হিসাব দিতে হইত সেই দিনের কথা এইখানে আমার মনে পড়িতেছে। তখন তিনি পার্ক ষ্ট্রীটে থাকিতেন। প্রতি মাসের ২রা ও ৩রা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত। তিনি তখন নিজে পড়িতে পারিতেন না। গত মাসের ও গত বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিয়া সমস্ত আয়ব্যয়ের বিবরণ তাঁহার সম্মুখে ধরিতে হইত। প্রথমত: মোটা অঙ্কগুলা তিনি শুনিয়া লইতেন ও মনে মনে তাহার যোগ বিয়োগ করিয়া লইতেন। মনের মধ্যে যদি কোনো দিন অসঙ্গতি

অনুভব করিতেন তবে ছোট ছোট অঙ্কগুলা শুনাইয়া যাইতে হইত। কোনো কোনো দিন এমন ঘটিয়াছে হিসাবে যেখানে কোনো দুর্ব্বলতা থাকিত সেখানে তাঁহার বিরক্তি বাঁচাইবার জন্য চাপিয়া গিয়াছি কিন্তু কোনোদিন তাহা চাপা থাকে নাই। হিসাবের মোট চেহারা তিনি চিত্তপটে আঁকিয়া লইতেন। যেখানে ছিদ্র পড়িত সেখানেই তিনি ধরিতে পারিতেন। এই কারণে মাসের ঐ দুটা দিন বিশেষ উদ্বেগের দিন ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনের মধ্যে সকল জিনিষ সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লওয়া-তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল—তা হিসাবের অঙ্কই হোক্, বা প্রাকৃতিক দৃশ্যই হোক্, বা অনুষ্ঠানের আয়োজনই হোক্। শান্তিনিকেতনের নূতন মন্দির প্রভৃতি অনেক জিনিষ তিনি চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু যে-কেহ শান্তিনিকেতন দেখিয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে প্রত্যেক লোকের কাছ হইতে বিবরণ শুনিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ জিনিষগুলিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আঁকিয়া না লইয়া ছাড়েন নাই। তাঁহার স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল। সেই জন্য একবার মনের মধ্যে যাহা গ্রহণ করিতেন তাহা কিছুতেই তাঁহার মন হইতে ভ্রষ্ট হইত না।

ভগবদ্গীতায় পিতার মনের মত শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার পরে এই সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এখন খাতাপত্র এবং বাহ্য উপকরণের দ্বারা কবিত্বের ইজ্জৎ রাখিবার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। এই জন্য বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভাল বাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে "পৃথ্বীরাজের পরাজয়" বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারো কাছে রাখিয়া যায় নাই।

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অমৃতসরে গিয়া পৌঁছিলাম।

পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যেটা এখনো আমার মনে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কোনো একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। টিকিট পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কি একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর একজন আসিল—উভয়ে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উস্‌খুস্ করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয়বারে বোধ হয় স্বয়ং ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফটিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে? পিতা কহিলেন "না"। তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। ষ্টেশন মাষ্টার কহিল ইহার জন্য পূরা ভাড়া দিতে হইবে। আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনি নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহারা প্ল্যাটফর্ম্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। ষ্টেশন মাষ্টার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া চলিয়া গেল—টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।

অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মত মনে পড়ে। অনেক দিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ-মন্দিরে গিয়াছি। সেখানে

নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা একসময় সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন—বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছ্‌রির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে—আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

"তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে
কে সহায় ভব-অন্ধকারে"—

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন,—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠ বাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড় বয়সে আর একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি নূতন গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান—"নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে"।

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হার্ম্মোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সবকটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে ত তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশো টাকার চেক্ আমার হাতে দিলেন।

পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া Peter Parley's Tales পর্য্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন জীবনী অনেকটা গল্পের মত লাগিবে এবং তাহা পড়িয়া আমার উপকার হইবে। কিন্তু পড়াইতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিল। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ ছিলেন। তাঁহার হিসাব-করা কেজো ধর্ম্মনীতির সঙ্কীর্ণতা আমার পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি এক এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্রাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ইহার পূর্ব্বে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর কোনো চর্চ্চা হয় নাই। পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন। বাংলা আমাদিগকে এমন করিয়া পড়িতে হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। একেবারে গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাকার্য্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলট্‌পালট্ করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে সেখানে যথেচ্ছ অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।

ইহা ছাড়া তিনি প্রক্টরের লিখিত সরল পাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।

তাঁহার নিজের পড়ার জন্য তিনি যে বইগুলি সঙ্গে লইয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটা আমার চোখে খুব ঠেকিত। দশ বারো খণ্ডে বাঁধানো বৃহদাকার গিবনের রোম। দেখিয়া মনে হইত না ইহার মধ্যে কিছুমাত্র রস

আছে। আমি মনে মনে ভাবিতাম—আমাকে দায়ে পড়িয়া অনেক জিনিষ পড়িতে হয়, কারণ আমি বালক, আমার উপায় নাই—কিন্তু ইনি ত ইচ্ছা করিলেই না পড়িলেই পারিতেন, তবে এ দুঃখ কেন?

অমৃতসরে মাসখানেক ছিলাম। সেখান হইতে চৈত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তখন পর্ব্বতের উপত্যকা-অধিত্যকা-দেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পংক্তিতে পংক্তিতে সৌন্দর্য্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রাতঃকালেই দুধরুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্নে ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্তদিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না—পাছে কিছু একটা এড়াইয়া যায় এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে পথের কোনো বাঁকে পল্লব-ভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের নিকটের লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মত দুই একটি ঝরণার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ঘন শীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল্‌কুল্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম এ সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন? এইখানে থাকিলেই ত হয়।

নূতন পরিচয়ের ঐ একটা মস্ত সুবিধা। মন তখনো জানিতে পারে না যে এমন আরো অনেক আছে। তাহা জানিতে পারিলেই হিসাবী মন মনোযোগের খরচটা বাঁচাইতে চেষ্টা করে। যখন প্রত্যেক জিনিষটাকেই একান্ত দুর্লভ বলিয়া মনে করে তখনই মন আপনার কৃপণতা ঘুচাইয়া পূর্ণ মূল্য দেয়।

আমার কাছে পিতা তাঁহার ছোট ক্যাশবাক্সটি রাখিবার ভার দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমিই যোগ্যতম ব্যক্তি সে কথা মনে করিবার হেতু ছিল না। পথখরচের জন্য তাহাতে অনেক টাকাই থাকিত। কিশোরী চাটুর্য্যের হাতে দিলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু আমার উপর বিশেষ ভার দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ডাক বাংলায় পৌঁছিয়া একদিন বাক্সটি তাঁহার হাতে না দিয়া ঘরের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে ভৎসর্না করিয়াছিলেন।

ডাক বাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্ব্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

ব'ক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। যদিও তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল। এমন কি, পথের যে অংশে রৌদ্র পড়ে নাই সেখানে তখনো বরফ গলে নাই।

এখানেও কোন বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা একদিনও আমাকে বাধা দেন নাই।

আমাদের বাসার নিম্নবর্ত্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলক-বিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতি-গুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ! কিন্তু এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসঙ্কোচে তাহাদের গা ঘেঁসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না! এখনকার চোখে এই বনটি কত বড় বলিতে পারি না—হয়ত বিশেষ কিছুই না। কিন্তু তখন এটাকে পুরাতন দণ্ডকারণ্য বলিয়া বোধ হইত। বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মত একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্য্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।

আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রা-লোকের অস্পষ্টতায় পর্ব্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি

দেখিতে পাইতাম। এক একদিন—জানিনা কতরাত্রে দেখিতাম পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দ সঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

তাহার পর আর এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে নরঃ নরৌ নরাঃ মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্তবেষ্টন হইতে বড় দুঃখের এই উদ্বোধন।

সূর্য্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা অন্তে একবাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্র পাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন।

তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে আমি পারিব কেন? অনেক বয়স্ক লোকেরও সে সাধ্য ছিল না। আমি পথি-মধ্যেই কোনো একটা জায়গায় ভঙ্গ দিয়া পায়-চলা পথ বাহিয়া উঠিয়া আমাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম।

পিতা ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টাখানেক ইংরেজি পড়া চলিত। তাহার পর দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডা জলে স্নান। ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না; তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরম জল মিশাইতেও ভৃত্যেরা কেহ সাহস করিত না। যৌবনকালে তিনি নিজে কিরূপ দুঃসহ শীতল জলে স্নান করিয়াছেন আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য সেই গল্প করিতেন।

দুধ খাওয়া আমার আর এক তপস্যা ছিল। আমার পিতা প্রচুর পরিমাণে দুধ খাইতেন। আমি এই পৈতৃক দুগ্ধপান-শক্তির অধিকারী হইতে পারিতাম কি না নিশ্চয় বলা যায় না কিন্তু পূর্ব্বেই জানাইয়াছি কি কারণে আমার পানাহারের অভ্যাস সম্পূর্ণ উল্টা দিকে চলিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে বরাবর আমাকে দুধ খাইতে হইত। ভৃত্যদের শরণাপন্ন হইলাম। তাহারা আমার প্রতি দয়া করিয়া বা নিজের প্রতি মমতা বশত বাটিতে দুধের অপেক্ষা ফেনার পরিমাণ বেশি করিয়া দিত।

মধ্যাহ্নে আহারের পর পিতা আমাকে আর একবার পড়াইতে বসিতেন। কিন্তু সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যুষের নষ্ট ঘুম তাহার অকাল ব্যাঘাতের শোধ লইত। আমি ঘুমে বার বার ঢুলিয়া পড়িতাম। আমার অবস্থা বুঝিয়া পিতা ছুটি দিবামাত্র ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।

পিতার সঙ্গে অনেক সময়েই বাড়ির গল্প বলিতাম। বাড়ি হইতে কাহারো চিঠি পাইবামাত্র তাঁহাকে দেখাইতাম। নিশ্চয়ই তিনি আমার কাছ হইতে এমন অনেক ছবি পাইতেন যাহা আর কাহারো কাছ হইতে পাইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

তিনিও আমার সঙ্গে অনেক কৌতুকের গল্প করিতেন। তাঁহার কাছ হইতে সেকালের বড়মানুষীর অনেক কথা শুনিতাম। ঢাকাই কাপড়ের পাড় তাহাদের গায়ে কর্কশ ঠেকিত বলিয়া তখনকার দিনের সৌখীন লোকেরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কাপড় পরিত—এই সব গল্প তাঁহার কাছে শুনিয়াছি। গয়লা দুধে জল দিত বলিয়া দুধ পরিদর্শনের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত হইল, পুনশ্চ তাহার কার্য্য পরিদর্শনের জন্য দ্বিতীয় পরিদর্শক নিযুক্ত হইল। এইরূপে পরিদর্শকের সংখ্যা যতই বাড়িয়া চলিল দুধের রংও ততই ঘোলা এবং ক্রমশঃ কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছনীল হইয়া উঠিতে লাগিল—এবং কৈফিয়ৎ দিবার কালে গয়লা বাবুকে জানাইল, পরিদর্শক যদি আরো বাড়ানো হয় তবে অগত্যা দুধের মধ্যে শামুক ঝিনুক ও চিংড়িমাছের প্রাদুর্ভাব হইবে। এই গল্প তাঁহারই মুখে প্রথম শুনিয়া খুব আমোদ পাইয়াছি।

এমন করিয়া কয়েক মাস কাটিলে পর পিতৃদেব তাঁহার অনুচর কিশোরী চাটুর্য্যের সঙ্গে আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মালদহের রাধেশচন্দ্র*

[বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের হেমচন্দ্র বসু মল্লিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, কর্তৃক লিখিত।]

আজ আমি আপনাদের সম্মুখে যাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে উঠিয়াছি তাঁহার নামই হয়ত অনেক বাঙ্গালী জানেন না। রাধেশচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন অথবা অদ্ভুত ক্রিয়াবান পুরুষ ছিলেন না। তাঁহার চিন্তা ও কর্ম্ম সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ কোন আন্দোলন সৃষ্টি করে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যেও তিনি তাঁহার স্বতন্ত্র স্থান আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই।

কিন্তু একটি অনুন্নত জেলার পশ্চাৎপদ সমাজকে সর্ব্ববিধ উপায়ে উন্নীত করিয়া তোলা তাঁহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষবিধানের জন্য উদ্যম ও অধ্যবসায় তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতিকল্পে দেশবিশ্রুত কর্ম্ম-ও-চিন্তাবীরগণ যেরূপ নায়ক ও পথপ্রদর্শকের কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন রাধেশচন্দ্র মালদহের আধুনিক কর্ম্মক্ষেত্রেও সেই অগ্রণী এবং প্রবর্ত্তকের স্থানই অধিকার করিতেন। বর্ত্তমান যুগে সমাজসংস্কার, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, শিল্পপ্রতিষ্ঠা, সভাসমিতি গঠন, শিক্ষাবিস্তার এবং সাহিত্য চর্চ্চা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে আয়াস স্বীকার করিয়া যে কয়জন বাঙ্গালী নিজ নিজ জেলা বা জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; রাধেশচন্দ্রও তাঁহাদেরই পন্থা অবলম্বন করিয়া স্বকীয় গণ্ডীর মধ্যে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারের দ্বারা এই ক্ষুদ্র জেলাকে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের সাধারণ জীবনপ্রবাহের সহিত মিলাইয়াছেন।

তাঁহার এই জীবনব্যাপিনী সাধনার মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন তখন মালদহ জেলার গৌরবের সামগ্রী কিছুই ছিল না। তাঁহার জন্মভূমি একদিন অর্দ্ধভারতের মুকুটমণি থাকিলেও, তাঁহার জন্মের বহু পূর্ব্বে সে মহান্ গৌরবের কণিকামাত্রও তথায় পড়িয়া থাকে নাই। থাকিবার মধ্যে প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ কয়েক খণ্ড ইষ্টক ও পাষাণ, আর মহামহিমান্বিত প্রাচীন স্মৃতিটুকু গৌড় পুণ্ড্র নামের সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছিল মাত্র। একজনও সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, প্রত্নতত্ত্ববিদের তখনও তথায় আবির্ভাব হয় নাই।

যে মালদহে "নাগর ধানুক চাঁই এ তিন ছাড়া আর লোক নাই" বলিয়া অন্যান্য জেলার শিক্ষিত ভদ্রগণ উপহাস করিতেন তিনি সেই মালদহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গের অধিকাংশ জেলাগুলি উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিতেছিল। কিন্তু মালদহ তখনও অহিফেন-ঘোরে তন্দ্রাতুর হইয়া রহিয়াছিল। এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির ১৩১৪-১৫ বার্ষিক বিবরণীতে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

> এই বৎসর মালদহ আদর্শ বিদ্যালয় হইতে পাঁচজন ছাত্র জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পঞ্চম মান পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা গিয়াছেন। ইঁহাদের শিক্ষালাভের প্রধান উদ্দেশ্য মালদহ জেলার মধ্যে জাতীয় শিক্ষার বিস্তার করা।
>
> ইঁহারা সকলেই খাঁটী মালদহবাসী, মালদহ জেলার প্রত্যেকের আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। এক বৎসরে মালদহ জেলা হইতে কখনও কোনদিন বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য এক সঙ্গে পাঁচ জন ছাত্র বাঙ্গালাদেশের প্রধান নগরী কলিকাতার কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই বৎসর এককালে পাঁচ জন ছাত্র শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভের জন্য কলিকাতায় গমন করিতেছেন। ইহা মালদহ সমাজের এক নূতন দৃশ্য—মালদহের শিক্ষাজগতে এক নূতন ঘটনা।

এই বর্ণনা হইতেই মালদহ জেলার শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাধেশচন্দ্রের জন্মভূমি স্বয়ং তাঁহাকে কিরূপ সাহায্য করিয়াছে এবং তাঁহাকে কিরূপ সমাজের জন্য কর্ম্ম করিতে হইয়াছে তাহাও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

রাধেশচন্দ্রের জীবিতকালে মালদহের অধিবাসীসমাজের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সাধিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাঁহার বাসনা ও সাধনার সাহায্য করিবার উপযুক্ত একজন মালদহের সন্তানও প্রস্তুত হ'ন নাই। এখন পর্য্যন্ত শিক্ষার অভাব যথেষ্টই রহিয়া গিয়াছে। শেষ জীবনে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে যে সাহায্য এবং উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়'ছেন তাহাতে

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে (৩১ ভাদ্র, ১৩১৮) পঠিত।

স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ।

নিজ জেলার বিশেষ কৃতিত্ব নাই। সমগ্র বঙ্গসমাজের চিন্তা ও কর্ম্মজীবনে যে তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল তাহাতে প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রেই বিভিন্ন জেলার কর্ম্মিগণের সমবায় ও সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। তাহাতে মালদহের বিভিন্ন পল্লীসমাজের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির আধার উদ্ভূত হইয়াছে বটে এবং পরোপকারী শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষ প্রমুখ কেহ কেহ স্বসমাজের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয় কর্ম্মিগণের চেষ্টার সুফল দেখিবার পূর্ব্বেই রাধেশচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপ এক সমাজের জন্য আজীবন কর্ম্ম করিয়া তিনি তাহার সম্মানার্হ হইয়াছেন। মালদহের কয়জন অধিবাসী তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া কর্ম্মে ব্রতী হইবেন, ইহা তাঁহাদেরই ভাবিবার বিষয়। কিন্তু রাধেশ চন্দ্রের স্মৃতি কেবল তাঁহার জন্মভূমিরই সহিত জড়িত নহে। তাঁহার প্রতিভার জ্যোতি বাঙ্গালার প্রশস্ত গগনকেও কথঞ্চিৎ আলোকিত করিয়াছে। সমগ্র প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের পশ্চাতেও তাঁহার যত্ন এবং অধ্যবসায় প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার সাহিত্যসেবায় বাঙ্গালী লেখক-সমাজের সহায়তা হইয়াছে। তাঁহার সৌজন্য শিষ্টাচারে বিভিন্ন জেলার বন্ধুগণ মালদহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় সাধারণ বঙ্গসমাজ মালদহের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাঁহার সাধনায় ঐতিহাসিক কবি গায়ক লেখক প্রভৃতি বিবিধ ব্যবসায়ীর ব্যবহারোপযোগী সরঞ্জাম ও উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং বাঙ্গালা দেশের সমাজ ও সভ্যতার পরিপূর্ণতর বিবরণ প্রকাশের পন্থা উন্মুক্ত হইয়াছে।

সুতরাং রাধেশচন্দ্র কেবলমাত্র মালদহেরই কর্ম্মবীর নহেন। বাঙ্গালা দেশ তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। সমগ্র বাঙ্গালীসমাজ তাঁহার নিকটে ঋণে আবদ্ধ।

অপরাজিতা

(গল্প)

তাহার নাম বসন্ত। সে কাশীর রাজার অন্তঃপুরের মালাকর।

একদিন বসন্তপ্রভাতে অখ্যাত অজ্ঞাত তরুণ সুপুরুষ সে যখন রাজার সভায় কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহাকে দেখিয়া সভাসদের ঈর্ষাকুটিল মন প্রীতিরসে অভিষিক্ত হইয়াছিল, বৃদ্ধ মন্ত্রীর সন্দিগ্ধ গম্ভীর চিত্ত স্নেহ-স্পর্শে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, রাজার চক্ষু প্রশংসাপুলকে বিস্ফারিত হইয়াছিল, আর রাজসভার একান্তে গজদন্তের চকচকে চিকের আড়ালে তরুণীদের চটুল চোখের চাহনিতে পলক পড়ে নাই।

রাজা সাদর অভ্যর্থনায় তাহাকে সভায় বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে যুবক, কোন দেশের কোন পরিবারকে সুখী করিয়া তুমি জন্মিয়াছ? কুসুম-সুকুমার তোমার কান্তি, তুমি কোন কাজ করিবে? তোমার কোনো কাজ করিতে হইবে না, তুমি আমার রাজসভা আনন্দে উজ্জ্বল করিয়া থাক।

বসন্ত মূর্ত্তিমান বিনয়ের মতো মাথা নত করিয়া রাজ-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধীর দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—মহারাজ, কর্ম্মহীনের ক্লান্তি হইতে আমায় রক্ষা করুন। আমার সামান্য শক্তি মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হোক।

স্মিত মুখে প্রীত রাজা বলিলেন—বেশ যুবক বেশ! কোন কর্ম্ম তোমার প্রীতিকর? মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাকবি, যে-কেহ তোমায় সহকারী পাইলে সুখী হইবেন। বল, তোমার কোন কর্ম্ম রুচিকর?

বসন্ত হাত জোড় করিয়া বলিল—মহারাজ আমি অক্ষম; গুরু ভার আমার উপর দিবেন না। আমি মহারাজের খাস বাগানের মালী হইব; নিত্য নূতন ফুলের মালায় মহারাজের পূজা করিব; বীণার গানে সকাল সন্ধ্যা মহারাজের বন্দনা গাহিব। আর আমি কিছু চাহি না।

সকলে মনে করিল এমন সুন্দর রূপ ইহার, কিন্তু এ পাগল। রাজা এই পাগলকে দয়া করিয়া তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সে সেইদিন হইতে রাজার খাস বাগানের মালী হইল।

ফুলের-ফরাশ-বিছানো বাগানখানির একটি কোণে ফুলের-পাড়-বোনা পাতায়-ঢাকা লতায়-ঘেরা কুটীরখানিতে তাহার বাসা। সেখানকার গাছগুলি সব ফুলের মোহন স্বপন দেখে, কোকিলকণ্ঠে কথা বলে। আর বসন্ত সকাল সন্ধ্যা বীণার তারে যে গান বাজায় তাহার সুরে আকাশ বাতাস মদির হইয়া উঠে; রাজপ্রাসাদের ঘরে ঘরে সে গান গিয়া প্রীতি আনন্দ বিলাইয়া ফিরে। সকাল বিকাল সে নানান ফুলে বিনাইয়া বিনাইয়া যে সব বিনোদমোহন হার গাঁথে সে সব মালা গলায় গলায় পুলক-পরশে হরষ জাগায়। দম্পতির মিলন মধুর হয়, দৃঢ় হয়। আর যাহারা তরুণ তরুণী অপরিণীত, তাহাদের প্রাণ অচেনা প্রিয়ের প্রণয়-বেদনায় পীড়িত হয়, বিরহব্যথায় ব্যাকুল হয়।

সকাল বিকাল নূতন মালীর ভক্তিদান পাইবার জন্য রাজকুমারীরা যখন গোলাপ-কেয়ারীর ফাঁকে ফাঁকে বকুল-বীথির তলে তলে মণিশিলার পথে পথে অরুণরাঙা চরণ ফেলিয়া মালীর কুটীরের কাছে ভিড় করিয়া জমিত, তখন সমস্ত বাগান খুসি হইয়া উঠিত, গাছে গাছে রূপযৌবনের ঢেউ লাগিয়া ফুলের মুখে হাসি ফুটিত, কলহাস্যে কোকিল পাপিয়ার কণ্ঠ খুলিত। আর বসন্ত? পত্রপুটে তাজা ফুলের শিশিরভিজা মালার ভেট আনিয়া সে আপনার সেবাবৃত্তি সার্থক করিত।

সে কত ছন্দের কত ফুলের মালা! কুমারী ইন্দিরার জন্য অম্লান ইন্দীবরের মালা! কুমারী শুক্লার জন্য প্রফুল্ল গোলাপের গোড়ে! কুমারী আনন্দিতার জন্য বেলযুঁই-গন্ধরাজের অনিন্দিত হার! পাঁচনর, সাতনর, শতনর!

ইহাদের সকলের পশ্চাতে আসিত আর একজন। কালো কুৎসিত সে। সে রাজকন্যা যমুনা।

চাঁদের বুকে কলঙ্কের মতো সুন্দরীদের মাঝখানে তাহার রূপহীনতা বেশি করিয়া চোখে লাগিত। যমুনা নিজে বুঝিত; আপনাকে সে লুকাইতে পারিলে বাঁচিত। মলমলের গোলাপী শাড়ীর আঁচলখানিতে নিবিড় করিয়া আপনাকে সে ঢাকিতে চাহিত, সকলের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য সকলের পশ্চাতে থাকিত। চক্ষের পলক তাহার লজ্জিত, চরণ তাহার কুণ্ঠিত, কণ্ঠ তাহার মৃদু, হৃদয় তাহার ভীরু। পদে পদে সবার কাছে তাহার লজ্জা, সবার দৃষ্টি হাসি তাহার লজ্জার, সবার সঙ্গ তাহার লজ্জার। সে যে রূপহীনা। বিধাতা তাহার অঙ্গে অঙ্গে দারুণ পরাভব আঁকিয়া দিয়াছেন—তাহা আর লুকাইবার ঢাকিবার জো নাই। সবাই নিজের নিজের গর্ব্বগৌরবে হাসে বকে

নাচে; অকুণ্ঠিত তাহাদের গতি, স্বাধীন তাহাদের ব্যবহার। তাহারা বসন্তর সম্মুখে রঙ্গ করে, মালা পরে, ফুল কাড়ে, তোড়া ছুড়িয়া লোফালুফি করে। প্রীত বসন্ত বিনিময়ে ফুলের অর্ঘ্য চরণে ঢালে, বীণার তারে গুঞ্জন তোলে, নূতন গাথায় তরুণীদের রূপের স্তুতি গাহে। আর যমুনা? যমুনা তখন লজ্জাভয়ের একান্ত সঙ্কোচে একটি ধারে চুপটি করিয়া আপনাকে গোপন করিতে চায়। কেহ কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চায় না।

এত লজ্জা তাহার, এত অবহেলা তাহাকে, তবুও সে আসে। বসন্ত তাহার মালায় গানে, বীণায় গাথায়, কথায় হাসিতে, রূপে যৌবনে মিলাইয়া যে বিচিত্র রাগিণী তাহার চারিদিকে বাজাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার অরূপ স্পর্শ এই রূপহীনার অন্তরেও এমন একটি মদির সুর ধ্বনিয়া তুলিয়াছিল যাহার মাদকতা গুরু লজ্জা দারুণ অবহেলাতেও দমন করা যাইত না। সবাই হাসিতে গাহিতে খেলিতে আসে; যমুনা আসে শুধু অতৃপ্ত আঁখি ভরিয়া দেখিয়া লইতে। সবাই পাইতে আসে বসন্তর সেবা গান মালা স্তুতি; যমুনা দিতে আসে তাহার যমুনার মতো কালো সজল উজল চোখের স্বচ্ছ তরল দৃষ্টি ভরিয়া রূপহীনার রূপের পূজা, গুণহীনার গুণের প্রশংসা, বঞ্চিতার বিপুল বিস্ময়।

সবার সহিত সে একসুরে আপনার জীবনটিকে বাজাইয়া তুলিতে পারিতেছিল না বলিয়াই বৈষম্যে সে যা একটু বসন্তর নজরে পড়িয়াছিল। নতুবা সেই রূপহীনা কুণ্ঠাকাতর মৌনমূক আগন্তুকটিকে দৃষ্টিতে তুলিবার অবসর বসন্তর ছিল না—তখন তাহার খর যৌবনের তপ্ত শোণিত রূপের নেশায় ভরপুর।

রূপহীনাকে রূপের হাট হইতে দূর করিবার যখন উপায় ছিল না, তখন শুধু ভদ্রতার খাতিরে বসন্ত সেরা সুন্দরীদের সেরা সেরা মালা গাঁথিয়া শেষের যত বাছপড়া ঝরা ছেঁড়া বাসি ফুলে একগাছি মালা যেমন-তেমন গাঁথিয়া রাখিত;—রাজদ্বারে ভিখারীর হাতে ভিক্ষার মতন অবহেলা-ভরে সেই মালাগাছি যমুনার হাতে ফেলিয়া দিত। আর যমুনা? যমুনা সেই মালাগাছি দেবতার নির্ম্মাল্যের মতো শ্রদ্ধার সহিত মাথায় পরিত। যেদিন কুমারী ইন্দিরা একটু বিশেষ রকমের গ্রীবাভঙ্গি করিয়া সলীল কটাক্ষে হাসিয়া যাইত, কুমারী শুক্লা যেদিন যাইতে যাইতে এক আধবার দয়া করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিত, কুমারী আনন্দিতা যেদিন মিষ্ট রকমের প্রাণমাতানো পরিহাস করিত, সেই দিন আনন্দোৎসবে মুক্তহস্ত দাতার মতো মালাকর বসন্ত যমুনার জন্যও বিশেষ করিয়া একগাছি মালা গাঁথিত নিগুর্ণ নির্গন্ধ কালো রঙের অপরাজিতা ফুলে। এদিন বসন্তর এই অপূর্ব্ব প্রসাদ পাইয়া যমুনার মন আনন্দ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিত, এদিন তাহার লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিত না।

বসন্তর বাগানখানি ঘরের ফুলে ও বনের ফুলে শোভিত, চাঁদের জ্যোৎস্নায় ও রূপের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত, পাখীর কলকূজনে ও তরুণীর কলহাস্যকৌতুকে মুখর, ফোয়ারার অজস্র ধারায় ও হৃদয়ের অজস্র প্রীতিতে অভিষিক্ত, মণিদীপের আলোকে ও ডাগর চোখের পুলকে উজ্জ্বল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সকালের পর বিকাল, সন্ধ্যার পর প্রভাত, একটানা সুখস্রোতের মতো সময় ভাসিয়া যায়। তাহার মধ্যে একটি তরুণকে ঘিরিয়া তরুণীদের মেলা আনন্দে জমাট, উল্লাসে ফেনিল, প্রণয়ে মদির। বসন্ত কুসুমফুলের গাঢ় রঙে তরুণীদের শাড়ী ওড়না রঙাইয়া দিত, সন্ধ্যামণির হৃদয় পিষিয়া চরণ রঙাইত, হেনার পাতার রস গালিয়া হাত রাঙাইত। আর, মধুর হাসি, প্রিয় বচন, চটুল চাহনি দিয়া হৃদয় রঙাইতে চেষ্টা করিত—রূপসীদের হৃদয় তাহাতে রঙিত কি না কে জানে। কিন্তু তরুণীদের আফিমফুলের মতো রাঙা মাদক ঠোঁট দুখানি, ডালিমফুলের মতো গাল দুটি, শিউলিরঙা বসন আর মেহেদিরঙা চরণ নিজেদের সকল লালিমা জড়ো করিয়া বসন্তর তরুণ কোমল হৃদয়খানি শোণিত রঙে রঙাইয়া তুলিতেছিল। তরুণীরা বসন্তর যত অন্তরঙ্গ হইতেছিল বসন্ত আপনার অন্তরের মধ্যে তত শূন্য অনুভব করিতেছিল। সকল শূন্য পূর্ণ করিয়া একজন কাহাকেও আপনার জীবনে আবাহন করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

একদিন যখন সন্ধ্যাবেলায় গাছে গাছে ফুলের দেয়ালি সাজিতেছিল, যখন দক্ষিণা বাতাস বিরহমূর্চ্ছিতের নিশ্বাসের মতো থাকিয়া থাকিয়া ফুলের বনে শিহরণ হানিতেছিল,

যখন ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া কোকিল পাপিয়া প্রলাপ বকিতেছিল, যখন হাজার দীপের শিখার মাঝে ফোয়ারার জল তরল হীরার মালার মতো গলিয়া পড়িতেছিল, যখন সান্দ্রনিবিড়-পল্লবচ্ছদ পথের উপর পরীরা সব হাল্কা হাতে চাঁদের আলোর আলপনা দিতেছিল, তখন বসন্তর বীণাসঙ্গতের প্রণয়সঙ্গীত বন্ধ করিয়া লক্ষ্মীর মতো রাজকুমারী ইন্দিরা তাহার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপনীত হইল।

বসন্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া ইন্দিরার পদপ্রান্তে তাহার ভরা সাজি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া বলিল—ইন্দিরা, আমার বাহিরের ফুলই নিত্য তুমি লইয়া যাও, আমার অন্তরের অতুল ফুল তোমার চরণে কি স্থান পাইবে না? বিবাহউৎসবে ফুলের বন ফুল্লতর হইয়া উঠিবে না?

কুমারী ইন্দিরা ভ্রুকুটি করিয়া ঘৃণাভরে ফুলগুলি সব পদাঘাতে ছড়াইয়া দিয়া উদ্যত অশনির মতো বলিল—কী! এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার নীচ মালাকর! অনুগ্রহকে ভাব তুমি প্রণয়! রাজকন্যাকে কুটীরে বরণ করিবার সাধ তোমার! জানো তুমি, কর্ণাটরাজ স্বয়ং আমার উপযাচক পাণিপ্রার্থী! স্পর্দ্ধা তোমার ঘুচিবে, কাল যখন রাজাদেশে তুমি শূলে চড়িবে!

অবহেলার যে বেদনা বসন্তর বুকে লাগিল, সে বেদনা শূলাঘাতের অপেক্ষা অল্প নয়। এই ইন্দিরার শ্রীচরণে সে তাহার অন্তরভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠতম মহার্ঘ অর্ঘ্য দিনের পর দিন, একে একে উজাড় করিয়া একেবারে রিক্ত হইয়া গিয়াছে, আজ তাহাকে নিঃস্ব করিয়া পদাঘাতে দূর করিল কি না সেই!

বসন্ত ইন্দিরার পায়ে পড়িয়া বলিল—শূলে দিতে হয় দিয়ো। কিন্তু রাজকুমারী ভাবিয়া দেখ, বাহিরে দীন বলিয়া আমি অন্তরে দীন নই। বিশ্বজোড়া ঐশ্বর্য আমি তোমার পায়ে উজাড় করিয়া দিয়াছি—সে ঐশ্বর্য্য তুমি কোনো রাজার ভাণ্ডারে খুঁজিয়া পাইবে না। কাঙালকে সর্ব্ব রকমে কাঙাল করিয়া মারিয়ো না।

ইন্দিরা হাসিয়া উঠিল। সেই উপহাস করাতের মতো করকর করিয়া বসন্তর অন্তর এপার ওপার চিরিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

তখন বসন্ত মিনতির স্বরে বলিল—আমার এতদিনের ব্যর্থ পূজার খাতিরে আমার একটি শেষ অনুরোধ রাখ। কাল প্রভাতের আগে একথা তুমি কাহারো কাছে প্রকাশ করিয়ো না। আমি একবার কুমারী শুক্লা আর আনন্দিতার কাছে ভাগ্য যাচাই করিয়া দেখিব।

ইন্দিরা দৃপ্তভাবে বলিল—বেশ, প্রার্থনা মঞ্জুর। আমিই তাহাদের ডাকিয়া দিতেছি। তোমার এ যে দুরাশা—কোনো রাজকুমারী মালাকরকে মালা দিবে না, কালো কুৎসিত যমুনাও না,—সে মালাকর যতই কেন মোহন হোক না।

ইন্দিরা আসিয়া শুক্লাকে পাঠাইয়া দিল। শুক্লাও তেমনি রূঢ়ভাবে বসন্তর প্রণয়নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া আসিয়া আনন্দিতাকে পাঠাইল। আনন্দিতাও ব্যথিত মালাকরকে জ্বালাকর তাচ্ছিল্যে লাঞ্ছিত করিয়া ফিরিয়া আসিল। আনন্দিতা আসিয়া যমুনাকে হাসিয়া বলিল—ওলো যমুনা, যা লো যা, তোকে বসন্ত ডাকিতেছে।

বসন্ত ডাকিতেছে! তাহাকে! আনন্দে উল্লাসে লজ্জায় সঙ্কোচে আশায় আশঙ্কায় যমুনার হৃদয় ছাপাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সে ভগিনীদের দিকে চাহিতে পারিল না, তাহাদের ক্রূর পরিহাস লক্ষ্য করিল না; সে তীর্থযাত্রী ভক্তের মতো পরম সম্ভ্রমে, প্রথমমিলনভীতা নবোঢ়ার মতো কম্পিত হৃদয়ে কুণ্ঠিত চরণে লজ্জিত সঙ্কোচে ধীরে ধীরে গিয়া নির্বাক নতনেত্রে বসন্তর সম্মুখে দাঁড়াইল। বসন্ত তখন ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছিল, যমুনার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

বসন্তকে ক্রন্দনে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া যমুনার হৃদয় ফাটিয়া গিয়া শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। না জানি তাহার নির্ম্মম ভগিনীরা তাহাকে কি দারুণ ব্যথাই দিয়া গিয়াছে। যমুনা তাহার ব্যথিত বন্ধুর দিকে সজল করুণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে কম্পিত কণ্ঠে সান্ত্বনা ভরিয়া ভয়ে ভয়ে ডাকিল—বসন্ত!

বসন্ত উচ্ছ্বসিত গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল দূর হও দূর হও, ডাকিয়া আন জল্লাদকে, এখনি আমাকে শূলে দিক।

লজ্জিতা ব্যথিতা মিতবাক যমুনা সজল চক্ষে প্রাণভরা ব্যর্থ সান্ত্বনা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল, তাহার কুণ্ঠিত প্রাণের উপর বসন্তর বেদনা পুঞ্জিত

হইতে লাগিল। সে তাহার সকল শক্তির, সকল শান্তির, সকল শুভের, সকল সুখের বিনিময়ে বিশ্ব ছানিয়া বসন্তকে সান্ত্বনা দিতে পারিলে দিত কিন্তু সে সকলের অনাদৃতা কুরূপা, সে আপনার অক্ষমতায় আপনি শুধু পীড়িত হইতে লাগিল।

রূপসী রাজকুমারীরা মুচকি হাসিয়া জিজ্ঞাসিল—ওলো যমুনা, মালাকর তোকে কি বলিল?

একথার উত্তর সে এই হৃদয়হীনাদের কি দিবে? সে নতমুখে শুধু বলিল—কিছু না।

সুন্দরীরা অট্টহাসে গাছে গাছে পাখীগুলিকে ভীত করিয়া বলিল—সৌখীন মালাকর! কালো কুৎসিত মনে ধরে না! যমুনা, তুই যে আমাদের বোন একথা মনে করিতেও লজ্জা হয়। সামান্য মালাকরও তোকে ঘৃণা করে। আমাদের ছায়ার মতন বেড়াইতে তোর লজ্জা করে না?

এ অপমান যমুনাকে স্পর্শ করিল না। ইহা তাহার প্রতিদিনের প্রাপ্য, ইহাই তাহার আভরণ। স্বয়ং বিধাতা যে তাহার বাদী! কিন্তু বসন্তর পরাভবে তাহার ভগিনীদের উল্লাস, বসন্তকে উপহাস, তাহাকে পীড়া দিবার পরামর্শ, যমুনার বুকে সহস্রসূচী শস্ত্রের মতো বিঁধিতে লাগিল; সে ভগিনীদের বর্ব্বর আনন্দে মরিয়া যাইতে চাহিতেছিল; সে তাহার শোণিতাশ্রুপ্লুত হৃদয়খানি মেলিয়া বসন্তকে এই রূঢ় নিষ্ঠুরতা হইতে ঢাকিয়া রাখিতে পারিলে রাখিত। অক্ষমা সে!

পুষ্পবনের জ্যোৎস্নামাখা হাল্কা হাওয়া আজ যমুনার হৃদয়খাতের ভাবস্রোতে যে লহর তুলিয়াছিল তাহাও বড় দুঃখময়, বড় ক্লেশাতুর। আজ এই বাগানের জীবনস্বরূপ মালাকরের বেদনার চারিদিকে এত ফুলের হাসি, এত পাখীর কলগান, এত ভ্রমরের গুঞ্জন, এত জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি, এত হাওয়ার মাতামাতি বড় নিষ্ঠুর, বড় অসমঞ্জস বলিয়া মনে হইতেছিল। দুই হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারিলে সে ফেলিত, অন্ধকারের কালো পর্দ্দা টানিয়া দিয়া বাগানের এই নির্লজ্জ ব্যবহার ঢাকিতে পারিলে সে ঢাকিত। আজ যেন তাহার ভগিনীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া সারা বাগান বসন্তর বেদনায় আনন্দ করিতেছে। আর, তাহার লজ্জা বাণের মতো বাজিতেছিল গিয়া যমুনার বেদনাহত হৃদয়ে।

প্রভাতে রূপসী রাজকুমারীরা রাজার নিকট বসন্তর বেয়াদবি নিবেদন করিল। অনুরোধ করিল বেয়াদব বর্ব্বরটাকে শূলে দিতে হইবে, অনেকদিন রাজকুমারীরা শূলে হত্যার মজার দৃশ্য দেখিতে পান নাই।

রাজার আদেশে বসন্ত ধৃত হইয়া রাজসভায় নীত হইলে সে অকপটেই আপন অপরাধ স্বীকার করিল। সে মিথ্যা করিয়াও অস্বীকার করিলে রাজসভা সুখী হইত। কিন্তু না, বসন্ত মরিবেই, কিছুতেই সে অভিযোগ অস্বীকার করিল না। বর্ম্মাবৃত দ্বারীর চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আহা এমন সুকুমার রূপ! এমন কোমল মধুর প্রকৃতি এই বসন্তর! এ কে কিনা শূলে মরিতে হইবে!

কন্যাদিগকে রাজা অনুনয়ের স্বরে বলিলেন—ওটা পাগল! ওকে না হয় দূর করিয়া দি, আপদ চুকিয়া যাক।

রাজকুমারীরা অটল। সেবকের শোণিত দিয়া তাহারা চোখে আনন্দের অঞ্জন টানিবেই টানিবে, পায়ে তাহার হৃদয় দলিয়া রক্তের অলক্তক তাহাদের পরিতেই হইবে।

শেষে রাজা অনেক কষ্টে রক্ষা করিলেন বসন্ত যাবজ্জীবন বন্দী থাকুক।

বেশ! বন্দীই যদি থাকে তবে সে অন্তঃপুরের অন্ধ কারায় বন্দী থাকিবে; রাজকুমারীরা তাহাকে লইয়া একটু আনন্দ উল্লাসে সময় কাটাইবেন।

রাজা বলিলেন তথাস্তু।

অন্তঃপুরের দয়াময়ীদের রোষে যাহারা অভিশপ্ত তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য গঠিত এই অন্ধ কারা। পাষাণ প্রাচীর লৌহকপাটের দন্ত মেলিয়া একবার যাহাকে গ্রাস করে তাহাকে জীর্ণ না করিয়া উদ্গিরণ আর করে না। কপাট ইহার রন্ধ্রশূন্য, প্রাচীর ইহার নরেট পুরু। কেবল বাতাস যাইবার জন্য মেঝে ও ছাদের কাছাকাছি দেয়ালে গুটিকয়েক ছিদ্র, আর বন্দীকে আহার দিবার জন্য এক দেয়ালে ছোট একটি ঘুলঘুলি। মরণকে বিলম্বিত করিবার এই সমস্ত ব্যবস্থা। আলো বাতাস খাদ্য যত পারে এই সব পথে যাইতে পারে, দয়াময়ীদের হুকুম আছে। কিন্তু হুকুম সত্ত্বেও এ পথে আলো বাতাস অসঙ্কোচে ঢুকিতে

পারে না, ঘুলঘুলির সামনে প্রকাণ্ড উঁচু ভারি পাথরের পুরু দেয়াল খাড়া; আর ঘুলঘুলিতে একটি বাটি খাবার ছাড়া অধিক দিবার উপায় নাই। এখানে যে একবার প্রবেশ করে মরিয়া যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করা ছাড়া তাহার আর অন্য উপায় নাই। ঘুলঘুলিটি এমন উঁচুতে, যে, বাহিরের লোক ভিতরে বা ভিতরের লোক বাহিরে উঁকি মারিতে পারে না, শুধু হাত গলাইয়া খাবার দিতে ও লইতে পারে। প্রতিদিন আহারের পাত্র শূন্য হইয়া ঘুলঘুলির মুখের তাকের উপরে থাকে; যেদিন পাত্র শূন্য না হয় সেদিন বুঝা যায় বন্দী পীড়িত। একাদিক্রমে এক সপ্তাহ আহার অস্পৃষ্ট থাকিলে বুঝিতে হয় বন্দী ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

বসন্ত এই ভীষণ কারাগারে বন্দী। ধরণীর সহিত অধিক দিন পরিচয় না হইতেই ধরার সহিত সকল সম্পর্ক তাহার ঘুচিয়া গেল। তাহার সকল আশা আকাঙ্ক্ষার এই ধরিত্রী, তাহার আনন্দ ভালোবাসার সকল সুন্দর মুখ, তাহার চন্দ্রসূর্য্য, আলো ফুল বাতাস, সমস্ত জন্মের মতো লোহার কপাটের কঠিন আড়ালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাহিরের হর্ষকোলাহল হয়ত তাহার কানে ভাসিয়া আসিবে, সে তাহাতে যোগ দিবে না।

কিন্তু বসন্ত নিজের নিষ্ফল প্রণয়ের হতাশ্বাসে এমন মগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে তাহার এসব দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না।

রূপসী রাজকুমারীরা আসিয়া রন্ধ্রপথে হাসিয়া হাসিয়া বসন্তকে বলিত—কিগো বর, বাসরঘরের আনন্দ আজ কেমন লাগিতেছে? আমরা তোমার বরমাল্য রচনা করিয়া আনিয়াছি, ওহে রসিক মালাকর, গ্রহণ কর গ্রহণ কর।

রাজকুমারীরা কাঁটার মালা বসন্তর কাছে ফেলিয়া দিয়া রূঢ় হাসি হাসিত। আর সেই কাঁটাগুলির চেয়েও তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর তাহাদের হাসি ব্যবহার তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তিনী যমুনার হৃদয়ে ফুটিয়া ফুটিয়া রক্তের অলকাতিলকায় তাহার হৃদয়খানিকে লজ্জিত ভীরু বধুর বেশে সাজাইয়া দিত।

কিন্তু রাজকুমারীদের এই রূঢ় ব্যবহার বসন্তকে অধিক পীড়া দিতে পারিত না—তাহাদের প্রথম ব্যবহারই এমন মর্ম্মন্তুদ হইয়াছিল যে তাহার পর আর তাহার নূতন বেদনার অনুভূতি ছিল না।

বসন্ত অনেক অনুনয়ে আপনার বীণাটিকে কারাগারের সঙ্গী করিয়া লইয়াছিল। অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া সে যখন একমাত্র অবশিষ্ট সুহৃৎটিকে আবেগভরে বুকে চাপিয়া তাহার তারে তারে প্রাণের বেদনা ব্যক্ত করিয়া তুলিত, তখন সমস্ত রাজপুরী বিষাদে যেন আচ্ছন্ন অশ্রুতে পরিম্লান হইয়া উঠিত। কেবল রূপসী রাজকুমারীরা হাসিয়া হাসিয়া রন্ধ্রপথে বসন্তকে বলিত—বাহবা বর, বাসরঘরে গান করিতেছ!

রাজকুমারীদের আনন্দ উৎসাহ দুদিনেই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বসন্তকে লইয়া একঘেয়ে আমোদ তাহাদের আর ভালো লাগে না, তাহারা নূতন আমোদের সন্ধানে কর্ণাট কলিঙ্গের রাজাদের দিকে মন দিল।

রাজকুমারীদের অন্তর্দ্ধানে বসন্ত ক্রমশঃ নিজের অস্তিত্বের চারিদিকে সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিল। সে দেখিল রাজকুমারীরা আর আসে না, কিন্তু তাহার খাবারের বাটিটি সকাল সন্ধ্যা নিত্য নিয়মিত ঘুলঘুলিতে হাজির হয়। যে তাহার আহার লইয়া আসে তাহার হাত দুখানি ক্ষুদ্র কোমল,—সে রমণী, এবং সে রমণী করুণাময়ী! বরাদ্দ তাহার একবাটি ছাতু। এই ছাতু যে আনিত সে আনিত ইহা গোলাপজলে দুগ্ধক্ষীরে মাখিয়া; ছাতুর তলায় চুরি-করা পায়সপিষ্টক ফলমিষ্টান্ন গোপন করিয়া; বাটিটিকে ফুল্ল ফুলের গন্ধবিধুর মালার পাকে বেড়িয়া। এই পাষাণ-হৃদয় রাজপ্রাসাদেও কমলকোমল হৃদয় তবে এক আধখানিও আছে! কে এই করুণাময়ী? কে এ?

এই সেবিকার প্রতি বসন্ত ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বসন্ত পরম আগ্রহে রন্ধ্রপথের দিকে তাকাইয়া থাকে কখন সেই করুণাময়ী তাহার হাত দুখানি বাড়াইয়া বাটিটিকে ধরিবে। দেখিতে দেখিতে বসন্তর জানা হইয়া গিয়াছিল কখন সে আসে; যখন ঘরের অন্ধকার গাঢ়তায় বিশেষ একটি রকমে একটুখানি তরল হয়, যখন ঘুলঘুলির মুখে দেয়ালের ছায়া বিশেষ একটু ফিকে হয়, যখন ছাদের নীচের বিশেষ একটি রন্ধ্রের কাছে সূর্য্যালোকের তিলক পড়ে, তখনই সেই করুণার আবির্ভাবের সময়। তখন

ঘরের বাহিরের বাতাসের নিশ্বাস, টিকটিকির শব্দ, বিড়ালের সন্তর্পণ প্রস্থান বসন্তকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সচকিত করিয়া তুলে—তখন সে তাহার সমস্ত প্রাণের মনোযোগ কানে ও চোখে কেন্দ্রীভূত করিয়া বসিয়া থাকে। তারপর যখন সেই সেবিকা অন্নপূর্ণার মতো অঞ্জলিতে মমতা ভরিয়া ঘুলঘুলির পথে বাটিটি বাড়াইয়া ধরিয়া সান্ত্বনামধুর মৃদু কণ্ঠে তাহাকে ডাকে—বসন্ত, তখন বসন্ত উৎফুল্ল হইয়া এক লাফে নিকটে গিয়া দুই হাতে সেই বাটি ধরে, কিন্তু তাহার অচেনা অদেখা প্রিয় বন্ধুর হাত হইতে বাটি লইতে বড়ই বেশি দেরি হয়।

সেই হাত দুখানিই ত বসন্তর সম্বল ; বাহিরের প্রাণের, আনন্দের, সেবার, মমতার অতি ক্ষীণ নিদর্শন সেই অতি কোমল ছোট্ট দুখানি হাত ! বসন্ত সমস্ত প্রাণ মেলিয়া চক্ষু ভরিয়া শুধু তাহাই দেখে। সেই হাত দুখানির বিশেষ আকার, আঙুলগুলির বিশেষ ভঙ্গি, নখগুলির বিশেষ গঠন, করতলের রেখাগুলির বিশেষ টানের বিচিত্র সমবায়, আর ডাহিন হাতের মণিবন্ধে কালো কুচকুচে ছোট্ট একটি তিল নিত্য নিত্য দেখিতে দেখিতে সেগুলি সব বসন্তর অতি প্রিয় বন্ধুর মতো সুপরিচিত হইয়া উঠিতেছিল। অঙুলে আঙুলে ঈষৎ স্পর্শেই বসন্তর বুকের মধ্যে রসপুলকের জোয়ার জাগিয়া স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিত ঐ আঙুলের অধিকারিণী তারুণ্যে বিমণ্ডিত, মমতায় সে ভরপুর, লজ্জায় সে সঙ্কুচিত! এই হাত দুখানি যে শরীরকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, অমন মনের মন্দির যে শরীর, অমন করুণার্দ্র কণ্ঠস্বর যে শরীরের, সে শরীর না জানি কত সুন্দর! কি দিব্য! কি অনিন্দ্য!

একদিন বসন্ত সেই হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—দেবী, আমার এই ঋণের বোঝা কাহার কাছে বাড়িয়া উঠিতেছে? কে তুমি চিরবন্দী আমাকে কঠিনতর বন্ধনে চিরবন্দী করিয়া তুলিতেছ? শুধু আমি ঋণীই হইব, শোধ দিবার ত উপায় নাই।

তরুণী স্নিগ্ধস্বরে বলিল—ভয় নাই মালাকর, তোমার ভয় নাই। যে তোমার কাছে অশেষ ভাবে ঋণী সেই তাহার কৃতজ্ঞতার এক কণা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

বসন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল—আমার কাছে ঋণী? তুমি কে?

তরুণী বলিল—আমায় তুমি সুভদ্রা বলিয়া জানিয়ো।

বসন্ত তাহাকে করুণস্বরে বলিল—ভদ্রে, তুমি কে আমি জানি না। কিন্তু তোমার দয়া দেখিয়া আমার আবার আলোকে নরলোকে ফিরিয়া যাইতে স ধ হইতেছে।

তরুণী কাতরকণ্ঠে সমবেদনা ভরিয়া বলিল—আমার প্রাণ দিয়াও তোমায় মুক্তি দিতে পারিলে দিতাম।

তরুণীর কথাগুলি অশ্রুতে ভিজা। বসন্ত তাহার আর্দ্র কম্পমান স্পর্শ অন্তরে অনুভব করিল। বসন্ত মুগ্ধ হইয়া বলিল—রাজকুমারীরা কি এই হতভাগার কথা ভাবেন না একবার?

—না বসন্ত, তাঁহাদের এমন তুচ্ছ ভাবনার নিতান্ত সময়াভাব। কর্ণাট কলিঙ্গ মদ্রের রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করিবার জন্য ইন্দিরা শুক্লা আনন্দিতা ব্যস্ত।

—আর রাজকুমারী যমুনা?

—অক্ষমা কুৎসিতা কুণ্ঠিতা সে। বাহির তাহার বিধাতা ঢাকিয়াছেন, অন্তর তাহার সে নিজে ঢাকিয়াছে। তাহার ভাগ্য ত অত সহজ নয় বসন্ত! আর, যে বাড়ীতে একজন নিরপরাধ বন্দী পলে পলে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছে, সে বাড়ী ছাড়িয়া ত সে যাইতেও পারে না। তাহার ভগিনীদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে তাহাকে করিতে হইবে।

বসন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল—অ্যাঁ! যমুনা তাহা হইলে আমায় স্মরণ করে?

—স্মরণ করে বৈ কি বসন্ত, নিশিদিনই সে স্মরণ করে। তুমি তাহাকে এতদিন মালা দিয়া গান দিয়া প্রীতি দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছ, আর আজ সে তোমায় বিপদের মুখে ফেলিয়া ভুলিয়া যাইবে, এত বড় স্পর্দ্ধার যোগ্যতা ত তাহার কিছুই নাই।

বসন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল—আমি ত তাহাকে কোনো দিন আদর করিয়া কিছু দি নাই। তাহার ভগিনীদের উচ্ছিষ্ট অবহেলা করিয়া তাহাকে দিয়াছি।

সুভদ্রা কণ্ঠস্বরে বিনয় ভরিয়া লইয়া বলিল—তাহাই সে সবহুমানে মাথা পাতিয়া লইয়াছে। সে ত জীবনে

এত বেশি পায় না যে যাহা পায় তাহা আবার বাছিয়া বাছিয়া লইবে?

—সে যদি এমন তবে সে আমার প্রণয়দান গ্রহণ করিল না কেন?

– হতভাগিনী সে। তাহাকে ত তুমি কিছুই বল নাই। শুধু তোমার বেদনায় ব্যথিত করিয়া তাহাকে অশ্রুজলে বিদায় করিয়া দিয়াছিলে।

বসন্তর মন সুখে দুঃখে বিমথিত হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল তবে সে এখন একবার আমায় দেখিতে আসে না কেন?

সুভদ্রা তাহার স্বচ্ছ সুন্দর দৃষ্টিটি রন্ধ্রপথের দিকে ঊর্দ্ধ করিয়া তুলিয়া বলিল -আসে, সে আসে। কুণ্ঠিতা লজ্জিতা অক্ষমা সে, আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমি তাহারই ইচ্ছায় তোমার সেবা করিতেছি।

বসন্ত উৎফুল্ল হইয়া সুভদ্রার হাত দুখানি প্রাণপণ বলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল ভদ্রে, তোমার কথা শুনিয়া আমার আবার বাঁচিতে সাধ হইতেছে। জগতের সকল নারীই ইন্দিরা শুক্লা আনন্দিতা নহে; তার মধ্যে যমুনা আছে, সুভদ্রা আছে। ভদ্রা, আমি যমুনাকে দেখিয়াছি, কিন্তু কখনো তাহাকে বুঝি নাই; আমি তোমাকে দেখি নাই, কিন্তু তোমায় যেন বুঝিয়াছি। যমুনাকে কুরূপ দেখিয়া অবহেলা করিয়াছি, ইহার লজ্জা আজ তাহার দয়ায় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে এই রূপলোলুপের অবিনয় ক্ষমা করিতে বলিয়ো। ভদ্রা, তুমি যদি আমায় গ্রহণ কর, তবে আমি বাঁচিতে পারি, এই অন্ধ কারা হইতে বাহির হইতে পারি।

সুভদ্রা বলিল—আমি যমুনার মতোই কুরূপ কুশ্রী।

বসন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল—হোক তোমার রূপ বিশ্রী কালো। এমন দুখানি বেদনাহরা হাত যাহার, এমন একখানি সদয়করুণ হৃদয় যাহার, এমন মধুর বিনয়নম্র স্বর যাহার তাহার সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, তাহার তুলনা জগতে নাই!

সুভদ্রা বলিল—তুমি ত আমার কোনো পরিচয়ই জিজ্ঞাসা কর নাই।

বসন্ত বলিল—আমি চাহি না কিছু পরিচয়। একবার বাহিরের পরিচয় খুঁজিতে গিয়া যমুনার কাছে অপরাধী হইয়াছি। তোমার অন্তরের পরিচয়ই যথেষ্ট; যথেষ্ট এই জানা যে তুমি সুভদ্রা, তুমি আমায় ভালোবাস, আমি তোমায় ভালোবাসি! এই চরম পরিচয়টি তুমি আমায় দাও। বল ভদ্রা, আমি যদি মুক্তি পাইয়া বাহির হইতে পারি তুমি কি রাজকুমারার সঙ্গ, রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া আমার কুটীরে যাইতে পারিবে? একজন সামান্য মালাকরকে তুমি বরণ করিবে?

সুভদ্রার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল কেমন করিয়া সে মুখ ফুটিয়া স্বীকার করিবে বসন্তকে সে প্রাণ ঢালিয়া ভালোবাসে। তাহার হৃদয় ফাটিয়া পড়িয়া বলিতে চাহিতেছিল ওগো বাসি বাসি, তোমায় ভালোবাসি! আমি সকল কিছু তুচ্ছ করিয়া তোমার কুটীরে সুখে থাকিব। তোমায় সুখী করিতে পারাই আমার সম্পদ, শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য, চরম আকাঙ্ক্ষা!—কিন্তু লজ্জা তাহাকে বলিতে দিতেছিল না। সে এতক্ষণ এত কথা বলিতে পারিতেছিল শুধু সে বসন্তর না-জানার আড়ালে ছিল বলিয়া, বসন্তর কাছে সে যে একেবারে অপরিচিতা। কিন্তু সেই অপরিচিতা দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়াইয়াও মুখ ফুটিয়া নিজের প্রণয় নিবেদন করিতে কিছুতেই যে পারিতেছিল না।

বসন্ত কোনো উত্তর না পাইয়া আবার বলিল—বল, ভদ্রা, বল। তোমার কথায় হতভাগ্যের সুখদুঃখ জীবন-মরণের নির্ভর। তুমি কি এই সামান্য মালাকরকে গ্রহণ করিতে পারিবে?

সুভদ্রা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া অনেক কষ্টে মৃদুস্বরে বলিল - বসন্ত, তুমি সামান্য, আমিও ত অসামান্যা নই! তুমি যদি আমাকে কুরূপ কুশ্রী জানিয়াও গ্রহণ কর তবে তোমার পর্ণশালা আমার অট্টালিকা হইবে।

এই কথা কয়টি বলিয়া নিজের কাছে নিজের লজ্জায় সুভদ্রা যেন মরিয়া গেল।

বসন্ত তাহার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—বাঁচিব ভদ্রা, তোমার জন্যই আমি বাঁচিব।... আমায় একটু লিখিবার উপকরণ আনিয়া দিলে আমি বাঁচিবার উপায় করিতে পারি।

—রাত্রি হইলে আনিয়া দিব।—বলিয়া সুভদ্রা তাহার বন্দী বন্ধুর ব্যগ্র মুঠি শিথিল করিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

আজ অকস্মাৎ রাজপ্রাসাদ চমকিত করিয়া বন্দীর বীণায় আনন্দরাগিণী উচ্ছ্বসিত হইয়া বাজিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া বড় কান্নাটাই কাঁদিল যমুনা।

বসন্তর প্রাণ আজ প্রেমের প্রতিদানে আনন্দিত হইয়া গিয়াছে; প্রেয়সীর কোমলমদির স্পর্শখানি তাহার সমস্ত শরীর মন পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। সে ব্যগ্রহৃদয়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সেই অন্ধকার ঘরের শক্ত লোহার কালো কঠিন বিরাট কপাট একেবারে খুলিয়া গেছে—সে সুভদ্রাকে লইয়া জ্যোৎস্নার আলোয় ফুলের বাগানে পুষ্পপাগল চাঁপার তলে বসিয়া সুভদ্রাকে ফুলে ফুলে সাজাইতেছে। আজ তাহাদের ফুলশয্যা!

অন্ধকার কারাগারের অন্ধকার ঘন করিয়া রাত আসিল। তারপর অকস্মাৎ ঘন অন্ধকার খুসি করিয়া দীপ্ত দীপের স্বর্ণরশ্মি কালো রেশমে জরি বুনিল। বাহির হইতে সুভদ্রা ধীরকণ্ঠে ডাকিল—বসন্ত!

বসন্ত পুলকোদ্বেলিত কণ্ঠে উত্তর দিল—ভদ্রা!

সুভদ্রা লেখার উপকরণ অগ্রসর করিয়া ধরিয়া বলিল --এই লও।

আনন্দিত বসন্ত অন্ধকারক্লিষ্ট আলোকভীত চক্ষু ঘুলঘুলি-পথের আলোর নীচে বিস্ফারিত করিয়া একখানি চিঠি লিখিল। তারপর বলিল—ভদ্রা, প্রতিজ্ঞা কর এই চিঠি তুমি বা যমুনা পড়িবে না, অপর কাহাকেও দেখাইবে না। দয়া করিয়া চিঠিখানি অবন্তীর রাজমন্ত্রীকে পাঠাইয়া দিতে পারিলেই আমি মুক্তি পাইব।

সুভদ্রা বলিল তোমার শপথ, তোমার আদেশ পালন করিতে প্রাণপণ।

চিঠি লইয়া সেই রাত্রেই অবন্তীতে দূত গেল।

দূত গিয়া অবন্তী হইতে সংবাদ আসিবার সময় যত দিন লাগিতে পারে বসন্ত তাহা মনে মনে আন্দাজ করিয়া লইল। তাহার ছাদতলে রৌদ্রতিলকের ঘড়ীটি দেখিয়া দেখিয়া, সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে দিবারাত্রির অভেদ-আঁধার ঘরে বসিয়া দিন গণিতে লাগিল।

একদিন সুভদ্রা বলিল—বসন্ত, আজ অবন্তীর রাজমন্ত্রী সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু তিনি ত তোমার উদ্ধারের কোনো চেষ্টা করিতেছেন না।

বসন্ত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে তিনি কোন উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?

—তিনি বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছেন।

কাহার?

– রাজকুমারী যমুনার সহিত অবন্তীর সম্রাটসহোদরের, আর সম্রাটের সহিত ...

সুভদ্রা আর বলিতে পারিল না, লজ্জায় তাহার মুখের কথা ওষ্ঠে বাধিল।

সুভদ্রা লজ্জায় নীরব হইল দেখিয়া বসন্ত হাসিয়া বলিল —অবন্তীর রাজার সহিত বিবাহসম্বন্ধ কাহার?

সুভদ্রা লজ্জারুণ হইয়া নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল—এই পোড়ারমুখী সুভদ্রার।

বসন্ত উৎসাহ দেখাইয়া বলিল—বেশ বেশ সুসংবাদ!

সুভদ্রা বসন্তের উৎসাহে ক্ষুণ্ণ হইয়া ব্যথিত স্বরে বলিল সুসংবাদ নয় বসন্ত!

বসন্ত সবিস্ময়ে বলিল -সে কি? অবন্তীর রাজা যে সার্ব্বভৌম রাজা।

সুভদ্রা দৃঢ়স্বরে বলিল---সার্ব্বভৌম হইতে পারেন, কিন্তু তিনি সার্ব্বমানস রাজা নহেন।

-- তবে কি সম্রাটের প্রার্থনা ব্যর্থ হইয়া ফিরিবে?

- ব্যর্থ ত এমনিও হইত। যমুনাকে দেখিলে সম্রাট-সহোদরের আগ্রহ থাকিত না; আর সুভদ্রা এ বাড়ীতে এতই হীনা যে কেহই তাহাকে চেনে না, সম্রাটের পরোয়ানাও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। কিন্তু এ বাড়ীতে রাজ্যলোলুপ রাজকুমারীর ত অভাব নাই। রূপসী রাজার-ঝিয়ারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া গেছে তাহারা রাজার প্রার্থনা ব্যর্থ হইতে দিবে না।

বসন্ত স্মিতপ্রফুল্ল মুখে বলিল--ভদ্রা, এইবার আমার মুক্তি নিকট। আজ এই শেষ আমাদের এই অদেখা অন্ধকারের মিলন। কাল সহস্র নারীর মধ্য হইতে শুধু

যে হাতদুখানি দেখিয়া তোমায় আমি চিনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে পারিব সেই হাতদুখানি আজ আমাকে আলোকে যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া যাক।

সুভদ্রা তাহার সরমকম্পিত হাত দুখানি ঘুলঘুলি দিয়া বাড়াইয়া দিল। বসন্ত সেই লজ্জাহিম হাত দুখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, আকুল ওষ্ঠ তাহার অতদূর পৌঁছিল না।

পরদিন প্রত্যুষেই বসন্তর নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইয়া কারাগারের ভারি কবাট আর্ত্তনাদ করিয়া খুলিয়া গেল। কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন স্বয়ং কাশীরাজ; সঙ্গে তাঁহার অবন্তীর রাজমন্ত্রী।

কাশীরাজ বসন্তর চরণে পতিত হইয়া করজোড়ে বলিলেন—মহারাজ, অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

মন্ত্রী অভিবাদন করিয়া বলিলেন—মহারাজচক্রবর্ত্তীর জয় হোক।

বসন্ত রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া কারাগার হইতে বাহির হইল। স্নানশুচি হইয়া নির্ম্মল বেশবাস ধারণ করিল।

কাশীরাজ তাঁহার ভীত লজ্জিত কন্যাদের বসন্তর নিকট ডাকিয়া আনিলেন। তাহারা আসিয়া একে একে দূর হইতে সসম্ভ্রমে বসন্তকে প্রণাম করিয়া এক পাশে নতমুখে দাঁড়াইল। সর্ব্বশেষে লজ্জায় জড়সড় হইয়া নিকটে গিয়া প্রণাম করিল যমুনা—তাহার সদ্যস্নানে সিক্ত কেশকলাপ বসন্তর দুই পা ঢাকিয়া ছড়াইয়া পড়িল, কেশের মৃদু আর্দ্রতা বসন্তর চিত্ত দ্রব করিয়া তুলিল। বসন্ত তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রাণের গভীর প্রীতি ঢালিয়া নিজের অতীত আচরণ যেন মুছিয়া দিতে চাহিল।

কাশীরাজ বলিলেন—মহারাজ, অবোধ বালিকাদের অপরাধ আপনাকে ক্ষমা করিতে হইবে।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—আমি উহাঁদিগকে ক্ষমা করিয়াছি আপনার এই উপেক্ষিতা কন্যাটির গুণে। ইহাঁর কাছে আমার ক্ষমা চাহিবার আছে।

এই বলিয়া বসন্ত অন্য রাজকুমারীদিগকে লক্ষ্য না করিয়া যমুনাকে বলিল—যমুনা, আমার অতীত অবিনয় মার্জ্জনা কর।

যমুনা নতমুখে নখ খুঁটিতে লাগিল। তাহার গর্ব্বিতা ভগিনীদের সম্মুখে, স্নেহহীন পিতার সমক্ষে তাহাকে এ কি লাঞ্ছনা! কি লজ্জা!

বসন্ত সকলের সহিত কথা কহিতেছিল কিন্তু তাহার চক্ষু দুটি ব্যাকুল হইয়া অন্তঃপুরের চতুর্দ্দিকে প্রত্যেক কপাটের অন্তরাল জনতার অভ্যন্তর খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, কোথায় তাহার সুভদ্রা, কোথায় তাহার দয়িতা, কোথায় তাহার প্রেয়সী! সে ত তাহার মুখ চিনে না! চিনে তাহার হাত, চিনে তাহার কণ্ঠস্বর, চিনে তাহার সদয় হৃদয়!

কথার উত্তর না পাইয়া বসন্তর চক্ষু যমুনার দিকে ফিরিয়া আসিল। সে দেখিয়া চমকিত হইল যমুনার হাত দুখানিই সেই তাহার অন্ধকারের সান্ত্বনা সুভদ্রার হাত! সেই তাহার দুঃখদিনের অতি পরিচিত আঙুলগুলি, নখগুলি, রেখাগুলি, আর সেই মণিবন্ধের অতি সুন্দর তিলটি যেন তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছিল এই সেই, এই সেই, এই সেই!

বসন্তর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তে প্রণয়কৃতজ্ঞতার মোহন স্পর্শে যমুনা বসন্তর চক্ষে অতুলনা রূপসী হইয়া দেখা দিল। একটি অতিসুন্দর চিরকিশোর অশরীরী দেবতার বরে বসন্তর দৃষ্টিতে যে প্রেমের অঞ্জন লাগিয়া গেল, তাহার ভিতর দিয়া সে দেখিল যমুনা অতুলন রূপ যৌবনে আনন্দে কল্যাণে মাধুর্য্যে সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিতেছে। বসন্ত তখন কাশীরাজের দিকে ফিরিয়া বলিল—রাজন্, আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।

—ভিক্ষা কি মহারাজ! অপরাধীর অপরাধ বাড়াইবেন না। আদেশ করুন।

—আপনার দণ্ডস্বরূপ আপনার ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নটি আমি লইব।

—সে ত আপনার অনুগ্রহ, আমার সৌভাগ্য। কোষাধ্যক্ষ আপনার আদেশের অপেক্ষা করিতেছে।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—আমি যে রত্নের কথা বলিতেছি, সে রত্ন আপনার কোষাধ্যক্ষ চেনেন না। সেটি আমি অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছি, সেটি এই।

এই বলিয়া বসন্ত অগ্রসর হইয়া দুই হাতে যমুনার

হাত দুখানি চাপিয়া ধরিল। সকল লোকের বিস্মিত অবিশ্বাস অগ্রাহ্য করিয়া বসন্ত যমুনাকে হাসিয়া বলিল— ভদ্রা, যমুনা, রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত প্রবঞ্চনা! এর শাস্তি তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে—কাশী হইতে অবন্তীর রাজপ্রাসাদে তোমার নির্ব্বাসন! কেমন, এ দণ্ড স্বীকার করিলে ত? আজ আর বোধহয় অবন্তীর প্রার্থনা ব্যর্থ করিয়া ফিরাইতে পারিবে না। অবন্তীর রাজপ্রাসাদ যদি ভালো না লাগে, অবন্তীতে ফুলের বনের অভাব নাই, অবন্তীর মহারাজ সেইখানেই তোমার বসন্ত মালাকরকে ধরিয়া রাখিবে! তাহার বীণা তোমার বন্দনা আনন্দে গাহিবে! নিত্যই সে তোমার গলায় অম্লান পুষ্পের মালা পরাইবে! তুমি ছুটি না দিলে ছুটি সে পাইবে না!

যমুনা লজ্জায় সুখে গলিয়া পড়িবার মতো হইয়া কোনো মতে দাঁড়াইয়া রহিল।

কাশীরাজ অবিশ্বাস্য ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিলেন—মহারাজ, আমার এই সমস্ত সুন্দরী কন্যারা এখনো অবিবাহিতা।

বসন্ত হাসিয়া রূপসীদের লজ্জায় মাটি করিয়া দিয়া বলিল না রাজন্, উহাঁরা কর্ণাট কলিঙ্গ উজ্জ্বল করিবেন শুনিয়াছি।

—কিন্তু মহারাজ, আপনার শ্রীচরণে স্থান পাইলে উহারা আনন্দে কর্ণাট কলিঙ্গ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—রূপের নেশা আমার কাটিয়াছে। রাজার প্রাসাদে হৃদয় কিনিতে পাওয়া যায়, জয় করিয়া পাওয়া যায় না। তাহা জানিয়াই এই দীনবেশে হৃদয়জয়ে বাহির হইয়াছিলাম। একটি হৃদয় আমি পাইয়াছি যাহা হৃদয় চায় রাজ্য চায় না। জয় কবিতে আসিয়া বড় আনন্দে হারিয়া গেলাম। আমার এই কালো বধূটিই আমার রাজ্য উজ্জ্বল করিবে। আমি বুঝিতে পারি নাই যমুনার হৃদয় গভীর শীতল বলিয়া তাহার রূপ কালো! যামিনী কালো বলিয়াই তাহার বুকে অযুত জ্যোতিষ্কের মালা দোলে! কালো কয়লার হৃদয় আলো করিয়াই সূর্য্যের কণা দীপ্ত হীরক লুকানো থাকে! যমুনা, আমি অবহেলা করিয়া তোমায় অপরাজিতার মালা দিতাম, দুঃখে পড়িয়া সুখে জানিলাম তুমি বাস্তবিকই অপরাজিতা! তুমি অতুলনা!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাষাণ ও নির্ঝরিণী

কে তুই, কে তুই মোরে বল,
মোর হিয়া মাঝখানে,
কল কল কল গানে,
ঢেলে যাস আনন্দ তরল,
কে তুই কে তুই মোরে বল।

আমি যেরে কঠিন পাষাণ,
এ অনন্ত কথা তোর,
বুঝি কোথা শক্তি মোর,
শুনি শুধু আকুল পরাণ,
আমি যেরে কঠিন পাষাণ।

নাহি জানি কারে তুই চাস,
মোর এ পাষাণ কোড়ে,
না পারি রাখিতে তোরে,
কোথা তুই ছুটে চলে যাস,
নাহি জানি কারে তুই চাস।

তুই কিরে করুণা তরল,
নেমে এলি স্বর্গ হতে,
সুকঠিন এ মরতে,
পাষাণেরে করিতে পাগল,
তুই কিরে করুণা তরল?

তুই যেন আনন্দের রাশি,
ঢল ঢল আত্মহারা,
বিমল আলোকধারা,
পাষাণের মুখে দিবি হাসি,
তুই যেন আনন্দের রাশি।

কার তুই আকুল ক্রন্দন ?

এ অনন্ত আঁখিজল,
কোথা পেয়েছিস বল,
গলে যায় পাষাণ বন্ধন,
কার তুই আকুল ক্রন্দন ?

বুঝি তুই বিশ্বের সকল,
এ বিশ্বের যত গান,
যত হাসি, যত প্রাণ,
যত ব্যথা, যত আঁখিজল,
বুঝি তুই বিশ্বের সকল।

বল মোরে শুধু খুলে বল,
কে তুই, কি তোর কথা,
কার সে অনন্ত ব্যথা,
কার তুই হৃদয় তরল,
বল মোরে শুধু খুলে বল।

প্রাণ মোর ব্যথিছে কেবল,
পাষাণ, পাষাণ, আমি,
শুনে যাই দিন যামী,
নাহি বুঝি পরাণ বিকল,
প্রাণ মোর ব্যথিছে কেবল।

শ্রীবিপিনবিহারী দাস।

নাসিক

"মুম্বই" আসিয়া নাসিক ও 'পুণে' দেখা হইবে না, তাহা হইতেই পারে না, তাই একদিন হঠাৎ পুণা যাওয়া ঠিক করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু (Man proposes God disposes) মানুষের আরজি খোদার মরজি। কল্যাণের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ধরিয়া বসিলেন যে আগামী রবিবারে তাঁহার গৃহে উপাসনা করিতে হইবে। কল্যাণ বম্বে হইতে প্রায় ৪০ মাইল। এই কল্যাণ হইতে দুইটী রাস্তা একটী পুণা যাইবার ও একটী নাসিক যাইবার এবং কল্যাণ হইতে উভয়ে সমদূরবর্ত্তী। আমি ঠিক করিয়াছিলাম আগে পুণা যাইব। কিন্তু তাহা হইল না। কেননা, যে দিন পুণা যাইব ঠিক করিয়াছি, সে দিন পুণা যাইয়া রবিবারে ফিরিলে দেখা শেষ হইবে না, অথচ সে দিন নাসিক রওনা হইলে, এতদিন লাগিবে না। সুতরাং সব বন্দোবস্ত উল্টাইতে হইল। আগে নাসিক যাওয়াই ঠিক করিলাম। এক বন্ধু সপরিবারে আমাদের পথপ্রদর্শক 'পাণ্ডা' হইলেন। শুক্রবার অতি প্রত্যুষে জি, আই, পি, আর রেলওয়ের বম্বের প্রধান ষ্টেশন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে (Victoria Terminus) আসিয়া উপনীত হইলাম। যাইয়া দেখি তখনও অনেক দেরী আছে। আমার ঘড়ী ২০ মিনিট্ ফাষ্ট্। সবে চার দিন হইল ঘড়ীওয়ালা ৩৲ টাকা লইয়া ঘড়ী মেরামত করিয়া দিয়াছে, সুতরাং দ্রুত না চলিলে চলিবে কেন ? যাহা হউক, "অধিকন্তু ন দোষায়," রেলে দেরী হইলেই বরং বিপদ্। আমরা টিকিট্ কিনিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। কিন্তু দেরী অনেক, তাই বাহিরে আসিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পাইচারি করিতে লাগিলাম। গাড়ীগুলি সব আগাগোড়া দেখিয়া বুঝিলাম,

এটি একটী ডিমক্র্যাটিক ট্রেন।

ধনী দরিদ্রের ভেদ নাই, সব থার্ড ক্লাস। শ্বেত ব্রাহ্মণ, পার্শী বৈশ্য, আর কেরাণী শূদ্র বাঙ্গালী, আজ সব একাকার। একপর্য্যায়ভুক্ত কোন ক্ষত্রিয় ছিল কি না, জানিতে পারি নাই। ক্ষত্রিয় বোধ হয় ডিমক্র্যাসির পক্ষপাতী হয় না। তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলে স্বভাবতঃই মনটা ক্ষুদ্র হয়, উহা যেন হীনতাব্যঞ্জক। গ্লাড্‌ষ্টোনের মত যখন বলিবার অধিকার নাই, "ফোর্থ ক্লাস নাই, কি করি, তাই থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছি" সুতরাং "আজ সব থার্ড ক্লাস," ক্ষতস্থানে এই মলম লাগাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কিন্তু হেঙ্গাম তো থামিল না। আমি যে ষ্টেশনে নামিব, গাড়ীটা হুঁস করিয়া যদি সেইখানে যাইয়া থামিত, তবে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু তা হয় না। অনর্থক মাঝখানে কতগুলি ষ্টেশনে ট্রেন থামে। সুতরাং প্রত্যেক ষ্টেশনে মুখ বাড়াইয়া "জায়গা নাই জায়গা নাই" বলিয়া একটা ছোটখাট

খণ্ড যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। গাড়ীতে চড়া আর বাঙ্গালী হিন্দুকন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করা যেন একই ব্যাপার। পুত্রের পিতা সৌভাগ্যবান্, তিনি যেন আগে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়াছেন। দুর্ভাগা কন্যার পিতা কন্যার জন্মরূপ দৈব দুর্ব্বিপাকে যেন পিছাইয়া পড়িয়াছেন। তাই আপনার পুঁটুলীটি লইয়া গাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া কাকুতি মিনতি করিতেছেন। কিন্তু কেহই ইচ্ছা করিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার ভাব দেখাইতেছে না, বরং অর্দ্ধচন্দ্রেরই ব্যবস্থা করিতেছে। কিন্তু যদি কন্যার পিতা কিঞ্চিৎ অধিক টাকার লোভপ্রদর্শনরূপ একটা শক্ত ধাক্কা মারিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্য সজোরে দরজা খুলিয়া যায়। তারপর তিনি যখন উঠিয়া পড়িলেন, তখন গাড়ীস্থ সকলেই তাঁহাকে একটু জায়গা করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তখন আর কেহ ক্ষণকাল পূর্ব্বের ঐ ধস্তাধস্তির কথা মনে করিয়া বসিয়া থাকে না। তিনি সকলের আপনার লোক হইয়া পড়েন, তাঁহার সুখ দুঃখ সকলের সুখ দুঃখের সামিল হইয়া যায়। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে যাহা হউক, গাড়ী কল্যাণে পৌঁছিল। দেখি বন্ধুবর ডাক্তার খাণ্ডবালা উপস্থিত - তিনি একখানা গুজরাটী ও একখানা মারাঠী সঙ্গীতপুস্তক লইয়া উপস্থিত। উপাসনায় গৃহিণীকে গান করিতে হইবে। তিনি গাড়ীসুদ্ধ লোককে রবিবার তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। গাড়ী নানা ঘুরপাক্ খাইয়া কেননা, ঐ রাস্তায় গাড়ী চলিতে চলিতে কখন কখন ঠিক বিপরীত মুখে যায় এক ষ্টেশনে আসিল, তখন বেলা ১০টা। একজন লোক আসিয়া গাড়ীতে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। তাহার কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলাম,

লোকটা পাগল না কি ?

আমাদের গ্রামের একজন লোক পাগল হইয়া গিয়াছিল এই আক্ষেপে যে, যদিও সে বিপত্নীক তবুও কেন তাহার ভাই তাহাকে বিবাহ না করাইয়া নিজে বিবাহ করিল। একদিন দিনদুপুরে সে ধুচুনির মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিল; কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিল,—"বাবু, ঘোর কলি অন্ধকার, দুই চক্ষে কিছু দেখা যায় না।" ভাবিলাম এ লোকটার অবস্থাও তাই নাকি? কিন্তু প্রকৃত কারণ বুঝিতে দেরী হইল না। ইতিপূর্ব্বেই একটা "টানেলে"র ভিতর দিয়া আসিয়াছি। ভাবিলাম এবার বোধ হয় বহু বড় বড় টানেল পার হইতে হইবে। সুতরাং সকলে আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইলাম। প্রথম প্রথম আমোদ লাগিল বটে কিন্তু ক্রমে ভয়ানক বিরক্তি ধরিয়া উঠিল। বড় টানেলের মধ্যে ধোঁয়া, গন্ধ ও অন্ধকারে প্রাণ যায় যায় আর কি! ঘড়ী ধরিয়া দেখিয়াছি, বড় জোর দুই মিনিটের বেশী কোন টানেলের মধ্যেই ছিলাম না। ইহারই মধ্যে আলোর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন হৃদয়ঙ্গম হইল ঋগ্বেদের ঋষিগণের অন্ধকারের পরপারে যাইবার জন্য সেই বিষম ব্যাকুলতার অর্থ কি। ছ'মাসের জন্য অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রাণ অস্থির না হইয়া থাকিতে পারে কি? তা আবার সেই আদিমকালে, যখন প্রাকৃতিক নিয়মাদি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয় নাই। এ অন্ধকার যে আবার দূর হইবে তাহার বিশ্বাস কি? যাহা হউক, স্থানে স্থানে দেখিলাম, টানেল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ভীষণ গর্জ্জন করিয়া বৃষ্টির জল সেই সব ফাটল দিয়া গাড়ীর উপর পড়িতেছে। টানেলের গাত্র বাহিয়া সে জলস্রোত সর্ব্বত্রই বহিয়া যাইতেছে। এ প্রদেশে রেলরাস্তার দুইধার পরম সুন্দর। ইহাকে "ঘাটের" সৌন্দর্য্য বলা হয়। কল্যাণ হইতে নাসিক অপেক্ষা আবার কল্যাণ হইতে পুণা পর্য্যন্ত ঘাটের সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোহারী। কোথায়ও বা দুই পার্শ্বে পাহাড় মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু গাড়ী চলিতেছে সুগভীর খাতের উপর দিয়া; নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। কোথায়ও বা পর্ব্বত ভেদ করিয়া রাস্তা বাহির করা হইয়াছে। দুখান এঞ্জিন দু'পাশ হইতে ঠেলিয়া ট্রেনখানাকে ঠিক পথে ধরিয়া রাখিয়াছে। দুই পার্শ্বে পর্ব্বতমালা সবুজ দূর্ব্বাদলে মণ্ডিত। বর্ষা বলিয়া বোধ হয় সর্ব্বত্র ঘাস গজাইয়াছে, কাল পাথর আর দেখা যাইতেছে না। সহস্রধারায় বৃষ্টির জল সর্পাকারে পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া নিম্নদেশে নামিয়া আসিতেছে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন শত শত সর্প পর্ব্বতের গাত্র বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, দেখিতে অতি

রমণীয়। কবি হইলে বলিতাম এগুলি যোগিনী ধরিত্রী-দেবীর পর্ব্বত-শীর্ষবিলম্বিত জটাজাল। জানিনা, কেন সর্প ও জটা এই উভয় উপমা একসঙ্গে মনে হইল। পৌরাণিকের কল্পনায় মহাদেব কিন্তু জটাজুটসমন্বিত ও নাগমালাবিমণ্ডিত। যেখানে পাহাড়ের নিকট দিয়া গাড়ী চলিয়াছে সেখানে দেখা যায় বহুজলধারা মিলিয়া পাহাড়ের পাদদেশে উৎসের উৎপত্তি করিয়াছে, যেন পর্ব্বতের গাত্র বাহিয়া রজতধারা বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে। সে দৃশ্য যে কি হৃদয়গ্রাহী তাহা যিনি দর্শন করেন নাই তাঁহাকে বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দিবার শক্তি আমার নাই। এইরূপ নানা সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে বেলা সাড়ে বারটার সময় আমরা পৌঁছিলাম,

নাসিক্ রোড্ ষ্টেশন।

কিন্তু ষ্টেশন হইতে আমাদের গন্তব্যস্থান প্রায় ছয় মাইল। আমরা দুই টোঙ্গায় বোঝাই হইয়া কর্দ্দমময় রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। কিন্তু রাস্তা কি আর ফুরায়! তবে এ মহাপথও নয়, আর আমরা মহাযাত্রাও করি নাই! সুতরাং নাসিকের এই দুর্গম রাস্তাও ফুরাইল। আমাদের টোঙ্গা প্রস্তরনির্ম্মিত পোল্ বাহিয়া নদী পার হইয়া ধর্ম্মশালার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ধর্ম্মশালায় ঢুকিয়াই মহাবিভ্রাট্। ধর্ম্মশালার লোকেরা কি জানি কেন আমাকে মুসলমান ঠাওরাইয়া বসিল। অপরাধ, বোধ হয় আমি কোট-প্যাণ্ট-পরা এবং কিঞ্চিৎ দাড়ি-সমন্বিত। আর গৃহিণীর পোষাক না 'অর্থদক্ষ' (orthodox) না মারাঠী না গুজ্‌রাটী, তাহাতে আবার কপালে এক ইঞ্চি পরিমাণ ব্যাসবিশিষ্ট না আছে সেই বিরাট সিন্দূরের ফোঁটা। সুতরা· ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না যে আমরা দুটী প্রাণী মুসলমান নহি। মহা মুস্কিল হইল। আমি নানাদিক ভাবিয়া বন্ধুটীকে বলিলাম, স্বীকার করুন আমরা মুসলমান এবং বলুন আমার নাম দেদার্‌বক্স নবাবআলি চৌধুরী। কেন না, মানবপ্রকৃতিই এই, যেদিকে যখন ঝোঁক্ হয় তাহার বিপরীত দিকের যুক্তি কিছুতেই তখন হৃদগত হয় না। তর্কে কেবলই ঝোঁক বাড়িয়া যায়। তাই জন্য, যদি হঠাৎ স্বীকার করিয়া ফেলি যে আমরা মুসলমান, তাহা হইলে আমাদের মুসলমান না হইবার পক্ষে যে যুক্তি আছে সেদিকে ইহাদের দৃষ্টি পতিত হইতে পারে, এবং আমাদের স্বীকারটাও যে নিতান্ত পরিহাসব্যঞ্জক তাহাও তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এতদূর যাইতে হইল না, অল্পকাল মধ্যেই ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ আপনাদিগের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হইলেন এবং আমাদিগকে ধর্ম্মশালার বিছানা, বাসন ইত্যাদি যোগাইলেন। কিন্তু আমাদিগের বিপদ ঘুচিল না। পাণ্ডাগণ আধ মণ ত্রিশ সের ওজনের এক এক খাতা মুটিয়ার স্কন্ধে দিয়া এতক্ষণ আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাঁহারা খাতা খুলিয়া বসিয়া গেলেন, সেই বিরাট জঙ্গলের মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিবেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কখন নাসিকতীর্থে আসিয়াছিলেন কি না। আমার তো ঊৰ্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কেহ কখনও নাসিকতীর্থে আসিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। তখন তাহারা আমাকেই নাম লিখিতে বলিল। আমি তাহাদিগকে বাংলা ভাষায় হাসিতে হাসিতে বলিয়া দিলাম যে আমাকে শিষ্য করিতে হইলে একটা অসম্ভব কার্য্য করিতে হইবে। তাহারা তো আমার কথা সবই বুঝিল, সিদ্ধান্ত করিল বাবু বেড়াইতে আসিয়াছেন, তীর্থ করিতে আসেন নাই সুতরাং পীড়াপীড়ি করা বৃথা। সুতরাং তাহারা নিরস্ত হইল, আমরাও হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। শুনিলাম স্থানটীর নাম—

পঞ্চবটী।

নাম শুনিয়াই কোমলে কঠোরে মিশানো রামায়ণবর্ণিত কত কাহিনী মনে পড়িয়া গেল। এই পঞ্চবটীতেই কি রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল? সেই পৌরাণিক আখ্যায়িকার নিদর্শনস্বরূপ এখানে একটী বটতলা আছে। কতকগুলি বটবৃক্ষ সেখানে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাশে একটী গর্ত্তের মধ্যে সীতাদেবীর মূর্ত্তি। সেই গর্ত্তের উপরে একটী মন্দিরের মত নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এইখানেই নাকি ছিল সেই কুটীর যেখান হইতে জনকনন্দিনীকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যায়। বাহিরে একটী

ক্ষুদ্র প্রস্তরে সর্ব্বাঙ্গে সিন্দুর লিপ্ত হইয়া হনুমানজী বিরাজ করিতেছেন। খুঁজিয়া এইটুকু মাত্র যুগযুগান্তের নিদর্শন পাইলাম। শ্রীরাম মন্দির বলিয়া আর একটী মন্দির আছে, এই মন্দিরের শীর্ষদেশ স্বর্ণমণ্ডিত। মন্দিরের মধ্যে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরটীর কিছুই বিশেষত্ব নাই। বিশেষতঃ যাঁহারা পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিয়াছেন অন্য কোন মন্দির যে তাঁহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। নদীটীর নাম শুনিলাম—

গোদাবরী।

শুনিয়াই মাইকেলের সীতাদেবীকে মনে পড়িল,—"ছিনু মোরা সুলচনে গোদাবরীতীরে"। এই খানে কি শ্রীরাম-

রামকুণ্ড।

চন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ সহ অঙ্গ প্রক্ষালন করিতেন? রামায়ণবর্ণিত ঘটনার তথ্যানুসন্ধান তখন কে করে? যুগ যুগান্তের সংস্কার তখন আমার উপর অধিকার বিস্তার করিল। গোদাবরীর দিকে তাকাইয়া শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এখানে গোদাবরী দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে বহিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব পারের নাম নাসিক, দক্ষিণ-পারের নাম পঞ্চবটী। প্রস্তর ও ইষ্টকে নির্ম্মিত এক সেতু দ্বারা নাসিকের সঙ্গে পঞ্চবটী যুক্ত হইয়াছে এই সেতুর উত্তর দিকে নদীর কিয়দংশের নাম রামকুণ্ড। তৎপরে লক্ষ্মণ ও সীতাকুণ্ড। রামকুণ্ডের জল পানীয় জলরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া লোকে যাহাতে জল অপরিষ্কার না করে সে জন্য গোদাবরীতে পাহারা নিযুক্ত রহিয়াছে। অন্যান্য কুণ্ডে স্নান ও বাসন মাজিবার ও কাপড় কাচিবার অধিকার আছে। নাসিকে পাষাণের উপর দিয়া কুলু কুলু রবে—না, শৈলবিহারিণী পাষাণশয্যাশায়িনী নগনন্দিনী গোদাবরী এখানে নিতান্ত বীণাবাদিনী নহেন, বেশ একটু শব্দ করিয়া আসর জমাইয়া আপনার পরিচয় দিতে দিতে চলিয়াছেন। পর্ব্বতদুহিতা এখানে সার্থকনাম্নী। তলে পাহাড়, উপরে পাহাড়, এই সব পাহাড় কাটিয়া দুধারে সুন্দর স্নানের ঘাট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার স্থানে স্থানে এই জলস্রোতের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির মুখ তুলিয়া দণ্ডায়মান। আমার জলে নামিয়া স্নান করিবার সখ হইল। বন্ধুটী গোদাবরীর খরস্রোতের ভয় দেখাইলেন, আমি মনে ভাবিলাম—

আমার পদ্মাপারে বাড়ী
আমি কি ডরাই এই তুচ্ছ গোদাবরী।

ঝুপ করিয়া জলে নামিয়া পড়িলাম। পাষাণকন্যা আমার এ ধৃষ্টতা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিলেন না। আমাকে দুইবার দুই পাথরের উপর আছড়াইয়া দিলেন, আমি কিন্তু কিছুতেই হটিবার পাত্র নহি, তাহার সকল বেগ সামলাইয়া যখন চিৎ হইয়া চারি দাঁড় সাহায্যে স্রোতের বিপরীত দিকে পাড়ি ধরিলাম, তখন আমার এ ক্ষুদ্র চেষ্টা তীরবর্ত্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ছাড়ে নাই। আমি লক্ষ্মণকুণ্ডে স্নান করিয়াছি। বহুকাল পরে অবগাহন ও সন্তরণ করিয়া বেশ তৃপ্তি লাভ করা গেল। এ আবার যে সে অবগাহন নহে, একটী রীতিমত adventure.

নাসিকের প্রধান দ্রষ্টব্যবিষয় পাণ্ডবগুম্ফা পাহাড়। পঞ্চবটী ও নাসিক সহর কাল বৈকালেই দেখিয়া রাখিয়াছি। নাসিক সহর দেখিতে দুই ঘুরানি খাইয়াছিলাম। একজনকে

সীতাকুণ্ড।

লক্ষ্মণকুণ্ড।

আমিও আমার ইন্দ্রিয়গণের অনুসরণ করিয়া অনায়াসে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। যাহা হউক, আমরা এক টোঙ্গায় চড়িয়া গুম্ফার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গুম্ফা আমাদের আবাসস্থান হইতে প্রায় দশ বার মাইল, কিন্তু সহরের বাহিরে গুম্ফা পর্য্যন্ত রাস্তা অতি সুন্দর। রাস্তা দেখিয়া বন্ধুটীর সাইকেল চালাইবার প্রলোভন উপস্থিত হইল। কিন্তু তখন সাইকেল পাইবেন কোথায়? তাই সে রাস্তায় কেমন সুন্দর সাইকেল চলিতে পারে এবং তাঁহার দাদা সাইকেলে চড়া শিখিতে পারেন নাই কিন্তু তিনি ও তাঁহার ছোট ভাই কেমন সাইকেল চড়িতে শিখিয়াছেন ইত্যাদি গল্প করিয়া মনের আপশোষ মিটাইতে লাগিলেন। ভোজনবিলাসী যেমন খাওয়ার কথা উঠিলেই কোন জিনিষে কিরূপ সুখাদ্য প্রস্তুত হয় এবং কোথাকার কোন্ ভাল দ্রব্য আহার করিয়াছিলেন তাহার গল্প জুড়িয়া দেন, বন্ধুটীরও সেই দশা হইল। আমার এক বন্ধু বার বৎসর পূর্ব্বে কোথায় সুমিষ্ট টক খাইয়াছিলেন তাহার স্বাদ মনে করিয়া বসিয়া আছেন। আমার কিন্তু এ বেলা আহার্য্যের স্বাদ ওবেলার সঙ্গে তুলনা করিবার শক্তি নাই।

রাস্তা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে একদিক দেখাইয়া দিল সেই দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইয়া আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কিন্তু ঠিক বিপরীত মার্গ প্রদর্শন করিল। কাজেই আমার দুইবার সহর প্রদক্ষিণ হইল। রাত্রি নিকটবর্ত্তী দেখিয়া আমি স্বাবলম্বন অবলম্বন করিলাম। রাস্তা হারাইলে অশ্বারোহী যেমন লাগামে আল্‌গা দিয়া অশ্বের স্বাভাবিক বুদ্ধির উপর নির্ভর করতঃ পথ পায়,

স্বাদ বিষয়ক স্মৃতি সম্বন্ধে আমি এমনি 'অন্ধ'! বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিষয়ক স্মৃতি বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন। আমার বন্ধুটীর স্বাদ বিষয়ক স্মৃতির প্রাখর্য্য আমি ধারণাই করিতে পারি না। যাহা হউক, এই সাইকেল বর্ণনার মধ্যে শকট চালকের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। সে নিজে নিজে কত কি বলিয়া যাইতেছিল। শেষে বুঝিলাম, সে তাহার আত্মচরিতের এক অধ্যায়

বর্ণনা করিতেছে। সে চল্লিশ টাকা মাহিনায় বোম্বেতে এক রেলওয়ের কারখানায় চাকুরী করিত। উপরওয়ালা সাহেবের অবিচারে চাকুরী ছাড়িয়া গাড়োয়ানি করিতেছে, অধিকন্তু একটা বিজাতীয় ইংরাজবিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করিতেছে। "খাটিয়া মরিব আমরা, আর নাম হইবে সাহেবের, তার উপর কথায় কথায় অপমান।" এই গাড়োয়ানের মনের ভাব দেখিয়া হৃদয়ে স্বতঃই একটা প্রশ্নের উদয় হইল। দেশে অশান্তি ও অসন্তোষ নিবারণের জন্য মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের পশ্চাতে সরকার বাহাদুর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া টিক্‌টিকি লাগাইয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু অশান্তির যেখানে গোড়া সেদিকে নজর পড়িতেছে না। শিক্ষিত লোকের যে অসন্তোষ তাহার কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা। তাহা আত্মোন্নতির চেষ্টা হইতে উদ্ভূত, সে অসন্তোষ হইতে গবর্ণমেণ্টের কোনই আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর অসন্তোষের প্রকৃতি ও তাহার বেগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উপরওয়ালার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কেহ আপনার ৪০৲ টাকার চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছে, বলিয়া তো জানি না। ইহা একটা প্রণিধানযোগ্য বিষয়। আফিসে উপরওয়ালার অত্যাচার, রেলগাড়ীতে শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গের অপমান এবং নির্দ্দোষীর উপর পুলিশের অত্যাচার—ইহাতে দেশে যে অশান্তির উৎপত্তি হইতেছে তাহার তুলনায় শিক্ষিতমণ্ডলীর রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রয়াসোৎপন্ন যে আন্দোলন তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সরকার যদি টিক্‌টিকি লাগাইয়া এই সকল অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে পারেন, তবে বাস্তবিকই দেশ হইতে অশান্তি অন্তর্হিত হইবে। এই যে সেদিন মহামান্য হাইকোর্টের একজন জজ মীমাংসা করিয়াছেন যে পুলিশের অতি উচ্চ কর্ম্মচারীরাও ষড়যন্ত্র করিয়া নিরীহ প্রজাকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারে, ইহাতে সাধারণ জনমণ্ডলীর হৃদয়ে যে আতঙ্ক ও অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সঙ্গে অন্য কোন অশান্তি তুলিত হইতে পারে না। সরকার বাহাদুর এ অশান্তি নিবারণের কি ব্যবস্থা করিতেছেন? আমরা এ কথা বলিতে চাই না যে সব পুলিশ খারাপ। আমরা জানি মানব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় পুলিশ ছাড়া দেশ রক্ষা করা চলে না। এমন মূর্খ কেহই নাই যে বায়ু ঝড়রূপে প্রবাহিত হইয়া অনিষ্ট করে বলিয়া বায়ু চলাচল বন্ধ করিবার পরামর্শ দিবে। ঝড়ে যাহাতে অনিষ্ট না হয় মানুষ সেই উপায়ই অবলম্বন করে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদিগকে এই সব ঝড় হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন তবেই দেশে আপনা হইতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এখন দেশে এমন কেহই নাই, আমরা দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলিতে পারি, যে নাকি রাষ্ট্রবিপ্লব কামনা করে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি আসল অশান্তির কারণগুলি দূরীকৃত করিতে পারেন তাহা হইলে দেশ হইতে অশান্তির বীজ আপনা হইতেই নির্ব্বাসিত হইবে। যাহা হোক্ ইতিমধ্যে আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। গাড়োয়ান বলিল—ঐ যে দেখা যায় –

পাণ্ডবগুম্ফা পাহাড়।

আমার ইচ্ছা হইল নাম দি নৈবেদ্য পাহাড়। এমনি সুন্দর নৈবেদ্যের মত পাহাড়টী দেখিতে! কিন্তু নিকটে যাইয়া দেখিলাম উহারি পাশে আর একটা পাহাড় আছে যাহার নৈবেদ্যত্বের দাবী বেশি। বড় রাস্তায় গাড়ী থামিল; আমরা সেখান হইতে অবতরণ করিয়া পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম। রাস্তা হইতে পর্ব্বত আরম্ভ হইয়াছে। উঠিতে উঠিতে কয় পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গেল। বাঁকিয়া চুরিয়া উঠিতে গাছের আড়ালে আমরা বৃষ্টি হইতে আশ্রয় লইতে লাগিলাম। পাহাড়ের উপর হইতে বৃষ্টির পতন দেখিতে কেমন সুন্দর। আমরা এত উপরে উঠি নাই যেথান হইতে আমরা অনাহত থাকিয়া নীচে বৃষ্টির পতন দেখিতে পাইব; তবুও বুঝিলাম, আমাদের গায়ে বর্ষার যে ছাট্ লাগিতেছে নিম্নদেশে বর্ষণের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা শতগুণ বেশি। আমরা মেঘ ও রৌদ্র ভেদ করিয়া ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিয়া গুম্ফাদর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম। লোকের বিশ্বাস, এই সকল গুম্ফায় বনবাসকালে পাণ্ডবগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি রামায়ণ ও মহাভারতকে পাশাপাশি বসাইয়া দিয়াছে। কাম্যবন ও দণ্ডকারণ্য গোদাবরীর এপার আর ওপার।

পর্ব্বতের দুইতৃতীয়াংশ উঠিলে তবে গুম্ফার নাগাল

পাওয়া যায়। এইখানে পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ ঘুরাইয়া কাটিয়া চারিদিকে গুহার সৃষ্টি হইয়াছে। একএকটা গুহা বেশ বড়। এক একটা প্রকাণ্ড হল্, যেখানে বহুশত লোক বসিয়া বক্তৃতাদি শ্রবণ করিতে পারে। মধ্যে মধ্যে স্তম্ভ রহিয়াছে। এ স্তম্ভগুলি লাগান হয় নাই, পর্ব্বত খুঁড়িয়া গৃহ হইয়াছে, স্তম্ভ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এলিফাণ্টা কেভে অতি বিশালকায় স্তম্ভসকল দেখিয়াছি, এত বড় আর কোথাও দেখি নাই। এখানে স্থানে স্থানে দোতালা গুহাও আছে। অনেক গুহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে গুহাগুলি বড় বড় হল্, তাহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে বহুসংখ্যক এক দরজার কুঠ্‌রী, একজন মানুষের শয়ন করিবার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। পর্ব্বত চুয়াইয়া যে জল পড়ে সেই জল ধরিবার জন্য স্থানে স্থানে চৌবাচ্চা, ইহাই পানীয় জলরূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ সেই জল পান করিলেন, আমাদের প্রবৃত্তি হইল না। পর্ব্বত কাটিয়া একটা ছোটখাট পুকুরের মত করা হইয়াছে। এখনও তাহার মধ্যে দুই হাত গভীর জল দেখিলাম। এইটা ছিল স্নানের বন্দোবস্ত। ঝরণার জল ধরিয়া রাখিবার জন্য এলিফাণ্টাতেও একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা দেখিয়াছি, সেখানে পাহারা নিযুক্ত রহিয়াছে। দর্শকগণ সে জল পান করিতে পারেন কিন্তু বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবেন না। সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়া বোধ হয় সেখানে ঐ নিয়ম, দু পয়সা রোজগারের পন্থা। এলিফাণ্টার ন্যায় এখানেও দেব দেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। কিন্তু সেখানকার মূর্ত্তিগুলি যেমন বিপুল-কলেবর, এমন আর কোথাও নাই। দেখিলেই মনে হয় যেন দানবের কীর্ত্তি। এলিফাণ্টার মূর্ত্তিগুলি পৌরাণিক, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই, সেগুলি বৌদ্ধ যুগের নহে। সেগুলি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, সরস্বতীমূর্ত্তি ইত্যাদি। কিন্তু পাণ্ডবগুম্ফার মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না, যদিও সেখানকার লোকেরা পৌরাণিক মূর্ত্তি বলিয়াই ব্যাখ্যা করিল। আমাদের সময় ছিল না যে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তত্ত্ব অনুসন্ধান করি। এক জায়গায় তিনটি মূর্ত্তি রহিয়াছে, আমাদের "গাইড্" বলিল ইন্দ্রের সভা। কিন্তু মূর্ত্তি তিনটির একটীর গায়ে *নীল, একটীর গায়ে হরিদ্রা ও একটীর গায়ে শাদা রং দেওয়া হইয়াছে।* বেশ বুঝা গেল, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সকলেরই দুই হাত। আমার তো বুদ্ধ মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইল। ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সংঘ নহে তো? সর্ব্বত্রই তিন মূর্ত্তি। যেটাকে পাণ্ডব সভা বলা হয় সেটা একটা মস্ত গুহা সুতরাং ভীষণ অন্ধকার, আলো জ্বালিয়া মূর্ত্তিগুলি দেখিলাম। মূর্ত্তিগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। হল্ শেষ হইলে একদরজার একটী কুঠরী। দরজায় সোজা একটি বিরাট্ মূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছে। বাহির হইতে কুঠরীর এই মূর্ত্তিটি মাত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু দরজার দুই পার্শ্বে বাহিরে দুইটী প্রকাণ্ড দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, উচ্চে ছ হাতের কম নয়। তবুও এলিফেণ্টার মত তত বড় নহে। বাহির হইতে এই তিন মূর্ত্তিই দেখা যায়। কুঠরীর ভিতরে ঢুকিলে দেখা যায় যে ঐ উপবিষ্ট মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুই মূর্ত্তি রহিয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়াও ত্রিমূর্ত্তি, বাহির হইতেও ত্রিমূর্ত্তি। অথচ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নহে, ইহা স্থির। এই গুম্ফাই বিশেষ ভাবে পাণ্ডবগুম্ফা নামে অভিহিত। উপবিষ্ট ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, দুই পাশে নকুল সহদেব বাহিরে ভীমার্জ্জুন। ভীমের কাছে তাহার হাঁটুর নীচে পড়িয়া রহিয়াছে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি, শুনিলাম ইনিই নাকি যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী, আর অর্জ্জুনের হাঁটুর নীচে একটী হাতখানেক মূর্ত্তি, উনিই পাণ্ডবশখা শ্রীকিষণ্‌জী। বুঝিতে দেরী হয় না, যে পাণ্ডব আখ্যায়িকা পূরণ করিবার জন্যই ও দুইটি পরে যোগ করা হইয়াছে। স্থানাভাব তাই উহাদিগের এই দুর্দ্দশা। এইরূপ পঞ্চমূর্ত্তির দ্বারা ভিতরে বাহিরে ত্রিমূর্ত্তির প্রকাশ আরও অনেক কুঠরীতেই দেখিলাম। সুতরাং আমি উহাদিগকে পাণ্ডব বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। একটী গুহার নাম কৌরব সভা। গুহাটীর বড়ই জীর্ণ দশা, চারিদিক্ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, এখানেও ঐরূপ ত্রিমূর্ত্তি আছে। কিন্তু দেয়ালের খোদাই যতদূর বুঝিতে পারিলাম তাহাতে মনে হইল বুদ্ধের জন্ম হইতে পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এখানে খোদিত হইয়াছিল, কৌরবের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই। যাহা হউক, হিন্দুর

পুরাণ তো অধিকাংশই বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণের ব্রাহ্মণ সংস্করণ, সুতরাং বৌদ্ধগুম্ফা হিন্দুগুম্ফায় পরিণত হওয়া একটা বেশি কথা কি? এইরূপে চারিদিক্ ঘুরিয়া দেখিতে অনেক সময়ও অতীত হইল, আর আমরাও পরিশ্রান্ত হইলাম, সুতরাং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনই শ্রেয়ঃ। অবতরণ করিতে কুড়ি মিনিট লাগিল, আমার গুম্ফাপর্ব্বও শেষ হইল।

পরিশিষ্ট।

আমাদের আজই নাসিক ছাড়িতে হইবে, কেননা, কাল রবিবার। ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া কাপড় চোপড় লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই টোঙ্গায় উঠিয়া বসিলাম। খানিক দূর যাইয়া মনে হইল রাত্রিতে ব্যবহারের জন্য যে বিছানা ও গায়ের কাপড় আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা ফেলিয়া আসা হইয়াছে। তবে বন্ধুরা ধর্ম্মশালায়ই রহিয়াছেন, কেননা, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার আসিবার প্রস্তাব আছে। গাড়োয়ানকে বলিলাম ফিরিয়া যাইয়া উক্ত জিনিষ লইয়া আসিতে হইলে সে কত বেশী ভাড়া লইবে। সময় অত্যন্ত কম। সে বলিল, এখন কাজের সময় কাজ তো করি, ভাড়ার কথা মীমাংসা করিতে বসিলে সময়ে কুলাইবে না, যাহা বিবেচনা হয় দিবেন। এই বলিয়া সে গাড়ী ফিরাইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, কার্য্যক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা উচ্চসত্য আর কি আছে? যাহা কর্ত্তব্য তাহাতেই মনোনিবেশ কর, আর যা' কিছু সব অবান্তর। গীতাতেও তো এই উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"। যাহাদিগকে আমরা ভ্রান্ত সামাজিক আচারের খাতিরে নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া অবজ্ঞা করি, তাহাদের কাছেই আমাদের কত শিখিবার রহিয়াছে! ইহাদিগের "অশিক্ষিত পটুত্ব" অনেক সময়ে শিক্ষিতাভিমানীদিগকে অবাক্ করিয়া দেয়। একদিন বরিশালে একজন মুসলমান মৎস্যব্যবসায়ীর নিকট মৎসের দর জিজ্ঞাসা করায় সে চাহিল ছ' আনা। আমি বলিলাম চারি আনা, সে সম্মত হইল না। আমি পুনরায় বলিলাম যে সে পাঁচ আনায় দিতে পারে কি না? মাছওয়ালা হাসিয়া বলিল, "বাবু, টাকা অর্জ্জন করা কষ্ট তাহা জানি, কিন্তু খরচ করিতেও যদি এত দুঃখ হয়, তবে টাকায় সুখ কোথায়?" আমি তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর এখন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। যাহা হউক, আমরা সময় মতই ফিরিয়া ষ্টেশনে আসিলাম। জিনিষপত্র গুছাইয়া ট্রেনে শুইয়া পড়িলাম। ট্রেন আপনার মনে চলিল, রাত্রি যখন প্রায় ২টা তখন গাড়ী আসিয়া এক ষ্টেশনে থামিল, সেই গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ও জড়তা ভঙ্গ করিয়া প্লাটফরম হইতে ধ্বনি উত্থিত হইল, "কল্যাণ"। আমরাও তল্পীতল্পা লইয়া নামিয়া পড়িলাম। ডাঃ খাণ্ডবালার লোক গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত, সুতরাং অনায়াসে আমরা হাস্‌পাতালে যাইয়া পৌঁছিলাম। শয্যা প্রস্তুত ছিল, ঘুমাইয়া পড়িতে দেরী লাগিল না। পরদিন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখি কেবল ভজন নহে ভোজনেরও বিরাট্ আয়োজন হইয়াছে। আমাদের ধারণাই ছিল না যে উপাসনার নামে এত বড় একটা কাণ্ড হইবে। বম্বে হইতে অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। উপাসনা হইল বাংলায়, আস্তে আস্তে কথা বলিলে গুজরাঠীদের বাংলা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বাংলার সঙ্গে গুজরাঠীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সঙ্গীত মারাঠী, হিন্দী, বাংলা নানা ভাষায় হইল। বহুলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। ডাক্তারের পরিজনবর্গের অমায়িকতায় ও আতিথ্যসৎকারে আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। পরদিন যখন পুণা যাত্রা করিলাম, তখন ডাক্তার বাবুর একটী রোগী আসিয়া উপস্থিত হইল, সুতরাং তিনি আর আমাদের সঙ্গে ষ্টেশনে আসিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে দেখি যে তিনি ছুটিয়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। আসিবার তো কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কোন কোন মানুষের ভদ্রতা জিনিষটি এমন অস্থিমজ্জাগত, যে, সাধারণের বিচারে যেখানে কোনই ত্রুটী দেখা যায় না, তাঁহাদের নিজেদের সম্বন্ধে তাহা তাঁহাদের কাছে ত্রুটী বলিয়া মনে হয়। তাই, যেই দেখিয়াছেন গাড়ী ছাড়ে নাই—বাড়ী হইতেই তাহা দেখা যায়—অমনি ছুটিয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহার সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া গেলাম তিনি কেবল বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন তাহা নহে,

ফিরিবার পথে আবার তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবার নিমন্ত্রণ দিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গ আমাদের এমন মিষ্ট লাগিয়াছে যে, অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা ফিরিবার সময় আবার কল্যাণে নামিয়াছিলাম। পরদিন ৪টার মেলে বম্বে আসিলাম। মেলের টিকিট কল্যাণে সংগৃহীত হয়, সুতরাং কল্যাণ হইতে বম্বের জন্য নূতন যাত্রী লওয়া হয় না। ডাঃ খাণ্ডবালা আমাদিগকে লইবার জন্য একজন টিকিট কলেক্টরকে অনুরোধ করিলেন, সে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী খুলিয়া আমাদের জিনিষপত্র তাহাতে বোঝাই করিয়া দিল। আমি উঠিতে দ্বিধাবোধ করিতেছিলাম, কিন্তু অবস্থাটা সম্যক্ অবধারণ করিয়া কল্যাণের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে হৃষ্ট চিত্তে আসন গ্রহণ করিলাম। নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হইল। বম্বেতে আর কেহ টিকিট চাহিতে আসিল না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

নিবেদন

কোরোনা জীবন মম দীর্ঘিকার মত,
চিররুদ্ধ, কাজ নাই মরালে কমলে ;
নদীসম ছুটিবারে দাও অবিরত
সিন্ধু পানে ক্লান্ত শ্রান্ত ব্যথিত উপলে।
পাথরের ফুলসম অমর অক্ষয়
করিয়া রেখোনা মোরে প্রদর্শনী-গেহে,
কোরো মোরে বনফুল মধুগন্ধময়,
ঝরিগো নিভৃতে, ফুটি' নীহারের স্নেহে।

শ্রীকালিদাস রায়।

বাঙ্গালা শব্দের ড় *

বহু বাঙ্গালা শব্দে ড় আছে। ওড়িয়া ও হিন্দী ভাষার শব্দেও আছে। এই সব ভাষা সংস্কৃত ভাষার রূপান্তর। কিন্তু সংস্কৃত শব্দে ড় পাই না। মরাঠী ভাষাও সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। তাহাতেও ড় নাই।

* গৌহাটী সাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত।

সংস্কৃত বর্ণমালায় ট ঠ ড ঢ ণ। বাঙ্গালা বর্ণমালায় ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ। ট-বর্গে পাঁচ বর্ণ স্থানে সাতটা বর্ণ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যঞ্জন বর্ণের শেষে ড় ঢ় য় এই তিন বর্ণ বসাইয়াছিলেন। গ্রামে পাঠশালায় শৈশবে আমরা এই তিন বর্ণ শিখি নাই। ওড়িয়া পাঠশালাতেও অদ্যাপি শেখান হয় না। তখন জানিতাম ক হইতে হ্ক্ষ ব্যঞ্জন বর্ণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় ড় ঢ় য় বর্ণত্রয়কে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়াছিলেন। পাঠশালার গুরুমশায় এই তিন বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না।

শুধু এই তিন বর্ণের দশা হেয় ছিল না। গুরুমশায় শিখাইতেন হ্ক্ষ, বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ক্ষ একটা স্বতন্ত্র বর্ণ কি না, কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে বিচার হইয়া গিয়াছে। ডিগ্রি-ডিস্‌মিস কোন্ পক্ষ পাইয়াছেন, তাহা স্মরণ হইতেছে না। ক্ষ বর্ণের ভাগ্য বরং ভাল, বিচারে উঠিয়াছিল। জ্ঞ ঙ্ক হ্ন—এই তিন অক্ষরের ভাগ্য মন্দ। কেহ জিজ্ঞাসে না, এই তিন অক্ষর ব্যঞ্জনাক্ষরের পঙ্‌ক্তিতে বসিবে কি না। মরাঠী জ্ঞ অক্ষরের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ক্ষ অক্ষরের পরে জ্ঞ অক্ষরের স্থান করিয়াছেন। কারণ, জ্ঞ অক্ষরের ধ্বনি মরাঠীতে জ্‌ঞ না থাকিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে। আমরা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি সংস্কৃত ভাষার ধ্বনির মতন আছে, এবং বাঙ্গালা ভাষা আর কিছু নয় সংস্কৃত ভাষার যৎকিঞ্চিৎ রূপান্তর। বঙ্গীয় পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ দেখিয়া ক্ষ বর্ণের ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে বসিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় ক্ষ অক্ষরের উচ্চারণ খিঅ বা খেঅ। এই হেতু সং ক্ষুধা বাঙ্গালায় হইয়াছে খিউধা—খিধা, সং ক্ষমা বাঙ্গালা উচ্চারণে খেমা, সং ক্ষণে—খেনে, ইত্যাদি।*

মানুষ অল্প-জ্ঞান, অল্প-ধৈর্য্য। নিজের সুবিধা মতন শৃঙ্খলা না পাইলে অতিচার, ব্যভিচার-আদি নিজের রচিত শব্দের অন্তরালে আশ্রয় লইতে চায়। বিধাতা বিধিবাহ্য কিছুই করেন না। তিনি তাঁহার সংসারে প্লুতগতির স্থান রাখেন নাই, সৃষ্টিরূপ উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশ্য

* অল্পদিনের মধ্যে ক্ষ-অক্ষরের উচ্চারণ খ হইতে আরম্ভ করিয়াছে অপর অক্ষরেরও উচ্চারণবিকার ঘটিতেছে।

করিয়াছেন। এই গূঢ়তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া লোকে দিশাহারা হইয়া পড়ে। তাহারা একটী একটী গণিয়া সংসার অংশাংশি করিয়া লইতে চায়, ক্রমশঃ কত হইয়াছে, কত হইবে, তাহা কল্পনা করিতে পারে না।

বাঙ্গালা শব্দের ড় ঢ় এইরূপ ক্রমশঃ প্রকাশিত বর্ণ। য় স্থানে য (উচ্চারণ জ) পরে আসিয়াছে। জ্ঞ ষ্ণ হ্য অক্ষরের সংস্কৃত বিধি-বাহ্য উচ্চারণ হঠাৎ আসে নাই।

ট-ধ্বনির সহিত হ মিশিলে ঠ-ধ্বনি হয়, ড-ধ্বনির সহিত হ মিশিলে ঢ-ধ্বনি হয়। ড় ধ্বনিতে ল আছে, যেন উহা লড়। বঙ্গের বহুলোকে ড় ধ্বনি শোনে র। এইহেতু ড় স্থানে র, এবং র স্থানে ড় প্রয়োগ করে। কানে প্রভেদ না পাওয়াতে জিহ্বা সে প্রভেদ প্রকাশ করিতে পারে না। কেহ কেহ ড় র ধ্বনির প্রভেদ বুঝিতে পারে, কিন্তু জিহ্বা সে প্রভেদ ব্যক্ত করিতে পারে না। এই হেতু লিখিবার সময় ড় আসে, বলিবার সময় আসে না। গীতজ্ঞ জানেন প্রথমে সুরের সূক্ষ্ম প্রভেদ শুনিতে শিখিতে হয়, তার পর কণ্ঠের ক্ষমতা আনিতে হয়। কাহার পক্ষে কান দুর্বল, কাহার পক্ষে কণ্ঠ দুর্বল, তাহার নিরূপণ দুঃসাধ্য। অনুমান হয়, অধিকাংশের পক্ষে কান দুবল। লোকে কালা হইলে বোবা হয়, কিন্তু বোবা হইলেই কালা হয় না। চোখে প্রভেদ দেখিতে না পারিলে চিত্রকর সে প্রভেদ চিত্রে দেখাইতে পারে না।

আমরা ন ও ণকার এক করিয়াছি। হিন্দীভাষীও করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণভারতের পূর্ব প্রান্তে ওড়িয়া, পশ্চিম প্রান্তে মরাঠী হইতে কুমারিকা পর্যন্ত দেশের ভাষায় ন ও ণকারের প্রভেদ আছে। বাঙ্গালীর উচ্চারিত ণকারের সহিত ড় মিশিলে যেমন ড়ঁ মতন শোনায়, দাক্ষিণাত্যবাসীর মুখে তেমন শুনি। একটু সূক্ষ্ম ভেদ আছে তাহাতে ণ কোমল হয়। তেলুগু ণ্ড উচ্চারণ করে যেন ণি (ড়িঁ)। বোধ হয়, সহস্র বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী ণ উচ্চারণ করিতে পারিত। বোধ হয়, ফারসী ভাষার প্রভাবে ণ উচ্চারণ বিস্মৃত হইয়াছে। রাজ্ঞী স্থানে যে রা-ণী হইয়াছে, তাহার কারণ পূর্বকালে ছিল, এখন নাই। সেই পূর্বকালের কারণে আমরা বিষ্ণু শব্দ উচ্চারণ করি বিষ্টু। নব্যযুবকেরা করিতেছে বিষ্‌ন। হিন্দীভাষী করে বিস্‌নু। বিষনু, বিস্‌নু যে ভুল উচ্চারণ, তাহা স্মরণ করে না। বিষ্‌নু অপেক্ষা বিষ্টুঁ যে অনেক ভাল, অর্থাৎ পূর্বকালের উচ্চারণের নিকটবর্তী, তাহা ভুলিয়া যাইতেছে। বিষ্টুঁ অপেক্ষা বিষ্ড়ুঁ আরও নিকটবর্তী। (অবশ্য ষ কোমল, ষ কর্কশ)।

আর এক ধ্বনি আছে, তাহাতে না ল, না ড়, অথচ দুইই আছে। ড় ণ অপেক্ষা এই ধ্বনি বাঙ্গালীর মুখে দুরুচ্চার্য। বাঙ্গালা ভাষা হইতে এই ধ্বনি লুপ্ত হইয়াছে, হিন্দী ভাষা হইতেও হইয়াছে। এবিষয়েও ওড়িশা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত সমস্ত দক্ষিণাপথ পৃথক হইয়াছে। ধ্বনি গিয়াছে, বাঙ্গালা হিন্দী হইতে এই বর্ণ-জ্ঞাপনের অক্ষর পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। ধ্বনি গেলে ধ্বনি-প্রকাশের দ্যোতক বা অক্ষর অনাবশ্যক হয়। (বাঙ্গালা হিন্দীতে য অক্ষর অনাবশ্যক হইয়াও আছে। ইহার কারণ, এই এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দের লিখনে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ)।

প্রায় একশত বৎসর পূবে প্রবোধচন্দ্রিকা-কর্তা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লিখিয়াছিলেন, "বর্ণ শব্দে স্বর, হল্. বিসর্গ ও অনুস্বারকে কহে। অকারাদি ষোড়শ বর্ণকে স্বর শব্দে কহে। ককারাদি ক্ষকারান্ত চতুস্ত্রিংশদ্‌বর্ণকে হল্ ও ব্যঞ্জন ও হস্ শব্দে কহে। এ সমুদায়ে বর্ণ পঞ্চাশৎ। হ-কারের পর ক্ষ-কারের পূর্বে আর এক লকার হয়, এমতে অক্ষর সমুদায় এক-পঞ্চাশৎ। অকারাদি ষোড়শ স্বরের মধ্যে অকারাদি ঔকার পর্যন্ত যে চতুর্দ্দশ বর্ণ, সেই স্বর। অং অঃ এই দুই বর্ণ অনুস্বার ও বিসর্গ। এ দুয়ের যে নামান্তর যথাক্রমে বিন্দু ও বিসর্জনীয়। * * অনুস্বার-বিসর্গ স্বাতন্ত্র্যে থাকিতে পারে না। অতএব এই দুই অক্ষর স্বরধর্ম্মী। বর্ণ পাঠেতে এই দুই বর্ণের অকার সহিত পাঠের বীজ এই।" এই গণনা হইতে জানিতেছি, একশত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ড় ঢ় য়ঁ বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। য র ল ব শ ষ স হ ল ক্ষ এই শেষের ল ক্ষ তখনও পণ্ডিতগণ দ্বারা স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণ্য হইতেছিল।

হ ল ক্ষ এই ল বাস্তবিক লকার নহে। বাঙ্গালা ছাপাখানায় এই অক্ষর নাই। বঙ্গদেশের ও আর্যাবর্তের

নাগরী অক্ষর-মালার মধ্যেও এই ল় অক্ষর নাই। ওড়িয়া তেলুগু মরাঠী প্রভৃতি ভাষার অক্ষরে এই ল় আছে। এই ল় এর মূর্তিতে ল ড, এই দুই অক্ষরের মূর্তি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই ল় কে লড বলা যাউক। ফল, জল, বালক, গোপাল প্রভৃতি শব্দের ল ওড়িয়াতে লড; মরাঠীতে ফল শব্দে লড, জল শব্দে ল, বালক ও গোপাল শব্দে বিকল্পে ল ও লড হয়।

ডকারের সদৃশ ধ্বনি বা বর্ণ তবে এই,—ড ড় ণ লড র ল। বাঙ্গালায় ড ড় র ল, এই চারি বর্ণ আছে। হিন্দীতেও তাই। মরাঠীতে ড ণ লড র ল, এই পাঁচ; ওড়িয়াতে ড ড় ণ লড র ল, এই ছয় আছে। আসামীতে ড় নাই বলিলে বলা যায়। তাহাতে ড র ল, এই তিন বর্ণ আছে।

এক এক জাতি এক এক বর্ণের সূক্ষ্ম ভেদ করিয়া নানা বর্ণের উৎপত্তি করিয়াছে। ফারসী ও আরবী একত্রে ধরিলে অ দুই রকম, ক দুই রকম, গ দুই রকম, স জ চারি চারি রকম আছে। উর্দুতে আরবী ও ফারসী শব্দ আছে। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ যেমন বিকৃত হইয়াছে, বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট উর্দু শব্দের উচ্চারণ তেমন হইয়াছে। কর্ণের আংশিক বধিরতা ও বাগ্‌যন্ত্রের শিথিলতা ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচ্য নহে। ফল কি হইয়াছে, তাহা আলোচ্য।

ভাষা চেষ্টা করিয়া লিখিতে হয়, মাতৃভাষাও শিখিতে হয়, আপনা-আপনি শেখা হয় না। পাঠশালার গুরুমশায় ক খ শিখাইবার সময় শিষ্যকে বর্ণের ধ্বনি অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া শিখাইলে উচ্চারণ বিকৃত হয় না। গুরুমশায়ের অমনোযোগিতায় বাঙ্গালী বালক-বালিকা গুরবর্ণ উচ্চারণ ভুলিয়া যাইতেছে। সং হস্ত হস্তী বাং হাথ হাথী গত দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে হাত হাতী হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ, সং কুঠার বাং কুঢ়ার, কুঢ়ালি; সং ঘট ধাতু বাং গঢ় ধাতু, সং বেষ্ট ধাতু বাং বেঢ় ধাতু; সং পঠ ধাতু বাং পঢ় ধাতু ছিল।

বেদের সংস্কৃতে ড় নাই, আছে ড লড র ল ণ। তারপর ভারতের এক স্থানে লড রহিয়া গিয়াছে, অন্য স্থানে লড স্থানে ড় আছে, অপর স্থানে ড় আছে লড ও আছে। বিবর্তনে এইরূপ হয়। ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ অগ্নি-মীলে পুরোহিতং, কোথাও মীলে, কোথাও মীড়ে, কোথাও মীলেড আছে। কিন্তু কোথায় সেই লড, আর কোথায় ড়! ড় কর্কশ, লড কোমল; ন কর্কশ ণ কোমল।

প্রাচীন লড স্থানে ড়, এই অনুমান ঠিক বোধ হইতেছে। কিন্তু সব শব্দের লড স্থানে ড় আসে নাই। কোথাও কোথাও ল আসিয়াছে। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও লড স্থানে ড় অনুমান করেন। তিনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লঢ় পাইয়া অনুমান করেন, বর্তমান ঢ়কারের মূল সেই লঢ়। সংস্কৃত ব্যাকরণে একটা সূত্র আছে, তাহাতে ড ল অভেদ বলা হইয়াছে। কিন্তু কোথায় ড, আর কোথায় ল মনে হয়। বস্তুতঃ মাঝে লড স্মরণ করিলে সূত্রে অস্বাভাবিক কিছু থাকে না। জল ও জড় শব্দের সং ধাতু এক। উভয় শব্দের অর্থ এক, সলিল ও শীতল। ওড়িয়াতে জল শব্দে লড, মরাঠীতে ল অর্থাৎ ওড়িয়াতে জলড সলিল, মরাঠীতে জল—সলিল। ওড়িয়াতে জড় - শীতল, মরাঠীতে জড—শীতল। ওড়িয়াতে জড় স্থানে জড লেখা ও বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক ওড়িয়াতে ড় অক্ষর নূতন নির্মিত হইয়াছে।

ড় কিংবা লড, শব্দের আদিতে বসে না, ঢ় য় বর্ণও বসে না। অন্য ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলেও বসে না। জড় কিন্তু জাড্য, দৃঢ় কিন্তু দার্ঢ্য, শয় কিন্তু শয্যা। ওড়িয়া ভাষায় লড প্রয়োগের সূত্র পাইলে বাঙ্গালা ভাষায় ড় প্রয়োগের সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। ওড়িয়া ভাষায় সূত্র এই, লড শব্দের আদিতে হয় না, সংযুক্ত ব্যঞ্জনেও হয় না। সংস্কৃত শব্দে এবং সংস্কৃত হইতে অপভ্রষ্ট শব্দেও প্রায় এই রূপ। এমন কি, ইংরেজী রেল (গাড়ী) ওড়িয়াতে রেলড হইয়াছে। ওড়িয়াতে চপলড (চপল), কিন্তু চাপল্য। সংস্কৃতে যে শব্দে সংযুক্ত ল, ওড়িয়া ভাষায় সে শব্দের সংক্ষেপে ল থাকে, লড হয় না। সং মল্লিকা হইতে ওং মলি, সং বিল্ব হইতে ওং বেল। ক্রিয়াপদের ল বর্ণও লড হয় না। সং কৃত—বাং করিল, ওং কলা; সং গত—বাং গেল, ওং গলা।

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ওড়িয়া শব্দের ড ড় লড হইতে স্পষ্ট

বুঝা যায় যে উচ্চারণ-সৌকর্য ড় ও লড় বর্ণের উৎপত্তির কারণ। সলিল্ ওড়িয়াতে সলিল্ড, যেন পরে পরে দুই ল উচ্চারণ কঠিন। এইরূপ, শরীর গ্রাম্য বাঙ্গালাতে শরাল শুনিতে পাই। অড়র (কলাই), কেহ কেহ বলে অড়ল (কলাই) ; কারণ তাহারা ড় ও র্ প্রভেদ প্রায় করিতে পারে না। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বের চৈতন্যমঙ্গলে আছে,

রঘুরাম ভাব দেখিঞা চন্দ্রচূড়।
মুরারি গুপ্তের দেখ দীঘল লাঙ্গুল॥

এখানে ড় ল এক বোধ হইয়াছিল।

বাঙ্গালাতে কেহ কেহ ড় র্ প্রয়োগে ভুল করেন। কোথায় ড় আর কোথায় র্, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতেছে।

(১) অসংযুক্ত ও অনাদিভূত ডকার ড় হয়। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, উভয়বিধ শব্দে এই এক সূত্র। উপরে উদাহরণ পাইয়াছি। অন্য উদাহরণ, খড় গুড় ক্রোড় চূড়া লগুড় তড়াগ গরুড় দ্রাবিড় বড়বা। কিন্তু মার্ত্তণ্ড বিতণ্ডা ভাণ্ড ; ডোর ডাকিনী ডমরু ডিম্ব।

(২) সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশে বাঙ্গালা শব্দে ড় আসিয়াছে। টবর্গের বর্ণ হইতে অধিক আসিয়াছে। ট স্থানে, যথা, কর্পট কাপড়, ঝাট ঝাড়, চিপিট--চিড়া ; ঠ স্থানে, যথা, কুষ্ঠ কুড় (ঔষধ), কনিষ্ঠ—কড়িয়া, কড়ি (আঁগুল), কুঠার—কুড়াল ; ড স্থানে, যথা, দণ্ড—দাঁড়, কুণ্ডী—কুঁড়ী, কুষ্মাণ্ড কুমড়া ; ঢ় স্থানে, যথা, দংষ্ট্রা--দাঢ়া—দাড়া, দৃঢ়—দড়, সং পঠ পঢ়—পড়, সং কটাহ--কঢ়াই—কড়াই ; ণ স্থানে, যথা, তীক্ষ্ণ—তোখড়, রণ—রড় লড়, শ্রেণী শিঁড়ী। টবর্গের বর্ণের মধ্যে ট স্থানে ড় অধিক আসিয়াছে, অন্য অসংযুক্ত বর্ণ হইতে অল্প।

(৩) তবর্গের দুই একটা বর্ণ স্থানে ড় আসিয়াছে। ত স্থানে যথা, আবৃত্তি—আওড়া, পতিত -পড়া, ধাত্রী—ধাড়ী। র্ধ স্থানে, যথা, অর্ধ আড় (আড় পাগলা), সার্ধ—সাড়ে, বর্ধকী—বাড়ই। ন স্থানে, যথা, রাজন্য—রাজড়া, চর্মন্ চামড়া। দ স্থানে ড, যথা, দাড়িম্ব—ডালিম, দর—ডর, দণ্ড—দাঁড় (পাখীর)।

(৪) সংস্কৃত শব্দের র্ ল স্থানে ড় আসিয়াছে। যথা, অপ—সৃ ধাতু হইতে অপসারি—আছাড়ি ; দ্রু ধাতু হইতে দউড় বা দৌড় ; মরক মড়ক ; মারবালী—মাড়োয়ারী ; আলি আড়ি, আইড় ; সং ফাল ধাতু—ফাড়া ; চর, চল চড়া।

(৫) বাঙ্গালায় ড়া, আড়, আড়া প্রত্যয় আছে। এইসকল প্রত্যয়ের মূল নির্ণয় এখানে নিষ্প্রয়োজন। সাদৃশ্য, সম্বন্ধ, কর্তৃত্ব, প্রভৃতি অর্থে এই সব প্রত্যয় হয়। চাম চামড়া, আঁত আঁতড়ী, পা পাতড়া, লাঠী-আড়া, খেলআড়, ইত্যাদি বহু শব্দ আছে। রা রী প্রত্যয়ও এইরূপ। যেমন, কাঠরা, কাঠরিয়া, ঝুপরী, মুহরী (মুখ+রী), ইত্যাদি।

র্ কি ড়, ইহা নিরূপণের একটা সামান্য সঙ্কেত এই, যে সংস্কৃত শব্দে র্ কিংবা ড় আছে, বাঙ্গালাতেও সে শব্দে সেই বর্ণ থাকে। সংস্কৃত হইতে আগত কিংবা বিকৃত না হইলে ড় আসে না ; নদীর পারে যাওয়া—পার সং ; নদীতে পাড়ি দেওয়া—সং পালি হইতে বাং পাড়ি ; নদীর পাড়--পাহাড় (সং পর্বত, পাষাণ, কিংবা পাটক) হইতে, অর্থ তীরভূমি। ছেলেবেলাকার একটা ঠকানিয়া কথা আছে, গড়ের মাঠে ঘোড়ার গাড়ী গড়্‌গড়ায়া যায়—এখানে গড় সং ; ঘোড়া সং ঘোটক ; গাড়ী সং গন্ত্রী ; গড়গড়ায়া--ঘর্ঘর শব্দ করিয়া, সং ঘৃ ধাতু হইতে ঘড়্‌-ঘড়ায়া গড়্‌গড়ায়া।

আরবী ফারসী ইংরেজী শব্দের ড র্ ল স্থানে বাঙ্গালায় ড র্ ল থাকে, ড় হয় না। (সং ঘর্ম), ফারসী গরম বাঙ্গালায় গরম ; গড়ম হয় নাই। এই রূপ, জোর, জবর প্রভৃতি শব্দের র্ বাঙ্গালাতেও র্।

কটক। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

আমার চীন-প্রবাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চীনদেশে বড় বড় শহরের রাস্তায় বাহির হইলে ভিখারীর দল আসিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কেহ সম্মুখে কো-টৌ (ভূমিতে অবনত হইয়া প্রণাম) করিতে থাকে,

কেহ রাস্তার ধূলা চাটিয়া লয়। কেহ বলে তিন দিন হইতে আমার চাউ-চাউ (খাদ্য) মেলে নাই; আমাকে অনুগ্রহ করিয়া কিছু খাইতে দিয়া প্রাণ রক্ষা করুন, ইত্যাদি। তাহাদের বিশ্বাস পথিককে যত শীঘ্র উত্যক্ত করিতে পারিবে তত শীঘ্র তাহাদের কিছু প্রাপ্তি ঘটিবে। কার্য্যতও ঘটে তাই। সকলেই কিছু না কিছু দিয়া তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন।

চীনের ভিক্ষুকদিগকে টাউ-ফান-টি বলে, ইহার অর্থ যাহারা লোকের নিকট চাউল ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ফান অর্থে চাউল। ইহা হইতে সাধারণ অভিবাদনের নাম চি-ফান হইয়াছে, ইহার অর্থ আপনি ভাত খাইয়াছেন ত, ভাবার্থ আপনি ভাল আছেন ত? চিন চিন কথাও ইহারই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়।

চীন ছুতার মিস্ত্রিরা সাধারণতঃ সাড়ে সাতটায় কাজ আরম্ভ করে। সকাল সাতটায় তাহারা একবার প্রাতরাশ সমাপন করিয়া লইয়া তামাকু সেবন করে। বারটা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া মাধ্যাহ্নিক ভোজনে প্রবৃত্ত হয়, এই সময় তাহাদের এক ঘণ্টার ছুটি। আহারান্তে তামাক খাওয়া একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। পুনরায় সুরু করিয়া সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত কাজ করে। গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে আর একবার আহার সমাধা করিয়া লয় এবং মনের আনন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাতে দৈনিক শ্রমের কোন কষ্ট তাহারা অনুভব করে বলিয়া বোধ হয় না। হাসি মুখে কাজে লাগে। হাসি মুখে ঘরে ফিরিয়া যায়। কণ্ট্রাকটর মজুরদিগকে সপ্তাহদ্বয় অন্তর শূকরমাংস এবং রুটি দিয়া থাকে। প্রতি পঞ্চম দিবসে তামাকু সেবনের জন্য মজুরেরা কিছু বখসিস পায়, তাহাকে 'কামশান' বলে। সাধারণ অস্ত্রপাতি মিস্ত্রিরা নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া লইয়া কাজে যায়। বিশেষ কোন অস্ত্রের প্রয়োজন হইলে ঠিকাদার যোগাইয়া থাকে। মজুরেরা যে সময় কাজ করে তখন খুব মন দিয়াই করে এবং কাজও খুব ভাল হয়। তাহাদের পেছনে একজনকে লাগিয়া থাকিতে হয় না। কিম্বা কর্ম্মদাতাকে নিজে বিরক্ত হইয়া মজুরদিগকেও উত্যক্ত করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত বলা যাইতে পারে। যে সময়টুকু কাজ করে শ্রমজীবিদল তাহার অধিকাংশ সময় গল্প করিয়া এবং তামাক খাইয়া কাটায় এবং অবশিষ্ট সময়টুকু কোন মতে রোজসহি করিয়া শুষ্ক মুখে ঘরে ফিরিয়া যায়।

চীনে মিস্ত্রীর খাদ্য প্রধানতঃ ভাত। যখন তাহারা মণ্ডলী করিয়া ভাত খাইতে বসে, একটী ঝুড়িতে করিয়া ভাত মধ্যস্থলে রাখা হয় এবং একটী পাত্রে ভাতের মাড় রক্ষিত হয়। প্রত্যেকে বাটি পূরিয়া ভাত লইয়া তাহার সহিত মাড় মিশাইয়া খাইতে থাকে। তাহাদের খাইবার অন্য উপকরণ শাক সব্জী ও লোনা মাছ। শাক সব্জী চাটনির মত করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রত্যেক উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন বাটিতে রক্ষিত হয়। ঐগুলি তাহারা কাঠি দ্বারা একএকবার একএকটী পাত্র হইতে গ্রহণ করে। মজুরী বেশ সস্তা, পাঁচ ছয় আনার বেশি নয়।

বৃষ্টি বাদলার দিনে চীনের মজুরেরা মোটেই কাজ করে না। তাহার কারণ এক পক্ষে বৃষ্টিতে তাহাদের কাপড় চোপড় ভিজিয়া নষ্ট হইতে পারে এবং ভিজে কাপড়ে থাকিলে বাতে ধরাও সম্ভব। আবার, যে কাজ করাইবে সে মনে করে বৃষ্টিতে সুচারুরূপে কাজ হইবে না কেবল বৃথা মজুরী যাইবে; জিনিষপত্রগুলিও ভিজিয়া নষ্ট হইতে পারে। বাহিরের কাজেই অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থা।

বড় বড় কাজে চীনে মজুরদিগকে সন্ধ্যাকালে পরদিনের জন্য একখানি করিয়া টিকিট দেওয়া হয়। পরদিন সে সেইখানি দেখাইয়া কাজে লাগিতে পারে। ঐরূপ টিকিট না থাকিলে কাহাকেও কাজ করিতে দেওয়া হয় না। বৈকালে কার্য্যাবসানে ঐ টিকিটগুলি সংগ্রহ করিলেই জানিতে পারা যায় কত লোক কাজ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পিকিনের রাস্তার উভয় পার্শ্ব দোকান পসারে পরিপূর্ণ। চীন শহরের এবং তাতার শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে দোকানপসার প্রায়ই এক রকমের। চীন শহরের পূর্ব্বদিকের রাস্তায় শাক সব্জী, মাছ এবং গৃহপালিত পশু ও পাখী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়া থাকে। শাক সব্জীর মধ্যে গাজর, বাঁধা কপি, পেঁয়াজ, গোল আলু, শিম, শালগম,

সরাইখানার অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে।

(শ্রীযুক্ত হ্যাভেল সাহেবের Indian Sculpture and Painting নামক পুস্তক হইতে)।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

শুটি, একপ্রকার আলু (Yam) এবং ভিন্ন ভিন্ন শাক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শীতকালে ঐগুলি সুন্দর ভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে। গোল আলুর চীনে নাম সাংউ। মঙ্গোলীয় আলু খুব বড় হইয়া থাকে। নানাবিধ সমুদ্রের মাছ বাজারে দেখিয়াছি কিন্তু সে রকম মাছ আমাদের দেশে দেখি নাই বলিয়া নামোল্লেখে ক্ষান্ত থাকিলাম।

চীনে একপ্রকার খেলা দেখিয়াছি তাহা এইরূপ।—ছোট একটুকরা কোনরকম ধাতু চামড়া দিয়া মুড়িয়া তাহার সহিত কতকগুলি পালক সংযুক্ত করিয়া লওয়া হয়। তিন চার জন চীনে পা দিয়া শূন্যে শূন্যে একে অন্যের নিকট উহা ফেলিতে থাকে। এমন নিপুণতা ও ক্ষিপ্রতা সহকারে খেলিতে থাকে যে ক্রীড়নক মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে পারে না।

চীনেরা মনে করে অপর সকল জাতি অপেক্ষা তাহারা দীর্ঘায়ু। কারণ তাহারা অপরাপর জাতির ন্যায় কোন বিষয়েই সহজে উত্তেজিত হয় না। যে কোন জটিল বিষয়ও তাহারা সহজভাবে গ্রহণ করে। উহারা মনে করে উদ্বেগ ও অশান্তি স্বল্পায়ু হইবার একমাত্র কারণ।

চীনে ভদ্রলোকের গ্রীষ্মকালের পোষাক নানা বর্ণের রেশমে নির্ম্মিত। হাতে একখানি উন্মুক্ত পাখা, যখন ব্যবহৃত না হয় একটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত খাপের মধ্যে রাখিয়া কটিবন্ধে ঝুলাইয়া রাখা হয়। এক দিকে নস্যের কৌটা এবং ঘড়ী দোদুল্যমান। খাইবার কাঠি, টাকার থলি এবং চাবির থলি আর একদিকে ঝুলান। চশমা ব্যবহার থাকিলে উহার খাপও ঐ সঙ্গে ঝুলিতে থাকে। টুকটাক জিনিষ সঙ্গে লইতে হইলে যাহা পকেটে ধরে আমরা তৎসমুদয়ই পকেটে রাখি কিন্তু চীনেরা সকলগুলি ভিন্ন ভিন্ন থলির মধ্যে রাখিয়া বাহিরে ঝুলাইয়া দেয়। ইহার এই উদ্দেশ্য যে ভদ্রলোকের কত রকম খুঁটিনাটি জিনিষের দরকার সাধারণে দেখিয়া তাহা ধারণা করিতে পারিবে। আমাদের দেশে অনেক ভদ্র মুসলমানও রুমাল পকেটে রাখিয়া তাহার কতকাংশ বাহিরে ঝুলাইয়া রাখেন, তাহাও দেখাইবার উদ্দেশ্যে কি না জানি না। আজকাল আমাদের মধ্যেও আর একটী নূতন ভাব বা ফ্যাসান প্রবেশ লাভ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে যতগুলি জামা গায়ে দিবে, সবগুলিরই কিছু না কিছু বাহিরে থাকার প্রয়োজন। এইরূপ রীতি জাপানের মধ্যযুগে জাপানে প্রচলিত হইয়াছিল।

চীনদেশে কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকট কেহ বেনামী চিঠি লিখিলে লেখকের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। চিঠির লিখিত বিষয়ের কোন প্রতিকার করা হয় না।

এইরূপ শুনিলাম পিকিনে কোন বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া তৈয়ারী করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। জীর্ণসংস্কার যতবার ইচ্ছা করিতে পারা যায়। কিন্তু একেবারে ভূমিসাৎ না হইলে পুনর্গঠন করিতে চেষ্টা করিলে আইনতঃ দণ্ডিত হইতে হয়।

এক কথা পুনঃপুন বলা চীনেদের ভারি অভ্যাস, একজন কোন কথা বুঝাইয়া বলিলে অপরে সেই কথা পুনরুল্লেখ করিবেই করিবে।

চীনের কং এক রকমারি শয্যা। গৃহের এক প্রান্তে চত্বর সদৃশ খানিকটা স্থান বাঁধাইয়া লওয়া হয়। ইহার মধ্যে ইটের পাঁজার ন্যায় নালি থাকে, আবার ইহার এক কোণে একটী উনান পাতা থাকে। ইহার উপর শুইবার বিছানা এবং রন্ধনকার্য্য এক স্থানেই হইয়া থাকে। ইহার উপরিভাগ বেশ সমতল ও মসৃণ। এই চত্বরের পার্শ্বস্থ উনানে আগুন জ্বালিলে সমস্ত কক্ষটী গরম হইয়া উঠে। শীতকালে বিছানা বেশ গরম থাকিবে বলিয়াই এইরূপে প্রস্তুত করা হয়। অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ইহার উপর শুইলে বেশ আরাম বোধ হয়।

টেলিগ্রাফ চীনদেশে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত হয়। চীন টেলিগ্রাফের মধ্যে গোবি মরুভূমির উপর তিন সহস্র মাইল লম্বা তার উল্লেখযোগ্য।

চীনের আনহুইতে একটী টাঁকশাল আছে। হুপে, হুনান এবং উচাং প্রদেশের জন্য রাজপ্রতিনিধি একটী টাঁকশাল স্থাপিত করেন।

চীনদেশে তিনটী ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, যথা—কনফুসিয়াস, তাউ এবং বৌদ্ধ। তন্মধ্যে প্রথম দুইটী চীনের নিজস্ব এবং তৃতীয়টী বিদেশ হইতে আনীত। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কনফুসিয়াস ধর্ম্ম নীতিশাস্ত্র

এবং আচরণ শিক্ষা দিয়া থাকে। তাউধর্ম্ম আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। এই ধর্ম্মের স্থাপক লাওজ (Lao Tsz)। বৌদ্ধধর্ম্ম মনোবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকে। এরূপ কথিত আছে সম্রাট স্বপ্নে বৃহৎ স্বর্ণমূর্ত্তি দেখিয়া নূতন ধর্ম্মানুসন্ধানের নিমিত্ত ভারতবর্ষে পণ্ডিতদিগকে প্রেরণ করেন, তদনুযায়ী ৬১ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে আনীত এবং প্রচারিত হয়। কেহ কেহ বলেন উক্ত ধর্ম্ম তৎকালপূর্ব্ববর্ত্তী। এইরূপে চতুর্থ শতাব্দীতে চীনের দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ অধিবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। অধুনা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তর এবং দাক্ষিণ দুইটী প্রধান শাখায় বিভক্ত। চীন, নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান এবং কোচিন চায়না উত্তর শাখার অন্তর্গত; এবং সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং শ্যামদেশ দক্ষিণ শাখার অন্তর্গত। মুসলমান চীন অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ লক্ষ। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে এখানে মুসলমানধর্ম্ম প্রচারিত হয়। অধিকাংশ শহরেই মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টান অধিবাসীর সংখ্যা অল্প।

কনফুসিয়াস ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কুঙ-ফুসি বা কনফিউসিয়াস ৫৫০ পূঃ খৃঃ কিউ-ফাউ-হিয়েন জেলার লু নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এইস্থান সানটুং প্রদেশের সুবৃহৎ খালের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। তিনি বিখ্যাত পিথাগোরাসের সমসাময়িক। প্রথমাবস্থা হইতেই তিনি যৌবনের আমোদ প্রমোদে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, এবং গভীর চিন্তার বিষয় লইয়া কাল কাটাইতেন। নীতিবিজ্ঞান এবং রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা একজন রাজনীতিবিশারদ বিখ্যাত মন্ত্রী ছিলেন।

চীনদেশে ৪৭টী সন্ধিবন্দর আছে। বন্দরের নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থান বিদেশীয়দিগের বাসস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। বিদেশীয়েরা প্রধান প্রধান স্থানে আপনাদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। এইরূপ কনসেসন ক্যান্টনের মধ্যে সামিয়ানের কতক অংশ ফরাসীদিগের। টিনসিনে ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মান এবং জাপানী কনসেসন আছে। হানকাউতে জাপানী, জর্ম্মান, ইংরাজ, ফরাসী এবং রুষের গণ্ডি বা কনসেসন বিদ্যমান। নিউচোয়াংয়ে জাপানীরা একখণ্ড জমি কনসেসনের জন্য লইয়াছে। ব্রিটিশরাজও উক্ত অভিপ্রায়ে একটুকরা জমি লাভ করিয়াছে। জাপানীদিগের সাসি, হাংচাউ এবং সুচাউয়ে উপনিবেশ আছে। সাংঘাই ফরাসীদিগের প্রধান আড্ডা। এইসকল সন্ধিবন্দর ব্যতীত আরও অন্যান্য বন্দর কিম্বা স্থান বিদেশীয়দিগের হস্তে আছে কিম্বা তাহাদিগকে পাট্টা দেওয়া হইয়াছে। পোর্ট আর্থার রুসীয়দিগের আয়ত্তাধীন অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন বন্দর ছিল, এক্ষণে জাপানের করতলগত। কিয়াউ চাউ জর্ম্মানদিগের ক্ষমতার অধীন। ১৮৯৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর এই স্থান স্বাধীন বন্দর বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ম্যাকাউ পর্ত্তুগিজ উপনিবেশ, প্রায় তিনশত বৎসরের পুরাতন। ব্রিটিশ শাসনাধীন হংকং আকারে প্রায় দ্বিগুণ করা হইয়াছে। কোউচাউওয়ান এবং ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান ফরাসীরা ১৮৯৮ সালের ২রা এপ্রেল আয়ত্ত করে।

কোন বিদেশীয় ব্যক্তি সন্ধিবন্দরে পাচাদনে একশত লি বা প্রায় তেত্রিশ মাইল ভ্রমণ করিতে পারে। তদূর্দ্ধ ভ্রমণ করিতে হইলে তাহাদের নিজ নিজ কনসলের নিকট হইতে পাশ লইতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ রায়।

রেণু ও বিশ্ব

রেণু কহে—'ওহে বিশ্ব! শ্রেষ্ঠ তুমি—তব দৃশ্য
কি মহান! প্রশান্ত, সরল!
ক্ষুদ্র আমি—তুচ্ছ আমি, অসহায় দীন আমি
অর্থহীন, জনম বিফল!'
বিশ্ব কহে—'আর কেন, বৃথা লজ্জা দাও হেন,
সুবিশাল,—আমি ত অসার,
ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ আমি—ধন্য তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি
তোমাতেই আমিত্ব আমার!'

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

বঙ্গের পয়লা পৌষ

বৈশাখের প্রবাসীতে মাননীয় কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "ইরানে নওরোজ" গাথার শীর্ষে বলিয়াছেন —"আমাদের বাংলা দেশের গরীব ছেলেদের ঠিক এরূপ নিজস্ব কোন উৎসব নাই।" বাংলা দেশের গরীব ছেলেদের ঠিক নওরোজের মত একটি নিজস্ব উৎসব এখনো মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম "হোরবোল্" গাওয়া। তবে এখন দেশের সমস্ত উৎসবেই যে "মন্দা" পড়িয়া আসিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য।

পয়লা পৌষের প্রভাতে সদ্য ধনুরাশিস্থ সূর্য্য দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় পৌছিয়া নীহারকুহেলিকাজাল ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই গ্রামের পথে ও গৃহস্থের অঙ্গনে স্বর্ণদ্যুতি গাঁদাফুলে গ্রথিত মালো মণ্ডিত দীর্ঘ দীর্ঘ যষ্টিগুলি উত্তোলন করিয়া, এবং তাহাদের ছিন্ন মলিন গাত্রবস্ত্রের উপর এক এক ছড়া গাঁদাফুলের মালা দোলাইয়া বালকের দল কলকণ্ঠে সমস্বরে গাহিয়া উঠে "কালো তুলসী কালো তুলসী হোরবোল্!" যে নামে হিন্দুর জাতীয় একতাব মূলসূত্র বহু যুগ হইতে গ্রথিত সেই "হরিবোল"ই বোধহয় "হোরবোলে" রূপান্তরিত হইয়াছে। এ উৎসব কেবলমাত্র হিন্দুবালকদিগের নহে, এদেশের গরীব মুসলমান-বালকেরাও ঐ দিনে "হোরবোল্" গাহিতে বাহির হয়। তাহারা "হোরবোল" না বলিয়া "ভারবোল" বলে। "ভারবোল" শব্দের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু "হোরবোল" বা "ভারবোল" গাওয়ার শেষে উভয় দলই বলিয়া থাকে—

"হোরবোল গাইতে গাইতে গলা হ'ল ভারি,
মুসলমানে আল্লা বলে হিঁদু বলে হরি।"

বেলা দ্বিপ্রহর না হওয়া পর্য্যন্ত বালকেরা এইরূপে গ্রামস্থ সকলের নিকট পয়সা চাল ডাল তরকারী মিষ্ট প্রভৃতি আদায় করিয়া শেষে মাঠে নদীতীরে বা কোন বাগানের মধ্যে মহানন্দে "পোষলা" করিয়া থাকে।

আমাদের মাতা মাতামহীগণের মুখে "হোরবোল" গাওয়ার দু চার ছত্র যাহা আমরা শুনিতে পাই তাহাতে বুঝা যায় যে নওরোজী বালকদের মত সেকালেও "হোর-বোল"-গাওয়া বালকেরা স্বাধীন নিরঙ্কুশভাবে গৃহস্থগণকে যথেচ্ছ বলিয়া বেড়াইত। চৈত্রমাসে গাজন ও মাঘমাসে সরস্বতী পূজার "বোলানের" পরিশিষ্টে যেমন গ্রামবাসী কাহারো দুর্ব্যবহার বা গ্রামের উপস্থিত কোন আন্দোলন লইয়া গায়কেরা শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ছড়া গাহিতে থাকে (অন্য কোন জেলায় আছে কিনা জানিনা কিন্তু উপরোক্ত দুই জেলায় শুনিতে পাওয়া যায়) তেমনি এই বালকদলের মুখ দিয়া গ্রাম্য উপস্থিত কবি সেদিন গ্রামের অপরাধীদিগকে বিলক্ষণ সাজা দিত; সে মানহানির কোন "নালিশ ফরিদ" ছিলনা, উপরন্ত হাসিমুখে তাহাদের মিষ্টান্ন বা চাউলাদি দিতে হইত। প্রমাণ স্বরূপ কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"এক ঠগ দুই ঠগ্ তিন ঠগের মেলা,
ঠগের গুরু অমুক মোড়ল অমুক তার চালা।
ওপারেতে কদম গাছে ঝরো ঝরো ফুল,
অমুক ঠা'র পূজো করে আগা গোড়াই ভুল।"

কে কবে মাতাকে অন্ন না দিয়া এবং সংসার না করিয়া কুস্থানে বাবুগিরিতে কাটাইয়াছিল তাহার উদ্দেশে গ্রাম্য-কবি ছড়া বাঁধিয়াছিল—

"যার জননী ছেঁড়া কানি পরে' ব্যাভার করে,
তার বেটার পরণে টিপের ধুতি "বাবু" হ'য়ে ফেরে!
যার জননী শুশুনির শাক গালুনো রেধে খায়,
তার বেটার পায়ে সাপাটি জুতো "বাবু" হ'য়ে যায়।
যার জননী অগ্নি জ্বেলে শীতের বেলা কাটে,
তার বেটার গায়ে শালের জোড়া দ্বময় ছাপোর খাটে।
"বাবু" হ'তে জানত যদি, করত যদি বিয়ে,
পুত্র হ'য়ে করত ত্রাণ গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে।"

একজন মহা পাপিষ্ঠার পাপ নিম্নলিখিত ছড়ায় প্রকাশ—

"দুশ্চারিণী যে রমণী তার কর্ম্মফলে,
সোনার জাদু গিরিবালা ভাসছে বিলের জলে।
ননদ ভাজে কোঁদল করে তিন বছরে ছেলে,
মায়ের কোল্ শূন্য করে যমের কোলে দিলে।
মানুষের বিচার হয়না দণ্ড পায়নি সাজা ঢের,
সদর হ'তে তলব এলে তখন পাবে টের!"

"হোরবোল" গাওয়া বালকেরা প্রথমতঃ কৃষ্ণের নানাভাবের বাল্যলীলার গীতই গাহিত, কেননা তখন দেশে "কানু ছাড়া গীত" ছিলনা। সে সব ছড়ায়ও গ্রাম্য কবিদের বিশেষ গুণপনা প্রকাশ পাইত। তাহারা কেহ কেহ হয়ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর কৃষক মাত্র। এখন সেসব নিরক্ষর কৃষক কবি বা অতি অল্প শিক্ষিত গ্রাম্য কবি কেন যে দিনে দিনে দেশ হইতে লুপ্ত হইতেছে, তাই মনে হয়! তাহাদের উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত দুরবস্থা এবং সাধারণের

ঔদাসীন্যই বোধ হয় ইহার কারণ। যাঁহারা এখনকার দিনের শিক্ষিত ও ভদ্রলোক তাঁহারা তাহাদের সে অশিক্ষিতপটুত্বের কোন মর্য্যাদাই রাখেন নাই তাই দিনে দিনে তাহারা এমন করিয়া নীরব হইয়া গেল। তাই এখনকার "হোরবোল"-গায়ক বালকের দল পূর্ব্বের ন্যায় পুষ্ট নয় এবং দলের সংখ্যাও কম! ইহার কারণ ইহা নয় যে দেশের দারিদ্র্য কমিয়াছে, বরং তাহার শতগুণ বৃদ্ধিই;—গৃহস্থের অনাদরেই তাহাদের এ অনুৎসাহ! এখন হোরবোল-গায়ক বালকেরা প্রচলিত কয়েকটি 'পদ' এবং তাহাদের দলের মূল গায়নের যে দু একটি ছড়া মুখস্থ আছে তাহার এক এক পদের বিরামস্থলে কেবল সমস্বরে "হোরবোল" বলিয়া থাকে। তাহার উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

কালো তুলসী কালো তুলসী হোরবোল!
যে দেবে কাঠা কাঠা তার হবে সাত ব্যাটা,
যে দেবে মুঠি মুঠি তার হবে সাত বিটি,
যে দেবে আড়ি আড়ি—তার ঘরে লক্ষ্মীর হাঁড়ি।

* * * *

একটা বুড়ি মাথে বসে পথে লয়ে একখান্ ডেলে
"ফল নাওসে ফল নাওসে যত গোপের ছেলে,
বাবা সকল আয়রে তোরা"—বলে বুড়ী ডাকছে ঘনে ঘনে।
শ্রীদাম বলে "ওরে সুবল বুড়ী ডাক্‌ছে ক্যানে!"
"বুড়ী তুই ডাকিস্ কেন করিস্ কলরব।
তোর বাণী শুনে আমরা ধেয়ে আস্‌ছি সব!"
"ডাকি কেন শোন গোপের বেটা,
আম কাঁটাল পেয়ারা জাম ফল এনেছি গোটা,
কিছু মিছু ধর শিশু মুখে দাও মুখের হোক্ তার,
ঘরকে গিয়ে মাকে বলে নিয়ে এস গে ধান!"
শুনে বুড়ীর কথা যান্ হরি যান যদুপতি।
ঘরকে গিয়ে মা বলিয়ে ধরেন যশোমতী।
"সঙ্গে চলমা বাজার পথে কিনে দাও গে ফল
দিবা কিনা দিবা রাণী সত্যি করে বল।
তোর ভাঙব হাঁড়ী ভাঙব কুঁড়ী ভাঙব দুধের হোলা।
ঘর সর্ব্বস্বি ভেঙ্গে দেব তখন পাবি জ্বালা!"
"একি জ্বালা" বলেন গোপের ঝি।
"হাঁরে লোকের ছেলে কত খাচ্চে তোরাই বা না খাচ্চিস্ কি?
এমন কথা বল্লে হেথা আমায় দিয়ে দোষ,
পাকা পাকা ফল আনিবে ঘরকে আসুক ঘোষ।
আসুক নন্দ কৃষ্ণচন্দ্র ফল আনিবে পাড়ি,
কিসের জন্যে মিছের ঘরে মজাইবে কড়ি।
ঘরে বসে ননী খাও ওরে চাঁদের কোণা।
আমি কুম্ভ কাঁখে যমুনাতে জল আনিগে সোনা!"
নন্দ গেল বাথানে—যশোদা গেল জলে,
খালি ঘর পেয়ে কৃষ্ণ ননী চুরী করে।
ভাণ্ড ভাণ্ডে ননী খায় উদুখলে পা,
যশোদারে দেখে কৃষ্ণের মুখে নাহি রা।
"হারে গোপাল হারে গোপাল ননী খেল কে।"
"আমি ত খাইনি মা বলাই খেয়েছে।"
রাণী দেখেন চাঁদমুখে ননী লেগে রয়েছে।
"বলাই যদি খেত ননী ডালায় রাখ্‌ত কড়ি,
সাত পুরুষের ভাণ্ড আমার যাচ্ছে গড়াগড়ি।"
আগে আগে পালান্ কৃষ্ণ যশোমতী পাছে,
লাফ দিয়ে ওঠেন কৃষ্ণ কদম্বের গাছে।
ডালে ডালে বেড়ান কৃষ্ণ পাতায় দিয়ে পা,
তা দেখে যশোদা কপালে মারে ঘা!
"গাছে হ'তে নাম গোপাল পেড়ে দেব ফুল,
ওখান থেকে পড় যদি মজাবে গোকুল।"
"তবে আমি নামি মা এই সত্য কর,
নন্দ ঘোষ তোমার বাবা যদি আমায় মার।"

* * * *

ওপারেতে কদম গাছটি কদম ঝুর ঝুর করে,
তার তলাতে রাধাকৃষ্ণ সদাই নৃত্য করে।
গোপ কাঁদে গোপিনী কাঁদে কাঁদে তরুলতা,
সকল লতা বলে আমার কৃষ্ণ গেল কোথা।
কৃষ্ণ গেল বিষ্ণুপুর না বোল বলিয়ে
হেন সময়ে এলেন কৃষ্ণ পাঁচনি হারিয়ে।
পাঁচনি হারায়ে কৃষ্ণ বেড়ান বনে বনে
নবীন কুশের অঙ্কুর ফুটিল চরণে।
ডাহিন্ হাতে তেলের বাটি কানে কদম্বের ফুল
রাধা গেলেন স্নান করিতে কালীদহের কূল।
কালিদহে গিয়ে রাধা খুলে দিলেন কেশ
কেশ পানে চেয়ে চেয়ে তনু হ'ল শেষ।
আলি লো মা ডালে কেবা—কৃষ্ণ কেন গাছে।
সকল সখী নৃত্য করে বলরামের কাছে।

কেহবা রামালীলা গাহিয়া থাকে—

"মাগো সরস্বতী করি স্তুতি, বল্‌তে নাহি জানি,
পিতৃসত্য পাল্‌তে বনে চল্‌লেন রঘুমণি।
সঙ্গে জানকী লয়ে লক্ষ্মণ ভায়ে করিলেন গতি,
পঞ্চবটী বনে স্থিতি কর্‌লেন বসতি।
শুন্‌ল রাবণ রাজা, শুন্‌লো রাবণ রাজা
বল প্রজা রাক্ষসে প্রধান।
মায়া-মৃগ পাঠায়ে সাজালো রথখান।
হ'লো সেই সাগর পার—হ'লো সেই সাগর পার
দণ্ডধর সন্ন্যাসীর বেশে।
ভিক্ষা ছলে ধর্‌ল সীতা কেমন সাহসে।
তুলে নিল অশোক বনে,—তুলে নিল অশোক বনে
চেড়ীগণে রাখ্‌লেক প্রহরি।
শূন্য পুরী কাঁদেন হরি না দেখে সুন্দরী।
জানকী কোথায় গেল!—জানকী কোথায় গেল
কিনা হ'ল ভাইরে লক্ষ্মণ
সূর্য্যবংশ হবার ধ্বংস বুঝি তার লক্ষণ।
মোর এই "বক্ষে" ছিল—মোর এই "বক্ষে" ছিল
পিতা মোলো অন্ধ মুনির শাপে,
শূন্য ঘরে সীতা চুরী কর্‌লে কোন পাপে! ইত্যাদি—

বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করা গেল না। 'বক্ত' শব্দটি কবিই প্রয়োগ করিয়াছেন অথবা মুখে মুখে মূল শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়া বসিয়াছে তাহা বলা যায় না! শেষোক্ত সম্ভাবনাটাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে কৃষ্ণের দানসাধা কৃষ্ণকালী ইত্যাদি নানা লীলার বর্ণনাপূর্ণ কবিতা গাহিয়া বালকেরা সেদিনের উৎসব সমাপ্ত করে।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

দেশলাইয়ের কথা

বহুকাল হইতে এ দেশে দেশলাইয়ের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে এবং প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু খুব অল্প দিন হইল প্রস্তুতের চেষ্টা দেশে দেখা দিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, আমাদের অজ্ঞতা এবং এই প্রকার নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার উৎসাহের অভাবই একমাত্র কারণ। দেশলাই প্রস্তুত অপেক্ষা অনেক দুরূহ ব্যবসা এ দেশে অনেক কাল হইতে প্রচলিত আছে। উপযুক্ত কারিগরের অভাব নাই এবং অর্থেরও তেমন অভাব নাই। প্রতি বৎসর ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যেসকল প্রদর্শনী হইতেছে তাহাতে আমরা দেখিতে পাই কত শ্রমসাধ্য সূক্ষ্মশিল্প আমাদের দেশের সাধারণ লোক দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে এবং তাহাতে এত ধৈর্য্য ও বিচারণার সমবায় বিদ্যমান যে তাহা যে-কোন জাতীয় শিল্পীর গৌরবের কারণ। তা ছাড়া দেশলাই প্রস্তুতের ন্যায় শিল্প কলের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করে, শিক্ষিত শিল্পীর প্রয়োজন তত নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি টাকারও তত অভাব নাই। তবে যে এই শিল্প এদেশে এতকাল অজ্ঞাত ও অচেষ্টিত আছে ইহার কারণ আমরা পুরাণো চাল্‌তি পথ ছাড়িয়া নূতন পথ ধরিতে স্বতই ধীর। আজকাল কলের সাহায্যে যেসকল ব্যবসায় চলে তাহার প্রধান উপকরণ উপযুক্ত কল ও দক্ষ ম্যানেজার। উপযুক্ত কলেরও অভাব নাই, কেন না ইউরোপে অনেক কারখানা আছে যাহাদের কাজই এই জাতীয় কল প্রস্তুত করা। আমাদের দেশীয়দের উদ্যমের অভাবেই এতকাল এই শিল্প পরের হাতে রহিয়াছে। কল বলিতেই আমাদের দেশীয় জনসাধারণের মনে একটা অনির্দ্দিষ্ট জটিল ব্যাপারের চিত্র উপস্থিত হয়। জন্মাবধি কোন কলেরই সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় না। আমাদের ধোপা কলে কাপড় কাচে না, রুটী কলে প্রস্তুত হয় না, বস্ত্র কলে প্রস্তুত হয় না, ধান ভানা, বা ডাল ছাঁটাও কলে হয় না। সাধারণ জীবন-যাপনোপযোগী যাহা কিছু আবশ্যকীয় তাহার সবগুলিই আমরা হস্তে প্রস্তুত করিতে জানি। বিদেশী বণিক আসিয়া যে অভাবগুলির সৃষ্টি করিয়াছে ও যে আরামের আদর্শে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটীর উপকরণই তাহারা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া আসিয়া আমাদের অভাব মিটাইতেছে আরাম যোগাইতেছে। আরও ঐসকল সামগ্রীর অধিকাংশ কলে প্রস্তুত বলিয়া আমরা এতকাল ধরিয়া মানিয়া লইয়া আসিয়াছি যে আমাদিগকে এসকল বিদেশীর কাছে কিনিতেই হইবে। এসকল যে আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে পারে, আমরাই সামান্য বিদ্যা ও ব্যবহার পরিচালনা করিয়া ঐগুলি নিজেরাই যে প্রস্তুত করিতে পারি একথা আমাদের মনেই আসে নাই। কলের বিভীষিকাও আমাদিগকে এ পথ হইতে দূরে রাখিয়াছে। নূতন আন্দোলনের ফলে আমাদের দেশে এই বিশ্বাস ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে যে কলের সাহায্যে সামগ্রী প্রস্তুত করা আমাদিগেরও আয়ত্তাধীন। পূর্ব্বে যুবকগণ ডাক্তার বা ব্যারিষ্টার হইতে বিলাত যাইতেন; এখন অনেকেই নূতন প্রণালীতে কলকারখানার সাহায্যে সামগ্রী প্রস্তুত শিখিবার জন্য বিদেশে যাইতেছেন। ফলে দেখিতেছি দেশীয় লোক-দ্বারা পরিচালিত কারখানা এখানে সেখানে হইতেছে। সাধারণের মনকে আরও এই দিকে পরিচালিত করিবার জন্য কলকারখানার কথা, দশের সাহায্যে পরিচালিত ব্যবসায়ের কথা সহজভাবে লোকের নিকট উপস্থিত করা প্রয়োজন এবং তজ্জন্য এইসকল বিষয়ের অনুক্ষণ আলোচনা প্রয়োজন। আমাদিগের কন্যারা যেমন শিশুকাল হইতে রান্না করার খেলা করিয়া গৃহিণীর পাঠ সাজিয়া ভবিষ্যৎ গৃহিণী-জীবনকে অজ্ঞাতে অভ্যস্ত ও স্বাভাবিক করিয়া লয়—আমাদের দেশের পক্ষেও তেমনি এই নূতন কর্ত্তব্যকে, জ্ঞানকে, নূতন জাগরিত ব্যবসায়ের অঙ্কুরকে সর্ব্বতোভাবে

স্বাভাবিক করিয়া লইবার জন্য এই বিষয়গুলি জাতীয় জীবনের নিত্য আন্দোলন ও আলোচনার বিষয় করার দরকার। তাহা হইলে প্রয়োজনটা দূরে থাকিয়া ভয় দেখাইবে না, কাছে আসিয়া অর্থাগমের ও কর্ত্তব্যপালনের সহায় হইবে।

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৭৩ লক্ষ টাকার দেশলাই আসিতেছে। জাপান, সুইডেন, নরওয়ে, দেনমার্ক, জর্ম্মনি, বেলজিয়ম, ইটালি, অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড সকলেই কিছু না কিছু টাকার মাল পাঠাইয়া ভারতে দেশলাই ব্যবসায়ের অংশ লইতেছে। এতন্মধ্যে সুইডেনের অংশই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, ঐ দেশ হইতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মাল আসে। তৎপর জাপান ১২ লক্ষ টাকার রপ্তানি লইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। সম্প্রতি সুইডেনে ও জাপানের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে কথা চলিতেছে কি করিয়া উভয়ে একত্র হইয়া ভারতে দেশলাই রপ্তানি আরও সুবিধাজনক করিতে পারিবে। সুইডেন অপেক্ষা জাপানের কাষ্ঠসম্পদ অধিক। যদিও অধুনা সুইডেন জাপানকে নীচে রাখিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে তথাপি কাষ্ঠ যোগাইয়া উঠিতে না পারিলে সুইডেনের ব্যবসায় নীচে পড়িয়া যাইবে। জাপানে বৃহৎ বৃহৎ কারখানা প্রস্তুত হইবে এবং সুইডিস্ ও জাপানী অংশ ঐ কারবারে সমান থাকিবে এইরূপ ধরণের একটা প্রস্তাব কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। যখন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ কি করিয়া ভারতে দেশলাই-য়ের বাজার স্থায়ী ও দৃঢ় করিতে পারে তাহার জন্য প্রতিযোগিতা করিতেছে তখন আমরা ভারতবাসীরা--- তাহাদের নিকট হইতে কিনিয়াই তৃপ্ত অন্তরে বসিয়া আছি। এ দেশে যে দুই চারিটি কারখানায় দেশলাই প্রস্তুত হয় তাহার উৎপন্ন পণ্যের মূল্য আমদানীর তুলনায় কিছুই নয়। সর্ব্বসাকুল্যে এ দেশে গুটি নয় দেশলাইয়ের কারখানা আছে। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি জাপান হইতে কাঠি লইয়া আসিয়া শুধু উৎসবে ব্যবহৃত রঙ্গীন দেশলাই প্রস্তুত করে। কতকগুলি এমন কি জাপানী দেশলাই কিনিয়া তাহার ডগা ভাঙ্গিয়া রঙ্গীন দেশলাইয়ের মশলা ধরাইয়া লয়। যাহারা এ বিষয় বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা হিসাব করেন যে যদি এক একটী কারখানায় দৈনিক ১০০ গ্রোস বাক্স প্রস্তুত করা যায় তাহা হইলে ভারতে বিদেশী রপ্তানি বন্ধ করিবার জন্য অন্যূন আরও ৫৬টী কারখানা হওয়া আবশ্যক।

জর্ম্মানীতে একটী কোম্পানী দেশলাইয়ের কল প্রস্তুত করেন। কিসে তাঁহাদের কলের কাটতি বৃদ্ধি হয় এই চেষ্টায় তাঁহারা ভারতবর্ষের দিকে নজর দেন। তাঁহারা নানাপ্রকার কাষ্ঠ এ দেশ হইতে নমুনা লইয়া তাহা দ্বারা দেশলাই প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছেন যে কোন কোন প্রকারের কাষ্ঠ দেশলাইয়ের পক্ষে উপযোগী। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা নমুনা স্বরূপ একটী দেশলাইয়ের কারখানা পঞ্জাবে প্রস্তুত করিতেছেন। উদ্দেশ্য লোকে দেশলাইয়ের ব্যবসায়ের দিকে মন দিবে এবং তাঁহাদের কলের কাটতি হইবে। গবর্ণমেণ্টের যে সকল রক্ষিত বন আছে তাহাতে বহুল পরিমাণে বাজে কাষ্ঠ জন্মে; অন্যান্য দামী গাছগুলির স্থান করিবার জন্য সেগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। এদিকে কিসে অধিক অর্থাগম হয় এই জন্য সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন, কেননা যেসকল কাষ্ঠ অন্যান্য কাজের পক্ষে অনুপযোগী, দেশলাইয়ের পক্ষে তাহার অধিকাংশই উপযোগী, আর দেশলাইয়ের কারখানা হইলেই ঐসকল কাষ্ঠের একটা গতি হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের বন-বিভাগ হইতে এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান হইতেছে এবং সাধারণের অবগতির জন্য অনুসন্ধান ফল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে দেশলাই সম্বন্ধে অনেক সারবান ও প্রয়োজনীয় কথা জানিতে পারা যায়। যে পরিমাণ ব্যয় ও পরিশ্রমে গবর্ণমেণ্ট এইসকল অনুসন্ধান করিতেছেন তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদিগের মধ্যে খুব কম লোকেই এই সমস্ত সংবাদ রাখিতে এবং তদ্দ্বারা লাভবান হইতে যত্নবান। এইসকল পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন দেশীয়েরা আদরের সহিত পাঠ করিতেছে এবং ইহাও আশা করা যায় আমাদের দেশে বিদেশীয় অর্থে দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইবে। দেশলাইয়ের কারখানা চালাইবার সুবিধা ভারতবর্ষে বিস্তর। এখানে কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পরিশ্রমের মূল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প। বিদেশে দেশলাইয়ের কারখানায় এক একটী মজুর প্রায় আট আনা রোজগার করে---আমাদের পাঁচ

ছয় আনাতেই তাহা হইতে পারে। জাপানেও মজুরদের রোজগার খুব কম। কাষ্ঠের মূল্য এ দেশে অপেক্ষাকৃত খুব কম। তা'ছাড়া নদীপথে অনেক স্থলেই কাষ্ঠ নীত হইতে পারে বলিয়া বন হইতে কারখানায় কাষ্ঠ পঁহুছাইবার খরচ অল্প। যেমন অনেকগুলি সুবিধা আছে তেম্নি একটী অসুবিধার কথা বলিয়া রাখা ভাল। এ দেশে কাষ্ঠ যেমন সস্তা ও বহুল পরিমাণে প্রাপ্য তেমনি নির্দ্দিষ্ট কাটতি না থাকার দরুণ কোন এক প্রকারের কাষ্ঠ বহুল পরিমাণে সমস্ত বৎসর ধরিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। যেসকল দেশে দেশলাইয়ের ব্যবসায় প্রচলিত আছে সে স্থানে প্রয়োজনবশতঃ দেশলাইয়ের উপযোগী কাষ্ঠের আবাদ হয় এবং বরাবর পাইবার ব্যবস্থা হয়। যাঁহারা প্রথম প্রথম এই ব্যবসায় করিবেন তাঁহাদিগকে নিয়মিত কাষ্ঠ পাইবার ব্যবস্থার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে বা বিশেষ বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে।

দেশলাই প্রস্তুত করিতে যেমন কাষ্ঠের আবশ্যক তেম্নি কতকগুলি রাসায়নিক মসলার প্রয়োজন। কাষ্ঠ যেমন বনের ধারে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় ও সস্তা, এই মসলাগুলি আবার শহরে প্রাপ্য ও সস্তা। এই দুই প্রকারের জিনিষের প্রাপ্তি ও ব্যয়লাঘবের সামঞ্জস্যের জন্য কোথায়ও এই প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে যে বনপ্রদেশে শুধু কাঠি তৈয়ারীর কল বসিবে। এই কারখানার কার্য্যই হইবে কাঠি প্রস্তুত করিয়া শহরস্থ দেশলাই প্রস্তুতের কারখানায় বিক্রয় করা। বন হইতে যেমন কাষ্ঠের সংগ্রহ কমিতে থাকিবে তেমনি কলটী আরও বনাভ্যন্তরে লইয়া কাষ্ঠের সরবরাহ স্থায়ী রাখা যাইতে পারে। এদিকে এই একটী কাঠি প্রস্তুতের কারখানা একাধিক দেশলাই প্রস্তুতের কারখানায় কাঠি যোগাইতে পারিবে। আর শহরস্থ কারখানা কাঠিতে মসলা লাগাইবে, বাক্স জুড়িবে, লেবেল আঁটিবে ও ভর্ত্তি বাক্স প্যাক করিয়া বাজারে পাঠাইবে। আমাদের দেশে সকল প্রকার ব্যবসায়ই অত্যল্প সূচনায় আরম্ভ করিতে হয়, সেইজন্য উপরোক্ত ব্যবস্থায় কারখানা চালাইবার আশা আপাততঃ করা যায় না। একই কারখানায় কাঠি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া বাক্সে শেষ করিতে হইলে সে প্রকার কারখানা বনপ্রদেশের যত নিকটবর্ত্তী হয় ততই সুবিধা। বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ জলপথে হইতে পারিলেই ভাল, কেননা ব্যয় কম হইবে। প্রস্তুত বাক্স যাহাতে বাহিরে পাঠান যাইতে পারে তজ্জন্য রেলপথের নিকটবর্ত্তী স্থানও হওয়া আবশ্যক। লেবেলের জন্য ছাপান কাগজ কিনিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কারখানার ভিতরেই ছাপাখানা রাখিলে সব চাইতে সুবিধা। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ দেশী কারবার যাঁহারা দেশলাই প্রস্তুত করেন তাঁহারা তাঁহাদের লেবেল বিদেশ হইতে ছাপাইয়া লইয়া আসেন।

বাঙ্গলা দেশে অনেকগুলি জায়গা আছে যেসকল স্থানে সুবিধামত কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে।

কাষ্ঠ।

কাঠ ত অনেক প্রকারই পাওয়া যায় তন্মধ্যে গুটিকতক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিমুল কাঠ—ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেশে জন্মে এবং এতদ্দ্বারা অতি সুন্দর দেশলাই প্রস্তুত হইতে পারে। গেয়ো কাঠ—যদিও ইহা প্রথম শ্রেণীর কাঠ নহে তথাপি কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে সকল সময়েই কিনিতে পাওয়া যায় বলিয়া দেশলাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ছাতিম কাঠ ইহা লইয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয় নাই কিন্তু অনুমান করা যায় যে এতদ্দ্বারা অতি উত্তম কাজ চলিবে। কাষ্ঠের উপযোগিতা সম্বন্ধে বিচার করিবার সময় উহার মূল্যের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কেননা খুব সস্তা না হইলে তদ্দ্বারা প্রস্তুত দেশলাই লাভজনক হইতে পারে না। কোন একটী কাষ্ঠ মনোনীত করিবার পূর্ব্বে সরবরাহের জন্য সরকারী বন-বিভাগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয় কেননা তাহা হইলে সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়।

প্রস্তুত-প্রণালী।

এক ফুট্ বা ততোধিক ব্যাসযুক্ত কাঠের গুঁড়িকে ৮ ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা লম্বা করিয়া টুকরা করিতে হইবে। যদি কাঠ টাটকা রসযুক্ত ও নরম না হয় তবে ভিজাইয়া রাখিয়া বা গরমজলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। কুন্দের

মত যন্ত্রে চড়াইয়া গুঁড়ির সমান চওড়া বাটালি চাপিয়া ধরিলে গুঁড়ি হইতে পুরু কাঠের পাত বাহির হইতে থাকে। তক্তার উপর ছুতোরের র‍্যান্দা (Carpenters plane) চালাইলে যেমন কাঠের পাত উঠিতে থাকে অনেকটা সেই রকম—কেবল পুরু ও সমানভাবে পাত উঠিতে থাকে। এই পাতকে লম্বাভাবে ৪ ইঞ্চি করিয়া টুকরা করিলে দুইটী দেশলাইয়ের কাঠির সমান লম্বা, দেশলাইয়ের কাঠির সমান পুরু পাত পাওয়া যাইবে। এই ৪ ইঞ্চি চওড়া পাতগুলি একে একে সাজাইয়া গিলটিনের মত একটা যন্ত্রে কাটা হইলে কাঠি প্রস্তুত হইল। তারপর কাঠিগুলিকে শুকাইয়া লইতে হয়। শুষ্ক হইলে পর এই কাঠিগুলির দুই মুড়িতে মসলা লাগাইয়া মাঝে কাটিয়া দুইটী কাঠি করিলেই কাঠি প্রস্তুত শেষ হইল। ডবল লম্বা কাঠিগুলি অমনি কিছু মসলার পাত্রে ডুবাইয়া লওয়া যায় না, কেননা কাঠিগুলি এলোমেলো অবস্থায় থাকে, সমান ফাঁক রাখিয়া লম্বাভাবে না সাজাইলে মসলাগুলি গায় গায় জড়াইয়া যাইবে। কাঠিগুলি সাজাইবার জন্য নানা প্রকারের কল প্রচলিত আছে। ইহাদিগের মধ্যে এক প্রকার ফিতে-জড়ান কল সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। একটী বড় বাক্সের মধ্যে শুক্‌নো কাঠিগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয়—বাক্সের নিম্নস্থ ফাঁক হইতে কাঠিগুলি একে একে একটী দাঁতওয়ালা চাকার ভিতর পড়িতে থাকে এবং তথা হইতে একটী ফিতার উপর নীত হয়। ফিতাটী আস্তে আস্তে জড়ান হইতে থাকে এবং কাঠিগুলি ফিতার পাকের মধ্যে মধ্যে সাজান হইতে থাকে, অবশ্য ফিতাটী হইতে কাঠির দুই মুড়ি দুই দিকে বাহির হইয়া থাকে। সাজান হইলে একবার প্যারাফিন (খনিজ মোম—যাহাতে রেঙ্গুন বাতী প্রস্তুত হয়) গলাইয়া তাহাতে কাঠির প্রান্ত প্রথমতঃ ডুবাইয়া লওয়া হয়। তারপর ডিপিং কম্পোজিসন বা মসলায় ডুবান হয়। দুই প্রান্ত ডুবাইয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া শুষ্ক করা হয়। তারপর কাঠিগুলি দ্বিখণ্ডিত করিয়া বাক্সে ভর্ত্তি করিতে হয়। এই শেষোক্ত কার্য্যটী অনেক স্থলে হস্তদ্বারা সম্পন্ন হয়। দক্ষ স্ত্রীলোকেরা প্রতিদিন ৩৫ হইতে ৪০ গ্রোস্ বাক্স ভর্ত্তি করিতে পারে, তাহারা কাঠিগুলি দ্বিখণ্ড করার পর হাতের মুঠার ভিতর একেবারে এতগুলি লয় যাহাতে ঠিক দুইটী বাক্স ভর্ত্তি হইতে পারে।

মসলা।

আজকাল সেফ্‌টি দেশলাই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে এবং গন্ধকের দেশলাই শহর হইতে বহুদূর পল্লী ব্যতীত কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। গন্ধকের দেশলাই যাহা কিছুতে হউক একটু ঘষিলেই জ্বলিয়া উঠে। উহাতে হল্‌দে ফস্‌ফরস্ থাকে বলিয়া ঐ প্রকার হয়। গন্ধকের দেশলাই অত্যন্ত বিপদজনক বলিয়া নানা প্রকার চেষ্টার পর আজকালকার চল্‌তি দেশলাই প্রস্তুত হইয়াছে। এগুলিতে বাক্সের উপরকার তৈরী মসলায় না ঘষিলে কাঠি জ্বলে না। কাঠির মাথায় যে মসলা থাকে তাহাতে সাধারণতঃ পটাস্ ক্লোরাস্ ৫ ভাগ, পটাস্ বাইক্রোমেট্ ২ ভাগ, কাঁচের গুঁড়া ৩ ভাগ ও গঁদ ২ ভাগ থাকে। রাসায়নিক পদার্থগুলি বেশ গুঁড়া করিয়া আস্তে আস্তে গঁদের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। বাক্সের কাগজে এ্যাণ্টিমনি সাল্‌ফাইড্ ৫ ভাগ, লাল ফস্‌ফরস্ ৩ ভাগ, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড্ (manganese dioxide) ১॥ ভাগ, সিরিশ্ ৪ ভাগ থাকে। ঠিক কি মসলায় প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা সকলকেই নিজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। থর্পের ডিক্‌সনারীতে প্রায় ৫০টা মসলার বর্ণনা আছে।

জর্ম্মানীর রোলার কোম্পানী দেশলাই প্রস্তুত কার-খানার একটা হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে ১৭৬,০০০ টাকা ব্যয় করিলে একটী দৈনিক ১০০ গ্রোস্ দেশলাই প্রস্তুতের কারখানা করা যাইতে পারে। জর্ম্মানীর কলগুলির দাম অত্যন্ত অধিক। জাপানে যেসমস্ত কল প্রস্তুত হয় তাহাদের দাম অল্প, কেননা জাপানী কলে যেখানেই সম্ভব লোহের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ জর্ম্মান পেটেণ্টের অনুকরণে অধিকাংশই প্রস্তুত। ১৫,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী ১০০ গ্রোসের কল বা ৩০,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী ২০০ গ্রোসের কারখানা প্রস্তুত হইতে পারে।

রোলার কোম্পানীর হিসাবে ১০ টাকা টন দরে কাষ্ঠ কিনিলে সমস্ত ব্যয় বাদে শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে

বাৎসরিক লাভ হইতে পারে। ১৬৲ টাকা টন দরে কাষ্ঠ কিনিলে ১৭৲ টাকা শতকরা লাভ হইতে পারে।

যাঁহারা জাপান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন তাঁহারাই জাপানী কলের বিষয় বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন। রোলার কোম্পানী যেমন ভারতবর্ষে তাহাদের কলের কাটতি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তেমন কোন জাপানী ব্যবসায়ী এদেশে আসে নাই এবং তাহাদের প্রস্তুত কল সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করাও দুরূহ। জাপানী কলগুলি বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইলে এ দেশে দেশলাই প্রস্তুত সহজ হইয়া উঠিতে পারে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত।

বড়োদা লাইব্রেরী

শ্রীমন্ত সম্পৎরাও গায়কোয়াড়।

আমরা সমগ্র ভারতবাসী ব্রিটিশ প্রজা যেসকল অধিকার ও সুখসুবিধার জন্য রাজদরবারে বৎসরের পর বৎসর আবেদন করিতেছি, সেইসমস্ত অধিকার ও সুখসুবিধা বড়োদার প্রজারা বিনা আবেদনে তাহাদের নিজেদের রাজার নিকট হইতে ক্রমশঃ একটির পর একটি লাভ করিতেছে। "রাজা" শব্দের ধাতুগত অর্থ প্রজারঞ্জক; গায়কোয়াড়ের রাজা নাম অন্বর্থ হইয়াছে।

মানুষের সব চেয়ে বড় অধিকার জ্ঞানলাভ; জ্ঞানেই মানুষকে পশু হইতে পৃথক করে; জ্ঞানেই মানুষকে দেবত্বের পথে অগ্রসর করে। জ্ঞান আপামরসাধারণ সকলের সম্পত্তি। এই শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে আমরা এতদিন নিজেদের বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলাম—ব্রাহ্মণশাসিত ভারতবর্ষে অব্রাহ্মণের জ্ঞানের অধিকার নানা বাধায় খণ্ডিত ও খর্ব্ব ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সাম্যবাদী পাশ্চাত্য জাতির উপর আমাদের রাষ্ট্রশাসনের ভার গিয়া পড়িল। রাষ্ট্রশাসনে সুবিধা হইবে বলিয়া এবং তদানীন্তন কালের কতিপয় সজ্জন রাজপুরুষের চেষ্টায় ভারতে অবাধ শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল এবং সেই পুণ্যকর্ম্ম জাতীয়কলঙ্কমোচন প্রয়াসী দুইজন ব্রাহ্মণ পুরুষসিংহ কর্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়া জনহিতের কারণ হইতে পারিয়াছে—সেই দুই মহাপুরুষ রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। মহানদীর যাত্রা-পথে যেমন বহু উপনদীর ক্ষীণজলধারা সম্মিলিত হইয়া মহানদীর বেগ ও প্রসার বর্দ্ধিত করে তেমনি কালে কালে ও দেশে দেশে বহু সজ্জন মনীষী এই জ্ঞানবিস্তারব্রতের উদ্‌যাপনবিষয়ে সহায় হইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গোখলের প্রস্তাবিত সার্ব্বজনীন অবশ্যশিক্ষা সম্বন্ধে যে আবেদন সরকারের বিবেচনাধীন হইয়া আছে, যাহার জন্য দেশের হিতকামী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন, সেই অবশ্যশিক্ষার বিধি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই বড়োদা রাজ্যে প্রচারিত হইয়া জনসাধারণকে অজ্ঞতা ও মূর্খতা হইতে মুক্ত ও উদ্ধার করিতে যত্নপর হইয়াছে।

মহারাজ গায়কোয়াড় কেবল মাত্র অবশ্যশিক্ষার বিধান করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। ক্ষুধা জাগাইয়া খাদ্যেরও ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করিতেছেন। জ্ঞানের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

মহারাজা সয়াজারাও গায়কোয়াড়।

ইচ্ছা হয় যে তিনিও নিজের রাজ্যে এই সুব্যবস্থা করিবেন। স্কুল, লাইব্রেরী, ম্যুজিয়ম—সমস্তই পরস্পরসাপেক্ষ, সকলগুলি না থাকিলে কোনোটিই সম্পূর্ণ হয় না। এই বোধ ভারতবর্ষে প্রথমে মহারাজের মনে জাগিয়াছে।

'হুজুর' হুকুম দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বড়োদার শিক্ষাবিভাগ বৎসরে ত্রিশ হাজার টাকায় গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা, বিস্তার ও সংরক্ষণের আয়োজন আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে একশত আন্দাজ পল্লী লাইব্রেরী পরস্পর বিযুক্তভাবে গ্রামে গ্রামে ছড়ানো ছিল—তাহাকে মিত্রমণ্ডলী বলিত। মিত্রমণ্ডল লাইব্রেরী সরকারী সাহায্যেই চলিত। যে গ্রাম বৎসরে ২৪৲ টাকা চাঁদা তুলিতে পারিত সেই গ্রাম বৎসরে ২৪৲ টাকা সরকারী সাহায্য পাইত এবং লাইব্রেরীর স্থায়ী তহবিলের জন্য ২৫৲ টাকা এককালীন চাঁদা তুলিতে পারিলে সরকার হইতে ২৫০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক পাইত। গত বৎসরের শেষে বড়োদার রাজ্যে এইরূপ ২০০টি মিত্রমণ্ডল ছিল।

রাজারাজড়ারা বিলাতভ্রমণে যান ঘরের পয়সা পরকে দিয়া একটু ক্ষণিক স্ফূর্ত্তি লুটিতে। মহারাজা গায়কোয়াড় য়ুরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া প্রজাহিতের বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে লাইব্রেরী যে কিরূপ শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের কেন্দ্র তাহাই দেখিয়া গায়কোয়াড়ের

এই বীজটিকে দেশব্যাপী ফসলে পরিণত করিবার জন্য মহারাজা আমেরিকা হইতে একজন দক্ষ লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত বর্ডেনকে নিযুক্ত করেন। বর্ডেন বড়োদায় আসিয়া দেখিলেন যে বড়োদা শহরেই কতকগুলি বেশ বড় লাইব্রেরী রহিয়াছে। মহারাজার লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের লাইবেরীতে ২১০০০ বাছা বাছা বহুমূল্য পুস্তক আছে। শ্রীসয়াজী লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ১৬০০০; ইহা মহারাজার ভ্রাতা শ্রীমন্ত সম্পৎরাও গায়কোয়াড়ের সম্পত্তি; তিনি লোক-হিতের জন্য ইহা সাধারণের অধিগম্য করিয়া দিয়াছেন; এই লাইবেরী প্রাচ্য পুস্তকের সংগ্রহের জন্য খ্যাত। তার পর বড়োদা কলেজ লাইবেরী। ইহা ছাড়া বিদ্যাধিকারী, দেওয়ান, কৃষি-অধ্যক্ষ, পূর্ত্তপতি, সামরিক বিভাগ ও ম্যুজিয়ম প্রভৃতির কার্য্যালয়সংলগ্ন লাইবেরী আছে। পর্দ্দা পাঠাগারের পুস্তকসংগ্রহও মন্দ নয়। বিঠল মন্দিরে প্রায় ২০০০ বই ও পুঁথি আছে। এই সমস্ত লাইব্রেরীর মোট পুস্তকসংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার; ইহা ভিন্ন সরকারী লাইব্রেরীতে ১০ হাজার বই আছে।

বড়োদা রাজ্যে পঞ্চায়েৎ, ম্যুনিসিপালিটি ও সরকার হইতে সাহায্য প্রাপ্ত আরো অনেক লাইব্রেরী আছে। বড়োদা জেলায় ১৪টি লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ১৪১৩৯। কড়ি জেলায় ১১টি লাইব্রেরী ও ৬৭৭০ পুস্তক। নওসারি জেলায় ৯ লাইব্রেরী, ১২৬৬৮ পুস্তক। আমরেলি জেলায় ৬ লাইব্রেরী ৬০১৮ পুস্তক। মোট ৪০টি লাইব্রেরীতে প্রায় ৪০ হাজার বই। ইহা ছাড়া খুচরা ১৯১টি লাইব্রেরীতে মোট ২৫ হাজার পুস্তক সংগৃহীত আছে। সর্ব্বমোট ২৪১টি লাইব্রেরীতে ২ লক্ষ পুস্তকের সংগ্রহ বড় সামান্য সংগ্রহ নহে।

বর্ডেন সাহেব এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া প্রস্তাব করিলেন যে লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের লাইব্রেরীটিকে কেন্দ্র লাইব্রেরী করিয়া অন্যান্য লাইব্রেরীকে উহারই শাখা করিতে হইবে। কেন্দ্র লাইবেরীর জন্য একটি স্বতন্ত্র বাড়ী থাকিবে —তাহার ঘরে ঘরে পুস্তকাগার—পাঠাগার, বেক্ষণাগার, পর্দ্দা পাঠাগার, শিশু পাঠাগার, বক্তৃতা কক্ষ, লাইব্রেরী স্কুল ও কার্য্যনির্ব্বাহক আপিস প্রভৃতি থাকিবে। ইহাতে বেখরচায় সাধারণের পাঠাধিকার থাকিবে; এবং
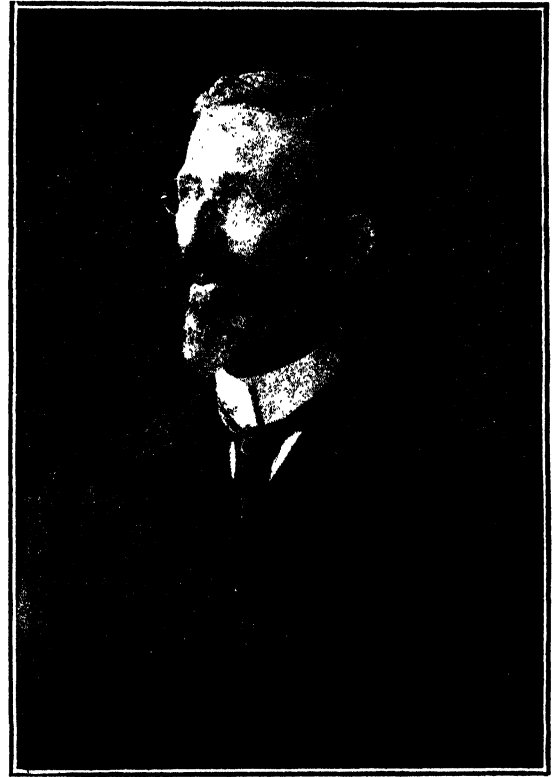
শ্রীযুক্ত বর্ডেন।

সরকারী বা সরকারসংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট যে-সব বহুমূল্য ঐতিহাসিক দলিলদস্তাবেজ আছে সে সমস্ত এই গৃহেই সংগৃহীত থাকিবে। এই কেন্দ্র লাইব্রেরী হইতে নূতন পুরাতন পুস্তক অন্যান্য লাইব্রেরীতে যোগানো হইবে এবং এই লাইব্রেরী হইতে চলন্ত লাইব্রেরী গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরাইয়া আনা হইবে।

কেন্দ্র লাইব্রেরীর কর্ম্ম হইবে—(১) বড়োদা শহরে একটি সুপুষ্ট ও হাল ফ্যাশান দুরুস্ত লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা। (২) লাইব্রেরী স্কুল করিয়া লাইব্রেরী পরিচালনার আর্ট শিখানো। (৩) সাময়িক পত্র সমূহ হইতে বিশেষ বিশেষ সংবাদ ও তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য তত্ত্বমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা। (৪) গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণের মধ্যে লাইব্রেরী স্থাপনের উপকারিতার বোধ জন্মানো। এই সমস্ত কাজে দশ বৎসরে ১৮ লক্ষ টাকা লাগাইতে হইবে।

মহারাজা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। কেন্দ্র

বড়োদা লাইব্রেরী স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ও অধ্যক্ষগণ।

লাইব্রেরীর জন্য কলাভবন ও লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের সম্মুখে ৩।৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতী-ভবন —আকারে ও গুণে—হইবে।

এই লাইব্রেরীর ঘরে সময়ে সময়ে বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, বেক্ষণ, পরীক্ষা, প্রদর্শন ইত্যাদি দ্বারা বিবিধ বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। পর্দানশিন স্ত্রীলোকেরাও যাহাতে বঞ্চিত না হন তাহারও ব্যবস্থা থাকিবে। আমরা
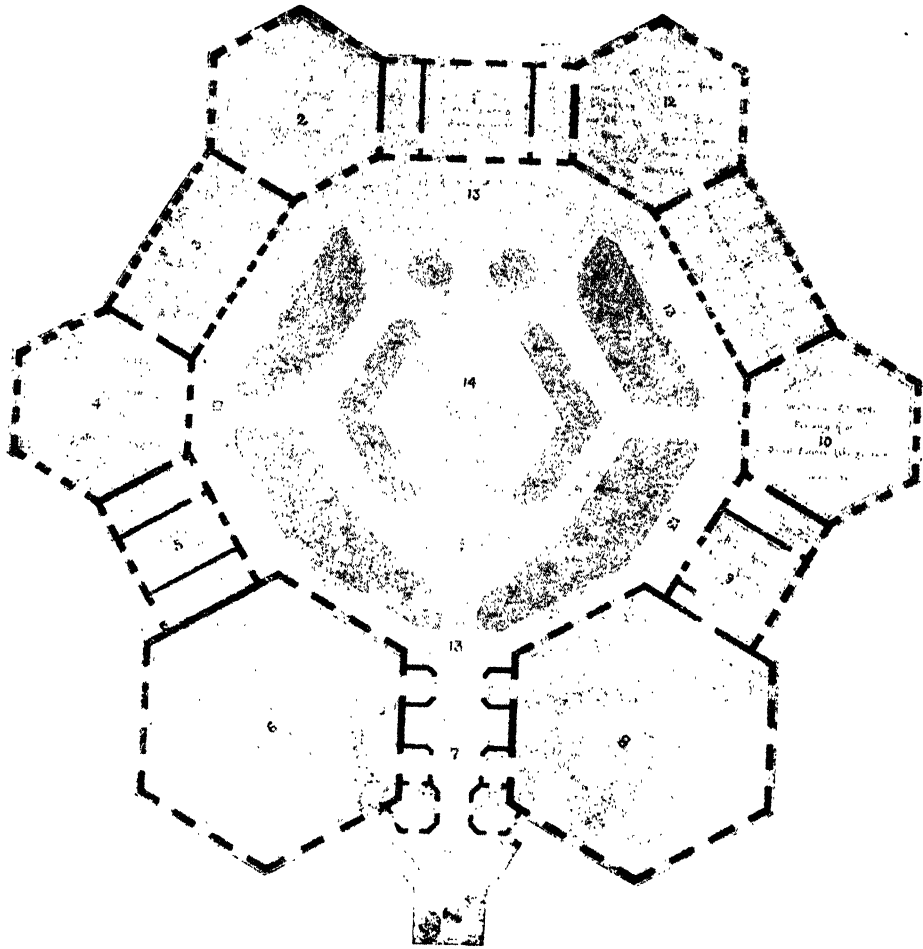
বড়োদা কেন্দ্র লাইব্রেরীর নক্সা।

যেখানে যে কাজ করি শুধু পুরুষদিগকেই মনে রাখিয়া, স্ত্রীলোকেরও যে সমাজে অধিকার তুল্য, এ কথা আমরা ভুলিয়া যাই। কলিকাতায় সাহিত্যপরিষৎ প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে স্ত্রীলোকের জন্য কোনো ব্যবস্থাই নাই, ইহা বড়ই লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। শিশুদিগেরও পাঠের ক্ষুধা অসাধারণ, জানিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। তাহাদিগকে আমরা স্কুলরূপ জেলখানায় বেত্রহস্ত মাষ্টার ওয়ার্ডারের জিম্মায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত, তাহাদের জন্য আর কোনো ব্যবস্থার আবশ্যকতা আমরা মনেও করি না। বড়োদার লাইব্রেরীতে শিশুদের জন্যও ব্যবস্থা থাকিবে, সমাজের কোনো অংশকেই ভুলিয়া যাওয়া হয় নাই।

এই লাইব্রেরীতে গবেষণাগার ও বেক্ষণাগার প্রভৃতিও থাকিবে এবং বিশেষজ্ঞ ছাত্রগণ সেখানে নির্জনে নির্বিঘ্নে সকল রকম সুবিধা পাইবেন এমন ব্যবস্থাও হইবে।

বর্ত্তমানে ২৫০০০ বই লইয়া এই লাইব্রেরী খোলা হইয়াছে। এবৎসর পুস্তক ক্রয়ের জন্য ১৩০০০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১৫০০৲ টাকায় সাময়িক পত্র কেনা হইবে। ফি মাসেই নূতন বই কেনা হইতেছে।

গত মার্চ মাস হইতে লাইব্রেরী স্কুল খোলা হইয়াছে। ৭ জন ছাত্র ও ৩ জন ছাত্রী সরকারী বৃত্তি লইয়া শিক্ষা পাইতেছেন। ইঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সরকারী কর্ম্মচারী রূপে গণ্য হইবেন। ছাত্রদের মধ্যে একজন এম. এ., তিনজন বি. এ.। ছাত্রীদের মধ্যে একজন হিন্দু, দুজন খৃষ্টপন্থী।

গ্রাম্য লাইব্রেরীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকারী হুকুম হইয়াছে যে—কোনো গ্রাম বাৎসরিক ৫০৲ টাকার অধিক চাঁদা তুলিতে পারিলে প্রান্তপঞ্চায়েৎ ও কেন্দ্র লাইব্রেরী প্রত্যেকে সমপরিমাণ চাঁদা দিবে; কোনো গ্রাম এককালীন ২৫৲ টাকা তুলিতে পারিলে কেন্দ্র লাইব্রেরী ১০০৲ টাকা মূল্যের দেশভাষার পুস্তক কিনিয়া দিবে।

যে শহরের জনসংখ্যা ৪০০০ বা ততোধিক, সেই শহর বাৎসরিক ৩০০৲ টাকার সংস্থান করিলে শহরের ম্যুনিসিপালিটি, প্রান্তপঞ্চায়েৎ ও কেন্দ্র লাইব্রেরী সম পরিমাণ টাকা দিবে। শহরের লাইব্রেরী ৭০০৲ টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য পাইতে পারিবে, তদূর্দ্ধ নহে।

লাইব্রেরী মন্দিরের জন্য যত টাকার প্রয়োজন তাহার তৃতীয়াংশ অধিবাসীরা দিলে বাকি টাকা প্রান্তপঞ্চায়েৎ ও কেন্দ্র লাইব্রেরী দিবে।

সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত সকল লাইব্রেরী জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের অধিগম্য হইবে।

কেন্দ্র লাইব্রেরী মধ্যে মধ্যে বাছা বাছা বই দিয়া একটি চলন্ত লাইব্রেরী সাজাইয়া উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে পাঠাইবে; এবং সেইসব বই গ্রামবাসীরা পড়িয়া শেষ করিলে সে লাইব্রেরী গ্রামান্তরে চলিয়া যাইবে এবং আর এক নূতন লাইব্রেরী সে গ্রামে আসিবে। এইরূপে গ্রামে বসিয়া কেন্দ্র লাইব্রেরীর সমস্ত নূতন জ্ঞান-সম্পৎ ভোগ করিবার সুবিধা গ্রামবাসীরও ঘটিবে।

পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত কেন্দ্র লাইব্রেরী হইতে পাঠকদিগকে পুস্তক বিলির সংখ্যা ছিল দৈনিক ২০ হইতে ৩৬ খানি। গত সেপ্টেম্বর মাসে হইয়াছে ১৫৩½খানি; এক রবিবারে হইয়াছিল ২৮৭ খানি। অক্টোবরে যে দিন সবচেয়ে কম বিলি সেদিন ১৪০, এবং সবচেয়ে বেশি বিলি ৩০৫, সমস্ত মাসে বিলি ৪৪৭৫। নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে; সেপ্টেম্বর মাসে নূতন পাঠক হইয়াছিল ৩২৫ জন; অক্টোবরে হইয়াছে ২৪৬ জন; সর্ব্বমোট পাঠক ১৮৩১ জন।

গ্রাম্য ও চলন্ত লাইব্রেরীর চাহিদাও বাড়িয়া চলিয়াছে।

জনবন্ধু গায়কোয়াড় যে আদর্শ আমাদের সমক্ষে স্থাপন করিতেছেন এই আদর্শানুযায়ী সুখসুবিধা আমরা আমাদের ব্রিটিশ রাজসরকারের নিকট দাবী করিতেছি—এ দাবী গ্রাহ্য হইবে কিনা ভগবান জানেন। ইংরেজ রাজসরকার আমাদের এই অভাব মোচন করুন আর না করুন, আমরা নিজেরা যতটা পারি ততটা আমাদের করিয়া তোলা উচিত। ম্যুনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি অনেকটা আমাদের আয়ত্তাধীন; এইসকল প্রতিষ্ঠান ও আমাদের দেশের বড় বড় রাজা মহারাজা জমিদারেরা যদি এই আদর্শে কার্য্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল করা হয়। প্রজার প্রদত্ত অর্থ লইয়া কেবল মোটর গাড়ী হাঁকাইয়া অপব্যয় করিবার অধিকার জমিদারদিগের নাই তাঁহারা ন্যায়ত ধর্ম্মত প্রজাহিত করিতে বাধ্য। সব চেয়ে দায়িত্ব বেশি ইংরেজ রাজসরকারের। বড়োদার শুভানুষ্ঠান আমাদের রাজসরকার, দেশীয় রাজন্যবর্গ, জমিদার ও জনসাধারণের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলে গায়কোয়াড়ের চেষ্টা সার্থক ও দেশ ধন্য হইবে।

জ্ঞানপিপাসু।

হৃদয়-মন্থন

সাধনা আমার গভীর জলধি, নাহি তা'র সীমা পার,
মন্থন লাগি' অন্তর মম মন্দর হ'বে তা'র;
বাসনা আমার বাসুকির ডোর, কোথা তা'র আছে শেষ,
কি উঠে আলোড়ি'—অনিমেষ তাই চেয়ে আছি, পরমেশ!
প্রথমেই এ কি তীব্র গরল ঘোর বেদনার স্তূপ,
তা'র পর, দেব, - প্রেমের অমৃত, আনন্দ-কৌস্তুভ!

শ্রীসুব্রত চক্রবর্ত্তী।

জীবন-বৈচিত্র্য

যৌবন।

বসন্তের সমাগমে তরুলতা যেমন নূতন জীবন লাভ করে, সেইরূপ মানুষ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেই অভিনব শ্রী ও শক্তি-সমন্বিত হয়। জীবনের স্রোত এক সম্পূর্ণরূপ নূতন গাঙে প্রবাহিত হইতে থাকে। যেন একটি ক্ষুদ্র

গিরিনির্ঝরিণী মহানদীর সহিত মিলিত হইল। বাল্য-জীবনের প্রবাহ অতি ধীরে ধীরে ও অলক্ষিত ভাবে বহিতেছিল, হঠাৎ যৌবনসঙ্গমে আসিয়া তরঙ্গাকুলিতচঞ্চল-চরণে মহাসাগরাভিমুখে ধাবমান হইল। এই সঙ্গমে উপনীত হইলে মনে আনন্দ, ভয় ও বিস্ময়মিশ্রিত এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। যৌবনে বাল্যের পরিণতি বাস্তবিক এত বিস্ময়কর যে মনে হয় এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন কোনও সুনিপুণ ঐন্দ্রজালিকের বেণুযষ্টিসঞ্চালনে সংসাধিত। বঙ্গের আদি বৈষ্ণবকবিগণ এই বয়ঃসন্ধির অতি মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস একটিমাত্র শ্লোকে নবোদিত যৌবনের কি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন!

"অসম্ভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেরণাসবাখ্যং করণং মদস্য।
কামস্য পুষ্পব্যতিরিক্তমস্ত্রং বাল্যাৎ পরং সাধুবয়ঃ প্রপেদে॥"

যৌবনে দেহের যে শোভা হয় তাহা অযত্নসিদ্ধ, উহা মণিমাণিক্য-স্বর্ণরৌপ্যাদি-নির্ম্মিত অলঙ্কারের ন্যায় নানাস্থান হইতে আহৃত নহে। মদ্যপান ব্যতিরেকে যৌবনে এক প্রকার মত্ততা জন্মে। যৌবন-জনিত সৌন্দর্য্য সহজেই প্রণয়াকর্ষণ করে।

আর একজন সংস্কৃত কবি বলেন—

"অনায়াসকৃশং মধ্যমশঙ্কতরলে দৃশৌ।
অভূষণমনোহারি বপুর্ব্বয়সি সুভ্রুবঃ॥"

যৌবনকালে কামিনার কটিদেশ সহজেই কৃশ হয়, চক্ষু দুইটি বিনা শঙ্কায় চঞ্চল হয়, এবং দেহলতা বিনা ভূষণে চিত্তহরণ করে।

যৌবনে যেরূপ দৈহিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় মানসিক পরিবর্ত্তনও তদপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। বসন্ত যেমন কুসুমকুলের সুপ্তসৌরভকে পুষ্পগর্ভ হইতে জাগাইয়া তোলে, সেইরূপ যৌবনও মানবহৃদয়নিহিত বিচিত্র ভাবনিচয়কে প্রস্ফুটিত বা জাগরিত করে। ফলতঃ বিধাতা মানবকে বিনা প্রার্থনায় যেসমস্ত অমূল্য বর প্রদান করেন তন্মধ্যে যৌবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যৌবনই মানবজীবনের সারভাগ। মানুষ বাল্যাবস্থায় যেরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া যৌবনের প্রতীক্ষা করে, যৌবনে প্রৌঢ়ত্ব বা বার্দ্ধক্য লাভ করিবার জন্য কে কবে সেরূপ উৎসুক হয়? মধুময় যৌবন চিরদিন থাকে ইহা সকলেরই একান্ত বাসনা, কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে গমনোন্মুখ যৌবনকে একদিনের জন্য ধরিয়া রাখে। যৌবন চলিয়া গেলেও যে পরিমাণে তাহার স্মৃতি ও লুপ্তাবশেষ সংরক্ষিত হয়, পরবর্ত্তী জীবনের অনেকটা তাহার উপর নির্ভর করে, নতুবা নিপীত যৌবনাসব জীবন-পেয়ালার তলানিতে কাহার না অরুচি হইত? যদি কোনও বৃদ্ধকে তাহার জীবনের কুসুমকালের কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে দেখিবে যৌবন স্মৃতির কি আশ্চর্য্য সঞ্জীবনীশক্তি। নিজের যৌবনকাহিনী বলিতে বলিতে বৃদ্ধের দীপ্তিহীন চক্ষে জ্যোতি দেখ দিবে, শুষ্ক অধরপ্রান্তে হাসির বিদ্যুৎ খেলিবে এবং নির্জীব ধমনীতে শোণিতপ্রবাহ স্পন্দিত হইবে। একজন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত বলেন যে "সেকাল" ও "একালের" যখনই তুলনায় সমালোচনা হয় তখনই লোকে যে "সেকালের" প্রশংসা করে, বৃদ্ধেরাই তাহার মূলকারণ। "সেকাল" বৃদ্ধের যৌবনকাল এবং "একাল" বৃদ্ধের অবনতি-কাল, সুতরাং "সেকালের" স্মৃতি তাহার বড়ই ভাল লাগে এবং বৃদ্ধের মুখে "সেকালের" নিরতিশয় সুখ্যাতি শুনিয়া সেকালের সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ একালের লোকও তাহাতে সায় দেয়। এইরূপে "সেকালের" প্রশংসা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে এবং এইরূপেই কবিকল্পিত সত্যযুগের সৃষ্টি হইয়াছে।

জীবনের সরস বসন্তে নিতান্ত অরসিক লোকও কিয়ৎপরিমাণে কবি হইয়া উঠে। তরুণের চক্ষে সংসারের সকলবস্তুই সুন্দর ও কাব্যময় দেখায়। একজন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক বলেন যে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে কাব্যের জন্ম হয়। বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কোনও পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও আমাদের মানসিক ও দৈহিক অবস্থাভেদে আমরা উহাতে কত ভিন্ন ভিন্ন ভাব আরোপ করি! যে সুধাংশুবিম্ব দম্পতীর মিলনে সুধাবর্ষণ করে আবার বিয়োগ ঘটিলে তদ্দর্শনে কতই বিষাদের উদ্দীপনা হয়! সেইরূপ যৌবনের অভিনব উদ্যম, আশা ও স্ফূর্ত্তি মিলিত হইয়া যে অপূর্ব্ব স্পর্শমণির সৃষ্টি করে তাহার স্পর্শে সমগ্র সংসার কাঞ্চনকান্তি ধারণ করে। একজন কবি বলেন যে আশা জাগ্রতের স্বপ্ন। যখন আয়ুর তহবিল পরিপূর্ণ থাকে এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তির কোনরূপ অপ্রতুল থাকে না তখন আশাকুহকিনী জীবনকে স্বপ্নময় করিয়া তোলে। যৌবনে

মানবহৃদয়ে সহজেই প্রেমের সঞ্চার হয়। এই নবোদিত প্রেমজনিত সুখের স্বপ্ন কি মধুর! সে মধুরিমার তুলনা জীবনে আর কোথাও মিলে না। তরুণ বয়সের প্রেমই যথার্থ প্রেম। প্রেমিক দম্পতী পরস্পরকে ভালবাসিয়া তৃপ্তিলাভ করে না, কৃপণের ধনের ন্যায় পরস্পরকে চক্ষের অন্তরাল করিতে চায় না, তিলেক বিচ্ছেদে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে।

> "যবে থাকি কাছাকাছি, ভাবি চিরজন্ম বাঁচি,
> চ'খের আড়ালে ভাবি, মরণ কি নাই আমার।"

যুগল হৃদয়ের অতি নিগূঢ়তম তত্ত্ব পরস্পরের অবিদিত থাকে না, তথাপি তাহাদের পরস্পরকে বলিবার এত কি কথা থাকে যে তাহা বলিয়া শেষ হয় না? মৃত্যুর স্বনামাঙ্কিত ক্ষুদ্র প্রাণী দুইটি কি সাহসে পরস্পরকে পরস্পরের কাছে অনন্ত কালের জন্য বিক্রয় করে—একবার নয়, শতবার নয়, শত সহস্রবার অকাতরে ও অকপটে আত্মবিসর্জ্জন করে?

নবীন যৌবনে যে প্রেমের উদয় হয় তাহার অস্ত-গমনোন্মুখ কিরণছটায় জীবন-সন্ধ্যাও অনুরঞ্জিত হয়। বুড়া বুড়ী যখন পরস্পরের হাত ধরিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখনও তাহাদের সেই নব অনুরাগের স্মৃতি একটি দৃঢ়গ্রন্থিরূপে তাহাদের হৃদয় যুগলের বন্ধনকে দৃঢ়তর করে।

যৌবনের বন্ধুত্বও কি বিচিত্র ও মনোহর! চল্লিশের পর চশমা নাকে দিয়া নূতন বন্ধুর অন্বেষণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যৌবনের বন্ধুর ন্যায় বন্ধু কোথায় পাইবে? সে সরলতা, সে সহৃদয়তা, সে অকৃত্রিম সহানুভূতি ও অপরিসীম অনুরাগ যৌবনের সঙ্গেই বিলীন হয়। আমার এককালে এমন দিন ছিল যখন অন্ততঃ দিনান্তেও কতিপয় বন্ধুর দর্শন না পাইলে ও তৎসহবাসে কিয়ৎকাল না কাটাইলে প্রাণ অস্থির হইত। এখন দশার শেষে বন্ধুসহবাসসুখে এক প্রকার জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। এখন স্থির বুঝিয়াছি যে মানুষ যেমন একাকী আসে ও একাকী চলিয়া যায়, সেইরূপ তাহাকে নিঃসঙ্গে ও নিঃশব্দে জীবনের শেষ পথটুকু অতিবাহিত করিতে হইবে।

যৌবন সুখের পসরা মাথায় করিয়া অবতীর্ণ হয়। এই জন্য যৌবনে সুখভোগ মোটেই কষ্টসাধ্য নহে। সুখের মূল মন্ত্র যুবার হৃদয়ে নিহিত থাকে বলিয়া এই নীল আকাশ, এই শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা, এই কুসুমগন্ধবাহী সমীরণ, যাহা সর্ব্বসাধারণের নির্ব্বিশেষে উপভোগ্য, যুবককে স্বর্গসুখে সুখী করে। সুখভোগ করিবার জন্য তাহাকে কোনও রূপ বিশেষ আয়োজন করিতে হয় না। অনেক কষ্টকে সে কষ্ট বলিয়াই মনে করে না; বরং মধুমক্ষিকা যেমন তিক্তস্বাদ উদ্ভিদ্ হইতেও মধু সংগ্রহ করে সেইরূপ তরুণও অনেক সময়ে কষ্ট হইতে আমোদ লাভ করে। আমার বেশ স্মরণ হয়, আমি যখন তরুণ-বয়স্ক ছিলাম তখন রঙ্গালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে, অর্থাৎ গ্যালারিতে, বসিয়া যে নাট্যামোদ উপভোগ করিয়াছি এখন বক্সে বসিলেও সে আমোদ পাইবার আশা নাই। তখন ইলেক্ট্রিক্ ফ্যানের বন্দোবস্ত ছিল না। দারুণ গ্রীষ্মকালেও জনতাপূর্ণ গ্যালারিতে ছোট ছোট হাত-পাখা ভিন্ন গ্রীষ্মনিবারণের কোনও উপায় ছিল না। রঙ্গমঞ্চ হইতে গ্যালারির দূরত্বনিবন্ধন সময়ে সময়ে অভিনয় দেখিবার ও শুনিবার বিশেষ অসুবিধা হইত। তা ছাড়া, যেসকল অর্দ্ধশিক্ষিত লোক গ্যালারি অলঙ্কৃত করিত তাহাদের চীৎকার ও ব্যঙ্গোক্তি মধ্যে মধ্যে অভিনয়ের ব্যাঘাত ঘটাইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইসকল ব্যাঘাতে বিরক্ত না হইয়া আমি বিশেষ আমোদ পাইতাম। আমার যৌবনাবস্থায় আমি মধ্যে মধ্যে দুই একটি বন্ধুর সঙ্গে শহর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত আমাদের এক পৈত্রিক বাগানে পদব্রজে বেড়াইতে যাইতাম। সেখানে বাগানের ডাব ও দোকানের মুড়ি ভিন্ন ক্ষুৎপিপাসা শান্তির বিশেষ কোনও উপায় ছিল না। ফিরিবার সময় প্রায় দুই প্রহর অতীত হইত এবং সমস্ত পথ আমাদের মাথার উপর মধ্যাহ্ন সূর্য্য অগ্নিবর্ষণ করিত, কিন্তু আমরা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতাম না। তখন যে আনন্দ অনুভব করিতাম কয়েক বৎসর পরে বড় বড় "গার্ডেন্ পার্টিতে" নিমন্ত্রিত হইয়াও তাহার এককণা মাত্র আনন্দ উপভোগ করিয়াছি কি না সন্দেহ।

অনেক বৎসর অতীত হইল আমি একবার কতিপয়

তরুণ বন্ধুর সহিত পূজার ছুটিতে মধুপুর যাত্রা করি। সেখানে আমরা জনৈক আত্মীয়ের বাটীতে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পাঁচ ছয় দিন বাস করিয়াছিলাম। ঐ বাটী তখন অর্দ্ধনির্ম্মিত, সুতরাং তথায় অবস্থিতি বিশেষ সুবিধাজনক হয় নাই। শৌচাদিক্রিয়া মাঠে ঘাটে সমাপন করিতে হইত। সে যাহা হউক, আমাদের আহারের বন্দোবস্ত সর্ব্বাপেক্ষা অসন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইত। আমরা বহুকষ্টে মধুপুর হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে একজন হিন্দুস্থানী পাচক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলাম। ঐ ব্যক্তি কেবল ভাত ও ঘোড়ামুগের দাইল বাঁধিতে জানিত। যে দিন ভাতে "ধরা" গন্ধ পাইতাম না সেদিন ঐ গন্ধ দাইলে পাইতাম; কোনও কোন দিন দুইয়েতেই পাইতাম এবং দুইয়েতেই প্রচুর কঙ্কর থাকিত। তখন মধুপুরে আলু পাওয়া যাইত না, মৎস্যও প্রায় মিলিত না। পাওয়া যাইত কেবল ঝিঙ্গা ও চিচিঙ্গা। খাঁটি দুগ্ধের অপ্রতুল ছিলনা বটে, কিন্তু তাহাতে একপ্রকার দুর্গন্ধ পাইতাম। কেল্‌নারের হোটেলের একজন কর্ম্মচারীর সহিত আমাদের পরিচয় ছিল বলিয়া তিনি আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে আলুটা আশ্‌টা উপহার দিতেন। এতদ্ভিন্ন আমরা কলিকাতা হইতে যাত্রাকালীন কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সঙ্গে লইয়াছিলাম। মোটের উপর আমাদের কমিসেরিয়াটের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। কিন্তু মধুপুরের জলবায়ুর গুণে ও আমাদের ভরাযৌবনের প্রভাবে আমরা কোনও কষ্টকে কষ্ট বোধ করি নাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঠে মাঠে ঘুরিতাম। মধ্যাহ্নে সময় কাটাইবার জন্য আমরা সকলেই প্রথম প্রথম একএকখানি পুস্তক হাতে করিয়া বসিতাম, কিন্তু এ প্রকারে বৃথা সময় নষ্ট করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া পরিশেষে নিবিষ্ট চিত্তে যতগুলি মালগাড়ী দেখা দিত তাহাদের ওয়াগনের সংখ্যা গণনা ও আমাদের বাসগৃহের দেয়ালে যেসমস্ত শ্রেণীবদ্ধ মৎকুণের ফৌজ দেখা দিত তাহাদের গতিবিধি পর্য্যালোচনা ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম। একদিন প্রাতর্ভ্রমণে নির্গত হইয়া আমরা একটি স্ফটিক-শুভ্র জলপ্রপাত দেখিতে পাইলাম। দেখিবামাত্র আমাদের দলের একজন প্রপাতে অবগাহন করিলেন এবং আমাকে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। আমার সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, স্নানান্তে কি পরিব? আমি এই বলিয়া তাহার অনুরোধ পালন করিতে অস্বীকৃত হইলাম। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র ন'ন, আমাকে স্নানার্থ তাঁহার উত্তরীয়খানি দিলেন। আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে প্রপাতে অবগাহন করিলাম। স্নান সাঙ্গ হইলে দেখি যে আমার মস্তকে ও সর্ব্বশরীরে অজস্র বালুকাকণা। তখন বন্ধুবরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের মর্ম্মগ্রহ হইল। সেদিন যতবার মাথা চুল্‌কাইয়াছিলাম ততবারই মস্তক হইতে ঝুর ঝুর করিয়া বালি পড়িয়াছিল, এবং এই কৌতুকে আমরা সারাদিনটি মহানন্দে কাটাইয়াছিলাম। যৌবনে সুখভোগ কত সুলভ তাহার অন্য উদাহরণ দিয়া পুঁথি বাড়াইব না। যৌবনে মনের স্থিতিস্থাপকতা গুণ এত অধিক পরিমাণে থাকে, যে মন সহজে দমিয়া যায় না। এক দ্বার রুদ্ধ দেখিলে যুবা ভগ্নোৎসাহ হয় না, তাহার জন্য শতদ্বার উন্মুক্ত। দুঃখের অশ্রু যখন যুবকের গণ্ড বাহিয়া পড়ে তখন উহা তাহার গণ্ডস্থ লাবণ্যকুসুমকে ধৌত করে মাত্র, একেবারে বিনষ্ট করে না। যুবার বিচারশক্তি কাঁচা হইলে কি হয়? আমি তাহার কাচাসোনার মত মুখলাবণ্যে জলন্ত উৎসাহ ও জীবন্ত স্ফূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হই।

বৃদ্ধেরা যে এককালে যুবা ছিলেন ইহা তাঁহারা অনেক সময়ে ভুলিয়া যান। তাঁহারা এখন যেমন স্ফূর্ত্তিহীন, গজ-গম্ভীর, স্থিতিশীল, আমোদবিমুখ, শ্রমকাতর, নিরুৎসাহ ও শান্তিপ্রিয়, প্রত্যাশা করেন তরুণেরাও সেইরূপ হইবে। কিন্তু ইহা কি বিষম ভুল! বৃদ্ধের বেশ তরুণকে সাজিবে কেন? বৃদ্ধের বেশ বৃদ্ধেই শোভা পায়, তরুণের বেশ তরুণকেই সাজে। তরুণের জীবন কর্ম্মশীল, সুতরাং তাহার তদুপযোগী গুণ থাকা আবশ্যক। যৌবনে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে বার্দ্ধক্যে কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার অধিকার কিরূপে অর্জ্জিত হইবে? যৌবনে যে-সকল উৎকট মনোবৃত্তির উদয় হয় তাহা নির্ম্মূল করিলে কি হইবে? চুল্লীর অগ্নি নিবাইয়া দিলে রন্ধন কার্য্যের কি সুবিধা হইবে? সুনিপুণ পাচক যেমন অগ্নির সাহায্যে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী পাক করে, কিন্তু প্রত্যেক

ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য যতটুকু উত্তাপের প্রয়োজন তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখে, সেইরূপ যুবকের মনোবৃত্তিগুলিকে উন্মূলিত না করিয়া সৎপথে চালিত করিতে হইবে। বেগগামী অশ্বের ঠ্যাঙ্ ভাঙ্গিয়া দিলে কি লাভ? তাহাকে রশ্মি সংযত করিয়া এরূপভাবে চালাইতে হইবে যাহাতে সে বিপথে না যায় অথচ তাহার অভিলষিত বেগের হ্রাস না হয়। যে সহজ সংস্কারবশতঃ তরুণ এত লালায়িত হয় তাহা যেন নিষ্ফল না হয়। সুখ অবহেলার বস্তু নহে। সংসারে দুঃখের অপ্রতুল নাই। যৌবনই সুখের সময়। যৌবনের হাটে সুখ কিনিতে না পারিলে প্রৌঢ়বয়সের ভাঙ্গা হাটে কি সুখ মিলিবে? যৌবনে প্রচুর সুখ আহরণ করিয়া প্রৌঢ়বয়সের সম্বল কর। এই বেলা যত পার গোলাপের কুঁড়ি সংগ্রহ করিয়া উৎকৃষ্ট গাজিপুরী আতর প্রস্তুত করিয়া লও। একজন সুপণ্ডিত ঠিক বলিয়াছেন যে যদি কেহ কিঞ্চিদ্দীর্ঘকালের জন্য কোনও সুখ সম্ভোগ করিতে পারে তাহা হইলে উহা তাহার চিরজীবনের সাথী হয়। এই মধুময় যৌবনে সুখের বীণার তার সপ্তমে চড়াও। এই সুন্দর জগৎকে প্রাণ ভরিয়া ভোগদখল কর, যেন একটিও আলোকরশ্মি, একটিও পবনোচ্ছ্বাস, একটিও বৃক্ষপত্রের কম্পন বৃথা না যায়। কিন্তু সাবধান যেন সুখকে যৌবনতরীর কর্ণধার করিয়া দিব্যজ্ঞানে জলাঞ্জলি না দাও। তাহা হইলে অচিরাৎ অতল জলে ডুবিবে। সাবধান যেন উন্মত্ত ভ্রমরের ন্যায় কেতকী বনে মধু আহরণ করিতে গিয়া ছিন্নপক্ষ না হও। সাবধান যেন সুধাভ্রমে হলাহল পান না কর। যে আমোদ সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ-জ্ঞানানুমোদিত ও নীতিসঙ্গত, সেই আমোদই আমোদ। যে আমোদে শরীর ও মন কলুষিত হয়, যে আমোদ সাধুতাবিগর্হিত ও নীতিবিরুদ্ধ, যে আমোদ স্বাস্থ্য নাশ করে ও অধঃপতনের দ্বার খুলিয়া দেয়, যে আমোদে মত্ত হইয়া মানুষ যৌবনে হাসিতে হাসিতে অনুতাপের বীজ বপন করে এবং বৃদ্ধবয়সে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার ফলভোগ করে, সে আমোদ আমোদই নহে।

যৌবন কাহারও জীবনে একবার বই দুইবার দেখা দেয় না। এই রঙের তাস যদি হাতে পাইয়াছ বিশেষ বিবেচনা করিয়া খেলিও। এখন খেলায় ভুল করিলে মধ্যবয়সে যতই আঁকুপাঁকু কর না কেন পরিণামে পরিতাপই সার হইবে। এই মাহেন্দ্রযোগের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের উপর তোমার ভাবী জীবনের সারবত্তা নির্ভর করিতেছে।

ইংলণ্ডের একজন ভূতপূর্ব্ব প্রধান সচিব কোনও কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে করিতে পারিতেন না। এই জন্য একজন পরিহাসরসিক বলিয়াছিলেন যে সচিবপ্রবর প্রতিদিন প্রাতঃকালে অর্দ্ধঘণ্টা সময় হারাইয়া ফেলেন এবং উহাকে ধরিবার জন্য সারাদিন বৃথা ঘুরিয়া বেড়ান। সেইরূপ যৌবনের অপব্যবহার করিলে সারাজীবনেও তাহার ক্ষতি পূরণ হয় না। তাল কাটিলে অতি সুমধুর সঙ্গীতও যেমন শ্রুতিকঠোর হয়, সেইরূপ বৃথা কালক্ষেপে জীবন-সঙ্গীতেরও তাল কাটে এবং তখন উহা কোনও কার্য্যেরই হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রেই বল, জ্ঞানোপার্জ্জনেই বল, ধর্ম্মসাধনেই বল, যে কোন বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে চাও তজ্জন্য বিশেষ যত্ন না করিলে সিদ্ধিলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। কবি ঠিক বলিয়াছেন—

> "ন সদ্গুণান্ যো বিভর্ত্তি যৌবনে
> ন বার্দ্ধক্যে তেন সুখং হি লভ্যতে।
> মধৌ ন ধত্তে মুকুলানি যস্তরুঃ
> স কিং নিদাঘে পরিশোভতে ফলৈঃ॥"

যে ব্যক্তি যৌবনে সদ্গুণশালী না হয়, সে বার্দ্ধক্যে সুখলাভ করিতে পারে না। যে বৃক্ষে বসন্তকালে মুকুলোদ্গম হয় না সে কি কখনও গ্রীষ্মকালে ফলশোভিত হয়? মানবজীবনে যাহাকিছু মহৎ ও প্রশংসনীয় তাহার মূল পত্তন যৌবনকালে যেরূপ সহজে হয় এমন আর কোনও কালে নহে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এই জন্যই বলিয়াছেন—"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।" যৌবনকালেই ধর্ম্মশীল হইবে। জ্ঞানীপ্রবর এমার্সন বলেন কর্ত্তব্যবোধ যখন যুবাকে বলে "তোমাকে এই কাজ করিতেই হইবে" তখন সে কাজ যতই কঠিন হউক না কেন, যুবা বলে "আমি পারিব।" উদ্যমশীল যুবকের অভিধানে "অক্ষম" কথাটি আদৌ নাই। মানুষ যৌবনে যেরূপ উদারচিত্ত, সহৃদয় ও মুক্তহস্ত হয় এবং লোককে যত সহজে বিশ্বাস করে অধিক বয়সে প্রায় সেরূপ থাকে না। যুবার মনে সহজেই উন্নত ভাবের উদয় হয় এবং সে ছন্দোবন্ধে মনের ভাব

প্রকাশ করিতে না পারিলেও স্বভাবসিদ্ধ কবি। আমার বয়স যখন উনবিংশবৎসর তখন আমি আমার কোন সতীর্থকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"প্রাণের ভাই * * *

* * * *

এই দুঃখবহুল পৃথিবী একটি প্রচ্ছন্ন স্বর্গ। এই স্বর্গের দ্বার তোমার মনশ্চক্ষু। চক্ষু খুলিয়া সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ কর। সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে জীবন উৎসর্গ কর। নীল আকাশে তারা ফুটিতে দেখিলে মনকে নাচিতে দিও; পাগলের কথা শুন, সে নৃত্যে মন উন্নত বই অবনত হয় না। কুসুমকোরকের মুখ চুম্বন করিও, শতবার করিও, পাগলের কথায় বিশ্বাস কর, সে চুম্বনে পাপ নাই। নদীর কল্লোল, বিটপীর ছায়া, পাখীর রোদন, সন্ধ্যাসমীরণের শোকপূর্ণ নিশ্বাস ও রজনীর গম্ভীরতা যদি তোমার মনকে না ভুলায় তবে তুমি পাগল হইতেও নিকৃষ্ট। বার বার বলিতেছি শোক পবিত্র ও দৈব। শূন্য-ক্রোড়া জননীর মর্ম্মভেদী রোদননিনাদ যেন তোমার কর্ণকে বৃথা আঘাত না করে। পিতৃহীন অনাথের করুণ বিলাপকে কখনও অবহেলা করিও না। প্রেমের প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া যে স্বামী নীরবে রোদন করেন তাহার আঁধার ঘরে প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইও না। পতিশোক-বিধুরা পতিব্রতার সহিত মুক্তকণ্ঠে রোদন করিও। লোকে তোমাকে কাপুরুষ বলে বলুক। যাহার পরের দুঃখে অশ্রুপাত হয় না এ সংসারে পাগল তাহাকেই কাপুরুষ বলিয়া গণে। যে দরিদ্রের পর্ণশালায় দয়ার আলো ছড়ায় না, যে শোকতপ্ত হৃদয়ে শান্তিসলিল বিতরণ করিতে কাতর, রোগীর মৃত্যুশয্যায় যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, ভাই! সেই সৌভাগ্যপ্রিয় পতঙ্গের আমি কখনই গুণগান করিব না। শিশুর সরল হাস্য, মুগ্ধস্বভাবা যুবতীর প্রেম-পবিত্র মুখমণ্ডল, জননীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি, পিতার নিঃস্বার্থবাৎসল্য যেন তোমার মনকে চির-বিকশিত করে। বিশুদ্ধ সঙ্গীত, যাহার প্রতিধ্বনি হৃদয়ের গভীরতম কন্দরে উঠিতে থাকে, ঐশ্বরিক জানিও। কে বলে পৃথিবী নরক? কে বলে সংসারে পাপ এবং দুর্ব্বলতা ভিন্ন কিছুই নাই? ভাই! আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি এ বিশ্বাসকে ক্ষণকালের জন্যও মনে স্থান দিও না। পৃথিবীর পঞ্জর পবিত্র—স্বাধীনতাপ্রিয় বীরের, দেশহিতৈষী বীরের শোণিতে পবিত্র—সত্যপ্রিয় পণ্ডিতের শোণিতে পবিত্র—ধর্ম্মাত্মা পরোপকারী মৃত সাধুদিগের মৃত্তিকায় পবিত্র—সতীর কোমল নিশ্বাসে পবিত্র। এ সংসারে পূজাতেই সুখ। কে কবে আপনার গুণ আপনি দেখিয়া সুখী হয়? কোন্ সেক্স্পীয়ার্ আপনাকে সেক্স্পীয়ার বলিয়া জানিতেন? কোন্ গেটে আপনাকে গেটে মনে করিয়া সুখী হইয়াছেন? পরের গুণ দেখিয়া তাহার পূজা যে না করিল তাহার সুখ কিসে? বুদ্ধদেব, ঈশা, প্লেটো, কার্লাইল্, এমার্সন্, যুধিষ্ঠির ও হাফেজের পূজা কর; সীতার পূজা কর; পাগল ব্যবস্থা দিতেছে পূজায় পৌত্তলিকতা নাই।

নিশ্চয় জানিও মনুষ্যের ইচ্ছার অসীম ক্ষমতা। তুমি যদি আজি হইতে ইচ্ছা কর পৃথিবীকে স্বর্গ করিবে, তাহা হইলে তাহাই করিতে পারিবে। স্বর্গের রচয়িতা ইচ্ছা করিলে কে না হইতে পারে? স্বর্গ মনে। মনকে উন্নত ও প্রশস্ত কর। অপরিশ্রান্ত হইয়া জ্ঞানরত্ন আহরণ কর। পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা দেখ; সোদর সোদরাদিগকে প্রাণতুল্য ভাল বাস; প্রণয়িনীকে বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ও সরলভাবে প্রেম কর; পরের দুঃখে কাঁদ, আপনার দুঃখে হাস; জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কর; নির্ভীক হৃদয়ে সত্যের পথে বিচরণ কর। সকলে তোমাকে ভাল বাসুক বা না বাসুক, তোমার যশ ও মান হউক বা না হউক, তুমি চিরসুখী; কারণ, তোমার সুখ কর্ত্তব্যসাধনে। ধর্ম্ম লইয়া কি বিতণ্ডা কর? পরলোক আছে কি না আছে তাহা লইয়া কেন বৃথা তর্ক কর? ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই সুখ"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

(De La Mazeliereর নব প্রকাশিত ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি)

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মকাব্যগুলি ছাড়া ভারতের সাহিত্যিক মহাকাব্যও আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বাল্মীকির রামায়ণ (বোধ হয় আধুনিক যুগের প্রথম শতাব্দীতে লিখিত)।

পিতার আদেশ পালন করিবার জন্য রাম বনে গমন করিলেন। রামের পিতা দশরথ তাঁহার একটি কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করেন। রাম একটি আশ্রমকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নিজ পত্নী সীতার সহিত তথায় বাস করিলেন। কিন্তু এক সময় রামের অবর্ত্তমানে লঙ্কাধিপতি সহস্রবাহু রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।

কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া রাম সীতাকে আর দেখিতে পাইলেন না। "সীতা কোথায়? সীতা কি মরিয়াছেন, কি অনুদ্দিষ্টা হইয়াছেন, অথবা রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে, কি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; কিংবা সেই ভীরু সীতা বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লুক্কায়িতা হইয়াছেন, কি বনমধ্যে পুষ্পচয়ন বা ফল আহরণ করিতেছেন, অথবা বারি আনয়নার্থ (১) নদীতে গিয়াছেন?"

রাবণের পথচিহ্ন অনুসরণ করিয়া রাম লঙ্কা পর্য্যন্ত যাত্রা করিলেন। হনুমান কর্ত্তৃক আনীত কতকগুলি

(১) অরণ্যকাণ্ড—৬০ সর্গ।

বানরের সহিত রাম সখ্য স্থাপন করিলেন। পবননন্দন হনুমান সীতাকে সন্ধান করিবার জন্য সবেগে আকাশে উত্থান করিলেন।

"ইত্যবসরে হনুমান অশোকবনের অদূরে প্রতিষ্ঠিত, সহস্র সহস্র স্তম্ভের উপরি গোলাকারে নির্ম্মিত কৈলাস শিখরের পাণ্ডুবর্ণ অত্যুচ্চ এক প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। তাহার সোপানপঙক্তি প্রবাল-বিরচিত; বেদিকাসমূহ বিশুদ্ধ কাঞ্চনময়; সুবিমল তেজঃপ্রভাবে বিদ্যোতিত হইয়া ঐ প্রাসাদ যেন চক্ষু ঝলসাইতেছে; উহা এত উচ্চ যেন আকাশ ভেদ করিতেছে। পরে পবনতনয় দূর হইতে নিরীক্ষণ করিলেন, সীতা শুক্ল বিমল প্রতিপচ্চন্দ্র-রেখার ন্যায় ক্ষীণা হইয়া রাক্ষসীদিগের মধ্যে মলিনবেশে ঐ প্রাসাদের মূলদেশে অবস্থান পূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে বারংবার নিশ্বাস ফেলিতেছেন।"

একটু পরেই, ভাস্বর পরিচ্ছদ-পরিহিত রাবণ সেই খানে আসিল। সীতা স্বকীয় মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ ঢাকিবার চেষ্টা করিলেন। রাবণ বলিল "অয়ি পঙ্কজনেত্রি, আমাকে দেখিয়া কেন ভয় করিতেছ? কেন তোমার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল? আমি তোমার প্রতি অনুরাগী, তুমিও আমার প্রতি অনুরাগী হও।" সীতা অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিলেন। তখন রাবণ তাঁহাকে রাক্ষসীদের হস্তে সমর্পণ করিল। রাক্ষসীরা তাঁহাকে যারপরনাই অবমাননা করিল। কিন্তু হনুমান সীতার সমীপে আসিয়া সীতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল; পরে, প্রস্তর-সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভারতের সহিত সিংহলকে সম্মিলিত করিয়া রামকে ঐ দ্বীপে লইয়া গেল। রাবণ নিহত হইল। সীতা মুক্তিলাভ করিলেন। তাঁহার সতীত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার অগ্নিপরীক্ষা হইল। আকাশমার্গে দেবতারা জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

মহাভারতের বিপরীতে, রামায়ণ একটি সুরচিত কাব্য গ্রন্থ। ইহার রচনাভঙ্গী ও ছন্দ যেমন প্রভূত যত্ন-প্রসূত, তেমনি উহার নায়ক নায়িকাগুলিও অতীব ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া মনে হয়। বাঁধাবাঁধি ধরণে ও নিতান্ত ঠাণ্ডাভাবে বর্ণিত যুদ্ধের বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে মনে হয় সে সময়ে সমাজের সামরিক ভাবটা তেমন প্রবল ছিল না। কিন্তু প্রণয় ব্যাপারের বর্ণনাগুলি, য়ুরোপীয় সাহিত্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণয়-বর্ণনার সমতুল্য।

রামায়ণ একটি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য; পরবর্ত্তীকালে এরূপ মহাকাব্য আর আবির্ভূত হয় নাই। ভারত-সমাজ এত শীঘ্র নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল যে বৃহৎ রচনা সকল তাহার পক্ষে ক্লান্তিজনক হইয়া উঠিল। কল্পনাশক্তিরও দৈন্য উপস্থিত হওয়ায় ক্রমাগত একই বিষয়ের অবতারণা হইতে লাগিল। কীরাতার্জ্জুনীয় এইরূপ একটি কাব্য। ইহাতে অর্জ্জুনের প্রলোভন বর্ণিত হইয়াছে।

"উহাদের চরণতল সিন্দুর রাগ-রঞ্জিত ভীরুতা ও বিলাসলীলা একটি অপরের পশ্চাতে লুকাইয়া আছে। নতকায় হইয়া সেই রমণী সুদীর্ঘ অনুরাগ-দৃষ্টিতে অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিল। ফুল্লযৌবনা রূপলাবণ্যবতী আর একটি রমণী বিস্তৃত ক্ষেত্রের উপর ক্রীড়া করিতেছে। অনিল উহার নবোদ্ভিন্না যৌবন-শ্রী ও মধুর লাবণ্যচ্ছটা উদ্ঘাটিত করিয়া প্রীতিলাভ করিতেছে (২)।"

ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর কোন কবি, ঊষার নামান্তর উমাকে শিবের প্রেমে আসক্তা একটি নবযুবতীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। মহেশ্বরের চিত্তহরণের আশায় উমা কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বসন্ত কাল সমাগত। একজন ব্রাহ্মণ কুটীরে প্রবেশ করিয়া একটি শীর্ণকায় রক্তনেত্র বল্কলপরিহিতা বালিকাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া বিস্মিত হইল।

"এই দীর্ঘ নিশ্বাসে, এই বক্ষের গুরু স্পন্দনে উহার গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! এমন রূপসী একজন নিষ্ঠুর পুরুষের প্রেমে কি না উন্মত্তা!"

"উমার প্রত্যয় জন্মিল, উমা স্বকীয় প্রেম তাহার নিকট ব্যক্ত করিল। ব্রাহ্মণরূপী শিব-সেই শ্মশানবাসী ভীষণ তাপস। অমনি উমা আনন্দে আত্মহারা হইল। "শিব যিনি দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনি যদি মানুষের অধমও হন তবু আমি তাহাকে ভালবাসিব।"

বালিকা উঠিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। তাহার পরিচ্ছদ কিছুতে আটকাইয়া গেল, সে বিরক্ত হইয়া

(২) ভারবী-প্রণীত কিরাতার্জুনীয় VII—রমেশ দত্তের ইংরাজি অনুবাদ (Lays of Ancient India).

ফিরিয়া আসিল ; শিব তাঁহার দিব্য মহিমায় প্রকাশিত হইয়া উমাকে বলিলেন :-তোমার কঠোর তপস্যায় ও তোমার অনুরাগে আমি বিজিত হইয়াছি! ভদ্রে এখন আমি তোমারি।"(৩)

এইরূপ রচনায় যাঁহারা প্রীতিলাভ করিতেন সেই ব্রাহ্মণেরা কি উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন? বোধ হয় তাঁহারা সংশয়বাদী হইলেও লোকের প্রতি মমতা বশত তাঁহারা এই সকল লৌকিক পুরাণকে আধ্যাত্মিক কাহিনী বা প্রেমের কাহিনী বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাকাব্য এইরূপ রূপান্তরিত হইয়া তাহা হইতে দুই ভিন্ন জাতীয় কাব্য স্বতঃ নিঃসৃত হয়। প্রথমে গীতিকাব্য ; কিন্তু এই গীতিকাব্য সম্পূর্ণরূপে বাঁধা নিয়মের (Conventional) অনুবর্ত্তী। এই ধরণের একটি কাব্য—মেঘদূত। একজন নির্ব্বাসিত যক্ষ, মেঘকে দূতস্বরূপ স্বীয় পত্নীর নিকট প্রেরণ করিতেছেন। এবং যে পথ দিয়া মেঘ যাত্রা করিবে যক্ষ সেই যাত্রাপথের নির্দ্দেশ করিতেছেন:—নগর, গিরি, নদী—এই সমস্ত উচ্ছ্বাসময় বাক্য সহকারে বর্ণিত হইয়াছে।

যথা:—

বক্রপথ যদিও সে, যাইবারে উত্তরের মুখ,
উজ্জয়িনী সৌধ ছাতে হয়ো না গো প্রণয়-বিমুখ।
স্ফুরিত বিদ্যুন্মালা, ভয়ে বালা চকিত-নয়ন—
সে আঁখির ঠারে যদি না মজিলে বৃথায় জীবন॥
স্রোতোপরি ভাসি যায় হংসশ্রেণী রচি চন্দ্রহার
ঘূরায় আবর্ত্ত-নাভী নাচি নাচি, মরি কি বাহার।
নির্ব্বিন্ধ্যা-তটিনী সঙ্গে রস রঙ্গে হইও মগন ;
বিভ্রম-বিলাসে ফোটে রমণীর প্রণয়-বচন॥

অবশেষে মেঘ, যেখানে যক্ষপত্নী বিশ্রাম করিতেছিল সেই প্রাসাদে উপনীত হইল।

"মরকত শিলা দিয়া বাঁধা-ঘাট দীর্ঘ বাপী তায়
স্নিগ্ধ বৈদুর্য্যনাল বিকশিত হেমপদ্ম ভায়—
তার জলে হংসকুল আরামেতে এমনি বিচরে
মানস সরেও যেতে তোমা হেরি মানস না সরে॥
তার তীরে ইন্দ্রনীল মণি দিয়া রচিত শিখর—
কনক-কদলী ঘেরা ক্রীড়া শৈল, কান্তি মনোহর—
গৃহিণীর প্রিয় বলে, সখা ওহে, তব দরশনে,
প্রান্তে তড়িতের আলো, সেই শৈল জাগি উঠে মনে॥
মাধবী-মণ্ডপ সেথা, সুগঠন, করবি-বেষ্টন,
কাছে তার সুশোভন অশোক বকুল দুটি বোন
একটি আমার মত চাহে বাম পদের তাড়না,
প্রিয়ার বদন-সুধা অন্যটির দোহদ-কামনা॥
কাঞ্চনের বাস যষ্টি স্ফটিক ফলকা তার মাঝে
মণি-বাঁধা মূলে যায় কচি বেণু সমকচি সাজে।
দিবসান্তে গিয়া বসে নীলকণ্ঠ প্রিয়সখা তোর
বলয়ঝঙ্কনী তালে নাচায় তাহায় প্রিয়া মোর।" *

গীতিকাব্য, তারপর গদ্য-কাহিনী। পঞ্চম শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্রের আবির্ভাব। এই সকল কাহিনী অতীব দীর্ঘ। উহার মূল-গল্পটা এইরূপ:

একটা বৃষভ অরণ্যে পথ হারাইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই শব্দ শুনিয়া সিংহ ভীত হইল। তখনই দুইটা শৃগাল সিংহকে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রস্তাব করিল। পশুরাজের সন্দেশ তাহারা বৃষভের নিকট লইয়া যাইবে এইরূপ স্থির হইল। পরে তাহারা বৃষভের নিকট চুপিচুপি গিয়া, সিংহ বলবান ও নিষ্ঠুর, এইরূপ বর্ণনা করিল। বৃষভ তাহা শুনিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। শৃগালদ্বয় তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহাকে সিংহের নিকট লইয়া গেল। সাক্ষাৎকারের পর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপ প্রগাঢ় বন্ধুতা স্থাপিত হওয়ায় বিশ্বাসঘাতক শৃগালদ্বয়ের অভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন উহারা দুই সখার মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দিল। বৃষভ নিহত হইল। সিংহ স্বকৃত অপরাধের জন্য যার-পর নাই অনুতপ্ত হইল। এই সকল পাত্রদিগের,—বিশেষতঃ শৃগালদ্বয়ের কথাবার্ত্তার মধ্যে অন্যান্য গল্প আসিয়া মিশিয়াছে—ঐ সকল গল্প জাতক-কাহিনীদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু উভয়ের নীতি উপদেশ বিভিন্ন। বৌদ্ধ জাতকের মূল-নীতি—বিবেক ও করুণা। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রে কেবলই প্রবঞ্চনা, অবিশ্বাস, এবং অবিনশ্বর আদর্শচিন্তনের পরিবর্ত্তে, যে কোন উপায়ে নশ্বর দ্রব্যের অর্জ্জনে বলবতী আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়।

(৩) কোন হেতু প্রদর্শন না করিয়া, "কুমার-সম্ভব" কালিদাসের প্রতি আরোপিত হইয়াছে। (দত্তের ইংরাজী অনুবাদ) উমা ও বৈদিক যুগের উষা—একই। কেন-উপনিষদে—প্রজ্ঞারূপা উমা দেবতাদিগের নিকট ব্রহ্মস্বরূপের ব্যাখ্যা করিতেছেন দেখা যায়।

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ।

যে সময়ে পঞ্চতন্ত্রের সরল গদ্য, ক্লিষ্ট লিখনভঙ্গীতে পরিণত হয়, সেই একই সময়ে উপন্যাসও বিকাশ লাভ করে। অবশেষে, এই ক্রমবিকাশ, সপ্তম শতাব্দীতে, বাণভট্টের কাদম্বরীতে পর্য্যবসিত হয়। ইহা দুই বন্ধুর গল্প। দুইটি বন্ধু জন্মান্তরেও পরস্পরকে ভাল বাসিত—দুইজনই প্রেমাসক্ত, দুইজনই দুর্ব্বলচিত্ত, দুইজনই স্বকীয় অদৃষ্টের ও স্বকীয় উদ্দাম প্রবৃত্তির ক্রীড়নক।

***

ইহাই "এপিক্"-জাতীয় কাব্যের ক্রমবিকাশ।

মহাভারতে,—ধর্ম্মের বিশ্বাস, জ্ঞানানুশীলনের আনন্দ, বাদানুবাদের রুচি—সেই সঙ্গে বীরপ্রসূ অতীতের স্মৃতিসমূহ এবং পুরাণে—রূপকাত্মক বর্ণনা, জটিল ধরণের দর্শনতত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়। তন্ত্রে—উদ্ভট কল্পনা, ও ভয়ানক রসের প্রাদুর্ভাব। পক্ষান্তরে, রামায়ণ দাম্পত্যপ্রেমঘটিত অতি-গম্ভীর মহাকাব্য। পরে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্যের আবির্ভাব—যাহার রচনা অতীব জটিল, ও যাহার রস রুচি অতীব কৃত্রিম। ক্রমে হিন্দুর চিন্তাপ্রবাহ কুৎসিৎ ও ক্লিষ্ট কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে যেমন ধর্ম্মে তেমনি কাব্যেও আমরা একটা কলুষিত, হীনবীর্য্য, অন্তিম-দশাগ্রস্ত সমাজের পরিচয় পাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দিল্লী

প্রতীচ্যদেশের রোমের ন্যায় প্রাচ্যভূখণ্ডে দিল্লী ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীনতম রাজধানী। অতি পুরাকাল হইতে এই স্থানে প্রবলপরাক্রান্ত বহু জাতির উত্থানপতন হইয়াছে। ইংরেজ-রাজত্বে রাজধানীস্বরূপে দিল্লীর গৌরব লুপ্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু সংপ্রতি ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে এই নগরীতে যে বিরাট ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ভারতে ইংরেজরাজত্বের ইতিহাসে তাহা সম্পূর্ণ অভিনব, সুতরাং ইংরেজ অধিকৃত দিল্লীর পক্ষেও নূতন। এই সময়ে দিল্লীর বিবরণী-সঙ্কলন বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, এই বিবেচনায় বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

প্রাচীন দিল্লী।

ইন্দ্রপৎ দুর্গ অর্থাৎ আধুনিক 'পুরাণা কিল্লা' যে স্থানে বর্ত্তমান, মহাভারতোক্ত পাণ্ডবদের রাজধানী প্রাচীন দিল্লী সম্ভবতঃ সেই স্থলে অবস্থিত ছিল। অনেকের মতে রাজা দিলু বা দিলীপের নামানুসারে দিল্লীনগরীর নামকরণ হইয়াছে। রাজা দিলু বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া সাধারণের অনুমান। দিল্লীনগরীর ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে অনঙ্গপাল নামক জনৈক তোমার-নৃপতি লালকোট বা লালদুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই লালদুর্গের উপরই বর্ত্তমান কুতব-মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। ইহার একশত বৎসর পরে সম্বর ও আজমীরের চৌহানবংশীয় নৃপতি বিশালদেব অনঙ্গপালের বংশধরকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। রাজা বিশালদেব খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। ফিরোজ সা'র স্তম্ভের উপর দুই স্থলে তাঁহার নাম উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র পৃথ্বীরাজ বা রায় পিথোরা চৌহানবংশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। মুসলমানদের সহিত সংঘর্ষের সময় ইনিই রাজপুতদের অধিনায়কত্ব করেন। সংযুক্তা-হরণ-ব্যাপারে কনোজের রাজা জয়চন্দ্রের সহিত ইহার রণ-কাহিনী তদানীন্তন রাজবন্ধু ও রাজকবি চাঁদবরদাই প্রণীত 'পৃথ্বীরাজ রায়সা' নামক কাব্যে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরি ইহার সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া বহুকষ্টে জীবন লইয়া পলায়ন করেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে পুনরায় ইহাদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে রাজপুতগণ পরাজিত হয় এবং পৃথ্বীরাজ স্বয়ং শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দেন। নারায়ণ নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এবং ইহাই ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল।

নারায়ণ-ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াই ঘোরি দিল্লীর অভিমুখে সমরাভিযান করেন এবং সে স্থান অধিকার করিয়া কুতবউদ্দীন আইবাককে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া যান। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লী পাঠানরাজগণের অধিকারে ছিল।

কুতব মিনার।

ঐ সময়ে এই স্থানে বহু বিশালকায় হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়,—ঐ সকল হর্ম্ম্যের ভগ্নাবশেষ প্রাচীনকালের শিল্প-সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিয়া অন্থাপি জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। উল্লিখিত হর্ম্ম্যরাজির মধ্যে কুতবউদ্দীনের নির্ম্মিত কুতব-মিনার ও বৃহৎ মসজিদ, দাসরাজা আলা-উদ্দীনের কীর্ত্তি কেশর-ই-হাজার সাতুন অর্থাৎ সহস্রস্তম্ভ প্রাসাদ এবং গিয়াসুদ্দীন তোগলকের তোগলকাবাদ-দুর্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ফিরোজ সা তোগলক ফিরোজাবাদনগর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তন্মধ্যে কুস্ক্-ই-ফিরোজাবাদ ও কুস্ক্-ই-শাকার নামক দুইটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ফিরোজ সা'র রাজত্বকালে দিল্লীনগরীতে জনহিতকর বহু অনুষ্ঠান হয়। দিল্লীর মধ্যদেশবাহী যমুনা খাল বা আধুনিক পশ্চিম যমুনা খাল (Western Jumna Canal) ঐ সকল অনুষ্ঠানের একতম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আধুনিক দিল্লী।

বর্ত্তমান দিল্লী যমুনানদীর দক্ষিণ তীরে ও পঞ্জাবের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। ইহার একদিকে যমুনা এবং অন্যদিকে আরাবল্লী পর্ব্বতের উত্তরপ্রান্তস্থ শৈল-ভূমি; এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় নগরীর সংস্থান। এই নগরীর অন্যতম নাম সাহজাহানাবাদ। বিগত ৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে যে সকল দুর্গ ও রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, দিল্লীনগরী তন্মধ্যে সর্ব্বশেষে নির্ম্মিত ও সকলের উত্তরপ্রান্তে স্থিত। তদানীন্তন কালের দুর্গ ও রাজধানী সমূহের একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) সিরি (বর্ত্তমান সাপুর)—১৩০৪ খৃষ্টাব্দে আলা-উদ্দীন খিলিজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত; ইন্দ্রপতের ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

(২) তোগলকাবাদ—সিরির ৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ব- প্রান্তবর্ত্তী; ১৩২০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক সা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত।

(৩) প্রাচীন দিল্লী বা রায় পিথোরা দুর্গ—পাঠান-রাজগণের আমলের দিল্লী; জগৎ প্রসিদ্ধ কুতব-মিনার ইহারই অন্তর্ভুক্ত।

(৪) জাহানপানা অর্থাৎ ভুবনাশ্রয়—১৩৩০ খৃষ্টাব্দে সিরি ও দিল্লীর মধ্যপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত।

(৫) ফিরোজাবাদ—আধুনিক দিল্লীর দুই মাইল দক্ষিণে ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ সা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

(৬) সের সা'র সময়ের ইন্দ্রপাট বা হুমায়ুনের দীন্‌পানা—বর্ত্তমান দিল্লীর ২ মাইল দক্ষিণে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে বিনির্ম্মিত।

এতদ্ব্যতীত হুমায়ুনের সমাধির দক্ষিণে কিলোখিরি ও মারকাবাদ নামক ক্ষণস্থায়ী দুইটী রাজধানীও ঐ সময়ে

কুতব মিনারের দ্বার।

সংস্থাপিত হইয়াছিল। অধুনা উহার চিহ্নমাত্রও নাই।

বর্ত্তমান দিল্লী ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সাহজাহান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারেই ইহার অন্যতম নাম সাহজাহানাবাদ। যমুনানদীর দক্ষিণ তীরে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ওয়াটার বেষ্টিয়ন (Water Bastion) হইতে, ওয়েলেস্‌লি বেষ্টিয়ন (Wellesley Bastion) পর্য্যন্ত প্রসারিত, প্রায় ২½ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই নগরী অবস্থিত। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩½ মাইল স্থান ব্যাপী একটা প্রাচীর আছে। কাশ্মীর তোরণ (Kashmere Gate) ও মোরা বা ড্রেণ তোরণ এই প্রাচীরের উত্তরগাত্রে সংলগ্ন। কাবুল, লাহোর, ফরাসখানা ও আজমীর তোরণ প্রাচীরের পশ্চিমাংশে এবং তুরকমান (Turkman) ও দিল্লী তোরণ দক্ষিণাংশে সংস্থিত।"

ভারতীয় মোগল সম্রাটগণের মধ্যে সাহজাহান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আড়ম্বরশীল ছিলেন। মন্দিরাদি নির্ম্মাণেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব অপরাজিত ছিল। ইহার সময়ে দিল্লীনগরী বহু সৌধশোভিত হয়। এই সকল সৌধ যুগযুগান্তর ধরিয়া জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠিত 'লালকিল্লা' বা সাহজাহান দুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্য ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়া ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। লাহোর তোরণ ও দিল্লী তোরণ নামক দুইটী প্রকাণ্ড দ্বার এই দুর্গের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। লাহোর তোরণের উপর দণ্ডায়মান হইলে জুম্মা মস্‌জিদ, শুভ্র জৈনমন্দির ও দেশী সহর সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই তোরণই চাঁদনীচকের প্রবেশদ্বার।

দিল্লী প্রাসাদ যমুনাতীরে অবস্থিত। আকৃতিতে ইহা একটী সমান্তরাল সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রের ন্যায়। ইহার পরিসর পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৬০০ ফুট ও উত্তর দক্ষিণে ৩২০০ ফুট। প্রাসাদের চতুর্দ্দিক লোহিতবর্ণ বালুকাপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের মাঝে মাঝে এক একটী চূড় গৃহ। প্রাসাদের সিংহদ্বারের ঠিক বিপরীতদিকে চাঁদনী চক এবং সম্মুখে প্রাসাদাভ্যন্তরে একটী বৃহৎ হল বা প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠের পরে ভিতরের দিকে ৫৪০ ফুট লম্বা ও ৩৬০ ফুট প্রশস্ত একটী প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের প্রবেশপথে, সম্মুখ ভাগে, নক্করখানা বা সঙ্গীতাগার প্রতিষ্ঠিত। ইহারই কিছু দূরে প্রসিদ্ধ দেওয়ান-ই-আম বা প্রকাশ্য দরবার-গৃহ।

দিল্লী দুর্গের কাশ্মীর তোরণ।

কুতব মিনারের বারান্দার অভ্যন্তর।

এই গৃহের পরিসর ১৮০×১৬০ ফুট। দেওয়ান-ই-আমের মধ্যস্থলে মহার্ঘ্য মর্ম্মর নির্ম্মিত মঞ্চোপরি রমণীয় কারুকার্য্য-বিশিষ্ট একটী কুলুঙ্গী আছে। কুলুঙ্গীর উপর ভুবনবিখ্যাত ময়ূরসিংহাসন স্থাপিত ছিল। দেওয়ান-ই-আমের তিনদিক খোলা; লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত সূক্ষ্ম চুণকাম শোভী স্বর্ণাভ কয়েক সারি স্তম্ভ ঐ তিনদিকের মুক্তপথে দেহ-বিস্তার করিয়া গৃহের তুঙ্গ ছাদ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে! সিংহাসনমঞ্চ গৃহভিত্তি হইতে ১০ ফুট উচ্চ। গৃহের পশ্চাৎদিকস্থ প্রাচীরগাত্রে সংস্থাপিত সিংহাসনাধিরোহণের সোপানপথ মঞ্চের সহিত সংলগ্ন। মঞ্চের চারি কোণে বিশেষ কারুকার্য্য সম্পন্ন শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত চারিটী স্তম্ভ, তদুপরি চারুচন্দ্রাতপ বিন্যস্ত। সিংহাসনের পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্রদ্বার আছে,—ঐ দ্বারপথে সম্রাট স্বীয় নিভৃতাবাস হইতে সভাগৃহে আগমন করিতেন। সিংহাসনের পশ্চাৎদিকস্থ প্রাচীরের সর্ব্বস্থানে মূল্যবান মণিমাণিক্যদ্বারা হিন্দুস্থানী ফলফুল, পশুপক্ষী প্রভৃতির চিত্র রচিত। সিংহাসনের সম্মুখে গৃহভিত্তি হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে সংস্থাপিত একখণ্ড শ্বেত প্রস্তর আছে। পূর্ব্বে উহা মণিমাণিক্যখচিত ছিল; অধুনা তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। গৃহের উত্তরদিকস্থ খিলানগাঁথা পথে একটী ফটক দৃষ্ট হয়; উহার পর একটী

দিল্লী প্রাসাদের প্রবেশ পথ (From an old steel engraving)।

ক্ষুদ্র অঙ্গন। এই অঙ্গনের প্রান্তবর্ত্ত 'লালপরদা' ফটক 'জলাউথানা' বা ঐশ্বর্য্যাগারের প্রবেশপথ। ঐশ্বর্য্যাগার দেওয়ান-ই-খাসের সম্মুখে অবস্থিত ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্রাটের শরীররক্ষকগণ লালপরদা ফটকে অবস্থান করিত।

দেওয়ান-ই-খাস বা অন্তরঙ্গ দরবারগৃহ দেওয়ান-ই-আম হইতে প্রায় ১০০ গজ পূর্ব্বে অবস্থিত। আকৃতিতে ইহা একখানি শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত পটমণ্ডপের ন্যায়। সৌন্দর্য্য সম্পদে ইহা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার না করিলেও কারুকার্য্যে ও গৃহসজ্জায় ইহাকে সাহ্‌জাহানের আমলের সৌধাবলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলা যাইতে পারে। ইহার চতুর্দ্দিক খোলা এবং সর্ব্বাংশ স্বর্ণশোভিত। গৃহের অভ্যন্তরস্থ ছাদ পূর্ব্বে রৌপ্যরেখায় মণ্ডিত ছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ তাহার বিলোপ সাধন করিয়াছে। গৃহের প্রাচীর গাত্রে স্বর্ণাক্ষরে একটী পারসী শ্লোক বৃত্তাকারে লিখিত আছে। শ্লোকটীর ভাবার্থ এই—

মর্ত্ত্যে যদি থাকে ঠাঁই স্বর্গ যারে কহে,—
এই সেই, এই সেই—অন্য কিছু নহে।

দেওয়ান-ই-খাসের অনতিদূরে দক্ষিণদিকে খোয়াব্‌গা বা নিদ্রাগৃহ, তসিবখানা বা নির্জ্জনগৃহ এবং বৈঠক বা বিশ্রাম-গৃহ নামক সম্রাটের নিভৃত গৃহগুলি বর্ত্তমান ছিল। উহার সন্নিকটে মুসম্মান বুরুজ বা তিল্লা বুরুজ বা অষ্টকোণ চূড়াগৃহ এবং অন্তঃপুরিকাদের রংমহল অবস্থিত ছিল। বেগমদের মহলগুলি শ্বেতমর্ম্মরে নির্ম্মিত। উহার ভিত্তি ও ছাদ কারুকার্য্যময় এবং চতুর্দ্দিক স্বর্ণলেখা রঞ্জিত। রংমহলের উত্তর প্রাচীরকেন্দ্রে মিজান-ই-আদল বা ন্যায়ের তৌলদণ্ডের একটী চিত্র আছে। মর্ম্মর নির্ম্মিত একটী পয়ঃপ্রণালী রংমহল হইতে খোয়াবগার কেন্দ্রভূমি পর্য্যন্ত প্রসারিত।

দেওয়ান-ই-খাসের কিঞ্চিৎ উত্তরে রাজকীয় স্নানাগার। ইহা তিনটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। ইহার সর্ব্বাংশ শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত ও বহু কারুকার্য্যশোভিত এবং শীর্ষদেশে তিনটী শ্বেতমর্ম্মরের গুম্বজ। স্নানাগারের
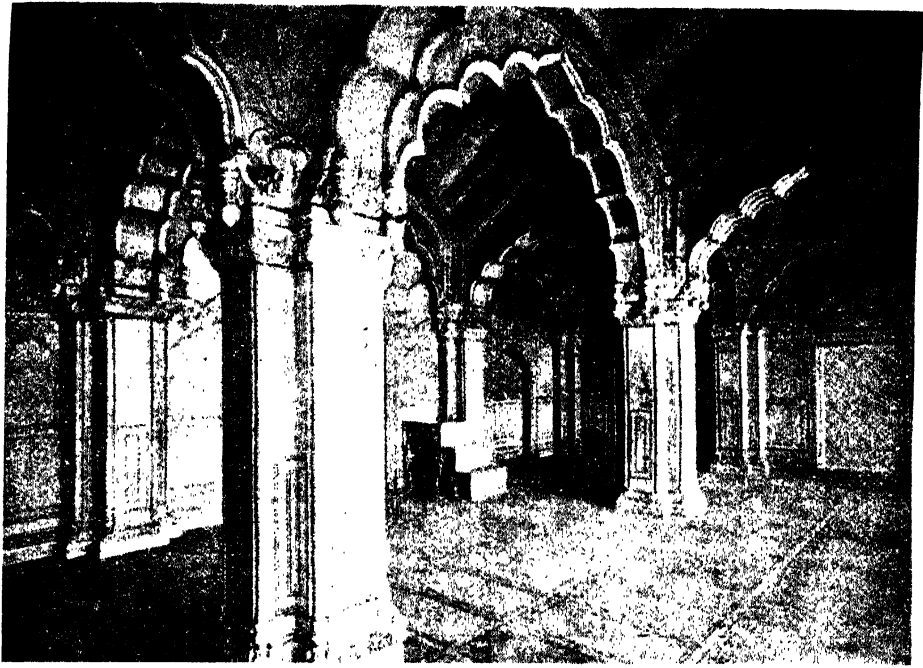
মোতি মস্‌জিদের অভ্যন্তর।
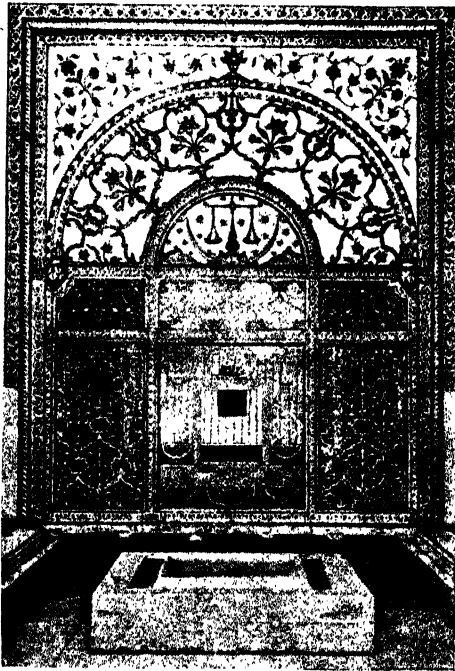
মর্ম্মর প্রস্তরের পর্দা এবং ন্যায়ের তুলাদণ্ড।

অভ্যন্তরে অনেকগুলি পুষ্করিণী ও কৃত্রিম জলপ্রপাত ছিল বলিয়া সমস্ত দেওয়ান-ই-খাস প্রাসাদটীই 'গোসল খানা' নামে অভিহিত হইত।

মসজিদ প্রভৃতি।

মোতি মসজিদ—স্নানাগারের বিপরীত দিকে, কিঞ্চিৎ পশ্চিমে, বহু শ্বেতবর্ণ মণি ও মর্ম্মর শোভিত মোতি মসজিদ। রাজপরিবারের ব্যবহারের জন্য ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইহা আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ১৬০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। মসজিদের প্রাঙ্গনের পরিসর ৪০×৩৫ ফুট। ইহার দুই দিকে দুইটী পার্শ্বগৃহ বর্ত্তমান। ফটকের কপাট ব্রঞ্জ-ধাতু নির্ম্মিত এবং উহার উপর নানা চিত্র খোদিত। মসজিদের দেওয়ালেও ঐরূপ অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত। উত্তর-দিকের প্রাচীর-গাত্রে একটী গুপ্ত পথ আছে,—তদ্দারা রাজপরিবারের রমণীগণ মসজিদে যাতায়াত করিতেন।

সোনাহ্ মসজিদ—দুর্গতোরণের (Fort Gate) সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। সম্রাট আহম্মদ সা'র মাতা কুদ্‌সিয়া বেগমের বিশ্বস্ত মন্ত্রী জাবিদ খাঁ কর্ত্তৃক ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদ নির্ম্মিত হয়। গোলাম কাদের কর্ত্তৃক
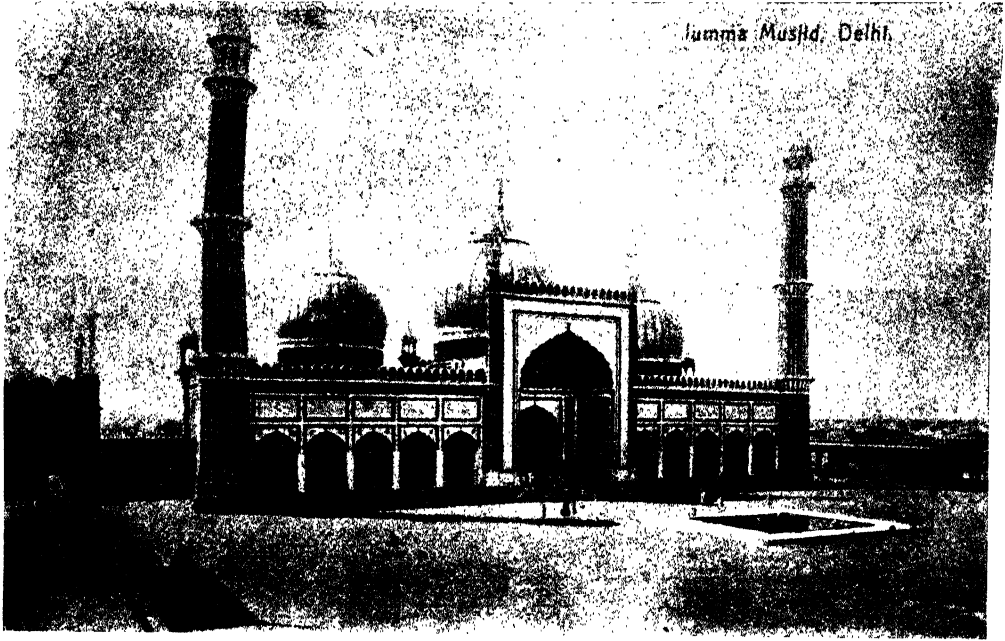
জুম্মা মস্‌জিদ, দিল্লী।

আহম্মদ সা'র সিংহাসনচ্যুতির সময় জাবিদ খাঁ নিহত হ'ন। মসজিদের গায়ে লিখিত বিবরণী ইহাকে 'বেথেলহামের মসজিদ' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছে।

আকবরাবাদী মসজিদ—পূর্ব্বে ইহা সোনাঙ্গ মসজিদ ও দুর্গতোরণের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সাহ্‌জাহানের পত্নী আকবরাবাদী কর্তৃক এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

সোনালা বা সোনামসজিদ—মহম্মদ সা'র বক্সী রোসন-উদ্দৌলা জাফর খাঁ কর্তৃক ১৭২১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। তিনটী স্বর্ণাভ গুম্বজবিশিষ্ট বলিয়া ইহার নাম সোনালা। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে দিল্লীতে নাগরিকগণের হত্যা উৎসব করিবার সময় বিখ্যাত পারস্য যোদ্ধা নাদির সা এই মসজিদে অবস্থান করিয়াছিলেন।

জুম্মা মসজিদ—আকারে ইহা অদ্বিতীয়। শ্বেত মর্ম্মর ও রক্ত প্রস্তরের সংমিশ্রণে ইহার অবয়ব গঠিত। ইহার ১৩০ ফুট উচ্চ দুইটী মিনার আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফার্গুসন বলেন, বাহ্যশোভায় যে সকল মসজিদ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, জুম্মা তন্মধ্যে একতম। মসজিদটীর ভিত্তিস্থল অতি উচ্চ। ইহার তিনটী ফটক ও চারিটী চূড়াগৃহ আছে। মসজিদের গুম্বজ ও তোরণের কারুকার্য্য পরস্পর পরস্পরের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক এবং সর্ব্বাংশে চিত্তরঞ্জক। গৃহের প্রত্যেক ফটকের সম্মুখেই গ্যালারী এবং উহার উপর পনেরোটী মর্ম্মর নির্ম্মিত গুম্বজ। সকল গুম্বজের চূড়াই স্বর্ণমণ্ডিত। এতদ্ব্যতীত ছয়টী মর্ম্মরমিনার দ্বারাও ইহার শোভা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এই মিনার গুলির শীর্ষদেশে এক একটী স্বর্ণচূড় বৃত্তাকার প্রকোষ্ঠ বর্ত্তমান। মসজিদের ফটকত্রয়ের সম্মুখে প্রশস্ত সোপানরাজি বিলম্বিত। দ্বারের কপাটগুলি অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরু পিতলের চাদর দ্বারা হল করা। গৃহের মধ্যস্থল ৪০০ ফুট পরিমিত এবং চতুষ্কোণাকার; উহার কেন্দ্র স্থলে মর্ম্মরগাত্রের অভ্যন্তরে একটী ফোয়ারা-যন্ত্র। মসজিদের পশ্চিমে অর্থাৎ সম্মুখের প্রকোষ্ঠাংশে বেদী ও 'কিব্‌লাবাগ' প্রতিষ্ঠিত। 'কিব্‌লাবাগ মক্কার অভিমুখে সংস্থাপিত কুলুঙ্গী বিশেষ,—ঐ স্থানে নমাজের কার্য্য সম্পন্ন হইত। সমস্ত মসজিদটী ২০১ ফুট লম্বা ও ১২০ ফুট প্রশস্ত। মসজিদের গাত্রে আরবী ভাষায় লিখিত বিবরণী পাঠে জানা যায় ইহা ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আরঙ্গজেব কর্তৃক সাহ্‌জাহানের সিংহাসন-

চ্যুতির সময় নির্ম্মিত হয়। ৫০০০ মিস্ত্রী একাদিক্রমে ছয় বৎসর খাটিয়া ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করে। গৃহের উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটী পট-মণ্ডপ আছে, উহার মধ্যে মহম্মদের দেহের কোন কোন ক্ষুদ্র অংশ রক্ষিত বলিয়া অনেকের সংস্কার। সপ্তম খৃষ্টাব্দে ইমাম হুসেন ও ইমাম হাসান কর্ত্তৃক কুফিক অক্ষরে লিখিত কোরাণ-গ্রন্থ এই মসজিদে রক্ষিত আছে। মসজিদের প্রধান মিনার দুইটীতে আরোহণ করিবার জন্য দুইটী সিঁড়ি আছে। ঐ মিনারের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলে সমগ্র সহরের দৃশ্য, এমন কি ১১ মাইল দূরবর্ত্তী কুতবমিনারও, স্পষ্ট নয়নগোচর হয়।

এই মসজিদের তত্ত্বাবধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত স্থানীয় ডেপুটী কমিশনরের অধীনে একটী কমিটী আছে। ৭০।৮০ বৎসর হইল গভর্ণমেণ্ট একবার ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। সংপ্রতি রামপুর ও বাহাওলপুরের নবাব বাহাদুরদ্বয় ইহার সংস্কার ও তত্ত্বাবধানের সুবন্দোবস্তের জন্য গভর্ণমেণ্টের হস্তে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

ফতেপুরী মসজিদ— চাঁদনী চকের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। ইহা সাহ্‌জাহানের পত্নী ফতেপুরী বেগম কর্ত্তৃক ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র মসজিদটী লালবর্ণ বালুকা-প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার ১০৫ ফুট উচ্চ দুইটী মিনার আছে।

কালা বা কালন মসজিদ—দিল্লীর দক্ষিণাংশে, তুরকমান তোরণের সন্নিকটে, সংস্থিত। এই মসজিদটী ফিরোজ সা তোগলকের সময়ের স্থাপত্যকলার খাঁটি নমুনা। বহিরংশে মসজিদটী দ্বিতল বিশিষ্ট; নিম্নতল ২৮ ফুট উচ্চ এবং উভয় তলের উচ্চতা ৬৬ ফুট। গৃহের প্রবেশ দ্বারে একটী সিঁড়ি এবং অভ্যন্তরে একটী প্রাঙ্গন আছে। প্রাঙ্গনটীর তিনদিক স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত খিলানবেষ্টিত এবং ইহার দক্ষিণে মসজিদের মূল প্রকোষ্ঠ। কোণের চূড়াগৃহ এবং বহিঃপ্রাচীর ভিতরের দিকে ঢালুভাবে রচিত। এই মসজিদে কোন মিনার নাই। মসজিদের মুখামুখি রাস্তার বামপার্শ্বে তুরকমান সা'র সমাধি। তুরকমান মুসলমান যুগের প্রথম শতাব্দীর ভক্তবীর ছিলেন। সাধারণতঃ ইনি "যোগীসূর্য্য" নামে অভিহিত হইতেন। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। দিল্লীর তুরকমান তোরণ ইহার নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুরকমানের সমাধির কিঞ্চিৎ উত্তরে দুইটী কবর দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ উহারই একটী কবরে ভারতের প্রথমা সম্রাজ্ঞী সুলতানা রিজিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

চৌবরজী মসজিদ- পূর্ব্বে ইহার চতুষ্কোণের গুম্বজ গৃহগুলি উচ্চ ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল বলিয়া ইহার নাম চৌবরজী। ইহা ফিরোজ সা তোগলকের সময়ে নির্ম্মিত। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে ইহা ফিরোজ সা'র কুস্‌ক্-ই-শিকার বা পল্লীপ্রাসাদের বহির্ভাগে অবস্থিত ছিল।

দিল্লী মিউনিসিপাল হাঁসপাতাল জুম্মা মসজিদের পূর্ব্বদিকে স্থিত। লর্ড ডাফরিণের নামানুসারে এই হাঁসপাতাল পরিচিত। এই স্থান হইতে দরীবাবাজারের পথে চাঁদনীচকে পঁহুছা যায়। পূর্ব্বে দরীবাবাজার খুনী দরোজার সংশ্লিষ্ট ছিল। এই খুনী দরোজার সন্নিকটে নাদির সা কর্ত্তৃক দিল্লীর হত্যা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তজ্জন্যই ইহার এইরূপ নামকরণ হয়। দুর্গ হইতে দরীবা পর্য্যন্ত চাঁদনীচকের যে অংশ বিস্তৃত তাহা পূর্ব্বে উর্দ্দু বা সৈনিকবাজার নামে অভিহিত হইত। দরীবার পশ্চিমে কোতোয়ালী পর্য্যন্ত প্রসারিত অংশে ফুল-কী মণ্ডী বা কুসুমবাজার এবং তৎপশ্চাতে জহুরীবাজার ও চাঁদনীচক বর্ত্তমান ছিল।

১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বার্ণিয়ার যখন এদেশে আগমন করেন তখন চাঁদনীচক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাজার ছিল। তখন এস্থানে জগতের যাবতীয় পণ্যসামগ্রীর ক্রয় বিক্রয় হইত এবং ক্রেতা বিক্রেতার গমনাগমনে বাজারস্থল সর্ব্বদা সমাকুল থাকিত।

মোড়সরাই - রেলওয়ে ষ্টেসনের সন্নিকটে কুঈন্‌স্ রোডের পার্শ্বে সংস্থাপিত। মিউনিসিপাল কমিটী কর্ত্তৃক ইহা ১০০,৫৭০৲ ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। দিল্লীযাত্রিগণ এইস্থানে আশ্রয় লইতে পারেন।

কুঈন্‌স্ গার্ডেন্‌স্ বা প্রাচীন বেগম উদ্যান - মোড়-সরাইয়ের সন্নিপাতী। উদ্যানের উত্তরে, ঠিক সম্মুখদিকে, রেলওয়ে ষ্টেশন এবং দক্ষিণে চাঁদনীচক। উদ্যান-মধ্যে উচ্চ মঞ্চের উপর প্রস্তর নির্ম্মিত একটী অতিকায় হস্তীমূর্ত্তি আছে। ইহার গাত্রে উৎকীর্ণ বিবরণী পাঠে জানা যায়,
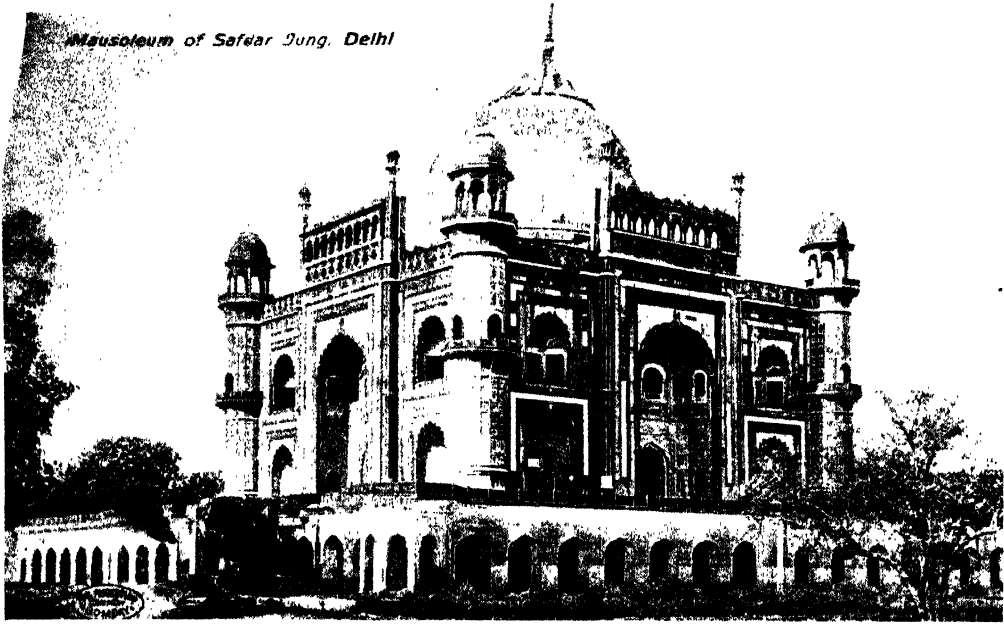
সফ্‌দর জঙ্গের সমাধি।

এই মূর্ত্তি গোয়ালিয়ার হইতে আনীত এবং ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সাহ্‌জাহান কর্ত্তৃক তাঁহার নূতন প্রাসাদের দক্ষিণ তোরণের বহির্দ্দেশে সংস্থাপিত হয়।

নর্থব্রুক্ ক্লক্ টাওয়ার (বা ঘটিকা-গৃহ)—সাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা বেগম বা পাদিসা বেগমের সরাই যে স্থানে বর্ত্তমান ছিল ইহা তৎস্থলে প্রতিষ্ঠিত। বার্ণিয়ারের মতে এই সরাই দিল্লীর রম্যহর্ম্ম্যরাজির মধ্যে একতম এবং ছাদবিশিষ্ট পথ ও গ্যালারিমণ্ডিত প্রকোষ্ঠের জন্য প্রসিদ্ধ পেলে রয়েলের (Palais Royal) তুল্য।

কুদ্‌সিয়া-উদ্যান কাশ্মীর তোরণের বহির্দ্দেশে এবং সহরের ৩০০ গজ উত্তরে, যমুনাতীরে, এই মনোরম উদ্যানের সংস্থান। ইহা আহম্মদ সা'র মাতা কুদ্‌সিয়া বেগম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উদ্যানের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের অনেকাংশ অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে, বটে; কিন্তু ফটকের ভগ্নাবশেষের মধ্য হইতে এখনও উহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ-ক্রীড়া-ভূমির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটী সুন্দর মসজিদ আছে।

দিল্লীর জৈন মন্দির—জুম্মা মসজিদের ২০০ গজ উত্তর-পশ্চিমে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের সম্মুখে কারুকার্য্যময় স্তম্ভাবলী-বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন আছে। প্রাঙ্গনটী শ্বেতমর্ম্মরে প্রস্তুত। মন্দিরের প্রাচীর ও অভ্যন্তরস্থ ছাদ স্বর্ণশোভী এবং দুই সারি মর্ম্মর স্তম্ভের উপর সংস্থিত। গৃহকেন্দ্রে তিনটী খিলানের উপর শঙ্কু আকারের একটী মঞ্চ বিদ্যমান। তদুপরি, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত চন্দ্রাতপের তলে, মহাবীরের এক ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। প্রবেশ-দ্বারের চাঁদনী সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবিশিষ্ট। ইহার গুম্বজের তলদেশস্থ কড়ির সহিত সংযুক্ত 'থিরকাঠে'র পৃষ্ঠে নানাবিধ চিত্র খোদিত।

দিল্লীর চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যাবলী।

ফিরোজাবাদ সহর—ইহার বিস্তার পশ্চিমে কালন মসজিদ পর্য্যন্ত এবং উত্তর-দক্ষিণে দুই মাইল। ফিরোজ সা'র কোটিলা দুর্গ এই স্থানে যমুনাতীরে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ অশোকস্তম্ভ ও জুম্মা মসজিদও এই সহরে বর্ত্তমান। কোটিলা দুর্গের অন্যতম নাম কুস্ক্-ই-শীকার। এই দুর্গের বেষ্টন নিম্ন হইতে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া উপরে উঠিয়াছে।

লাট বা অশোকস্তম্ভ—কোটিলা দুর্গের অভ্যন্তরে

একটী মন্দিরের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধুনা ইহা ভগ্নচূড়। অম্বালার নিকটবর্ত্তী সিবালিক পর্ব্বতের প্রান্ত ভূমি তোপহার হইতে আনীত বলিয়া কানিংহাম সাহেব ইহাকে 'দিল্লী-সিবালিক স্তম্ভ' (Delhi-Siwalik-Pillar) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা অখণ্ড পাটলবর্ণ বালুকা-প্রস্তরে নির্ম্মিত। বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক ও অজস্র অর্থব্যয়ে এই স্তম্ভ ফিরোজ সা তোপহার হইতে দিল্লীতে আনয়ন করেন। প্রতিষ্ঠার সময়ে ইহার চূড়া শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে মণ্ডিত করিয়া তদুপরি স্বর্ণাভ কলস সংস্থাপিত করা হইয়াছিল। এই নিমিত্তই ইহাকে মিনার-ই-জরিন অর্থাৎ হৈম মিনার বলা হইত। স্তম্ভের ভিত্তি-মূলের পরিধি ৯ ফুট ৪ ইঞ্চি ও শৃঙ্গের পরিমাপ ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। ভিত্তির উপর ইহার উচ্চতার পরিমাণ ৩৭ ফুট। স্তম্ভগাত্রে অনেক গুলি অনুশাসন উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে পালিভাষায় উৎকীর্ণ জীবহিংসা নিষেধ বিষয়ক অশোকের অনুশাসন-চতুষ্টয় খৃষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। ভারতীয় উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে এই অনুশাসনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রথমতঃ এই অনুশাসনগুলির পাঠোদ্ধারের জন্য ফিরোজ সা বহু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও যোগী-ঋষির শরণাপন্ন হ'ন। কিন্তু তাঁহারা কেহই ইহার মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হ'ন না। অতঃপর কয়েক জন ধূর্ত্ত হিন্দু এই বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা করে যে সুলতান ফিরোজ নামক জনৈক মুসলমান সম্রাট ব্যতীত কেহই এই স্তম্ভ স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন না। উপরি-উক্ত অশোকের অনুশাসন ব্যতীত চৌহানবংশীয় রাজা বিশালদেবের সময়ের দুইটী বাক্যও এই স্তম্ভে দৃষ্ট হয়। ইহার একটী অশোকের অনুশাসনের ২ ফুট উর্দ্ধে এবং অপরটী তন্নিম্নে উৎকীর্ণ। উভয় লিপিরই রচনা-কাল ১২২০ সম্বৎ বা ১১৬৪ খৃষ্টাব্দ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল অনুশাসন স্তম্ভপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ আছে, ঐতিহাসিকের চক্ষে তাহার বিশেষ মূল্য নাই।

অশোকের অন্য একটী স্তম্ভ হিন্দু রাওর বাড়ীর ২০০ গজ দক্ষিণে রীজের (Ridge—জাঙ্গালের) উপর সংস্থিত। স্তম্ভপীঠে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় ইহা খৃষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অশোক কর্ত্তৃক মিরাটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ সা এই স্তম্ভ দিল্লীতে আনয়ন করিয়া কুস্ক্-ই-শীকার প্রাসাদের অভ্যন্তরে স্থাপনা করেন। লাটস্তম্ভের সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ইহাকে 'দিল্লী-মিরাট-স্তম্ভ' বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতে ইহা ভূমিসাৎ হইয়া পাঁচ খণ্ডে ভাঙ্গিয়া যায়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ইহা রীজের (জাঙ্গালের) উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন।

জুম্মা মসজিদের অভ্যন্তরস্থ মুক্ত প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত বারান্দা-পথ ছিল। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে স্থাপিত একটী অষ্টকোণ ক্ষুদ্র ইমারতের উপর ফিরোজ সা'র রাজত্বের প্রধান ঘটনাবলী ও তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত জনহিতকর কার্য্যাদির বিবরণী লিপিবদ্ধ ছিল। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর দিল্লী হইতে মিরাট গমন পথে তাইমুর এই স্থানে নমাজ করিয়াছিলেন। এই মসজিদের সন্নিকটে সম্রাট দ্বিতীয় আলামগীর ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে নিহত হ'ন।

ইদ্‌গা—নগর-প্রান্তের প্রাচীর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, সহরের পশ্চিমাংশে স্থিত। ইহারই দক্ষিণে 'কদম শরীফের দরগা'। উক্ত দরগা 'ফরাসখানা' নামেও পরিচিত। দরগার অভ্যন্তরে সম্রাট ফিরোজ সা কর্ত্তৃক ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সম্রাট-পুত্র ফতে খাঁর সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান। মন্দির-মধ্যে ফতেখাঁর কবরের উপর জলপাত্রের ভিতর একখণ্ড পবিত্র ফলক-লিপি আছে; উহা বোগ্দাদের খলিফা ফিরোজসা'র নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সমাধি এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম উল-মুল্কের জ্যেষ্ঠপুত্র গাজিউদ্দীন খাঁর প্রতিষ্ঠিত কলেজ ইহারই সন্নিপাতী। কলেজ-প্রাঙ্গনের তিনদিকে দুইসারি করিয়া ছাত্রদের থাকিবার প্রকোষ্ঠ। ইহার পশ্চিমে এই মসজিদ এবং দক্ষিণে প্রতিষ্ঠাতার সমাধি। মসজিদটী সিঁদুরবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং বৃত্তাকার গুম্বজবিশিষ্ট। সমাধির চতুর্দ্দিক নানাবর্ণ প্রস্তরের ঝাঁঝ্‌রিদ্বারা আবৃত এবং গৃহকপাট কুসুম-চিত্রে শোভিত।

ইন্দ্রপত্ বা পুরাণা কিল্লা—দিল্লী তোরণের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পুরাণোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থের সংস্থান এই স্থানেই ছিল। সের সা ও হুমায়ুন কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত 'লাল দরোজা' সের সা'র সময়ে (১৫৪০ খৃঃ) নগরের উত্তর তোরণ স্থানীয়
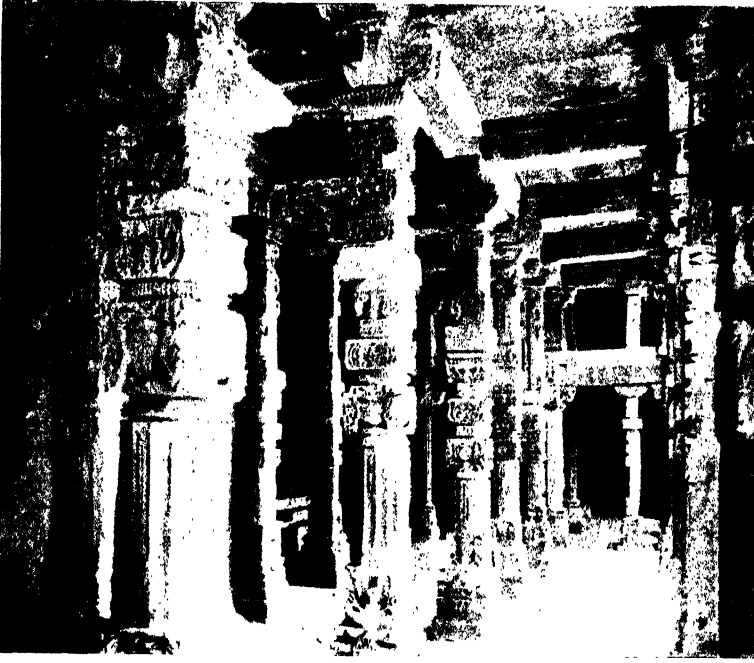
হিন্দু রাজত্বকালের স্তম্ভশ্রেণী।

ছিল। হুমায়ুন দুর্গটার সংস্কারসাধন পূর্ব্বক 'দীন্‌পানা' অর্থাৎ ভক্তাশ্রম নামকরণ করেন। পুরাতন দুর্গের প্রাচীরের অধিকাংশই অধুনা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। দুর্গের দক্ষিণদ্বারপথে উত্তর দিকে 'কিল্লা কোহ্নামসজিদ' নামক সের সা'র মসজিদের পশ্চাদ্দেশ বর্ত্তমান। এই মসজিদটার সম্মুখভাগ ১৫০ ফুট লম্বা। বর্ণসৌন্দর্য্যে এই অংশের শোভা দিল্লীতে অতুলনীয়। মর্ম্মর ও শ্লেট প্রস্তরের সহিত রক্তরাগমণির সংযোগে ইহা প্রস্তুত। নস্ক্‌ ও কুফিক অক্ষরে লিখিত কোরাণের বহু উপদেশাবলী এই স্থানের প্রাচীরগাত্রে লিপিবদ্ধ আছে। মসজিদের অভ্যন্তরস্থ শ্বেত মর্ম্মরের কিব্‌লার উপরও ঐরূপ উপদেশ অতি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। মসজিদের পশ্চাদ্দিকস্থ চূড়াগৃহের সংলগ্ন অষ্টকোণ প্রকোষ্ঠ চারু কারুকার্য্যময়। ইহার দক্ষিণে 'সের মণ্ডল' নামক রক্তপ্রস্তরের অষ্টকোণ প্রাসাদ। এই প্রাসাদটী ৭০ ফুট উচ্চ। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন ইহার মধ্যস্থ সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যা'ন এবং সেই আঘাতে কয়েকদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন।

সমাধি-মন্দির প্রভৃতি।

হুমায়ুনের সমাধি—পুরাণা কিল্লার প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার প্রবেশ-দ্বার দুইটী। একটী দ্বার রক্ত-প্রস্তর বিনির্ম্মিত। দ্বিতীয় দ্বারের বামপার্শ্বে একখণ্ড ইস্তাহারে লিখিত আছে—এই সমাধি-মন্দির হুমায়ুন-পত্নী হাজা বেগম ওরফে হামিদাবানু বেগম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য ১৬ বৎসরে শেষ হয় এবং এই কার্য্যে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে হাজী বেগমের নিজের কবরও বর্ত্তমান। হতভাগ্য দারাসুকো, সম্রাট জহন্দর সা, ফরকসিয়ার ও দ্বিতীয় আলামগীরও এই মন্দিরের মধ্যে সমাধিস্থ হইয়াছেন। মূল সমাধিমন্দিরটী উচ্চ ভিত্তির উপর রচিত। ইহার কেন্দ্রগৃহ অষ্টকোণ বিশিষ্ট; গুম্বজের কোণও বিভিন্ন আকৃতির অষ্টকোণ চূড়া-সম্বলিত। তাজমহল ও এই মন্দিরের স্থপতি-পরিকল্পনা একই রূপ, তবে ইহাতে তাজের শিল্প-সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই। দিল্লীতে ইহাও একটী দেখিবার জিনিষ বটে। তাজমহলের কথা ছাড়িয়া দিলে, ইহা ভারতের দর্শনযোগ্য শ্রেষ্ঠ সম্পদের মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত। হুমায়ুনের কবরটী শ্বেতমর্ম্মরে প্রস্তুত। উহার উপর কোনরূপ স্মৃতিলিপি নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজসৈন্য যখন দিল্লী অবরোধ করেন তখন বাহাদুর সা এই মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং এই স্থানেই তিনি মেজর হড্‌সনের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

নবাব সফদর জঙ্গের মসোলিয়ম অর্থাৎ সমাধি-মন্দির—সহর হইতে ৬ মাইল ও কুতব মিনার হইতে ৫ মাইল দূরে

মেয়ো তোরণ ও লৌহস্তম্ভ।

অবস্থিত। সফদর জঙ্গ আহম্মদ সা'র উজীর ছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রোহিল্লা যুদ্ধে ইনি পরাজিত হ'ন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। বর্ত্তমান সমাধি ইঁহার পুত্র সুজাউদ্দৌলা কর্ত্তৃক তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিনির্ম্মিত। সমগ্র মন্দিরটী রক্তপ্রস্তরময়। ইহার প্রবেশদ্বারের বামে একটী সরাই ও দক্ষিণে একটী মসজিদ আছে। মন্দিরের পরিসর প্রায় ১০০ বর্গ ফুট। ইহার ও তাজমহলের তত্ত্বাবধানের বন্দোবস্তপ্রণালী একই রূপ।

কুতব মিনার—আজমীর তোরণের ১১ মাইল দূরস্থ। ইহার সন্নিকটে কবাত-উল-ইস্লাম মসজিদ ও চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি হর্ম্ম্য আছে। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অনঙ্গপালের নির্ম্মিত লালকোট দুর্গ বা প্রাচীন দিল্লী যেস্থানে বর্ত্তমান ছিল এই মিনার সম্ভবতঃ সেই স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবাত-উল-ইসলাম মসজিদ ও তৎসংলগ্ন হর্ম্ম্যাবলী কুতবউদ্দীন, আলতমস ও আলাউদ্দীন খিলিজীর কীর্ত্তি। ইহার মধ্যে মসজিদের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গন এবং প্রাঙ্গনের পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী বৃত্তযবনিকা কুতবউদ্দীনের নির্ম্মিত। আলতমাস কুতব মিনারের প্রতিষ্ঠা এবং কুতবউদ্দীন-নির্ম্মিত যবনিকার উত্তর-দক্ষিণাংশ প্রস্তুত করেন। আলাউদ্দীন খিলিজি মিনারের নিম্নস্থ রমণীয় 'আলাই দরোজা'র প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহারই সময়ে আলতমাসের নির্ম্মিত গৃহমধ্যস্থ মঞ্চপথ পূর্ব্ব ও উত্তরে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বৃত্তযবনিকা উত্তরদিকে প্রসারিত হয়।

ইহা যেন একটী পুরাকালের জয়স্তম্ভ। জনবাদ, স্বীয় কন্যার যমুনা-দর্শনের উদ্দেশ্যে পৃথ্বীরাজ এই মিনার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস, সা কুতব-ই-দীন নামক জনৈক মুসলমান ফকিরের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা যে মুসলমানগণের আমলে নির্ম্মিত কানিংহাম সাহেব তাহা বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। কুতবউদ্দীন কর্ত্তৃক ইহার ভিত্তি গঠিত হয়। মিনারটী পাঁচতল; প্রত্যেক তলের চারিদিকে বৃত্তাকার বারান্দা আছে। বারান্দা-পৃষ্ঠ বহু লিপিমালায় শোভিত। একস্থানের লিপিতে দিল্লীর প্রথম সম্রাট স্বরূপে মহম্মদ ঘোরি, আলতমাস, ফিরোজ সা ও সেকন্দর লোদীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মিনরের নিম্ন দেশস্থ তিনটী তল রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত ও অর্দ্ধবৃত্তাকার। চতুর্থ ও পঞ্চম তল ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ সা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গঠিত হয়। ঐ সময়ে তিনি ইহার উপর একটী গুম্বজও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে সেকন্দর লোদী ইহার সংস্কার করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ৩১শে আগষ্ট তারিখের ভূমিকম্পে ফিরোজ সা নির্ম্মিত গুম্বজটী ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং মূল মিনারটীরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট মিনারের সংস্কার করেন এবং ভগ্ন গুম্বজের স্থলে কাপ্তেন স্মিথের পরিকল্পিত একটী নূতন গুম্বজ স্থাপিত করেন। কিন্তু ঐ গুম্বজ অত্যল্পকাল পরেই ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। মিনারটী ২৩৮ ফুট উচ্চ। ইহার ভিত্তিমূল ৪৭ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং শিখরদেশ ৯ ফুট পরিমিত। ভিত্তিমূল হইতে চূড়ায় আরোহণের জন্য ৩৭৯টী সিঁড়ি আছে। এই মিনারের চূড়ার উপর হইতে চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যাবলী অতি সুন্দর দৃষ্ট হয়।
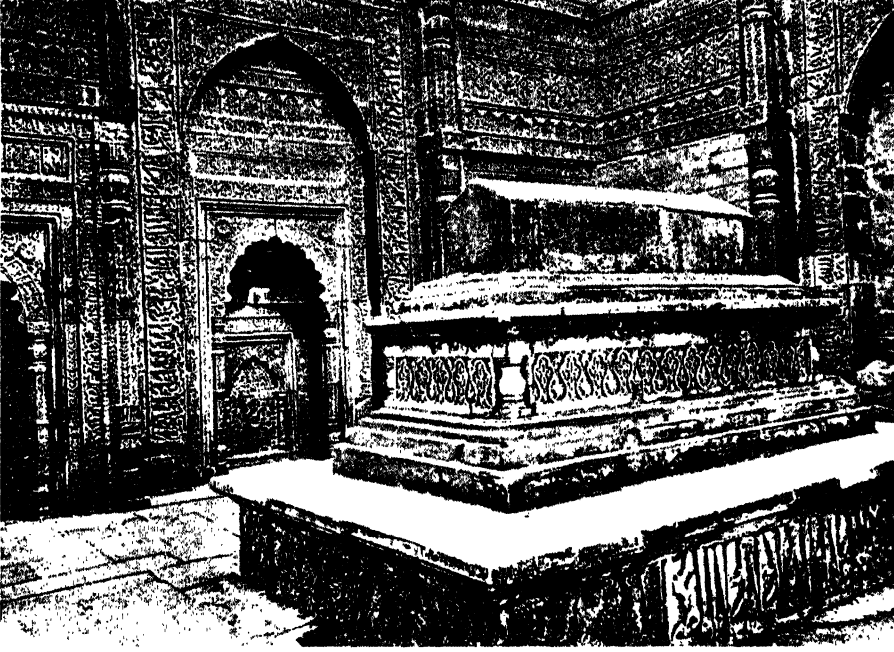
আলতমাসের কবর।

কুবাত-উল-ইসলাম মসজিদ—মুসলমান কর্তৃক দিল্লী অধিকারের অব্যবহিত পরে কুতবউদ্দীন ইহা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। মসজিদের অভ্যন্তরস্থ ছাদের উপর লিখিত বিবরণীও কুতবউদ্দীনকে ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। পৃথ্বীরাজের দেবমন্দির ভঙ্গ করিয়া তৎস্থলে এই মসজিদের ভিত্তি গঠিত হয়। উপরিউক্ত ছাদের লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় ২৭টী হিন্দু দেব-মন্দির ভাঙ্গিয়া এই গৃহের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল। মসজিদের দক্ষিণদিকের প্রাঙ্গন-সংলগ্ন প্রকোষ্ঠ আলতমাস কর্তৃক এবং আলাই দরোজার সম্মুখস্থ পূর্ব্বদিকের অঙ্গনটী আলাউদ্দীন কতৃক নির্ম্মিত। অভ্যন্তরস্থ মূল প্রাঙ্গন প্রবেশদ্বারের অভিমুখে স্থিত। এই প্রাঙ্গনটী দৈর্ঘ্যে ১৪২ ও প্রস্থে ১০৮ ফুট। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ খিলান-পথ হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরের স্তম্ভাবলী সন্নিবেশে প্রস্তত। মসজিদের পশ্চিমাংশে উত্তর-দক্ষিণাভিমুখে ৩৮৫ ফুট পরিমিত স্থান সম্পূর্ণ খিলানবিশিষ্ট। মধ্যে খিলানটী প্রায় ২২ ফুট প্রশস্ত। উহার দুই পার্শ্বে ২টী বড় ও ৮টী ছোট খিলান। প্রাচীরের গাত্র পুষ্পাদির চিত্রে শোভিত। এই মসজিদ প্রতিষ্ঠার দেড় বৎসর পরে প্রসি আফ্রিকাবাসী পর্য্যটক: ইবন বটুটা ইহা দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—'সৌন্দর্য্যে ও বিস্তৃতিতে ইহার অনুরূপ মসজিদ জগতে নাই।' হিন্দুগণ এই মসজিদকে 'ঠাকুরদ্বার' বা 'চৌষট্ খাম্বা' (ষষ্টিসংখ্যক স্তম্ভবিশিষ্ট) বলিয়া থাকে। মসজিদ-প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে পেটা লোহায় নির্ম্মিত একটী স্তম্ভ আছে। ইহার উচ্চতা ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং ব্যাস ১½ ফুট। স্তম্ভগাত্রে গুপ্তবংশীয় রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ওরফে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ৩৭৫—৪১৩ খৃঃ) স্তুতি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। উহা হইতে জানা যায়, চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিয়া শত্রুকুল নির্ম্মূল করেন এবং সিন্ধুনদ অতিক্রম পূর্ব্বক পঞ্জাবের বাহ্লিক জাতির উচ্ছেদসাধন করেন। এই স্তম্ভ সম্ভবতঃ প্রথমে মথুরায় স্থাপিত ছিল। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে অনঙ্গপাল কর্তৃক ইহা স্থানান্তরিত হয়। যে সকল মন্দিরাদির উপাদানে কুবাত-উল-ইসলাম মসজিদ নির্ম্মিত তাহারই পার্শ্বে অনঙ্গ-পাল ইহা সংরোপিত করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভ ভারতে হিন্দুরাজার এককালীন প্রাধান্যের শ্রেষ্ঠ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ গণ্য হইতে পারে।

কাপ্তেন হড্‌সন কর্ত্তৃক দিল্লীর শেষ বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ বন্দীকৃত।
(From an old steel engraving.)

আলতমাসের সমাধি- উক্ত মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে রক্তপ্রস্তরদ্বারা (১২৩৫ খৃঃ) নির্ম্মিত। সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরে কোরাণের উপদেশাবলী সুন্দরভাবে মুদ্রিত। ভারতের মধ্যে এই সমাধিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

আলাই দরোজা—বহুবর্ণে রঞ্জিত চিত্রের জন্য জগতের মধ্যে সুন্দরতম। ইহার আকৃতি চতুষ্কোণ। রক্তপ্রস্তরে ইহার অবয়ব গঠিত এবং ইহার গাত্র বহু চিত্রে রঞ্জিত।

মেস্‌হেদের ইমাম মহম্মদ আলির সমাধি—রক্তপ্রস্তর দ্বারা (১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে) বিনির্ম্মিত। ইহার বিস্তার ১৮ বর্গ ফুট। এই সমাধি 'ইমাম জামিন' নামে পরিচিত।

আলাই মিনার—কুতব মিনারের প্রায় ১৪০ গজ উত্তরে স্থিত। সাধারণ প্রস্তরখণ্ডে ইহার অবয়ব গঠিত হইয়াছে। ভিত্তিমূল হইতে ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা ৮৭ ফুট। প্রায় ৫০০ ফুট উচ্চ করিবার কল্পনায় মিনারটীর নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়; কিন্তু ১৩১২ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের আদেশে অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই ইহা পরিত্যক্ত হয়।

মেট্‌কাফ্ হাউস্—আকবরের বৈমাত্র ভ্রাতা মহম্মদ কুলি খাঁর সমাধি। কুতব মিনার হইতে প্রায় পোয়া মাইল দূরবর্ত্তী।

আদম খাঁর সমাধি -কুতবের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থিত। আকবরের বৈমাত্র ভ্রাতাকে হত্যা করার অপরাধে সম্রাটের আদেশে ইহাকে একটী উচ্চ সৌধের উপর হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিয়া বধ করা হয়।

জয়পুরের জ্যোতির্ব্বিদ রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহের বীক্ষণাগার—কুতব হইতে প্রায় এক মাইল দূরস্থ। সাধারণ লোকে ইহাকে 'যন্তর মন্তর' বলে। গৃহের নির্ম্মাণকাল ১৭২৮ খৃষ্টাব্দ। বীক্ষণাগারের 'সম্রাট যন্ত্র' নামধেয় বৃহৎ সূর্য্যঘড়িটী এখনও বর্ত্তমান আছে। সমস্ত

গৃহখানি অধুনা ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। জয়পুররাজ ইহার সংস্কারসাধনে অভিলাষী হইয়াছেন।

হৌজ-ই-খাসের চৌবাচ্চা—১২৯৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খিলিজি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। কুতব হইতে ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ সা ইহার সংস্কারসাধন করেন, এবং ইহার সন্নিকটে একটী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধি—পুরাণা কিল্লা হইতে ইহার দূরত্ব এক মাইল মাত্র। ইহার চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি কবর ও মন্দির আছে। সমাধি-মন্দিরের ত্রিশগজ দূরে আকবরের বৈমাত্র ভ্রাতা আজিজ কোকলতসের কবর—চৌষট্ খাম্বে বর্ত্তমান। এই কবরের উপর লিখিত বিবরণী পাঠে জানা যায় ইহা ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। চৌষট্ খাম্বের পশ্চিমে অল্প ঘেরা স্থান আছে, উহার মধ্যে নিজামুদ্দীনের দরগা প্রতিষ্ঠিত। ইহার সন্নিকটে কবি আমীর খস্রুর কবর। আমীর খস্রুর প্রকৃত নাম ছিল আবু-অল-হাসান; কবিত্বের জন্য ইহার উপাধি হইয়াছিল 'তুতী-ই-হিন্দ' অর্থাৎ হিন্দুস্থানের তোতাপাখী। আলাউদ্দীন খিলিজির রাজত্ব সময়ে ইহার জন্ম ও ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। খস্রুর সমাধির উত্তরে একখণ্ড লম্বা শ্বেতপ্রস্তর আছে; তদুপরি মুসলমান ধর্ম্মের মর্ম্ম ও ১৮টী পারসী কবিতা খোদিত আছে। এই সমাধিরই সন্নিকটে সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের পুত্র মির্জা জাহাঙ্গীরের কবর। পূর্ব্বোল্লিখিত ঘেরাস্থানের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে সম্রাট প্রথম মহম্মদ সা'র (রাজত্বকাল ১৭১২—১৭৪৮ খৃঃ) সমাধি। উহার দক্ষিণে সাজাহানের কন্যা জাহানারার কবর। কবরের শিয়রদেশে পারসী ভাষায় নিম্নলিখিত বাক্যাবলী লিখিত -

> সবুজ ঘাস ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ দ্বারা আমার কবর আবৃত করিয়োনা। ঘাসই শান্ত প্রকৃতি লোকের কবরের যোগ্য আচ্ছাদন।

শোনা যায় উপরি-উক্ত বাক্যাবলী শাহাজাদীর নিজেরই রচিত।

জাহানারার কবরের বামে দ্বিতীয় সা আলমের পুত্র আলি গৌহর মির্জার এবং দক্ষিণে দ্বিতীয় আকবরের কন্যা জমিলা নেসার সমাধি।

দিল্লীর শেষ বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্।

নিজামুদ্দীন উচ্চশ্রেণীর সাধু পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সমাধি শ্বেতমর্ম্মরে রচিত। সমাধির উত্তরে ৩৯ ফুট গভীর একটী কূপ আছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই কূপে কেহ ডুবিয়া না যায় সেই জন্য নিজামুদ্দীন ইহাকে মন্ত্রপূত করিয়া গিয়াছেন। সামান্য বক্‌সিসের লোভে স্থানীয় বালকগণ অদ্যাপি ৫০ ফুট উচ্চ স্থান হইতে নিরাপদে এই কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে।

তোগলকাবাদ দুর্গ ও তোগলকাবাদ সহর—কুতব হইতে ৪ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী, পূর্ব্বদিকে স্থিত। দুর্গের ১৩টী তোরণ এবং দুর্গ মধ্যে সাতটী পুষ্করিণী এবং জুম্মামসজিদ ও ব্রহ্মমন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। ইহার নির্ম্মাণকার্য্য ১৩২১ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ ও ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। দুর্গ হইতে ৬০০ ফুট লম্বা একটী সেতু একটী কৃত্রিম হ্রদমধ্যস্থ তোগলক সা'র সমাধির সহিত সংযুক্ত। ঐ সমাধি-মন্দিরের মধ্যে তোগলক সা'র, তৎপত্নীর ও তৎপুত্র জুনা খাঁর (যিনি পরে

মহম্মদ তোগলক নামে পরিচিত হইয়াছিলেন) কবর। এই স্থান হইতে একটী রাস্তা আদিলাবাদস্থ মহম্মদ তোগলক দুর্গ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর অবস্থা।

দিল্লীর রাজবিদ্রোহ মিরাটের সিপাহী-বিদ্রোহেরই ফল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে ৩য় সংখ্যক ভারতীয় অশ্বারোহী এবং ১১ ও ২০ সংখ্যক সিপাহী পদাতিক সৈন্যদল মিরাটে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। এবং তত্রত্য ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের গৃহে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয়। দিল্লীর ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্য বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে এবং দুর্গের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ৩৮ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যগণকেও বিদ্রোহী হইবার জন্য উৎসাহিত করে। ইহাদের হস্তে দিল্লীর গির্জ্জাসমূহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ নিহত হয়। ৫৪ সংখ্যক ভারতীয় পদাতিকগণও এই সময়ে ৩৮ সংখ্যক সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজ সেনানীগণকে গুলি করিয়া হত্যা করিতে আরম্ভ করে। মেজর এবট্ ৭৪ সংখ্যক পদাতিকগণের সহায়তায় এই বিদ্রোহ দমন করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কোন প্রকারেই সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। ফলে দুর্গ সমেত দিল্লীনগরী বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়।

কিন্তু অবিলম্বেই গবর্ণমেণ্ট দিল্লীতে গোরা ও রাজপক্ষীয় সিপাহী সৈন্য সমাবেশের বন্দোবস্ত করেন। সার এইচ্, বানার্ডের অধীন কার্নাল ও মিরাটের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিদ্রোহীদল বদ্‌লী কি-সরাই নামক স্থানে পরাজিত হয় এবং রিজ ইংরেজের অধিকারভুক্ত হয়। ইংরেজসৈন্য তখন এই রিজে থাকিয়াই বিদ্রোহদমনে যত্নবান হয়। হিন্দু রাওর বাড়ীর সন্নিকটে, ফ্লাগ্ ষ্টাফ্ টাওয়ারে, বীক্ষণাগারে ও অপরাপর উপযুক্ত স্থলে আশ্রয় লইয়া রাজপক্ষ সিপাহীদের প্রতি গুলি চালাইতে থাকে। ১২ই হইতে ১৮ই জুনের মধ্যে চারিবার বিদ্রোহীদল ইংরেজ শিবিরের সম্মুখ ও পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করে। ২৩শে তারিখেও ইহাদের সহিত ইংরেজের একটী সংঘর্ষ

বাহাদুর শাহের বেগম জেনৎ মহল।

হয়। ১৪ই জুলাই হিন্দু রাওর বাড়ীর সন্নিকটে উভয়পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হয়।

১৪ই আগষ্ট জেনারেল নিকোলসন্ পঞ্জাব হইতে সসৈন্যে দিল্লী আগমন করেন। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদল নজফগড় নামক স্থানে পরাজিত হয়। ইংরেজসৈন্যের যথেষ্ট সমাবেশে এই সময়ে রাজপক্ষও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে; অতঃপর ইহারা একাংশের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া নগর-প্রবেশের মানসে একদল সৈন্যকে মরী ও কাশ্মীর তোরণ এবং ওয়াটার বেষ্টিয়নের পথে যুদ্ধার্থ সজ্জিত করিয়া রাখে। ১১ই সেপ্টেম্বর ইহারা উপরি-উক্ত প্রাচীর ভগ্ন করিতে সমর্থ হয়। ১২ই তারিখের প্রচেষ্টায় ওয়াটার বেষ্টিয়ন বিধ্বস্ত হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর নিকোলসন্ কাশ্মীর বেষ্টিয়ন আক্রমণের আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে ১ম ও ২য় সৈন্যদল বেষ্টিয়নের পোস্তার উপর আরোহণ করে এবং বিদ্রোহীদলের নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাত সহ্য করিয়াও অধিকৃত স্থল রক্ষা করে। নিকোলসন্ নিজেই অতঃপর

প্রাচীরের উপর উঠিয়া দাঁড়ান এবং ১ম সৈন্যদলকে ঐস্থলের রক্ষীস্বরূপে সমাবেশ করিয়া রাখেন। -য় সৈন্যদল মোরী বেষ্টিয়ন ধ্বংস করিয়া কাবুল-তোরণ অধিকার করে। বিদ্রোহীদল লাহোর তোরণে অবস্থিত থাকিয়া ইংরেজদিগকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে। এই স্থানের যুদ্ধে তোরণদ্বার ভগ্ন করিতে যাইয়া নিকোলসন্ নিজে জীবন বিসর্জ্জন দেন।

কাশ্মীর-তোরণ ভগ্ন করিয়া তৃতীয় দল সৈন্যের দিল্লী প্রবেশের বন্দোবস্ত ছিল। প্রথমতঃ ইহারা এই কার্য্যে ততদূর সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই; পক্ষান্তরে এই স্থানের যুদ্ধে ইহাদের পক্ষের অনেক বীর সৈনিক নিহত হয়। বহু চেষ্টার পর কাশ্মীর-তোরণ বিধ্বস্ত হইলে সৈন্যদল এই পথে নগর-প্রবেশ করে। এই প্রকারে ছয়দিন যুদ্ধের পর প্রাচীরবেষ্টিত দিল্লী নগরী পুনরায় ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ২১শে তারিখে সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর সা ধৃত হইয়া রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হ'ন। ইঁহার দুটী পুত্র ও একটী পৌত্রকে ধৃত করিয়া হড্‌সন সাহেব গুলি করিয়া হত্যা করেন এবং উঁহাদের মৃতদেহ ২৪ ঘণ্টার জন্য কোতোয়ালীর সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখেন।

১৮৫৭ সালের এই বিজয়-বার্ত্তা সজীব রাখিবার জন্য দিল্লীতে একটা 'বিদ্রোহ-স্মৃতিমন্দির' (Mutiny Memorial) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্মৃতিফলকে সিপাহী-যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, যোদ্ধৃগণের নামধাম এবং রণক্ষেত্রে নিহত বীরগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। স্মৃতি-মন্দিরটা গথিক ধরণে নির্ম্মিত একটা অষ্টকোণ শৃঙ্গবিশেষ। তিনটা ক্রম-সঙ্কুচিত মঞ্চের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত।

রিজের দক্ষিণে বাওয়ারী মাঠ—এই স্থানেই লর্ড লিটনের সময়ের (১৮৭৭ খৃঃ, ১লা জানুয়ারী) দরবার ও কর্জ্জনের আমলের (১৯০৩ খৃঃ, ১লা জানুয়ারী) অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

রূপ ও অরূপ

জগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানিতেছি সেই জানাটাকে আমাদের দেশে মায়া বলে। বস্তুত তাহার মধ্যে যে একটা মায়ার ভাব আছে তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞান বলে না আধুনিক বিজ্ঞানও বলিয়া থাকে। কোনো জিনিষ বস্তুত স্থির নাই, তাহার সমস্ত অণু পরমাণু নিয়ত কম্পমান অথচ জানিবার বেলায় এবং ব্যবহারকালে আমরা তাহাকে স্থির বলিয়াই জানিতেছি। নিবিড়তম বস্তুও জালের মত ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ জানিবার বেলায় তাহাকে আমরা অচ্ছিদ্র বলিয়াই জানি। স্ফটিক জিনিষটা যে কঠিন জিনিষ তাহা দুর্য্যোধন একদিন ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন অথচ আলোকের কাছে যেন সে জিনিষটা একেবারে নাই বলিলেই হয়। এদিকে যে মহাপ্রবল আকর্ষণ সূর্য্য হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে সূর্য্যে প্রসারিত যাহা লক্ষ কোটি হাতির বলকে পরাস্ত করে আমরা তাহার ভিতর দিয়া চলিতেছি কিন্তু মাকড়ষার জালটুকুর মতও তাহা আমাদের গায়ে ঠেকিতেছে না। আমাদের সম্বন্ধে যেটা আছে এবং যেটা নাই অস্তিত্বরাজ্যে যমজ ভাইয়ের মত তাহারা হয়ত উভয়েই পরমাত্মীয়; তাহাদের মাঝখানে হয়ত একেবারেই ভেদ নাই। বস্তু-মাত্রই একদিক থেকে দেখিতে গেলে বাষ্প—সেই বাষ্প ঘন হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে দৃঢ় আকারে বদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখি কিন্তু উত্তাপের তাড়ায় তাহা আল্‌গা হইয়া গেলেই মরীচিকার মত তাহা ক্রমশই দৃষ্টির অগোচর হইবার উপক্রম করিতে থাকে। বস্তুত হিমালয় পর্ব্বতের উপরকার মেঘের সহিত হিমালয়ের প্রভেদকে আমরা গুরুতর বলি বটে কিন্তু সেই গুরুতরত্ব ভাবিয়া দেখিলেই লঘু হইয়া পড়ে। মেঘ যেমন অদৃশ্য বাষ্পের চেয়ে নিবিড়তর, হিমালয়ও সেইরূপ মেঘের চেয়ে নিবিড়তর।

তারপর কালের ভিতর দিয়া দেখ সমস্ত জিনিষই প্রবহমান। তাই আমাদের দেশে বিশ্বকে জগৎ বলে—সংসার বলে; তাহা মুহূর্ত্তকাল স্থির নাই, তাহা কেবলি চলিতেছে, সরিতেছে।

যাহা কেবলি চলে, সরে, তাহার রূপ দেখি কি করিয়া? রূপের মধ্যে ত একটা স্থিরত্ব আছে। যাহা চলিতেছে,

তাহাকে, যেন চলিতেছে না, এমন ভাবে না দেখিলে আমরা দেখিতেই পাই না। লাঠিম যখন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে তখন আমরা তাহাকে স্থির দেখি। মাটি ভেদ করিয়া যে অঙ্কুরটি বাহির হইয়াছে প্রতি নিমেষেই তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়াই তাহার পরিণতি ঘটে। কিন্তু যখন তাহার দিকে তাকাই সে কিছুমাত্র ব্যস্ততা দেখায় না; যেন অনন্তকাল সে এই রকম অঙ্কুর হইয়াই খুসি থাকিবে, যেন তাহার বাড়িয়া উঠিবার কোনো মৎলবই নাই। আমরা তাহাকে পরিবর্ত্তনের ভাবে দেখি না, স্থিতির ভাবেই দেখি।

এই পৃথিবীকে আমরা ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখিতেছি বলিয়াই ইহাকে ধ্রুব বলিয়া বর্ণনা করিতেছি—ধরণী আমাদের কাছে ধৈর্য্যের প্রতিমা। কিন্তু বৃহৎকালের মধ্যে ইহাকে দেখিতে গেলে ইহার ধ্রুবরূপ আর দেখি না তখন ইহার বহুরূপী মূর্ত্তি ক্রমেই ব্যাপ্ত হইতে হইতে এমন হইয়া আসে যে, আমাদের ধারণার অগোচর হইয়া যায়। আমরা বীজকে ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বীজরূপে দেখিতেছি কিন্তু বৃহৎকালে তাহাকে দেখিতে গেলে তাহা গাছ হইয়া অরণ্য-পরম্পরার মধ্য দিয়া নানা বিচিত্ররূপে ধাবিত হইয়া পাথুরে কয়লার খনি হইয়া আগুনে পুড়িয়া ধোঁয়া হইয়া ছাই হইয়া ক্রমে যে কি হইয়া যায় তাহার আর উদ্দেশ পাওয়াই শক্ত।

আমরা ক্ষণকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধরিয়া যাহাকে জমাট করিয়া দেখি বস্তুত তাহার সেরূপ নাই কেন না সত্যই তাহা বদ্ধ হইয়া নাই এবং ক্ষণকালেই তাহার শেষ নহে। আমরা দেখিবার জন্য জানিবার জন্য তাহাকে স্থির করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে যে নাম দিতেছি সে নাম তাহার চিরকালের সত্য নাম নহে। এই জন্যই আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি জানিতেছি বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহাকে মায়া বলা হইয়াছে। নাম ও রূপ যে শাশ্বত নহে একথা আমাদের দেশের চাষারাও বলিয়া থাকে।

কিন্তু গতিকে এই যে স্থিতির মধ্য দিয়া আমরা জানি এই স্থিতির তত্ত্বটা ত আমাদের নিজের গড়া নহে। আমাদের গড়িবার ক্ষমতা কিসের? অতএব, গতিই সত্য, স্থিতি সত্য নহে, একথা বলিলে চলিবে কেন? বস্তুত সত্যকেই আমরা ধ্রুব বলিয়া থাকি, নিত্য বলিয়া থাকি। সমস্ত চঞ্চলতার মাঝখানে একটি স্থিতি আছে বলিয়া সেই বিধৃতিসূত্রে আমরা যাহা কিছু জানিতেছি নহিলে সেই জানার বালাইমাত্র থাকিত না—যাহাকে মায়া বলিতেছি তাহাকে মায়াই বলিতে পারিতাম না যদি কোনোখানে সত্যের উপলব্ধি না থাকিত।

সেই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ বলিতেছেন "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।" সেই নিত্য পুরুষের প্রশাসনে, হে গার্গি, নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র অর্দ্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর সকল বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

অর্থাৎ এই সমস্ত নিমেষ মুহূর্ত্তগুলিকে আমরা একদিকে দেখিতেছি চলিতেছে কিন্তু আর একদিকে দেখিতেছি তাহা একটি নিরবচ্ছিন্নতাসূত্রে বিধৃত হইয়া আছে। এইজন্যই কাল বিশ্বচরাচরকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া যাইতেছে না, তাহাকে সর্ব্বত্র জুড়িয়া গাঁথিয়া চলিতেছে। তাহা জগৎকে চকমকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গ পরম্পরার মত নিক্ষেপ করিতেছে না, আদ্যন্ত যোগযুক্ত শিখার মত প্রকাশ করিতেছে। তাহা যদি না হইত তবে আমরা মুহূর্ত্তকালকেও জানিতাম না। কারণ আমরা এক মুহূর্ত্তকে অন্য মুহূর্ত্তের সঙ্গে যোগেই জানিতে পারি বিচ্ছিন্নতাকে জানাই যায় না। এই যোগের তত্ত্বই স্থিতির তত্ত্ব। এইখানেই সত্য, এইখানেই নিত্য।

যাহা অনন্ত সত্য, অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি, তাহা অনন্ত গতির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এইজন্য সকল প্রকাশের মধ্যেই দুই দিক আছে। তাহা একদিকে বদ্ধ, নতুবা প্রকাশই হয় না, আর একদিকে মুক্ত, নতুবা অনন্তের প্রকাশ হইতে পারে না। একদিকে তাহা হইয়াছে আর একদিকে তাহার হওয়া শেষ হয় নাই, তাই সে কেবলি চলিতেছে। এইজন্যই জগৎ জগৎ, সংসার সংসার। এইজন্য কোনো বিশেষরূপ আপনাকে চরমভাবে বদ্ধ করে না—যদি করিত তবে সে অনন্তের প্রকাশকে বাধা দিত।

তাই যাঁহারা অনন্তের সাধনা করেন, যাঁহারা সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহাদিগকে বারবার এ কথা চিন্তা করিতে হয়, চারিদিকে যাহা কিছু দেখিতেছি জানিতেছি

ইহাই চরম নহে, স্বতন্ত্র নহে, কোনো মুহূর্ত্তেই ইহা আপনাকে আপনি পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতেছে না—যদি তাহা করিত তবে ইহারা প্রত্যেকে স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ হইয়া স্থির হইয়া থাকিত। ইহারা অন্তহীন গতি দ্বারা যে অন্তহীন স্থিতিকে নির্দ্দেশ করিতেছে সেই খানেই আমাদের চিত্তের চরম আশ্রয় চরম আনন্দ।

অতএব আধ্যাত্মিক সাধনা কখনই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গোচর যে কোনো বস্তু আপনাকেই চরম বলিয়া স্বতন্ত্র বলিয়া ভাণ করিতেছে, সাধক তাহার সেই ভাণের আবরণ ভেদ করিয়া পরম পদার্থকে দেখিতে চায়। ভেদ করিতেই পারিত না যদি এই সমস্ত নাম রূপের আবরণ চিরন্তন হইত। যদি ইহারা অবিশ্রাম প্রবহমান ভাবে নিয়তই আপনার বেড়া আপনিই ভাঙিয়া না চলিত তবে ইহারা ছাড়া আর কিছুর জন্য কোনো চিন্তাও মানুষের মনে মুহূর্ত্তকালের জন্য স্থান পাইত না তবে ইহাদিগকেই সত্য জানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতাম—তবে বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই সমস্ত অচল প্রত্যক্ষ সত্যের ভীষণ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া একেবারে মূক হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিত। ইহার পিছনে কিছুই দেখিতে পাইত না। কিন্তু, সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলি চলিতেছে বলিয়াই, সারি সারি দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অখণ্ড সত্যের, অক্ষর পুরুষের, সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া সেই পুরুষের কাছেই আপনার সমস্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা। সুতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোনো মতে উজান পথে চলিতে পারে না।

এই ত আধ্যাত্মিক সাধনা। শিল্প-সাহিত্যের সাধনাটা কি? এই সাধনায় মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপের ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকেই ফিরিয়া দেখিতেছে।

সৌন্দর্য্যের মধ্যে আনন্দ আপনাকেই বাহিরে দেখিতে পায়—সেই জন্যই সৌন্দর্য্যের গৌরব। মানুষ আপনার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখিতে পায়—শিল্পীর শিল্পে কবির কাব্যে মানুষের সেই জন্যই এত অনুরাগ। শিল্পে সাহিত্যে মানুষ কেবলি যদি বাহিরের রূপকেই দেখিত আপনাকে না দেখিত তবে সে শিল্প-সাহিত্য তাহার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হইত।

এই জন্যই শিল্পে-সাহিত্যে ভাব ব্যঞ্জনার (Suggestiveness) এত আদর। এই ভাব ব্যঞ্জনার দ্বারা রূপ আপনার একান্ত ব্যক্ততা যথাসম্ভব পরিহার করে বলিয়াই অব্যক্তের অভিমুখে আপনাকে বিলীন করে বলিয়াই মানুষের হৃদয় তাহার দ্বারা প্রতিহত হয় না। রাজোদ্যানের সিংহদ্বারটা কেমন? তাহা যতই অভ্রভেদী হৌক্, তাহার কারুনৈপুণ্য যতই থাক্, তবু সে বলে না আমাতে আসিয়াই সমস্ত পথ শেষ হইল। আসল গন্তব্য স্থানটি যে তাহাকে অতিক্রম করিয়াই আছে এই কথাই তাহার জানাইবার কথা। এই জন্য সেই তোরণ কঠিন পাথর দিয়া যত দৃঢ় করিয়াই তৈরি হউক্ না কেন, সে আপনার মধ্যে অনেক খানি ফাঁক রাখিয়া দেয়। বস্তুত সেই ফাঁকটাকেই প্রকাশ করিবার জন্য সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যতটা আছে তাহার চেয়ে নাই অনেক বেশি। তাহার সেই "নাই" অংশটাকে যদি সে একেবারে ভরাট করিয়া দেয় তবে সিংহোদ্যানের পথ একেবারেই বন্ধ। তবে তাহার মত নিষ্ঠুর বাধা আর নাই। তবে সে দেয়াল হইয়া উঠে এবং যাহারা মূঢ় তাহারা মনে করে এইটেই দেখিবার জিনিষ, ইহার পশ্চাতে আর কিছুই নাই; এবং যাহারা সন্ধান জানে তাহারা ইহাকে অতি স্থূল একটা মূর্ত্তিমান বাহুল্য জানিয়া অন্যত্র পথ খুঁজিতে বাহির হয়। রূপ মাত্রই এইরূপ সিংহদ্বার। সে আপনার ফাঁকটা লইয়াই গৌরব করিতে পারে। সে আপনাকেই নির্দ্দেশ করিলে বঞ্চন করে, পথ নির্দ্দেশ করিলেই সত্য কথা বলে। সে ভূমাকে দেখাইবে, আনন্দকে প্রকাশ করিবে, কি শিল্পে সাহিত্যে কি জগৎ-সৃষ্টিতে এই তাহার একমাত্র কাজ। কিন্তু সে প্রায় মাঝে মাঝে দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত দাসের মত আপনার প্রভুর সিংহাসনে চড়িয়া বসিবার আয়োজন করে। তখন তাহার সেই স্পর্দ্ধায় আমরা যদি যোগ

দিই তবে বিপদ ঘটে—তখন তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলাই তাহার সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য তা সে যতই প্রিয় হোক্, এমন কি, সে যদি আমার নিজেরই অহংরূপটা হয় তবুও। বস্তুত রূপ যাহা তাহাকে তাহার চেয়ে বড় করিয়া জানিলেই সেই বড়কে হারানো হয়।

মানুষের সাহিত্য-শিল্পকলায় হৃদয়ের ভাব রূপে ধরা দেয় বটে কিন্তু রূপে বদ্ধ হয় না। এই জন্য সে কেবলি নব নব রূপের প্রবাহ সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই প্রতিভাকে বলে "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি।" প্রতিভা রূপের মধ্যে চিত্তকে ব্যক্ত করে কিন্তু বন্দী করে না—এই জন্য নব নব উন্মেষের শক্তি তাহার থাকা চাই।

মনে করা যাক্ পূর্ণিমা রাত্রির শুভ্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া কোনো কবি বর্ণনা করিতেছেন যে, সুরলোকে নীলকান্ত-মণিময় প্রাঙ্গণে সুরাঙ্গনারা নন্দনের নবমল্লিকায় ফুলশয্যা রচনা করিতেছেন। এই বর্ণনা যখন আমরা পড়ি তখন আমরা জানি পূর্ণিমা রাত্রি সম্বন্ধে এই কথাটা একেবারে শেষ কথা নহে—অসংখ্য ব্যক্ত এবং অব্যক্ত কথার মধ্যে এ একটা কথা;—এই উপমাটিকে গ্রহণ করার দ্বারা অন্য অগণ্য উপমার পথ বন্ধ করা হয় না, বরঞ্চ পথকে প্রশস্তই করা হয়।

কিন্তু যদি আলঙ্কারিক বলপূর্ব্বক নিয়ম করিয়া দেন যে, পূর্ণিমা রাত্রি সম্বন্ধে সমস্ত মানবসাহিত্যে এই একটি মাত্র উপমা ছাড়া আর কোনো উপমাই হইতে পারে না—যদি কেহ বলে, কোনো দেবতা রাত্রে স্বপ্ন দিয়াছেন যে এইরূপই পূর্ণিমার সত্য রূপ—এই রূপকেই কেবল ধ্যান করিতে হইবে, প্রকাশ করিতে হইবে, কাব্যে পুরাণে এই রূপেরই আলোচনা করিতে হইবে, তবে পূর্ণিমা সম্বন্ধে সাহিত্যের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে এরূপ চরম উপমার দৌরাত্ম্য একেবারে অসহ্য—কারণ ইহা মিথ্যা। যতক্ষণ ইহা চরম ছিলনা ততক্ষণই ইহা সত্য ছিল। বস্তুত এই কথাটাই সত্য যে পূর্ণিমা সম্বন্ধে নিত্য নব নব রূপে মানুষের আনন্দ আপনাকেই প্রকাশ করে কোনো বিশেষ একটিমাত্র রূপই যদি সত্য হয় তবে সেই আনন্দই মিথ্যা হইয়া যায়। জগৎ সৃষ্টিতেও যেমন সৃষ্টিকর্ত্তার আনন্দ কোনো একটিমাত্র রূপে আপনাকে চিরকাল বদ্ধ করিয়া শেষ করিয়া ফেলে নাই,—অনাদিকাল হইতে তাহার নব নব বিকাশ চলিয়া আসিতেছে, তেমনি সাহিত্যশিল্প সৃষ্টিতেও মানুষের আনন্দ কোনো একটিমাত্র উপমায় বর্ণনায় আপনাকে চিরকালের মত বন্দী করিয়া থামিয়া যায় নাই, সে কেবলি নব নব প্রকাশের মধ্যে লীলা করিতেছে। কারণ, রূপ জিনিষটা কোনো কালে বলিতে পারিবে না যে, আমি এইখানেই থামিয়া দাঁড়াইলাম, আমিই শেষ—সে যদি চলিতে না পারে তবে তাহাকে বিকৃত হইয়া মরিতে হইবে। বাতি যেমন ছাই হইতে হইতে শিখাকে প্রকাশ করে, রূপ তেমনি কেবলি আপনাকে লোপ করিতে করিতে একটি শক্তিকে আনন্দকে প্রকাশ করিতে থাকে। বাতি যদি নিজে অক্ষয় হইতে চায় তবে শিখাকেই গোপন করে—রূপ যদি আপনাকেই ধ্রুব করিতে চায় তবে সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া তাহার উপায় নাই। এইজন্য রূপের অনিত্যতাই রূপের সার্থকতা, তাহাই তাহার গৌরব। রূপ নিত্য হইবার চেষ্টা করিলেই ভয়ঙ্কর উৎপাত হইয়া ওঠে।—সুরের অমৃত অসুর পান করিলে স্বর্গ-লোকের বিপদ—তখন বিধাতার হাতে তাহার অপঘাত মৃত্যু ঘটে। পৃথিবীতে ধর্ম্মে কর্ম্মে সমাজে সাহিত্যে শিল্পে সকল বিষয়েই আমরা ইহার প্রমাণ পাই। মানুষের ইতিহাসে যত কিছু ভীষণ বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহার মূলেই রূপের এই অসাধু চেষ্টা আছে। রূপ যখনি একান্ত হইয়া উঠিতে চায় তখনি তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া মানুষ তাহার অত্যাচার হইতে মনুষ্যত্বকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হয়।

বর্ত্তমানকালে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখন প্রতিমা পূজার সমর্থন করেন তখন তাঁহারা বলেন প্রতিমা জিনিষটা আর কিছুই নহে, উহা ভাবকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে বৃত্তি শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করে ইহাও সেই বৃত্তির কাজ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কথাটা সত্য নহে। দেবমূর্ত্তিকে, উপাসক কখনই সাহিত্য হিসাবে দেখেন না। কারণ, সাহিত্যে আমরা কল্পনাকে মুক্তি দিবার জন্যেই রূপের সৃষ্টি করি—দেবমূর্ত্তিতে আমরা কল্পনাকে বদ্ধ করিবার জন্যই চেষ্টা

করিয়া থাকি। আমরা কল্পনাকে তখনই কল্পনা বলিয়া জানি যখন তাহার প্রবাহ থাকে, যখন তাহা এক হইতে আর-একের দিকে চলে, যখন তাহার সীমা কঠিন থাকে না; তখনি কল্পনা আপনার সত্য কাজ করে। সে কাজটি কি, না সত্যের অনন্তরূপকে নির্দ্দেশ করা। কল্পনা যখন থামিয়া গিয়া কেবলমাত্র একটি রূপের মধ্যে একান্তভাবে দেহধারণ করে তখন সে আপনার সেই রূপকেই দেখায়, রূপের অতীতকে অনন্ত সত্যকে আর দেখায় না। সেইজন্য বিশ্বজগতের বিচিত্র ও নিত্যপ্রবাহিত রূপের চিরপরিবর্ত্তনশীল অন্তহীন প্রকাশের মধ্যেই আমরা অনন্তের আনন্দকে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাই। জগতের রূপ কারাপ্রাচীরের মত অটল অচল হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিলে কখনই তাহার মধ্যে আমরা অনন্তের আনন্দকে জানিবার অবকাশমাত্র পাইতাম না। কিন্তু যখনি আমরা বিশেষ দেবমূর্ত্তিকে পূজা করি তখনি সেই রূপের প্রতি আমরা চরমসত্যতা আরোপ করি। রূপের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মকে লোপ করিয়া দিই—রূপকে তেমন করিয়া দেখিবামাত্রই তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেওয়া হয়, সেই মিথ্যার দ্বারা কখনই সত্যের পূজা হইতে পারে না।

তবে কেন কোনো কোনো বিদেশী ভাবুকের মুখে আমরা প্রতিমাপূজার সম্বন্ধে ভাবের কথা শুনিতে পাই? তাহার কারণ, তাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা পূজক নহেন। তাঁহারা যতক্ষণ ভাবুকের দৃষ্টিতে কোনো মূর্ত্তিকে দেখিতেছেন ততক্ষণ তাঁহারা তাহাকে চরম করিয়া দেখিতেছেন না। একজন খৃষ্টানও তাঁহার কাব্যে সরস্বতীর বন্দনা করিতে পারেন; কারণ সরস্বতী তাঁহার কাছে ভাবের প্রকাশমাত্র—গ্রীসের এথিনীও তাঁহার কাছে যেমন, সরস্বতীও তেমনি। কিন্তু সরস্বতীর যাঁহারা পূজক তাঁহারা এই বিশেষ মূর্ত্তিকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তের এই একটিমাত্র রূপকেই তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন—তাঁহাদের ধারণাকে তাঁহাদের ভক্তিকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত করিতেই পারেন না।

এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্য্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তিউপাসক কোনো একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেননা "সিংহ মায়ের বাহন।" শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়। কারণ, যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ-উদ্ভাবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি—যদি তাহা কোনো এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।

যাহা স্বভাবতই প্রবহমান তাহাকে কোনো একটা জায়গায় রুদ্ধ করিবামাত্র তাহা যে মিথ্যা হইয়া উঠিতে থাকে সমাজে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আচার জিনিষটা অনেক স্থলেই সেই বন্ধন-আকার ধারণ করে। তাহার সময় উত্তীর্ণ হইলেও অভ্যাসের আসক্তিবশত আমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাই না। যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য চলা এবং চালানো, এক সময়ে তাহাকেই আমরা খোঁটার মত ব্যবহার করি, অথচ মনে করি যেন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে।

একটা উদাহরণ দিই। জগতে বৈষম্য আছে। বস্তুত বৈষম্য সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। কিন্তু সেই বৈষম্য ধ্রুব নহে। পৃথিবীতে ধনমান বিদ্যাক্ষমতা এক জায়গায় স্থির নাই, তাহা আবর্ত্তিত হইতেছে। আজ যে ছোট কাল সে বড়, আজ যে ধনী কাল সে দরিদ্র। বৈষম্যের এই চলাচল আছে বলিয়াই মানবসমাজে স্বাস্থ্য আছে। কেননা বৈষম্য না থাকিলে গতিই থাকেনা—উঁচুনীচু না থাকিলে নদী চলে না, বাতাসে তাপের পার্থক্য না থাকিলে বাতাস বহে না। যাহা চলে না এবং যাহা সচল পদার্থের সঙ্গে যোগ রাখে না তাহা দূষিত হইতে থাকে। অতএব, মানবসমাজে উচ্চ নীচ আছেই, থাকিবেই এবং থাকিলেই ভাল, একথা মানিতেই হইবে।

কিন্তু এই বৈষম্যের চলাচলকে যদি বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া ফেলি, যদি একশ্রেণীর লোককে পুরুষানুক্রমে মাথায় করিয়া রাখিব এবং আর এক শ্রেণীকে পায়ের তলায়

ফেলিব এই বাঁধা নিয়ম একেবারে পাকা করিয়া দিই তবে বৈষম্যের প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যই একেবারে মাটি করিয়া ফেলি। যে বৈষম্য চাকার মত আবর্ত্তিত হয় না, সে বৈষম্য নিদারুণ ভাবে মানুষকে চাপিয়া রাখে, তাহা মানুষকে অগ্রসর করে না। জগতে বৈষম্য ততক্ষণ সত্য যতক্ষণ তাহা চলে, যতক্ষণ তাহা মুক্ত - জগতে লক্ষ্মী যতক্ষণ চঞ্চলা ততক্ষণ তিনি কল্যাণদায়িণী লক্ষ্মীকে এক জায়গায় চিরকাল বাঁধিতে গেলেই তিনি অলক্ষ্মী হইয়া উঠেন। কারণ, চঞ্চলতার দ্বারাই লক্ষ্মী বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে আনেন। দুঃখী চিরদিন দুঃখী নয়, সুখী চিরদিন সুখী নয়—এইখানেই সুখীতে দুঃখীতে সাম্য আছে। সুখ দুঃখের এই চলাচল আছে বলিয়াই সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বে মানুষের মঙ্গল ঘটে।

তাই বলিতেছি, সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে, যেরূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করিতে থাকে তাহা বদ্ধরূপ নহে, তাহা একরূপ নহে, তাহা প্রবহমান এবং তাহা বহু। এই সত্যসুন্দর মঙ্গলের প্রকাশকে যখনি আমরা বিশেষ দেশে কালে পাত্রে বিশেষ আকারে বা আচারে বদ্ধ করিতে চাই তখনি তাহা সত্যসুন্দর মঙ্গলকে বাধাগ্রস্ত করিয়া মানবসমাজে দুর্গতি আনয়ন করে। রূপমাত্রের মধ্যেই যে একটি মায়া আছে, অর্থাৎ যে চঞ্চলতা অনিত্যতা আছে, যে অনিত্যতাই সেই রূপকে সত্য ও সৌন্দর্য্য দান করে, যে অনিত্যতাই তাহার প্রাণ, সেই কল্যাণময়ী অনিত্যতাকে কি সংসারে, কি ধর্ম্মসমাজে, কি শিল্পসাহিত্যে, প্রথার পিঞ্জরে অচল করিয়া বাঁধিতে গেলে আমরা কেবল বন্ধনকেই লাভ করি, গতিকে একেবারেই হারাইয়া ফেলি। এই গতিকে যদি হারাই তবে শিকলে বাঁধা পাখী যেমন আকাশকে হারায় তেমনি আমরা অনন্তের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হই সুতরাং সত্যের চিরমুক্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং চারিদিক হইতে নানা অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য প্রমাদ আমাদিগকে মায়াবী নিশাচরের মত আক্রমণ করিতে থাকে। স্তব্ধ হইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া আমাদিগকে তাহা সহ্য করিতে হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীনের জাতীয় সঙ্গীত

সোনার ঝাঁপিটি অটুট থাকুক—
মোদের সোনার দেশ;
আশ্রয়-ভূমি আমাদের তুমি
যুগে যুগে, পরমেশ!
পদ্ম সায়রে মরালের মত
সুখে এ দেশের থাক লোক যত;
সমান হউক হৃদয় পরাণ
সমান যাদের বেশ।
জন্মেছি মোরা কীর্ত্তি-ভুবনে,
অমৃত-বর্ত্তি পেয়েছি জীবনে;
দেব-রক্ষিত রাজা আমাদের
রাজ-রক্ষিত দেশ!
গগনে যেমন অগণন তারা
রাজার স্ব-গণ হোক্ তারি পারা,
অশেষ যেমন সাগর প্রবাহে
লহরের উন্মেষ!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জন্মদুঃখী

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আকস্মিক আবির্ভাব।

মিস্ত্রি হইবার কিছুদিন পরেই মাতৃস্নেহে বঞ্চিত নিকোলা মাকে ফিরিয়া পাইল। হঠাৎ একদিন বার্ব্বারা আসিয়া হাজির। নিকোলা যে এখন রোজগার করিতে শিখিয়াছে সে খবর বার্ব্বারা গ্রামে বসিয়াই পাইয়াছে। একখানা তক্তা বোঝাই গাড়ী সহরে আসিতেছিল, উহার গাড়োয়ানকে বলিয়া কহিয়া ঐ গাড়ীটাতে চড়িয়াই বার্ব্বারা সহরে আসিয়াছে। বেচারী ভারি খুসী। সে নিকোলার জন্য কত কাঁদিয়াছে,—বলিতে বলিতে সত্য সত্যই সে পাটকরা রুমাল দিয়া পুনঃ পুনঃ অশ্রু মার্জ্জনা করিতে লাগিল।

বার্ব্বারা অনেক দুঃখ সহ্য করিয়াছে; তবে, ছেলে যখন মানুষ হইয়াছে,—ছেলেকে যখন সে ফিরিয়া পাইয়াছে, তখন আর ভাবনা নাই। নিকোলা এখন কত বড়টি হইয়াছে। বলি, গির্জ্জায় যাইবার মত ভাল জামাজোড়া তৈয়ার করাইয়াছে তো? একটা টুপি তাহাকে কিনিতেই হইবে। এসব বিষয়ে মার কথা শুনিতেই হইবে। অবস্থার মত ব্যবস্থা নহিলে লোকে কি বলিবে? বার্ব্বারা পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে নিকোলাকে যথেষ্ট উপদেশ দিতে পারিবে। সে সংসারের অনেক দেখিয়াছে।

নিকোলা মার উপর খুসী হইবে কি চটিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। বার্ব্বারার আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে খরচ এবং বাজে খরচ অনেক বাড়িয়া উঠিল।

নিকোলা বহুবৎসর মাকে দেখে নাই; মাতার যে ছবি তাহার অন্তরে অঙ্কিত ছিল তাহাও অজস্র অশ্রুপাতে লুপ্তপ্রায়। পুরাণো স্মৃতি খোঁচাইয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার খুব বেশী প্রবল ছিল না। কারণ, নিকোলার পক্ষে পূর্ব্বস্মৃতি "আগাগোড়া কেবল মধু" নহে। সে বর্ত্তমানের স্বচ্ছ স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝখানে অতীতের আবিলতা ঘোলাইয়া তুলিতে রাজী নয়। মনে মনে কিন্তু নিকোলার মার প্রতি একটা টান আছে, একথা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। সে মাকে ভালবাসে, সুতরাং মা আসিয়াছে,—ভালই।

একটা শনিবারের অপরাহ্নে নিকোলা কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া মাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। সে হোটেলে গিয়া বার্ব্বারাকে দামী রুটি এবং মাংস খাওয়াইল। বার্ব্বারা খাইতে পারে বেশ। শেষে ঠিক পূরাপূরি ইচ্ছা না থাকিলেও, আনন্দের ক্ষণিক আতিশয্যে, সে সমস্ত সপ্তাহের সঞ্চিত অর্থে বার্ব্বারার জন্য একখানি প্রকাণ্ড ফুলকাটা রেশমী রুমাল কিনিয়া ফেলিল। বার্ব্বারা জিনিষটা পছন্দ করিয়াছে, সুতরাং নিকোলা সেটা না কিনিয়া থাকিতে পারিল না।

নিকোলার টাকার থলি ক্রমশই হাল্কা হইয়া পড়িতেছে। উপায় কি? বার্ব্বারা কোনোদিন বুঝিয়া চলিতে অভ্যস্ত নয়। সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে বিদায়ের দিন বার্ব্বারাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সন্ধ্যার ঝোঁকে নিকোলা সিলার সন্ধানে চলিয়া গেল।

সহরের মলিন দরিদ্র পল্লীতে সন্ধ্যার ঘোর সকলের আগে ঘনাইয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মাতিশয্যে মুটে মজুরের দল গায়ের জামা কাঁধে ফেলিয়া চলিয়াছে। কোনো কোনো কারখানায় হাতুড়ির শব্দ এখনো বন্ধ হয় নাই।

আজ সিলাদের পাড়ায় সমস্ত অলিগলি ঘুরিয়াও নিকোলা সিলাকে দেখিতে পাইল না। সে ফুটপাতে উঠিল, রাস্তায় নামিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া এদিক ওদিক করিল। সিলার দেখা নাই। একটা মেয়ে দুধের বাল্‌তি হাতে লইয়া যাইতে যাইতে নিকোলাকে এইরূপ ঘুরিতে দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিকোলা আর দাঁড়াইল না। তাহার মনে হইল, সবাই উহাকে লক্ষ্য করিতেছে,—হয়তো সকলে ভাবিতেছে লোকটা না-জানি কি মৎলবে প্রায়ই এমন করিয়া এখানে ঘুর ঘুর করে।

দূরে 'পানি-চক্কী'র আবর্ত্তনে ঝরণার জল ছড়াইয়া পড়িতেছে। একখানা গাড়ী ঘড়্ ঘড়্ শব্দে গন্তব্যস্থানে ছুটিয়া চলিয়াছে। মাল খালাসের জন্য গাড়ীখানা দাঁড়াইল। প্রকাণ্ড বোঝা,—এক ঝাঁকানিতে একেবারে রাস্তায়। মালটা ভীর্গ্যাং সাহেবের কারখানা সংলগ্ন বাগানের ফটকে খালাস করা হইল। বাগানের ভিতরে একটা লোক মোটা নলে করিয়া জল ছিটাইতেছে, আর কতকগুলা মেয়ে ঘাস নিড়াইতেছে, আগাছা তুলিয়া সাফ করিতেছে, নূতন চারা রোপণ করিতেছে। খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া লাড্‌ভিগ্ ভীর্গ্যাং উহাদের সঙ্গে হাস্যালাপে একেবারে মশ্‌গুল্। মেয়েদের মাঝখানে শ্রীমতী হল্‌ম্যান্ দণ্ডায়মান।...... সিলাও আছে! লাড্‌ভিগ্ উহাকে লক্ষ্য করিয়া হাসি তামাসা করিতেছে! সিলাও হাসিতেছে......কিন্তু হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর ভয়ে জবাব দিতে পারিতেছে না।

নিকোলার হৃৎপিণ্ডটা কে যেন হঠাৎ একগাছা দস্তুর সাঁড়াশি দিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিল। সে যে এক দিন লাড্‌ভিগ্‌কে প্রহার দিবার সুযোগ পাইয়াছিল, সেই কথাটাই আজ সকলের আগে তাহার মনে জাগিতেছিল। নিকোলার বুক যেন কিসে চাপিয়া ধরিতেছিল। সে উহাদের উপর নজর রাখিবার জন্য

একটু তফাতে গিয়া একটা গাছের আড়ালে বসিয়া পড়িল।

'সিলা হাসিলে কি সুন্দর দেখায়'—নিকোলা বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতেছিল, আর ভাবিতেছিল তার সমস্ত দুঃখের কারণ লাড্‌ভিগ্‌ ভীর্গ্যাঙের কথা।

বসিয়া বসিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। নিকোলা লোকের আনাগোনা দেখিতেছে। হাবার মত হাঁদার মত সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। হঠাৎ তাহার চেহারা ভীষণ হইয়া উঠিল। ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাং একেবারে নিকোলার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ উহাকে দেখা গেল রুদ্ধ আক্রোশে নিকোলা ততক্ষণই শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুর মত তাহার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আবার সেই নৈরাশ্য, দরিদ্রের সেই চিরসঙ্কোচ, সেই চিরদাস্য, ধনীর সঙ্গে নির্ধনের প্রতিযোগিতায় সেই চিরন্তন নিষ্পেষণ···নিকোলা চক্ষু মুদ্রিত করিল; সে প্রাণপণ বলে আত্মসংবরণ করিল।

যখন সে চোখ খুলিল তখন শ্রীমতী হলম্যান্‌ ঘরে ফিরিতেছে,—সঙ্গে সিলা।

খানিক দূরে দু'জনে দুই পথ অবলম্বন করিল। হল্‌ম্যান্‌গৃহিণী বাড়ীর দিকে গেলেন, সিলা চলিল গোয়ালা বাড়ী।

দুধ লইয়া ফিরিবার সময় হঠাৎ নিকোলার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া সিলা চমকিয়া উঠিল।

"কি সিলা? আজ কাল আমায় দেখেও যে চমকাও, দেখছি!"

সিলা ঠাট্টা করিয়া বলিল, "যে ভীষণ তোমার চেহারা!"

"তুমি না বলেছিলে আমায় বিয়ে করবে? কেমন, বলনি?"

"হঠাৎ সে কথা কেন? সে তো ঢের কালের কথা।"

"আমি আর একবার কথাটা শুনতে চাই, আর একবার শোন্‌বার দরকার হয়েছে, তাই বল্‌ছি। পতর মেরে কাঠ জুড়্‌তে হ'লে দুদিক থেকেই পরখ ক'রে দেখা দরকার, যে, সে পতর টেকসই কি না··· কোথাও ফাটা চটা আছে কি না। কারখানায় ঢুকে পর্য্যন্ত তোমার মাথা নানান্‌ দিকে ঘোরে কি না, তাই বল্‌ছি।"

"বাস্‌রে বাস্‌, আমার জন্যে তুমি আজ কাল বেজায় ভাব্‌তে সুরু করেছ, দেখ্‌ছি। কিন্তু দেখ, সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি এখন নিজেও একটু একটু ভাব্‌তে শিখেছি,—বড় হইছি কি না। নিজের ভাল মন্দ একটু একটু বুঝ্‌তে শিখেছি। তুমি ঠাউরে রেখেছ চিরদিন আমি সেই খুকীটি আছি। কি আশ্চর্য্য! দেখ, এখন আমি চল্লুম, আমার আজ ঢের কাজ। বাড়ীতে গিয়ে দুটো খেয়েই আবার কারখানার বাগানে এসে কপি কড়াইশুঁটির ক্ষেতগুলো সাফ করে ফেল্‌তে হবে। ক্রিষ্টোফা আস্‌বে, জোসেফা আস্‌বে, আরো তিন চারজন আস্‌বে। এ ফসলের আমরা ভাগ পাব, তা জানো?"

নিকোলা এতক্ষণ মনে মনে হিসাব করিতেছিল; মায়ের জন্য যাহা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা বাদে এখন তাহার হাতে আছে মোট সাতাশ ডলার। অন্ততঃ এর তিন গুণ না জমিলে ঘর বসতের জিনিস পত্র কিনিতেও কুলাইবে না। সিলাকে এই রকম কুসঙ্গে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে দেওয়া নয়; এ জন্য সে দিন রাত খাটিতেও প্রস্তুত।

প্রকাশ্যে সে বলিল, "দেখ সিলা, দুজনেই যদি এখন থেকে একটু চারিদিক সম্‌ঝে চলি তা হ'লে চাই কি বছর খানেকের মধ্যেই আমরা নিজস্ব ঘরকন্না পেতে, পায়ের উপর পা দিয়ে, অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বস্‌তে পারি। তবে, জোর ক'রে কিছুই বল্‌তে পারি নে; মনে করি এক, হয় আর।" নিকোলা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

সিলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি কি ভাব্‌ছি তা' জান? বিয়ে না হ'লে তোমার বুদ্ধিও খুল্‌বে না, বলও বাড়্‌বে না, ফুরতিও ফিরবে না। এখন তুমি এম্‌নি হ'য়েছ, যে, যে দিন তোমার সঙ্গে কথা কই সে দিন সমস্ত দিন রাত মনটা কেমন যেন দমে যায়। খুব ভাল-বাসার মানুষ যা হোক!" সিলা কতকটা ছলভরে জুতার গোড়ালির উপর ভর দিয়া এক পাক ঘুরিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে দূরে চলিয়া গেল।

নিকোলা বার্ব্বারার আগমনের কথা সিলাকে জানাইবার জন্যই আজ আসিয়াছিল, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি সে কথা একদম তাহার মনেই ছিল না। থাক্, এবার যে দিন দেখা হইবে, ও খবরটা সেই দিন দিলেই চলিবে। সে দিনেরও বড় বিলম্ব নাই। আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে।

* * * *

মাস খানেক পরে একজন পাড়াগেঁয়ে গাড়োয়ান একটা প্রকাণ্ড পেঁটরা নিকোলার দরজায় আনিয়া হাজির করিল। পেটরাটি বার্ব্বারার। গাড়োয়ানের মুখে নিকোলা শুনিল দুই চারিদিনের মধ্যে স্বয়ং বার্ব্বারাও আসিতেছেন।

মাতাঠাকুরাণীর মৎলব নিকোলা ঠিক ঠাওরাইতে পারিল না। আবার চাকরীর চেষ্টা? ভগবান জানেন।

ইহার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা নিকোলা দোকান হইতে ফিরিয়া দেখিল উহার ঘরের ভিতর এক কাঠের বাক্স আর এক জোড়া ফিতাওয়ালা জেনানা বুট। মাতাঠাকুরাণী তবে আসিয়াছেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, মাখন পনির রুটি প্রভৃতি সওদা করিয়া বার্ব্বারা সশরীরে উপস্থিত হইল। উহার মোট ঘাট এবং মোটা দেহে নিকোলার স্বল্পায়তন ঘরটি একেবারে ভরাট হইয়া গেল। স্থূলতা বশতঃ বার্ব্বারা এখন অল্পেই হাঁপায়, উহার অস্থিময় চিবুকের নীচে এখন আবার আর একটা মাংসময় চিবুক গজাইয়াছে!

যৌবনে যে মুখ গোলাপ ফুলের মত সুন্দর মনে হইত এখন সেটা একটা চর্ব্বণের যন্ত্র মাত্র।

নিকোলা বিছানার উপর বসিয়াছিল; বার্ব্বারা সিন্দুকের উপর বসিয়া খাইতে খাইতে অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল। তাহার বক্তব্য মোটের উপর এই :—

বার্ষিক আঠারো ডলার বন্দোবস্তে যে চাষীর ঘরে বার্ব্বারা চাকরী লইয়াছিল সে এমনি কৃপণ, যে নিজেও পেটে খায় না লোকজনদেরও পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না! কাজেই বার্ব্বারাকে গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া এটা ওটা কিনিয়া খাইতে হইত। কৌঁসুলী সাহেবের বাড়ী চাকরী করা অবধি এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে মন্দ জিনিস মুখে তুলিতে গেলে চোখে জল আসে। বড়লোকের ছেলে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়া শেষে কিনা বার্ব্বারার এই দুর্দ্দশা। লাড্‌ভিগ্‌ লিজির দুধ্‌মার ভাগ্যে কিনা এই বখ্‌শিশ্‌! সহরে বড় বড় ঘরে সুখ্যাতি লাভ করিয়া শেষে কিনা ধান ভানিয়া দিন কাটানো!

বার্ব্বারা প্রথম প্রথম ভাবিয়াছিল কৌঁসুলী সাহেব আবার ডাকিবেন। বার্ব্বারারই ভুল। বড়লোককে মনে করাইয়া দিতে হয়, নহিলে, নিজে হইতে তাহারা বড় একটা কিছুই করে না। আর নিকোলা বাঁচিয়া থাক; সহরে বার্ব্বারার এখন আর সহায়ের ভাবনা নাই। বার্ব্বারা সহরে একখানি ছোটোখাটো দোকান করিবার মতলব করিয়াছে। কৌঁসুলী সাহেবকে এ কথা সে আজ নিবেদন করিয়া আসিয়াছে।

গোড়াতেই কৌঁসুলী সাহেব বার্ব্বারাকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ভাল করিয়া কথার জবাব পর্য্যন্ত দেন নাই। কিন্তু তাহাতে কি? বার্ব্বারা উহাঁর মেজাজ বুঝে, সে নানা রকম মন-জোগান কথা কহিয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিতে জানে।

"লাড্‌ভিগ্‌ দাদা বাবু কেমন আছেন? লিজি দিদি বাবু কেমন আছেন?—জিজ্ঞেস্ কর্ত্তে পারি কি? এতদিনে না জানি তাঁরা কত বড়সড় হয়েছেন; কেমন মোটা সোটা হয়েছেন! এখন বোধ হয় আর আমাকে দেখ্‌লে চিন্‌তে পারবেন না। না পারবারই তো কথা। কত দিন দেখা শুনো নেই।"

"হ্যাঁ বড় সড় হয়েছে, কিন্তু মোটা সোটা হয় নি। নৌকোর লগির মতন পাৎলা—ছিপ্‌ছিপে। তুই বোধ হয় এখনো দু'হাতে দু'জনের কোমর ধরে তুল্‌তে পারিস্। আচ্ছা বার্ব্বারা তুই কি খেয়ে এত মোটা হ'লি বল্ দেখি? যে চাষার কাছে ছিলি তার মরাইটা শুদ্ধ গিলে ফেলিছিস্ নাকি? তার বোধ হয় ক্ষেত খামার সব গেছে?"

"আজ্ঞে, হুজুর! কৌঁসুলী সাহেবের বাড়ী থাক্‌তে তো আর জাব্‌না খাওয়া অভ্যাস করিনি, যে চাষার খোরাকীতে মোটা হব! চাষা কি কম লোক? সে খুব চালাক, নিজের গণ্ডা খুব বোঝে; আমি আবার তার ক্ষেত খামার খাব।

কষ্ট পেতে আমিই পেইছি। অর্দ্ধেকদিন গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে খেতে হ'য়েছে।"

ইহার পর লাড্‌ভিগ্‌-লিজির স্নেহের কথা তুলিয়া বার্ব্বারা কান্না জুড়িয়া দিয়াছিল। এই সময়ে কৌন্সুলী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সেই লক্ষীছাড়া ছেলেটা?—সেটা কোথায়?"

"কে? নিকোলা? সে এখন এই সহরেই আছে। সে এখন মিস্ত্রির কাজে পাকা হ'য়ে উঠেছে।"

ইহার পর বার্ব্বারা দোকান করিবার মৎলবটাও কৌন্সুলী সাহেবের কাছে খুলিয়া বলে। কৌন্সুলী সাহেব উহার কথায় খুসী হইয়া বাজার পাড়ায় বিনা ভাড়ায় এক বৎসরের জন্য তাহাকে দুইটা ঘর দিতে রাজী হইয়াছেন।

নিকোলা ও বার্ব্বারা সাম্‌না সাম্‌নি বসিয়া আছে। দু'জনের মধ্যে চেহারার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। তফাতের মধ্যে, অদৃষ্ট একজনকে কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিয়া দৃঢ়সন্নদ্ধ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে আর একজনকে অগাধ আলস্যের আরকে ডুবাইয়া মেরুদণ্ডহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়াছে।

বার্ব্বারা কেমন করিয়া ব্যবসা জমাইবে নিকোলাকে তাহা বিস্তারিত বলিল। ভীর্গ্যাংদের দৌলতে সহরের যত বড় ঘরে তাহার যাতায়াত। সকলকে সে খরিদ্দার পাকড়াইবে। একবার জমিয়া গেলে, তখন আর ভাবিতে হইবে না, বাজারে একবার সুনাম হইলে অনেক মাল ধারেও পাওয়া যাইবে। তখন বকেয়া চুকাও আর মাল বেচ আর মুনাফা কর; মাল খরিদের বিষয়ে তখন আর কোনো ঝক্কিই থাকিবে না।

সম্প্রতি কিছু নগদ টাকার দরকার। বার্ব্বারার যাহা আছে তাহাতে কুলাইবে না। এখন এক নিকোলাই ভরসা, সে যদি কিছু দেয়! টাকা নগদে থাকাও যা, আর, পাঁচটা মালে থাকাও তাই। উহাতে নিকোলার লোক-সানের কোনো ভয়ই নাই। পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত ঠিক সমান—পূরা থাকিবে। এখন আছে পকেটে তখন থাকিবে প্যাকেটে,—তফাতের মধ্যে এই।

"আচ্ছা, সস্তায় একখানা টেবিল কোথায় পাওয়া যায় বল, দেখি? আর খানকয়েক চেয়ার? দোকান কর্ত্তে হ'লে এগুলো তো আগে কেনা দরকার। নাঃ, ও সব ধারেও পাওয়া যেতে পারে। এখন কিছু নগদ হাতে না হ'লে দোকান খুলি কি ক'রে বল দেখি? নগদেরি দরকার আগে। দোকানটা জম্‌লে, তুমিও আমার কাছে এসে থাকবে; কি বল, নিকোলা! এখন তোমায় খাবার কিনে খেতে হয়, তাতে ঢের বেশী পড়ে যায়; আমি রাঁধব বাড়ব, তাতে অনেক পয়সা বেঁচে যাবে। সে কথাও ভেবে দেখ।"

বার্ব্বারার বাক্যে সুবর্ণ বর্ষিতেছিল। নিকোলা কিন্তু কোনো মতেই মায়ের সঙ্গে সুর মিলাইতে পারিতে-ছিল না। সে মনে মনে খুবই ইতস্ততঃ করিতেছিল এবং ঘন ঘন পা দুলাইতেছিল। দোকানের ভবিষ্যৎ হয় তো খুবই আশাজনক। আর সে বিষয় হয় তো বার্ব্বারা নিকোলার অপেক্ষা অনেক বেশী বোঝে—তাহার উপর সে কৌন্সুলী সাহেবের কাছেও এসম্বন্ধে অনেকটা আশা ভরসা পাইয়াছে। কিন্তু বার্ব্বারা যে হঠাৎ আজ নিকোলার সর্ব্বস্বের উপর দাবী করিতে আসিয়াছে এ দাবী কি ন্যায্য? যাহাকে সে স্তন্যে এবং স্নেহে বঞ্চিত করিয়াছে তাহার কাছে সে কি এতটা আশা করিতে পারে? নিকোলার মন বলিল, উহার চেয়ে আর একজনের দাবী অনেক বেশী। সে সিলা। বার্ব্বারার কথায় পূরাপূরি রাজী হওয়া নিকোলার পক্ষে এখন অসম্ভব।

বার্ব্বারা বকিয়াই চলিয়াছে; সে যে দেওয়ালে ঠেস্ দিতে গিয়া গজালে ধাক্কা পাইয়াছে সে কথা সে এতক্ষণেও বুঝিতে পারে নাই।

নিকোলা অনেকক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল; শেষে, মুখ না তুলিয়াই বলিতে আরম্ভ করিল, "তা দেখ, মা, আমার টাকা তোমায় দেব এ আর বেশী কথা কি? তবে, ওটা কিন্তু আমার বছরের শেষে ফিরে পাওয়া চাই। তার কারণ, যে ঐ সময়ে আমি বিয়ে করব বলে স্থির করেছি। ঐ যে হল্‌ম্যান্ ছুতার,—তার মেয়ে সিলা, তারি সঙ্গে;—আমি কথা দিয়েছি। হল্‌ম্যান্ মরবার পরেই এ বিষয়ে আমাদের সব ঠিকঠাক হয়ে আছে। এর আর নড়চড় হবে না। আর ঐ জন্যেই খেটে খুটে কিছু পয়সা হাতে করেছি; এখন এ সমস্ত ভেস্তে দিলে আমার উপর অন্যায় করা হ'বে।"

নিকোলা তীক্ষ্ণ চক্ষে একবার মাতার দিকে চাহিল। বার্ব্বারা বুঝিল এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছেলেটির মন এখন একেবারেই তাহার হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। এমনটা যে ঘটিতে পারে সে কথা মোটে তাহার খেয়ালেই আসে নাই।

বেচারা নিকোলা মুখে যাহাই বলুক, মায়ের মনস্তুষ্টির জন্য বিদায়ের ঠিক পূর্ব্বে তাহার কষ্টসঞ্চিত ডলারগুলি বার্ব্বারার হাতেই সমর্পণ করিল।

সহরের গলিঘুঁজিতে এক শ্রেণীর দোকান আছে,—যাহারা ঠিক পাইকারও নয় অথচ ঠিক ছুটা দোকানদারও নয়। উহারা মহাজনের দেনা, হপ্তায় হপ্তায় না মিটাইয়া মাসে মাসে মিটায়; এবং নিজের পাওনাগণ্ডা খরিদ্দারের কাছে হাতে হাতে আদায় না ক'রয়া সপ্তাহান্তে 'বিলে' আদায় করে। বার্ব্বারা হইল এই শ্রেণীর দোকানী। সে মার্কিন মুলুকের লোকেদের মত রাতারাতি দোকানদার হইয়া উঠিল। এক সপ্তাহের মধ্যে বার্ব্বারা দোকান সাজাইয়া ফেলিল। পেঁজা তুলা, টোনের সুতা; রঙীন ফিতা, চুরুটের পাইপ; ছুরি, কলম, দেশালাই, নস্য; পাঁউরুটি, লজেঞ্জেস্ প্রভৃতি নানা রকম জিনিসে ঘর ভরিল। মোমজামায় ঢাকা একটা প্রকাণ্ড কেরোসিনের বাক্স হইল টেবিল; একটা ছোটো বাক্স হইল চেয়ার। টাকাকড়ি যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা প্রায় সিন্দুকেই থাকিত, খুচরা থাকিত একটা ফুটা চুরুটের বাক্সে।

দোকান খুলিবার ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই বার্ব্বারা শ্রীমতী হল্‌ম্যানের সঙ্গে পুরাণো পরিচয় ঝালাইয়া লইল; কিন্তু সিলা সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করিল না।

হল্‌ম্যান গৃহিণীর বর্ত্তমান বাসা বার্ব্বারার দোকান হইতে বেশী দূর নয়। সে রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে, নূতন দোকানের সাম্‌নে, বার্ব্বারাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। বার্ব্বারাও ছাড়িবার পাত্র নয়; চা তৈয়ারী; পুরাণো বন্ধুকে নূতন দোকানে চা না খাওয়াইয়া সে কিছুতেই অম্‌নি অম্‌নি যাইতে দিবে না।

দোকানে ঢুকিয়া হল্‌ম্যান্ গৃহিণী নাক সিঁটকাইল, তাহার অনেক বক্তব্য ছিল, কিন্তু চাপিয়া গেল। চা খাইতে খাইতে সে নিজের দুঃখকাহিনী জুড়িয়া দিল। হল্‌ম্যানের মৃত্যুর পর হইতে সে যে স্ত্রীলোক হইয়া কেমন করিয়া সংসার মাথায় করিয়া রাখিয়াছে তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা!

"ওকি! এরি মধ্যে পেয়ালা সরিয়ে রাখ্‌চ যে? আর এক পেয়ালা নাও!"

এক পেয়ালা, দুই পেয়ালা, তিন পেয়ালা চা উড়িয়া গেল, হল্‌ম্যান-গৃহিণীর কিন্তু নাকীসুর ঘুচিল না, স্ফূর্ত্তির লক্ষণও দেখা গেল না। সে যতক্ষণ চা খাইতেছিল এবং ওজন করিয়া কথা কহিতেছিল, ততক্ষণ তাহার মাছের মত নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটা বার্ব্বারার আসবাব-পত্রের উপর ঘুরিতেছিল। শেষে, ভবিষ্যতে স্বয়ং বার্ব্বারার দোকান হইতেই জিনিস-পত্র খরিদ ক'রিবে এইরূপ একটা আশ্বাস দিয়া হল্‌ম্যান-গৃহিণী গম্ভীর চালে চলিয়া গেল।

* * * *

কি একটা জিনিসের প্রয়োজনে সিলা বার্ব্বারার দোকানে ঢুকিয়াছে এমন সময় লাড্‌ভিগ্ আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। বার্ব্বারা ভারি খুসী; তবে তো লাড্‌ভিগ্ দুধ-মাকে ভোলে নাই। বড়লোকের ছেলে বলিয়া উহার তো কোনো দেমাক নাই, তা থাকিলে কি এই দরিদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র দোকানের অপরিচ্ছন্ন পথ সে মাড়াইত?

লাড্‌ভিগ্ কিন্তু আসিয়াই সিলার সঙ্গে হাসি তামাসা সুরু করিয়া দিল। সিলা তাহার দরকারী জিনিষটা বার্ব্বারার হাত হইতে একরকম টানিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভদ্রলোকের ছেলে লাড্‌ভিগের প্রতি সিলার এই অদ্ভুত ব্যবহারের কথা সেই রাত্রেই নিকোলার কাণে পৌঁছিল। বার্ব্বারা বলিল, "লাড্‌ভিগ্ এমন কিছুই বলেনি যাতে অমন ক'রে কাণে আঙুল দিয়ে পালাতে হয়। মেয়ে যেন সরমের ডালি! একেবারে ছুটে পালানো হল। ভদ্র ঘরের মেয়ে অমন অবস্থায় মাথা হেঁট ক'রে থাকে; জবাব না দিলেই হ'ল। পালাবার কি দরকার? ও সব ঢং কি আর আমরা বুঝিনি? ও একরকম বাচ-খেলানো, পুরুষমানুষগুলোকে নিয়ে মাছের মতন খেলিয়ে বেড়ানো আর কি! আর তাও বলি, ঐ খাটো জামাপরা,

ডিগ্‌ডিগে, ভাজা চিংড়ির মত কোল-কুঁজো মেয়েটা—ওকি নিকোলার মতন ছেলের যুগ্যি? না আছে শিক্ষা, না জানে সহবৎ। লাড্‌ভিগ্‌ না হ'য়ে যদি আর কেউ হ'ত তো আমি নিজে তাকে মেয়েটার পিছনে লেলিয়ে দিতুম।··ভাল কথা, নিকোলা, আজ যখন লাড্‌ভিগ্‌ দোকানে এল, তখন একবার ভাব্‌লুম, যে পনেরো ডলারের কথা তোমায় বলিছিলুম, সেটা ওর কাছে চেয়ে দেখি, শেষে সিলার কাণ্ড দেখে সব গুলিয়ে গেল; যখন মনে পড়্‌ল তখন লাড্‌ভিগ্‌ বেরিয়ে চলে গেছে!"

"ওর কাছে? ন-না মা! তুমি দু'দিন সবুর কর, আমিই জোগাড় ক'রে দিচ্ছি; আমি যতক্ষণ পারি ওর কাছে চেয়ো না। দরকার কি?"

"এমন নইলে পেটের ছেলে", বার্ব্বারার পান্‌সে চোখে জল আসিল। "দেখ, নিকোলা, কিছু ভাল চা আর কেক তোমার জন্যে রেখেছি; আজ প্যাকেট খুলেছিলুম, বিক্রি হ'য়ে কিছুটা পড়ে আছে, সেইটে তোমার জন্যে রেখেছি।"

"না, মা, চা তো আমার রয়েছে; আর কি হ'বে?" বলিতে বলিতে নিকোলা বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে রাস্তায় সিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ। সিলার আজ হাসি ধরে না।

"পালিয়ে এলুম; ওর দিকে একবার তাকিয়েও দেখিনি। তুমি কি বল? ওর কাছে খানিক দাঁড়ানো উচিত ছিল, না? অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে, না?" সিলা আবার হাসতে লাগিল।

নিকোলার গাম্ভীর্য্য উড়িয়া গেল। সে হাসিয়া ফেলিল।

ফিরিবার সময়ে লাড্‌ভিগের সঙ্গে নিকোলার চোখাচোখি হইল। নিকোলার মন এবং সর্ব্বশরীর কঠিন হইয়া উঠিল। সে আত্মসংবরণ করিয়া কোনো মতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিল।

আজ সিলার স্ফূর্ত্তি নিকোলার চোখে তেমন ভাল লাগে নাই। আজ কাল যখনি সে দেখা করিতে যায় তখনি সিলার মুখে লাডভিগের কথাই শোনে। লাড্‌ভিগ্‌ কি বলিল, লাড্‌ভিগ্‌ কি পোষাক পরিল, ক্রমাগত এই সমস্ত কথা।··উহাদের বাগান সাফ করা আর ফুরায় না।

রাত পর্য্যন্ত ক্রিষ্টোফা জোসেফার মত হতভাগা মেয়েদের সঙ্গে বাগান সাফ! ভালর মধ্যে এই যে এ সব খবর এখনো পর্য্যন্ত সে স্বয়ং সিলার মুখেই পাইতেছে। এখনো আশা আছে, এখনো উদ্ধারের উপায় আছে। আজ কাল কারখানায় কাজ করিতে করিতে মনের ভিতর এই প্রসঙ্গ উঠিলে নিকোলা কেমন একরকম হইয়া যায়। উহার মনে হয় কে যেন একটা প্রকাণ্ড ইস্ক্রুপের প্যাঁচ কসিয়া উহাদের দুজনকে তফাৎ করিয়া ফেলিতেছে।

গরীবের উপর এ কী জুলুম? আপনার বলিতে তাহার আছে তো অতি অল্পই;—সেটুকুও সে নিশ্চিন্ত মনে ভোগ করিতে পাইবে না? নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পাইবে না? সিলার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য,—তাহাকে ধর্ম্মপত্নী করিবার জন্য, নিকোলা প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে; গৃহস্থালীর ভিত্তি পত্তন করিতে সে বিন্দু বিন্দু করিয়া শরীরের সমস্ত রক্ত দান করিতে প্রস্তুত। আর,—আর একজন, যাহার টাকার অভাব নাই, বিবাহের ইচ্ছা থাকিলে যে যে কোনো ভদ্রঘরের সুন্দরী মেয়েকে পাইতে পারে সে পশু, পশু! পশুর অধম, নরহন্তা, সুখের হন্তারক!

এইরূপ দুশ্চিন্তায় নিকোলার দিন কাটিতে লাগিল।

আজ কাল সে বর্ষার অন্ধকারকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়াছে। বর্ষার কল্যাণে তাহার সিলার সন্ধানে সহর প্রদক্ষিণ বন্ধ হইয়াছে। ইহার পর শীত পড়িবে, বরফ পড়া সুরু হইবে; বাস্‌! নিশ্চিন্ত।

* * * *

নিকোলা একদিন হিসাব করিয়া দেখিল নাগাদ নূতন খাতা তাহার হাতে প্রায় পঁচাত্তর ডলার জমিবে। ইহার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ, (আর তের) মোট আটান্ন ডলার উহার মায়ের হাতে। শেষবারে টাকা লইবার সময় বার্ব্বারা বলিয়াছে, "কোনো ভয় নেই, দোকানে খুব বিক্রী, বেশ দু'পয়সা আস্‌ছে।"

ইহার মধ্যে নিকোলা একদিন ঘর ঠিক করিতে বাহির হইয়াছিল। এক রকম ঠিক করিয়াই আসিয়াছে।

ঘরের সঙ্গে আলাদা রান্না ঘরও পাওয়া যাইবে। ভাড়াও বেশী নয়। সব ঠিক। এইবার একদিন হল্‌ম্যান-গৃহিণীর কাছে কথাটা পাড়িতে হইবে। নগদ পঁচাত্তর ডলার, হীগ্‌বার্গের সার্টিফিকেট, তাহার উপর বাঁধা রোজগার,—হল্‌ম্যান গৃহিণী ভিজিবেই ভিজিবে।

বড়দিন ও ছোটদিনের মাঝখানের সপ্তাহে একদিন নিকোলা মাকে গিয়া বলিল, "ফেব্রুয়ারি মাসে আমার টাকাটা আমায় জোগাড় ক'রে দিতে হ'বে। টাকাটা পেলে তবে হল্‌ম্যান গিন্নির কাছে কথাটা পাড়ব, মনে করেছি।"

বার্ব্বারা চা তৈয়ার করিতেছিল, হঠাৎ উহার মাথাটা কেমন গোলমাল হইয়া গেল। সে বলিল, "তাই তো, তাই তো, আজ হিসেব নিকেশ করতে করতে প্রায় ক্ষেপে যাবার মত অবস্থা হ'য়েছে। যাক্, চা তৈরী হ'য়েছ, কেক আছে—তোমার জন্যে রেখেছি, ওগুলো আগে খাও; তারপরে ওসব কথা হ'বে। বড়দিন—বছরকার দিন, এ তো আর বছরে দু'বার হবে না। আজকের দিন যার যেমন সাধ্য—ভাল মন্দ খেতে হয়। যে সংসারে মানুষ হইছি সেখানে এ রীতির কখ্‌খনো নড়চড় হ'তে দেখি নি।…তাই তো নিকোলা! এরি মধ্যে তুমি টাকা ফেরৎ চাইছ! এই বড়দিনের আগেই আমাকে চিনির মহাজনের দেনা শোধ কর্ত্তে হ'য়েছে, আমি ভেবেছিলুম ও দেনাটা জুন মাস নাগাদ দিতে হ'বে, কিন্তু যখন তাগিদ এসে পড়্‌ল তখন শোধ না ক'রে আর পেরে উঠ্‌লুম না।…তা তোমার কোনো ভয় নেই; বল না কেন, এখনি টুপি মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লে টাকার জোগাড় ক'রে আস্‌তে পারি। এমন কি এক বাড়ী ছেড়ে দ্বিতীয় বাড়ীতেও পা দিতে হবে না।…খাও, নিকোলা, খাও; বড় দিন বছরকার দিন। টাকার কথা ভাব্‌ছ? কোনো ভাব্‌না নেই। তোমার মা যখন বলেছে—তখন তোমার মোটেই ভাব্‌বার দরকার নেই। লাড্‌ভিগ্ ভারি ভাল ছেলে। আর সে দিন আমায় দেখে টুপি খুলে যখন মাথা নীচু করলে তখন আমার যে কি আনন্দ হ'ল তা' আর বল্‌তে পারি নি। লাড্‌ভিগ্ বললে,—পয়সার অভাবে বার্ব্বারা কষ্ট পাবে—এ আমি দেখ্‌তে পারব না। আমি যদি গিয়ে বলি আমার টাকার দরকার, আমার ছেলের দরকার, তা' হলে সে না দিয়ে থাক্‌তে পারবে না। ওকি নিকোলা অমন ক'রে রইলে কেন? আমি তো বল্‌ছি,—টাকা তুমি ঠিক সময়ে পাবে। ওকি! ওকি! অমন করে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলে যে?"

নিকোলা নিরুত্তর; সে অনেকক্ষণ একেবারে চুপ্‌চাপ্ বসিয়া রহিল। শেষে বিরক্ত হইয়া বার্ব্বারা বলিয়া উঠিল;—

"ছোটদিনের পরেই দিয়ে দেব, বাপু। এমন জান্‌লে আমি মরে গেলেও তোমার কাছে টাকা চাইতে যেতাম না।"

"না, মা। এখন আমায় টাকা দেবার দরকার নেই; যখন পার, দিও। আমি তোমায় এজন্যে আর পীড়াপীড়ি করতে চাই নে। কিন্তু যদি শুনি তুমি লাড্‌ভিগ ভাগ্যাণ্ডের কাছে টাকার জন্যে হাত পেতেছ, তবে সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে আমাদের সম্বন্ধ চুকে যাবে। ইহ জন্মের মত চুকে যাবে। যাক্, বিয়ের আয়োজন খুব এগিয়ে দিলে যা' হোক্! ভাল!"

নিকোলা দরজা খুলিয়া একেবারে রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিরহে

অধিরাজ! অভিযোগ এই তব পায়—
ভুবন তোমার কেন আমারে কাঁদায়!
ও সে জ্বল্‌জ্বল্ ধরি' রূপের আরসী,
স্ব-রূপে প্রকাশে কোন্ অরূপের শশী!
ও সে সারা অঙ্গে মাখি' গন্ধ ভুর্‌ভুর্,
কা'র গন্ধ বহে' আনে জীবনে মধুর!
ও সে মধুর, মধুর, বাণী মধুময়,
ঘরের কথায় টানি' কা'র কথা কয়!
ও সে পাতায় পাতায় প্রেমের আখর,
প্রেমলিপি ধরে কা'র নয়নের পর!
ও সে জানেনাক চির প্রবাসের দুখ্!
ও সে জানেনাক বিরহের ভরাবুক!
ও সে যাদুকর, কি জানায় কত ছলে,
আমার নয়ন মন ভেসে যায় জলে!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুস্তক-পরিচয়

পরলোকগত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী—

বলেন্দ্রনাথ ভরা যৌবনেই পরলোকে গিয়াছেন। এই অল্প বয়সেই তিনি যেসমস্ত সাহিত্যকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দেখিলে তাহার অকালমৃত্যুর জন্য হৃদয় দুঃখে অভিভূত হইয়া উঠে, তাহার মৃত্যু দেশের ক্ষতি, সাহিত্যের ক্ষতি বলিয়া মনে হয়। বলেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ছিল প্রাঞ্জল বিশুদ্ধ ভাষায় ভাববিশ্লেষণে—সে ভাব কাব্যে, কলায়, দৃশ্যে, চরিত্রে, স্থানে, ইতিহাসে, প্রতিষ্ঠানে, আচারে ব্যবহারে, বা নিজের মনে যেখানেই অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার শক্তিমান লেখনী রসোদ্গিরণ করিয়াছে। বলেন্দ্রনাথ যে খাঁটি সমালোচনাপদ্ধতির সূত্রপাত বাংলা সাহিত্যে করিতেছিলেন তাহা সর্ব্বত্র গ্রাহ্য বা সকলের সহিত এক মতনা হইলেও জিনিষটি ছিল

পরলোকগত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুস্থ সবল নির্বিষ সুসমঞ্জস; একঝোঁকা ভাব সমালোচকের পক্ষে মারাত্মক,—তিনি সেই গণ্ডির বাহিরে থাকিয়া, নিজের ব্যক্তিবৈশিষ্ট যথাসম্ভব পরিহার করিয়া সমালোচনা লিখিতেন বলিয়া তাহা আনন্দ দিত অনেককে, পীড়া দিত না কাহাকেও। কাব্য ও কলা সমালোচনায় তাঁহার হাত ওস্তাদিধরণের ছিল। তাঁহার যুবকহৃদয়ের মধ্যে একটি প্রৌঢ়বয়সের গাম্ভীর্য্য যে প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাঁহার রচনার পংক্তিতে পংক্তিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—কোথাও বাচালতা নাই, বাহুল্য নাই, উচ্ছ্বাস নাই, সমস্তই সংহত ও সংযত। বলেন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তিও যথেষ্ট ছিল; তাহা তরলভাবের হইলেও ভাবব্যঞ্জনায় বিশেষত্বপূর্ণ—যুবার কবিতা যুবহৃদয়ের প্রকাশক হওয়াই স্বাভাবিক। এই যুবার রচনা যে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়া পরিপক হইবার অবকাশ পায় নাই তাহা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। তথাপি তাঁহার বহুরচনা—যেমন, কণারক, গীতগোবিন্দ, বারাণসী, খণ্ডগিরি হিন্দুদেবদেবীর চিত্র, প্রাচ্যপ্রসাধন-কলা, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, নিমন্ত্রণসভা, দিল্লীর চিত্রশালিকা, প্রভৃতি—বঙ্গসাহিত্যের বিশিষ্টসম্পৎ হইয়া থাকিবে।

গ্রন্থখানি ডিমাই অষ্টাংশিত ৭৩৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; কাপড়ে বাঁধা। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাক্রমে এই গ্রন্থের ভূমিকা ও বলেন্দ্রনাথের জীবনী লিখিয়া দিয়াছেন, এবং ঐ দুইটী রচনাও বিশেষ সহিত্যরসপূর্ণ সুন্দর হইয়াছে, গ্রন্থের মূল্য ৫৲ টাকা। প্রকাশক শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুদ্রারাক্ষস।

সংস্কৃতমঞ্জরী

শ্রীরেবতীকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রণীত। পৃঃ ৫৮; মূল্য চারি আনা।

যে প্রণালীতে এই গ্রন্থ লেখা হইয়াছে তাহা 'শিক্ষা-বিজ্ঞান' সম্মত নহে।

শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত—

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ॥৴+২৮৫; মূল্য ১।০ আনা।

গ্রন্থকার বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং তিনি একজন সুলেখক। বহুবিস্তৃত বৈষ্ণবসাহিত্য মন্থন করিয়া গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে—ইহা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।

অঘোর বাবু বৈষ্ণবধর্ম্ম বিষয়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

"এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মনে করিতেছেন বৈষ্ণবধর্ম্ম অস্বাভাবিক-ভাবপ্রবণ এবং কর্ম্মবিরোধী। অর্থাৎ ইহা গীতোপনিষৎ প্রোক্ত জ্ঞানমূলক বৈরাগ্য ও নিষ্কাম কর্ম্মপ্রবণতা এবং মনুপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণরক্ষিত পরিচিতমার্গ ও গৃহস্থাশ্রম হইতে হিন্দুসমাজকে ক্রমে ক্রমে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। এতৎ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ভূয়োভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ভগবানের প্রতি অহৈতুকী প্রেমভক্তি ব্যতীত নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রবৃত্তি হয় না। ভগবৎপ্রীত্যর্থ যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তদ্ব্যতীত অন্যকর্ম্ম বন্ধনের কারণ (গীতা ৩।৯)। ভগবানে ঐকান্তিক প্রীতি সমুপস্থিত হইলে সাংসারিক ভোগস্পৃহা স্বতঃই বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং যাঁহারা পুরোহিতবর্গের পুষ্পিতবাক্য ও শাস্ত্রের ফলশ্রুতিতে মুগ্ধ হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগলালসায় পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠান কখনও নিষ্কাম ও বিশুদ্ধ হইতে পারে না। উপাসনা সম্বন্ধে ভগবান বাদরায়ণ বেদান্ত সূত্রের তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদের ৫৪ সূত্রে বলিয়াছেন, "পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ।" 'অনুবন্ধ' কিনা পরমেশ্বরের প্রতি ও জীবের প্রতি প্রীতি, আর 'তাদ্বিধ্যং'—প্রীত্যনুকূল ব্যাপার অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য, এই দ্বিবিধ সাধনই মুখ্যোপাসনা, 'শব্দ' কিনা শ্রুতি, 'ভূয়ঃ' অর্থাৎ বারবার ইহাই বলেন। ইহাই প্রকৃত উপাসনাতত্ত্ব। বৈষ্ণবধর্ম্মেরও উপদেশ "নামে রুচি, জীবে দয়া।" সুতরাং তাহা এ সম্বন্ধে বেদান্ত বিজ্ঞানের বিরোধী নহে। ভগবানে নির্ম্মল রতি ও জনহিতৈষণাই বিশুদ্ধ জ্ঞানানুমোদিত ধর্ম্ম। যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মকে কর্ম্মবিমুখ গার্হস্থ্য-বিরোধী মনে করেন, তাঁহারা স্থূলদর্শী। বৈষ্ণবেরা যে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থের কথা বলেন, তাহা বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই ভগবৎ-প্রীতি ও তাহা হইতে সঞ্জাত লোকহিতৈষণা বা লোকসেবা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ। লোকহিতৈষণা বা লোকসেবা কর্ম্মবিমুখতা নহে, প্রত্যুত তাহা জ্ঞানমূলক নিষ্কাম কর্ম্মযোগের নামান্তর মাত্র। বৈষ্ণবধর্ম্ম ভোগসাধনভূত যাগযজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মকাণ্ড ও বিবাদপরায়ণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের বাদবিতর্কময় জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধী বটে, কিন্তু তাহা গৃহস্থাশ্রমের প্রতি ঔদাসীন্যময় অস্বাভাবিক বৈরাগ্যপ্রবণতা নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ মায়ামোহান্ধ জীবগণের নিস্তারের জন্যই সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্ত পরিবারে মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বয় এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক ভক্তবৈষ্ণব গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। ঠাকুর মহাশয় যদিও দারপরিগ্রহ করেন নাই কিন্তু সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক উদাসীনও হয়েন নাই। তিনি জীবনের প্রথম হইতে অতুল বিত্তবিভব ও ভোগবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল জনসমাজের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনে চিরজীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন। আচার্য্য প্রভু দারপরিগ্রহ করিয়া যথানিয়মে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পরিপালন পূর্ব্বক কেবল জ্ঞানধর্ম্ম প্রচারে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত পক্ষে গীতোপনিষদোক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানসঙ্গত নিষ্কাম কর্ম্ম-প্রবণতা।"

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

মহান

লোকে আমায় বলে এসে
তুমি মহাশয়,
শুনে আমার প্রাণের মধ্যে
জাগে মহাভয়।
তাই যদি গো হবে আমার
আশয় হবে বড়
তবে কেন সেথায় এত
তৃষ্ণা রবে জড় ?
লোকে আমায় বড় বলে
করে কানাকানি
আমার হেথা বুকের মধ্যে
কাঁপে মহাপ্রাণী।

খোঁজে যদি তারা আমার
বুকের তলদেশ
দেখ্‌বে সেথা টানাটানি
হানাহানির শেষ।
লাজে তখন মুখখানি মোর
হয়ে যাবে নত
মহা আশার কথা হবে
স্বপ্নসম গত।
আগে ভাগে সবায় আমি
বলে রাখি তাই
"মহা" আমার সীমার মধ্যে
কোনখানে নাই।
দেয় যদি সে কভু এসে
সীমার মাঝে ধরা
সকল আশা হবে আমার
মহান্‌-ভাবে-ভরা।

শ্রীহেমলতা দেবী।

গীতাপাঠ*

(পূর্বানুবৃত্তি)

ত্রিগুণতত্ত্বের গোড়ার কথাটির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার প্রথম উপক্রমে সত্ত্বগুণের দুইটি অবয়ব প্রধানতঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—(১) সত্তার প্রকাশ এবং (২) সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। তাহার পরে সত্ত্বগুণের আর একটি অবয়ব সহসা আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে নিপতিত হইল—(৩) সত্তার আত্মসমর্থনা শক্তি, সংক্ষেপে—আত্মশক্তি। ঐ তিনটি সত্ত্বাঙ্গের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ সহযোগিতা-সম্বন্ধ—বিগত প্রবন্ধাংশে আমি তাহার ঈষৎ আভাস মাত্র প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলাম;—বলিয়াছিলাম কেবল এইমাত্র যে,

আনন্দ সত্ত্বগুণের হৃদয়;
প্রকাশ সত্ত্বগুণের বামহস্ত;
আত্মশক্তি সত্ত্বগুণের দক্ষিণ হস্ত।

এই স্বল্প ইঙ্গিতটুকুর মধ্যে মনোনিবেশপূর্ব্বক তলাইয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আত্মসত্তার প্রকাশ ঘটাইয়া তোলা একটা-শুধু মনোবৃত্তির অ্যাক্‌লার কার্য্য নহে;—চলন-কার্য্যের পক্ষে যেমন দুই পদের পরিচালনা সমান আবশ্যক, সন্তরণ কার্য্যের পক্ষে যেমন দুই হস্তের পরিচালনা সমান আবশ্যক, আত্মসত্তার প্রকাশের পক্ষে তেমনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মৃতি এই দুই বৃত্তির উভয়েরই পরিচালনা সমান আবশ্যক। আবার, চলন-কালে যেমন দুই পদ স্বভাবতই একযোগে কার্য্য করে, আত্মসত্তার প্রকাশকালে তেমনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মৃতি উভয়ে মিলিয়া স্বভাবতই একযোগে কার্য্য করে। ভূতপূর্ব্ব বিষয়ের স্মরণ কিরূপে বর্ত্তমান বিষয়ের সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইয়া দাঁড়ায়, তাহার গোটাদুই দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—প্রণিধান কর।

বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা যখন সাত রঙ্‌ একসঙ্গে মিশিয়া কিরূপে সাদা রঙ্‌ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা ছাত্রবর্গের প্রত্যক্ষগোচরে আনিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সেই অভিপ্রেত কার্য্যটি নিষ্পাদন করেন এইরূপ সুকৌশলে:—

* শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রবন্ধ-পাঠ সভায় পঠিত।
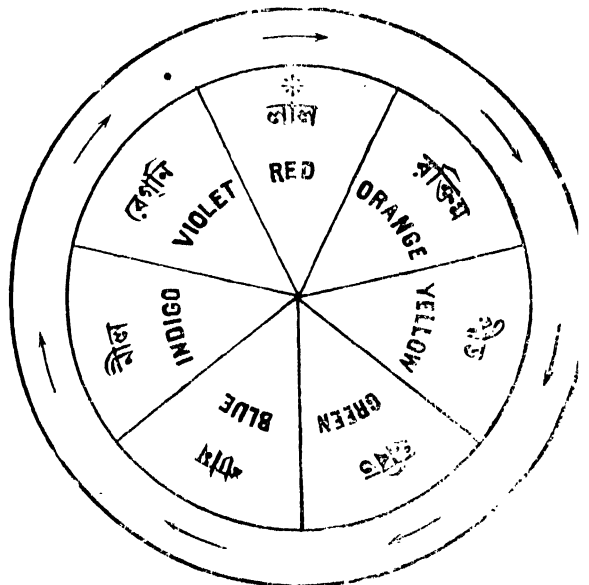
অধ্যাপক চূড়ামণি একটি চক্রফলক'কে সাতরঙের সাতটি কেন্দ্রোত্থপুচ্ছাকৃতি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যন্ত্রযোগে দ্রুতবেগে ঘুরাইতে থাকেন, আর তাহারই গুণে সাতরঙ একসঙ্গে মিশিয়া ছাত্রবর্গের চক্ষের সমুখে সাদা রঙে পরিণত হয় (ক্ষেত্র দেখ)। তারা-চিহ্নিত চূড়াস্থানটিতে প্রথমে ছিল ঘূর্ণায়মান চক্রটার বেগুনি খণ্ড, তাহার পরে আসিল নাল* খণ্ড, তাহার পরে শ্যাম খণ্ড, তাহার পরে হরিত খণ্ড, তাহার পরে পীত খণ্ড, তাহার পরে রক্তিম খণ্ড। এইরূপে ঐ তারা-চিহ্নিত চূড়াস্থানটিতে ছয় রঙের ছয় খণ্ড একে একে আসিয়া ওখান হইতে ঘুরিয়া গেল যেমি-মাত্র, তৎক্ষণাৎ অমি লাল খণ্ডটি ঐ স্থান অধিকার করিল। তারা-চিহ্নিত চূড়াস্থানে লাল-খণ্ডটি যখন উপস্থিত, তখন দর্শক ঐ স্থানটিতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছে শুদ্ধ কেবল লালরঙ, তা ছাড়া আর কোনো রঙ নহে; কিন্তু, হইলে কি হয় আর ছয়টা রঙের সব-ক'টাই দর্শকের স্মরণের খিড়্‌কিদ্বার দিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি-ক্ষেত্রে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া লালরঙের সঙ্গে জোড়া লাগিয়া গেল। লাল তাই, এক্ষণে আর লাল নাই—লাল এক্ষণে সবারই সমক্ষে সাদা। চূড়াস্থানের এ যেমন দেখা গেল—সব স্থানেরই ঐ দশা; ঘূর্ণায়মান চক্রফলকটা'র ব্যাপ্তিস্থানের প্রত্যেক বিভাগেই সব-ক'টা রঙ স্মরণ এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধির যোগে প্রতিমুহূর্ত্তে একসঙ্গে জড়ো হইয়া সাদা রঙে পরিণত হইতেছে। এরূপ স্থলে স্মরণ স্মরণ-মাত্র হইয়াই ক্ষান্ত থাকে না—স্মরণ সাক্ষাৎ উপলব্ধির পদে আরূঢ় হয়। এটা চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত;—ইহারই জুড়ি ধাঁচার আর-একটি দৃষ্টান্ত আছে—সেটা শ্রৌত দৃষ্টান্ত, সেটাও দেখা উচিত। সেটা এই :—

তুমি যখন মুখে উচ্চারণ করিতেছ "শ্রী" এই একটি-মাত্র শব্দ, তখন তোমার শ্রবণগোচরে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছে শ্‌, তাহার পরে র্‌, শেষে উপস্থিত হইল ঈ। ঈ যখন তোমার শ্রবণে উপস্থিত, তখন শ্‌ এবং র্‌ উভয়ে তোমার স্মরণের খিড়্‌কিদ্বার দিয়া চুপি চুপি সাক্ষাৎ উপলব্ধি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঈ'র সঙ্গে দিব্য অবলীলাক্রমে মিশিয়া গিয়াছে; আর সেই গতিকে তুমি ঈ শুনিবামাত্রই তাহার পরিবর্ত্তে "শ্রী" শুনিতেছ। এই দৃষ্টান্তের পরিষ্কার আলোকে এটা এখন বেস্‌ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আত্মসত্তার উদ্দ্যোতনে সাক্ষাৎ উপলব্ধিরও যেমন, স্মরণেরও তেমনি, দুয়েরই কার্য্যকারিতা সমান। একটি বিষয় কিন্তু এখনো বুঝিতে বাকি আছে সেটা হ'চ্চে এই যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে স্মরণের সংযোগ ঘটে কিরূপে? এ প্রশ্নের সোজা উত্তর এই যে, সংযোগ ঘটে আত্মশক্তির বলে। আত্মসত্তার উদ্দ্যোতনের অর্থই হ'চ্চে আত্মসমর্থন তাহা আত্মসমর্থনী শক্তিরই কার্য্য। যখন আমরা চলিতে আরম্ভ করি তখন স্বভাবতই আমাদের দুই পা একযোগে কার্য্য করে দেখিয়া আমাদের মনে হইতে পারে যে দুই পায়ের চলনের মধ্যে যোগ রক্ষা করিবার জন্য চলনকর্ত্তার কোনোপ্রকার শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের মনে হয় বটে ঐরূপ; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, বিনা শক্তিতে কোনো কার্য্যই সম্ভবে না। এমন কি, সমস্ত দিন আমরা যে, ঘাড় উঁচা করিয়া বসি দাঁড়াই এবং চলাফেরা করি, এই সহজ কার্য্যটিতেও আমাদের শক্তি খাটে কম না। তার সাক্ষী—একঘেয়ে পুরাতন কথার অজস্র ধারা শুনিতে শুনিতে সভার মাঝখানে যখন কোনো শ্রোতার নিদ্রাকর্ষণ হয়, তখন তাঁহার গ্রীবোন্নামনী শক্তির উদ্যম শিথিল হওয়া গতিকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঘাড় ঢুলিয়া পড়ে। ইহাতেই আক-ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে স্মরণ জোড়া দিয়া প্রকাশ ঘটাইয়া তোলা বিনা-শক্তিতে সম্ভাবনীয় নহে,—তাহা আত্মশক্তিরই কার্য্য তাহাতে আর ভুল নাই। তবে এটা সত্য যে, প্রথম উদ্যমে, আত্মশক্তি দ্রষ্টাপুরুষের চক্ষে আপনাকে ধরা দ্যায় না। প্রথম উদ্যমে, সন্ধিসূত্র যেমন দ্রবীভূত শর্করারাশির মধ্যে ঢাকা থাকিয়া চারিদিক হইতে নিঃশব্দে পরমাণু সংগ্রহ করিয়া বিচিত্র স্ফাটিক ব্যূহ (মিছ্‌রি)

* [নীলমণি এবং শ্যামচাঁদ দুই নামই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ-পরিচায়ক; তাছাড়া কালিদাস একস্থানে আকাশের বিশেষণ দিয়াছেন অসি-শ্যাম অর্থাৎ তলোয়ারের মতো শ্যামবর্ণ। আকাশের বর্ণ ইংরাজি ভাষায় blue। আকাশের বর্ণকে শ্যাম বলাও যাইতে পারে, নীল বলাও যাইতে পারে, কিন্তু indigoকে নীল ভিন্ন শ্যাম বলা যাইতে পারে না।]

নির্ম্মাণ করে, আত্মশক্তি তেমনি প্রকৃতি-গর্ভে লুকাইয়া থাকিয়া বর্ত্তমানমুখী সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং ভূতমুখী স্মৃতি এই দুই বিভিন্নমুখী মনোবৃত্তিকে এক সূত্রে বাঁধিয়া সেই জোড়া-মনোবৃত্তিকে আত্মসত্তার উদ্দ্যোতন-কার্য্যে সমভাবে নিয়োজিত করে। প্রথম উদ্যমে, এইরূপ আত্মশক্তি প্রকৃতি-গর্ভে তমসাচ্ছন্ন থাকিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় অলক্ষিতভাবে কার্য্য করে। দ্বিতীয় উদ্যমে, আত্মশক্তি আত্মসত্তার প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশে অভ্যুত্থান্ করিয়া আত্মসত্তা'র নৈবেদ্যের ডালা হইতে রজস্তমোগুণের আবরণ সরাইয়া ফেলিয়া দ্রষ্টাপুরুষের আনন্দ-বর্দ্ধন করে।

আত্মশক্তির দুই উদ্যমের কথা এ যাহা আমি বলিতেছি—এ কথা আমি কোথা হইতে পাইলাম? বেদ হইতে—না কোরান হইতে—না বাইবেল্ হইতে? তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, আদিম শাস্ত্র বেদও নহে, কোরানও নহে, বাইবেলও নহে।

আদিম শাস্ত্র আবার কোন শাস্ত্র?
তাহা জানো না?—
সে যে মহাশাস্ত্র!
তাহার নাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এ শাস্ত্রের মূল গ্রন্থ দুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আত্মশক্তির প্রথম উদ্যমের পুরাণ কাহিনী যথাবিহিত স্পষ্টাক্ষরে আনুপূর্ব্বিক লেখা রহিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মশক্তির দ্বিতীয় উদ্যমের অভিনব কাহিনী সেইরূপই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়া মানবমণ্ডলীর বংশ পরম্পরার মুদ্রাযন্ত্র হইতে খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইয়া মান্ধাতার আমল হইতে নিরবচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে এবং আরো যে কত যুগযুগান্তর চলিবে তাহা কে বলিতে পারে? এই দুই অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকার্য্য আমাদের দেশের পুরাকালের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যেরা সাধ্যমতে এক দফা করিয়া চুকিয়াছেন। এখন আবার—পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সেই পুরাতন, অথচ নিত্য-নূতন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার্য্যের অনুষ্ঠানে কোমর-বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। জীবদিগের অজ্ঞাতসারে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় তলে তলে কার্য্য করিয়া—জীবেরা যাহাতে যথাকালে মনুষ্যত্বের ব্রহ্মডাঙায় তমোগুণের মৃত্তিকার উপরে দুই পায়ের ভর দিয়া এবং সত্ত্বগুণের মুক্ত আকাশে মাথা উঁচা করিয়া গৌরবের সহিত দাঁড়াইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, আত্মশক্তি কিরূপ সুকৌশলে রজোগুণের শাণিত অস্ত্র দিয়া রজস্তমোগুণের বাধা অল্পে অল্পে অপসারণ করে কাঁটা দিয়া কাঁটা উন্মোচন করে—আত্মশক্তির এই প্রথম উদ্যমের ব্যাপারটি প্রথম অধ্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দ্যায়; আর মনুষ্যের জ্ঞানগোচরে আত্মশক্তি কিরূপে রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দ্যায়—আত্মশক্তির এই দ্বিতীয় উদ্যমের ব্যাপারটি দ্বিতীয় অধ্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দ্যায়। দুই অধ্যায় এক সঙ্গে মিলিয়া সমস্বরে এই একটি নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান আমাদের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছে যে, প্রথম উদ্যমে জীবের আত্মশক্তি পরমাত্মার হস্তে বিধৃত থাকে; দ্বিতীয় উদ্যমে তাহা জীবাত্মার হস্তে বিধিমতে সমর্পিত হয়। এই কথাটির মর্ম্মের ভিতরে একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক তলাইয়া দেখিলে, গোড়ায় আমরা এই যে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম—"এক" যদি হয় সমস্তই, তবে "অনেক" আসিবেই বা কোথা হইতে, বসিতে স্থান পাইবেই বা কোথায় এই দুরূহ প্রশ্নটির মীমাংসার পথ অনেকটা দূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

একটু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, আত্মসত্তার প্রকাশ-সংঘটনে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণ দুয়েরই কার্য্যকারিতা সমান; এটাও দেখিয়াছি যে, স্মরণ সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধিরই সামিল হইয়া যায়, আর, তাহা যখন হয় তখন সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণের মধ্যেই মূলেই কোনো প্রভেদ থাকে না। আমরা যখন সঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন শ্রূয়মান গীতের নানা স্বরাঙ্গ এক-এক মুহূর্ত্তে একএকটি করিয়া আমাদের কর্ণে উপস্থিত হয়, আর যে-সুরটি যে-মুহূর্ত্তে আমাদের কর্ণে উপস্থিত হয় সেই-সুরটিই কেবল আমরা সেই মুহূর্ত্তে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করি। কিন্তু হইলে কি হয়—সাক্ষাৎ উপলব্ধির যে-একটি কনিষ্ঠা ভগ্নী আছে—যাহার নাম স্মৃতি সাক্ষাৎ উপলব্ধির সেই সহবৃত্তিটি ভূতকাল হইতে নানা সুর যোটপাট করিয়া

আনিয়া সমস্ত দলবল সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ উপলব্ধির কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাহার সঙ্গে মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়, আর, সেই গতিকে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা গানই শ্রবণ করি, তা বই কোনো মুহূর্ত্তে আমরা যূথভ্রষ্ট একটি মাত্র সুর শ্রবণ করি না। সঙ্গীত শ্রবণের ব্যাপারটি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই এই :—

গায়ক চূড়ামণি আত্মশক্তির প্রভাবে শ্রোতার সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণের উপরে একযোগে কার্য্য করিয়া শ্রোতার জ্ঞানগোচরে বিশেষ কোনো একটি রাগের বা রাগিণীর রূপ প্রকাশ করেন, আর, সেই প্রকাশের মধ্য দিয়াই শ্রোতা গীয়মান স্বরলহরার মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করেন। প্রথম উদ্যমে শ্রোতা অজ্ঞাতসারে আত্মশক্তি খাটাইয়া স্মরণ এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধির যোগে গায়কের কণ্ঠনিঃসৃত গানটি মুগ্ধভাবে শ্রবণ করেন; দ্বিতীয় উদ্যমে, সজ্ঞানভাবে অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মশক্তি খাটাইয়া সেই গানটি সাধ্যানুসারে পুনরাবৃত্তি করেন। পুনরাবৃত্তি করেন কেন? না যেহেতু সে গানটি তাঁহার বড্ড ভাল লাগিয়াছে গানের রসাস্বাদনজনিত আনন্দই পুনরাবৃত্তি কার্য্যটির প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামক। আনন্দকে পুনরাবৃত্তি কার্য্যের নিয়ামক বলিতেছি এই জন্য যেহেতু পুনরাবৃত্তি কার্য্যের কোনোস্থান যদি খাপছাড়া হয়, তবে সাধকের তৎক্ষণাৎ আনন্দের ব্যাঘাত হয়, আর তাহাতেই সাধক বুঝিতে পারেন যে, "এ জায়্‌গাটা ঠিক্ হইতেছে না।" সাধক যখন বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার পুনরাবৃত্তি-কার্য্যটি ঠিক্‌মাফিক হইতেছে না, তখন তিনি গায়কের নিকটে গমন করিয়া সাধের গানটি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন করেন; এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে যখন তাঁহার অন্তরের আনন্দের সহিত পুনরাবৃত্তি-কার্য্যটির সুর মিলিয়া যায়, তখন তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। বলিলাম "শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন"; এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকাশ-সংঘটনের পক্ষে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণ দুই-ই যেহেতু সমান আবশ্যক, এই জন্য সঙ্গীত-শিক্ষার পক্ষে শ্রবণ এবং মনন দুইই সমান আবশ্যক; আবার, আত্মশক্তি খাটাইয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধির সহিত স্মরণের যোগ-বন্ধন করা যেহেতু প্রকাশ-সংঘটনের পক্ষে আবশ্যক এই জন্য নিদিধ্যাসন দ্বারা শ্রবণ এবং মননকে একসূত্রে বাঁধিয়া একীভূত করা সঙ্গীত শিক্ষার পক্ষে আবশ্যক। গানের সম্বন্ধে এতগুলা কথা এ যাহা বলিলাম—এ সমস্তই কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। প্রকৃত কথা যাহা বক্তব্য তাহা এই :

এটা আমরা এখন বেস্ বুঝিতে পারিয়াছি যে আত্মশক্তির কার্য্যকারিতায় সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণ একসঙ্গে মিশিয়া একীভূত হইলে তবেই দ্রষ্টা পুরুষের অন্তঃকরণের বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চিৎপ্রকাশের অভ্যুদয় হয়। এই সঙ্গে এটাও কিন্তু বোঝা উচিত যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধিই মূল স্মরণ তাহার একপ্রকার লেজুড়। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি ধ্বনি স্মরণ প্রতিধ্বনি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্রষ্টা পুরুষের অন্তঃকরণে আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধি কোথা হইতে আইসে? এটা যখন স্থির যে, তাহা দ্রষ্টাপুরুষের নিজের শক্তি হইতে আসে না, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরমাত্মার ঐশী শক্তিই তাহার একমাত্র প্রেরয়িতা। যদি সূর্য্য হইতে আলোক না আসিত তবে জীব চক্ষু চক্ষুই হইত না ইহা বলা বাহুল্য। কালিদাস যদি বলেন যে, "আমি শুদ্ধ কেবল আত্মশক্তির বলে ঋতুসংহার রচনা করিয়াছি" তবে মোটামুটি-ভাবে তাঁহার মুখে সে কথা শোভা পাইতে পারে—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তাঁহার ঐ কথাটির ভিতরে একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক তলাইয়া দেখিলে দর্শকের চক্ষে উহার অপ্রামাণিকতা ঢাকা ঢাকা থাকিতে পারে না। এ তো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, নানা ঋতুর নানা সৌন্দর্য্য যাহা তিনি পূর্ব্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; তাহার পরে তিনি আত্মশক্তির বলে সেই স্মরণায়ত্ত ব্যাপারগুলির মধ্যে যথাভিরুচি যোগাযোগ ঘটাইয়া ঋতুসংহার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কালিদাসের কবিতার গোড়ার সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধির ব্যাপারটি যদি গণনার

মধ্য হইতে সরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার একথা খুবই ঠিক যে, তিনি আত্মশক্তির বলে ঋতুসংহার রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ও কথাটি সত্য হইতে পারে না এই জন্য—যেহেতু, গোড়ার সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধির উপরে তাঁহার নিজের হস্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহা না থাকারই মধ্যে। "তাঁহার নিজের হস্ত মূলেই ছিল না" না বলিয়া—বলিলাম "তাঁহার নিজের হস্ত। যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহা না থাকারই মধ্যে" এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান দৃষ্টান্তস্থলে যাহাকে বলা হইতেছে গোড়ার সাক্ষাৎ উপলব্ধি তাহা অপেক্ষাকৃত গোড়ার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইলেও তাহা আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধি নহে—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি নহে। আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধির সংঘটনকর্ত্তা স্বয়ং পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না এইজন্য যেহেতু সাক্ষাৎ উপলব্ধি স্মরণের গোড়ার প্রতিষ্ঠাভূমি, সুতরাং তাহার সংঘটনে স্মরণের কোনো প্রকার কার্য্যকারিতা থাকিতে পারে না। একটি সদ্যো-জাত শিশুর সাক্ষাৎ উপলব্ধি-ক্ষেত্রে দিবালোক কিছুকাল ধরিয়া কার্য্য করিলে, তবে তাহা তাহার স্মরণে মুদ্রিত হয়; স্মরণে মুদ্রিত হইলে, আত্মশক্তি তলে তলে কার্য্য করিয়া স্মরণ এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধির যোগে শিশুর জ্ঞান-গোচরে দৃশ্যবস্তুসকলের নৈবেদ্যের ডালা অনাবৃত করে। সদ্যজাত শিশুর স্মরণে দিবালোক রীতিমত মুদ্রিত হওয়া যেহেতু সময়-সাপেক্ষ, এইজন্য সদ্যোজাত শিশু প্রথমে যখন আলোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করে, তখন তাহার সহিত স্মরণ মিশ্রিত থাকে না বলিয়া তাহা তাহার জ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে আসে না; আর, তাহা যখন তাহার জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে গোড়ার সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধির সংঘটনে তাহার নিজের কোনো হস্ত ছিল না। অতএব এটা স্থির যে আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধি পরমাত্মার ঐশীশক্তির বলেই মনুষ্যের অন্তঃকরণে জাগিয়া ওঠে। মনে কর একজন সঙ্গীতের ওস্তাদ সঙ্গীতরসে এমনি মাতোয়ারা যে, লোকে তাহার নাম দিয়াছে গীতানন্দ সরস্বতী; এখন দ্রষ্টব্য এই যে, গীতানন্দ স্বামী যেমন আপনার গীতানন্দ শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে জাগাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের কর্ণে গীত-সুধা বর্ষণ করেন—আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা তেমনি আপনার আনন্দ জীবাত্মার অন্তঃকরণে জাগাইয়া তুলিবার জন্য সাত্ত্বিক প্রকাশ প্রেরণ করেন। উপনিষদে তাই উক্ত হইয়াছে "রসো বৈ সঃ" রস তিনি নিশ্চয়ই "রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" রসকেই লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়। "এষহ্যেবানন্দয়াতি" পরমাত্মাই আনন্দ জাগাইয়া তোলেন। এ কথাগুলি কবির কল্পনামাত্র নহে উহা ধ্রুব সত্য। সত্ত্বগুণপ্রধান জীবের অন্তঃকরণে (অর্থাৎ মনুষ্যের অন্তঃকরণে) ঐশীশক্তির বলে সাত্ত্বিক প্রকাশ যাহা উদ্বোধিত হয়, তাহা বাস্তবিকই আনন্দের মূল উৎস। তার সাক্ষী—কি মনুষ্য কি পশ্বাদি জন্তু সকল জীবেরই ক্ষুধা-তৃষ্ণার সময় অন্ন পানে আনন্দ হয়, কিন্তু জীব-রাজ্যে অ্যাকা কেবল মনুষ্যেরই সাত্ত্বিক প্রকাশে বা জ্ঞানে আনন্দ হয়। কচি বালক কেমন অবলীলাক্রমে মাতৃভাষা শিখিয়া ফ্যালে ইহা সকলেরই জ্যাখা কথা। দুই এক বৎসরের বালক মাতৃমুখোচ্চারিত কথা শুধু কেবল কানে শুনিয়াই ক্ষান্ত থাকে না—পরন্তু তাহার ভাবের ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। ক্ষুধাকালে মাতার স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া সে যেমন আনন্দ লাভ করে—মাতৃবাক্যের ভাবসুধা পান করিয়া সে সেইরূপই বা ততোধিক আনন্দ লাভ করে। পরমাত্মার ঐশীশক্তি হইতে যেমন সূর্য্যালোক আসিয়া নির্জীব জগৎকে সজীব করিয়া তোলে—অন্ধ জগৎকে চক্ষুষ্মান্ করিয়া তোলে—অচেতন জগৎকে সচেতন করিয়া তোলে, তেমনি, সেই সঙ্গে সাত্ত্বিক প্রকাশ (অর্থাৎ গোড়ার সাক্ষাৎ উপলব্ধি) অবতীর্ণ হইয়া আবালবৃদ্ধ মনুষ্যের অন্তঃকরণে বিমল আনন্দের দ্বারা উদ্ঘাটন করিয়া দ্যায়। ঈশ্বর-প্রেরিত সত্ত্বগুণ শুধু যে কেবল জ্ঞান এবং আনন্দের গোড়ার সূত্র তাহা নহে তাহা ধর্ম্মেরও গোড়ার সূত্র। কচি বালকেরা তাহাদের মাতাপিতা ভ্রাতাভগ্নী এবং পার্শ্ববর্ত্তী আর আর লোকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার সত্তার নবোদিত প্রকাশের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তাঁহাদের সবাই-কার সত্তার রসাস্বাদন করে, আর তাহাতেই তাহাদের আনন্দ হয়; তার সাক্ষী তাহারা ধাত্রীর বা মাতাপিতার বা ভ্রাতাভগ্নীর আদর-বাণী শুনিলে কেমন সুমধুর হাস্য

করে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাহাদের অকৃত্রিম সরল হৃদয়ের নিকটে সকলেই আত্মতুল্য—অথচ তাহারা গীতাশাস্ত্রের বা বাইবেলের এক ছত্রও পাঠ করে নাই। এইরূপ সমদর্শিতা এবং সমব্যথিতাই ধর্ম্মের গোড়ার কথা। এখন দেখিতে হইবে যে, গীতানন্দ সরস্বতীর কণ্ঠ-নিঃসৃত গান যেমন নিখুঁত, শিক্ষার্থী সাধকের কণ্ঠ-নিঃসৃত গান সেরূপ নিখুঁত হওয়া দূরে থাকুক, তাহা নানা প্রকার বাধায় জড়িত। শিক্ষার্থী সাধককে কিছুদিন ধরিয়া গান সাধিতে হইবে—তাল মান সুর ঠিক মতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা কণ্ঠ দিয়া বাহির করিতে হইবে—এইরূপ আর আর নানাবিধ কার্য্য হাতে-কলমে করিতে হইবে যাহা সহজে হইবার নহে। শিক্ষার্থী ব্যক্তি সঙ্গীত-বিদ্যার তীর্থ-যাত্রী; কাজেই, গন্তব্য পথের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে গম্যস্থানে উপনীত হইতে হইবে।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পরমাত্মা সমষ্টি সৎ, সুতরাং তাঁহার সত্তা সত্ত্বগুণের নিদান, আর তাঁহার শক্তিরূপী সেই আদিম এবং সনাতন সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধায় জড়িত নহে বলিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রে তাহা শুদ্ধ সত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই ত্রিগুণাত্মক; অথবা যাহা একই কথা—ব্যষ্টিসত্তার অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধায় জড়িত। এই জন্য প্রথম উদ্যমে সাধক সহজভাবে আত্মশক্তি খাটাইয়া পরমাত্মার হস্ত হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন, দ্বিতীয় উদ্যমে পরমাত্মার প্রসাদ-লব্ধ সেই সত্ত্বগুণের আশপাশের বাধা আত্মপ্রভাবের বলে অতিক্রম করিয়া তাহার আগমনের পথ পরিষ্কার করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, আত্মশক্তির প্রথম উদ্যমের ফল সেই যে অযাচিত সাত্ত্বিক আনন্দ যাহা পরমাত্মার প্রসাদে শিশুর অন্তঃকরণেও যেমন আর সরল হৃদয় সাধু-যুবার অন্তঃকরণেও তেমনি, টাট্‌কা-টাট্‌কি আকাশ হইতে নিপতিত হয়, তাহাই সাধকের আত্মশক্তির দ্বিতীয় উদ্যমের নিয়ামক। পরমাত্মার প্রসাদ-লব্ধ গোড়ার সেই সাত্ত্বিক আনন্দই সাধককে মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করে। সে আনন্দ বিষয়সুখের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন আনন্দ নহে—পরন্তু তাহা জ্ঞানগর্ভ সুবিমল আনন্দ; আর, সেইজন্য উপনিষদে তাহা প্রজ্ঞানঘন বলিয়া উক্ত হইয়াছে;—উক্ত হইয়াছে

"প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ"

আনন্দময় কোষস্থ জীব প্রজ্ঞানঘন আনন্দভুক্ চেতোমুখ।

এই সাত্ত্বিক আনন্দের সঙ্গে যাহার সুর মেলে তাহাই মঙ্গল কার্য্য, আর, তাহার সঙ্গে যাহার সুর মেলে না তাহাই অমঙ্গল কার্য্য। দেবপ্রসাদ-লব্ধ সাত্ত্বিক আনন্দই সাধকের আত্মপ্রসাদের মূল উৎস, আর, তাহারই আর এক নাম অন্তরাত্মা। পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও বলে, Conscience is the voice of God অন্তরাত্মার বাণী ঈশ্বরেরই বাণী। এ বিষয়টি আর একটু বিশদরূপে বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক। আগামী বারে তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবীন-সন্ন্যাসী

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সাধুসঙ্গ।

মোহিত যখন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তখন সামান্য আলোক ফুটিয়াছে মাত্র। পৌরজন কিম্বা দাসদাসী কেহ তখনও জাগে নাই। নির্ব্বিঘ্নে ফটক পার হইয়া মোহিত গ্রাম্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। দুই চারি জন পরিচিত লোক পথে ছিল বটে কিন্তু আলোকের অল্পতায়, এ ছদ্মবেশে কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না।

মোহিতের পরিধানে একখানি গৈরিক বসন, একখানি উত্তরীয়, তাহার উপর কম্বলখানি জড়ান। অগ্রহায়ণের মধ্যভাগ—একটু বেশ শীতের আমেজ দিয়াছিল। গৈরিক-বর্ণের মোটা কাপড়ের একটি ঝুলি তাহার দক্ষিণহস্তে ঝুলিতেছিল। তন্মধ্যে একখানি গীতা, একখানি সাংখ্য-দর্শন এবং আরও চারি পাঁচখানি পুস্তক ছিল। একখানি বড় ছুরিও ছিল। বামহস্তে লোটাটি বগলে একখানি মৃগচর্ম্ম। কোনওরূপ খাদ্যদ্রব্য কিম্বা অর্থ—এসব কিছুই

ছিল না। কেমন করিয়া তাহার চলিবে তাহা কি মোহিত ভাবে নাই? ভাবিয়াছিল বৈ কি। বাল্যকালাবধি তাহার মনটি ভক্তিপ্রবণ। তাহার বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর যখন জীব দিয়াছেন তখন আহার তিনিই যোগাইবেন। এই নির্ভরশীলতার ভাব তাহার মনে এখন অধিকতর স্ফূর্ত্ত হইয়াছে।

কোন্ পথে, কোথায় যে মোহিত যাইবে তাহা কিছুই সে স্থির করিয়া বাহির হয় নাই। কল্যাণপুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে একটি সরকারী পাকা রাস্তা ছিল, সে রাস্তা বরাবর খুলনা গিয়াছে। যখন রেল খোলে নাই, তখন এই পথ দিয়াই লোকে জেলায় যাইত। গ্রামপ্রান্তে পৌছিয়া সেই রাস্তার দিকেই মোহিত পদচালনা করিল। মাঠের মধ্যে দিয়া কাঁচা রাস্তা গিয়া সেই রাজপথে মিশিয়াছে।

মোহিত যখন গ্রাম হইতে অনুমান একক্রোশ আসিয়াছে, তখন বড় ঘটা করিয়া পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় হইল। সে দৃশ্য দেখিয়া, কয়েকদিন পূর্ব্বে শেষবার যে সূর্য্যোদয় মোহিত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাই তাহার স্মরণ হইল। মনে হইল, সে সূর্য্য তাহার আকুল প্রার্থনার পুরস্কারে, চিনির নবজীবনদাতা স্বরূপ আসিয়া উদিত হইয়াছিলেন। কি শান্তি—কি পুলকহিল্লোল তাহার অন্তঃকরণ সেদিন পরিপ্লাবিত করিয়াছিল!—ভাবিতে লাগিল, চিনি এখন কেমন আছে?—কি করিতেছে?—আহা, সে বালিকার জীবন সুখময় হউক।—এইরূপ চিন্তা-পরম্পরা মোহিতের মানসক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিতেই তাহার চৈতন্য হইল। পথের মধ্যে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নিজের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভাবিল—"এ কি! আমি না গৃহ ছাড়িয়া গৈরিক বস্ত্র পরিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে চলিয়াছি? কোথায় আমি ধর্ম্মচিন্তায় ভগবচ্চিন্তায় বিভোর থাকিব, তাহার পরিবর্ত্তে আমার মনে কামিনী চিন্তাই আধিপত্য করিতেছে! ছি ছি ছি - ধিক আমাকে!"—এইরূপ আত্মানুশোচনার পর, মনে মনে মোহমুদ্গরের শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর বেগে সে পথ চলিতে লাগিল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাল এইরূপ চলিলে, সম্মুখরৌদ্রে তাহার কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তখন কম্বলখানি গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া, ঝুলির মধ্যে ভরিয়া লইল। দুই দিকের মাঠ পীত ধান্যে পরিপূর্ণ। পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একখানি গোশকট, বিপরীত দিক হইতে আসিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আরোহিগণ কৌতুহলপূর্ণ নেত্রে তাহার পানে চাহিতেছে—কেহ কেহ প্রণামও করিতেছে।

মোহিত যখন পাকা রাস্তার উপর পৌছিল, তখন বেলা ৭টা হইবে। ইতিমধ্যেই সে একটু শ্রান্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ, গত রাত্রে তাহার নিদ্রা হয় নাই বলিলেই হয়। দ্বিতীয়তঃ, পথ চলাও কোন কালে অভ্যাস ছিল না। যখন কলিকাতায় কলেজে পড়িত তখন বৈকালে একবার করিয়া গোলদীঘিতে বেড়াইতে যাইত মাত্র। রবিবার কিম্বা অন্য ছুটির দিনে আর একটু অগ্রসর হইয়া, বিডন বাগানে কিম্বা হেদুয়া পুষ্করিণীর তীরে গিয়া বেড়াইত।—কখনও বা ইডেন বাগানে অথবা গড়ের মাঠে যাইত—সেও কালে ভদ্রে। কলেজ ছাড়িয়া অবধি প্রাত্যহিক ভ্রমণ আর নাই। কোন দিন ঝোঁক হইলে তিন চারি মাইলও বেড়াইয়াছে বটে কিন্তু সে কদাচিৎ।

সংযোগস্থলে বড় রাস্তার নিম্নে একটি পাকা সাঁকো ছিল। তাহারই একটি আলিসায়, গাছের ছায়ায় মোহিত উপবেশন করিল। ঝির ঝির করিয়া মৃদু হৈমন্তিক বায়ু বহিতেছে। মোহিতের ঘর্ম্ম ও শ্রান্তি শীঘ্রই অপনোদিত হইল। সেখানে বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, "এখন কোন দিকে যাই? খুলনার দিকে না বিপরীত দিকে?"—বিপরীত দিকে কোন স্থানে গিয়া যে রাস্তা শেষ হইয়াছে তাহা মোহিত জ্ঞাত ছিল না। ভাবিল—"বরং খুলনার দিকেই যাই। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, সেখান হইতে রেলে কাশী কিম্বা বৃন্দাবন চলিয়া যাইব।"

এখান হইতে খুলনা ছত্রিশ মাইল—দুইদিনের পথ। তিন ক্রোশ দূরে কাশিয়াদহ নামে একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। মোহিত উঠিয়া আবার পথ চলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে রৌদ্র ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, মোহিতের গতিবেগও হ্রাস হইল। বেলা যখন দশটা হইবে, তখন

পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। পথচারী লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, এক ক্রোশ দূরে কাশিয়াদহ। আজ সেখানে হাঠ বসিবে—ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ, ফল, তরীতরকারী সেখানে যাইতেছে। গোয়ালারা ঘৃত, দধি, দুগ্ধের ভার লইয়া ছুটিয়াছে। পথের পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড দীঘি ছিল, জলপানার্থ মোহিত রাস্তা হইতে নামিয়া তাহার তীরে গিয়া দাঁড়াইল।

জলের নিকট পৌঁছিয়া হটাৎ মোহিতের মনে হইল, আজ ত এখনও সন্ধ্যা আহ্নিক করা হয় নাই—তৎপূর্ব্বে জলপান করিবে কেমন করিয়া? তখন সে জলে নামিয়া মুখাদি ধৌত করিয়া লইল। দীর্ঘিকার তীরে তীরে আম্র, নারিকেল প্রভৃতি নানাবিধ ফলের বাগান। সেই বাগানে প্রবেশ করিয়া একটি পরিচ্ছন্ন স্থান দেখিয়া, মৃগচর্ম্মখানি বিছাইয়া মোহিত উপবেশন করিল।

তাহার গলায় এখনও যজ্ঞোপবীত আছে। ইচ্ছা ছিল, কোনও সদ্গুরু সন্ন্যাসী পাইলে, তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবে।

গায়ত্রী, সন্ধ্যা প্রভৃতি সমাপন করিয়া মোহিত গীতাখানি খুলিল। কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিবার পর দেখিতে পাইল, বাগানের ভিতর কিছু দূরে তিন চারিজন লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একজনের হাতে ফল পাড়িবার একটা আকর্ষণী অপর সকলের স্কন্ধে ধামা। লোকগুলি ক্রমশঃ মোহিতের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অল্প দূরে কয়েকটা কাগজি লেবুর গাছ ছিল—যাহার হস্তে আকর্ষণী, সে পটাপট কাগজি নেবু ছিঁড়িয়া একজনের স্কন্ধস্থিত ধামায় ফেলিতে লাগিল। মোহিত বুঝিল, ইহারই বাগান।

লেবু তোলা শেষ হইলে সে লোকটির দৃষ্টি মোহিতের উপর পতিত হইল। তখন সে ধীরে ধীরে, যেন একটু স্ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়দ্দূরে নিজ চটিজুতা পরিত্যাগ করিয়া, মোহিতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

মোহিত পুস্তক হইতে মুখ উঠাইবা মাত্র, লোকটি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। পরে, করযোড়ে বলিতে লাগিল—"বাবা, আমি এই দীঘির তিন দিক্‌কার বাগান, জমিদারের কাছে বছরে ১২০৲ খাজানায় জমা নিয়েছি। আজই প্রথম ফল পাড়তে এসেছি—কেশেদর হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করব। আজ বাগানে বাবার পার ধূলো পড়েছে—এটা বড় শুভলক্ষণ বলে আমার মনে হচ্ছে।"—বলিয়া ধামা হইতে একটি বাতাবী নেবু এবং একটি সুপক্ক বড় আতা লইয়া, মোহিতের সম্মুখে রাখিয়া, লোকটি আবার হাতযোড় করিল।

মোহিত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে বলিল—"প্রভু, আমি ত জানিতাম, যখন তোমার পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তখন আমার আর কোন বিষয় চিন্তা করিতে হইবে না। তোমার পদভরসা যেন আমার হৃদয়ে চিরদিন অচল থাকে, এই করিও দয়াময়।"

মোহিত চক্ষু খুলিলে লোকটি বিনয় করিয়া বলিল—"ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ কর যেন এ বাগানের ফল বেচে আমার দুপয়সা লাভ হয়।"

মোহিত বলিল—"আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার ভক্তিলাভ হোক্। ভগবানের পায়ে যেন চিরদিন তোমার মতি থাকে।"

অর্থলাভের আশীর্ব্বাদ না পাইয়া লোকটি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল।—"তবে বিদায় হই ঠাকুর"—বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। মোহিত পুনরায় গীতায় মনোনিবেশ করিল।

অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপে কাটিলে, নেবুটি ঝুলির মধ্যে রাখিয়া, আতাটি মোহিত ভক্ষণ করিল। দীর্ঘিকায় নামিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া, দুই চারি গণ্ডূষ জলপান করিয়া, মোহিত আবার পথ চলিতে লাগিল।

যখন কাশিয়াদহ পৌঁছিল, তখন মধ্যাহ্নকাল। গ্রামের প্রান্তে হাট বসিয়াছে। রৌদ্রে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মোহিত ভাবিল, কোথাও বসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া, স্নান করিয়া ফেলি। হাটের অনতিদূরেই একটি স্বচ্ছ সরোবর দেখা যাইতেছিল।

বিশ্রামাশায় কিয়দ্দূরস্থিত একটি বটবৃক্ষের দিকে চলিল। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল, বৃক্ষতলে জটাজূটধারী ভস্মাবৃত-কলেবর বিপুলকায় একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছে—কয়েকজন নরনারী তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। একটি স্ত্রীলোক বসিয়া হাত দেখাইতেছে। সন্ন্যাসীঠাকুরের

পার্শ্বে একখানি গৈরিকবস্ত্র বিস্তৃত—তাহার উপর সিকি, দুয়ানি, পয়সা পড়িয়া আছে।

কৌতূহলবশতঃ একমিনিটকাল মোহিত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া, ক্রোধ ও বিরক্তিপূর্ণ নেত্রে তাহার পানে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল। মোহিত তখন অবস্থা বুঝিয়া মানে মানে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল।

পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইয়া মোহিত দেখিল—দুই তিন জনমাত্র লোক ঘাটে স্নান করিতেছে। সোপানের উপর ঝুলি প্রভৃতি এবং উত্তরীয়খানি রাখিয়া, মোহিত জলে নামিল। কিছুক্ষণ অবগাহন করিয়া তাহার শরীর শীতল হইল। স্নানান্তে উঠিয়া, উত্তরীয়খানি পরিধান করিয়া, তীরস্থিত একটি পরিচ্ছন্ন বৃক্ষতল নির্ব্বাচন করিয়া লইল। দুইটি নিম্নস্থ শাখায় সিক্ত বস্ত্রখানি বাঁধিয়া শুকাইতে দিয়া, মৃগচর্ম্ম পাতিয়া গীতাপাঠার্থ উপবেশন করিল।

কিছুক্ষণ পাঠ করিতে করিতে, মোহিতের অত্যন্ত ক্ষুধা উপস্থিত হইল। সেই উষাকাল হইতে পরিশ্রম একটি আতা ভিন্ন আর কিছুই খায় নাই ক্ষুধার অপরাধ কি? তথাপি মোহিত মনে মনে হাসিয়া নিজেকে বলিল "সাধু সন্ন্যাসী মানুষ—সারাদিন খাই খাই করিলে চলিবে কেন?"—আবার গীতায় মনোনিবেশ করিল।

কিন্তু ক্ষুধা বড় বালাই। গীতা মানে না, উপনিষদ্ মানে না, বেদান্তদর্শন মানে না। মোহিত পাঠে অধিকক্ষণ মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। তখন পুঁথি বন্ধ করিয়া, ঝুলি হইতে বাতাবী নেবুটি এবং ছুরিখানি বাহির করিল। নেবুটি লাগিল—যেন অমৃত। আহারান্তে পুষ্করিণী হইতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া, বেদান্ত রামায়ণখানি মোহিত খুলিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই ঘুমে তাহার চক্ষু জড়াইয়া আসিতে লাগিল। গতরাত্রি প্রায় অনিদ্রায় কাটিয়াছে বলিলেই হয়। তাহার পর রৌদ্রে ঝুলি ঘাড়ে করিয়া এই ছয় ক্রোশ পথ হাঁটা। মোহিত বহি বন্ধ করিয়া, ঝুলিটি মাথায় দিয়া, কম্বলখানি গায়ে দিয়া, মৃগচর্ম্মের উপর গুটি সুটি হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল।

যখন জাগিল, তখন সূর্য্য অস্তমান। বস্ত্রখানি একটি শাখা হইতে গ্রন্থিচ্যুত হইয়া মাটীতে লুটাইতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া, সেখানি খুলিয়া, বক্ষে ও পৃষ্ঠে উত্তরীয় স্বরূপ মোহিত বাঁধিয়া লইল। তখন বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

সম্মুখে শীত রজনী। এ বৃক্ষতলে কতক্ষণ থাকিবে! আশ্রয় অন্বেষণ আবশ্যক। ক্ষুধাও পাইয়াছে। তথাপি কিয়ৎক্ষণ অলসভাবে মোহিত সেখানে বসিয়া রহিল।

সূর্য্য অস্তমিত। মোহিত তখন উঠিয়া, যেখানে হাট বসিয়াছিল, সেই দিকে পদচালনা করিল। ভাবিল, সেখানে কোনস্থানে নিশ্চয়ই আশ্রয় মিলিবে।

বটবৃক্ষতলে আসিয়া দেখিল, পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী তখনও সেখানে বসিয়া। নিকটে আর কোনও লোক নাই। হাটও প্রায় ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে। মোহিতকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি স্মিতমুখে বলিল—"এস স্যাঙ্গাৎ—বস।" বলিয়া নিজের পার্শ্বস্থিত স্থান দেখাইয়া দিল।

মোহিত মৃগচর্ম্মখানি বিছাইয়া বসিল।

সন্ন্যাসী তখন বলিল—"কোন খানে ছিলে?"

কোথায় ছিল তাহা মোহিত বলিল।

"হল কি রকম বল।"

বুঝিতে না পারিয়া মোহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি হল?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—"এই পাওনা থোওনা। রোজগার হে, রোজগার।"

মোহিত মনে মনে হাসিয়া বলিল—"সুবিধে নয়।"

সন্ন্যাসী বলিল—"আমিও তেমন সুবিধে করতে পারিনি। এখানকার লোকগুলো ভারি ঠেঁটা হে ভারি ঠেঁটা। একবারে কেপ্পনের একশেষ। এক মাগীকে ছেলে হবার ওষুধ দিলাম, আটগণ্ডা পয়সা দিয়েছে। বাকী সব, হাত দেখিয়ে, হাজার কথা বকিয়ে, দুটো চারটে পয়সা দিয়েছে, তুমি কাউকে ওষুধ বিষুধ দিলে না কি?"

মোহিত বলিল—"ওষুধ জানিনে।"

"হাত দেখলে?"

"হাতও দেখতে জানিনে।"

"তবে কি জান? শুধু গাঁজা ভস্ম করতে জান বুঝি?"

মোহিত হাসিয়া বলিল—"তাই বা জানি কৈ।"

"কি, এখনও গাঁজা খেতে শেখনি? নতুন ভর্ত্তি হয়েছ বুঝি? তা আমি তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। পষ্ট কথা বলি ভাই—তুমি নেহাৎ আনাড়িরাম। মাথায় জটা কৈ? শুধু গেরুয়া পরলে আর কাঁধে ঝুলি নিলেই কি সন্ন্যাসী হয়? গায়ে ছাই মাখা চাই, মাথায় জটা চাই, ঘড়ি ঘড়ি গাঁজা খাওয়া চাই, চক্ষু রক্তবর্ণ হবে, তবে ত দেখে লোকের ভক্তি হবে। আমি যখন প্রথম বেরিয়েছিলাম, একবারে কলকাতা টেরিটি বাজার থেকে সাড়ে তিন টাকা দিয়া একখানি এক পেল্লায় জটা কিনে মাথায় দিয়েছিলাম। ফাঁকি দিয়ে কি হয় স্যাঙ্গাৎ?"—বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর গাঁজা বাহির করিয়া হস্তে ডলিতে আরম্ভ করিল।

গাঁজা প্রস্তুত হইলে, কলিকায় ঠাসিয়া বলিল—"কতদিন বেরিয়েছ?

"বেশী দিন নয়।"

এ দিক ওদিক চাহিয়া, স্বর নামাইয়া, মোহিতের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সন্ন্যাসী বলিল--"বলি, কোন ধারা?"

মোহিত বুঝিতে না পারিয়া বলিল "কি বলছেন?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল "ন্যাকামি কর কেন? যেন কিছুই জানেন না—নিরীহ ভাল মানুষটি! বলি, খুনী মোকদ্দমা না ডাকাতি মোকদ্দমা না জালের মোকদ্দমা,—কিসে পড়েছিলে?"

মোহিত গম্ভীর ভাবে বলিল—"কোন মোকদ্দমায় পড়িনি।"

সন্ন্যাসী মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল—"ইল্‌ লো?—দাঁত দেখি তোর বয়স কত? শুধু শুধু পালিয়েছ! তুমি তেমনি ইয়ার কি না!"—বলিয়া সন্ন্যাসী গাঁজার ছিলিমে অগ্নি সংযোগ করিল।

মোহিত নীরব। সন্ন্যাসী দুই চারি টান টানিয়া বলিল—"সত্যি, বল না। আমার কাছে লুকোও কেন? আমি ডিটেক্টিব নই—কোন শালা মিছে কথা কয়, তোমার দিব্যি।"

তথাপি মোহিত স্বীকার করে না যে সে ফৌজদারীতে পড়িয়াছিল।

সন্ন্যাসী আরও দুই চারি টান টানিয়া, কলিকাটি নামাইয়া বলিল—"তুমি বল্লেই আমি বিশ্বাস করব কি না? এত লোকের হাত দেখে গুণে বলছি কত কথা মিলছে কত কথা মিলছে না। কিন্তু বাবা তোমার হাত না দেখেই বলে দিচ্ছি, আচ্ছা তুমি দায়রা মোকদ্দমার ফেরারী আসামী। কলকের মাথায় আগুন জ্বলছে—সাক্ষাৎ ব্রহ্মা। হাত দিয়ে বল দেখি যে তুমি ফেরারী আসামী নও।"

মোহিত সে পরীক্ষা দিতেও স্বীকৃত হইল না। শেষে সন্ন্যাসী গাঁজার কলিকা মোহিতের দিকে সরাইয়া বলিল—"খাবে?"

"না।"

সন্ন্যাসী তখন নিঃশেষে গাঁজাটুকু ভস্ম করিয়া বলিল—"ওঠ—চল।"

মোহিত বলিল—"কোথা?"

"ঠাকুর বাড়ী। এখানে ঠাকুরবাড়ী আছে জান না বুঝি?"

"না।"

"এ অঞ্চলে প্রথম এসেছ কি না। গ্রামের ভিতর রাধাগোবিন্দজীর মন্দির আছে। রোজ মালপুয়া ভোগ হয়। সাধু সন্ন্যাসী এলে প্রসাদ পায়। আট খানা—দশ খানা পনেরো খানা—বেশ বড় বড় গরম গরম মালপুয়া, ঘিয়ে চব্‌ চব্‌ করছে তোফা হে—অতি তোফা। আজ রাত্রে সেই খানেই আমি থাকব। সাধু সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্যে পাকা ঘরও আছে—একবারে জামাই আদর। যাবে ত আমার সঙ্গে এস।"—বলিয়া গাত্রোত্থান করিল।

এই ভণ্ডটার সাহচর্য্য মোহিতের কাছে মোটেই লোভনীয় মনে হইতেছিল না। তথাপি, আহার ও আশ্রয়ের জন্য বাধ্য হইয়া তাহার সঙ্গ স্বীকার করিল। দুইজনে ধীর পদে ঠাকুর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সাধুসঙ্গ ঘনীভূত।

পথে যাইতে যাইতে মোহিত জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর, আপনার নাম কি?"

"আমার নাম ক্ষেমানন্দ ভারতী। যখন গৃহস্থ ছিলাম, তখন অবিশ্যি অন্য নাম ছিল। তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম এখনও কিছু হয় নি—গৃহস্থ নামই এখনও আছে।"

"গৃহস্থ নাম বলতে নেই—কাউকে বোলো না। পুলিস জানতে পারলে খাতায় নাম লিখে নিয়ে তদন্ত করবে। আমায় চুপি চুপি বলতে পার আমি তোমায় ধরিয়ে দেব না।"—বলিয়া সন্ন্যাসী হাসিতে লাগিল।

মোহিতকে নীরব দেখিয়া বলিল—"দেখ, একটা বিষয় সাবধান করে দিই। ঠাকুরবাড়ীতে গিয়ে খুব ভারিক্কে হয়ে থাকবে, বুঝেছ! এমনি ভাবটা দেখাবে যেন সর্ব্বদাই মনে মনে পরমার্থ চিন্তা করছ। পৃথিবীর কিছু যেমন টাকাকড়ি, লুচি, মালপুয়া এ সব জিনিষের প্রতি যেন দৃক্‌পাতও নেই। আমরা যে সব হাসি মস্করা করি, তা গোপনে নিজেদের মধ্যে। ওদের সামনে একেবারে গম্ভীর বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি। এক কায কর না—তুমি বরং আমার চেলা সাজ। দুই একটা চেলা টেলা না থাকলে সাধু সন্ন্যাসীর ইজ্জৎ বাড়ে না। আর তোমার লাভ এই হবে, আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালে, নানারকম বুজরুকি, রোজগারের ফন্দি তোমায় বাৎলে দেব। আর, একটু বিজ্ঞানও শিখিয়ে দেব।"

মোহিত বলিল—"আপনি বিজ্ঞান পড়েছেন না কি ?"

"পড়েছি বৈ কি। আজ কাল সহর অঞ্চলে বিজ্ঞানের ভারি কদর! দু চারটে বিজ্ঞানের বুলি যদি তাক্ মাফিক্ ঝাড়তে পার, তা হলে বড় বড় লোক—ডেপুটি, মুন্সেফ তোমায় গুরু করে মন্তর নেয়। দিব্যি পাওনা থোওনা হে। এই সব দেখে শুনে, বিজ্ঞান একটু শিখব বলে অনেক দিন থেকে চেষ্টায় ছিলাম। আমি একটু লেখাপড়াও জানি কিনা। সন্ন্যাসী বলেই যে গোমুখ্যু তা নই। বল্লে না পিত্যয় যাবে আমি ছাত্রবৃত্তি ফেল। একখানা বিজ্ঞানের বাঙ্গালা বই পেলে পড়ে বুঝতে পারি এটুকু গর্ব্ব আমার ছিল। একটা সুযোগও হয়ে গেল। একদিন এক বড়-লোকের বাড়ী অতিথি হব বলে গিয়েছি। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি বাবুরা কেউ নেই। পাশের ঘরে ছেলেরা বসে পড়ে, তারাও কেউ নেই। কেবল টেবিলে খানকতক বই ছড়ান রয়েছে। নজর পড়ল, একখানা বই রয়েছে 'সরল বিজ্ঞানপ্রবেশ'। যাঁহা দেখা, বুঝলে কিনা, তাঁহা বইখানা নিয়ে ঝুলির মধ্যে পোরা। বকাধার্ম্মিকটির মত আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম। অন্য বাড়ীতে অতিথি হলাম। সেই বইখানা পড়ে গড়ে, বিজ্ঞানটা বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছি। যে পাতে ছেলেটার নাম লেখা ছিল, সে পাতটা ছিঁড়ে ফেলেছি। মধ্যে মধ্যে পড়ি। তুমি যদি চেলা হয়ে আমার খুব সেবাশুশ্রূষা কর,—আর, বইখানি নিয়ে চম্পট না দাও, তবে সেখানি আমি তোমায় পড়তে দিতে পারি। কিন্তু আপনি পড়ে বুঝতে পারবে কি ? পড়াশুনো কতদূর হয়েছিল ?"

মোহিত বলিল—"বেশীদূর নয়।"

"হেঁ হেঁ—ওদিকে বুঝি ঢুঢ় ? ঘট একবারে উবুড় ? আচ্ছা, তা আমি তোমায় মুখে মুখেই শিখিয়ে দেব এখন, কিছু ভেবনা। সবাই কি আর ছাত্রবৃত্তি পড়েছে ? ও কথা বল্লে চলবে কেন ? আজ কালকার বাজারে ছাত্রবৃত্তি ফেল সন্ন্যাসী কটা মেলে ? চেলা হয়ে পড়, এমন সুবিধেটি হঠাৎ পাবে না কিন্তু।"

এই কথা বলিতে বলিতে উভয়ে ঠাকুরবাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিল। নাটমন্দিরের একদিকে বিগ্রহের মন্দির, অন্যদিকে অতিথিশালা। মোহিত প্রবেশ করিয়া দেখিল, অতিথিশালার বারান্দায় তিনজন প্রৌঢ়বয়স্ক সন্ন্যাসী বসিয়া আছে—তন্মধ্যে একজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল। একজন বালক সন্ন্যাসী বসিয়া গাঁজা সাজিতেছে এবং একজন যুবক সন্ন্যাসী, বিল্বকাষ্ঠের বৃহৎ দণ্ড হাতে করিয়া একটা পাত্রস্থিত সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। মোহিত ও ক্ষেমা-নন্দকে দেখিয়াই সেই হৃষ্টপুষ্ট সন্ন্যাসীটি জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল—

"আরে—আওর দোমুরত সাধু আয়া। উসমে আওর দো ছটাক ভাঙ্গ ডালদে।"—বলিয়া, উচ্চতর স্বরে হাঁকিতে লাগিল—"পুজেরীজি—এ পুজেরীজি—বাবু—এ বাঙ্গালী বাবু।"

স্বর শুনিয়া একজন কৃশকায় ভট্টাচার্য্য নামাবলী গায়ে দিয়া আসিয়া বলিলেন—"কি বলছেন স্বামীজি ?"

স্বামীজি বলিলেন—"পুজেরীজি—আওর দোমুরত সাধু

লায়। দো ছটাক কিসমিস, দো ছটাক চিনি, আওর আধাসের দুধ মাঙ্গা দো।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিলেন।

ইতিমধ্যে মোহিত ও ক্ষেমানন্দ সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। স্বামীজি বলিলেন—"বৈঠো।"

দুইজনে উপবিষ্ট হইলে স্বামীজি মোহিতের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"তুঝনে নয়া ভেখ্ লিয়া ?"

মোহিতের সঙ্গী বলিল - "একেবারে নয়া।"

"তেরেহি চেলা হায় ?"

ক্ষেমানন্দ মোহিতের পানে চাহিয়া বলিল "হ্যাঁ—না—এখনও উস্কো চেলা নেহি কিয়া। লেকেন, হামারা চেলা হোনেকে বাস্তে উস্কো বহুৎ আকিঞ্চন।"

"বহুৎ আচ্ছা বহুৎ আচ্ছা। দেখ, হামারা দো দো চেলা। এক চেলা ভাঙ্গ পিশে, এক চেলা গাঁজা চড়ায়।"—বলিতে বলিতে বালক-চেলাটি গাঁজার কলিকা গুরুহস্তে প্রদান করিল। অগ্নিসংযোগে তিনি কয়েক টান টানিয়া, ছিলিমটি ক্ষেমানন্দের হাতে দিলেন। ক্ষেমানন্দ প্রসাদ পাইয়া, অপর একজন সন্ন্যাসীকে দিল। সে ব্যক্তি দুই টান টানিয়া, মোহিতকে দিবে বলিয়া হাত বাড়াইল। এমন সময় স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন—"ক্যারে—তুঁভি গাঁজা পিতা হায় ?"

মোহিত বলিল—"নেহি।"

"বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা। মৎ পী—গাঁজা মৎ পী—তু আভি বাচ্চা হায়। গাঁজা পিয়েগা—তো পাগল হো যায়েগা—মর যায়েগা। ভাঙ্গ পী—গাঁজা মৎ পী। ভাঙ্গ আচ্ছা হায়। 'ভাঙ্গ পিয়ে, মৌজ করে, বনা রহে অবধূত'—ইয়ে কবিৎ হায়। যব তেরা চালিশ বরষ কা উমর হো—তব গাঁজা পী। আভি ভাঙ্গ পী।"

গাঁজার কলিকাটি পর্য্যায়ক্রমে বয়স্ক সন্ন্যাসিগণেব মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

এদিকে একটা বৃহৎ পাত্রে যথেষ্ট চিনি ও দুগ্ধের সহিত কিসমিস মিশ্রিত সিদ্ধির বৃহৎ মণ্ডটি গোলা হইল। মন্দিরের পরিচারক সদ্যধৌত মাটীর নূতন ভাঁড় আনিয়া প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে একটা করিয়া দিয়া গেল। সেই ভাঁড়ে করিয়া সকলে সিদ্ধি পান আরম্ভ করিল।

দুই ভাঁড় সিদ্ধি পান পর করিবার স্বামীজি দেখিলেন, মোহিত পান করিতেছে না। বলিলেন—"ক্যারে, তু ভাঙ্গ ভি নেহি পিতা হায় ?"

মোহিত বলিল সে সিদ্ধি পান করে না।

"ভাঙ্গ নেহি পিতা হায়! তব শুন্, এক কবিৎ শুন—
জিস্‌নে ইস্ দুনিয়ামে আ-কর, একদিনভি পিয়ে ন ভাঙ্গ,
উস্‌নে, সচ্ পুছোতো, ক্যাদেখা জাহানকা আরঙ্গ ?
সমঝা ? নেহি সমঝা ? জিস্‌নে ইস্ দুনিয়ামো আ-কর, ইয়ানে জনম লেকর, একদিনভি ভাঙ্গ নেহি পীলিয়া, উস্‌নে জাহান্‌কা—জাহান কহতেহেঁ দুনিয়াকো - ফার্সী হায়—উস্‌নে দুনিয়াকে রং ঢং ক্যাদেখা ? কুছু নেই দেখা।"—বলিয়া স্বামীজি হাহা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

অপর সন্ন্যাসিগণ হাসিয়া লুটাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"কুছ নেই দেখা।" ক্ষেমানন্দ বলিয়া উঠিল—"বাহবা, বহুৎ আচ্ছা কবিতা হায়, বহুৎ আচ্ছা কবিতা হায়।"

সন্ধ্যা হইয়াছে। আরতির আর বিলম্ব নাই। একটি দুইটি করিয়া গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষ আরতি দর্শনের জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। সোনার চশমাধারী, শাল গায়ে একটি স্থূলকায় বাবুও আসিয়াছেন। আরতির একটু বিলম্ব আছে দেখিয়া তাঁহারা সন্নাসীদের কাছে আসিয়া বসিলেন।

স্বামীজি তখন চারি পাত্র ভাঙ্গ শেষ করিয়াছেন। পঞ্চম পাত্রটির কিয়দংশমাত্র পান করিয়া অবশিষ্ট বালক চেলাকে প্রদান করিলেন। সে তাহা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। তাহার পর স্বামীজি বলিলেন—"আরে বাচ্চা—থোড়া ভজন শুনা দে। বাবুলোগ, মায়িলোগ আয়ে হাঁয়, থোড়া নাম শুনা দে।"

বালকটি তখন দুইটা কাঠের খঞ্জনী বাহির করিল। কাঠের একঅংশ কাটা, সেখানে একযোড়া করতাল লাগান আছে। স্বামীজি একটা খঞ্জনী বাজাইতে লাগিলেন। বালক অপরটা বাজাইয়া, নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—

"রামনাম লাড্ডু, গোপাল নাম ঘি,
হরিনাম মিছুরি, ঘোর ঘোর পী।"

স্বামীজিও বাজাইতে বাজাইতে তালে তালে মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে গান থামিল। শ্রোত্রীগণের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন এবং অগ্রবর্ত্তী হইয়া বসিয়াছিলেন, স্বামীজি তাঁহাকে বলিলেন—"হিন্দী গীত তুমি বুঝিয়েছে মায়ি?"

"হ্যাঁ বাবা, কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি।"

স্বামীজি বলিলেন—"রামনাম লাড্ডু আছে (অঙ্গুলি সঙ্কেতে গোলাকার পদার্থ দেখাইয়া) সনেশ রসগুল্লা। গোপালনাম ঘিউ আছে আর হরিনাম সেটা মিছরি আছে।"

বিধবাটি বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা—রাম নাম সন্দেশের চেয়েও সুতার, হরিনাম মিছরির চেয়েও মিষ্টি।"

"হাঁ—বহুত মিষ্টি হায় বহুত মিষ্টি হায়। এক সাধুনে বোলা—

ভরোসা দেহকা মৎ রাখো,
অমি-রস নামকা চাখো।

বুঝিয়েছে মায়ি? ইয়ে যো মানুষকা দেহ হায়, ইস্‌কা কুছ ভরোসা নেহি হায়। কুছভি নেহি।"

অপর সন্ন্যাসিগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"কুছভি নেহি—কুছভি নেহি।"

বিধবাটি বলিলেন "ঠিক কথাই ত বাবা। এদেহের আর ভরসা কি? এই আছে এই নেই।"

স্বামীজি বলিলেন—"তুমি ঠিক বলিয়েছে মায়ি, ঠিক বলিয়েছে। তাই সাধু কহিয়েছে—অমি-রস নামকা চাখো। হাঁ। হরিকা নাম যো হায় উয়হ্ অমৃত হায়—পীনেসে জীবকে মুক্তি হোতা হায়।"

সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—"লোকটি আসল তত্ত্বজ্ঞানী বটে। এমন সাধুদর্শনে পুণ্য আছে।"—কথাগুলি অবশ্য স্বামীজি বেশ শুনিতে পাইলেন।

স্থূলকায় বাবুটি বলিলেন—"ঠিক কথা বাবা। আমাদের বাঙ্গলাতেও আছে,—'নামামৃত পান কর মন, এ সংসার মিছারি মায়া!' ইয়ে সংসার কুছ চীজ নেহি হায়।"

স্বামীজি তখন দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, ভক্তি গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন—

"সোঁয়াসা সোঁয়াসা কৃষ্ণ রটু, সোঁয়াসা বৃথা ন খো,
ন জানো ইয়হ সোঁয়াসকো এহি অস্ত না হো।"

আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। দর্শকগণ স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া কেহ সিকি কেহ দুয়ানি কেহ পয়সা তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিলেন। স্থূলকায় বাবুটি ঠং করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিলেন। সকলে আরতি দর্শন করিতে গেলেন।

আরতি শেষ হইলে, ভট্টাচার্য্য আসিয়া সন্ন্যাসিগণকে লুচি ও মালপুয়া বণ্টন করিয়া দিলেন। মোহিতও হাত পাতিয়া লইল—কিন্তু তাহার যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল। এই ভণ্ডদের দলে মিশিয়া সেও যেন তাহাদেরই একজন হইয়া, মালপুয়া খাইতে আসিয়াছে,—ইহা মনে করিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় লজ্জা ও ক্ষোভে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে উপায় নাই। ক্ষুধায় তাহার নাড়ী জ্বলিয়া যাইতেছিল। একটি অন্ধকার কোণে বসিয়া, কোন মতে চোখের জল চোখে বাঁধিয়া রাখিয়া আহার শেষ করিল।

বিগ্রহের দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূজারী প্রভৃতি সকলে প্রস্থান করিয়াছে। আর যে দুই জন সন্ন্যাসী ছিল, তাহারা স্বামীজিকে বলিল—"প্রণামীতে আজ কত হইল?"

যুবক চেলা বলিল "দুই টাকা হইয়াছে।"

একজন সন্ন্যাসী বলিল—"আমাদের ভাগ দিতে হইবে।"

এ কথা শুনিয়া স্বামীজি বলিল—"কেন? ভাগ কিসের?"

"বাঙ্গালীরা যে প্রণামী দিয়া গিয়াছে, তাহা সকল সন্ন্যাসীকে দিয়া গিয়াছে। একলা তোমাকে দিয়া যায় নাই।"

স্বামীজি বলিল—"বটে!—আমাকে প্রণাম করিয়া আমার পায়ের কাছে রাখিয়া গেল কেন তবে? শ্লোক বলিলাম আমি। চেলা নাচিয়া গান গাহিল আমার। আমি তাহাদের খুসী করিয়াছি, তাহারা আমাকে টাকা দিয়াছে। তোমরা কি করিয়াছ যে বখরা চাহিতেছ? লজ্জা করে না?"

অপর সন্ন্যাসীদ্বয় বলিল—"আমরাও ত এই খানে বসিয়াছিলাম। আমরা কি ঘাস কাটিতে আসিয়াছি? দাও, ভাগ দিতে হইবে।"

তুমুল কলহ বাধিয়া উঠিল। তাহার পর গালাগালি। স্বামীজি এমন অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ আরম্ভ করিল যে শুনিলে কাণে আঙুল দিতে হয়। অবশেষে 'সিদ্ধি ঘুঁটিবার সেই বিল্বদণ্ডটা হাতে করিয়া, ঘুরাইয়া বলিল "কে ভাগ লয় দেখি। আজ খুনোখুনী হইবে।" যুবক চেলাটিও গুরুর হইয়া খুব আস্ফালন করিতে লাগিল। অবশেষে সন্ন্যাসীদ্বয় বেগতিক দেখিয়া নিরস্ত হইল।

স্বামীজি তখন চেলাদের লইয়া, ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। একজন সন্ন্যাসী ক্ষেমানন্দকে বলিতে লাগিল—"দেখিলে? একবার অবিচার দেখিলে? এই রকম করিয়া গরীবকে ফঁাকি দেওয়া?"

অপর সন্ন্যাসী বলিল—"কেন, উনি দুটো শ্লোক বলিয়াছেন এবং দুইজন চেলা সঙ্গে আনিয়াছেন বলিয়া কি সর্ব্বস্ব গ্রাস করিবেন? আমাদের হক মারা গেল—অপমানিতও হইলাম।"

মোহিত নীরবে এই অভিনয় দেখিতেছিল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে। পাষণ্ডগণের সহিত

একরাত্রি যাপন করিতে হইবে—এই কল্পনামাত্র তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগিল। অবশেষে মনের ধিক্কারে সে স্থির করিল—না—মাঠের মধ্যে গাছের তলায় শুইয়া থাকিতে হয় সেও ভাল—এই নরাধমদের সহিত রাত্রি বাস করিতেছি না। সে তখন নিজের ঝুলি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া ঠাকুরবাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (অগ্রহায়ণ)

রোমীয় বহু দেববাদের পরিণতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিন শতাব্দীর প্রাচ্যপ্রভাবে রোমীয় বহুদেববাদ ও প্রায়শ্চিত্ত বিধি ও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান ক্রমে একটা সুসম্পূর্ণ অধ্যাত্মবিদ্যায় পরিণত হইয়াছিল; সম্রাট অগষ্টাস রোমের যে সনাতন পূজাবিধি পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা খৃষ্টান ধর্ম্মের যত বিরুদ্ধ ছিল, নূতন ধর্ম্মতন্ত্রটি তেমন ছিল না। বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম্মেরও প্রায় এইরূপ সম্বন্ধ। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমের ন্যায় ভারতেও ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রাচীন মতের সহিত নবীন মতের আনাগোনা চলিতেছে; এবং উভয়ের বিরুদ্ধতা ক্ষয় হইয়া ভেদচিহ্ন ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। শেষ যুগের লাটীন লেখকদের রচনা পাঠ করিয়া যেমন ঠিক করা কঠিন যে লেখক বহুদেববাদী কি খৃষ্টান, তেমনি বর্ত্তমান যুগের হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখকদের রচনার মধ্যে নীতি ও তত্ত্বমূলক সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। যে প্রাচ্যপ্রকৃতি সমস্ত ধর্ম্মভেদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে থাকে তাহা যেমন রোমে তেমনি ভারতবর্ষেও কার্য্য করিয়াছে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপে দেবতাগণের মহিমা ম্লান হইলেও ইতর সাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধায় ও পল্লীগ্রামের লোকাচারে তাহারা আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। তথাপি বিভিন্ন ধর্ম্মমত লোকের সংশয়াকুল চিত্তকে বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে নানাভাবে মথিত করিয়া তুলিতেছিল। যেখানে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ সেইখানেই বহুদেববাদ; যেখানে বহুদেববাদের প্রাদুর্ভাব সেখানে কোনো ধর্ম্মমত সহসা আঘাত পাইয়া মরে না, তাহা বহুকালে ক্রমে রূপান্তরিত হয়; নূতন ও পুরাতন পাশাপাশি থাকে। রোমের বহুধাবিভক্ত দেবপূজার সহিত খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরোধে বহুদেববাদ প্লেটোর অনুবর্ত্তী দর্শন আশ্রয় করিয়া শাস্ত্র অপৌরুষের বলিয়া ও পূজার অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিল। এইরূপে নূতন ও পুরাতনের আপোষের চেষ্টায় একটি সম্মিলিত ও স্বতন্ত্র রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল। তখন দেবতারা এক একটি শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে যোগ স্থাপিত হওয়াতে একটি সুসংলগ্ন বিশ্বতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইল। তখনো অনির্ব্বচনীয় পরমদেবতা সর্ব্বব্যাপী হইলেও বিশেষ ভাবে আকাশের জ্যোতিষ্কের মধ্যেই আপনাকে ব্যক্ত করেন। রোমীয় বহুদেববাদের এই পরিণতির ইতিহাসের মধ্যে আমাদের দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মবৈচিত্র্য ও তাহার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনা—শ্রীঅজিত কুমার চক্রবর্ত্তী।

ধর্ম্মজগতে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়—নীতিপরায়ণ কর্ম্মী ও বিরাগী ভক্ত। এই দুই শ্রেণীর সাধক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশের ধর্ম্মসাধনার আদর্শ। আধুনিক কালে এই দ্বিবিধ ধর্ম্মসাধনার সামঞ্জস্যের জন্য উভয় দেশেই ব্যগ্রতা জাগিয়াছে। য়ুরোপ বলিতেছে নীতিপ্রধান জীবন শুধু কাজ করার অগ্রসর হওয়ার জীবন; কিন্তু জীবনের মধ্যে এমন সব গভীরতর জিনিষ আছে যাহা স্থিতি চাহে, প্রাপ্তি চাহে। এদিকে আমরা নিষ্কর্ম্ম বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করিয়াছি। পশ্চিম অত্যন্ত বেশী চলিয়া এখন থামিতে চাহিতেছে, পূর্ব্ব অত্যন্ত বেশী থামিয়া এখন চলিতে চাহিতেছে; পূর্ব্বপশ্চিমে মিলিয়া অখণ্ড বিশ্বমানব সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। য়ুরোপ মনে করে জীবনের মধ্যে পথটাই আসল, জীবন মানেই অনন্ত বৈচিত্র্য; প্রত্যেক মানুষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিবে ইহাই সে দেশের প্রাণের কথা; সেই কারণেই চলাতেই জীবনের সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য। এই কথা য়ুরোপের সাহিত্যে জাজ্বল্যমান, কিন্তু ভারতবর্ষ ধর্ম্মনৈতিক সাধনাকে পথ বলিয়াই জানিয়াছে, আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা পরমানন্দ লাভই তাহার গম্যস্থান। ভারতবর্ষ আত্মায় অনন্ত পরিপূর্ণতায় সমাপ্তি জানিয়াও কর্ম্মকে একেবারে অবহেলা করে নাই। তাহার আভাস ভারতীয় সাহিত্যে আছে। ভারতের সাহিত্য প্রাপ্তির কথা যেমন আনন্দে বলিয়াছে, পথের কথা তেমন করিয়া বলে নাই। বাহির ভিতরকে নিরন্তর করিবার সাধনাই সকলের চেয়ে সত্যতম সাধনা এবং বৃহত্তম সাধনা, এই আমাদের দেশের কথা। আমাদের শেষ লক্ষ্য কেবল অন্তহীন শক্তি ও উন্নতি লাভ নহে, আমাদের শেষ লক্ষ্য সমগ্রের সঙ্গে সমগ্রের যোগ—সমগ্র সত্তার সঙ্গে সমগ্র জীবনের যোগ। মানুষের আত্মবোধ বিশ্ববোধে প্রসারিত হইতে পারিলেই সকল সংগ্রামের অবসান। এই শক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্ব পশ্চিম উভয়ত্রই প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে।

বাহাই ধর্ম্ম—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মানুষের মন সকল দেশেই সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডির মধ্যে হাঁপাইয়া উঠিয়া আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, পারস্যে এই লক্ষণের প্রকাশ নব ধর্ম্মান্দোলনে। বাহাই ধর্ম্মান্দোলন তিন জনের জীবনের সহিত যুক্ত—বাব, বাহাউল্লা ও আব্দুল বাহা। ১৮১৭ সালে বাব সিরাজনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৪ সালে তিনি আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত ও একজন মহাপুরুষের অগ্রদূত বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহার শিক্ষার মূল তত্ত্ব—একেশ্বরে বিশ্বাস, জীবে দয়া, জীবনে সততা, স্ত্রীপুরুষের অধিকারসাম্য। রাজা ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত ভ্রান্ত শক্তি তাঁহাকে বন্দী করিয়া ১৮৪৬ সালে তাঁহাকে হত্যা করে এবং এই বিপ্লবকারী ধর্ম্মমত উচ্ছেদ করিবার জন্য কুড়ি হাজার বাবীর প্রাণনাশ করা হয়। কিন্তু সত্যের স্ফুলিঙ্গ জ্বলিলে নিভানো শক্ত। বাবের অনুগামী মির্জা হুশেন আলি দুই বৎসর নির্জ্জন উপসনার পর প্রচার করিলেন যে, বাব যে মহাপুরুষের অভ্যুদয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন তিনি তিনিই, তিনিই বাহাউল্লা (ঈশ্বরের মহিমা)। জীবিত বাবীগণের অধিকাংশ বাহাউল্লার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বাহাই নাম গ্রহণ করিল। বাহাউল্লার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আব্দুল বাহা বাহাইদিগের নেতা হইয়াছেন। ইনি এখন ইংলণ্ডে। ৪০ বৎসর বন্দীদশায় থাকিয়া ইঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সরলতা ও প্রসন্নতা নষ্ট হয় নাই। মানব সমাজ ও ধর্ম্মের সাম্য তাঁহার মূলমন্ত্র। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতারা ক্রমশঃ ঈশ্বরের কাছাকাছি হইয়া উঠেন, পাছে এরূপ কেহ মনে করে, তাই তিনি নিজেকে আব্দুল বা ঈশ্বরের ভৃত্য বলিয়া প্রচার করিতে ভালো বাসেন। বাহাইগণ পরধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি বলেন—আমরা সকলে এক মূলের শাখা, একই ক্ষেত্রের তৃণদল। মানুষ যদি মানুষকে ভালো বাসিতে না পারে তবে ঈশ্বরকে ভালো বাসিবে কেমন করিয়া?

বঙ্গদর্শন (কার্ত্তিক)—

জৈব রসায়নের উন্নতি—শ্রীজগদানন্দ রায়।—

শিল্পীর কৌশলে যেমন ইট চূর্ণ কাঠ একত্র হইয়া অট্টালিকা হয় তেমনি জীব অঙ্গার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির সমবায়। বৈজ্ঞানিকগণের আধুনিক চেষ্টা হইয়াছে জড় হইতে জীব সৃষ্টি। জৈব পদার্থ তিন প্রকার—বসা বা চর্ব্বি, কার্বোহাইড্রেট বা অঙ্গার ও হাইড্রোজেন যুক্ত সামগ্রী, প্রটিনস বা মাংসাদির প্রধান উপাদান। ফরাসী বৈজ্ঞানিক বার্থেলো কৃত্রিম চর্ব্বি প্রস্তুত করিয়াছেন। জার্ম্মানিতে কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত হইতেছে; চিনি এই শ্রেণীর পদার্থ। প্রটিন প্রস্তুত হয় নাই; কিন্তু প্রস্তুতচেষ্টায় জীবনীক্রিয়ায় জীব ও উদ্ভিদদেহের পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। জীবনের ক্রিয়া ও রাসায়নিক ক্রিয়া অভিন্ন। জৈব পদার্থের এক শ্রেণীর পদার্থকে বলে সেলুলোস; ইহাতে অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের প্রাধান্য; গাছের ছাল, আঁশ, কাঠ, তুলা এই পদার্থে গঠিত। কৃত্রিম সেলুলোস সৃষ্টি করিয়া কাগজ, নির্ধূম বারুদ, কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম কেশ ও চর্ম্ম প্রস্তুত হইতেছে। আলকাতরা হইতে নানাবিধ কৃত্রিম রং তৈরি করা জার্ম্মানির বিশেষ ব্যবসায় হইয়াছে; এখন আর উদ্ভিজ্জ ও জৈব রঙের প্রাধান্য নাই। কৃত্রিম রবার প্রস্তুতের উপায়ও জার্ম্মান পণ্ডিত ডাঃ হফম্যান আবিষ্কার করিয়াছেন। রবার প্রস্তুত করিতে গিয়া অনুরূপ কতকগুলি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। কর্পূর জৈব পদার্থ; ইহাও কৃত্রিম হইয়াছে। স্ফটিক প্রস্তুতও রসায়নের সাধ্য হইয়াছে। রসায়নের কারখানাতে আফিং ও তামাকের সার প্রস্তুত হইতেছে। প্রাণীশরীরে আড্রেনালিন (Adrenalin) নামক এক পদার্থ আপনা হইতে সঞ্চিত হয়; কোনো অঙ্গে রক্ত আবদ্ধ হইয়া পড়িলে এই সামগ্রী উৎপন্ন হইয়া রক্তের চাপ নিয়মিত করে; ডাঃ ষ্টলজ্ কমলালেবু হইতে এই সামগ্রী বাহির করিয়াছেন; শরীরে ইহার প্রলেপ দিলে সে স্থান রক্ত শূন্য হইয়া যায়; এজন্য ইহা অস্ত্রচিকিৎসার দোসর হইয়া উঠিতেছে। পুষ্পকোষ বিশ্লেষণ করিয়া বহুবিধ মূল গন্ধ আবিষ্কার করিয়া তাহাদের বিভিন্ন প্রকার মিশ্রণে বিবিধ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

কোহিনুর (অগ্রহায়ণ)—

বাঙালার সংস্কৃত উচ্চারণ—শ্রীমোহম্মদ শহীদুল্লাহ্।—

বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণে ণ ন, জ য, শ ষ স, প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ সাম্য; মকার, নকার ও যকার, বকার, প্রভৃতি যুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ; প্রভৃতি বাঙালীর বিশেষ উচ্চারণ পদ্ধতি প্রাকৃত উচ্চারণের অনুরূপ, ইহা প্রাকৃতপ্রকাশ প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্রদ্বারা সমর্থিত। প্রাকৃতে উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস (Phonetic Spelling) লিখিত হইত; প্রাকৃত ভাষার লেখকগণ স্বাধীনতার পরিচয় দিয়া নিজেদের বৈজ্ঞানিকতা দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা বাংলায় উচ্চারণ করি প্রাকৃত ভাবে, বর্ণবিন্যাস রাখিয়া দেই সংস্কৃতের; এই প্রকার সংস্কৃতের গিল্টি কেবল অন্ধ সংস্কৃত ভক্তির পরিচায়ক, বৈজ্ঞানিকতার লক্ষণ নহে। বাংলা বাংলার ন্যায় লিখিত ও উচ্চারিত হওয়া সঙ্গত।

লেখকের এই প্রস্তাবের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পদাঙ্কানুসারী কতিপয় লেখকের এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় বাংলার বানান-সংস্কার অল্পস্বল্প হইয়াছে ও হইতেছে। ফরাসী দেশে Officier de l' Instruction Publique ও Association Phonetique Internationale বানানের রূপ ও পদের শব্দ সংস্থানের ক্রম প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন; আমেরিকার দেশনায়ক রুজভেল্ট প্রভৃতির ইঙ্গিতে বানান-সংস্কার চলিতেছে; আমাদের দেশে নাগরী-প্রচারিণী-সভা সদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

চিত্র-পরিচয়

একজন কৃষক দিবসের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহাই বর্ত্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত রঙীন ছবিটির বিষয়। শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার অঙ্কিত এই তৈলচিত্রটির প্রতিলিপি মুদ্রিত করিতে অনুমতি দেওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কালকালীতে ছাপা ছবিটির বিষয়ও উহা দেখিবামাত্র বুঝা যায়। সরাইখানা বা পান্থনিবাসে নানাদেশের নানা রকমের পথিক জুটিয়াছে। শীতকাল। মধ্যে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বালিয়া সকলে আগুন পোহাইতেছে। ধূমপান ও গল্পগুজব চলিতেছে। একটি শিশু এক বৃদ্ধের বালাপোষের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। অগ্নিশিখার আলো যাহাদের সম্মুখভাগে পড়িয়াছে, ছবিতে তাহাদিগকে আলোকিত দেখাইতেছে। অন্য সকলের পৃষ্ঠদেশ অন্ধকারে কাল দেখাইতেছে। একটি স্ত্রীলোক দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গল্প শুনিতেছে। সে কতক আলোতে কতক আঁধারে।

ইহা একটি প্রাচীন চিত্র।

ভ্রম-সংশোধন

বর্ত্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত "পয়লা পৌষ" নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে লেখিকা লিখিয়াছেন—

প্রবন্ধটির নাম "বঙ্গের পৌষ সংক্রান্তি" দিলে ভাল হয়, কেন না ঐ উৎসবটি পয়লা পৌষ না হইয়া পৌষ সংক্রান্তির দিন হইয়া থাকে। যেখানে "পয়লা পৌষের প্রভাতে সদ্য ধনুরাশিস্থ সূর্য্য দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া" এইরূপ লেখা আছে সে স্থলটাও ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া "পৌষ সংক্রান্তির প্রত্যুষে ধনুরাশিস্থ সূর্য্য দক্ষিণায়ণের শেষ সীমা হইতে উত্তরায়ণ পথে ফিরিয়া নীহার কুয়াশা জাল ভেদ করিয়া" ইত্যাদি এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

আমি লিখিয়াছি নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার গরীব বালকদের এই নিজস্ব উৎসবটি এখনো দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ঢাকা জেলায়ও এটি মহা ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং সেখানেও ঐরূপ ছড়া বাঁধে। প্রসিদ্ধ গণিমিঞাকেও তাহারা রেহাই দ্যায় না। একবার তাহারা গাহিয়াছিল—

"গণিমিঞা বাহাদুর নাম পড়েছে বহুদুর
শুখ্না পটল কিনিয়া বাগবাগিচা বানাইয়া"—

গণিমিঞা বাহাদুরকে বালকদের বিশেষভাবে সেবার প্রসন্ন করিতে হইয়াছিল—এইরূপ জনশ্রুতি। উক্ত ছড়াটিতে বাহাদুর সাহেবের উপরে কৃপণতার দোষারোপের ইঙ্গিত হইয়াছিল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

একবার লক্ষ্ণৌয়ের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিষেণ নারায়ণ দর কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ইংরাজীতে সুবক্তা ও সুলেখক। উর্দ্দুতেও সুবক্তা ও সুলেখক, তাঁহার সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বেশ পড়াশুনা আছে। কংগ্রেসের সহিত তাঁহার যোগ ২৩।২৪ বৎসর ব্যাপী; তবে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি অধিকাংশ কংগ্রেসেই উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিষেণনারায়ণ দর।

যখন যখন উপস্থিত হইয়াছেন, তখন বেশ ভাল বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহার লেখা ও বক্তৃতায় স্পষ্টবাদিতা আছে। তবে কংগ্রেস দলের অধিকাংশ নেতার মত তাঁহারও ঝোঁক বেশী মাত্রায় গবর্ণমেণ্টকে আমাদের অভাব অভিযোগ জানান এবং গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা করার দিকে। প্রকৃত জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করা, তাহার প্রকৃত উপায় চিন্তা করা, আমাদের দেশের মঙ্গলের জন্য সাক্ষাৎভাবে আমাদের যে সকল কাজ করা উচিত, তৎপ্রতি কংগ্রেসের অধিকতর দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

দর মহাশয় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণবংশজাত; এইজন্য তাঁহার পণ্ডিত পদবী। কাশ্মীরে, পঞ্জাবে, হিন্দুস্থানে ও বেহারে ব্রাহ্মণ নিরক্ষর হইলেও পণ্ডিত পদবাচ্য। বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃত না জানিলে কাহাকেও পণ্ডিত বলা হয় না।

দর মহাশয় সামাজিক বিষয়ে সংস্কারক দলের লোক।

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধি স্বদেশহিতৈষণা, এক কথায়, যোগ্যতা, সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ দিল্লীতে মুকুট ধারণ উৎসব উপলক্ষে ভারত শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত বঙ্গকে আবার এক শাসনকর্ত্তার অধীনে আনিয়া সম্মিলিত করা অন্যতম। ইহা দ্বারা চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগকে একত্র করিয়া সমস্ত প্রদেশটিকে একজন ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত গবর্ণর, ও কৌন্সিলের অধীন করা হইয়াছে। ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের সন্তোষের একটি কারণ এই যে বাঙ্গালী প্রধানত নিজ চেষ্টার দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত স্বদেশকে এক করিল সত্য বটে, রাজানুগ্রহ এই একীকরণের সাক্ষাৎ কারণ। কিন্তু পরোক্ষ ও প্রকৃত কারণ, বাঙ্গালীর পুরুষকার, এবং বাঙ্গালীর আন্দোলনের ন্যায়মূলকতা। উপনিষদে আছে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, পরমাত্মা যিনি তিনিও দুর্ব্বলের লভ্য নহেন; তদ্রূপ রাজশক্তির অনুগ্রহও সবল যে সেই পায়। বাঙ্গালী ভারি শক্তিশালী জাতি, ইহা আমাদের বক্তব্য নহে; কিন্তু কিছু শক্তি যে জন্মিয়াছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ভগবান্‌কে না ভুলিলে এই শক্তি আরও বাড়িবে। যাহারা একভাষায় কথা বলে, যাহাদের সাহিত্য এক, যাহারা একদেশে বাস করে, তাহাদের এক শাসনাধীনে থাকা ও একত্র শক্তিসঞ্চয় করাই বাঞ্ছনীয়। কোন কোন ব্যক্তি বঙ্গ বিভাগের পর, নানা উপায়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালীদের পার্থক্য বাড়াইতে ও তাহাদের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আশা করি এখন সেই সকল চেষ্টা পরিত্যক্ত হইবে। এবং পূর্ব্ববঙ্গের পুলিস শাসনও রহিত হইবে।

বঙ্গের উভয় দিকের সম্মিলনে বাঙ্গালী মুসলমানেরও অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। কারণ সুবে বাঙ্গলার, বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরেই হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী; ঐ প্রদেশগুলি খাস্ বাঙ্গলার সহিত থাকাতেই সমস্ত সুবাটিতে হিন্দুর সংখ্যা বেশী ছিল। এখন যাহা দাঁড়াইল, তাহাতে, খাস বাঙ্গলার মুসলমানের সংখ্যাই বেশী হওয়ায়, মুসলমানেরা উদ্যোগী ও সুশিক্ষিত হইলে তাঁহাদের প্রাধান্য ও গুরুত্ব অনায়াসে বজায় থাকিবে। কারণ ১৯০১ সালের লোকসংখ্যা গণনা অনুসারে খাস্ বঙ্গে হিন্দু ছিল ২০,১৯১,০৮২, এবং মুসলমান ছিল ২১,৯৫৪,৯৭৬; অর্থাৎ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ১৭,৬৩,৮৯৪ বেশী ছিল। বর্ত্তমান সেন্সসে নিশ্চয়ই আরও বেশী হইয়াছে। এখন হিন্দুবাঙ্গালী যদি নিজের গৌরব রাখিতে চান, নিজের ক্ষমতা হারাইতে না চান, তাহা হইলে তাঁহাকেও শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পবাণিজ্যে কৃষিতে, দৈহিক শ্রম ও সামর্থ্যে, চরিত্রে ও স্বদেশহিতৈষণায় জগতের শ্রেষ্ঠজাতি সকলের সহিত সমকক্ষতা করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

আমরা মুখে বলি, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর ভাই। ইহার মানেটা তলাইয়া বুঝিয়া কাযে, ব্যবহারে, এই ভ্রাতৃত্ব দেখাইতে হইবে। ইহার মানে মুসলমান ও হিন্দু বাঙ্গালীর পরস্পর আন্তরিক সহকারিতা।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ সম্মিলিত হওয়ায় অধিকাংশ বাঙ্গালী এক শাসনকর্ত্তার অধীনে আসিল বটে, কিন্তু বঙ্গভাষী সকল জেলা আসিল না। কারণ ছোটনাগপুর প্রদেশের অন্তর্গত মানভূম জেলার শতকরা ১২॥ জন হিন্দী, শতকরা ১৪ জন সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষা এবং শতকরা ৭২ জনেরও উপর বাঙ্গলা বলে। সুতরাং মানভূম জেলাটি খাস্ বঙ্গেরই অংশ এবং ইহা বাঙ্গলার গবর্ণরেরই অধীনে আনা উচিত। আমরা যদি সময় থাকিতে চেষ্টা করি, মানভূমের বাঙ্গালীরা যদি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহারা অন্য বাঙ্গালীদের সঙ্গে থাকিতে সমর্থ হইবেন।

আসামে বাঙ্গালী অর্থাৎ বঙ্গভাষীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ, আসামীর সংখ্যা কেবল ১৩॥ লক্ষ। প্রতি হাজারে কাছাড়ে বাঙ্গালী ৬১৫, শ্রীহট্টে ৯২২, গোয়ালপাড়ায় ৬৯২। সুতরাং এই তিনটি জেলাও বাঙ্গলার সামিল হওয়া উচিত। কিন্তু এই জেলাগুলিকে বহুবৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। এখন এ বিষয়ে কোন
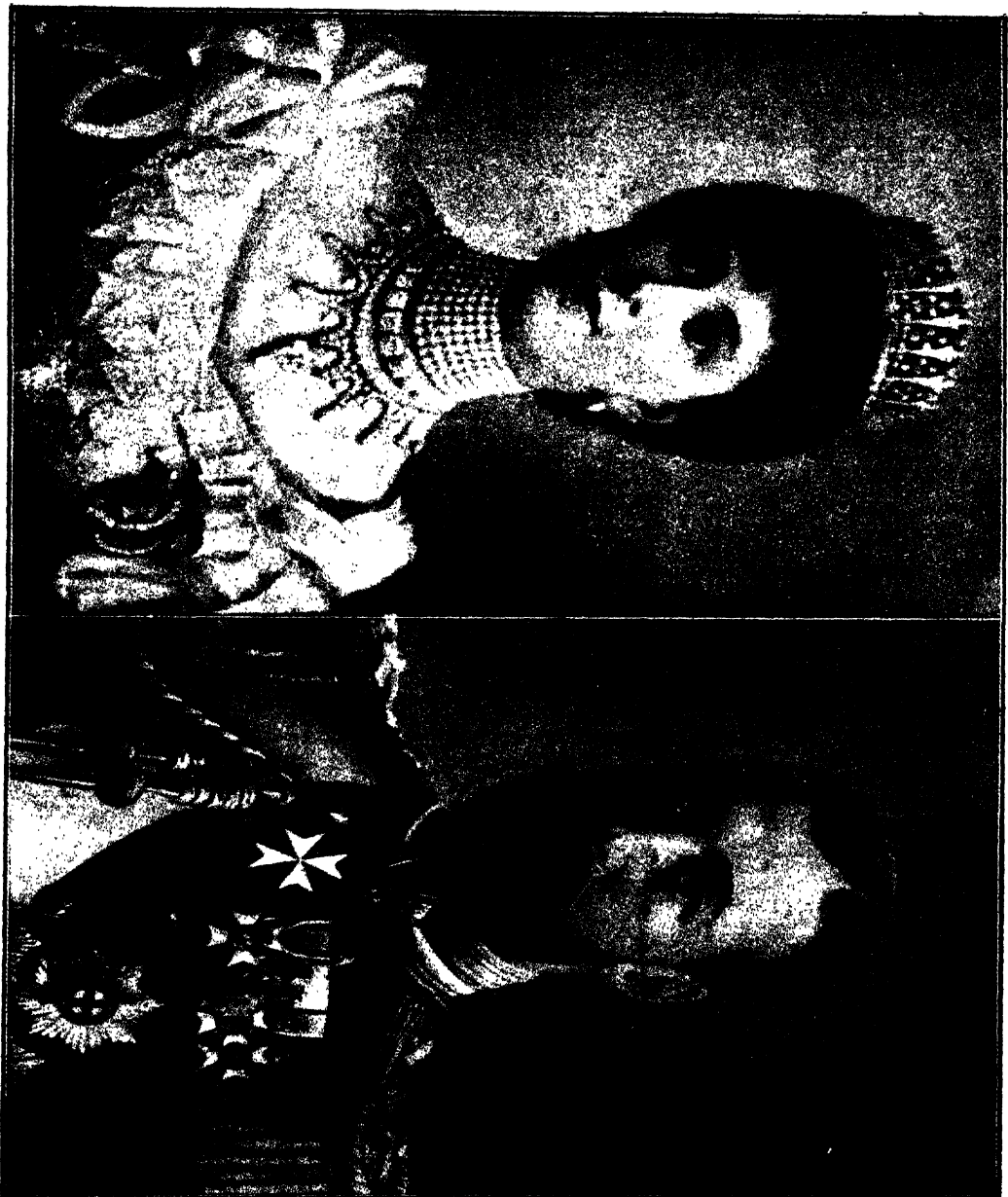
ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী।

আন্দোলন করিয়া কোন ফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আসামবাসী বাঙ্গালীদিগকে সাহিত্যিক ও সামাজিক সর্ব্ববিষয়ে আমাদের সঙ্গে লইয়া চলিবার জন্য আমাদিগকে পূর্ণ শক্তির সহিত চেষ্টা করিতে হইবে।

বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইবে। ইহাতে আমাদের অসন্তোষের কোন ন্যায্য কারণ নাই। বেহারীরা ইহাতে খুব সন্তুষ্ট হইবে। কারণ তাহারা বরাবর মনে করিতেছিল যে বাঙ্গালীর আওতায় পড়িয়া তাহারা ভাল করিয়া বাড়িতে পারিতেছিল না। তজ্জন্য বাঙ্গালীদের প্রতি তাহাদের সদ্ভাবও কম ছিল। এখন আশা করি অসদ্ভাব কমিবে। ছোটনাগপুরের মানভূম জেলা ভিন্ন অন্য জেলার অধিকাংশ লোকের বেহারের সহিত যুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি হইবার কথা নয়, যদিও এবিষয়ে আমরা ঠিক্ সংবাদ জানি না। উড়িষ্যাবাসীরা বাঙ্গালা ছাড়িয়া বেহারের সঙ্গে যুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবে কিনা, তাহাও জানি না। বেহারের পক্ষে নূতন ছোটলাট আদির খরচ যোগান সহজ হইবে না। নূতন প্রাসাদ, আফিস প্রভৃতি নির্ম্মাণেও অনেক কোটি টাকা অপব্যয় হইবে।

আসামে পূর্ব্ববৎ চীফ্ কমিশনার নিযুক্ত হইবেন। আমাদের মত এই যে আসামের বাঙ্গালী জেলাগুলি বাঙ্গালার সহিত যোগ করিয়া দিলে বড় ভাল হইত। কিন্তু আপাততঃ তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

সম্রাট যে যে পরিবর্ত্তন ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার প্রথমটি এই যে ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে উঠিয়া গিয়া দিল্লীতে স্থাপিত হইবে; এবং এইরূপ বলা হইয়াছে যে এই পরিবর্ত্তনের জন্যই অন্য সকল নূতন ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এবম্বিধ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সম্বন্ধে খুব মতভেদ হইবে। কোন্‌টি যে মূল কারণ তদ্বিষয়েও সহজেই লোকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে। রাজধানী কলিকাতায় রাখিয়া যে কেন বঙ্গবিভাগ রহিত করা যাইত না, বা বঙ্গদেশকে গবর্ণর দেওয়া যাইত না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দিল্লীতে রাজধানী লইয়া গিয়া বিশেষ কি যে সুবিধা হইবে, তাহাও বুঝিতে পারি না। একটা কারণ এই বলা হইয়াছে যে দিল্লী কলিকাতা অপেক্ষা কেন্দ্রস্থানীয় ও সুগম। কিন্তু বাস্তবিক দিল্লীও কেন্দ্রস্থানীয় নহে, কলিকাতাও নহে। পৃথিবীতে যতগুলা রাজ্য আছে, তাহার কয়টার রাজধানী ঠিক্ কেন্দ্র স্থলে? ওটা কোন কাজের কথা নয়। অধিকাংশ ভারতবাসীর ও ব্রহ্মবাসীর পক্ষে দিল্লী কলিকাতা অপেক্ষা সুগমও নহে। তাহার পর বলা হইয়াছে যে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণেও রাজধানী দিল্লীতে যাওয়া উচিত। ইংরাজের ইতিহাসে কলিকাতাই শ্রেষ্ঠস্থানীয়, দিল্লী নহে; দিল্লী মুসলমানের ইতিহাসে বড় বটে। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণ জড়াইলে, অর্থাৎ মুসলমানকে সন্তুষ্ট করা দরকার, এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে, দিল্লীর সপক্ষে ওকালতী নিশ্চয়ই করা যায়। আর মুসলমানের সন্তোষ উৎপাদন আর এক কারণে দরকারও বটে। কারণ পূর্ব্ববঙ্গ যে পরিমাণে মুসলমানপ্রধান প্রদেশ হইয়াছিল, নূতন জোড়া-দেওয়া বঙ্গ সে পরিমাণে মুসলমানপ্রধান বঙ্গ হইবে না। মুসলমানকে সন্তুষ্ট করা একমাত্র রাজনৈতিক কারণ নহে। কারণ বড় লাট লর্ড ক্রুকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আছে :—

On the other hand, the peculiar political situation which has arisen in Bengal since the Partition, makes it eminently desirable to withdraw the Government of India from its present provincial environment...

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গব্যবচ্ছেদের পর বঙ্গে যে বিশেষ রকমের রাজনৈতিক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গলা-প্রদেশ হইতে সরিয়া পড়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহার গূঢ়মর্ম্ম আমরা আদায় করিতে পারিলাম না। সুতরাং মৌনই ভাল। আমাদের ত মনে হয় যে যদি বাঙ্গলা দেশে নূতন কোন শক্তি বা অশান্তির কারণ বা উপদ্রবের কারণ জন্মিয়া থাকে, ত নিকটে থাকিয়া তাহাকে বুঝিয়া তাহাকে হয় দমন নয় সৎপথে চালিত করাই রাজনীতিজ্ঞের কাজ।

লর্ড ক্রুও ঐতিহাসিক কারণের উল্লেখ করিয়া দিল্লীতে রাজধানী করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নিঃসন্দিগ্ধ হইবে বলিয়া আশা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিতেছি দিল্লীকে রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে খুব সুলক্ষণাক্রান্ত স্থান মনে করিতেছেন কিন্তু বাস্তবিক কি তাহা সত্য? তাহার পর বলা হইয়াছে যে দেশীয় রাজ্যের রাজারা এই পরিবর্ত্তন পছন্দ করিবেন। কিন্তু কলিকাতা সম্বন্ধে তাঁহারা কখনও অসন্তোষ জানাইয়াছিলেন কি? একথাও বলা হইয়াছে যে বড়লাট কলিকাতায় থাকিলে লোকে অনেক ঘটনার জন্য তাঁহাকে দায়ী করে (যেমন মনে করুন গতবৎসরের বক্‌রীদের দাঙ্গা ও ডাকাতী) যার জন্য তিনি দায়ী নন। কিন্তু দিল্লীও পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীন। সেখানে গিয়া বড়লাট কি সাক্ষাৎভাবে দিল্লী শাসন করিবেন না, পঞ্জাব শাসন করিবেন? (কারণ দিল্লীতেও পঞ্জাবেও, পূর্ব্বোক্তরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে।) যদি তাহা করেন, তাহা হইলে কলিকাতায়ও তাহা করিতে পারিতেন, বঙ্গদেশেও করিতে পারিতেন।

রাজনৈতিক কারণ সম্বন্ধে বিলাতের টাইম্‌স্ ও ডেলীমেল্ কাগজ দুখানা আমাদের মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিতেছে। তাহাদের মত এই :—

The "Times" says that the chief objects towards which Lord Curzon's Partition of Bengal was directed have been fully safeguarded.

The "Daily Mail" says:—'Lord Curzon's ends have been attained by slightly different means.

উভয়েই বলেন লর্ড কার্জ্জন যেসকল উদ্দেশ্যে বঙ্গব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন দ্বারাও সেই সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

যাহা হউক, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় গূঢ় জিনিষ। তৎসম্বন্ধে সত্য-নির্ণয় দুঃসাধ্য। সুতরাং এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করা ঠিক নয়।

দিল্লীতে রাজধানী চলিয়া গেলে কলিকাতার বাণিজ্য কিছু কমিবে বলিয়া আমাদের ধারণা। কারণ ইহার ইংরাজ অধিবাসী কিছু কমিবে, এখানে রাজা মহারাজার আগমন কমিবে, পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরাও এখনকার মত এত বেশী আসিবে না; এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ এই যে বোম্বাই ও করাচী বন্দরদ্বয় দিল্লী পর্য্যন্ত রেলভাড়া কমাইয়া লইয়া কলিকাতার আমদানী ব্যবসার কতক অংশ আত্মসাৎ করিতে পারিবে। ইংরাজের বাণিজ্য কমিলে ইংরাজ সওদাগর আফিসের বাঙ্গালী কেরাণী কিছু কমিবে। ছোটখাট দেশী ব্যবসাদারদের ব্যবসায়ও কিছু কমিবে। তারপর ভারত গবর্ণমেণ্টের আফিসগুলিতে অতঃপর নূতন চাকরী বাঙ্গালী আর এখনকার মত পরিমাণে পাইবে না। কিন্তু প্রধান ক্ষতি এই যে বাঙ্গালীর মতের প্রভাব ও চাপ ভারতগবর্ণমেণ্ট এখনকার মত অনুভব করিবেন না, সকল প্রদেশের নেতারা এখানে আসিয়া তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে ভাব ও চিন্তার আদান প্রদানের সুযোগ করিয়া দিবেন না, বাঙ্গালীর কূপমণ্ডুকতা বাড়িবে,

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্গালীর এই সব যে ক্ষতি হইবে, তাহাতে পঞ্জাবীর লাভ হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বলা বাঙ্গালীর অকর্ত্তব্য। প্রাকৃতিক সুবিধা যাহা তাহাই প্রধান সুবিধা। রাজদত্ত সুবিধা ভাল, কিন্তু তাহা পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং বঙ্গদেশে রাজধানী থাকায় যদি আমাদের কিছু সুবিধা হইয়া থাকে, ত, এখন তাহা অনুন্নত দিল্লী অঞ্চলের হউক; যদি আমাদের মধ্যে কোন বস্তু থাকে, ত আমরা এখন হইতে শুধু আত্মশক্তিতেই বেশী নির্ভর করিয়া বড় হইবার চেষ্টা করি। ভারতের ইতিহাসে, জগতের নানা দেশের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, যে প্রকৃত প্রজাশক্তির জন্ম কেবল রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেই হইয়াছে তাহা নহে। সুতরাং কলিকাতা হইতে রাজধানী উঠিয়া যাওয়ায় আপাততঃ আমাদের প্রাণে ক্লেশ হইলেও, আপাততঃ আমাদের কিছু ক্ষতি হইলেও, আমরা বলি, রাজার আদেশই জয়যুক্ত হউক। ক্ষতিটা গবর্ণমেণ্টেরও হইবে। কারণ, গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার ইংরাজবণিকের মতের প্রভাব অনুভব করিবেন না; বাঙ্গালীর মতেরও না। দিল্লীতে ইংরাজবণিক্‌দল কখনও কলিকাতার মত সংখ্যা বহুল বা প্রবল হইবে না। পঞ্জাবও বাঙ্গলার মত হইতে সময় লাগিবে। উন্নত প্রজামতের সাহায্যব্যতীত সুশাসন দুঃসাধ্য। দিল্লীতে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণেও অনেক কোটিটাকা লাগিবে।

কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে একজন পুরাতন পঞ্জাবপ্রবাসী বাঙ্গালী লিখিয়াছিলেন যে বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস পঞ্জাবপ্রবাসী বাঙ্গালীদের বিষয় অনেক লিখিয়াছেন; তাঁহাকেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ উক্ত বাঙ্গালীদের ইতিহাস সংগ্রহের ভার দিলে ভাল হয়। তদুত্তরে জ্ঞানেন্দ্র বাবু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে নানা কারণে তিনি এখন ঐ ভার লইতে অসমর্থ, এবং তাঁহার মতে বাবু কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এই কার্য্য করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষষ্ঠীপূজা।

শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

তাঁহার অনুমতিক্রমে।

Three-colour blocks by U. Ray & Sons *Kuntaline Press, Calcutta*

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১১শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩১৮

৪র্থ সংখ্যা

জীবনস্মৃতি

প্রত্যাবর্ত্তন।

পূর্ব্বে যে শাসনের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া ছিলাম হিমালয়ে যাইবার সময়ে তাহা একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়া গেছে। যে লোকটা চোখে চোখে থাকে সে আর চোখেই পড়ে না; দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে একবার দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া তবেই এবার আমি বাড়ির লোকের চোখে পড়িলাম।

ফিরিবার সময়ে রেলের পথেই আমার ভাগ্যে আদর সুরু হইল। মাথায় এক জরির টুপি পরিয়া আমি একলা বালক ভ্রমণ করিতেছিলাম- সঙ্গে কেবল একজন ভৃত্য ছিল - স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে শরীর পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পথে যেখানে যত সাহেব মেম গাড়িতে উঠিত আমাকে নাড়াচাড়া না করিয়া ছাড়িত না।

বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে—এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে নির্ব্বাসনে ছিলাম সেই নির্ব্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অন্তঃপুরের বাধা ঘুচিয়া গেল, চাকরদের ঘরে আর আমাকে কুলাইল না। মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড় আসন দখল করিলাম। তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম

ছোটবেলায় মেয়েদের স্নেহযত্ন মানুষ না যাচিয়াই পাইয়া থাকে। আলো বাতাসে তাহার যেমন দরকার এই মেয়েদের আদরও তাহার পক্ষে তেমনি আবশ্যক। কিন্তু আলো বাতাস পাইতেছি বলিয়া কেহ বিশেষভাবে অনুভব করে না—মেয়েদের যত্ন সম্বন্ধেও শিশুদের সেইরূপ কিছুই না ভাবাটাই স্বাভাবিক। বরঞ্চ শিশুরা এইপ্রকার যত্নের জাল হইতে কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্যই ছটফট করে। কিন্তু যখনকার যেটি সহজপ্রাপ্য তখন সেটি না জুটিলে মানুষ কাঙাল হইয়া দাঁড়ায়। আমার সেই দশা ঘটিল। ছেলেবেলায় চাকরদের শাসনে বাহিরের ঘরে মানুষ হইতে হইতে হঠাৎ এক সময়ে মেয়েদের অপর্য্যাপ্ত স্নেহ পাইয়া সে জিনিসটাকে আর ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। শিশুবয়সে অন্তঃপুর যখন আমাদের কাছে দূরে থাকিত তখন মনে মনে সেইখানেই আপনার কল্পলোক সৃজন করিয়াছিলাম। যে জায়গাটাকে ভাষায় বলিয়া থাকে অবরোধ সেইখানেই সকল বন্ধনের অবসান দেখিতাম। মনে করিতাম, ওখানে ইস্কুল নাই, মাষ্টার নাই, জোর করিয়া কেহ কাহাকেও কিছুতে প্রবৃত্ত করায় না—ওখানকার নিভৃত অবকাশ অত্যন্ত রহস্যময়—ওখানে কারো কাছে সমস্ত দিনের সময়ের হিসাব নিকাশ করিতে হয় না, খেলাধূলা সমস্ত আপন ইচ্ছামত। বিশেষত দেখিতাম ছোড়দিদি আমাদের সঙ্গে সেই একই নীলকমল পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে পড়িতেন কিন্তু পড়া করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে যেমন

বিধান, না করিলেও সেইরূপ। দশটার সময় আমরা তাড়াতাড়ি খাইয়া ইস্কুলে যাইবার জন্য ভালমানুষের মত প্রস্তুত হইতাম—তিনি বেণী দোলাইয়া নিশ্চিন্তমনে বাড়ির ভিতর দিকে চলিয়া যাইতেন; দেখিয়া মনটা বিকল হইত। তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত। কিন্তু কোনো সুযোগে কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারিলে ছোড়দিদি তাড়া দিয়া বলিতেন—'এখানে তোমরা কি করতে এসেছ, যাও বাইরে যাও',—তখন একে নৈরাশ্য তাহাতে অপমান, দু-ই মনে বড় বাজিত। তারপরে আবার তাঁহাদের আলমারিতে শাসির পাল্লার মধ্য দিয়া সাজানো দেখিতে পাইতাম, কাঁচের এবং চীনামাটির কত দুর্লভ সামগ্রী—তাহার কত রং এবং কত সজ্জা! আমরা কোনো দিন তাহা স্পর্শ করিবার যোগ্য ছিলাম না—কখনো তাহা চাহিতেও সাহস করিতাম না। কিন্তু এইসকল দুষ্প্রাপ্য সুন্দর জিনিষগুলি অন্তঃপুরের দুর্লভতাকে আরো কেমন রঙীন করিয়া তুলিত।

এমনি করিয়া ত দূরে দূরে প্রতিহত হইয়া চিরদিন কাটিয়াছে। বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনই ছিল। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম সেটুকু আমার চোখে যেন ছবির মত পড়িত। রাত্রি নটার পর অঘোর মাষ্টারের কাছে পড়া শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে শয়ন করিতে চলিয়াছি—খড়খড়ে দেওয়া লম্বা বারান্দাটাতে মিট্‌মিটে লণ্ঠন জ্বলিতেছে;—সেই বারান্দা পার হইয়া গোটা চার-পাঁচ অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ নামিয়া একটি উঠান-ঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি,—বারান্দার পশ্চিমভাগে পূর্ব্ব আকাশ হইতে বাঁকা হইয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে—বারান্দার অপর অংশগুলি অন্ধকার—সেই একটুখানি জ্যোৎস্নায় বাড়ির দাসীরা পাশাপাশি পা মেলিয়া বসিয়া উরুর উপর প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছে এবং মৃদুস্বরে আপনাদের দেশের কথা বলাবলি করিতেছে এমন কত ছবি মনের মধ্যে একেবারে আঁকা হইয়া রহিয়াছে। তারপরে রাত্রে আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিয়া পা ধুইয়া একটা মস্ত বিছানায় আমরা তিনজনে শুইয়া পড়িতাম—শঙ্করী কিম্বা প্যারী কিম্বা তিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া তেপান্তর মাঠের উপর দিয়া রাজপুত্রের ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিত—সে কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শয্যাতল নীরব হইয়া যাইত;—দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া শুইয়া ক্ষীণালোকে দেখিতাম, দেয়ালের উপর হইতে মাঝে মাঝে চুনকাম খসিয়া গিয়া কালোয় শাদায় নানাপ্রকারের রেখাপাত হইয়াছে; সেই রেখাগুলি হইতে আমি মনে মনে বহুবিধ অদ্ভুত ছবি উদ্ভাবন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম,—তারপরে অর্দ্ধরাত্রে কোনো কোনো দিন আধঘুমে শুনিতে পাইতাম, অতি বৃদ্ধ স্বরূপ সর্দ্দার উচ্চস্বরে হাঁক দিতে দিতে এক বারান্দা হইতে আর এক বারান্দায় চলিয়া যাইতেছে।

সেই অল্পপরিচিত কল্পনাজড়িত অন্তঃপুরে একদিন বহুদিনের প্রত্যাশিত আদর পাইলাম। যাহা প্রতিদিন পরিমিতরূপে পাইতে পাইতে সহজ হইয়া যাইত তাহাই হঠাৎ একদিনে বাকিবকেয়া সমেত পাইয়া যে বেশ ভাল করিয়া তাহা বহন করিতে পারিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না।

ক্ষুদ্র ভ্রমণকারী বাড়ি ফিরিয়া কিছুদিন ঘরে ঘরে কেবলি ভ্রমণের গল্প বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বার বার বলিতে বলিতে কল্পনার সংঘর্ষে ক্রমেই তাহা এত অত্যন্ত ঢিলা হইতে লাগিল যে, মূল বৃত্তান্তের সঙ্গে তাহার থাপ খাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। হায়, সকল জিনিষের মতই গল্পও পুরাতন হয়, ম্লান হইয়া যায়, যে গল্প বলে তাহার গৌরবের পুঁজি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। এমনি করিয়া পুরাতন গল্পের উজ্জ্বলতা যতই কমিয়া আসে ততই তাহাতে এক এক পোঁচ করিয়া নূতন রং লাগাইতে হয়।

পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসার পর ছাদের উপরে মাতার বায়ুসেবনসভায় আমিই প্রধান বক্তার পদলাভ করিয়াছিলাম। মার কাছে যশস্বী হইবার প্রলোভন

ত্যাগ করা কঠিন এবং কাজটাও অত্যন্ত দুরূহ নহে।

নর্ম্মাল স্কুলে পড়িবার সময় যেদিন কোনো একটি শিশুপাঠে প্রথম দেখা গেল সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে চোদ্দলক্ষ-গুণে বড় সেদিন মাতার সভায় এই সত্যটাকে প্রকাশ করিয়াছিলাম, ইহাতে প্রমাণ হইয়াছিল যাহাকে দেখিতে ছোট সেও হয়ত নিতান্ত কম বড় নয়! আমাদের পাঠ্য ব্যাকরণে কাব্যালঙ্কার অংশে যে সকল কবিতা উদাহৃত ছিল তাহাই মুখস্থ করিয়া মাকে বিস্মিত করিতাম। তাহার একটা আজও মনে আছে।

ওরে আমার মাছি!
আহা কি নম্রতা ধর, এসে হাত জোড় কর,
কিন্তু কেন বারি কর তীক্ষ্ণ শুঁড়গাছি!

সম্প্রতি প্রক্‌টরের গ্রন্থ হইতে গ্রহতারা সম্বন্ধে অল্প যে একটু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম তাহাও সেই দক্ষিণবায়ু বীজিত সান্ধ্য-সমিতির মধ্যে বিবৃত করিতে লাগিলাম।

আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুর্য্যে এককালে পাঁচালির দলের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত—আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম সে আর কি বলিব! শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত—পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাচালির গান শিখিয়া-ছিলাম "ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এস বন," "প্রাণত অস্ত হ'ল আমার কমল-আঁখি," "রাঙা জবায় কি শোভা পায় পায়," "কাতরে রেখ রাঙা পায়, মা অভয়ে," "ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে একান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে," এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্য্যের অগ্নি-উচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।

পৃথিবীসুদ্ধ লোকে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায় আর আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বেশী বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি অত্যন্ত খুসি হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, বাছা, সেই রামায়ণ আমাদের একটু পড়িয়া শোনা দেখি।"

হায়, একে ঋজুপাঠের সামান্য উদ্ধৃত অংশ, তাহার মধ্যে আবার আমার পড়া অতি অল্পই, তাহাও পড়িতে গিয়া দেখি মাঝে মাঝে অনেকখানি অংশ বিস্মৃতিবশত অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে মা পুত্রের বিদ্যা-বুদ্ধির অসামান্যতা অনুভব করিয়া আনন্দসম্ভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়াছেন তাঁহাকে "ভুলিয়া গেছি" বলিবার মত শক্তি আমার ছিল না। সুতরাং ঋজুপাঠ হইতে যেটুকু পড়িয়া গেলাম তাহার মধ্যে বাল্মীকির রচনা ও আমার ব্যাখ্যার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে অসামঞ্জস্য রহিয়া গেল। স্বর্গ হইতে করুণহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি নিশ্চয়ই জননীর নিকট খ্যাতিপ্রত্যাশী অর্ব্বাচীন বালকের সেই অপরাধ সকৌতুক স্নেহহাস্যে মার্জ্জনা করিয়াছেন কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আমাকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিলেন না।

মা মনে করিলেন আমার দ্বারা অসাধ্যসাধন হইয়াছে, তাই আর সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কহিলেন "একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি।" তখন মনে মনে সমূহ বিপদ গণিয়া প্রচুর আপত্তি করিলাম। মা কোনোমতেই শুনিলেন না। বড়দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড়দাদা আসিতেই কহিলেন "রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়িতে শিখিয়াছে একবার শোন না।" পড়িতেই হইল। দয়ালু মধুসূদন তাঁহার দর্পহারিত্বের একটু আভাসমাত্র দিয়া আমাকে এ যাত্রা ছাড়িয়া দিলেন। বড়দাদা বোধ হয় কোনো একটা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন—বাংলা ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তিনি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। গুটিকয়েক শ্লোক শুনিয়াই "বেশ হইয়াছে" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ইহার পর ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক কঠিন হইয়া উঠিল। নানা ছল করিয়া বেঙ্গল একাডেমি হইতে পলাইতে সুরু করিলাম। সেণ্টজেবিয়ার্সে আমাদের ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল, সে খানেও কোনো ফল হইল না।

দাদারা মাঝে মাঝে এক আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভৎর্সনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড় হইলে রবি মানুষের মত হইবে কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল। আমি বেশ বুঝিতাম ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তবু যে-বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাঁসপাতালজাতীয় একটা নির্ম্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য-আবর্ত্তিত ঘানির সঙ্গে কোনো মতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।

ঘরের পড়া।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনো মতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাক্‌বেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জ্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্ম্মফলের বোঝা ঐ পরিমাণে হাল্কা হইয়াছে।

আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধকরি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। তখন ছেলেদের এবং বড়দের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যেসকল ছেলেভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম—যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুইই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক্ তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সাম্‌নের দিকে ঠেলে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারি বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন? একদিকে বিজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, অন্য দিকে প্রচুর গল্পকবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণ-কাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভর্ত্তি করা হয়। সর্ব্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌লস্ ম্যাগাজিন, ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিক সংখ্যক পত্রই সর্ব্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।

বাল্যকালে আর একটি ছোট কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধবন্ধু। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণদিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া

তুলিত। "এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলবর্জ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কি মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙীন রুমালপরা বর্জ্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জ্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কি প্রেমই জমিয়াছিল!

অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুট্ করিয়া লইল। একে ত তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়দলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর এখন যে খুসি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড় করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্ব্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোট বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি-অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।

বাড়ির আবহাওয়া।

ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত। মনে পড়ে খুব যখন শিশু ছিলাম বারান্দার রেলিং ধরিয়া এক একদিন সন্ধ্যার সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সম্মুখের বৈঠকখানা বাড়িতে আলো জ্বলিতেছে, লোক চলিতেছে, দ্বারে বড় বড় গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কি হইতেছে ভাল বুঝিতাম না কেবল অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেই আলোক-মালার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। মাঝখানে ব্যবধান যদিও বেশি ছিল না তবু সে আমার শিশুজগৎ হইতে বহুদূরের আলো। আমার খুড়তত ভাই গণেন্দ্র দাদা তখন রামনারায়ণ তকরত্নকে দিয়া নবনাটক লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিত কলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্ম্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসচর্চ্চায় গণদাদার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। অনেক ইতিহাস তিনি বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের একটি অনুবাদ অনেক দিন হইল ছাপা হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি এখনো ধর্ম্মসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

> গাও হে তাঁহার নাম
> রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
> দয়ার যাঁর নাহি বিরাম
> ঝরে অবিরত ধারে ---

বিখ্যাত গানটি তাঁহারই। বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা, যখন গণদাদার রচিত "লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কি করে" গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত। যুবাবয়সেই গণদাদার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প। কিন্তু তাঁহার সেই সৌম্য গম্ভীর উন্নত গৌরকান্ত দেহ একবার দেখিলে আর ভুলিবার যো থাকে না। তাঁহার ভারি একটি প্রভাব ছিল।

সে প্রভাবটি সামাজিক প্রভাব। তিনি আপনার চারিদিকের সকলকে টানিতে পারিতেন, বাঁধিতে পারিতেন—তাঁহার আকর্ষণের জোরে সংসারের কিছুই যেন ভাঙিয়া চুরিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে পারিতনা।

আমাদের দেশে এক একজন এই রকম মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা চরিত্রের একটি বিশেষ শক্তিপ্রভাবে সমস্ত পরিবারের অথবা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অনায়াসে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ইঁহারাই যদি এমন দেশে জন্মিতেন যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বাণিজ্য ব্যবসায়ে ও নানাবিধ সার্ব্বজনীন কর্ম্মে সর্ব্বদাই বড় বড় দল বাঁধা চলিতেছে তবে ইঁহারা স্বভাবতই গণনায়ক হইয়া উঠিতে পারিতেন। বহুমানবকে মিলাইয়া এক-একটি প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া তোলা বিশেষ এক প্রকার প্রতিভার কাজ। আমাদের দেশে সেই প্রতিভা কেবল এক একটি বড় বড় পরিবারের মধ্যে অখ্যাতভাবে আপনার কাজ করিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমার মনে হয় এমন করিয়া শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে—এ যেন জ্যোতিষ্কলোক হইতে নক্ষত্রকে পাড়িয়া আনিয়া তাহার দ্বারা দেশলাই কাঠির কাজ উদ্ধার করিয়া লওয়া।

ইঁহার কনিষ্ঠ ভাই গুণদাদাকে বেশ মনে পড়ে। তিনিও বাড়িটিকে একেবারে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আত্মীয় বন্ধু আশ্রিত অনুগত অতিথি অভ্যাগতকে তিনি আপনার বিপুল ঔদার্য্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণের বারান্দায়, তাঁহার দক্ষিণের বাগানে, পুকুরের বাঁধা ঘাটে মাছ ধরিবার সভায় তিনি মূর্ত্তিমান দাক্ষিণ্যের মত বিরাজ করিতেন। সৌন্দর্য্যবোধ ও গুণগ্রাহিতায় তাঁহার নধর শরীর-মনটি যেন ঢলঢল করিতে থাকিত। নাট্য কৌতুক আমোদ উৎসবের নানা সংকল্প তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশলাভের চেষ্টা করিত। শৈশবের অনধিকার বশত তাঁহাদের সে সমস্ত উদ্যোগের মধ্যে আমরা সকল সময়ে প্রবেশ করিতে পাইতাম না—কিন্তু উৎসাহের ঢেউ চারিদিক হইতে আসিয়া আমাদের ঔৎসুক্যের উপরে কেবলি ঘা দিতে থাকিত। বেশ মনে পড়ে বড় দাদা একবার কি একটা কিম্ভূত কৌতুক-নাট্য (Burlesque) রচনা করিয়াছিলেন—প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড় বৈঠকখানা ঘরে তাহার রিহার্সাল চলিত। আমরা এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনো মনে আছে।

ও কথা আর বোলোনা আর বোলোনা
বল্‌চ বঁধু কিসের ঝোঁকে—
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা
হাস্‌বে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌বে লোকে!

এত বড় হাসির কথাটা যে কি তাহা আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই—কিন্তু এক সময়ে জানিতে পাইব এই আশাতেই মনটা খুব দোলা খাইত।

মধ্যাহ্নে আহারের পর গুণদাদা এবাড়িতে কাছারি করিতে আসিতেন। কাছারি তাঁহাদের একটা ক্লাবের মতই ছিল—কাজের সঙ্গে হাস্যালাপের বড় বেশি বিচ্ছেদ ছিল না। গুণদাদা কাছারি ঘরে একটা কৌচে হেলান দিয়া বসিতেন—সেই সুযোগে আমি আস্তে আস্তে তাঁহার কোলের কাছে আসিয়া বসিতাম। গুণদাদা আমার ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেন যে আমার পকেটের মধ্যে একটা খাতা লুকান আছে। একটুখানি প্রশ্রয় পাইবামাত্র খাতাটি তাহার আবরণ হইতে নির্লজ্জ-ভাবে বাহির হইয়া আসিত। বলা বাহুল্য তিনি খুব কঠোর সমালোচক ছিলেন না; এমন কি, তাঁহার অভিমতগুলি বিজ্ঞাপনে ছাপাইলে কাজে লাগিতে পারিত। তবু বেশ মনে পড়ে এক একদিন কবিত্বের মধ্যে ছেলেমানুষীর মাত্রা এত অতিশয় বেশি থাকিত যে তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। ভারতমাতা সম্বন্ধে কি একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার কোনো একটি ছত্রের প্রান্তে কথাটা ছিল "নিকটে", ঐ শব্দটাকে দূরে পাঠাইবার সামর্থ্য ছিল না, অথচ কোনোমতেই তাহার সঙ্গত মিল খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা পরের ছত্রে "শকটে" শব্দটা যোজনা করিয়াছিলাম। সে জায়গায় সহজে শকট

আসিবার একেবারেই রাস্তা ছিল না—কিন্তু মিলের দাবী কোনো কৈফিয়তেই কর্ণপাত করে না ; কাজেই বিনা কারণেই সে জায়গায় আমাকে শকট উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। গুণদাদার প্রবল হাস্যে, ঘোড়াসুদ্ধ শকট যে দুর্গম পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়াই কোথায় অন্তর্ধান করিল এ পর্য্যন্ত তাহার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সাম্‌নে একটি ছোট ডেস্ক লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসন্ত-বাতাসের মত কাজ করিত। বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।

তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মত প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার—বান ডাকিয়া আসিত নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল-উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম? কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি লাভ করিবার জন্য পুরাপুরী বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম—তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত!

তখনকার কথা যতই ভাবি আমার একটি কথা কেবলি মনে হয়, তখনকার দিনে মজ্‌লিশ বলিয়া একটা পদার্থ ছিল এখন সেটা নাই। পূর্ব্বকার দিনে যে একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল আমরা যেন বাল্যকালে তাহারই শেষ অস্তচ্ছটা দেখিয়াছি। পরস্পরের মেলামেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল সুতরাং মজ্‌লিশ তখনকার কালের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। যাঁহারা মজ্‌লিশি মানুষ ছিলেন তখন তাঁহাদের বিশেষ আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের জন্য আসে, দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু মজ্‌লিশ করিতে আসে না। লোকের সময় নাই এবং সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তখন বাড়িতে কত আনাগোনা দেখিতাম—হাসি ও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত। চারিদিকে সেই নানা লোককে জমাইয়া তোলা, হাসি গল্প জমাইয়া তোলা, এ একটা শক্তি সেই শক্তিটাই কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। মানুষ আছে তবু সেই সব বারান্দা সেই সব বৈঠকখানা যেন জনশূন্য। তখনকার সময়ের সমস্ত আস্‌বাব আয়োজন, ক্রিয়া কর্ম্ম, সমস্তই দশজনের জন্য ছিল—এইজন্য তাহার মধ্যে যে জাঁকজমক ছিল তাহা উদ্ধত নহে। এখনকার বড়মানুষের গৃহসজ্জা আগেকার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু তাহা নির্ম্মম, তাহা নির্ব্বিচারে উদারভাবে আহ্বান করিতে জানে না—খোলা গা, ময়লা চাদর এবং হাসিমুখ সেখানে বিনা হুকুমে প্রবেশ করিয়া আসন জুড়িয়া বসিতে পারে না। আমরা আজকালি যাহাদের নকল করিয়া ঘর তৈরি করি ও ঘর সাজাই, নিজের প্রণালীমত তাহাদেরও সমাজ আছে এবং তাহাদের সামাজিকতাও বহুব্যাপ্ত। আমাদের মুস্কিল এই দেখিতেছি, নিজেদের সামাজিক পদ্ধতি ভাঙিয়াছে, সাহেবী সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় নাই—মাঝে হইতে প্রত্যেক ঘর নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে। আজকাল কাজের জন্য দেশহিতের জন্য দশজনকে লইয়া আমরা সভা করিয়া থাকি—কিন্তু কিছুর জন্য নহে, শুদ্ধমাত্র দশজনের জন্যই দশজনকে লইয়া জমাইয়া বসা—মানুষকে ভাল লাগে বলিয়াই মানুষকে একত্র করিবার নানা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করা—এ এখনকার দিনে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এত বড় সামাজিক কৃপণতার মত কুশ্রী জিনিষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য তখনকার

দিনে যাঁহারা প্রাণখোলা হাসির ধ্বনিতে প্রত্যহ সংসারের ভার হাল্কা করিয়া রাখিয়াছিলেন—আজকের দিনে তাঁহাদিগকে আর-কোনো দেশের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।

বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ জুটিয়াছিল। ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম, এ। সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। বায়রন্ এবং শেক্সপীয়রের রসে তিনি আগাগোড়া রসিয়া উঠিয়াছিলেন। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদকর্ত্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রাম বসু, নিধু বাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনোপ্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক বই হউক বৈধ অবৈধ যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন তাহাকে অজস্র টপাটপ্ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন। আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ করিতে ইঁহার কোনো বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এইসকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্ন পত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত সে দিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। "উদাসিনী" নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।

সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয় বাবুর সেই অপর্য্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।

সাহিত্যে যেমন তাঁর ঔদার্য্য বন্ধুত্বেও তেমনি। অপরিচিত সভায় তিনি ডাঙায় তোলা মাছের মত ছিলেন, কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে তিনি বয়স বা বিদ্যাবুদ্ধির কোনো বাছ-বিচার করিতেন না। বালকদের দলে তিনি বালক ছিলেন। দাদাদের সভা হইতে যখন অনেক রাত্রে তিনি বিদায় লইতেন তখন কতদিন আমি তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিয়া আমাদের ইস্কুল ঘরে টানিয়া আনিয়াছি। সেখানেও রেড়ির তেলের মিট্মিটে আলোতে আমাদের পড়িবার টেবিলের উপর বসিয়া সভা জমাইয়া তুলিতে তাঁহার কোনো কুণ্ঠা ছিল না। এমনি করিয়া তাঁহার কাছে কত ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তাঁহাকে লইয়া কত তর্ক বিতর্ক আলোচনা সমালোচনা করিয়াছি। নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্য্যাপ্ত প্রশংসালাভ করিয়াছি।

গীতচর্চ্চা।

সাহিত্যের শিক্ষায় ভাবের চর্চ্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম—তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।

তিনি আমাকে খুব একটা বড় রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সঙ্কোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না—সে জন্য হয়ত কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল।

সে সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত। প্রবল পক্ষেরা সর্ব্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার লইয়া খোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে—কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়ের দ্বারাই সদ্ব্যয়ের যে শিক্ষা হয় তাহাই খাঁটি শিক্ষা। অন্তত আমি একথা জোর করিয়া বলিতে পারি—স্বাধীনতার দ্বারা যেটুকু উৎপাত ঘটিয়াছে তাহাতে আমাকে উৎপাতনিবারণের পন্থাতেই পৌঁছাইয়া দিয়াছে। শাসনের দ্বারা পীড়নের দ্বারা কান-মলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা আমাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ভালমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি যে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি তত ভয় করি না ভাল করিয়া তুলিবার উপদ্রবকে যত ডরাই—ধর্ম্মনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্যুনিটিভ পুলিসের পায়ে আমি গড় করি—ইহাতে যে দাসত্বের সৃষ্টি করে তাহার মত বালাই জগতে আর কিছুই নাই।

এক সময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলি-নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর বর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয় বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চ্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে শিক্ষা পাকা হয় নাই। সঙ্গীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।

জ্যোতিদাদার পিয়ানো যন্ত্র যখন খুব চলিতেছে সেই সময়ে সেই উৎসাহেই কতক তাঁহার সুরে কতক হিন্দি গানের সুরে বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলাম। তখন এই নাটক লিখিবার একটি উপলক্ষ্য ঘটিয়াছিল। বৎসরে একবার দেশের সমস্ত সাহিত্যিকগণকে একত্র করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের বাড়ীতে "বিদ্বজ্জনসমাগম" নামক এক সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সম্মিলন উপলক্ষ্যে গান বাজনা, আবৃত্তি ও আহারাদি হইত।

দ্বিতীয় বৎসর দাদারা এই সম্মিলনে একটি নাট্যাভিনয় করিবার ইচ্ছা করিলেন। কোন্ বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিলে এই সভার উপযুক্ত হইবে তাহারই আলোচনাকালে দস্যু রত্নাকরের কবি হইবার কাহিনীই সকলের চেয়ে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। ইহার কিছু পূর্ব্বেই আর্য্যদর্শনে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সঙ্গীত বাহির হইয়া আমাদের সকলকেই মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এই কাব্যে বাল্মীকির কাহিনী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহারই সঙ্গে দস্যু রত্নাকরের বিবরণ জড়াইয়া দিয়া এই নাটকের গল্পটা একরূপ খাড়া হইল। তাহার পর জ্যোতিদাদা বাজাইতে লাগিলেন আমি গান তৈরি করিতে লাগিলাম। অক্ষয় বাবুও মাঝে মাঝে যোগ দিলেন। অক্ষয় বাবুর রচিত দুই তিনটা গান বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে আছে।

তেতালার ছাদের উপর পাল খাটাইয়া ষ্টেজ্ বাঁধিয়া বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় হইল। আমি সাজিয়াছিলাম বাল্মীকি। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল। বাল্মীকি-প্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়াছে। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন—অভিনয়মঞ্চ হইতে আমি তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাইলাম না কিন্তু শুনিতে পাইলাম তিনি খুসি হইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাশ্মীর ও কাশ্মীরী

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

(মডার্ণ রিভিয়ু হইতে সঙ্কলিত)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা মুখ্যতঃ কাশ্মীর-পথের দৃশ্যশোভার বর্ণনা করিয়াছি। বর্ত্তমানে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

হাঁজি।

কাশ্মীরের অধিবাসী বলিলে সর্ব্বাগ্রে হাঁজিশ্রেণীর কাশ্মীরীগণের কথাই স্মরণ হয়। সংখ্যায় অল্প হইলেও প্রাধান্য ও কার্য্যপটুতায় ইহারাই নগরের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীনগরে উপস্থিত হওয়ামাত্র সর্ব্বপ্রথম এই জাতীয় নাগরিকগণের সহিতই পথিকের সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা এবং কাশ্মীরে ইহারাই প্রবাসীর প্রধান আশ্রয়দাতা।

চিনারবাগ, আমীরকাডাল প্রভৃতি স্থলে এবং রাজধানীর তৃতীয় সেতুর সন্নিকটে ইহাদের প্রধান আড্ডা। যাত্রিগণ প্রধানতঃ ঐসকল স্থানে ইহাদের নিকট হইতে বজরা ভাড়া লইয়া অবস্থান করেন। রাজধানীতে ইংরেজদের বিশ্রামস্থলস্বরূপ নাইডুর হোটেল নামে একটিমাত্র হোটেল আছে, তাহা প্রায় সময়েই সাহেব-যাত্রীর কোলাহলে মুখরিত থাকে। চিনারবাগ সুবৃহৎ-চিনারবৃক্ষ-পরিশোভিত রম্যস্থান; আমীরকাডাল ইহারই এক মাইল দূরবর্ত্তী ঝিলামের প্রথম সেতুর সংলগ্ন। ভদ্র প্রবাসীর অধিকাংশই এই দুই স্থলে বাস করিয়া থাকেন। রাজধানীর তৃতীয় সেতু প্রধানতঃ অসাধু লোকেরই আশ্রয়স্থল।

সামাজিক অবস্থায় হাঁজিগণ এদেশের মাঝিদের তুল্য, উভয়ের ব্যবসায়ও অভিন্ন। তবে মাঝিদের তুলনায় হাঁজিগণ কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধিশালী এবং কাশ্মীর রাজ্যের খাদ্যাদি সরবরাহ ও সর্ব্বপ্রকার যানের ভার ইহাদেরই হস্তে ন্যস্ত। সুতরাং কার্য্যকারিতায় কাশ্মীরে ইহাদের স্থান কাহারও তুলনায় হীন নহে। জাতি হিসাবে একদিকে ইহারা ব্যবসায়ী বা শ্রমজীবী মুসলমানের তুল্য, অন্যদিকে শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণগণের অনুরূপ। হিন্দু মুসলমানের সামঞ্জস্যের এহেন প্রকৃষ্ট নিদর্শন একমাত্র কাশ্মীরেই বর্ত্তমান।

চিনার বাগ- অবিবাহিত য়ুরোপীয় পর্য্যটকদিগের জন্য স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত।

প্রাচীনকালে হাঁজিগণ বৈদিকমতের হিন্দু ছিল। সমাজেও তখন ইহারা হিন্দু নামেই পরিচিত ছিল। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ তাতারদেশ হইতে কাশ্মীরে আগমন করে এবং কালক্রমে আচারব্যবহারে, ধর্ম্মেকর্ম্মে তত্রত্য আর্য্যজাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া পড়ে। হিন্দুমুসলমানের এই সংমিশ্রণের ফলই—হাঁজি। ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই বিশেষত্বব্যঞ্জক। আচারব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতিতেও ইহারা ইদানীং অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

বিগত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাশ্মীরে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রচলন হয়। ঐ সময়ে হাঁজিগণ হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহাদের অবলম্বিত ধর্ম্ম প্রচলিত ইসলামধর্ম্ম অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন; আচারব্যবহারেও ইহারা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে হিন্দুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। অধিকন্তু ইহাদের নিজস্ব কতকগুলি কুঅভ্যাস আছে। এইসকল

তৃতীয় সেতু ও শিকারা নৌকা, যাহাতে চড়িয়া পর্য্যটকেরা দৃশ্য দেখিয়া বেড়ায়
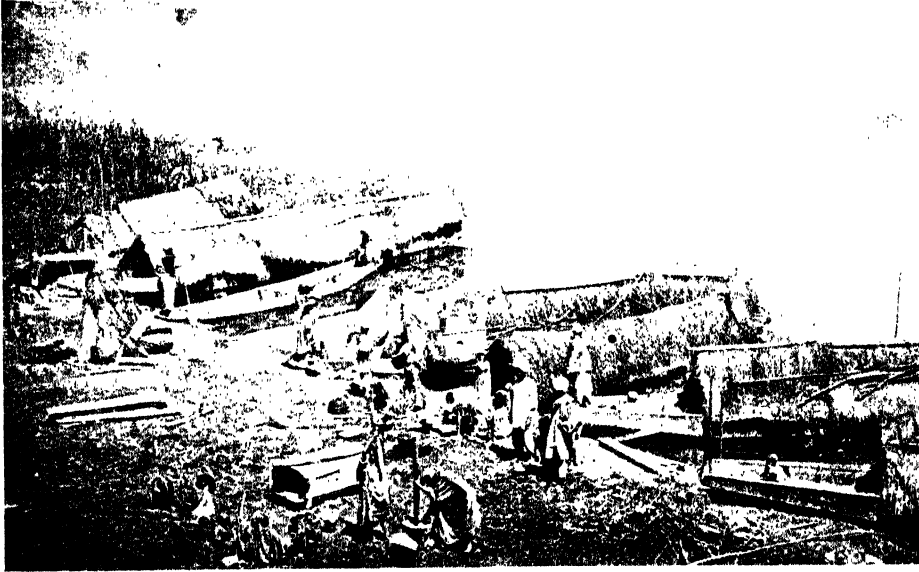
শ্রমজীবী হাঁজি পল্লী।

কারণে ইহাদিগকে হিন্দুমুসলমানের সংমিশ্রণজাত শঙ্কর-জাতিবিশেষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ব্যবসায়ভেদে হাঁজিগণ (১) শালীওয়ালা হাঁজি, (২) শ্রমজীবী হাঁজি, (৩) কর্ম্মজীবী হাঁজি ও (৪) বজরাওয়ালা হাঁজি—এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

(১) শালীওয়ালা হাঁজি।

ইহাদের মধ্যে কার্য্যকারিতায় শালীওয়ালা হাঁজিগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা নদীপথে রাজ্যের অভ্যন্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শালী বা ধান্য সংগ্রহ করে এবং বন্দরবাসী নাগরিকগণের নিকট তাহা বিক্রয় করে। কোনদিন

কর্ম্মজীবী হাঁজি পল্লী।

ডাঙায় বাস করা ইহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই—জলপথে ডোঙার উপরই ইহাদের সমগ্রজীবন কাটিয়া যায় এবং জন্মমৃত্যুকে সঙ্গী করিয়া উহার উপরই চিরদিনের বাস্তভিটা গড়িয়া লয়। ডোঙার এক পার্শ্বে আপনারা অবস্থান করে, অপর পার্শ্বে গোলা ভরিয়া শালীধান্য মজুত করিয়া রাখে। অনেক সময়ে উহার মধ্যে আবার গরু, টাটু, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুরও স্থান হইয়া থাকে।

(২) শ্রমজীবী হাঁজি।

কাশ্মীর রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্রই এই সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে ইহাদের প্রধান আড্ডাও আছে। সিন্ধনালার তটবর্ত্তী গান্ধারবল নামক স্থানের আড্ডাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই স্থান যেমন নির্জ্জন, তেমনি দৃশ্যশোভায় মনোরম। এই গান্ধারবলে এই সম্প্রদায়ের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রও প্রতিষ্ঠিত। আড্ডাসমূহে ইহারা পুরুষানুক্রমে খড়ের ছাউনীবিশিষ্ট বৃহৎ নৌকায় বাস করিয়া থাকে।

শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের স্ত্রী হাঁজিগণ কাটুনা কাটা, ধান-ভানা ও গৃহস্থালী কর্ম্মে নিপুণ। বাহিরের কার্য্যেও ইহারা পুরুষের প্রধান সহায়। অনাবশ্যক সঙ্কোচ ইহাদিগকে কোন দিন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া রাখিতে পারে নাই।

শ্রমজীবী হাঁজিগণ গান্ধারবলের নদীখালে একটি অদ্ভুত ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহাকে মৎস্য ধরা বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই কার্য্যের জন্য প্রাতঃ ৯টায় আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক ইহারা স্বামী স্ত্রী একত্র হইয়া নৌকাযোগে জলপথে বাহির হয় এবং স্রোতের মুখে জাল পাতিয়া জলের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করে। এই কার্য্যে প্রত্যহ ৫।৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া ইহারা যে ফল পায়, আর্থিক হিসাবে তাহার মূল্য চারি পাঁচ আনার অধিক নহে। অধিকন্তু কেবলমাত্র গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অন্য ঋতুতে এই ব্যবসায় পরিচালনার সুবিধা না থাকায় ইহা লাভজনক বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। তবে কাশ্মীরে খাদ্যাদি সুলভ বলিয়া এই স্বল্প উপার্জ্জনও ইহাদের সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট।

শালীওয়ালা হাঁজি পল্লী।

(৩) কর্ম্মজীবী হাঁজি।

নানাবিধ কর্ম্ম করাই এই সম্প্রদায়ের পেশা। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নানাস্থানে ঘুরিয়া মজুরী খাটিয়া, কেহ জিনিসাদি ফিরী করিয়া, কেহ বা শাকসবজী ও ঘাস বিক্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য ইহারা প্রায়ই বৃহৎ শহর ও পল্লীর মধ্যে অথবা সন্নিকটে বাস করে।

রাজকার্য্যে নৌকা চালাইবার জন্য আবশ্যকমত ইহাদিগকে বেগার লওয়া হয়। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে ইহারা জনসাধারণের নৌকা চালাইবার কার্য্যও করিয়া থাকে।

হ্রদ হইতে ঘাস সংগ্রহ করা ও খাদ হইতে পাথর কাটিয়া আনাও ইহাদের একতম ব্যবসায়। এই ব্যবসায়ের ভার প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের হস্তে ন্যস্ত।

(৪) শিকারাওয়ালা হাঁজি।

আকৃতিতে ইহারা বজরাওয়ালা হাঁজিদের তুল্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি বিভিন্ন উপসম্প্রদায়। সমগ্র হাঁজিজাতির মধ্যে কেবলমাত্র এই সম্প্রদায়ই 'স্থলচর'। ইহারা প্রধানতঃ শহরেই বাস করে। শিকারা বা ক্ষুদ্র নৌকায় যাত্রী লইয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া এবং নদী বা হ্রদের দৃশ্য দেখানোই ইহাদের কাজ।

আমীরকাডাল ইহাদের প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র। এই স্থানে ঝিলাম নদে শিকারা লইয়া ইহারা যাত্রীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকে।

হাঁজিজাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া শিকারাওয়ালা হাঁজি বড়াই করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ বড়াইয়ের কোন মূল্য নাই। হাঁজিজাতির প্রত্যেক

হাঁজি—কাশ্মীরা নৌকা-ওয়ালা।

হাঁজি রমণীর ধান-ভানা।

সম্প্রদায়ই অন্যান্য সম্প্রদায়কে হীন প্রতিপন্ন করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুৎসুক।

(৫) বজরাওয়ালা হাঁজি।

ইহাদের নিকট হইতে যাত্রিগণকে বজরা বা নৌগৃহ ভাড়া লইতে হয়। ইহাদের বজরাগুলি অনেকাংশে সরাইয়ের তুল্য এবং ইহারা নিজেরা সরাইস্বামীর অনুরূপ। হাঁজিজাতির মধ্যে প্রাধান্য ও সমৃদ্ধিতে এই সম্প্রদায়ই শ্রেষ্ঠতম।

ইহাদের নৌগৃহগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত। প্রত্যেক নৌগৃহই বহুপ্রকোষ্ঠবিশিষ্ট, সুসজ্জিত ও পরিষ্কৃত। প্রায় প্রত্যেক নৌগৃহের সঙ্গে সঙ্গেই খড়ের ছাউনীযুক্ত এক একখানি ডোঙা থাকে। উহার অর্দ্ধাংশ বজরাবাসীর রন্ধনশালা ও ভৃত্যবাসরূপে ব্যবহৃত হয়, অপরার্দ্ধে বজরাস্বামী সপরিবারে বাস করে।

অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করিলে বজরার সঙ্গে বজরাস্বামী ও তাহার পরিজনকেও ভৃত্যস্বরূপ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ একখানি বজরার ভাড়া ৩০৲ হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত হইতে পারে। ডোঙার ভাড়া অতিরিক্ত ১৫৲ টাকা। ডোঙাসমেত একখানি ক্ষুদ্র বজরা ৩৫৲+১৫৲=৫০৲ টাকায় ভাড়া পাওয়া যায়। বজরার মালিকগণ প্রধানতঃ শিকারা চালাইবার জন্য নিয়োজিত থাকিলেও, ঐ ভাড়ার মধ্যে তাহাদের পক্ষের তিনজন হাঁজিকেও ফরমাস খাটানোর অধিকার পাওয়া যায়। একস্থান হইতে অন্যস্থানে বজরা চালাইবার সময় অতিরিক্ত মাঝি নিযুক্ত করিতে হয়।

ভাড়া অপেক্ষা বক্‌সিস ও প্রবঞ্চনাজাত আয়ের উপরই এই সম্প্রদায়ের দৃষ্টি বেশি। যাত্রীর নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতে ইহারা বিশেষ মজবুত। এই জন্য ইহাদের অসাধ্য কোন কর্ম্ম দুনিয়ায় নাই।

হাঁজি রমণীর জ্বালানি সংগ্রহ।

যুবক হাঁজিগণ যাত্রীর বেহারা বা ভাণ্ডারীর কার্য্য করিয়া থাকে। যুবতীগণ অনেক সময়ে সাহেবদের রক্ষিতা রূপে জীবন উৎসর্গ করে। অর্থই ইহাদের প্রধান কাম্য বস্তু; এই অর্থের লোভে ইহারা সাহেবদের বশীভূত হইয়া নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

হাঁজিজাতির মধ্যে সুন্দরীর অভাব নাই। যেসকল হাঁজি মজুরী খাটিয়া, ফিরী করিয়া বা নৌকা বাহিয়া দিন যাপন করে, তাহাদেরও ঘরে অপ্সরীতুল্য রূপসী দৃষ্ট হয়। এই রূপসীগণের জীবনের অধিকাংশ সময়ই স্বামীর কার্য্যের সাহায্যে ও ধানভানায় ব্যয়িত হয়। ভাতই কাশ্মীরীর প্রধান খাদ্য, সুতরাং ধানভানা রমণীগণের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য।

কুমারী হাঁজিগণ শ্রেণীবদ্ধ বেণী রচনাপূর্ব্বক কেশসংস্কার করে এবং মস্তকে পাতলা কাপড়ের "কৌস্তি টুপী" ব্যবহার করে। এই দুইটী চিহ্নই রমণীগণের কৌমার্য্যের লক্ষণ।

হাঁজিদের সামাজিক প্রথা।

পরিবারের মধ্যে কেহ গর্ভবতী হইলে হাঁজিগণ তাহাকে

হাঁজি বধূ।

কতকগুলি মন্ত্রপূত তাবিজ ও কবচ পরাইয়া দেয়। ইহাদের বিশ্বাস, উহা ধারণ করিলে প্রসূতির অপদেবতার ভয় থাকে না এবং প্রসব ক্রিয়া সহজে ও নিরাপদে সম্পন্ন হয়।

জন্মমাত্রই সন্তানের সর্ব্বশরীর জলদ্বারা ধৌত করিয়া 'বাং'-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। এই জন্য পরিবারস্থ কোন পুরুষ শিশুকে কোলে লইয়া তাহার কর্ণধারণ পূর্ব্বক একপ্রকার প্রার্থনা-মন্ত্র আবৃত্তি করে। এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শিশুর জাতসংস্কার করার নামই 'বাং'-ক্রিয়া। হাঁজি শিশুগণের পক্ষে ইহাই প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান। ইহার পর তৃতীয় দিবসে 'সোন্দার'-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে প্রসূতি ও সন্তানের মলমূত্র ও আঁতুরঘরের আবর্জ্জনা চাউলের গুঁড়ি ও মাংসের সহিত মিশ্রিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই অনুষ্ঠানে সন্তানের লোভ ও রোদন নিবৃত্ত হয় বলিয়াই হাঁজিদের ধারণা।

ছয় হইতে বারো মাস বয়ঃক্রমের মধ্যে শিশু সন্তানের 'চুলফেলা'-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে কাহারও চুল একেবারে মুড়াইয়া দেওয়া হয়, কাহারও বা মস্তকের শীর্ষভাগে এক গোছা চুল রাখিয়া অবশিষ্টাংশ কামাইয়া ফেলা হয়। এই ক্রিয়ার পর শিশুকে কুৎসিতের একশেষ দেখায়। একে তো নেড়া মাথা, তার উপর পাতলা কাপড়ের 'কৌস্তি টুপী', পরিধানেও অতি ময়লা জীর্ণবস্ত্র—শিশুর তখনকার চেহারা দর্শকমাত্রেরই হাস্য উদ্রেক করে।

তিন বৎসর বয়সের পর প্রত্যেক শিশু সন্তানকে হাঁজি-শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য একটী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এতদুপলক্ষে গৃহস্বামী একটী বৃহৎ ভোজের আয়োজন করে। সাধারণতঃ ভাত, মিঠাই ও চা দ্বারা ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দরিদ্রের পক্ষে কুল্‌চা ও বাখরখানিই এক্ষেত্রে সর্ব্বস্ব। এই উৎসবের পরই শিশুদের 'খৎনা' বা 'মুসলমানী' হইয়া থাকে।

বিবাহ।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায় হাঁজিগণও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বিবাহকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করে। সাধারণতঃ বারো বৎসর বয়সের পর ছেলেদের বিবাহ হয়। ধনীর পক্ষে অবশ্য এ নিয়ম প্রতিপাল্য নহে—তাহারা শৈশবেই ছেলের বিবাহ দিয়া থাকে।

হাঁজি বজরা-ওয়ালী।

বিবাহ কার্য্যে বেহাইর বংশমর্য্যাদার প্রতিই হাঁজিদের দৃষ্টি বেশি। সম্বন্ধ পাত্রের পক্ষ হইতে প্রথমতঃ উত্থাপিত হয় এবং কথাবার্ত্তা ঘটকের মধ্যস্থতায় স্থির হয়। হাঁজিদের ঘটকগণ এদেশের ঘটকেরই মত কুলতত্ত্ববিশারদ। পাত্রীর

হাঁজি রমণীর বেণীবন্ধন।

গৃহে উপস্থিত হইয়াই ইহারা কুলের বিচার আরম্ভ করে এবং স্বপক্ষের কুলমহিমা কীর্ত্তন করিয়া পাত্রীর পিতার মন আকর্ষণে চেষ্টা করে। অনেক সময়ে এই কুলবর্ণনার প্রসঙ্গে ইহারা পাত্রের রূপগুণের পরিচয় দিয়া পাত্রীর মন ভুলাইতেও সমর্থ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রী আপনারাই আপনাদের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া রাখে, কেবলমাত্র সামাজিক প্রথার অনুরোধে একবার ঘটকের দ্বারা অভি-

ভাবকের নিকট কথা উত্থাপনের আবশ্যক হয়। বয়স্ক হাঁজিগণ নিজেরাই নিজেদের সম্বন্ধ স্থির করে।

বিবাহে পাত্রীপক্ষের সম্মতি পাইলে পাত্রপক্ষ 'পাকা দেখিতে' যায়। এই উপলক্ষে পাত্রপক্ষকে একপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইতে হয়। এই পিষ্টকের ব্যাস ৩ হইতে ৫ ইঞ্চি পরিমিত এবং ইহার উপরে নানাবিধ পশু পক্ষী ও উদ্ভিদের চিত্র অঙ্কিত থাকে। পাত্রপক্ষ উল্লিখিত পিষ্টক এবং মিঠাই, ফল, ইক্ষু, লবণ ও চা সঙ্গে লইয়া পাত্রীর গৃহে উপস্থিত হইলে পাত্রীর পিতা উহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া একটী ভোজ দেয়। ইহার পর 'পাকাদেখা' ও বিবাহের দিন স্থির হয়। কাহারও কাহারও পক্ষে বিবাহের দিন ৩।৪ বৎসর পরেও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সামাজিক নিয়মানুসারে পাত্রপক্ষকে পাত্রীর পিতাকে যে ২০।২৫৲ পণ দিতে হয় তাহা সংগ্রহ করিবার জন্যই অনেকে এতদিন সময় লইয়া থাকে। কোন কোন চতুর বেহাই 'পাকাদেখা'র সময়েই মোল্লা ডাকিয়া 'নিকা'-মন্ত্র পড়াইয়া পাত্রপাত্রীর ভবিষ্য বিবাহের বন্দোবস্তটী পাকা করিয়া রাখে। বস্তুতঃ হাঁজিদের বিবাহ 'পাকাদেখা'র দিনই একরূপ সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ দিন হইতেই উভয় বেহাই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হয় এবং পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে পরস্পর পরস্পরকে তত্ত্ব পাঠাইতে থাকে।

বিবাহের ৪।৫ দিন পূর্ব্বে পাত্রীর অভিভাবক পাত্রের বাড়ী আসিয়া পণের টাকা লইয়া যায়। ঐ সময়ে বিবাহের 'লগন-চির'ও স্থির হয়।

বিবাহক্রিয়া পাত্রীর বাড়ীতে সম্পন্ন হয়। বিবাহের দিন পাত্র বরযাত্র সমভিব্যাহারে মিছিল করিয়া নৌকায় বা অশ্বপৃষ্ঠে শ্বশুরবাড়ী গমন করে। পাত্রীর পিতা মহা সমাদরে পাত্রকে বরণ করিয়া লইয়া উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করে। বলা বাহুল্য, সেদিন বিবাহ বাড়ীতে 'ইতরজনে'র 'মিষ্টান্ন' ভোজে কোন বাধা হয় না।

হাঁজিসমাজে সৌন্দর্য্য পাত্রীর প্রধান গুণ বলিয়া স্বীকৃত। সুখের বিষয়, ইহারা এখনও 'পণের দরে' এই সৌন্দর্য্যের পরিমাণ করিতে শিখে নাই।

বর্ত্তমানে অনেক হাঁজি পিতামাতা পাত্রপাত্রীর স্বেচ্ছা-বিবাহের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে—বংশমর্য্যাদা এখন আর অনেকের ঘরে কল্‌কে পায় না।

দাম্পত্য প্রেম।

দাম্পত্য প্রেমে হাঁজিদম্পতী পৃথিবীর সভ্যজাতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক অনুরাগ এত প্রবল যে একের সম্মানের জন্য অন্যে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত। এ সম্বন্ধে একটী প্রত্যক্ষীভূত দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। একসময়ে কোন এক হাঁজি-পরিবারের পুত্রবধূ পিত্রালয়ে যাইয়া ওয়াদার বেশী ২।৩ দিন অপেক্ষা করে। ইহাতে শ্বশুরশাশুড়ী একান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া পুত্রবধূকে জোর করিয়া গৃহে লইয়া আসে এবং অবশেষে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করে। পুত্রবধূটী দেখিতে বড় সুশ্রী নহে, বিশেষতঃ বয়সেও তখন ভাঁটা পড়িয়াছে—সুতরাং ইহাকে তাড়াইবার জন্য পুত্রের মতের অপেক্ষা করা বৃদ্ধদম্পতীর নিকট সমীচীন বোধ হয় নাই। কিন্তু ঘটনা যখন পুত্রের কর্ণে প্রবেশ করিল তখন সে স্ত্রীর সঙ্গে নিজেও গৃহত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। বেগতিক দেখিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা তখন সোজা পথ অবলম্বন করিল। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এরূপ অনুরাগের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

হাঁজিদের নৈতিক চরিত্র।

নৈতিক চরিত্রে হাঁজিজাতির মধ্যে বজরাওয়ালা ও শিকারাওয়ালা হাঁজিগণ অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। সাধুতা, সততা ও সতীত্বের সহিত ইহাদের অনেকের আদৌ সম্পর্ক নাই। একটিমাত্র পয়সার লোভে অনেকে গণ্ডা গণ্ডা মিথ্যাকথা বলিতে কিংবা সতীত্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পরাঙ্মুখ নহে। অনেক সময় অর্থের লোভ দেখাইয়া সাহেবেরাই ইহাদের সর্ব্বনাশ করে; অথচ তাহারাই আবার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া এই জাতির কুৎসা রটাইয়া বেড়ায়! প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরে বিদেশী যাত্রিগণের গতিবিধির সঙ্গে সঙ্গেই এই জাতির চরিত্রহীনতা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। হাঁজিগণ বলে, দারিদ্র্যই এই নৈতিক অবনতির কারণ। এ কথা সত্য হইলে, অর্থের লোভ দেখাইয়া এ জাতিকে পাপকার্য্যে প্ররোচিত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ইহাদের মধ্যে

সতীসাধ্বী যে একেবারেই নাই এমন কথা বলা যায় না। কাশ্মীর-যাত্রিগণ একটু যত্ন করিয়া ইহাদিগকে সৎপথে চালাইতে চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে এই জাতির মধ্যে অনেক আদর্শ সতীর উদ্ভব হইতে পারে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

(De La Mazeliereর নবপ্রকাশিত ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি)

৩

নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ।—ট্র্যাজিডি।—চণ্ডকৌশিক।—কালিদাস ও ভবভূতির রচনা।—মিশ্ররসের নাটক ও আচরণঘটিত নাটক।—মৃচ্ছকটিক—মালবিকা ও অগ্নিমিত্র।—মালতী ও মাধব।—হিন্দু নাট্যের অবনতি।

ভাটদিগের গাথায় মহাকাব্য ছাড়া আর এক জাতীয় কাব্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভাটদিগের কথকতায়, কথার সঙ্গে সঙ্গে গীত, নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গীর অভিনয়ও থাকিত। গীতমিশ্রিত নৃত্য ক্রমে ধর্ম্মনাট্যে রূপান্তরিত হইল। এই সকল ধর্ম্মনাট্য তীর্থযাত্রার উপলক্ষে, মন্দিরপ্রাঙ্গণে অভিনীত হইত। কালক্রমে, উহার মধ্য হইতে নৃত্য গীত বিলুপ্ত হইল; এবং গ্রীশদেশের প্রভাববশে প্রকৃত নাট্যকলা গড়িয়া উঠিল। নাটকের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ হইল।

❁

ট্র্যাজিডি।

গোড়ায়, যে সকল বিষয় নিছক্ ধর্ম্মঘটিত, সেই সকল বিষয় লইয়া তৎকালীন সমাজের তরুণ অবস্থার অনুরূপ নিতান্ত স্থূল ও অনিপুণ ধরণে নাটক রচিত হয়। চণ্ড-কৌশিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মতবাদসকল অদ্ভুতরূপে মিশ্রিত হইয়াছে। গোড়ার ভাবটা সমস্তই ব্রাহ্মণ্যিক-তপস্যার অতুল প্রভাব। একজন রাজা পথহারা হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি রমণীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন; তিনি সেইখানে দ্রুতপদে গমন করিলেন। তাপস কৌশিক যে ত্রিবিদ্যাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, উহা সেই ত্রিবিদ্যাদিগের কণ্ঠস্বর। ত্রিবিদ্যা মুক্ত হইয়া পলায়ন করিল, ব্রাহ্মণ রাজাকে অভিসম্পাত করিল। রাজা স্বকীয় ধনঐশ্বর্য্য, এমন কি রাজ্যের বিনিময়ে তাহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। কৌশিক সে সমস্ত ছাড়া আরও দক্ষিণা চাহিলেন। সর্ব্বস্বান্ত রাজা কোথা হইতে দক্ষিণা সংগ্রহ করিবেন? তিনি আপনাকে বিক্রয় করিলেন, স্বকীয় পত্নীকে বিক্রয় করিলেন, শিশু পুত্রটিকেও বিক্রয় করিলেন।

এরূপ নিষ্ঠুর কাহিনীকে বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীকার করে না। রাজা, ভগবান ধর্ম্মকে লাভ করিতে চাহেন। (বৌদ্ধধর্ম্মও মূর্ত্তিমান ধর্ম্মনামে অভিহিত) শিব ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাণীকে ও রাজকুমারকে ক্রয় করিলেন। দেবতারা কেবল রাজার ধর্ম্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করিতে চাহেন।

ধর্ম্ম চণ্ডালের রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার দাসকে শ্মশান-কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। রাত্রিসমাগমে ভূত প্রেতগণ রাজাকে আক্রমণ করিল। প্রভাতে একটি মৃত শিশুকে বহন করিয়া একটি রমণী রাজার নিকটে আসিল। ...তাঁহার নিজ পত্নী! তাঁহার নিজ পুত্র! রাজা মূর্চ্ছিত হইলেন; চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে, তিনি অনেক্ষণ ধরিয়া স্বকীয় পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন:—

"হায় আমি কি হতভাগ্য! এর শৈশবের দন্তোদ্গমের সময়টা আমার মনে পড়চে।

মঙ্গল গুগ্‌গুল দিয়া রচিত হইত এর
আলুলিত সূক্ষ্ম জটাবলি;
মুখটি শোভিত যেন মধুপ-দলিত পদ্ম
—এবে সেই দ্যুতি গেছে চলি॥

......হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র! এখনও যখন এই দগ্ধপ্রাণ বিসর্জন করচিস্ নে, তবে কি আত্মঘাতীর নরক হতে আপনাকে রক্ষা করতে ইচ্ছা করচিস্?—ধিক!......

রাণী।—হা ধিক্! হা ধিক্! মরণের মহোৎসবে মুগ্ধ হয়ে আমি আমার দাসত্বও বিস্মৃত হয়েচি। তা হলে জন্মান্তরেও যে আর আমি এই দাসত্ব হতে মুক্ত হব না। ভগবন্! আমার পতিকেও যে তা হলে আর পাব না। এখন তবে কিছুকালের জন্য এই দশাবিপর্য্যয় সহ্য করি।"

কিন্তু ঐ দেখ আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতেছে। যিনি অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন নেপথ্য হইতে সেই রাজার মহিমা কীর্ত্তন হইতেছে। ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া ঐ হতভাগ্য রাজদম্পতীকে মুক্তিদান করিলেন, রাজ্য ও পুত্র প্রত্যর্পণ করিলেন। পুত্রটি চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে, পুত্রের পিতা ভাস্বর রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে যাত্রা করিবেন। ঐ দেখ, সৌভাগ্যলাভ করিবার পূর্ব্বে রাজা স্বকীয় প্রজাগণের উদ্ধারকল্পে আপনার পুণ্যরাশি উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।(১)

---

(১) চণ্ডকৌশিক (ক্ষেমেশ্বর প্রণীত) Ludwig Fritzeর জর্ম্মাণ অনুবাদ।

যখন সমৃদ্ধি ও শান্তি লোকের চরিত্রে কোমলতা আনয়ন করিল, তখন উক্ত প্রকারের নাট্যবিষয়গুলি বর্ব্বরতাদুষ্ট বলিয়া মনে হইল। তখন ট্রাজেডি, রাজাদের মহিমা ও তাঁহাদের মার্জ্জিত ভোগ-বিলাসের কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ধর্ম্মনাটকের আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, কেবল এইটুকু মাত্র রহিল যে, মধ্যে মধ্যে দেবতাদের মধ্যবর্ত্তিতায় ধর্ম্ম-নাটকের ন্যায় লৌকিক নাটকেও লোকের ভক্তির উদ্রেক করা হইত।

কালিদাসের নাটক প্রেমের জয় ঘোষণা করিল।

শকুন্তলা।—একজন রাজা, কোন এক তপোবনের সন্নিকটে, একটা হরিণকে অনুধাবন করিতেছিলেন। এই হরিণটি শকুন্তলা নামক কোন এক মুনিকন্যার। রাজা শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইলেন, তাহাকে বিবাহ করিলেন। শকুন্তলা গর্ভবতী হইল। পরে কোন অনিবার্য্য রাজকার্য্যের উপলক্ষে রাজাকে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে হইল। তপোবনের তাপসেরা শকুন্তলাকে রাজার নিকট লইয়া গেল। কিন্তু হায়! শকুন্তলা প্রেমের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া একজন মুনিকে অভিবাদন করে নাই।

"রে অতিথি-অবমানিনি!

এমনি অনন্য মনে করিতেছ ধ্যান
কে আইল তপোধন নাহিক সে জ্ঞান?
যার ধ্যানে এইরূপ আছিস্ মগন,
কিছুতেই তোকে তার হবে না স্মরণ,
মনে করে' দিলে তবু পড়িবে না মনে,
ভুলে যথা পূর্ব্বকথা সুরাপায়ী জনে॥"

ফলতঃ রাজার স্মৃতিলোপ হইল; তাঁহার ধর্ম্মপত্নী রাজ-প্রাসাদে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু রাজা, তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। শকুন্তলা নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া অপ্সরা-তীর্থে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বিবাহের সাক্ষীস্বরূপ যে অঙ্গুরীটি শকুন্তলা হারাইয়াছিলেন, একজন ধীবর তাহা পাইয়া রাজার নিকট আনিল। অমনি রাজার স্মৃতিনাশের শাপ মোচন হইল; স্মৃতি ফিরিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রেমও ফিরিয়া পাইলেন। শকুন্তলা কোথায় লুকাইয়া আছে? অনেক পরীক্ষার পর তবে দেবতারা দম্পতীর পুনর্মিলন ঘটাইলেন।

উর্ব্বশী।—একজন অপ্সরা কোন রাজার সঙ্গিনী হইবার উদ্দেশে স্বর্গধাম পরিত্যাগ করে। অবশ্য এইরূপ অপরাধ দণ্ডনীয়। উর্ব্বশী লতায় পরিণত হইল। প্রিয়তমাকে ডাকিয়া রাজা বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি পর্ব্বতদিগকে, স্রোতস্বিনীদিগকে, ভ্রমরকে, সম্বোধন করিয়া তাঁহার প্রিয়ার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

"প্রিয়াকে কি দেখিয়াছ তোমাদের বনে?
তাহার লক্ষণ বলি শোনো গো শ্রবণে।
আয়ত-লোচনা যথা তব সহচরী
আমার প্রেয়সী সেও এমনি সুন্দরী।"

কি! আমার কথায় অনাদর করে' ওর স্ত্রীর কাছেই রইল। বোঝা গেছে। দশাবিপর্য্যয় হলেই অপমানের পাত্র হতে হয়।"

নেপথ্য হইতে কোন অদৃশ্য পুরুষ একটি মণি তুলিয়া লইতে পরামর্শ দিল। একটা ফাটা পাষাণের ভিতর মণিটি প্রচ্ছন্ন ছিল। রাজা ঐ মণিটিকে লইয়া একটি লতার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"এই কুসুমহীন লতাটিকে দেখে কি জন্য আমার ওর উপর এত ভালবাসা হচ্চে? অথবা, ভালবাসবার কোন উপযুক্ত কারণ আছে—কেন না:—

মেঘ-জলে আর্দ্র দেখি পল্লব লতার
—অশ্রুজলে ধৌত যেন অধর প্রিয়ার।
লতাটি কুসুম-হীন
গেছে কাল পুষ্প ফুটিবার,
প্রিয়াও ভূষণ-হীন
না পরেন কোন অলঙ্কার।
তাঁহার চরণে পড়ি
কত আমি চাহিলাম মাপ,
তখন অগ্রাহ্য করি
এবে চণ্ডী করে অনুতাপ॥

প্রিয়ার অনুকারিণী এই লতাটিকে তবে প্রণয়ীভাবে আলিঙ্গন করি। (নিমীলিতাক্ষ হইয়া স্পর্শসুখের অভিনয়) উর্ব্বশীর গাত্রস্পর্শের মত আমার শরীরে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হচ্চে। তবু এখনও বিশ্বাস নেই। কেন না:—

প্রথমেতে প্রিয়া বলি'
যারে যারে করি নির্দ্ধারিত
—মুহূর্ত্তে হইল তারা
অন্যরূপে রূপান্তরিত।
এ মোর নয়ন দুটি
উন্মীলিত করিব না আর
স্পর্শি যারে প্রিয়া ভাবি'
—পাছে প্রিয়া না হয় আবার।

(ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া) একি! সত্যই যে প্রিয়তমা!

উর্ব্বশী।—মহারাজের জয় হোক্!......শুনুন মহারাজ,—ভগবান্ কার্ত্তিকেয় চিরকুমার ব্রত গ্রহণ করে' অকলুষ নামে গন্ধমাদনের এই প্রান্তরদেশে এসে বাস করেন। এবং সেই সময়ে এই নিয়ম স্থাপন করেন:—যে কোন রমণী এ প্রদেশে প্রবেশ করবে অমনি সে লতারূপে

পরিণত হবে—গৌরীচরণ-প্রসূত মণি বিনা আর তার উদ্ধার হবে না।(২)

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে জনসমাজ আরও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে:—কেবলি বিলাস বিভ্রম, হাব-ভাব, কুরুচি, আত্মতত্ত্ববিদ্যা, গুপ্তপ্রেমের অন্বেষণ, তথাপি আর একটি নাট্যকবির আবির্ভাব হইল যিনি কালিদাসের সমকক্ষ। তিনি ভবভূতি। তাঁহার প্রধান দুই নাটকে রামের জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

প্রথম নাটকটিতে রামায়ণ-কথাই বর্ণিত হইয়াছে। এই নাটকে দেখা যায়, হিন্দুজাতির কি পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! সমস্তই দিব্য অস্ত্র, এবং এরূপ শক্তিমান যে তাহাদের এক আঘাতেই মহাবীরগণ অচেতন হইয়া পড়িল। দেবতারা আবার তাঁহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে আরও শক্তিমান অস্ত্রসকল প্রদান করিলেন। কিন্তু কবির প্রতিভা লক্ষিত হয়—বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনায়, হৃদিস্থিত সূক্ষ্মভাবের বিশ্লেষণে, সুকুমার অনুভূতিসমূহে—এই গুণগুলি অবনতিগ্রস্ত সাহিত্যে সর্ব্বশেষে দেখা যায়।(৩)

ভবভূতি তাঁহার উত্তররামচরিতে এমন একটি বিষয় পাইলেন যাহা তাঁহার প্রতিভার উপযোগী।

সীতা অন্তঃসত্ত্বা। সীতা রাবণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল বলিয়া প্রজারা সন্দেহ করিতে লাগিল। তাহারা সীতাকে বনবাসে পাঠাইবার জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা করিল। বনবাসে গিয়া সীতা দুই যমজপুত্র প্রসব করিলেন। দেবতারা উহাদিগকে বাল্মীকির হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য উহাদিগকে হরণ করিলেন—সেই বাল্মীকি যিনি রামায়ণেরও গ্রন্থকার।

১৫ বৎসর পরে, রাম—তখনও প্রেমাসক্ত—গঙ্গার তটভূমির উপর একটি রঙ্গভূমি প্রস্তুত করাইলেন। সেই-খানে সীতার ইতিহাস অভিনীত হইবে। ঐ দেখ, পৃথ্বী ও ভাগীরথী—দুই দেবী কর্ত্তৃক পরিধৃত হইয়া স্বয়ং সীতা আবির্ভূত হইলেন। ঐ দুই দেবীর প্রত্যেকেরই ক্রোড়ে এক একটি সদ্যোজাত শিশু।

রাম।—ধর লক্ষ্মণ আমায় ধর! আমি যেন অকস্মাৎ অননুভূতপূর্ব্ব ঘোর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করচি।

দেবীদ্বয়।—(সীতার প্রতি)

"শান্ত হও সুকল্যাণি,
অদৃষ্ট হয়েছে এবে সুপ্রসন্ন তব।
জল-অভ্যন্তরে দেখ,
রঘুবংশ পুত্রদুটি করেছ প্রসব॥

সীতা। (আশ্বস্ত হইয়া) অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বটে—দুটি পুত্রসন্তান প্রসূত হয়েছে। হা নাথ!—(মূর্চ্ছা)...

পৃথিবী।—বৎসে! শান্ত হও! শান্ত হও!

সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া) ভগবতি! তোমরা দুজনে কে গো?

পৃথিবী।—ইনি তোমার শ্বশুরকুলদেবতা ভাগীরথী।

সীতা।—ভগবতি, তোমাকে নমস্কার।

ভাগীরথী। বৎসে! চরিত্র-সঞ্চিত কল্যাণসম্পদ লাভ কর।

লক্ষ্মণ।—দেবীর যথেষ্ট অনুগ্রহ।

ভাগীরথী।—ইনি তোমার জননী বসুন্ধরা।"

পরে দেবীদ্বয় প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তখনও তাহাদের কণ্ঠনিঃসৃত বাক্য শুনা যাইতেছিল।

... ...

"ভাগীরথী।—শোনো রাজাধিরাজ রামচন্দ্র! চিত্রদর্শনের সময় আমাকে যে বলেছিলে, মাতঃ! অরুন্ধতীর ন্যায় আপনার এই পুত্রবধূ সীতার প্রতি কল্যাণ-দায়িনী হোন্—এই দেখ আমি সেই বিষয়ে এখন ঋণমুক্ত হলেম।

... ...

পৃথিবী।—সীতাকে পরিত্যাগ করবার সময় আমাকে যে বলে-ছিলে,—'মাতঃ! আপনার গুণবতী কন্যা সীতাকে আপনিই এখন অবধি রক্ষা করবেন'—এই দেখ, সে কথাও আমার প্রতিপালন করা হল।"

রামের সহিত সীতার পুনর্ম্মিলন হইল। এই সময়ে বাল্মীকি আবির্ভূত হইলেন এবং অরণ্যজাত সীতার যমক শিশু লব কুশকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। অবশেষে সীতার সতীত্বসম্বন্ধে প্রজাবৃন্দের সন্দেহ দূর হইল। লবকুশকে উহারা রাজা রামচন্দ্রের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিল।(৪)

***

ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের দ্বিতীয় রূপ—করুণ হাস্য-রসাত্মক মিশ্র নাটক (drama) এবং মিলনাত্মক (Heroic Comedy) পৌরাণিক নাটক। এই দুই শ্রেণীর নাটক হইতে তৎকালীন আচারব্যবহার ও রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

মৃচ্ছকটিক।—নায়িকা বাসবদত্তা, উজ্জয়িনীর একজন

(২) চতুর্থ অঙ্কের শেষভাগ, Fritzeর জর্ম্মাণ-অনুবাদ, Wilsonএর ইংরাজি-অনুবাদ।

(৩) বীর রাম চরিত।

(৪) উত্তর রামচরিত—Wilson-এর অনুবাদ

নর্ত্তকী। যেমন তাহার অসাধারণ রূপলাবণ্য তেমনি অসীম ঐশ্বর্য্য। নায়ক :—বাণিজ্যব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ চারুদত্ত। ইনি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, মানব ও পশুর জন্য আশ্রম স্থাপন করিয়া, আত্মীয়, সাধু ও চোর যে-কেহ তাঁহার নিকট আসিত তাহাকেই তিনি প্রচুর অর্থ দান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। নর্ত্তকী ব্রাহ্মণের রূপগুণে মুগ্ধ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণও তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল। এবং ব্রাহ্মণপত্নীও নিজ গৃহে উহাদের প্রেমলীলার প্রশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঐ বারবণিতা রাজার শ্যালকের হস্তে পতিত হইল। রাজশ্যালক মূর্খ ও নিষ্ঠুর-প্রকৃতি; সে বলপূর্ব্বক তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করে। বসন্তসেনা কিছুতেই রাজি হইল না। রাজশ্যালক তাহাকে গলাটিপিয়া হত্যা করিল। পরে, চারুদত্ত হত্যা করিয়াছে বলিয়া বিচারকদিগের নিকট অভিযোগ করিল। নির্দ্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। চারুদত্তের প্রাণদণ্ড হইল। কিন্তু বসন্তসেনা আসলে মরে নাই। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে।

বসন্তসেনা বধ্যস্থানে দৌড়িয়া গিয়া তাহার বল্লভকে উদ্ধার করিল। ঠিক্ সেই সময়ে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়া রাজা রাজ্যচ্যুত হইলেন। চারুদত্তের এক বন্ধু রাজসিংহাসন অধিকার করিল। চারুদত্ত মন্ত্রী হইলেন। মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমেই তিনি তাঁহার শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।(৪)

নাট্যের রচনা-কৌশল ও নাটকের বিষয় উভয়েতেই নাটকের একটা সন্ধিযুগ সূচিত হয়। করুণরস ও হাস্যরসের সংমিশ্রণ। চরিত্রগুলি সুচারুরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। দৃশ্যগুলি বেশ সবল, লিখনভঙ্গী বেশ জোরালো। দুইটি আখ্যানবস্তু বেশ নিপুণভাবে মিশ্রিত হইয়াছে, বসন্তসেনাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য জালবিস্তার এবং যে ষড়যন্ত্রে রাজা রাজ্যচ্যুত হয় সেই ষড়যন্ত্র। সেই সঙ্গে আবার কতকগুলি প্রাসঙ্গিক কথা আছে,—যথা, সংস্কৃত কাব্যের রীত্যনুসারে বসন্তসেনা কর্ত্তৃক বর্ণিত প্রাবৃটের প্রথম-ঝটিকা :—মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, জল-প্লাবিত পথ, এবং পশু ও মনুষ্যের আশ্রয় অন্বেষণ। তারপর, চারুদত্তের চরিত্রের কি বিষম দুর্ব্বলতা :—তিনি টাকাকাড় উড়াইয়া দিলেন, তারপর স্বকীয় দুর্দ্দশার জন্য পরিতাপ করিতে লাগিলেন। নিজ প্রণয়িনীকে হত্যা করিবার অপবাধে অভিযুক্ত হইলে, তিনি তার অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং যখন তাঁহার সৌভাগ্য ফিরিয়া আসিল, আবার প্রভুত্ব লাভ করিলেন, তখন তিনি, যে রাজশ্যালক স্বকীয় অপরাধের জন্য গুরুদণ্ডের যোগ্য, তাহাকে আশ্রয়দান করিলেন।

যাহা কালিদাসের রচনা বলিয়া সাধারণে প্রচলিত, সেই "মালবিকা অগ্নিমিত্রে", হিন্দুজাতি আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এইরূপ প্রতীতি হয়। ইহা একটি রাজান্তঃপুরের বৃত্তান্ত। এক রাজা স্বকীয় ঈর্ষাপরায়ণা পত্নীদিগকে লইয়া প্রণয়বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। (৫) ভবভূতির "মালতী মাধবে" আমরা একটি কলুষিত সমাজের পরিচয় পাই। অবশ্য, নাটকটিতে ঔৎসুক্য উদ্রেকের অভাব নাই, বর্ণনাগুলি খুব উজ্জ্বল, মনস্তত্ত্বঘটিত আলোচনা অতীব নিপুণহস্তে সম্পাদিত হইয়াছে, কিন্তু এই বিষাদ-তমসাচ্ছন্ন নাটকখানিতে কোন দৃশ্যই মুক্তভাবে আলোচিত হয় নাই, কোন চরিত্রই বরাবর অনুসৃত হয় নাই, ইহার সকল পাত্রগণই দুর্ব্বলচিত্ত, অ-স্থিরসঙ্কল্প ও স্নায়বিক উত্তেজনার বশীভূত।

***

ভবভূতির পর নাট্যসাহিত্যের দ্রুত অবনতি পরিলক্ষিত হয়। নাটকে গুপ্তপ্রেমের পাকচক্র, ও বিস্ময়জনক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নাই। যে ধর্ম্মনাট্য (mystery) হইতে 'ট্র্যাজেডি' নিঃসৃত হয়, সেই ট্র্যাজেডি ধর্ম্মনাট্যের সহিত মিশিয়া গেল। নাট্যকলা অলঙ্কারশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বাঁধা-নিয়মের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল (Conventional) এবং উহাতে কেবলি কৃত্রিম হাব-ভাব ও ভয়ানকরসের প্রাদুর্ভাব হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৪) শূদ্রক কর্ত্তৃক প্রণীত মৃচ্ছকটিক—Wilson-এর ইংরাজি অনুবাদ, Kellner-এর জর্ম্মাণ অনুবাদ।

(৫) Albrecht Weber ও L. Fritze-র জর্ম্মাণ অনুবাদ।

প্রবাসী বাঙ্গালী

স্বর্গীয় ডাক্তার নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশের শিক্ষিত অধিবাসীবর্গের মধ্যে এমন লোক বোধ হয় নাই যিনি আগ্রার ডাক্তার রায় নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের নাম শুনেন নাই। বিগত ১লা নভেম্বর কলিকাতার প্রবাসে তাঁহার পরিজনবর্গ ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে শোকাভিভূত করিয়া নবীনচন্দ্র ইহলোক হইতে চিরবিদায় লইয়াছেন। আগ্রা অঞ্চলে

স্বর্গীয় ডাক্তার নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ইহাঁর অভাবে যে স্থান শূন্য হইয়াছে, তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে। নবীনচন্দ্র মানসম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যের উচ্চাসনে উঠিয়াও আপনার মনুষ্যত্ব অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; এই জন্যই তাঁহার স্মৃতি "প্রবাসী"র পৃষ্ঠায় সজীব রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

পাবনা জেলার একটী সম্ভ্রান্ত কবিরাজ-পরিবারে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্রের জন্ম হয়। ইংরাজী শিক্ষায় কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। সে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা। তখন পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার মুক্ত বাতাস আমাদের রক্ষণশীল সমাজের বুকের উপরে এতটা অবাধে বহিতে আরম্ভ করে নাই। ইংরাজের স্কুল কলেজে হিন্দুর ছেলেকে পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া উচিত কিনা ইহা সে সময় বিশেষ বিবেচনার বিষয় ছিল। আয়ুর্ব্বেদ মতেই তখন হিন্দুর চিকিৎসা হইত; হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া এলোপ্যাথি ঔষধ সেবন করা সম্ভব নয়, অনেকেরই এই ধারণা ছিল। সে যুগে মেডিকেল কলেজে পড়িয়া মড়া কাটিয়া ডাক্তারী শিক্ষা করিবার কল্পনাটাও কিরূপ বিভীষিকাপূর্ণ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। নবীনচন্দ্রের এইরূপ বীভৎস সংকল্পে সমাজের লোক তাঁহাকে ধর্ম্মলোপ ও সমাজচ্যুতির ভয় দেখাইয়া ও অন্যান্য উপায়ে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে অনেক বিঘ্ন জন্মাইয়াছিল। কিন্তু তিনি নিজে যাহা ভাল মনে করিতেন তাহা হইতে সহজে নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। এসকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। ১৮৬৭ সালে তিনি কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী ডাক্তারের পদে নিযুক্ত হন ও প্রথমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নৈনিতাল সহরে প্রেরিত হন। এখানে তিনি কেবল এক বৎসর মাত্র ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের ভিতরেই তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার পর বুলন্দ-সহর ও তৎপরে মথুরায় পাঁচবৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি আগ্রা মেডিকেল স্কুলে অস্ত্রবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আগ্রায় আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিচক্ষণ চিকিৎসকরূপে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। গভর্ণমেণ্টও এই গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে চিকিৎসা বিদ্যার (medicine) অধ্যাপকের পদে উন্নীত করিয়া দেন। এই পদে নবীনচন্দ্র ২৮ বৎসরকাল অতি গৌরবের সহিত কার্য্য করিয়া ১৯০৩ সালে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী কার্য্যে নবীনচন্দ্র যে অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহার কণামাত্রও চরিত্র অথবা মনুষ্যত্বের বিনিময়ে অর্জ্জিত হয় নাই। ১৮৭৮-৭৯ সালে যখন উত্তর-পশ্চিমে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারি উপস্থিত হয়, তখন তিনি অনশনপীড়িত ও রোগক্লিষ্ট দেশবাসীর জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন,

সে কালের সংবাদপত্রাদি তাহার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিল, এবং গভর্ণমেণ্টও এজন্য তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পেন্সন লইয়া তাঁহার ভাগ্যে বিশ্রামসুখ উপভোগ বড় একটা ঘটিয়া উঠে নাই। চিকিৎসাকার্য্যে প্রতিদিন অনেক সময় তাঁহার অতিবাহিত হইত। অথচ সাধারণ চিকিৎসকের ন্যায় অর্থলিপ্সা তাঁহার ছিল না। আগ্রার বাঙ্গালী অধিবাসীর নিকট তিনি চিকিৎসার জন্য এক কপর্দ্দকও পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না। স্বজাতির প্রতি তাঁহার যথার্থ অনুরাগ ছিল। আবার জাতিনির্ব্বিশেষে গরীব দুঃখী ও অসমর্থ মাত্রকেই তিনি বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করিতেন এবং ঔষধ ও অনেক সময় পথ্যাদিও দান করিয়া তাহাদিগের উপকার করিতেন। সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠান মাত্রেই তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল; তাঁহার যত্ন চেষ্টায় এরূপ অনেক অনুষ্ঠান সজীব ছিল। তিনি দীর্ঘকাল "আগ্রা বঙ্গ সাহিত্য সমিতি" ও তাহার সংসৃষ্ট লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন। সাহিত্যচর্চ্চায় নিজেও আনন্দ অনুভব করিতেন। হিন্দী, উর্দ্দু ও পার্শী ভাষায় তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় চিকিৎসা বিষয়ক একখানি বৃহৎ পুস্তক (The Principles and Practice of Medicine) রচনা করিয়া সে যুগের ইংরাজী অনভিজ্ঞ অনেক ছাত্রের উপকার করিয়াছিলেন। সে সময় দেশীয় ভাষায় লিখিত এ জাতীয় কোনও পুস্তক বাজারে ছিল না।

বাঙ্গালাদেশে যে সময় ইংরাজের প্রভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অনেক পরবর্ত্তীযুগে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ গিয়া পৌঁছে। নবীনচন্দ্র যখন সরকারী ডাক্তার হইয়া আগ্রায় আসিলেন, এলোপ্যাথি চিকিৎসা তখন সেখানে অতি সামান্যই প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলেই ইংরাজের আনীত চিকিৎসাপদ্ধতি ঐ প্রদেশের আপামরসাধারণের ভিতরে প্রথম প্রচলিত হয়। চিকিৎসায় তাঁহার নিপুণতা ও বিচক্ষণতা এতই ছিল, যে, লোকে অতি অল্প দিনেই এলোপ্যাথির প্রতি আস্থাসম্পন্ন হইয়া উঠিল।

নবীনচন্দ্রের যশঃসৌরভ ক্রমে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। রাজপুতানা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সামন্ত রাজাদিগের অনেকেই তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভূপাল রাজ্যের ভূতপূর্ব্বা বেগম, ঢোলপুরের স্বর্গীয় রাণা নিহাল সিং, জয়পুরের মহারাজ, রামপুরের নবাব, আবগড়ের রাজা, কিষেণগড়ের অধিপতি প্রভৃতি সকলেই তাঁহার চিকিৎসাধীন হইয়াছেন। দেশপর্য্যটনেও নবীনচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল। সিন্ধুপ্রদেশ হইতে কামরূপ, কাশ্মীর হইতে সেতুবন্ধ, ইহার কোন দর্শনীয় স্থানই তাঁহার দেখিতে বাকী ছিল না। চিরকাল গৃহের কোণে বসিয়া জাগিয়া ঘুমাইবার মতন বাঙ্গালী তিনি ছিলেন না। এই জন্যই যশ ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার পক্ষে অনায়াসলভ্য হইয়াছিল।

নবীনচন্দ্র বাহিরের সুখৈশ্বর্য্যে এত বড় হইয়াও চরিত্রসম্পদে কোনরূপেই হীন ছিলেন না। তাঁহার মিতাচার, অমায়িকতা, বিনয়নম্র সৌজন্য ও আতিথেয়তা আমাদের অনেকের আদর্শ হইবার যোগ্য। তাঁহার আগ্রার বাড়ী বাঙ্গালী অতিথি অভ্যাগতের জন্য অবারিতদ্বার ছিল। কত অজ্ঞাতকুলশীল প্রবাসীও তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইয়াছেন। মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে কত তীর্থযাত্রী তাঁহার উদ্যোগে তাঁহার বন্ধুবর্গের গৃহে আশ্রয়লাভ করিয়া অনায়াসে তীর্থদর্শনের কামনা সফল করিয়া গিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের চরিত্র অনেকাংশে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার ফলে আমাদের বহুশতাব্দীর অর্জ্জিত মানসিক দুর্ব্বলতাই তাঁহার চরিত্র হইতে দূর হইয়াছিল;—হিন্দুর জাতীয় প্রকৃতির যাহা প্রধান উপাদান ও গৌরব সেই ধর্ম্মপ্রাণতা, বিনয় ও ঔদার্য্য হইতে তিনি বঞ্চিত হন নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

কেশব-নিকেতন

সকল মানবজাতির মহা সম্মিলন-ক্ষেত্র লণ্ডন নগরীতে সকল সম্প্রদায় কিম্বা সকল জাতিরই বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র আকারের এক একটী মিলন-মন্দির, ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান

আছে, যেখানে তাঁহারা সুখে দুঃখে মিলিত হইয়া, পরস্পরে ভাব বিনিময়, শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন, সাহিত্য চর্চ্চা বা ধর্ম্মালাপ করিয়া, কত রকমের হৃদয় মনের খোরাক্ সেই কেন্দ্রভূমি হইতে সংগ্রহ করেন। সেই এক একটী মিলন-মন্দির তাঁহাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য, জাতীয় সাহিত্য ও কলাশিল্প, জাতীয় নানা প্রশ্ন, তাঁহাদের যাহা কিছু ভাল ও যাহা কিছু তাঁহাদের জাতীয় জীবনের আহার ও পুষ্টিবর্দ্ধনের সামগ্রী, সেগুলির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রভৃতিকে এই আধুনিক বিশ্বজনীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে জীবিত রাখিবার একটা মহান্ চেষ্টার নিদর্শনরূপে দণ্ডায়মান।

আমরা জগতের সমক্ষে অতি তুচ্ছ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেও, আমাদের অনেক ধন ছিল এবং এখনও এই যুগযুগান্তর ধরিয়া অপরকে অকাতরে বিলাইয়া দিয়াও যথেষ্ট আছে যাহা আরও লক্ষ লক্ষ শতাব্দী জগতের নরনারীর পাতে পাতে পরিবেষণ করিয়াও ফুরাইবে না। আমাদের এইসকল চিরন্তন সাধন-লব্ধ সামগ্রীকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা জিনিষটা আমাদের ভিতরে বড় ছিল না। এখন অন্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া এবং ডাহিনে বাঁয়ে আমাদের জিনিষ লইয়াই অপরেরা বড় হইতেছে দেখিয়া আজ আমাদেরও আত্মরক্ষার ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছে। এই জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থানের সময়ে এই লণ্ডন নগরে আমাদেরও এমন একটী কেন্দ্র আবশ্যক হইয়াছে যেখানে আমরা অন্ততঃ সপ্তাহান্তে একবার মিলিত হইতে পারি। পরস্পর প্রীতিদানে এবং একত্রে প্রীতি-ভোজনে পরস্পর পরম পরিতোষ লাভ করিব, এই রকম একটা আকাঙ্ক্ষা এই শহরবাসী কি ছাত্র কি কর্ম্মোপলক্ষে সমাগত ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল যখন এখানে প্রথম উপস্থিত হইয়া গীর্জ্জায় যাইতাম বা কোন ক্লাবে যাইতাম তখন প্রাণে বড় আকাঙ্ক্ষা হইত, আহা! যদি আমাদেরও এমন একটি জায়গা থাকিত যেখানে আমরা স্বদেশবাসী দু দশ জন এক সঙ্গে মিলিয়া আমাদেরও উপাস্য দেবতার উদ্দেশে প্রীতি পুষ্প চন্দন উৎসর্গ করিতে পারি, বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি।

সদাকাঙ্ক্ষা কাহারও অপূর্ণ থাকে না ইহা প্রকৃতির নিয়ম, এবং প্রকৃতির রাজা বা রাণী যিনি তাঁহারও প্রেমের নিদর্শন। কিছু দিনের মধ্যেই কুচবিহারের মহারাণীর কৃপায় এসেক্স্ হল্ (Essex Hall) নামক একেশ্বরবাদীদের একটী মন্দির ভাড়া করিয়া তাহাতেই আমাদের প্রতি শনিবারে সম্মিলনের ব্যবস্থা হইল। শ্রীযুক্ত ভাই প্রমথলাল সেন আচার্য্যের পদে বৃত হইলেন। কয়েক মাস ইহা একটী সদ্ভাবের প্রস্রবণরূপে আমাদের প্রাণে শুভইচ্ছার ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। সকলেই প্রীত। সকলেই এই সম্মিলনের সুফল নিজ নিজ প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন কেহ কেহ ভাবিতে লাগিলেন; আচ্ছা, এই জিনিষকে কি স্থায়ী করা যায় না? আমাদের ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষায় ভগবান সাড়া দিলেন। তাহারই ফল স্বরূপ গত ২১শে মে তারিখ হইতে এই কেশব-নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলে এখানে সম্মিলিত হইব, সেইজন্যই ইহার নামকরণ করা হইয়াছে কেশব-নিকেতন। যাঁহার অন্তর বিশ্ব-বাণীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিল, যাঁহার রসনা সমগ্র জগন্মানবের সুখ দুঃখের কাহিনী গাহিয়াছিল, যাঁহার বাহুদ্বয় সমগ্র বিশ্ব-মানবকে আলিঙ্গন প্রদান করিতে প্রয়াসী ছিল, সেই বিশ্ব-প্রেমিক, বিশ্ব-মানবের জন্য বিশ্ব-জোড়া মহা সম্মিলনের ধর্ম্মবার্ত্তা-বাহক কেশবচন্দ্রের নামে এই মিলন-মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। যদি এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা সার্থক হয়, যদি ইহার উদ্যোগকারীদের চেষ্টা ফলবতী হয়, তবে সেই কেশবের নামের গুণে এবং কেশবের কেশব যিনি, যিনি কেশবের ভিতর দিয়া লীলা করিয়াছিলেন সেই লীলাময় হরির কৃপাগুণেই সফল হইবে।

এই অল্প সময়ের মধ্যে কেশব-নিকেতন যেরূপ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে তাহা যে শুধু এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের ফলেই হইয়াছে তাহা নহে, লণ্ডনপ্রবাসী নানা সম্প্রদায়ের সমস্ত ভারত-সন্তানের, এমন কি এদেশবাসীদেরও, প্রগাঢ় সহানুভূতি ও যত্নের ফলেই আজ এই নিকেতনের এত সুখ্যাতি। প্রতি সপ্তাহে এতগুলি ভারতসন্তান এক সঙ্গে মিলিত হইয়া

অসাম্প্রদায়িক ভাবে ভগবানের আরাধনা করা এবং পূজান্তে এক সঙ্গে ঘরের মেজেতে আসন পাতিয়া বসিয়া খিচুড়ী তরকারী পরমান্ন ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভারতীয় আহার্য্যে পরম পরিতোষ লাভ করা লণ্ডনে একান্ত অপ্রত্যাশিত বলিয়াই সকলে এপ্রকার প্রগাঢ় প্রীতি লাভ করিয়াছেন। একএকদিন যখন দেখিয়াছি, ইংরেজ, আমেরিকান, আফ্রিকাবাসী, পারশী, পাঞ্জাবী, বঙ্গবাসী ও চীনবাসী সকলে মাটিতে বসিয়া প্রীতি ভোজনে আপ্যায়িত হইতেছেন তখন রামমোহনের আত্মার স্পর্শ যেন প্রাণের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, দেবেন্দ্রনাথের গভীর ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি যেন হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে—তারপর সেই ব্রহ্মযোগী ব্রহ্মানন্দের জ্বলন্ত জীবন্ত বিশ্বপ্রেমের হাওয়া যেন সমগ্র দেহ মন প্রাণের উপর দিয়া ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে, শরীরের প্রত্যেক অণু পরমাণু যেন প্রগাঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আলোকময় ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিয়াছে--বিশ্বপ্রেমের চেষ্টা কখনও বিফল হইবে না। রামমোহন, দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্রের অক্ষয়বাণী পূর্ণ হইবে,—জগত এক হইবে, সে দিন ক্রমশ নিকট হইয়া আসিতেছে। বিশ্বমানব বর্ণে এক হইবে না, ভাষায়ও এক হইবে না, মতেও হয়ত এক হইবে না, কিন্তু তাহারা এক হইবে—প্রেমে।

মায়ের পাঁচটী ছেলে, একটী কালা, একটী বোবা, একটী খোঁড়া এবং একটী সুঠাম এবং কর্ম্মঠ, সেই সমস্ত ছেলেই যেমন এক হয় মাতৃপ্রেমের কাছে, তেমনি বিশ্বমাতার সিংহাসন-তলে সকলকেই সমুদয় স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া এক হইতে হইবে; ধনী নির্ধনে এক হইতে হইবে, পণ্ডিতে মূর্খে এক হইতে হইবে, সাদায় কালোয় এক হইতে হইবে; এক হইবে হইবে হইবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

কিছুদিন হইল নিকেতনে একটা সুন্দর হাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় আসিয়াছিলেন, আর আসিয়াছিলেন আমেরিকার প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত মিড্‌ভিল্ থিওলজিকেল্ কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার ডোন্, তাঁহার পত্নী ও দুটী ছোট মেয়ে, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা মিসেস্ হজ্ (তাঁহার স্বামী আমেরিকার ওয়াশিংটন্ ষ্টেটের একজন প্রসিদ্ধ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী), এবং রেভারেণ্ড রিচার্ড্‌স্ যিনি লাহোর দয়াল সিং কলেজে অধ্যাপক মনোনীত হইয়া কিছুদিন হইল ভারতযাত্রা করিয়াছেন তিনি এবং তাঁহার পত্নী। এতগুলি পণ্ডিতের সম্মিলনে কিছুদিন এই নিকেতন যেন একটা জ্ঞানালোচনার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে রেঃ রিচার্ড্‌স্ বড়ই সরলস্বভাব এবং আমোদপ্রিয়। যখন ভোজন টেবিলে ব্রজেন্দ্রনাথ ও ডাক্তার ডোনের মধ্যে কোনও গভীর বিষয় লইয়া তুমুল যুক্তি-তর্ক বাঁধিয়া উঠিত, তখন বড়ই মজা হইত। আর সকলকে প্রায় চুপ করিয়াই থাকিতে হইত। কোনও দিন হয়ত রেঃ রিচার্ড্‌স্ বলিয়া উঠিতেন "ডাক্তার শীল, আপনি একটু থামুন, আমাদিগকে গভীর অতলস্পর্শ জলে ফেলিয়া দিয়াছেন, একটু তুলিয়া লউন, তাহা হইলে আপনাদের ঠিক অনুসরণ করিতে পারিব।" একদিন ডাক্তার শীল সম্বন্ধে কথা বলিতে বলিতে রেঃ রিচার্ড্‌স্ সাহেব আমাকে বলিতেছিলেন "দেখুন এই ব্যক্তির জ্ঞান যে শুধু মানব-চিন্তার সমুদয় বিভাগেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে তাহা নয়, ইঁহার আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ, ইঁহার বিশাল প্রাণ যেন মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় উধাও হইয়া অনন্ত আকাশের পানে ছুটিয়াছে; এরূপ বিশ্বাস ও জ্ঞানের সঙ্গে এই যবনিকার অন্তরালবর্ত্তী লীলাময়ের পানে এমন করিয়া ছুটিয়া যাইতে শুধু তোমাদের ভারত-বাসীই জানে। যে দেশের মাটীতে এমন লোক জন্মে সে দেশ না জানি কেমন!" এইরূপ শ্রদ্ধা ও অভিজ্ঞতা লইয়াই রিচার্ড্‌স্ সাহেব ভারতের অতিথি হইয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে নিকেতনে কতক দিন কি সুখেই কাটান গিয়াছে! কত আমোদ, কত আহ্লাদ, কত গবেষণা, কত শিক্ষা। এই দিন কয়টির মনোরম ও প্রীতিপূর্ণ স্মৃতি এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। ভরসা এই নিকেতনের কৃপায় এমন দৃশ্য আবার দেখিতে পাইব। ডাক্তার ডোন্ ও তাঁহার পরিবারবর্গ, রেভারেণ্ড ও মিসেস্ রিচার্ড্‌স্ যে এই নিকেতনের প্রতি এতদূর প্রীতি লইয়া যাইবেন এরূপ বড় একটা আশা করিতে পারি নাই। ব্রজেন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র। তিনিত

আমাদেরই। নিকেতনকে তিনি নিজের জিনিষ বলিয়াই মনে করেন।

এখন নিকেতনের পরিচালনা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আজিকার প্রবন্ধ শেষ করিব। নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোগকারিগণ ইহাকে একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়াই এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং সে পক্ষে তাঁহারা পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়েরও ক্রটী করিতেছেন না। এখানে ভারতীয় ছাত্রগণের থাকিবার ব্যবস্থাও করা হইতেছে। কিন্তু কথায় বলে "দশের নড়ী একের বোঝা"। এইরূপ ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার একজন কিম্বা দুই জনের আর্থিক সাহায্যের উপর চলিতে পারে না, বিশেষতঃ দশের সহানুভূতির ভিত্তিতে এই রকম ব্যাপার দাঁড়াইলে তবেই তাহার ভিত্তি দৃঢ় হয়। এই ভরসায় নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোগকারিগণ নিকেতনে আর্থিক সাহায্যের জন্য বঙ্গের এবং ভারতের সকল হিতৈষী মনস্বী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এখন আমাদের ভরসা এই যে আমাদের এই বৃহৎ আয়োজন অর্থাভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে না।

৺কুচবিহারাধিপতি নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের আকস্মিক পরলোক গমনে অনেক বিষয়েই একটা বিষাদময় পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। মহারাণী, নূতন মহারাজা এবং সকলকে লইয়া স্বর্গগত মহারাজের শ্রাদ্ধক্রিয়া ও নূতন মহারাজের অভিষেক সমাপন উপলক্ষে স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। এই শোকাবহ আকস্মিক ঘটনায় নিকেতন যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা লেখনী প্রকাশ করিতে অক্ষম। এক্ষণে আমাদের দৃঢ় আশা এই বর্ত্তমান মহারাজা এই নিকেতনটীকে ভুলিবেন না।

ময়ুরভঞ্জের মহারাজা নিকেতনে বাৎসরিক ৪৫০৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া নিকেতনের আসবাবপত্রাদি ও বাড়ীভাড়া বাবদে কিছু টাকা এককালীন দানস্বরূপ দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা বঙ্গের সকল ধনবান ও বদান্য মহাশয়গণের নিকট হইতেও এইরূপ সাহায্য আশা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত ভাই প্রমথলাল সেন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কয়েক মাসের জন্য দেশে গিয়াছেন। নিকেতন সম্বন্ধে কাহারও কিছু জানিবার ইচ্ছা হইলে তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিবেন। তাঁহার কলিকাতার ঠিকানা ৮২নং হেরিসন রোড্।

কলিকাতা হইতে যে সমস্ত পিতা বা অভিভাবকগণ তাঁহাদের ছেলেদের নিকেতনে পাঠাইতে চাহেন তাঁহারা ভাই প্রমথলাল, শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ২৫নং রামমোহন সাহার লেন, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, ইঁহাদের মধ্যে কাহারও নিকট হইতে সবিশেষ সংবাদ পাইতে পারিবেন।

যাঁহারা নিকেতনে দান পাঠাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ভাই প্রমথলাল সেন ৮২নং হেরিসন রোড্ কিম্বা মিঃ পি, সেন, প্রাইভেট্ সেক্রেটারী, মহারাণী, কুচবিহার, এই দুই জনের কাহারও নিকট পাঠাইবেন। যথাসময়ে দানের প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে।

বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত ভাই প্রমথলালের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত নিকেতন পরিচালনার ভার শ্রীযুক্ত ডাক্তার চৈতন্যপ্রসাদ ঘোষ ও আমার উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে। যদি কাহারও কিছু জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে আমাদিগকে চিঠি লিখিতে পারেন। শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ।

কেশব-নিকেতন,
২০নং সাউথ হিল, পার্ক গার্ডেনস্, হেম্পষ্টেড, লণ্ডন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব*

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব নামক গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক এবং ব্রাহ্মসমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকেন। আশা করা যায় তাঁহার গ্রন্থও সকলে আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যেসকল ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষ বা দেশবিশেষ হইতে উৎপন্ন, তাহাদের নামে ও প্রকৃতিতেই তাহা ব্যক্ত আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ দেশের নামে পরিচিত নহে। ইহার নামকরণ হইতেই জানা যায় ইহা ব্রহ্মের, ব্রহ্মই ইহার উদ্ভবস্থল।

* শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃঃ ২২৬। মূল্য ।৵০।

প্রচলিত ধর্ম্মের কোনটাই যেমন বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, তেমনি প্রচলিত কোন ধর্ম্মই বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিবর্জ্জিত নহে। যে ধর্ম্মে যে পরিমাণে সত্যের অধিষ্ঠান, সে ধর্ম্ম সেই পরিমাণেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্মের। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রতি উদ্ভূত হইয়াছে ইহা যেমন সত্য নহে, তেমনি ইহা কেবল প্রাচীনের ব্যাখ্যা বা পুনরাবৃত্তি, ইহা বলাও তেমনি সঙ্গত নহে।

যে ব্যাপার নির্ব্বিরোধে সর্ব্বজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত, সমর্থিত গৃহীত ও আদৃত হইবার উপযুক্ত তাহাই শাশ্বত ধর্ম্ম—তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। দেশ, কাল, জাতি, সম্প্রদায় ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ হইয়া যাহা সত্য—অবিসম্বাদিত সত্য বা ধর্ম্মের শাশ্বতরূপ বলিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। স্বানুভূতি, ধর্ম্মশাস্ত্র (প্রাচীনকালের ধর্ম্মপ্রবক্তাগণের প্রচারিত তত্ত্ব) এবং বর্ত্তমানের উপদেষ্টা ও শিক্ষকগণের উক্তি—এই তিনের যদি ঐক্য হয় অর্থাৎ তিনটী সাক্ষীর (নিজের, পূর্ব্বকালের ধর্ম্মপ্রবক্তার ও বর্ত্তমানকালের উপদেষ্টার) সাক্ষ্যে যদি ঐক্য থাকে এই তিনে যদি এক হইয়া কোন বিষয়ের সমর্থন করে, তবে তাহাও ধর্ম্ম এবং সত্য বলিয়া অবলম্বনীয়।

একেশ্বরবাদ প্রচার ও সমর্থন যে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু উহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার প্রকৃতি নির্ণয়ে। এদেশের একেশ্বরবাদিগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, উদাসীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা কর্ত্তা নহেন, কারণ নহেন, তাহা হইতে কিছুর উদ্ভব হয় নাই বা তাঁহাতে কিছু অবস্থিত নহে। তিনি সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত তিনি একরস। অন্য একশ্রেণীর লোক অবতারবাদাদি স্বীকার করিয়া এবং তাঁহাকে জাগতিক ভাবাপন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাঁহার প্রকৃতি নির্ণয়ে অন্য সীমাতে গমন করিয়াছেন। এই দুই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত ঈশ্বরস্বরূপের মধ্যবর্ত্তী ব্যাখ্যা দ্বারা পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপব্যাখ্যা গ্রহণ ও প্রচার করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কার্য্য।

আত্মার সহজ স্বাভাবিক স্বাধীনতার বার্ত্তা ঘোষণা করা ব্রাহ্মধর্ম্মের আত্মা সম্বন্ধীয় তত্ত্বের একটা বিশেষত্ব।

জগদ্গুরু জগদীশ্বর সর্ব্বজনহৃদয়ে নিত্য অবস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। সকলেই জগদ্গুরুর মঙ্গলবাণী শ্রবণের অধিকারী। সাক্ষাৎ ও স্বাধীনভাবে এবং স্বাভাবিকরূপেই এই ব্যাপার সর্ব্বত্র সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রত্যেক আত্মাতে জগদ্গুরুর এই যে অনুপ্রাণনের সংবাদ ঘোষণা, ইহা ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ কার্য্য ও বিশেষত্ব।

আত্মা অনন্ত উন্নতিশীল। পরম প্রভু সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অসীম কৃপায় তাহার উন্নতিপথের অন্তরায় সমূহ বিদূরিত হইয়া, সে তাঁহার কৃপায় শুভমতি ও শুদ্ধস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইবে। এই মহা আশার সংবাদ ঘোষণা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ বিশেষত্ব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারিত মুক্তিবাদের অর্থ রোগের প্রতিকার বা সংশোধন। প্রধানতঃ পরমেশ্বরের করুণা এবং সামান্যতঃ মানবের চেষ্টা এই দুয়ের সম্মিলনেই প্রত্যেক আত্মার মুক্তি। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তি বা পরিত্রাণ বিষয়ক বিশেষত্ব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় এবং তাঁহাকে প্রীতিকরা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।"

জনসমাজ বা সংসারই মানবের জন্য অপরিহার্য্য এবং প্রকৃষ্ট সাধনক্ষেত্র। কিন্তু সাংসারিকতা, বিষয়াসক্তি সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনক্ষেত্র সম্বন্ধীয় বিশেষত্ব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ বিশেষত্ব ইহার উদারতাতে ও বিশ্বজনীন বা সার্ব্বভৌমিক প্রকৃতিতে।

পরমেশ্বর মানবপ্রাণে ন্যায়ান্যায়তত্ত্ব-পরিমাপক ও প্রদর্শকরূপে বিবেককে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই অন্তরনিহিত বাণী বা বিবেকের অনুসরণ সর্ব্বথা সর্ব্বতোভাবে তাহার আদেশ পালন—অসঙ্কোচে লাভালাভ গণনাশূন্য হইয়া সেই অন্তরনিহিত-বাণী প্রদর্শিত পথের অনুসরণরূপ যে বিবেকানুবর্ত্তিতা—এই মহাতত্ত্বের আবিষ্কার, প্রচার ও সমাদর ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কার্য্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম। একাধারে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম কিরূপে সাধিত হইতে পারে—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

সাধনের পর্য্যায় সম্বন্ধে সাধারণতঃ বলা যায় প্রথমে জ্ঞান, পরে ভক্তি এবং তৎপরে কর্ম্ম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনই এমনভাবে সংসৃষ্ট যে উহাদের পর্য্যায়ের ক্রম নির্ণয় করা সুকঠিন ব্যাপার। ধর্ম্মের এই তিন অঙ্গের সাধনাতেই সাধনের পূর্ণতা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম। নিজে যাহা পাইয়া পরিতৃপ্ত ও আশ্বস্ত হওয়া গিয়াছে এবং যাহাকে কল্যাণকর বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে তাহা অপরকে প্রদান করিতে হইবে। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রচার সম্বন্ধীয় বিশেষত্ব।

দুঃখ অসহ্য, দুঃখ অপ্রার্থনীয়; দুঃখ কোন প্রকারেই উপার্জ্জনীয় বা লোভনীয় নহে—ইহাই চিরপ্রচলিত কথা। দুঃখ ও অমঙ্গলের প্রভেদজ্ঞান জনসাধারণের নাই বলিলেও চলে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন—দুঃখ আর অমঙ্গল এক নহে, দুঃখও সুখনিদান হইতে পারে, সুখও দুঃখনিদানে পরিণত হইতে পারে। দুঃখ দেন বলিয়া বিধাতাকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, দুঃখদানকে বিধাতার দয়া বলিয়া ঘোষণা করা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত অভিনব ভক্তিবাদের বিশেষ বিশেষত্ব।

সেই বিশ্ববিধাতা সর্ব্বজননিয়ন্তা জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা, সময়ে সময়ে নহে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে নহে, বিশেষ বিশেষ দেশে নহে, কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বজনে সর্ব্বত্রই তাঁহার কল্যাণকর বিধিসকল প্রেরণ করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন। ইহাই বিধাতার প্রকৃত বিধাতৃত্ব—ইহা প্রচার করাও ব্রাহ্মধর্ম্মের এক বিশেষত্ব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে 'সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং'—সত্যই অবিনশ্বর শাস্ত্র। সত্য যেস্থলেই থাকুক—তাহা গ্রহণ ও স্বীকার করিতে হইবে। লোকে যাহাকে শাস্ত্র বলিয়া থাকে—তাহা সত্য ও মিথ্যাতে জড়িত—সুতরাং কোন শাস্ত্রগ্রন্থই সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয় কিম্বা সম্পূর্ণ গ্রহণীয় হইতে পারে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্রান্ত গুরুবাদ এবং মধ্যবর্ত্তীবাদ স্বীকার করেন না—কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষকের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

সাধুতাই ভক্তির প্রণোদক ও আকর্ষক। পরমেশ্বরেই মানবের ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা। তৎপরে সাধুতার বিকাশ যে যে স্থলে, সেই সেই সাধুমানবও ব্রাহ্মগণের ভক্তিভাজন। এখানে দেশ, কাল, জাতি বা সম্প্রদায়ের বিচার নাই। যেখানে সাধুতা সেইখানেই ভক্তি।

লেখক তাঁহার গ্রন্থে এই সমুদয় মত অতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি। উদার পাঠকগণও পরিতৃপ্ত হইবেন।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

গুপ্তমাতৃকা ও সাঙ্কেতিক পরিভাষা

চলিত বর্ণলিপি বা মাতৃকার জটিলতা নিবন্ধন দ্রুত লিখিতে কষ্ট হয় বলিয়া পাশ্চাত্য সুধীগণ নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আধুনিক প্রবর্ত্তিত শর্টহ্যাণ্ড লেখা (Shorthand writing ও phonography) তাহার পরিচয়। সম্প্রতি এতদ্দেশেও উহার প্রবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। উহা একটী বিশেষ বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত। উহা শিক্ষা ও অভ্যাসের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার ও আয়াস পাইতে হয়। ঐ বিদ্যা যে না জানে সে ঐরূপ লেখা পড়িতে পারে না। এইরূপে বক্তব্য গোপন রাখিবার জন্য প্রচলিত বর্ণমালাকে বিকৃত করিয়া বিবিধ সাঙ্কেতিক উপায় অনেকে অবলম্বন করিয়া থাকেন; ইহার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র কথা সাধারণের নিকট গোপন রাখা।

কেবল আজকালের কথা বলিতেছি না, খৃষ্টাব্দের প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে "গুপ্তমাতৃকা ও সাঙ্কেতিক পরিভাষার" আবিষ্কার হইয়াছে। ঠিক কখন কে উহা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। অতি প্রাচীনকাল হইতে স্পার্টান ও রোমানদিগের মধ্যে উহার প্রচলন ছিল। অপরকে না জানিতে দিয়া, শত্রুর চক্ষে ধূলি দিয়া, গোপনে নিজের আবশ্যকীয় বিষয় আত্মীয় বন্ধুকে জানাইবার আবশ্যকতাই ইহার আবিষ্কারের মৌলিক কারণ, সন্দেহ নাই। সমর কি বিপ্লবের সময় এই উপায় অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। ঘোর বিপদের সময় ইউরোপীয় কি রাজা, কি মন্ত্রী, কি আমাত্য, কি দূতগণ সকলেই কমবেশী এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অসৎ কার্য্য সম্পাদনের সময় কখনও কখনও ইহার অপব্যবহার হইয়া থাকে। আধুনিক বণিকগণ মধ্যে ইহার আদর দেখা যায়। এমন কি টেলিগ্রাফ দ্বারা (cipher message) সাঙ্কেতিক খবর প্রেরণ করা সকল দেশেই বণিকদিগের রীতি হইয়াছে। ইহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীর ভিন্ন ভিন্ন code initials বা সংক্ষিপ্ত শব্দমালা আছে। কোর্টশিপ-প্রধান দেশে প্রণয়ীদের মধ্যে প্রেমলিপির ইহা একটী প্রশস্ত অবলম্বন। এ দেশে ইহার কতদূর প্রচলন তাহা জানি না। কেহ কেহ ইহার প্রবর্ত্তন করিয়া থাকিলেও সাধারণের পক্ষে উহা নূতন।

"গুপ্তমাতৃকা" বা secret writing ও "সাঙ্কেতিক পরিভাষা" বা cipher writingকে ইংরাজী ভাষায় যথাক্রমে cryptography ও stenography বলে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পুরাকালে স্পার্টানদিগের মধ্যে ইহার প্রচার ছিল। তাহারা এক টুকরা পার্চমেণ্ট কাগজ একটি বিশেষ মাপের কাঠিতে জড়াইয়া উহার উপর অত্যাবশ্যকীয় কথা লিখিত। যাহার নিকট ঐ কাগজ প্রেরিত হইত তাহার নিকটও ঐরূপ একটী কাঠি থাকিত, সে ঐ কাগজ টুকরা তাহাতে জড়াইয়া লিখিত কথাগুলি অনায়াসে পড়িত। যাহারা ঐ রহস্য না জানিত তাহারা অসংলগ্ন বর্ণসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই বুঝিত না। ইহাতে অবশ্য কিছু বিশেষত্ব নাই তথাপি উহা তাৎকালিক মানব-বুদ্ধির পরিচায়ক।

সম্রাট সার্লেমান নিজে নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করেন। তাহার নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মিশরদেশের বিখ্যাত heiroglyphics বা চিত্র-লেখার বিষয় পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। উহা নানা প্রকার পশু পক্ষী প্রভৃতির চিত্র দ্বারা এক অভিনব ভাষার সৃষ্টি। ইংলণ্ডেশ্বর বিখ্যাত আলফ্রেডেরও নিজের সৃষ্ট অক্ষর ছিল। বীরকেশরী জুলিয়স সিজার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি চলিত বর্ণমালা ব্যতিক্রম করিয়া নিজে এক বর্ণমালা প্রস্তুত করেন। তাঁহার উপায় অতি সহজ। মনে করুন, বর্ণমালার আদ্য অক্ষর "ক" না হইয়া "খ" হইতে আরম্ভ হইয়াছে ও উহার শেষ অক্ষর "ক"। এইরূপে যে বর্ণমালা হইবে তাহাই জুলিয়স সিজারের বর্ণমালার অনুরূপ হইল।

রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বিলাতে বড় লোকদের মধ্যে এইরূপ পরিভাষার বহুল প্রচার ছিল। তদানীন্তন ভদ্রলোকদের মধ্যে উহার ব্যবহার একটী ফ্যাসানের মধ্যে গণিত হইত। মন্দভাগ্য রাজা প্রথম চার্লসের প্রচারিত অনেক সনন্দাদি এই রকম ভাষায় লিখিত। ঐ সময় আর্ল অফ্ গ্লামরগেন (যিনি পরে মারকুইস অফ ষ্টোর হন) এই বিদ্যায় একজন বিশেষ পারদর্শী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

তাৎকালিক ভীষণ যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষ এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী লোক (experts) নিযুক্ত করেন। তাঁহারা বিপক্ষের নিকট হইতে ধৃত কাগজপত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনে সদা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। লোমহর্ষণ ফরাসী রাজ্য-বিপ্লবের সময় তদ্দেশের নেতৃগণ এই বিদ্যার বিশেষ সমাদর ও ব্যবহার করেন। সুপ্রসিদ্ধ লর্ড বেকন এই বিদ্যার অনেক অনুশীলন করেন। তাঁহার প্রণীত Advancement of Learning নামক পুস্তকে তিনি ইহার বহু গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু তৎপ্রচলিত বর্ণমালা বড় জটিল ও কষ্টসাধ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় বিলাতে ভিক্ষুকগণের মধ্যে এক রকম সাঙ্কেতিক ভাষার প্রচলন আছে। কখনও কখনও কোনও ধর্ম্মযাজকের বাটীর ফটকে II, (০), এইরূপ সব সঙ্কেত দৃষ্ট হয়। উহা আর কিছু নয়, কেবল এক ভিক্ষুক অপর সকলকে কোন্ ধর্ম্মযাজক মন্দলোক, কে ভাল, কেবা ভিক্ষা দেয় ও কেবা কুকুর লেলাইয়া দেয়, কে ভিক্ষুক দেখিলেই ধরিয়া জেলে পাঠায় এই সকল বিষয় সাধারণের অবোধ্য সঙ্কেতে সতর্ক করিয়া দেয়। কথিত আছে যে কোন ধর্ম্মযাজক ঐসকল সঙ্কেত বিশেষ লক্ষ্য করিয়া পরে উহার রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন এবং নিজেই আপন দরজায় ভয়ব্যঞ্জক সঙ্কেতসকল অঙ্কিত করিয়া ভিক্ষুকদের জ্বালাতন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

বীরশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন একপ্রকার জটিল গুপ্ত বর্ণমালা ব্যবহার করিতেন। উহা তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার একটি উদাহরণ। তাঁহার প্রচলিত প্রথা একটি নূতন বিদ্যার মধ্যে ধরা যাইতে পারে। বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিলে তবে উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। অনুপাঠ (key) ব্যতীত উহা বুঝা অসাধ্য। কার্ডিনেল উলসের নিজের আবিষ্কৃত অক্ষর ছিল। স্যামুয়েল পেপিস তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ডায়েরীতে মধ্যে মধ্যে নূতন অক্ষরের অবতারণা করিয়াছেন।

কতকগুলি ডিটেক্‌টিভ গল্পে সাঙ্কেতিক লিপির সাহায্যে গল্পগুলি অধিক রহস্যময় ও জটিল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে দেখা যায়। এডগার আলেন পোই বোধ হয় প্রথমে এইরূপভাবে গল্প লিখিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার The Golden Bug নামক গল্প এইরূপ শ্রেণীর গল্পের একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই গল্পের প্রারম্ভে একটী পার্চ্চমেণ্ট কাগজে সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত একখানি দলিল নায়কের হস্তগত হয়। নায়ক স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে এই সাঙ্কেতিক লিপির মর্ম্মোদ্ঘাটনে সক্ষম হন। তাহাতে তিনি জানিতে পারেন যে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহুল ধনরত্ন প্রোথিত আছে। সুবিখ্যাত কোনান ডয়েলের Sherlock Holmes নামক ডিটেক্‌টিভ গল্পের মধ্যে এরূপ শ্রেণীর গল্প আছে। এরূপ গল্পলেখকগণ ইংরাজী ভাষায় গুপ্ত-মাতৃকার রহস্য কিরূপে উদ্‌ঘাটন করিতে হয় তাহার আভাস দিয়াছেন। মনে করুন এক একটী সংখ্যার দ্বারা ইংরাজী বর্ণমালা নির্দ্দেশ করা হইল। যিনি সাঙ্কেতিক লিপির মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবেন তাঁহাকে স্থির করিতে হইবে কোন সংখ্যাতে বর্ণমালার কোন অক্ষর বুঝাইতেছে। সাধারণতঃ সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত কোনও লিপি পাইলে তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার পক্ষে এইরূপ চেষ্টা করা যায়। প্রথমতঃ গণনা করিয়া দেখা যায় কোন অক্ষরটী অর্থাৎ বাচক সংখ্যাটি সর্ব্বাপেক্ষা লিপির মধ্যে অধিক আছে। এই অক্ষরটী প্রায়ই 'e' হইয়া থাকে। কারণ ইংরাজী ভাষায় যাহাই লেখা যাউক না 'e' অক্ষরটী যত অধিকবার লিখিতে হয় তত আর কোনও অক্ষর নয়। এইরূপে 'e' স্থির হইলে তাহার পর the, he, be, me প্রভৃতি কথাগুলি খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে, কারণ ইহার শেষ অক্ষর 'e'। ইহা হইতে 't' এবং 'h' প্রভৃতি অক্ষরগুলি জানা যায়। এইরূপে দুই তিনটি অক্ষর জানিলে আন্দাজে সমস্ত অক্ষরই বুঝা যায়। রেনল্ডের Mysteries of the Court of London পুস্তকে এইরূপ একটি চিঠির নমুনা ও তাহা পাঠ করিবার সঙ্কেত আছে। এই সকলের অনুকরণে আমাদের দেশের বহু ডিটেক্‌টিভ গল্পেও এই প্রকার গুপ্তলিপির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

পেনিনসুলার যুদ্ধের সময় বিখ্যাত জেনারেল নেপিয়রের (Napier) পত্নী ফরাসী দেশীয় সাঙ্কেতিক গুপ্তলিপির মর্ম্মোদ্ধার কতকটা এইরূপে করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই বিদুষী এই যুদ্ধের সময় ২০০০০ সাঙ্কেতিক লিপি পড়িয়া

বুঝিতে পারেন। তাঁহার স্বামী তাহাতেই তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যাহাতে সাঙ্কেতিক পরিভাষার মর্ম্ম উপরোক্ত উপায়ে সহজে আবিষ্কৃত না হয় তাহার জন্য কতক সতর্কতা লওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ যদি একই অক্ষর একই সংখ্যা কিম্বা চিহ্নদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হয় তাহা হইলে পরিভাষার মর্ম্মোদ্ঘাটন করা কঠিন হয় না। কিন্তু যদি এক অক্ষর স্থলে একাধিক সংখ্যা কিম্বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তবে পরিভাষার জটিলতা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাহারও অসুবিধা এই যে যে তাহা পড়িবে তাহার ঐ জটিলতার দরুণ পাঠ করা বিশেষ কষ্টকর হইবে। তজ্জন্য উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার key অর্থাৎ অনুপাঠ স্থির করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ পরিভাষার key অর্থাৎ অনুপাঠ এইরূপ হইবে যে যেন সহজেই তাহার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে অর্থাৎ প্রত্যেক দুই জনের নিকট একপ্রকার অনুপাঠ থাকিবে যাহা তৃতীয় ব্যক্তির অগোচর, কিন্তু বহুল অনুপাঠের ব্যবহার জন্য কোন লোকের কোন গোলযোগ হইবে না।

সম্প্রতি হাবড়া ডাকাতি মামলার আসামী শৈলেন দাসের স্বীকারোক্তিতে এইরূপ গুপ্ত পরিভাষার কথা প্রকাশ পাইয়াছিল। সংবাদপত্র পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন কিম্বা সংখ্যা ব্যবহার দ্বারা গুপ্তলিপি লেখার আর একটি বিপদ আছে। এই গুপ্তলিপি যাহার হাতে পড়ে সেই এই অর্থশূন্য লিপি দেখিলে সহজে বুঝিতে পারে যে ইহা রহস্যাবৃত। সেইজন্য উহা লিখিবার আর একটি প্রণালী আছে যাহাকে রুসীয় প্রণালী বলে। সংখ্যা ও চিহ্নদ্বারা লিখিত গুপ্ত মাতৃকাকে ফরাসী প্রণালী বলে। রুসীয় প্রণালীতে কোনও নির্দ্দিষ্ট কথার সাধারণ অর্থ ব্যতীত বিশেষ কোনও গুপ্ত অর্থ পরস্পরের মধ্যে স্থির করিয়া লওয়া হয়। এইরূপ গুপ্ত-লিপি দেখিয়া প্রথম দৃষ্টিতে সাধারণ লোকে সাধারণ লিপি বলিয়াই মনে করে। যেমন "মাছিলাগা" অর্থে "তোমার পেছনে লোক লাগিয়াছে"—"ঠাকুর" অর্থে রিভলভার ইত্যাদি। ইহার বিপদ এই যে ভদ্রলোকের নির্দ্দোষ কথা কূটবুদ্ধিতে বিপরীত ভাবে গৃহীত হইয়া তাহাকে অনেক সময় বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তুলে।

কৌতূহলী পাঠকগণের সম্যক উপলব্ধির জন্য কয়েকটী গুপ্তলিপির নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহার চর্চ্চা বিশেষ আনন্দজনক। পাঠকগণের মধ্যে অবসর প্রাপ্ত অনেকেই উহার বিশেষ আলোচনা করিয়া নিজেদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন। পড়ুন,—

g	r	l	n
e	c	i	r
n	d	v	a
t	a	e	e
l	e	a	l
e	r	n	d

ইহা পড়িবার সঙ্কেত—১ম লাইন উপর হইতে নীচে, ২য় তাহার বিপরীত, ৩য় প্রথমের মত, ৪র্থ দ্বিতীয়ের মত। দেখিবেন লেখা আছে,—

"Gentle reader live and learn."

আবার,—

ngv og mpqy vjcv cqw ctg kpvglguvgf kp vjkv cpf k ujcnn dg corna tgyclfgf.

উপরে "a" স্থলে "c", "f" স্থলে "d"·· "z" স্থলে "b" এইরূপ বর্ণপরম্পরায় পড়িলে ইহার অর্থাগম হইবে—

"Let me know that you are interested in this and I shall be amply rewarded."

কোনও চতুর লোক বিলাতে সুবিখ্যাত "Times" কাগজের উপর একবার বেশ একহাত মজা করেন। তিনি উক্ত কাগজে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি ছাপান,

"Tig tjohw it tig jfhivnkz og tig psgvw.—F. D. N."

উপরে প্রত্যেক শব্দের প্রথম অক্ষরটী ঠিক আছে, দ্বিতীয় অক্ষরটী কিন্তু প্রকৃত অক্ষরের একটী পরের অক্ষর, তৃতীয় অক্ষরগুলি ঐরূপে প্রকৃত অক্ষর হইতে দুইটি পরের হইবে। এইরূপ বর্ণক্রমে বরাবর পড়িলে উহার প্রকৃত পাঠ হইবে,

"The "Times" is the Jeffries of the press."

উপরিলিখিত দৃষ্টান্তগুলি সহজ। উহা জটিল করিবার

মানসে কেহ কেহ রূপান্তরিত শব্দের মধ্যে অন্য অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার করিয়া পাঠ দুরূহ করেন। যথা মনে করুন প্রথম লাইনে "a" শব্দের প্রকৃত অর্থ "a"ই হইল কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে উহার মানে "c" আর এক লাইনে "g", অন্যত্র উহার তাৎপর্য্য "z" বুঝিতে হইবে।

অঙ্কের দ্বারা অক্ষর ও অক্ষর দ্বারা অঙ্ক সঙ্কেত করা যায়। যেমন,

৮ ১, ২২, ৫ ; ১৬, ১, ২০, ৯, ৫, ১৪, ৩, ৫ ; ২০, ১৫ ; ১৮, ৫ ১, ৪ ; ২০, ৮, ৯, ১৯।

ইংরাজী বর্ণমালার ২৬টী অক্ষরকে পর্য্যায়ক্রমে ১ হইতে ২৬ নম্বর দিয়া মিলাইয়া উপরের অঙ্কগুলি পড়িলে পাঠ অতি সহজ হইবে—

"Have patience to read this."

ঐ রকমে অক্ষরগুলির সংখ্যা বিপরীত করিয়া অর্থাৎ "a"কে ২৬ দিয়া ক্রমিক "z"কে ১ দিলে "26, 15, 12, 4, 14, 22" পাঠ হইবে, "Allow me."

আবার 17, 6, 1 স্থলে ag-f-a লেখা যাইতে পারে।

"5 meet me 6 at 5s 3ft"

উহার অর্থ,

"Meet me between 5 and 6 at Crown Yard—5s অর্থাৎ এক crown ; 3 ft. অর্থাৎ এক yard.

কোনও দুইজনের একই পুস্তক দুইখানি থাকিলে অন্যের অগোচরে পরস্পর চিঠিপত্র লেখা চলিতে পারে। একজন পুস্তক খুলিয়া পাতা উল্টাইয়া ইচ্ছানুযায়ী শব্দ বাছিয়া লইয়া সেই পাতার নম্বর ও লাইনের নম্বর কাগজে টুকিয়া লিখিয়া পাঠাইলে জগতের সকল ওস্তাদকে পরাজিত করা যাইতে পারে। উপায়টি সোজা। পাঠকগণ নিজে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। পোষ্টকার্ডের প্রথম আবির্ভাবে লোকে মনে করিয়াছিল যে এইবার গুপ্তলিপির বহুল প্রচার হইবে। ফলতঃ অনুমান কতদূর ঠিক পাঠকগণ অবশ্য বুঝিতে পারেন।

দুইখানি তাস কিম্বা সমমাপের অপর দুইখানি কার্ড লইয়া একত্রে (punch) ছেনি দ্বারা সারবন্দী কতকগুলি গোল ছিদ্র করিয়া একখানি নিজে রাখুন ও অপর খানি প্রদেশস্থ কাহারও নিকট রাখুন। সেই কার্ডের নীচে সাদা কাগজ কি পোষ্টকার্ড ফেলিয়া তাহার উপর ছিদ্রের মধ্যস্থিত স্থানে লাইন অনুসারে আবশ্যকীয় শব্দসকল লিখিয়া শেষ করিয়া পরে ছিদ্রযুক্ত কাগজখানি তুলিয়া লইয়া নীচের কাগজের অবশিষ্ট সাদা অংশগুলিতে যা তা শব্দ লিখিয়া পাঠাইয়া দেন, দেখিবেন ঐ অসম্বন্ধ লেখা কেহ পড়িয়া বুঝিবে না, কেবল যাঁহার নিকট ছিদ্রযুক্ত অপর কাগজখানি আছে তিনি উহা চিঠির উপর রাখিয়া ছিদ্রের মধ্যস্থ আবশ্যকীয় কথাগুলি বুঝিয়া লইবেন, বাজে কথাগুলি তখন চাপা থাকিবে। ইহাতে বেশ আমোদ আছে। এই উপায়ে বাঙ্গলা শব্দ লেখা যাইতে পারে। অন্য কোনও উপায়ে বাঙ্গলা শব্দ চালান বড় কঠিন, যুক্ত বর্ণ ও স্বর এবং ব্যঞ্জনের পুনঃ পুনঃ সংযোগ লইয়া বড়ই গোলমাল হয়। অবশ্য বুদ্ধিমান পাঠকগণ নিজের উদ্যমে ও অধ্যবসায়ে এই দুরূহ কার্য্যকেও সহজ করিতে পারিবেন।

উপরে ব্যবসাদারী সাঙ্কেতিক সংবাদ (code initial) সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করা গিয়াছে তাহা অনুপাঠ বা key ব্যতীত সহজে বুঝা যায় না। উহাতে সুবিধা দ্বিবিধ:—১ম আবশ্যকীয় বিষয় গোপন করা ; ২য় বর্ণসংক্ষেপ হওয়ায় তারে পাঠাইবার মাসুল কম লাগে। আমাদের দেশে দেখা যায় যে সচরাচর দোকানদারেরা পণ্য দ্রব্যের মূল্য অন্যের অপরিচিত সঙ্কেত দ্বারা লিপিবদ্ধ করেন। বিলাতে যুবক যুবতীগণ প্রেমপত্রে গানের স্বরলিপি দ্বারা বিশেষ সঙ্কেত প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করেন। উহার সমালোচনা কি দৃষ্টান্ত এখানে অনাবশ্যক।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

আমার চীন-প্রবাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চীনদেশের সকল স্থানেই হোটেল আছে। ভ্রমণকারীকে আশ্রয়ের জন্য বেশি কষ্ট পাইতে হয় না। তবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির খাদ্যাদি সেই জাতির রুচি অনুযায়ী প্রস্তুত

হয়। বিদেশে স্বজাতির প্রস্তুত খাদ্যের ন্যায় খাদ্যাদি আশা করাও সঙ্গত নহে।

চীনদেশে প্রায় প্রত্যেক চীনে পথিকই নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজে বহন করিয়া থাকে। আমাদের দেশের পশ্চিম দেশবাসীর ন্যায় তাহারা একটী বাণ্ডিল বাঁধিয়া ঐ সকল জিনিষ পিঠে লইয়া বেড়ায়। শীত অনুযায়ী বিছানাপত্র বেশি লইবার বড় প্রয়োজন হয় না, কারণ কংয়ের উপর শুইবার বন্দোবস্ত থাকাতে সামান্য বিছানা-পত্রেও শীতে কোন কষ্ট হয় না। নতুবা যেরূপ হাড়ভাঙা শীত তাহাতে ঘরে আগুন নিভিয়া গেলে ছয় সাতখানা কম্বলেও শীত যায় না।

শিষ্টাচার অনুযায়ী শোকে সহানুভূতি করিতে হইলে চীনেরা নীল রংয়ের পোষাক পরিয়া সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাহাদের শোকসূচক পরিচ্ছদ সাদা রংয়ের। সম্রাটের মৃত্যুতে ঐ সাদা পোষাক পরিহিত হয়, কারণ আমাদের ন্যায় চীনেরাও সম্রাটকে পিতৃস্থানীয় জ্ঞান করিয়া থাকে।

চীনের অবস্থাপন্ন লোকের ভিতর কাহারও মৃত্যু হইলে অনেক সময় শুভদিন না পাইলে উক্ত শব একটী শবাধারে রক্ষিত থাকে। পরে শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে কবর দেওয়া হয়। এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া কখন কখন শব কতিপয় মাস অথবা বৎসর পর্য্যন্ত কোন স্থানে সযত্নে রক্ষিত হয়।

চীন সম্রাটের মৃত্যু হইলে একশত দিন যেমন মস্তক মুণ্ডন নিষিদ্ধ, সেইরূপ তাঁহার মৃত্যুতে কোন চীনে সপ্ত-বিংশতি মাসের মধ্যে বিবাহ করিতে পারে না। করিলে তাহার মস্তকচ্ছেদ করা হয়। থিয়েটার ইত্যাদিও ঐ সময়ের জন্য বন্ধ থাকে। তজ্জন্য সম্রাটের অসুখ হইলেই চীনেদের বিবাহের ধূম পড়িয়া যায়।

কোন দোকানে লোককে আকৃষ্ট করিতে হইলে কিম্বা কোন জিনিষে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইলে চীনে ব্যবসায়ী দুইখানি পিতলের রেকাবি অনবরত পরস্পর টুংটাং করিয়া বাজাইতে থাকে। নাপিত ক্ষৌরকার্য্যে বাহির হইয়া ঠিক ঐরূপে শব্দ করিতে করিতে গিয়া থাকে। যাহার দরকার সে ঐ শব্দ শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া লয়।

পিকিনের গাড়ী খুব আরামের না হইলেও নিতান্ত মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। খচ্চরে এই গাড়ী টানিয়া থাকে।
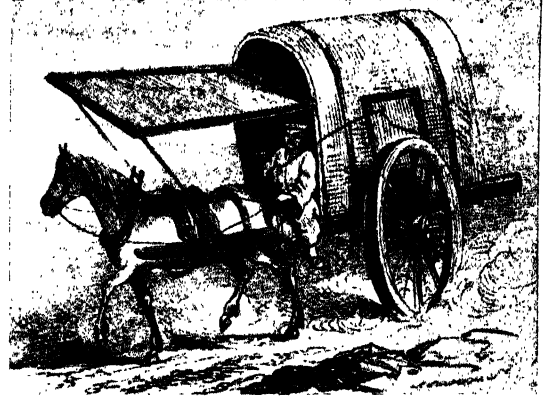
চীন দেশের গাড়ী।

আমাদের দেশের ন্যায় চীনদেশেও কাগজের নানা প্রকার মানুষ, গাড়ী, ঘোড়া, ফুল, ঘোড়সওয়ার ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া রাস্তায় বিক্রয় করে। রেশমী বস্ত্র দ্বারা এমন সুন্দর ফুল তৈয়ারী হয় যে প্রকৃত পুষ্প হইতে তাহার কোনই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

ভারতের মত বন্ধকী কারবার চীনদেশেও খুব চলিয়া থাকে এবং বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত।

গ্রীষ্মাধিক্যে পারদ যখন ১১৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে, সেই সময়ে চীনেরা শরীরের উপরিভাগ অনাবৃত রাখে, শুধু একটী পায়জামা পরা থাকে; পাখা অনবরত চলিতে থাকে; বরফে পানীয় সুশীতল করিয়া সকলেই ব্যবহার করে; চা বরফের মধ্যে রাখিয়া ঠাণ্ডা করিয়া এই সময়ে চীনেরা ব্যবহার করে; শাম-সু নামক দেশী মদও ঐ প্রক্রিয়ায় ঠাণ্ডা করিয়া ব্যবহৃত হয়। এই সময়ে পীচফল, তরমুজ, কুল ইত্যাদি বাজারে আমদানী হইয়া বিক্রয় হয়। চীনে কতকগুলি তরমুজের মধ্যভাগ গাঢ় পীত বর্ণ এবং বেশ সুস্বাদু।

গ্রীষ্মকালে চীনের অবস্থাপন্ন লোকে এক প্রকার পাতলা খড়ের টুপি ব্যবহার করে। সাধারণ লোকে ঐ সময় মাথায় কিছুই পরে না।

চীনের বালকেরা এক প্রকার পোকা ধরিয়া তাহার

পায়ে সুতা বাঁধিয়া ঘুড়ির মত উড়াইয়া খেলা করে। বালক সকল স্থানে একই রকম। ইতস্ততঃ সঞ্চালিত বালুকা-স্তূপের উপর চীনে বালকের দল কেহবা গড়াইয়া পড়িতেছে, কেহ ডিগবাজি খাইতেছে, কেহবা লম্ফ প্রদান করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলেরা আমাদের দেশে যেমন ঘোড়া ঘোড়া খেলে, চীনদেশেও ছেলেদের ঐরূপ খেলিতে দেখিয়াছি।

চীন যুবকদের মধ্যে আর এক প্রকার খেলা দেখিয়াছি তাহা এইরূপ,—একটী মোটা থলিয়ার মধ্যে ৮।১০ সের আন্দাজ লৌহ চূর্ণ পুরিয়া থলিয়ার সিকিভাগ খালি রাখা হয়। মুখটী ভাল করিয়া বাঁধিয়া থলেটী মধ্যস্থলে রাখা হয়। চারি জন চীনে মাঝখানে খানিকটা স্থান রাখিয়া চতুষ্কোণ হইয়া দাঁড়াইয়া খেলা আরম্ভ করে। তুইজন করিয়া এক-এক দল হইয়া থাকে, সুতরাং তুইদলে খেলা সুরু হয়। এক ব্যক্তি পূর্ব্বকথিত থলিয়াটী হাতে লইয়া ২।১ বার ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত করিয়া লুফিয়া লয়। পরে একে অন্য ব্যক্তির হস্তে ছুঁড়িয়া দিলে সে তৃতীয় ব্যক্তির হাতে ঐরূপে দিয়া থাকে, সে আবার চতুর্থ ব্যক্তির হস্তে ফেলিতে থাকে। এইরূপ খেলা চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে। যখন খেলা পূরা দমে আরম্ভ হয় তখন আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতা সহকারে লোহার-গুঁড়াপূর্ণ থলিয়াটী একের হাত হইতে অন্যের হাতে ঘুরিতে থাকে। যাহার হাত হইতে থলেটী ভূমিতে পতিত হইবে তাহার পক্ষ সেবার পরাজিত হইবে। এই খেলা তুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনবরত খেলিতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে শরীরের মাংসপেশীসকল সবল এবং শ্বাসক্রিয়ার উন্নতি হইয়া থাকে। থলিয়াটী ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে একটু উবু হইলে শরীরে মোটেই ধাক্কা লাগে না।

চীনের কসাইগণ খুব চটপটে। এত তাড়াতাড়ি মাংস ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া খরিদ্দারকে দিয়া থাকে যে দেখিলে অবাক হইতে হয়। ভেড়া, শূকর ইত্যাদি কাটিবার সময় উহাদিগকে পা বাঁধিয়া শোয়াইয়া রাখা হয়। পরে একখানি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা গলদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। রক্ত মাটিতে পড়িতে পায় না, একটী শূন্য পাত্রে ধরিয়া রাখিয়া রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

পিকিনে পোষা পায়রার পায়ে এক প্রকার বাঁশি বাঁধিয়া দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়, ঐ বাঁশি তখন বাতাস পাইয়া শীস দেওয়ার মত বাজিতে থাকে। চীন সাম্রাজ্যের আর কোন সহরে এরূপ দেখি নাই।

চীনের অনেক কথা আছে যাহার উচ্চারণ ভেদে বিবিধ অর্থ হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে তজ্জন্য আমাদিগকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইত। এক জিনিষ আনিতে বলিলে চীনে ভৃত্য অপর জিনিষ আনিয়া হাজির করিত।

পিকিনে বৃদ্ধ লোকদিগের মধ্যে এক রকম অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা হাতের মধ্যে একটী পিতলের গোলা রাখিয়া সর্ব্বদাই নাড়িতে থাকে, ইহাতে নাকি তাহাদের বয়সের জন্য হাতের আঙুলগুলি শক্ত না হইয়া কোমলই থাকে।

চীন দেশে ধনুষ্টঙ্কার রোগ খুব বেশি হয়। এই ব্যারাম হইলে চীনে ডাক্তার শরীরের স্থানে স্থানে কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়া থাকে। হাতের কনুয়ের কাছ থেকে কিম্বা অগ্রভাগ হইতে অথবা মধ্যভাগ হইতে রক্ত মোক্ষণ করা হয়। কখন কখন পেট হইতেও রক্ত বাহির করা হইয়া থাকে। চীনের ডাক্তারকে টাই-ফূ বলে। ইহারা শরীরের নানা স্থানের নাড়ী পরীক্ষা করে। তাহাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চারিশত একবার নাড়ী দেখা যাইতে পারে। বসন্তরোগ হইলে তামা দিয়া চুলকাইতে দেওয়া হয়। কোন বাড়ীতে বসন্তরোগ দেখা দিলে সদর দরজার সম্মুখে এক প্রকার চিহ্ন দিয়া রাখিয়া অপর সাধারণ লোককে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। প্রায়ই এই চারিটী কথা লেখা থাকে "চোয়াং—ইউয়েন—টিয়েন—হোয়া"—ইহার অর্থ 'প্রথম শ্রেণীর স্বর্গের ফুল।' আমাদের দেশেও উক্ত ব্যারামকে 'মাতার আবির্ভাব', 'মায়ের কৃপা' ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। পাণ্ডুরোগকে চীনেরা পীত ব্যারাম বলে। ইহাদের মধ্যে এই ব্যারামের জন্যে এক প্রকার ওষধি আছে, তাহাকে 'ইন-চি-এন' বলে। ইহার কাথ বাহির করিয়া সুগন্ধি করা হয়। চীনেদের প্রায় সমস্ত ঔষধই আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের ন্যায় গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত এবং বেশ সুগন্ধযুক্ত। কামলা রোগে আর এক প্রকার প্রক্রিয়া করা হয় তাহাতে নাকি গায়ের হলুদপারা রং গিয়া স্বাভাবিক

রং ফিরিয়া আসে। প্রক্রিয়া এইরূপ,—ময়দা জলে গুলিয়া পুল্‌টিস করিয়া উদরের উপর প্রলেপ দেওয়া হয় এবং মোম গলাইয়া একখানি কাগজে মাখাইয়া একটী নল প্রস্তুত করা হয়। রোগীকে আগুনের পাশে এক স্থানে শোয়াইয়া ঐ নলের একটী মুখ পেটের প্রলেপের সহিত সংলগ্ন করিয়া অপর মুখ আগুনের খুব নিকটে ধরা হয়। গরমে মোমলিপ্ত কাগজখানি যখন আর ধরিয়া রাখা যায় না তখন দেখিতে পাওয়া যায় কাগজখানি অনেকটা পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। গাত্রের স্বাভাবিক রং ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। চীনেদের এই চিকিৎসার উপর ভারি বিশ্বাস। শুনিয়াছি বসন্তরোগের সময় চীনেরা উক্ত রোগের মামড়ী বালকের নাকের মধ্যে রাখিয়া দিয়া থাকে। তাহাতেই টীকা দেওয়ার কাজ হয়। এই প্রক্রিয়া বোধ হয় অধিক বিপদজনক।

আমাদের দেশের অঘোরপন্থীদের মত চীনের অনেক ভিক্ষুক শরীরের কোন স্থান হইতে রক্ত বাহির করিয়া লোকের দয়া আকর্ষণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। কোন সময়ে ভারতের এক সুদূর প্রদেশে এক ভিক্ষুককে শরীরের নানাস্থানে পচামাংস লেপ্‌টাইয়া তাহার সহিত রক্ত মিশ্রিত করিয়া ময়দা দিয়া লাগাইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। অনেক পথিক দয়াপরবশ হইয়া প্রত্যহই তাহাকে কিছু কিছু দান করিত। পরে একদিন সেই ব্যক্তির শঠতা প্রকাশ হইয়া পড়ায় সে তথা হইতে পলাইয়া যায়। এরূপ ঘটনা অনেক দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। ধূর্ত্তদের চালচলন সৃষ্টি বহির্ভূত।

চীনদেশে কোন জিনিষই অপচয় হইতে পায় না। অতি তুচ্ছ জিনিষও কোন না কোন কাজে লাগাইয়া তাহার উপকারিতা প্রমাণ করা হয়। এমন কি নদী দিয়া যেসমস্ত আবর্জ্জনা ইত্যাদি ভাসিয়া যায় লোকে তাহাও ধরিয়া জমিতে সার অথবা জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

অনেক বিদেশীয়ের ধারণা চীনেদের বায়ুবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই কিন্তু কয়লার খনি দেখিলে, আমার বিশ্বাস, সে ভ্রম দুর হইতে পারে। তাহাদের কয়লার খনির মুখে একটী ঘরে বড় একটা কং জ্বালান হইয়া থাকে। সে ঘরটী এত গরম যে তাহার মধ্যে অল্প সময়ও তিষ্ঠান দায়। উক্ত কংয়ের উত্তাপে খনির মধ্যে দূষিত বায়ু জমিতে পারে না। তাহাতেই বোধ হয় খোলা আলো লইয়া চীনেরা খনির মধ্যে গতিবিধি করাতে কোনরূপ বিপদ ঘটে না।

চীন দেশে ইস্পাত তৈয়ারীর একটী সামান্য প্রক্রিয়া দেখিয়াছি। প্রথমে এক টুকরা লৌহ অগ্নিতে খুব লাল করিয়া একটী কটাহপূর্ণ কয়লার টুকরার মধ্যে রাখা হয়। কটাহ অগ্ন্যুত্তাপে বেশ গরম থাকে। একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পরে উক্ত লৌহ বাহিরে রাখিয়া আপনাআপনি ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া হয়। এইটী প্রথম প্রক্রিয়া।

চীনে থাকা সময়ে একদিন গুলির আড্ডা দেখিতে বাহির হইয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম চীনেরা আফিমের নেশায় বুঁদ হইয়া বসিয়া থাকে। তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই আমাদের এই অভিনব অভিযান। বেশ বড় একটা আড্ডায় চীনে দোভাষীকে সঙ্গে লইয়া সশরীরে গিয়া হাজির হইলাম। তখন আমরা অনেক চীনে কথা শিখিয়াছি। মনের ভাব আদানপ্রদান করিতে আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। তবুও দোভাষীকে সঙ্গে লইলাম, কি জানি পাছে কোন বিপদ ঘটে। আড্ডা ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন চীনে বেশ সবলকায়, আমাদের দেশের গুলিখোরের মত নহে, গড়া গড়া বিছানায় পড়িয়া একটা পিতলের হুকা (অনেকটা পাইপের মত) এবং নল আর কতকগুলি 'গুলি' লইয়া মহা আরামে খাইতেছে আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া আছে। আহা! কি অপরূপ দৃশ্য, দেখিলে করুণ রসের উদয় হয়। আমাদের আড্ডা প্রবেশের কথা ৩।১ মিনিট কেহই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যখন চোক চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিল ২।৩টী সৈনিকবেশধারী পুরুষ গৃহ মধ্যে, এমন কি আরাম শয্যার অতি নিকটে, একদৃষ্টে তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছে, অমনি সকলে একপ্রকার অস্পষ্ট শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিল। তখন তাহাদের নেশার ঝোঁক কাটিয়া গিয়া আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। আহা বেচারীদের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হইল। তাহারা মনে করিল আমরা তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে গিয়াছি। কিন্তু যখন আমরা

বলিলাম 'ওয়া ইয়াও তায়েন চো-চো' অর্থাৎ 'আমি গুলি খাইতে চাই,' তখন তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল 'নি তায়েন চো-চো' অর্থাৎ আপনিও গুলি খাইবেন! প্রথমে একথা যেন তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু যখন দোভাষী আমাদিগের কথার সমর্থন করিয়া বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল তখন আর পায় কে। সকলে একযোগে উঠিয়া সমুদয় সরঞ্জাম ইত্যাদি আমাদের সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। নূতন হুঁকাও আসিল এবং অনেকে 'হাউ তায়েন চো-চো' অর্থাৎ 'গুলি খাওয়াটা বেশ ভাল' ইহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার বিশেষ চেষ্টা পাইল। কিন্তু হায়, স্বর্গীয় অধিবাসীদের স্বর্গের এই অমৃতরসে আমরা বঞ্চিত হইলেও তাহাদের সাদর অভ্যর্থনায় আমরা বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। আমরা যে 'গুলি' খাই না, শুধু দেখিতে আসিয়াছি, এ কথা তাহাদিগকে না বলিয়া 'আমরা এখন সরকারী কার্য্যে বাহির হইয়াছি, এখন যদি খাই আমাদের উপরের মাণ্ডারিন জানিতে পারিলে বিশেষ শাস্তি পাইতে হইবে' এইরূপ বুঝাইয়া দিলে তাহারা কিছু বিষণ্ণ হইল বটে, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিল 'হাউদি-হাউদি', অর্থাৎ 'খুব ভাল।' কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমরা বিদায় লইলাম। সকলে একযোগে আমাদের আগু বাড়াইয়া রাস্তা পর্য্যন্ত রাখিয়া গেল, এবং যে হুঁকা ইত্যাদি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য আনিয়াছিল তাহাও দোভাষীর নিকট গতাইয়া দিল। স্বর্গীয় অধিবাসীদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে আমরাও তাহাদেরই সঙ্গী। আহা, তাহাদের সে সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া দেওয়া নিষ্ঠুরতার লক্ষণ বলিয়া আমরা নীরবেই চলিয়া আসিলাম।

মাঞ্চুরিয়া-প্রান্তে শান-হাই-কোয়ানে অবস্থান সময়ে চীনের মহা প্রাচীরের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে নূতন নূতন অনেক দৃশ্য দেখিয়া নয়ন মন বিমোহিত হইত। এখানকার সমুদ্রতীরের দৃশ্যও অতি মনোরম। জর্ম্মানদিগের একখানি পিসবোর্ডের ঘর পি-চিলি উপসাগরকূলে স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম আমেরিকায় না কি ঐরূপ কাগজের ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। তখন ধারণায় আসিত না কি করিয়া কাগজের ঘর তৈয়ারী হইতে পারে। কিম্বা হইলেও উহা যে ছেলেখেলার মত হইবে ইহাই বোধ হইত। কিন্তু চীনপ্রবাসকালে উহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয়ে অননুভূত আনন্দ অনুভব করিয়াছি। কথিত গৃহ আমূল কাগজ দিয়া প্রস্তুত। সবুজ রংয়ে রঞ্জিত এবং পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত। একজন জর্ম্মান গার্ড অতি আগ্রহের সহিত সকল খুঁটিনাটি আমাদিগকে দেখাইয়াছিল। মাটির উপর মঞ্চ সদৃশ করিয়া তাহার উপর গৃহ স্থাপিত। মেজেও কাগজের, মঞ্চের নীচে ফাঁকা। দোর জানালাগুলি দেওয়ালের সঙ্গে বেশ মানানসই ভাবে পরাইয়া দেওয়া। এমন সুন্দর ভাবে জোড়া মিল এবং বন্ধ হয় যে বায়ু কি আলো মোটেই প্রবেশ করিতে পারে না। গৃহের প্রত্যেক অংশ খুলিয়া মুড়িয়া লওয়া যায়। তাঁবু খাটানর মত একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়া স্থাপিত করার বেশ সুবিধা। দেখিয়া বোধ হয় না যে কাগজের, এত মোটা পিসবোর্ড এবং এরূপভাবে জমাটবাধা। এটা একটা অভিনব দৃশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গৃহে মরিচা ধরে না, উইয়ে খায় না কিম্বা ঘুণ লাগে না, জলে গলে না বা আগুনে শীঘ্র পুড়ে না।

আমরা প্রায়ই সমুদ্রে স্নান করিতে যাইতাম। সপ্তাহে একবার ত বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল। আমাদের সামরিক বাসস্থান হইতে ট্রলি করিয়া সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত যাইতাম। সমুদ্র পর্য্যন্ত মালপত্র আনিবার জন্য সঙ্কীর্ণ রেল লাইন পাতা হইয়াছিল। ঐ ট্রলি বা গাড়ী খচ্চরে টানিত। সাগরস্নান খুব স্বাস্থ্যকর। ইহার উপকারিতা স্নানের পর বেশ বুঝিতে পারা যায়। স্নান করিয়া উঠিলেই গা দিয়া ঘাম বাহির হইতে থাকে, এবং খুব স্ফূর্ত্তি বোধ হয়। জল লবণাক্ত বলিয়া মাথার কেশ কিছু চটচটে হয় বটে। স্বাদু জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলেই সে ভাব চলিয়া যায়। সমুদ্রে স্নানের দিন প্রত্যহই সাঁতার কাটিতাম। একদিন সাঁতার দিতে গিয়া প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় বাঁচিয়া আসিয়া আজ এই প্রবন্ধ লিখিবার অবসর পাইয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল আমাদের সঙ্গে বাঙ্গালী ধুতি ইত্যাদি

কিছুই ছিল না। যাহা লইয়া গিয়াছিলাম ছমাসের মধ্যেই সমুদায় ন্যাকড়ায় পরিণত হইয়া বাঙ্গালীর বাঙ্গালিত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং ধুতি ছাড়িয়া ঢিলে পায়জামা সার হইয়াছিল। তখনকার পোষাক এবং চীনে ভাষা ব্যবহার যদি কোন আত্মীয় স্বজন দেখিতেন তাহা হইলে চিনিতে পারিতেন কিনা সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। আমাদের কাপড়ের একটা সুবিধা আছে, পরিয়া স্নান করিয়া সহজেই আবার শুকাইয়া লওয়া যায়। অন্য জাতির পোষাকের সে সুবিধা নাই বলিয়া তাহাদের উলঙ্গ হইয়া স্নান করাই রীতি। আমি স্নান করিতে গিয়া অন্য সকল জাতির ন্যায় উলঙ্গ হইয়া নাহিতে পারিতাম না। কারণ অস্থিমজ্জাগত অভ্যাস দুদিনে ত্যাগ করা আমাদের মত বাঙ্গালীর সম্ভবপর ছিল না। তবে যে কেহ কেহ চিরকেলে অভ্যাস দুদিনে কি করিয়া উল্টাইয়া দেন, তাহার কারণ তাঁহারাই বলিতে পারেন। পায়জামা-পরিহিত অবস্থাতেই স্নান করিতে নামিতাম। পায়জামা গুটাইয়া হাঁটুর উপরিভাগে গাঁইট বদ্ধ করিয়া রাখিতাম। একদিন সমুদ্রে বেজায় ঢেউ। তালগাছ সমান উঁচু ঢেউগুলি একের পর একটী, তার পর আর একটী, এইরূপ অগণন নৃত্যশীল লহরমালা কূলে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে। সেদিন সাঁতার দিয়া সবে ৩০।৪০ হাত দূরে গিয়াছি আর পায়জামার গাঁইট খুলিয়া ঢেউয়ে ঢেউয়ে হাঁটুর নীচে নামিয়া আসিল। আমি ত একেবারে কাবু, পা আর নাড়িবার ক্ষমতা রহিল না, অসাড় অবস্থায় চিৎ হইয়া যতদূর সম্ভব হাত পা নাড়িয়া জলের উপর কোন প্রকারে ভাসমান রহিলাম। ক্রমে দুই চারি ঢোক জল গলার মধ্যে গিয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত করিল, বোধ হইল অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবে। সে জল যে কি তিক্ত, কি কটু তাহা আর কি বলিব; যেদিন বামুনঠাকুরের অনুগ্রহে কোন তরকারিতে লবণ কিছু বেশি হয় তাহা খাইতে যেমন স্বাদ, পাঠক তাহা হইতেই কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া লইবেন। অদূরে শতাধিক গোরা সৈন্য সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া পোস্তার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িতেছে, সাঁতার কাটিতেছে, কিন্তু অভাগা যে ডুবিতে বসিয়াছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছে না। আর তাহারা আমার এ অবস্থা জানিবেই বা কিরূপে, তাহারা মনে করিয়াছে আমি বুঝি খুব কায়দার সহিত সাঁতারই দিতেছি। আমার সঙ্গী আরও দুইটী বাঙ্গালী বন্ধু ছিলেন, তাঁহারাও সাঁতার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কূলে ফিরিয়া গিয়াছেন, আর আমি অতলজলে হাবুডুবু খাইতেছি,—শুধু হাবুডুবু নহে অনেকটা জলও খাইয়া ফেলিয়াছি। ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসিয়া যেন করালমূর্ত্তি ধরিয়া গরীব বেচারীকে গ্রাস করিতে উদ্যত। তখন মনে মনে ভাবিলাম হায় ভগবান, শেষে কি চীনের দেশে, সুদূর মাঞ্চুরিয়া-প্রান্তে সমুদ্রগর্ভে এ অভাগার চিরবিশ্রামের ব্যবস্থা হইল! বাঙালীর ছেলে যুদ্ধে আসিয়াছিলাম, ইহার চেয়ে যে যুদ্ধে মরা ছিল ভাল। বাঙালীর বোধ হয় যুদ্ধে মরা অদৃষ্টে নাই, তাহাকে ডুবিয়াই মরিতে হইবে এই তাহার বিধিলিপি! আচ্ছা প্রভু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। কখনও ভাবিতেছি শুনিতে পাই সমুদ্র কখনও অপর বস্তু গ্রহণ করেন না, তবে কি সেটা মিথ্যা কথা! কখনও পূজনীয় রামমোহন রায়ের সেই গানটী "আমায় কোথায় আনিলে" মনে হইতেছে। এইরূপ নানা কথা বায়স্কোপের চিত্রের মত মনের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় ভগবানকে ধন্যবাদ, একটী প্রকাণ্ড ঢেউ (দ্বিতল সমান উঁচু) আসিয়া নিমজ্জমান যে আমি, আমাকে লইয়া আর সকলকে যেন উপেক্ষা করিয়া একেবারে তীরে, বেলা-সৈকতে রাখিয়া দিল; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বিষম আকর্ষণ, সমুদ্র মধ্যে লইয়া যাইবার উপক্রম। আমি ত যথাশক্তি বালুকাময় ভূমি আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া রহিলাম, ঢেউ ফিরিয়া চলিয়া গেল। আমার চোক মুখ নাক কান দিয়া, এক কথায় সমস্ত শরীর দিয়া, যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল; আমি ত ৪।৫ মিনিট ধরিয়া বালুকাশয্যায় পড়িয়া রহিলাম। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া বন্ধু দুইটী ছুটিয়া আসিলেন, এবং আমার অবস্থা দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া আমি তাঁহাদিগকে

সমুদয় বলিলে তাঁহারাও ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তখন সকলে মিলিয়া ভগবানের গুণগান করিতে করিতে বাসায় ফিরিলাম। এই ঘটনার পরেও সাগর স্নান করিয়াছি এবং সাঁতারও কাটিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বের মত আর বোকামির ফল ভোগ করিতে হয় নাই। এই আমার চীনপ্রবাসকালের মোটামুটি অভিজ্ঞতা। এখন পাঠকগণ সমীপে বিদায় হই। শ্রীআশুতোষ রায়।

সত্য

শিশুটিরে ফেল্লে যখন জলে,
ডুবল্‌না সে নাচলো কমল দলে,
বিস্ময়ে তাই দেখলো হাজার লোকে,
জলের পরে আসছে ছুলি ছুলি।
ফেলে দিলো সিংহ করীর পায়ে,
ধুলা তারা ঝাড়লো তাহার গায়ে,
কেশরী তার চাট্‌লো চরণ রাঙা,
হস্তী তাহায় পৃষ্ঠে নিল তুলি।
আগুনে তায় ফেল্‌লে অবোধ যত,
নিভ্‌লো আগুন। ইন্দ্রধনুর মত
তোরণ হ'য়ে জাগ্‌লো তাহার শিরে,
মুছে দিল গায়ের যত মলা।
প্রহ্লাদ—এ সত্য—শিশুটীরে
জল্লাদে তার করবে বল কিরে ?
আহ্লাদে সে করবে হরিনাম,
যত কেন বাঁধো তাহার গলা।
মণিময় ও স্তম্ভ ভেঙে চূরে
নৃসিংহ যে জাগ্‌বে দানবপুরে,
মিথ্যাসুরের সব মায়াজাল ছেদি
ভাঙ্‌তে ফাঁকি রাঙা নখর বহি !
ভ্রান্তি দ্বিধা মিথ্যা ধরি' ধরি'
উদর চিরে ফেলবে জাম্বুর পরি।
জোড় করেতে দেখ্‌বে চেয়ে চেয়ে
শেষ কালেতে সত্য হবে জয়ী।

শ্রীকালিদাস রায়।

বিধবার কাজ ও ব্রহ্মচর্য্য

হিন্দু শাস্ত্র যেমন বিধবার জীবন যাপনের জন্য কঠোর বিধি প্রচলন করিয়াছেন, জগদীশ্বরও সেইরূপ তাঁহাদের জীবনের উচ্চব্রত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের অজ্ঞতা বা ঔদাস্যবশতঃ একদিকে যেমন ব্রহ্মচর্য্যার নিয়ম শিথিল হইয়া গিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ শিক্ষার অভাবে বিধবারা তাঁহাদের জীবনের কাজের দায়িত্ব বুঝিতে অক্ষম রহিয়াছেন। অবশ্য দুই চার জন এরূপ উদারস্বভাবা ও মহৎহৃদয়া মহিলা আছেন যাঁহারা আপনা হইতেই আত্মীয় স্বজনের সেবা ও পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রৌঢ়া ও প্রবীণা বিধবাদের কথা আমি বলিতেছি না, ভগবান হয় ত তাঁহাদিগকে সন্তান সন্ততি দিয়াছেন অথবা পরিণত বয়সে তাঁহারা নিজেই নিজ কাজ বুঝিয়া লইতে পারেন। আমি ভাবিতেছি ঐ হতভাগিনী বালবিধবাদের কথা। সংসারে প্রবেশের পূর্ব্বেই যাহাদের কাছে সংসার মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করে; জীবনের সুখাস্বাদ গ্রহণের প্রারম্ভেই যাহাদের জীবন শ্মশানে পরিণত হয়—সেই অবলা, কোমলা, নির্দ্দোষী অথচ দুর্ভাগ্য বালিকাদের মুখের দিকে চাহিবামাত্রই আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে! এরূপ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য জগতে আর কোন দেশে নাই! মনে হয় এই অবোধ বালিকারা কি পাপ করিয়াছে যে হিন্দু শাস্ত্রকার তাহাদের প্রতি এরূপ কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

যদি বলি, যাহারা স্বামী কি পদার্থ বুঝে নাই, স্ত্রীর গুরুত্ব জানে নাই, সংসারের দায়িত্ব যখন মাথায় লয় নাই, সেই কুমারী বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া গৃহিণীর আসনে বসাইয়া দাও, উহারা জগতের অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া, সন্তান ধারণ ও সন্তান পালন দ্বারা হাসিয়া খেলিয়া জীবন অতিবাহিত করুক; তবে অমনি হিন্দু পিতাগণ দশমুখে শাস্ত্রের দোহাই দিবেন, অবশেষে চন্দ্রনাথ বাবুর "হিন্দুপত্নী" শীর্ষক প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। আমি হিন্দু শাস্ত্র অধিক পড়ি নাই, তাহার মূল বিধিগুলি জানি না। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকাট্য শাস্ত্রবিশ্লেষণ পড়িয়াছি। আর রামায়ণ মহাভারত পাঠেও

জানিয়াছি পুরাকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের মধ্যেও সন্তান-হীনা বিধবাদের পুনরায় স্বামী গ্রহণের প্রথা ছিল। তা ছাড়া, চন্দ্রনাথ বাবুর 'হিন্দুপত্নীর' যথার্থ মর্ম্ম কয়জন বুঝিতে পারেন? যখন অনেক প্রবীণা ভার্য্যাও বহু বৎসর স্বামীর সঙ্গে ঘর করিয়াও পতিতে মিশিয়া যাইতে বা পতির আত্মীয়দিগকে নিজের করিয়া লইতে পারেন না, তখন যে ১২।১৩ বৎসরের বালিকা, বিধবা হইলেই—শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়া—চিরজীবন সেই অপরিচিত বালক স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া দিন কাটাইতে পারিবে ইহা যে একরূপ অসম্ভব।

কিন্তু আমরা জোর করিয়া স্বাভাবিক গতি রোধ করিয়া ঐ অপরিপক্ক জীবনটাকে যদি শুকাইয়া ফেলিতে চাই বা উহাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে চালাইয়াও উহাকে সজীব রাখিতে চেষ্টা পাই, তাহা হইলে প্রথম হইতেই ঐ বালিকাগুলির শিক্ষার অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যে দিন হতভাগিনীর স্বামী ইহলোক ত্যজিয়া যায়, সেই দিন হইতেই তাহার মনে যেন এই ভাব বদ্ধমূল হয় যে ভগবান তাহাকে অন্য প্রকারে জীবন যাপিবার জন্য ও অন্যরূপ লক্ষ্য জীবনের উদ্দেশ্য করিবার নিমিত্ত সৃজন করিয়াছেন। সংসার প্রবেশের পূর্ব্বেই সে যখন প্রধান সংসারসুখে বঞ্চিত হইয়াছে তখন এ জগতের ঐহিক সুখসম্ভোগে তাহার আর কোন অধিকার নাই। নিষ্কামভাবে জীবন যাপিলে সাংসারিক সুখের অপেক্ষাও অধিক উন্নত আনন্দ ও বিমল শান্তি তাহার আয়ত্ত হইতে পারে। শরীর ও মনের সংযম, ইন্দ্রিয় দমন, পরের সেবা ও সাধারণের কাজে জীবন উৎসর্গ দ্বারা সে ইহজগতে প্রচুর শান্তি ও আনন্দ পাইবে, নতুবা তাহার জীবনে সুখের সহিত শান্তি, উল্লাসের সহিত আনন্দ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইবে, এক ভয়ঙ্কর আকাঙ্ক্ষা ও নিরাশার আগুনে যাবজ্জীবন জ্বলিতে থাকিবে। সেই কোমল অথচ হতাশাপূর্ণ প্রাণটাকে ইহজগতের মরুভূমি হইতে তুলিয়া স্বর্গের উপবনে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করুন, ইহজীবনের অস্থায়ী বাসনা আকাঙ্ক্ষা ত্যজিয়া যাহাতে সে পরজীবনের উচ্চ সুখশান্তিতে অধিকারী হইতে পারে, সংসারের ক্ষণিক উল্লাসের পরিবর্ত্তে পরকালের অনন্ত আনন্দে ডুবিতে পারে—সেই অক্ষয় অমর শান্তির জন্য ঐ জীবনগুলিকে প্রস্তুত করুন, দেখিবেন তাহাদের ভবিষ্যতে কি হইবে ভাবিয়া আর আমা-দিগকে ব্যাকুল হইতে হইবে না। এই মহৎ কাজ সাধনের জন্য বালবিধবাদের পিতামাতা ও শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি অভিভাবকদিগকেই প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত একবার অভ্যাস হইয়া গেলে উহা সমাজের আর কঠোর শাসন বলিয়া কখনই বোধ হয় না। মাছ মাংস আহার না করা যে বিশেষ কষ্টকর তাহা নহে। উহা কিছুদিন না খাইলে আপনা হইতেই উহাতে একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। জৈনেরা ও পশ্চিমের ব্রাহ্মণেরা কখন আমিষ ভক্ষণ করেন না, তাঁহারা স্বভাবতঃই জীবহত্যা করিয়া আহারকে অতি গুরুতর পাপ মনে করেন। আত্মীয়ের মধ্যেও অনেক সধবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিরামিষ আহার করেন। আর মোটা বস্ত্র পরিধানে অভ্যস্ত হইলে স্ত্রীলোকেরা অতি চিকণ কাপড় পরিতে স্বতঃই লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। আবার প্রাণে বৈরাগ্য আসিলে কোন বিধবাই চুল কাটিয়া ফেলিতে বা সন্ন্যাসিনী সাজিতে অনিচ্ছুক হন না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যার এই বাহ্যিক উপকরণগুলি বিধবার জীবনে কি প্রকারে আনিতে হইবে? আমার মতে জীবনে বৈরাগ্য আনয়নের একমাত্র উপায় জ্ঞান ও কাজশিক্ষা। অজ্ঞান ও নিষ্কর্ম্মা জীবন দ্বারা এ জগতের যত অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

অধিকাংশ প্রবীণা স্ত্রীলোকদের স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গেই মনে একটা দারুণ বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসিনী করিয়া দেয়। তাঁহারা পতির সঙ্গেই জীবনের যত বাসনা কামনা ও সুখাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞান ও দুর্ব্বল তাঁহারা নীরবে মৃত্যুর অপেক্ষা করেন, আর যাঁহাদের শিক্ষা ও শান্তি আছে, তাঁহারা কার্য্যস্রোতে জীবন ভাসাইয়া পরহিতের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন।

কিন্তু শিক্ষাহীনা শক্তিহীনা ও উদ্দেশ্যবিহীনা বাল-বিধবাদের জীবনে প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে আপনা হইতেই কাজের ও ব্রহ্মচর্য্যার দিকে লওয়ান যে কত গুরুতর ব্যাপার তাহা লিখিয়া বুঝান অসাধ্য। সমাজের শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকদের জন্য আইনের দরকার

হয় না, মূর্খ বা অজ্ঞান ব্যাক্তিদের মধ্যেই চৌর্য্য বা হত্যা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পাপকার্য্য নিবারণের নিমিত্ত আইনের দণ্ডবিধান করিতে হয়। সেইরূপ অবোধ বালবিধবাদের জন্যই শাস্ত্রের বিধান আবশ্যক। কিন্তু শাস্ত্রের আজ্ঞা অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন—জ্ঞান ও সংযমশিক্ষা।

নানারূপ সুশিক্ষা পাইয়া যে মনটী মার্জিত, উন্নত ও সংযত হইয়াছে তাহার কাছে কোন মন্দ অভ্যাস ত্যাগ বা শারীরিক সুখ আরাম ও আয়েস বিসর্জ্জন দেওয়া বেশি কষ্টকর বোধ হয় না। আমি দেখিয়াছি যে একটী অজ্ঞ ও অশিক্ষিতা বিধবাকে শুভ্রবেশ পরাইবার জন্য আত্মীয়-দিগকে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে। কিন্তু যে বালিকা-দিগকে পিতামাতা প্রথম হইতেই সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞান ধর্ম্মে প্রণোদিত করেন, তাঁহারা অল্প দিনের মধ্যেই স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচারিণী হইয়া পরসেবায় ও জগতের কাজে জীবন সমর্পণ করেন। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বালিকারা বিধবা হইবামাত্র, তাঁহারা যে সংসারের আবর্জ্জনা নন, কোন বিশেষ কাজের জন্য আদিষ্ট হইয়া জগতে আসিয়াছেন, এইরূপ ভাবিয়া তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত।

ব্রহ্মচর্য্য কথাটী যত সহজ কাজটী তত নয়। বাহ্যিক অপেক্ষা আন্তরিক বৈরাগ্যই অধিক ফলপ্রদ। শারীরিক ত্যাগ স্বীকারের সঙ্গে মনের বাসনা, কামনা ও সুখাশা বিসর্জ্জন দেওয়াই প্রকৃত বৈরাগ্য। এরূপ বৈরাগ্য দুর্ব্বল ও অসংযত মনে কখন স্থান পায় না। সে কারণে প্রথম হইতেই উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ঐ কোমল মনগুলিকে সবল ও সংযত করিয়া উহাদিগকে নিষ্কাম ভাবে পরের জন্য কাজ করিতে শিখাইলে তাহাদের দ্বারা জগতের অনেক মহৎ কাজ সাধিত হইতে পারিবে। ইউরোপের ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কুমারীদের দ্বারা সাধারণের যে সব উপকার সাধিত হয়, আমাদের দেশের বিধবারা শিক্ষা পাইলে অনায়াসে সেই সব কাজ করিতে পারিবেন। যাঁহাদের কোনরূপ সংসার-বন্ধন নাই, স্বামীসন্তানদের প্রতি কর্ত্তব্যের দায়িত্ব নাই, তাঁহারা সরলপ্রাণে জগতের কাজে জীবন উৎসর্গিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আমরা বিধবাদের এই কার্য্যশক্তি হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি।

বোম্বাইয়ের সারদাসদন, পুনার বিধবাআশ্রম ও কলি-কাতার শিল্পসমিতি স্থাপন দ্বারা যে মহোদয়ারা বিধবাদিগকে নানারূপ বিদ্যা জ্ঞান ও শিল্পকার্য্যে সুশিক্ষিতা করিয়া তাঁহাদের জীবনে নূতন কাজের পথ ও জীবিকার উপায় খুলিয়া দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্রী। কিন্তু এত বড় দেশে ২।৩টী বিধবাশ্রমে কি হইবে? তাঁহাদের জন্য বালিকা বিদ্যালয়ের ন্যায় প্রতি নগরে এক একটী আশ্রম বা শিক্ষালয়ের আবশ্যক। ঐসব শিক্ষালয়ে শিক্ষা পাইয়া তাঁহারা সকল কার্য্যে পার-দর্শিনী হইলে সহজেই তাঁহারা দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যা ও জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিবেন। এদেশে যেসব অঞ্চলে অবরোধ প্রথা নাই সেখানে বিবাহিতা মেয়েদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার প্রচলন নাই, সুতরাং অন্তঃপুর-শিক্ষার ভার বিধবাদিগকেই লইতে হইবে।

তাহা ছাড়া প্রতি গৃহে রোগীদের সেবা সচরাচর বিধবারাই করিয়া থাকেন। এই মহৎ কাজটী উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে উহার জন্য যে কত শিক্ষা, ধৈর্য্য ও আত্মত্যাগ আবশ্যক তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। সে কারণে এই সেবাব্রতের জন্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিধবাদের জন্য শিক্ষালয় থাকা আবশ্যক। কারণ, আমাদের দেশে এখনও ভদ্র হিন্দু বিধবারা হাঁসপাতালে গিয়া সেবিকা বা নর্সের কাজ শিখিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এই সব গুরুতর কাজের ভার লইতে হইলে প্রথমে বিধবাদের চরিত্রগঠন একান্ত প্রয়োজনীয়। এই চরিত্রগঠনের প্রথম সোপান—স্বার্থত্যাগ; দ্বিতীয়—আত্মশাসন; তৃতীয়—আত্মবিসর্জ্জন। এ জগতে যে ব্যক্তি যতখানি স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাঁহা দ্বারা ততখানি বেশি পরের কাজ হয়। মানব-মনের কর্ষণের সঙ্গে স্বার্থের ইচ্ছা দূর হইলেই উহা স্বতঃই পরার্থের দিকে ধাবিত হয়। তখন হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি যত মলিনতা অন্তর হইতে চলিয়া যায়। আত্মশাসন দ্বারা সংযমশিক্ষা হয়; যে-কোন কুবাসনা বা অসৎ প্রবৃত্তি মনে উদিত হইবা মাত্র উহা দমিত হইলে মন সুসংযত ও চরিত্র সবল হয়। স্বার্থবর্জ্জিত ও আত্ম-

শাসিত মনের কাছে আত্মবিসর্জ্জন অতি সহজ কাজ হইয়া আসে। একটী অসংযত মনে সামান্য পানখাওয়ার অভ্যাসটী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কত কষ্ট পাইতে হয়, কিন্তু একটী সুশাসিত মন আফিমের নেশা পর্য্যন্ত অনায়াসে ছাড়িতে পারে। ইহাতেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে সংযত মনের শক্তি কত প্রবল, ও সুশাসিত চরিত্র কত সবল। সে কারণে প্রথম হইতেই বিধবাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি দ্বারা সংযম শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের চরিত্র গঠন করিলে তাঁহারা এ জগতে নিরাপদে আপন আপন কাজ করিয়া যাইবেন, ইহাতে সমাজেরও প্রচুর লাভ হইবে ও দেশেরও মহা কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

মিনতি

আমার কুটীর- দুয়ারে যখন
তোমার বার্ত্তা ক'য়ে
মৃদু মর্ম্মরে শীতের সমীর
ধীরে গিয়াছিল ব'য়ে,
জানা'তে তোমারে একটী মিনতি
বলিয়া দিয়াছি তা'য়,
এই ভিখারীর ভিক্ষার কথা
বলেছে কি তব পায়?
করুণা করিয়া সখাহে, আমারে
প্রেম ধনে কর ধনী,
সুদূর প্রবাসে কাটা'ব দিবস
মিলনের দিন গণি।
অশ্রু সলিলে সিক্ত করিয়া
কঠোর এ হৃদি, প্রিয়,
বারেক তোমার রাজীব চরণ
অঙ্কিত করি দিও!

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

দিল্লীতে একদিন

আমি এবার স্থির করিয়াছিলাম দিল্লী যাইব না। যে জিজ্ঞাসা করিয়াছে তাহাকেই ধন্যবাদ দিয়াছি ও যাইব না বলিয়াছি। কিন্তু যা মনে করা যায় তা ঘটে কৈ? ঘটাইবার কর্ত্তা ত আমি নই, তিনি আর একজন। তাই কার্য্যোপলক্ষে মীরাট গিয়া পড়িলাম, আজ কাল ফিরি করিতে করিতে ৬ই ডিসেম্বর আসিয়া পড়িল। ৭ই দিল্লীতে রাজার আগমন, সহরসুদ্ধ লোক দিল্লী চলিল। আমিও স্রোতে ভাসিয়া গেলাম।

আট বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীতে কর্জ্জন্‌যজ্ঞ দেখিয়াছিলাম। এবার রাজা নিজে আসিতেছেন, ইংরাজ-রাজত্ব আরম্ভ হইয়া অবধি এরূপ আর কখনও হয় নাই, উৎসব ও সমারোহে যোগ দিবার ইচ্ছা সকলেরই হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

দিল্লীতে কি দেখিলাম? বিপুল আয়োজন, অনেক রকমের, বড়মানুষী যতদূর হইতে পারে। সে-সকল ব্যাপার দেখিয়া কে বলিতে পারে দেশে ধনের ঐশ্বর্য্যের কিছুমাত্র অনাটন আছে। কে বলে এদেশে লোকের দুইবেলা অন্ন জুটে না, দুর্ভিক্ষের কালোছায়া এখনও সর্ব্বত্র মিটে নাই?

সেবারেও দেখিবার জিনিস হইয়াছিল দেশীয় রাজাদের 'কেম্প', এবারেও তাই। তবে এবারে ব্যবস্থা ভাল, সকল রাজারাই কাছাকাছি। এক একজন রাজা খরচ করিয়াছেনও যথেষ্ট। হায়দ্রাবাদের নিজামের শুনিলাম দুই ক্রোড়ের 'বজেট্'। তাঁহার সখ মোটরের ও বেগমের, দুই প্রকার সখের সামগ্রীই সত্তরের উপর নিজের সমভি-ব্যাহারে দিল্লী আনিয়াছেন এইরূপ কিম্বদন্তী! তবে মোটরের এবার ছড়াছড়ি। আর তাম্বুতে তাম্বুতে বিদ্যু-তের আলো। কয়টা তাম্বুতে ত আগুনও ধরিয়া গেল।

আর একটা জিনিসে এবার উন্নতি দেখিলাম। রাস্তায় ধুলা নাই, দেদার তেল ঢালা হইয়াছে।

কিন্তু এসব বাজে জিনিস। আসল জিনিসটা যা দেখিলাম, যা দেখিব কখনও মনে করি নাই কিন্তু যা দেখিয়া বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, সেটা একেবারেই অন্য

সর্প ও মহিষের কথোপকথন।

(ভারত-পারসিক মিশ্র চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে)।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

প্রকারের। সেটা—চুপি চুপি বলি—ইংরাজের ভয়! 'ভয়' কথাটা বড় নরম হইল, বলা উচিত 'আতঙ্ক'। না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে, শ্বেতচর্ম্মের আবরণে এরূপ পাণ্ডুবর্ণের যকৃৎ লুক্কায়িত থাকিতে পারে।

ভয় কিসের? প্রাণের ভয়। বোমার ভয়। একেবারে ভিত্তিহীন কিন্তু অতি বিসদৃশ ভয়।

রাজা, সম্রাট, নিজের রাজত্বে সাম্রাজ্যে আসিতেছেন, তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইবে, ভারতের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী নগরে রাজপ্রবেশ (State entry), ওঃ তাহাতে কি লুকাচুরি, কি রকম রাজাকে ঢাকিবার, জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার, চেষ্টা! ষ্টেশন্ হইতে ক্যাম্প্ পৌঁছিতে রাজা ও রাণীর ঘণ্টা দুই নিশ্চয়ই লাগিয়া থাকিবে,—অনেকটা পথ ঘুরিয়া গেলেন, রাস্তার দুইধারে কাতার দিয়া লক্ষাধিক জনসমূহ, কিন্তু কয়জন লোক তাঁহাদের চিনিল? রাণী ছয় ঘোড়া-যোতা মস্ত গাড়ীতে ছিলেন, তাঁহার মস্তকের উপর স্বর্ণছত্র, তাঁহাকে তবু কিছু লোক আন্দাজে চিনিয়া লইল। কিন্তু রাজা অশ্বপৃষ্ঠে, লাল ফৌজী পোষাক, হাতে ছোট একটি সৈন্যাধ্যক্ষের দণ্ড, আগুপিছু চতুর্দ্দিকে কত অশ্বারোহী, তাহার মধ্যে তাঁহাকে চিনিয়া লওয়া একেবারেই সহজ ছিল না। আমরা নিতান্ত কাছে ছিলাম, রাজার দাড়ি দেখিয়া চিনিলাম। তিনি একবার ডানদিকে হাত তুলিতেছেন, একবার বাম দিকে, কিন্তু সে নিবিড় জনতা একেবারে নিস্তব্ধ, রাজা সেলামের জবাব পর্য্যন্ত অনেক স্থানে পাইলেন না। অন্যত্র কি হইয়াছিল বলিতে পারিনা, কিন্তু আমি যেখানে ছিলাম সেখানে, প্রাদেশিক লাটেরা, রাজা রাণী, বড়লাট প্রভৃতি সকলে চলিয়া যাইবার পর যখন মহারাজা বরোদা আসিলেন তখন প্রথম করতালির ধ্বনি হইল!

যদি কর্ত্তৃপক্ষদের এতই ভয় ছিল তাহা হইলে state entryর আয়োজন কেন করা হইল? ফলে লোকেরা সকলেই দুঃখিত হইল, রাজা রাণীও নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হইয়া থাকিবেন। তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে সবেমাত্র আসিয়াছেন, এংলোইণ্ডিয়নের মত 'রৌদ্রবিশুষ্ক' নহেন, স্থানীয় সবজান্তাদের মত অলীক স্বপনও দেখেন না। তাঁহাদের ভয় কিসের? আর কেনই বা হইবে? ভয়ের যে কোন কারণই ছিল না রাজা ও রাণী তাহা বেশ ভাল করিয়া পরে প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা গাড়ীতে ঘোড়াতে পদব্রজে তাহার পর বাহির হইয়াছেন, কিছুই ত ঘটে নাই। যে নৃপতি প্রজাবৎসল ও প্রজাকে বিশ্বাস করেন, তাঁহার প্রজা বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে না।

সকল নৃপতিবৃন্দ ও তাঁহাদের সেনানীর কোন এক স্থান দিয়া যাইতে দুই ঘণ্টার অধিক সময় লাগিয়াছিল। সকাল ৬টার পর রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, দর্শকেরা স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া তখন বসিয়াছিল, এবং তাহাদের বাড়ী ফিরিতে বেলা ৩টা বাজিয়া গেল। তবে আরবারের মত সমারোহ হয় নাই। বেশী ভাগ লোক হয় ঘোড়ার উপর, নয় গাড়ীতে। হাতীর স্থানে ঘোড়া বা গাড়ী করিলে আর জাঁক হইল কৈ? নূতনের মধ্যে রাস্তার দুই পার্শ্বে একসার পদাতিক সৈন্য, তাহার পর একসার পুলিস। 'টিকটিকি' পুলিস চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, তাহাদের হাতে ভরা 'রিভল্‌ভার্।' যে সময় রাজা কোন স্থান দিয়া যাইলেন, সে স্থানের কনষ্টেবলেরা অমনি ঘুরিয়া গেল, অর্থাৎ রাজার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দর্শকসমূহের দিকে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল তাহারা কেহ বোমা ছুঁড়িবার উদ্যোগ করিতেছে কি না!

আর একটি জিনিস দেখিলাম সেটি উল্লেখযোগ্য। আমরা সেকেলে মানুষ, ভালমন্দ বিচার করিতে তত সক্ষম নহি। তবে মনে হয় সমাজসংস্কারকমাত্রেরই হৃদয় উল্লসিত হইবে। ভূপালের বেগম অতি সূক্ষ্ম একটি হরিৎ বর্ণের 'বুরখা' পরিয়া ইংরাজ রাজপ্রতিনিধিকে সাদরে আপন বামে বসাইয়া একখানি খোলা গাড়ীতে গেলেন। এইবার আশা করা যায় দেশে পর্দ্দাটা উঠিবে।

রাজপ্রতিনিধি সাহেব তিনি 'এজেণ্ট' হউন বা 'রেসিডেণ্ট' হউন সকল দেশীয় রাজারই সম্মানের পাত্র। তবে কোন কোন রাজা একটু বেশী ভক্তি প্রকাশ করিয়া সাহেবকে গাড়ীতে নিজের দক্ষিণপার্শ্বে বসাইয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে কাশীনরেশ মহারাজা বেনারস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নূতন ক্ষমতা পাইয়াছেন, এখন শুধু নামে রাজা নহেন, কাযেও রাজা হইয়াছেন, তাই বোধ হয় এজেণ্ট সাহেবকে সম্মানের

আসনে বসাইয়া, নিজে তাঁহার বামপার্শ্বে অতীব তটস্থভাবে বসিয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছিলেন।

সমস্ত সকাল নানারূপ ছোট বড় আসল নকল রাজগণের দর্শনের পর আর দরবারের জন্য অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম। আমি সেইদিন রাত্রেই দিল্লী ত্যাগ করিলাম।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বীপনিবাস

অনেক বৎসর আগে হল্যাণ্ড্ হইতে পাঁচ মাইল দূরে উত্তর সাগরের কোন এক দ্বীপে একদল জলদস্যু বাস করিত এবং যেসকল জাহাজ ঝড়ে পড়িয়া সেই পর্ব্বতসঙ্কুল দ্বীপের কূলে আসিয়া পড়িত রক্তপাত ও অত্যাচারের দ্বারা সেই-সকল জাহাজ লুট করিয়া দিনপাত করা তাহাদের ব্যবসায় ছিল। অবশেষে তাহাদের প্রতি রাজা প্রথম উইলিয়মের দৃষ্টি পড়িল। তিনি একজন অল্পবয়স্ক আইনব্যবসায়ীর উপর সমস্ত দ্বীপটি নিরুপদ্রব করিবার ভার দিলেন। কি প্রকারে তিনি এই মরুদ্বীপটির উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ সেই আইনব্যবসায়ীর পৌত্র স্বয়ং যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন নিম্নে আমরা তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি। এরূপ অধ্যবসায় আমাদের সকলেরই পক্ষে দৃষ্টান্তস্থল।

সেই যুবক দ্বীপটিতে একেবারে বাস করাই স্থির করিলেন। কিন্তু জায়গাটি কোনো অংশেই মনোরম ছিল না; সেখানে কোথাও একটি গাছ বা সবুজ ঘাস দেখা যাইত না; সেখানে বাস করা নির্ব্বাসন দণ্ড। তবু, যুবক মেয়র তর্ক করিলেন, একটা জায়গা সুন্দর নয় বলিয়াই কদর্য্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিলেই ত তাহার সে দোষ খণ্ডন হইয়া যায়।

একদিন মেয়র তাঁহার মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের গাছ চাই, আমরা চেষ্টা করিলে এ জায়গাটি সুন্দর করিতে পারি।" কিন্তু তাঁহার দলের সকলে ছিল কেজো প্রকৃতির লোক, সমুদ্রে নাবিকবৃত্তিই তাহাদের কাজ; তাহারা আপত্তি করিল, তাহাদের সামান্য সম্বল; গাছের জন্য সেটাকে ক্ষয় করা তাহার সঙ্গত বোধ করে না।

মেয়র বলিলেন, "বেশ। এ কাজ আমিই করিব।" তাঁহার কথার অর্থ তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই। সেই বছরেই তিনি একশত গাছ লাগাইলেন; ইহার পূর্ব্বে সেখানে কখনো গাছ বসান হয় নাই।

দ্বীপবাসীরা বলিল, "বড় ঠাণ্ডা, এই কন্‌কনে উত্তরে বাতাসে আর ঝড়ে সব গাছ মরিয়া যাইবে।"

মেয়র দমিলেন না; তিনি বলিলেন, "যদি মরে তবে আরো গাছ লাগাইব।" এবং যে পঞ্চাশ বছর তিনি সেই দ্বীপে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার কথা রাখিয়াছিলেন, প্রতি বৎসর তিনি একশত গাছ রোপন করিতেন। ইত্যবসরে তিনি দ্বীপের গভর্মেণ্টকে সমস্ত জমি পাট্টা করিয়া দিয়া সেই জমিতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বাগান এবং চত্বর নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন এবং সেখানে প্রত্যেক বছরে ছোট ছোট চারা এবং লতা বসাইতে সুরু করিয়া দিলেন।

সমুদ্রের লবণাক্ত কোয়াশায় সিক্ত হইয়া গাছগুলি না শুকাইয়া খুব বাড়িয়া উঠিল। যাহারা ঝড়ের সময় দেখিয়াছে, তাহারাই জানে উত্তর সমুদ্র কিরূপ অশান্ত হইতে পারে—সেই বীচিসংক্ষুব্ধ সমুদ্রতটে বহু ক্রোশের মধ্যে কোথাও এক হাত পরিমাণও জমি ছিল না যেখানে ঝটিকাচালিত পাখীগুলি একটু আশ্রয় পাইতে পারে। তাই সহস্র সহস্র মৃত পাখীর দ্বারা সমুদ্র আচ্ছন্ন হইত।

শেষে একদিন যখন গাছগুলি বড় হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল তখন প্রথমে একদল শ্রান্ত ও তাড়িত পাখী গাছের পাতার আড়ালে আশ্রয় লাভ করিল; পরে আরো পাখী আসিল, তাহারাও আশ্রয় পাইল এবং গান গাহিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে এত পাখী এই দ্বীপের নূতন নিকুঞ্জে বাসা বাঁধিল যে শুধু দ্বীপবাসীদের নয়, তাহারা পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্রকূলের লোকেদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, আর অল্পকালের ভিতরেই দ্বীপটি দুর্লভ ও সুন্দর সুন্দর পাখীর বাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিল।

এমন সময় একদিন রাজার জাহাজ সেখানে নোঙ্গর

ফেলিল ; রাজা ও রাণী এই দ্বীপের ও এখানকার পাখীদের কথা শুনিয়াছিলেন তাই তাঁহারা দেখিতে আসিলেন। তখন হইতে ইহার নাম হইল বিহঙ্গদ্বীপ এবং ইহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

এই আশ্রয়ভূমিটির প্রতি পাখীদের এমনি মন বসিয়া গেল যে তাহারা এই দ্বীপের একটি প্রান্ত ডিম পাড়িবার ও শাবক পালন করিবার জন্য বাছিয়া লইল আর দেখিতে দেখিতে সে স্থান পাখীতে ছাইয়া গেল ; সে দিকটার নামই হইয়া গেল ডিম্বভূমি, এবং চারিদিক হইতে পক্ষীতত্ত্ববিদ্‌গণ কখন সহস্র সহস্র, কখন শত সহস্রাধিক সংখ্যক ডিমের অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল।

এক যোড়া নাইটিংগেল্ পাখী ঝড়ের তাড়া খাইয়া দ্বীপে আসিয়া বাসা বাঁধিল আর তাহাদের সুমধুর গানে দ্বীপবাসীদের মন কাড়িয়া লইল। সমুদ্রঘেরা এই ভূখণ্ডের উপর যখন সন্ধ্যা নামিয়া আসিত, মেয়েরা ও শিশুরা পাখীদুটির সন্ধ্যাসঙ্গীত শুনিবার জন্য চত্বরে আসিয়া জুটিত। এই নাইটিংগেল্-দম্পতি হইতে ক্রমে বেশ একটি উপনিবেশ জমিয়া উঠিল, আর, কয়েক বৎসরেই দ্বীপটি ঐ জাতীয় পাখীতে এত ভরিয়া উঠিল যে আর একবার এখানকার নামকরণ হইল এবং দেশ বিদেশে নাইটিংগেল্‌দ্বীপ নাম ছড়াইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে সেই যুবক আইনব্যবসায়ী বৎসরে এক শত করিয়া গাছ রোপন করিয়াই চলিলেন।

চিত্রকরেরা সেই দ্বীপের কথা শুনিয়া ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম সুদ্ধ আসিতে লাগিল। আজ পৃথিবী জুড়িয়া শত শত ঘরের দেয়ালে নাইটিঙ্গেল দ্বীপের সুন্দর ছায়াবীথি ও বনভূমির ছবি ঝুলিতেছে। একজন আমেরিকান চিত্রকর তাঁহার ছাত্রদিগকে প্রতি বৎসর সেখানে লইয়া যান, এবং তিনি বলেন যে সমগ্র পৃথিবী খুঁজিয়া এমন সুন্দর স্থান এখন পাওয়া যায় না।

গাছগুলি এখন ৪০।৫০ ফুট দীর্ঘ হইয়া উন্নত গম্ভীর শ্রী ধারণ করিয়াছে, কারণ যেদিন সেই যুবক এটর্ণি এই দ্বীপে বৃক্ষ রোপণ করেন সে আজ প্রায় একশো বছর হইয়া গেল। একটি শীতল শ্যামল কুঞ্জের ভিতর তাঁহার সমাধিস্থান ; সেখানে তাঁহার স্বরোপিত গাছেরই পাতা হইতে শিশির ঝরিয়া শৈবালমণ্ডিত সমাধিশিলাতলকে সিক্ত করে।

তাঁহার পৌত্র বলেন, এ সমস্তই একজন মানুষের কাজ। "কিন্তু তিনি আরো কিছু করিয়াছিলেন।"

অনুর্ব্বর দ্বীপে দুই বৎসর বাস করিবার পর তিনি একদিন দেশে গেলেন ও নববিবাহিত পত্নীসহ ফিরিয়া আসিলেন। বিবাহিত জীবন যাপনের পক্ষে এই শীতপীড়িত মরুস্থান অনুকূল ছিল না, কিন্তু যুবতী পত্নী স্বামীর মত গুণশালিনী। তিনি বলিলেন, "তুমি যেমন গাছ পালন করিতেছ আমিও তেমনি আমাদের সন্তান পালন করিব।" বিশ বৎসরের মধ্যে সেই স্ত্রী যত্নে পরিপালিত তেরোটি সন্তানকে এই দ্বীপে স্থান দিলেন। যে গৃহে তাঁহার ছেলেরা জন্মিল তেমন ঘর সচরাচর সকল শিশুর ভাগ্যে ঘটে না। যে একজন লোক এই পরিবারে একদা বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি বলেন, "পরিবারটি এমনি যে একবার তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলে নিজেকে সেই পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে হয়। সে বাড়ীর মেয়েকে বিবাহ করিতে না পাইলে দাসীকেও বাঞ্ছনীয় বোধ হয়।"

ছেলেমেয়েগুলি সকলে যখন যৌবন লাভ করিল, একদিন মা তাহাদের সকলকে সমবেত করিয়া তাহাদের পিতার ও এই দ্বীপের কাহিনী তাহাদিগকে শুনাইলেন এবং বলিলেনঃ—"যখন জীবনযাত্রার পথে বাহির হইয়া পড়িবে তখন তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের পিতার কার্য্যের আদর্শ মনের মধ্যে বহন করিয়া লইবে ; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষমতা ও অবস্থানুসারে তিনি যেমন করিয়াছেন সেইরূপ করিবে। যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সেই পৃথিবীকে পূর্ব্বের চেয়ে আর একটু সুন্দর বা ভালো করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে। তোমাদের মায়ের এই অনুরোধ।"

মধ্যম পুত্র হল্যাণ্ডে গিয়া একটি গির্জ্জায় প্রবেশ করেন। যখন তাঁহার কাজ ফুরাইল তখন রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত সকলে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিল। তখনকার ধর্ম্মাচার্য্যদিগের ও জনসাধারণের তিনি নেতা হইয়াছিলেন।

সমুদ্রতীরে প্রায়ই প্রবলবেগে ঝড় আসে; কোন এক ভয়ানক ঝড়ের রাত্রে, তৃতীয় পুত্র, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া, তুমুল ঢেউয়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া একজন অর্দ্ধমৃত নাবিককে তুলিয়া পিতার গৃহে লইয়া যান; এইরূপে তিনি যে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা সামান্য নহে, কারণ সেই জলমগ্ন নাবিকটির নাম হাইন্‌রিক্ শ্লীমান্। পরে একদিন ইনিই মাটির নীচে বিলুপ্ত ট্রয় নগর আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

প্রথম যে পুত্র গৃহ ছাড়িয়া যান, তিনি একদল পরিশ্রমক্ষম লোক লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন ও সেই দল বোয়ার নামে অভিহিত হয়। তাঁহাদের অশ্রান্ত অধ্যবসায়ে সেখানে ক্রমে কত সহরের পত্তন হইল এবং একটি নূতন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল, তাহাই ট্রান্স্‌ভাল্ রিপাব্লিক। সেই পুত্র নবপ্রতিষ্ঠিত দেশের রাজমন্ত্রী হইলেন, এবং মা যে বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীকে পূর্ব্বের চেয়ে আর একটু সুন্দর বা ভাল করিও," আজ দক্ষিণ আফ্রিকার নবসম্মিলিত রাষ্ট্রে সেই মাতৃআজ্ঞা-পালনের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীমাধুরীলতা দেবী।

সোফোক্লিস্

এস্কাইলাসের* প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে সোফোক্লিস জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীক নাট্যসাহিত্যে বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। দেশের উপকথা, কুসংস্কার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উপরে, প্রতিভা সকল দেশে সকল সময়ে, সাহিত্যের কীর্ত্তিসৌধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দূর অতীতের কুয়াসার অন্তরালে মিজ্জার স্বপ্নদৃষ্ট সেতুর ন্যায় যে অস্পষ্ট জাতীয় জীবনরেখা প্রকৃতির ক্রোড়ে স্বতঃ প্রতিভাত হয়, প্রতিভা সেই অস্পষ্টতার ভিতরে দীপ্তি আনয়ন করিয়া ক্ষীণ রেখাকে নিপুণতুলিকায় জাতীয়-জীবনের সাধনাক্ষেত্রে পরিণত করিয়া জগতের সমক্ষে প্রচার করে। বিশ্বসাহিত্যের চর্চ্চা করিলে, জগতের মানব সভ্যতার এই যে ক্রমবিকাশ তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এই হিসাবে সোফোক্লিসের রচনা গ্রীসদেশে ধর্ম্মভাব স্ফুরণের ইতিকথায় পূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

সোফোক্লিসের অঙ্কিত চরিত্রের আলোচনা করিলে ভারতবাসী আমরা শিহরিয়া উঠি। মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, আত্মহত্যা, মাতৃপরিণয়, ভ্রাতৃরক্ত, উন্মত্ততা, দুর্ব্ব্যাধি প্রভৃতি জগতের যত অপকৃষ্ট অকথ্য কথা আছে, সোফোক্লিসের গ্রন্থাবলী যেন তাহাদেরই জীবন্তচিত্রের কৌতুকাগার। স্থূলদৃষ্টিতে মনে হয়, এমন নিকৃষ্ট ভাবপরম্পরাকে সাহিত্যে স্থান দিয়া তিনি সাহিত্যের সম্মান নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে ঘটনা ও চরিত্রের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, দেবতার প্রতি একটা আন্তরিক ভয় সমস্ত গ্রীক্‌জাতিকে বিহ্বল করিয়াছিল; দেবতার অভিশাপে ও ক্রূর দৃষ্টিতে সোনার সংসার ছারখার হইয়াছিল; গ্রীকদেবীদিগের কামনা ও ক্রোধের সম্মুখে পড়িয়া বীর-যুগের গ্রীসবাসীরা যেন পতঙ্গের ন্যায় নিজেদের সুখশান্তি আগুনে বিসর্জ্জন দিয়াছিল; এই দেবভীতি ও দেবতার প্রীত্যর্থে আহুতি সোফোক্লিসের লেখনীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। দেবতার অভিশাপ কিরূপ ভয়াবহ তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বাংলাদেশের মনসামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের কবিগণের ন্যায় তিনি যেন আপন মস্তকে দেবতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। দেবলীলার এমন রক্তসঞ্চালনশিথিলকারী দক্ষ লেখক বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আইয়াস (Aias) নামক নাটক এথেনার রোষবহ্নির উপাখ্যান মাত্র। ট্রয়যুদ্ধের বীরশ্রেষ্ঠ একিলিসের (Achilles) মৃত্যুর পর তাঁহার পরিত্যক্ত বর্ম্ম লইয়া গ্রীকজাতির ভিতরে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। আইয়াস বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ (Odysseus) ওদিশাস্‌কে সকলে সেই বর্ম্ম ধারণের যোগ্য ব্যক্তি মনে করিলেন। অপমানিত আইয়াস সমস্ত গ্রীক সেনানীর নিধন সঙ্কল্পে অসিহস্তে বাহির হইলেন, কিন্তু এথেনার বিকট পরিহাসে গ্রীকশিবিরের সমস্ত ভারবাহী পশু বীরের নেত্রে সেনানী বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আইয়াস সমস্ত পশু বিনাশ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। পর মুহূর্ত্তেই জানা গেল

* ১৩১৭ সালের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে 'এস্কাইলাস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এথেনার রোষবহ্নি দিনান্তস্থায়ী, রাত্রিশেষে আইয়াস আবার প্রকৃতিস্থ হইতেন। আইয়াসের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই নাটকে বিশেষ কোন চরিত্রগৌরব বা ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই। আইয়াসের মত পাগল ব্রহ্ম ও সুমাত্রার উপকূলে "to run amock" "উন্মত্ত ভাবে দৌড়িতে" প্রায়ই দেখা যায়; এমন পাগলের কথায় পাঠকের সময় নষ্ট করা কি বাঞ্ছনীয়? কিন্তু দেবীর রোষবহ্নির অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি গ্রীকসেনানীবর্গের প্রাণরক্ষা করিয়া গ্রীক-জাতিকে মঙ্গলবারিতে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহাই বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

আন্তিগোনি (Antigone) সোফোক্লিসের অঙ্কিত একটী নারী-চরিত্র। এই নারীর ভ্রাতৃপ্রেমগাথায় দেশ প্রতিধ্বনিত ছিল। এস্কাইলাসের আন্তিগোনি দেশদ্রোহী পোলিনিসের ভগিনী; সোফোক্লিসের আন্তিগোনি অন্ধ পিতার যষ্টিস্বরূপিনী কন্যাও বটে। ভগিনীর চিত্রে এস্কাইলাস্ তাহাকে মহত্ত্বের গৌরবশৃঙ্গে স্থাপিত করিয়া নারীত্বের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। সোফোক্লিস্ সেই নারীকে কন্যার মহিমায় মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু অবশেষে পোলিনিসের ভগিনী বলিয়া তাহাকে নির্জ্জন শৈলপ্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া দড়ির ব্যবস্থা করিয়াছেন। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীরূপিণী ভারতনারীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবাসী এই রজ্জু ব্যবস্থায় আন্তিগোনির প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে নারীমহিমা বিসর্জ্জিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারেন। এস্কাইলাস্ যে স্থানে সংযম অবলম্বন করিয়াছেন, সোফোক্লিস্ সেই স্থানে প্রচলিত কিংবদন্তীর সবিস্তর অনুসরণ করিয়া চরিত্রচিত্রনে অব্যাহত গতির পরিচয় দিয়াছেন। দামোদরের বন্যায় যেরূপ বঙ্কিমের নারীচরিত্র স্বল্পবিস্তর হতশ্রী হইয়াছে, সেইরূপ এস্কাইলাসের আন্তিগোনি সোফোক্লিসের লেখনীমুখে বিগতশ্রী হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পোলিনিস্ দেশদ্রোহী বলিয়া নগরাধিপ মাতুল ক্রেওন (Creon) তাহার শবদেহের সৎকার নিষেধ করিয়া দিলেন, আন্তিগোনি রাজনিষিদ্ধ কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক আপন মস্তকে রাজরোষ আনয়ন করিলেন। রাজপুত্রের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব ছিল, রাজা সেই কথায় কর্ণপাত করিলেন না। প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া আন্তিগোনি শৈলকারাগারের দিকে গমন করিতে করিতে বলিলেন,---

> A husband lost might be replaced; a son,
> If son were lost to me, might yet be born;
> But with both the parents hidden in the tomb,
> No brother may arise to comfort me.

ভগিনীর স্নেহে কথাগুলি অনুপ্রাণিত হইতে পারে, তবে ভারতের আদর্শস্থানীয়া কোনও নারী পতি পুত্র সম্বন্ধে কখনও এমন কথা বলিতেন না। তবে গ্রীসের কথা স্বতন্ত্র। গ্রীকসাহিত্যে ভগিনী ও কন্যার গৌরবোজ্জ্বল অধিকার যেন গৃহিণী ও মাতার অবস্থার প্রতি উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বিরাজ করিতেছে। পরমুহূর্ত্তে রাজপুত্র (Haemon) হীমনের মৃতদেহ আন্তিগোনির লম্বিত প্রাণশূন্য দেহের সহিত একত্র আবিষ্কৃত হইল। রাজপত্নী আত্মহত্যা করিলেন। পুত্রশোকবিধুরা এই একমাত্র মাতা ইউরিদাইসিস (Eurydices) সোফোক্লিসের গ্রন্থাবলীতে মরুভূমির ওয়েশিস্ স্বরূপিনী।

ইলেক্ত্রা (Electra) ওরেস্তিসের ভগিনী, স্বামীহন্ত্রী ক্লিতামেনস্ত্রার কন্যা, পিতৃহত্যার প্রতিশোধকল্পে বিদেশ হইতে আগত ভ্রাতার সাহায্যকারিণী। কিন্তু ইলেক্ত্রা শেফালিকা পুষ্পের ন্যায় কোমল। কবি গাহিয়াছেন,

> ...তুই ধন্য অয়ি শেফালিকে,
> ধরণীর বিমল তারকা, হৃদিভরা
> প্রেম লয়ে সমস্ত রজনী চেয়ে থাক
> শশধর পানে, প্রভাতে নীরবে মিশে
> যাও ধরণীর নগ্নগাত্রে পূর্ণ আশা
> লয়ে।.......................

ইলেকত্রা "হৃদিভরা প্রেম লয়ে" ভ্রাতার আগমন অপেক্ষায় পিতার সমাধিমন্দির অশ্রুসিক্ত করিতেছিলেন। যখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়া ভ্রাতা সুখের সংসার রচনা করিবার কল্পনা করিতেছিলেন, ইলেক্ত্রা যখন আপন দুঃখ-রজনীর প্রভাত আশায় জীবনসম্বল ভ্রাতার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়াছিলেন, তখন নির্ম্মম নিষ্ঠুর প্রভাতবায়ুর ন্যায় নিশানন্দিনী ফিউরিগণের (Furies) উপদ্রবে সমস্ত সুখকল্পনা অন্তর্হিত হইল। ইলেক্ত্রা পূর্ণ আশা লইয়া মাতৃহত্যার রক্তরাগে কথঞ্চিৎ রঞ্জিত হইয়া রক্ত-শুভ্র শেফালিকার ন্যায় ধরণীর নগ্নগাত্রে মিশিয়া গেলেন।

দেয়ানীরা (Deanira) বীরশ্রেষ্ঠ হারকুলিয়সের

সহধর্ম্মিণী। তাঁহার রূপলালসায় মহানাগ নিশাস্ হারকুলিয়সের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। কিন্তু নাগজাতির কুটিলতা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। নিশাস্ মৃত্যুকালে দেয়ানীরাকে আহ্বান করিয়া বলিল "সুন্দরি, স্বামীসোহাগিনী হইবার লালসা যদি পোষণ করিয়া থাক, তবে আমার রক্তে একটী গাত্রাবরণী রঞ্জিত করিয়া লও। স্বামী যখন তোমাকে উপেক্ষা করিবেন, তখন এই রক্তরঞ্জিত গাত্রাবরণী তাঁহাকে ব্যবহার করিতে দিও, দেখিবে স্বামী তোমার বশীভূত হইবেন।" তারপর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। হারকুলিয়স্ উকালিয়া দেশ জয় করিয়া রাজপুত্রী (Iole) আইওলের সহিত দেশে ফিরিলেন। সমস্ত দেশ হারকুলিয়সকে অভিবাদন করিবার জন্য সমুদ্রের উপকূলে ভাঙিয়া আসিল। হারকুলিয়স্ অনুচরের সহিত আইওলেকে গৃহে প্রেরণ করিলেন। নবযৌবন-সম্পন্না সপত্নীর দর্শনে দেয়ানীরা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি সযত্নসংরক্ষিত সেই প্রাচীন গাত্রাবরণী অনুচরের সহিত উৎসবমগ্ন স্বামীকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। নিঃসন্দিগ্ধ বীর পত্নীপ্রেরিত রঞ্জিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিলেন। কিন্তু গাত্রাবরণী শতশীর্ষ নাগের কালকূটে পরিপূর্ণ ছিল, রৌদ্রের আলোকে বিষ জ্বলিয়া উঠিল। দেয়ানীরা বা হারকুলিয়স্ এই বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। মৃত্যুযন্ত্রণা-গ্রস্ত হারকুলিয়স্ পত্নীকে বিশ্বাসঘাতিনী মনে করিয়া অভিশাপ করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন—কিন্তু সতী স্ত্রী ইতিপূর্ব্বেই দুর্ঘটনার কথা অবগত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। "The Trachinian Maidens" নামক নাটকের ইহাই উপাখ্যানভাগ। নিয়তির আদেশে, নাগের কূটমন্ত্রণায় এই দুর্ঘটনার সংঘটন হইল। দেয়ানীরার চরিত্রে সতীত্বের ছায়া আছে। স্বামী যখন ব্যভিচারী হইতে চান, তখন সতীর শাসনে তিনি নিষ্পাপ থাকিতে পারেন। তবে সতী মাত্রেই ভবিষ্যদ্দর্শিনী বিজ্ঞা নারী নহেন, পরন্তু সতীচরিত্রে পতিভক্তির এমন একটী উৎস প্রবাহিত হয় যে, সংসারকুটিল ব্যক্তি সময়ে সময়ে সেই কোমল প্রকৃতির সাহায্যে গার্হস্থ্য মহান্ অনর্থের সৃষ্টি করিতে পারে। পতিপ্রাণা দেয়ানীরার অদৃষ্টেও এই অনর্থের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। দেয়ানীরার চরিত্র অঙ্কন করিয়া ধ্বংসের ভিতরে, নিয়তির খেলার মধ্যেও গ্রন্থকার পতিপ্রাণার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। দেয়ানীরা প্রকৃত সতীত্বের তুলনায় প্রকৃষ্টা না হইলেও সোফোক্লিসের নারী-সমাজে একমাত্র গৌরবস্থানীয়া পতিপ্রাণা রমণী।

ফাইলোকতেতিস (Philoctetes) নাটকে বংশজ ও শিক্ষিত যুবকের অন্তরাত্মা প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীকগৌরব (Achilles) একিলিসের পুত্র নবীন যুবক। দেবতার আদেশ হইয়াছে যে এই যুবকই ট্রয় যুদ্ধের বিজয়মাল্য অর্জ্জন করিবে, তবে তাহাকে (Philoctetes) ফাইলোকতেতিসের হস্তে হারকুলিয়সের যে অচ্ছেদ্য গাণ্ডীব আছে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ফাইলোকতেতিস দুরারোগ্য ক্ষত-রোগ-গ্রস্ত বলিয়া গ্রীক সেনাপতি ওদিশাস্ তাহাকে একটী দ্বীপে ফেলিয়া আসিয়াছেন। যুবক প্রথমে সেনাপতির পরামর্শানুযায়ী ফাইলোকতেতিসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রবঞ্চনার সাহায্যে তাহার গাণ্ডীব হস্তগত করিলেন। কিন্তু তখনই তাহার হৃদয়ে একটা বেদনা জাগিয়া উঠিল। স্বজাতির ও স্বদেশের গৌরব অর্জ্জন, মহাসমরে বিজয় লাভ, যে-কোনও যুবকের জীবনের স্পৃহনীয়তম পদার্থ হইতে পারে, কিন্তু যুবকের পবিত্র চিত্তবৃত্তি সেই গৌরববাসনাকে, সেই সুনামস্পৃহাকে দলিত করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গ্রীক সেনাপতির আদেশ অমান্য করিলে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন জানিয়াও মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া তিনি সেই ব্যাধিগ্রস্তকে তাহার গাণ্ডীব ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু ফাইলোকতেতিস সমস্ত কথা অবগত হইয়া আহ্লাদের সহিত স্বজাতির প্রীতিকামনায় সেই দুর্জ্জয় গাণ্ডীব যুবক (Neoptolemus) নিয়োপতোলেমাসকে প্রদান করিলেন। এই নাটকখানির ভিতরে স্বদেশপ্রীতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু বাহিরে দুর্ব্যাধিগ্রস্ত ফাইলোকতেতিসের করুণ আর্ত্তনাদে সংসারবিজ্ঞ ওদিশাসের ধূর্ত্তামি ও প্রতারণায় পাঠক যেন অভিভূত হইয়া পড়েন। ফাইলোক-তেতিসের চিত্র বড় ভয়াবহ, তাঁহার ক্রন্দন বড় মর্ম্মভেদী, হৃদয় বড় সরল প্রশস্ত ও মহৎ।

ঈদিপাস (Oedipus) সোফোক্লিসের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

ঈদিপাস দেবতার অভিশাপের জীবন্ত চিত্র। ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র পিতৃহন্তা বলিয়া তিনি নির্দ্দিষ্ট হইলেন, পরে মৃত্যুদণ্ড হইতে গোপনে বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে রক্ষা করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। নির্ব্বাসনে মেষপালকের গৃহে তিনি লালিত পালিত হইলেন। যৌবনে দস্যু সাজিয়া পথিমধ্যে অজ্ঞাতসারে আপন জন্মদাতাকে হত্যা করিয়া বিধির বিধান অব্যাহত রাখিলেন। জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার অতুলনীয় শৌর্য্যে বীর্য্যে মোহিত হইয়া দেশবাসী তাঁহাকে রাজসিংহাসন ও বিধবা রাজমহিষী প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিল। ঈদিপাস আপনাকে মেষপালকের পুত্র বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে তিনি আপন পিতাকে হত্যা করিয়া আপন মাতাকে বিবাহ করিতেছেন। কালে মাতৃগর্ভে তাঁহার দুই পুত্র দুই কন্যা জন্মে। এই বিষম পাপে দেশের দেবতা দেশে মড়ক সৃষ্টি করিলেন। পরিশেষে সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হইলে অপমানে ও ক্ষোভে ঈদিপাস নিজ হস্তে দুইটী চক্ষু উৎপাটিত করিলেন। এবং দেশত্যাগ করিয়া সেই শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত নির্ব্বাসনকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার উভয় পুত্র দ্বন্দযুদ্ধে নিহত হইল। তাঁহার যষ্টিস্বরূপিনী কন্যা আন্তিগোনি ভ্রাতার সংকার করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। ঈদিপাস যন্ত্রণায় অধীর হইয়া অবশেষে শৈলশৃঙ্গে রহস্যপূর্ণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। ঈদিপাস নিজজীবনে কখনও জ্ঞাতসারে কোনও পাপের প্রশ্রয় দেন নাই, তাঁহার চরিত্র নিষ্পাপ, হৃদয় মহৎ, বীরত্ব অতুলনীয়, প্রজারঞ্জন ক্ষমতা অননুকরণীয়। এমন যে সর্ব্বগুণোপেত মহাত্মা তাঁহাকে জগতের যত নিকৃষ্ট যাতনা দিয়া দেবতা তাঁহাকে দণ্ডিত করিলেন। গ্রীক-জাতি বুঝিল দেবতার ক্ষমতা কত বেশী, দেবতার অভিশাপ কেমন ভয়াবহ। ঈদিপাস পিতৃপাপে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আমাদের দেশেও পূজাপ্রয়াসী দেবতারা চন্দ্রধর প্রভৃতি বণিকরাজদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের দেশের সমাজবন্ধন এমন কঠিন, যে, দেবতারও সাধ্য নাই যে তিনি মানুষকে মাতৃপরিণয়ে আবদ্ধ করিতে পারেন। আমাদের দেবতা পূজার জন্য লালায়িত, পূজা পাইলেই সন্তুষ্ট; কিন্তু গ্রীক্‌দেবতা সৃষ্টির প্রাক্‌কাল হইতে পূজা পাইয়াও মানুষের ভাগ্যচক্র লইয়া নিয়ত খেলা করিয়াছেন। ইতর ও মহৎ, ধনী ও নির্দ্ধন, জ্ঞানী ও মূর্খ কেহই গ্রীক্‌দেবতাদের কামনার ও ক্রোধের অধিকারবহির্ভূত নহে। গ্রীসদেশে দেবভীতি জাগাইয়া রাখিবার জন্যই কি এত নিত্যনূতন বিভীষিকার কল্পনা ও কাহিনী দেশে প্রচলিত হইয়াছিল? দেবভীতিই কি ধর্ম্মভাব? সেইজন্য কি যীশুর দেবপ্রীতি সর্ব্বপ্রথমে গ্রীসদেশে মানবমনের উপর অধিকার স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল?

শ্রীরজনীরঞ্জন দেব।

ঋগ্বেদের একটি সূক্ত

[৩য় অষ্টক (৪র্থ মণ্ডল), ৫৮ সূক্ত]

ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের এই শেষ সূক্তটি প্রাচীন কি না, এ বিষয়ে "বৈদিক ছন্দ" গ্রন্থ-প্রণেতা আর্ণল্ড, সন্দেহের কথা উপস্থাপিত করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যের টীকা হইতে উহার সকল স্থলের পূর্ণ অর্থ প্রতীত হয় না। কয়েকটি ঋকের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা অতি কষ্টসাধ্য বলিয়া প্রায় সকল পণ্ডিতেরই অভিমতি পাই। কঠিন এবং সন্দিগ্ধ স্থলে উহার যেরূপ ব্যাখ্যা আমার মনে সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

এই সূক্তের পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তে ক্ষেত্রপতি প্রভৃতি দেবতা এবং বামদেব ঋষি। ঐ সূক্তে 'বাহাঃ' (বলদাদি), 'লাঙ্গল,' 'অষ্ট্রা' (পাচনবাড়ি), 'ফালাঃ' (লাঙ্গলের ফালসমূহ) এবং ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'সীতা' উল্লিখিত হইয়াছে; এবং এই সূক্তটি ক্ষেত্র চাষ করিবার পূর্ব্বে পড়িতে হয় বলিয়া দুইখানি গৃহ্যসূত্রেই নির্দ্দেশ আছে। কাজেই পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৭ সূক্তের সহিত ৫৮ সূক্তের কোন সম্পর্ক নাই। জোর করিয়া সূক্তে সূক্তে মিলাইয়া অর্থ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিলাম।

৫৮ সূক্তের দশম ঋক্‌টি যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতায় (১৭, ৯৮), এবং অথর্ব্ববেদে (৭ কাণ্ড, ৮২ সূক্ত, ১ম ঋক্) পাওয়া যায়।

প্রথম ঋক্।

সমুদ্রাৎ উর্ম্মিঃ মধুমান্ উদারৎ
উপাংশুনা সম্ অমৃতত্বমানট্
ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি
জিহ্বা দেবানাং অমৃতস্য নাভিঃ।(১)

প্রথমে ছন্দপাঠের সময়েই দেখিতে পাইবেন যে, তৃতীয় ছত্রে 'নাম' উচ্চারণ করিতে হইলে যদি অ-কারকে দীর্ঘ করা না যায়, তবে ছন্দপতন হয়। এখানে পালি উচ্চারণের মত 'নামো' পড়িলে ঠিক থাকে। চতুর্থ ছত্রে 'দেবানাং' উচ্চারণ করিবার সময় 'দে'টিকে হ্রস্ব এ-কার করিয়া পড়িতে হইবে। পদপাঠেও সেই নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

মধুমান্ উর্ম্মিঃ, সমুদ্রাৎ (সমুদ্র হইতে) উদারৎ (উৎগচ্ছতি) উৎপন্ন হয়েন। এই আলঙ্কারিক ভাষা যখন ঘৃতের কথায় আরব্ধ, তখন সায়ণের টীকার তৃতীয় অর্থ গ্রহণ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন সমুদ্রাৎ তৎলক্ষণাৎ গবাম্ উধসঃ। 'উপাংশু' অর্থ এখানে কিরণ বা আলোক নহে; হয়ত অলঙ্কারের ভাষায় ঐ অর্থ লইয়া pun থাকিতে পারে। এখানে উহার অর্থ 'জাপ' বা অর্দ্ধব্যক্ত স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পড়া। প্রমাণস্বরূপে 'উপাংশু' শব্দের অর্থ মনু হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিৎ দেবতাগতমানসঃ
নিজ শ্রবণযোগ্যঃ স্যাৎ উপাংশুঃ সঃ জপঃ স্মৃতঃ।
(মনু, ২, ৮৫)

দেবতারা স্বাদ গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন অর্থে জিহ্বা; এবং দেবতাদিগকে বাঁধা হইবে বলিয়া 'নাভি' কথা belt বা কোমরবন্ধ অর্থে ব্যবহৃত। সায়ণ লিখিয়াছেন—বন্ধকং ভবতি।

পূর্ণ অর্থ—মধুযুক্ত ঘৃত সমুদ্র হইতে উর্ম্মি উঠিবার মত গোরুর পালান হইতে উদ্ভূত হয়; এবং উদ্ভূত হইবার সময়, উর্ম্মিতে যেমন কিরণ লাগে, তেমনি উহা মন্ত্র লাগিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। ঘৃতের যে গুহ্য জিহ্বা আছে, তাহাই দেবতাদের জিহ্বা; এবং উহা দ্বারা দেবতারা বাঁধা পড়েন। ['নাম' কথাটি অব্যয়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে; অভিধা বা name অর্থে নহে। 'গুহ্যং জিহ্বা' বলিলে ব্যাকরণে ভুল হইবে; পদের অন্বয় অন্যরূপ, যথা:—ঘৃতের যাহা (যৎ) 'গুহ্য' আছে, তাহাই দেবতাদের জিহ্বা, এবং তাহাই অমৃতস্য নাভিঃ। পরবর্ত্তী কথার সহিত কোন নির্দ্দেশ বুঝাইতে হইলে, 'নাম' প্রভৃতি অব্যয় ব্যবহৃত হইত। ঘৃতের দ্বারা কার্য্য সাধিত হইত বলিয়া ঘৃতের গুহ্য ক্ষমতার কথাই বলা হইয়াছে।]

বয়ং নামঃ প্রব্রবাম ঘৃতস্য
অস্মিন্ যজ্ঞে ধারয়াম নমোভিঃ
উপব্রহ্মা শৃণবৎ শস্যমানম্
চতুঃ শৃঙ্গ অবমীৎ গৌরঃ এতৎ।(২)
চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদাঃ
দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য
ত্রিধা বদ্ধঃ বৃষভঃ রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্যান্ আবিবেশ।(৩)

ব্রহ্মা হইতেছেন সেই মন্ত্রশক্তি, যাহা দেবতাদের মধ্যে রহিয়াছে, এই মন্ত্র দেখিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই যাস্ক বলিয়াছেন যে, ঋষি অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা। সায়ণ চারিটি শৃঙ্গকে বেদচতুষ্টয় বলিয়া বুঝাইয়াছেন। গোরুর সঙ্গে তুলনা হইয়াছে বলিয়া টীকাকার চারিটি শিং উল্লেখ করিয়াছেন। মন্দিরের চূড়াকে শৃঙ্গ বলে, যজ্ঞবেদীর চারিদিকের turretকেও শৃঙ্গ বলা যাইত। এই শেষ অর্থে যজ্ঞের অধিদেবতা বুঝা যাইতে পারে। মল্লিনাথ রঘুবংশের ৯ম স্বর্গের ৬২ শ্লোকের টীকা করিতে লিখিয়াছেন—'শৃঙ্গং প্রাধান্যং সাম্বোশ্চ'। কেবল প্রাধান্য অর্থও পাওয়া যায়, এবং সেই অর্থ অনুসরণ করিলে, চারিদিকে যাহার ক্ষমতা বা প্রভুত্ব, এই অর্থ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। শৃঙ্গ সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা যাস্কের অনুকরণ। ৩য় ঋকের 'পাদাঃ' তিন লোককে বুঝাইবে। কেননা বৃহদ্দেবতাতে ঠিক সেই অর্থ দেওয়া আছে। সায়ণ ইহা দ্বারা তিনটি 'সবন' বুঝায় বলিয়াছেন। কেননা সবন ত্রিসন্ধ্যায় হইয়া থাকে এবং উহা দ্বারা সোমরস নিষ্কাসন করা হয়। দুইটি মস্তক বা শীর্ষ কেন বলা হইল, তাহা সায়ণের টীকায় পরিষ্কার হয় না। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ব্যাখ্যা অত্যন্ত দোষযুক্ত মনে হইল। এখানে কেবল উপমার অনেক detail বা বাহুল্য হইয়াছে, ভাবিতে পারা যায়। ইংরেজিতে slang কথায় যাহাকে niggle বলে, সেইরূপ 'তুলনা' মনে হয়। যাস্ক অবলম্বনে 'দুই মস্তক' "অহোরাত্রি" বলিয়া ধরা যায়। 'সপ্তহস্তা' অর্থে সপ্ত ছন্দ বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে বিবিধ ছন্দের কথার তুলনা ঠিক মিলিতেছে না। সায়ণ সূর্য্যের সপ্তরশ্মির কথা বলিতেছেন। সে অর্থ

সঙ্গত মনে হয়। 'ত্রিধাবদ্ধ' অর্থে সায়ণ অর্থ করিয়াছেন যে পৃথিবী, ব্যোম এবং স্বর্গে বদ্ধ।

পূর্ণ অর্থ—আমরা ঘৃতের নাম করি, এবং নমস্কার করিয়া উহা যজ্ঞের জন্য ধারণ করি। যাঁহাতে মন্ত্র বাস করেন, সেই মন্ত্রাধিষ্ঠিত ব্রহ্মাকে স্তব করি; তিনি শ্রবণ করুন। চতুর্দ্দিকে যাঁহার প্রভুত্ব, সেই গৌরবর্ণ দেব এই সকল পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছেন। (অবমীৎ= উদ্গীরতি)।(২)

চারিদিক ইঁহার শাসন; ইনি ত্রিপাদে ত্রিসন্ধ্যা সৃষ্টি করেন, অহোরাত্রি ইঁহার দুইটি শির, সপ্ত কিরণ ইঁহার সপ্ত হস্ত, ইনি পৃথিবী, ব্যোম এবং স্বর্গে বদ্ধ হইয়া আহুতি প্রার্থনায় শব্দ করিতেছেন। দেবশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর লোকদিগের নিকট প্রবেশ করিতেছেন।(৩)

চতুর্থ ঋকের অর্থ সায়ণের টীকা সহিত গ্রহণ করিলে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ ঠিক বলিয়া মনে হয়। পঞ্চম ঋকের অনুবাদও দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থে ঠিক আছে। তবে 'শতব্রজ' অর্থে সায়ণের 'অপরিমিত গতি' গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 'ব্রজ' শব্দ গোষ্ঠ অর্থেও হয়, গৃহ অর্থেও হয়। আর্য্যেরা গৃহে আছেন বলিয়া দস্যুরা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছে না, এই অর্থ সঙ্গত মনে করি।

সূক্তের পরবর্ত্তী অংশ সহজ। দুই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন অর্থ মিলাইয়া যে অর্থটি দিলাম, উহা কাহারও নিকট দোষযুক্ত মনে হইলে, অনুগ্রহ করিয়া তিনি একটি মন্তব্য লিখিবেন, আশা করি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মনস্কামনা

যদি প্রতিদিন, নাথ, মনোপুষ্পগুলি ওঠে ফুটে
সুন্দর সুগন্ধ স্নিগ্ধ পবিত্র নির্ম্মল, পড়ে টুটে
তোমারি চরণে পূজার অঞ্জলি, হে মঙ্গলময়,
শূন্য পূর্ণ হয় ‍ বে, আকাঙ্ক্ষার কিছু নাহি রয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

জন্মদুঃখী

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের প্রস্তাব।

নিকোলার টাকার তাগাদায় অসন্তুষ্ট হইয়া বার্ব্বারা মনে মনে সিলাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিল। ঐ মেয়েটাই তো উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে, নিকোলার মন ভাঙাইয়া লইয়াছে। নহিলে বার্ব্বারার আজ ভাবনা কিসের? নিকোলার রোজগারের টাকা যদি বার্ব্বারার হাতে পড়িত তাহা হইলে আর বেচারাকে হিসাব নিকাসের এত ভাবনা ভাবিতে হইত না। তাহা ছাড়া, জিনিস ফুরাইয়া যাইতেছে অথচ টাকা ঠিকমত জমিতেছে না, ইহাতে সে আরো ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অনেক পাড়াগেঁয়ে লোক পল্লীগ্রামের ধরণে খাই-খরচটা একরকম হিসাবের মধ্যেই ধরে না। বার্ব্বারাও এই দলের। নিজের সুবিপুল শরীর রক্ষার খাতে দোকানের যে সমস্ত জিনিস খরচ হইতেছে, তাহা সে ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিত না, সুতরাং প্যাকেটগুলি তো খালি হইলই, অধিকন্তু পকেটও পূরিল না। ইহার উপর আবার সন্ধ্যাবেলায় চা-বিস্কুট বিতরণ ছিল। এটাকে সে কতকটা ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের অঙ্গ বলিয়াই মনে করিত। এক-গুণ দিলে একশো গুণ আদায় হইবে, চায়ের মৌতাতে নূতন নূতন খরিদ্দার জুটিবে, এমনি তাহার আশা।

সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই বার্ব্বারার দোকানঘর পাড়ার আধা-বয়সী মেয়েদের পরচর্চ্চার আড্ডা হইয়া উঠিল।

* * * *

বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কন্‌কনে শীত। বেড়ার খুঁটির মাথায় মাথায় বরফের টুপি ঝুরো বরফে পথ ঘাট সমাচ্ছন্ন।

বৈকালের দিকে, চা ধ্বংস করিতে এবং আগুন পোহাইতে, একে একে অনেকগুলি প্রৌঢ়া বার্ব্বারার দোকানে আসিয়া জমায়েৎ হইল।

জোঁকওয়ালী তায়াল্‌সেন-গৃহিণী আজিকার সান্ধ্যসভায়

প্রধান বক্তা। বর্ত্তমানে সকল ব্যবসায়েরই যে অবনতি ঘটিতেছে ইহাই তাহার প্রতিপাদ্য।

বিকেন-গৃহিণী (ওরফে ঢেঙা গিন্নি) কিন্তু উহার মতে ঠিক সায় দিতে পারিল না। সে বলিল, "আরে সেকালেই বা এমন কি ভাল ছিল? আমিও তো আজ্‌কের লোক নই, সেকালের কথা আমার কাছে তো আর ছাপা নেই। এই দেখ না, এখনকার কালে কেরোসিন তেল সস্তা হ'য়ে গরীব লোকের কত সুবিধে হ'য়েছে, রাতকে দিন করে ফেলেছে। আগেকার কালে, লোকে আগুন পোহাবার সময়ে যেটুকু আলো পেত তাইতে একটু আধটু সূতা কাট্‌ত, রাত্রে অন্য কাজ করবার জো ছিল না। ছেলেগুলো তো বেলা তিনটে থেকে বিছানায় পড়ে পড়ে ক্রমাগত হাই তুল্‌ত আর এপাশ ওপাশ করত। এখন কেরোসিন হ'য়ে রাত আর দিন সমান হ'য়ে গেছে। লোকের রোজগারের রাস্তা বেড়ে গেছে।"

"হুঁ! বেড়েছে বই কি! সঙ্গে সঙ্গে জুয়াখেলা, মদ গেলা, রাত্তির বেড়ানোও বেড়েছে।"

"সে তো আর কেরোসিনের দোষ নয়, সে দোষ গ্যাসের। অবিশ্যি গ্যাসের গুণও আছে, গ্যাসের জোরেই কল চল্‌ছে, কত লোককে অন্ন দিচ্ছে।"

"হ্যাঁ, বদ্‌মায়েসীও শেখাচ্ছে।"

ঢেঙা গিন্নি জবাব দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ অ্যানি গ্রেভ্‌কে দোকানে ঢুকিতে দেখিয়া, চুপ করিয়া গেল।

অ্যানি গ্রেভ্‌ পাদ্‌রী সাহেবের কাছে কর্ম্ম করে, তাহার সামনে কাহারো বেফাঁস কথা কহিবার জো নাই।

ধন্যবাদ! অ্যানির চা খাইতে কোনো আপত্তি নাই। আজ আবার, তাহার উপর, অনেক খাটুনি হইয়াছে। শহরের একজন প্রসিদ্ধ বড়লোকের আজ কবর। শহরের যত বড় লোক আজ সমাধিস্থানে আসিয়াছিল।

"জীয়ন্তে, মানুষ মানুষ চিন্তে পারে না, ম'লে পরে তার মর্য্যাদা বোঝা যায়। যে গরীবের হ'য়ে দু'কথা বলে, জীয়ন্তে তার ঢাক ঘাড়ে নেবার ঢের লোক জোটে, কিন্তু ম'লে"—ঢেঙাগিন্নি চায়ের পেয়ালায় আবার চুমুক দিল। এই অবসরে তায়াল্‌সেন-গৃহিণী অন্য কথা পাড়িয়া বিকেন-গৃহিণী ওরফে ঢেঙাগিন্নির কথা চাপা দিল। সে বলিল "গরীবই বল আর বড়লোকই বল, আজকাল সকল ঘরের ছেলে মেয়েই এক এক ধিঙ্গি। কাল সন্ধ্যাবেলা গুটি পাঁচ ছয় জোঁকের জোগাড় করে ঘরে ফিরছি,—বাজারের কাছে ওষুধের দোকানের সাম্‌নে এসে ভাব্‌লুম, —এতখানি যখন বাটপাড়ের হাত এড়িয়ে আসা গেছে তখন আর ভয় নেই, নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী পৌঁছব। হঠাৎ কতকগুলো বুড়ো বুড়ো মেয়ে এসে পিছন থেকে এমনি জোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, যে ভয়ে আমার হাত থেকে জোঁকের শিশিটা ছিট্‌কে পড়ে গেল। আমি তাই সাম্‌লে গেলুম, অন্য লোক হ'লে আঁৎকে অজ্ঞান হ'য়ে যেত। ভাগ্যিস্‌ চাঁদের আলো ছিল তাই সেগুলোকে আবার কুড়ুতে পারলুম। নইলে সব মেহনৎ মাটি হত।····· কে আবার? ঐ জোসেফা, ক্রিষ্টোফা আর আমাদের হল্‌ম্যান-গিন্নির ধিঙ্গি মেয়ে সিলা। ওর মা ভাবে আমার মেয়ে বুঝি ভারি ভাল, অন্ধকারে তার যে আর এক মূর্ত্তি হয় সে খবর তো আর রাখে না।"

বার্ব্বারা শেষের কথাগুলি মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিল। সিলার সম্বন্ধে দশে কি বলে, নিকোলাকে তাহা শুনাইয়া দেওয়া চাইই চাই।

"জোঁকের কথা যা তুমি বল্লে সেটাতে অবিশ্যি মেয়েদের একটু দোষ আছে; তা' আমি অস্বীকার করিনে। তবে কি জান, ছেলে মানুষ—এখন ওদের রক্ত গরম, এ বয়সে অমন একটু আধটু হয়েই থাকে। তা' ছাড়া ওরা যদি আমোদ না করবে তো করবে কে? বুড়োরা?"

ঢেঙাগিন্নির প্রতিবাদে জোঁকওয়ালী বেজায় চটিয়া উঠিল।

"গেরস্তর মেয়ের পক্ষে রাস্তায় মাতামাতি ক'রে বেড়ানো—এও বুঝি একটা নতুন ফ্যাশান্‌! তা' হ'বে! আমরা বুড়ো সুড়ো মানুষ নতুন ফ্যাশানের মর্ম্ম বুঝিনে।·· বলি, হাঁসের পালে মাঝে মাঝে যে শেয়াল ঢোকে সে খবর কি রাখ?"

"বেশ, বেশ, তাই যদি হয়, তা হ'লে শেয়ালের উপরেই ঝাল ঝাড়া উচিত, হাঁসের উপর রাগ করে কি হবে? ওই যে ভাঙাই-ওলার ছোকরা বাবু, ওই যে ভেড়া-বাজারের বাজার-সরকার, ওই যে কৌমুলী সাহেবের

ছেলে লাড্‌ভিগ্‌,—ওদের উপর ঝাল ঝাড়্‌তে পার তবে বলি, হাঁ।"

বার্ব্বারা খরিদ্দারকে জিনিস দেখাইতেছিল হঠাৎ লাড্‌ভিগের নাম শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"লাড্‌ভিগ? লাড্‌ভিগের সম্বন্ধে আমার সাম্‌নে কেউ কিছু বল্‌তে পাবে না। অমন ছেলে আর আছে? আমি এক নাগাড়ে চোদ্দ বছর তাকে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি। ওর সম্বন্ধে আমি যা' জানি তার চেয়ে বেশী কেউ জানে না। লাড্‌ভিগ্‌ আমার কি 'ন্যাওটো'ই ছিল। সে সব কথা"--

খরিদ্দার সাবানের জন্য তাগিদ না দিলে বার্ব্বারা আরও খানিক লাড্‌ভিগের গুণ বর্ণনা করিতে পারিত। কিন্তু কি করিবে খরিদ্দার বেজার হইতেছে; অগত্যা বেচারা মুখ বন্ধ করিয়া সাবানের বাক্স খুলিতে গেল।

জোঁকওয়ালী আবার মেয়েদের লইয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইলে কলের মেয়েগুলা যে আর্সুলার মত দরজায় দরজায় মুখ বাড়াইতে থাকে ইহা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

অ্যানি গ্রেভ উহার সঙ্গে যোগ দিয়া একধার হইতে সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। কোনো কোনো মেয়ের সম্বন্ধে উহারা স্পষ্ট নাম না করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যাহা-না-বলিবার তাহাই বলিল, কাহারো সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইল; আবার কাহারো কাহারো নাম ধরিয়াই অসঙ্কোচে কুৎসার কালি লেপন করিতে লাগিল।

বার্ব্বারা আগাগোড়া কান খাড়া করিয়া আছে। সিলার সম্বন্ধে ইহারা কি বলে সেই দিকেই উহার লক্ষ্য। কারণ, সে সমস্ত কথা নিকোলাকে জানাইতে হইবে। আগে থাকিতে সাবধান করিয়া দেওয়া চাই তো।

নিকোলার কাছে, অল্প বয়সী কলের মেয়েদের চরিত্র কীর্ত্তন করিতে গিয়া বার্ব্বারা কোনোদিন স্পষ্ট করিয়া সিলার নাম করে নাই, ততটুকু বুদ্ধি উহার ছিল। নিকোলা এমন না ঠাওরায় যে বার্ব্বারা সিলার নামে উহার কাছে লাগাইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কথা যে ক্রমেই নিকোলার পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে ইহা বার্ব্বারা বেশ বুঝিতে পারিত। ইহাই তো সে চায়।

ঢেঙাগিন্নি, জোঁকওয়ালী প্রভৃতি চলিয়া গেলে, সেই রাত্রেই বার্ব্বারা নিকোলাকে তাহাদের সমস্ত মন্তব্য বিবৃত করিয়া বলিল। নিকোলা মুখ ভার করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল।

চাঁদের আলোয় দলে দলে কিশোরবয়স্ক ছেলে মেয়েরা আনন্দে হল্লা করিতে করিতে চলিয়াছে। মাঝে মাঝে শহরের ভদ্রলোকেদেরও দর্শন পাওয়া যাইতেছে। একজন ছোকরা একটা ঠেলাগাড়ী ঠেলিয়া আনিতেছে। একগাড়ী মেয়ে।

নিকোলা মায়ের কথায় কোন প্রতিবাদ না করিয়া, উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়াইল; বার্ব্বারা সেলাই করিতে লাগিল।

নিকোলা দেখিল জানালার নীচে ক্রিষ্টোফা ও জোসেফা। নিশ্চয় কাহারো জন্যে অপেক্ষা করিতেছে।—বোধ হয় সিলার জন্য। উহাদের উভয়ের মধ্যে কে যে হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর কাছে, সাহস করিয়া, সিলাকে আজিকার মত ছুটি দিবার কথা পাড়িবে এই লইয়া তর্ক চলিতেছিল।

এই সময়ে আর একটা দল উচ্চ হাস্যে পথ মুখরিত করিয়া নিকোলার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

বার্ব্বারা সেলাই বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল—

"ইস্! কী কলরব। যতক্ষণ জোচ্ছনা ততক্ষণ আর নিস্তার নেই। এ সব ক্রমে হল কি?"

নিকোলার সর্ব্বাঙ্গ আগুন হইয়া উঠিল। সিলা যদি এই সমস্ত দলে মেশে তবে সে আর ইহজন্মে হাতুড়ি ধরিবে না।

ঐ যে সিলা গলির মোড়ে; বোধ হয় বন্ধুদের খুঁজিতেছে।

নিকোলা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

"এই যে! সিলা নাকি?"

"এই যে! নিকোলা! ক্রিষ্টোফাকে এদিকে দেখেছ? জোসেফাকে? দেখনি? ভারি একটা কথা ছিল! ... আচ্ছা, কেমন ক'রে এলুম বল দেখি? আমাদের সেই বেরালটাকে ধরতে এসেছি! আমিই সেটাকে তাড়িয়ে বা'র করেছিলুম। তারপর উঠানে চট্ ক'রে একটা কাঠের টব্ চাপা দিয়ে রেখে এসেছি। মা তা' দেখতে পায়নি। এখন 'ম্যাও' 'ম্যাও' না করলে বাঁচি।"

সিলা সশঙ্কভাবে আর একবার চতুর্দ্দিকে চাহিল।

"বারবার ক'য়ে বল্লে,—আমার জন্যে অপেক্ষা কর্ব্বেই অথচ—"

"অথচ, চলে গেল, সোজা!"

"না, না, বোধ হয় তারা এখনো আসেনি, এলে অপেক্ষা করতই। কিন্তু আমি আর বেশীক্ষণ বাইরে থাকলে এখনি মা এসে হাজির হবে। আমি চল্লুম। ...নিক! তুমি যদি একটু দাঁড়াও এইখানে; তারা এলে বোলো আজ আমি কোনো মতেই বেরুতে পারব না। কাল মা যাবে আণ্টনিদের কাপড় ইস্ত্রি করতে, রাত্রে ফিরবে না। আমিও দেব দৌড়। তুমি কিন্তু একটু এইখানটা ঘুরে, তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে, সব কথা ভাল ক'রে বোলো; নইলে তারা আমায় ভারি দুষবে।"

"বেশ সিলা, বাঃ! তুমি এখন একেবারে স্বাধীন হ'তে চাও। তোমাকে ওরা নিজের দলে না টেনে ছাড়্‌লে না দেখ্‌ছি। কিন্তু যাদের ইজ্জতের ভয় আছে তারা যে কেমন ক'রে ওদের সঙ্গে মেশে এ আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি নে।"

"ইজ্জৎ? যাদের ইজ্জৎ আছে তারা বুঝি কেবল দোলাই মুড়ি দিয়ে ঠুঁটো কাঠের পুতুলের মত ঠুক্‌ঠুক্ করে বেড়ায়? হাসেও না? কাঁদেও না? নাচেও না? দেখ, আড়ষ্ট হ'য়ে, ভয়ে ভয়ে, গণ্ডির ভিতর চিম্‌টের মত পা ফেলে, আমি কখ্‌খনো চল্‌তে শিখ্‌ব না, এতে তুমি যাই বল, আর যাই কও। আড়ষ্ট হয়েই যদি জীবন কেটে গেল তবে বেঁচে সুখ কি? মলেই তো মঙ্গল।"

নিকোলা মাথা নাড়িয়া বলিল, "যা বল্‌ছ, সব ঠিক,—যদি রাস্তায় ওৎপাতা জানোয়ারের উৎপাত না থাক্‌তো। কি জান, তারাও শীকার চায়, কাজেই গরীব মানুষের নানাদিকে চোখ রাখ্‌তে হয়, সকল দিক বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। দেখ, সিলা এ উদ্বেগ আর সহ্য হয় না। এখন তোমার যদি মত থাকে তো বল, আজ—এখনি তোমার মার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা করে ফেলি।"

আকস্মিক আতঙ্কে সিলা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"পাগল! তুমি ক্ষেপেছ! না, না, না; মাকে তুমি জান না? তুমি কি আগাগোড়া সকল কথাই ভুলে গেলে? ওকথা বলবার ঢের সময় আছে, আরো কিছু জমুক, তখন বোলো। ঢের সময় আছে।"

"ঢের সময় আছে? না, সিলা, আমার মনে হচ্ছে আর একটুও দেরী করা উচিত নয়। ও আমি জোর ক'রে, মন বেঁধে, চট্‌পট্ বলে ফেল্‌তে চাই।"

"তার পর? বাড়ীতে আমার কি দুর্দ্দশা হ'বে তা' বল দেখি? আর এ পোষাকে এমন সময়ে তুমি মার কাছে কি করে যাবে? সে কিছুতেই হ'বে না।"

"ভয় কি, মিষ্টার নিকোলা, ভয় কি? আমার সুবোধ মেয়ে অসহায় বিধবা মায়ের সুনাম কেমন ক'রে রক্ষা করছেন সেটা না হয় নিজের চোখেই দেখ্‌লুম, তাতেই বা ক্ষতি কি?"

তাইত! এ যে হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর আওয়াজ! সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। সে কখন যে নিঃশব্দে আসিয়া, একেবারে জাহাজের মাস্তুলের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা কেহই টের পায় নাই।

"যখন কর্ত্তা মারা গেলেন ভাব্‌লুম এর চেয়ে বুঝি আর কষ্টের বিষয় কিছু নেই। আজ আমার সে ভুল ঘুচ্‌ল। আমার মেয়ে!—সিলা আমায় না ব'লে এই অন্ধকারে, বাড়ীর বার হ'য়ে বরফের মাঝখানে, বেটা-ছেলের সঙ্গে কথা কয়!...সিলা! চলে এস বল্‌ছি, চলে এস; এখুনি চ'লে এস বল্‌ছি, এস!"

সিলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধে, ঘৃণায়, অবজ্ঞায়, তাচ্ছিল্যে, ক্ষোভে, হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর কণ্ঠস্বর বিকট হইয়া উঠিয়াছে।

নিকোলা কিন্তু এই চণ্ডীমূর্ত্তিতে পূর্ব্বের মত আর ভয় পাইল না। সে বলিল—

"দেখুন, আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম। এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে ঠিক ইচ্ছা ছিল না। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। চলুন আপনার বাড়ী গিয়াই সব বল্‌ব।"

"যা' বল্‌তে হয় তা এইখানেই বোধ হয় বলা যেতে পারে, এইখানে দাঁড়িয়েই বলা যেতে পারে।......সিলা এস এই দিকে!"

"হাঁ, এইখানেই বলা যেতে পারে, তবে সমস্ত পরিষ্কার ক'রে বল্‌তে হ'বে সেই জন্যই বল্‌ছিলুম্।"

হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী গলির মোড় জুড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং বারম্বার সিলার উপর তর্জ্জন করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ সহ্য করিয়া, আতঙ্কের আতিশয্যে নৈরাশ্যের দুঃসাহসে সিলা অবশেষে একরূপ চোখ বুজিয়াই নিকোলার পার্শ্বে আসিয়া তাহার দুই হাতে ধরিয়া পা দৃঢ় করিয়া দাঁড়াইল।

"হাঁা, ম্যাডাম্, যা' দেখছেন ঠিক এই। আমাদের ছেলে বেলা থেকে পরস্পরের প্রতি ঠিক এই ভাব। আজ্‌কে আপনার কাছে আমি এই কথাই জানাতে যাচ্ছিলুম্। আপনি এখন মত করলেই হয়। আমি পাকা মিস্ত্রি হ'য়েছি, ভাল ভাল সার্টিফিকেট পেয়েছি, তা ছাড়া আমি কোনো নেশা করিনে, এ সমস্ত কথা মনে ক'রে আপনাকে বিবেচনা করতে হ'বে—"

অবসন্ন সিলা আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, সে নিকোলাকে ও শ্রীমতী হল্‌ম্যান্‌কে ঠেলিয়া একেবারে সোজা বাড়ীর দিকে চলিল। পিছনে পিছনে হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীও চলিল, নিকোলাও চলিল।

সিলা ঘরে ঢুকিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। নিকোলা বসিল না। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাম্ভীর্য্যের অবতার হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর কাছে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা ভরসার কথা উৎসাহের সহিত বিবৃত করিতে লাগিল।

অনাথা বিধবার একমাত্র অবলম্বন সিলাকে কাড়িয়া লইয়া নিকোলা যে ভয়ঙ্কর অন্যায় কার্য্য করিতেছে, এই কথাটাই হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী খুব ঘোরালো করিয়া বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু, কি ভাবিয়া থামিয়া গেল। সহসা উহার চোখ খুলিয়া গেল। সে ভাবিল, নিকোলা যাহা বলিতেছে তাহা যদি সত্যই ঘটে, সে যদি বড় কারিগরই হয় তবে তাহাকে জামাই করিয়া লইলে ভবিষ্যতের আর ভাবনা থাকে না, তাহা হইলে নিকোলার ঘরেই আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে।

এই কথাটা ফস্‌ করিয়া মাথায় আসায় ভিতরে ভিতরে মনটা নরম হইলেও বাহিরে সে বড় একটা নরম ভাব দেখাইল না। ইহার পরেও সে রীতিমত দর দস্তুর করিতে ছাড়িল না। সিলার বিবাহের সম্বন্ধে তাহার যে অনেক বড় আশা ছিল এমন কথাও বলিল।

সে যাহাই হউক, ন্যূনপক্ষে অন্ততঃ একশত ডলার না দেখাইতে পারিলে নিকোলার যে কোনো আশা ভরসাই নাই এ কথা সে স্পষ্টই বলিয়া দিল। হল্‌ম্যানের বিবাহের পূর্ব্বে হল্‌ম্যান্‌ও ঠিক অতগুলি ডলারের মালিক ছিল। তবেই না সে হলম্যানের গৃহিণী হইতে রাজী হয়। এ যতদিন জোগাড় না হয় ততদিন সিলার সঙ্গে দেখাশুনা বন্ধ।

একশত ডলার!—যাক্‌! নিকোলা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

বার্ব্বারাকে সে এই সুখবরটা না দিয়া থাকিতে পারিল না। সিলাদের বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া সে একেবারে বার্ব্বারার দরজায় গিয়া হাজির হইল এবং কড়া নাড়িয়া তাহাকে জাগাইয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

বার্ব্বারা কথাটা যে কি ভাবে লইল তাহা ঠিক বোঝা গেল না; সে নিজেও নিজের মন বুঝিতে পারিল বলিয়া মনে হয় না। অনেকক্ষণ বিছানায় এ পাশ ও পাশ করিয়া সে হঠাৎ লেপ ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। তাই তো! এবার তো সে নিকোলার সংসারে 'গিন্নি বান্নি' হইয়া থাকিতে পারে। কি আশ্চর্য্য! এ কথাটা এতক্ষণ তাহার মাথায় প্রবেশ করে নাই!

কুক্ষণে সে দোকান করিতে গিয়াছিল। দোকানই এখন তাহাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। হায়! বার্ব্বারা যে নিজেই দোকানটা গ্রাস করিতেছে এ কথাটা তাহাকে কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই। এখন দোকানপাট তুলিয়া দিয়া সময় থাকিতে সে সাবধান হইবে। সিলা ছেলে মানুষ, সংসারের কিছুই জানে না। বার্ব্বারা না থাকিলে কিছুতেই সে পাকা গৃহিণী হইতে পারিবে না। আর নিকোলার কথাও বলি, মাকে ভরণপোষণ করা তো সন্তানের কর্ত্তব্যই।

পরবর্ত্তী রবিবারে হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী অভ্যাসমত বার্ব্বারার দোকানে চা খাইতে আসিল। বিবাহ সম্বন্ধে, কিন্তু, দুজনের মধ্যে কেহই কোনো উচ্চবাচ্য করিল না। অনেকক্ষণ পরে কথায় কথায় নিকোলার কথা উঠিলে বার্ব্বারা বলিল,

"ছেলেকে ছেড়ে অনেকদিন তফাৎ হ'য়ে রয়েছি। এবার, ভেবেছি, বোন্, এই শীতটা বাদে মায়েবেটায় ঐ সাম্‌নের ঘরটাতে উঠে গিয়ে নতুন সংসার গুছিয়ে নেব।"

হঠাৎ হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর মুখ অন্ধকার হইয়া গেল, সে আর চা গিলিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি, শুধু 'ধন্যবাদ' দিয়া, উঠিয়া চলিয়া গেল। এই ঘটনার পর দুজনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে বেশ একটু মন কষাকষি চলিল, বাহিরে অবশ্য তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইত না। এমন কি ইহাতে হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর চায়ের স্পৃহাটা একটুও কমিল না এবং যাতায়াতও বন্ধ হইল না, বরং বাড়িয়াই উঠিল। কেবল, যে কথাটা উঁহাদের উভয়েরই ঠোঁটের আগায় সর্ব্বদাই আসিয়া উপস্থিত হইত, সেই কথাটাই চাপা রহিয়া গেল।

নিকোলা ও সিলার ভাবী গৃহস্থালীতে শূন্য গৃহিণীর পদ লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হইয়াছে তাহাতে কে যে জয়ী হইবে তাহা বলা দুষ্কর। দু'জনেই পাকা খেলোয়াড়ের মত 'বড়ের' চাল চালিতে লাগিল।

এক বিষয়ে উঁহাদের দুইজনেরই মতের ভারি ঐক্য ছিল; উঁহাদের উভয়েরই মনোগত কথাটা এই যে "নিজে যদি সংসারের কর্ত্রী হইতে না পাই, তবে অন্ততঃ প্রতিপক্ষকেও কর্ত্রী হইতে দিব না।"

এমনি করিয়া দুই ভাবী বৈবাহিকা পরস্পরের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন এবং পরস্পরের সমস্ত সঙ্কল্প পণ্ড করিবার পন্থা খুঁজিতেছিলেন। অথচ, নিকোলা কিম্বা সিলা এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেছিল না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আনন্দ

হে আনন্দ, হে অমৃত, হে আমার বচন-অতীত,
আঘাত করিয়া বক্ষে বেদনায় করিয়া ব্যথিত,
নিভৃত হৃদয়ে মম যে উৎসের খুলি দিলে দ্বার,
সেথা হতে পশে কানে সঙ্গীতের বিচিত্র ঝঙ্কার,
অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা-ধ্বনি, নিত্য নব নব রাগিণীর
আনন্দ নূতনতর, উৎসবের উৎসাহ বাণীর
নবীন প্রেরণা, চির অবারিত হৃদয়ের পরে
শীতল শীকরস্পর্শ অনুদিন ঝরে ঝরে পড়ে
অনন্ত সান্ত্বনা সম, বেদনার অস্তিত্ব কোথায়?
অমৃতের আস্বাদনে চরিতার্থ করিলে আমায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

নবীন-সন্ন্যাসী

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রমণ ঘোষের দুর্গতি।

সেদিন রমণ ঘোষ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সেই মাত্র বড় ঘরের রকে বসিয়া একটি ছিলিম তামাক সাজিয়াছে, এমন সময় তাহার সপ্তদশবর্ষবয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র আসিয়া বলিল—"বাবা, দরজায় সেপাই।"

রমণ ঘোষ বিস্মিত হইয়া বলিল—"সেপাই কি রে? কেন এসেছে?"

বালক উত্তর করিল "তা ত জানিনে। আমি বাইরে যাচ্ছিলাম, বল্লে বাইরে যেতে পাবে না, হুকুম নেই।"

এমন সময় বাড়ীর ঝি হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বলিল "ওগো ঘোষজা মশাই, খিড়কী দরজায় সিপুই দাঁড়িয়ে।"

শুনিয়া রমণ ঘোষ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"কেন, সেপাই কেন এল?"

ঝি বলিল—"আমি পুকুরঘাটে বাসন মাজতে যাচ্ছিলাম, সিপুই বল্লে যেতে পাবিনে, দারোগার হুকুম নেই।"

রমণ ঘোষ তখন উভয় দরজায় গিয়া দেখিল, বাস্তবিকই লালপাগড়ীধারী দুইজন কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসায় তাহারা বলিল—"এখনি দারোগা সাহেব আসবেন, কারু বাইরে যাবার হুকুম নেই।"

রমণ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, কি হয়েছে?"

"আমরা তা জানিনে। এখনি দারোগা সাহেব আসবেন, এলেই জানতে পারবে।"

রমণ ঘোষ চিন্তান্বিত হইয়া অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার কন্যা আসিয়া বলিল—"বাবা, গোহাল ঘরের পিছনে যেথানে পাঁচিল থানিক ভাঙ্গা আছে, সেথানে একজন সেপাই।"

রমণ ঘোষ সেইদিকে গিয়া দেখিল, যথার্থ কথা বটে। ভাঙ্গা প্রাচীরের বাহিরেও একজন কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে। নির্গমের সমস্ত পথই বন্ধ।

বাটীর লোকে সকলেই এই অভাবনীয় ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। একটা আসন্ন বিপৎপাতের আশঙ্কায় সকলেরই মুখ অন্ধকার।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অশ্বারোহণে দারোগা শেফায়েৎ হোসেন আসিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইজন চৌকিদার ছুটিয়া আসিতেছে। একজনের স্কন্ধে একটা কাঠের বাক্স—তাহাতে দারোগা সাহেবের কাগজপত্র দোয়াত কলম প্রভৃতি আছে।

দারোগা সদর দরজায় পৌঁছিতেই, চৌকিদার দুইজন ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল। রমণ ঘোষ বাহিরে গিয়া দারোগাকে সেলাম করিল। দারোগা বলিল—"তোমার নাম কি?"

রমণ নাম বলিল।

"এ বাড়ী তোমার?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আর কেউ সরিকদার আছে?"

"কেউ না। আমিই ষোল আনার মালিক।"

"তোমার বাড়ী থানাতল্লাসী হবে। স্ত্রীলোকদের সরাও।"

রমণ বলিল—"কেন দারোগা সাহেব? আমার বাড়ী থানাতল্লাসী হবে কেন?"

"তোমার বাড়ীতে চোরাই মাল আছে আমি খবর পেয়েছি।"

এমন সময় কেনারাম আসিয়া সেখানে পৌঁছিল।

রমণ বলিল—"চোরাই মাল? আমার বাড়ীতে? কথ্‌খনো নয়। কে খবর দিলে?"

দারোগা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বলিল—"কে খবর দিলে তা পুলিস বলতে বাধ্য নয়।" একজন চৌকিদার ঘোড়াটা ধরিল। অন্য চৌকিদারকে দারোগা বলিল—"পাড়ার দুচারজন মাতব্বর লোককে ডেকে আন্।"

দারোগা অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া কেনারামকে দেখাইয়া বলিল—"এই লোকটির বাড়ীতে সিঁধ হয়েছিল—চুরি হয়ে গেছে। সেই মাল তোমার বাড়ীতে আছে সন্ধান পেয়েছি। যদি ভাল চাও, কোথা আছে এই বেলা দেখিয়ে দাও। না দেখাও ত তোমার বাড়ী উলট পালট করে ফেলাব।"

শুনিয়া রমণ ঘোষের মন হইতে আশঙ্কার বোঝা নামিয়া গেল। হাসিয়া বলিল—"এই কথা দারোগা সাহেব? তা আপনি স্বচ্ছন্দে তল্লাস করতে পারেন। আমার বাড়ীতে কারু কোনও মাল নেই। এ খবর নিশ্চয় আমাব কোনও শত্রু আপনাকে দিয়েছে। (কেনারামের প্রতি) কে হে বাবু তুমি? তোমার নাম কি, বাড়ী কোথায়?"

দারোগা তৎক্ষণাৎ কেনারামের প্রতি সরোষ কটাক্ষ করিয়া বলিল—"চুপ রও। বলিস্‌নে।"

রমণ বলিল—"তা না বলুক। আমার কোন্ শত্রু আমার নামে এ মিছে অপবাদ দিয়েছে তা আমার জান্‌তে বাকী থাক্‌বে না। আজ হয় কাল হয় জান্‌তে পার্‌বই। তখন, দারোগা সাহেব, আমি আপনারই কাছে গিয়ে নালিশবন্দ হব। আমাকে এই যে খামকা অপমানটা কর্‌লে আপনাকে মিছে হায়রাণ করলে তার বিচার আপনাকে করতে হবে। এখন আসুন, বাক্স পেটারা সব জিনিষের চাবি দিচ্ছি, যত খুসি তল্লাসী করুন।"

এই সময় পাড়ার তিন চারিজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই কৃষিজীবী—অশিক্ষিত ও ভীতিগ্রস্ত। দারোগাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দারোগা কাগজ কলম বাহির করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নাম লিখিয়া লইল। শেষে বলিল—"বাড়ী থানাতল্লাসী হবে, তোমরা সাক্ষী। সঙ্গে সঙ্গে থেক।"

দারোগা তখন প্রত্যেক ঘরে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। বাক্স পেটারা যেখানে যাহা ছিল, সমস্ত খোলাইয়া দেখিল। সমস্ত বাসন এবং অলঙ্কারাদি এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া কেনারামকে

জিজ্ঞাসা করিল—"দেখ্, এ সবের মধ্যে তোর কোন মাল আছে ?"

কেনারাম হাতযোড় করিয়া বলিল—"না হুজুর।"

দারোগা ছড়ির দ্বারা তাহার পাঁজরে খোঁচা দিয়া বলিল—"বেটা না দেখেই বল্‌ছিস যে! আগে সব জিনিষ ভাল করে দেখ, দেখে বল।"

কেনারাম সব জিনিষ ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—"না, এর মধ্যে আমার কিছু নেই।"

দারোগা তখন অঙ্গনে নামিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। খুঁড়িয়া পুঁতিয়া রাখিবার কোন চিহ্ন কোথাও আছে কি না দেখিবার জন্য কনেষ্টবলগণকে আদেশ করিল। তাহারা চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া কোথাও সেরূপ কোন চিহ্ন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল না।

উঠানে দুইটা বড় বড় ধানের গোলা ছিল। দারোগা হুকুম দিল—"এই গোলা দুটোর মধ্যে মাল আছে কি না দেখ।" কনেষ্টবলগণ আপন আপন উর্দ্দি খুলিয়া ফেলিয়া গোলা দুইটা হইতে সমস্ত ধান বাহির করিয়া ফেলিল। কোনও মাল পাওয়া গেল না।

দারোগা তখন সদলবলে রান্না ঘরের দিকে গেল। বলিল—"এই ঘরে নিশ্চয় আছে।" রমণ ঘোষের আপত্তি সত্ত্বেও দারোগা ভিতরে প্রবেশ করিল। করিম খাঁ কনেষ্টবলকে ডাকিয়া বলিল—"হাণ্ডি সব তোড় ডালো। দেখো ভিতরমে মাল হায় কি নেহি।"

তখন সেই মুসলমান কনেষ্টবল লাঠির আঘাতে সমস্ত হাঁড়ি চূরমার করিয়া ফেলিল। বাসি ভাত, ভাজা মাছ, প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, ঘরময় ছত্রাকার হইয়া পড়িল। কিছু কিছু সিপাহীর দাড়ীতে ও গাত্রেও লাগিয়া গেল। কোনও মাল বাহির হইল না।

অবশেষে দারোগা গোহালের নিকট গিয়া বলিল—"এই যে এখানে একটা মস্ত খড়ের পাঁজা রয়েছে। এটা এতক্ষণ দেখি নি।"—আজ্ঞানুসারে কনেষ্টবলগণ সেই পাঁজার খড় সরাইয়া খুঁজিতে লাগিল। অধিক খুঁজিবার পূর্ব্বেই তাহার মধ্যে হইতে খানকতক পিতল কাঁসার বাসন বাহির হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া কেনারাম লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"ঐ আমার বাসন। কাঁসারি মেরামৎ করে দিয়েছিল, ঐ দাগ রয়েছে।"

দারোগা মুহূর্ত্তের জন্য কেনারামের প্রতি রোষ-কটাক্ষ করিয়া বলিল—"কি ঘোষের পো? বড় যে সাধুপনা জানাচ্ছিলে? এখন?"

এই ব্যাপার দেখিয়া রমণ ঘোষ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ তাহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। অবশেষে কষ্টে বলিল—"এ আমার কোনও শত্রুর কায। আমাকে ফাঁসাবার জন্যে কেউ লুকিয়ে রেখে গেছে।"

ব্যঙ্গস্বরে দারোগা বলিল—"শত্রুর কায!—আদালতে গিয়ে তাই জবাব দিও। বুদ্ধি দেখ একবার! খড়ের পাঁজার মধ্যে রেখেছে। মনে করেছে পুলিস আসে ত বাক্স পেটারা খুঁজবে—ঘর খুঁজবে—খড়ের পাঁজা আর কে খুঁজবে? ওরে—আমি আজ তেরো বচ্ছর দারোগাগিরি করছি। আমার চোখে তুই ধূলো দিবি? চোর বেটা।"

ইহা শুনিয়া রমণ ঘোষের চক্ষু দুইটা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল—"খপর্দ্দার দারোগা সাহেব। গাল মন্দ কোরো না। মুখ সামলে কথা কোয়ো।"

দারোগা বলিল—"কী।—যত বড় মুখ তত বড় কথা? দারোগাকে চোখ রাঙানি?—পাজি বেটা নচ্ছার বেটা। করিম খাঁ—হাঁথ কড়ি লাগাও শালে বেয়াদব কো।"

করিম খাঁ তৎক্ষণাৎ রমণ ঘোষকে এক ধাক্কা দিল। নিকটে একটা নারিকেল গাছ ছিল, কোন মতে তাহাই অবলম্বন করিয়া রমণ ঘোষ নিজেকে পতন হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু গাছের গুঁড়িতে লাগিয়া তাহার পঞ্জরের এক অংশ ছড়িয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। রমণ উঠিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে দুইজন কনেষ্টবল তাহার দুই হস্ত পৃষ্ঠের দিকে টানিয়া ধরিল, করিম খাঁ হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা এ ব্যাপার দেখিয়া সকলে মিলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দারোগা মাটীতে দুই পা সজোরে ঠুকিয়া, স্ত্রীলোকগণের প্রতি চাহিয়া বলিল—"চুপ রও হারামজাদি-লোগ।"—বলিয়া কদর্য্য ভাষায় তাহাদিগকে গালি দিল।

রমণ ঘোষ চীৎকার করিয়া বলিল—"দারোগা সাহেব—তুমি নীচ, তুমি ছোটলোক। সাবধান, মেয়েদের অপমান কোরো না। আমি জেলায় গিয়ে তোমার নামে নালিশ করব।"—তাহার দুই চক্ষু দিয়া ক্রোধ ও ক্ষোভের জ্বালা বাহির হইতেছিল। নাসিকা ক্ষণে ক্ষণে স্ফীত হইতে লাগিল।

দারোগা রমণ ঘোষের গণ্ডস্থলে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল—"করিম খাঁ—শালাকে মুহ্‌মে থুক দেও।"

এ হুকুম তামিল করিতে করিম খাঁ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকগণ আবার উচ্চরোলে ক্রন্দন আরম্ভ করিল।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, অশ্রুগদ্‌গদস্বরে কেনারাম বলিল—"দারোগা সাহেব—এনাকে ছেড়ে দাও। ও বাসন আমার নয়।"

দারোগা চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল—"কি বল্লি?"

পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর স্বরে কেনারাম বলিল—"আজ্ঞে ও বাসন আমার নয়। এনাকে ছেড়ে দাও।"

দারোগা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"কী!—তোর নয়? তবে কেন এখনি বল্লি যে তোর?"

"আজ্ঞে সেটা মিছে করে বলেছিলাম।"

দারোগা সপ্তমে চড়িয়া বলিল—"দারোগার কাছে মিথ্যে এজেহার? তবে তোকেই চালান করি।—তোর সাতবচ্ছর জেল হবে। করিম খাঁ—হাঁথকড়ি লে আও।"

যদিও দ্বিতীয় হাতকড়ি আর ছিল না—তথাপি করিম খাঁ তাহার ব্যাগের মধ্যে হাতকড়ি খুঁজিবার ভাণ করিল।

কেনারাম দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—"আজ্ঞে মিথ্যে এজেহার করলে জেল হয়?"

দারোগা দন্ত খিচাইয়া, বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"নাঃ—জেল হবে কেন? সন্দেশ খেতে দেয়। করিম খাঁ—হাঁথকড়ি লাগাও।"

কেনারাম তখন কাঁপিতে কাঁপিতে, করযোড়ে বলিল—"আজ্ঞে—তবে—ও বাসন—আমারই।"—বলিয়া যেদিকে স্ত্রীলোকগণ ছিল, সেদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কেনারাম দাঁড়াইয়া রহিল।

দারোগা কাগজ কলম প্রভৃতি লইয়া বাসনগুলির ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। সেই ফর্দ্দে সাক্ষীগণের সহি লইল—এবং আবার পাছে কেনারাম বাসনগুলা নিজের বলিয়া অস্বীকার করে,—তাই সেই ফর্দ্দের প্রান্তভাগে তাহারও বুড়া আঙুলের টিপ সহি লইল।

ইতিমধ্যে অঙ্গনে আরও কয়েকজন প্রতিবেশী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখা গেল একজন বৃদ্ধলোক, রমণের পুত্রের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে। ছেলেটি তাহার পর স্ত্রীলোকগণের কাছে গিয়া চুপি চুপি কি বলিতে লাগিল। এ সমস্ত কিছুই দারোগার চক্ষু এড়ায় নাই। ব্যাপার কি, তাহাও দারোগা ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে অনুমান করিতে সমর্থ হইল।

শেফায়ৎ হোসেন তখন উচ্চকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"এদিকের ত সব ঠিক হল। একজন চৌকিদার বাসনগুলো বেঁধে নে। করিম খাঁ—আসামীর কোমরে একগাছা দড়ি বাঁধ। হরি সিং আর রাম সিং—সেই দড়ির দুধার দুজনে ধরে নিয়ে যাবে। পথে যদি বেটা বদমায়েসি করে—কি চলতে দেরী করে—তবে অমনি করিম খাঁ—তুমি মারবে বেটার পেটে রুলের গুঁতো। আর, পথে যেতে যেতে কোনও একটা জঙ্গল থেকে দুটো বড় বড় জলবিছুটির গাছ উপড়ে নিয়ে যাবে। থানায় গিয়ে, আসামী যদি সহজে দোষ স্বীকার না করে—তবে কষে জলবিছুটি লাগাতে হবে। কোমরে দড়ি বাঁধ।"

করিম খাঁ দড়ি বাহির করিল। তাহা দেখিয়া স্ত্রীলোকগণ আবার চীৎকার করিতে লাগিল।

বৃদ্ধটি তখন দারোগার কাছে আসিয়া বলিল—"হুজুর—একবার এদিকে আসবেন?"

"হুজুর" অতি অমায়িকতার সহিত বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অঙ্গনের প্রান্তে গিয়া উভয়ে দণ্ডায়মান হইলে বৃদ্ধ বলিল—"দারোগা সাহেব, একটা উপায় করুন, নইলে গরীব মারা যায়।"

"আমি কি উপায় করব?"

"গরীব কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করে—সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। দয়া করুন। ছেড়ে দিন।"

"আমি য়া ব ার কে? আমি ছাড়ব কি করে?

আইন কি আমি তৈরি করেছি। আমরা সরকারের নুন খাই—সরকারের আইন যে ভঙ্গ করেছে—তাকে কি ছেড়ে দিতে পারি ?"

"কেন পারবেন না হুজুর—আপনি গরীবের মা বাপ। আপনি মনে করলে সব করতে পারেন।"

আসল কথাটা বলিতে বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া দারোগা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল—"ওসব বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই। কি বলতে চাও চটপট্ বল।"

বৃদ্ধ তখন এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—"দারোগা সাহেব, কত হলে ওকে খালাস দিতে পারেন ?"

"খালাস দিতে পারি এমন ত বোধ হয় না। আচ্ছা সে কথা পরে হবে। আমি যা বলি শোন। আমি সেপাইদের কি হুকুম দিয়েছি স্বকর্ণে শুনেছ ত ? আমি বড় কড়া হাকিম। যা বলেছি, তাই সমস্ত করব—বরং বেশী তবু কম নয়। এখনি নগদ যদি ১০০৲ আমায় দাও, তবে কোমরের দড়ি হাতের হাতকড়ি খুলে দেব, শুধু সেপাইদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। একরার করাবার জন্যে জলবিছুটি কি মারপিট কি অন্য কোন রকম অত্যাচার করব না। শুধু হাজতে রেখে দেব। তোমরা গিয়ে রেঁধে ওকে খাওয়াতে পাবে—কথা বার্ত্তা কইতে পাবে। শুধু এর জন্যে নগদ ১০০৲ চাই। অন্য সব কথা সন্ধ্যাবেলা থানায় বসে হবে।"

বৃদ্ধ বারকতক স্ত্রীলোকগণ ও দারোগার মধ্যে যাতায়াত করিল। শেষে রফা হইল দারোগার জন্য ৫০৲ তিন জন কনেষ্টবল ২৲ করিয়া এবং চৌকিদার দুইজন ৷৷০ হিসাবে—মোট ৫৭৲ টাকা। টাকা লইয়া, আসামী লইয়া দারোগা প্রস্থান করিল।

পরদিন গদাই পাল পত্র দ্বারায় গোপীকান্ত বাবুকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিল। আরও লিখিল—"রমণ ঘোষ অর্থশালী লোক বিধায় দারোগাকে ৫০০৲ পর্য্যন্ত ঘুষ দিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই সংবাদ শ্রবণে আমি গিয়া দারোগাকে আরও ১০০৲ কবুল করাতে দারোগা অদ্য তাহাকে ৪১১ ধারায় চালান দিয়াছে। যেরূপ হয় পরে হুজুরে জানাইব।"

ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বিপত্নীকের কাহিনী।

রাধাগোবিন্দজীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া মোহিত মনের আবেগে অনেক দূর পর্য্যন্ত হন হন করিয়া চলিয়া গেল। পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। গ্রামপথ জনশূন্য। অধিকাংশ গৃহস্থই শয়ন করিয়াছে—কোন দুই একটা বৈঠকখানার জানালার ফাঁক দিয়া অল্প আলোক নির্গত হইতেছে।

দশমিনিট কাল এইরূপ যদৃচ্ছা চলিবার পর মোহিতের মন কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইল। সে তখন চিন্তা করিবার অবসর পাইল। ভাবিল—এই রাত্রে কোথায় যাই ? কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে যদি আশ্রয় প্রার্থনা করি—হয়ত আমাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিবে। "সাধু সন্ন্যাসী" শ্রেণীর যেরূপ ভাবগতিক দেখিতেছি, তাহাতে গৃহস্থের ওরূপ মনে করা কিছুই বিচিত্র নহে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মোহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক একটা কুকুর তাহাকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিতেছে। কিয়দ্দূরে গিয়া মোহিত দেখিল অনেকটা স্থান খোলা, এখানে ওখানে কয়েকটা চালা বাঁধা রহিয়াছে, অদূরে বৃহৎ বটবৃক্ষ। মোহিত বুঝিল, দিবসে যেখানে হাট বসিয়াছিল সেইখানেই আবার আসিয়া পড়িয়াছে।

মোহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল, হাটের দুই দিকে অনেকগুলি স্থায়ী দোকান। দোকানীরা ঝাঁপ বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছে। চালাগুলির নিকট গিয়া দেখিল, দুই তিন খানায় মৎস্যের দুর্গন্ধ—হাটের সময় জেলেরা এইগুলিতে মাছ বেচিয়া থাকে। দুই তিন খানা গন্ধহীন পাওয়া গেল বটে কিন্তু অত্যন্ত অপরিষ্কার। মেঝেটাও পার্শ্বস্থ ভূমির সমতল—এখানে শয়ন করিলে রাত্রে সর্পাদির আশঙ্কা। সুতরাং মোহিত সে স্থান ত্যাগ করিয়া, বড় রাস্তা ধরিয়া চলিল।

অধিকদূর যাইবার পূর্ব্বেই দেখিল, পথপার্শ্বে উচ্চ বারান্দাযুক্ত একখানা বাঙ্গলা ঘর। ভাবিল, এই বারান্দায় নিরাপদে শুইয়া থাকা যাইতে পারে। রাস্তা হইতে

নামিয়া, বাড়ীটির সম্মুখে আসিয়া মোহিত দাঁড়াইল। ভাবিল, যাহার বাড়ী, তাহার অনুমতি লইয়া বারান্দায় শয়ন করাই ভাল। তাই সে অনতি-উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"এখানে কে আছে?"

কোনও উত্তর নাই।

মোহিত গলা আর একটু চড়াইয়া ডাকিল—"এখানে কেউ আছ কি?"

কোনও উত্তর নাই। মোহিত ভাবিল, বাড়ীটা খালি না কি? সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠিল। অল্প যাহা আলোক ছিল, তাহাতে দেখিল, সম্মুখের দরজাটি তালাবন্ধ। তখন সে ধীরে ধীরে বারান্দার প্রান্তে গিয়া দেখিল, পার্শ্ব দিয়াও বারান্দা চলিয়া গিয়াছে—বাড়ীটির চারিদিকেই বারান্দা। বারান্দা দিয়া দিয়া ক্রমে বাড়ীর পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একটি ঈষন্মুক্ত জানালা পথে আলোক নির্গত হইতেছে। জানালার কাছে গিয়া দেখিল, ভিতরে কক্ষে মেঝের উপর আসন পাতিয়া, অনুমান ত্রিংশ বৎসর বয়স্ক একজন যুবক, মুদ্রিত চক্ষে করযোড়ে বসিয়া আছে। বুঝিল, লোকটি উপাসনায় ব্যাপৃত। এখন ত উহাঁকে ডাকা যায় না।—মোহিত চোরের মত কিয়ৎক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে, সেখান হইতে সরিয়া সেই কক্ষের দ্বারের কাছে আসিল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। শ্রান্ত হইয়াছিল, ভাবিল ঝুলিটা রাখিয়া একটু বসি। বসিবার সময় ঝুলিটা মাটীতে পড়িয়া শব্দ হইল। তখন ভিতর হইতে শব্দ হইল—"কেও?"

মোহিত আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আমি সন্ন্যাসী।"

বলিতে বলিতে দ্বার খুলিয়া বাবুটি বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন—"আপনি সন্ন্যাসী? আসুন, ভিতরে আসুন।"

মোহিত বলিল—"ভিতরে যাবার আবশ্যক নেই। আমি আপনাকে বিরক্ত করলাম, তার জন্যে আমায় মাফ করবেন। আপনার বারান্দায় আমি রাত্রিটা শুয়ে থাকব, তাই আপনার অনুমতি চাইতে এসেছি।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"শোবেন? তা বারান্দায় কেন? এই অগ্রহায়ণের হিমে আপনার কষ্ট হবে। আমার এই ঘরেই শোবেন আসুন বাবাজী।"

মোহিত বলিল—"না, আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে ইচ্ছে করিনে। বারান্দাতেই আমি বেশ শুতে পারব এখন।"

"বিলক্ষণ, তা কি হয়? আমি শোব ঘরে আর আপনি বারান্দায় পড়ে থাক্‌বেন?—আসুন আসুন। আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না—মস্ত ঘর।"

মোহিত তখন বাবুটির পশ্চাৎ ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, কক্ষখানি সুপরিসর বটে। এক স্থানে একখানা তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা রহিয়াছে। বিছানার পাশে একখানা বেঞ্চির উপর একটা ষ্টীলট্রাঙ্ক,—তাহার পাশে একটা বিলাতী চুল্লী এবং এনামেলের কেটলি, পিরিচ, পেয়ালা প্রভৃতি চা পানের সরঞ্জাম। তক্তপোষের শিরোদেশে একখানি টেবিলের উপর একটা হরিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে —পার্শ্বে খান কতক মোটা মোটা পুস্তকসাজানো। কক্ষটির অপর প্রান্তে দেওয়ালের গায়ে গুটান গুটান চারি পাঁচ খানা মানচিত্র, দুই খানা বেঞ্চি এবং একটা অর্দ্ধভগ্ন কালো বোর্ড।

প্রবেশ করিয়া বাবুটি তক্তপোষে বসিয়া, পার্শ্বে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"আসুন—বসুন।" মোহিত বসিয়া, কক্ষতলস্থ আসনখানির প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল—"আপনি উপাসনায় ছিলেন, আমি ব্যাঘাত করলাম, বড় অন্যায় হল।"

বাবুটি বলিলেন—"হ্যাঃ—আমার আবার উপাসনা! গৃহীর কি মনস্থির হয়? বসে একটু ভগবানকে ডাকতে চেষ্টা করি এই পর্য্যন্ত। আপনি এসেছেন, এ আমার সৌভাগ্য। আচ্ছা বাবাজী, যদি অনুমতি করেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"জিজ্ঞাসা করুন।"

বাবুটি ভ্রূযুগল অঙ্গুলির দ্বারায় চাপিয়া বলিলেন—"মানুষের মৃত্যু হলে—আত্মা বলুন,—বা বলুন, তার কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে?"

মোহিত বলিল—"হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করতে হলে—"

লোকটি বাধা দিয়া বলিলেন—"ও সব আমি জানি—

পড়েছি। আমি আপনাকে তা জিজ্ঞাসা করি নি। আপনার নিজের মনের—শাস্ত্র টাস্ত্র ছেড়ে দিন—নিজের মনের স্বাধীন বিশ্বাস কি তাই আমাকে বলুন।"

মোহিত বলিল "আমার নিজের মনের বিশ্বাস, মানুষ মরে গেলেও তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে।"

বাবুটি একমিনিটকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—"অস্তিত্ব থাকে। আমারও এই বিশ্বাস। বাবাজী, আর একটি কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করব, আপনি দয়া করে সেটা আমার অহমিকা বলে বিবেচনা করবেন না। আমি আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্যে কিম্বা আপনাকে ঠকিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে এ কথা জিজ্ঞাসা করছি না। কোনও কারণে আমার মন বড় ব্যাকুল। ওটা অসংলগ্ন কথা হল—যাক্। আপনি যে বল্লেন, মৃত্যুর পরেও মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে এই আপনার স্বাধীন বিশ্বাস,—আচ্ছা, এ বিশ্বাসের ভিত্তি কি? কি থেকে অর্থাৎ কি বিবেচনা করে আপনি বিশ্বাস করছেন যে মৃত্যুর পরেও মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে?"

মোহিত বলিল—"আমার বিশ্বাস a priori ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—"

বাধা দিয়া বাবুটি বলিলেন—"আপনি ইংরাজি জানেন?"

"জানি।"

"পাশ্চাত্য দর্শন পড়েছেন?"

"কিছু কিছু।"

"ভালই হল। আমাদের চিন্তাপ্রণালী মিলবে। বলুন তার পর।"

মোহিত বলিতে লাগিল—"আমার বিশ্বাস—প্রথমতঃ ঈশ্বর স্রষ্টিকর্ত্তা এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর সৃষ্টির অভিপ্রায় মঙ্গলময়। মানুষকে যে তিনি সৃষ্টি করেছেন—তা খাম-খেয়ালিভাবে করেন নি—তাকে ক্রমে পূর্ণ পরিণতি দেবার অভিপ্রায়েই করেছেন। সোপানের পর সোপানে উঠিয়ে তিনি মানুষকে সেই পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছে দেবেন। ইস্কুলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস থাকে, আমার মনে হয় মানুষের এক একটা জন্ম সেই রকম এক একটা ক্লাস। একটা জন্মে মানুষ নিজের কতটুকুই বা উন্নতি করতে পারে? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যদি সবই শেষ হয়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা যে নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন ছেলেখেলার মত দাঁড়ায়। তাই আমি বিশ্বাস করি, মৃত্যুর পরেও মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে—তাকে আত্মাই বলুন আর যাই বলুন। সেই আত্মা আবার নূতন করে মানবদেহ ধারণ করে। গত জন্মে যেখানে শেষ করেছিল, এ জন্মে সেইখান থেকে আবার আরম্ভ করে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।"

বাবুটি বলিলেন—"আমিও এক সময় তা ভাবতাম। আচ্ছা আমার একটা কথার উত্তর দিন। গাছের কি আত্মা আছে? গাছ মরে যাবার পর কি তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে এবং সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আবার নূতন গাছ হয়ে জন্মায়?"

মোহিত বলিল—"আমার তা মনে হয় না।"

"তা হলে ত গাছ সৃষ্টি করা ভগবানের উদ্দেশ্যহীন ছেলেখেলা?"

"তা কেন? গাছ মরে যায়, কিন্তু তার ফলের বীজ থেকে তার যে শত শত বংশধর জন্মগ্রহণ করেছিল—তারা রইল ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে।"

বাবুটি বলিলেন—"সেই রকম আমি যদি বলি, ভগবান পূর্ণ পরিণতির জন্যেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মানুষভাবে পূর্ণ পরিণতি পাবে এ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। পূর্ণ পরিণতির জন্যে তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। বংশাবলী ক্রমে মানবজাতি সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্চে—তাঁর অভিপ্রায় সফল করবে।"

মোহিত একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"হ্যাঁ।—তর্কের এ দিকটা আমার মনে কখনও উদয় হয়নি। আমি ভেবে দেখব। মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এ বিশ্বাসের আপনার ভিত্তি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

বাবুটি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"অবশ্যই পারেন। দেখুন, আমি অল্প বয়সে খুব হিন্দু ছিলাম—সবাই যেমন থাকে। যখন প্রথম প্রথম কলেজে ঢুকি, মনে আছে আমাদের বাসার একটি ছাত্র বলেছিল, গঙ্গা অন্য সকল নদীরই মত, তার বিশেষ কোন পবিত্রতা নেই,—তখন

একমাস ধরে তাকে নানারূপ বিদ্রূপ করেছিলাম। তার পরে যখন বি, এ, ক্লাসে পড়ি—বিজ্ঞানের আলোচনা করতে করতে, অল্পে অল্পে মনে হতে লাগল, আমাদের এই সব কালী দুর্গা, এ সব মুনি ঋষিদের কবিকল্পনা নয় ত? ক্রমে যত আলোচনা করতে লাগলাম, ততই সংশয় বেড়ে যেতে লাগল। একদিন আমাদের বাসায় একটা ভোজ ছিল, ছেলেরা দুষ্টামি করে সাধারণ বরফি বলে আমায় সিদ্ধির বরফি খাইয়ে দিয়েছিল। অল্পক্ষণ পরেই নেশায় একেবারে মাথা চন্ চন্ করে উঠল। সে রাত্রে সিদ্ধির নেশায় আমি চোখ বুজে কত রকম চমৎকার চমৎকার ছবি যে দেখতে লাগলাম—সে আর কি বলব। পরদিন প্রকৃতিস্থ হয়ে মনে মনে ভাবলাম, হিন্দুপুরাণের এই যে তেত্রিশকোটি দেবতা, এ সব বিলকুল মুনিঋষিদের স্বপ্ন। এম্ এ ক্লাসে হার্বার্ট স্পেন্সার পড়ে পড়ে একবারে ঘোর অজ্ঞেয়বাদী হয়ে উঠলাম। পাশ করে হেডমাষ্টারি করতে লাগলাম—যতই পড়ি ততই ঘোরতর সংশয়বাদী হয়ে উঠি। এই রকমে বছর কতক কাটলে, আমার—"

ভিতরে কোন একটা কক্ষে ঘড়িতে রাত্রি ১২টা বাজিল। বাবুটি ঘড়ি শুনিয়া, অর্দ্ধ মিনিট কাল যেন ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুতরস্বরে আবার বলিতে লাগিলেন—

"আমার স্ত্রীর মৃত্যু হল। সে শোকে আমি একবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলুম। ছ মাস কেটে গেল তবুও মনস্থির হল না। এক জায়গায় কোথাও থাকতে পারিনে—খালি ছট্‌ফট্ করে বেড়াতে ইচ্ছে করে। ইন্সপেক্টর সাহেবকে বলে এই ডেপুটি ইন্সপেক্টারি চাকরি নিলাম। তিনটে জেলার যত ইস্কুল পাঠশালা—ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করে বেড়াই। এ বাঙ্গলাটা এখানকার মাইনার ইস্কুল—আজ সকালেই এসেছি। কাল সকালে আবার স্থানান্তরে যাব। কথাগুলো বড় অসংলগ্ন হয়ে পড়ছে—থাক্। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, আমার মনে হতে লাগল, মরে গেলেই মানুষের সব শেষ হয় এ হতেই পারে না। তা হলে ত আর আমাদের দেখা হবে না—কস্মিন কালেও নয়। এ একবারেই অসম্ভব। নিশ্চয় আবার দেখা হবে। তখন বিশ্বাস করতে লাগলাম, নিশ্চয় আমার স্ত্রী আত্মারূপিণী হয়ে কোথাও আছে—আমার আত্মা এই দেহ যখন পরিত্যাগ করবে, তখন আবার আমাদের মিলন হবে। পরলোকে বিশ্বাস ফিরে এল, সুতরাং সংশয়বাদ ঘুচে গেল। ঈশ্বরে বিশ্বাসও ফিরে পেলাম। তাই অবসর পেলেই আমি ভগবানকে ডাকি। বলি, হে প্রভু, সে আমার কোথায় আছে, তাকে ভাল রেখ, সুখে রেখ। আবার যেন তার দেখা পাই।"

বলিয়া বাবুটি নীরব হইলেন। মোহিত বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া এই শোককাহিনী শুনিতেছিল। বাবুটি যখন ওরূপ ঐকান্তিক প্রার্থনায় নিমগ্ন ছিলেন, সে সময় আসিয়া ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে বলিয়া তাহার অনুশোচনা হইল।

বাবুটি তক্তপোষ হইতে নামিয়া, কলসী হইতে এক গেলাস জল গড়াইয়া পান করিলেন। আর এক গেলাস জল লইয়া, বাহিরে গিয়া মুখ চক্ষু ধৌত করিয়া আসিলেন। রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"বাবাজী আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনার আহার হয়েছে কি না তা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে ভুলে রয়েছি।"

মোহিত হাসিয়া বলিল "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার এখানে পৌঁছাবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই আমার আহার হয়ে গেছে।"

"আপনাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে। আপনি এই তক্ত-পোষে শয়ন করুন।"

"আপনি কোথা শোবেন?"

"বিছানার তলায় যে শতরঞ্জখানা আছে, সেইটি টেনে আমি মেঝের উপর শুচ্ছি।"

মোহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"না না, সে কি হতে পারে- আমি মেঝেতে শুচ্ছি। আমার কাছে কম্বল রয়েছে।"

বাবুটি বলিলেন—"না, মেঝেতে আপনার কষ্ট হবে। আপনি তক্তপোষেই শুন।"

মোহিত বলিল—"কিছু কষ্ট হবে না। ঐ যে দুখানা বেঞ্চি রয়েছে, ঐ জুড়ে না হয় আমি শুচ্ছি।"

বাবুটি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আপনি বেঞ্চিতে শুলেও আমায় মেঝেতে শুতে হবে। আমি ও তক্তপোষে শুই না। আপনি না এলেও, তক্তপোষ থেকে বিছানা নামিয়ে আমি মেঝেতে শুতাম।"

মোহিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তক্তপোষে শোন না কেন?"

বাবুটি মৃদুস্বরে বলিলেন—"আমার স্ত্রীর অণু পরমাণু এই পৃথিবীর সঙ্গে মিশে রয়েছে যে!"

মোহিত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার বিছানাটি নামাইয়া দিল। সেই তক্তপোষে শুইয়া, অধিকরাত্রে স্বপ্ন দেখিল, যেন চিনি আসিয়া তাহার বাহু ধরিয়া বলিতেছে—"চলুন।"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, ডেপুটি ইনস্পেক্টার বাবুর অনুরোধক্রমে তাঁহার সহিত গোরুর গাড়ীতে মোহিত খুলনা যাত্রা করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গীতাপাঠ

এখন আমরা এটা বেস্ বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রথম উদ্যমে মনুষ্যের আত্মশক্তি ঐশীশক্তির গর্ভে লুকাইয়া থাকিয়া অলক্ষিতভাবে তাহার অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণ (অর্থাৎ সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ) জাগাইয়া তোলে, এবং দ্বিতীয় উদ্যমে সত্তার প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশে গাত্রোত্থান করিয়া জাগ্রৎভাবে রজস্তমোগুণের বাধাপনয়ন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; আর তাহাতে যে পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়, সেই পরিমাণে তাহার সম্মুখে সত্ত্বগুণের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়, অথবা, যাহা একই কথা—দেবপ্রসাদের আগমন-দ্বার উন্মুক্ত হয়। দ্বিতীয় উদ্যমে আত্মশক্তি তিন তিন ধাপে পদনিক্ষেপ করিয়া সাধন-সোপানে অগ্রসর হয়। প্রথম ধাপ হ'চ্চে সংকল্প-বন্ধন, দ্বিতীয় ধাপ মনোযোগ, তৃতীয় ধাপ উদ্যম বা অধ্যবসায়। উদ্যম কি? না কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নের যোগ বা প্রাণের যোগ। এইজন্য উদ্যম এবং অধ্যবসায়কে (অর্থাৎ কোমর বাঁধিয়া লাগাকে) বলা যাইতে পারে প্রাণযোগ বা কর্ম্মযোগ। মনোযোগ কি? না জ্ঞেয় বিষয়ে জ্ঞানের যোগ। এই জন্য মনোযোগকে বলা যাইতে পারে জ্ঞানযোগ। সংকল্প-বন্ধন কি? না লক্ষ্য বিষয়েতে প্রীতি ভক্তি এবং নিষ্ঠার যোগ। যদি একজন টোলের ভট্টাচার্য্য এবং মারোআরি বণিক্ উভয়েই একহাজার টাকার পুঁজির উপরে ভর করিয়া একই সময়ে বস্ত্রের দোকান খোলেন, তবে খুব সম্ভব যে, বছর-খানেকের মধ্যেই মারোআরি বণিকের একহাজার টাকা দুহাজার হইয়া উঠিবে; পক্ষান্তরে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একহাজার টাকা অ্যাকের পিঠে তিনটি মাত্র শূন্যে পর্য্যবসিত হইবে। এরূপ এক যাত্রায় পৃথক্ ফলের কারণ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ভট্টাচার্য্যের মনের ষোলোআনা টান সরস্বতীর প্রতি—কেবল পেটের দায়ে তিনি লক্ষ্মীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন; পক্ষান্তরে, মারোআরি বণিকের মনের ষোলো-আনা টান লক্ষ্মীর প্রতি; আর, সেই জন্য তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে লক্ষ্মীর সেবায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দোঁহার মধ্যে কে সাঁচা সোনা কে ঝুঁটা সোনা, দেবী কি আর তাহা বোঝেন না? খুবই যে তিনি তাহা বোঝেন তাহা ফলেন পরিচীয়তে। লক্ষ্যসাধনে যাঁহার সংকল্পবন্ধন সত্যসত্যই হয়, তাঁহার সেই সংকল্পের বন্ধন-সূত্র হ'চ্চে লক্ষ্য বিষয়ের প্রতি মনের টান বা প্রীতি-ভক্তি। এমন কি—যদি ভোজন-কার্য্যও অভক্তির সহিত অনুষ্ঠান করা যায়, তবে উদরে যে দেবতা-এক আছেন তিনি নিবেদিত অন্ন কণ্ঠনলীর দ্বার দিয়া দূরে বিসর্জ্জন করেন। লক্ষ্য-সাধনের গোড়ার কথা যখন সংকল্প-বন্ধন; সংকল্প-বন্ধনের গোড়ার কথা যখন লক্ষ্য বিষয়েতে প্রীতি-ভক্তি বা অনুরাগ; আর, অনুরাগের গোড়ার কথা যখন লক্ষ্য-বিষয়েতে আনন্দের আস্বাদ-প্রাপ্তি; তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের প্রসাদ-লব্ধ গোড়ার সাত্ত্বিক আনন্দই মনুষ্যের মঙ্গল-কার্য্যের মূল প্রবর্ত্তক। আত্মশক্তির সাধনীয় লক্ষ্য বা সংকল্প—বিষয়টা হ'চ্চে সংক্ষেপে—অন্তঃকরণের গোড়ার সেই যে সাত্ত্বিক আনন্দ যাহা আত্মসত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গের সঙ্গী সেই গোড়ার আনন্দকে রজস্তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইতে না দেওয়া। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, রজস্তমোগুণের বাধা কোথা হইতে আইসে? ইহার উত্তর এই যে, সবই যেখান হইতে আসে, রজস্তমোগুণের বাধাও সেইখান হইতে আসে; ঐশীশক্তি হইতে আসে। বেদা-ন্তের মতে ঐশীশক্তি দুই প্রকার—আবরণ-শক্তি এবং

বিক্ষেপ-শক্তি। আবরণ-শক্তি সত্যকে ঢাকিয়া রাখে, এবং বিক্ষেপ-শক্তি প্রকৃত সত্যের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার কৃত্রিম সত্যের অবতারণা করে। বেদান্তের আবরণ-শক্তি এবং সাংখ্যের তমোগুণ, তথৈব, বেদান্তের বিক্ষেপ-শক্তি এবং সাংখ্যের রজোগুণ, নামেই কেবল বিভিন্ন—ফলে একই। আবরণ-শক্তি এবং বিক্ষেপ-শক্তি কিরূপে একযোগে কার্য্য করে, তাহার একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—প্রণিধান কর।

এক্ষণকার কালের এই যে একটি সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য—যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ সত্যটি পূর্ব্বতন কালে ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় দুই এক জন প্রতিভাশালী মহাত্মা ব্যতীত অপরাপর জ্যোতির্বিৎগণের নিকটে অপ্রকাশ ছিল। সত্যের এইরূপ অপ্রকাশের নাম আবরণ। আবার, ঐ সকল সাধারণ-শ্রেণীর জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা "পৃথিবী ঘুরিতেছে" এটা যেমন জানিতেন না, তেমনি, জানিতেন তাঁহারা এই যে, সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। "পৃথিবী ঘুরিতেছে" এই সত্যটি ঢাকিয়া রাখা আবরণ-শক্তির কার্য্য; আর, প্রকৃত সত্যের পরিবর্ত্তে "সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে" এই অসত্যটিকে সত্যরূপে দাঁড় করানো বিক্ষেপ-শক্তির কার্য্য। আর একটি দৃষ্টান্ত এই:—

নিদ্রাকালে বাহিরের কোনো কিছুই আমরা দেখিতে পাই না, শুনিতে পাই না। বাহিরের বাড়ি ঘর ঘট পট প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই আমাদের জ্ঞানে অপ্রকাশ থাকে। যখন কিন্তু নিদ্রার তিমিরাবরণের আশপাশের ফাঁকের মধ্য দিয়া একটু আধটু চেতনার স্ফুলিঙ্গ সহসা বিনির্গত হয়, তখন "আমি বাহিরের কোনো বস্তুই দেখিতেছি না—শুনিতেছি না," এই সত্যকথাটিকে সে কিছুতেই মনে স্থান দিতে চাহে না; তাহার পরিবর্ত্তে সে "এটা দেখিতেছি—ওটা দেখিতেছি—সেটা দেখিতেছি" এইরূপ করিয়া নানাপ্রকার কৃত্রিম বাড়ি ঘর, লোক জন জীবজন্তু দিয়া আপনার অজ্ঞানের খাঁক্তি পূরণ করিতে থাকে—দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে থাকে। নিদ্রাকালে "আমি কিছুই দেখিতেছি না—শুনিতেছি না" এইরূপ যে অজ্ঞান ইহাই আবরণ-শক্তির প্রভাবের পরিচায়ক; আর, তৎকালে "আমি এটা দেখিতেছি—ওটা দেখিতেছি—সেটা দেখিতেছি" এইরূপ যে কৃত্রিম ধাঁচার জ্ঞান ইহাই বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবের পরিচায়ক। ফল কথা এই যে জীবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ বলিয়া একদিকে যেমন তাহার নিকটে প্রকৃত সত্য অন্ধকারে আবৃত থাকে, আর একদিকে সেই অল্পজ্ঞ জীব "এটা জানিতেছি—ওটা জানিতেছি—সেটা জানিতেছি" এইরূপ করিয়া নানা প্রকার ভুল জ্ঞান দিয়া আপনার অজ্ঞানের খাঁক্তি পূরণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার না-জানা ব্যাপারটি আবরণ-শক্তির প্রভাবের পরিচায়ক, শেষোক্ত প্রকার অসত্যকে সত্য করিয়া সাজানো ব্যাপারটি বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবের পরিচায়ক। আবরণ-শক্তি এবং বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা জ্ঞানের এই যে সীমাবন্ধন—সর্ব্বাঙ্গীন প্রকৃত সত্যকে ঢাকা দিয়া রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে খণ্ড খণ্ড এক-এক দিক্‌ঘঁাসা এক এক ভাবের কৃত্রিম সত্য দিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে জ্ঞানের ক্ষোভ নিবারণ - এইরূপ যে সীমাবন্ধন, ইহাই জীবসৃষ্টির গোড়ার কথা। কেননা, জীব যদি অল্পজ্ঞ না হয়, তবে জীব জীবই হয় না।

পূর্ব্বে আমি বারম্বার বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে, সমষ্টি-সত্তার বাহিরে দ্বিতীয় কোনো সত্তা হইতেই পারে না, সুতরাং পরমাত্মার সত্তা মূলেই রজস্তমোগুণ-দ্বারা বাধাক্রান্ত নহে। তিনি স্বপ্রকাশ এবং পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ। তাঁহার প্রকাশেরও প্রতিঘাত নাই—আনন্দেরও প্রতিঘাত নাই। সুতরাং আপনার প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা অপসারণ করিবার জন্য শক্তি খাটাইবার কোনো প্রয়োজনই তাঁহার নাই। তাঁহার অপরাজিত মহতী শক্তি এই যে প্রভূত জগৎকার্য্যে নিরবচ্ছেদে খাটিতেছে খাটিতেছে তবে তাহা কিসের জন্য? ইহার একমাত্র উত্তর যাহা সম্ভবে তাহা এই যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মার আনন্দের ভাগী করিবার জন্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবাত্মা তো সেদিনকার জীব; তাহার জন্য অনাদি ঐশীশক্তি অবিশ্রাম জগৎকার্য্যে ব্যাপৃত হইবে—ইহা কি সম্ভবে? ইহার উত্তর এই যে, জীবাত্মা পরমাত্মার পর নহে; জীবাত্মা পরমাত্মার আপনারই জীবাত্মা। একদিকে জীব যেমন ঈশ্বরেরই জীব, আর

একদিকে ঈশ্বর তেমনি জীবেরই ঈশ্বর। যদি জীব একেবারেই না থাকে তবে জগদীশ্বর কাহার ঈশ্বর? জগদ্‌গুরু কাহার গুরু? জগৎপিতা কাহার পিতা? আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রের অভিপ্রায় মতে, জীবেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ শুধু যে কেবল আজিকের সম্বন্ধ তাহা নহে; তাহা অনাদিকালের সম্বন্ধ। আর, সেই জন্য, বেদান্তাদি শাস্ত্রে জীবেশ্বরের বিভিন্ন ভাবের বিভিন্ন নাম-গুলি এপিঠ-ওপিঠভাবে একসঙ্গে জোড়া লাগানো আছে, তার সাক্ষী নর-নারায়ণ, বিশ্ব-বৈশ্বানর, তৈজস-হিরণ্যগর্ভ, প্রাজ্ঞ-ঈশ্বর ইত্যাদি। ফলকথা এই যে, আকাশেরও যেমন, কালেরও তেমনি, সত্তারও তেমনি, দুই পিঠ। এক পিঠে সবই ভিন্ন ভিন্ন, এবং আর এক পিঠে সবই অ্যাকে সমাহিত। আকাশের এ-পিঠে—এক জায়গায় জল এক জায়গায় স্থল, এক জায়-গায় বায়ুমণ্ডল, এক জায়গায় ঈথর নামক জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ; পক্ষান্তরে, আকাশের ওপিঠে কোনোপ্রকার ঢিবিঢাবা নাই; আকাশের ওপিঠ সুমার্জ্জিত পেশল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এবং আগাগোড়া লপেট্; তাহা একে-বারেই অখণ্ড; আকাশের ওপিঠে সমস্ত আকাশ অ্যাক আকাশ। কালসূত্রের তেমনি এপিঠে মোটা মোটা ছেদ-গ্রন্থি রহিয়াছে। তা'র সাক্ষী:—আমাদের দেশে প্রথমে ছিল স্বরাজ্য; তাহার পরে আসিল মুসলমান রাজ্য; তাহার পরে আসিল এক্ষণকার ঐংরাজ্য। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভাবগতি কত না বিভিন্ন। বেদের আমলে আমাদের দেশ ঋষিপ্রধান ছিল; মনুর আমলে ব্রাহ্মণপ্রধান ছিল; ব্যাসের আমলে ক্ষত্রিয়প্রধান ছিল; শ্রীমন্ত সদাগরদিগের প্রাদুর্ভাবকালে বৈশ্যপ্রধান ছিল; এবং সম্প্রতি শূদ্রপ্রধান বা দাসত্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে কালসূত্রের ওপিঠে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের মধ্যে মূলেই ব্যবধান নাই। কালের ওপিঠে সমস্ত কাল অ্যাক চির-বর্ত্তমানকাল। ভূত বিষয়ের স্মরণ এবং বর্ত্তমানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি একযোগে মিলিয়া কিরূপে একীভূত হইয়া যায়, তাহা বিগত প্রবন্ধাংশে দেখান হইয়াছে। কালের ওপিঠে তেমনি ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান একযোগে মিলিয়া চির-বর্ত্তমানে কেন্দ্রভূত। পাশ্চাত্য দেশের অগস্ত্য ঋষি (St Augustine) তাই কালের ওপিঠের নাম দিয়া-ছিলেন Eternal Now। তেমনি আবার দেশকালের এপিঠে আত্মসত্তা ভিন্ন ভিন্ন শরীরে, তথৈব, একই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং ভিন্ন ভিন্ন গুণবৈচিত্র্যে ভিন্ন ভিন্ন; পক্ষান্তরে দেশকালের ওপিঠে সমস্ত গুণবৈচিত্র্য গুণসাম্যে কেন্দ্রীভূত—সকল সত্তাই এক অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড সত্তা। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সমুদ্রের তরঙ্গিত উপরিস্তর এবং নিস্তরঙ্গ গভীর অন্তস্তর এই দুই পিঠ এক সঙ্গে ধরিয়া যেমন এক সমুদ্র, দেশকাল-সত্তার দুই পিঠ এক সঙ্গে ধরিয়া তেমনি এক সত্য। সত্যের দুই পিঠের মধ্যে প্রতিযোগিতাও যেমন, সামঞ্জস্যও তেমনি, দুইই সমান বলবৎ:—প্রতিযোগিতা ছায়াতপের ন্যায় প্রকাশের অপরিহার্য্য অঙ্গ, সামঞ্জস্য দৈহিক ধাতুসাম্য এবং মানসিক গুণসাম্যের ন্যায়, এক কথায়—স্বাস্থ্যের ন্যায়, আনন্দের অপরিহার্য্য অঙ্গ। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিভাগেই সাধারণতঃ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এপিঠ সমস্ত বৈচিত্র্য-সমভিব্যাহারে একবার ওপিঠে বিলীন হইতেছে—যেমন নিদ্রাবস্থায়; আবার, যথাসময়ে সমস্ত বৈচিত্র্য-সমভিব্যাহারে এপিঠে আবির্ভূত হইতেছে—যেমন জাগ-রিতাবস্থায়। দুই পিঠের মধ্যে এইরূপ শক্তির ক্রীড়া অনবরত চলিতেছে, আর তাহাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সজীব রহিয়াছে। এই যে এক মহাশক্তি নিখিল দিগ্‌দিগন্তর এবং যুগযুগান্তর জুড়িয়া অনবরত কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে:—দিন হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে দিনে; শুক্লপক্ষ হইতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে শুক্লপক্ষে; উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে, দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় অনবরত দোলায়মান হইতেছে—এ মহাশক্তির সমস্ত উদ্যমই ব্যর্থ হইয়া যায়, যদি জীব গণের আনন্দ-সম্পাদন উহার উদ্দেশ্য না হয়। উপনিষদে তাই আছে—"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" "এষহ্যেবানন্দয়াতি" ইহার অর্থ এই যে, কে বা শরীর চেষ্টা করিত কে বা জীবিত থাকিত—আকাশে যদি এই আনন্দ না থাকিত অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন; ইনিই জীবগণকে আনন্দায়মান করেন। জলস্থলআকাশ বিচিত্র জীবজন্তু

এবং ওষধিবনস্পতির মধ্যস্থলে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসানুভূতিজনিত আনন্দ লইয়া পৃথিবীবক্ষে মনুষ্য জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তো আর ভুল নাই! কে তাহাকে জাগাইয়া তুলিল - কেনই বা জাগাইয়া তুলিল? ইহার উত্তর উপনিষদে দেওয়া হইয়াছে এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে:- "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি" "আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" ইহার অর্থ এই যে, আনন্দ হইতে নিশ্চয়ই ভূতগণ জন্মিতেছে, আনন্দের গুণেই বাঁচিয়া থাকিতেছে, এবং আনন্দে গিয়াই সমাহিত হইতেছে। উপনিষদে আরো আছে এই যে, "রসো বৈ সঃ" ইহার অর্থ এই যে, তিনি রসই; "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" রস পাইয়াই জীব আনন্দিত হয়। অপরিচ্ছিন্ন সমষ্টি-সত্তা নীরস সত্তা নহে - তাহা ভরপুর আনন্দময় আত্মসত্তা, তাহা রসের অগাধ নিধি। চারিটি বিষয় এখানে পরে পরে দ্রষ্টব্য:—

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সমষ্টি-সত্তার সেই যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি যাহা সমস্ত জ্ঞানের মূলাধার, সেই চিরবর্ত্তমান সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে অখণ্ড সত্তার রসানুভূতি এবং তজ্জনিত পরিপূর্ণ আনন্দ প্রেমসূত্রে বাঁধা রহিয়াছে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে নিখিল জগতের সমষ্টিসত্তার সেই যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং তজ্জনিত পরিপূর্ণ আনন্দ, তাহাই প্রতি মনুষ্যের অন্তঃকরণের গোড়াঘ্যাঁসা আত্মসত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং তজ্জনিত আনন্দ।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, মনুষ্যের অন্তরতম সেই যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং আনন্দ, আর, তাহার ভিতরে প্রথম-উদ্যমের আত্মশক্তি যাহা চাপা দেওয়া রহিয়াছে— তিনই যিনি একাধারে, তিনিই মনুষ্যের অন্তরাত্মা বা অন্তর্যামী সাক্ষীপুরুষ।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য এই যে, মনুষ্যের অন্তরাত্মাই মনুষ্যের অন্তরস্থিত পরমাত্মা; আর, সেই অন্তরাত্মার কথা শুনিয়া কার্য্য করার নামই পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করা।

এই রকমের জ্যোতিস্মান্ প্রাণবান্ এবং সারবান্ কার্য্যের সাধন-পথে সাধক বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া প্রাণপণ-যত্নে অগ্রসর হইতে থাকিলে, কাচপোকার সংস্পর্শে আর্‌সুলা যেমন কাচপোকার স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সাধক তেমনি পরমাত্মার প্রসাদামৃতের সংস্পর্শগুণে জাগ্রত জ্ঞানময় প্রেমময় এবং তেজোময় আত্মা হইয়া ওঠেন; আর, তখন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যেরূপ হইতে বলিতেছেন—সাধক সেইরূপ নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হ'ন। নিস্ত্রৈগুণ্য ভাব যে কিরূপ ভাব—স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে আমরা তাহার কতকটা আভাস পাইতে পারি এইরূপ:—

পরমাত্মার অনিরুদ্ধ এবং অপরিচ্ছিন্ন সত্তা রজস্তমোগুণদ্বারা একটুও বাধা-যুক্ত নহে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ — অথচ আপনার কোনো প্রকার বাধা-বিঘ্ন অপনয়ন করিবার উদ্দেশে শক্তি খাটাইবার স্বল্পমাত্রও তাঁহার প্রয়োজন নাই। তিনি স্বরূপে অবিচলিত রহিয়াছেন; আর, তাঁহার প্রভাব-স্বরূপা মহতী শক্তির কণামাত্র বলে প্রতিমুহূর্ত্তে নিখিল জগতের প্রভূত কার্য্যকলাপ যথাবিহিতরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া যাইতেছে। আমরা আমাদের আপনাদের কার্য্য-প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই এইরূপ যে, আমরা যখন শুদ্ধ কেবল স্বার্থসাধনের উদ্দেশে কার্য্য করি, তখন আমাদের হাতের কায্য ভাল হয় না এই-জন্য—যেহেতু আমাদের মন ক্রিয়মান কার্য্যের ফলাফল-চিন্তার দোলায় ক্রমাগতই দোদুল্যমান হইতে থাকে, আর সেই গতিকে সংকল্পিত কার্য্যটি পথের মাঝখানে খেই হারাইয়া ভণ্ডুল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, সাধু মহাপুরুষেরা যখন জগতের মঙ্গলকে আপনার মঙ্গল এবং আপনার প্রকৃত মঙ্গলকে জগতের মঙ্গল জানিয়া আত্মপর-নির্ব্বিশেষে লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হন তখন তাঁহার কার্য্যের প্রণালীপদ্ধতি স্বতন্ত্র। পদ্মপত্র যেমন তরঙ্গদোলায় সহস্র দোদুল্যমান হইলেও জলে একটুও লিপ্ত হয় না, সাধু মহাপুরুষেরা তেমনি সহস্র কর্ম্মধন্ধায় ব্যাপৃত হইলেও কর্ম্মের ফলাফল চিন্তায় বিভ্রান্ত হ'ন না; কেননা, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমাত্মার প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস অটল; আর, সেইজন্য তাঁহারই পদতলে তাঁহারা আপনাদের করণীয় ক্রিয়মান এবং কৃত সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত। বলিলাম যে, "সাধু মহাপুরুষেরা যখন (লোকহিতকার্য্যে) ব্যাপৃত হ'ন"—কিন্তু লোকহিতকর কার্য্য বলে কাহাকে? কেহ যদি মনে করেন যে লোক-

হিতকর কার্য্য রাজার কার্য্য, তা বই, তাহা চাসার কার্য্য নহে, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া সেখান হইতে যদি নগর-গ্রামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তবে রাজার প্রাসাদ এবং চাসার কুটীরের মধ্যে বড়ছোটোর প্রভেদ যতকিছু আছে সমস্তই দর্শকের দৃষ্টি-ক্ষেত্র হইতে অন্তর্ধান করে;—তেমনি এখন আমি যে জায়গার কথা বলিতেছি, সে জায়গায় দাঁড়াইয়া দেখিলে রাজার বিস্তীর্ণ রাজ্য এবং চাসার চাসের ভূমিটুকুর মধ্যে বড়ছোটোর প্রভেদ যাহা আছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। রাজা যেমন আপনার রাজ্যটুকুর-সীমার মধ্যেই রাজা, তা বই, তাহার সীমার বাহিরে তিনি রাজা নহেন, চাসাও তেমনি আপনার ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রটুকুর সীমার মধ্যে একপ্রকার ছোটোখাটো রাজা—যদিচ তাহার সীমার বাহিরে সে চাসা বই আর কিছুই নহে। চাসা যদি আপনার মুষ্টিমেয় রাজ্যটুকুর রাজকার্য্য যথাবিহিতরূপে সুনির্ব্বাহ করে, আর, রাজা যদি আসমুদ্র পৃথিবীর রাজকার্য্য মূঢ়ের ন্যায় দিক্‌বিদিক্‌শূন্যভাবে নির্ব্বাহ করেন, তবে চাসাই আপনার ক্ষুদ্র রাজ্যটুকুর প্রকৃত রাজা—রাজা কেবল নামেই রাজা। রাজাই হো'ন্ আর চাসাই হো'ন্ যিনি যে অবস্থায় থাকুন্ না কেন, সেই অবস্থাই তাঁহার ঈশ্বর-দত্ত রাজ্য। তিনি যদি ঈশ্বরের মঙ্গলইচ্ছার উপরে বিশ্বস্তচিত্তে নির্ভর করিয়া সেই অবস্থার রাজা হ'ন—তিনি যদি কাহারো প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করিয়া কাহারো মনে আঘাত না দিয়া, বৈধ প্রণালীতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করেন, অন্তরের সহিত আত্মীয়স্বজন এবং পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করেন এবং সাধ্যমতে তাহাদের উপকারসাধন করেন, তবে তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট লোকহিতকর কার্য্য। ফল কথা এই যে, কার্য্যাড়ম্বর স্বতন্ত্র এবং কার্য্য স্বতন্ত্র। কেমন ব্যস্ততা-বিহীন প্রশান্তভাবে সূর্য্যচন্দ্র উদয়াস্তগিরির শিখর আরোহণ করেন; অরণ্যের বনস্পতি কেমন নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সন্ধ্যা না হইতে হইতেই পক্ষিগণকে আপনার সুনিভৃত শাখাপ্রশাখা এবং কোটরের মধ্যে আশ্রয় প্রদান করিয়া মাতার ন্যায় তাহাদিগকে কুশলে রক্ষা করেন, তাহার পরে সন্ধ্যা দেখা দিবামাত্র আকাশের দীপমালা কেমন ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিতে থাকে। তাহার পরে সর্ব্বসন্তাপহারিণী রাত্রি কেমন অলক্ষিতভাবে আগমন করিয়া বিনা কোনো কথাবার্ত্তায় লোকের অসাক্ষাতে আপনার নিত্যকৃত্য মঙ্গলকার্য্যের ব্রত উদ্‌যাপন করেন। প্রকৃতিমাতার সকল কার্য্যই সৌন্দর্য্যময়; তাঁহার কোনো কার্য্যই বেতালা বা বেসুরা নহে। তাঁহার ত্রিগুণাত্মক কার্য্যের ভিতরে নিস্ত্রৈগুণ্যভাব চাপা দেওয়া রহিয়াছে, আর, তাহাই সূক্ষ্মভাবে দশদিকে ফুটিয়া বাহির হইয়া ভাবুক কবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ যাহা বলিলাম, এইটিই হ'চ্চে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতরের কথা। যে সাধক পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে মঙ্গল-কার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান হ'ন, তাঁহার কার্য্যের মধ্য হইতেও ঐরূপ আড়ম্বরশূন্য প্রশান্ত নিস্ত্রৈগুণ্য ভাব সূক্ষ্মরূপে ফুটিয়া বাহির হয়—যাঁহার চক্ষু আছে তিনিই তাহা দেখিতে পান, দেখিতে পাইয়া তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হ'ন। সাধক প্রথম উদ্যমেই কিছু আর নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হ'ন না—তাঁহাকে পূর্ব্বের পূর্ব্বের সোপান মাড়াইয়া পরের পরের সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রতিযোগিতা প্রকাশের সঙ্গের সঙ্গী, এবং সামঞ্জস্য আনন্দের সঙ্গের সঙ্গী। কিন্তু আগে প্রকাশ—পরে আনন্দ। প্রতি-যোগিতা প্রকাশের প্রদীপ উস্কাইয়া দ্যায়, সামঞ্জস্য আনন্দের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে। প্রকাশের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য সাধককে প্রথমে আত্মশক্তি খাটাইয়া রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিতে হয়; পরমাত্মাকে সহায় করিয়া অর্জ্জুনের ন্যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মাতিতে হয়। খাঁটি সোনাকে ব্যবহারকার্য্যে খাটাইতে হইলে তাহার সঙ্গে যেমন কতক পরিমাণে তাঁবা মেশানো আবশ্যক হয়, তেমনি সত্ত্বগুণপ্রধান আত্মশক্তিকে রিপুসংগ্রামে কার্য্যক্ষম করিবার জন্য তাহার সঙ্গে কতক পরিমাণে রজোগুণের তীব্রতা এবং কঠোরতা মেশানো প্রথম প্রথম সাধকের পক্ষে আবশ্যক হয়; কাঁটা দিয়া কাঁটা খোঁচাইয়া বাহির করা আবশ্যক হয়। কেননা, মনুষ্যের আত্মশক্তি যদিচ সত্ত্বগুণপ্রধান, কিন্তু তথাপি তাহা ত্রিগুণাত্মক, তা বই, তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ নহে। বেদান্তশাস্ত্র এবং যোগশাস্ত্র উভয়েই এইরূপ অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, একমাত্র ঐশীশক্তিই কেবল

পরম পরিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ—অর্থাৎ মূলেই তাহা রজস্তমোগুণদ্বারা বাধাগ্রস্ত নহে। প্রথম সোপানে সাধক রিপুগণের উপরে জয়লাভ করিয়া দ্বিতীয় সোপানে যখন বিশেষমতে পরমাত্মার ভাবের ভাবুক হ'ন, আর, সেই সময়ে যখন পরমাত্মার প্রসাদামৃত অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং জ্বালাযন্ত্রণা ঘুচাইয়া যায়, তখনই তিনি নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হ'ন। কথাটা যাহা বলিলে শ্রোতৃবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন তাহা এই: একজন ওস্তাদ গায়কের যতক্ষণ না শ্রোতা যোটে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আপনিই আপনার শ্রোতা; কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর উপস্থিতি ব্যতিরেকে তাঁহার গান কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে চাহে না। বিজন উপদ্বীপবাসী রবিন্‌সন্ ক্রুসো যদি শেক্সপিয়রের ন্যায় হ্যাম্‌লেট্ ম্যাগ্‌বেথ প্রভৃতি মহানাট্যের রচনাকার্য্যে পারদর্শী হইতেন, তবে শ্রোতার অভাবে তিনি দুঃখে মারা যাইতেন তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। আবার শ্রোতৃমণ্ডলী যদি গানের ভাবগ্রাহী হ'ন, অর্থাৎ সমজ্‌দার হ'ন, তবে তো কথাই নাই; তাহা হইলে গায়কের হৃদয়ের কপাট উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়া তাঁহার মধুর কণ্ঠ হইতে অমৃতের ধারা উৎসারিত হইতে থাকে। কিন্তু সমজ্‌দার বলে কাহাকে? শেক্সপিয়রের সমজ্‌দার হইতে হইলে কতক পরিমাণে শেক্সপিয়র হওয়া চাই; কালিদাসের সমজদার হইতে হইলে কতক পরিমাণে কালিদাস হওয়া চাই। সমজদার হওয়া কাষ্ঠপাষাণের কর্ম্ম নহে। তবেই হইতেছে যে ওস্তাদ গায়ক অ্যাক্‌লাই যে কেবল গায়ক তাহা নহে; তাঁহার রসগ্রাহী শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহারই দ্বিতীয় তিনি। রাজা যেমন সমস্ত প্রজাবর্গ লইয়া রাজা; ওস্তাদ গায়ক তেমনি সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী লইয়া ওস্তাদ গায়ক। গায়কের কণ্ঠকুহর এবং কর্ণকুহর যেমন পরস্পরের সহিত যোগসূত্রে বাঁধা, গায়কের হৃদয় এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় তেমনিই চমৎকার যোগসূত্রে বাঁধা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শ্রোতাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও এরূপ নহেন যিনি সহস্র চেষ্টা করিলেও ওস্তাদ গায়কের মতো ইচ্ছামাত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুমধুর গীত কণ্ঠ হইতে নিঃসারণ করিতে পারেন। তবে যদি তাঁহাদের মধ্যে গান শিখিবার জন্য যাঁহার আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তিনি কিছুদিন ধরিয়া গলা সাধেন এবং তাহার পরে গায়কের সঙ্গে একযোগে সমস্বরে গান করেন, তাহা হইলে গায়কের গুণে তাঁহার কণ্ঠের গীত ক্রমে গায়কের মতো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া ওঠা অসম্ভব নহে। পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করিলে সাধকের আত্মশক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে কাঁটাখোঁচা অপনীত হইয়া গিয়া কেমন তিনি আড়ম্বরশূন্য সহজশোভনভাবে জ্ঞানের সহিত প্রেমের সহিত এবং নিষ্ঠার সহিত অন্তরাত্মার প্রদর্শিত পথে চলিয়া আনন্দনিকেতনের দ্বার সম্মুখে উন্মুক্ত দেখিতে পান, উপরি উক্ত উপমাটির আলোকে আমরা তাহা কতকটা বুঝিতে পারিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মহা একটা সংকটাপন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ করিতেছেন, তাহা যেমন-তেমন সংকটাপন্ন কার্য্য নহে তাহা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ; অথচ বলিতেছেন "নিস্ত্রৈগুণ্য হও" অর্থাৎ "অন্তরস্থিত সত্ত্বগুণকে রজস্তমোগুণদ্বারা বাধাক্রান্ত হইতে দিও না, কোনো কিছু দ্বারা বিচলিত হইও না অব্যাকুলিত এবং অনাসক্ত চিত্তে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হও।" ব্যাপারটি অত্যন্ত দুরূহ। সামান্য লোক কেহ নহেন অর্জ্জুন! ঐ দুরূহ ব্যাপারটির উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকেও সাত পাঁচ ভাবিতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, অর্জ্জুনের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না শেষে তখন তিনি সার কথাটি অর্জ্জুনকে শুনাইলেন; সে কথা এই যে, আমাকে তুমি কায়মনোবাক্যে আশ্রয় কর—আমাতে কর্ম্ম সমর্পন কর, তাহা হইলে তুমি সহজে সিদ্ধিলাভে কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু এ কথাটি তিনি সকলের শেষে অর্জ্জুনের নিকটে খুলিয়াছিলেন। আপাততঃ এখন তিনি অর্জ্জুনকে কঠোর কর্ম্মযোগের উপদেশ দিতেছেন। নিস্ত্রৈগুণ্য যে, কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতে গিয়া এতটা সময় যাহা ক্ষেপিত হইল—আশা করি তাহা নিষ্ফল হয় নাই। নিস্ত্রৈগুণ্য-ভাব সংক্ষেপে এইরূপ:—পরমাত্মার সত্তা রজস্তমোগুণদ্বারা বাধাক্রান্ত নহে; পরন্তু জীবাত্মার সত্তা রজস্তমোগুণে জড়িত। তবেই হইতেছে যে নিস্ত্রৈগুণ্য ভাব পরমাত্মারই স্বরূপ-ভাব, তা বই, তাহা জীবাত্মার স্বভাবসিদ্ধ ভাব নহে। কাজেই শুদ্ধ কেবল আত্ম-

প্রভাবের বলে জীবাত্মা নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হইতে পারেন না। তবে কি? না সাধক অকৃত্রিম প্রীতিভক্তির সহিত পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে যখন তাঁহাতে পরমাত্মার গুণ ধরে, তখন পরমাত্মা যেমন স্বরূপে অবিচলিত থাকিয়া নিখিল জগতের মঙ্গলের জন্য যথাযথমাত্রা শক্তি প্রেরণা করিতে ক্ষান্ত থাকেন না, ভক্ত সাধক তেমনি জল-নির্লিপ্ত জলজ পত্রের ন্যায় কর্ম্মের ফলাফলে নির্লিপ্ত থাকিয়া যথাবিহিত কর্ত্তব্য-সাধনে যত্নের ত্রুটি করেন না। স্পর্শমণির প্রভাবগুণে লৌহ যেমন স্বর্ণ হয়, পরমাত্মার প্রভাবগুণে তেমনি ত্রিগুণাত্মক সাধক নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হ'ন। ত্রিগুণের ব্যাখ্যা-কার্য্য হইয়া চুকিল; আগামী বারে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের যে স্থানটিতে থামিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাখ্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছিল, সেইখানটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্মুখস্থ পথে বিধিমতে অগ্রসর হওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চটির পাটি

(গল্প)

আমি পশ্চিমে চাকরি করি। বড়দিনের ছুটির আগে কয়েকদিনের ছুটি লইয়া আমি বাড়ী আসিতেছিলাম। ট্রেনে দেখিলাম বিষম ভিড়। দিল্লীর দরবার তখন সদ্য সমাপ্ত হইয়াছে, এবং কলিকাতায় রাজসমাগম, কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; শীতকালে কলিকাতায় আমোদ আহ্লাদ রঙ্গ তামাসারও আয়োজন থাকে প্রচুর—এবারে বিশেষ ভাবে গণ্ডা দেড়েক সার্কাস, দুদল সেক্স-পীয়র অভিনেতা, চার চারটে বায়োস্কোপ প্রভৃতি, দীপ্ত দীপের ধারে পতঙ্গের মতো, দর্শক আকর্ষণ করিতেছিল বিস্তর। অধিকন্তু এই সময়ে রেল কোম্পানী একবারের পারাণি কড়ি লইয়া ডবল খেয়া পার করে বলিয়া দরকার না থাকিলেও অনেকে এক পাক ঘুরিয়া আসার প্রলোভন সামলাইতে পারে না। সুতরাং ভিড়েরও অবধি থাকে না। ট্রেনে বগি গাড়ী দিয়া কুলাইতে না পারিয়া রেল কোম্পানীর সেকেলে বকেয়া সম্পত্তি সরু-সরু-কামরা-ভাগ-করা গাড়ী জুড়িয়াও লোকের স্থান করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি অনেক কষ্টে একখানি শিকঘেরা সরু কামরার মধ্যে উঠিয়া কোনো মতে একটু স্থান করিয়া লইয়াছিলাম। সে কামরায় একজন পাঞ্জাবী বড় বড় বিছানার মোট ও বাক্স তোরঙ্গ ঝুড়ি প্রভৃতিতে উপরের বাঙ্ক দুটি বোঝাই করিয়া বসিয়া ছিল—তাহার যেমন দেহ, তেমন দাড়ি এবং তেমনি কি পাগড়ীর আয়তন! নীচের বেঞ্চিতে পাঁচজন পেশোয়ারী তাহাদের বিপুলায়তন শরীর, ঢিলাঢালা পোষাক ও শীতবস্ত্রের মোট লইয়া বিরাজমান। অপর সাত জনের মধ্যে তিন জন বাঙালী চার জন হিন্দুস্থানী। এই তের জনের উপর আমি হইলাম চতুর্দ্দশ। সুতরাং আমি যখন এই কামরায় প্রবেশের দুশ্চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন পাঞ্জাবীর গর্জ্জন, পেশোয়ারীর আস্ফালন, হিন্দুস্থানীর বকবকানি ও বাঙালীর দাঁতখিঁচুনি যে কিরূপ ভীষণ প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছিল তাহা বলিয়া বুঝানো শক্ত।

আমি কাহাকেও কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া যখন গাড়ীতে চড়িতে আসিলাম তখন দুইজন পেশোয়ারী দুই দিক হইতে গাড়ীর কপাট টানিয়া ধরিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। আমি তৎক্ষণাৎ রণে ভঙ্গ দিবার ভাণ করিয়া সেখান হইতে একটু সরিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, লক্ষ্যটা যেন আশেপাশের কামরার প্রতিই। তখন আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া পেশোয়ারীরা সরিয়া বসিল আর তৎক্ষণাৎ আমিও দরজার হাতল ঘুরাইয়া একেবারে গাড়ীর ভিতরে উঠিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

আমার আকস্মিক আবির্ভাবে আরোহীরা একবার কোলাহল করিয়া উঠিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল। সুতরাং শীঘ্রই সন্ধি হইয়া গেল। আমি গাড়ীর দরজার কাছেই এক পেশোয়ারীর পাশে স্থান পাইলাম।

এতক্ষণ যে গাড়ীর দরজা ধরিয়া উভয় পক্ষে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ চলিতেছিল তাহা যেন মিথ্যা, স্বপ্ন মাত্র—বাস্তবিক পক্ষে আমরা পরম মিত্র, এমনি ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ জমিয়া উঠিল। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সকলেই কলিকাতায় যাইবে; কেবল হিন্দুস্থানীরা

নামিবে পাটনায় এবং পাঞ্জাবী নামিবে আসান-সোলে।

গাড়ী নির্বিবাদে মোগলসরাই ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। একটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ধরণের লোক চাদরের উপর একখানি লাল বনাত গায়ে দিয়া, একটি ভারি পুঁটুলি বগলে লইয়া, প্লাটফর্ম্মে ছুটাছুটি করিতেছিল। ব্রাহ্মণ যেখানে যায় সেখান হইতেই বিতাড়িত হইয়া ফিরিয়া আসে। সময় যতই যায় ব্রাহ্মণও ততই ব্যস্ত হইয়া কলের তাঁতের মাকুর মতন, দক্ষ খেলোয়াড়ের ব্যাটের মুখে লনটেনিসের বলের মতন কেবলই এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে, কোথাও বেচারা একটু স্থিতি পাইতেছে না। অবশেষে ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের কামরার সম্মুখে আসিয়া অতি মিনতির স্বরে বলিল—বাবা, একটু দরজাটা খুলে দাও বাবা।

আমি বলিলাম—ঠাকুর মশায়, দেখছেন আমরা চোদ্দ জন আছি ; আর দেখছেন ত চোদ্দ জন নয় চোদ্দ জোয়ান! আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।

ব্রাহ্মণ নেড়া মাথায় টিকি নাড়িয়া বলিল—সব শালার খোসামোদ করে এসেছি বাবা, কোনো বেটার যদি ব্রাহ্মণ বলে একটু ভক্তিশ্রদ্ধা হল। ঘোর কলি! ঘোর কলি! খুলে দাও বাবা!

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠাকুর মশায়, এ কামরার আরোহীদেরও যে ব্রাহ্মণের প্রতি খুব বেশি রকম ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে এরূপ সন্দেহ আপনি কেন করছেন? এই যে পেশোয়ারী ক'টি এরা গোব্রাহ্মণহিতায় চ মোটেই নয়।

—তোমরা ত বাবা বাঙালী হিঁদু, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপকারটি কর বাবা...

একজন পেশোয়ারী ব্রাহ্মণের বোচকায় ধাক্কা দিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলিল—ভাগো ভাগো, ইহাঁ পর জাগা কাঁহা!

ব্রাহ্মণ বোচকার ভারে টলিয়া পড়িয়া গেল। এবং ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল।

আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া নামিয়া একহাতে ব্রাহ্মণের বোচকা ও অপর হাতে ব্রাহ্মণকে ধরিয়া টানিয়া গাড়ীতে তুলিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পেশোয়ারীরা রুষ্ট হইয়া আমাকে ভৎসনা করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণ আমার মাথার টেড়িটিকে নাস্তানাবুদ করিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, আমি হাসিমুখে উভয় পক্ষেরই অত্যাচার গ্রহণ করিলাম।

আমার জায়গাটিতে আমি ব্রাহ্মণকে বসাইয়া নিজে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পেশোয়ারীরা কি জানি কেন আমার উপর ভারি খুসি হইয়া গিয়াছিল—তাহারা আমাকে তাহাদের কাপড়ের মোটের উপর বসিতে বলিল।

ইহার পর হইতে আমাদের কাহাকেও আর লোক তাড়াইবার কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। সে ভার লইয়াছিল সেই ঠাকুর মশায়। পশ্চিমে তীর্থ করিতে আসিয়া তাহার মেজাজটা এমনি রোখালো হইয়া গিয়াছিল যে হিন্দি ছাড়া সে আর কিছু বলিতে পারিতে-ছিল না; তাহার হিন্দি নাগরীপ্রচারিণী সভাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নির্ভীক নিরঙ্কুশভাবেই নির্গত হইতেছিল। কেহ গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলেই ঠাকুর চীৎকার করিতেছিল জায়গা নেই হায়, জায়গা নেই হায়! দেখতা নেই পনর আদমি হায়? আর কাঁহা বৈঠেগা? গা পর বৈঠেগা না মাথা পর বৈঠেগা?

আমি হাসিয়া বলিলাম ঠাকুর মশায়, আপনি ত এইমাত্র গাড়ীতে ওঠবার জন্যে আকুলি বিকুলি করছিলেন; এখন গাড়ীতে উঠে সে কথাটা ভুলে গেলে চলবে কেন যে সকল যাত্রীরই গরজ সমান।

ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া নাকে খুব বড় এক টিপ নস্য ভরিয়া বলিল—গরজ সমান হলে কি হয়, বসবে কোথা, জায়গা কৈ?

আমি হাসিয়া বলিলাম—আপনি যখন উঠেছিলেন তখনও ত জায়গা ছিল না।

—আরে তার চেয়ে ত এখন আরো কমে গেছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু সে বিচার আপনার আমার করা শোভা পায় না, কারণ আমরা ভরা গাড়ীতে উঠেছি। বিচারের ভার থাকা উচিত আগন্তুক আরোহীর ওপর। তাঁরা যদি এত লোক দেখেও ওঠেন তবে বুঝতে হবে অন্যত্রও এই রকম অবস্থা।

ঠাকুর টিকি নাড়িয়া বলিল—হাঁঃ! তুমি ত বললে

এই রকম অবস্থা। কিন্তু এর ওপর লোক-বৃদ্ধি হলে আমাদের অবস্থাটা কি রকম হবে?

আমি নীরব হইয়া হাসিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণ খুব ঘন ঘন নস্য লইতে লাগিল। শেষে বলিল—কাশীর নস্য অতি উত্তম! নেবে?

—আজ্ঞে না।—বলিয়া আমি ব্রাহ্মণের রকম দেখিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাড়ীসুদ্ধ সকলেই স্মিত-মুখে কৌতুক অনুভব করিতেছিল।

গাড়ী বক্সারে পৌঁছিলে একজন বাঙালী ভদ্রলোক একটা তোরঙ্গ ও একমোট বিছানা লইয়া আমাদের গাড়ী আক্রমণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ত টিকি নাড়িয়া একেবারে মারমুখো। আমি আগন্তুককে বলিলাম—আমরা এখানে পনরজন আছি। অন্য গাড়ীতে আপনি চেষ্টা দেখলে ভালো হত।

—সব গাড়ীতেই এই রকম মশায়। আমি বেশি দূর যাব না, আমি মোকামাতে নেমে যাব।

—আচ্ছা আসুন।—বলিয়া আমি দরজা খুলিয়া ধরিলাম।

ব্রাহ্মণ দরজা ধরিয়া বন্ধ করিবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি জোর করিয়া খুলিয়া রাখিয়া হাসিতে হাসিতে ব্রাহ্মণকে বলিলাম—ঠাকুরমশায়, মোগলসরাইয়ে নিজের অবস্থাটা স্মরণ করুন।

ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি ত বড় পাজি লোক হে! আমায় গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়েছ ত একেবারে মাথা কিনেছ আর কি? এ গাড়ী কি তোমার কেনা? কোম্পানীর গাড়ী! আমি পয়সা দিয়ে চড়েছি! তবে অত কথা কও কেন হা?

আমি হাসিয়া বলিলাম—এ ভদ্রলোকও কোম্পানীকে পয়সা দিয়ে এসেছেন, অমনি আসেন নি আপনার দয়া ভিক্ষে করতে।

ব্রাহ্মণ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—তুমি ত বড় বেল্লিক হে! যত লোক পয়সা দিয়েছে সব লোক এক গাড়ীতে আসবে নাকি?

আমি পূর্ব্ববৎ হাসিয়াই বলিলাম আজ্ঞে, সেটা আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। এক গাড়ীতে যে সকলের ঠাঁই হয় না সে বোধটা মোগলসরাইয়ে হলেই ঠিক হত।

ব্রাহ্মণ পরাস্ত হইয়া রাগিয়া গনগন করিতে লাগিল। আমার উপর ব্রাহ্মণের ক্রোধ দেখিয়া আর কেহই আমাকে কিছু বলিল না। কেবল একজন পেশোয়ারী হাসিয়া বলিল—বাবু, তুমি সবাইকেই যে নিমন্ত্রণ করে এই কামরাতেই ভরছ।

আমি হাসিয়া বলিলাম—কি করি বল মিঞা সাহেব, সকলের যেতে হবে ত? আর, পাটনায় এই কজন নেবে যাবে; এ ভদ্রলোকও মোকামায় নাবেবন; তখন খুব জায়গা হয়ে যাবে, তখন আমাদেরই রাজত্ব হবে।

ব্রাহ্মণ বলিল—হাঁঃ, তুমি সেই ধাতের লোক কিনা; বিশ্ব বাংলার সকল লোককে ডেকে এই গাড়ীতে তুলবে তখন।

চরম লোক-বোঝাই হওয়াতে আর কোনো ষ্টেসনে কেহ আমাদের কামরার প্রতি দৃকপাতও করিল না। এখন নামিবার পালা।

পাটনায় হিন্দুস্থানীরা নামিবার জন্য উঠিল। ব্রাহ্মণ হুঙ্কার করিয়া বলিল—এই, আভি নামতা কাহে, আভি কেত্তা লোক উঠেগা। বৈঠো বৈঠো।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠাকুর মশায়, আপনার অনুরোধে কি ওরা গন্তব্য স্থান ছেড়ে আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে পৌছে দেবার জন্যে স্থির হয়ে বসে থাকবে?

ব্রাহ্মণ বলিল—তুমি ত বড় ব্যস্তবাগীশ হে! লোককে তোলবার জন্যেও যেমন তাড়াতাড়ি নামাবার জন্যেও তেমনি!

আমি হাসিয়া বলিলাম—একটু ব্যস্তবাগীশ না হলে যে ঠাকুর মশায়কে এখনো মোগলসরাই ষ্টেসনের কাঁকরের ওপর গড়াগড়ি দিতে হত।

হিন্দুস্থানীরা তাহাদের পোঁটলা পাটলি, লেপ লোটা, লাঠি সোঁটা, নাগরা জুতা প্রভৃতি ঘাড়ে পিঠে হাতে ঝুলাইয়া লইয়া একে একে নামিতে লাগিল; কাহারো লোটা ভট্টাচার্য্যের নেড়া মাথায় ঠক ঠক করিয়া ঠুকিয়া গেল, কাহারো নাগরা জুতার নাল ব্রাহ্মণের দীর্ঘ নাসিকায় ঘসিয়া

গেল। ব্রাহ্মণ বসিয়া বসিয়া—উজবুক! ছাতুখোর কাঁহাকা! এই সামালকে নামো!—ইত্যাদি বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

মোকামায় শেষাগত বাঙালীটি তাঁহার বাক্স বিছানা লইয়া নামিয়া গেলেন। বাক্সর কোণ লাগিয়া ভট্টাচার্য্যের পুঁটলিটি বেঞ্চি হইতে নীচে গড়াইয়া পড়িল এবং বোচকা-বাঁধা কাপড়খানা একটু ছিঁড়িয়া গেল। আর যায় কোথায়! ব্রাহ্মণ সপ্তমে চড়িয়া গালাগালি আরম্ভ করিল। রাগের শেষ তালটা আসিয়া পড়িল আমার ঘাড়ে।—তোমার জন্যেই ত আমার এই কাপড় ছিঁড়ল। এর ভেতরে বাবা বিশ্বেশ্বরের ফুল বেলপাত আছে, এতে যে পা ঠেকল তাতে কি তোমার ভালো হবে? উচ্ছন্ন যাবে, উচ্ছন্ন যাবে।—বলিয়া ব্রাহ্মণ ঘন ঘন হাত ও টিকি আন্দোলন করিতে লাগিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠাকুরমশায়, কোনটা ফলবে গাড়ীতে ওঠার আশীর্ব্বাদটা না এই অভিসম্পাতটা?

একজন বাঙালী সহযাত্রী দূরের কোণ হইতে বলিল—কোনোটাই ফলবে না; দুটোকে কাটাকাটি হয়ে যাবে!

ব্রাহ্মণ আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিল ফলবে না? ফলবে না? সাক্ষাৎ বাবা বিশ্বেশ্বরের টাটকা ফুল বেলপাতের অপমান! উচ্ছন্ন যাবে! উচ্ছন্ন যাবে!

আমি গম্ভীরভাবে জোড়হাত করিয়া বলিলাম—ঠাকুরমশায়, আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন; আমি উচ্ছন্ন গেলে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণটা আপনার কেন ফস্কাবে; আপনি অনুগ্রহ করে আমার শ্রাদ্ধের দিন পায়ের ধূলো দিলে আমি পরলোকে গিয়ে কৃতার্থ হব।

গাড়ীর সকল বাঙালী আরোহীরা উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। তাহাদের হাসি দেখিয়া পাঞ্জাবী পেশোয়ারী সকলেই হাসিল। হাসির সংক্রামকতা ক্রমশ শিকের ফাঁকে ফাঁকে কামরা হইতে কামরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। তখন সকল কামরার আরোহীর নজর পড়িল সেই ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের দিকে।

ব্রাহ্মণ আমাকে রাগাইতে না পারিয়া এবং সকলের কৌতুকপাত্র হইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া নস্য লইতে মনঃ-সংযোগ করিল।

এখন হইতে যেই গাড়ী ষ্টেসনে থামে আর অমনি ব্রাহ্মণ মুখ বিকৃত করিয়া আমায় বলে ডাক ডাক, সবা-ইকে ডাক, অনেক জায়গা রয়েছে, ডাক।

অন্যান্য কামরাও প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছিল সুতরাং আমাদের কামরায় মধ্যে মধ্যে অল্প দূরের যাত্রী দু একজন ছাড়া আর বড় বেশি কেহ উঠিল না।

এইবার পাঞ্জাবীপ্রবরের নামিবার পালা। তাহার সেই বিপুলায়তন দেহ ও পাগড়ী লইয়া সে ক্রমে ক্রমে তাহার অতিকায় বাক্স পেটরা মোটমাটরি নামাইতে লাগিল। মোটা মোটা মোট বাক্সগুলি কি সহজে দরজা দিয়া গলে? অনেক টানাটানি অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া এক একটি পার হইতে লাগিল। আমি দরজার মুখের কাছে ছিলাম; সুতরাং আমিই ধরিয়া ধরিয়া মোটগুলি বাহির করিয়া দিতেছিলাম। ব্রাহ্মণও দরজার কাছেই ছিল। কিন্তু সে হাত পা গুটাইয়া বেঞ্চির উপর জগন্নাথের মতন বসিয়া অনবরত বকিয়া যাইতেছিল যত সব হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া এসে জুটেছে। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার জো নেই। আর এই এক ফফরদালাল জুটেছে, সকল তাতেই আছে। কার মোট নামল না নামল তোর অত মাথা ব্যথা কেনরে বাপু!—

পাঞ্জাবীর সমস্ত মোট নামাইবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। তাড়া হুড়া করিয়া সব মোট নামাইয়া পাঞ্জাবী যখন গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

এতক্ষণে ব্রাহ্মণ পা নামাইয়া সোজা হইয়া বসিল। পা নামাইয়াই বেঞ্চির তলে পা চালাইয়া কিছুক্ষণ সে ইতস্তত পদচালনা করিল। তারপর ঝুঁকিয়া সে কি খুঁজিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঠাকুর মশায় কি খুঁজছেন?

ব্রাহ্মণ এক পায়ে চটি পরিয়া অপর নগ্নপদ ঊর্দ্ধে উঠাইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল—আমার আর একপাটি চটি?

বেঞ্চির তল, মোটের নীচে, আশ পাশ সর্ব্বত্র খুঁজিলাম কোথাও চটির পাটি মিলিল না। বুঝিলাম পাঞ্জাবীর মাল টানাটানি করিবার সময় চটির পাটি পরিপাটি চম্পট দিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ঠাকুর মশায়, আপনার চটির দু পাটিই ছিল ত?

ব্রাহ্মণ ত তেলেবেগুনে জ্বলিয়া আমার উপরে খাপ্পা হইয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিল—না দুপাটি থাকবে কেন? আমি এক পায়ে চটি পরে বেড়াই? আমি কি একানড়ে ভুত? বেল্লিক আহাম্মক কোথাকার!

আমি হাসিয়া বলিলাম—না না, আমি সে কথা বলছিনে যে আপনি এক পায়ে চটি দিয়ে বেড়ান। তবে এমনও ত হতে পারে যে তীর্থে লোকে এক একটা বস্তু ত্যাগ করে আসে, আপনি এক পাটি চটি ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় পাণ্ডা গুণ্ডার পীড়াপীড়িতে ত্যাগ করে এসেছেন।

ব্রাহ্মণ টিকি উৎক্ষিপ্ত করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল—কী! খৃষ্টান, অধাম্মিক, বেল্লিক! তীর্থের অপমান!...আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, যদি আমি ত্রিসন্ধ্যা করি ...

আমি তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলাম—তবে তুমি গোল্লায় যাও! কিন্তু ঠাকুর মশায় গোল্লায় যাওয়াটা কেমন তা জানা নেই, গোল্লা খেতে কিন্তু ভারি মুখরোচক। আর, কলিকালে ব্রাহ্মণের শাপে কেউ মরে না, ব্রাহ্মণের লাঠিতে সাপ থেকে মানুষ পর্য্যন্ত মরে বটে!

ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে না পারিয়া গন গন করিতে করিতে পা হইতে চটির পাটি খুলিয়া লইয়া এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ক্রোধ তিরোহিত হইয়া দৃষ্টি হইতে বাৎসল্য ক্ষরিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দুই হাতে চটির পাটিটিকে মুখের সামনে উঁচু করিয়া ধরিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল আমার নতুন চটি! এই সবে কাশী আসবার আগে ঠনঠনে থেকে দেড় টাকায় কিনেছি! আমার নতুন চটি!—

ব্রাহ্মণের স্বরে বেদনা মাখানো।

তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার যেমন হাসি পাইতেছিল তেমনি দুঃখও হইতেছিল। আমি চারিদিকের হাসির হররার মধ্যে অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখভাব যথাসম্ভব গম্ভীর ও বিমর্ষ করিয়া বলিলাম—তাই ত ঠাকুর মশায়, আপনার নতুন চটির এক পাটি পড়ে গেল......

—পড়ে গেল! বলতে লজ্জা করে না, মিথ্যাবাদী পাষণ্ড! তুই-ই ত ইচ্ছে করে' বদমায়েসি করে' আমার চটির পাটি ফেলে দিয়েছিস। নইলে আমার পয়সা দিয়ে কেনা, হকের ধন, অমনি খামখা পড়ে গেলেই হল।... আমার একেবারে আনকোরা নতুন চটি!—

ব্রাহ্মণের স্বর তিরস্কারের তীব্রতা হইতে চটির স্নেহে করুণার্দ্র হইয়া আসিল এবং দৃষ্টি তাহার জ্বালা ভুলিয়া শীতল হইয়া গেল। সে দুই হাতে অবশিষ্ট পাটিটিকে তুলিয়া ধরিয়া একবার আস্ফালন করিয়া আমাকে বলে—তুই ইচ্ছে করে, বদমায়েসি করে ফেলে দিয়েছিস!—আবার চটির শোকে করুণার্দ্র হইয়া বারংবার বলিতে থাকে—আমার নতুন চটি! আমার নতুন চটি!

আমি অতি মিনতির স্বরে বলিলাম ঠাকুর মশায়, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, ত আমি দাম দিচ্ছি, আপনি কলকেতা গিয়ে আর একজোড়া নতুন চটি কিনে নেবেন। আপনার মতন ব্রাহ্মণকে জুতো দান করলে আমার অক্ষয় পুণ্য হবে।

ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া নাসারন্ধ্র ফুলাইয়া টিকি নাড়িয়া বলিল অ্যাঁ বেটা পাজি নচ্ছার হতভাগা বেল্লিক অকালকুষ্মাণ্ড! আমি তীর্থ করে ফিরে যাবার পথে তোর দান প্রতিগ্রহ করে পতিত হই আর কি? তেমনি তোর মতলব বটে! নইলে আর ইচ্ছে করে আমার নতুন চটি পাটটে ফেলে দিস। আমার নতুন চটি!

ব্রাহ্মণকে আর অধিক ঘাঁটানো নির্দ্দয়ের কার্য হইবে বলিয়া আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ব্রাহ্মণ কিন্তু কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছিল না। সে একবার এক পায়ে চটি পরিয়া বসে; একএকবার বা চটিপরা পা তুলিয়া দেখে; একএকবার বা খালি পা দেখে; কখনো বা পরম আগ্রহে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চটির পাটি চোখের সামনে তুলিয়া করুণ নেত্রে দেখে; দেখিয়া দেখিয়া আবার নামাইয়া রাখে। থাকিয়া থাকিয়া একএকবার আমার দিকে সক্রোধ দৃষ্টিতে চাহে, কলিকাল বলিয়া রক্ষা, নতুবা ব্রাহ্মণের রোষানলে আমি ভস্ম হইয়া যাইতাম; একএকবার ব্রাহ্মণ অস্ফুট ক্রোধমিশ্র করুণ স্বরে বলে—আমার নতুন চটি। আমার আনকোরা চটি!

থানিকক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ চটির পাটিটি চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিল—যাক, এ একপাটি থেকেই বা কি হবে, এ পাটিও যাক !—

এই বলিয়াই গাড়ীর জানালা দিয়া চটির পাটিটি টান মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। কিন্তু ফেলিয়া দিয়াই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেই চটির পাটিটিকে দেখিতে লাগিল। যখন আর দেখা গেল না তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রাহ্মণ দুঃখ ও ক্রোধমিশ্র বিকৃত স্বরে আমাকে বলিল—কেমন ? মনস্কামনা পূর্ণ হল ত ?

আমি হাসিয়া বলিলাম—এ পাটি ফেলে দিয়ে আপনি আর তেমন বেশি কি করলেন। সঙ্গীহারা হয়েই ত বেচারা একেবারে নিষ্কর্ম্মা হয়ে পড়েছিল ; কারণ আপনি ত বলেইছেন এই একটু আগে যে আপনি একানড়ে নন যে একপায়ে জুতো পরবেন !

ব্রাহ্মণ মুখ খিঁচাইয়া বলিল—হাঁ হাঁ, ভারি আনন্দ হয়েছে। বাক্যবাগীশ ! কথার ধুকুড়ি ! বদমায়েস ! পাজি ! হতভাগা !......

ব্রাহ্মণের গালির 'ট্রেন' শেষ হইবার পূর্ব্বে ট্রেন আসিয়া রাণীগঞ্জে থামিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া প্লাটফর্ম্মে পাচারি করিতে করিতে দেখিলাম ভট্টাচার্য্যের প্রথম পাটি চটি পাঞ্জাবীর মোটের টানে সরিয়া পড়িয়া গাড়ীর পাদানের নীচের ধাপে আটকাইয়া আছে। আমি ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম—ঠাকুর মশায় এই যে আপনার চটি এখানে আটকে আছে !—

এবং তারপর সেই চটির পাটিটিকে উদ্ধার করিয়া ভট্টাচার্য্যের হাতে দিলাম।

ভট্টাচার্য্য হারাণো পুত্র ফিরিয়া পাওয়ার মতো ব্যগ্র আগ্রহে সেই চটির পাটিটিকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল—দেখেছ একবার নষ্টামিটে ! চটির পাটিটে লুকিয়ে রেখে এতক্ষণ আমার সঙ্গে তামাসা করা ! আমি তোর বাপের বয়সি, আমার সঙ্গে তামাসা ! ওরে হতভাগা পাজি ! তামাসাই যদি করছিলি তবে যখন আমি ওপাটিটে ফেলে দিলাম, তখন আমায় বারণ করলিনে কেন ? আমি ফেলে টেলে দিলাম এখন এসে বলছেন ঠাকুর মশায় আপনার চটি ! আমায় একেবারে নেহাল করে দিলেন আর কি !

ভট্টাচার্য্যের চোখ ছল ছল করিতেছিল। তাহার ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছিল লোকলজ্জা অন্তরায় না হইলে ব্রাহ্মণ হয়ত হারাধন চটির পাটিটিকে চুম্বন করিয়া অশ্রুজলে স্নান করাইত।

ব্রাহ্মণ চটির পাটিটিকে দেখিয়া দেখিয়া আপনার পাশে বেঞ্চির উপর রাখিল। তারপর পোটলাটি কোলের উপর তুলিয়া আস্তে আস্তে খুলিয়া চটির পাটিটিকে পোঁটলায় বাধিয়া রাখিল। হয়ত তাহার মনের মধ্যে একটু আশা জাগিতেছিল যে ফেলিয়া-দেওয়া পাটিটিও হয় ত এমনি করিয়া কোনো আশ্চর্য্য উপায়ে আমি ফিরাইয়া দিতে পারিব। কিংবা পণ্ডিত লোকে এক রকম ভুল দুবার করে না বলিয়াই হয় ত এ পাটিটিকে ব্রাহ্মণ আর ফেলিয়া দিতে পারিল না।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভগ্নপোত

(মোপাসা হইতে)

গতকল্য ৩১শে ডিসেম্বর গিয়াছে।

আমি আমার পুরাতন বন্ধু মিঃ গেরিনের সহিত প্রাতরাশ করিতেছি ; এমন সময় তাঁহার ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল। দেখিলাম টিকিটের উপর বিদেশী রাজ্যের শিল মোহর রহিয়াছে।

তিনি চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিলেন। দীর্ঘ আটপৃষ্ঠাব্যাপী মেয়েলি হাতে লেখা। আমি নীরবে লক্ষ্য করিতেছিলাম, তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে, মুখে একটা চাপা হর্ষের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তারপর পত্রখানা খামের ভিতর ভরিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

"তোমাকে আজ পর্য্যন্ত তাহা বলা হয় নাই- সে এক গল্প – ভাবপূর্ণ অদ্ভুত ঘটনা ! সেবারকার নূতন বৎসর কি অদ্ভুত অবস্থায়ই আমার কাছে উপস্থিত হইয়াছিল।

সে আজ কুড়ি বছর পূর্ব্বের কথা, তখন আমার বয়স ছিল ত্রিশ।

"আমি তখন একটা বীমা কোম্পানীর ইন্‌স্পেক্টার ছিলাম।

"আমার ইচ্ছা ছিল যে ১লা জানুয়ারীটা পেরীতেই কাটাইব, কারণ বছরের প্রথম দিন বন্ধু বান্ধব লইয়া সেখানে বেশ আমোদ করা যাইবে। কিন্তু ঠিক তাহার পূর্ব্বের দিন ৩১শে ডিসেম্বর আমাদের কোম্পানী হইতে এক টেলিগ্রাম পাইলাম আমাকে আজই সমুদ্রোপকূলে —সহরে যাইতে হইবে, কারণ সেখানে একটা জাহাজ মারা পড়িয়াছে। সে জাহাজটা ছিল আমাদের কোম্পানীতে বীমা করা। কি করি? আগামী কাল ১লা জানুয়ারী সত্বেও আমাকে তৎক্ষণাৎই রওনা হইতে হইল।

"সহরের একটি হোটেলে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। বিকালবেলা হোটেলের ম্যানেজারকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের তীরে আসিলাম। সম্মুখে বিস্তৃত বালুময় স্থান ও তৎপরে অনন্ত জলরাশি। অনেকদূরে একটি কালো জিনিস দৃষ্টিগোচর হইল। সঙ্গীটি তাহা দেখাইয়া আমাকে বলিল, 'ঐ আপনার জাহাজ দেখা যাইতেছে।'

"আমি বলিলাম, 'ও যে প্রায় তিন মাইল দূরে। ওখানে বোধ হয় দু'শ হাতের কম জল হবে না?'

"সঙ্গীটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'বলেন কি? ওখানে দু'হাত জলও নয়। এই এখন তিনটা বেজেছে আর এক ঘণ্টা পরেই দেখতে পাবেন যে জাহাজখানা শুক্‌না ডাঙায় পড়ে রয়েছে। আর একঘণ্টা পরেই ভাটা আরম্ভ হবে, তখন আপনি স্বচ্ছন্দে সেখানে হেঁটে যেতে পার্‌বেন। কিন্তু সাবধান ওখানে বেশিক্ষণ থাক্‌বেন না, কারণ, ৭টার সময়ই আবার জোয়ার আরম্ভ হবে।'

"সঙ্গীটি চলিয়া গেলেন; আমি ভাটার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ দেখি জল অনেকদূর সরিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত্তের মাঝেই জলরেখা আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল। আমি জাহাজটার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

"জাহাজটার একধার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং বালুতে অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। ভাঙা ধার দিয়া কোন প্রকারে উপরে উঠিলাম। জাহাজটার অবস্থা সম্বন্ধে আমাকে রিপোর্ট দিতে হইবে, কাজে আমার নোটবুক বাহির করিয়া জাহাজের একপাশে গি বসিলাম।

"চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিছু দেখা যায় না একদিকে অনন্ত জলরাশি আর অপরদিকে বিস্তৃত বালু স্থান, মাঝখানে আমি রহিয়াছি একা, একটি ভগ্নপোতে উপর দাঁড়াইয়া। সমুদ্রের বাতাস আসিয়া আমার গ লাগিতেছিল আর এই ঘোর নিস্তব্ধতায় মাঝে মা আমি শিহরিয়া উঠিতেছিলাম।

"সহসা আমার পাশেই যেন মানুষের কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল যেদিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল আমি সেইদিকে আসি দাঁড়াইলাম। নীচেই দেখিলাম, একজন বয়স্ক ইংরেজ তাঁহার সঙ্গে তাঁহার তিনটি মেয়ে। আমাকে দেখি ছোট মেয়ে দুটি ভীত হইয়া তাহাদের পিতাকে জড়াই ধরিল। তাঁহারাও আমার চেয়ে কম ভীত হন নাই।

"শরীরের প্রথম কম্পনটা শেষ হইলে ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে 'মহাশয়, এ জাহাজখানা কি আপনার?'

" 'হাঁ মহাশয়!'

" 'আমরা এটায় উঠে দেখতে পারি?'

" 'স্বচ্ছন্দে।'

"ভদ্রলোকটি আমাকে খুব ধন্যবাদ করিতে লাগিলে কিন্তু সে ইংরেজীমিশ্রিত ফরাসী ভাষা আমি বিশে কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ভদ্রলোকটি উঠিবার জ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে হাত ধরি তুলিলাম ও তারপর তাঁহার মেয়ে তিনটিকেও একে এ তুলিলাম। মেয়েগুলি কি সুন্দর! বিশেষত বড়টির কথাই নাই। বোধ হয় প্রায় আঠারো বছর বয়স সুন্দর চোখ দুটি, সুন্দর চুলগুলি, মুখখানি যেন ফুলে মত সুন্দর ও কোমল!

"তাহার পিতার চেয়ে ফরাসী ভাষা সে ভাল জানিত তাহার পিতার সঙ্গে আলাপ করিবার সময় সে দোভাষী কাজ চালাইতে লাগিল।

"আমি জাহাজখানার নানাস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহার অবস্থা ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম; বড় মেয়েটি আসিয়া তখন আমার সঙ্গে আলাপ যুড়িয়া দিল।

"তাহার কাছে শুনিতে পাইলাম যে তাহারা ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, সবেমাত্র গতকাল এই সহরে আসিয়াছে, কালই এখান হইতে চলিয়া যাইবে। চরের উপর ভাঙা জাহাজটা দেখিবার জন্য তাহাদের বড় কৌতূহল হয়, তাই তাহারা এটাকে দেখিতে আসিয়াছে।

"তাহার কথা বলিবার, গল্প করিবার, হাসিবার, বুঝিবার কি না বুঝিবার এবং সুনীল চক্ষুদুটি তুলিয়া উৎসুকভাবে চাহিবার ও 'হাঁ' অথবা 'না' প্রভৃতি বলিবার এম্‌নি একটি সুন্দর প্রাণমুগ্ধকর রকম ছিল যে শুধু তাহার স্বরটি শুনিবার জন্য ও তাহার শরীরের নড়াচড়া দেখিবার জন্য আমি অনন্তকাল সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতাম।

"হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল, 'একটা শোঁ শোঁ শব্দ শুনা যাচ্ছে না?'

"আমি কান পাতিলাম, হাঁ, তাইত বটে। কিসের শব্দ দেখিবার জন্য বাহিরে আসিলাম। হায়! হায়! আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সমুদ্র আবার ফিরিয়া আসিয়াছে—জোয়ার আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত চর জলে ভাসিয়া গেল। আমরা নিরুপায় হইয়া পড়িলাম।

"ভদ্রলোকটি তখনই যাইতে চাহিলেন কিন্তু যাওয়া তখন অসম্ভব। আমি তাঁহাকে বিরত করিলাম। যদিও জল খুব কম কিন্তু মাঝে মাঝে যেসব গর্ত্ত আছে সেগুলি তো আর জলের তলে এখন দেখা যাইবে না, কাজেই তাহাতে একবার পড়িলে প্রাণ লইয়া উঠা দায় হইবে।

"বিমর্ষ ভাবে আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম, কি করা যায়! এমন সময় বড় মেয়েটি একটু হাসিয়া বলিল, 'আর যাওয়া! আমাদের আর সংসারে যেতে হবে না, সংসার আমাদের পরিত্যাগ করেছে।'

"তাহার কথা শুনিয়া এত দুঃখের ভিতরও আমার হাসিবার ইচ্ছা হইল কিন্তু হাসিতে পারিলাম না। একটা ভয় আসিয়া আমাকে চাপিয়া ধরিল—জীবনের মায়া কেন না জানি তখন বাড়িয়া উঠিল—আমার চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু হায়! এ নির্জ্জনে কে তাহা শুনিবে?

"অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'ভাটার জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন আর কোনো উপায় নাই।'

"সমুদ্রের বাতাস! বড় শীত করিতে লাগিল। আমরা এক জায়গায় গিয়া বসিলাম; এখানে বেশি বাতাস লাগিতেছিল না।

"অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। আমরা জড়সড় হইয়া পড়িয়া রহিলাম। আমাদের চারিদিকে ছিল শুধু ঘোর অন্ধকার, সমুদ্রের জলরাশি ও তাহার কল্লোল। বড় মেয়েটির তন্দ্রালস মাথাটি হেলিয়া আমার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। সে কাঁপিতেছিল, শীতে তাহার দাঁতে দাঁতে লাগিতেছিল; কিন্তু আমার বোধ হইল যেন তাহার দেহের মৃদু উত্তাপ আমার শরীরে প্রবেশ করিতেছে, এবং আমার ও তাহার দেহের এই মৃদু উত্তাপের সম্মিলন-টুকু আমার কাছে একটি মধুর চুম্বনের মতন অনুভূত হইতেছে।

"দুজনার ভিতর টুঁ শব্দটি ছিল না; ঝড়ের সময় পশু যেমনভাবে ঝোপের ভিতর পড়িয়া থাকে সেইরূপ জড়সড় হইয়া আমরা পড়িয়া রহিলাম। এই অন্ধকার, এই বিপদাপন্ন অবস্থা, এসব সত্ত্বেও আমি সেখানে আছি বলিয়া নিজকে বেশ সুখী বোধ করিলাম। এই সুন্দর, কোমল, মনোহারিণী বালিকার কাছে সেই অন্ধকারের ঘণ্টা কয়টি বাস্তবিকই খুব সুখে কাটিয়াছিল।

"আমি নিজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথা হইতে আসিল এই আনন্দপূর্ণ তন্ময় ভাব? কেন এই সুখ ও হর্ষের উপলব্ধি?

"কেন? কে বলিবে? সে এখানে ছিল বলিয়া কি? সে কে? অজ্ঞাত এক ইংরেজ রমণী। আমি তাহাকে ভালবাসিতাম না, আমি তাহার কিছু জানিতাম না, কিন্তু আমি নিজকে শান্ত ও বিজিত মনে করিলাম। আমার শুধু ইচ্ছা হইতেছিল তাহাকে রক্ষা করিতে, তাহার কার্য্যে নিজকে নিয়োজিত করিতে, আর তাহার জন্য শত শত

অপরাধজনক কার্য্য সাধন করিতে। কিন্তু কেন হইতেছিল আমার সে ইচ্ছা ?

"এ কি সেই ভালবাসার মধুর স্পর্শ যাহা চিরকাল অবধি পরস্পরের হৃদয় যুক্ত করিয়া দিতেছে, যাহা পুরুষের সম্মুখে রমণীকে দেখিলেই তাহার ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র আরম্ভ করিয়া দেয়—এ কি সেই ? ..

"অন্ধকার গাঢ় হইতে লাগিল; শিরশির করিয়া বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল।

"হঠাৎ আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিতে পাইলাম। আমি আমার পার্শ্ববর্ত্তিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার বোধ হয় খুব শীত করছে ?'

" 'হাঁ বড় শীত করছে।'

"আমি আমার কোর্ত্তাটা তাহাকে দিতে চাহিলাম, সে অস্বীকার করিল; কিন্তু আমি তাহার বাধা সত্ত্বেও আমার কোর্ত্তাটা দিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া দিলাম। এই ক্ষুদ্র চেষ্টাটুকুর সময় আমার হস্ত তাহার তুষারধবল হস্তটি স্পর্শ করিল; এই স্পর্শে একটা হর্ষের ধারা শিরাগুলির ভিতর দিয়া আমার সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হইয়া গেল।

"বাতাস প্রখর হইতে লাগিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন, 'এ ভাল লক্ষণ নয়, সামনেই বিপদ'। কারণ যদি ঝড় উঠে তাহা হইলে প্রথম আঘাতেই জাহাজখানা চূর্ণ হইয়া যাইবে। সমুদ্রের ঢেউ বড় হইতে লাগিল, গর্জ্জনও বাড়িল, আমাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

"ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালাইয়া তাঁহার পকেটস্থ ঘড়ি দেখিতেছিলেন। এখনো বারোটা বাজে নাই। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার ঘড়ি দেখিলেন ও আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'মহাশয়, আপনার নূতন বৎসর সুখের হউক।'

"তখন রাত্রি ঠিক দুপুর। কয়েক মিনিট হয় নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। আমি হাত বাড়াইয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিলাম, অমনি তাঁহার তিন মেয়ে সমস্বরে গাহিয়া উঠিল, Rule Britannia.

"যখন তাহাদের গান শেষ হইল তখন আমার পার্শ্ববর্ত্তিনীকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিলাম যেন সময়টা কোনোমতে কাটানো যায়। সে স্বীকৃত হইল ও একটি শান্ত, গম্ভীর, বিষাদপূর্ণ সঙ্গীত গাহিল আমি শুধু তাহার স্বরের মাধুর্য্য ভাবিতে লাগিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম এই মুগ্ধকারিণীকে। এমন সময়ে যদি কোনো পোত আমাদের কাছ দিয়া চলিয়া যাইত তাহা হইলে তাহার লোকেরা কি ভাবিত? আমার বিলোড়িত প্রাণ স্বপ্ন-রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। মুগ্ধকারিণী! সে কি বাস্তবিকই মুগ্ধকারিণী নয় যে আমাকে এই ভগ্নপোতে আটকাইয়া রাখিয়াছে ও কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই হয় তো যে আমার সঙ্গে অতলসাগরে নিমজ্জিতা হইবে।

"সমুদ্রবক্ষে আমাদের খুব নিকটে হঠাৎ একটি আলোক দেখিতে পাইলাম। আমি চীৎকার করিয়া ডাকিলাম; তাহার প্রত্যুত্তরও আসিল। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাই তিনি আমাদের জন্য নৌকা লইয়া বাহির হইয়াছেন।

"আমরা রক্ষা পাইলাম! কিন্তু তাহাতে আমি বড় দুঃখিত হইলাম!

"পরদিনই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিল। অনেক আলিঙ্গনের পর প্রতিজ্ঞা করা হইল পরস্পরের কাছে চিঠি লিখিতে হইবে। আমার মনে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। আমি প্রায় তাহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব তুলিয়াছিলাম আর কি। বাস্তবিকই যদি এক সপ্তাহ আমরা একত্র থাকিতাম তবে ইহার যবনিকা নিশ্চয়ই বিবাহে গিয়া পড়িত। কিন্তু প্রজাপতি এ জীবনে আমাকে বিবাহের অধিকার দিলেন না।

"দুই বছর চলিয়া গেল কিন্তু তাহাদের কোনো খবর পাই নাই। অবশেষে 'নউ ইয়র্ক হইতে একখানা চিঠি পাই। সে তখন বিবাহিতা। সেই অবধি আমরা প্রত্যেক বছর ১লা জানুয়ারী পরস্পরের পত্র পাই। সে তাহার সাংসারিক খবর দেয়, ছেলেপেলের খবর লেখে কিন্তু কখনো তাহার স্বামীর কথা লেখে না! কেন? কেন যে, কে ইহার উত্তর দিবে!"

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি

১। কোন সময়ে পিতৃদেব সাহেবগঞ্জে গঙ্গাবক্ষে বজ্‌রায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কোন বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। বজ্‌রার মধ্যে গিয়া দেখি, টেবিলের উপর দুই চারি খানা বাঁধান ফরাসী গ্রন্থ, আর একখানি ফরাসি-ইংরাজি অভিধান রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থগুলি Victor Cousinর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Le vrai, le beau, le bien"—অর্থাৎ "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।" উহার ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার এতই ভাল লাগিয়াছিল যে ফরাসী মূল-গ্রন্থ পড়িবার জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছিলেন। তাই তিনি কয়েক কাপি বিলাত হইতে আনাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক কাপি প্রতিপৃষ্ঠার মধ্যে সাদা কাগজ গ্রথিত করিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছিলেন। আমি যখন গেলাম, তখন তিনি ইংরাজি অনুবাদের সহিত মিলাইয়া, অভিধানের সাহায্যে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে, যে অংশ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, আমাকে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, আমি অল্পস্বল্প ফরাসী জানি। তাঁহার বার্দ্ধক্যে এই অধ্যবসায় দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য হইলেও সে সময়ে আমি পাঠ করিবার অবসর পাই নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, ঐ কীটদষ্ট গ্রন্থ বোলপুরের লাইব্রেরী হইতে আনাইয়া পাঠ করি ও অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই।

২। একদিন আমাদের বাড়ীর পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া তালপাতায় ক, খ প্রভৃতি অক্ষরে দাগা বুলাইতেছিলাম বোধ হয় আমার বয়স তখন ৫ বৎসর—সেই সময় পিতৃদেব আমাদের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। গুরুমহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দাঁড়াইলাম না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া, আমাকে দাঁড়াইতে বলিলেন। আদব-কায়দার প্রতি এমনি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

৩। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। আমার প্রণীত পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতী নাটক প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যেকেরই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আমাকে পত্র লেখেন, সেই পত্রগুলি সযত্নে রক্ষা করি নাই বলিয়া এখন দুঃখ হয়।

৪। তিনি প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকিতেন। যখনই বাড়ী আসিতেন, তিনি আমাদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। তাঁহার তেতালার বসিবার ঘরে, দিন কতক তিনি আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদিগকে ধারাবাহিকরূপে মৌখিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের সঙ্গে তাঁহার দুই একজন বাহিরের শিষ্যও উপস্থিত থাকিতেন। আমার সেঝদাদা গণেশঠাকুরের কাজ করিতেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার সমস্ত কথা টুকিয়া লইতেন। তিনি এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেঝদাদা কাগজ পেনসিল লইয়া সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। কি ব্রাহ্মসমাজে, কি পারিবারিক উপাসনা-মণ্ডপে, যেখানেই পিতৃদেব বক্তৃতা করিতেন বা উপদেশ দিতেন, তিনি যতদূর সম্ভব তাহা অবিকল টুকিয়া লইতেন। পরে পরিষ্কার করিয়া লিখিতেন। এমন কি, পিতৃদেব ঘরে বসিয়া সহজ ভাবে বাক্যালাপ করিতেছেন, তাহাও তিনি টুকিতে ছাড়িতেন না। আমরা এখন পিতৃদেবের যে সকল ব্যাখ্যান দেখিতে পাই, উহার অধিকাংশ তাঁহারই পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। সেঝদাদার পূর্ব্বে মেঝদাদাও এইরূপ পিতৃদেবের বক্তৃতাসকল টুকিয়া লইতেন। পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইলে, তিনি কোন কোন অংশ সংশোধন করিয়া দিতেন।

৫। আমাদের স্বাস্থ্য ও দৈহিক উন্নতির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কুস্তি শিখাইবার জন্য হীরা সিং নামক একজন শিখ্ পালোয়ানকে তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই হীরা সিংহের নিকট প্রসিদ্ধ পালোয়ান অম্বুগুহও শিক্ষা করিতেন। আমাদের বাড়ীতে কুস্তির একটা আখ্‌ড়া ছিল। আমি তখন শিশু ছিলাম। আমি ইহাতে যোগ দিই নাই। ভাইদের মধ্যে আমার সেঝদাদা (৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ব্যায়াম চর্চ্চায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রীতিমত পালোয়ান হইয়া

উঠিয়াছিলেন। হীরা সিংহের নিকট তলোয়ার, গৎকা, লাঠি সব রকমই শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে আমার সেঝদাদা ও অম্বুগুহ সেই সময়ে এই বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

পিতৃদেব যখন বাড়ী আসিতেন, তিনি আমাদের সকলকে লইয়া আহারে বসিতেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়, অন্ন ব্যঞ্জনের পর, শেষে চাপাটি ও সন্দেশ আসিত। বোধ হয় পিতৃদেব মনে করিতেন, ভাতে যথেষ্ট দৈহিক পুষ্টি হয় না। আবার দিনকতক, কাশী হইতে একজন হালুইকর আনাইয়াছিলেন, সেই হালুইকর রাত্রে নানাবিধ উৎকৃষ্ট নিম্‌কি ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত।

৬। পিতৃদেব যখন দেরাদূনে ছিলেন, আমি কোন বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি ৺সীতানাথ ঘোষের পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "বেচারা বড় কষ্টে পড়েছে"। এই বলিয়া, সীতানাথকে ৭০০০৲ টাকা দিতে আমাকে অনুমতি করিলেন। শুনিলাম সীতানাথ বাবু অত টাকা পাইবেন বলিয়া আদৌ প্রত্যাশা করেন নাই। এইরূপ আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত আছে। পিতৃদেব যখন দান করিতেন, এইরূপেই মুক্তহস্তে দান করিতেন। এই প্রসঙ্গে ৺সীতানাথ বাবুর কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি তাড়িৎ চিকিৎসার জন্য একপ্রকার নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। হিন্দু তাড়িৎ-জ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ তিনি পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

৭। কলিকাতায় আমার বড়দিদিমার একখানা বাড়ী ছিল। দিদিমার এক পালিত কন্যামাত্র ছিল। পিতৃদেব ছাড়া তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী আর কেহই ছিল না। দিদিমার মৃত্যু হইলে সেই বাড়ীর স্বত্ব আমার পিতৃদেবে আসিয়া বর্ত্তিল। সেই বাড়ী দখল করিবার কথা উঠিল। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সেই বাড়ীর উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। বাড়ীটি বেশ বড়। মূল্য ২০।৩০ হাজারের কম হইবে না। কিন্তু পিতৃদেব ঐ বাড়ী দিদিমার পালিত কন্যাকেই দান করিলেন। এইরূপ তাঁহার দয়া ও উদারতা ছিল।

৮। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ৺বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী আমাদের বাড়ীর বেতনভুক্ গায়ক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার পর তিনি বিষ্ণুর গান শুনিতেন। মাসিক বেতন পাইলেও, গান শুনিবার পর, প্রত্যেক বারে ২৲ টাকা করিয়া বিষ্ণুকে পারিতোষিক দিতেন। তিনি ভাল ভাল গায়ককে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিতেন। তন্মধ্যে, শ্রীরমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, যদু ভট্ট, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার মতি বাবুর ভ্রাতা রাজচন্দ্র বাবু—ইঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল ওস্তাদের হিন্দী গান ভাঙ্গিয়া আমরা অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছি। সর্ব্বপ্রথমে মেঝদাদা বড়দাদা বিষ্ণুর গান ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। কিছুকাল পরে, বড়দাদা, সেঝদাদা ও আমি—আমরা নানা ওস্তাদের হিন্দী গান ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। যাহার যেদিন রচনা হইত, পিতৃদেব সেই রচিত গান সন্ধ্যার পর শুনিতেন। তাঁহার ভাল লাগিলে আমরা উৎসাহিত হইতাম। যখন আমি সঙ্গীতসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করি, সেখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চ্চা হইবে শুনিয়া তিনি ১০০০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিতে আমাকে অনুমতি করেন।

৯। প্রায়ই দুই একজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রকে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার তিনি বহন করিতেন। তন্মধ্যে একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র—এখন ডাক্তার—আমাদের সহিত কখন সাক্ষাৎ হইলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুই একজন বন্ধুর পুত্রকেও, কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্য উত্তম ঘর ও উত্তম আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন।

১০। তিনি অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি যেখানে বসিতেন তাঁহার সম্মুখস্থ টিপায়ে একটা জেব-ঘড়ি খোলা থাকিত। তিনি ঘড়ি দেখিয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান আহারাদি করিতেন। কখন তাহার ব্যতিক্রম হইত

না। কেবল যখন কাহারও সঙ্গে ঈশ্বর প্রসঙ্গে কথা বার্ত্তা হইত, তখন সময়ের জ্ঞান থাকিত না। তাঁহার জীবনের ঘটনায় ঈশ্বরের করুণার কত নিদর্শন পাইয়াছেন, এক এক দিন আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন; বর্ণনা করিতে করিতে তিনি যেন একেবারে মাতিয়া উঠিতেন—তাঁহার মুখে উৎসাহ ও আনন্দের একটা স্বর্গীয় প্রভা ফুটিয়া উঠিত। তখন আর কিছুই হুঁস থাকিত না। যখন হুঁস হইত, তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রস্থান করিতেন।

১১। তাঁহার 'রাশ ভারী' ছিল। তিনি যখন বাড়ী থাকিতেন, তখন যেন বাড়ী 'গম্‌গম' করিত। পাছে কোন কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়, চাকর-বাকর সকলেই সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত। সব কাজ ঠিক্ নিয়মে চলিত। তিনি কাহাকেও শাসন করিতেন না, অথচ সমস্ত কাজ সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইত। তিনি যখন বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেন তখন চাকর-বাকরদিগের মন হইতে যেন একটা পাষাণ-ভার নামিয়া যাইত। ইণ্ডিয়ান মিরারের লেখক কাপ্তেন পামার কখন কখন আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। পিতৃদেব বিদেশে চলিয়া গেলে, পামার সাহেব বাড়ীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন:—"When the cat is away the mice will play।"

১২। আমাদের কাহারও কোন দোষ ত্রুটি তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি পারিবারিক উপাসনার সময় উপাসনা-মণ্ডপে সাধারণ উপদেশচ্ছলে এমন ভাবে বলিতেন যে দোষী ব্যক্তি তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইত।

১৩। আমি যখন শিশু ছিলাম, পিতৃদেব তাঁহার এক বন্ধু বেনী বাবুর সহিত কখন কখন দাবা খেলিতেন। কিন্তু তাস খেলিতে কখন তাঁহাকে দেখি নাই।

১৪। পিতৃদেব স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। আমার শৈশবকালে দেখিতাম, একজন তিলক কাটা বৈষ্ণবী ঠাকরুণ আমাদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতে আসিতেন। তারপর মিস্ গোমিস্ প্রভৃতি খৃষ্টান মেয়েরা বাঙ্গালা শিখাইতে আসিতেন। "এইরূপে আমরা মুখ ধুই, মুখ ধুই, তা'দেখাই-বার পূর্ব্বে" (অর্থাৎ মুখ দেখাইবার পূর্ব্বে)—"একবার নাহি পার পুনর্ব্বার লাগো, সাধ্যমত চেষ্টা কর পুনর্ব্বার লাগো"—এই সকল বাক্য অভ্যাস করান হইত আমার মনে পড়ে। তার পর পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী আমাদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতেন। ইহাই বিশুদ্ধ শিক্ষা। যখন বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয়, তখন পিতৃদেব আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

১৫। পিতৃদেব আমাদের সকলকেই একে একে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্লোক পাঠ করিতে অভ্যাস করাইয়াছিলেন। হ্রস্ব দীর্ঘ রক্ষা করিয়া, বিশুদ্ধ উচ্চারণ-সহকারে টানা-সুরে আমাদিগকে শ্লোক পাঠ করাইতেন। এত অল্প বয়সে উপনিষদের গভীর তত্ত্ব সকল বুঝিতে পারিব না বলিয়াই বোধ হয় তিনি শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেন না। তবে তখন হইতে ঐ সকল শ্লোক আমাদের নিকট পরিচিত হইয়া থাকিলে, ভবিষ্যতে আমরা উহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারিব, ইহাই বোধ হয় তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল। আমাদের সময়ে, আমি ও আমার খুড়তুত ভ্রাতা ৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমরা দুইজনে প্রতিদিন প্রাতে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করিতাম। কিছুকাল পরে, ৺রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্রদ্বয় তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ শিক্ষা করিতে আসিতেন। পরে, ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার জন্য আমাদের বাড়ীর পূজার দালানে একটি ছোটখাট পাঠশালাও খোলা হয়। এই পাঠশালায় বাহিরের চারি পাঁচ জন বিদ্যালয়ের ছাত্রও ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আসিত। পণ্ডিত অযোধ্যা-নাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করাইতেন, শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিতেন। রীতিমত পরীক্ষাও হইত। আমার বাল্যবন্ধু ৺অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী (পরে হাইকোর্টের অ্যাটর্নি, "ভারতীর" সাহিত্য-সমালোচক, সুলেখক, সুকবি) পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করায় পিতৃদেব একখানা বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ তাঁহাকে স্বহস্তে পুরস্কার দেন। আমার দীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য পিতৃদেব প্রতিদিন তাঁহার নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিতেন। আমার উপনয়নের সময় পিতৃদেব বাড়ী ছিলেন না। আমার উপনয়ন প্রচলিত প্রথা-অনুসারেই হইয়াছিল। আমার দীক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। আমার বোধ হয়, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান।

১৬। একবার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়।

সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজে একটা সভা হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমনি মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করিল। কেহ আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়ি ও ঘড়ির চেন্ খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধ হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোচনা

বঙ্গের পৌষসংক্রান্তি

সুলেখিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবী পৌষের প্রবাসীতে সুকবি শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ইরানে নওরোজ" গাথার মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে তৎ-সদৃশ উৎসব বঙ্গের পৌষসংক্রান্তির উল্লেখ করিয়া এবং বঙ্গের একাংশের ঐ উৎসবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বগুড়া জেলাতেও ঐ উৎসব আছে, তথায় কিন্তু সমস্ত পৌষমাস হিন্দু ও মুসলমান রাখালবালকগণ দিবাবসানে দীর্ঘ যষ্টি হস্তে দলে দলে শ্রুতিমধুর বিচিত্র সুরে বিবিধ কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং তৎপরদিন মধ্যাহ্নে কোন মাঠে গিয়া মহানন্দে "পুষণা" বা পোসলা করিয়া থাকে। অন্যান্য দিন অপেক্ষা সংক্রান্তির দিন অবশ্য মহা সমারোহে এই উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। হিন্দু বালকেরা হরির নামে এবং মুসলমান বালকেরা মাণিকপীর ফকিরের নামে উৎসবে ব্রতী হয়। সত্যনারায়ণ পূজার মত উৎসবটি বোধ হয় পরস্পর সামঞ্জস্যের জন্য সৃজিত হইয়া ক্রমে কথঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে দাঁড়াইয়াছে।

বগুড়া জেলায় প্রচলিত কয়েকটি 'ছড়া' নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১। আইল রে আমশালুকা(১) দাঁতে করা কুট।
হাম্‌রা মাঙ্গিয়া খাই এই মাস পুষ॥
এই মাস পুষেরে বনে প'লো টাটি,
একি ঝাঁকে উড়ান দিলাম নও জোড়া পাখী।
নওজোড়া পাখীরে ইকর বিকর
চোরা ব্যাটা করছে ভাঁসা(২) টুয়ের উপর।
টুয়েরি খাড় গোছা কোরছে লোছা গোছা
আউর যায় বাউর যায় পন্তি(৩) করে ভাঁসা।
চাষা ব্যাটার কামাই খায় বড় বড় আজা।
খায় আর মোচড়ে দাঁড়ি
আগুন লাগুক দুষমণের বাড়ী।
ছিকা লড়ে ছিকা চড়ে দুদ্দ্‌ড়াতে ট্যাকা পড়ে,
একটা ট্যাকা পাল্যামরে বাণ্যার বাড়ী গেলামরে,
বাণ্যার বাড়ী সুপুর ভাঁসা একে ভাঁসা নও নও টাকা,
নও ট্যাকা দিয়া কিন্‌লাম গাই,
গাইর নাম মোনা মুনি,
দুধ হয় আঠার হাড়ি,
আজা খায় বাজা খায়
কওক দুধ ঢেউ যায়।

"চাষা ব্যাটার কামাই খায় বড় বড় আজা"—ইত্যাদি কথায় নিরক্ষর কৃষক কবি নিজের ও ধনীর অবস্থা তুলনা করিয়া স্পষ্ট কথা বলিয়াছে।

২। আলোরে অরণি মা লক্ষীর চরণি।
মা লক্ষী দিল বর ধান কড়ি বার কর,
ধান দিবু না দিবু কড়ি তোক্ করমু নড়ি ধরি,
নড়ি ধরি রাম রে সোনার কড়ির ফল রে,
সোনা না উপার মালা এ সরখান জগত মালা,
জগত মালা ঝিলি ঝিলি হামার সরক খায় লিলি,
লিলি খা'তে বড় মন পান্তাভাতে ঢালে নুন।
পান্তাভাত খ্যাড়খ্যাড়া খেড্যাবাড়ী খ্যাড়খ্যাড়া,
খেড়খেড়াতে লাগ্‌লো ভড় কে কে যাব বিরামপুর,
বিরামপুর পাত পাড়া তিছয় আঠার ঘোড়া,
ঘোড়া ঘুড়ি বুঝ্যা লব শ্যাল গোটা দুই মার্যা লব।
শ্যাল মারতে আছি ও ছি।
সাত বামণের সাত ন্যাট বুড়া বামণের হাড্যা প্যাট,
হাড্যা প্যাটোত মারমু গুড়ি(১) ছোল(২) বাড়ান আড়াই কুড়ি।
ছোলের নাম কি
আখাল গোপাল।
বুড়ার নাম কি
বুড়া গোপাল।
বুড়ির নাম ল্যাজকাটা ভোম্‌রি।

৩। শাম কই শাম কই
আমরা আছি ছোল পোল(৩),
জাড়ে (৪) কসমা (৫) পাই,
মাঙ্গন দ্যাও বাড়'ত যাই,
গ্যাতা দ্যাও উড়্যা (৬) যাই,
ঘোড়া দাও চড়্যা যাই।

৪। কাল বাড়ীরে কাল বাড়ী
লাফ দিয়া উঠে গিরি বাড়ী।
কেমন গিরি জাগ হে
ভিক্ষা মাগি কার নামে

(১) রাম শালুকা—রাম শালিক।
(২) ভাঁসা—পাখীর বাসা।
(৩) পন্তি—প্রতিদিন।

(১) গুড়ি—লাথি।
(২) ছোল—ছেলে।
(৩) ছোল পোল—ছেলে পেলে।
(৪) জাড়ে—শীতে।
(৫) কসমা—বস্ত্র বিশেষ।
(৬) উড়্যা—গাত্র আচ্ছাদন করিয়া।

মাণিকপীর সাহেবের নামে।
যাঁই দিবি কাঠা কাঠা
তার হোবে সাত বেটা.
সাত ব্যাটা আঠার নাতি
ঘরে ঘরে মোম বাতি
জ্বলুক বাতি পুড়ুক ত্যাল
আমশালুকা পাকা ব্যাল।

৫। কড় কড়া ভাতে কি কাম করে
বুড়া বুড়ি চেতন করে।
ক্যারে বুড়া ক্যারে বুড়ি।
কয়ডা গাই কয়ডা বলদ
বারডা গাই তেরডা বলদ।
একটা গাই নড়ে চড়ে
বাঘা আস্যা ঘারেত পড়ে,
যায় বাঘা বনে
খায় আপন মনে
খায় আর কড়মড়ায়
দুই চোখ কড়কড়ায়।
দুই গানে দুই মূলা
ধান বাইকর কলা কুলা,
কুলা থিনি কাঠাত যাউক
গিরিলি থানেক বাঘে খা'ক।
ও বাঘ তুই খাসন্যা
শড়ীর জাত মারিস না।

বুড়াবুড়ি রাখালদিগকে পর্য্যুসিত অন্ন দিয়াছে বলিয়া বালকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে "তোদের কয়টা গাই বলদ"? যখন শুনিল বারটা গাই তেরটা বলদ, তখন তাহারা বলিতেছে "এত দুধ, এত ক্ষীর ছানা থাকিতে তোরা কিনা আমাদিগকে বাসিভাত খাইতে দিলি। বাঘ আসিয়া তোর গাই গোরুর ঘাড়ে পড়িয়া বনে লইয়া যাইবে ও কড়মড় করিয়া খাইবে, এমন কি বুড়ি গিন্নিকেও লইয়া যাইতে পারে। যাক্—কাঠা কাঠা ধান দিলে আর তোদের ভয় নাই। ওরে বাঘ তুই এদের খা'স না, শাশুড়ির জাতিকে মারিস না।"

ছড়াগুলির বিষয় বিভিন্ন, কোনটি পাখী লইয়া, কোনটি ইন্দুর লইয়া, কোনটি লক্ষ্মীর নামে, কোনটি মাণিকপীরের নামে রচিত। কিন্তু কোন ছড়াতেই তাদৃশ সামঞ্জস্য নাই, কষ্টকল্পনায় অর্থ টানিয়া আনিতে হয়। সেই জন্য অর্থ গ্রহণ করা কঠিন। ইহার কোনটিতে স্পষ্ট-বাদিত্ব, কোনটিতে তোষামোদ, কোনটিতে বা বিদ্রূপ আরোপিত হইয়াছে। কৃষককে বুঝিতে হইলে এগুলি সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের এই উৎসবের সবিবরণ ছড়া প্রকাশিত হইতে থাকিলে উৎসবটির সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগঠিত এবং উদ্দেশ্যও আবিষ্কৃত হইতে পারে। ছড়াগুলি ভাষাতত্ত্ব আলোচনার পক্ষেও সুবিধাজনক।

শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু।

বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিচার্য্য

আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা বহুবচনের 'এ' বিভক্তি সম্বন্ধে আমার সূত্রের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত এই, 'ঠেলা দিলে টেবিল উল্টে পড়ে', আমরা টেবিলে বলি না। এখানে 'ঠেলা দিলে' বলাতে টেবিলের সামান্য বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম পতন সিদ্ধ হইল না। 'ইংরেজ সৈন্যদল ভারতবর্ষে আছে'—এখানে সৈন্যদলে হইতে পারে না। কারণ থাকা না থাকা কেবল সৈন্যদলের সামান্য ধর্ম্ম নহে। 'গাছে ফুল ধরে' এখানে ধর ধাতুর কর্ম্ম ফুল বলিতে হইবে। ধর ধাতু অকর্ম্মকও হয়। যেমন, জল ধরিয়াছে, মেঘ ধরিয়াছে, এসব স্থলে ধর ধাতুর অর্থ বিরাম। আমার বোধ হয়, সামান্য ধর্ম্ম প্রকাশ ব্যতীত কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ উদ্দেশ্য হইলেও বহুবচনে এ লাগে। যেমন, টাকায় টাকা করে, নদীতে নামিও না কুমীরে কামড়াবে। কর্ত্তা কারক ভিন্ন অন্য কারকেও সে কারক স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে হইলে বিভক্তি দিতে হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

একটী প্রাচীন গ্রীকমূর্ত্তি

বিগত জুলাই মাসে আমি একটী গ্রীক-অলঙ্কার বা মূর্ত্তি ক্রয় করিয়াছি। উহার আকৃতি ১½ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ১ ইঞ্চ প্রস্থ; ওজন ১½ ভরি। এই দ্রব্যটা কলিকাতার মিউজিয়ামের ও সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তাদের নিকট বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছিল, কিন্তু মূল্যাধিক্য জন্য তাঁহারা লন নাই। সিন্ধুদেশীয় একজন ইংরাজ সৈন্য সীমান্ত যুদ্ধের সময় একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ জয়ের পর এক জন হত আফ্গানসৈনিকের পাগড়িতে ইহা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। উক্ত সৈনিকের পুত্রের নিকট হইতে এই মূর্ত্তিটা আমি ক্রয় করিয়াছি। এ ব্যক্তির পিতা ঐ মূর্ত্তিটাকে তাহাদের গৃহদেবতার স্থলাভিষিক্ত করিয়া পূজা করিত।

ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ও তদ্বিভাগীয় কলিকাতা মিউজিয়ামের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া স্থির হইয়াছে যে এ মূর্ত্তিটা অতি প্রাচীন গ্রীক দেশীয় মূর্ত্তিনির্ম্মাণ-প্রথানুসারে প্রস্তুত এবং খাঁটি "হেলেনিক" কারুকার্য্য (Pure Hellenic Workmanship).

উক্ত আভরণটীতে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীমূর্ত্তি ঈষৎ বক্রভাবে পাশাপাশি পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পুরুষটীর ঘাড় হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত একটী প্রাচীন গ্রীকদেশীয় পিঠবস্ত্র লম্বিত আছে, অবশিষ্ট সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ। উহার কেশদাম অতি সুন্দর কোঁকড়ান, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা

গ্রীক স্বর্ণমূর্ত্তি—সম্মুখ ও পশ্চাৎ দৃশ্য।

স্ত্রীমূর্ত্তিটীর চিবুক ধরিয়া ও বাম হস্ত তাহার স্কন্ধদেশে দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্ত্রী মূর্ত্তিটীর গাত্রে একখানি আবরণ-বস্ত্র স্খলিতভাবে ঘাড় ও বাম বগলের তলদেশ দিয়া ঝুলিয়া আছে। সে উহা বাম হস্ত দ্বারা ধরিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রায় আবরণশূন্য। গঠনপ্রণালী দেখিয়া মনে হয় হঠাৎ গাত্রবস্ত্র স্খলিত হওয়ায় অপ্রতিভ ভাবে সে উহা বাম হস্ত দ্বারা ধরিতে যাইতেছে। মাথার চুলগুলির মধ্যভাগে সিঁতি কাটা ও পশ্চাতে কবরী বন্ধন করা আছে। মূর্ত্তিটী ফাঁপা এবং গিনি স্বর্ণের এবং একটী সরু বেদীর উপর নির্ম্মিত। উহার পশ্চাৎভাগে কোন কারুকার্য্য নাই, কেবল সাদা সোনার পাত মোড়া, উপরে দুইটী ও নীচে একটী কোঁড়া লাগান আছে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে উহা কোন একটী অলঙ্কারের অংশবিশেষ অথবা শিরস্ত্রাণাদিতে "ব্যাজের" ন্যায় ব্যবহৃত হইত। কোঁড়া তিনটী পিন-আঁটার উপযুক্ত ভাবে গঠিত। ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে এই জিনিষটীর নির্ম্মাণ-প্রণালীতে প্রাচীন গ্রীকগণের পানোন্মাদ অবস্থার একটী প্রতিকৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাহা পূর্ব্বকালে গান্ধার ও উদ্যান প্রদেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল ঐ সকল স্থানের প্রাচীন স্তূপ ও সংঘারামগুলির ধ্বংসাবশেষ হইতে এইরূপ প্রস্তরময় কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় সার্ আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি এই ধরণের শিলামূর্ত্তি কলিকাতা মিউজিয়ামে দিয়াছিলেন। উহার মধ্যে পাঁচটীর বিবরণ ডাক্তার জন এণ্ডারসন্ তাঁহার কৃত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তালিকা-পুস্তকে ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তৎপর স্বর্গীয় ডাক্তার টি, ব্লক (T. Block) তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের শিক্ষার সুবিধাকল্পে ঐগুলি নানাস্থান হইতে একত্রিত করিয়া কলিকাতা মিউজিয়ামের গ্যালারীতে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে চারিটী মূর্ত্তির সহিত পরস্পর সামঞ্জস্যের তুলনা নিম্নে লিখিত হইল:—

(১) একটী বা ততোধিক বালকের সম্পূর্ণ খোদিত মূর্ত্তি প্রত্যেক খানি ছবিতে দেখা যায়।

(২) এই সকল ছবিতে প্রত্যেক স্ত্রীমূর্ত্তির গাত্রে একটী করিয়া আঁটা জামা আছে, তাহার উপর ঢিলে গাত্রাবরণ। সম্পূর্ণ উলঙ্গমূর্ত্তি একটীতেও নাই।

(৩) ইহার মধ্যে কেবল মাত্র দুটী ছবির পুরুষমূর্ত্তি উলঙ্গ (G3 & G44)। কেবল একখণ্ড চাদরের গাত্রবস্ত্র ঘাড় হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বিত আছে। তদ্দ্বারা লজ্জা নিবারিত হয় নাই।

অন্য দুটীতে পুরুষমূর্ত্তির কটিদেশে এক খণ্ড খাটো বস্ত্র জড়ান আছে। যদ্দ্বারা কেবল লজ্জা নিবারণ হইয়াছে মাত্র। পূর্ব্বোল্লিখিত পুরুষ দুটীর ন্যায় ইহাদেরও একটা করিয়া ঢিলে গাত্রবস্ত্র লম্বিত আছে।

এস্থলে এই সকল খোদিত প্রস্তর মূর্ত্তিগুলির সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না।

G3 এই শিলাখণ্ডে চারিটী খোদিত মূর্ত্তি আছে, দুই পার্শ্বে দুইটী দণ্ডায়মান পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তি, উহাদের মধ্যে একটী বালক দাঁড়াইয়া আছে। উহাদের ঘাড়ের উপর আর একটী ছেলের অর্দ্ধাংশ বিদ্যমান আছে। পুরুষটী একেবারে উলঙ্গ, কেবলমাত্র পূর্ব্ববর্ণিত ভাবে এক খণ্ড ঢিলে গাত্রবস্ত্র আছে। বামহস্ত দ্বারা ঐ বস্ত্রখণ্ডের এক প্রান্ত ধরা আছে। একটী পুত্তলিকারও মস্তক নাই। স্ত্রীলোকটীর গায়ে একটী "বডি," পরিধানে একটী "গাউন" এবং গাত্রে ঘাড় হইতে বাম বগলের তলা দিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলান ও উহার টেপটা বাম কনুই হইতে কোমরে জড়ান অবস্থায় আছে। বক্ষস্থলের ডান পার্শ্বে বডিটার বোতাম দেওয়া আছে এবং এক গাছ ফিতা দ্বারা উহা

গলায় বাঁধা হইয়াছে। দুইটী বালকেরই গাত্রে কোন বস্ত্রালঙ্কার নাই।*

G. 44—এই প্রস্তর পুত্তলিকাটীতে একটী পুরুষ, একটী স্ত্রী, ও একটী শিশু বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে। বৃক্ষটীর পত্রগুলি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে উহা গ্রীকদেশীয় 'একান্থাস্' (Acanthus) বৃক্ষ। স্ত্রীমূর্ত্তির মুখমণ্ডল বিশ্রী হইয়াছে, পুরুষটীর মস্তক ঠিক ভাবেই আছে ও পূর্ব্ববর্ণিত বেশ ভূষায় সজ্জিত। ইহার ডান হাতটী এবং স্ত্রীমূর্ত্তির উভয় হস্তই নগ্ন। পুরুষটীর চেহারা বেশ দৃঢ় ও সবল। চুলগুলি আলুথালু, দাড়ি অপরিষ্কৃতভাবে চারকোণা করিয়া কাটা। গঠন-প্রণালী প্রাচীন গ্রীক-দৈত্যের চেহারার ন্যায়। স্ত্রীলোকটীর চুলগুলি পশ্চাৎভাগে ঢিলে কবরীবদ্ধ ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইহার পরিধানে একটী ঢিলে পরিচ্ছদ, উহা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বেশ ঢাকা আছে, কাপড়খানিতে অনেকগুলি ভাঁজ পড়িয়াছে। পুরুষটীর দিকে মুখ ফিরাইয়া স্ত্রীলোকটী দাঁড়াইতে যাইতেছে, কিন্তু পুরুষটী বাম হস্তখানি তাহার ঘাড়ে দেওয়াতে মনে হয় যেন স্ত্রীলোকটী বিরক্ত ভাবে তাহার প্রণয়ীর দিক হইতে মুখ ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে।†

G 4—এই প্রস্তর ফলকটীতে চারিটী মূর্ত্তি আছে। একটী পুরুষ, একটী স্ত্রীলোক, পুরুষটীর দক্ষিণভাগে একটী ছেলে এবং স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যস্থলে উহাদের ঘাড়ের উপর বস্ত্রাচ্ছাদিত আর একটী বালকের মূর্ত্তি। সব ছবিগুলিরই মাথা নষ্ট হইয়াছে। এবং বালকটীর হাত পাও গিয়াছে। পুরুষটীর কোমরে একখানি দৃঢ়বদ্ধ বস্ত্র এবং গাত্রে একটা ঢিলে কাপড় কোমর পর্য্যন্ত ঝুলিয়া আছে। সে উহা বামহস্ত দ্বারা ধরিয়া আছে। দক্ষিণ হস্তখানি সম্মুখ ভাগে উত্তোলিত, যদ্দ্বারা উহার অভিসন্ধি অভিব্যক্ত হইতেছে। স্ত্রীলোকটীর গাত্রে একটী দৃঢ়বদ্ধ বস্ত্রাবরণ আছে। তদ্দ্বারা বক্ষঃস্থলের ও স্কন্ধদেশের কতকাংশ অনাবৃত হইয়া পা পর্য্যন্ত অনেকগুলি ভাঁজে ভাঁজে লম্বিত। আর একখানি ঢিলে কাপড় হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে
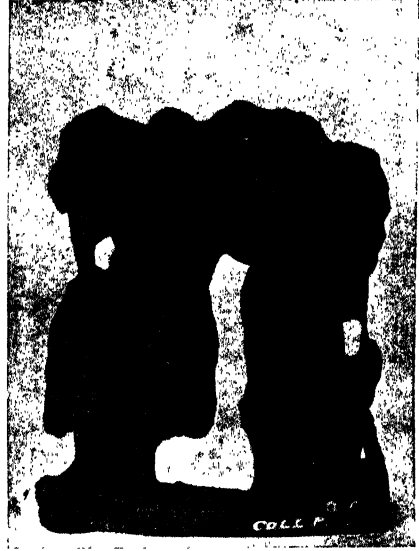
G4—গ্রীক প্রস্তরমূর্ত্তি।

কিন্তু ঐখানি সে বাম হস্তদ্বারা ধরিয়াছে। পুরুষের দক্ষিণপার্শ্বে বালকটীর ভগ্নদেহ মাত্র আছে। বড় পুত্তলিকা দুইটীর ঘাড়ের উপর উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত হস্তপদাদিশূন্য ছবিটী বসিয়া আছে। পুরুষটীর পশ্চাৎভাগে তালপত্রের ন্যায় ২।১টা পাতা দৃষ্ট হয়; খুব সম্ভব ঐগুলি দ্রাক্ষা বৃক্ষের পত্র। স্ত্রী ও পুং মূর্ত্তির মধ্যভাগে একটী বালকের ক্ষুদ্র পদের ভগ্নাংশ থাকায় বলিতে পারা যায় যে ঐ স্থানেও একটী শিশু ছিল।*

G 8—পূর্ব্বোল্লিখিত আর একটী শিলামূর্ত্তি। ইহাতে একটী পুরুষ, একটী স্ত্রী, উভয়ের মধ্যস্থলে একটী শিশু এবং উহাদের স্কন্ধদেশে আর একটী দোদুল্যমান শিশু। পূর্ব্ববর্ণিত (G 4) পুত্তলিকাটীর ন্যায় এই ছবিখানির স্ত্রী এবং পুরুষের বস্ত্রাদি ঠিক একই ভাবে আছে। স্ত্রীলোকটী ভিন্ন আর সকল ছবিগুলির মাথা ভগ্ন হইয়াছে। উহার মুখশ্রী অতি সুন্দর, কেশগুলি সুবিন্যস্ত ও কবরীবদ্ধ, তদুপরি পুষ্পমালা বা কমনীয় শিরস্ত্রাণ শোভমান। উভয়ের মধ্যস্থলে যে শিশুটী মস্তকশূন্য উহার হস্তদ্বয় উর্দ্ধদিকে উত্তোলিত। অপর শিশুটীর কেবল দেহভাগ ও দক্ষিণ হস্তখানি ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই। পূর্ব্বোক্ত শিশুটীর

* Anderson's Catalogue, Part 1, Page 202.
† Anderson's Catalogue, Part 1, Page 24.

* Anderson's Catalogue, Part 1, Page 203.

G৪—গ্রীক প্রস্তরমূর্ত্তি।

চেহারা সুঠাম ও বলবান যুবার ন্যায়। তাহার দক্ষিণ হস্তখানি বাম বক্ষঃস্থলের উপর স্থাপিত। এই ছবিখানির পশ্চাৎভাগে কতকগুলি বড়পাতাবিশিষ্ট গাছ আছে। ঐগুলিকে পুরাকালের গ্রীসদেশীয় তালবৃক্ষের প্রতিকৃতি বলিয়া অনুমান করা যায় (Plam Acanthus).*

গান্ধারদেশীয় প্রাচীন শিল্পকলার মধ্যে পূর্ব্বকালীন গ্রীকদেশীয় "মধুমত্ত বনিতাসখ"গণের (Bacchanalian revelry) প্রতিকৃতি থাকাটা অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না। এম্, ফুসে (M. Fouche) প্রণীত সুবিখ্যাত "গান্ধারের গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পকলা" (Greco-Buddhique du Gāndhārā, Figure 127—130) নামক গ্রন্থে এইরূপ মূর্ত্তির চিত্র আছে। আলোচ্য সুবর্ণ প্রতিমাটীতেও একটা নগ্ন দম্পতি মূর্ত্তি দেখা যায়। পূর্ব্ববর্ণিত পাষাণমূর্ত্তি-গুলির সহিত এইটার তুলনা করিলে স্ত্রী ও পুরুষের আঁট ও ঢিলে গাত্রাবরণ ছাড়া অন্য কোন বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। যদিচ সুবর্ণ মূর্ত্তিটাতে স্ত্রী ও পুরুষের গাত্রবস্ত্র আছে কিন্তু তাহা না থাকার সামিল। কারণ দুইটাই সম্পূর্ণ নগ্ন। এই মূর্ত্তিটাতে কোন শিশুর অস্তিত্ব নাই। সম্ভবতঃ ইহা কামরতির মূর্ত্তির অনুরূপে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল (Cupid or Eros সংস্কৃত কাম)। যে সময়ে গান্ধারের এসব মূর্ত্তি নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল গান্ধার তখন ভাস্করকার্য্যে অতিউচ্চস্থানারূঢ়। এই মূর্ত্তিটী মহামান্য ভারত গবর্ণ-মেণ্টকে উপহার প্রদত্ত হইবে এইরূপ প্রস্তাব চলিতেছে। যদি উহা প্রদত্ত হয় তবে সাধারণের দর্শনার্থে কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত হইবে।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী।

* Andersons Catalogue, Part 1, Page 207.

জাতিগঠনে রক্তসংমিশ্রণ

জাতিগঠনে বিবিধ প্রকারের মিশ্রণ আবশ্যক; তন্মধ্যে রক্তের মিশ্রণ অতীব প্রয়োজনীয়। যদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এক দেশে বাস করে, এক ভাষায় কথা কহে অথচ বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইবার সুযোগ না পায়, তবে বৈষম্যের রেখা এত দৃষ্টি-ব্যাপিকা হইয়া দাঁড়ায় যে তাহাতে জাতি গড়িতে দেয় না। যদি জাতিগঠন করিতে হয় তবে অপরাপর মিশ্রণের সুযোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না, উদার বিবাহবিধির সাহায্যে রক্তের মিশ্রণের পথ সুকর করিয়া দিতে হইবে। বিরুদ্ধবাদী দুইকে এক করিবার উপায় বিবাহের মত আর দ্বিতীয়টা নাই। বিবাহের কল্যাণে ইট্রস্কীয় ও রোমক এই দুই মিলিয়া এক মহাপ্রতাপা-ন্বিত রোমক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। আমাদের দেশে শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ মীমাংসায় বিবাহের সালিশি যে বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছে কে তাহা অস্বীকার করিবে? হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের মীমাংসারও "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে" জানিয়া রাখা উচিত।

এই রক্তের মিশ্রণের পথ এখন ব্যাহত বটে কিন্তু চিরদিন এইরূপ ছিল না। স্মৃতি পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে অতীতে বিস্তর মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে এবং তখন মিশ্রণের পথ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ে আছে:—

"অব্রাহ্মণন্তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্রমনৈপুণাৎ।
ত্রিষুবর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥ ২৭
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈবহি॥ ২৮

"মাতৃদোষে শূদ্রার পুত্র অব্রাহ্মণ বা শূদ্র হইবে কিন্তু অপর তিন বর্ণে জাত ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হইবে। ব্রাহ্মণীতে জাত ব্রাহ্মণের পুত্র যে ব্রাহ্মণ অহাতে সন্দেহ নাই, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে জাত পুত্রও সেইরূপ ব্রাহ্মণ।"

মনুর বিবাহবিষয়ে সাধারণ বিধি এই যে প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রী প্রশস্তা, স্বেচ্ছাকৃত পুনর্বিবাহে শূদ্র শূদ্রা বিবাহ করিবে, বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রা, এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রা বিবাহ করিবে। তাঁহার বিশেষ মত এই যে দ্বিজাতিগণ শূদ্রা বিবাহে পতিত হন। যে দ্বিজের দৈব পৈত্র আতিথ্য কার্য্যে শূদ্রা সহধর্ম্মিণী-স্বরূপা তাহার সকলই পণ্ড হয়। বিভিন্নজাতির রক্তের মিশ্রণ তখন চলিয়াছে, তবে কেহ কেহ তাহা পসন্দ করেন নাই, মনু তাঁহাদের অন্যতম। মনুর মতে বিবাহকালে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর পাণি গ্রহণ করিবেন। অসবর্ণ বিবাহে ক্ষত্রিয়া তাঁহার হস্তধৃত শর গ্রহণ করিবেন, বৈশ্যা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বরের হস্তস্থ গোতাড়নযষ্টির একদেশ গ্রহণ করিবে, শূদ্রা দ্বিজাতির পরিহিত বসনের দশা গ্রহণ করিবে।

অনুলোম বিবাহকে লোকচক্ষে হীন করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও ইহা বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত ও প্রচলিত ছিল। এইরূপে পরিণীতা স্ত্রীগণ যে সম্মানিতা হইতেন তাহারও প্রমাণ মনুতেই আছে :—

"অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তা অধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্ ॥" (মনু ৯।২৩)

"অধমমাতৃজা অক্ষমালা ও শারঙ্গী ক্রমান্বয়ে ঋষি বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত উদ্বাহসূত্রে মিলিত হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন।"

এই প্রসঙ্গে মৎস্যগন্ধার সত্যবতী নাম লাভের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই বিবাহের পুত্রেরা অতি পূর্ব্বে পিতৃসাজাত্য লাভ করিতেন; যথা—কক্ষীবাণ, পরশুরাম ও ব্যাস। পরে পিতৃসাদৃশ্য মাত্র লাভ করিতেন অর্থাৎ পিতৃকুল অপেক্ষা একটু হীন হইতেন কিন্তু তাঁহাদের দায়াধিকার থাকিত। অনুলোমজ সন্তানের পিতৃসাজাত্য প্রাপ্তির একটা ক্রমও নির্দ্দিষ্ট ছিল দেখা যায়। যাহারা সদাচার অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট জাতিতে কন্যাদান করিতেন তাহারা পাঁচ ছয় পুরুষ পরে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট জাতি হইতেন। এইরূপে কত হীন বর্ণ উচ্চ বর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কত শূদ্রধর্ম্মা জাতি ক্রমশঃ বৈশ্য ক্ষত্রিয় এমন কি ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছে।

সবর্ণের মধ্যে অনিন্দ্য বিবাহে যে পুত্র জন্মে সে তজ্জাতীয়; কিন্তু উচ্চ বর্ণের পুরুষ যদি নিম্ন বর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে সে কি জাতি হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

"জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপিবা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরম্ ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৯৬)

"জাতির উৎকর্ষ পঞ্চ বা সপ্তম জন্মে (ব্রাহ্মণ্যলাভ), কিন্তু জীবিকার ব্যতিক্রমে পূর্ব্ববৎ অধর (প্রতিলোমজ) ও উত্তর (অনুলোমজ) হইয়া থাকে।"

এখানে মিতাক্ষরায় বিজ্ঞানেশ্বর খুলিয়া লিখিয়াছেন,—

"মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতির উৎকর্ষ ব্রাহ্মণত্বাদি প্রাপ্তি সপ্তম, পঞ্চম বা ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্ত জানিবে। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ দ্বারা শূদ্রাতে উৎপন্ন কন্যা নিষাদী, সেই কন্যা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিত হইলে যদি তাহার আবার কন্যা জন্মে সেই কন্যাকে আবার যদি ব্রাহ্মণে বিবাহ করে ও তাহার গর্ভে কন্যা উৎপাদন করে, এইরূপ ষষ্ঠী কন্যা (তৎপরপুরুষে অর্থাৎ) সপ্তম পুরুষে ব্রাহ্মণ জন্মাইবে। ব্রাহ্মণ দ্বারা বৈশ্যাতে উৎপন্ন কন্যা অম্বষ্ঠা, সেই অম্বষ্ঠার (পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইলে) পঞ্চমী কন্যা (তৎপরপুরুষে অর্থাৎ) ষষ্ঠ পুরুষে ব্রাহ্মণ জন্মাইবে। মূর্দ্ধাবসিক্তার এইরূপ চতুর্থী কন্যা পঞ্চম পুরুষে ব্রাহ্মণ জন্মাইয়া থাকে। এই প্রকার ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিত উগ্রা বা মাহিষ্যা যথাক্রমে ষষ্ঠ বা পঞ্চম পুরুষে ক্ষত্রিয় উৎপাদন করে। তদ্রূপ করণীও বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিত হইয়া পঞ্চম পুরুষে বৈশ্য জন্মাইয়া থাকে। * * * ক্ষত্রিয় বৈশ্য কর্ত্তৃক মূর্দ্ধাবসিক্তাতে উৎপন্ন এবং শূদ্র দ্বারা নিষাদীতে উৎপন্ন সন্তান অধর (প্রতিলোমজ) এবং মূর্দ্ধাবসিক্তা, অম্বষ্ঠা এবং নিষাদীতে ব্রাহ্মণ দ্বারা উৎপন্ন সন্তান উত্তর (অনুলোমজ)। এছাড়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দ্বারা মাহিষ্যা ও উগ্রাতে উৎপন্ন সন্তান এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বারা করণীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান উত্তর (অনুলোমজ) বলিয়া জানিবে।" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস- ব্রাহ্মণকাণ্ড)।

মনুও বলেন

"উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকন্যাতে যে সন্তান জন্মে, সেই নিকৃষ্টও সপ্তম জন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এই-রূপে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। ব্রাহ্মণ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে অনার্য্যা নারীতে যে (সন্তান) উৎপন্ন হয় এবং অনার্য্য হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? (এ প্রশ্নের উত্তর এই) আর্য্যের ঔরসে অনার্য্যের গর্ভজাত সন্তান সদ্গুণসম্পন্ন হইলে আর্য্য হইবে এবং অনার্য্যের ঔরসে আর্য্যার গর্ভজাত সন্তান নিশ্চয় অনার্য্যই হইবে। (কিন্তু) পূর্ব্বটী নিন্দিত-ক্ষেত্র-সম্ভূত ও পরবর্ত্তী প্রতিলোমজ বলিয়া উভয়েই উপনয়নাদি সংস্কারের যোগ্য নহে, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা।" (মনু ৬৪—৬৮।১০)।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে যুগপৎ অনুলোম ও প্রতিলোম প্রণালী দিয়া শোণিতস্রোত সর্ব্ব বর্ণে—আর্য্য অনার্য্যে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। মহাভারতের

বনপর্ব্বে ১৮০ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে যুধিষ্ঠির সর্পের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, হে মহাসর্প, এই মনুষ্য জন্মে সকল বর্ণের সঙ্করত্বহেতু জাতি নির্ণয় করা অতি কঠিন। সকল বর্ণের লোকেরাই সকল বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিতেছে। সকলের ভক্ষ্য সকলের জন্মমৃত্যু এক প্রকার। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত না মানবের বেদাধিকার জন্মে, সে পর্য্যন্ত শূদ্রই থাকে।

শাস্ত্রকারেরা প্রতিলোম বিবাহকে উৎপাটিত করিবার জন্য সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও মেধাতিথির মতে প্রতিলোম সঙ্করগণ সমাজে নীচ শূদ্রবৎ হেয়। কিন্তু ব্রাহ্মণী দেবযানীর গর্ভজাত যযাতির অনু পুরু যদু আদি সন্তানগণ কি সমাজে নীচ শূদ্রবৎ হেয় ছিলেন? ব্রাহ্মণ-কন্যারূপে পরিচিতা শকুন্তলার গর্ভজাত দুষ্মন্তের সন্তানগণ কি সমাজে নীচ শূদ্রবৎ অবজ্ঞাভাজন ছিলেন? প্রতিলোমপ্রণালী বিবাহ বলিয়া গণ্য না থাকিলে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এমন কি কাম্বোজ ও যবন নির্ব্বিশেষে সকলকেই লক্ষ্য ভেদ করিতে কি আহ্বান করা সম্ভব হইত? উশনাস্মৃতির মতে প্রতিলোমপ্রণালীও বিবাহ, এবং সেইরূপ বিবাহে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকন্যায় উৎপন্ন পুত্র প্রতিলোম দ্বিজ।

> নৃপাৎ ব্রাহ্মণকন্যায়াং বিবাহেষু সমন্বয়াৎ।
> জাতঃ সূতোঽত্র নির্দ্দিষ্টঃ প্রতিলোম বিধিদ্বিজঃ॥
> ২—১ উশনা।

প্রতিলোমজ সঙ্করগণের শাস্ত্রোক্ত তালিকা যদি মানিয়া লইতে হয় তাহা হইলেও বলিতে হইবে প্রতিলোম বিবাহ দ্বারাও প্রচুর শোণিতমিশ্রণ ঘটিয়াছে। শাস্ত্রের নিগড় শক্ত করিয়া বাঁধিবার পূর্ব্বে বহু প্রতিলোমজ ব্যক্তি স্বতন্ত্র বর্ণ না হইয়া বিবিধ বর্ণে স্থান পাইয়াছে। আর সদাচার ত্যাগ ও বৃত্তি ত্যাগ নিবন্ধন যে সকল ব্যক্তি ব্রাত্যত্ব বা সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের রক্তও ত অপর প্রতিলোম সঙ্করের শোণিতে মিশিয়া গিয়াছে।

আর এক পথ দিয়া মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে। মৎস্য-পুরাণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীভুক্ত সর্ব্বসুদ্ধ ৯২ জন মন্ত্রকৃৎ ঋষির উল্লেখ আছে। পুরাণে যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির প্রসঙ্গ আছে তাঁহাদের প্রত্যেকেই গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল ঋক্‌মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ আছে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের কুলপরিচায়ক উপাধি আলোচনা করিলে তাঁহারা ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হন। "পুরোহিতপ্রবরোরাজ্ঞাং" এই আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রের মতে পুরোহিতের গোত্র অনুসারে ক্ষত্রিয়ের গোত্র স্থির করিতে হইবে। উক্ত ঋষিগণ ক্ষত্রিয়সন্তান হইলেও তাঁহাদের নামে গোত্র প্রচার হইল কিরূপে? কারণ ব্রাহ্মণ না হইলে গোত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন না। এরূপ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে, ঐ সকল ক্ষত্রিয়সন্তানও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইলেও পূর্ব্বপুরুষের পরিচায়ক ক্ষত্রোপেত গোত্র ধারণ করিতেছেন।

শাস্ত্রে যেমন ব্রাহ্মণ হইতে চতুর্বর্ণের উৎপত্তির কথা আছে তেমনি ক্ষত্রিয় হইতেও চতুর্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ উল্লেখ আছে। ক্ষত্রিয় গৃৎসমদের পুত্র শুনক; এই শুনক হইতে শৌনক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ভার্গবের বংশে অঙ্গিরস-পুত্রগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যত্ব ও বৈশ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির কথাও অনেক পুরাণে দেখা যায়। ক্ষত্রিয় নাভাস বৈশ্যাকন্যা বিবাহ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৈশ্য নভোগরিষ্ঠের দুই পুত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ভলন্দ, বন্দ্য ও সংকৃতি বৈশ্য হইলেও বেদের মন্ত্রকৃৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শূদ্র করষ ব্রাহ্মণ ও বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে (২১১ অধ্যায়ে) আছে:—শূদ্র মাতার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াও কোন ব্যক্তি যদি সদ্‌গুণ সকলের সেবা করে তবে তাহার বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়, সারল্য গুণ থাকিলে তাহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইতে পারে।

এতটা মিশ্রণের পর আবার রক্ত অবিমিশ্র রাখিবার প্রয়াস বৃথা নয় কি? মাথা নাই তবে মাথার ব্যথা ভাবিয়া অস্থির হই কেন? এই মিশ্রণ যে শুধু প্রাচীন কালেই হইয়া গিয়াছে তাহা নয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও দেখা যায় মিশ্রণ চলিয়াছে। মৌর্য্য রাজগণ শূদ্র বলিয়া

খ্যাত অথচ দেখিতেছি অশোকের মাতা ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন। ব্রাহ্মণ পিতা রাজা বিন্দুসারকে তাঁহার কন্যা দান করেন। গৌড়াধিপতি শূরসেন বা আদিশূরকে সাধারণে বৈদ্য বলিয়াই জানে। বৈদ্যের মাতৃসাজাত্য স্বীকার করিলে তিনি বৈশ্য, পিতৃসাজাত্য মানিলে তিনি ব্রাহ্মণ। কথিত আছে তিনি কান্যকুব্জের ক্ষত্রিয় রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন এবং সেই সূত্রেই এদেশে কান্যকুব্জ হইতে ইতিহাস-কথিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন সম্ভব হয়। যে বল্লাল-রচিত কৌলীন্য-নাগপাশে বাঙ্গালীর সমাজ এখনো জড়ভরত হইয়া রহিয়াছে তাঁহার কুল অনুসন্ধান করিতে যাইয়া জানা যায় তাহা অবিমিশ্র নহে। ওষধিনাথ নামে একজন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ তাঁহার ক্ষত্রিয়া জাতীয়া পত্নী লইয়া ত্রিবেণীতে গঙ্গাবাস করিতেন। তাঁহাদের সন্তান সামন্ত সেন ব্রহ্মক্ষত্র। ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যেরা ব্রহ্মক্ষত্রকে কুলীন জ্ঞান করিতেন। সামন্ত সেন এক বৈদ্য সামন্তের কন্যা বিবাহ করিয়া বৈদ্য জাতিতে মিলিত হইয়া যান। তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেনও বৈদ্যকন্যা বিবাহ করেন। হেমন্তের পুত্র বিজয় সেন গৌড়াধিপতি চন্দ্র সেনের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহারই পুত্র রাজাধিরাজ বল্লাল সেন। এখনো অনেকে বল্লাল সেনকে ব্রহ্মক্ষত্র বলিয়া থাকেন।*

মোগল আমলে সম্রাট আকবর রাজপুত রাজগণের সহিত স্বীয় বংশের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালীতে মোগল সম্রাটগণ রাজপুত রাজকন্যাদিগের পাণিগ্রহণ করিতেন। বাঙ্গালার পাঠান অধিকারের সময় দেখা যায় এখানকার গৌড়ের বাদশাহগণ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ সামন্তদিগের পুত্রের সহিত আপনাদিগের কন্যার বিবাহ দিতে উৎসুক ছিলেন।

সৈয়দ হোসেন শাহ এই প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার চারি বেগমের গর্ভজাত অনেকগুলি কন্যা ছিল, তন্মধ্যে দুই জনের ২০ বৎসরের অধিক বয়স হইয়াছিল। সমকক্ষ পাত্রাভাবে বিবাহ দিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। এমন সময় একটাকিয়ার রাজা মদন (ভাদুড়ী) খাঁ তাঁহার দুই পুত্র কন্দর্প ও কামদেব সহ আসিয়া বাদশাহর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে আটক করিয়া রাজা মদনের নিকট এইরূপে বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করেন—"খাঁ সাহেব, আমি একটাকিয়ার রাজবংশীয়গণকে অতিশয় ভালবাসি এবং মান্য করি। তোমরা যেমন হিন্দুর গুরু ব্রাহ্মণ, আমরা তেমনি মুসলমানের গুরু সৈয়দ। তোমাদের কন্যা যেমন অপর হিন্দু বিবাহ করিতে পারে না, আমাদের কন্যাও অপর মুসলমানে বিবাহ করিতে পারে না। তোমাকে অতীব সম্ভ্রান্ত জানিয়াই তোমার পুত্র সহ আমি আমার কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। আমি তোমার পুত্রগণকে মুসলমান হইতে বলি না। বরং পত্নীই পতির ধর্ম্ম অনুসরণ করে। তুমি যদি আমার কন্যাদিগকে তোমার স্বজাতিতে মিলাইয়া লইতে চাও তাহাতেও সম্মত আছি। নতুবা তোমার পুত্রেরা আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করুক, আমি তাহাদিগকে স্বজাতিতে মিলাইয়া লইব। অগত্যা রাজা মদন দুইপুত্রের মায়া ত্যাগ করিলেন; তাহারা মুসলমান হইয়া শাহজাদীদ্বয়কে বিবাহ করিল। ঘটকদের পুস্তকে ২৯ জন একটাকিয়া ভাদুড়ীর মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইবার কথা জানা যায়। তজ্জন্য একটাকিয়ারা হিন্দুমুসলমানের কুলান বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। প্রথম যখন কন্দর্প ও কামদেব মুসলমান হইয়া শাহজাদীদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিল, তখন দেশব্যাপী অখ্যাতি এবং আন্দোলন হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ হওয়ায় তাহা অভ্যস্ত হইয়া গেল। তখন আর বেশী কিছু আন্দোলন ও আক্ষেপের কারণ হইত না। হিন্দু জ্ঞাতি কুটুম্বেরা প্রথম প্রথম তাঁহাদের সহিত কোনরূপ আত্মীয়তা করিত না; কিন্তু অভ্যস্ত হওয়ার পর পরস্পর আত্মীয়তা থাকিয়া যাইত এবং পরস্পর সাহায্যও করিত। জাতিভ্রষ্ট একটাকিয়ারা হিন্দু একটাকিয়ার উত্তরাধিকারী হইত না এবং চেষ্টাও করিত না।"—(সান্যালসংগৃহীত ইতিহাস)।

এই ভাদুড়ী বংশের রাজা গণেশনারায়ণ গৌড় অধিকার করিয়া বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতিরূপে রাজত্ব করেন। ইতিহাসে তিনি রাজা গণেশ নামে পরিচিত। তাঁহার সম্বন্ধে মীর ফর্জন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে রাজা গণেশ হত বাদশাহের বেগমদিগকে গোপনে নিকা করিয়াছিলেন। তিনি যখন গৌড়ে থাকিতেন, তখন প্রায় মুসলমানের ন্যায় চলিতেন। আবার যখন তিনি পাণ্ডুয়াতে থাকিতেন অতি নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার পালন করিতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই তাঁহাকে স্বজাতি জ্ঞান করিত। এই রাজা গণেশের পুত্র যদুনারায়ণ আজীম শাহের কন্যা আশমানতারাকে হিন্দুমতে বিবাহ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

"রাজা যদুনারায়ণ এই উদ্দেশ্যে নানাস্থান হইতে পণ্ডিত আনাইয়া কৌশলে তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন যে, 'যবনীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ব্রাহ্মণে তাহাকে বিবাহ করিতে পারে কি না?' পণ্ডিতেরা কহিলেন 'যবনীকে হিন্দুনী করা যায়, কিন্তু সে শূদ্রাণী হয়। ব্রাহ্মণের সহ তাহার বিবাহ লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অসিদ্ধ। দ্বাপরযুগে গর্গমুনি যবনীগর্ভে কালযবনকে উৎপাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৈধবিবাহ হয় নাই। ক্ষত্রিয় রাজারা ম্লেচ্ছযবনাদি রাজকন্যা সময়ে সময়ে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের তাদৃশ বিবাহ কোন শাস্ত্রে বা ব্যবহারে নাই। যদু সনাতনধর্ম্মে থাকিয়া আশমানতারাকে বিবাহ করিবার কোন পন্থা না পাইয়া নিজেই মুসলমান হইলেন এবং জেলালুদ্দীন নাম ধারণপূর্ব্বক আশমানতারাকে বিবাহ করিলেন।"—(সান্যালসংগৃহীত ইতিহাস)।

* দুর্গাচন্দ্র সান্যাল সংগৃহীত বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিতগণের ব্যবস্থার মর্ম্ম অনুসারে বলিতে হইবে যদি যদুনারায়ণ ব্রাহ্মণ না হইয়া অন্য কোনো জাতি হইতেন তবে তিনি হিন্দুমতে আশমানতারা বেগমকে শূদ্রাণী করিয়া বিবাহ করিতে পারিতেন এবং তাহা সিদ্ধ হইত। এই জেলালুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার হিন্দুপুত্র রাজা অনূপনারায়ণ তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

সকলেই জানেন কালাপাহাড় পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন। তিনি কিরূপ ঘটনাচক্রে মুসলমান হন তাহা হয়ত অনেকে জানেন না।

কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। তিনি জগদানন্দ রায়ের বংশজাত একটাকিয়া ভাদুড়ী। কালাচাঁদ অতিশয় বুদ্ধিমান্ মেধাবী বলবান্ দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় সুবিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত না জানিলেও বহুসংখ্যক সংস্কৃত শ্লোক তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি শস্ত্রচালনায় ও অশ্বারোহণে পটু ছিলেন; গৌড় বাদশাহ সলিমান কেরাণী তাঁহাকে গৌড় নগরের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। বাদশাহের কন্যা দুলারী পরমাসুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়স সতের বৎসর হইয়াছিল, সুপাত্র অভাবে তখনও বিবাহ হয় নাই। তিনি একদিন অট্টালিকার ছাদে দাসীগণ সহ বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কালাচাঁদ মহানন্দায় স্নান ও তর্পণ করিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে বাসায় যাইতেছিলেন। ছত্রধর তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিয়া যাইতেছিল। দুলারী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তাদৃশ সুন্দর পুরুষ তিনি আর কখনও দেখেন নাই। কুমারী অমনি বিমোহিতচিত্তে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। দাসীগণ কহিল, "এই ব্যক্তির কোন পরিচয় না জানিয়া ঈদৃশ প্রতিজ্ঞা করা অনুচিত।" দুলারী কহিলেন "পরিচয় আমি যাহা পাইলাম তাহাই যথেষ্ট, উহার গলার পৈতা দেখিয়া জানিলাম যে, নীচজাতীয় নহে। উহার ছাতাবরদার এবং হাতে সোনার কোষা দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে ধনী লোক। তাহার মন্ত্রপাঠ শুনিয়া আমি বুঝিলাম যে, সে মূর্খ লোক নহে। তাহার শরীর দেখিয়াই জানিলাম যে সে পরম সুন্দর বলবান্ নবযুবক। আর বেশী পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।" দাসীগণের নিকট হইতে বেগম এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া কন্যার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য বাদশাহকে অনুরোধ করিলেন। সলিমান কালাচাঁদকে গৌড়বাদশাহদিগের মেলবন্ধ কুলীন এবং সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কালাচাঁদ তাহা স্বীকার করিলেন না। লোভ ও ভয়প্রদর্শন বৃথা হইল দেখিয়া বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ শূলে দিতে আদেশ করিলেন। যখন জল্লাদেরা কালাচাঁদকে শূলে দিতে লইয়া চলিয়াছে এমন সময় দুলারী উন্মত্তার ন্যায় দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আমাকে হত্যা না করিয়া কেহ ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" জল্লাদেরা হতবুদ্ধি হইয়া বাদশাহকে সংবাদ দিল। এদিকে কালাচাঁদ বাদশাহজাদীর অদ্ভুত প্রেম, অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও নবযৌবন দৃষ্টে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। বাদশাহ কালাচাঁদকে সম্মত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই দিনই বিবাহ দিলেন। এই বিবাহ কি প্রণালীতে হইয়াছিল জানা যায় না; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে কালাচাঁদ তখনো মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। এই বিবাহহেতু কালাচাঁদ সমাজচ্যুত হইলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিলেন এবং তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইলেন। মাতার উপদেশ মত কালাচাঁদ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন তথাপি সমাজে একঘরিয়া হইয়া থাকিলেন। অবশেষে তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে যাইয়া ধন্না দিলেন। সপ্তাহকাল অনাহারে ধন্না দিয়াও যখন কোন প্রত্যাদেশ লাভ হইল না অধিকন্তু পাণ্ডারা তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়া শ্রীমন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল; তখন কালাচাঁদ ক্রোধে অধীর হইয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং হিন্দুধর্ম্ম একেবারে বিলোপ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। মুসলমান হইলে তাঁহার নাম হইয়াছিল মহম্মদ কর্ম্মুলি। তাঁহার অত্যাচার হেতু তাঁহাকে হিন্দুরা কালাপাহাড় বলিত এবং তাঁহার কালাপাহাড় নামই সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

ইতিহাস-লেখক নিঃসংশয়ে বলিতেছেন যে দুলারীকে বিবাহ করিবার সময় কালাচাঁদ মুসলমান হন নাই। বিবাহ কিরূপে হইয়াছিল জানিতে পারা যায় নাই। তখন বাঙ্গালাদেশে বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্রিক শাক্তমতই প্রবল ছিল। যদি হিন্দুমতে কালাচাঁদ বিবাহ করিয়া থাকেন তবে তাহা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বিধি অনুসারে নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। কেননা তিনি তাঁহার বৈষ্ণব মাতামহের শিক্ষায় বিষ্ণুর উপাসক হইলেও তাঁহার কুলধর্ম্ম ছিল শাক্ত।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দেখা যায় জাতিনির্ব্বিশেষে শৈব বিবাহের বিধি রহিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার "চারি প্রশ্নের উত্তর" পুস্তিকায় এই বিধির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :—

"যবনী কি আত্মজাতীয়া পরদার মাত্র গমনে সর্ব্বদা পাতক এবং সে দস্যুচণ্ডাল হইতেও অধম; কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈববিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় গণ্যা হয়। বৈদিক-বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবা মাত্রই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে এমত নহে। বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না, সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী, সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল শাস্ত্রকে এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন। *** স্মৃতির বচনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ব্রাহ্মণে চতুর্ব্বর্ণের কন্যা বিবাহ করিয়া ও সন্তান জন্মাইয়াও পাতকী হইতেন না। সেইরূপ সাক্ষাৎ মহেশ্বর-প্রোক্ত আগমপ্রমাণে সর্ব্বজাতি শক্তি শৈববিবাহ গ্রহণ করিলে পাতক হয় না। এসকল বিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ। যথা—

বয়োজাতিবিচারোত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বাহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ॥
—(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)।

শৈববিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নহে। কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্তৃকা না হয়; তাঁহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবে।"

তন্ত্র ধর্ম্মের গ্লানির সঙ্গে এই শৈববিবাহ এখন অপ্রচুর হইয়া পড়িয়াছে। এক সময় ইহার বিশেষ প্রাচুর্য্য ছিল। ইহাতে হিন্দুর পক্ষে সর্ব্ববর্ণের স্ত্রী এমন কি যবনী বিবাহ সম্ভব হইত। এখনো বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠী বদলের বিবাহে বর্ণের বিচার নাই। মহামতি রাণাডে ও সুধীপ্রবর তেলাঙ্গের মতে প্রথম বাজীরাও পেশোয়া নিজামকন্যা মস্তানীকে বিবাহ করেন এবং তিনি তাঁহার গর্ভজাত পুত্র ওসমান বাহাদুরের উপনয়ন সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তেলাঙ্গের বিবরণ পাঠে জানা যায় ওসমান বাহাদুর অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন না। নিজামের বর্ত্তমান মন্ত্রী মহারাজ কিষণপ্রসাদ যে তাঁহার কৌলিক রীতি অনুসারে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে বিবাহ করিয়াছেন এবং সেই পত্নীর গর্ভজাত কন্যাকে যে এক মুসলমান নবাবের সহিত বিবাহ দিয়াছেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। দেশের নানা স্থানে কোথাও আনন্দ বিবাহ কোথাও শান্তি বিবাহ কোথাও বা প্রথার ব্যপদেশে অল্পবিস্তর মিশ্রণ চলিয়াছে। কিন্তু এই সকলই অতি সংকীর্ণ পন্থা।

জাতিগঠন করিতে হইলে আমাদিগকে রক্তমিশ্রণের পথ সম্পূর্ণ বিধিসঙ্গত ও প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহার ফলে আমরা ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দের ৩ আইন প্রাপ্ত হইয়াছি; নানা প্রতিবাদসঙ্ঘাতে আইনটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই। উক্ত বিধি অনুসারে যাঁহারা বিবাহ করেন তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টীয়, ইহুদা, হিন্দু-মুসলমান পার্শী, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্ম্ম মানিনা বলিয়া লিখিয়া দিতে হয়। অনেকের নিকটই এরূপ না-না বলা বড়ই অপ্রীতিকর। অধিকন্তু একবর্ণের হিন্দু অপর বর্ণের হিন্দুকে বিবাহ করিতে গেলে তাহাকে ধর্ম্মবর্জ্জনের এক খত লিখিয়া দিতে হইবে ইহা অত্যন্ত অবিচার। শুধু তাহাই কেন, হিন্দুর অহিন্দুকে বিবাহ করিতে হইলেও তাহাকে তাহার ধর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করা কোন সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উচিত নহে। সরকার কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত। কিন্তু এস্থলে কার্য্যতঃ ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। হিন্দুধর্ম্ম কি এবং কি নয় এ বিচারে সরকার প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। ইহা শুধু শাস্ত্রনিবদ্ধ নহে। ইহার নিকট দেশাচার ও লোকাচারও বেদতুল্য। আচারের উৎপত্তি অতীতে হইয়াছে, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে হইবে না এমন কোন কথা নাই। অথচ সরকারের আইন তাহাতে বাধা দিতেছে। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে কিনা রাজপুরুষেরা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত বিশেষ বিবাহবিধির আপত্তিকর অংশের সংশোধনপ্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ব্যবস্থাসচিবদিগকে এবং রাজপুরুষদিগকে তাঁহাদের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ বিষয়ে ভাবিবার অবকাশ দিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষিত হিন্দুদিগের মধ্যে কাহারো কাহারো উপস্থিত প্রস্তাব বিষয়ে আপত্তি দেখিয়া বুঝিলাম হিন্দুর আত্মঘাতিনী প্রবৃত্তি এখনো বেশ প্রবল। নহিলে এই জাতিগঠনের দিনেও বর্জ্জনের চেষ্টা কেন? তুমি বর্ত্তমান আইনে বিবাহ করিয়া আমার পর হইয়া যাও তাহাতে আপত্তি নাই, আমার আপনার জন থাকিতে তোমায় দিব না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ঈশাহী বা মহম্মদীয় হইলে তাহার সঙ্গে সমব্যবহার করিতে যাহাদের প্রবৃত্তি হয় অথচ সে হিন্দু থাকিতে সদ্ব্যবহারে যাহাদের অরুচি তাহাদের পক্ষে এইরূপ আচরণই স্বাভাবিক। আপত্তির হেতু কি?—হিন্দু সমাজে বিপ্লব ঘটিবে। ঘটিবার ত সহস্র কারণ বিদ্যমান। বিবাহসিদ্ধির আইন বিদ্যমান। বৃটীশ ভারতে ধর্ম্মত্যাগে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না তাহা ত বহুকাল স্থির হইয়া গিয়াছে। তবে বিপ্লব আটকায় কিসে? শুধু যে-ব্যক্তি অসবর্ণ বা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ করিবে সে হিন্দু রহিবে না, ইহা বলিলেই বিপ্লব প্রশমিত হইয়া যাইবে, ইহা বলা অপেক্ষা অর্ব্বাচীনতা আর কি হইতে পারে? বিধবা বিবাহ আইন যেমন বলিতেছে না সকলকেই বিধবা বিবাহ দিতে হইবে অথবা এরূপ বিবাহিত ব্যক্তির সহিত আচরণ করিতে হইবে, এই বিশেষ বিবাহ বিধির সংশোধন প্রস্তাবও বলিতেছে না সকলকেই অসবর্ণ বিবাহ দিতে হইবে বা এবম্প্রকার বিবাহিতদিগের সহিত আচরণ করিতে হইবে। হিন্দু হইলেই যে আচরণীয় হইবে তাহা যখন নহে তখন আচরণীয় না হইয়া অসবর্ণ বা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহকারীর

হিন্দু থাকার বিরুদ্ধে অপরাপর হিন্দুর কি ন্যায়সঙ্গত আপত্তি হইতে পারে তাহাও বুঝিয়া উঠা যায় না। বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক অনেকে আপত্তি করিয়াছে ও করিবে। ইহাতে বিচলিত না হইয়া দেশের কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই আমাদের উদার সুসভ্য গবর্ণমেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে সরকার যেন সংখ্যাবহুল প্রবল অযথা-প্রতিবাদকারিগণের আন্দোলনে বিভ্রান্ত হইয়া প্রজার ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার পথকে কণ্টকিত করিয়া না রাখেন। তুমি হিন্দু খ্রীষ্টান কি মুসলমান কি অপর ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পার, এ বিষয়ে তোমার স্বাধীনতা আছে বলিলেই যথেষ্ট হইল না। তুমি বিভিন্নপ্রকারের হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান ইত্যাদি হইতে পার; ইহাদের যেমনটী এতকাল ছিল না তেমনটীও হইতে পার, তাহাতে বাধা নাই; যে যাহাই বলুক তুমি হিন্দু নহ মুসলমান নহ খ্রীষ্টান নহ এমন কথা বলিতে তোমায় বাধ্য করিব না; এরূপ সদাশয়তা আমরা সরকারের নিকট প্রত্যাশা করি।

আর স্বদেশবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা ঘর না ভাঙ্গিয়া গড়িতে চাহেন তাঁহারা প্রাণপণে ভূপেন্দ্র বাবুর পৃষ্ঠপোষক হইয়া প্রস্তাবটী যাহাতে গৃহীত হয় তদ্বিষয়ে বিধিমত চেষ্টা করুন। মিশ্রণের পথ প্রশস্ত না হইলে আমাদের জাতি গড়িবে না। বরং আমরা দিন দিন স্বস্বপ্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুযুৎসু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের সমূহ অকল্যাণ ও স্বজাতির ধ্বংস সাধন করিব। হিন্দু নামরূপ হারাইয়া মহা-পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে।

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম।

মাটি

হবে যদি খাঁটি,
মাটি সনে মাটি
হতে হবে জেন, গর্ব্ব রাখ কেন?
স্মরিও কথাটি,
মাটি তব বাটী।
এসেছিলে যবে,
পুরাতন ভবে,
দিয়েছিল মাটি, আপনারে বাঁটি,
অতুল গৌরবে,
সকল মানবে।

আজ (ও) তার স্নেহ,
গড়িছে এ দেহ;
ধন ধান্য প্রাণ মাটি করে দান
সে কথাটি কেহ,
ভুলে নাহি যেও।

খাঁটি হতে চাও,
মাটি হয়ে যাও,
মাটি সনে মিশে, গর্ব্ব মহা বিষে
পিষে ফেলে দাও,
সবে মিশে যাও।

শ্রীহেমলতা দেবী।

গ্রহ পর্য্যবেক্ষণ

১। বাল্যকাল হইতে আমরা নবগ্রহের কথা শুনিতে পাই। তন্মধ্যে রাহু ও কেতু বাস্তবিক কোন স্থূল পদার্থই নহে। চন্দ্রকক্ষা ও পৃথিবীকক্ষার পাতবিন্দুদ্বয় (Nodes); এজন্য ইহাদিগকে কখনও কখনও ছায়াগ্রহ বলা হইয়া থাকে। রবি (সূর্য্য) গ্রহ নহে, অসংখ্য স্থির নক্ষত্রের মধ্যে পৃথিবীর নিকটস্থ (নয়কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী) একটী নক্ষত্র (Fixed Star)। সোম (চন্দ্র) পৃথিবীর উপগ্রহ। অবশিষ্ট মঙ্গল (Mars), বুধ (Mercury), বৃহস্পতি (Jupiter), শুক্র (Venus) ও শনি (Saturn) এই পাঁচটাই প্রকৃত গ্রহ (Planet)। ইহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঠিক পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে। পৃথিবীর আপেক্ষিক গতি ও অবস্থান বশতঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ের কতক দিন পর্য্যন্ত ইহারা পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাই গ্রহগণের বক্রগতি

(Retrograde motion)। এই পাঁচটী গ্রহের গতি-বিধি লক্ষ্য করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। ইহারা সঞ্চরণশীল বলিয়া প্রায়শঃই এক একটী রাশিচক্রের এক এক অংশে অবস্থান করে; সুতরাং একসময়ে বা একরাত্রিতে সবগুলির দর্শনলাভ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। অনেককাল পরে সম্প্রতি এই সুযোগ উপস্থিত। আশা করি সর্ব্বসাধারণে এই সময় গ্রহ কয়েকটী চিনিয়া রাখিবেন এবং এখন হইতে তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

২। সম্প্রতি সন্ধ্যাকালেই মধ্যগগনের পূর্ব্বাংশে কৃত্তিকার (সাত ভাইয়ের, Pleades) সন্নিকটে রক্তোজ্জ্বল মঙ্গল গ্রহ ও তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে শনিগ্রহ অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মঙ্গল সরল গতিতে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতেছে। শনি এখনও বক্রী; পৌষ সংক্রান্তিতে বক্রগতি ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিকে সরিতে থাকিবে। অপর তিনটী গ্রহ ইহাদের বিপরীতদিকে বৃশ্চিক রাশিতে বিচরণ করিতেছে।

৩। বৃশ্চিক রাশিকে অনেকে চিনেন। নামের অনুরূপ এমন সুস্পষ্ট আকার অপর কোন তারকাপুঞ্জেরই নাই। পুষ্পমাল্যের ন্যায় অল্পোজ্জ্বল ছয়টী নক্ষত্র (বিশাখা, Akrab) ইহার মস্তক ও সম্মুখস্থ পদদ্বয়; সুন্দর লোহিত কান্তি অনুরাধা নক্ষত্র (Antares লইয়া সাতটী তারকার ঈষদ্বক্র রেখাতে ইহার মধ্য শরীর; এবং তন্নিম্নে অর্দ্ধ গোলাকার তিন চারিটী উজ্জ্বল নক্ষত্র (জ্যেষ্ঠা) লইয়া ইহার পুচ্ছদেশ।

৪। আগামী মাঘমাসের প্রথম সপ্তাহে প্রত্যুষে দক্ষিণ-পূর্ব্বগগনে দৃষ্টিপাত করিলেই সমুজ্জ্বল তারকাপুঞ্জে সুগঠিত বৃশ্চিক (কাঁকড়া-বিছা, Scorpion) সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। উহার মধ্য শরীরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ অনুরাধা নক্ষত্র কেমন শোভা পাইতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহার সন্নিকটেই উজ্জ্বল বৃহস্পতি (Jupiter)। তাহার কয়েক অংশ নিম্নেই সমুজ্জ্বল শুক্রগ্রহ (Venus) সুবৃহৎ বৃহস্পতিকেও হীনপ্রভ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ১৬° ডিগ্রী নিম্নে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে যে একটী জ্যোতিষ্ক চঞ্চল প্রভায় ঝিকমিক (twinkle) করিতেছে, ঐটীই আমাদের সুদুর্লভ বুধগ্রহ (Mercury)। অপর গ্রহগুলি স্থিরপ্রভ; কেবলমাত্র বুধগ্রহের প্রভাই স্থির নক্ষত্রের প্রভার ন্যায় চঞ্চল।

৫। বুধগ্রহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, এবং সূর্য্যের নিকটে ২৫° ডিগ্রী মধ্যে বিচরণ করে বলিয়া ইহা প্রায়ই আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় না। কখনও সূর্য্যোদয়ের ঠিক পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে, কখনও সূর্য্যাস্তের পরই পশ্চিমাকাশে, ১০।১৫ দিন মাত্র বুধকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; তৎপর বিপরীত গতিতে ক্রমশঃ সূর্য্যাভিমুখে সরিতে সরিতে অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং কয়েক দিন পরেই সূর্য্যের অপরদিকে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

৬। এইরূপে বক্রগতিতে পশ্চিমগগনে অদৃশ্য হইয়া গত ১১ই পৌষ বুধ পূর্ব্বআকাশে উদিত হইয়াছে, এবং ১৮ই পৌষ পর্য্যন্ত পশ্চিম দিকে সরিয়া সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়াছে। তৎপর বক্রগতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরল গতিতে এক ডিগ্রীর কম পরিমাণ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতেছে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর গতিবশতঃ সূর্য্যের পূর্ব্বাভিমুখ দৃশ্যমান গতি সম্প্রতি দৈনিক ১° ডিগ্রী অপেক্ষা কিছু অধিক। সুতরাং কয়েক দিন আমরা বুধকে ক্রমশঃ উপরে উঠিতে অর্থাৎ সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী হইতেই দেখিতেছি। পৌষ সংক্রান্তিতে বুধ-সূর্য্যের এই দূরত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে (২৪$\frac{১}{২}$° ডিগ্রী, Greatest elongation)। তৎপর বুধের গতি ক্রমশঃ দ্রুততর হইতে থাকিবে, এবং সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া কয়েকদিন মধ্যেই অদৃশ্য হইবে; পুনরায় ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহে সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে পরিদৃষ্ট হইবে।

৭। বৃহস্পতির দৈনিক সরলগতি সম্প্রতি $\frac{১}{৪}$° ডিগ্রী মাত্র। সুতরাং প্রতিদিনই তাহাকে সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী হইতে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে সরিতে দেখা যাইতেছে। পক্ষান্তরে শুক্রের গতি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। এই দ্রুতগতিতে শুক্র ২৭শে পৌষ বৃহস্পতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া দৈনিক কিছু কিছু সূর্য্যের দিকে অগ্রসর হইবে এবং বৃহস্পতি হইতে দূরবর্ত্তী হইতে থাকিবে।

৮। ১লা ও ২রা মাঘ উষাকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে কৃষ্ণা দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীর ক্ষীণ শশিকলার সহিত উল্লিখিত

গ্রহাদির সুন্দর সমাবেশ দেখিবেন; পক্ষান্তরে অমাবস্যা বা তাহার পর পর্য্যবেক্ষণ করিলে গাঢ় অন্ধকারে উক্ত জ্যোতিষ্ক সমূহ উজ্জ্বলতর দেখিতে পাইবেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র দে।

কষ্টিপাথর

ভারতী (পৌষ)—

পণরক্ষা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পণরক্ষা ছোট গল্প, রবিবাবুর লেখা, এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির সঙ্গে একত্র আসন পাইবার যোগ্য—ইহা বলিলে যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইল মনে করি। ছোট গল্পের রস, বিশেষ ভাবে এই গল্পের করুণতা, পল্লীচিত্র, মানবচিত্তের বৈচিত্র্য প্রভৃতি, সংক্ষিপ্তসার করিয়া বুঝাইবার নহে। গল্পটি চমৎকার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (পৌষ)—

বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তিবাদ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমাদের ধারণা যে, বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি জ্ঞানে, মন্দির কর্ম্মে, কিন্তু মন্দিরের মধ্যে কেহ নাই, সেখানে নির্ব্বাণের অন্ধকার, ভক্তি সেখান হইতে নির্ব্বাসিত, অর্থাৎ আমরা হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের ধর্ম্মকেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম মনে করি। কোনো বৃহৎ ধর্ম্মের আংশিক পরিচয়কেই আমরা সেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া বসিয়া আছি। ইহার প্রথম কারণ মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভারতবর্ষে নাই; দ্বিতীয় কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞান আমাদের পুঁথিগত; তৃতীয়তঃ বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে স্পষ্ট করিয়া ভক্তির কোনো চরম আশ্রয় নির্দ্দেশ করেন নাই; চতুর্থতঃ ইতিহাসের কোনো একটা বিশেষ স্থানে যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম্ম বলি, যাহা মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নব নব খাদ্যকে আত্মসাৎ করিয়া আপন জীবনকে পরিপুষ্ট প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম বলি না। বুদ্ধদেব কোনো চরম ভক্তি-আশ্রয়ের নির্দ্দেশ করেন নাই বলিয়া বুদ্ধের অনুবর্ত্তীদের ভক্তিবৃত্তি তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া ধরিয়া একজন মানুষকে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি করিয়া দেখিয়াছে এবং ভক্তির স্বাভাবিক চরম গতি যে পরমপুরুষে, বুদ্ধকে তাঁহার সঙ্গেই মিলাইয়া লইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে সত্য মানবরূপ গ্রহণ করিয়াছে, ভক্তি নরদেহ ধারণ করিয়াছে, প্রেমেতে এবং ভক্তিতে সত্যকে সম্মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য বিশ্বমানবের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন মানুষের প্রয়োজন হইয়াছে। এই বৌদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত খৃষ্টানধর্ম্ম; এবং বৌদ্ধধর্ম্মের এই অবতার-বাদ ও ভক্তিবাদের দিকটাই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরিণামরূপে বিরাজ করিতেছে। এমনি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গুরুবাদের উৎপত্তি। অবশ্য মানবকে এখানে যে ভাবে কল্পনা করা হয় তাহাতে তাহার মানবত্বই থাকে না, গুরুতে আরোপিত যে শক্তি তাহা মানবের শক্তি নহে। এবং এই গুরুবাদের পরিণতি হইয়াছে নামজপে; কারণ ভক্তির পাত্রের অবর্ত্তমানে তাঁহার নামই ভক্তের সম্বল। মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ে এবং বৈষ্ণবধর্ম্মে এই নাম-মাহাত্ম্যের প্রাধান্যের একশেষ হইয়াছে। অজ্ঞানে ভ্রমক্রমে নাম উচ্চারণ করিলেও মহাপাপী উদ্ধার পায় এই বিশ্বাস মানুষের পুণ্যচেষ্টাকে শিথিল করিয়া দিয়াছে। মানবপ্রকৃতির কোনো সত্যকে অবজ্ঞা করিয়া কোনো ধর্ম্ম বাঁচে না। জ্ঞানকে হতমান করিলে সে তাহার শোধ লয়, ভক্তিকে অপমান করিলে সে তাহা ক্ষমা করে না। এই কারণেই ভক্তি সাধু হোনেনকে আশ্রয় করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের তিনটি মুখ—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ। ধর্ম্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত। এই তিনের পরিপূর্ণ সম্মিলনই বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ। বৌদ্ধধর্ম্ম একদিকে যেমন ত্যাগের ধর্ম্ম, অন্যদিকে তেমনি প্রেমের ধর্ম্ম। বিশ্বব্যাপী প্রেমের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করাকেই বুদ্ধ ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে বুদ্ধ ব্রহ্মকে প্রেমস্বরূপ বলিয়াই জানিয়াছেন—ব্রহ্ম তাঁহার কাছে শূন্যতা নহে।

ঢাকা রিভিয়ু ও সম্মিলন (পৌষ)—

মহাকবি উমাপতি ধর ও কবিশ্রেষ্ঠ রাণক শূলপাণি—শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

বরেন্দ্রভূমির অনুসন্ধানে প্রাপ্ত শিলালিপিতে বাঙালী-কবি উমাপতি একস্থানে তক্ষণশিল্পী রাণক শূলপাণির পরিচয় দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে তৎকালে শিল্পীদিগের মর্যাদা ও সম্মান কিরূপ ছিল।

মেজর রেনেলের সমসাময়িক পূর্ব্ববঙ্গ শ্রীআনন্দনাথ রায়।

মেজর রেনেলের প্রাচীন মানচিত্র হইতে তদানীন্তন কালের স্থান-সংস্থান জানা যায়। এক্ষণে মেজরের একখানি ডায়েরি পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহার কন্যা লেডি রব সেখানি এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশিত করিয়াছেন। আনন্দ বাবু তাহার বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বাংলার ভূগোল ও ইতিহাসের প্রাচীন তত্ত্ব অনেক জানিতে পারা যাইবে।

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন—শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

এবারে যশদ (zinc) সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

আর্য্যাবর্ত্ত (পৌষ)—

রামায়ণ ও মহাভারত—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় দ্রোণাচার্য্যের বয়স ৮৫ বৎসর ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সমবয়স্ক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম জ্যোতিষ গণনায় পাওয়া যায় খৃঃ পূঃ ৩১৮৫ অব্দের ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে। খৃঃ পূঃ ৩১০১ সালে কলিযুগ আরম্ভ। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সঙ্গে কলির আবির্ভাব। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৪ বৎসর। ইহার ১২ বা ১৪ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারতের জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় উল্লেখ আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ ২৫০০ সালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। কিন্তু শশিবাবু ত্রিবেদী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস—শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

বৈদিক যুগে প্রথমে ব্রহ্মসংহিতা নামক গ্রন্থ রচিত হয়। তৎপরে দক্ষদীধিতি। ঋগ্বেদে হৃদ্রোগ, হরিমাণ রোগ, রাজযক্ষ্মা, ও শ্বেতিরোগের পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য্য ও দস্যুর বিরোধের সময়েই শল্যতন্ত্র

(Surgery) আবিষ্কৃত হয়। বৈদিক যুগের বৈদ্যগণ অশ্মরী (পাথুরী) কাটিয়া বাহির করিতেন; এক দেহের শিরা হইতে অন্য দেহের শিরায় রক্ত চালনা করিতে পারিতেন; অকর্ম্মণ্য ভগ্নপদ কাটিয়া ফেলিয়া রোগীকে লৌহময়ী জঙ্ঘা পরাইয়া দিতেন; কাহারও চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলে সেই বিনষ্ট চক্ষু উৎপাটিত করিতেন; মাথার খর্পর খুলিয়া মস্তিষ্কপীড়ার নিদান স্থির করিতেন; জরাজীর্ণ শরীরে নবযৌবনের শক্তি আনিয়া দিতেন। বৈদিক যুগের বৈদ্যগণ শরীরতত্ত্বে (Physiology) কৃতবিদ্য ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে কায়চিকিৎসকের আবির্ভাব হয়। বৈদিক যুগে ১১০০ ঔষধ ও ভ্রূণতত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিল। স্বাস্থ্যতত্ত্বও অপরিজ্ঞাত ছিল না। মূঢ় গর্ভে প্রসূতির কুক্ষি ভেদ করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে সন্তান আহরণ করা হইত। সর্ব্বসমেত ১৫৩ খানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

বরভিক্ষা

(নোগুচি)

চিত্তহারিণী জাপানী বালিকা
ওহারু তাহার নাম,
বুকে তার চেরী ফুলের স্তবক
রক্তিম অভিরাম!
জানু পাতি' বালা পতিবর মাগে
প্রজাপতি-মন্দিরে;
থরে থরে ফুটে চন্দ্রমল্লি
ওহারুর তনু ঘিরে।

কহিছে ওহারু করযোড়ে "প্রভু!
দাও মোরে হেন বর,
উৎসুক যার উষ্ণ নিশাসে
নিবে আসে চরাচর;—
নিশ্বাসে যার নেশা হয় ক্ষণে
ক্ষণেকে দৃষ্টি হরে!"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরী ফুল থরে থরে।

"দাও, প্রজাপতি! দাও মোরে পতি
দাও মোরে হেন বর,—
গোপন সানুর মর্ম্মর সম
যার কণ্ঠের স্বর;—
যেই সানু দেশে চুপে চুপে পশে
বাসন্তী চাঁদ একা।"
ওহারুর বুকে চারু চেরীফুল
চন্দ্রমল্লি লেখা!

"হেন পতি দাও, কটাক্ষ যার
পাগল করিবে প্রাণ,—
আফিম ফুলের রক্তিম বীথি
মৃদু বায়ে আন্‌চান্।
ভালবাসা যার কানন উদার
পাখী-ডাকা, ছায়া-ঢাকা।"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
মুখে চেরীফুল আঁকা।

"দাও হেন বর সাগরের মত
গম্ভীর যার বাণী,
আন্‌-ভুবনের অজানা সুরভি
পরাণে মিলাবে আনি';
কল্প-আঙুলে ফুটাবে যে মোর
সকল পাপ্‌ড়িগুলি!"
ওহারুর প্রাণে চন্দ্রমল্লি
চেরীফুল ওঠে দুলি'।

"দাও হেন স্বামী যে আমার পানে
চাহিবে সহজ সুখে,—
যে চোখে শ্যামল প্রান্তর চায়
উষার অরুণ মুখে;
চুম্বনে যার তরুণী ওহারু
নারী হবে রাতারাতি!"
ওহারুর চোখে চন্দ্রমল্লি,
চুলে চেরীফুলপাতি।

"দাও হেন বর হাসে ভাষে যার
প্রাণে সান্ত্বনা আসে,—
কাব্য-ভুবনে জোছনার মত
রহিবে যে পাশে পাশে;

স্নেহ হ'বে যার মধুর-উদার
নিদাঘের শ্যাম ছায়া।"
চন্দ্রমল্লি ওহারুর প্রাণে
চেরী-চারু তার কায়া।

"দাও হেন পতি যাহার মুরতি
হৃদে অহরহ রয়,
জনমের আগে সাথী যে ছিল গো
মরণে যে পর নয়;
জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে
হারায়ে ফেলেছি যায়।"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরীফুল মুরছায়।

"দাও সে যুবকে আছে যার বুকে
অঙ্কিত মোর নাম,
যদিও বলিতে পারিনে এখন
কবে তাহা লিখিলাম!
কোন্ সে জনমে কোন্ সে ভুবনে
কোন্ বিস্মৃত যুগে!"
চেরীফুল সনে চন্দ্রমল্লি
জাগে ওহারুর বুকে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পুস্তক-পরিচয়

অধ্যাত্মবিজ্ঞান অর্থাৎ পরলোকবাসীর সহিত ইহলোকবাসীর আলাপ পরিচয় বিষয়ক প্রবন্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ৮১; মূল্য ৷৵০।

গ্রন্থকার পুস্তিকার মলাটে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন:—"এই পুস্তক অধিকাংশ কোন পরলোকবাসী আমাকে মিডিয়ম করিয়া, আমার জবানী লিখিয়াছেন। অল্প অংশ আমার লিখিত। যে মহাত্মা এইরূপ আমার জবানী লিখিয়াছেন, তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি নিজে গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার বন্ধুদের নামে প্রকাশ করিতেন। এক্ষণে সাধারণের সম্মুখে আমি ইহা উপস্থিত করিলাম। সত্যান্বেষী পাঠক ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব।"

এই পুস্তক কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকানে এবং ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে পাওয়া যায়।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

গোধূলি—

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী, বসিরহাট। ডবল ফুলস্ক্যাপ্ ১৬অংশিত ১৬৮ পৃষ্ঠা। মূল্য বারো আনা। ১৩১৮। কবি বলিয়া গ্রন্থকারের খ্যাতি আছে। এ গ্রন্থ তাঁহার পরিণত রচনা; সুতরাং সে হিসাবে ইহার নাম অন্বর্থ হইয়াছে; এই গ্রন্থের কবিতাগুলিও শান্তোজ্জ্বল, আনন্দগম্ভীর এবং কবিত্ব ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ; সুতরাং এদিক দিয়াও ইহার নাম ব্যর্থ হয় নাই। গ্রন্থের কবিতাগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) চিন্ময়ী। এই বিভাগের কবিতা তিনটিতে "আদ্যাশক্তিরূপিণী প্রকৃতি মানবী মূর্ত্তিতে কবির চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়-রাজ্যে বিশ্বরূপ বিস্তার করিতেছেন…"। (২) সিন্ধুসংবাদ। ইহাতে সিন্ধুর আকুল আহ্বানে কবির আত্মার অবিচল আত্মরতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। (৩) ঋতুমঙ্গল। ইহা কালিদাসের ঋতুসংহার ও মেঘদূতের আংশিক অনুবাদ। (৪) ঐকতান। কীট্‌স, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতির কবিতার ভাবাবলম্বনে রচিত কবিতা চতুষ্টয়। (৫) অরণ্য। ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি; প্রায় সবগুলিই তত্ত্ব সম্বন্ধীয়।

কবি কবিত্বের সঙ্গে তত্ত্ব গাঁথিতে গিয়া নিজের কবিত্বের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সকল স্থানে সেইজন্য কবিত্ব অব্যাহত গতিতে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে নাই, তত্ত্বকথার ভারে আড়ষ্ট হইয়াছে, এবং যেখানে কবিত্ব সে ভার ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে সেখানে তত্ত্ব আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। যেন—"জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে।" কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবির বীণা বড় মধুর বাজিয়াছে—ছন্দে, ভাবে, লালিত্যে কবিতাগুলি মনোরম হইয়াছে। ছাপা কাগজ ভালো।

জাতীয় মঙ্গল —

শ্রীমহম্মদ মোজাম্মেল হক প্রণীত সামাজিক কাব্য। প্রকাশক নুর লাইব্রেরী, ১২ রয়েড ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ফুলস্ক্যাপ্ ১৬অং, ৮৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা। ১৩১৮। এই কাব্যখানির অল্পদিনেই দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। এই কাব্যখানির কয়েকটি বিশেষত্ব তাহার কারণ বলিয়া মনে হয়—(১) মুসলমান বাঙালী কবির খাঁটি বাংলার কবিতা। (২) রচনার লালিত্য, কবিত্ব ও ওজস্বিতা। (৩) দেশ ও স্বজাতি (হিন্দু মুসলমান বাঙালী)-প্রীতি। (৪) বিদ্বেষশূন্য স্পষ্টবাদিতা। (৫) বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাপ্রবণতা। বাঙালী ও স্বজাতি বলিতে কবি হিন্দু মুসলমান উভয়কেই বুঝিয়াছেন, স্বদেশ বলিতে বাংলা দেশকেই বুঝিয়াছেন, এবং অপক্ষপাতে নিন্দাপ্রশংসা ও সমাজহিতের কথা বলিতে পারিয়াছেন—ইহাই কবির কবিহৃদয়ের পরিচায়ক। কবিকে আমরা অভিনন্দন করিয়া বঙ্গসাহিত্য সমাজে আমন্ত্রণ করিতেছি—তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে আশা করি।

জ্যোতি—

শ্রীজীবনবালা দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসতীশ চন্দ্র দত্ত। ১৪৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা। ৫০১২ কল্যব্দ। কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলি অধিকাংশই তত্ত্ব, ভক্তি ও আন্তরিকতায় পূর্ণ। কবিত্ব হইতেও একেবারে বঞ্চিত নয়। ভাষা সরস, ছন্দের উপরও অধিকার আছে।

নূতন সাজি—

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষাল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ডিমাই ১২ অং ৮২ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ আনা। ১৯১১ খৃঃ। কবিতাপুস্তক। নানা বিষয়ের খণ্ড কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলিতে সরসতা আছে। তবে কাঁচা হাতের লেখা বলিয়া কবিত্ব সুপরিস্ফুট নহে এবং কোনো নিজস্ব বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না।

নারী—

শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত দৃশ্যকাব্য। প্রকাশক নির্দ্দিষ্ট নাই। ডঃ ক্রাঃ ১৬অং ৫৪ পৃষ্ঠা, পাইকা অক্ষরে ছাপা। মূল্য আট আনা, অত্যন্ত বেশী। ১৩৫৭। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রাজপুত ইতিহাসের উপাখ্যান অবলম্বনে নাট্যের আকারে, নারীচরিত্রের বিভিন্ন দিক প্রদর্শন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এবং সে জন্য বিভিন্ন চরিত্রের কয়েকটি পাত্রীর অবতারণা করা হইয়াছে। তাহাদের চরিত্র শুধু বর্ণনায় প্রকাশ করা হইয়াছে, নাট্যের ঘটনাপ্রবাহের মধ্য হইতে আপনিই ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। রচনাও নিতান্ত সাধারণ, কবিত্ব বা নাট্যকৌশল-বর্জ্জিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের পূর্ব্বরচিত কাব্যের আমরা প্রশংসা করিয়াছিলাম, পরবর্ত্তী রচনায় পরিপক্কতা ও পরিণতি আশা করিয়া আমরা হতাশ ও দুঃখিত হইয়াছি। ইহার রচনা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কৃষ্ণপান্তি—

শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকালীনাথ সিংহ, ১৩ নিকাশীপাড়া লেন। ডবল ফুলস্ক্যাপ্ ১৬অং ২০৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ১৲ টাকা। ১৩১৮। কৃষ্ণপান্তি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া এই জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সেই স্বনাম-প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীর বরপুত্রের সত্যনিষ্ঠা, পরোপকার, প্রতিজ্ঞারক্ষা, আশ্রিত-বাৎসল্য, সরল অমায়িকতা, ব্যবসায়বুদ্ধি, ধর্ম্মভয় প্রভৃতি চরিত্রের বহু উজ্জ্বল দিক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু রচনাপদ্ধতির দোষে বইখানি অপাঠ্য হইয়াছে। মাঝে মাঝে নভেলি ধরণে প্রাদেশিক ভাষার নকল করিতে গিয়া যে অপভাষার আবর্জ্জনা পুস্তকের পাতায় পাতায় ছড়ানো হইয়াছে তাহার সংস্পর্শে যাইতে মন স্বভাবতঃ কেমন অশুচি বোধ করে, বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিতে চায়। যেখানে লেখক লিখিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও বিশুদ্ধ হয় নাই। ছাপাও ত বিশুদ্ধ নহেই।

কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ—

শ্রীসূর্য্যকুমার ঘোষাল সম্পাদিত। ডবল ক্রাউন ১৬অং ২৫১ পৃষ্ঠা। সচিত্র। মূল্য পাঁচ সিকা। ১৩১৮। সুপ্রথিতনামা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের ও কর্ম্মের পরিচয় এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা ঠিক জীবন-চরিত নহে। ইহা পাঠ করিলে সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মময় বিচিত্র জীবন-কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়।

ইসলাম-কাহিনী—

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক এস, কে, লাহিড়ী। ডবল ক্রাউন ১৬অং ২৬৯ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা। ১৯১১। ইসলাম ধর্ম্ম আমাদের অতি নিকট আত্মীয় প্রতিবাসীদিগের ধর্ম্ম। ইহার সহিত পরিচয় স্থাপন না করিলে আমাদের প্রতিবেশীদিগের মত, আচার, ব্যবহার, সামাজিক রীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বুঝিতে ক্লেশ ত পাইতে হয়ই, মাঝে মাঝে ভুল করিয়া পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাবেরও সূত্রপাত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। ইসলাম ধর্ম্ম আমাদের প্রতিবেশীর ধর্ম্ম হইলেও ইহা বিদেশী ধর্ম্ম—ইহার উদ্ভব বিদেশে, প্রচারক বিদেশী, শাস্ত্রগ্রন্থ বিদেশী ভাষায়; সুতরাং ইহা সকলের নিকট সহজবোধ্য নহে। যাঁহারা এই ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ও ইতিহাসের সহিত আমাদের পরিচয় সাধন করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। এই পরিচয়ে মোসলেম প্রতিবেশীর সহিত সদ্ভাবের পথ যেমন একদিকে উন্মুক্ত ও সরল হইতেছে, অপর দিকে তেমনি আমরা এই একটি মহাধর্ম্মের পরিচয় লাভ করিয়া বিশ্বজনীন সত্য মানবধর্ম্মের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছি। সমালোচ্য পুস্তকে হজরত মোহম্মদ কর্ত্তৃক ইসলাম প্রবর্ত্তন হইতে খলিফাগণ কর্ত্তৃক ইসলামের প্রচার ও সংরক্ষণের একটি সমগ্র ধারাবাহিক ইতিহাস ২৩ খানি বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য লইয়া সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তক বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—

শ্রীবিনোদবিহারী রায় প্রণীত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬অং ২১৪ পৃষ্ঠা মূল্য ১॥০ টাকা। ১৩১৮। "অমুক সময় হইতে তৎপূর্ব্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না" এই সাধারণ বিশ্বাস খণ্ডন করিবার ইচ্ছায় লেখক ১৪ বৎসর কঠোর পরিশ্রম সহকারে ভূতত্ত্ব, বেদ, জ্যোতিষ, পুরাণ, অবস্তা, বাইবেল, কোরান, প্রভৃতি আলোচনা করিয়া পৃথিবীর প্রাগ্-ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই খণ্ডে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। জ্যোতিষের সাহায্যে কাল-নির্ণয় ও প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য সাধন করিবার চেষ্টা পত্রে পত্রে বিদ্যমান। কিন্তু সে সকলের যাথার্থ্য মীমাংসা বা যাচাই করিবার মতো বিদ্যা বুদ্ধি আমাদের নাই, সুতরাং সে ভার বিশেষজ্ঞের উপর দিয়া আমরা কেবলমাত্র এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় দিলাম। এই গ্রন্থের মতে পৃথিবীর বয়স ৫৬৪৩৭ বৎসর।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও বৈশ্যজাতি—

শ্রীসত্যরঞ্জন রায় প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। ১৩১৮। সাহা উপাধিধারী জাতি শৌণ্ডিক হইতে স্বতন্ত্র এবং তাঁহারা বৈশ্যশ্রেণীর অন্তর্গত—ইহা শাস্ত্র ও ব্যবহারিক প্রমাণ দ্বারা এবং পণ্ডিতদিগের অভিমত দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। এই সাহা জাতি হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া আছেন, অথচ ইঁহারা আচার, বিদ্যা, অর্থ, ধর্ম্ম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠত্ব পরিজ্ঞাপক কোনো বিষয়েই হীন নন। সুতরাং হিন্দু সমাজের উচিত এই উন্নতিপরায়ণ ও উন্নতিকামী জাতিকে সমাদর করিয়া যথাস্থান প্রদান করা এবং সাহা জাতির উচিত জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে বিদ্যায় আচারে অনুষ্ঠানে উন্নত হইয়া আপনাদের মর্য্যাদা সমাজের নিকট আদায় করিয়া লওয়া। লেখকের এই সকল উক্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

ষোড়শী—:

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটার্য্যি কোম্পানি। মূল্য ১॥০ টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রভাত বাবুর গল্প সর্ব্বজনসমাদৃত; সুতরাং তাহার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। এই ষোড়শীর ষোলটি গল্প লেখকের গল্প-রচনা শক্তির মধ্যাহ্ন কালের রচনা; সুতরাং এগুলি তাঁহার অ-সাধারণ শক্তির বিশেষত্ব সমূহে যে অলঙ্কৃত তাহাও বলা বাহুল্য। এ গল্পগুলি হাস্য ও করুণ উভয় রসের সমাবেশে পরম উপভোগ্য হইয়াছে। ভাষা সহজ, বাঞ্জনা যথাযথ, আখ্যান ঘরোয়া; সুতরাং ইহা সকল শ্রেণীর পাঠকের প্রীতিপ্রদ। অতিসূক্ষ্ম বিচারে রচনা-রীতিতে যে সব ছোট খাটো ত্রুটি লক্ষিত হয় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে; তবে সে ত্রুটিটুকুও না থাকিলে নিখুঁত হইত। কিন্তু জগতে নিখুঁত কিছুই নাই। গুণের প্রাধান্যই অমিশ্র প্রশংসা লাভের যোগ্য।

শৈব্যা—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা। সচিত্র। মূল্য ছয় আনা। ১৩১৮। দাতা হরিশ্চন্দ্রের সাধ্বী

রাণী শৈব্যার পুণ্য-কাহিনী বিশুদ্ধ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনায় এক একটি চিত্র কবিত্বের সহিত বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। চরিত্রগুলিও বর্ণনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। অনেকগুলি ছবি আছে, একখানি রঙিন। ছবিগুলি যেমন অন্যান্য বাংলা বইয়ে থাকিতেছে তেমনি।

রত্নাঞ্জলি—

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত ও প্রকাশিত। ডিমাই ১২ অং ৯৩ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। ১৩১৮। গল্পের বই—দুটি গল্প মাত্র, হরিভক্তি এবং সাধনা ও সিদ্ধি। প্রথম গল্পটিতে বৈষ্ণবমতে হরির সাধনার এবং দ্বিতীয়টিতে শাক্তমতে শক্তির উপাসনার মাহাত্ম্য গল্পচ্ছলে বিবৃত হইয়াছে। লেখক হরিভক্তির বাহ্যিক উত্তেজনার এবং শক্তি উপাসনার সদ্গুরু লাভের খুব প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গল্প হিসাবে ধরিতে গেলে বইখানিতে বিশেষত্ব বা প্রশংসাযোগ্য কিছু নাই, তত্ত্বব্যাখ্যা হিসাবে ধরিলেও ইহা তথৈবচ।

ডাকঘর—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। খুব ভালো এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা, ৫৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা। ১৩১৮। এখানি নাটকাকারে লিখিত। উপাখ্যানটি মোটামুটি এই—নিঃসন্তান মাধবদত্ত তাহার শ্যালকপুত্র অমল গুপ্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহারপ্রতি অতিরিক্ত স্নেহের বশে সর্ব্বদাই হারাই হারাই মনে করে; তাহার মনে হয় বুঝিবা অমল অসুস্থ। অতিশাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ তাহাকে আরো ভীত করিয়া তুলিয়াছে। অমলের শিশুসুলভ চঞ্চলতা, বাধাবন্ধহীন মুক্তির জন্য ব্যগ্রতা কবিরাজের নিকট নিদারুণ রোগের নিদান বলিয়া শাস্ত্রবচনে সমর্থিত হইয়া গেছে। এজন্য অমলকে একটি রাস্তার ধারের ঘরে শয্যায় আটক করিয়া রাখা হইয়াছে; সে অসুস্থ এই কথা অনবরত শুনিয়া তাহারও মনে ধারণা জন্মিয়াছে সে অসুস্থ। কিন্তু সে যখন খোলা জানালা দিয়া পথে জীবনের আনন্দের স্বাস্থ্যের মুক্তির অবিরল প্রবাহ দেখিতে থাকে, যখন বাধাবন্ধহীন সদানন্দ ঠাকুর্দার সুস্থ সংস্পর্শ সে লাভ করে, তখনই সে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। পথিক কত লোকের সহিত তাহার পরিচয় হইতেছে—দইওয়ালা, রাখালছেলে, প্রহরী, মালিনীর মেয়ে সুধা, গাঁয়ের মোড়ল, আরো কত কে। সকলে তাহাকে বহিঃসংসারের সংবাদ দিয়া প্রীতি দিয়া সান্ত্বনা দিয়া তাহাকে আশা দিয়া যাইতেছে সে ভালো হইলে বাহির হইবে। সুধা অতিরিক্ত স্নেহভরে তাহার একমাত্র খোলা জানালাটিও বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত। কেবল মোড়ল তাহাকে সুনজরে দেখে নাই। অমল খবর পাইয়াছে তাহার জানালার সম্মুখেই রাজার ডাকঘর বসিয়াছে, ডাকহরকরা ঘরে ঘরে রাজার চিঠি বিলি করিয়া বেড়ায়। অমল একখানি এতটুকু রাজার চিঠি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া মোড়লের শরণাপন্ন হইল। মোড়ল এই নির্ব্বোধ বালকের দুরাশাকে উপহাস করিবার জন্য যখন একখানা সাদা কাগজ দিয়া বলিল এই রাজার চিঠি, সেই মুহূর্ত্তে রাজার দূত দ্বার ভাঙিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে রাজা নিজে আসিতেছেন এবং অমলের চিকিৎসার জন্য তিনি রাজকবিরাজকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। রাজার আগমনের সংবাদে সমস্ত মিথ্যা প্রবঞ্চনা দূর হইয়া গেল—মোড়ল অমলের বন্ধু হইয়া গেল, শাস্ত্রবাগীশ কবিরাজের আর দর্শন মিলিল না। রাজ-আগমনের সম্ভাবনার আনন্দে ভগ্ন দ্বার ও মুক্ত জানালার পথে ধ্রুবতারার আলো দেখিতে দেখিতে অমল শিশু ঘুমাইয়া পড়িল। সে জাগিবে যখন রাজা আসিয়া তাহাকে ডাকিবেন। সুধা তাহার জন্য ফুল আনিয়াছিল, সে ফুল রাখিয়া বলিয়া গেল যে অমল জাগিলে যেন তাহাকে এই একটি কথা কানে কানে বলা হয় যে সুধা তাহাকে ভুলে নাই।

ইহাকে রূপক বলিয়া একটা ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি। অমল মানবাত্মা। তাহার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ তাহার বন্ধনটাই আমরা তাহার হিতকর বলিয়া মনে করি; মাঝে মাঝে আমরা মুক্তির আভাস পাই কিন্তু সাংসারিকতা আমাদিগকে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভোগ করিবার অবকাশ দিতে চাহে না; সে বরং সুধার মতো এক মাত্র খোলা জানালাটি বন্ধ করিয়া দিতে চায়। কিন্তু খেলার ছলে রাজার চিঠি চাহিতে চাহিতে একদিন রাজার দূত রাজ কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইয়া রাজার অপেক্ষায় ঘুম পাড়াইয়া দেয়, কিন্তু তখনো ইহজগৎ হইতে আমাদের স্মৃতি একেবারে মুছিয়া যায় না, সুধা আমাদিগকে ইহজগতেও অমৃত করিয়া রাখে।

নাটকখানির আগাগোড়া মুক্তির জন্য একটি করুণ ব্যাকুলতা পাঠকের মনকে মাধুর্য্যে রসসিক্ত করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য তাগাদা করিতে থাকে। ঘুমের পর রাজার ডাকে জাগা ব্যাপারটি খৃষ্টানী resurrectionএর মতন বোধ হয়। গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে।

পুরীর চিঠি—

শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স। সচিত্র। মূল্য ১৲ টাকা। চিঠিগুলি বালককে উদ্দেশ করিয়া লেখা। তাই মধ্যে মধ্যে মধ্যম পুরুষে সম্বোধন অন্যথা-সুন্দর রচনায় একটু খুঁত করিয়াছে। এইরূপ পদগুলি ছাপিবার সময় বদলাইয়া দিলে ভালো হইত। এতৎসত্ত্বেও বইখানি বয়স্কদিগেরও প্রীতিকর হইবে। লেখকের পর্য্যবেক্ষণশক্তি বেশ প্রখর ও সূক্ষ্ম এবং বর্ণনায় প্রকাশ করিবার শক্তি আরো সুন্দর। রচনার মধ্যে একটি মৃদু হাস্যরস ও ভগবদ্ভক্তি সমস্ত বর্ণনাটি বিশেষ ভাবে উপভোগ্য করিয়াছে। বর্ণনার মধ্যে এক এক স্থানে এক একটি ছবি এমন ফুটিয়াছে যেন প্রত্যক্ষবৎ মনে হয়। সেই সমস্ত লেখার ছবি গ্রন্থকারের স্বহস্ত অঙ্কিত রেখার ছবিতে সমর্থিত হইয়াছে। সাধারণতঃ যেরূপ ছবি বাংলা বইয়ে থাকে এছবিগুলি তাহা হইতে স্বতন্ত্র, শ্রেষ্ঠ, বিশেষত্বপূর্ণ। জগন্নাথমন্দিরের নক্সা, উড়িয়া প্রাচীরচিত্রের বা মঠদেউলের নমুনা, নুনিয়া পল্লী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দুএকখানি ছবি না দিলেই ভালো হইত। কয়েকখানি ফটোগ্রাফ ও একখানি রঙিন ছবিও আছে। রচনারীতির মধ্যে এমন কয়েকটি সামান্য ত্রুটি আছে যাহা গ্রন্থকার যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী তাহা বলিয়া দেয়—এ ত্রুটি সহজেই সংশোধিত হইতে পারিত।

সতীর পতিভক্তি—

মরহুমা খায়রণ-নেছা খাতুন প্রণীত। প্রকাশক মোহাম্মদ মেহের উল্লা, মুন্সিবাড়া পোষ্ট, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। ডিমাই ১২ অং ৫৬ পৃষ্ঠা। মূল্য চার আনা ১৩১৮। সতীর পতিভক্তি বিষয়ক গদ্যপদ্যময় সন্দর্ভ পুস্তক। আরব ইতিহাসের বহু সাধ্বী রমণীর চরিত্রকথার দ্বারা উদাহৃত। বাংলায় অব্যবহৃত দুচারটি পারসী আরবী শব্দ প্রয়োগ ভিন্ন রচনা বিশুদ্ধ এবং লেখিকার আন্তরিকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। লেখিকা স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি গ্রন্থাবসানে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে কয়েকটি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সকল রমণীর অনুধাবনযোগ্য। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

অবকাশ—

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত। প্রকাশক সাহিত্য সম্মিলনী, কাঁঠালপাড়া। মূল্য আট আনা। ১৩১৮। সন্দর্ভ পুস্তক। ইহাতে

তত্ত্বমসি, পরমাণু, সুখ, পরমাত্মা, প্রতিমাপূজা, মৈত্রেয়ীর আত্মশ্রবণ, আত্রেয়ীর দীক্ষা, মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী নামক কয়েকটি সন্দর্ভে বিবিধ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। রচনার বিষয় গুরু, কিন্তু রচনার ভঙ্গিটি সমীচীন বোধ হইল না, মীমাংসাও সুষ্ঠ হয় নাই।

সাত ভাই চম্পা—

প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। মূল্য চার আনা। পাইকা অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা। সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোনটির চির পুরাতন অথচ নিত্য নূতন শিশুপ্রিয় গল্পটি বেশ একটি নূতন ধরণে নাটক আকারে গ্রথিত হইয়াছে। রচনা-পারিপাট্যে ও ঘটনা সমাবেশে আগাগোড়া, গল্প জানা থাকা সত্ত্বেও, একটি কৌতূহল জাগ্রত থাকে। শিশুদের পক্ষে শিক্ষা ও আনন্দের সমাবেশ একত্র হইয়াছে—কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর ভিতর দিয়া বস্তু-পরিচয় ভূগোল-পরিচয় প্রভৃতি হইতে নীতি ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব পর্য্যন্ত অনেক শিখিবার কথা আছে, কিন্তু সে সমস্তই আনন্দের আবরণে ঢাকা। শিশুদের অভিনয়ের অতি উপযুক্ত হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে দেশী চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির তিনখানি ছবি আছে; ছবিগুলির অঙ্কন বেশ তেজালো এবং ভাবব্যঞ্জক; কিন্তু দুখানিতে শারীরতত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যবোধ দৃষ্টিকটুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রচনার মধ্যেও দুটি ত্রুটি আছে—একটি, একই ভাবের কথার স্থানে স্থানে পুনরুক্তি, ইহা শ্রোতা ও পাঠকের নিকট ক্লেশকর। দ্বিতীয়, অনভ্যস্ত হাতে পদ্য রচনার প্রয়াস। এই দুটি ত্রুটি সহজেই পরিহার করিতে পারা যাইত। যাহাই হোক শিশুমহলে ইহার যথেষ্টই আদর হইবে।

মুদ্রা-রাক্ষস।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও মহিষী মেরীর ভারতবর্ষে আগমন-উপলক্ষে রচিত অনেক পুস্তক পুস্তিকা ও অভিনন্দন পত্র সমালোচনার জন্য আমরা পাইয়াছি। তাহার সকলগুলির সমালোচনা বা উল্লেখের স্থান আমাদের নাই, বলিয়া আমরা দুঃখের সহিত বিরত রহিলাম।

প্রবাসী-সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ

এবার কংগ্রেসে প্রতিনিধি এবং শ্রোতা উভয়েরই সংখ্যা খুব কম হইয়াছিল। কেন এরূপ হইল, তাহা চিন্তার বিষয়। হাল্‌-ফ্যাশানের কংগ্রেসের নেতারা স্বদেশপ্রেমিক নহেন, এ কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু কংগ্রেস্ যখন দেশের জন্য, এবং সেই দেশবাসী লোকেরা যখন আর কংগ্রেস্ সম্বন্ধে পূর্ব্ববৎ উৎসাহশীল নহে, তখন আপনাদের জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য বা অন্য কোন কারণে নেতারা কেন চিরাগত প্রথাই অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন জানি না। কংগ্রেস এমন কোন কাজ করুন, এমন কোন কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করুন, যাহাতে ইহা দেশের লোকের প্রাণের জিনিষ হইতে পারে। কিন্তু হয়ত আমরা বাঙ্গালা কাগজে বাঙ্গালা ভাষায় ও অক্ষরে এই সব কথা বৃথাই লিখিতেছি। নেতারা বাঙ্গালা জিনিষ পড়েন কিনা তাই সন্দেহ।

এবার সমাজসংস্কার সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী। যে দিন সমিতি বসিবে তাহার পূর্ব্বদিন তাঁহাকে রাজী করা হয়। বিবাহমণ্ডপে বর নাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাহাকেও ধরিয়া আনিয়া কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া কখনও কখনও ঘটিয়া থাকে। ইহাও তদ্বিধ ব্যাপার। যাহা হউক ইহাতে চৌধুরী মহাশয়ের কোনই ত্রুটি নাই; বরং তিনি এত অল্প সময় থাকিতে এরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার লওয়ায় তাঁহার অমায়িকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তারা যে অসাধারণ রকমের উদ্যোগী, তাহা নিশ্চয়ই জাজ্বল্যমানরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতার সকল অংশ শুনিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিতে পারি নাই। তিনি বালবিধবার বিবাহ সম্বন্ধে যেরূপ লঘুহৃদয়ে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ঐ দুঃখভাগিনীদের দুর্দ্দশার জন্য যে ক্লেশ অনুভব করেন, তাহা মনে হয় নাই।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বিবাহ আইনসঙ্গত করিবার জন্য যে বিল ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে লোকে বড় ভুল করিতেছেন। এই আইন কাহাকেও ইহার বিধি অনুসারে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতেছে না; তাহা করিবার স্বাধীনতা দিতেছে মাত্র। তা ছাড়া অনেকে একেবারে চরম ফলটা ধরিয়া লইতেছেন; মনে করিতেছেন যে এই আইনটা পাশ হইবামাত্র হাজার হাজার হিন্দু হাজার হাজার মুসলমানের সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখনও ত মুসলমান এবং খৃষ্টানের পরস্পরের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু সেরূপ বিবাহ কতগুলি হইতেছে? অতি অল্প। তদ্ভিন্ন, ভূপেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও, হাইদরাবাদে হিন্দু মুসলমান-নারীকে বিবাহ করিতেছে; ইহা শিক্ষিত লোকদের জানা উচিত যে হাইদরাবাদের প্রধান মন্ত্রী মহারাজা কিষেণ-প্রসাদ এইরূপ বিবাহ করিয়াছেন, এবং ইহা তাঁহাদের কৌলিক প্রথা।

যাহা হউক এই বিল সম্বন্ধে আলোচনার সময়

লাহোরের শ্রীযুক্ত রামভজ দত্তচৌধুরী মহাশয়ের বিরোধিতায় অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন; তাহার কোন কারণ নাই, এবং সভাস্থলে কোন প্রস্তাবের বিপক্ষতা করিবার সকলেরই অধিকার আছে। চৌধুরী মহাশয়ের ভাষা, উচ্চারণ এবং অঙ্গভঙ্গী বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার যুক্তিগুলি সারবান্ হইয়াছিল, একথা বলিতে পারিলে সুখী হইতাম।

কংগ্রেস মণ্ডপে "শুদ্ধি" সভারও অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য "নীচ" জাতিদিগকে এবং খৃষ্টীয় বা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুবংশজাত লোকদিগকে "শুদ্ধ" করিয়া লইয়া আবার হিন্দু বা "আর্য্য" করা। "শুদ্ধি" নামটাই দাম্ভিকতা-পূর্ণ। হিন্দু "শুদ্ধ", আর সবাই অশুদ্ধ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি "দ্বিজ"গণ শুদ্ধ, অপরাপর হিন্দুরা অশুদ্ধ, ইহা ভয়ানক অহঙ্কারের কথা। ইহার চেয়ে মিথ্যা কথা আর নাই। এইরূপ অহঙ্কার ও মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হিন্দু জাতির অধঃপতনের একটি কারণ। অপরের প্রতি এই অবজ্ঞার পরোক্ষ শাস্তি স্বরূপ হিন্দু দক্ষিণ আফ্রিকায়, কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, সর্ব্বত্র ঘৃণিত ও উৎপীড়িত হইতেছে। "গাঁয়ে মানেনা, আপনি মড়ল"। আমরা এখনও বৃথা অভিমান লইয়া মত্ত রহিলাম, নিজের ওজন, নিজের অপদার্থতা বুঝিলাম না, ইহা ঘোরতর পরিতাপের বিষয়।

বলা বাহুল্য, যে কেহ হিন্দু হইতে চান, যে কেহ দ্বিজ বা আর্য্য হইতে চান, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। সমাজের সকল শ্রেণী, সকল স্তর, সকলের জন্য উন্মুক্ত হওয়া ও থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা মিথ্যা দম্ভের প্রশ্রয় দিতে পারি না। যে অহিন্দু হইয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনর্ব্বার হিন্দু করিবার জন্য যদি কোন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহাকে দীক্ষা বা পুনর্দীক্ষা বলুন; "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুকে "উচ্চ" শ্রেণীতে লইবার জন্য ক্রিয়ার দরকার হইলে তাহাকে উপনয়ন বা আর কিছু বলুন। মানুষ মানুষকে শুদ্ধ করিতে পারে না। কেবল পতিতপাবন ভগবান্ পারেন। যে ব্যক্তি কোনও মানুষকে অশুদ্ধ মনে করে, ধর্ম্ম ও সাত্ত্বিকতার সহিত এখনও তাহার পরিচয় হইতে অনেক বিলম্ব আছে।

শ্রীযুক্ত প্রমদাকুমার বিশ্বাস।

চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমদাকুমার বিশ্বাস ছয় বৎসর পূর্ব্বে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষাসমিতির বৃত্তি লইয়া জাপান গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে টোহোকু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজে ভর্ত্তি হন। কিছুদিন হইল সম্মানের সহিত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের "নাগাকুবি" উপাধি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

মালদহ জেলা হইতে এবৎসর চারি জন ছাত্র আমেরিকার উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে (Wisconsin State University) অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে খাঁটী মালদহবাসীর এই প্রথম বিদেশ যাত্রা। জেলার শিল্প ও সামাজিক উন্নতির পক্ষে ইহাতে সহায়তা হইবে আশা করা যায়। চিত্রের বামদিক হইতে ইঁহাদিগের নাম ও শিক্ষার বিষয় প্রদত্ত হইতেছে—

১। শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—রসায়ন।
২। শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র—ঔষধ প্রস্তুতকরণ।
৩। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস—কৃষি।
৪। শ্রীবাণেশ্বর দাস—ইঞ্জিনিয়ারিং।

মালদহজেলার আমেরিকা-প্রবাসী চারিজন ছাত্র।

ইঁহারা কলিকাতা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয়ে বিদ্যাদান করিতেছিলেন। মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী ঘোষ, বি, এল, পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠ, বি, এল, এবং স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয়গণের উদ্যোগে এবং কলিকাতা সোসাইটি ফর দি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এডুকেশন অফ্ দি ইণ্ডিয়ানস্ এর তত্ত্বাবধানে ইঁহাদের বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিচ্ছিন্নবঙ্গ একীভূত হইবে, বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর লইয়া স্বতন্ত্র একটি প্রদেশ গঠিত হইবে, দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত হইয়া দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি সাক্ষাৎভাবে বড়লাট কর্ত্তৃক শাসিত হইবে, ইত্যাদি পরিবর্ত্তন হওয়ায় অনেক প্রদেশের বর্ত্তমান সীমার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। তাহা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য গতমাসেই বলিয়াছি। বঙ্গব্যবচ্ছেদে ব্যথিত হইয়া আমরা চাহিয়াছিলাম এই যে সমুদয় বাঙ্গলাভাষী জেলাগুলি এক শাসনের অধীন হউক। হইতে পারে যে ভাষা ছাড়া অন্য সাদৃশ্যের জন্যও কোন কোন স্থান এক শাসনাধীন হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা ত আমাদের দাবী ছিল না। এখন আমাদের মূল দাবী বা প্রার্থনা বহুপরিমাণে মঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া, জাতিগত সাম্য, ইতিহাসের নজীর, পূজা অর্চ্চনার ঐক্য, আচারব্যবহার খাদ্যাদির ঐক্য, ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া, কোনও জেলা বাঙ্গলাভাষী না হইলেও তাহাকে বঙ্গদেশের সামিল করিবার চেষ্টাকে আমরা সম্পূর্ণ ন্যায় বিগর্হিত মনে করি। হইতে পারে যে ভাগলপুর জেলার-ভাষা হিন্দী নয়, কিন্তু উহা ত বাঙ্গলাও নয়। তবে নানারকম বাজে কারণ দেখাইয়া উহাকে বঙ্গের সামিল করিবার চেষ্টা কেন করা হইতেছে? বাজে অর্থাৎ আমাদের মুল প্রার্থনার সহিত সম্পর্কবিহীন।

এখন দেখা যাক্ যে বাঙ্গলাভাষী স্থান বলিলে কি বুঝিতে হইবে। যেখানে দু চার জন লোক বাঙ্গলা বলে, তাহাই বাঙ্গলাভাষী স্থান হইতে পারে না। তাহার অধিকাংশ অধিবাসীর ভাষা বাঙ্গলা হওয়া চাই। তদ্ভিন্ন ঐ স্থানটি স্বাভাবিক-বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী বা রাজনৈতিক-

বঙ্গের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী হওয়া চাই। কাশীর বা বৃন্দাবনের অধিকাংশ লোক বঙ্গভাষী হইলেও আমরা উহাকে বঙ্গের সামিল করিতে চাহিতাম না, চাওয়া উচিত হইত না। সকলে সেন্সস রিপোর্ট খুলি লই দেখিতে পাইবেন যে পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলার মহানন্দার পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ, সাঁওতাল পরগণার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশ, সিংহভূম জেলার ধলভূম পরগণা, মানভূম জেলার অধিকাংশ, সেরাইকেলা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ, হাজারীবাঘ জেলার কিয়দংশ, বালেশ্বর জেলার উত্তরাংশ, এবং শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা; এই সকল স্থানের অধিকাংশ অধিবাসী বঙ্গভাষী। এই সমস্ত স্থানই স্বাভাবিক-বঙ্গের অন্তঃপাতী অথবা রাজনৈতিক-বঙ্গের সীমার অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী। সক্রিগলি মুসলমান রাজত্বকালে বঙ্গের দ্বার বলিয়া পরিচিত ছিল। রাজমহল বরাবর বঙ্গেরই অন্তর্গত। এই সমুদয় স্থানই রাজনৈতিক-বঙ্গের অন্তর্ভূত হওয়া উচিত।

এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে কোন স্থানের "অধিকাংশ" লোক বাঙ্গলা বলিলে উহাকে বঙ্গের অংশ না বলিয়া, কোন স্থানের সমুদয় লোক বাঙ্গলা বলিলে তবেই উহাকে বঙ্গের সামিল বলা উচিত। ইহা অঙ্গের দাবী। কারণ, যে যায়গাগুলি নিশ্চয়ই বঙ্গের মধ্যে, তাহাদের অধিবাসীদিগের মধ্যে বঙ্গভাষীর অনুপাত দেখুন। কলিকাতায় বঙ্গভাষী হাজারে ৫১৩ জন; জেলার মধ্যে বর্দ্ধমানে হাজারে ৯১৯, বীরভূমে ৯১৪, বাঁকুড়ায় ৯০৬, মেদিনীপুরে ৮০৪, হুগলীতে ৯৪৪, হাবড়ায় ৮৮৩, ২৪ পরগণায় ৯১৫, নদিয়ায় ৯৯১, মুরশিদাবাদে ৯১৭, যশোরে ৯৯৭, রাজশাহী ৯৭৭, ইত্যাদি।

সম্রাট পঞ্চমজর্জ ও তাঁহার মহিষী ভারতবর্ষে আসিয়া দেখিয়া গেলেন যে ভারতবর্ষের লোক কত অল্পে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ; তাহাদিগকে কোন রাজনৈতিক অধিকার দিতে হইল না, রাজধানী স্থানান্তরিত ও কয়েকটি প্রদেশের সীমা পরিবর্ত্তিত করিয়া কেবল সহৃদয় ব্যবহার করায় ও মিষ্ট সরল কথা বলায় তাহাদের হৃদয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় উছলিয়া পড়িল। এমন সরল আশুতোষ লোকেরা যদি কখনও বিদ্রোহের বা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিয়া থাকে, যদি দেশে অশান্তি হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাহা "রাজ"-বিদ্রোহ নহে, তাহা রাজার কোন কোন ভৃত্যের ব্যবহারের, অন্যায় কার্য্যের দোষে হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই সম্রাট্ বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাতে কিছু সুফল হইতে পারে।

সম্রাট্ বলিয়াছেন, ভারতশাসনে অধিকতর, উদারতর সহানুভূতির প্রয়োজন। তাঁহার স্বজাতীয় মন্ত্রী ও ভৃত্যগণের উপর ভারতশাসনের ভার অর্পিত আছে। রাজভক্তি ও প্রভুভক্তির অনুরোধে সম্রাটের এই কথা অনুসারে তাঁহাদের কার্য্য করা উচিত।

সম্রাট্ তাঁহার ভারতীয় প্রজাদিগকে এই আশা দিয়াছেন যে দেশময় কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হইবে; তাহাতে জ্ঞানের আলোকে ভারতবাসীর গৃহ উজ্জ্বল হইবে, শ্রম মিষ্ট বোধ হইবে, এবং উচ্চ চিন্তা, আরাম ও স্বাস্থ্যের আবির্ভাব হইবে। শুনা যায় যে ভারতের সমুদয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত গোখলের প্রাথমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। এখন আমরা কি এরূপ আশা করিতে পারি যে রাজার ভৃত্যদের মত ও কার্য্য রাজার ইচ্ছা ও আশার সহিত কোন না কোন প্রকারে সমঞ্জসীভূত হইবে? ভারতবাসীকে নিজ আচরণের দৃষ্টান্ত দ্বারা রাজভক্তি শিখাইবার এমন সুযোগ রাজার স্বজাতীয় রাজভৃত্যেরা আর পাইবেন না। আমাদের ভারতবর্ষীয় এক শ্রেণীর লোক, যেমন অনেক রাজা, মহারাজা ও জমীদার, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর লোকদের চেয়ে আপনাদিগকে অধিক রাজভক্ত বলিয়া থাকেন। এখন আশা করি তাঁহারা সম্রাটের ইচ্ছা অনুসারে শিক্ষা-বিস্তারের প্রতিকূলতা না করিয়া সহায়তা করিবেন। তাহা না করিলে তাঁহারা কোন্ মুখে রাজভক্তির অহঙ্কার করিবেন?

সম্রাট এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতীয় স্কুল কলেজ সমূহ হইতে রাজভক্ত ও পৌরুষবিশিষ্ট ("loyal & manly") শিক্ষিত লোক কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবে। শিক্ষিত লোকেরা যে রাজদ্রোহী নয় তাহা সম্রাট্ ত স্বয়ং দেখিয়া গেলেন। অতএব আশা করিতে পারি কি, যে, পৌরুষের বাহ্যচিহ্ন মাত্রই আর পুলিশের প্রাণে সন্দেহ ও আতঙ্কের সঞ্চার করিবে না? পৌরুষবিশিষ্ট-লোকদের পশ্চাতে পুলিশের গুপ্তচর লাগিয়া থাকিবে না?

বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার অভিনন্দন-পত্রের এবং বোম্বাইয়ের বিদায়সূচক অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে সম্রাট্ যে দুটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করেন, ও এই আশা প্রকাশ করেন যে যেন সকল জাতির ও সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে সহানুভূতি, ভ্রাতৃভাব ও ঐক্যের সহিত ব্যবহার করে, এবং ঐরূপে সমগ্র ভারতবাসীর কুশল সাধনের চেষ্টা করে।

ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় বলেন যে তাঁহারা হিন্দুর চেয়ে অধিক রাজভক্ত, অনেকে এমনও বলেন যে কেবল তাঁহারাই রাজভক্ত। অতএব আশা করি সম্রাটের এই কথাগুলিতে অন্য সকলের চেয়ে তাঁহারা অধিকতর মনোযোগী হইবেন। সম্রাটের স্বজাতীয় কর্ম্মচারীরা তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ। মুসলমান বা হিন্দুর চেয়ে তাঁহারা রাজভক্তিতে নিম্নস্থানীয় বলিয়া প্রমাণিত হন, ইহা কখনই তাঁহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব আশা করি তাঁহারাও কখন আর এরূপ কার্য্য করিবেন না যাহাতে জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ উপস্থিত হয়। একথা বলিতেছি এইজন্য যে বঙ্গবিভাগ রহিত হওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বর্ত্তমান বড়লাট স্বীকার করিয়াছেন যে লর্ড কার্জ্জনকৃত বঙ্গব্যবচ্ছেদের ফলে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতবাসীদিগের প্রতিও আমাদের একটি নিবেদন আছে। তাঁহারা জানেন স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহাতে তিনি তাঁহার ভারতবাসী প্রজাদিগকে আইনের চক্ষে অন্য সকল প্রজার সমান এবং পৌর ও জানপদবর্গের নানা অধিকার বিষয়ে অন্য সমুদয় প্রজার সঙ্গে সমাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। ইংরেজ মন্ত্রী ও রাজপুরুষগণ তাঁহার অঙ্গীকার কোন কোন বিষয়ে পালন করিতে অল্প পরিমাণে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে ঐ ঘোষণাপত্র অনুসারে কাজ হইতে এখনও বিলম্ব আছে; এবং আমরা যত অলস হইব, বিলম্ব তত অধিক হইবে। তদ্রূপ, বর্ত্তমান সম্রাট্‌ও আমাদিগকে যে সকল আশার কথা বলিয়াছেন, তৎ সমুদয়ও ফলবতী হওয়া আমাদের চেষ্টাসাপেক্ষ। তিনি আশা দিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না।

বিলাতের লোকেরাও রাজভক্ত। সম্রাট্ কোথাও ভ্রমণে বা বায়ুসেবনে বাহির হইলে তাহারাও তাঁহার জয়জয়কার করে। কিন্তু তা বলিয়া তাঁহার মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীরা কোন অনিষ্টকর বা অন্যায় আইন বা কার্য্য করিলে তাহারা ঘোরতর প্রতিবাদ এবং আন্দোলন করিতে বিরত হয় না। তাহাতে রাজদ্রোহিতা হয় না। আমরা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজায় সমুদয় উচ্চ অধিকার পাইতে চাই, যদি এবিষয়ে ব্রিটনের সমান হইতে চাই, তাহা হইলে রাজমন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারীদিগের আইন ও কার্য্যের সমালোচনাদিতেও আমাদিগকে ব্রিটনের সমকক্ষ হইতে হইবে। রাজা আমাদের সম্মুখে উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শ ধরিবার মালিক। কিন্তু সেই আদর্শ অনুসারে কাজ ইংরাজ যেমন মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারীদের নিকট হইতে আদায় করে, আমাদিগকেও তেমনি অনলসভাবে উদ্যোগিতার সহিত আদায় করিতে হইবে। নতুবা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র এবং বর্ত্তমান সম্রাটের আশার বাণী সত্ত্বেও আমরা চিরকালই যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিব। সম্পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন, উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন, ভাবুক লোকে দেখুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কাজের লোকেরা কিন্তু হাতের সম্মুখের কাজটাও, সচেষ্ট ভাবে করিতে থাকেন। সম্রাটের আগমনে ভারতের প্রতি, "পর দীপমালা নগরে নগরে নগরে", এই বিধি হইয়াছিল। দীপমালা জ্বলিয়াও ছিল। অন্তরের তিমির দূর করিবার জন্য অতিরিক্ত বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা লোকশিক্ষার নিমিত্ত মঞ্জুর হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে তিমিরে আছি (এবং এই তিমির কেবল নিরক্ষরতার তিমির নহে) যদি সেই তিমিরেই না থাকিতে চাই, তাহা হইলে রাজপুরুষদিগকে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক টাকা খরচ করাইতে হইবে, আমাদিগকেও ততোধিক টাকা ব্যয় করিতে হইবে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক হইবে আমাদের স্বদেশপ্রীতি, স্বার্থত্যাগ ও উদ্যোগিতা। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ, আমরা এই শিক্ষা না পাইয়া থাকিলে, জগতের অগ্রসর জাতিরা চিরকাল ভারতকে বলিবে, "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

চীনের রাষ্ট্রবিপ্লবের শেষ ফল এখনও জানা যায় নাই। মধ্যে, সম্রাটের দল ও সাধারণতন্ত্রের দলের মধ্যে, শাসন-প্রণালী কিরূপ হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য আলোচনার নিমিত্ত, কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ ছিল। এই যুদ্ধ স্থগিত থাকার কাল শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চূড়ান্ত মীমাংসা কিছুই হয় নাই। সাধারণতন্ত্রের দলের নেতা ডাক্তার সন্-য়াট্-সেন্ সম্রাটের দলের নেতা য়ুয়ন-শিহ্-কাইকে সাধারণতন্ত্রের সভাপতির পদ দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। য়ুয়ন তাহা গ্রহণ করেন নাই। এদিকে বিদেশীরা পেকিনের রেলওয়ে দখল করিয়া বসিতেছেন। তাহা না হয় তাঁহারা নিজ নিজ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছু দিনের নিমিত্ত করিলেন। কিন্তু রুশিয়া এখন সুযোগ বুঝিয়া দিনে ডাকাতি করিবার উপক্রম করিতেছে। রুশিয়ার মত এই যে মোঙ্গোলিয়ার প্রধান সহর উর্গায় যে লামা (বৌদ্ধপুরোহিত) রাজা হইয়াছে তাহার অধীনে মোঙ্গোলিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে চীন দেশ বাধ্য; চীন আর মোঙ্গোলিয়ায় সৈন্য বা উপনিবেশ রাখিতে পারিবে না; রুশিয়া শান্তি ও

ডাক্তার সন্‌-ইয়াট্‌-সেন।

য়ুয়ন্‌-শিহ্‌ কাই।

শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মোঙ্গালিয়ার সাহায্য করিবে, এবং কিয়াটকা হইতে উর্গা পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিবে; ইত্যাদি। রুশিয়া বলিতেছে যে মোঙ্গালিয়া দখল করিবার তাহার কোন ইচ্ছা নাই। তবে কিনা মোঙ্গোলিয়া নিজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহার সাহায্য চাহিয়াছে, এই জন্যই তাহার যত মাথাব্যথা! এ সকল ভণ্ডামির অর্থ এশিয়াবাসী সকলেই বুঝে।

পারস্যের বড়ই দুরবস্থা। গ্রেট্‌ব্রিটেন্‌ ও রুশিয়া এই দুই শক্তিশালী অভিভাবকের হস্তে পড়িয়া বেচারা বুঝি বা আর সাবালক হইতে পাইল না; এখন তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইবে!

শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সিংহ।

কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সিংহ শিল্পবিজ্ঞান-সমিতির বৃত্তি লইয়া কৃষি শিক্ষার্থ আমেরিকা গিয়াছিলেন। তিনি তথাকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস, উপাধি লাভ করিয়া, কিছুদিন হইল দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শুনা যায় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে কানাডার ওণ্টারিও কৃষি কলেজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষিকলেজ। শ্রীমান্‌ সত্যশরণ ঐ কলেজের পরীক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কচ ও দেবযানী।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে ও

অধিকারী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনুমতিক্রমে।

olour blocks by C. Ray & Sons.

Kuntaline Press, Calcu

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১১শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩১৮

৫ম সংখ্যা

জীবনস্মৃতি

সাহিত্যের সঙ্গী।

হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসার পর স্বাধীনতার মাত্রা কেবলি বাড়িয়া চলিল। চাকরদের শাসন গেল, ইস্কুলের বন্ধন নানা চেষ্টায় ছেদন করিলাম, বাড়িতেও শিক্ষকদিগকে আমল দিলাম না। আমাদের পূর্ব্বশিক্ষক জ্ঞান বাবু আমাকে কিছু কুমারসম্ভব, কিছু আর দুই একটা জিনিষ এলোমেলো ভাবে পড়াইয়া ওকালতি করিতে গেলেন। তাঁহার পর শিক্ষক আসিলেন ব্রজ বাবু। তিনি আমাকে প্রথম দিন গোল্ড্স্মিথের ভিকর্ অফ্ ওয়েক্ফীল্ড্ হইতে বাংলা তর্জ্জমা করিতে দিলেন। সেটা আমার মন্দ লাগিল না। তাহার পরে শিক্ষার আয়োজন আরো অনেকটা ব্যাপক দেখিয়া তাঁহার পক্ষে আমি সম্পূর্ণ দুরধিগম্য হইয়া উঠিলাম।

বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার, না আর কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে—সেই বাষ্পভরা বুদ্বুদরাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা অলস কল্পনার আবর্ত্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওটা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাহা কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যে টুকু, সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।

সাহিত্যে বৌঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চায় আমি অংশী ছিলাম।

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভাল লাগিত। বিশেষত আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম তাই ইহার সৌন্দর্য্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অনুকরণের অতীত ছিল। কখনো মনেও হয় নাই এই রকমের কিছু একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্র, মূর্ত্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য্য নহে,

রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড় জিনিষকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি ত সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।

এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সারদামঙ্গল সঙ্গীত আর্য্যদর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৌ-ঠাকুরাণী এই কাব্যের মাধুর্য্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজে হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসন দিয়াছিলেন।

এই সূত্রে কবির সঙ্গে আমারও বেশ একটু পরিচয় হইয়া গেল। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দিনে দুপরে যখন তখন তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত,—তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল- তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনি তাঁহার কাছে গিয়াছি সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি। তাঁহার তেতলার নিভৃত ছোট ঘরটিতে পঙ্খের কাজ করা মেজের উপর উপুড় হইয়া গুন্‌গুন্ আবৃত্তি করিতে করিতে মধ্যাহ্নে তিনি কবিতা লিখিতেছেন এমন অবস্থায় অনেক-দিন তাঁহার ঘরে গিয়াছি -আমি বালক হইলেও এমন একটি উদার হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া লইতেন যে, মনে লেশমাত্র সঙ্কোচ থাকিত না। তাহার পরে ভাবে ভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার খুব বেশি সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না—যে সুরটা গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। গম্ভীর গদ্গদ কণ্ঠে চোখ বুজিয়া গান গাহিতেন, সুরে যাহা পৌঁছিত না, ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন। তাঁহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে—"বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে" "কেরে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহর।" তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো কখনো শুনাইতে যাইতাম।

কালিদাস ও বাল্মীকির কবিত্বে তিনি মুগ্ধ ছিলেন।

মনে আছে একদিন তিনি আমার কাছে কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোকটি খুব গলা ছাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া বলিয়া-ছিলেন, ইহাতে পরে পরে যে এতগুলি দীর্ঘ আ স্বরের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা আকস্মিক নহে—হিমালয়ের উদার মহিমাকে এই আ স্বরের দ্বারা বিস্ফারিত করিয়া দেখাইবার জন্যই "দেবতাত্মা" হইতে আরম্ভ করিয়া "নগাধিরাজ" পর্য্যন্ত কবি এতগুলি আকারের সমাবেশ করিয়াছেন।

বিহারী বাবুর মত কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন ঐ পর্য্যন্ত দৌড়িত। হয় ত কোনোদিন বা মনে করিয়া বসিতে পারিতাম যে, তাঁহার মতই কাব্য লিখিতেছি--কিন্তু এই গর্ব্ব উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারী কবির ভক্ত পাঠিকাটি। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে একথাটি স্মরণ করাইয়া রাখিতেন যে "মন্দঃ কবি-যশঃপ্রার্থী" আমি "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।" আমার অহ-ঙ্কারকে প্রশ্রয় দিলে তাহাকে দমন করা দুরূহ হইবে এ কথা তিনি নিশ্চয় বুঝিতেন—তাই কেবল কবিতা সম্বন্ধে নহে আমার গানের কণ্ঠ সম্বন্ধেও তিনি আমাকে কোনো মতে প্রশংসা করিতে চাহিতেন না, আর দুই একজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেন তাহাদের গলা কেমন মিষ্ট। আমারো মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে আমার গলায় যথোচিত মিষ্টতা নাই। কবিত্বশক্তি সম্বন্ধেও আমার মনটা যথেষ্ট দমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু আত্মসম্মান লাভের পক্ষে আমার এই একটি মাত্র ক্ষেত্র অবশিষ্ট ছিল, কাজেই কাহারো কথায় আশা ছাড়িয়া দেওয়া চলে না—তা ছাড়া ভিতরে ভারি একটা দুরন্ত তাগিদ ছিল তাহাকে থামাইয়া রাখা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

রচনাপ্রকাশ।

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্ত্তৃপক্ষেরা সংগ্র

করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্ব্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে সুরু করিয়াছিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোন্‌দিন তাহাদের তলব পড়িবে, এবং কোন্ উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্মৃত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।

প্রথম যে গদ্য প্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থসমালোচনা। তাহার একটু ইতিহাস আছে।

তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইখানি ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। "সাধারণী" কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেব বাবু এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।

তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন—তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে "ভুবনমোহিনী" সই-করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। "ভুবনমোহিনী" কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং "ভুবনমোহিনী" ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা, বইটা ভক্তি-উপহার রূপে পাঠাইয়া দিতেন।

এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভাল লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রী জাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল। কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না, তাঁহার প্রতিমাপূজা চলিতে লাগিল।

আমি তখন "ভুবনমোহিনীপ্রতিভা" "দুঃখসঙ্গিনী" ও "অবসরসরোজিনী" বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।

খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কি, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কি, তাহা অপূর্ব্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্ব্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার জো নাই, লেখকটা কেমন, তাহার বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় কত। আমার বন্ধু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিলেন একজন বি, এ, তোমার এই লেখার জবাব লিখিতেছেন! বি, এ, শুনিয়া আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বি, এ,! শিশুকালে সত্য যেদিন বারান্দা হইতে পুলিসম্যানকে ডাকিয়াছিল সে দিন আমার যে দশা, আজও আমার সেইরূপ। আমি চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম খণ্ডকাব্য গীতি-কাব্য সম্বন্ধে আমি যে কীর্ত্তিস্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলিয়াছি বড় বড় কোটেশনের নির্ম্মম আঘাতে তাহা সমস্ত ধূলিসাৎ হইয়াছে এবং পাঠকসমাজে আমার মুখ দেখাইবার পথ একেবারে বন্ধ। "কুক্ষণে জনম তোর রে সমালোচনা!" উদ্বেগে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু বি, এ, সমালোচক বাল্যকালের পুলিসম্যানটির মতই দেখা দিলেন না।

ভানুসিংহের কবিতা।

অল্পবয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলে তাহার গৌরব কবিও ভুলিতে পারে না এবং তাহার চারিদিকের লোকও ভুলিতে দেয় না। এইরূপ অবস্থায় অক্ষয় বাবুর মুখে বালক-কবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিলাম। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোল বছর বয়সে এই হতভাগ্য কবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ঐ আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

একদিন মেঘলাদিনের মধ্যাহ্নে বাড়ির ভিতরের এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম "গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে।" লিখিয়া ভারি খুসি হইলাম—তখনি এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম, বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল "বেশত, এ ত বেশ হইয়াছে।"

পূর্ব্বলিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম—

সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি। এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম এ লেখা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ, এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "নিতান্ত মন্দ হয় নাই।"

ভানুসিংহ যিনিই হৌন্ তাঁহার লেখা যদি বর্ত্তমান-আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয় ঠকিতাম না একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্ত্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা—তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কসিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতী টুং টাং মাত্র।

স্বাদেশিকতা।

বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেই অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত-লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনি ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত "মিলে সবে ভারত সন্তান" রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্পব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কর্জ্জনের সময় দিল্লীদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গবর্মেণ্ট রুশিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এই জন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। টাইমস্ পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্ত্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া ব্রিটিস রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড় বয়সে তিনি একদিন একথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। আমার মত অর্ব্বাচীনও তাহার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি ক্ষ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সঙ্কোচ আমাদের কিছুই ছিল

না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিষটা কোথাও বা সুবিধাকর, কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। এবং সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে অবস্থাতেই মানুষ থাকনা, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া ত নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া, সেই ধাক্কাটা সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয় তাহার সকল প্রকার রাস্তা মারিয়া তাহার সকল প্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরাণীগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্ম্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্ম্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাই কেবলি গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে—সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্মেণ্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই স্বভার বালকেরা যে বীরত্বের প্রহসন মাত্র অভিনয় করিতেছিল তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্ব্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সার্ব্বজনীন পরিচ্ছদ কি হইতে পারে এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এই জন্য তিনি এমন একটা আপোষ করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ তিনি পায়জামার উপর এক খণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সার্ব্বজনীন পোষাকের নমুনা সর্ব্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক্ হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সার্ব্বজনীন পোষাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল। রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সব চেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেরূপ ঘটনা আমার ত মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুরমাত্রায় ছিল—আমরা হত আহত পশু পক্ষীর অতিতুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বৌঠাকুরাণী রাশীকৃত লুচি তরকারী প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ঐ জিনিষটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মাণিকতলায় পোড়োবাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচ নির্ব্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারীদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটান কলেজের

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। কয়েক দিন আমাকে পড়াইবার অসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালিকে ডাকিয়া কহিলেন— *"ওরে ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন?"* *মালি তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল "আজ্ঞা না, বাবু ত আসে নাই।"* ব্রজবাবু কহিলেন "আচ্ছা ডাব পাড়িয়া আন্।" সে দিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্নে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণ বাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধ ভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁহার ক্ষীণকণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল—তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকাদাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড় বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে; অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জ্জন, কেবল দুইধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির-লুঠ ছড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরা কাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারত-সন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলাধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। *দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত,* তবে আজ পর্য্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল একটি কোন অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিষ হইতেছে কিনা তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারো ছিলনা —কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, আমাদের কলে এই গামছার টুক্‌রা তৈরি হইয়াছে। বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য!—তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।

অবশেষে দুটি একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুল দাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোট তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মত হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য্য, না অস্বাস্থ্য,

না সংসারের দুঃখ কষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর একদিকে দেশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান্ করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ড্সনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরাজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ, সে তাঁহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন —গলায় সুর লাগুক্ আর না লাগুক্ সে তিনি খেয়ালই করিতেন না,—

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভিলাষ

(১)

নিদাঘ নিশীথে যবে, বিশ্ব তন্দ্রামগ্ন হবে,
বিমল চন্দ্রের করে ভরিবে ভুবন,—
বিকশিত পদ্মবন, শান্ত দৃশ্য সুশোভন,
ফুল্লফুলে সুরভিত হবে সমীরণ,
নিঃসঙ্গ-প্রাসাদ-শিরে, বিশাল দীর্ঘিকাতীরে—
রহিব আকুলপ্রাণে কেবলই চাহিয়া;
এ নীরব ব্যাকুলতা—কঠোর হৃদয়ব্যথা—
হে বাঞ্ছিত! করো শান্ত তখনই আসিয়া।

(২)

প্রাবৃট্ ঘনান্ধকারে, মগ্ন যবে চরাচরে,
হবে ঘোর ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি বরিষণ;
অশ্রান্ত-ঝিল্লির গান, কাঁপিয়া উঠিবে প্রাণ,
করিব সে প্রেমাস্পদে আকুল আহ্বান।
ভীষণ জীমূত-রবে, চপলায় চমকিবে,
চকিতে শয়নগৃহে যাইব ছুটিয়া;
হে বাঞ্ছিত! তুমি মোর—ভীত ক্লান্ত কলেবর,
ও শান্ত সুখদ বক্ষে লইও টানিয়া।

(৩)

শরতে নির্ম্মলাকাশে, শুভেন্দুর পরকাশে,
কাশ কুসুমের হাসে ব্যাপ্ত চরাচর;
কমলে মালতী পড়ি স্বপনে সোহাগ গড়ি,
উলসি উঠিবে সুপ্ত প্রেম-সরোবর।
সোপানে মর্ম্মরাসনে, বসে যবে একমনে
মানসে মধুর মূর্ত্তি করিব সৃজন;
পরিপূর্ণ করি ডালা, সেফালি-রচিত মালা—
তখনই আসি গলে করিও অর্পণ।

(৪)

প্রভাতে অরুণোদয়, ধূম সে আকাশময়,
হেমন্তের পক্কশীর্ষে কষিত কাঞ্চন;
শিশিরের বিন্দুসারি, মুকুতার হার পরি,
শীতল চঞ্চল বাতে দুলিবে কেমন।
বিকসিত নীলোৎপল, রাজহংস সচঞ্চল
মনোহর সরোবর হিল্লোলে কম্পিত,—
চেয়ে র'ব দীনভাবে শরীর শিথিল হবে,
স্বহস্তে কবরী প্রিয় করিও রচিত।

(৫)

মধুমাসে আম্রশাখে ভ্রমর বসিবে ঝাঁকে,
মাধবীর পরিমলে মাতিবে ভুবন,
কোকিল উন্মত্ত হবে, সরোজিনী বিকসিবে,
সুরভি মলয়ানিলে ভরিবে কানন।
রজনীতে চন্দ্রোদয়, হেরিলে পরাণ দয়,
বকুল বিচ্যুতি হেরি চেতনার লয়;

কুঞ্চিত কুন্তলভার, বিরচিত গন্ধসার,
অনুরাগদীপ্ত নেত্রে হবে ভাবোদয় ;
এহেন একান্তে যবে, আশ্রিতা বসিয়া রবে,—
পলে পলে উৎকণ্ঠিতা কি যেন আশায় ;
আসি ফুলমালা ল'য়ে, দিও গলে দোলাইয়ে,
সাদরে "বসন্তরাণী" সাধিও আমায়।

শ্রীঃ—

সাতচল্লিশ রোনিন্*

উপন্যাস-জগতে 'আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু'র গল্প যেমন সুবিখ্যাত, মিকাদোর রাজ্যে 'সাতচল্লিশ রোনিন্' তদ্রূপ। তবে প্রথমটির ভিত্তি কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত; দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক সত্যঘটনা, অপরিসীম প্রভুভক্তি ও বিরাট্ আত্মত্যাগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আসানো তাকুমি-নো-কামি নামক দাইম্যো, হারিমা প্রদেশে বাস করিতেন। কিয়োতোর রাজপ্রাসাদ হইতে তোকিওবাসী ষোগুনের নিকট রাজদূত প্রেরিত হইলেন। রাজদূতকে অবশ্য যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিতে হইবে, সেজন্য পূর্ব্বোল্লিখিত তাকুমি ও কামেইসামা নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজদূতকে অভ্যর্থনা করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। রাজদূত ত আর সাধারণ লোক নন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে অনেক আদবকায়দা শিখিতে হইবে। ষোগুন, কিরা-কোৎস্কে-নো-স্কে নামক এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে ঐ দুই সম্ভ্রান্ত পুরুষকে আদবকায়দা শিক্ষাদানে নিযুক্ত করিলেন। প্রতিদিন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদ্বয় ষোগুনের দুর্গে গিয়া আদবকায়দা শিখিতে লাগিলেন।

কোৎস্কে বড়ই অর্থগৃধ্নু ছিল। দাইম্যোদ্বয় কর্ত্তৃক আনীত উপহারের অল্পতা দেখিয়া সে মনে মনে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিত। শিক্ষাদানের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে বিদ্রূপাদি করিয়া অপমান করিত। তাকুমি এ সমস্ত অপমান নীরবে সহ্য করিতেন, কিন্তু কামেইসামা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও কোৎস্কেকে নিহত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

একদিন রাত্রে পাঠ সাঙ্গ হইলে কামেইসামা নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পরামর্শদাতাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"কোৎস্কে, তাকুমি ও আমাকে অপমান করিয়াছে। তাহাকে নিহত করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু দুর্গের মধ্যে এরূপ করিলে আমার জীবন নাশ, এবং তৎসঙ্গে আমার পরিবারবর্গ ও প্রজাবর্গ সর্ব্বস্বান্ত হইবে ভাবিয়া এতাবৎকাল এ কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছি। কিন্তু এরূপ দুর্বৃত্তের জীবনধারণ নিষ্প্রয়োজন, সেজন্য স্থির করিয়াছি আগামী কল্য তাহাকে দুর্গমধ্যে নিহত করিব।" এই কথা শুনিয়া কামেইসামার একজন কর্ম্মচারী কহিলেন "প্রভুর কথাই আইন। আগামী কল্য কোৎস্কে পুনর্ব্বার অভদ্র ব্যবহার করিলে তাহাকে অবশ্য নিহত করিবেন।" সে রাত্রে এই কর্ম্মচারী বাটী গিয়া ভাবিল বোধ হয় কোৎস্কে অর্থ পাইলে তাহার প্রভুর সহিত শিষ্ট ব্যবহার করিতে পারে। সেজন্য প্রভুর ও তাঁহার পরিবারবর্গের রক্ষার জন্য সেই কর্ম্মচারী সেই রাত্রেই অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া ভৃত্য সমভিব্যাহারে কোৎস্কের গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইল। কর্ম্মচারী সেখানে পৌঁছিয়া কোৎস্কের ভৃত্যদের কিছু মুদ্রা পারিতোষিক দিয়া কোৎস্কের নিকট হাজির হইয়া কহিল, "আমার প্রভু আপনাকে নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া এই সামান্য উপহার পাঠাইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে শিক্ষাদানে বিশেষ যত্ন করেন সেজন্য তিনি আপনার নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ।" এই বলিয়া সমস্ত টাকা কোৎস্কের সম্মুখে স্থাপন করিল। এত অর্থ দেখিয়া অর্থপিশাচের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে মিষ্টবচনে কামেইসামার কর্ম্মচারীকে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিল। পরদিন কোৎস্কে কামেইসামার প্রতি বিশেষ শিষ্ট ব্যবহার

---

* ইহার প্রকৃত অর্থ "ঢেউ-মানব", যে ঢেউয়ের মত ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। ভদ্রসন্তান যাদের অস্ত্রধারণ করবার অধিকার ছিল, কোনও কারণে, কৃতকর্ম্মের জন্য কার্য্য হতে জবাব পেয়ে, বা অদৃষ্টদোষে প্রভু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্দ্দিষ্ট পেশা না থাকাতে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত; কখন কখন নূতন প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত হয়ে, কখন বা লুণ্ঠনবৃত্তি অবলম্বন করে দিনযাপন করত। তারা পুরাতন জাপানে "রোনিন্" নামে অভিহিত হত। কখন কখন রাষ্ট্রনৈতিক কারণে, কোন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হবার আগে লোকে রোনিন্ হত, তাহাতে তার প্রভুকে সেই দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য দুঃখভোগ করতে হত না—মৎলিখিত "জাপান", ১৮৫-১৮৬ পৃঃ।

করাতে কামেই পূর্ব্ব অপমানকথা সমস্ত বিস্মৃত হইল ও কোৎসুকেকে মনে মনে ক্ষমা করিল। কিছুক্ষণ পরে তাকুমি আসিলেন। তিনি কোনও উপহার পাঠান নাই সেহেতু কোৎসুকে সেদিন তাঁহাকে বিশেষরূপে উপহাসাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাকুমি সমস্ত অপমান নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। কোৎসুকে উত্তরোত্তর উদ্ধত হইতে লাগিল, অবশেষে কহিল "আমার মোজার ফিতাটা খুলিয়া গিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া বাঁধিয়া দিন।" তাকুমি ক্রোধে বাক্‌শূন্য হইল, কিন্তু এই হীন কার্য্যও করিল। তাহা দেখিয়া কোৎসুকে কহিল, "তুমি ত বিষম আনাড়ি দেখ্‌চি, মোজার ফিতাও ঠিকমত বাঁধ্‌তে পার না। তুমি যে একটি পাড়াগেঁয়ে ভূত ও সহরের আদবকায়দা কিছুই জাননা তা'তে সন্দেহ নাই!" এই বলিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ভিতরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। উপরোক্ত কথা শুনিয়া তাকুমি আর স্থির থাকিতে পারিল না, কোৎসুকেকে ডাকিয়া কহিল 'দাঁড়ান মশায়'। যেই কোৎসুকে ফিরিয়া দাঁড়াইল অমনি তাকুমি তরবারি দ্বারা তাহার মাথায় আঘাত করিল, কিন্তু তরবারি কোৎসুকের টুপির উপর পড়াতে বিশেষ কোনো ফল হইল না। প্রথম আঘাতের পর কোৎসুকে প্রাণভয়ে দৌড়িতে লাগিল। তাকুমি তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পুনরায় আঘাত করিল কিন্তু এবার অসি থামের উপর পড়িল ও সেই অবসরে একজন কর্ম্মচারী তাকুমিকে ধরিয়া ফেলিল। সুযোগ বুঝিয়া কোৎসুকে পলায়ন করিল।

প্রাসাদের মধ্যে একজন লোককে আক্রমণ করা অপরাধে তাকুমিকে ধরিয়া একটি ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। যথাসময়ে বিচার বসিল। তাকুমি 'হারাকিরি' করিয়া বা স্বহস্তে নিজের পেট চিরিয়া প্রাণত্যাগ করুক, ইহাই বিচারে সাব্যস্ত হইল! তাকুমি প্রাণত্যাগ করিল, তাহার দুর্গ ও যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল, অনুচরেরা সকলে রোনিন্ হইয়া অন্যত্র চাকরি গ্রহণ করিল, কেহ বা ব্যবসায় আরম্ভ করিল।

তাকুমির প্রধান পরামর্শদাতা ওইষি কুরানোসুকে অন্য ৪৬ জন প্রভুভক্ত অনুচরের সহিত কোৎসুকেকে নিহত করিয়া প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য একটী দল গঠন করিল।

৪৭ রোনিন্ প্রতিহিংসা লইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কোৎসুকে, তাহার শ্বশুর দাইম্যো উয়েসুগি সামার একদল লোক দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সেহেতু তাহাদিগকে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করাই স্থির হইল।

রোনিনেরা সকলে পৃথক হইয়া গেল ও ছদ্মবেশ ধারণ করিল। কেহ বা ছুতারের কাজ আরম্ভ করিল, কেহ বা ব্যবসায়ীরূপ ধারণ করিল। তাহাদের সর্দ্দার কুরানোসুকে কিয়োতো গমন করিল। সেখানে য়্যামাষিণা নামক স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বারাঙ্গনা সঙ্গে সুরার স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিল। যেন প্রতিহিংসার কথা কোনদিন তাহার চিন্তামধ্যেও স্থান পায় নাই!

এদিকে কোৎসুকে রোনিনদের খবরাখবর জানিবার জন্য কিওতোয় গুপ্তচর পাঠাইতে লাগিল। এ কথা কুরানোসুকের অবিদিত রহিল না। সে শত্রু-চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া যথেচ্ছাচারের মাত্রা আরো বাড়াইয়া দিল।

একদিন কুরানোসুকে মাতাল হইয়া বাটী ফিরিবার পথে রাস্তার মাঝে পড়িয়া গেল ও সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল। সকলেই তাহার এ অবস্থা দেখিয়া হাস্যপরিহাস করিতে লাগিল। জনৈক সাৎসুমাবাসী সেই পথে যাইবার সময় কহিল "এই ত দেখ্‌চি তাকুমির পরামর্শদাতা ওইষি! মদ ও বারাঙ্গনা নিয়ে প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার কথা ভুলে গেছে, রাস্তার মাঝে অচেতন হয়ে পড়ে রয়েচে! লোক্‌টা পশুর চেয়েও অধম, সামুরাই কুলের কলঙ্ক!" এই বলিয়া সে তাহার মুখে পদাঘাত করিল ও তাহার উপর থুথু ফেলিয়া চলিয়া গেল।

কোৎসুকের গুপ্তচরেরা তাহার নিকট এই ঘটনা বিবৃত করিলে সে অনেকটা নির্ভয় হইল। মনে ভাবিল এরূপ লোকের নিকট বিপদের আশঙ্কা নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কুরানোসুকের স্ত্রী স্বামীর অধঃপতনে দুঃখিত হইয়া বলিলেন "প্রভু প্রথমে

আপনি বলেছিলেন শত্রুকে অসতর্ক করানোই আপনার যথেচ্ছাচারিতার উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আপনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েচেন সে জন্য অনুরোধ করি আপনি এ ঘৃণিত পথ ত্যাগ করুন।" কুরানোস্থকে বলিল "বিরক্ত কোরো না। তোমার এ সব আব্‌দার শোন্‌বার সময় নেই। আমাকে তোমার ভাল লাগে না, সেহেতু আমি তোমাকে ত্যাগ করে আমার মনোমত কোন সুন্দরীকে বিবাহ করব। তুমি আমার বাটী থেকে যেখানে ইচ্ছা চলে যাও, দেরী কোরো না।" তার স্ত্রী ভীত হইয়া অনেক অনুনয় করিলেন। ক্ষমা চাহিলেন কিন্তু কিছুতেই স্বামীর ক্রোধ উপশম হইল না। সে বলিল "মিছে কান্নাকাটি কোরো না। মত বদ্‌লানো আমার অভ্যাস নয়। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে তুমি চলে যাও।" এই কথা শুনিয়া পত্নী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চিকারাকে তাঁহার হইয়া ক্ষমা চাহিতে বলিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, কুরানোস্থকে স্ত্রীকে ছোট দুটি ছেলের সহিত তাঁর পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র চিকারা পিতার সঙ্গে রহিল।

যথাসময়ে এ কথাও কোৎসুকের কর্ণগোচর হইল। এই চরিত্রহীন অপদার্থ কুরানোস্থকে ও তাহার অনুচরদের দ্বারা তাহার কোনো ক্ষতি সাধিত হইতে পারে না, এ বিশ্বাস তাহার মনে দৃঢ়ীভূত হইল। ক্রমশঃ সে সতর্কতা ত্যাগ করিতে লাগিল ও অর্দ্ধেকের উপর শরীররক্ষকদের ফিরাইয়া পাঠাইল। কুরানোস্থকে প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য স্ত্রীপুত্রকে ত্যাগ করিতেও দ্বিধা করে নাই এ চিন্তা তাহার মনে একবারও উদয় হইল না!

এইরূপে কুরানোস্থকে শত্রুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিল। এধারে তাহার সঙ্গীরা য়েদো গমন করিল। সেখানে গিয়া মজুরবেশে বা ফিরিওয়ালার মত কোৎসুকের বাটীতে প্রবেশ করিয়া সেখানকার ঘর দালান প্রভৃতির সমস্ত খুঁটিনাটির সন্ধান লইল। শরীররক্ষকদের মধ্যে কে সাহসী, কে ভীরু তাহাও ক্রমশঃ জানিল। সঙ্গীদের পত্র হইতে যখন কুরানোস্থকে বুঝিল যে শত্রু একেবারে অসতর্ক হইয়াছে, তখন সে য়েদোয় একটা মিলনের স্থান নিরূপিত করিয়া কিয়োতো হইতে গুপ্তভাবে রওয়া[না] হইল। যথাসময়ে সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইয়া উপযু[ক্ত] সময়ের প্রতীক্ষায় রহিল।

তখন বৎসরের শেষ মাস। দারুণ শীত। একদিন রা[ত্রে] অবিরাম বরফ পড়িতেছে। যে যাহার গৃহাভ্যন্তরে ঘো[র] নিদ্রায় অচেতন। রোনিনেরা পরামর্শ করিল, আক্রমণে[র] ইহাই উপযুক্ত সময়। তাহারা নিজেদের দুইটি দলে বিভ[ক্ত] করিল। প্রথম দল ওইষি কুরানোস্থকের নেতৃত্বে সম্মুখে[র] ফটক আক্রমণ করিবে ও দ্বিতীয় দল কুরানোস্থকে[র] ষোল বৎসর বয়স্ক পুত্র ওইষি চিকারার নেতৃত্বে পশ্চাতে[র] ফটক আক্রমণ করিবে স্থির হইল। ইহাও স্থিরীকৃ[ত] হইল যে কুরানোস্থকে একটি ঢাক বাজাইলে উভয় দলই একযোগে আক্রমণ করিবে; কেহ যদি কোৎসুকের শিরশ্ছেদ করে তবে সে একটি শীস্ দিবে, তখন সকলে সমবেত হইয়া শত্রুর মস্তক নিকটস্থ সেঙ্গাকুজি মন্দিরে গিয়া, তাহাদের মৃত প্রভুর কবরের সম্মুখে স্থাপন করিবে। তারপর সকলে সরকারের নিকট হইতে মৃত্যুর আদেশ মাথা পাতিয়া লইবে।

মধ্যরাত্রিতে আক্রমণ হইবে স্থির হইল। রোনিনেরা একসঙ্গে তাহাদের শেষ আহার করিল। পরদিন তাহারা জীবনের পরপারে গিয়া দাঁড়াইবে!

তারপর কুরানোস্থকে সঙ্গীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল "আজ রাত্রে আমরা শত্রুকে তাহার দুর্গে আক্রমণ করিতে যাইতেছি। তাহার অনুচরেরা আমাদিগকে বাধা দিবে এবং সেই জন্য আমরা তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া নিহত করিব। কিন্তু স্ত্রীলোক, স্থবির ও শিশু, ইহারা নিতান্ত অসহায়। সকলে সাবধান, এরূপ লোক একটিও যেন নিহত না হয়।"

যথাসময়ে রোনিনেরা যাত্রা করিল। বাতাস তখন করুণ-ভীষণ গান জুড়িয়া দিয়াছে। বাত্যাতাড়িত বরফের কণাগুলা তাহাদের চোখে মুখে ঝাপ্‌টা মারিয়া দিক্‌ভ্রম জন্মাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা নিরস্ত হইবার লোক নয়, সিদ্ধির পথে এতদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিবার লোক নয়।

কোৎসুকের বাটী পৌছিয়াই রোনিনেরা দুইভাগে

বিভক্ত হইয়া গেল। চিকারা তেইশ জন লোক লইয়া পশ্চাতের ফটকে গিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের ফটক বন্ধ ছিল। চার জন লোক দড়ির সিঁড়ি দ্বারা পাঁচিল ডিঙাইয়া উঠানে পড়িল, নিদ্রিত দ্বারবানদের ঘুম ভাঙিবার পূর্ব্বেই তাহাদের হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। ভীত দ্বারবানেরা করুণস্বরে প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। রোনিনেরা ফটকের চাবি চাহিল কিন্তু দ্বারবানেরা কহিল চাবি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট। তখন রোনিনেরা হাতুড়ির দ্বারা ফটকের কাঠের হুড়্কা ভাঙিয়া ফেলিয়া সকলে প্রবেশ করিল। ওধারে পশ্চাতের ফটক ভাঙিয়া চিকারা ও তাহার দল প্রবেশ করিল।

কুরানোসুকে তখন নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীদিগকে দূত-মুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমরা ইতিপূর্ব্বে আসানো-তাকুমি-নো-কামির অধীনে কার্য্য করিতাম। আমাদের প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য আমরা কোৎসুকের প্রাসাদ আক্রমণ করিব। আমরা দস্যুও নই তস্করও নই, সে জন্য আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন, আপনাদের কোনো ক্ষতি হইবে না।"

কোৎসুকের অর্থগৃধ্নুতা তাহাকে সকলের নিকট অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল, সেজন্য কেহই তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইল না। ভিতরের লোক কেহ যাহাতে বাহিরে সাহায্য আহরণে যাইতে না পারে, সেজন্য কুরানোসুকে দলের দশজন লোককে উঠানের চারিধারে ছাতের উপর স্থাপন করিল, ও কেহ বাটীর বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিল। সমস্ত স্থির হইলে কুরানোসুকে স্বহস্তে ঢাক বাজাইয়া আক্রমণের আদেশ দিল।

সেই শব্দে জাগরিত কোৎসুকের শরীররক্ষকদের সহিত রোনিনদের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। খড়্গে খড়্গে, বল্লমে বল্লমে বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর বীর রোনিনদের অস্ত্রচালনায় অর্থপিশাচের অনুচরসকল একে একে নিহত হইল।

তখন তাহারা কয়েক দলে বিভক্ত হইয়া কোৎসুকের সন্ধান করিতে লাগিল। সর্ব্বত্রই রমণী ও শিশু ক্রন্দন করিতেছে দেখিতে পাইল। বহু অনুসন্ধানের পর কোৎসুকের শয়নকক্ষের পশ্চাদ্ভাগে কয়লা, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির ঘরে এককোণে কি একটা সাদা পদার্থ দেখিতে পাইল। তাহাদের মধ্যে একজন বল্লমের খোঁচা দেওয়াতে সেই কোণ হইতে কে বেদনাধ্বনি করিল। তখন তাহারা আলোকের সাহায্যে দেখিল একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ। বয়স প্রায় ষাট বৎসর, সে ঘুমাইবার সাদা রেশমী পরিচ্ছদে সজ্জিত। পরিচ্ছদে রক্তের দাগ। তখন তাহাকে টানিয়া বাহির করা হইল। কে একজন শীস্ দিল, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে রোনিনেরা সমবেত হইল। এই বৃদ্ধ নাম বলিতে অসম্মত হইল। কিন্তু কুরানোসুকে তাহার কপালে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া এই লোকটিই যে কোৎসুকে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইল। কপালের ক্ষতচিহ্ন তাকুমির খড়্গাঘাতে হইয়াছিল।

কুরানোসুকে কোৎসুকের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সম্ভ্রমের সহিত এই কথাগুলি বলিল, "মহাশয়, আমরা আসানো-তাকুমি-নো-কামির অনুচরবর্গ। গত বৎসর আপনাতে ও আমার প্রভুতে দুর্গের মধ্যে কলহ হওয়াতে, আমাদের প্রভু 'হারাকিরি' করিয়া মরিতে বাধ্য হন। আমরা, প্রভুভক্ত বিশ্বাসী লোকের যাহা কর্ত্তব্য, তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছি। আমাদের সংকল্প যে সাধু, আশা করি আপনি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা আপনাকে 'হারাকিরি' করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনার মৃত্যু হইলে মহাশয়ের মস্তক আমাদের প্রভুর কবরের সম্মুখে রাখিব।"

রোনিনেরা কোৎসুকের উচ্চপদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার সহিত যথাসম্ভব ভদ্র ব্যবহার করিল। বার বার তাহাকে 'হারাকিরি' করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সে এই সম্মানকর মৃত্যু গ্রহণ করিতে অসম্মত দেখিয়া কুরানোসুকে, তাকুমি যে খড়্গদ্বারা 'হারাকিরি' করিয়া-ছিলেন, তদ্দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিল। তখন সেই ৪৭ রোনিন তাহাদের কার্য্য-সিদ্ধিতে প্রফুল্লিত হইয়া, শত্রুর ছিন্নমস্তক একটি বাল্‌তির মধ্যে লইয়া রওয়ানা হইল।

তাকানাওয়ার পথে, যেখানে সেঙ্গাকুজি মন্দির অবস্থিত, প্রভাত হইল। রাস্তার উভয়পার্শ্বে লোকেরা জনতা করিয়া এই রক্তাক্ত-পরিচ্ছদাবৃত ভীষণদর্শন ৪৭

জনকে দেখিয়া তাহাদের সাহস ও প্রভুভক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিল, তাহাদের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

সকাল প্রায় সাতটার সময় তাহারা সেন্দাইরাজের বাটীর সম্মুখে আসিল। সেন্দাইরাজ তাহা শুনিয়া একজন সভাসদকে কহিলেন "তাকুমির অনুচরেরা তাহাদের প্রভুর শত্রুকে নিহত করিয়া এই পথ দিয়া যাইতেছে। আমি তাহাদের প্রভুভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। গত রাত্রের কার্য্যের পর তাহারা অবশ্য ক্লান্ত হইয়া থাকিবে সেজন্য তাহাদিগকে এখানে আসিয়া কিছু জলযোগ করিতে অনুরোধ কর।"

সকলেই এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। সেন্দাইরাজের সভাসদেরা সকলেই তাহাদের প্রশংসা করিলেন।

ক্রমে রোনিনেরা তাহাদের প্রভুর সমাধির নিকট উপনীত হইল। সেঙ্গাকুজি মন্দিরের অধ্যক্ষ তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। রোনিনেরা নিকটস্থ কূপে কোৎস্কের মস্তক উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাকুমির আত্মার উদ্দেশে তাঁহার সমাধির সম্মুখে রাখিল। তৎপরে সকলে একে একে ধূপ জ্বালাইল। এইবার কুরানোস্কে তাহার নিকট যে অর্থ ছিল সমস্ত মন্দিরাধ্যক্ষকে প্রদান করিয়া কহিল "আমরা 'হারাকিরি' করিয়া মরিয়া গেলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের বেশ ভালভাবে সমাহিত করিবেন ও আমাদের আত্মার উদ্দেশে প্রার্থনাদি করিবেন।" এ কথা শুনিয়া মন্দিরাধ্যক্ষের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল।

যথাসময়ে রোনিন্‌দের ডাক পড়িল। দেশের বিচারালয়ে তাহাদের বিচার হইবে। রোনিনেরা হাজির হইল। তাহাদের কৃতকর্ম্মের জন্য সকলকে স্বহস্তে পেট চিরিয়া মরিবার আদেশ প্রদত্ত হইল।

সেঙ্গাকুজি মন্দিরের নিকটে একটা উচ্চভূমির উপর ৪৭ জনকে সমাহিত করা হইল। সেইদিন হইতে এ স্থান পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। নানাদিক হইতে এই অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী শুনিয়া লোকজন এই স্থান দেখিতে আসিতে লাগিল। একদিন একজন সাৎসুমার লোক আসিয়া ওইষি কুরানোস্কের সমাধির নিকট নতজানু হইয়া কহিল "আপনাকে কিয়োতোয় পথের ধারে মাতালের মত পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, আপনা অভিসন্ধি কিছুমাত্র না বুঝিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ জ্ঞানে পদাঘাত করিয়াছিলাম। আজ আপনার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতে ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া কোমর হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া পেট চিরিয়া ফেলিল।

মন্দিরাধ্যক্ষ ইহাকেও রোনিনদের পার্শ্বে সমাহিত করিলেন। লোকেরা আজকাল এই ৪৮ জনের সমাধি দেখিতে আসেন। রমণীরা বীরাত্মাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইয়া দেন ও পানীয় জল দান করেন। এখনও শীতের দিনে বাতাস বহিয়া চতুর্দ্দিকস্থ গাছপালার মধ্যে একটা গভীর হাহুতাশ জাগাইয়া তুলে, আকাশ সমাধিগুলির উপর তুষার-অশ্রু বর্ষণ করে। সকল দেশে সর্ব্বকালে এইরূপে লোকে মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে!

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিবা শেষে

দিবস হইল শেষ। রবি গেল পাটে,
কঠোর কর্ম্মের পথে যাত্রা শেষ তার।
মাঠে শেষ কৃষিকার্য্য, বেচা কেনা হাটে,
তটে শেষ পাটনীর শেষ খেয়া পার।
ঘাটে শেষ ঘটভরা কাঁকণের তান,
গোঠে শেষ গোধনের দিনান্ত ভোজন,
বট-বিল্ব-বিটপীতে বিহগের গান,
বাটে শেষ মানবের ব্যস্ত বিচরণ।
ফোটা শেষ কুসুমের বনে উপবনে,
মঠে শেষ আরতির মঙ্গল নিনাদ,
ঝাটে পাটে গৃহকাজ কুটীর প্রাঙ্গনে,
হাঁটা শেষ পথিকের ক্লান্তি অবসাদ।
এই সর্ব্ব শেষ মাঝে উদাস সন্ধ্যায়,
জীবনের শেষ,—সেও উঁকি মেরে যায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

যাত্রী।

(শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে)।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

বহির্ভারত

ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে টং-কিং উপসাগর পর্য্যন্ত এবং চীনের দক্ষিণভাগ হইতে ভারত সাগর পর্য্যন্ত বহু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড Farther India বা বহির্ভারত নামে এখনও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। একদিন যে ঐ সমগ্র ভূভাগ ভারতবর্ষের অধীনে ছিল, এবং ভারতবর্ষের সভ্যতা উহাকে উন্নত করিয়াছিল, একথা এখন অনেকেই জানেন না। প্রথমতঃ ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বহির্ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্বের সহিত আমরা সহসা পরিচিত হইতে পারি নাই। তাহার পর ফেয়ার (Phayre) সাহেব যখন ব্রহ্মদেশের ইতিহাস লিখিলেন (সেও অল্পদিনের কথা নয়), তখন ভারতের প্রাচীন শৌর্য্য এবং মহিমার কথা কথঞ্চিৎ পরিমাণে জানিতে পারা গিয়াছিল। কর্ণেল গেরিনি (Colonel Gerini) যখন রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে তাঁহার সুদীর্ঘ ভৌগোলিক তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, তখন ভারতের অতি প্রাচীন কালের অধিকার-বিস্তৃতির বিবরণ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। যতই প্রত্নতত্ত্ব সংগৃহীত হইতেছে, ততই অনেক মঙ্গোলীয় জাতির সভ্যতার মূলে ভারত সভ্যতার বীজ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, আনাম প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ বৌদ্ধ বলিয়া আমরা কেবল এইটুকু জানিতাম, যে, বৌদ্ধ শ্রমণেরা ঐ সকল দেশের লোকদিগকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নূতন সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে যে ভারতবাসীরা ঐ সকল দেশ জয় করিয়া "অতিরিক্ত ভারত রাজ্য" স্থাপন করিতেছিলেন, আমরা সে কথা জানিতাম না। পুরাণগুলিতে ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার কিছু কিছু নিদর্শন আছে; কিন্তু মূল ঘটনাগুলি অজ্ঞাত ছিল বলিয়া, সে নিদর্শন হইতে পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। এ বিষয়ে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অল্প পরিমাণে সূচিত করিবার জন্যই এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি।

আর্য্যেরা যখন দ্রবিড়জাতীয় লোকদিগের কোন সন্ধান লইতেন না, কিন্তু দ্রবিড়জাতীয়েরা আর্য্য সভ্যতা সংগ্রহ করিয়া নব তেজে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তখনও দ্রবিড়-জাতীয়েরা স্থলপথে এবং জলপথে বহির্ভারতের অনেক স্থলে উপনীত হইয়া অনেক রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৯০০ সংবৎসরেও ব্রহ্মদেশে এই দ্রবিড়-অধিকারের বিবরণ পাওয়া যায়। মুড়-কলিঙ্গ অথবা ত্রি-কলিঙ্গের অধিবাসীরা যে অতি প্রাচীনকালে পেগু, তেনাসেরিম, আরাকান প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিল, চোলমণ্ডল বা করমণ্ডলের অধিবাসীরা যে মলয় উপদ্বীপ, কম্বোজ প্রভৃতি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল, এবং বঙ্গদেশের প্রাচীন দ্রবিড় অধিবাসীরা যে আনাম দেশ অধিকার করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত আনামে রাজত্ব করিয়াছিল, সে কথা ১৩১৭ বঙ্গাব্দের নব্যভারতে (৪২৯ পৃষ্ঠা) কিঞ্চিৎ লিখিয়াছিলাম। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব সময়েই আর্য্যেরা প্রধানতঃ আসাম (প্রাগ্‌জ্যোতিষ) এবং মণিপুর প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগ, শ্যামরাজ্য, আনাম এবং চীনের দক্ষিণভাগের য়ুন্নান (Yunnan) ও টং-কিং রাজ্যসমূহে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন; এবং পরে সমগ্র দ্রবিড়-জাতীয় লোকদিগকে পরাভূত করিয়া বহির্ভারত এবং চীনরাজ্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। চীন এবং ব্রহ্মদেশের ইতিহাস হইতেই এই সকল কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দ্রবিড়জাতীয়েরা যেমন দেশ অধিকার করিয়া ব্রহ্মদেশে আপনাদের ত্রিকলিঙ্গ প্রভৃতি নাম স্থাপন করিয়াছিল, আর্য্যেরাও তেমনি ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক নাম দিয়া বহির্ভারতের পর্ব্বত, নদী, দেশ ও নগরগুলিকে চিহ্নিত করিয়াছিলেন। সেই চিহ্ন হইতেই আর্য্যজাতির প্রাচীন অধিকার-বিস্তারের কথা যে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, পাঠকেরা তাহা দেখিতে পাইবেন। ব্রহ্মদেশের প্রবাদ ও লিখিত বিবরণ, এবং অসম্পর্কিত চীন দেশের ইতিহাস এই প্রাচীন বিবরণের সাক্ষী। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে কর্ণেল গেরিনি প্রভৃতি

ঐতিহাসিকেরা এ কথা উদ্ধার করিয়াছেন যে উত্তর ব্রহ্মের (Upper Burma) ভামো নগরে হস্তিনাপুর হইতে আগত ক্ষত্রিয় রাজারা খৃঃ পূঃ ৯২৩ অব্দে রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্য ব্রহ্মদেশের উত্তর সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া মণিপুর সীমান্ত দিয়া ইরাবতী-তটস্থ পাগান (Pagan) নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খৃঃ পূঃ ৬৪৪ অব্দে শ্যামদেশের সমগ্র উত্তর ভাগ মালব নামে প্রচারিত হইয়াছিল, এবং উহার প্রধান নগরের নাম হইয়াছিল দশার্ণা (Muang Yong Chronicleএর গেরিনি প্রদত্ত বিবরণ)। এখনও শ্যামের উত্তরভাগের 'মালা প্রাথেট' নাম (মালব প্রদেশ) এবং প্রধান নগরের দশাণ বা দোয়াণ নাম লুপ্ত হয় নাই। যিনি প্রথম এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সুনন্দকুমার বলিয়া পাওয়া গিয়াছে। এই রাজ্য এতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে খাস চীনরাজ্যভুক্ত য়ুন্নানটি সুনন্দকুমারের বংশধরদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। পার্ব্বত্য সীমান্ত বলিয়া, ভারতবর্ষের দেশসংস্থিতির অনুকরণে এই য়ুন্নানরাজ্য, "গন্ধার" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। চীনের ইতিহাসেও একথা স্বীকৃত হইয়াছে। যখন টংকিং এবং উত্তর আনাম এই দেশভুক্ত হয়, তখন আনামের উত্তরপূর্ব্ব ভাগ মিথিলা নাম পাইয়াছিল; এবং বিদেহ বলিয়া তাহার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্ররাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। শ্যামদেশের পূর্ব্বভাগে চম্পা নামেও একটি নগরী একসময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। এ নামগুলি কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু লুপ্ত হয় নাই।

বহির্ভারতের উত্তরভাগের এই বিবরণ লক্ষ্য করিয়া কর্ণেল গেরিনি (Colonel Gerini) লিখিয়াছেন :—

"Northern Indo-China owes its early civilisation to settlers from Northern India" (Pp. 22).

পুনরপি লিখিয়াছেন :—

"We find Indu [Hindu] dynasties established by adventurers claiming descent from the Ksatriya potentates of Northern India, ruling in Upper Burma, in Siam and Laos, in Yunnan and Tonkin and even in most parts of South-eastern China. From the Brahmaputra and Manipur to the Tankin Gulf we can trace a continuous string of petty States ruled by the scions of th Ksatriya race, using the Sanskrit or the Pali language in official documents and inscriptions, building temple. and other monuments after the Indu [Hindu] style and employing Brahman priests for the propitiatory ceremonies connected with the Court and the State (p. 122). .....The presence of this Indu [Hindu] element and its influence upon the development of Chinese civilization at a far earlier period than has hitherto been known or even suspected, commands attention, and can henceforth be hardly overlooked by Sinologists" (p. 124).

ইহার ভাবার্থ এই যে উত্তর হিন্দু-চীন দেশ ইহার প্রাথমিক সভ্যতার জন্য উত্তর ভারতের নিকট ঋণী। উত্তর ব্রহ্ম, শ্যাম, লওস, য়ুন্নান, টংকিং, এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনের অনেকাংশে ক্ষত্রিয় রাজ্যের চিহ্ন এবং সংস্কৃত ও পালি ভাষা ব্যবহারের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। চীনের প্রাচীন সভ্যতাও অনেকাংশে ভারত সভ্যতার নিকট ঋণী।

আর্য্যজাতির প্রভাবে যখন দ্রবিড়জাতীয়দিগের অধিকৃত রাজ্য আর্য্যের শাসনে আসিয়াছিল, তখন পেগুর ত্রিকলিঙ্গ-রাষ্ট্র প্রথমতঃ 'সুবর্ণভূমি' এবং পরে 'রামণ্য দেশ' নামে অভিহিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের অতি প্রাচীন বিবরণে যে স্থানের কালিঙ্গরট্ঠ নাম পাওয়া যায়, সেখানে এখনও অনেক তেলেগু নামের অপভ্রংশ প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে পেগু হইতে তেনাসেরিম পর্য্যন্ত সুবর্ণভূমি নাম পাওয়া যায়। ভারতের বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে সমুদ্রপারের যে সুবর্ণভূমির কথা বর্ণিত আছে, তাহা এই সুবর্ণভূমি। ব্রহ্মদেশের কল্যাণীর খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে পরবর্ত্তী সময়ে ঐ প্রদেশ কখন বা সুবর্ণভূমি, কখন বা রামণ্যদেশ নামে অভিহিত হইত। উহার একটি উপবিভাগ কুসিমমণ্ডল নামে (এ কালের Bassein), একটি হংসবতীমণ্ডল নামে (পেগু) এবং তৃতীয়টি মুৰ্ত্তিমমণ্ডল নামে (Martaban) অভিহিত হইয়াছিল। এই নাম ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। কেননা পেগুর রাজা (Dhamma Cheta) ধর্ম্মচেতা ঐ বৎসরে যে খোদিত লিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ঐ নামগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রদেশ হইতে যে যথার্থই ভারতের জন্য স্বর্ণ সংগৃহীত হইত বলিয়া সুবর্ণভূমি নাম হইয়াছিল, তাহা দেশের স্বর্ণ-খনি হইতেই সূচিত হয়।

মালয়-উপদ্বীপের উত্তরভাগে যে স্থানে এখনও স্বর্ণ পাওয়া যায়, সেই বিভাগের নাম জম্বী। জম্বী বিভাগের

নদী হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইত বলিয়াই হয়ত স্বর্ণের "জাম্বুনদ" নাম হইয়াছিল। এটি আমার নিজের অনুমান। অতি প্রাচীন সংস্কৃতে স্বর্ণের জাম্বুনদ নাম নাই; কি কারণে ঐ নামের উৎপত্তি হইল, তাহাও যখন জানা যায় না, তখন জম্বী প্রদেশের সুবর্ণের সহিত জাম্বুন কথাটি গ্রথিত করিতেছি।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ভাগের কমিলা (কমিল্লা), চট্টল (চট্টগ্রাম) এবং আরাকান লইয়া দ্রবিড়দিগের ত্রিকলিঙ্গ রাজ্যের একটি উপবিভাগ সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তখনও কমিলার পার্ব্বত্য প্রদেশ, শিলাচট্টল (শ্রীহট্ট বা Sylhet) এবং মণিপুর প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে কিরাতদিগের অধিকারে ছিল। ত্রিপুরার 'রাজমালা' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে ত্রিপুরা দেশ প্রথমে কিরাত-রাজ্য ছিল। আলোসন্ধ (Shillong) দেশও সম্ভবতঃ কিরাতজাতির অধিকৃত ছিল (Proceedings, A. S. B., Jan. 1874)। যখন ঐ ভূভাগের অধিকাংশ স্থল আর্য্যের অধিকারে আসিয়াছিল, তখন প্রাচীন ত্রিরাজ্যের নামের ঐতিহ্যে চট্টগ্রাম, কমিলা এবং ত্রিপুরা লইয়া নূতন ত্রিপুররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অর্থাৎ ব্রহ্মে হউক, ভারত সীমান্তে হউক, কুত্রাপি দ্রবিড়-জাতীয়দিগের প্রাধান্য রক্ষিত হইতে পারে নাই। তবে ভারতবর্ষের হিন্দুগণ যখন ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সুন্দরীদিগকে তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বংশের জননীরূপে বরণ করিয়া প্রাচীন দেশের মায়া কাটাইয়াছিলেন, তখন ভারতবাসীদিগের বিচারে তাঁহারা ঠিক্ হিন্দু বলিয়া বিচারিত হয়েন নাই। এখন বহির্ভারতের মধ্যে কেবল শ্যামদেশ স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে। এই শ্যামদেশের রাজবংশীয়েরা আপনাদিগকে ভারতের ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আমরা কি আবার তাঁহাদিগকে আপনার ভাই বলিয়া সম্ভাষণ করিতে কুণ্ঠিত হইব? পিতৃ-পুরুষেরা যে অভিমানে তাঁহাদিগকে ত্যাজ্যপুত্র বলিয়াছিলেন, এখনও কি সে অভিমান ভুলিবার দিন আসে নাই?

বহির্ভারতে আর্য্যের কীর্ত্তি এখনও লুপ্ত হয় নাই। আনামের অতি সুন্দর মন্দিরগুলি আমাদেরই পিতৃব্য বংশীয়েরা গড়িয়াছিলেন। সকল প্রত্নতত্ত্ববিদেরাই বলিতেছেন, উহা হিন্দু-কীর্ত্তি। ঐ সকল কীর্ত্তির দিকে তাকাইয়া ঐ দেশের লোকদিগকে কি আপনার ভাই বলিতে ইচ্ছা করে না? খাঁটি চীন জাতীয় লোকের সৌন্দর্য্য তোমার আমার চক্ষে এখন তেমন মনোজ্ঞ না হইতে পারে, কিন্তু আর্য্যরক্ত সংমিশ্রণে বহির্ভারতে নরনারীর যে সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহা ত মনোজ্ঞ নহে বলিয়া কেহই বলেন না। তবুও কি একবার প্রাচীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সন্তানদিগকে আপনার বলিয়া দাবি করিবে না? মেখং নদীর উত্তরভাগ একদিন যমুনানদী নাম পাইয়াছিল এবং উহার অন্য অংশের নাম হইয়াছিল গঙ্গা। ঐ গঙ্গা এবং যমুনা ভারতের নদী দুইটির মতই আমাদের দৃষ্টিতে পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হউক।

ভাল কথা। এক দিন যখন আর্য্যরক্তপুত (Lao) লাও জাতি উত্তর ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিল, তখন যদিও লাওজাতি আর্য্যভাষায় কথা কহিত না, তবুও ঐ লাও-অধিকার দ্বারা কিরাতজাতির প্রভাব দূরীভূত হইয়াছিল। লাওএরা নিজের ভাষায় স্বদেশের নদী নগরের নাম অনেক রাখিয়া গিয়াছিল। এখনও তাহার অনেক চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। মেখং কিম্বা মান্-ওয়াঙ্গএর অপভ্রংশে 'মেঘনা' নাম রহিয়া গিয়াছে; মান্‌ওয়াঙ্গ অর্থ মেঘবতী। অর্থে এবং উচ্চারণে প্রাচীন চিহ্ন লুপ্ত হয় নাই। ব্রহ্মের ভাষায় "ঢক্কা" অর্থ প্রাচীন নদী বা "পুরাতন গঙ্গা"। সেই ঢক্কার অনুবাদে "বুড়ী-গঙ্গা" নদীটি রহিয়াছে, এবং তাহার কূলে সাক্ষাৎ ঢাকা নগরী বর্ত্তমান। যে সময়ে এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তখন ব্রহ্মদেশের লোকের ভারত-অভিযান "মগের উৎপাতে" পরিণত হয় নাই।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষীয়েরা বহির্ভারত অধিকার করিতেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সময় হইতে আর্য্যপ্রভাব বহির্ভারতের সর্ব্ব অঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে নূতন প্রোম নগরীর ছয় মাইল দূরে শ্রীক্ষেত্র নামক নূতন নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে এই দেশ মৌর্য্য রাজাদের শাসনাধীন হয়। খৃষ্টোত্তর দুই তিন শতাব্দী পর্য্যন্তও প্রোম এবং পাগানের রাজ-

আনামের মন্দির।
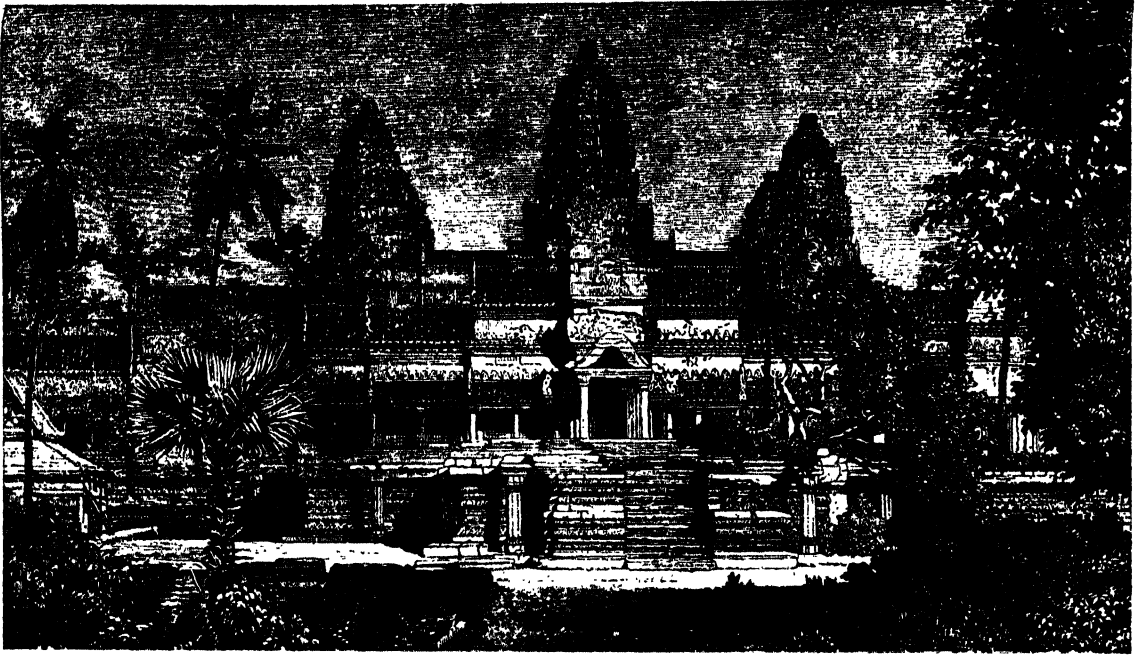
বংশীয়েরা মৌর্য্যবংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন। চীনদেশের ইতিহাস হইতে ঈ, এইচ, পার্কার (E. H. Parker) সংগ্রহ করিয়াছেন যে সে দেশের ঐতিহাসিক প্রবাদ এই যে শ্রীধর্ম্মাশোকের পঞ্চম পুত্র য়ুনান (Yunnan) রাজ্য অধিকার করিয়া সেখানে মৌর্য্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামদেশ বা সামরট্টেও মৌর্য্য রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া খৃঃ পূঃ ১০২ অব্দের শ্যামদেশের একটি বিবরণে জানিতে পারা যায়। চোলমণ্ডল বা করমণ্ডলের অধিবাসী কর্তৃক পর্ব্বতসঙ্কুল যে দেশ মলয় নামে (তামিলে মলয় অর্থ পর্ব্বত) অভিহিত হইয়াছিল, উহাও মৌর্য্যশাসনে আসিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। আশ্চর্য্য এই যে বহু পরবর্ত্তী সময়েও হিন্দুরা ভারতবর্ষ হইতে গিয়া ব্রহ্মদেশে অধিকার বিস্তার করিতেন। এলাহাবাদে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রস্তরলিপি আছে, তাহাতে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক "ডবাক" রাজ্য জয়ের কথা পাওয়া যায়। এই ডবাক রাজ্য যে উত্তর ব্রহ্মদেশ, গেরিনি (Gerini) তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে পাগান্ নগরে যে একখানি খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে, সে খানিতে ১৬৩ গুপ্ত সংবৎ ব্যবহৃত আছে। ডবাক নামটি যে এখনও লুপ্ত হয় নাই, তাহাও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। আনাম দেশের প্রাচীন চম্পা নগরীতে একটি খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে; ঐটিতে ১৫০ খৃষ্টাব্দের গির্ণারের খোদিতলিপির অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতেও ভারত হইতে অনেক লোক ব্রহ্মদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন। শ্যামদেশের সম্বোর নামক স্থানে জয়বর্ম্মণ নামক রাজা শম্ভুপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। ৯৪৭ খৃষ্টাব্দে জয়বর্ম্মণের পূর্ব্বপুরুষ শ্রুতবর্ম্মণ কাম্বোজে কম্বু নামে মহাদেব বা শম্ভু স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কর্ণেল গেরিনি (Colonel Gerini) অতি যোগ্যতার সহিত দেখাইয়াছেন যে পুরাণে বর্ণিত ভারতবর্ষের বাহিরের অনেকগুলি দ্বীপ বহির্ভারতের কতকগুলি দেশের সহিত অভিন্ন। পাঠকদিগের নিকট সকল প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারিতেছি না। লবণসমুদ্র-বেষ্টিত জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষের পরে অন্য যে সকল দ্বীপের

কথা বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে সে কথা কিছু কিছু বলিতেছি।

সর্পী-সাগর-বেষ্টিত প্লক্ষ দ্বীপটি আরাকানের নিকটস্থ ব্রহ্মদেশের নিম্নভাগ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রকৃতপক্ষে এই দেশ প্লক্ষবৃক্ষ পরিপূর্ণ, অন্য দিকে আবার সুখদ দেশ বা শ্যামদেশের পশ্চিমে পো-লো-সো দেশ বলিয়া একটি দেশের কথা চীনদেশের লিখিত বিবরণে পাওয়া যায়। পর্তুগীজেরা ষোড়শ শতাব্দীতেও নিম্ন ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী সাগরকে Mare di Serpe অর্থাৎ সর্পসাগর বলিয়া দেশপ্রবাদ হইতে নাম দিয়াছিলেন। Serpe বা সর্প, "সর্পী" হইতেই হইয়াছে। পরবর্ত্তী দ্বীপগুলির নিদর্শন হইতে এ কথা আরও সুস্পষ্ট হইবে।

সুরা-সাগর-বেষ্টিত শাল্মলী দ্বীপটি মালয় উপদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদিও এখানে বহু পরিমাণে শাল্মলীবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি গেরিনি বিবেচনা করেন যে "সুবর্ণমালী" কথা হইতেই শাল্মলী দ্বীপ নাম হইয়াছে। শ্যামদেশের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে তেনাসেরিম প্রদেশস্থ সুবর্ণমালী গিরির উপরে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন আছে বলিয়া লিখিত আছে। পেগুর একখানি খোদিত-লিপিতে মালয় উপদ্বীপকে শাল্মলী দ্বীপ এবং সুবর্ণমালী দ্বীপ এই দুই নামেই অভিহিত করা আছে। রামায়ণে সুরাসাগরের নাম পাওয়া যায় শ্রীলোহিত। এই সাগরের চীনদেশের নামেও লোহিত অর্থ পাওয়া যায়। আরব দেশের লোকেরা ইহাকে সেলাহেট নাম দিয়াছিল; ঐ শব্দটি শ্রীলোহিতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

সমগ্র শ্যাম দেশটি শাকদ্বীপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই ক্ষীরসাগরবেষ্টিত দ্বীপটির কতকগুলি প্রাচীন এবং পৌরাণিক লক্ষণের কথা বলিতেছি। শ্যামদেশের নিকটবর্ত্তী সাগরটির দেশভাষায় কেদ্রেঞ্জ বা কেরদেঞ্জ নাম ছিল। বিষ্ণুপুরাণের মতে শাক বৃক্ষ (সেগুন বা Teak) বেশি ছিল বলিয়া এই দ্বীপের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। শ্যামদেশে শাক বা সেগুন গাছের খুব আধিক্য; এবং উহার নাম মৈ-শাক। বিষ্ণুপুরাণে এ কথাও আছে যে "ভব্য" নামে নরপতি শাকদ্বীপের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের সময়ে জলদ, কুমার এবং সুকুমার প্রভৃতি নামে দেশের বর্ষবিভাগ হয়। পুরাণে উল্লিখিত ঐ দেশের পর্ব্বতগুলির মধ্যে উদয়গিরি, অস্তগিরি এবং শ্যামগিরি নাম পাওয়া যায় এবং সুকুমারী, কুমারী ও নলিনী নামে নদীর নাম পাওয়া যায়। কাম্বোজ দেশের ৬০০ খৃষ্টাব্দের খোদিতলিপিতে যথার্থতঃই ভববর্ম্মণ রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনি খোদিতলিপি প্রস্তুত হইবার পূর্ব্ব সময়ে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। গেরিনি বলেন যে শ্যাম দেশের ভাষার C'honla শব্দের অর্থ "জল," এবং জল শব্দটি ঐ দেশের উচ্চারণে প্রায় ঐরূপ দাঁড়ায়। মেখং উপত্যকার জলপ্রায় বিভাগটির নাম C'honla। শ্যাম এবং কাম্বোজের দক্ষিণভাগে কুমারী নদী এবং অন্তরীপ আছে। ঐ কুমারীনদীধৌত প্রদেশকেই কুমারবর্ষ মনে করা হইয়াছে। আরবদিগের একটি প্রাচীন বর্ণনা হইতেও ঐ প্রদেশের 'কোমর' নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্যামদেশে 'উদৈ' এবং 'লেষ্টৈ' (Lestai) নামে যে দুই পর্ব্বত পাওয়া যায়, তাহাই উদয়গিরি এবং অস্তগিরি বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে। ভাগবত পুরাণের পুরোজব এবং মনোজব নামের অনুরূপ লাউজবা অথবা Lāu C'hwā নাম পাওয়া যায়। শ্যাম দেশের প্রাচীন নাম সামরট্ট বা শ্যামরাষ্ট্র। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় আছে যে ভব্যের পুত্র বর্ষবিভাগ করিয়াছিলেন। শ্যাম ও কাম্বোজের প্রাচীন বিবরণে পা য়া যায় যে ভববর্ম্মণের পুত্র ঈশান বর্ম্মণ ৬২৭ খৃষ্টাব্দে কাম্বোজ জয় করিয়াছিলেন। এই কাম্বোজের দক্ষিণেই কুমারবর্ষ।

শ্যামদেশের প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিব। শ্যাম দেশের তিনটি স্থানে প্রধান নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল জানা যায়; যথা সুখকৈ বা সুখদ, দ্বারবতী, এবং আয়ুথিয়া বা অযোধ্যা। বিষ্ণুপুরাণে সুখোদয় নামক স্থানকে প্লক্ষদ্বীপ বা ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু "সুখকৈ" শ্যাম দেশে স্থিত হইলেও ব্রহ্মের ঠিক পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। শ্যামদেশের পূর্ব্বদিকে প্রাচীন সরযূ নদী প্রবাহিতা। অপভ্রংশেরও অপভ্রংশে এখন সরযূ নদী Hsiyu নামে প্রসিদ্ধ। এদেশের ব্রাহ্মণেরা অর্থাৎ পৌরোহিত্যকার্য্যকারীরা "আচান্" নামে পরিচিত। আচান কথাটি আচার্য্য শব্দের অপভ্রংশ। আমাদের দেশের

আচার্য্য ব্রাহ্মণেরা বলেন, যে, তাঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ; এবং পূর্ব্বে তাঁহারা সরযূতীরবাসী ছিলেন; এবং সেই স্থান হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। আমরা শ্যামদেশকে শাকদ্বীপ বলিয়া পাইতেছি; সেখানে সরযূ নদীও পাইতেছি। এবং ব্রাহ্মণগুরুর সাধারণ নাম আচান বা আচার্য্য বলিয়া পাইতেছি। ইহা হইতে কোন সিদ্ধান্ত করা চলে কিনা, তাহা পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। শ্যামের রাজারা অল্পকাল হইল, অযোধ্যার রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বেঙ্ককে রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। এখন যিনি শ্যামের অধিপতি, তিনি অক্সফর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। এই শিক্ষিত মহারাজাও আপনাকে ভারতের ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

বহির্ভারতে ভারতের আর্য্যজাতির কীর্ত্তির কথা অতি অল্পই বলা হইল। কিন্তু যতটুকু লিখিয়াছি, তাহাতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে এই পতিত জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা একদিন বহু গুণে বহু ক্ষমতায় ভূষিত ছিলেন। একদিন যে দেশ বাহুবলে এবং নৈতিক বলে বিজিত হইয়াছিল, এখন কি প্রীতির বলে আমরা সে দেশের সহিত একতা স্থাপন করিয়া প্রাচীন গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারি না? পূর্ব্বে একবার যে কথাটি লিখিয়াছিলাম, সে কথাটি আবার বলি, যে, একদিন "গান্ধার হইতে জলধি শেষ" বলিলে টং-কিং উপসাগরের কূল পর্য্যন্ত বুঝাইত। সেই দেশ আর এই দেশ!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

শীত ও বসন্ত

প্রকৃতি দেবীর স্বপনপুরেতে, কে তুমি গোপন হ'য়ে,
পশিলে জীয়ন-মরণ-কাঠির সোনার শস্ত্র ল'য়ে!
তোমার মরণ-কাঠির তুহিন অবশ পরশ লাগি'
স্বপ্ন-জড়িত নয়ন-পক্ষ্মে শিশির উঠিল জাগি'।
পল্লব-নীল শ্লথ অঞ্চলে আস্তৃত ধরাতল,
খসিয়া পড়িল স্রস্ত মলিন পুষ্প-চিকুরদল।
মুছিয়া হাস্য, আস্যে ফুটিল জড়িমা, কুহেলি মায়া,
মরণের হিম শ্বাসের আঁধারে ছাইল পাণ্ডু ছায়া।
দূরে গেল সেই প্রণয়ের মৃদু রোমাঞ্চ শিহরণ,
ভীম কম্পনে কাঁপায় গাত্র সমীরণ-প্রহরণ।

কে তুমি প্রেমের মোহন দেবতা, নিখিল প্রাণের প্রিয়,—
ছোঁয়ালে প্রকৃতিবালার অঙ্গে জীয়ন-কাঠিটি স্বীয়।
কেটে গেছে কত অধীর বিরহে বিরহ-দীর্ঘ মাস;
করিয়া চূর্ণ গত প্রণয়ের জীর্ণ সে ইতিহাস,
নূতন-মিলন-কাব্য রচনা কবিছ পাগল পারা,
কোন্ সে পুরুর যৌবন দেহে যযাতির দিয়া জরা!
তোমার জীয়ন কাঠির সরস জীবনী পরশ লভি'
উঠিল জাগিয়া তরুণী প্রকৃতি - নবীন মোহন ছবি।
তোমার প্রথম দরশ লভিয়া, বিহ্বল অনুরাগে,
ভাতিল দু'খানি কোমল গণ্ড রক্তিম স্নেহ-রাগে।
পুষ্প-বিলাসে দিলে গো ভরিয়া তা'র কুন্তল-সাজি,
চরণে কোকিল-কণ্ঠ-মুখর নূপুর উঠিল বাজি'।
কে তোমরা ওগো গোপন দেবতা, প্রকৃতি-পুরুষরূপে,
যুগ যুগ ধরি' প্রণয়ের খেলা খেলিতেছ চুপে চুপে!

শ্রীসুব্রত চক্রবর্ত্তী।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

৪

ভারতীয় শিল্পকলার ক্রমবিকাশ।—হীন-যানসম্প্রদায়ের বৌদ্ধ-বাস্তুশিল্প।—মহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ বাস্তুশিল্প ও তক্ষণশিল্প। —পারস্য ও গ্রীসের প্রভাব।—হিন্দুধর্ম্মের শিল্পকলা।—চিত্রকলা—অজন্তা —ভবভূতির একটী বর্ণনা।

কল্পনা-সাহিত্যের ন্যায় শিল্পকলাও প্রাচীনযুগের শেষ তিন শতাব্দীর মধ্যে গঠিত হয়; আধুনিক যুগের চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত ক্রমশ পুষ্টিলাভ করে, পরে অবনতি প্রাপ্ত হয়।

বাস্তুশিল্প।—আর্য্যেরা কাষ্ঠের দ্বারাই গৃহ-নির্ম্মাণ করিত।

উহারা দ্রাবিড়ীয়দিগের নিকট হইতে পাথরের স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে শেখে। পারস্য, নক্সা যোগাইল; গ্রীস্, অলঙ্কার যোগাইল। কিন্তু অত্যুজ্জ্বল বহুবর্ণের

প্রয়োগে এই ধার-করা গঠনরীতিগুলির ধরণটাই বদ্‌লাইয়া গেল।

আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের বাস্তুরচনায় এমন একটা কঠোর সরলতা দৃষ্ট হয় যাহা তত্ত্বজ্ঞানী ও ভক্তদিগের মন্দিরেরই উপযোগী; উহাতে সুরুচি ভক্তি ও কঠোর তপস্যার আভাস পাওয়া যায়। কতকগুলি স্মৃতিমন্দির—যথা, স্তুপ ও "ডাগোবা" বা ভরাট গম্বুজ যাহার মধ্যে গৌতমের স্মৃতিচিহ্নসমূহ নিহিত; উহা পাথরের গরাদের দ্বারা বেষ্টিত। শৈলের মধ্যে কতকগুলি গুহাও খোদিত। তারপর চৈত্য:—বহির্ভাগে একটা দ্বারপ্রকোষ্ঠ, স্তম্ভ-শ্রেণীর দ্বারা পৃথক্‌কৃত তিনটি দর-দালান; ছোট ছোট কাঠের খিলানের দ্বারা সমাচ্ছন্ন কতকগুলি খিলান-মণ্ডপ; মণ্ডপের বেদীস্থানে ডাগোবা। তারপর, বিহার:—একটা বারণ্ডা দিয়া একটা বড় দালানে প্রবেশ করা যায়; সেই দালানের গায়েই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ উদ্‌ঘাটিত। তারপর অলঙ্কারহীন কতকগুলি সাদাসিধা মঠ।

ভিক্ষুসম্প্রদায় রাজাশ্রিত হইয়া পড়িল। এই বিজয়-সংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য, কতকগুলা প্রকাণ্ড ডাগোবা—যেমন, সিংহলস্থ অনুরাধপুরের ডাগোবা এবং কতকগুলি কারুকার্য্যভূষিত জম্‌কাল ধরণের ডাগোবা নির্ম্মিত হইল—যেমন সাঁচির ডাগোবা:—পাথরের গরাদের গায়ে চারিটি বিজয়-তোরণ উদ্‌ঘাটিত, উহা খোদিত মূর্ত্তিতে আচ্ছন্ন; পৌরাণিক-কাহিনী ও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাই ঐ সকল মূর্ত্তিরচনার বিষয়। কিন্তু কুত্রাপি বুদ্ধের মূর্ত্তি নাই, তখনও পৌত্তলিকতা বৌদ্ধধর্ম্মে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত।

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে, রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম্ম, মূর্ত্তিপূজা, অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ্যা, নির্লজ্জ কল্পনা, বিকৃত অনুভূতি—এই সমস্ত আবির্ভূত হইল। গুহা ও ডাগোবাসমূহ, খোদিত মূর্ত্তিতে, প্রতিমাতে, চিত্রকর্ম্মে সমাচ্ছন্ন হইল। সর্ব্বত্রই বুদ্ধমূর্ত্তি দেবতারূপে আরাধিত, কিন্তু মন্দিরাদির বহুবর্ণ রঞ্জিত সম্মুখভাগের উপর যে সকল অদ্ভুত অলৌকিক কার্য্য চিত্রিত ও যে সকল বিকট দেবমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে তাহাতে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশ পায়, সেরূপ চাঞ্চল্যের ভাব বুদ্ধ মূর্ত্তিতে নাই। বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি সৌম্য শান্ত ও সুন্দর। কোথাও ভগবান ধর্ম্মপ্রচারের জন্য হস্তোত্তলন করিয়াছেন; কোথাও বা বুদ্ধ মহাযোগীর ন্যায় যোগাসনে পদ্মের উপর আসীন হইয়া শূন্যের ধ্যানে নিমগ্ন। এই মূর্ত্তিগুলি যেন স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে—বিশুদ্ধ মতবাদগুলি অন্তর্হিত হইয়া এখন কেবল তাহার স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তিরচনায় ফলবতী গ্রীসীয় শিক্ষারই পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত যুঝিবার জন্য, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক একটা পূজা-পদ্ধতি গঠিত হইল। হিন্দু দেবতাদিগের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। দেবালয়ের ইমারতগুলি পারস্য ধরণের;—গুরুভার তলদেশ, সরল রেখাগুলি অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত, ত্রিকোণাকৃতি পাথরের চূড়া। বৌদ্ধ বিহারের আদর্শে গুহা সকল খোদিত হইল।

হিন্দুসাহিত্যের যে প্রবণতা, সেই একই প্রবণতা গুহা-মন্দির ও নির্ম্মিত মন্দিরেও সত্বর প্রকাশ পাইল। প্রশান্ত বুদ্ধমূর্ত্তির স্থান অধিকার করিল,—বহু-অঙ্গবিশিষ্ট, বহু মস্তকবিশিষ্ট হিন্দুদেবগণ। "সপ্ত মন্দিরে," এল্লোরার প্রাথমিক গুহাগুলিতে, এলেফ্যাণ্টায়, তবু একটা ভব্য-ধরণের গঠনরীতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু কৈলাস নামক গোটা-পাথরের মন্দিরে কোন গঠনরীতিই দৃষ্ট হয় না। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর নাটকগুলি যে শিক্ষা দিয়াছিল,—"মাতৃকা-গুহা"র করালদশনা ও কামাতুরা দেবীগণ সেই শিক্ষার পূর্ণতা সম্পাদন করিল। ঐ গুহা-মন্দিরে কেবলি মন্ত্রতন্ত্র, ইন্দ্রজাল ও নরবলির দৃশ্য। একদিকে যেমন বিকট ধরণের রচনা, আবার অন্য দিকে এমন একটা সুকুমার সঙ্কোচের ভাবও দৃষ্ট হয় যাহা কৃত্রিমতার সীমা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রতি শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে, অলঙ্কারের বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অলঙ্কারগুলিও আরও জটিল ধরণের হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত সরল রেখাগুলি পাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে ঢাকিয়া গিয়াছে। যে রুচি, মহা-কাব্যের স্থানে, সূক্ষ্মধরণের শ্লেষবাক্যবিশিষ্ট ও জটিল ধরণের বিবিধ ছন্দোবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাকে বরণ করিয়াছে, এস্থলেও সেই একই রুচি প্রকাশ পায়। (১)

**

(১) কি বাস্তুশিল্প, কি তক্ষণশিল্প—উভয়েতেই, কোন্‌গুলি গ্রীসীয় কীর্ত্তিচিহ্ন তাহা প্রথমে নির্ণয় করা আবশ্যক। পরিচ্ছদে আবৃত মূর্ত্তি,

বহুবর্ণময়ী উৎকীর্ণ মূর্ত্তি-রচনা হইতে চিত্রশিল্প আপনাকে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া শীঘ্রই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। গোড়ায়, অজন্তা গুহা মন্দিরের অনুরূপ স্থূল অথচ স্বাভাবি ধরণের রচনারীতি:—ছেলেমানুষী ধরণের ভূভাগে দৃশ্য, মূর্ত্তিগুলি গঠনহীন, মুখ সযত্নে নকল-করা, চেহা সুন্দররূপে ও জীবন্তভাবে চিত্রিত। তাহার পর, ধর্ম্মঘটি চিত্ররচনা:—বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন, অপ্সরাগ সিদ্ধ ভক্তদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছে। সর্ব্বশে প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত কতকগুলি বৃহৎ চিত্র (Fresco তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের চিত্র আছে, এবং সেই চিত্রে ভূষণাংশে, কোন একটা বিশেষ উপাখ্যানের ঘটনাপরম্প চিত্রিত:—যথা, মৃগয়া, যুদ্ধ, সমারোহযাত্রা, সারিবদ্ধ যাত্রা, মনুষ্য ও দেবতা, দেবযোনি, রাক্ষস ও দৈত্য।

যখন সমাজ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল তখনই চিত্রশিল্পে লোকের সমধিক রুচি জন্মিল। তখন রাজপ্রাসাদে চিত্রশাল স্থাপিত হইল। চিত্রশালার প্রাচীর-গাত্রে অথবা বড় বড় চিত্রপটে চিত্র অঙ্কিত হইত। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই ভূভাগের চিত্র রচনা করিত। প্রেমিকজন স্বকীয় প্রেয়সীর চিত্র এবং প্রণয়িনী স্বীয় বল্লভের চিত্র আঁকিত; এইরূপে তারা স্বকীয় অনুরাগের সাক্ষ্য বিনিময় করিত। চিত্রপটে কোন একটা সরস শ্লোক লিখিয়া দেওয়া হইত।

"নব-ইন্দুকলা-আদি আছে দ্রব্য প্রকৃতি-মধুর
উন্মাদক আরো কত পদার্থ প্রচুর।
সে নেত্র-জোছনা হেরি' মনে নাহি ধরে এই সব
সেই মোর একমাত্র নেত্রের বিষয়—মহোৎসব॥" (২)

এই চিত্রশিল্পের অনুরাগ,—এমন কি, কাব্যের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভবভূতির এই বর্ণনাটি দেখ:—

মানান-সই মুখাবয়ব সামঞ্জস্য-সহকারে বিন্যস্ত উৎকীর্ণ মূর্ত্তিসমূহ, 'ডোরিয়েন্' 'আইয়োনিক' বা মিশ্র ধরণের স্তম্ভবিশিষ্ট মন্দির—এই সমস্তই গ্রীসীয় কীর্ত্তির নিদর্শন। এই প্রকারের অধিকাংশ কীর্ত্তিচিহ্ন আফ্‌গানিস্থান, পঞ্জাব, কাশ্মীর ও যমুনা-অববাহিকার উত্তরাংশে পাওয়া গিয়াছে। তত্রাপি গ্রীসীয় হিন্দুশিল্প সমস্ত ভারতবর্ষেই ছড়াইয়া পড়ে; কেন না, কৃষ্ণা-অববাহিকার অন্তর্গত অমরাবতীর মন্দির—ঐরূপ শিল্পরচনার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা (খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দী)। এই গ্রীসীয় শিল্পের প্রতিযোগী—হিন্দুরা যাহাকে জাতীয় শিল্প বলে। বাস্তুশিল্প একেবারেই পারস্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়; কিন্তু এই যুগের অধিকাংশ ইমারৎই মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে, কাথিওয়ার-প্রায়দ্বীপের অন্তর্ভুত দ্বারকার মন্দির খুব প্রাচীন বলিয়া প্রচলিত, কিন্তু সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ; পুরীর মন্দিরের নির্ম্মাণ-কাল নবম শতাব্দী; বুন্দেলখণ্ডে কতকগুলি খুব প্রাচীনকালের মন্দির আছে, এবং গোয়ালিয়ারে নবম ও একাদশ শতাব্দীর কতকগুলি মন্দির দৃষ্ট হয়; এই সকল মন্দির দেখিয়াই আমরা প্রাচীন গঠন-রীতির বিচার করিতে পারি; বারাণসীর আধুনিক মন্দিরগুলি উহা হইতে বেশী তফাৎ নহে; কেবল পাথরের চূড়াগুলি একটু বেশী সূচাগ্র। এক ধরণের তক্ষণশিল্প আছে, হিন্দুরা যাহাকে জাতীয় শিল্প বলিয়া বিশ্বাস করে। এই "জাতীয়"-শিল্পের শিল্পিগণ, অন্যান্য রচনার মধ্যে বড়‍্টের তক্ষণশিল্প (যাহা একটু স্থূলধরণের) রচনা করিয়াছে; আর রচনা করিয়াছে সেই সকল চমৎকার উৎকীর্ণ মূর্ত্তি যাহার দ্বারা সাঁচির তোরণ সকল বিভূষিত। অবশ্য মূর্ত্তিগুলির মুখের ধাঁচা নিছক ভারতীয় ধরণের; কাহিনী ও দৃশ্যগুলিও ভারতীয়; ব্যক্তিগুলিও ক্ষুদ্রাকৃতি ও ত্বরান্বিত; গ্রীক্ উৎকীর্ণ মূর্ত্তি-রচনার সহিত এ সমস্তর কোন সাদৃশ্য নাই। তথাপি,—যেহেতু এই সকল তক্ষণশিল্পের মধ্যে কোনটাই আলেক্‌জাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, তাই আমাদের প্রতীতি হয়, এই সম্প্রদায়ের শিল্পিগণ গোড়ায় গ্রীক্‌দিগের শিষ্য ছিল, পরে নিজ শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া, উত্তরোত্তর গ্রাক্‌গুরুদিগের প্রভাব অতিক্রম করে। বাস্তুশিল্প ও তক্ষণ-শিল্পের সাধারণ ধরণ দেখিয়া আমাদের এইরূপ প্রতীতি হয়, খুব প্রাচীনকালে একসম্প্রদায়ের ভারতীয় শিল্পী ছিল, যাহারা কাষ্ঠফলকের উপর রচনা করিত; পরে ঐ ধরণের কাজ উহারা পাথরের উপর নকল করিতে আরম্ভ করে। হইতে পারে, এই সকল শিল্পী গ্রীসীয়-হিন্দু শিল্পসম্প্রদায়ের প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াও, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে স্বকীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করে।

দাক্ষিণাত্যের বাস্তুশিল্প একেবারেই বিশেষ ধরণের; ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দেই উহার একটা নিজস্ব রচনারীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের বিষয় বলিবার সময় এই বিষয়ের অনুশীলন করা যাইবে। প্রস্তর-নির্ম্মিত যত ইমারৎ আছে, গুহা মন্দিরগুলি যে সেই সব ইমারতের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সকল প্রদেশে শৈল খনন করা সহজসাধ্য হয় নাই—সেইখানে বিহার ও মন্দির কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়। কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দিরাদির আদর্শেই খুব প্রাচীন গুহা-মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয়। তাছাড়া, সম্ভবত বহির্ভাগে কাষ্ঠ বা ইঁট দিয়া গুহামন্দিরের পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। কার্লির চৈত্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর (খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী)। প্রাচীনযুগের দ্বিতীয় শতাব্দী ও আধুনিক যুগের দ্বিতীয় শতাব্দী এই দুয়ের মধ্যে হীনযানসম্প্রদায়ের অজন্তাগুহা-মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয়। মহাযান-সম্প্রদায়ের গুহামন্দিরগুলি বোধ হয় ৫০০ ও ৬৫০ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। ৬৫০ হইতে ৭০০ এই কালের মধ্যে এল্লোরার বৌদ্ধ মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয়। আধুনিক যুগের আরম্ভ ও সপ্তম শতাব্দী এই কালের মধ্যে নাসিকের মন্দিরগুলির খননকার্য্য ও বিভূষণ-কার্য্য সম্পাদিত হয়। মাদ্রাস হইতে কিয়ৎ ক্রোশ দূরে, সমুদ্রের ধারে অবস্থিত মহাবল্লিপুরের গোটা-পাথরের ব্রাহ্মণ্যিক মন্দিরগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেখানে কতকগুলি গুহা, কতকগুলি উৎকীর্ণ মূর্ত্তি, কতকগুলি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। যতগুলি ব্রাহ্মণ্যিক গুহা আছে তন্মধ্যে, বোম্বায়ের অন্তর্গত সালসেট্‌দ্বীপস্থ এলেফান্টার গুহাগুলি সর্ব্বপ্রধান। এবং এল্লোরার গুহাসমূহের মধ্যে কৈলাস নামক গোটা-পাথরের মন্দিরটি সর্ব্বপ্রধান (অষ্টম শতাব্দী)।

(২) মালতী-মাধব, প্রথম অঙ্ক। উত্তররামচরিতের আরম্ভ ও মালবিকাগ্নিমিত্রও দ্রষ্টব্য।

"......এখান থেকে এই সকল গিরি:নগর গ্রাম সরিৎ অরণ্য সমস্ত একেবারেই আমার দৃষ্টিগোচর হচ্চে। (পশ্চাতে অবলোকন করিয়া) চমৎকার! চমৎকার!

কিবা শোভে পদ্মাবতী!
সুবিশাল দুই নদী "সিন্ধু" আর "পারা"
ঘিরিয়া রয়েছে তারে,
—কটিবন্ধসম কিবা স্বচ্ছ বারিধারা।
উত্তুঙ্গ প্রাসাদ কত,
দেব-গৃহ, পুরদ্বারী অট্ট অগণন,
হইয়া বিভক্ত তাহে
আকাশ করিছে নিজ মস্তকে ধারণ।

শোভিছে লবণা নদী
বক্ষে যার উর্ম্মিমালা সুন্দর শোভন
বর্ষাগমে যার তট
নব উলু-তৃণরাজি করয়ে ধারণ—
(জনপদ-সুখদায়ী,
গর্ভিণী গাভীর ভক্ষ্য প্রিয় অতিশয়)
নদীটির উপকণ্ঠে
শোভিতেছে মনোহর বিপিন-নিচয়॥

এই সেই ভগবতী সিন্ধুর প্রপাত; জলের পতন-বেগে ভূতল বিদীর্ণ করে' যেন একটা রসাতলের সৃষ্টি করেছে।

হেথায় তুমুল ধ্বনি
—জলগর্ভ-নবঘন-ঘোরতর-গর্জ্জন সমান—
সীমান্ত-ভূধর কুঞ্জে
সমুত্থিত—হেরম্বের কণ্ঠধ্বনি হয় অনুমান॥

এই সকল অরণ্য-গিরিভূমি—চন্দন, অশ্বকর্ণ, সরল, পাটল প্রভৃতি গহন তরুরাজিতে পরিপূর্ণ ও পক্ব বিল্বফলের সৌরভে আমোদিত। এইগুলি দেখে দাক্ষিণাত্যের অরণ্য-পর্ব্বতগুলি মনে পড়ে;—সেই সব স্থান—যেখানে গোদাবরী নদীর প্রচণ্ড প্রবাহ, তরুণ কদম্ব-জম্বু-বৃক্ষাচ্ছন্ন গহন কুঞ্জে প্রবেশ করে, এবং তার ঘোরতর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিকস্থ বিশাল মেখলা-ভূমি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আর ঐ দেখ, সুবর্ণবিন্দু নামে ভগবান ভবানীপতি এইখানে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হয়ে, মধুমতী ও সিন্ধুর সঙ্গম-প্রদেশটিকে পবিত্র করেছেন।

এই যে উত্তুঙ্গ সানু
অভিনব-মেঘ-শ্যাম মহাকায় পর্ব্বত হেথায়
মিলিয়া ময়ূরী সাথে
ময়ূর মদ-মুখর হর্ষভরে কেকারবে ছায়;
স্নিগ্ধচ্ছায় দেহ-মাঝে
বিচিত্র বরণ কত পক্ষী-নীড় করয়ে ধারণ
নিরখিয়া হেন গিরি তিরপিত হইল নয়ন॥
গহ্বর-নিবাসী যত
সুভীষণ মদমত্ত ভল্লুক তরুণ
তাদের ফুৎকার রবে
গরজন-প্রতিধ্বনি বাড়য়ে দ্বিগুণ।
গজভগ্ন শল্লকীর
গ্রন্থিখণ্ড চারিধারে রহে বিকীরিত
তা হতে ঝরিয়া ক্ষীর
শিশির-কটু-কষায় গন্ধে আমোদিত॥
(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া)

একি। মধ্যাহ্ন যে। এখন এখানে:—
ত্যজিয়া কাশ্মরী-তরু
কোবা-পক্ষী, পল্লবিত-কৃতমালে করয়ে গমন,
তীরের অশ্বত্থ-শাকে
চুম্বিয়া পুণিকা-পক্ষী, জলাশয়ে করয়ে ধারন।
তিনিশ-কোটর-মাঝে
দাত্যূহ নিলীন হয়ে করে অবস্থান—
কপোত সে গুল্ম-নীড়ে
কাঁদিছে,—কুক্কুভ নীচে করে যোগদান॥"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'রহসি'

(নোগুচি)

গোলাপ যে ভাষা বলিতে এখন গিয়েছে ভুলি'
সে নিভৃত ভাষে নারী সে কহিল মু'খানি তুলি,'—
"প্রিয় মোর! প্রিয়তম!"
সচেত গোলাপ সম;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে আওয়াজ আজো ফোটে নাই কোনো সাগর দিয়া।

মখ্‌মল্-পরা জোছনা যেমন ভুবনে নামে,—
তারি মত চুপে নারী সে কহিল হেলিয়া বামে,—
"প্রিয় মোর! প্রিয়তম!"
সান্দ্র জোছনা সম;
পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল ক[illegible]ল "প্রিয়া!"
সে আওয়াজ আজো লুকায়ে রেখেছে গিরির হিয়া।

সন্ধ্যা যে সুরে তারাদলে ডাকে গোধূলি শেষে
সেই মৃদু সুরে নারী সে কহিল রভসাবেশে,—
"প্রিয় মোর! প্রিয়তম!"
সন্ধ্যা-প্রতিমা সম;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে আওয়াজে জাগে ফাল্গুন,—মৃত ওঠে গো জিয়া।

তুষার গলিয়া গোপনে যেমন সলিল সরে
তারি মত সুরে নারী সে কহিল নিরালা ঘরে,—
"প্রিয় মোর! প্রিয়তম!"
তরুণী তটিনী সম;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে ভাষায় শুধু আকাশেরে ডাকে বনের হিয়া।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্মদুঃখী

দশম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির দশা।

[illegible], সিলা যে এতদিন পর্য্যন্ত নিকোলার সঙ্গে ভাব রাখিতে পারিয়াছে, ইহাতে হল্‌ম্যান্ গৃহিণী মনে মনে ভারি বিরক্ত হইয়া গেল। এখন হইতে সে সিলাব গতিবিধিব উপব আবো কড়া নজর রাখিতে স্থরু করিল। নিকোলাব তো প্রবেশ নিষেধ্।

সমর্থ মেয়ে নিষ্কর্ম্মা থাকিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে; এখন হইতে সিলাকে দস্তরমত খাটাইতে হইবে; কাজে কর্ম্মে থাকিলে বাহিরের কথা মনে থাকিবে না। শুধু দুধ আনা, মোজা সেলাই নয়,—কাজের মত কাজ, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি।

নিকোলা দেখিল, সম্বন্ধ এক রকম স্থির হইয়া গেল বটে, কিন্তু, দেখা শুনার ভারি অসুবিধা হইল। না হোক দেখা সাক্ষাৎ,—সম্বন্ধ তো স্থির,—নিকোলা তাহাতেই খুসী। এখন পুরুষ বাচ্ছার মত খাটিয়া খুটিয়া এক শত ডলার জমাইতে পারিলেই হয়। নিকোলার হাতে, হাতুড়িটা যেন কলের বেগে চলিতে লাগিল।

হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর অতি-সতর্কতায় নিকোলা সন্তুষ্ট হইতে না পারুক, কতকটা নিশ্চিন্ত যে হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। ক্রিষ্টোফা-জোসেফাদের কুসংসর্গ হইতে বেচারী সিলা এবারের মত রক্ষা পাইল। সন্ধ্যা বেলার মাতামাতি একেবারে বন্ধ। কারখানা হইতে ফিরিবার সময় হঠাৎ একদিন বার্ব্বারার দোকান হইতে লাড্‌ভিগ্‌কে বাহির হইতে দেখিয়া নিকোলা চমকিয়া উঠিল।

"এই সে! না?" বার্ব্বারার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া কথা কয়টা বলিয়াই,—যেন ঠিক নিকোলাকে চিনিতে পারিতেছে না,—এই ভাবে উহার দিকে অর্দ্ধ-মুদিত চক্ষে চাহিতে চাহিতে, ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লাড্‌ভিগ্ চলিয়া গেল।

"মা! ও এখানে কি করতে এসেছিল?"

"কই? কিছু না।"

"তুমি টাকা ধার চেয়েছ? ঠিক ক'রে বল।"

"মা গো না,—এক পয়সাও চাইনি; টাকার খু দরকার, তবুও চাইনি!"

"ও বল্‌ছিল কি?"

"কি আবার বলবে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, দোকান থেকে চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে গেল।...এতে বোধ হয় তোমার অপমান করা হয় নি! আর, ওকে ঢুকতে মানা ক'রে কারো যে বেশী সম্মান বৃদ্ধি হ'বে তাও মনে হচ্ছে না।" বার্ব্বারা মনে মনে ক্রমশঃ গরম হইয়া উঠিতেছিল।

"না, মা, আমি ওকে ঢুকতে মানা করতে পারিনে। কিন্তু, মনে রেখো, যে, যদি শুনতে পাই তুমি ওর কাছে টাকা ধার করেছ, তা' হ'লে আর মুখ দেখাদেখি থাকবে না।"

"পাগল! পাগল! এত অল্পে তুমি রেগে ওঠ, নিকোলা!...ওর কাছে কেন টাকা চাইব? তুমি যখন একবার মানা ক'রে দিয়েছ তখন চাইবার দরকার?" বলিতে বলিতে হঠাৎ পিছন ফিরিয়া বার্ব্বারা তাহার মুঠা হইতে কি একটা জিনিস বুকের কাপড়ে লুকাইয়া ফেলিল।

"ও আমার বিষয় কী বলছিল?"

"কই? না!"

"বল্‌ছিল বই কি, মা!"

"তোমার কথা?...ও!...হ্যাঁ, হ্যাঁ; আমিই বল্‌ছিলুম যে, হল্‌ম্যান্-গিন্নির কথামত তুমি এখন উঠে পড়ে টাকা জমাতে সুরু ক'রেছ, আর আজকাল খুব খাট্‌ছ; তাইতে তোমার কথা উঠল।"

"সিলার কথাও হ'ল!"

"উঁ—হুঁ। ও সে আগেই শুনেছে;—এ পাড়ায় তো আর গেজেটের অভাব নেই, সে কথা ও আগেই শুনেছে।"

"তুমি বল্‌লেও ক্ষতি ছিল না। সিলা যে এখন বাগ্‌দত্তা হ'য়ে আছে, সে কথা ওর জেনে থাকা উচিত।"

"আমিও তাই বলিছি,...ও কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করলে বলে বোধ হল না।"

"তাই নাকি? বটে!" নিকোলা জানালার ধারে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। লাড্‌ভিগের এখন মৎলবটা কি?

নিকোলার ভাবনার অন্ত ছিল না। এদিকে তো এই; ওদিকে আবার যে কারখানায় সে কাজ করে, সেখানে

বাইস্‌ম্যানের কর্ম্ম খালি হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় ভারি একটা গোলমাল চলিতেছিল। মনিব-গৃহিণী অনেকবার নিকোলাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া বলেন নাই। কারণ, পুরাণ বাইস্‌ম্যানের বিদায় লইতেও দেরী আছে, সে গ্রীষ্মের পর ভিন্ন যাইবে না। কারখানায় ইহারি মধ্যে গোলমাল উঠিয়াছে "বল কি? আমাদের ওলফ্‌ বাইস্‌ম্যান্‌ হ'বে না?...আচ্ছা না হোক: ওকে ঠেলে যে বাইস্‌ম্যান্‌ হ'তে চায়, তাকে কিন্তু একলাই কারখানা চালাতে হ'বে, আমরা কেউ তার তাঁবেদার হ'য়ে থাক্‌ব না; ওলফের সঙ্গে সঙ্গে সব বেরিয়ে চলে যাব।" এই রকমের কথা আজ কাল নিকোলা প্রায়ই শুনিতে পায়। নিকোলার উপর সকলেই চটা,—নিকোলা মদ খায় না, কাজে ফাঁকি দেয় না, উহাদের দলে ভিড়ে না—ইহা কি কম অপরাধ!

নূতন কারখানায় নিকোলা একটিও সঙ্গী পায় নাই,—বন্ধু তো দূরের কথা। সুতরাং এত লোক থাকিতে হঠাৎ সে বাইস্‌ম্যান্‌ হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় খুসী তো কেহ হইলই না, উপরন্তু উহার জীবনের পুরাতন কাহিনী লইয়া খুব একটা ঘোঁট চলিতে লাগিল। চোর অপবাদে কবে সে পুলিশের হাতে পড়িয়াছিল সে কথাটা হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলেবেলায় কবে সে বান্‌হাউসে তেরপল মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল সে কথাটা পর্য্যন্ত,—কোনো কথাই উহাদের আলোচনা হইতে বাদ পড়িল না।

এই সমস্ত অপমান-সূচক কথা নিকোলার পক্ষে অত্যন্ত পীড়াজনক ছিল। লোকে তাহার জীবনের পূর্ব্বকাহিনী ভুলিয়া যাক্‌,—এই ছিল নিকোলার অন্তরের কামনা, কিন্তু লোকে তাহা ভুলিত না। এই সমস্ত আলোচনা ক্রমশঃ নিকোলার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তবুও, অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া দিনের পর দিন সে কারখানায় কাজ করিতে লাগিল, মনিব-গৃহিণীর কাছে হাজিরা দেওয়াও বন্ধ হইল না।

শেষে একদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া চশ্‌মা সাফ করিয়া গলা খাঁখার দিয়া অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মনিব-গৃহিণী বলিলেন, "দেখ বাপু, তুমি বেশ কাজের লোক, তা আমি জানি। কিন্তু অনেকে বলে ওলফ্‌ বড় ভাল লোক, খুব বিশ্বাসী। আর দেখ, আমি এখন বুড়ো হ'য়ে পড়েছি এখন একজন বিশ্বাসী লোকেরই বিশেষ দরকার,—না, না, তুমি যে বিশ্বাসী নও এমন কথা আমি বল্‌ছিনে,—আচ্ছা, আজ যাও, ভেবে দেখি,—ভাল করে চারিদিক ভেবে দেখি।"

যে আশায় নির্ভর করিয়া হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর কাছে নিকোলা বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে, মনিব-গৃহিণীর এই জবাবে তাহা একরূপ ধূলিসাৎ হইয়াই গেল।

তার পরদিন নিকোলা কারখানায় যাইতেই সবাই গা'টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল। নিকোলা বুঝিল, মনিব-গৃহিণী যে একরকম ঝাড়িয়া জবাব দিয়াছেন সে খবর উহারা রাখে। সে যাহাই হোক্‌, নিকোলা অত সহজে দাবী ছাড়িতেছে না। অত সহজে সে দমিবার পাত্র নয়।

ওলফ্‌ এম্‌নি ভাব দেখাইল, যেন কিছুই হয় নাই। সে অতীব ভদ্রভাবে নিকোলার কাজের সাহায্য করিতে গেল।

নিকোলা মুখ ফিরাইয়া বলিল "কাজের সময় আমি কাউকে দালালী করতে ডাকি নি; আমি নিজেও কারু কাজের উপর খোদ্‌কারি ফলাই নে। যে ভাল চায় সে সরে যাক্‌, নইলে পিটুনির চোটে তার পিটখানা এখুনি রাঙা লোহার মত গরম হ'য়ে উঠ্‌বে।"

সবাই নিস্তব্ধ, কেহ জবাব করিতে সাহস করিল না।

টিফিনের সময়ে কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। নিকোলা ওলফকে মারিবে বলিয়া শাসাইয়াছে,—সবাই সাক্ষী। হাতুড়ি দিয়া লোকটা শুধু লোহাই পিটে না, হাড়ও গুঁড়াইতে পারে! লোকটা কি! মানুষ?

নিকোলা উহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। ওস্তাদ হীগ্‌বার্গ্‌ পর্য্যন্ত কখনো নিকোলার কোনো খুৎ পায় নাই। কুছ্‌ পরোয়া নেহি;—নিকোলা বাইস্‌ম্যানির আশায় একরূপ জলাঞ্জলি দিয়াই দৈনিক কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল।

নিকোলা হীগ্‌বার্গ্‌কে মধ্যস্থ মানিবে; ওস্তাদ যাহাকে পছন্দ করে সেই বাইসম্যান্‌ হোক্‌। শেষ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাবই সে মনিব-গৃহিণীর কাছে করিবে।

এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে দুই মাস কাটিয়া গেল।

মনিব-ঠাকুরাণীর মৎলব কি? আর তো বাইস্ম্যান্ না হইলে চলে না। যাহাকে হোক্ বাহাল করুন্!

ইহারও পরে একদিন সকালে এক চিরকুটে নূতন বাইস্ম্যানের নাম লিখিয়া মনিব-ঠাকুরাণী একজন লোকের মারফৎ কারখানায় পাঠাইয়া দিলেন।

* * * *

গ্রীষ্মকালের সুদীর্ঘ দিনের অবসানে সন্ধ্যা নামিতেছে। হল্ম্যান্-গৃহিণীর বাসাবাড়ীর ছোট ছোট জানালাগুলি আগাগোড়া সব খোলা। জানালা দিয়া যাহাদের দেখা যাইতেছে তাহাদের সকলেরই পোষাক অল্পবিস্তর পাৎলা, অল্পবিস্তর ঢিলাঢালা। নিশ্বাসের মত মৃদু বাতাসে দড়ির উপরকার কাপড়গুলা মাঝে মাঝে অল্প দুলিয়া উঠিতেছে।

নীচেকার তলায় একটা জানালার পাশে, জলের কল খুলিয়া দিয়া জামার আস্তিন গুটাইয়া একটি ছিপ্‌ছিপে মেয়ে এক টব কাপড় জামা কাচিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার মুখও দেখা যাইতেছে।

মেয়েটি হঠাৎ চম্‌কিয়া কাপড় কাচা বন্ধ করিল।

বিজয়গর্ব্বে টুপিটা একেবারে মাথার পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিয়া নিকোলা হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

"দুনিয়া বেশ জায়গা, সিলা! বেশ জায়গা, মানিয়ে নিতে পারলেই হয়। মুরুব্বি যদি নাই থাকে তবে নিজেই নিজের মুরুব্বি হ'য়ে পড়্‌তে হয়। নিজেই নিজের মুরুব্বি।"

"আচ্ছা, নিকোলা, মা যে বাড়ী নেই তা কি করে জান্‌লে তুমি?"

"হুঁঃ! আমি যা' জানি নি এমন কিছু আছে নাকি!··· তবে শোনো, আমার মার মুখে শুন্‌তে পেলুম তোমার মা বাড়ী নেই, আণ্টনিদের বাড়ী কাপড় ইস্ত্রি করতে গেছে। বাস্! ···তাইত! সন্ধ্যা হ'য়ে এল;······দেখ সিলা, তুমি হয় তো শুনে খুসী হবে,—আমি বাইস্ম্যান্ হয়েছি। আজ সকালে মনিব-ঠাকরুণ আমাকেই বাহাল করেছেন। তার মানে মাসিক দশ ডলার ক'রে বেশী পাওয়া যাবে আর কি!"

"বাইসম্যান্? সত্যি? অ্যাঁ! বল কি?·· সত্যি!" সিলা কাপড়ের টব ফেলিয়া নিকোলার কাছে সরিয়া আসিল।

"এস, এস, তোমার মুখ চোখ ধুয়ে দিই, যে কালিঝুলি মেখেছ! ওর ভিতর থেকে বাইস্ম্যান্‌কে আমি চিনে উঠ্‌তে পারছি নে!······সত্যি? সত্যি বাইস্ম্যান্ হ'য়েছ? ······তা হ'লে ওলফ্ হ'ল না।"

"এখন আর অন্য মিস্ত্রিরা তোমার মনিব ঠাকরুণকে ভয় দেখাচ্চে না? তোমার সম্বন্ধে পাঁচ কথা লাগাচ্ছে না?"

"বোধ হয় হীগবার্গ্ সব ঠিক ক'রে দিয়েছে। নইলে যে রকম লাগাতে সুরু করেছিল তাতে কি আর হ'ত?"

"সেই—যে থেকে ওলফের হাতের কাজ তোমাকে ফের ভেঙে গড়তে হুকুম হয় সেই থেকে ওরা চটে আছে। তোমার এই উন্নতিতে হিংসেয় এইবার সব ফেটে মরবে আর কি! এখন আবার নতুন ক'রে তোমায় কোনো ফাঁদে ফেল্‌বার চেষ্টা না করলে বাঁচি।"

"নাঃ! আর কোনো গোল হ'বে না। দুনিয়া খাসা জায়গা! যে কাজের লোক সেই কাজ পায়।··· আজ সকালেই সইটই সব হ'য়ে গেছে। বাঁচা গেছে। এইবার টাকাটা চট্‌পট্ জমিয়ে ফেল্‌তে পারব। আর দেরী হ'লে মুস্কিলে পড়্‌তে হ'ত। মা যে টাকাটা নিয়েছিল—সে—সেতো হ'য়ে গেছে। মার ব্যবসাতে বোধ হয় উল্‌টা দিকে লাভ হ'চ্ছে!

"হাঁ! এতক্ষণে! দেখ দেখি,··মুখখানি যেন চক্‌চক্ করছে।"

"কারখানা থেকে সিধে তোমার কাছে চলে এসেছি—খবরটা দিতে। রাস্তায় মাকেও খবরটা দিয়ে এসেছি—বলে এসেছি,—আজ রাত্রের জন্যে দুটো ম্যাকারেল মাছ কিন্‌তে যাচ্ছি। আজ আবার দু নৌকা বোঝাই ম্যাকারেল এসেছে।"

সিলার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—খবরের মত খবর বটে। সিলা ও নিকোলা উভয়েই শৈশব হইতে শহরে বাস করিতেছে। সুতরাং ম্যাকারেল আসার সঙ্গে তাহাদের অনেক স্মৃতি জড়িত—বিশেষতঃ ছেলেবেলায় জেঠির ধারেই তাহাদের বাসা ছিল।

সিলা অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "আমি গায়ের কাপড়খানা নিয়ে তোমার সঙ্গে যাব? যাই, কি বল? ...তুমি ওই মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও পাড়ার ভিতরটা আমাদের একসঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না; দাঁড়িয়ো, বুঝ্‌লে? আমি এলুম বলে?"

সিলা উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছিল, সংযমের চেষ্টা অসম্ভব। তাহার উপর নিকোলার আজ মাহিনা বাড়িয়াছে! সে আজ বাইস্‌ম্যান্‌!

সিলা তাড়াতাড়ি নীল ছিটের পোষাকটা পরিয়া গায়ের কাপড় জড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং নিকোলার পিছনে পিছনে চলিল।

অল্প দূরে গিয়াই উহারা একসঙ্গে চলিতে লাগিল। সিলার সেই আগেকার মত স্ফূর্ত্তি, নিকোলার সেই তন্ময় দৃষ্টি। কোলাহলের মধ্যে ধূলার ভিতর দিয়া উহারা চলিয়াছে, নিকোলা কিন্তু দেখিতেছে শুধু সিলাকে;—হাস্যময়ী, লঘুহৃদয়া, কৃষ্ণনয়না সিলাকে।

ম্যাকারেলের আমদানীতে রাস্তায় ঘাটে আজ বেজায় ভিড়। পুলের উপরে কত লোক রেলিংয়ের উপর ঝুঁকিয়া মাছের নৌকা দেখিতেছে এবং মাঝে মাঝে পিছন হইতে ধাক্কা খাইয়া বিরক্ত ভাবে ঘাড় ফিরাইতেছে। আজ রাত্রে শহর সুদ্ধ লোক ম্যাকারেল্‌ খাইবে।

এই সুক্ষ্ম-পুচ্ছ, বিদ্যুৎগতি, সমুদ্রচারী, নীল-হরিৎ ম্যাকারেল আজ দুই দিন যাবৎ বাজারের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। একদিন পূর্ব্বেও ইহার আমদানী এত অল্প ছিল যে শহরের সকল বড়লোকের পাতে পড়িয়াছিল কিনা সন্দেহ। হঠাৎ 'হ্বাল্‌' দ্বীপ হইতে উপর্য্যুপরি একেবারে দুই তিন নৌকা আসিয়া পড়াতে বাজার একেবারে নামিয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যেকটার দাম দুই পেন্স্‌ আড়াই পেন্স্‌ মাত্র। সুতরাং মুটে মজুর সকলের ভাগ্যেই আজ ম্যাকারেল্‌।

আজ শহরের প্রত্যেক হাঁড়িতে ম্যাকারেল, প্রত্যেক কটাহে ম্যাকারেল, প্রত্যেক কেট্‌লিতে ম্যাকারেল। বন্দরে প্রত্যেক জাহাজে ম্যাকারেল, প্রত্যেক নৌকায় ম্যাকারেল, মাঝি মাল্লাদের প্রত্যেক শান্‌কিতে ম্যাকারেল। এই গরমের দিনে প্রত্যেকের হাতেই দুই তিনটা মাছ। ভাজা ম্যাকারেলের গন্ধে আজ সারা শহরটার হাওয়া ভরপুর।

যে গরম, আজ বেচিতে না পারিলে কাল সব পচিয়া যাইবে। "জন্ম জন্ম গরম পড়ুক, গরীব লোক খাইয়া বাঁচুক।" সকলের মুখে ঐ এক কথা।

নিকোলা ও সিলা একেবারে নৌকার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাছের দর করিতেছিল। সিলা এবিষয়ে খুব পটু, ছেলেবেলা হইতে তাহার এ বিষয়ে বেশ একটু দক্ষতা আছে। মেছুনি তাহার হাতে যে মাছ দুইটা তুলিয়া দিয়াছিল সিলা সে দুইটা নৌকার উপর ফেলিয়া বলিয়া উঠিল "না, বাছা, এ সুযিপক্ক চিম্‌সে মাছ আমার চাইনে। ঐ তলা থেকে তুলে দাও দেখি,—হ্যাঁ, ঐ—ঐ দুটো।"

সিলা টিপিয়া টুপিয়া বেশ করিয়া দেখিল, মাছ দুইটা নরম হইয়া যায় নাই।

নিকোলা দাম দিবার জন্য পকেটে হাত দিয়াছে এমন সময়ে তাচ্ছিল্যের ভাবে সিলা মাছ দুইটা আবার নৌকার পাটায় ফেলিয়া দিল।

"এঃ! এযে বাসি! চোখ দুটো একেবারে কড়ির মত হ'য়ে গেছে!"

"এই চমৎকার"—

"তুমি জান না, নিকোলা, তুমি কিছু চেন না। তা' দেখ বাছা, এ মাছ যদি আমাদের ঘাড়ে নিতান্তই চাপিয়ে দিতে চাও, তো ও দামে হবে না, দু এক পয়সা কমিয়ে নিতে হবে।"

শেষে দুই পেন্স্‌ করিয়া চারি পেন্সেই মেছুনি রাজী হইল।

* * *

বার্ব্বারা দরজায় দাঁড়াইয়া নিকোলার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিল দূরে সিলা, তাহার পিছনে একজোড়া ম্যাকারেল হাতে নিকোলা।

বার্ব্বারা সিলাকে মাছ চাখিবার নিমন্ত্রণ করিল। বার্ব্বারা খাইতে ও খাওয়াইতে সমান মজবুৎ।

সেদিন সারাটা সন্ধ্যা বার্ব্বারার তোলা উনুনে 'ছ্যাঁক' 'ছোঁক' শব্দে ম্যাকারেল ভাজা চলিতে লাগিল। ভাজার গন্ধে ক্ষুধাটাও একেবারে তাজা হইয়া উঠিল।

বার্ব্বারা মোটা মানুষ,—হাত তেমন চট্‌পট্ চলে না,—হাতাও নড়ে না। সিলা জোগাড় দেওয়াতে একরকম করিয়া সে দিনের রন্ধন-ব্যাপার চুকিল।

এইবার গরম গরম কড়া হইতে তুলিয়া পাঁউরুটি দিয়া ভাজা মাছ খাইবার পালা।

ঘর দালানের তপ্ত দেওয়াল মৃদুমন্দ সন্ধ্যার হাওয়ায় ক্রমে জুড়াইয়া আসিতেছে। যে তিনটি প্রাণী ঘরের মধ্যে ম্যাকারেল খাইতেছে তাহাদের পক্ষে এ রাত্রি উৎসবের রাত্রি।

নিকোলা আজ বাইস্‌ম্যান্, কারিগরের রাজা!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জৈনদর্শনের জীবতত্ত্বের একাংশ

বৌদ্ধেরা যেমন আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে প্রসিদ্ধ সম্যগ্‌দৃষ্টিপ্রভৃতিকে নির্ব্বাণের পথ বলিয়া থাকেন, জৈন ধর্ম্মেও সেইরূপ এই কয়টি মোক্ষপথ-নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে:-

সম্যগ্‌ দর্শন,
সম্যগ্‌ জ্ঞান, ও
সম্যক্ চারিত্র। *

এই মোক্ষপথের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা না করিলেও, কেবল যথাশ্রুত অর্থেই জৈন ধর্ম্মের মর্ম্মস্থানের একটি রমণীয় আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। জৈনগণ এই তিনটিকে রত্নের ন্যায় অত্যুপাদেয় মনে করেন, এবং সেই জন্যই ইহারা রত্নত্রয় বলিয়া জৈনশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। † আমরা এখানে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা না করিয়া সম্যগ্‌ জ্ঞানের বিষয়ীভূত তত্ত্বসমূহের মধ্যে কেবল জীবতত্ত্বসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ পাঠকগণের নিকট বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

তত্ত্ব বা প্রমেয় পদার্থের সংখ্যাসম্বন্ধে জৈন আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ চিৎ ও অচিৎ এই দুইটি পরম তত্ত্ব স্বীকার করিয়া সমস্তকেই ইহার অন্তর্গত করেন।‡ কেহ কেহ সাতটি তত্ত্বের কথা বলেন,§ আবার কেহ কেহ বিস্তৃতভাবে নয়টিও বলিয়া থাকেন,¶ চিৎ ও অচিৎ, অর্থাৎ অপর কথায় জীব ও অজীব এই দুইটি সমস্ত মতেই প্রধান তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অন্যান্য দর্শনে অথবা সাধারণ ব্যবহারে জীব শব্দে আমরা যে অর্থ বুঝিয়া থাকি, জৈন দর্শনের জীব শব্দ তাহা অপেক্ষা আরো ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে, এবং ইহা সবিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।

ইঁহারা জীবকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করেন; মুক্ত ও সংসারী। যাঁহাদের জন্মাদি ক্লেশ নাই, এবং সর্ব্বদাই আনন্দময় ও একরূপে থাকেন, তাঁহারা মুক্ত; অপরেরা সংসারী। সংসারী জীব দ্বিবিধ—স্থাবর ও জঙ্গম। জৈনদর্শনে জঙ্গম জীবের পারিভাষিক নাম ত্রস। ত্রস্ ধাতু কম্পন-অর্থেও ব্যবহৃত হয়, এবং স্বয়ং কম্পিত বা চলিত হয় বলিয়াই জঙ্গম জীবকে ত্রস বলা হয়।

স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ জীবকে আবার পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত এই দুই ভেদে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। আহার, শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ভাষা ও মন, এই কয়টিকে পর্য্যাপ্তি বলা হয়। যাহাতে এই ছয়টি পর্য্যাপ্তিই থাকিবে তাহা পর্য্যাপ্ত, এবং তদন্য অপর্য্যাপ্ত। একেন্দ্রিয় জীবগণের চারিটি, বিকলেন্দ্রিয় জীবগণের পাঁচটি, ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীবগণের ছয়টি পর্য্যাপ্তি থাকিতে পারে।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও বৃক্ষ (বা উদ্ভিদ্) এই কয়টি স্থাবর জীব; এবং ইহাদের এক স্পর্শেন্দ্রিয় মাত্র আছে বলিয়া * ইহারা একেন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য। দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীবগণ জঙ্গম। †

এই স্থানে দুইটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় রহিয়াছে।

* তত্ত্বাধিগম সূত্র, ১. ১।
† হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্র, ১. ১৫।

‡ চিদচিদ্ দ্বে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্‌বিবেচনম্।
উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ঞ্চ কুর্ব্বতঃ।"—পদ্মনন্দি।
§ তত্ত্বাধিগমসূত্র, ১. ৪; যোগশাস্ত্র, ১. ১৬।
¶ ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়, ৪৭।
* তত্ত্বাধি. ২. ২৩। উমাস্বাতি বলেন যে, তেজ ও বায়ু জঙ্গম জীবের মধ্যে: তত্ত্বাধি. ২. ১৩-১৪।
† কৃমি, গণ্ডূপদ (কেঁচো), শঙ্খ, শুক্তিকা, জলৌকা, ও শম্বূক প্রভৃতি দ্বীন্দ্রিয়; ইহাদের স্পর্শেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় আছে। পিপীলিকা, উকুন, ছারপোকা প্রভৃতি ত্রীন্দ্রিয়: ইহাদের স্পর্শেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় আছে। ভ্রমর, মক্ষিকা, দংশ ও মশক প্রভৃতি চতুরিন্দ্রিয়;

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী।

প্রথমতঃ, জৈন দার্শনিকগণের জীববিদ্যার পর্য্যালোচনা। কোন্ কোন্ জীবের কয়টি ইন্দ্রিয় আছে, ইহা নির্ণয় করা সামান্য পর্য্যবেক্ষণের ফল নহে। এ জন্য তাঁহাদিগকে বহুকাল ব্যাপিয়া বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইঁহাদের এই সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য, তাহা আলোচনা করিবার ভার আধুনিক বৈজ্ঞানিক জীববিদ্যাভিজ্ঞগণের উপর। বহু জৈন গ্রন্থেই এই সকল জীবের নাম পাওয়া যাইবে; তাঁহারা ইহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, জৈন দার্শনিকগণ পৃথিবী, জলপ্রভৃতিকেও জীবের শ্রেণীতে আসন প্রদান করিয়াছেন; তাঁহারা এইসকল পদার্থকেও সচেতন বলিতেছেন, ইহাদেরও ইন্দ্রিয় আছে। ইহা সামান্য বা উপেক্ষার বিষয় নহে। তাঁহারা কি যুক্তিতে এইরূপ অগ্রসর হইয়াছেন, এবং কতটুকুই বা তাহার মধ্যে তাঁহাদের মৌলিকতা রহিয়াছে, তাহা দর্শনরসিক বা ঐতিহাসিকের বিশেষ গবেষণার বিষয়। পৃথিবীপ্রভৃতি যে যে পদার্থকে তাঁহারা জীব বলিতেছেন, তাহাদের সকলেরই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বৃক্ষের জীবত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা অতিরমণীয়। স্থানের অল্পতানিবন্ধন অন্যান্য অংশ বর্জ্জন করিয়া আমরা এখানে কেবল বৃক্ষের জীবত্বসম্বন্ধেই জৈন দার্শনিকগণের উক্তি সংক্ষেপে সঙ্কলিত করিতে চেষ্টা করিব। পৃথিবী-প্রভৃতিও যে জীব, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যদিও পৃথিবীপ্রভৃতিতে স্পষ্ট জীব-লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা হইলেও তাহাদের অস্পষ্ট জীবলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। বৃক্ষের জীবত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন :—

মনুষ্য যে চেতন তদ্বিষয়ে কাহারো কোনো সন্দেহ নাই। এই চেতন মনুষ্যের সহিত বৃক্ষের প্রভূত সাদৃশ্য আছে দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যশরীর যেমন প্রতি-নিয়ত বাল্য, কৌমার, যৌবনপ্রভৃতি অবস্থায় সর্ব্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বৃক্ষশরীরও সেইরূপ অঙ্কুর, কিশলয়, শাখা, প্রশাখাদিতে সর্ব্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য যেমন সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ হয়, শমী, অগস্ত্য ও আমলকীপ্রভৃতি বৃক্ষকেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। লজ্জাবতীপ্রভৃতি লতাকে স্পর্শ করিলে তাহা সঙ্কুচিত হয়, আবার কোন কোন উদ্ভিদকে স্পর্শ করিলে তাহা উল্লসিত হইয়া উঠে। লতা-প্রভৃতি বেড়া-প্রভৃতিতে গিয়া উঠে। এই সমস্ত সঙ্কোচ, উল্লাস ও উপসর্পণ-প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়া চেতন মনুষ্যেরই সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষের কোন অবয়ব ছিন্ন করিলে তাহা ম্লান হয়, বৃক্ষেরা নিয়মমত আহার গ্রহণ করে, এই সকল ধর্ম্ম অচেতনের নহে। মনুষ্যের যেমন একটা আয়ুর পরিমাণ আছে, বৃক্ষেরও সেইরূপ আছে। ইষ্ট আহার বা অনিষ্টাহারে মনুষ্যশরীরের যেমন বৃদ্ধি বা হানি হয়, বৃক্ষশরীরেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। রোগহেতু মনুষ্যশরীরের যেমন নানারূপ বিকার ও বিকলতা উপস্থিত হয়, বৃক্ষেরও ঠিক সেইরূপই হইয়া থাকে; আবার চিকিৎসায় রোগক্ষয়ও উভয়েরই সমান। রসায়নসেবনে মনুষ্যশরীরের যেরূপ বিশিষ্ট কান্তি ও রস-বলের বৃদ্ধি হয়, বৃক্ষশরীরেও সেইরূপ। স্ত্রীলোকেরা যেমন দোহদ-উপভোগে পুত্রাদি প্রসব করে, বৃক্ষও সেইরূপ করিয়া থাকে। অতএব মনুষ্যের ন্যায় বৃক্ষও চেতন এবং ইহারও আত্মা আছে।*

ইহাদের ঐ তিনটি ভিন্ন দর্শনেন্দ্রিয়ও আছে। মনুষ্য ও চতুষ্পদ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়; ইহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আছে।

* আচারাঙ্গ সূত্র, ১.১.৫-৬; ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়; ৪৮-৪৯, গুণরত্নকৃত তর্করহস্য-নামক টীকা।

জৈন দার্শনিকগণের উদ্ভিদ্‌বিদ্যাতেও পর্য্যবেক্ষণশক্তি এস্থলে লক্ষণীয়। কিন্তু বৃক্ষকে চেতন জীব বলিয়া যে তাঁহারাই প্রথমে দর্শন করিয়াছেন, তাহা নহে। জৈনধর্ম্মের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে আমরা ভারতে এই মতের উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাভারতে (শান্তি ১৮৪ অধ্যায়, ৬ ইত্যাদি শ্লোক) বৃক্ষের জীবত্ব বহুযুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক নির্ণীত হইয়াছে। বৃক্ষের শরীর যে, মনুষ্যাদির শরীরের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক, তাহাও সেখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। জৈন দার্শনিকগণ বৃক্ষের একটিমাত্র ইন্দ্রিয় আছে বলেন, কিন্তু মহাভারতে তাহার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই আছে বলিয়া যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা এখানে মহাভারতের ঐ স্থানটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"উষ্মতো ম্লায়তে পর্ণং ত্বক্ ফলং পুষ্পমেব চ।
ম্লায়তে শীর্য্যতে চাপি স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে॥
বায়ূগ্ন্যশনিনির্ঘোষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্য্যতে।
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দস্তস্মাচ্ছৃ ণ্বন্তি পাদপাঃ॥
বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্ব্বতশ্চৈব গচ্ছতি।
ন হ্যদৃষ্টেশ্চ মার্গোঽস্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ॥
পুণ্যাপুণ্যৈস্তথা গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ বিবিধৈরপি।
অরোগাঃ পুষ্পিতাঃ সান্ত তস্মাজ্ জিঘ্রন্তি পাদপাঃ॥
পাদৈঃ সলিলপানাচ্চ ব্যাধীনাঞ্চাপি দর্শনাৎ।
ব্যাধিপ্রতিক্রিয়ত্বাচ্চ বিদ্যতে রসনং দ্রুমে॥
বক্ত্রেণোৎপলনালেন যথোর্দ্ধ্বে জলমাদদেৎ।
তথা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ॥
সুখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাৎ ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ।
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণামচৈতন্যং ন বিদ্যতে॥"

"তাপসংযোগে বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল ও ত্বক্ ম্লান ও শীর্ণ হয় ;* অতএব বৃক্ষের স্পর্শানুভব আছে। বায়ুশব্দ, অগ্নিশব্দ ও বজ্রনির্ঘোষে বৃক্ষের পুষ্প ও ফল বিশীর্ণ হইয়া যায় ; কর্ণ দ্বারাই শব্দ গৃহীত হয় ; অতএব ইহাতে জানা যায় যে, পাদপেরা শ্রবণ করে। বল্লী বৃক্ষকে বেষ্টন করে ও সর্ব্বদিকে গমন করে ; দৃষ্টিহীন ব্যক্তির পথ নাই ; অতএব বৃক্ষেরা দর্শন করিয়া থাকে। পুণ্যাপুণ্য গন্ধ ও বিবিধ ধূপের দ্বারা পাদপেরা নীরোগ হইয়া পুষ্পিত হইয়া থাকে ; অতএব তাহারা গন্ধ গ্রহণ করে। বৃক্ষেরা পাদদ্বারা জল পান করে, তাহাদের ব্যাধি হয় ও তাহার প্রতিক্রিয়াও হয় ; অতএব বৃক্ষের রসানুভব আছে। (ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত) পদ্মনালরূপ মুখের দ্বারা জল যেমন ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, বৃক্ষও সেইরূপ বায়ু সংযোগে পাদদ্বারা জল পান করে।† বৃক্ষ সুখ ও দুঃখ অনুভব করে, তাহার কোন অঙ্গ ছিন্ন হইলে তাহা আবার ভা[ল] হইয়া যায়। অতএব বৃক্ষগণের জীব আমি দেখিতে পাইতেছি তাহাদের অচেতনতা নাই। বৃক্ষেরা যে জল গ্রহণ করে অগ্নি [ও] বায়ুপ্রভাবে তাহা জীর্ণ হয়, তাহাদের ভুক্ত দ্রব্য পরিপক্ক হয়, এব[ং] ইহাতেই তাহাদের স্নেহ জন্মে ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"*

বৃক্ষে যে জীব আছে তাহা আমরা বৈদিক সাহিত্যেও দেখিতে পাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৬. ১১. ১-২) উক্ত হইয়াছে :—"হে সোম্য, যদি কোন ব্যক্তি এই মহাবৃক্ষের পাদদেশে আঘাত করে, তবে ইহা জীবিত থাকিয়াই (রস) ক্ষরিত করে ; যদি কেহ মধ্যে আঘাত করে তবে ইহা জীবিত থাকিয়াই (রস) ক্ষরিত করে ; (আবার) যদি কেহ অগ্রে আঘাত করে, (তথাপি) ইহা জীবিত থাকিয়াই (রস) ক্ষরিত করে। ইহা জীবরূপ আত্মার দ্বারা অনুব্যাপ্ত এবং অতিশয় (রস) পান করিতে করিতে মোদমান হইয়া অবস্থান করে। জীব যদি ইহার একটি শাখা ত্যাগ করে, তবে তাহা শুষ্ক হইয়া যায় : যদি দ্বিতীয় শাখা ত্যাগ করে, তবে তাহা শুষ্ক হইয়া যায় ; যদি তৃতীয় শাখা ত্যাগ করে, তবে তাহা শুষ্ক হইয়া যায় ; আর যদি সমগ্র বৃক্ষটিকে ত্যাগ করে, তবে তাহা সমগ্রই শুষ্ক হইয়া যায়।"

তন্ত্রশাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, হিন্দুরা বৃক্ষের মধ্যে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়াছিলেন।†

বৌদ্ধগণ উদ্ভিদে জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন (বিনয়, মহাবগ্গ, ৫.৭.১-২) দেখা যায়। এই জন্যই ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই যতদূর সম্ভব বৃক্ষের ছেদনাদি হইতে নিবৃত্ত থাকিবার উপদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

---

* মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ এই অংশের মধ্যে মধ্যে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আবশ্যক বোধে তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"শীর্য্যত ইত্যনেন বজ্রমণেরপি মৎকুণশোণিতস্পর্শাৎ শীর্য্যমানস্য চেতনত্বং ব্যাখ্যাতং। এবমেকদেশে কম্পাদি দর্শনাদ্ গোরিব ভূমেরপি তদ্ দ্রষ্টব্যম্।"

† Cf. Capillary attraction. নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের মন্তব্য লিখিয়াছেন—"এতেন ক্ষীরাদিপায়িনঃ পারদাদেরপি চেতনত্বং ব্যাখ্যাতম্।"

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও চিন্তনীয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাভারতের ঐ অংশটি বাহির করিয়া সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন ; তৎপ্রণীত The Economic Botany of India (pp. 26—28) দ্রষ্টব্য।

† *Ibid*, p. 28.

কাশ্মীর ও কাশ্মীরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সপ্ত-সেতু-নগর।

ইতালীর রাজধানী রোমকে যেমন সপ্ত-শৈল-নগর (City of the Seven Hills) বলা হয়, কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরকেও তেমনি সপ্ত-সেতু-নগর (City of the Seven Bridges) নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

সপ্ত-সেতু-নগর।

বুদ্ধিমত্তায় কাশ্মীরীগণ জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একথা দার্ঢ্যসহকারে বলা যাইতে পারে। কিন্তু মহতী নীতি ও মনুষ্যোচিত গুণাবলীর অভাবে উহাদের বুদ্ধি সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। কাশ্মীরী ছাত্র ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রগণের তুলনায় অধিকতর মেধাবী। কাশ্মীর বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের জন্মভূমি এবং এস্থানে অনেক দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

স্থাপত্য ও নগরের সংস্থান-পরিকল্পনা।

প্রচলিত হিন্দু-প্রবাদ বেরীনাগের দুই মাইল দূরবর্ত্তী বিতস্তা হইতে ঝিলামনদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে বেরীনাগকেই উহার মূল বলিয়া প্রতীতি হয়। ঝিলামনদ নগরের মধ্য দিয়া, প্রায় প্রত্যেক গৃহের ভিত্তিমূল স্পর্শ করিয়া, বক্রগতিতে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। নদের তরঙ্গোচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে গৃহস্থের বাসগৃহের নিম্নতল পরিপ্লাবিত করে।

শ্রীনগর ঝিলামের উভয় তীরে সংস্থিত। নদের বামে নগরের প্রারম্ভ-সীমা—রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদটীর মধ্য-ভাগের শোভা অনিন্দ্য হইলেও, পার্শ্ববর্ত্তী অংশের গঠন-প্রণালী নিতান্ত বিশ্রী। ঐরূপ কদর্য্য-অংশ-সম্বলিত প্রাসাদ কোন রাজার রাজ্যে আছে কিনা সন্দেহ। গৃহাদি নির্ম্মাণে স্থাপত্যের এইরূপ হীন আদর্শ অবলম্বন করিয়া ভারতীয় শিল্পের অবনতি ঘটাইবার জন্য বর্ত্তমান ভারতের —কি ইংরেজ কি দেশীয়—রাজসরকারমাত্রই দায়ী। এ বিষয়ে ভারত-সরকারের প্রধান চাটুকার স্যার জন ষ্ট্র্যাচির ন্যায় ব্যক্তিও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে দোষী করিয়া গিয়াছেন। ষ্ট্র্যাচি সাহেব তাঁহার 'ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থের (৪র্থ সংস্করণ, ১৯১১ সাল) ২৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

> 'এ সম্বন্ধে আমাদের নিকট ভারতের শিক্ষা করিবার উপযোগী কিছুই নাই। ভারতের রমণীয় ও সজীব শিল্পের অবনতি ঘটাইবার উদ্দেশ্যে আমরা যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছি ; এবং এক্ষেত্রে যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছি তাহার অধিকাংশই সংহারকারিণী।'

প্রসিদ্ধ শিল্পাচার্য্য হ্যাবেল ও ফার্গুসন প্রভৃতির মতও অনেকের বিদিত, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কাশ্মীরের রাজপ্রাসাদ।

ডাক্তার কুমারস্বামী অনেকবার স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসী অপেক্ষা য়ুরোপবাসীরা শিল্পের মর্য্যাদা অধিক বুঝেন, এবং এ বিষয়ে ভারতের অনুকরণ-প্রচেষ্টাকে তাঁহারা আদবেই পছন্দ করেন না। অনেকেই হয়ত জানেন, লর্ড কর্জ্জনের অভ্যর্থনা-উপলক্ষে এদেশের একজন নরপতিকে বিদেশী সজ্জা সরাইয়া রাখিয়া দেশীয় উপাদানে গৃহ সজ্জিত করিতে হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমানে শিল্পাদি সম্বন্ধে এ দেশের রাজন্যবর্গের রুচি একেবারে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে ভারতীয় কলার মহত্ব, সৌন্দর্য্য ও উপযোগিতা বুঝিবার পক্ষে অধিকাংশেরই যত্ন বা ক্ষমতা নাই। যে কর্জ্জন সাহেবের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য ভারতের রাজন্যগণ এক সময়ে অপরিমিত-ভাবে যত্নশীল ছিলেন, তিনিই এদেশের শিল্প সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, শুনুন —

'ভারতের পুরাকীর্ত্তি, শিল্প, ও স্তম্ভাবলী যেরূপ মূল্যবান, এরূপ আর কোন দেশেরই নহে।'

ফাগু´সন সাহেবও বলিয়াছেন—

'ভারতের স্থাপত্য এখনো সজীব শিল্পরূপে বর্ত্তমান। ভারতের অশিক্ষিত শিল্পিগণের নির্ম্মিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৌষ্ঠবশালী হর্ম্ম্যাবলী যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন শুধুমাত্র ঐ দেশেই বিদ্যার্থিগণ ব্যবহারিকভাবে শিল্পশিক্ষার সুযোগ পাইতে পারেন।'

ভারতীয় শিল্পের মহিমাকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে ফাগু´সন অন্যত্র বলিয়াছেন—

'ভারতের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও সমাধিস্তম্ভের পরিকল্পনা, বর্ণচিত্র ও ভাবব্যক্তির অন্তরালে যে সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত, ইতালীর স্থাপত্যকার্য্যেও তাহা দৃষ্ট হয় না।'

ভারতের স্থাপত্য-শিল্প কিরূপ উচ্চদরের, উপরিধৃত মন্তব্যগুলি হইতেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। অথচ নিজের ঘরের এই স্বর্ণহার উপেক্ষা করিয়া আজকাল আমরা—

'পরের ঘরে * * ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি'

—কিনিবার জন্যই লালায়িত! এদেশের সামন্তরাজগণ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যদি ভারতীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষণে একটু যত্নবান হ'ন, তবেই ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে।

কাশ্মীরে গৃহশিল্পের কার্য্য অতি নিপুণতার সহিত সম্পন্ন হয়। গৃহগুলির অধিকাংশই কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়া শিল্পীর পক্ষে উহাতে শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দেওয়াও সহজ হইয়া উঠে। ঝিলামনদের দক্ষিণাংশে কাষ্ঠনির্ম্মিত অনেক-গুলি গৃহ আছে; উহার কারুকার্য্য, বিশেষতঃ চতুর্থ সেতুর বামদিকস্থ দুইতিনখানি গৃহের শোভা-সৌন্দর্য্য, প্রকৃতই নয়ন-রঞ্জক। ঐ সকল গৃহের সম্মুখাংশ দ্বার ও জানালা-সংলগ্ন বারান্দাগুলি অতি পারিপাটীরূপে বক্রাকারে নির্ম্মিত। কাশ্মীরের দারুতক্ষণ-শিল্প এমন সুন্দর যে বিগত দিল্লীদরবারে সম্রাট জর্জ কাশ্মীরের মহারাজার শিবির-তোরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেইজন্য কাশ্মীররাজ তাঁহাকে সেই তোরণ উপহার দেওয়াতে তিনি তাহা বিলাতে লইয়া গিয়াছেন।

সমগ্র শহরটী ঝিলামনদের তটপ্রান্তে সংস্থিত। শহরের দৈর্ঘ্য তিন মাইল। রাস্তাগুলি শহরাভিমুখে ও তটের ধারে ধারে প্রসারিত। নদের উভয়তীরবর্ত্তী নগরাংশের বিভিন্ন স্থল সাতটী সেতুদ্বারা পরস্পর সংযোজিত। ধনী গৃহস্থের ও মহাজনগণের বসতবাটীগুলি প্রায়ই নদ-সংলগ্ন। ভোরে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় ঝিলামে নৌভ্রমণ করিলে যুগপৎ
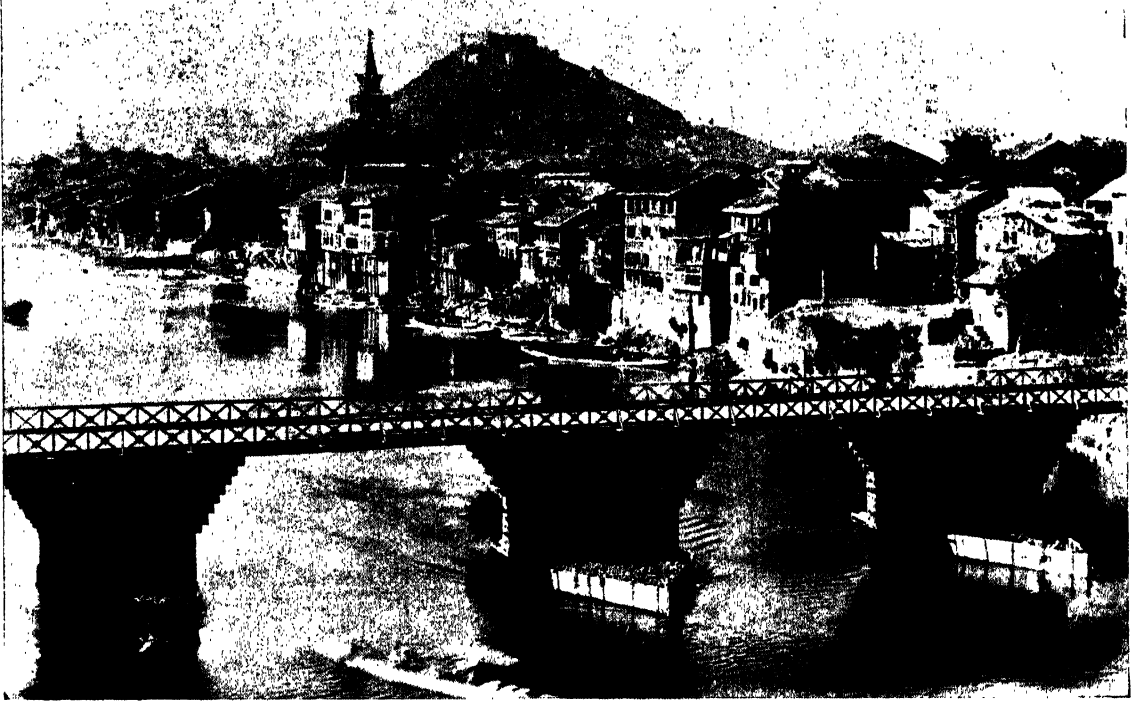
চতুর্থ সাঁকোর পশ্চাতে হরিপর্ব্বতের চূড়ায় দুর্গ।

আনন্দ ও বিচিত্র দৃশ্য উপভোগের সুযোগ ঘটিতে পারে।

ঝিলামনদের উপর ফেরীওয়ালার ও খেল্না বিক্রেতার দোকানগুলির ভাসমান দৃশ্য ভারি চমৎকার। নৌগৃহবাসী কাশ্মীর-যাত্রীকে আপনাদের পণ্যসম্ভার গছাইবার উদ্দেশ্যে ইহারা ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাশ্মীরের সমস্ত জলপথ বেষ্টন করিয়া অবস্থান করে।

নগরের অপরিচ্ছন্নতা।

নগরের অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠনির্ম্মিত। কিন্তু বহু ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া কোন গৃহই রংকরা নহে। কাজেই নির্ম্মাণের পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই গৃহের রং কালো হইয়া উঠে। ইহার উপর ধূঁয়া লাগিয়া ও বরফ পড়িয়া কালো রং পাকা হইয়া দাঁড়ায়। ফলে সমগ্র নগরটীকেই বিষণ্ণ বলিয়া মনে হয়।

নোংরামিতেও কাশ্মীর-শহর অতুলনীয়। জগতে ইহার ন্যায় নোংরা শহর দ্বিতীয় একটী আছে কিনা সন্দেহ। এবিষয়ে রাজধানীটি আবার সকলের সেরা! ত্রিজগতের সমস্ত আবর্জ্জনা একত্র করিয়া কল্পনাবলে তদ্দ্বারা একটী ক্ষেত্রের চিত্র রচিত করিতে পারিলেই কাশ্মীর-শহরের আবর্জ্জনা দৃশ্যের উপযুক্ত তুলনা বুঝিতে পারা যাইবে। শহরের তুলনায় মফঃস্বলের গ্রামগুলি কথঞ্চিৎ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তন্মধ্যেও মুসলমান পল্লী নোংরামিতে নরককুণ্ডসদৃশ। হিন্দুগণ মুসলমানগণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার বটে;—দুই একজন গৃহস্থের গৃহ বস্তুতঃই পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন;—কিন্তু মোটের উপর অধিকাংশই যার-পর-নাই নোংরা। হিন্দু পণ্ডিতগণ প্রত্যহ স্নানাদি করিবার পক্ষে যেরূপ যত্নশীল, বাড়ী ঘর পরিষ্কার রাখিবার পক্ষে তাহার শতাংশের একাংশও মনোযোগী হইলে কথা ছিল না। অপরিষ্কার

স্থানে বাস করিয়া ও অপরিষ্কার ভাবে থাকিয়া থাকিয়া ইহারা যেন অপরিচ্ছন্নতাকে মজ্জাগত করিয়া তুলিয়াছে!

শহরের মধ্যে জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী পায়খানা নাই বলিলেও চলে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর অধীনে যথেষ্ট মেথর আছে বটে; কিন্তু তাহাদের দ্বারা শহরের স্বাস্থ্যোন্নতির কোনই বন্দোবস্ত হইতেছে না। ফলে, প্রতিবৎসরই শ্রীনগর কলেরার আবাসভূমি হইয়া উঠে। কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলেই এ ক্রটী সংশোধন করিতে পারেন; কিন্তু সকলেই যেন এ বিষয়ে উদাসীন! কাশ্মীরের ন্যায় একটী প্রধান সামন্তরাজ্য আবর্জ্জনার আকর-সদৃশ, ইহা বড়ই লজ্জার কথা!

কিছু দিন পূর্ব্বে নাকি আবর্জ্জনা সমূহ স্তূপীকৃত করিয়া রাখাকে কাশ্মীরীগণ গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিত। তাই, তাহারা রাজ্যের যত আবর্জ্জনা কুড়াইয়া আনিয়া সযত্নে গৃহদ্বারে রক্ষা করিত।

নাগরিক।

জগতের অন্যান্য প্রদেশের শহরের ন্যায় কাশ্মীর-শহরেও সাধু ও অসাধু উভয় শ্রেণীরই লোক আছে। তবে এস্থানের অধিবাসীর অধিকাংশই মিথ্যা কথা বলিতে, প্রবঞ্চনা করিতে এবং 'যেন-তেন-প্রকারেণ' স্বার্থসিদ্ধি করিতে কোনপ্রকার দ্বিধাবোধ করে না। এ বিষয়ে ভদ্র ও অভদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে কোনই তারতম্য নাই। কাশ্মীর-যাত্রিগণ অনেক সময়ে এই সকল নাগরিকের কুহকে পড়িয়া নানাপ্রকারে বিড়ম্বিত হয়।

নাগরিকগণের তুলনায় কাশ্মীরের গ্রামবাসিগণ অনেকটা সরল ও সাধু। তাহাদের সততা ও সরলতার পরিচয় পাইলে অনেক সময়ে নাগরিকগণের অসদাচরণের কথাও ভুলিয়া যাইতে হয়।

মূলতঃ নাগরিকগণ একই বংশ-সম্ভূত—এই বংশ তুর্কী ও মঙ্গোলিয়ানের সহিত আর্য্যরক্ত সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ধর্ম্মে ইহারা কাশ্মীরী হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মোট অধিবাসীর সংখ্যানুপাতে মুসলমান-কাশ্মীরীর জনসংখ্যা শতকরা ৮৫ হইতে ৯০। নগরের শিল্প ও ব্যবসায় প্রধানতঃ মুসলমানেরই হস্তগত। হিন্দুগণ যন্ত্রপাতি ধরিয়া শিল্পকার্য্য করাকে অপবিত্র মনে করে; তাই প্রধানতঃ জ্যোতিষ-চর্চ্চা ও সংস্কৃত পুঁথি নকল করিতেই তাহারা অভ্যস্ত। তাহাদের মতে ইহাই একমাত্র পবিত্র ব্যবসায়,—ইহা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ব্যবসায়ই অপবিত্র। আজকাল দুই চারিজন হিন্দু সামান্যভাবে ব্যবসায়ের দিকেও মন দিয়াছে,—ইহাদের মধ্যেই কেহ কেহ বিলাতী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছে,—কেহবা ফটোগ্রাফের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। ফটোগ্রাফের কার্য্যে প্রধানতঃ হিন্দুপণ্ডিতগণকেই ব্যাপৃত দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহারা শিল্পযন্ত্র স্পর্শ করাকে যতদূর অপবিত্র মনে করে, উল্লিখিত ব্যবসায় পরিচালনায় বিলাতী কাপড় কিংবা ফটোগ্রাফের উপকরণাদি স্পর্শ করাকে ততদূর অপবিত্র মনে করে না!
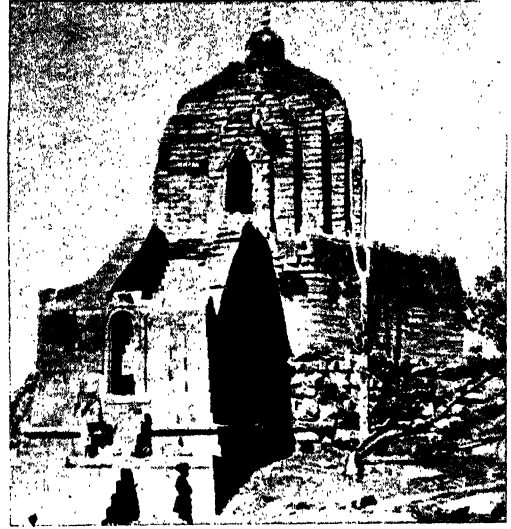
শঙ্করাচার্য্যশৈল বা তখ্‌ৎ-ই-সলেমান।

বজ্‌রা-ঘাটা ও শিবির-সন্নিবেশ-ভূমি।

শহরের উপকণ্ঠে বজ্‌রা-ঘাটা ও শিবির-সন্নিবেশ-ভূমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান। ঝিলামের তীরে ও হ্রদোপকূলে সুবৃহৎ-চিনার বৃক্ষশোভিত সবুজ মাঠের পাদপ্রান্তে ঐ সকল বজ্‌রা-ঘাটা বর্ত্তমান। মূল শহরের অন্তঃপাতী
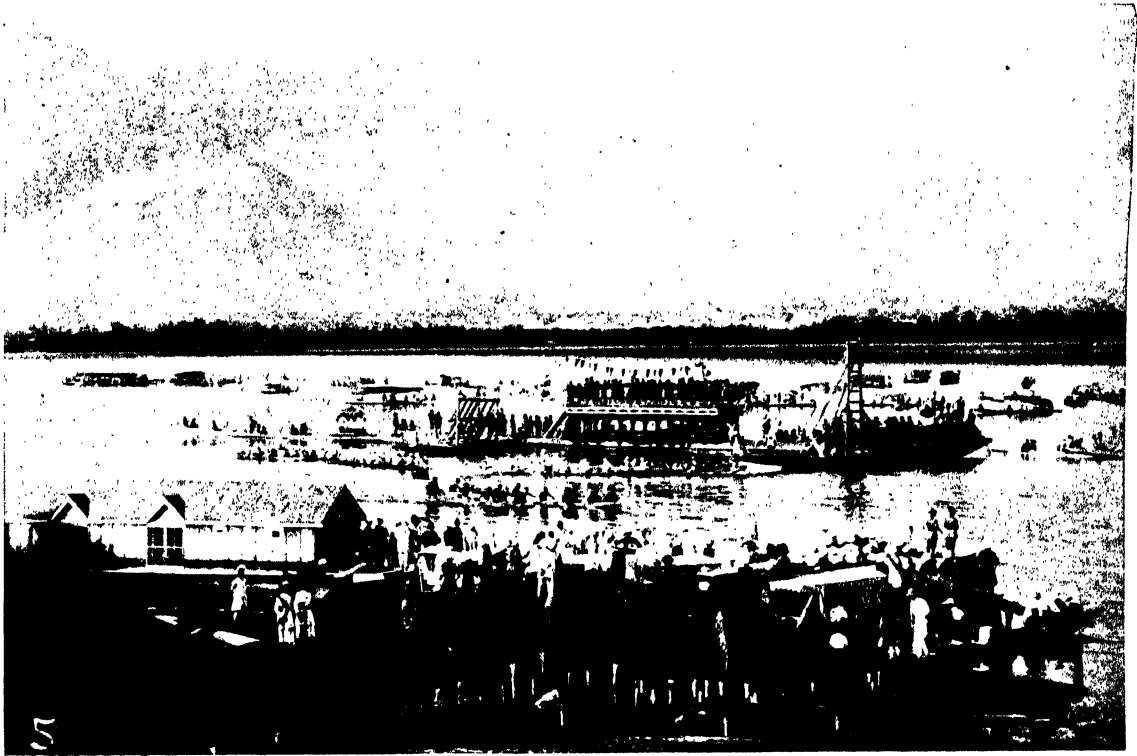
ডালহ্রদে সরকারী জলক্রীড়া ও উৎসব।

চিনারবাগ, মুন্সীবাগ ও সোনোয়ারবাগের অন্তর্ভুক্ত বজ্‌রা ঘাটা ও শিবির-সন্নিবেশ-ভূমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিখ্যাত ডালহ্রদের সন্নিকটেও অনেকগুলি সুন্দর বাগ আছে। চিনারবাগ ডালহ্রদের মোহানার সন্নিকটে, ঝিলামের শাখাবিশেষের তীরে সংস্থিত। এই বাগের শ্রেষ্ঠাংশ অবিবাহিত ইংরেজদের বাসের জন্য স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত। মুন্সীবাগ ও সোনোয়ারবাগও কার্য্যতঃ ইংরেজদেরই অধিকারভুক্ত। আমীরকাডাল কিংবা অপরাপর সাধারণ বজ্‌রা-ঘাটাই দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর আশ্রয়স্থল। নদের প্রচণ্ড জলস্রোত রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে শহরপ্রান্তে একটী বৃহৎ বাঁধ আছে। উহার উপর আপিস, বিলাতী দোকান ও য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারীদের বাসগৃহ অবস্থিত। সূর্য্যোদয়ের সময় কাশ্মীরের এই বাঁধের উপর ভ্রমণ করা বড়ই আরামদায়ক।

শ্রীনগরে ও তৎসন্নিহিত স্থলে দর্শনীয় বস্তু।

(ক) শঙ্করাচার্য্য শৈল—নগর-সান্নিধ্যে বর্ত্তমান গিরিচূড়া-বিশেষ। ইহাকে হিন্দুগণ 'শঙ্করাচার্য্য' ও মুসলমানগণ 'তখ্‌ৎ-ই-সলেমান' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। শৈলের শীর্ষদেশে অদ্ভুত আকারের একটী মন্দির বর্ত্তমান। মন্দিরটীর ভিত্তি অশোকের সময়ের স্থাপত্যের আদর্শে নির্ম্মিত। কাশ্মীরের পুরাতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতেও মূল মন্দিরটী অশোকের নির্ম্মিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্দিরটী প্রসিদ্ধ মন্দিরশিল্পী শঙ্করাচার্য্যের কীর্ত্তি বলিয়া শোনা যায়। বিগ্রহধ্বংসী মুসলমানগণ তাহাদের সম্প্রদায়-ভুক্ত সলেমান-সাধুর নামানুসারে নামকরণ করিতে যাইয়া মন্দিরটীর কিঞ্চিৎ ক্ষতি সাধন করিয়াছে; কিন্তু তদবধি তাহারা ইহার প্রতি শ্রদ্ধাবানও হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন উৎসব-উপলক্ষে এই মন্দিরের ভিত্তিদেশে একটি বোমা ছোড়া হইয়াছিল, তাহাতে ইহার একাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অধুনা এই শৃঙ্গটীর উপর উৎসবাদি উপলক্ষে অগ্নিক্রীড়ার অনুষ্ঠান হয়। এই গিরিচূড়ার

উপর উঠিয়া দাঁড়াইলে কাশ্মীর-শহরের ও তৎসন্নিহিত স্থলের দৃশ্যাবলী সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

(খ) হরিপর্ব্বত—শহরের একপ্রান্তে স্থিত। উচ্চতায় ইহা শঙ্করাচার্য্য শৈল হইতে ক্ষুদ্র। সম্রাট আকবর এই পর্ব্বতটীকে দুর্গস্বরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। অধুনা ইহার উপর সরকারী কয়েদখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কয়েদখানায় সংপ্রতি কয়েকজন সামন্ত-সর্দ্দারকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। পর্ব্বতের ঢালুস্থানে প্রাচীন হর্ম্ম্যাবলীর কিঞ্চিৎ চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহার একপার্শ্বে একটী দেব-মন্দির বর্ত্তমান আছে।

(গ) ডালহ্রদ—কাশ্মীরের হ্রদসমূহের মধ্যে ইহা দ্বিতীয়-স্থানীয়। কাশ্মীরী ভাষায় 'ডাল' শব্দের অর্থই হ্রদ, সুতরাং ইহার সহিত আবার 'হ্রদ' শব্দ যোগ করিয়া একই বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে। শ্রীনগরের মধ্য ডালহ্রদই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। যাত্রিগণ অনেক সময়ে এই হ্রদে নৌচালনা করিয়া থাকে। জনসাধারণ ও সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষেও ইহা একটি বিলাসের স্থল। শহরের উৎসবাদি উপলক্ষে এই স্থানেই জলক্রীড়ার অনুষ্ঠান হয়।

ডালহ্রদে বহুল পরিমাণে ঘাস ও শাকসবজি জন্মে। হ্রদের জলে ভাসমান উদ্যানশ্রেণী এ স্থানের একটি প্রধান দর্শনীয় বস্তু। এই উদ্যান মাদুরের উপর মাটী বিস্তীর্ণ করিয়া রচিত এবং জলের তলে খুঁটা পুঁতিয়া ভাসমান অবস্থায় বাঁধা। ইহাতে শশা, লাউ ও নানাপ্রকার শাক-সবজি উৎপন্ন হয়। কাশ্মীরে এই সকল উদ্যান চুরি যাওয়া একটী কৌতুকাবহ ব্যাপার। চোরেরা খুঁটার বাঁধ কাটিয়া উদ্যানটিকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে টানিয়া লইয়া যায়।

মধ্যাংশ ব্যতীত ডালহ্রদের চারিদিক সরকার কর্ত্তৃক ইজারা-পত্তনি দেওয়া হয়। ইহাতে রাজসরকারের যথেষ্ট অর্থলাভ হয়।

(ঘ) সলিমার ও (ঙ) নিশাৎ—মোগল রাজত্ব-সময়ের বিখ্যাত দুইটি বাগান। ইহা শ্রীনগরের উত্তরে,—উত্তর-দিকের গিরিমালার পাদদেশে, অবস্থিত। প্রবাদ, উভয় উদ্যানই সম্রাট শাহজাহান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কাশ্মীরের সলিমার লাহোরের প্রসিদ্ধ সলিমার-উদ্যানের আদর্শে প্রস্তুত। অধুনা ইহা বিনষ্টপ্রায়। নিশাৎবাগ রাজসরকার ও শ্রীযুক্ত
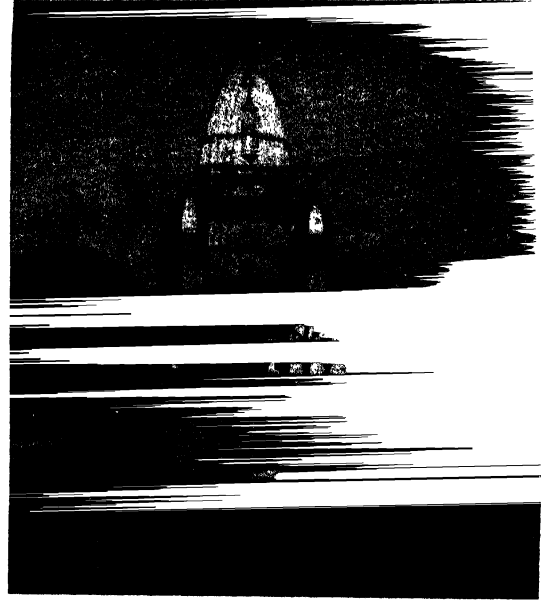
ঝিলাম নদের তটে ধর্ম্মশালা-পরিবেষ্টিত হিন্দুমন্দির।

জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নাধীনে সুরক্ষিত। এই বাগে প্রায় ২০০ ঝরণা আছে। প্রতি রবিবার উহার মুখ খুলিয়া দেওয়া হয়। ঐ সময়ে উহা হইতে বিনির্গত শত সহস্র জলধারা শোভাসৌন্দর্য্যে দর্শকের মনপ্রাণ হরণ করে। ঝরণাগুলির প্রত্যেকটী বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত যথোপযুক্ত স্থানে বিন্যস্ত। পরিষ্কার জলপূর্ণ একটি খালের মুখ হইতে এই সকল ঝরণায় জলসমাগম হইয়া থাকে।

উল্লিখিত ঝরণা ব্যতীত এই স্থানে কয়েকটী কৃত্রিম জলপ্রপাতও আছে। উদ্যানের মধ্যে ও দ্বারপ্রান্তে বহু রম্য চিত্রশোভী ছাদসংযুক্ত কতিপয় ক্ষুদ্র হর্ম্ম্য দৃষ্ট হয়। হর্ম্ম্য-গুলি মোগলসম্রাটগণের কীর্ত্তি। নিশাৎবাগের পুষ্পবিতান একটী বিশেষ দর্শনীয় বস্তু।

অনেকের বিশ্বাস, মূর্খ লোকের সৌন্দর্য্যবোধ মাত্রই নাই। একথা সম্পূর্ণ ভুল কাশ্মীরে ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, নারী পুরুষ প্রভৃতি সকলেরই সৌন্দর্য্যের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ। উদ্যানভ্রমণ, হ্রদভ্রমণ প্রভৃতি উপলক্ষে ইহারা মন প্রাণ দিয়া প্রকৃতির শোভা উপভোগ করে। জনসাধারণ, বিশেষতঃ মুসলমানগণের সমাগমে রমণীয় উদ্যান নিশাৎবাগ প্রতি শুক্রবার অপূর্ব্ব শোভা

ধারণ করে। ঐ দিন কাশ্মীরীগণ চাপাত্র ও রন্ধনোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে লইয়া নৌভ্রমণে বহির্গত হয় এবং চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিশাৎবাগে আসিয়া আনন্দোৎসব করে। মুসলমানগণ প্রথমতঃ নমাজ পড়িবার জন্য হজারৎবলে গমন করে এবং সে স্থান হইতে দলে দলে নিশাৎবাগে আসিয়া উপনীত হয়। শুক্রবার কাশ্মীরী জনসাধারণের বিশেষ আমোদ-প্রমোদের দিন, অথচ ঐ দিনে নিশাৎবাগের ঝরণাগুলি আগাগোড়াই বন্ধ--এদিকে কিন্তু যাত্রিগণের সমাগমের দিন, রবিবার, উহা খুলিয়া দেওয়ার বন্দোবস্তটী বরাবরই পাকা আছে!

সলিমারবাগ হইতে দেড় মাইল দূরে, পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত, ২০ ফুট গভীর ও বহু গজ প্রশস্ত 'হরবান' নামক একটি কৃত্রিম হ্রদ আছে। ঐ হ্রদের শোভা বস্তুতঃই অনির্ব্বচনীয়।

বিগ্রহধ্বংসীর নৃশংসতা।

বিগ্রহধ্বংসী মুসলমানদের অত্যাচারে বিনষ্ট হিন্দু-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কাশ্মীরে যত দৃষ্ট হয়, এরূপ আর কোথাও হয় কি না, সন্দেহ। সেকন্দর বুত্‌সিকিনের নৃশংসতার চিহ্ন—বহু হিন্দু-মন্দিরের ভগ্নাংশ অদ্যাপি কাশ্মীরের চতুর্দ্দিকে পতিত রহিয়াছে। এই সকল মন্দিরের প্রস্তর ও অন্যান্য উপকরণাদি প্রায়ই মুসলমানদের সমাধি ও মসজিদ এবং জিয়ারৎ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বাদ্‌সা' নামক জনৈক মুসলমান রাজার সমাধি একটি হিন্দুমন্দিরের ভিত্তিমূলে রচিত। শুধুমাত্র এই সমাধিটিই দেবমন্দিরের প্রস্তরের পরিবর্ত্তে ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত।

কাষ্ঠশিল্পের ন্যায় প্রস্তর শিল্পেও যে কাশ্মীরীগণ সুনিপুণ, উল্লিখিত হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুসলমান প্রজার অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে কাশ্মীররাজ ঐ সকল শিল্প-চিহ্ন রক্ষা করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উদাসীন; সুতরাং আগামী দশ বৎসরের মধ্যে পুরাকীর্ত্তির ঐ নিদর্শনটুকুও কাশ্মীর হইতে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

জিয়ারৎ।

কাশ্মীর প্রদেশে ইহা একটি বিশিষ্ট ও অতুলনীয় উপাসনা-স্থল। প্রকৃতপক্ষে, কোন-না-কোন মুসলমান ফকিরের সমাধির

জিয়ারৎ বা মুসলমান সাধকের সমাধি।
a চিহ্নিত প্রস্তরখণ্ড হিন্দুগণ পূজা করিয়া থাকে।

সহিত এই স্থান সংপৃক্ত। হিন্দুদের চক্ষে দেবমন্দির যেরূপ, মুসলমানদের চক্ষে এই জিয়ারৎও সেইরূপ পবিত্র। শ্রীনগরে চারিটী সুবৃহৎ জিয়ারৎ আছে; তন্মধ্যে একটির আকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড। ঐ জিয়ারৎটীতে ইসলাম-ধর্ম্মানুমোদিত কাষ্ঠশিল্পের চারু নিদর্শন যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। হিন্দুগণ উহার নদীতীরবর্ত্তী অংশ-বিশেষের ভিত্তির উপরস্থ একখণ্ড প্রস্তর পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমানে যেস্থলে ঐ জিয়ারৎটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পূর্ব্বে তথায় এক শূদ্র রমণী বাস করিত; তাহার ধর্ম্মভাব ও সম্মার্জ্জনকার্য্যে তৎপরতা দেখিয়া জনৈক সাধু তাহাকে ঐ স্থানে আশ্রয় দেন; কালে সাধন-ভজনবলে মুক্ত হইয়া সে হিন্দুদেবতা কালীর স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। এই কালীদেবীর পীঠস্থান বলিয়া তাই জিয়ারতের ঐ অংশ প্রত্যহ হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছে।

কাশ্মীরী ছাত্রগণের জলক্রীড়া - শ্রীনগরের তৃতীয় সাঁকোর নিকট মিশন স্কুল হইতে ছাত্রগণ জলে লাফাইয়া পড়িতেছে।

এই জিয়ারতের একদিকে যখন হিন্দুগণ শ্রদ্ধাভরে মস্তক লুটাইতে থাকে, মুসলমানগণ তখন চত্বরে ও বেদীর উপর বসিয়া উপাসনা করে—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

পাদরীদের কার্য্য।

কাশ্মীর-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীনগরে খৃষ্টান পাদরীদের কার্য্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মপ্রচারে ইহাদের উদ্যম উৎসাহের কথা অনেকেরই পরিজ্ঞাত, সুতরাং এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দরিদ্র হইলেও কাশ্মীরীগণ স্বধর্ম্মবিশ্বাসে বড়ই অনড় —এক্ষেত্রে অর্থের প্রলোভন তাহাদিগকে কোনমতে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে না। ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে অদ্য পর্য্যন্ত মাত্র একটী কাশ্মীরী যুবক নাকি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। মুসলমানগণ স্পষ্টতঃই বলে—স্বীয় ধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান বা মুসলমান হওয়া হিন্দুদেরই কাজ। বস্তুতঃ কাশ্মীরে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার বড়ই কঠিন ব্যাপার। ক্ষেত্র বুঝিয়া এস্থানে পাদরীগণও ধর্ম্মপ্রচারের প্রকাশ্য চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছে; কিন্তু কার্য্যতঃ বিভিন্ন উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথটীও প্রস্তুত করিতেছে! পূর্ব্বে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণ মৃত্যু স্বীকার করিয়াও বজরার দাঁড় স্পর্শ করিতে রাজী হইত না, কিন্তু বর্ত্তমানে পাদরীগণ তাহাদের সে সংস্কার ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! —দাঁড়টানা তো সহজ কথা, অধুনা তাহারা সিগারেট, বুট, জেবঘড়ি, হ্যাটকোট প্রভৃতির উপরও অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে! খৃষ্টবিদ্যালয়ের অর্দ্ধশিক্ষিত ছাত্রগণের অন্তরে দিন দিন অসন্তোষের ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে—দেশের বাড়ী ঘর ও স্বদেশী জিনিস এখন আর তাহাদের রুচি-গ্রাহ্য হয় না! জলে নামিয়া ডুবাডুবি ইত্যাদি খেলিবার সময়ে ইহারা এখন আর ম্লেচ্ছের স্পর্শ হইতে উপবীতের পবিত্রতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বের ন্যায় যত্নশীল নহে। যে সমস্ত ছাত্র উল্লিখিত বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে তাহাদের সংখ্যাও প্রায় ১৫০০। ইহারা সকলেই মিশন স্কুলের ছাত্র। 'পবিত্র হিমালয়' নামক ইংরেজী গ্রন্থপ্রণেতা এই সকল ছাত্রের রুচির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই সগর্ব্বে লিখিয়াছেন—

> 'কতকগুলা মিথ্যাবাদী ও পাজি লোককে মনুষ্যত্বের পথে উন্নীত করা হইতেছে!'

সুচতুর পাদরীগণ আপনাদের উদ্দেশ্যের প্রতি তীব্র-দৃষ্টি হইলেও অতি সন্তর্পণেই অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতেছে। জুতা ছাড়িয়া পাঠাভ্যাস করা কাশ্মীরী হিন্দুদের এক প্রথা; এই প্রথার উপর পাদরীগণ সংপ্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপই করিতেছে না। ফলে অধ্যয়নের সময় ছাত্রগণ মিশন-স্কুলের বারান্দাসমূহ জুতা-বোঝাই করিবার অব্যাহত অধিকারই পাইয়াছে।

স্কুলের ন্যায় হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠাও কাশ্মীরে পাদরীদের এক কীর্ত্তি। শ্রীনগরে শঙ্করাচার্য্যশৈলের পাদমূলে উহাদের প্রতিষ্ঠিত একটী সুবৃহৎ হাঁসপাতাল আছে।

মিশন-হাঁসপাতালে বাসিন্দা রোগিগণকেই অধিক সংখ্যায় গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা। ঔষধপ্রার্থী বাহিরের রোগিগণকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধ দেওয়া হয় না। ঐ সংখ্যা পূর্ণ হইলে যথারীতি উপাসনার পর ঔষধ বিতরণ আরম্ভ হয়। শিশির অপ্রাচুর্য্যবশতঃ ঔষধ বাটিতে বা মাটীর পাত্রে প্রদত্ত হয়।

প্রচারকার্য্যে উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদিই বর্ত্তমানে পাদরীদের প্রধান অবলম্বন। লোকরঞ্জনের পক্ষে উহা শ্রেষ্ঠ উপায়ও বটে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

কবি-প্রশস্তি

(কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে)

বাজাও তুমি সোনার বীণা, হে কবি! নব বঙ্গে ;
মাতাও তুমি, কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি রঙ্গে!
তোমার গানে,—তোমার সুরে,—
উঠিছে ধ্বনি বঙ্গ জুড়ে,
লক্ষ হিয়া গাহিয়া আজি উঠেছে তব সঙ্গে।

কমলে তুমি জাগালে প্রাতে, নিশীথে নিশিগন্ধা,
পূর্ণা তিথি মিলালে আনি' রিক্তা সাথে নন্দা।
যে ফুল ফুটে স্বর্গ-বায়ে
আহরি' দিলে প্রিয়ের পায়ে
মিলালে আনি অনাদি বাণী, নবীন মধুচ্ছন্দা।

জগত-কবি-সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব্ব,
বাঙালি আজি গানের রাজা, বাঙালি নহে খর্ব্ব।
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী! তব প্রতিভা-গুণে জগত-কবি সর্ব্ব।

জীবনব্রতে পঞ্চাশতে পড়িল তব অঙ্ক,
বঙ্গ-গৃহ জুড়িয়া আজি ধ্বনিছে শুভ শঙ্খ।
পান্থ! এসে পুষ্প-রথে
পৌছিলে হে অর্দ্ধ পথে,
সারথি তব শুভ্র শুচি কীর্ত্তি অকলঙ্ক।

অর্দ্ধ শত শরতে সোনা ঢেলেছ তুমি নিত্য,
অর্দ্ধ শত মিলিলে হেন তবে সে পূরে চিত্ত ;
সোনার তরী দিয়েছ তরি'
তবুও আশা অনেক করি ;—
ভরিয়া ঝুলি ভিখারী সম ফিরিয়া চাহি বিত্ত।

চাতক! তুমি কত না মেঘে মেখেছ বারিবিন্দু,
কত না ধারে ভরিয়া তুমি তুলেছ চিত-সিন্ধু!
মরাল! তুমি মানস-সরে
ফিরেছ কত হরষ-ভরে,
চকোর! তুমি এসেছ ছুঁয়ে গগন-ভালে ইন্দু।

বঙ্গবাসী-কুঞ্জে তুমি আনিলে শুভলগ্ন,
বাজালে বেণু মোহন তানে পরাণ হ'ল মগ্ন!
বিষাণ যবে বাজালে মরি,
গলিয়া শিলা পড়িল ঝরি',
মিশিল স্রোতে বদ্ধ ধারা, পাষাণ-কারা ভগ্ন।

গভীর তব প্রাণের প্রীতি, বিপুল তব যত্ন,
দিশারি! তুমি দেখাও দিশা, ডুবারি তোলো রত্ন।
যে তানে টলে শেষের ফণা
পেয়েছ তুমি তাহারি কণা ;—
অমৃত এনে দিয়েছে শ্রেনে,—নহে এ নহে প্রত্ন।

অমৃত এনে দিয়েছে প্রাণে পরাণ শোষী দুঃখ,
গৌণ যাহা না গণি' তাহে চিনিয়া নিলে মুখ্য ;
হিরণ্ময় মৃণাল ডোরে
শোকের রাতে র'হিলে ধ'রে,—
রুদ্রে নিলে বরণ করি' রসায়ে নিলে রুক্ষ!

রেখেছ তুমি দৈবী শিখা হৃদয়ে চির দীপ্ত,—
অবিশ্বাসে হতাশ্বাসে জগত যবে ক্ষিপ্ত ;
মত্ততারে করেছ ঘৃণা,
চাহ না তবু মুক্তি বিনা ;
উজল মনোমুকুর তব হয় নি মসীলিপ্ত।

বাজাও কবি অলোক-বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয়-শতদল সে তুমি ফুটাও সুধাগন্ধে ;
যে ভাবই ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলি আছে
তোমার নামে মেতেছে দেশ, মিলেছে মহানন্দে।

মলিন মেঘে বিজলি সম উজলি' আছ বঙ্গ,
মাতাও কভু কাঁদাও তুমি হাসাও করি' রঙ্গ!
সূর্য্য সম উজলি' ভূমি
সপ্ত ঘোড়া ছুটাও তুমি,
তৃপ্ত হ'ল বঙ্গ-হিয়া লভিয়া তব সঙ্গ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাজারে কেনাবেচা

(১)

অনেক লোকে ত প্রত্যহই হাটবাজারে যাইয়া জিনিষ কেনা বেচা করে। আমরাও আজ এখন বাজারে কেনাবেচার কাজ করিতেছি এইরূপ মনে করি; রোজই আমাদিগকে অনেকক্ষণ ধরিয়া দর কষাকষি করিতে হয়, কিন্তু আমরা ভাবি না, কেন একটী জিনিষ ৫৲ পাঁচ টাকায় একদিন পাওয়া যায়, উহার কমে বা বেশীতে পাওয়া যায় না, এবং কেনই বা আর একদিন উহা ৫৲ অপেক্ষা কমে বা বেশীতে বিক্রয় হয়। এই সব বিষয় আজ আমরা ধীর ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

লোকে বাজারে যাইয়া কাপড়, মাছ, দুধ, চাউল, শাকসবজী প্রভৃতি দ্রব্য দোকানদারদিগের নিকট হইতে কিনে। দোকানদারকে তাহারা টাকা পয়সা দেয়। দোকানদার জিনিষ যোগায়। কখনও বা জিনিষের বদলে জিনিষ পাওয়া যায়। গ্রামে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে চাষী তেলিকে চাউল দিতেছে আর তেলি তাহাকে তেল দিতেছে। এখন, কাপড়, মাছ, চাউল, শাকসবজী প্রভৃতি দ্রব্যের বিনিময় অথবা কেনাবেচা কেন হয় তাহা দেখিতে হইবে। আমরা চাউল, ডাল, মাছ প্রভৃতি কেন ক্রয় করি? সকলেই বলিবে খাইবার জন্য ক্রয় করি। কাপড় ক্রয় করি কেন? পরিবার জন্য। খাওয়াপরার যোগাড় হইলে পর আমরা বই কিনি, খেলনা কিনি, যাহা দরকার মনে করি, তাহাই এইরূপে সংগ্রহ করিয়া থাকি। বিনিময় বা কেনাবেচার উপযোগী হইতে হইলে জিনিষের একটি প্রধান গুণ থাকা চাই,—তাহা প্রয়োজনীয়তা। মানুষ যখন যে কোন অভাবের অসুবিধা অনুভব করে তখনই তাহা দূর করিতে উদ্যত হয়। দ্রব্যটি তখন তাহার নিকট প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে এবং সে ইহা ক্রয় করে।

কিন্তু জিনিষ প্রয়োজনীয় হইলেই যে কেনাবেচা বা বিনিময়ের উপযোগী হয় তাহা নহে। জল ত সকলেরই প্রয়োজনীয়, কিন্তু কেহই ত জল কেনাবেচা করে না। ইহার কারণ এই যে জল এত প্রচুর যে আমরা ইহা যত পরিমাণে চাহি তাহাই পাইতে পারি। জল অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়াই ইহার অভাব আমাদিগকে কখনও অনুভব করিতে হয় না। কিন্তু যখন জলের (ক) প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও (খ) অপ্রচুর হইয়া উঠে তখন জলেরও কেনাবেচা করিতে হয়। গ্রামে অনেক পুষ্করিণী আছে, গ্রামের লোককে সেই জন্য জলের দাম দিতে হয় না, কিন্তু তাহারা যখন কলিকাতায় আসে এবং বাড়ীর চৌতলায় বসিয়াই জল পাইতে চাহে, তখন তাহাকে জলের দাম দিতে হয়। মানুষ অন্ধকারে থাকিতে পারে না। দিনের বেলায় যখন সূর্য্যের আলো থাকে তখন ধনী নির্ধন সকলেই সমান ভাবে আলো পায়, কাহাকেও আলোর দাম দিতে হয় না। কিন্তু রাত্রি আসিলে ঘরে প্রদীপ জ্বালিতে হয়, যে ধনী সে বেশী দাম দিতে পারে এবং উজ্জ্বল আলোতে বাস করে, অন্যে অপেক্ষাকৃত কম আলোতে রাত্রি কাটায়।

কোন জিনিষ বিনিময়-সাধ্য বা বেচাকেনার উপযোগী হইতে হইলে ইহাকে (ক) প্রয়োজনীয় ও (খ) অপ্রচুর হইতে হইবে। আবার এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা আমরা আবশ্যক বোধ করি এবং তাহা অপ্রচুরও অথচ ইহার কেনাবেচা আমরা করিতে পারি না। ছেলে কাঁদিলে মা তাহাকে ভুলাইবার জন্য খেলনা আবশ্যক দ্রব্য মনে করেন। খেলনার কেনাবেচা হয় কারণ ইহা (ক) প্রয়োজনীয় (খ) অপ্রচুর। কিন্তু ছেলে যদি খেলনা পাইয়াও কাঁদিতে থাকে, তখন তাহার স্নেহময়ী মা খোকার কপালে একটি টিপ্ দিয়া যাইবার জন্য চাঁদমামাকে অনেক প্রলোভন দেখান। কলুকে যেমন তেলের বিনিময়ে গৃহিণী পুকুরের মাছ, গরুর দুধ দেন, মা আজ ছেলেকে চাঁদের টিপের জন্য ভাণ্ডারে যাহা কিছু মজুত আছে যাহা তিনি

দিতে পারেন মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো, গরুর দুধ, ইত্যাদি সবই দিতে চাহিতেছেন। কিন্তু কলুর তেলের মত, চাঁদের টিপের কেনাবেচা হয় না। যাহা কিছু আছে সব দিলেও আমাদের চাঁদমামা তাহার টিপ লইয়া ঘরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইবে না। চাঁদের টিপ, কষ্ট করিলেও পাওয়া যায় না, ইহা একবারেই অপ্রাপ্য।

বিনিময়োপযোগী হইতে হইলে দ্রব্যের কি কি গুণ আবশ্যক তাহা আমরা দেখিলাম। বাজারে যে সকল দ্রব্যের আমদানী রপ্তানি হয় তাহারা সকলেই (ক) প্রয়োজনীয়, (খ) অপ্রচুর ও (গ) আয়াসলভ্য।*

(২)

শাকসবজী যদি অনায়াসেই পাওয়া যায় এবং যদি ইহার যোগান ঐ কারণে খুব প্রচুর হয়, ইহার টান যতই বাড়ুক না কেন, যদি ইহার কখনও অকুলান না হয়, তাহা হইলে শাকসবজীর জন্য আমাদিগকে বাজারে যাইতে হইবে না। প্রত্যেকের বাড়ীতে ক্ষেত না থাকাতে, এবং অনেকেই ক্ষেত হইতে শাকসবজী তুলিবার কষ্টটুকু পাইতে অনিচ্ছুক হওয়াতে শাকসবজীরও দাম দিতে হয়। পূজা এবং উৎসবের দিনে, যখন শাকসবজী, ফলমূল, মাছ, প্রভৃতির যোগান টানের অপেক্ষা কম হয়, অথচ যোগান খুব তাড়াতাড়ি টানের অনুরূপ হওয়া অসম্ভব হয়, তখন ঐ সব দ্রব্যের দাম খুব বাড়িয়া যায়। প্রয়োজন হইলেই আয়োজন হয়, ইহা খুব সত্য। কিন্তু অনেক সময়ে প্রয়োজনমত আয়োজন হইতে সময় লাগে। মাছ, ফলমূল, শাকসবজী, দুধ, সন্দেশ প্রভৃতি দ্রব্য দোকানদারেরা ভবিষ্যতের জন্য মজুত করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ দুই একদিনের মধ্যেই এই সকল দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং হাটে যদি এই সকল দ্রব্যের যোগান টান অপেক্ষা খুব বেশী হইয়া যায়, দোকান্দারকে লোকসানের ভয়ে অনেক সময়ে ইহাদিগকে মুড়ির দরে ছাড়িয়া দিতে হয়। পক্ষান্তরে ইহাদিগের টান বাড়িলে যোগান হঠাৎ বাড়ান খুব কঠিন। দূর দেশ হইতে এই সকল দ্রব্য আমদানী করিতে খরচ ও সময় লাগে, পথে দ্রব্য নষ্ট হইয়া যাইবারও সম্ভাবনা থাকে। কাজেই দোকানদারেরা দুই এক দিনের লাভের আশায় দূর দেশ হইতে জিনিষের আমদানী করিতে শীঘ্র রাজী হয় না। অতএব টান হঠাৎ বাড়িয়া গেলে যতদিন নূতন আমদানী না হয় ততদিন যে সকল ব্যাপারীরা হাটে ঐ সকল দ্রব্য লইয়া আসিয়াছে তাহারা খুব লাভ করিতে পারে। এই সময়ের জন্য যোগান টানের অনুরূপ না হওয়াতে, যেমন টান কমিলে মূল্য কমে, সেইরূপ টান বাড়িলে মূল্য বাড়ে—মূল্য কেবলমাত্র টানের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া টান বেশী হওয়াতে যখন মূল্য বাড়িবার মুখে থাকে, তখন ব্যাপারীরা রেলের খরচ স্বীকার করিয়াও অন্য হাট হইতে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া আসে। কিছুকালের মধ্যেই যোগান টানের অনুরূপ হয়। সব খরিদদারেরাই তখন আবশ্যক পরিমাণে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে বলিয়া মূল্য বাড়িতে পায় না। অতএব দেখা গেল, যে, যে সময়ের জন্য যোগানের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, নির্দিষ্ট, সেই সময়ে মূল্য টানের উপর নির্ভর করে,—কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই যখন যোগান টানের অনুরূপ হয়—তখন টান ও যোগান উভয়েরই উপর মূল্য নির্ভর করে।

মাছ দুধ প্রভৃতি দ্রব্যের যোগান বাড়ান যাইতে পারে, কিন্তু হঠাৎ বাড়ান খুব কঠিন। আর একপ্রকার দ্রব্য আছে যাহাদিগের যোগান বাড়ান একবারেই অসম্ভব। পুরাতন পুঁথি, বড় বড় লোকের ব্যবহৃত সামগ্রী অনেকেই সংগ্রহ করেন। টান যতই হউক না কেন ইহাদিগের যোগান কখনও বাড়িতে পারে না। পুরাতন পুঁথি নূতন করিয়া লেখা যাইতে পারে, কিন্তু পুরাতন বলিয়াই পুঁথিটীর দাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটী জুতা অনেকের কাছে খুব দামী। ঐতিহাসিকগণও পুরাতন মুদ্রা, পুরাতন ছবি প্রভৃতি দ্রব্য অনেক সময়ে খুব বেশী মূল্যে কিনিয়া লয়। এই সকল দ্রব্যের মূল্য কেবল টানের উপরই নির্ভর করে।

* কেবল মাত্র দ্রব্য কেন, মানুষের কাজেরও কেনাবেচা হইয়া থাকে। চাকর, কেরাণী, ডাক্তার, উকীল প্রভৃতি তাহাদিগের ব্যক্তিগত গুণ অথবা কার্য্যতৎপরতার জন্য পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। আবার এমন কতকগুলি ব্যক্তিগত গুণ বা শক্তি আছে, যাহা টাকা দিলেও অপরের কার্য্যে নিয়োজিত হওয়া অসম্ভব। অর্থ পাইলে দাসীরা পরিচর্য্যা করে, কিন্তু মাতার স্নেহ অর্থের দ্বারা পাওয়া যায় না, ইহা স্বতঃপ্রবৃত্ত, হাটবাজারে ইহার ক্রয় বিক্রয় নাই।

(ক) মাছ, ফলমূল ইত্যাদির মূল্য কিছুকালের জন্য—যতদিন হাটে নূতন আমদানী না হয় সেই কাল যাবৎ—টানের উপর নির্ভর করে, পরে যখন নূতন আমদানী হয় তখন টান এবং যোগান উভয়েরই উপর নির্ভর করে।

(খ) পুরাতন পুঁথি ইত্যাদির মূল্য কেবলমাত্র টানের উপর নির্ভর করে।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

ভাবুকের নিবেদন

(রুসো)

মানুষ! মানুষের মত হও; ইহাই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য। সকল অবস্থায় এবং সকল বয়সের লোকের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করিয়ো।

স্বভাবতঃ মানুষ ধনী নয়, কুলীন নয়, বনিয়াদীও নয়; জন্মের সময় সবাই নিঃস্ব, সবাই নিঃসহায়। জীবনে সকলেই শোক, দুঃখ, অভাব প্রভৃতি সংসারের নানা কৃচ্ছ্র পরীক্ষার অধীন; অধিকন্তু সকলেই মৃত্যু-সংযত। এই তো মানুষের অবস্থা। এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে না; ইহার কাছে কাহারো নিস্তার নাই; ইহাই মানবের মানবত্ব।

মানুষ দুঃখের অধীন এবং স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বলিয়াই পরস্পরের সঙ্গে মিশিতে শিখিয়াছে; আমাদের অভাবের কষ্ট এবং অপূর্ণতার বেদনাই আমাদিগকে মানুষ করিয়াছে ব্যথা না পাইলে অন্যের ব্যথা বুঝিতে পারা যায় না।

এই অপূর্ণতা আমাদের পরমানন্দের হেতু হইয়াছে। যে মানুষ কিছুই চায় না, কাহাকেও চায় না,—যাহার কোনো অভাবই নাই, আমার মনে হয়, সে ভাল বাসিতেও পারে না; আর, যে ভালবাসে না সে যে সুখী, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না।

অন্যায়ে কেহই খুসী হয় না। দুর্ব্বৃত্তেরাও অন্যায়ের অনুমোদন করে না,—অবশ্য, যদি, তৎসঙ্গে নিজের স্বার্থ জড়িত না থাকে। যে ক্ষেত্রে নিজের লাভও নাই লোকসানও নাই, সেখানে, দুষ্ট লোকেও অন্য দুর্ব্বৃত্তের সিদ্ধিকামনা না করিয়া, বরং ধর্ম্মের জয়টাই কামনা করিয়া থাকে।

ইচ্ছাশক্তি নিজস্ব জিনিস; কিন্তু, তদনুযায়ী কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা সকল সময়ে নিজের করায়ত্ত নয়। যখন প্রলোভনে পড়িয়া কর্ম্ম করি, তখন বাহিরের দ্বারা অভিভূত হই; যখন তজ্জন্য অনুতপ্ত হই তখনি আমার হৃদ্গত ইচ্ছার স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যখন আমি অবগুণের অধীন তখন আমি গোলাম; যখন অনুতপ্ত তখন নির্ম্মুক্ত।

মনের যে সমস্ত ধর্ম্মকে আমরা রিপু বলিয়া জানি, পরোক্ষে তাহারাই আমাদের রক্ষক। তাহাদিগকে নষ্ট করিবার চেষ্টা বৃথা, সে চেষ্টা হাস্যকর। ইহা বিধিলিপির উপর কলম ডালিবার চেষ্টা; খোদার উপর খোদ্‌গিরি!

অভাবের সংখ্যা অল্প করিয়া ফেলা, অপরের সঙ্গে আপনার তুলনা না করা এবং কাহারো মতামতের মুখাপেক্ষী না হওয়া;—মূলতঃ এই সকলই মানুষকে খাঁটি রাখে।

অভাব ক্রমশঃ বাড়াইয়া তোলা, ক্রমাগত অপরের সঙ্গে নিজের তুলনা করা, এবং বাহিরের লোকের মতামতের উপর একান্ত নির্ভর রাখা,—মোটামুটি, এই সকলই মানুষকে বিগড়াইয়া দেয়।

পরের সঙ্গে নিজের তুলনা করিতে গিয়া, লোকের কাছে আপনাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে; আর, এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা হইতেই অশেষ ক্ষুদ্রতা এবং নানা বিবাদ-বিসংবাদের উৎপত্তি।

আত্মানুরাগ, বিকৃত হইলে, মহৎ চরিত্রে উহা আত্মাভিমানে পরিণত হয়; ক্ষুদ্র চিত্তে শূন্যগর্ভ গর্ব্বমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

যে স্থলে নিজের গুণ প্রকাশ হইলে, সঙ্গে সঙ্গে, অন্যের দোষও প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা, সেরূপ সঙ্কটস্থল যথাসাধ্য পরিবর্জ্জন করিয়ো।

সাধ এবং সাধ্যের অসামঞ্জস্যের ফল দুঃখ। সাধ পূর্ণ করিবার মত সাধ্য যাহার আছে সেই সুখী। শক্তি যাহার প্রয়োজন-সাধনের অতিরিক্ত, সে, ক্ষুদ্র কীট হইলেও, শক্তিমান এবং সুখী। যাহার সাধ্য অল্প, সাধ অপরিমিত, সে, হস্তী, সিংহ অথবা দিগ্বিজয়ী বীর হইলেও দুর্ব্বল; দেবতা হইলেও সুখহীন।

মানুষ যতক্ষণ মানুষ থাকিয়াই খুসী ততক্ষণ সে অজেয়। যখন সে মানুষের অপেক্ষা নিজেকে বড় মনে করিয়া বসে তখন সে একেবারে অপটু,—তুচ্ছ।

অভ্যস্ত হইয়া গেলে শারীরিক সুখ মাত্রেরই চেহারা বদ্‌লাইয়া যায়; গৌণভাবে যাহা সুখের ছিল মুখ্যভাবে তাহা দুঃখের হইয়া উঠে। দূর সম্পর্কে যাহাকে ইষ্ট বলিয়া মনে হইত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে তাহারই অভাবে জীবন কষ্টময় বলিয়া মনে হয়। আমরা নূতন শিকলও পরিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সুখের একটা স্বপ্নময় কাঙ্ক্ষিত পথে কাঁটা পড়িয়া গেল।

চাওয়া মাত্রেই যে পায়, সে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান না হইলে, নিশ্চয়ই অতি দুর্ভাগ্য; বেচারা চাহিবার সুখে বঞ্চিত।

জীবন অনিশ্চিত, বৃথা বিজ্ঞতা সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন কর। ভবিষ্যতের উদ্দেশে বর্ত্তমানকে বলি দিয়ো না। অধ্রুবের লোভে ধ্রুব সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়ো না।

অল্পবয়স্কেরা যদি অবিবেচকের মত আমোদের অনুসরণ করিয়া বেড়ায়, তবে, উহাদের বর্ত্তমানকে উপভোগ করিবার স্পৃহাটাকেই অবিবেচনার কাজ বলিতে পারি না। যেখানে সুখ নাই সেইখানে সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয় বলিয়াই উহাদের অবিবেচক বলা চলে।

সকল বয়সেই মানুষের নিজের আত্মসম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া চলা উচিত; প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় ফল নাই। যৌবনকালের বিশেষ সুখ-সম্ভার পিছনে পড়িয়া থাকে থাকুক; মানব-জীবনে সকল অবস্থাতেই বিচিত্র সুখের আয়োজন আছে।

যে সুখ আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে তাহার পিছনে ছুটিতে গিয়া, আমরা আয়ত্তাধীন সুখ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করি। যে মানুষ স্বভাবের অনুবর্ত্তন করে তাহার রুচি বয়সের সঙ্গে স্বভাবতঃই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সে যেমন বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন ফল আনন্দের সহিত গ্রহণ করে, ঠিক্ তেমনি করিয়াই বিভিন্ন বয়সেও সে বিচিত্র সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়।

কল্পনা, মানুষকে যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-বোধের কঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে লইয়া না যায় এবং চিত্তবোধ প্রসারিত হইয়া যে পর্য্যন্ত অন্য জীবে ব্যাপ্ত হইতে না পারে সে অবধি মানুষ ব্যথিতের বেদনা বুঝিতেই পারে না।

সাধারণ মানুষই মানবজাতির যথার্থ প্রতিরূপ। যাহাতে সাধারণ মানুষের কিছু আসে যায় না সে বিষয় এতই তুচ্ছ যে তাহা দার্শনিকের এবং ভাবুকের আলোচনার অযোগ্য।

সকল মানুষকেই ভালবাসিতে শেখ; কারণ তুমিও মানুষ উহারাও মানুষ। নিজেকে কোনো গণ্ডীর মধ্যে স্থাপন করিয়ো না, তবেই, সকল শ্রেণীর সকল লোকের প্রতি সহানুভূতি রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইবে।

মানবজাতি সম্বন্ধে যখনি আলোচনা করিবে, তখনি, যেন তোমার অন্তর হইতে সহানুভূতির সুর বাজিয়া ওঠে। সানুরাগ বিস্ময় এবং সকরুণ সমবেদনার সুরও যেন শুনিতে পাওয়া যায়। অবজ্ঞার সুর একেবারে বন্ধ করিয়া দাও। মানব! মানবজাতির অমর্য্যাদা করিয়ো না।

সমাজের বাহিরে, নিঃসম্পর্ক মানুষ যেমন খুসী তেম্‌নি করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু, সমাজে—যেখানে পরস্পর সকলেই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পরস্পরের মুখাপেক্ষী, সেখানে—প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সাধারণের নিকট অল্পবিস্তর ঋণী, এবং সে ঋণ প্রত্যেকেই খাটিয়া শোধ করিতে বাধ্য। এ আইনের কাছে কাহারো অব্যাহতি নাই; যে লোক সমাজে বাস করে, পরিশ্রম তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ধনীই হউক বা নির্ধনই হউক, বলবান হউক বা দুর্ব্বল হউক,—নিষ্কর্ম্মা লোক মাত্রেই পরস্বাপহারী তস্কর।

সমাজের ঋণ পরিশোধের জন্য,—নিজের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। যে কাজে মাথা অপেক্ষা হাতের পরিশ্রম বেশী সেইরূপ একটা কাজ অবলম্বন করিলেই চলিতে পারে। এরূপ কাজে ধনী হওয়া যায় না; ধনের অতীত হওয়া যায়।

গ্রন্থ রচনা যে পর্য্যন্ত দোকানদারীতে পরিণত না হয় সেই পর্য্যন্তই উহা সম্মানের কর্ম্ম।

শ্রমসাধ্য শিল্পকর্ম্মের মধ্যে যে কোনো একটা শিখিয়া লও; কেবল ব্যবসাদারীর খাতিরে নয়,—শুধু লাভের লোভে নয়; আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, চিত্ত ও চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার জন্য এবং শারীরিক পরিশ্রমের বিরুদ্ধে যে একটা পুরাতন বদ্ধমূল কুসংস্কার আছে, বিশেষ করিয়া, সেইটাকে একেবারে নির্ম্মূল করিবার জন্য নিষ্কলঙ্ক শ্রমসাধ্য কর্ম্ম অবলম্বন কর।

পৈতৃক সম্পত্তির আয় স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে পার; কিন্তু, যদি সে সম্পত্তি নষ্টই হইয়া যায়? অথবা পৈতৃক সম্পত্তি যদি একেবারেই না থাকে? তখন? একটা শিল্প শিখিয়া রাখ।

মানুষ কর্ম্মের দাস নয়; মানুষের জন্যই কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

লোকে বলে "ভিক্ষা দিয়া নিষ্কর্ম্মাদের প্রশ্রয় দিলে চোর-তৈয়ারীর সহায়তা করা হয়!" ঠিক বিপরীত; বরং ভিক্ষাদানই ভিখারীদের চোর হইয়া উঠিবার পক্ষে অন্তরায়।

মুষ্টি ভিক্ষার মত ক্ষুদ্র দানে কুণ্ঠিত হইয়ো না। মনে রাখিয়ো, তোমার ঐ তুচ্ছ অপব্যয় একজন মানব সন্তানকে অপকর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে, হয় তো মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইতে পারে।

অভিনেতার বাক্যজাল অনুকৃত কর্ম্মের বর্ণনা করিয়া আমাকে বিস্মিত করে; আর, ভিক্ষুদের নিবেদন স্বয়ং আমাকেই সৎকর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া আমাকে ধন্য হইবার অবসর দেয়।

পয়সা খরচ করিয়া করুণ-রসাত্মক নাটকের অভিনয় দেখিয়া যখন ফিরি, তখন, আমার কৃত্রিম উত্তেজনা রঙ্গালয়ের দ্বার পর্য্যন্ত টিঁকে কি না সন্দেহ। কিন্তু পয়সা খরচ করিয়া যদি কখনো একজন গরীবের এক বেলারও অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়া থাকি তবে সে আনন্দের স্মৃতি আমার চিরজীবনের সঙ্গী।

ভিখারীদের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর মতটাই না হয় মানিয়া লওয়া গেল। ধরিয়া লইলাম যে পরিশ্রমীর অন্ন শ্রম-বিমুখ অলস ব্যক্তির জন্য নয়,—কুড়ের সঙ্গে কর্ম্মীর আদান প্রদানের কোনো বাধ্য-বাধকতাই নাই। তবুও, নিজে যখন মানুষ, তখন মানুষের এই দুঃখক্লিষ্ট মলিন মূর্ত্তির সম্মুখে সসম্ভ্রমে অবনত হওয়াই স্বাভাবিক। অপরের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া নিজের মনটাকে নির্ম্মম হইতে দেওয়া কোনো মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

একটা পয়সা,—সাহায্যের হিসাবে হয় তো মোটেই যথেষ্ট নয়; তবুও, যৎসামান্য হইলেও, উহা সমবেদনার নিদর্শন, উহা আমাদের অভিন্নত্বের গভীর অনুভূতির চিহ্ন, উহা বিশ্বমানবত্বের প্রতি সসম্মান অভিবাদন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

নিরাশ-প্রণয়

(মোঁপাশা হইতে)

মার্ক্ইস বারট্রামের গৃহে সান্ধ্যভোজে সমবেত নিমন্ত্রিতদের আহার প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। উজ্জ্বল আলোক-মণ্ডিত সুশোভন এক কক্ষ, মেজে তার বিচিত্র কার্পেটে মোড়া, প্রাচীরে মনোহর চিত্ররাজি চিত্রকরের চিত্রনৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছিল। সেই সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠের মাঝখানটায় এক বৃহদায়তন 'ডিনার টেবিল' পত্রপুষ্পাদি নানা সাজসজ্জায় সাজান, তারই চারিদিক বেষ্টন করে বসেছিলেন এগারোজন স্পোর্টস্ম্যান (Sportsmen) আর জনকয়েক লেডি (ladies)। আর ছিলেন সেখানে স্থানীয় ডাক্তার এবি ভিলবোয়া।

তাঁরা আলোচনা করছিলেন 'প্রণয়ের বিচিত্রতা' সম্বন্ধে। জীবনে কেহ একাধিকবার কাহারও সহিত প্রকৃত ভালবাসায় আবদ্ধ হোতে পারেন কিনা—এবিষয়ে অফুরন্ত বাদ প্রতিবাদ চলছিল। 'প্রকৃত প্রণয়ী যে সে যাকে একবার হৃদয় দিয়ে ভালবাসবে—সে প্রতিদান না পেলেও তার ভালবাসা ভুলতে পার্ব্বে না; যাঁরা পবিত্র প্রেমের মাধুর্য্য বোঝেন, তাঁরা কখনও একবার ছাড়া দু'বার ভালবাসতে পারেন না।'—এরূপ যুক্তি প্রদর্শন কল্লেন এক পক্ষ। অপর পক্ষ অনেক ঘটনার উল্লেখ করে দেখালেন যে অনেকে একাধিকবার একাধিক ব্যক্তিকে ভালবেসেছেন। তাঁদের মতে, রোগ যেমন

সময়ে অসময়ে মানব-দেহ আক্রমণ করে থাকে—তেমি ভালবাসা যখন তখন মানব-হৃদয় অধিকার কর্ত্তে পারে।

মহিলাদের মনোবৃত্তি স্বভাবতঃই কোমল। তাঁদের চিন্তারাশি সর্ব্বদাই কবিত্বময়—ভাবময়। যা কিছু অন্যায় যা কিছু বিসদৃশ তা' তাঁরা কল্পনা কর্ত্তে পারেন না,—সেসবের অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার কর্ত্তে চান না। তাই তাঁরা শেষোক্ত মতের প্রতিবাদ করে বল্লেন,—'আমাদের মতে সত্য প্রণয়ী যাঁরা—ভালবাসার স্বর্গীয় ভাব যাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন—তাঁরা কখনও দান প্রতিদানের অপেক্ষা কর্ত্তে পারেন না। নিজেদের অপূর্ব্ব প্রণয়ের সুখ আপনা হতেই তাঁরা পাবেন।'

মার্ক্ইস্ বারট্রাম জীবনে অনেকবার অনেকের সহিত ভালবাসায় আবদ্ধ হয়েছেন, তিনি মহিলাদের এই বাক্যের প্রতিবাদ করে বল্লেন—'আমি বেশ জোর করে বল্‌তে পারি যে, যে মানুষ - যার হৃদয় বলে একটা জিনিষ আছে —সে সারাজীবন ভালবাসার এক নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ থাকতে পারে না। প্রণয় একটা মস্ত নেশা। যে মাতাল - সে যেমন মদ্যপান না করে থাক্‌তে পারে না, তেমি যে প্রণয়ী সে কখনও ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে না। সে নিত্য নূতন প্রণয়ে গা ঢেলে দেবেই। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।'

এই উষ্ণ বাদানুবাদের একটা শেষ মীমাংসা কর্ব্বার জন্যে সকলেই ডাক্তার ভিলবোয়াকে অনুরোধ কল্লেন। সমবেত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে তাঁর মত প্রাচীন ও বহুদর্শী ব্যক্তি আর কে? তাঁর উপর বিচারের ভার দিলে বিষয়টার উচিতরূপ মীমাংসা হবে—এই ভেবে সকলে তাঁকেই মধ্যস্থ মনোনীত করলেন। তিনিও সকলের অনুরোধ এড়াতে না পেরে বললেন—"মার্ক্ইস্ বারট্রামের যুক্তি আমি স্বীকার কর্ত্তে পারি না। হতে পারে প্রণয় একটা নেশা,—কিন্তু তাই বলে যে নিত্য নূতন লোককে ভালবাস্‌তে হবে তার কোনও মানে নাই। বরং যাঁরা প্রণয়ে মত্ত হয়ে যান—তাঁরা সেই নেশায় এতদূরই আত্মহারা হন যে তাঁরা সে ভালবাসা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারেন না। প্রণয় কখনও ক্ষণস্থায়ী নয়। প্রকৃত ভালবাসা জীবনে মরণে। আপনারা অনুমতি করলে আমি এমন একটী সত্য ঘটনামূলক বিবরণ বর্ণনা কর্ত্তে পারি যার নায়িকা সুদীর্ঘ ৫৫ বৎসর ধরে একজনকে ভালবেসেছিল। সে একটী দিনের জন্যও তার ভালবাসার কোনও প্রতিদান পায়নি এবং একদিনও তার সেই স্বর্গীয় ভালবাসার কথা প্রকাশ করে বলেনি। সেই সুদীর্ঘকাল ধরে হৃদয়ের নিভৃত স্থানে—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তার অতৃপ্ত প্রেম লুক্কায়িত রেখেছিল। অবশেষে মৃত্যু এসে তাকে স্বর্গের প্রেমরাজ্যে নিয়ে গিয়েছে।"

মার্ক্ইস্-পত্নী এ কথা শুনে আনন্দধ্বনি করে বল্লেন, 'বাঃ পবিত্র প্রণয়ের কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! এরূপ ভালবাসা স্বর্গীয়—যে নারী সুদীর্ঘ ৫৫ বৎসর কাল এরূপ অক্ষয় অতৃপ্ত ভালবাসা হৃদয়ে লুকিয়ে রাখতে পারে—সেই নারীই প্রকৃত ভাগ্যবতী। সে তার প্রতিদানশূন্য প্রেমের সুখ আপনা হতে পেয়েছে নিশ্চয়! বলুন, বলুন, আমরা সকলে এই পুণ্যকাহিনী শ্রবণ কর্ব্ব।'

মার্ক্ইসের বদনে বিরক্তিচিহ্ন দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তার ভিলবোয়া আরম্ভ করলেন—

"সে আজ তিন মাসের কথা, একদিন আমি উপরোক্ত নারীর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। আমি তার অন্তিম নির্দ্দেশ (will)এর একজন একজিকিউটার মনোনীত হয়েছিলাম।

"প্রতি বৎসর বসন্ত ঋতুতে যে নারী এখানে ভাঙা চেয়ার মেরামত কর্ত্তে আসতো, সেই আমার বর্ণিতব্য বিবরণের নায়িকা—আর তার হৃদয়ের দেবতা ছিল স্থানীয় রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ চকেট।"

নায়িকা সামান্য এক শ্রমজীবী নারী একথা শুনে মহিলাদের উৎসাহ খানিকটা আঘাত প্রাপ্ত হল। তাঁরা যেন বল্‌তে চাইলেন, যে, পবিত্র প্রণয় কেবল সম্ভ্রান্ত ও সৎকুলোদ্ভবা রমণীদেরই একচেটিয়া।

যা হোক ডাঃ ভিলবোয়া বলতে লাগলেন, "আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লাম পুরোহিত পূর্ব্বেই এসে পৌছেছেন। আমি নারীর শয্যার নিকট একখানা চেয়ার টেনে বস্‌লাম। নারী অতি মৃদুস্বরে আমাকে তার জীবনের সমস্ত কথা খুলে বললে, এর পূর্ব্বে সে তার করুণ প্রণয়কাহিনী আর কারও কাছে বলেনি।

সে তার জীবনের প্রত্যেক ঘটনার উল্লেখ করে আমাকে তার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা জানালে, আর আমার হাত ধরে সাশ্রু নয়নে বললে—তার আকাঙ্ক্ষা যেন পূরণ হয়। আজ আমি তার জীবনের কাহিনী আপনাদের নিকট বিবৃত করব।

"তার পিতা মাতা travelling chair mender ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা নানা স্থানে ঘুরে ফিরে চেয়ার মেরামত করতেন। অতি শৈশব হতেই বালিকা তার পিতা মাতার সঙ্গে এক স্থান হতে স্থানান্তরে নীত হত। *দুই রাত্রিও সে কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে শয়ন করে নাই।*

"তখন তার বয়স ২।৩ বৎসর। পিতা মাতা হয়তো কোনও সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে নিজ নিজ কাজে মন দিতেন-আর সে মলিন বস্ত্র পরে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতো। তাদের শকটবাহী ঘোড়া দুইটা নিকটেই লাগাম—খোলা চরে বেড়াত, কুকুরটা সামনের দু'পায়ের উপর নাক রেখে নিঃশব্দে নিদ্রা যেত। একটা বড় গাড়ীই তাদের গৃহ স্বরূপ ছিল--এ ছাড়া তাদের গৃহ ব'লতে আর কিছুই ছিল না। বড় বড় দুইটা ঘোড়ায় তাদের শকটাবাস টেনে নিয়ে বেড়াত। আর একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর তাদের সে গৃহ পাহারা দিত। এরূপ ভাবেই তার শৈশব জীবন কেটে গেল। বালিকা তার সারা জীবনে একটীও আদরের কথা শোনেনি। যখন ছুট্‌তে ছুট্‌তে বালিকা মধ্যে মধ্যে পিতা মাতার নিকট হতে দূরে চলে যেত কেবল তখনই তার পিতার গম্ভীর শাসন-বাক্য তাকে সম্ভাষণ করত। এরূপ শাসনবাক্য ব্যতীত সে তার পিতা মাতার অন্য কোনও প্রকার স্নেহবাণী শোনেনি।

ক্রমে বালিকা বাড়তে লাগল। পিতা মাতা তখন তাকে তাঁদের কার্য্যে সাহায্যকারিণী কর্ত্তে চাইলেন। তখন হতে বালিকাকে তাঁরা নিকটবর্ত্তী গ্রামের ভিতর মেরামতের উপযোগী চেয়ার খুঁজে আন্‌তে পাঠাতেন। বালিকা গ্রামের ভিতর রাস্তার স্থানে স্থানে সমবেত রাস্তার ছেলেদের (street boys) সঙ্গে মিশতে যেতো, কিন্তু তার মলিন বস্ত্র ও অপরিষ্কার শরীর দেখে কেউ তার কাছে আস্‌তো না। প্রায়ই দুষ্ট ছেলেরা দূরে গিয়ে তার উপর ঢিল ছুড়তো।

"একদিন এক সদয় মহিলা বালিকার জীর্ণ বস্ত্র দেখে তাকে একটী টাকা দান করেন, বালিকা সেই টাকা সযত্নে সঞ্চয় করে রেখে দিলে।

"বালিকার বয়স তখন এগারো বৎসর। একদিন সে উল্লিখিত চকেটদের (Choquette) বাড়ীর সামনে দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল, 'ভাঙা চেয়ার সারাবে গো'। রোজ যেমন হেঁকে যায় তেমনি হেঁকে যাচ্ছিল,--হঠাৎ সেদিন তার চোখ চকেটের উপর পড়লো। তখন চকেটের বয়স ৯।১০ বৎসর। সে তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। একটী ছেলে তার কাছ থেকে দুটা পয়সা কেড়ে নিয়েছে--বালক তার পয়সার শোক কোনও মতেই ভুলতে পারছিল না। বালিকা এ দৃশ্য দেখে বিচলিত হলো; যেসকল বালককে সে সর্ব্বদাই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী বলে কল্পনা করত, আজ সেরূপ এক ধনীর ছেলের চোখে অশ্রু দেখে বালিকার মন সহানুভূতিতে ভরে উঠ্‌লো, তার সব মানসিক বৃত্তি-গুলি হঠাৎ কেমন যেন আলোড়িত হয়ে পড়লো। সেই মুহূর্ত্তে নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে বালিকা তাকে ভাল বাসলে! তার সঞ্চিত সমুদায় অর্থ সে বালককে দান করে ফেললে। একটী একটী করে সে প্রায় ৫৲ টাকা সঞ্চয় করেছিল—সেগুলির জন্যে একটুকুও মায়া না কোরে সে তা বালকের হাতে গুঁজে দিলে। বালক বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে রইল। সে যে এত অর্থ পাবে তা সে কল্পনায়ও আন্‌তে পারেনি। তার ক্রন্দন সেই মুহূর্ত্তেই দূর হল। তখন বালিকা তার চোখের জল মুছিয়ে দিলে। সে যে তার এই সামান্য অর্থগুলির বিনিময়ে বালককে সন্তুষ্ট কর্ত্তে পেরেছে—তা' ভেবে তার আনন্দের আর সীমা রইল না। সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের অবস্থা ভুলে গিয়ে বালককে জড়িয়ে ধরলে—তাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বালকও আশাতিরিক্ত অর্থ পাওয়ায় এই নোংরা বালিকার আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়েও কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপন করলে না।

"বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কী এই আকস্মিক প্রলয়?

প্রেমের বন্ধন ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সবারই নিকট বড় শক্ত। কে কাকে কখন কোন সূত্রে ভাল বেসে ফেলে তা বুঝতে পারা কঠিন।

"সেই ঘটনার পর হতে বালিকা শয়নে স্বপনে কেবলই বালককে ভাবতো! বালকের সঙ্গে মেশবার আশা সর্ব্বদাই তার হৃদয় অধিকার কোরে থাকতো।

"তার পর আরও কয়েক মাস চলে গেছে, পিতামাতার সঙ্গে বালিকাকে তখন স্থানান্তরে যেতে হয়েছে। কিন্তু সে কিছুতেই সেখানে থাকৃতে পারলে না। পিতামাতার নিকট হতে অনুমতি নিয়ে সে পুনরায় বালককে দেখ্‌তে এলো, কিন্তু এবার তার আশা মিটলনা—অনেকক্ষণ চকেটদের বাড়ীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকবার পর—সে কেবল একবার বালককে মুহূর্ত্তের জন্যে জানালায় দেখ্‌তে পেয়েছিল।

"তবুও সে বালককে ভুলতে পারলে না—যতই সে বালক হতে দূরে চলে যেতে লাগলো, ততই তাকে আরও বেশী করে ভালবাস্‌তে লাগলো, যতই বালককে পাওয়ার আশা, তাকে দেখবার আশা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হলো, ততই তার প্রণয় গভীর হতে গভীরতর হলো। বালিকার হৃদয়ে বালকের মূর্ত্তি আঁকা হয়ে গেল।

"আবার নূতন পাতা, নূতন ফুল নিয়ে, নূতন সাজে সজ্জিত হয়ে বসন্ত এসে দেখা দিলে। প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্য সকলেরই মন এক নব উৎসাহে মাতিয়ে দিলে। কিন্তু আমাদের বালিকার সে উৎসাহ কোথায়? ক্রমেই যেন বালিকার উৎসাহ কমে যাচ্ছিল। সে যে চকেটের সঙ্গ পেতে পারে না, তা সে ক্রমেই স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারছিল। বাহিরে উৎসাহ কমে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু তার হৃদয়ের প্রণয় ক্রমেই বাড়ছিল। এবারও সে তার পিতা-মাতার সঙ্গে আমাদের এখানে এল,—সে এবার চকেটকে একদিন তাদের বাড়ীর সামনে দেখতে পেলে। বালক মার্ব্বেল খেলছে—বালিকা মনের উত্তেজনা দমন কর্ত্তে না পেরে—হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে শাসন কর্ত্তে না পেরে—দৌড়ে গিয়ে তাকে বুকে টেনে নিলে। আকস্মিক এক অসভ্য মেয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে বালক ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। বালিকা তখন তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার এক বৎসরের যাবতীয় সঞ্চয় বালককে দান করলে,—বালক কতক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে সেগুলির দিকে চেয়ে রইল তার পর দৌড়ে চলে গেলো।

"এই ভাবে আরও চারি বৎসর ধরে সে তার টাকা কড়ি যা কিছু বাঁচাতে পারতো—সব বালককে অর্পণ করতে লাগলো। বালক সে সমুদায় অর্থ গ্রহণ করে' তদ্বিনিময়ে বালিকাকে যতক্ষণ ইচ্ছা আলিঙ্গন কর্ত্তে দিত। এবৎসর ২৫৲, অন্য বৎসর ১৫।২০ টাকা এইরূপ ভাবে বালিকা বহু অর্থ তাকে দিত। পৃথিবীতে তার অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না—বালকের সঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই তাকে সুখী কর্ত্তে পারতো না; সে কেবল নিশি দিন বালককে ভাব্‌তো, তাতেই সে তার প্রণয়ের সুখ ও সার্থকতা পেত। বালককে তার সঞ্চিত অর্থ দান কর্ত্তে তার একটুও মায়া হ'ত না।

"তার পর আরও কয়েক বৎসর চলে গেছে—এখন আর সে বালককে দেখ্‌তে পায় না। বালক তখন অন্য শহরে পড়বার জন্যে গিয়েছিল। আরও দু বৎসর পর একদিন পুনরায় তার সঙ্গে বালকের দেখা হল—সে এখন অনেকটা বড় হয়েছে—তার বালসুলভ চপলতা আর নাই—সে আর এবার বালিকার কাছে এল না—যেন সে বালিকাকে দেখ্‌তে পায় নি এই ভাবে পাশ কাটিয়ে সে চলে গেল। হায়! যে নিজের সুখসুবিধার দিকে একটুও দৃষ্টিপাত না কোরে তার যাবতীয় সঞ্চয় বালকের হাতে তুলে দিয়েছে—আজ সেই অকৃতজ্ঞ বালক তার সমস্ত আদর সমস্ত দান অবজ্ঞা করে' গর্ব্বভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল!

"আর বালিকা, অনন্যোপায় হয়ে খুব খানিকক্ষণ কাঁদলে। বালকের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে সে দু'দিন ধরে কেবলই চোখের জলে ভাস্‌তে লাগলো—তবু ত সে তাকে ভুলতে পারলে না!

"তার পর প্রতি বৎসরই সেই নারী আমাদের এখানে আস্‌তো, কিন্তু আর চকেটের সঙ্গে তার দেখা হয় নি। তাকে ডাকতে—তার নিকটে যেতেও আর তার সাহস হত না। সে যে মধ্যে মধ্যে চকেটকে দূর হতে দেখ্‌তে পেত তাতেই সে অপার আনন্দ বোধ করত। মৃত্যুর সময়

সেই নারী আমাকে বলে গেছে—পৃথিবীতে আমি সেই এক মাত্র সুন্দর পুরুষকে জানতাম, সে ছাড়া অন্য কোনও সুন্দর পুরুষ এ পৃথিবীতে আছে তা আমি মনেও স্থান দিতে পারতাম না।

"ক্রমে তার বৃদ্ধ পিতা মাতার মৃত্যু হল—তখন সে তাঁদের ব্যবসা নিজেই চালাতে লাগ্‌লো।

"একদিন চকেটদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার সময় সে দেখ্‌লে,—একটী সুন্দরী যুবতী—তারই প্রিয়তম চকেটের বাহুতে বাহু সম্বদ্ধ করে বাড়ী হতে বের হয়ে আস্‌ছে। এই যুবতী যে চকেটেরই বিবাহিতা স্ত্রী তা বুঝতে তার বিলম্ব হলো না—হায় তাকে এ দৃশ্য দেখেও সহ্য কর্ত্তে হলো! তার হৃদয়ের দেবতা—এখন পরের সামগ্রী হয়েছে, সে সামগ্রীতে আর তার অধিকার নাই।

"সেই রাত্রিতেই—সে চকেটদের বাড়ীর সামনের একটা পুকুরে আত্মহত্যা কর্ব্বার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে এ ঘটনা কয়েক জন প্রতিবেশী দেখ্‌তে পেয়ে তাকে সে যাত্রা রক্ষা করে। এবং চকেটদেরই গৃহে তাকে শুশ্রূষার জন্যে নিয়ে আসে। চকেট নিজেই এসে রোগী দেখে তার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করলে—আর তিরস্কারের স্বরে বলে গেল—'মূর্খ নারি, আর কখনও এরূপ পাগ্‌লামি করো না!' যুবক তার সঙ্গে কথা কয়েছে—তাকে সম্বোধন করেছে—এ সুখেই নারীর সমস্ত অসুখ চলে গেল। এর পর অনেক দিন তার বেশ সুখে কেটেছিল।

"তার পর তার সারাটা জীবন এম্‌নি ভাবে কাট্‌লো, সে ভাঙা চেয়ার মেরামত করতো,—আর অবসর সময়ে যুবককে ভাবতো। প্রতি বৎসর একবার কোরে, এখানে এসে সে চকেটকে চোখের দেখা দেখে যেত। মধ্যে মধ্যে তার দোকান থেকে নানা ঔষধ কিনে আনতো,—তাতে একদিকে সে যেমনি যুবককে ভাল করে দেখ্‌তে পেতো, তার সঙ্গে একটুকু আধটুকু আলাপ কর্ত্তে পারতো—অন্যদিকে তেমনি তাকে তার সঞ্চয়ের কিছু অর্থ দিতে পারতো।

"আমি পূর্ব্বেই বলেছি তিন মাস হলো সেই নারীর মৃত্যু হয়েছে। তার জীবনের এই করুণ ঘটনা, এই নিরাশ প্রণয়ের কথা আমার নিকট বিবৃত করে—সে তার সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ আমার হাতে দিয়ে বললে, 'আপনি যদি কৃপা করে এই সমুদায় অর্থ তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে দেন—তবে আপনার নিকট জন্মে জন্মে ঋণী হয়ে থাকবো।' সে সারাজীবন দারিদ্র্যের নিষ্পেষন সহ্য করে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে' যুবকের জন্যই যা পেরেছে সঞ্চয় করেছে। সংসারে তার অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না—তাই মরবার পর সেগুলি তাকেই দান করে গেছে। আর ক্ষীণ স্বরে আমায় অনুরোধ করে গেছে—'আপনি আমার সুহৃদ হয়ে তাঁকে বলবেন মধ্যে মধ্যে যেন তিনি এই দরিদ্র নারীর কথা স্মরণ করেন—তা'হলে আমি পরলোকে সুখী হতে পারবো।'—এস্থানেই সেই নারীর করুণ আখ্যায়িকা সমাপ্ত হল। যদি কেহ প্রকৃত ভালবাসা জেনে থাকে—তবে এই নারীই জেনেছিল। এ পৃথিবীতে সে তার ভালবাসার ফল পেলে না কিন্তু পরলোকে পাবে নিশ্চয়। সে ভালবাসা স্বর্গীয়! ঈশ্বর তার পুরস্কার না দিয়ে থাকতে পারেন না।

"সেই নারী আমার কাছে নগদ পাঁচ হাজার টাকা রেখে গিয়েছিল। তার মধ্য হতে আমি তার পারলৌকিক ক্রিয়াদির জন্যে একশ টাকা পুরোহিতকে অর্পণ করি। পর দিন অবশিষ্ট টাকা নিয়ে—আমি চকেটদের বাড়ীতে গেলাম। তখন তারা স্বামাস্ত্রীতে বসে গল্প করছিল।

"তারা আমায় বস্‌তে বল্‌লে—আমি বস্‌লাম। বসে বলতে আরম্ভ করলাম—সেই নারীর করুণকাহিনী। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল—এই কাহিনী শুনে তারা দুঃখিত না হয়ে থাকতে পার্ব্বে না।

"যেই চকেট শুনলে যে এক পথের ভিখারিনী নারী—তাকে পবিত্রভাবে ভালবেসেছে ব'লে স্বীকার করে' গেছে—অম্‌নি সে সর্পদষ্ট পথিকের ন্যায় লাফিয়ে উঠ্‌লো, তার পর দু'পা পিছনে সরে দাঁড়াল। সে এমন ভাব দেখালে যেন সেই হতভাগিনী নীচ নারী তাকে ভালবেসে তার এমন কিছু ক্ষতি করেছে যা তার নিকট তার জীবন থেকেও অধিক মূল্যবান। আর তার স্ত্রী কিছু বলতে না পেরে বার বার

কেবলই বল্‌তে লাগলো—'ভিখারী মাগী, কি আস্পর্দ্ধা, কি আস্পর্দ্ধা, কি আস্পর্দ্ধা'—

"চকেট খানিকক্ষণ পাইচারী করে আমায় বললে, 'ডাক্তার ভিলবোয়া, আপনি বোধ হয় বুঝতে পারছেন এ আমার প্রতি এক দৈব উৎপাত—উঃ কি ভয়ানক অত্যাচার, কি ঘৃণা! আজ যদি সেই নারী বেঁচে থাকতো, তবে আমি তাকে তার উচিত শাস্তিটা দেখাতাম।'

"আমি এদের কাণ্ডকারখানা দেখে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বসে রইলাম—আমি কি যে করবো তা ভেবে উঠ্‌তে পারলাম না। যেরূপেই হোক আমার কাজ আমায় কর্ত্তে হবে এই মনে করে আমি বললাম—'সেই নারী তার জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় আমার নিকট দিয়ে গেছে—আর বলে গেছে সেগুলি তোমাকে দিতে। সে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। এ সংবাদটা যখন তোমাদের নিকট এতদূর অপ্রীতিকর ঠেকলো—তখন যে এ অর্থ তোমরা গ্রহণ করবে তার আশা নেই- তোমরা না হয় এ অর্থ আমার নিকট কোনও লোকহিতকর কার্য্যের জন্যেই রেখে দাও। তোমাদেরই ইচ্ছামত কোনও সৎকার্য্যে তা ব্যয়িত হবে।' টাকার কথা শুনে স্বামী স্ত্রীতে আমার পানে কতকক্ষণ চেয়ে রইল। তার পর চকেটের স্ত্রী বললে—'তা যা হোক যখন সে নারীর মৃত্যুকালের ইচ্ছা যে এ অর্থ আমরা নিই তখন এগুলি না নিলে আমাদের অন্যায় করা হবে।'

"আমি শুষ্ক ভাবে বললাম—'যা তোমাদের অভিরুচি।' এই বলে সেই নারীর সঞ্চিত নানা দেশের নানা প্রকার মুদ্রা—সোনা, রূপা, তামা সব রকম মিশানো পাঁচ হাজার টাকা বের করলাম। তার পর বিদায় সম্ভাষণ করে সেখান থেকে চলে এলাম।……আমার জীবনে প্রকৃত প্রণয়ের এই এক সুন্দর দৃষ্টান্ত আমি দেখতে পেয়েছি।"

এই বলে ডাক্তার চুপ করলেন। তখন মার্কুইস বারট্রাম সজল নয়নে—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—'সত্য ভালবাসা কাকে বলে এই নারী তা জেনেছিল। আজ এই পবিত্র কাহিনী শুনে আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙে গেল।'

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

ধর্ম্মের অধিকার

যেসকল মহাপুরুষের বাণী জগতে আজও অমর হইয়া আছে তাঁহারা কেহই মানুষের মন জোগাইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন মানুষ আপনার মনের চেয়েও অনেক বড়—অর্থাৎ মানুষ আপনাকে যাহা মনে করে সেইখানেই তাহার সমাপ্তি নহে। এই জন্য তাঁহারা একেবারে মানুষের রাজদরবারে আপনার দূত প্রেরণ করিয়াছেন, বাহিরের দেউড়িতে দ্বারীকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া কাজ উদ্ধারের সহজ উপায় সন্ধান করিয়া কাজ নষ্ট করেন নাই।

তাঁহারা এমন সব কথা বলিয়াছেন যাহা বলিতে কেহ সাহস করে না, এবং সংসারের কাজকর্ম্মের মধ্যে যাহা শুনিবামাত্র মানুষ বিরক্ত হইয়া ওঠে, বলিয়া বসে এসব কথা কোনো কাজের কথাই নহে। কিন্তু কত বড় বড় কাজের কথা কালের স্রোতে বুদ্‌বুদের মত ফেনাইয়া উঠিল এবং ভাসিতে ভাসিতে ফাটিয়া বিলীন হইয়া গেল, আর যত অসম্ভবই সম্ভব হইল, অভাবনীয়ই সত্য হইল, বুদ্ধিমানের মন্ত্রণা নহে কিন্তু পাগলের পাগ্‌লামিই যুগে যুগে মানুষের অন্তরে বাহিরে, তাহার চিন্তায় কর্ম্মে, তাহার দর্শনে সাহিত্যে কত নব নব সৃষ্টিবিকাশ করিয়া চলিল তাহার আর অন্ত নাই। তাঁহাদের সেইসকল অদ্ভুত কথা ঠেকাইতে গিয়াও কোনোমতেই ঠেকানো যায় না, তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলেই আরো অমর হইয়া উঠে, তাহাকে পোড়াইলে সে উজ্জ্বল হয়, তাহাকে পুঁতিয়া ফেলিলে সে অঙ্কুরিত হইয়া দেখা দেয়, তাহাকে সবলে বাধা দিতে গিয়াই আরো নিবিড় করিয়া গ্রহণ করিতে হয়—এবং যেন মন্ত্রের বলে কেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে নিজের অগোচরে, এমন কি, নিজের অনিচ্ছায়, সেই সকল বাণীর বেদনায় ভাবুক লোকের ভাবের রং বদল হইতে থাকে, কাজের লোকের কাজের সুর ফিরিয়া যায়।

মহাপুরুষেরা মানুষকে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে অসাধ্য সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ যেখানেই একটা কোনো বাধায় আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং মনে করিয়াছে ইহাই তাহার চরম আশ্রয়; এবং সেইখানেই আপনার শাস্ত্রকে

প্রথাকে একেবারে নিশ্ছিদ্ররূপে পাকা করিয়া সনাতন বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে—সেইখানেই মহাপুরুষেরা আসিয়া গণ্ডি মুছিয়াছেন, বেড়া ভাঙিয়াছেন—বলিয়াছেন, পথ এখনও বাকি, পাথেয় এখনো শেষ হয় নাই, যে অমৃতভবন তোমার আপন ঘর তোমার চরমলোক সে তোমাদের এই মিস্ত্রির হাতের গড়া পাথরের দেওয়াল দিয়া প্রস্তুত নহে, তাহা পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু ভাঙে না, তাহা আশ্রয় দেয় কিন্তু আবদ্ধ করে না, তাহা নির্ম্মিত হয় না বিকাশিত হয়, সঞ্চিত হয় না সঞ্চারিত হয়, তাহা কৌশলের কারুকার্য্য নহে তাহা অক্ষয় জীবনের অক্লান্ত সৃষ্টি। মানুষ বলে সেই পথযাত্রা আমার অসাধ্য কেননা আমি দুর্ব্বল আমি শ্রান্ত; তাঁহারা বলেন এইখানে স্থির হইয়া থাকাই তোমার অসাধ্য, কেননা তুমি মানুষ, তুমি মহৎ, তুমি অমৃতের পুত্র, ভূমাকে ছাড়া কোথাও তোমার সন্তোষ নাই।

যে ব্যক্তি ছোট সে বিশ্বসংসারকে অসংখ্য বাধার রাজ্য বলিয়াই জানে, বাধামাত্রই তাহার দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে ও তাহার আশাকে প্রতিহত করিয়া দেয় এই জন্য সে সত্যকে জানেনা, বাধাকেই সত্য বলিয়া জানে। যে ব্যক্তি বড় তিনি সমস্ত বাধাকে ছাড়াইয়া একেবারেই সত্যকে দেখিতে পান। এইজন্য ছোটর সঙ্গে বড়র কথার একেবারে এতই বৈপরীত্য। এইজন্য সকলেই যখন একবাক্যে বলিতেছে আমরা কেবল অন্ধকার দেখিতেছি তখনো তিনি জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—সমস্ত অন্ধকারকে ছাড়াইয়া আমি তাঁহাকেই জানিতেছি যিনি মহান পুরুষ, যিনি জ্যোতির্ম্ময়। এইজন্য যখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, অধর্ম্মই আমাকে বাঁচাইতে পারে এই মনে করিয়া হাজার হাজার লোক জালজালিয়াতি মারামারি কাড়াকাড়ির দিকে দলে দলে ছুটিয়া চলিয়াছে তখনো তাঁহারা অসঙ্কোচে এমন কথা বলেন যে, স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—অতি অল্পমাত্র ধর্ম্মও মহাভয় হইতে ত্রাণ করিতে পারে; যখন দেখা যাইতেছে সৎকর্ম্ম পদে পদে বাধাগ্রস্ত, তাহা মূঢ়তার জড়ত্বপুঞ্জে প্রতিহত, প্রবলের অত্যাচারে প্রপীড়িত, বাহিরে তাহার দারিদ্র্য সর্ব্বপ্রকারেই প্রত্যক্ষ তখনো তাঁহারা অসংশয়ে বলেন, সর্ষপপরিমাণ বিশ্বাস পর্ব্বতপরিমাণ বাধাকে জয় করিতে পারে। তাঁহারা কিছুমাত্র হাতে রাখিয়া কথা বলেন না, মানুষকে খাটো মনে করিয়া সত্যকে তাহার কাছে খাটো করিয়া ধরেন না—তাঁহারা অসত্যের আস্ফালনকে একেবারেই অবজ্ঞা করিয়া বলেন, সত্যমেব জয়তে—এবং সংসারকেই যে সকল লোক অহোরাত্র সত্য বলিয়া পাক খাইয়া ফিরিতেছে, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করেন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য। যাহাকে চোখে দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, যাহাকে জ্ঞানের শেষ বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি সত্যকে তাহার চেয়েও তাঁহারাই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন মানুষের মধ্যে যাঁহারা বড় হইয়া জন্মিয়াছেন।

তাঁহাদের যাহা অনুশাসন তাহাও শুনিতে অত্যন্ত অসম্ভব। সংসারে যে লোকটি যেমন তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখ এ পরামর্শটি নিতান্ত সহজ নহে কিন্তু এখানেই তাঁহারা দাঁড়ি টানেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন আপনার মত করিয়াই সকলকে দেখ। তাহার কারণ এই আত্মপরের ভেদ যেখানে সেইখানেই তাঁহাদের দৃষ্টি ঠেকিয়া যায় নাই, আত্মপরের মিল যেখানে সেইখানেই তাঁহারা বিহার করিতেছেন। শত্রুকে ক্ষমা করিবে একথা বলিলে যথেষ্ট বলা হইল কিন্তু তাঁহারা সে কথাও ছাড়াইয়া বলিয়াছেন শত্রুকেও প্রীতিদান করিবে যেমন করিয়া চন্দনতরু আঘাতকারীকেও সুগন্ধ দান করে। তাহার কারণ এই প্রেমের মধ্যেই তাঁহারা সত্যকে পূর্ণ করিয়া দেখিয়াছেন, এইজন্য স্বভাবতই সে পর্য্যন্ত না গিয়া তাঁহারা থামিতে পারেন না। তুমি বড় হও, ভাল হও এই কথাই মানুষের পক্ষে কম কথা নয় কিন্তু তাঁহারা একেবারে বলিয়া বসেন—"শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।" শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে একেবারে নিবিষ্ট হইয়া যায় তেমনি করিয়া তন্ময় হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ কর। ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকেই পূর্ণভাবে পাইতে হইবে এই কথাটিকে খাটো করিয়া বলা তাঁহাদের কর্ম্ম নহে—তাই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলেন, যে, তাঁহাকে না জানিয়া যে মানুষ কেবল জপ তপ করিয়াই কাটায় অন্তবদেবাস্য

তদ্ভবতি, তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়—তাঁহাকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হয়, স কৃপণঃ—সে কৃপাপাত্র।

অতএব ইহা দেখা যাইতেছে, মানুষের মধ্যে যাঁহারা সকলের বড় তাঁহারা সেইখানকার কথাই বলিতেছেন যাহা সকলের চরম। কোনো প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া সে সত্যকে তাঁহারা ছোট করেন না। সেই চরম লক্ষ্যকেই অসংশয়ে সুস্পষ্টরূপে সকল সত্যের পরম সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মানুষকে আত্ম-অবিশ্বাসী ও ভীরু করিয়া রাখা হয়; বাধার ওপারে যে সত্য আছে তাহার কথাই তাহাকে বড় করিয়া না শুনাইয়া বাধাটার উপরেই যদি ঝোঁক দেওয়া হয় তবে সে অবস্থায় মানুষ সেই বাধার সঙ্গেই আপোস করিয়াই বাসা বাঁধে এবং সত্যকে আয়ত্তের অতীত বলিয়া ব্যবহারের বাহিরে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়।

কিন্তু মানবগুরুগণ যে পরম লাভ, যে অসাধ্যসাধনের কথা বলেন তাহাকেই তাঁহারা মানুষের ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাই মানুষের পরিপূর্ণ স্বভাব, তাহাই মানুষের সত্য। যেমনি লোভ হইবে অমনি কাড়িয়া খাইবে মানুষের মধ্যে এমন একটা প্রবৃত্তি আছে সে কথা অস্বীকার করি না কিন্তু তবু ইহাকে আমরা মানুষের ধর্ম্ম অর্থাৎ মানুষের সত্যকার স্বভাব বলিনা। লোভ হইলেও লোভ দমন করিবে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইবে না, একথা বলিলেও কম বলা হয় না—কিন্তু তবু এখানেও মানুষ থামিতে পারে না। সে বলিয়াছে, ক্ষুধিতকে নিজের অন্ন দান করিবে, ইহাই মানুষের ধর্ম্ম, ইহাই মানুষের পুণ্য, অর্থাৎ তাহার পূর্ণতা। অথচ লোকসংখ্যা গণনা করিয়া যদি ওজনদরে মানুষের ধর্ম্ম বিচার করিতে হয় তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে নিজের অন্ন পরকে দান করা মানুষের ধর্ম্ম নহে কেননা অনেক-লোকই পরের অন্ন কাড়িবার বাধাহীন সুযোগ পাইলে নিজেকে সার্থক মনে করে। তবু আজপর্য্যন্ত মানুষ একথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে দয়াই ধর্ম্ম, দানই পুণ্য।

কিন্তু মানুষের পক্ষে যাহা সত্য মানুষের পক্ষে তাহাই যে সহজ তাহা নহে। তবেই দেখা যাইতেছে সহজকেই আপনার ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া মানুষ আরাম পাইতে চায় না, এবং যে-কোন দুর্ব্বল চিত্ত সহজকেই আপনার ধর্ম্ম বলিয়াছে এবং ধর্ম্মকে আপনার সুবিধামত সহজ করিয়া লইয়াছে তাহার আর দুর্গতির অন্ত থাকে না। আপন ধর্ম্মের পথকে মানুষ বলিয়াছে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" দুঃখকে মানুষ মনুষ্যত্বের বাহন বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে এবং সুখকেই সে সুখ বলে নাই, বলিয়াছে "ভূমৈব সুখং।"

এই জন্যই এই বড় একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায় যে, যাঁহারা মানুষকে অসাধ্যসাধনের উপদেশ দিয়াছেন, যাঁহাদের কথা শুনিলেই হঠাৎ মনে হয় ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস করিবার মত নহে, মানুষ তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ বিশ্বাস করে। তাহার কারণ মহত্ত্বই মানুষের আত্মার ধর্ম্ম; সে মুখে যাহাই বলুক শেষকালে দেখা যায় সে বড়কেই যথার্থ বিশ্বাস করে। সহজের উপরেই তাহার বস্তুত শ্রদ্ধা নাই; অসাধ্যসাধনকেই সে সত্য সাধনা বলিয়া জানে; সেই পথের পথিককেই সে সর্ব্বোচ্চ সম্মান না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারে না।

যাঁহারা মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন, মানুষ তাঁহা-দিগকে শ্রদ্ধা করে, কেননা মানুষকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা মানুষকে দীনাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করেন না। বাহিরে তাঁহারা মানুষের যত দুর্ব্বলতা যত মূঢ়তাই দেখুন না কেন তবুও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যথার্থত মানুষ হীনশক্তি নহে—তাহার শক্তিহীনতা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিষ; সেটাকে মায়া বলিলেই হয়। এই জন্য তাঁহারা যখন শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে বড় পথে ডাকেন তখন মানুষ আপনার মায়াকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে চিনিতে পারে, মানুষ নিজের মাহাত্ম্য দেখিতে পায় এবং নিজের সেই সত্যস্বরূপে বিশ্বাস করিবামাত্র সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। তখন সে বিস্মিত হইয়া দেখে ভয় তাহাকে ভয় দেখাইতেছে না, দুঃখ তাহাকে দুঃখ দিতেছে না, বাধা তাহাকে পরাভূত করিতেছে না, এমন কি, নিষ্ফলতাও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছে না। তখন সে হঠাৎ দেখিতে পায় ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, ক্লেশ তাহার পক্ষে আনন্দময়, এবং মৃত্যু তাহার পক্ষে অমৃতের সোপান।

বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার কালে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, মানুষের মনে কামনা অত্যন্ত বেশি প্রবল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার চেয়েও প্রবল পদার্থ আমাদের আছে : সত্যের পিপাসা যদি আমাদের রিপুর চেয়ে প্রবলতর না হইত তবে আমাদের মধ্যে কেইবা ধর্ম্মের পথে চলিতে পারিত।

মানুষের প্রতি এত বড় শ্রদ্ধার কথা এত বড় আশার কথা সকলে বলিতে পারে না। কামনার আঘাতে মানুষ বারবার স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, কেবল ইহাই বড় করিয়া তাহার চোখে পড়ে যে ছোট; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্যের আকর্ষণে মানুষ যে পাশবতার দিক হইতে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে এইটেই বড় করিয়া দেখিতে পান তিনিই যিনি বড়। এইজন্য তিনিই মানুষকে বারম্বার নির্ভয়ে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই মানুষের জন্য আশা করিতে পারেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড় কথাটি শুনাইতে আসেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড় অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হন না। তিনি কৃপণের ন্যায় মানুষকে ওজন করিয়া অনুগ্রহ দান করেন না, এবং বলেন না তাহাই তাহার বুদ্ধি ও শক্তির পক্ষে যথেষ্ট,—প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় তিনি আপন চিরজীবনের সর্ব্বোচ্চ সাধনের ধন তাহার নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গ করেন, জানেন সে তাহার যোগ্য। সে যে কত বড় যোগ্য তাহা সে নিজে তেমন করিয়া জানে না, তিনি যেমন করিয়া জানেন।

মানুষ বলে, জানি, আমরা পারি না—মহাপুরুষ বলেন, জানি, তোমরা পার ;—মানুষ বলে, যাহা সাধ্য এমন একটা ধর্ম্ম খাড়া কর; মহাপুরুষ বলেন, যাহা ধর্ম্ম তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের সাধ্য। মানুষের সমস্ত শক্তির উপরে তাঁহারা দাবী করেন - কেননা সমস্ত অশক্তির পরিচয়কে অতিক্রম করিয়াও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন তাহার শক্তি আছে।

অতএব ধর্ম্মেই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্ম্ম মানুষের উপরে যে পরিমাণে দাবি করে সেই অনুসারে মানুষ আপনাকে চেনে। কোনো লোক রাজার ছেলে হইয়াও হয় ত আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে তবুও দেশের লোকের দিক্ হইতে একটা তাগিদ্ থাকা চাই; তাহার পৈতৃক গৌরব তাহাকে স্মরণ করাইতেই হইবে; তাহাকে লজ্জা দিতে হইবে, এমন কি, তাহাকে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু তাহাকে চাষা বলিয়া মিথ্যা ভুলাইয়া সমস্যাকে দিব্য সহজ করিয়া দিলে চলিবে না; সে চাষার মত প্রত্যহ ব্যবহার করিলেও সত্য তাহার সম্মুখে স্থির রাখিতে হইবে। তেমনি ধর্ম্ম কেবলি মানুষকে বলিতেছে, তুমি অমৃতের পুত্র, ইহাই সত্য; ব্যবহারতঃ মানুষের স্খলন পদে পদে হইতেছে তবু ধর্ম্ম তাহার সত্য পরিচয়কে উচ্চে ধরিয়া রাখিতেছে; মানুষ বলিতে যে কতখানি বুঝায় ধর্ম্ম তাহা কোনোমতেই মানুষকে ভুলিতে দিবে না; ইহাই তাহার সর্ব্বপ্রধান কাজ।

ব্যাধি মানুষের শরীরের স্বভাব নহে, তবু ব্যাধি মানুষকে ধরে। কিন্তু তখন মানুষের শরীরের প্রকৃতি ভিতরের দিক হইতে ব্যাধিকে তাড়াইবার নানাপ্রকার উপায় করিতে থাকে। যতক্ষণ মস্তিষ্ক ঠিক থাকে ততক্ষণ এই সংগ্রামে ভয় বেশি নাই কিন্তু যখন মস্তিষ্ককেই ব্যাধি-শত্রু পরাভূত করে তখনি ব্যাধি সকলের চেয়ে নিদারুণ হইয়া উঠে—কারণ, তখন বাহিরের দিক হইতে চিকিৎসকের চেষ্টা যতই প্রবল হউক ভিতরের দিকের শ্রেষ্ঠ সহায়টি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক যেমন শরীরে, ধর্ম্ম তেমনি মানবসমাজে। এই ধর্ম্মের আদর্শই নিয়ত ভিতরে ভিতরে মানবপ্রকৃতিকে তাহার সমস্ত বিকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে কিন্তু যে পরম দুর্দ্দিনে এই ধর্ম্মের আদর্শকেই বিকৃতি আক্রমণ করে সেদিন বাহিরের নিয়ম সংযম আচার অনুষ্ঠান পুলিস ও রাষ্ট্রবিধি যতই প্রবল হউক না কেন, সমাজপ্রকৃতিকে দুর্গতি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে কে? এই জন্য দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মকে দুর্ব্বল করার মত আত্মঘাতকতা আর কিছুই হইতে পারে না, কারণ, দুর্ব্বলতার দিনেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় ধর্ম্মের বল।

আমাদের দেশে সকলের চেয়ে নিদারুণ দুর্ভাগ্য এই যে, মানুষের দুর্ব্বলতার মাপে ধর্ম্মকে সুবিধামত খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে এই অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা এ কথা অসঙ্কোচে বলিয়া থাকি, যাহার শক্তি কম তাহার জন্য ধর্ম্মকে ছাটিয়া ছোট করিতে দোষ নাই, এমন কি, তাহাই কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে এমন কথা কি বলা যায়? প্রয়োজন অনুসারে আমরা তাহাকে ছোট বড় করিব! ধর্ম্ম ত জীবনহীন জড় পদার্থ নহে; তাহার উপরে ফরমাসমত অনায়াসে দরজির কাঁচি বা ছুতারের করাত ত চলে না। এ কথা ত কেহ বলে না যে, শিশুটি ক্ষুদ্র বলিয়া মাকেও চারিদিক হইতে কাটিয়া কম করিয়া ফেল। মা ত শিশুর গায়ের জামার সঙ্গে তুলনীয় নহেন। প্রথমত মাকে কাটিতে গেলেই মারিয়া ফেলা হইবে, দ্বিতীয়ত অখণ্ড সমগ্র মাতাই বড় সন্তানের পক্ষে যেমন আবশ্যক ছোট সন্তানটির পক্ষেও তেমনি আবশ্যক—তাঁহাকে কম করিলে বড়ও যেমন বঞ্চিত হইবে, ছোটোও তেমনি বঞ্চিত হইবে। ধর্ম্ম কি মানুষের মাতার মতই নহে?

আমি জানি আমাকে এই প্রশ্ন করা হইবে সকল মানুষেরই কি বুদ্ধি ও প্রকৃতি একই রকমের? সকলেই কি ধর্ম্মকে একই ভাবে বোঝে? না, সকলে এক নহে; ছোট বড় উঁচু নীচু জগতে আছে। অতএব সত্যকে আমরা সকলেই সমান দূর পর্য্যন্ত পাইয়াছি একথা বলিতে পারি না। আমাদের শক্তি পরিমিত; কিন্তু যতদূর বড় করিয়া সত্যকে পাইয়াছি তাহার চেয়েও সে ছোট এ মিথ্যা কথা ত ক্ষণকালের জন্যও আমরা কাহারও খাতিরে বলিতে পারি না। গ্যালিলিও যে জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা তখনকার কালের প্রচলিত খৃষ্টানধর্ম্মের সঙ্গে খাপ খায় নাই—তাই বলিয়া একথা বলা কি শোভা পাইত যে, খৃষ্টান বেচারার পক্ষে মিথ্যা জ্যোতির্বিদ্যাই সত্য? তাহাকে কি এই উপদেশ দেওয়া চলিত যে, তুমি খৃষ্টান অতএব তোমার উচিত তোমার উপযোগী একটা বিশেষ জ্যোতিষকেই একান্ত শ্রদ্ধার সহিত বরণ করা?

কিন্তু তাই বলিয়া গ্যালিলিওই কি জ্যোতিষের চরমে গিয়াছেন? তাহা নহে। তবুও তাহা সত্যের দিকে যাওয়া। সেখান হইতেও অগ্রসর হও কিন্তু কোনো কারণেই পিছু হঠা আর চলিবে না; যদি হঠিতে থাকি তবে সত্যের উল্টা দিকে চলা হইবে সুতরাং তাহার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তেমনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটিমাত্র লোকের বোধও যদি দেশের সকল লোকের বোধকে ছাড়াইয়া গিয়া থাকে তবে তাহাই সমস্ত দেশের লোকের ধর্ম্ম, কারণ, তাহাই দেশের সর্ব্বোচ্চ সত্য। অন্য লোকে তাহা গ্রহণ করিতে রাজি হইবে না, তাহা বুঝিতে বিলম্ব করিবে; কিন্তু তুমি যদি বুঝিয়া থাক তবে তোমাকে সকল লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে, ইহাই সত্য এবং ইহা সকল লোকেরই সত্য, কেবল একলা আমার সত্য নহে। কেহ যদি জড়ভাবে বলিতে থাকে ইহা আমি বুঝিতে পারিব না তবে তোমাকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কারণ ইহা সত্য এবং সত্যকে গ্রহণ করাই মানুষের ধর্ম্ম।

ইতিহাসে আমরা কি দেখিলাম? আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধদেব যখন সত্যকে পাইয়াছি বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন আমার ভিতর দিয়া সমস্ত মানুষ এই সত্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে। তখন তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের শক্তির পরিমাপ করিয়া সত্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিথ্যার খাদ মিশাইতে লাগিলেন না। তাঁহার মত অদ্ভুত শক্তিমান পুরুষ বহুকাল একাগ্রচিন্তার পর যে সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহা যে সকল মানুষেরই নয় একথা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনা করেন নাই। অথচ সকল মানুষ তাহাকে শ্রদ্ধা করে নাই, অনেকে তাহা বুদ্ধির দোষে বিকৃতও করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও একথা নিশ্চিত সত্য যে, ধর্ম্মকে হিসাব করিয়া ক্ষুদ্র করা কোনোমতেই চলে না—যে তাহাকে যে পরিমাণে মানুক আর না মানুক, সেই যে একমাত্র মাননীয় এই কথা বলিয়া তাহাকে সকলের সাম্‌নে পূর্ণভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে। বাপকে সকল ছেলে সমান শ্রদ্ধা করে না এবং অনেক ছেলে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াও থাকে তাই বলিয়া ছেলেদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া এমন কথা বলা চলে না যে, তোমার বাপ বারো আনা, তোমার বাপ সিকি, এবং তোমার বাপ বাপই নহে তুমি একটা গাছের ডালকে বাপ বলিয়া গ্রহণ কর—এবং এইরূপে অধিকারভেদে তোমরা বাপের সঙ্গে ভিন্নরূপে ব্যবহার করিতে থাক তাহা হইলেই তোমাদের সন্তানধর্ম্ম পালন করা হইবে। বস্তুত পিতার তারতম্য নাই;—তাঁহার সম্বন্ধে সন্তানদের হৃদয়ের ও ব্যবহারের যদি তারতম্য থাকে তবে সেই অনুসারে তাহাদিগকে ভাল বলিব বা মন্দ বলিব, একথা কখনই বলিব না তুমি

যখন এইটুকু মাত্র পার তখন এইটুকুই তোমার পক্ষে ভাল।

সকলেই জানেন যিশু যখন বাহ্যঅনুষ্ঠানপ্রধান ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন তখন য়িহুদিরা তাহা গ্রহণ করে নাই। তবু তিনি নিজের গুটিকয়েক অনুবর্ত্তীমাত্রকেই লইয়া সত্যধর্ম্মকে নিখিল মানবের ধর্ম্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি একথা বলেন নাই, এ ধর্ম্ম যাহারা বুঝিতে পারিতেছে তাহাদেরই, যাহারা পারিতেছে না তাহাদের নহে। মহম্মদের আবির্ভাবকালে পৌত্তলিক আরবীয়েরা যে তাঁহার একেশ্বরবাদ সহজে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে, তাই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন নাই, তোমাদের পক্ষে যাহা সহজ তাহাই তোমাদের ধর্ম্ম, তোমরা বাপ দাদা ধরিয়া যাহা মানিয়া আসিয়াছ তাহাই তোমাদের সত্য। তিনি এমন অদ্ভুত অসত্য বলেন নাই, যে, যাহাকে দশজনে মিলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহাই সত্য, যাহাকে দশজনে মিলিয়া পালন করা যায় তাহাই ধর্ম্ম। একথা বলিলে উপস্থিত আপদ মিটিত কিন্তু চিরকালের বিপদ বাড়িয়া চলিত।

একথা বলাই বাহুল্য, উপস্থিতমত মানুষ যাহা পারে সেইখানেই তাহার সীমা নহে। তাহা যদি হইত তবে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ মৌমাছির মত একই রকম মৌচাক তৈরি করিয়া চলিত। বস্তুত অবিচলিত সনাতন প্রথার বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, মানুষ নহে। আরো বেশি বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে ধূলামাটিপাথর। মানুষ কোনো একটা জায়গায় আসিয়া হাল ছাড়িয়া চোখ বুজিয়া সীমাকে মানিতে চায় না বলিয়াই সে মানুষ। মানুষের এই যে কেবলি আরো-র দিকে গতি, ভূমার দিকে টান এইখানেই তাহার শ্রেয়। এই শ্রেয়কে রক্ষা করিবার, ইহাকে কেবলি স্মরণ করাইবার ভার তাহার ধর্ম্মের প্রতি। এইজন্যই মানুষের চিত্ত তাহার কল্যাণকে যত সুদূর পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে পারে তত সুদূরেই আপনার ধর্ম্মকে প্রহরীর মত বসাইয়া রাখিয়াছে—সেই মানবচেতনার একেবারে দিগন্তে দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম মানুষকে অনন্তের দিকে নিয়ত আহ্বান করিতেছে।

মানুষের শক্তির মধ্যে দুটা দিক্ আছে, একটা দিকের নাম "পারে" এবং আর একটা দিকের নাম "পারিবে"। "পারে"র দিকটাই মানুষের সহজ, আর "পারিবে"র দিকটাতেই তাহার তপস্যা। ধর্ম্ম মানুষের এই "পারিবে"র সর্ব্বোচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত "পারে"কে নিয়ত টান দিতেছে তাহাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না, তাহাকে কোনো একটা উপস্থিত সামান্য লাভের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতে দিতেছে না। এইরূপে মানুষের সমস্ত "পারে" যখন সেই "পারিবে"র দ্বারা অধিকৃত হইয়া সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে তখনি মানুষ বীর—তখনি সে সত্যভাবে আত্মাকে লাভ করে। কিন্তু "পারিবে"র দিকে এই আকর্ষণ যাহারা সহিতে পারে না, যাহারা নিজেকে মূঢ় ও অক্ষম বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা ধর্ম্মকে বলে আমি যেখানে আছি সেইখানে তুমিও নামিয়া এস।—তাহার পরে ধর্ম্মকে একবার সেই সহজসাধ্যের সমতলক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে পারিলে তখন তাহাকে বড় বড় পাথর চাপা দিয়া অত্যন্ত সনাতনভাবে জীবিতসমাধি দিয়া রাখিতে চায় এবং মনে করে ফাঁকি দিয়া ধর্ম্মকে পাইলাম এবং তাহাকে একেবারে ঘরের দরজার কাছে চিরকালের মত বাঁধিয়া রাখিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিলাম। তাহারা ধর্ম্মকে বন্দী করিয়া নিজেরাই অচল হইয়া বসে, ধর্ম্মকে দুর্ব্বল করিয়া নিজেরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, এবং ধর্ম্মকে প্রাণহীন করিয়া নিজেরা পলে পলে মরিতে থাকে; তাহাদের সমাজ কেবলি বাহ্য আচারে অনুষ্ঠানে অন্ধসংস্কারে এবং কাল্পনিক বিভীষিকার কুজ্ঝটিকায় দশদিকে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

বস্তুত ধর্ম্ম যখন মানুষকে অসাধ্যসাধন করিতে বলে তখনি তাহা মানুষের শিরোধার্য্য হইয়া উঠে, আর যখনি সে মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে কোনোমতে বন্ধুত্ব রাখিবার জন্য কানে কানে পরামর্শ দেয় যে তুমি যাহা পার তাহাই তোমার শ্রেয়, অথবা দশজনে যাহা করিয়া আসিতেছে তাহাতেই নির্ব্বিচারে যোগ দেওয়াই তোমার পুণ্য, ধর্ম্ম তখন আমাদের প্রবৃত্তির চেয়েও নীচে নামিয়া যায়। প্রবৃত্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে এবং লোকাচারের

সঙ্গে আপোস করিয়া গলাগলি করিতে আসিলেই ধর্ম্ম আপনার উপরের জায়গাটি আর রাখিতে পারে না; একেবারেই তাহার জাতি নষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান সমাজে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে পুণ্যকে সস্তা করিবার জন্য বলিয়াছে, কোনো বিশেষ তিথিনক্ষত্রে কোনো বিশেষ জলের ধারায় স্নান করিলে কেবল নিজের নহে বহুসহস্র পূর্ব্বপুরুষের সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইয়া যায়। পাপ দূর করিবার এতবড় সহজ উপায়ের কথাটা বিশ্বাস করিতে অত্যন্ত লোভ হয় সন্দেহ নাই, সুতরাং মানুষ তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রের এই কথায় আপনাকে কিছুপরিমাণে ভুলায় কিন্তু সম্পূর্ণ ভুলানো তাহার পক্ষেও অসাধ্য। একজন বিধবা রমণী একবার মধ্যরাত্রে চন্দ্রগ্রহণের পরে পীড়িত শরীর লইয়া যখন গঙ্গাস্নানে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "আপনি কি একথা সত্যই বিশ্বাস করিতে পারেন যে পাপ জিনিষটাকে ধূলামাটির মত জল দিয়া ধুইয়া ফেলা সম্ভব? অথচ অকারণে আপনার শরীর-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই যে পাপ করিতে যাইতেছেন ইহার ফল কি আপনাকে পাইতে হইবে না?" তিনি বলিলেন, "বাবা, এ ত সহজ কথা, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা বেশ বুঝি কিন্তু তবু ধর্ম্মে যাহা বলে তাহা পালন না করিতে যে ভরসা পাই না।" একথার অর্থ এই যে, সেই রমণীর স্বাভাবিক বুদ্ধি তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের উপরে উঠিয়া আছে।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখ। একাদশীর দিনে বিধবাকে নির্জ্জল উপবাস করিতে হইবে ইহা আমাদের দেশে লোকাচারসম্মত অথবা শাস্ত্রানুগত ধর্ম্মানুশাসন। ইহার মধ্যে যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আছে স্বভাবত আমাদের প্রকৃতিতে তাহা বর্ত্তমান নাই। একথা কখনই সত্য নহে স্ত্রীলোককে ক্ষুধাপিপাসায় পীড়িত করিতে আমরা সহজেই দুঃখ পাই না। তবে কেন হতভাগিনীদিগকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দুঃখ দিই এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আর কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর খুঁজিয়া পাই না, কেবল এই কথাই বলিতে হয় আমাদের ধর্ম্মে বলে বিধবাদিগকে একাদশীর দিনে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিতে পারিবে না, *এমন কি, মরিবার মুখে রোগের ঔষধ পর্য্যন্ত সেবন করানো নিষেধ। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্ম্ম আমাদের সহজবুদ্ধির চেয়ে* অনেক নীচে নামিয়া গেছে।

ইহা আমি অনেকবার দেখিয়াছি, ছেলেরা স্বভাবতই তাহাদের সহপাঠী বন্ধুদিগকে জাতিবর্ণ লইয়া ঘৃণা করে না—কখনোই তাহারা আপনাকে হীনবর্ণ বন্ধু অপেক্ষা কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারে না, কারণ অনেক স্থলেই শ্রেষ্ঠতা জাতিবর্ণের অপেক্ষা রাখে না তাহা তাহারা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছে, তথাপি আহারকালে তাহারা হীনবর্ণ বন্ধুর লেশমাত্র সংস্পর্শ পরিহার্য্য মনে করে। এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটা ঘুড়ি পড়িয়াছিল সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিতজাতির ছেলে ক্ষণকালের জন্য দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল, অথচ সেই দাওয়ায় সর্ব্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতে অন্ন অপবিত্র হয় না। এই আচরণের মধ্যে যে পরিমাণ অতিঅসহ্য মানবঘৃণা আছে, তত পরিমাণ ঘৃণা কি যথার্থই আমাদের অন্তরতর প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান? এতটা মানবঘৃণা আমাদের জাতির মনে স্বভাবতই আছে একথা আমি ত স্বীকার করিতে পারি না। বস্তুত এখানে স্পষ্টই আমাদের ধর্ম্ম আমাদের হৃদয়ের চেয়ে অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে।

এইরূপে মানুষ ধর্ম্মকে যখন আপনার চেয়েও নীচে নামাইয়া দেয় তখন সে নিজের সহজ মনুষ্যত্বও যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয় তাহার একটি নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত আমার মনে যেন আগুন দিয়া চিরকালের মত দাগিয়া রহিয়া গিয়াছে। আমি জানি একজন বিদেশী রোগী পথিক পল্লীগ্রামের পথের ধারে তিনদিন ধরিয়া অনাশ্রয়ে পড়িয়া তিল তিল করিয়া মরিয়াছে; ঠিক সেই সময়েই মস্ত একটা পুণ্যস্নানের তিথি পড়িয়াছিল—হাজার হাজার নরনারী কয়দিন ধরিয়া পুণ্যকামনায় সেই পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে একজনও বলে নাই এই মুমূর্ষুকে ঘরে লইয়া গিয়া বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা

করি এবং তাহাতেই আমার পুণ্য। সকলেই মনে মনে বলিয়াছে, জানিনা ও কোথাকার লোক, ওর কি জাত—শেষকালে কি ঘরে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্তের দায়ে পড়িব! মানুষের স্বাভাবিক দয়া যদি আপনার কাজ করিতে যায় তবে ধর্ম্মের রক্ষকস্বরূপে সমাজ তাহাকে দণ্ড দিবে! এখানে ধর্ম্ম যে মানুষের হৃদয়প্রকৃতির চেয়েও অনেক নীচে নামিয়া বসিয়াছে।

আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না—অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহারও অযোগ্য বলিয়াছে; বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি। অথচ মানুষকে এরূপ নিতান্তই অকারণে নির্যাতন করা কি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ? আমরা নিজে যাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সেবা ও সাহায্য লইতে দ্বিধা করি না তাহাদিগকে সকল প্রকার সহায়তা হইতে বঞ্চিত করাকেই আমাদের ন্যায়বুদ্ধি কি সত্যই সঙ্গত বলিতে পারে? কখনই না। কিন্তু মানুষকে এইরূপ অন্যায় অবজ্ঞা করিতে আমাদের ধর্ম্মই উপদেশ দিতেছে, আমাদের প্রকৃতি নয়। আমাদের হৃদয় দুর্ব্বল বলিয়াই যে আমরা এইরূপ অবিচার করি তাহা নহে, ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য এবং ইহাই না করা আমাদের স্খলন বলিয়া করিয়া থাকি। আমাদের ধর্ম্মই আমাদের প্রকৃতির নীচে নামিয়া অন্যায়ে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—শুভবুদ্ধির নাম লইয়া দেশের নরনারীকে শত শত বৎসর ধরিয়া এমন নির্দ্দয়ভাবে এমন অন্ধ মূঢ়ের মত পীড়ন করিয়া চলিয়াছে!

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক তর্ক করিয়া থাকেন যে, জাতিভেদ ত য়ুরোপেও আছে; সেখানেও ত অভিজাতবংশের লোক সহজে নীচবংশের সঙ্গে একত্রে পানাহার করিতে চান না। ইহাদের একথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মনে অভিমান বলিয়া একটা প্রবৃত্তি আছে, সেইটেকে অবলম্বন করিয়া মানুষের ভেদবুদ্ধি উদ্ধত হইয়া ওঠে ইহা সত্য,—কিন্তু ধর্ম্ম স্বয়ং কি সেই অভিমানটার সঙ্গেই আপোস করিয়া তাহার সঙ্গে একাসনে আসিয়া বসিবে? ধর্ম্ম কি আপনার সিংহাসনে বসিয়া এই অভিমানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না? চোর ত সকল দেশেই চুরি করিয়া থাকে কিন্তু আমাদের সমাজে যে ম্যাজিষ্ট্রেটসুদ্ধ তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া চোরকেই আপনার পেয়াদা বলিয়া স্বহস্তে তাহাকে নিজের সোনার চাপরাস পরাইয়া দিতেছে! কোনোকালে বিচার পাইব কোথায়, কোনোমতে রক্ষা পাইব কাহার কাছে?

এরূপ অদ্ভুত তর্ক আমাদের মুখেই শোনা যায় যে, যাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক, মদমাংস যাহারা খাইবেই এবং পাশবতা যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, ধর্ম্মের সম্মতিদ্বারা যদি তাহাদের পাশবতাকে নির্দ্দিষ্টপরিমাণে স্বীকার করা যায়—যদি বলা যায় এইরূপ বিশেষভাবে মদমাংস খাওয়া ও চরিত্রকে কলুষিত করা তোমাদের পক্ষে ধর্ম্ম, তবে তাহাতে দোষ নাই, বরং ভালই। এরূপ তর্কের সীমা যে কোন্‌খানে তাহা ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমনতর স্বভাবপাপিষ্ঠ অমানুষ দেখা যায় নরহত্যায় যাহারা আনন্দ বোধ করে। এই শ্রেণীর লোকের জন্য ঠগিধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত একথাও বোধ হয় আমাদের মুখে বাধিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঠিক নিজের গলাটা তাহাদের ফাঁসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত না হয়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য সম্বন্ধে মানুষের উচ্চাধিকার নিম্নাধিকার একবার কোথাও স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেই মানুষ যে-মহাতরী লইয়া জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙিয়া ছোট ছোট ভেলা তৈরি করা হয়—তাহাতে মহাসমুদ্রের যাত্রা আর চলে না, তীরের কাছে থাকিয়া হাঁটুজলে খেলা করা চলে মাত্র। কিন্তু যাহারা কেবল খেলিবেই, কোনোদিন যাত্রা করিবেই না, তাহারা খড়কুটা যাহা খুসি লইয়া আপনার খেলনা তৈরি করুক না—তাহাদের জড়তার খাতিরে অমূল্য

ধর্ম্মতরীকে টুকরা করিয়াই কি চিরদিনের মত সর্ব্বনাশ ঘটাইতে হইবে?

একথা আবার বলিতেছি, ধর্ম্ম মানুষের পূর্ণ শক্তির অকুণ্ঠিত বাণী, তাহার মধ্যে কোনো দ্বিধা নাই। সে মানুষকে মূঢ় বলিয়া স্বীকার করে না, দুর্ব্বল বলিয়া অবজ্ঞা করে না। সেই ত মানুষকে ডাক দিয়া বলিতেছে, তুমি অজয়, তুমি অশোক, তুমি অভয়, তুমি অমৃত। সেই ধর্ম্মের বলেই মানুষ যাহা পারে নাই তাহা পারিতেছে, যাহা হইয়া উঠিবে বলিয়া কোনোদিন স্বপ্নেও মনে করে নাই একদিন তাহাই হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই ধর্ম্মের মুখ দিয়াই মানুষ যদি মানুষকে এমন কথা কেবলি বলাইতে থাকে যে, "তুমি মূঢ়, তুমি বুঝিবে না," তবে তাহার মূঢ়তা ঘুচাইবে কে, যদি বলায়, "তুমি অক্ষম, তুমি পারিবে না"—তবে তাহাকে শক্তি দান করে জগতে এমন সাধ্য আর কাহার আছে?

আমাদের দেশে বহুকাল হইতে তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোককেই আমাদের ধর্ম্মশাসন স্বয়ং বলিয়া আসিয়াছে পূর্ণ সত্যে তোমার অধিকার নাই; অসম্পূর্ণেই তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাক। কতশত লোক পিতা পিতামহ ধরিয়া এই কথা শুনিয়া আসিয়াছে—মন্ত্রে তোমাদের দরকার নাই, পূজায় তোমাদের প্রয়োজন নাই, দেবমন্দিরে তোমাদের প্রবেশ নাই; তোমাদের কাছে ধর্ম্মের দাবি, তোমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যের পরিমাণে, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র;—তোমরা স্থূলকে লইয়াই থাক চিত্তকে অধিক উচ্চে তুলিতে হইবে না, যেখানে আছ ঐখানেই নীচে পড়িয়া থাকিয়া সহজে তোমরা ধর্ম্মের ফললাভ করিতে পারিবে।

অথচ হীনতম মানুষেরও একটিমাত্র সম্মানের স্থান আছে ধর্ম্মের দিকে—তাহার জানা উচিত সেইখানেই তাহার অধিকারের কোনো সঙ্কোচ নাই। রাজা বল, পণ্ডিত বল, অভিজাত বল, সংসারের ক্ষেত্রেই তাহাদের যত কিছু প্রতাপ প্রভুত্ব—ধর্ম্মের ক্ষেত্রে দীনহীন মূর্খেরও অধিকার কোনো কৃত্রিম শাসনের দ্বারা সঙ্কীর্ণ করিবার ভার কোনো মানুষের উপর নাই। ধর্ম্মই মানুষের সকলের চেয়ে বড় আশা—সেই খানেই তাহার মুক্তি, কেননা সেই খানেই তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সেই খানেই তাহার অন্তহীন সম্ভাব্যতা—ক্ষুদ্র বর্ত্তমানের সমস্ত সঙ্কোচ সেই খানেই ঘুচিতে পারে। অতএব সংসারের দিকে, জন্ম বা যোগ্যতার প্রতি চাহিয়া মানুষের স্বত্বকে যতই খণ্ডিত কর না, ধর্ম্মের দিকে কোনো মানুষের জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এতবড় স্পর্দ্ধিত অধিকার কোনো পরমজ্ঞানী পুরুষের কোনো চক্রবর্ত্তী সম্রাটের নাই।

ধর্ম্মের অধিকার বিচার করিয়া তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পার—তুমি কে, যে, তোমার সেই অলৌকিক শক্তি আছে! তুমি কি অন্তর্যামী? মানুষের মুক্তির ভার তুমি গ্রহণ করিবার অহঙ্কার রাখ? তুমি লোকসমাজ, তুমি লৌকিক ব্যবহারেও আপনাকে সামলাইতে পার না, কত তোমার পরাভব, কত তোমার বিকৃতি, কত তোমার প্রলোভন—তুমিই তোমার অত্যাচারের লাঠিটাকে ধর্ম্মের নামে গিল্টি করিয়া ধর্ম্মরাজের স্থান জুড়িয়া বসিতে চাও! তাই করিয়া আজ শত শত বৎসর ধরিয়া এতবড় একটি সমগ্র জাতিকে তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে পরাধীনতার অন্ধকূপের মধ্যে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়া দিয়াছ—তাহার আর উদ্ধারের পথ রাখ নাই! যাহা ক্ষুদ্র, যাহা স্থূল, যাহা অসত্য, যাহা অবিশ্বাস্য তাহাকেও দেশকালপাত্রঅনুসারে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কি প্রকাণ্ড, কি অসঙ্গত, কি অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ঙ্কর বোঝা মানুষের মাথার উপরে আজ শত শত বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছ! সেই ভগ্নমেরুদণ্ড, নিষ্পেষিতপৌরুষ, নতমস্তক মানুষ প্রশ্ন করিতেও জানে না, প্রশ্ন করিলেও তাহার উত্তর কোথাও নাই—কেবল বিভীষিকার তাড়নায় এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাসে তাহাকে চালনা করিয়া যাইতেছে, চারিদিক হইতেই আকাশে তর্জ্জনী উঠিতেছে এবং এই আদেশ নানা পরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা বলিতেছি তাহাই মানিয়া যাও কেন না তুমি মূঢ় তুমি বুঝিবে না; যাহা পাঁচজনে করিতেছে তাহাই করিয়া যাও, কেন না তুমি অক্ষম, সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের সহিত তোমাকে আপাদমস্তক শতসহস্র সূত্রে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি কেননা নূতন করিয়া নিজের কল্যাণচিন্তা করিবার শক্তিমাত্র তোমার নাই!

নিষেধজর্জ্জরিত চিরকাপুরুষ নির্ম্মাণ করিবার এত বড় সর্ব্বদেশব্যাপী ভয়ঙ্কর লৌহযন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে—এবং সেই মনুষ্যত্ব চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোনো দেশে কি ধর্ম্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে!

দুর্গতি ত প্রত্যক্ষ, আর ত কোনো যুক্তির প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু সেই প্রত্যক্ষকে চোখ মেলিয়া দেখিব না, চোখ বুজিয়া কি কেবল তর্কই করিব। আমাদের দেশে ব্রহ্মের ধ্যানে, পূজার্চ্চনায় যে বহুবিচিত্র স্থূলতার প্রচার হইয়াছে তর্ককালে তাহাকে আমরা চরম বলিয়া মানি না—আমরা বলিয়া থাকি, যে মানুষ আধ্যাত্মিকতার যে অবস্থায় আছে এ দেশে তাহার জন্য সেই প্রকার আশ্রয় গড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; এইরূপে প্রত্যেকে নিজ নিজ আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রমশ স্বতই উচ্চতর অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু জানিতে চাই অনন্ত কালের অসংখ্য মানুষের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য সেরূপ উপযুক্ত আশ্রয় গড়িতে পারে এমন সাধ্য কাহার! সমস্ত বিচিত্রতাকেই স্থান দিবে, বাধা দিবে না, এতবড় বিশ্বকর্ম্মা মানবসমাজে কে আছে?

বস্তুত মানুষের অসীম বৈচিত্র্যকে যাহারা সত্যই মানে তাহারা মানুষের জন্য অসীম স্থানকেই ছাড়িয়া রাখে। ক্ষেত্র যেখানে মুক্ত বৈচিত্র্য সেখানে আপনিই অবাধে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। এই জন্যই যে-সমাজে জাগ্রত ও নিদ্রিতকালের সমস্ত ব্যাপারই একেবারে পাকা করিয়া বাঁধা সেখানে মানুষের চরিত্র আপন স্বাতন্ত্র্যে দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না, সকলেই এক ছাঁচে গড়া নির্জ্জীব ভালোমানুষটি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে। মানুষের সমস্ত চিন্তাকে কল্পনাকে পর্য্যন্ত যদি অবিচলিত স্থূল আকারে একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, যদি তাহাকে বলা যায় অসীমকে তুমি কেবল এই একটি মাত্র বা কয়টিমাত্র বিশেষ রূপেই চিন্তা করিতে থাক তবে সেই উপায়ে সত্যই কি মানুষের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে আশ্রয় দেওয়া হয়, তাহার চিরধাবমান পরিণতিপ্রবাহকে সাহায্য করা হয়? ইহাতে তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশকে কি বদ্ধ করাই হয় না, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে মূঢ় ও পঙ্গু করিয়াই রাখা হয় না?

এই যে এক সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানাজাতির নানালোক শিশুকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চিন্তা করিতেছে, কল্পনা করিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে ইহারা যদি একই জগতের মধ্যে সকলে ছাড়া না পাইত, যদি একদল প্রবলপ্রতাপশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি মন্ত্রণা করিয়া বলিত ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এবং প্রত্যেকের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া ছোট ছোট জগৎ একেবারে পাকা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইবে তবে কি সেই হতভাগাদের উপকার করা হইত? মানবচিত্তের চিরবিচিত্র অভিব্যক্তিকে কোনো কৃত্রিম সৃষ্টির মধ্যে চিরদিনের মত আটক করা যাইতে পারে এ কথা যিনি কল্পনাও করিতে পারেন তিনি বিশ্বের অমিত্র ছোট হইতে বড়, অবোধ হইতে সুবোধ পর্য্যন্ত সকলেই এই একই অসীম জগতে বাস করিতেছে বলিয়াই প্রত্যেকেই আপন বুদ্ধি ও প্রকৃতি অনুসারে ইহার মধ্য হইতে আপন শক্তির পরিমাণ পূরা প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই জন্যই শিশু যখন কিশোর বয়সে পৌঁছিতেছে তখন তাহাকে তাহার শৈশবজগৎটা বলপূর্ব্বক ভাঙিয়া ফেলিয়া একটা বিপ্লব ঘটাইতে হইতেছে না। তাহার বুদ্ধি বাড়িল, শক্তি বাড়িল, জ্ঞান বাড়িল তবু তাহাকে নূতন জগতের সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হইল না। নিতান্ত অর্ব্বাচীন মূঢ় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সকলেরই পক্ষে এই একই সুবৃহৎ জগৎ। কিন্তু নিজের উপস্থিত প্রয়োজন বা মূঢ়তাবশতঃ মানুষ যেখানেই মানুষের বৈচিত্র্যকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের অধিকারকে সনাতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে সেই খানেই হয় মনুষ্যত্বকে বিনাশ করিয়াছে, নয়, ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কোনো মতেই কোনো বুদ্ধিমানই মানুষের প্রকৃতিকে সজীব রাখিয়া তাহাকে চিরদিনের মত সনাতন বন্ধনে বাঁধিতে পারেই না। মানুষকে না মারিয়া তাহাকে গোর দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। মানুষের বুদ্ধিকে যদি থামাইয়া রাখিতে চাও তবে তাহার বুদ্ধিকে বিনষ্ট কর, তাহার

জীবনের চাঞ্চল্যকে যদি কোনো একটা সুদূর অতীতের সুগভীর কূপের তলদেশে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে চাও তবে তাহাকে নির্জ্জীব করিয়া ফেল। নিজের উপস্থিত প্রয়োজনে অবিবেকী হইয়া উঠিলে মানুষ ত মানুষকে এইরূপ নির্ম্মমভাবে পঙ্গু করিতেই চায়; সেই জন্যই ত মানুষ নির্লজ্জ ভাষায় এমন কথা বলে যে, আপামর সকলকেই যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবে আমরা আর চাকর পাইব না; স্ত্রীলোককে যদি বিদ্যাদান করা যায় তবে তাহাকে দিয়া আর বাটনা বাটানো চলিবে না; প্রজাদিগকে যদি অবাধে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় তবে তাহারা নিজের সঙ্কীর্ণ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। বস্তুত এ কথা নিশ্চিত সত্য, মানুষকে কৃত্রিমশাসনে বাঁধিয়া খর্ব্ব করিতে না পারিলে কোনো মতেই তাহাকে একই স্থানে চিরকালের মত স্থির রাখিতে পারিবে না। অতএব যদি কেহ মনে করেন ধর্ম্মকেও মানুষের অন্যান্য শত শত নাগপাশবন্ধনের মত অন্যতম বন্ধন করিয়া তাহার দ্বারা মানুষের বুদ্ধিকে, বিশ্বাসকে, আচরণকে চিরদিনের মত একই জায়গায় বাঁধিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকাই শ্রেয়, তবে তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে আহারে বিহারে নিদ্রায় জাগরণে শতসহস্র নিষেধের দ্বারা বিভীষিকার দ্বারা প্রলোভনের দ্বারা এবং অসংযত কাল্পনিকতার দ্বারা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখা। সে মানুষকে জ্ঞানে কর্ম্মে কোথাও যেন মুক্তির স্বাদ না দেওয়া হয়; ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার রুচি যেন বন্দী থাকে, সামান্য না 'রেও তাহার ইচ্ছা যেন ছাড়া না পায়, কোনো মঙ্গল-সন্দেহমস্ যেন নিজের বুদ্ধিবিচারকে খাটাইতে না পারে বিকা'বাহ্যিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কোনো দিকেই সে যেন সমুদ্রপার হইবার কোনো সুযোগ না পায়, প্রাচীনতম শাস্ত্রের নোঙরে সে যেন কঠিনতম আচারের শৃঙ্খলে অবিচলিত হইয়া একই পাথরে বাঁধানো ঘাটে বাঁধা পড়িয়া থাকে! *

কিন্তু তার্কিকের সহিত তর্ক করিতে গিয়া আমি হয় ত নিজের দেশের প্রতি অবিচার করিতেছি। এই যে দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্ম্মচিন্তায় স্থূলতা এবং আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মে মূঢ়তা নানা রূপ ধরিয়া আজ সমস্ত দেশকে পর্দ্দার উপর পর্দ্দা ফেলিয়া বহুস্তরের অন্ধতায় আচ্ছন্ন করিয়াছে ইহা কোনো একদল বিশেষ বুদ্ধিমানে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঘটায় নাই। যদিও আমরা অহঙ্কার করিয়া বলি ইহা আমাদের বহু দূরদর্শী পূর্ব্বপুরুষদের জ্ঞানকৃত কিন্তু তাহা সত্য হইতেই পারে না—বস্তুত ইহা আমাদের অজ্ঞানকৃত। আমাদের দেশের ইতিহাসের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে বিপাকে পড়িয়া এইরূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে। এ কথা কখনই সত্য নহে যে, আমরা অধিকারভেদ চিন্তা করিয়া মানুষের বুদ্ধির ওজনমত ভিন্ন অবস্থার উপযোগী পূজার্চ্চনা ও আচারপদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের ঘাড়ে আসিয়া যাহা চাপিয়া পড়িয়াছে তাহাই আমরা বহন করিয়া লইয়াছি। ভারতবর্ষে আর্য্যেরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহারা আপনার ধর্ম্মকে সভ্যতাকে চিরদিন অবিমিশ্রভাবে নিজেদের প্রকৃতির পথে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। পদে পদেই নানা অনুন্নত জাতির সহিত তাঁহাদের সংঘাত বাধিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে করিতেও তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মিশ্রণ ঘটিতেছিল পুরাণে ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনি করিয়া একদিন ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির ঐক্যধারা বিভক্ত ও বিমিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। নানা নিকৃষ্ট জাতির নানা পূজাপদ্ধতি

* এ কথার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন অধিকারভেদ চিরন্তন নহে, তাহা সাধনার অবস্থাভেদ মাত্র। কিন্তু আমাদের যে সমাজে কোনো বর্ণবিশেষের পক্ষে ধর্ম্মের উচ্চতম অধিকার মুক্ত ও অন্যান্য বর্ণের পক্ষে তাহা রুদ্ধ সেখানে কি এমন কথা বলা চলে? একে ত প্রত্যেক মানুষের অধিকার কোনো কৃত্রিম নিয়মে কেহই স্থির করিয়া দিতেই পারে না তৎসত্ত্বে যদিবা দেখিতাম সমাজে সেই চেষ্টা সজীব হইয়া আছে, যদি দেখিতাম কখনো বা ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া যাইতেছে ও শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিতেছে তাহা হইলেও অন্তত ইহা বুঝিতে পারিতাম এখানে মানুষের অধিকারলাভ তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে সমাজের এবং ধর্ম্মের অধিকার-ভেদ হয় ত এককালে সচল ও সজীবভাবে ছিল—কিন্তু যখনি তাহা সচলতা হারাইয়াছে তখনি তাহা আমাদের পথের বাধা হইয়াছে, যখনি তাহা আমাদের জীবনের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতেছে না তখনি তাহা আমাদের জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ করিতেছে। এ কথা এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক পুরাকালে আর্য্যসমাজ কি নিয়মে চলিত তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

আচারসংস্কার কথাকাহিনী তাঁহাদের সমাজের ক্ষেত্রে জোর করিয়াই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। অত্যন্ত বীভৎস নিষ্ঠুর অনার্য্য ও কুৎসিত সামগ্রীকেও ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। এই সমস্ত বহুবিচিত্র অসংলগ্ন স্তূপকে লইয়া আর্য্যশিল্পী কোনো একটা কিছু খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা অসাধ্য। যাহাদের মধ্যে সত্যকার মিল নাই, কৌশলে তাহাদের মিল করা যায় না। সমাজের মধ্যে যাহা-কিছু স্রোতের বেগে আসিয়া পড়িয়াছে সমাজ যদি তাহাকেই সম্মতি দিতে বাধ্য হয় তবে সমাজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার আর স্থান থাকে না। কাঁটাগাছকে পালন করিবার ভার যদি কৃষকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে শস্যকে রক্ষা করা অসাধ্য হয়। কাঁটাগাছের সঙ্গে শস্যের যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে তাহার সমন্বয় সাধন করিতে পারে এমন কৃষক কোথায়! তাই আজ আমরা যেখানকার যত আগাছাকেই স্বীকার করিয়াছি; জঙ্গলে সমস্ত ক্ষেত একেবারে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে;—সেই সমস্ত আগাছার মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ঠেলাঠেলি চাপাচাপি চলিতেছে, আজ যাহা প্রবল, কাল তাহা দুর্ব্বল হইতেছে, আজ যাহা স্থান পাইতেছে কাল তাহা স্থান পাইতেছে না, আবার এই ভিড়ের মধ্যে কোথা হইতে বাতাসে বাহিরের বীজ উড়িয়া আসিয়া ক্ষেত্রের কোন্ এক কোণে রাতারাতি আর একটা অদ্ভুত উদ্ভিদকে ভুঁইফুড়িয়া তুলিতেছে। এখানে আর সমস্ত জঞ্জালই অবাধে প্রবেশ করিতে পারে একমাত্র নিষেধ কেবল কৃষকের নিড়ানির বেলাতেই; যাহা কিছু হইতেছে সমস্তই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মে হইতেছে;—পিতামহেরা এককালে সত্যের যে বীজ ছড়াইয়াছিলেন তাহার শস্য কোথায় চাপা পড়িয়াছে সে আর দেখা যায় না;—কেহ যদি সেই শস্যের দিকে তাকাইয়া জঙ্গলে হাত দিতে যায় তবে ক্ষেত্রপাল একেবারে লাঠি হাতে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে, বলে, এই অর্ব্বাচীনটা আমার সনাতন ক্ষেত নষ্ট করিতে আসিয়াছে। এই সমস্ত নানা জাতির বোঝা ও নানা কালের আবর্জ্জনাকে লইয়া নির্ব্বিচারে আমরা কেবলি একটা প্রকাণ্ড মোট বাঁধিতে বাঁধিতেই চলিয়াছি এবং সেই উত্তরোত্তর সঞ্চীয়মান উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নূতন পুরাতন আর্য্য ও অনার্য্য অসম্বদ্ধতাকে হিন্দুধর্ম্ম নামক এক নামে অভিহিত করিয়া এই সমস্তটাকেই আমাদের চিরকালীন জিনিষ বলিয়া গৌরব করিতেছি;—ইহার ভয়ঙ্কর ভারে আমাদের জাতি কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধূলিলুণ্ঠিত, কোনোমতেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; এই বিমিশ্রিত বিপুল বোঝাটাই তাহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ সম্পদ বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে; এই বোঝাকে কোনো দিকে কিছুমাত্র হ্রাস করিতে গেলেই সেটাকে সে অধর্ম্ম বলিয়া প্রাণপণে বাধা দিতে থাকে; এবং দুর্গতির মধ্যে ডুবিতে ডুবিতেও আজ সেই জাতির শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা গর্ব্ব করিতে থাকেন যে, ধর্ম্মের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য জগতের আর কোথাও নাই, অন্ধসংস্কারের এরূপ বাধাহীন একাধিপত্য আর কোনো সমাজে দেখা যায় না, সকল প্রকার মুগ্ধ বিশ্বাসের এরূপ প্রশস্তক্ষেত্র মানবের ইতিহাসে আর কোথাও প্রস্তুত হয় নাই, এবং পরস্পরের মধ্যে এত ভেদ এত পার্থক্যকে আর কোথাও এমন করিয়া চিরদিন বিভক্ত করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে অতএব বিশ্বসংসারে একমাত্র হিন্দুসমাজেই উচ্চ নীচ সমান নির্ব্বিচারে স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু বিচারই মানুষের ধর্ম্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে। সবই সে রাখিতে পারিবে না সেরূপ চেষ্টা করিতে গেলে তাহার আত্মরক্ষাই হইবে না। স্থূলতম তামসিকতাই বলে যাহা যেমন আছে তাহা তেমনি থাক্, যাহা বিনাশের যোগ্য তাহাকেও এই তামসি সনাতন বলিয়া আঁকড়িয়া থাকিতে চায় এবং যাহা তাহ একই স্থানে পড়িয়া থাকিতে বলে তাহাকেই সে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া সম্মান করে!

মানুষ নিয়ত আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠকেই প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য—যাহা আপনি আসিয়া জমিয়াছে তাহাকে নহে, যাহা হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে তাহাকেও নহে। নিজের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠকেই নিয়ত প্রকাশ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি তাহার ধর্ম্মই তাহাকে দান করে। এই কারণে মানুষ আপন ধর্ম্মের আদর্শকে আপন

তপস্যার সর্ব্বশেষে, আপন শ্রেষ্ঠতার চরমেই স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যদি বিপদে পড়িয়া বা মোহে ডুবিয়া ধর্ম্মকেই নামাইয়া বসে তবে নিজের সবচেয়ে সাংঘাতিক বিপদ ঘটায়, তবে ধর্ম্মের মত সর্ব্বনেশে ভার তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যাহাকে উপরে রাখিলে উপরে টানে, তাহাকে নীচে রাখিলে সে নীচেই টানিয়া লয়। অতএব ধর্ম্মকে কোনো জাতি যদি নীতির দিকে না বসাইয়া রীতির দিকে বসায়, বুদ্ধির দিকে না বসাইয়া সংস্কারের দিকেই বসায়, অন্তরের দিকে আসন না দিয়া যদি বাহ্য অনুষ্ঠানে তাহাকে বদ্ধ করে এবং ধর্ম্মের উপরেই দেশকালপাত্রের ভার না দিয়া দেশকালপাত্রের হাতেই ধর্ম্মকে হাত পা বাঁধিয়া নির্ম্মমভাবে সমর্পণ করিয়া বসে; ধর্ম্মেরই দোহাই দিয়া কোনো জাতি যদি মানুষকে পৃথক করিতে থাকে, এক শ্রেণীর অভিমানকে আর এক শ্রেণীর মাথার উপরে চাপাইয়া দেয় এবং মানুষের চরমতম আশা ও পরমতম অধিকারকে সঙ্কুচিত ও শতখণ্ড করিয়া ফেলে; তবে সে-জাতিকে হীনতার অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে এমন কোনো সভাসমিতি কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স্, এমন কোনো বাণিজ্যব্যবসায়ের উন্নতি, এমন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ইন্দ্রজাল বিশ্বজগতে নাই। সে জাতি এক সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইলে আর এক সঙ্কটে আসিয়া পড়িবে এবং এক প্রবলপক্ষ তাহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্মানদান করিলে আর এক প্রবলপক্ষ অগ্রসর হইয়া তাহাকে লাঞ্ছনা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না; যে আপনার সর্ব্বোচ্চকেই সর্ব্বোচ্চ সম্মান না দেয় সে কখনই উচ্চাসন পাইবে না। ইহাতে কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, ধর্ম্মের বিকারেই গ্রীস মরিয়াছে, ধর্ম্মের বিকারেই রোম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই। এবং ইহাতেও কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, যদি উদ্ধার ইচ্ছা করি তবে কোনো বাহিরের দিকে তাকাইয়া কোনো ফল নাই, কোনো উপস্থিত বাহ্য সুবিধার সুযোগ করিয়া কোনো লাভ নাই;—রক্ষার উপায়কে কেবলি বাহিরে খুঁজিতে যাওয়া দুর্ব্বল আত্মার মূঢ়তা;—ইহাই ধ্রুব সত্য যে ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

এই যে অনেক কালের বিচিত্র অসংলগ্নতার বিপুল বোঝা বহন করিতে করিতে এত বড় একটি মহৎজাতির বুদ্ধি ও উদ্যম ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে শুধু যদি ইহারই দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। যদি এই কথা চিন্তা করিতে হইত যে এই পর্ব্বতকে বাহির হইতে আঘাত করিতে হইবে তবে চিন্তা অবসন্ন হইয়া পড়িত। কিন্তু আমাদের সকলের চেয়ে একটি বড় আশার কথা আছে সেই কথাটিকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিয়া জয়ের সম্বন্ধে সমস্ত আশঙ্কা দূর করিয়া ঘরে ফিরিব। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যত বড় অসত্যের বোঝা আমরা বহন করিতেছি তাহার চেয়েও আরো অনেক বড় সত্যের সাধনা আমাদেরই দেশের মর্ম্মস্থানে বিরাজ করিতেছে;—যত বড় বিচ্ছিন্নতা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার চেয়ে অনেক ব্যাপকতর ঐক্যের বাণী আমাদেরই দেশের চিরন্তন বাণী। আমাদের দেশে ব্রহ্মকে যেমন গভীর করিয়া যেমন অন্তরতম করিয়া দেখিয়াছে এমন আর কোনো দেশেই দেখে নাই, আমাদের দেশে মানুষের চিত্তকে মানুষকেও ছাড়াইয়া যতদূরে প্রসারিত করিতে বলিয়াছে এমন আর কোনো দেশেই বলিতে সাহস করে নাই, আমাদের দেশে প্রেমকে করুণাকে যে সাধ্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছে অন্য কোনো দেশে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে নাই, আমাদের দেশে এককে যেমন একান্ত করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে এবং সেই উপলব্ধিকে যেমন অসঙ্কোচে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিবার দৃষ্টান্ত আমাদের মহাজনে দেখাইয়াছেন তেমন আর কোনো দেশেরই ইতিহাসে প্রকাশ পায় নাই। এক কথায়, ধর্ম্ম আমাদের দেশেই মানুষের শক্তিকে যত বড় করিয়া দেখিয়াছে, ধর্ম্ম আমাদের দেশে মানুষকে যত বড় অসাধ্যসাধন করিতে উপদেশ দিয়াছে এমন আর কোনো দেশেই করে নাই। এই কারণে আমাদের দেশের বর্ত্তমান সমস্যা যতই দুঃসাধ্য হউক্ তাহার একমাত্র মীমাংসার উপায় আমাদেরই দেশের অন্তরের মধ্যেই সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদেরই দেশে ধর্ম্মের সেই উচ্চতম আদর্শ রহিয়াছে যাহা সত্যতমরূপে মানুষের সমস্ত বিচ্ছেদ বৈচিত্র্যকে এক করিয়া মিলাইয়া দিতে পারে। সেই ঐক্যতত্ত্ব দেশহিতৈষণা নয়, জাতীয় স্বার্থসাধনা নয়, মানবপ্রেমও নহে—তাহা এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে সকল

আত্মার পরম ঐক্য, তাহা বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে আত্মচেতনার পরম মিলন, তাহা ব্রহ্মবিহার। অতএব বাহিরের দিক হইতে অসাধ্য যুদ্ধ আমাদের ব্রত নহে—আমাদের মর্ম্মের মধ্যে যেখানে আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড় সত্যটি বিরাজ করিতেছে তাহারই দিকে আমাদের সমস্ত দৃষ্টিকে জাগ্রত করিতে হইবে। আমাদের আলোক আছে কেবল উদ্বোধন নাই; আমাদের এই যে অন্ধকার ইহা সুপ্তির অন্ধকার, রাত্রির অন্ধকার নহে; আমাদের আছে, কেবল আমরা তাহা পাইতেছি না; বাহির হইতে আমাদিগকে ভিক্ষা আহরণ করিতে হইবে না, সমস্ত আবরণ ঠেলিয়া অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে। ভয় নাই, আমাদের জড়ত্ব যতই পর্ব্বত-প্রমাণ হউক্ আমাদের সত্যসাধনার স্ফুলিঙ্গমাত্র তাহা অপেক্ষা বলশালী। ভয় নাই, স্থূলত্বের বাধা যতই পুঞ্জ পুঞ্জ হউক না, সত্যের স্পর্শে তাহা যে কেমন করিয়া অন্তর্দ্ধান করে মানবের বিধাতা এই ভারতের ক্ষেত্রেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। আজ যুগারম্ভের প্রভাতে উদ্বোধিত হইয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার সেই মহাশ্চর্য্য লীলায় যোগ দিব এবং যুগব্যাপী নিরানন্দকে মহামিলনের পরমানন্দপারাবারে অবসান করিয়া দিব আমাদের প্রতি এই আহ্বান আসিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পিতৃস্মৃতি*

পিতা শিলাইদহ জমিদারীতে পদ্মানদীতে তাঁহার তিন চারিটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গেলেন। সেখানে থাকিতেই তিনি সঙ্কল্প করিলেন, দূরে কোথাও নির্জ্জনে গিয়া ঈশ্বর সাধনা করিবেন। সেখান হইতেই ছেলেদের বাড়ি পাঠাইয়া তিনি সিমলায় চলিয়া গেলেন। ইহাদিগকে বাড়ি পাঠাইবার সময় তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখনো সোম, রবি ও তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করে নাই। পিতা মনে করিয়াছিলেন, হয় ত তাঁহার বাড়ি ফেরা আর ঘটিয়া উঠিবে না।

তিনি সিমলায় যাইবার দিনকয়েক পরেই সিপাই-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। অনেকদিন তাঁহার চিঠিপত্র পাওয়া গেল না। একটা গুজব উঠিল সিপাহীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। একে অনেকদিন চিঠিপত্র লেখেন নাই, তাহার উপর এই গুজব,—বাড়ির সকলে ভাবনায় অভিভূত হইল। মা ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। সে এক ভয়ানক দিন গিয়াছে।

কিছুদিন পরে তাঁহার চিঠি পাওয়া গেল, তখন সকলে সুস্থ হইলেন। এদিকে, তাঁহার সিমলা থাকার সময়েই পুণ্যেন্দ্র বলিয়া আমার একটি ভাইয়ের মৃত্যু হইল। পিতার কাছে শুনিয়াছি, পুণ্যেন্দ্র মারা যাইবার সংবাদ তিনি পান নাই কিন্তু একদিন সেই প্রবাসেই তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন পুণ্যেন্দ্র কোনো কথা না কহিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা রাত্রির স্বপ্ন নহে; দিনের বেলা জাগ্রৎ অবস্থায় তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি সেই সিমলায় থাকিতেই ছোট কাকার মৃত্যু হইয়াছিল—তখনো তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।

রবির জন্মের পর হইতে আমাদের পরিবারে জাতকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে যেসকল ভট্টাচার্য্যেরা পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল রবির জাতকর্ম্ম উপলক্ষ্যে তাহাদের সহিত পিতার অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। রবির অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়ার উপরে আলপনার সঙ্গে তাহার নাম লেখা হইয়াছিল সেই পিঁড়ির চারিধারে পিতার আদেশে ছোট ছোট গর্ত্ত করানো হয়। সেই গর্ত্তের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। নামকরণের দিন তাহার নামের চারিদিকে বাতি জ্বলিতে লাগিল—রবির নামের উপরে সেই মহাত্মার আশীর্ব্বাদ এইরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল।

মা আমার সতীসাধ্বী পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতা সর্ব্বদাই বিদেশে কাটাইতেন এই কারণে সর্ব্বদাই তিনি চিন্তিত হইয়া থাকিতেন। পূজার সময় কোনোমতেই

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাকন্যাকর্তৃক লিখিত।

পিতা বাড়িতে থাকিতেন না—এইজন্য পূজার উৎসবে যাত্রা গান আমোদ যত কিছু হইত তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন - কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন না। তখন নির্জ্জন ঘরে তিনি একলা বসিয়া থাকিতেন। কাকীমায়া আসিয়া তাঁহাকে কত সাধ্য সাধনা করিতেন তিনি বাহির হইতেন না। গ্রহাচার্য্যেরা স্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা পিতার সর্ব্বপ্রকার আপদ দূর করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার কাছ হইতে সর্ব্বদাই যে কত অর্থ লইয়া যাইত তাহার সীমা নাই।

যে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মাতার মৃত্যু হইয়াছিল পিতা তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় হিমালয় হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে মা ক্ষণে ক্ষণে চেতনা হারাইতেছিলেন। পিতা আসিয়াছেন শুনিয়া বলিলেন, "বস্‌তে চৌকি দাও।" পিতা সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। মা বলিলেন, "আমি তবে চল্লেম।" আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমাদের মনে হইল, স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য এপর্য্যন্ত তিনি আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। মার মৃত্যুর পরে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় পিতা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুল চন্দন অভ্র দিয়া শয্যা সাজাইয়া দিয়া বলিলেন "ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম।"

আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে যে পূজার উৎসব ছিল তাহার মধ্যে সাত্ত্বিকভাব কিছুই দেখা যাইত না। এই পূজা-অনুষ্ঠান আমোদে উন্মত্ত হইবার একটা উপলক্ষ্যমাত্র ছিল। আমরা ছোটবেলায় শিব পূজা ইতু পূজা প্রভৃতি যাহা দেখিতাম তাহারই অনুকরণ করিতাম। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমার নিকট অঞ্জলি দিয়া তবে জলগ্রহণ করিতে পাইতাম। আমার ঘরে কৃষ্ণের ছবি ছিল আমি গোপনে ফুল জল লইয়া ভক্তির সহিত সেই ছবির পূজা করিতাম।

একবার পিতা যখন সিমলা পাহাড় হইতে হঠাৎ বাড়ি ফিরিলেন, তখন বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজা। সেদিন বিসর্জ্জন। তিনি বাড়িতে প্রবেশ না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে গিয়া বসিয়া রহিলেন—বাড়ির সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কোনোপ্রকারে ঠাকুর বিসর্জ্জন দেওয়া হইলে তিনি ঘরে আসিলেন। তাহার পর হইতে আমাদের বাড়িতে প্রতিমা পূজা উঠিয়া যাইতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে সত্যকে কোলে করিয়া লইয়া বসিয়া আছি ;—এমন সময় সেজদাদা একখানি ছোট ছাপানো কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এই কবিতাটি মুখস্থ করিয়া লইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। সে কবিতাটি বোধ করি সকলেই জানেন—

একে একে দিবারাত করিতেছে গতায়াত
তাঁহার শাসনে চলে সকল সংসার হে।

সেজদাদা, মেজকাকীমা ও তাঁর মেয়েদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিতেন। মেজকাকীমা খুব শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন কিন্তু তাঁহার মেয়েরা তাহাতে কান দিতেন না। অবশেষে তাঁহারা শালগ্রাম শিলাটিকে লইয়া আমাদের সম্মুখের বাড়িতে উঠিয়া গেলেন—আমরা একলা পড়িলাম। আমার মা বহুসন্তানবতী ছিলেন এই জন্য তিনি আমাদের সকলকে তেমন করিয়া দেখিতে পারিতেন না—মেজকাকীমার ঘরেই আমাদের সকলের আশ্রয় ছিল। তিনি আমাদের বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার পরেই আমাদের যত আবদার ছিল। তিনি যেদিন ভোরের বেলা গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন আমাকে তাঁহার সঙ্গে লইতেন। তিনি অল্পকালের জন্যও দূরে গেলে আমাদের বড় কষ্ট বোধ হইত।

এক সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ি আত্মীয়স্বজনে পূর্ণ ছিল। অবশেষে একদিন দেখিলাম প্রায় সকল আত্মীয়ই আমাদিগকে একে একে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পিতামহ তাঁহার উইলে যাঁহাদিগকে কিছু কিছু দান করিয়া গিয়াছিলেন দেখিলাম তাঁহারা আদালতে মকদ্দমা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল করাতে আমাদের বৈষয়িক দুর্গতির দিন উপস্থিত হইয়াছিল—তথাপি উইল অনুসারে যাহার যাহা প্রাপ্য ছিল তাহা পরিশোধ করিয়া দিয়া পিতৃদেব নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাঁহার উপর এত যে অত্যাচার গিয়াছে তিনি ধীরভাবে সমস্ত বহন করিয়াছেন, কখনও ন্যায়-পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। যাহারা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত

অনাত্মীয় ব্যবহার করিয়াছে দৈন্যদশায় পড়িয়া যখনি তাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে তখনি তিনি তাহাদের চির-জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের বাল্যকালে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা বড় একটা ছিল না। বৈষ্ণব মেয়েরা কেহ কেহ বাংলা, এমন কি, সংস্কৃত শিক্ষা করিত - তাহাদেরই নিকট অল্প একটু শিখিয়া রামায়ণ মহাভারত এবং সেকেলে দুই একখানা গল্পের বই পড়িতে পারিলেই তখন যথেষ্ট মনে করা হইত। আমাদের মা কাকীমারাও সেইরূপ শিক্ষাই পাইয়াছিলেন।

আমাদেরও প্রথম শিক্ষা একজন বৈষ্ণবীর নিকট হইতে। তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাম, এবং কলা-পাতে চিঠি লেখা অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পড়া পর্য্যন্ত আমাদের অগ্রসর হইয়াছিল। এমন সময় পিতৃদেব সিমলাপাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মন দিলেন। কেশববাবুদের অন্তঃপুরে মিশনরি মেয়েরা পড়াইতে আসিত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙালী খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন আমাদিগকে পড়াইতেন এবং হপ্তায় একদিন মেম আসিয়া আমাদিগকে বাইবল্ পড়াইয়া যাইতেন। মাস কয়েক এই ভাবে চলিয়াছিল। অবশেষে একবার পিতৃদেব, আমাদের পড়া শুনা কেমনতর চলিতেছে দেখিতে আসিলেন। একখানা স্লেটে শিক্ষয়িত্রী আমাদের পাঠ লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন—তাহারই অনুসরণ করিয়া কপি করিবার জন্য আমাদের প্রতি ভার ছিল। স্লেটে লিখিত সেই পাঠের বানান ও ভাষা দেখিয়া পিতা আমাদের এই নিয়মের শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় মেয়েদের জন্য যখন বেথুনস্কুল প্রথম স্থাপিত হয় তখন ছাত্রী পাওয়া কঠিন হইল। তখন পিতৃদেব আমাকে এবং আমার খুড়তত ভগিনীকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। হরদেব চাটুয্যেমশায় আমার পিতার বড় অনুগত ছিলেন, তিনিও তাঁহার দুই মেয়েকে সেখানে নিযুক্ত করিলেন। ইহা ছাড়া মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাঁহার কয়েকটি মেয়েকে বেথুনস্কুলে পড়িতে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে অতি অল্প কয়টিমাত্র ছাত্রী লইয়া বেথুনস্কুলের কাজ আরম্ভ হয়।

মেয়েদের কেবল লেখাপড়া শেখানো নয় শিল্প শেখানোর প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। আমাদের পরিবারে যখন বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান হইতে পৌত্তলিক অংশ উঠিয়া গেল তখনো জামাইবরণ স্ত্রীআচার প্রভৃতি বিবাহের আনুষঙ্গিক প্রথাগুলিকে পিতা রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সকল উপলক্ষ্যে পিঁড়াতে আল্পনা দিবার ভার আমাদের উপর ছিল। ভাল করিয়া ফুল কাটিয়া আল্পনা দিতে না পারিলে তিনি কিছুতেই পছন্দ করিতেন না। কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে আমার ছোট বোনদের চুল বাঁধার ভার আমার উপর ছিল। কেমন চুল বাঁধা হইল এক একদিন তিনি তাহা নিজে দেখিতেন। তাঁহার পছন্দমত না হইলে পুনর্ব্বার খুলিয়া ভাল করিয়া বাঁধিতে হইত।

মানসিক বিষয়ে পিতৃদেবের যেমন একটি সূক্ষ্মতা ছিল ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধেও সেইরূপ দেখা যাইত। কোনো প্রকার শ্রীহীনতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সঙ্গীত বিশেষরূপ ভাল না হইলে তিনি শুনিতে ভাল বাসিতেন না। প্রতিভার পিয়ানো বাজানো এবং রবির গান শুনিতে তিনি ভাল বাসিতেন। বলিতেন রবি আমাদের বাঙ্গালা দেশের বুল্‌বুল্। মন্দগন্ধ তাঁহার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল—সুগন্ধ দ্রব্য সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিত। ফুল তিনি বড় ভাল বাসিতেন। পার্কষ্ট্রীটে যখন তাঁহার কাছে ছিলাম তখন প্রত্যহ তাঁহাকে একটি করিয়া তোড়া বাঁধিয়া দিতাম। মাঝে মাঝে তাহাই ঘ্রাণ করিতে করিতে তিনি হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, বলিতেন, ফুলের গন্ধে আমি তাঁহারি গন্ধ পাই। একদিন এইরূপে যখন হাফেজের কাব্যরসে তিনি মগ্ন ছিলেন আমাকে বলিলেন কাগজ পেন্সিল লইয়া এস। আমি তাহা লইয়া গেলে তিনি হাফেজের কবিতা তর্জ্জমা করিয়া বলিতে লাগিলেন আমি তাহা লিখিয়া লইলাম। সেগুলি তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হইয়াছিল। সুন্দর পরিপাটী করিয়া কোনো কাজ নিষ্পন্ন না হইলে তিনি কোনোদিন খুসি হইতেন না। আমাদের রন্ধন শিক্ষার জন্য তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন প্রতিদিন একটা করিয়া তরকারি

রাঁধিতে হইবে। রোজ একটা করিয়া টাকা পাইতাম, সেই টাকায় মাছ তরকারী কিনিয়া আমাদিগকে রাঁধিতে হইত। আমাদের কোনো এক সম্পর্কের দিদিমা ভাল রাঁধিতে পারিতেন, তিনিই আমাদের শিক্ষক ছিলেন।

বাড়ির মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক উপাসনার একটি ঘর ছিল। পিতার আদেশ অনুসারে আমরা সাফ কাপড় পরিয়া সেই ঘর প্রতিদিন ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতাম। মহোৎসবের দিনে সেই ঘর ফুল পাতা দিয়া সাজাইতে হইত। আমরা পরমানন্দে সমস্ত রাত জাগিয়া ঘর সাজাইতাম। পিতা সকালে আসিয়া প্রথমে আমাদিগকে লইয়া সেই ঘরে উপাসনা করিয়া পরে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। সেই উপাসনার ঘরে তিনি প্রতিদিন উপাসনা করিয়া আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়াইতেন;—কোনো কোনো দিন আমাদিগকে লইয়া গ্রহনক্ষত্রের বিষয় আলোচনা করিতেন। এইরূপে যেসকল উপদেশ দিতেন আমাদিগকে তাহা লিখিতে হইত। লেখা ভাল হইলে তাহার পাশে তিনি উৎসাহবাক্য লিখিয়া দিতেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বলপ্রয়োগের কোনো স্থান ছিল না; তিনি যাহা আদেশ করিতেন তাহাই আমরা সন্তুষ্টচিত্তে পালন করিতাম—তাঁহার আদেশ আমাদের পক্ষে দেববাক্য ছিল।

বাহিরের দালানে যেদিন লোকসমাগম হইত, উপাসনা-সভা বসিত, মেজদাদা নিজে গান রচনা করিয়া একটি ছোট হার্ম্মোনিয়ম লইয়া মনের সঙ্গে যখন সেই গান গাহিতেন তখন সকলেই মুগ্ধ হইত, এবং আমাদের যে কি ভাল লাগিত তাহা বলিতে পারি না। ধর্ম্মের উৎসাহে মেজদাদা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। স্ত্রীস্বাধীনতা বলিয়া একখানি চটি বই তাঁহার অল্প বয়সেই তিনি লিখিয়াছিলেন। তখন মেয়েদের বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে ঢাকাদেওয়া পাল্কীতে যাওয়াই রীতি ছিল—মেয়েদের পক্ষে গাড়িচড়া বিষম লজ্জার কথা বলিয়া গণ্য হইত। একখানি পাতলা সাড়ি মাত্রই তখন মেয়েদের পরিধেয় ছিল। আমাদের বাড়িতে মেজদাদাই এ সমস্ত উল্টাইয়া দিলেন। আমরা যখন শেমিজ জামা জুতা মোজা পরিয়া গাড়ি চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম তখন চারিদিক হইতে যে কিরূপ ধিক্কার উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নহে। পিতৃদেব নিষেধ করিলে তাহা লঙ্ঘন করা আমাদের অসাধ্য হইত কিন্তু তিনি ইহাতে কোনো বাধা দেন নাই। তিনি যখন দেখিতেন ছেলেমেয়েরা কোনো মন্দের দিকে যাইতেছে না তখন কোনো আচারের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তিনি নিষেধ করিতেন না।

আমার পিতার পিস্‌তুতভাই চন্দ্র বাবু আমাদের সম্মুখের বাড়িতেই বাস করিতেন। একদিন তিনি আসিয়া পিতাকে বলিলেন—"দেখ, দেবেন্দ্র, তোমার বাড়ির মেয়েরা বাহিরের খোলা ছাতে বেড়ায়, আমরা দেখিতে পাই; আমাদের লজ্জা করে। তুমি শাসন করিয়া দাও না কেন?" পিতা বলিলেন, 'কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নবাবের আমলে যে নিয়ম খাটিত এখন আর সে নিয়ম খাটিবে না। আমি আর কিসের বাধা দিব, যাঁহার রাজ্য তিনিই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবেন।' ছোট মেয়েরা ভাল করিয়া কাপড় সামলাইতে পারিত না তাই তাহাদের সাড়ি পরা তিনি পছন্দ করিতেন না। বাড়িতে দর্জ্জি ছিল—পিতা নিজের কল্পনা হইতে নানা প্রকার পোষাক তৈরি করাইবার চেষ্টা করিতেন। অবশেষে আমাদের পোষাক অনেকটা পেযোয়াজের ধরণের হইয়া উঠিয়াছিল। আমার সেজ এবং ন বোন অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিল বলিয়া আত্মীয়েরা চারিদিক হইতেই মাকে এবং পিতাকে তাড়না করিতেন। মা বিচলিত হইয়া উঠিতেন কিন্তু পিতা কাহারও কোনো কথা কানেই লইতেন না। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে একত্রে আহারের প্রথা পিতার সম্মতিতে আমাদের বাড়িতেই আরম্ভ হয় কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্তই তাঁহার আপত্তি দূর হয় নাই। ব্রাহ্মণদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে তাঁহার উৎসাহ ছিল।

একদিকে প্রাচীন প্রথার সংস্কার ও আর একদিকে তাহার রক্ষণ এই দুইই তাঁহার চরিত্রে দৃঢ় ছিল। এইজন্য সমাজের আচার সম্বন্ধে তিনি যে-কোনো পরিবর্ত্তন তাঁহার পরিবারে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন সমাজের প্রতি নির্ম্মমতা-বশতঃ তাহা করেন নাই। দেশের সমাজকে তিনি আপনার জিনিষ বলিয়াই জানিতেন। সামাজিক প্রথার

মধ্যে যেখানে যেটুকু সৌন্দর্য্য আছে তাহার প্রতি তাঁহার মমতা ছিল। এইজন্য জামাই-ষষ্ঠী ভাই-ফোঁটা প্রভৃতি লৌকিক প্রথা আমাদের বাড়িতে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। অনেকে এ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিল, তিনি শোনেন নাই। আমি যখন তাঁহাকে খবর দিতাম, আজ ভাই-ফোঁটা, তিনি শুনিয়া হাসিতেন, বলিতেন, "তুমি ফোঁটা দিয়াছ—আমরা যমরাজার দুয়ারে কাঁটা দিতে যাই না, যিনি যমরাজের রাজা তাঁহার কাছে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করি।"

একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে;—এখনকার দিনে নিতান্ত দুর্ব্বল লোকও যে পথে অনায়াসে চলিতে পারে তখনকার কালের বিশেষ শক্তিমান লোকের পক্ষেও তাহা দুর্গম ছিল। তা ছাড়া একথাও মনে রাখা চাই একবার পথ বাহির হইলে সে পথে চলা তেমন কঠিন নহে কিন্তু পথ দেখানই শক্ত। সামাজিক উন্নতির পথে এখনকার কালের দ্রুতগামীরা পিতৃদেবের মৃদুগতিকে মনে মনে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, তখন যে রাস্তা ছিল তাহা পায়ে হাঁটিবার মত, প্রত্যেক পদক্ষেপেই নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত, এখন সেখানেই অবাধে গাড়ি চলিতেছে, তাই বলিয়া রথারোহীরা যে পদাতিকের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এমন কথা যেন তাঁহারা কল্পনা না করেন—এবং একথাও বোধ হয় চিন্তা করিবার যোগ্য যে তখনকার রাস্তায় অন্ধবেগে গাড়ি হাঁকাইলে আরোহীদের পক্ষে তাহা কল্যাণকর না হইতে পারিত।

একদিন কেশববাবু যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পিতার সঙ্গে যোগদান করিলেন তখন চারিদিকে ধর্ম্মোৎসাহ যে কিরূপ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মনে পড়ে। পিতা তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দজি বলিয়া ডাকিতেন ও পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন। বুধবারে সমাজে উপাসনার পর ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ির দালানে যখন সকলে মিলিয়া গান ধরিতেন

"সবে মিলে মিলে গাওরে,—
তাঁর পবিত্র নাম লয়ে জীবন কর সফল,
কেহ থেকোনা নীরব"—

তখন কি উৎসাহের আনন্দে আমাদের মন উদ্বোধিত হইয়া উঠিত! সমাজবাড়ি মেরামত হওয়ার উপলক্ষ্যে আমাদের বাড়ির দালানে রাত্রিতে উপাসনাসভা বসিত—তখন আমরা ছেলেমানুষ—কিন্তু উপদেশে গানে বক্তৃতায় ঈশ্বরের প্রেমরসে মানুষের মন যে কেমন করিয়া অভিষিক্ত হইত তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই।

একবার মাঘোৎসবের আগের দিনে মামা আসিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন—"কর্ত্তা বলিয়া দিলেন, কাল কেশববাবুর স্ত্রী ও আর দুই জন মেয়ে আসিবেন—তোমরা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া খাওয়ানো ও দেখাশোনা করিবে—কোনো ত্রুটি না হয়!" তাহার পরদিন কেশববাবু প্রতাপবাবু ও অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী আমাদের বাড়িতে আসিলেন।

কেশববাবুর স্ত্রী তিন চার মাস আমাদের কাছে ছিলেন। তখন আত্মীয় স্বজনেরা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, কেহ আমাদের বাড়িতে আসিতেন না। সেই সময়ে কেশববাবুর স্ত্রীকে আমাদের আত্মীয়রূপে পাইয়া আমরা বড় আনন্দে ছিলাম। প্রথমটা তাঁহার মন বিমর্ষ ছিল—বিশেষত তাঁর একটি ছোট ভাইয়ের জন্য তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হইত। সেই সময় সোম, রবি ও সত্য শিশু ছিল—তাহাদিগকেই তিনি সর্ব্বদা কোলে করিয়া থাকিতেন—বলিতেন, রবিকে তাঁহার সেই ছোট ভাইটির মত মনে হয়। সত্য তাঁহাকে মাসী বলিতে পারিত না, "মাচি" বলিত, তাহাতে তিনি আমোদ বোধ করিতেন। তাঁহাকে আমাদের ভগিনীর মতই মনে হইত -তিনি যাইবার সময় আমরা বড় বেদনা পাইয়াছিলাম।

আমরা যখন কিছুদিন নৈনানের বাগানে ছিলাম তখন সেখানে কেশববাবুর বড়ছেলে করুণার অন্নপ্রাশন হইয়াছিল। তখনকার সমস্ত ব্রাহ্মদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ সমারোহে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দশ পনোরো দিন আগে হইতে আমরা পিঁড়িতে আল্‌পনা দিতে নিযুক্ত ছিলাম। এই কাজে আমরা প্রশংসা পাইয়াছিলাম।

চুঁচুড়ার বাড়িতে পিতার যখন কঠিন পীড়া হয় তখন আমি আর আমার ন বোন স্বর্ণ তাঁহার সেবার জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু পাছে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়

সেজন্য তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। সেই অবস্থাতেই আমাদের শোবার খাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার কাছে থাকিয়া কেহ কোনো বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না,—এমন কি ভৃত্যদেরও কোনো অসুবিধা তাঁহার ভাল লাগিত না।

চুঁচুড়ায় থাকিতে একদিন তাঁহার জ্বর প্রবল হইয়া উঠিল, বিকাল হইতে জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন। ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া বলিল, এই জ্বর ত্যাগের সময় বিপদের আশঙ্কা আছে, সেই সময়েই নাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারে—অতএব সাবধান থাকা আবশ্যক। রাজনারায়ণ বাবু সেই রাত্রে আসিয়াছিলেন। ডাক্তার বেদানার রসে আর্সেনিক মিশাইয়া দিয়াছিলেন; আমি তাহাই কাপড়ে ভিজাইয়া তাঁহার জিভে দিতেছিলাম এবং ডাক্তার কেবলি নাড়ি পরীক্ষা করিতেছিলেন। নাড়ি দুর্ব্বল; ভোরের বেলাটাতে ভয়ের কথা। কিন্তু সকালবেলায় জ্ঞান হইবামাত্রই তিনি উঠিয়া বসিয়া শাস্ত্রীকে বলিলেন, রাজনারায়ণ বাবু আসিয়াছেন, তাঁহাকে ডাক। শাস্ত্রী ভয় পাইলেন পাছে এই অবস্থায় কথা কহিবার চেষ্টা করিয়া দুর্ব্বলতা বাড়িয়া যায়। রাজনারায়ণ বাবু কাছে আসিয়া বসিলেন। পিতা বলিলেন, "দেখ, আমি ঈশ্বরের আদেশ পাইলাম যে, এযাত্রায় তুমি রক্ষা পাইলে; তোমার এখনো কাজ বাকি আছে; আমার দিকে আরো তুমি অগ্রসর হও।"

সকল কর্ম্মই তিনি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া ও ন্যায়পথে থাকিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছেন। যখন পার্কষ্ট্রীটে তাঁহার কাছে ছিলাম, দেখিতাম সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি একই চৌকিতে সমানভাবে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তায় দিন কাটাইয়াছেন—স্নানাহার ছাড়া আর সমস্ত ক্ষণই তাঁহার মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট থাকিত। কোনো দিন যখন কোনো প্রয়োজনীয় কথা বলিতে যাইতাম তিনি বলিতেন আমি কোথায় ছিলাম, আমাকে কোথায় আনিলে—তখন মনে অনুতাপ হইত।

বয়সের শেষভাগে যখন পিতৃদেব পার্কষ্ট্রীট ও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়াছিলেন তখনি তাঁহার কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে প্রায়ই তিনি বিদেশে নির্জ্জনবাসে দিন যাপন করিয়াছেন। যখন চিঠিতে তাঁহার বাড়ি আসিবার খবর আসিত তখন আমাদের এত আনন্দ হইত যে, যে লোক সংবাদ দিত তাহাকে পুরস্কার দিতাম। সকালে তিনি আমাদের সকলকে একত্র করিয়া দালানে উপাসনা করিতেন। উপাসনা হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে তিনি একবার আমাদের দেখিয়া লইতেন। বাহিরে গিয়া মামাকে জিজ্ঞাসা করিতেন অমুককে আজ ভাল দেখিলাম না কেন, অমুককে যেন বিমর্ষ বোধ হইল। ক্ষণকালের দৃষ্টিতে তিনি আমাদের মনের অবস্থা বুঝিয়া লইতেন। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কত কাজ করিয়াছি কিন্তু কখনো তিনি আমাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন নাই। তিনি যখন মিষ্টস্বরে মা বলিয়া ডাকিতেন তখন সে যে কি মধুর লাগিত তাহা জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না। তেমন মধুর বাণী আর কাহারো মুখে ত শুনিতে পাই না। এত বড় বৃহৎ পরিবারকে তিনি তাঁহার স্নেহপূর্ণ মঙ্গল কামনায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখদুঃখ ও বিরোধ বিপ্লবের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া নীরবে নিয়ত সকলের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

শ্রীসৌদামিনী দেবী।

প্রাচীন ভারতে দুগ্ধাদি গব্য

প্রাচীনকালে গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ।

প্রাচীন ভারতে এক একটী গাভী কি পরিমাণ দুগ্ধ দিত, তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। যাহারা বিলাতি প্রণালীমতে গোপালন এবং গব্য ব্যবসায় চালনা করে তাহাদের গোশালার প্রত্যেক গাভীর দৈনিক, অন্ততঃ সাপ্তাহিক, একটী দুগ্ধ-তালিকা থাকে। এরূপ দুগ্ধ-তালিকা রাখিবার প্রথা যদিও সে কালে প্রচলিত ছিল না তথাপি একথা নিশ্চয় যে বংশাদি এবং আহারাদি ভেদে তখনও গাভীগণের দুগ্ধের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইত। গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক উপকথা প্রচলিত আছে। গোবংশের বিখ্যাত মাতা সুরভি সম্বন্ধে রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, রাবণ

বরুণালয়ে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে সুরভির স্তন হইতে অবিরাম দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে, এবং সেই ক্ষরিত দুগ্ধ মিলিত হইয়া ক্ষীরোদ-সাগরের উৎপত্তি হইয়াছে।* মহাভারতে বশিষ্ঠের নন্দিনী নামক হোমধেনুর যে বর্ণনা আছে, তাহাও প্রায় তদ্রূপ। নন্দিনী সুরভিরই অবতার। সেই নন্দিনীর বর্ণনা দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্যাসাদি ঋষিগণ অতি সূক্ষ্মভাবে অভিনিবেশ পূর্ব্বক গাভীর গুণাগুণ আলোচনা করিতেন।†

উধোদেশ (উলান) বিস্তৃত, দোহন করিতেও আরাম, গাত্রচর্ম্ম সুখস্পর্শ, খুর উৎকৃষ্ট, সেই গাভী মঙ্গলস্বরূপা, সর্ব্বগুণযুক্তা এবং সুশীলা। যে ভাগ্যবান মানব এ গাভীর ক্ষীর পান করে, সে স্থিরযৌবন লাভ করিয়া দশ হাজার বৎসর জীবিত থাকে।‡ যাহা হউক এ সকল উপকথা মাত্র। অমরকোষে আমরা একটী শব্দ পাইতেছি "দ্রোণ-ক্ষীরা" বা "দ্রোণদুঘা"। দ্রোণ অর্থে অর্দ্ধমণ বুঝায়। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে বেশী দুধের গাভীর আজকাল দেশে যেরূপ "অত্যন্তাভাব" পুরাকালে সেরূপ ছিল না। শাস্ত্রে স্থানে স্থানে সেকালের সাধারণ গাভীদিগের যে বর্ণনা পাঠ করা যায়, একজন অভিজ্ঞ গোপালক তদ্দৃষ্টে তাহাদের দুগ্ধেরও পরিমাণ সম্বন্ধে নিশ্চয়তার সহিত অনুমান করিতে পারেন। আজকালের বঙ্গদেশীয় সাধারণ গাভী পানাইলে, বাছুর যখন তাহার দুগ্ধ পান করে, পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, সেই হতভাগ্য বাছুরের মুখ বহিয়া এক ফোঁটাও দুগ্ধের ফেনা মাটিতে পড়ে না; আবার ৫।৭ সের দুধ দেয় এরূপ একটী নাগরা গাই পানাইয়া, বাছুরকে যখন দুধ খাইতে দেয়, পাঠক লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, তখন বাছুরের মুখ বহিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধফেন মাটিতে পড়ে। ১০।১২ সের দুধ দেয় এরূপ গাভীর বাছুরের মুখ দিয়া ঐরূপ অবস্থাতে প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধফেন বহিতে থাকে। পুরাকালে পরীক্ষিৎ রাজা মৃগয়া করিয়া, ক্লান্ত শরীরে মৌনব্রতালম্বী ঋষিবর শমীকের নিকট উপস্থিত হইয়া, ক্রোধভরে ঋষির গলায় মৃতসর্প ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সময়ে ঋষিবর বাছুরের মুখনিঃসৃত বহুল পরিমাণ দুগ্ধফেন পান করিয়া তনুরক্ষা করিতেছিলেন।* ঋষিবর ধৌম্যের শিষ্য উপমন্যুও ঐরূপে বৎসমুখনিঃসৃত দুগ্ধফেন পান করিয়া শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন।† এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, আর্য্যভারতে অনেক গাভীই ১০।১২ সের দুধ দিত। আইন-আকবরী পাঠে আমরা জানিতেছি যে আকবর বাদসাহের সময়ে বঙ্গদেশ উৎকৃষ্ট গাভীর জন্য বিখ্যাত ছিল। এবং অনেক বঙ্গীয় গোমাতা দৈনিক আধমণ করিয়া দুধ দিত।

দুগ্ধের গুণ।

প্রাচীনভারতে দুগ্ধ একটী প্রধান খাদ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। এবং শাস্ত্রকারগণ নানাস্থানে দুগ্ধের অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। "অমৃতং বৈ গবাং ক্ষীরম্ ইত্যাহ ত্রিদশাধিপঃ।" ৫ অ, ১০১ অনুশাসন—শান্তিপর্ব্ব। অত্রি-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে যে কপিলা গাভী দোহন করিয়া তাহার ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে চণ্ডালও শুদ্ধি লাভ করে।‡ স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে বর্ণনা করিয়াছেন যে তাঁহার পর্ব্বত-বিহারকালে তিনি ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া অনেক উপকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দৈনিক দশসের দুগ্ধ পান করিতেন। রাজা রামমোহন রায় দৈনিক বারসের দুগ্ধ সেবন করিতেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মত এই যে, সুস্থ

---

* ক্ষরন্তীঞ্চ পয়স্তত্র সুরভিং গামবস্থিতাং। যস্যাঃ পয়োঽভিনিস্যন্দাৎ ক্ষীরদো নাম সাগরঃ॥ ২১॥ দদর্শ রাবণ স্তত্র গোবৃষেন্দ্রবরারণিং। যস্মাচ্চন্দ্রঃ প্রভবতি শীতরশ্মি নিশাকরঃ॥ ২২॥ সর্গ ২৩ —উত্তরাকাণ্ড।

† আপীনাং চ সুদোগ্ধ্রীংচ সুবলেধি খুরাং শুভা। উপপন্নাং গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ শীলেনানুত্তমেন চ॥ ১৬॥ নন্দিনীং নাম রাজেন্দ্র সর্ব্বকামধুগুত্তমাং॥

‡ অস্যাঃ ক্ষীরং পিবেন্মর্ত্ত্যঃ স্বাদুসেবৈ সুমধ্যমে।
দশবর্ষ সহস্রাণি স জীবেৎ স্থিরযৌবনঃ॥ ১৯ অ, ১০১
—সম্ভব আদিপর্ব্ব।

* পরিশ্রান্ত পিপাসার্ত্ত আসসাদ মুনিং বনে। গবাং প্রচারেষ্বাসীনং বৎসানাং মুখনিঃসৃতং। ভূয়িষ্ঠমুপভুঞ্জানং ফেনং আপিবতাং পয়ঃ॥১৭ অ,
—৪০ আস্তিক—আদিপর্ব্ব।

† ভো ফেনং পিবামি যমিমে বৎসা মাতৃণাং স্তনাৎ পিবন্ত উদ্‌গিরন্তি॥ ৪৮ অ, ৩ পৌষ্য—আদিপর্ব্ব।

‡ কপিলা গোস্ত দুগ্ধায়া ধারোষ্ণং যঃ পয়ঃ পিবেৎ।
এষ ব্যাসকৃত কৃচ্ছ্র শ্বপাকমপি শোধয়েৎ॥ ১৩০॥

গাভীর দুগ্ধ উলান পরিষ্কার করিয়া পরিষ্কৃত পাত্রে পরিষ্কৃত হস্তে সতর্কতার সহিত দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিলে জ্বাল দেওয়া দুধ অপেক্ষা সমধিক লঘুপাক এবং পুষ্টিকর।

আয়ুর্ব্বেদ মতে দুগ্ধের গুণ।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আমাদের কোন অধিকার নাই। তথাপি গ্রন্থাদি পাঠে আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা অতিশয় মূল্যবান। সুশ্রুতাদি দুগ্ধ এবং অপরাপর গব্য দ্রব্যের এতদূর অনুশীলন করিয়াছিলেন যে আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকও তাঁহাদের নিকটে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। আমরা সংক্ষেপে নিম্নে তাহার সারাংশ উল্লেখ করিতেছি। ভাবপ্রকাশ* গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ড দ্বিতীয় ভাগে দেখা যায় (১) দুগ্ধ সুমধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তনাশক এবং মলনিঃসারক, সদ্য শুক্রকারক, শীতল এবং শরীরের হিতকর, জীবনীশক্তি এবং বল ও মেধাবর্দ্ধক। (২) বাল্যকালে ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, পরে বলকারক ও বীর্য্যপ্রদ। বৃদ্ধবয়সে রাত্রিতে দুগ্ধ পানে অনেক দোষ দূর হয়। অতএব সর্ব্বকালেই দুগ্ধ সেবন করিবে। (৩) সূর্য্যোদয়ের প্রহরেক পরে দুগ্ধ সেবন করিতে হয়।† বালবৎসা কিম্বা মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষকারক। বকনা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষনাশক, তৃপ্তিদায়ক ও বলকারক।‡ প্রভাতকালের দুগ্ধ সন্ধ্যাকালের দুগ্ধ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরুপাক এবং শীতল। সন্ধ্যাকালের দুগ্ধ প্রাভাতিক দুগ্ধ অপেক্ষা লঘুপাক এবং বাত ও কফনাশক কারণ দিবাকালে গোরু সূর্য্যালোক ও বায়ু সেবন করিতে পারে এবং বিবরণ দ্বারা ব্যায়াম লাভ হয়। (৪) আহার ও গোচারণের স্থান অনুসারে দুগ্ধের গুণের তারতম্য দৃষ্ট হয়।* জাঙ্গল, অনূপ বা জলাভূমি এবং পর্ব্বত এই তিনের মধ্যে বিচরণকারী গাভীর দুগ্ধ ক্রমানুসারে অধিকতর গুরুপাক। দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের ভাগেরও আহার অনুসারে তারতম্য হয়। স্বল্পাহার দিলে গাভীর যে দুধ হয় তাহা গুরুপাক এবং কফকারক কিন্তু বলকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক। ইহা সুস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পলাল, তৃণ এবং কার্পাস বীজ আহার করিলে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা রোগীদিগের উপকারী। ইক্ষু এবং মাসকলাইপত্র ভক্ষণে উৎপন্ন দুগ্ধ এবং উর্দ্ধশৃঙ্গযুক্ত গাভীর দুগ্ধ পকই হউক আর অপকই হউক উপকারী। (৬) বর্ণ বিশেষে দুগ্ধের গুণ বিশেষ দৃষ্ট হয়।† যথা কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধ বাতনাশক এবং অধিকতর উপকারী। পীতবর্ণ গাভীর দুগ্ধ পিত্তবাতহারক। শুক্লবর্ণ গাভীর দুগ্ধ গুরুপাক এবং শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। রক্তবর্ণ অথবা বিচিত্রবর্ণ গাভীর দুগ্ধ বাতহারক। (৭) ধারোষ্ণ গোদুগ্ধ‡ অমৃত

---

* ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড দ্বিতীয়ভাগ হইতে উদ্ধৃত দুগ্ধের সাধারণ গুণ :—

(১) দুগ্ধং মধুরং স্নিগ্ধং বাতপিত্তহরং সরং।
সদ্যঃ শুক্রকরং শীতং সাত্ম্যং সর্ব্ব শরীরিণাং।
জীবনং বৃংহণং বল্যং মেধ্যং বাজিকরং পরং।
বয়ঃস্থাপকমায়ুষ্যং সন্ধিকারি রসায়নম্
বিবেক বাস্তি বস্তিণাং তুল্যমোজোবিবর্দ্ধনম্।

(২) বাল্যে বহ্নিকরং বীর্য্যপ্রদং বার্দ্ধক্যে, রাত্রৌ ক্ষীরমনেকদোষশমনং সেব্যং ততঃ সর্ব্বদা॥

(৩) দুগ্ধ সেবনের কাল।

† সূর্য্যোদয়াৎ পরং যামং যামার্দ্ধমেব বা।
উত্তার্য্য পয়ো গ্রাহ্যং তৎ পথ্যং দীপনং লঘু॥

(৪) মৃতবৎসা, কাচি ও বকনা গাভীর দুগ্ধের গুণ।

‡ বালবৎস বিবৎসানাং গবাং দুগ্ধং ত্রিদোষকৃৎ॥
বয়স্কচিহ্নাং ত্রিদোষঘ্নং তর্পণং বলকৃৎ পয়ঃ॥
প্রাভাতিকং পয়ঃ প্রায়ঃ প্রদোষাদ্গুরু শীতলং।
দিবাকরকরাঘাতাৎ ব্যায়ামানিলসেবনাৎ॥
প্রাভাতিকাত্ত প্রাদোষং লঘু বাতকফাপহং।

(৫) আহার অনুসারে দুগ্ধের গুণভেদ।

* জাঙ্গলানূপ শৈলেষু চরন্তীনাং যথোত্তরং।
পয়ো গুরুতরং স্নেহো যথাহারং প্রবর্ত্ততে॥
স্বল্পান্ন ভক্ষণাজ্জাতং ক্ষীরং বাতকফপ্রদং।
তত্তু বল্যং পরং বৃষ্যং স্বস্থানাং গুণদায়কং।
পলাল তৃণ কার্পাস বীজজং রোগিনো হিতং॥
ইক্ষুভক্ষক মাষপর্ণভক্ষকোর্দ্ধশৃঙ্গং গোদুগ্ধং
পক্কমপকং বা হিতকারকং॥

গোদুগ্ধের বিশেষ গুণ।

গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনং॥
দোষ ধাতুমল স্রোত কিঞ্চিৎ ক্লেদকরং গুরু।
জরা সমস্ত রোগানাং শান্তিকৃৎ রোগিনাং সদা॥

(৬) বর্ণবিশেষে গুণবিশেষ।

† কৃষ্ণায়া গোর্ভবেদ্দুগ্ধং বাতহারি গুণাধিকং।
পীতায়া হরতে পিত্তং তথা বাতহরং ভবেৎ॥
শ্লেষ্মণং গুরু শুক্লায়া রক্তা চিত্রা চ বাতহৃৎ॥

(৭) ধারোষ্ণ দুগ্ধের গুণ।

‡ ধারোষ্ণং গোপয়ো বল্যং লঘুশীত সুধাসমং।
শীতলং দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং তদ্ধারা শিশিরং ত্যজেৎ।

তুল্য। "ধারোষ্ণ দুগ্ধং অমৃততুল্যং।" ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলকারক, লঘু, শীতল এবং অমৃত সমান ক্ষুধাবর্দ্ধক, ত্রিদোষঘ্ন, কিন্তু সেই দুগ্ধধারা শীতল হইলে পরিত্যাগ করিবে। গোরুর দুগ্ধ ধারোষ্ণই প্রশস্ত, ধারাশীতল মহিষের দুগ্ধ প্রশস্ত। পক্ক ও উষ্ণ মেষদুগ্ধ পথ্য এবং পক্ক-শীতল ছাগদুগ্ধ পথ্য। (৮) পক্ক, অপক্ক, পর্য্যুসিত ইত্যাদি* অবস্থাভেদে দুগ্ধের গুণভেদ দৃষ্ট হয়। যথা পর্য্যুসিত দুগ্ধ গুরুপাক এবং কষ্টদায়ক। অপক্ক দুগ্ধ শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর এবং গুরুপাক। পক্ক উষ্ণ দুগ্ধ কফ এবং বায়ুনাশক। পক্ক ঠাণ্ডা দুগ্ধ পিত্তনাশক। লবণযুক্ত দুগ্ধ এবং নষ্ট দুগ্ধ পরিত্যজ্য। বিবর্ণ, বিরস, দুর্গন্ধ, অম্ল, এবং গ্রথিত (ছানাইল) দুগ্ধ পরিত্যাগ করিবে। অম্ল ও লবণযুক্ত দুগ্ধ কুষ্ঠাদি রোগ উৎপাদক। দুগ্ধান্ন বা পায়সাদি চক্ষুর হিতকর, বলকারী পিত্তনাশক এবং ত্রিদোষনাশক। দুগ্ধান্নগুণাঃ—"চক্ষুর্হিতত্বং বলকারিত্বং পিত্তনাশিত্বং রসায়নঞ্চ।" চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ উপকারী—"ক্ষীরং সশর্করং পথ্যং।" গরম না করিয়া দুগ্ধ সেবন নিষেধ। এবং উষ্ণ দুগ্ধও লবণ যোগ করিয়া সেবন করিবে না। "ক্ষীরং ন ভুঞ্জীত কদাপ্যতপ্তং তপ্তঞ্চ নৈতৎ লবণেন সার্দ্ধং।" ঘন দুগ্ধ স্নিগ্ধ এবং শীতল, সর্ব্বদা সেবন করিবে না। কারণ তাহাতে ভাল শরীরেও ক্ষুধামান্দ্য হয় এবং মন্দাগ্নি থাকিলে ক্ষুধা একবারেই নষ্ট হয়। "স্নিগ্ধং শীতং গুরুক্ষীরং সর্ব্বকালে ন সেবয়েৎ। দীপ্তাগ্নিং কুরুতে মন্দং মন্দাগ্নিং নষ্টমেবচ।" সুশ্রুতাদি গোদুগ্ধের সহিত মাহিষ ও ছাগদুগ্ধের তুলনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তাঁহারা গোদুগ্ধের বিশেষ গুণ এইরূপে উল্লেখ করিতেছেন।(৯) গব্য দুগ্ধ* সুরস এবং সহজপাচ্য, শীতল স্তন্যবৃদ্ধিকারক, স্নিগ্ধ এবং বাতপিত্ত ও কফনাশক। শরীরস্থ ধাতুসকলের কিঞ্চিৎ ক্লেদকারক এবং গুরুপাক। গোদুগ্ধ সেবনে জরা এবং সমস্ত রোগের শান্তি হয়। মহিষের দুগ্ধ গোদুগ্ধ হইতে অধিকতর মধুর এবং মাখনযুক্ত, শুক্রকারক এবং গুরুপাক, নিদ্রাকারী, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক এবং অতিশয় শীতল। ছাগদুগ্ধ কষায়, মধুর, শীতল, ধারক, এবং সহজপাচ্য, রক্তপিত্তদোষ এবং অতিসারনাশক, ক্ষয়কাশ এবং জ্বরনাশক। ছাগ ক্ষুদ্রকায়, কটুতিক্তাদিভোজী, অল্পাম্বুপায়ী এবং সর্ব্বদা ব্যায়ামনিরত। এইজন্য ছাগদুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক।

প্রাচীন মতে দধির গুণ।

প্রাচীন আর্য্যগণ যেরূপ দুগ্ধ সেবন করিতেন, তাঁহারা দধি এবং ঘি মাখনও সেইরূপ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। "দধি দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে, দধি দ্বারা স্বস্তিবাচন করিবে, দধি দান করিবে, দধি ভোজন করিবে।" "ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে, ঘৃত দ্বারা স্বস্তিবাচন করিবে, ঘৃত লাভ করিলেই তাহা ভোজন করিবে।"† প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দধি এবং মাখনের দৃষ্টান্তই অত্যন্ত প্রচলিত। সামবেদীয় ছান্দগ্য উপনিষদে ঋষি বলিতেছেন "হে সৌম্য দধি মন্থন করিলে তাহার সূক্ষ্মতর অংশ সকল উপরে ভাসিয়া উঠে, তাহারই নাম সর্পী বা মাখন।" ইহাতে দেখা যায় তাঁহারা সচরাচরই দধি ব্যবহার

ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারাশীতন্তু মাহিষং।
শৃতোষ্ণ মাবিকং পথ্যং শৃতশীতমজাপয়ঃ॥

(৮) পক্ক, অপক্ক, পক্ক-শীতল পর্য্যুসিত ইত্যাদি দুগ্ধের গুণ।

* পর্য্যুষিত দুগ্ধগুণ—গুরুত্বং বিষ্টম্ভিত্বং দুর্জ্জরত্বং।
অপক্ক দুগ্ধগুণ—প্রায়োঽভিষ্যন্দিত্বং গুরুত্বঞ্চ।
শৃতোষ্ণ—শৃতোষ্ণং কফবাতনাশনং।
শৃতশীত—শৃতশীত পিত্তনাশনং।
ধারোষ্ণ—ধারোষ্ণ দুগ্ধং অমৃততুল্যং।
সলবণ দুগ্ধং বিগ্রথিতং নষ্ট ইতি খ্যাতং দুগ্ধঞ্চ ত্যজং।
বিবর্ণ বিরস ইত্যাদি—বিবর্ণং বিরসং চাম্লং দুর্গন্ধং গ্রথিতং পয়ঃ।
বর্জ্জয়েদম্ললবণযুক্তং কুষ্ঠাদিকৃন্মতঃ॥

(৯) গোদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ।

* গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ
শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনং "
দোষ ধাতু মলস্রোত কিঞ্চিৎ ক্লেদকরং গুরু
জরা সমস্তরোগানাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা॥
মাহিষং মধুরং গব্যাৎ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
নিদ্রাকরং অভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্যাকরং হিমং॥
ছাগং কষায়ং মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাশ জ্বরাপহং॥
অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তাদি সেবনাৎ।
স্তোকাম্বুপানাৎ ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগাপহং পয়ঃ॥

† দধিনা জুহুয়াদগ্নিং দধিনা স্বস্তি বাচয়েৎ। দধি দদ্যাচ্চ প্রাশেত গবাং ব্যুষ্টিং সমশ্নুতে॥ ২১॥ ঘৃতেন জুহুয়াদগ্নিং ঘৃতেন স্বস্তি বাচয়েৎ। ঘৃতেন জুহুয়াদগ্নিং ঘৃতেন স্বস্তি-বাচয়েৎ। ঘৃতমালভ্য প্রাশ্নীয়াদ্গবাং ব্যুষ্টিং সমশ্নুতে॥ ২২ অ, ১৩৫ অনুশাসন—দানধর্ম্ম—শান্তিপর্ব্ব।

করিতেন এবং তাহা মন্থন করিয়া মাখন উঠাইতেন, এবং সেই মথিত দধি যাহাকে আমরা মাটা বা ঘোল নামে অভিহিত করি তাহাও তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট যাহা নূতন আবিষ্কার, প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে তাহা সুপরিচিত ছিল। দধি সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিতেছেন যে দধি বাতপিত্তনাশক, রুচিকর, ক্ষুধা, এবং বলবৃদ্ধিকারক।* আধুনিক বিজ্ঞানও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে দধি শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। যে বীজাণু দুগ্ধ মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে দধিরূপে পরিণত করে (Bactirium acidi lactici) বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে তাহার একটী অপূর্ব্ব শক্তি এই যে তদ্দ্বারা নানা প্রকার রোগাদির বীজাণু বিনষ্ট হয়। এই কারণে পাশ্চাত্য জগতেও আজ কাল দধির বিশেষ আদর দৃষ্ট হইতেছে। এ বিষয়ে ভারত পাশ্চাত্য জগতেরও গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছে বলিতে হইবে। ইহা এ দেশের একটী বিশেষ গৌরবের কথা।

প্রাচীন মতে ঘৃত মাখনাদির গুণ।

দধির ন্যায় ঘৃতও প্রাচীন আর্য্যদিগের অতি সমাদরের বস্তু ছিল। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে "আজ্য বা গলিত ঘৃত দেবগণের প্রিয় বস্তু। ঘৃত (ঘনীভূত) মনুষ্যগণের, আয়ুত বা ঈষৎ গলিত ঘৃত পিতৃগণের এবং নবনী গর্ভস্থ শিশুগণের প্রিয় বস্তু।"† ঘৃত ও নবনীত সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিতেছেন "সদ্যজাত নবনীত লঘুপাক, সুকুমার, ধারক, ঈষদম্ল, শীতল, পবিত্র, ক্ষুধা-বৃদ্ধিকর, তৃপ্তিকর, সংগ্রাহী, বায়ুপিত্তনাশক, শুক্রকর ও জ্বালানিবারক, বলকর, পুষ্টিকর, পিপাসানিবারক, বালক-দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। দুগ্ধ হইতে উত্থিত নবনীত উৎকৃষ্ট মাধুর্য্যযুক্ত, অতি শীতল, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিকারক, চক্ষুর উপকারী, বলকারক, শুক্রকর, স্নিগ্ধ, রুচিকর, মধুর, রক্তপিত্তের উপকারী এবং গুরুপাক (৩০)।*

ঘৃতের গুণ সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিতেছেন—"ঘৃত ধৈর্য্যদায়ক, শীতবীর্য্য, মৃদুমধুর, ঈষৎ সর্দ্দিকারক, এবং লাবণ্যদায়ক। স্মৃতি-মতি-মেধা-কান্তি-স্বরলাবণ্য সৌকুমার্য্য-শক্তি-তেজ এবং বলবৃদ্ধিকারক। আয়ুবর্দ্ধক, শুক্রকারক, পবিত্র, বয়স্থাপক, গুরুপাক, চক্ষের উপকারী, শ্লেষ্মা-বৃদ্ধিকর। গব্যঘৃত সকলের শ্রেষ্ঠ, চক্ষুর বিশেষ উপকারী, এবং বলবর্দ্ধক।

অপরাপর গব্য খাদ্য।

উপরের লিখিত ভিন্ন অপরাপর গব্য দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যাহা জানা যায় তাহারও আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।† দধির সর (মালাই) গুরুপাক, শুক্রকর, বায়ুনাশক অগ্নিবর্দ্ধক কফকারক।‡ সর-রহিত দধি অর্থাৎ মাখন টানা দুধের দধি—রুক্ষ, ধারক, বাতনাশক, ক্ষুধা-কারক, লঘুতর, রুচিকর। শরৎ গ্রীষ্ম এবং বসন্ত কালে সেই দধি সেবন অনেক সময়ে অনিষ্টকারী হয়। হেমন্তে, শীতে, এবং বর্ষাকালে সেই দধি প্রশস্ত।§ মস্তু অর্থাৎ দধি ছাঁকিলে যে জলীয়ভাগ থাকে—তাহা তৃষ্ণা এবং ক্লান্তিনিবারক মধুর, কফ ও বায়ুনাশক, আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, মলনিবারক, এবং বলদায়ক। মস্তু বা দধি

---

* বাতপিত্তহরং রুচ্যং ধাত্বগ্নিবলবর্দ্ধনং। দধি মধুরমম্লমত্যম্লঞ্চেতি তৎ কষায়ানুরসং স্নিগ্ধমুষ্ণং পীনসবিষমজ্বরাতিসারারোচক-মূত্রকৃচ্ছ্র কার্শ্যাপহং বৃষ্যং প্রাণকরং মঙ্গল্যঞ্চ। মন্দ জাতং ত্রিদোষকৃৎ। বাতাপহং পবিত্রঞ্চ দধি গব্যং রুচিপ্রদং॥ ১৭॥ দধিন্যুক্তানি যানীহ গব্যাদিনা পৃথক্ পৃথক্। বিজ্ঞেয়মেষু সর্ব্বেষু গব্যমেব গুণোত্তরং। বাতঘ্নং কফকৃৎ স্নিগ্ধং বৃংহণঞ্চ পিত্তকৃৎ॥

† আজ্যং বৈ দেবানাং সুরভি ঘৃতং মনুষ্যাণাং আয়ুতং পিতৃণাং নবনীত গর্ভাণাং। টীকাকার বলিতেছেন—সর্পি-বিলীনমাজ্যং ঘনী-ভূতং ঘৃতং বিদুঃ ঈষদ্বিলীনমায়ুতং।

* নবনীত পুনঃ সদ্যস্কং লঘু সুকুমারং মধুরং কষায়মীষদম্লং শীতলং মেধ্যং দীপনং হৃদ্যং সংগ্রাহী পিত্তানিলহরং বৃষ্যমবিদাহী * * বলকরং বৃংহণং শোষঘ্নং বিশেষতো বালানাং প্রশষ্যতে। ক্ষীরোত্থং পুনর্নবনীতং উৎকৃষ্টং স্নেহং মাধুর্য্যযুক্তমতিশীতং সৌকুমার্য্যকরং চক্ষুষ্যং * * * বল্যা বৃষ্যা স্নিগ্ধা রুচ্যা মধুরা রক্তপিত্তপ্রসাদনী গুর্ব্বীচ॥ ৩০॥

ঘৃতন্তু সৌম্যং শীতবীর্য্যং মৃদুমধুরমল্পাভিষ্যন্দিস্নেহনং * * অগ্নি-দীপনং স্মৃতিমতি-মেধাকান্তি-স্বরলাবণ্য-সৌকুমার্য্যৌজস্তেজো-বলকর-মায়ুষ্যং বৃষ্যং মেধ্যং বয়ঃস্থাপনং গুরু চক্ষুষ্যং শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধনং * *॥ ৩১॥ চক্ষুষ্যমগ্র্যবলঞ্চ গব্যং সর্পিগুণোত্তরং॥ ৩২॥

† দধির সর—গুরুবৃষ্যো বিজ্ঞেয়োঽনিলনাশন বহ্নের্বিষমনশ্চাপি কফশুক্রবিবর্দ্ধনঃ।

‡ সররহিত দধি—রুক্ষঞ্চগ্রাহি বিষ্টম্ভি বাতলং দীপনীয়ং লঘুতরং সকষায়ং রুচিপ্রদং। শরদ্‌গ্রীষ্মবসন্তেষু প্রায়শো দধি গর্হিতং॥ হেমন্তে শিশিরেচৈব বর্ষাসু দধি শস্যতে।

§ মস্তু—তৃষ্ণাক্লমহরং লঘু স্রোতো বিশোধণং। অম্লং কষায়ং মধুরমবৃষ্যং কফবাতনুৎ॥ প্রহ্লাদনং প্রীণনঞ্চ ভির্ণত্তাশুমলঞ্চ তৎ। বলমাহ বত্তে পষ্টি ভক্তচ্ছন্দ করোতি চ॥ কুর্য্যাৎ ভক্তাভিলাষঞ্চ দধিবৎ সুপরিশ্রুতং॥ শৃতাৎ ক্ষীরাৎ তু যজ্জাতং গুণাদ্দধি তৎস্মৃতং। বাত-পিত্তহরং রুচ্যং ধাত্বগ্নিবলবর্দ্ধনং॥

ছাঁকা জলের গুণ সুশ্রুত বলিতেছেন—ভালরূপে দধি ছাঁকিয়া যে জল হয়, তাহা রুচিকর, পক্ক দুগ্ধ হইতে জাত মস্ত অধিক গুণশালী, তাহা বাত পিত্তের উপকারী, ধাতু অগ্নি ও বলের বর্দ্ধক।* তক্র—মাঠা বা ঘোল—অম্লমধুর, ধারক, বীর্য্যকারক, লঘুপাক, রুক্ষ, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, প্রীতিকর এবং মূত্রকৃচ্ছ্রের নাশক। দধি মন্থন করিয়া মাখন তুলিয়া অর্দ্ধেক জলযোগ করিলে তাহার নাম তক্র। তাহা স্বাদু অম্ল ও রসযুক্ত। মথিত মাখন ও জলরহিত দধির নাম ঘোল। ক্ষত স্থানে, দুর্ব্বল শরীরে কিম্বা শরীর উষ্ণ থাকিলে, তক্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। শীতকালে অগ্নিমান্দ্য হইলে কফ বা বায়ু জনিত রোগে তক্র ব্যবহার প্রশস্ত। বাতরোগে সৈন্ধবযুক্ত অম্ল তক্র, এবং পিত্তরোগে চিনিযুক্ত তক্র প্রশস্ত।† দধিপিণ্ড ক্ষীরসার, কিনাট ইত্যাদি—দধি তক্র কিম্বা নষ্ট দুগ্ধ পরিষ্কার বস্ত্রে বান্ধিয়া দ্রব ভাগ বাহির করিয়া দিলে যাহা থাকে তাহার নাম পিণ্ড। তাহা বলবীর্য্যবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক, গুরুপাক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, প্রীতিকর, বাতপিত্তনাশক। ক্ষুধা প্রবল হইলে কিম্বা অনিদ্রা হইলে ইহা উপকারী। ‡মোরট বা ক্ষীরি অর্থাৎ প্রসবের সাতদিন মধ্যে যে দুগ্ধ হয় (colostrum)—তাহাতে মুখশোষ, তৃষ্ণাদাহ, এবং রক্তপিত্তজনিত জ্বর নষ্ট করে। তাহা লঘুপাক, বলকারক এবং চিনিযুক্ত হইলে রুচিকর।(৭) সন্তানিকা বা দুধের সর—ইহা গুরুপাক, শীতল, বীর্য্যকর, পিত্তরক্ত ও বায়ুরোগনাশক, তৃপ্তিকর, স্নিগ্ধ এবং কফনাশক।(৮) মথিত দুগ্ধ—দণ্ডমথিত গোদুগ্ধ এবং ছাগদুগ্ধ ঈষৎ উষ্ণ থাকিতেই পান করিবে। ইহা লঘুপাক, বীর্য্যকর, জ্বরনাশক, এবং বাতপিত্তকফনাশক। (৯) দুগ্ধফেন—সদ্যদুগ্ধ ফেন ত্রিদোষনাশক, রুচিকর এবং বলবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক, লঘুপাক, এবং পথ্য। অতিসারে, অগ্নিমান্দ্যে, জ্বরকালে এবং অজীর্ণে ইহা বিশেষ উপকারী।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

* তক্র—তক্রমধুরমম্লং কষায়াম্লরসমুষ্ণবীর্য্যং লঘু রুক্ষমগ্নিদীপনং * * হৃদ্যং * * মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমনং * * মস্থাদি পৃথকভূত স্নেহমর্দ্ধোদকন্তু যৎ। নাতি সান্দ্রদ্রবং তক্রং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে॥ যত্ত সস্নেহমজলং মথিতং ঘোলমুচ্যতে তক্রং নৈব ক্ষতে দদ্যাৎ নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে॥ * * শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ কফোত্থেষ্বাময়েষু চ। * * বায়ৌ তক্রং প্রশস্যতে॥ ১১॥ বাতেঽম্ল সৈন্ধবোপেতং স্বাদু পিত্তে সশর্করং॥

† দধিপিণ্ড—দধ্নাতক্রেণ বা নষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা। দ্রবভাগেন হীনং যৎ তক্রপিণ্ড স উচ্যতে পেযুষঞ্চ কিলাটশ্চ ক্ষীরসরং তথৈবচ। তক্রপিণ্ডইমেবৃষ্যা বৃংহণা বলবর্দ্ধনাঃ। গুর্ব্বঃ শ্লেষ্মনা হৃদ্যা বাতপিত্তবিনাশনাঃ। দীপ্তাগ্নিনাং বিনিদ্রানাং ব্যবায়েচাতিপূজিতঃ।

‡ মোরট—মুখশোষ, তৃষ্ণাদাহ-রক্তপিত্তজ্বর-ঘ্নণুৎ। লঘুর্বলকরো রুচ্যো মোরট স্যাৎ সিতাযুতঃ॥

রাজবংশীদিগের কথা

উত্তরবঙ্গে অনেক রাজবংশীর বাস। দার্জ্জিলিং জেলার পার্ব্বত্য অংশ ভিন্ন অন্যান্য স্থানে রাজবংশী ব্যতীত কোন হিন্দুজাতি নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশেও এইরূপ। জলপাইগুড়ির রায়কত বা রাজা রাজবংশী জাতীয়।

এই রাজবংশী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা কোচজাতীয় (কোচবিহারের রাজবংশ) বলিয়া রাজবংশী নাম ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এ মত ভ্রমাত্মক। কোচবিহারের রাজবংশ রাজবংশী নামে অভিহিত নহেন; যদি রাজপরিবার হইতে এ নামের উৎপত্তি হইত, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারাই রাজবংশী বলিয়া পরিচিত হইতেন। দ্বিতীয়তঃ কোচবিহারের রাজবংশ অথবা কোচজাতীয় অন্য কাহারও সহিত ইহাদের বিবাহাদি সম্পন্ন হয় না। কোচ এবং রাজবংশী জাতির উৎপত্তি যে এক তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মতান্তরে, পরশুরামের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য যে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ উত্তরবঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন রাজবংশীরা তাঁহাদেরই বংশধর। এ মতও ভ্রান্তিমূলক। উত্তরবঙ্গ ও নেপালে যেসকল রাজবংশীর বাস, তাহারা খর্ব্বাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ; ইহাদের অবয়ব ও অনুন্নত নাসিকা দেখিয়া বোধ হয়, ইহারা আর্য্যবংশসম্ভূত নহে। বিশেষতঃ ইহাদের বিবাহ ও দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি হিন্দুজাতির অতি নিম্নস্তরের উপযোগী বলিয়া মনে হয়। কার্য্যোপলক্ষ্যে দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার অনেক রাজবংশীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল; এই পরিচয়-

সূত্রে ইহাদের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

জলপাইগুড়ির উত্তরাংশে এক পরগণার নাম "আমবাড়ি ফালাকাটা।" এখানকার রাজবংশীদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটি দেবদেবীর পূজা প্রচলিত। প্রথম— "ফালাকাটা।" ইঁহার নামেই পরগণার নামকরণ হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমার এ দেবতার দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল। ফালাকাটা উচ্চ বেদীর উপর বসিয়া দক্ষিণ হস্তে গড়্‌গড়ার নল ধরিয়া সুখে ধূমপান করিতেছেন। বেদীর নিম্নে দুইটি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি; ইহারা মুখব্যাদানপূর্ব্বক ফালাকাটার দিকে তাকাইয়া আছে। চারিদিকে চারিজন প্রহরী বন্দুক ও তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান।

ফালাকাটা অপুত্রককে পুত্রদান ও রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া থাকেন; সুতরাং নানাস্থান হইতে বহুলোকে কপোত ও ছাগশিশু লইয়া বৎসরান্তে দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়। বৈশাখ ও আষাঢ় মাস পূজার কাল। একজন রাজবংশী পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। পূজা যেমনই হউক, বলির খুব ঘটা। ছাগবলির মন্ত্র এই :—

"বাঘে ভালুকে নদীয়া লালা (১) ঝাড়ে জঙ্গলে ইলুয়াই (২) কাশি (৩) চইলে (৪) যায় সে বলি ঘাসও খায় ঘাসও না খায়, সোনার বলি রূপার ধার,—(৫) সে বলি দিমু তোমার দুয়ার।"

পায়রা বলির মন্ত্র—

"হীরার বলি সোনার ধার, (৬) কবুতরের বলি তোমার দুয়ার। এই বলি হাত কর, "ফলনার" (৭) উপর ছত্র ধর (৮)।"

বলি এক কোপে কাটা হয় না, দা'এর দুই তিন "পোঁচে" জবাই করার মত কাটিয়া ফেলে।

ফালাকাটার পূজার মন্ত্র যথা—

"নম উগ্র (৯) নম শেষ, এই নামে পড়িছেৎ; হরিনাম, শ্রীহরিপ্রাসাদ (১১) ভোগ কর, ধরতির (১২) উপর আসন কর।(১৩)

এই মন্ত্র দুইবার উচ্চারণ করিয়া ফুল ও সোলার ফুল দিয়া পূজা করিতে হয়। বলির পূর্ব্বে ছাগ ও পারাবতকে স্নান করাইয়া কপালে সিন্দুর লেপন করিয়া থাকে। যে পূজা দেয়, বলির মাংস তাহারই প্রাপ্য, তবে পুরোহিতও বঞ্চিত হন না।

ফালাকাটা আমিষাশী বটেন, কিন্তু ফলাহারেও তাঁহার অরুচি নাই। "চুড়া দহি", কদলী, আতপ চাউল, দুগ্ধ এবং চিনিও দেবতার ভোগে লাগিয়া থাকে।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই ফালাকাটার পূজা চলিয়া আসিতেছে। আমি যখন দেবদর্শন করি, তখন যে পূজারী ছিল, শুনিয়াছি সে অষ্টাদশবর্ষ পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছে। পুরুষানুক্রমেই তাহার এ ব্যবসায়। যে জোতদারের গৃহে দেবতা প্রতিষ্ঠিত, তাহার পরিবারে বিবাহ উপলক্ষ্য ঘটিলে ফালাকাটার অঙ্গ-সংস্কার হয়, তখন তিনি নূতন করিয়া গঠিত হন। পূজা দিবসেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় দেবতা—"তিস্তাবুড়ী।" দন্তহীনা, যষ্টিহস্তে সম্মুখে অবনতা বৃদ্ধার মূর্ত্তি। ইনিও পুত্রদান, রোগোপশম এবং রোগনিবারণ করিয়া থাকেন। যাহাদের অবস্থা ভাল, কোন কামনা না থাকিলেও তাহারা ইঁহার পূজা দেয়। শনি মঙ্গলবারে দিবাভাগে পূজা হয়। সময় সময় মূর্ত্তিব্যতিরেকেও তিস্তাবুড়ীর পূজা হইতে দেখা যায়। পূজার মন্ত্র এই—

"ধরতি ফাটে শিত্‌লি পিত্‌লি, মহামায়া তিস্তাবুড়ী, তাহার তলে শুয়ে থাক।"

বলি ছাগ এবং পারাবত। তাহার মন্ত্র—

"মহামায়া শিত্‌লি পিত্‌লি মহামায়া তিস্তাবুড়ী, এই বলি হাত কর, ফলনার উপর ছত্র ধর। সোনারার তোমরা কি করছেন নিশ্চিন্ত বসে', পাঁচ বহিন তোমরা বলি লহ এসে।"

---

(১) নদীয়া লালা = নদীনালা। (২) ইলুয়াই = উলুখড়।
(৩) কাশি = কাশ, কেশে। (৪) চইলে = চলিয়া, চলে'।
(৫) রূপার ধার = যে অস্ত্রে কাটা যায় তাহারই ধারের উল্লেখ করা হইতেছে।
(৬) "হীরার বলি সোনার ধার," সুতরাং পায়রা বলি ছাগ বলি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।
(৭) ফলনা = এখানে যে পূজা দেয় তাহার নাম বলিতে হইবে।
(৮) "ছত্র ধর" অর্থাৎ রক্ষা কর।

(৯) নম উগ্র = অগ্রে নমঃ; নম উগ্র নম শেষ = অগ্রে নমস্কার, শেষে নমস্কার।
(১০) পড়িছেৎ = পরিচ্ছেদ, বিরাম।
(১১) শ্রীহরিপ্রসাদ = শ্রীহরির কৃপা।
(১২) ধরতির = ধরিত্রীর। (১৩) আসন কর = উপবেশন কর।

তৃতীয় দেবতা—"শালশিরি মহারাজা।" সাকার নিরাকার দুই ভাবেই ইঁহার পূজা হইতে পারে। সাকারে ইঁহার ধূমপানরত মনুষ্যমূর্ত্তি, নিকটে ব্যাঘ্র; প্রহরী না থাকিলেও চলে। দেখা যাইতেছে, ইঁহার সহিত ফালাকাটার অতি নিকট সম্পর্ক। জঙ্গলে কাঠ কাটিবার সময় এবং নদীতে কাঠ ভাসাইবার সময় শালশিরি মহারাজার পূজা হইয়া থাকে। যাহারা বনে গোরু মহিষ চরায়, তাহারাও শালশিরির পূজা করে। সময় সময় বিনা পুরোহিতেও পূজা হইয়া থাকে। পূজার দিন শনি মঙ্গলবার। পূজার মন্ত্র এই—

"ওহিন্দ গোবিন্দ, লীলবরণ চক্র, সূর্য্যরণ (বর্ণ) চক্র, দেবচক্র আসন কর; খাট বাট সিংহাসন, তাহারি উপর শালশির মহারাজা আসন কর, ফলুনার উপর ছত্র ধর।"

বলির মন্ত্র—

"সোনার বলি হীরার ধার, এই বলি গেল শালশিরি মহারাজা তোমার দুয়ার; এই বলি হাত কর, ভক্তের উপর ছত্র ধর।"

রাজবংশীদের মধ্যে পূর্ব্বে শিবোপাসনা প্রচলিত ছিল; "বাণফোড়া" রহিত হইবার পর শিবপূজা উঠিয়া গিয়াছে। সূর্য্যের কিংবা পর্ব্বতের উপাসনা প্রচলিত নাই। প্রধানতঃ ব্যাঘ্রভয় নিবারণের জন্যই বোধ হয় ফালাকাটা ও শালশিরির পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। তিস্তা উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান নদী; স্নান পান কৃষি বাণিজ্য সর্ব্বাংশেই হিতকারী, আবার বন্যার সময় অহিতকারীও বটে; এই কারণেই সম্ভবতঃ তিস্তাবুড়ীর পূজা প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

রাজবংশীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছে; ব্রাহ্মণেরা বিবাহে ও শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করিয়া থাকে; কখন কখন বিনা পুরোহিতেও এ সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। মৃত্যুর পর তৃতীয় এবং দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

যৌবন সঞ্চারের পর কন্যার বিবাহে আপত্তি নাই। বিবাহ সম্বন্ধে বয়সের কোন বাঁধাবাঁধি দেখিতে পাওয়া যায় না। বিবাহের পর বরের বাড়ীতে বরের পিতামাতা নবদম্পতির মস্তকে জল ছিটাইয়া দেয়, এবং বরকন্যা কন্যাকর্ত্তার গৃহে গমন করিলে সেখানেও কন্যার পিতামাতা এইরূপ জল ছিটায়। বরের পিতা পুত্রের এবং মাতা নববধূর ললাটে সিন্দূর লেপন করে। কন্যার পিতাকে বরপক্ষ হইতে শুল্ক দিতে হয়। গ্রাম্য পঞ্চায়ৎকে ভোজ দিলেই সম্বন্ধ পাকাপাকি হইল; এই ভোজের নাম "পণকাঠি"।

পত্নী ঋতুমতী বা গর্ভবতী হইলে কোন অনুষ্ঠান হয় না। প্রসবের সময় সঙ্গতিপন্ন লোকে ধাত্রী ডাকিয়া থাকে; দরিদ্রের গৃহে পরিবারস্থ লোকেই ধাত্রীর কার্য্য করে। প্রসবের পর "ফুল" পড়িলেই অযুগ্ম (পঞ্চম, সপ্তম, নবম অথবা একাদশ) দিবসে প্রসূতি শুচি হয় এবং স্নান করিয়া গৃহস্থিত তুলসীকে চাউল, চিনি, আদা ও দুগ্ধ ভোগ দেয়। কন্যার বিবাহে পয়সা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পুত্র সন্তান জন্মিলেই গৃহস্থের অধিক আনন্দ, কারণ পুত্রের দ্বারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ এবং বংশ রক্ষা হয়।

বিধবারা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারে। বিধবা-বিবাহ দুই প্রকারের—(১) "ডাঙ্গুয়া," (২) "ঘরঢুকি।" অবস্থাপন্ন বিধবারাই ডাঙ্গুয়া-বিবাহ করে, গরিবের পক্ষে সাধারণতঃ ঘরঢুকির ব্যবস্থা।

ডাঙ্গুয়া বিবাহে ঘটকেরাই সম্বন্ধ স্থির করে; কিন্তু কখন কখন পাত্র পাত্রী পরস্পর পরস্পরকে পূর্ব্বেই মনোনীত করিয়া চক্ষুলজ্জার অনুরোধে ঘটকের উপর নাম-মাত্র ভার দেয়। প্রধানতঃ বিপত্নীকেরাই "ডাঙ্গুয়া" হয়, কিন্তু সময় সময় অপ্রিয় ভার্য্যার স্বামী স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় এই পদ্ধতিতে বিবাহ করে। "গিরি"কে (জমীদার) এক হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত কর দিতে হয় এবং পঞ্চায়ৎকে ভোজ না দিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না।

ডাঙ্গুয়া বিবাহে জল ছিটান কিংবা সিন্দুর লেপনের ব্যবস্থা নাই। বিধবারা শাঁখা সিঁদুর পরে না, কিন্তু ডাঙ্গুয়া-বিবাহের পর শাঁখা পরিতে পায়। বিবাহের সময় বরকন্যা মুখোমুখী হইয়া বসে; বর একটা ছোট বেতের চুপ্‌ড়ি মন্ত্রপূত করিয়া দেয়, কনে' সেটা বরের মাথায় ছুঁড়িয়া মারে। ইহার পর "ইতরে জনাঃ" অর্থাৎ জ্ঞাতিবর্গের জন্য মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করিতে হয়। পত্নী সম্মত হইলে স্বামী তাহাকে নিজগৃহে লইয়া যাইতে পারে কিন্তু কিছুদিন পত্নীগৃহে স্বামীর বাস করা চাই। দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত পুত্রেরা পূর্ব্বস্বামীর পুত্রদিগের সহিত একত্র বিষয় ভোগ করিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর পুত্রেরা কম অংশ পায়—তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র চলিতে

পারে। তাহারা সকলেই ভাই বলিয়া গণ্য হয় এবং কালেক্টরিতে ডাঙ্গুয়া তাহাদের সকলেরই নামে নামজারি করাইয়া লয়। কে কত অংশ পাইবে, তাহা স্থির করিবার ভার পঞ্চায়তের উপর পড়ে। যদি ডাঙ্গুয়ার সন্তান না জন্মে, তবে পূর্ব্বস্বামীর পুত্রেরা তাহার শ্রাদ্ধাধিকারী হয়; পুত্র জন্মিলে সে "সংভাইদিগের" সহিত একত্র ডাঙ্গুয়ার শ্রাদ্ধ করে। সাধারণতঃ ডাঙ্গুয়া-ভার্য্যা ডাঙ্গুয়ার ভরণ-পোষণ করিতে বাধ্য; কিন্তু পত্নীর বিষয় উভয়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হইলে ডাঙ্গুয়াকে কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে হয়। ইচ্ছা করিলে ডাঙ্গুয়া পত্নী ডাঙ্গুয়াকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ডাঙ্গুয়া গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু এরূপ ঘটনা বিরল। ডাঙ্গুয়াকে সমাজস্থ লোকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, কিন্তু সামাজিক হিসাবে তাহার অন্য কোন ক্ষতি হয় না। হীনাবস্থ পুরুষেই ডাঙ্গুয়া হয়, অবস্থাপন্ন লোকে এ বিবাহ করে না।

সম্ভ্রান্ত রাজবংশীরা ডাঙ্গুয়ার কন্যাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করে না; এরূপ কন্যা সমাজের মুরুব্বিদিগের মতে অপবিত্র, এবং তাহার পুত্র জন্মিলে সে পুত্র শ্রাদ্ধে সম্পূর্ণরূপে প্রশস্ত নহে। কন্যা সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা, কিন্তু ডাঙ্গুয়ার পুত্র বিবাহিত পুরুষের পুত্রের তুলনায় কোন অংশে হীন নহে; তাহার অবস্থা ভাল হইলে লোকে সমাদরপূর্ব্বক তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করে। নিজগৃহে ডাঙ্গুয়ার কন্যা অশ্রদ্ধার পাত্রী হয় না বটে, কিন্তু বাড়ীতে কোন্দল বাধিলে তাহার হীনতা সম্বন্ধে সকলে তাহাকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দেয়।

ঘরঢুকি বিবাহে ঘটকের প্রয়োজন হয় না; সাধারণতঃ হাটে বাজারে পাত্র পাত্রীই সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলে। এটা পূর্ণ মাত্রায় গন্ধর্ব্ব বিবাহ। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই "ঘরঢুকি" হইতে পারে। এরূপ বিবাহে পরিবারে কলঙ্ক স্পর্শে; যতদিন না পঞ্চায়ৎকে ভোজ দেওয়া যায় ততদিন কেহই ঘরঢুকি স্ত্রীর স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করে না। কিন্তু তাহাকে লইয়া পংক্তিভোজনে বসিতে বাধা নাই। রাজবংশী সমাজে পঞ্চায়ৎ হজ্‌মি-গুলি! তাঁহাদের উদর পূর্ণ করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই।

কুমারীরাও ঘরঢুকি হইতে পারে; মনোনয়নের পর যথারীতি বিবাহ সম্পন্ন হয়। ঘরঢুকি কুমারীকে লোকে কিন্তু কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে। সন্তান জন্মিবার পর ঘরঢুকির বিবাহ হইতে পারে, এমন কি কন্যার বিবাহের পরেও হইয়া থাকে; তবে এ ক্ষেত্রে অসুবিধা এই যে ঘরঢুকি জননী কন্যার বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পায় না, জলছিটান বা সিন্দূর লেপনের অধিকারিণী হয় না; এ সকল কার্য্য পরিবারস্থ অন্য স্ত্রীলোকে করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ঘরঢুকি স্ত্রীলোকেরা কন্যার শুল্ক আদায় করিয়া লইয়া নিজেরা বিবাহিত হয় পরে কন্যার বিবাহ দেয়। সম্ভ্রান্ত লোকেরা এরূপ কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেয় না বটে, কিন্তু কন্যা জন্মিবার পর মাতার বিবাহ হইলে কন্যার তাহাতে কলঙ্ক নাই। ঘরঢুকি বিবাহে বেতের চুপড়ি নিক্ষেপ করিবার প্রথা নাই। ঘরঢুকি রমণী শাঁখা পরিতে পায়। পাত্র পাত্রী মনোনয়নের দশ পোনর বৎসর পরে, এমন কি তাহাদের বৃদ্ধাবস্থায় পর্য্যন্ত ঘরঢুকি বিবাহ হইতে পারে। যখন কন্যা বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভ ঘটে, তখন ঘরঢুকিরা নিজেদের বিবাহ সমাধা করিয়া কন্যার বিবাহের উদ্‌যোগ করে, কারণ নিজের বিবাহ না হইলে তনয়ার পরিণয়ে মাতা জলছিটাইতে ও সিন্দূর লেপন করিতে পাইবে না। শুভ ব্যাপারে এ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে কেহই ইচ্ছা করে না। কখন কখন ঘরঢুকি স্ত্রী পুরুষ ঋণ করিয়া বিবাহ করে, এবং কন্যার বিবাহ দিয়া ঋণ শোধ দেয়।

পরিণীতা পত্নী এবং ঘরঢুকি স্ত্রী উভয়ের পুত্রেরাই পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী, সকলেই বিষয়ের সমান অংশ পায়। কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রাদ্ধ করিবে, এমন বিধান নাই।

রাজবংশী সমাজে অবিবাহিতা বিধবার (অর্থাৎ যাহারা ঘরঢুকি কিংবা ডাঙ্গুয়া-পত্নী নহে) পরিমাণ প্রায় ছয় আনা; বাকী দশ আনা বিবাহিত। ডাঙ্গুয়া এবং ঘরঢুকি প্রণালীর বিবাহে লোকের প্রবৃত্তি নাকি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কন্যাবিক্রয় প্রথা ইহার একটি প্রধান কারণ। পূর্ব্বে কন্যার শুল্ক অল্প ছিল, এখন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে; দরিদ্র পিতামাতাও ১০০৲ অথবা ১২০৲ টাকা না পাইলে মেয়ের বিবাহ দিতে রাজি হয়

না। মূল্যাধিক্য বশতঃ লোকে কুমারী বিবাহ করিতে অশক্ত হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং ঘরঢুকির সংখ্যা বাড়িতেছে। এদিকে বাপ মা বেশি পয়সা না পাইলে মেয়ে ছাড়িবে না, গতিকেই মেয়ে বয়স্থা হইয়া অবশেষে নিজের পথ দেখে—ঘরঢুকি হয়।

কুমারীদের মধ্যে ছয় আনা রকম ঘরঢুকি। অবশ্য পরে ইহাদের যথারীতি বিবাহ হয়, কিন্তু এ বিবাহে কন্যার পিতামাতা যোগ দেয় না। বরের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা জলছিটান ও সিন্দুর লেপনের কার্য্য করে। পাত্রীর পিতামাতা শুল্ক পায় না, তবে সময় সময় মেয়ে যে গহনা লইয়া যায় তাহারই মূল্য স্বরূপ কিঞ্চিৎ আদায় করিয়া লয়। মেয়ে ঘরঢুকি হইলে বাপ মায়ের বড় লোকসান! আমাদের সমাজে পিতৃকুলের অর্থলালসা যেরূপ বলবতী হইয়া উঠিয়াছে, এখন ছেলেরা ঘরঢুকি হইতে না শিখিলে সমাজের মঙ্গল নাই! আদর্শটি মন্দ কি!

আমার সঙ্গে এক জোতদারের পরিচয় ছিল, তাহার কন্যা কুমারী অবস্থায় ঘরঢুকি হইয়াছিল। জোতদার মেয়েকে ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই; ঘরঢুকি-যুগল জলপাইগুড়িতে যাইয়া আদালতের আশ্রয় লয়।

রাজবংশী সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ একটা লেখাপড়া হইয়া বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়। যাহাতে এ সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য না হয়, তজ্জন্য কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেওয়ারও রীতি আছে। বিচ্ছেদের পর স্ত্রী ঘরঢুকি হইতে কিংবা ডাঙ্গুয়া রাখিতে পারে। স্ত্রীলোকে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশ্যে বড় একটা বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে না। স্বামীর সহিত বনিবনাও না হইলে পলাইয়া ঘরঢুকি হইতে বা ডাঙ্গুয়া প্রণালীতে পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারে। এ রূপ স্থলে বিবাহের সময় যে শুল্ক দিতে হইয়াছিল তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্বামীকে পূর্ণ মূল্য বা তদপেক্ষা অল্প অর্থদান করিতে হয়।

মোটামুটি রাজবংশীদিগের ধর্ম্ম ও সমাজ এইরূপ।

শ্রীআশুতোষ বাগচী।

বঙ্গবিভাগের শিক্ষা

বিধাতার ইচ্ছায় এত দিনে ছিন্নবঙ্গ পুনরায় মিলিত হইল। আবার দেশজননী জন্মভূমির জয়ধ্বনিতে বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। লর্ড কার্জ্জন একদিন ময়মনসিংহের মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার একটি কলমের আঘাতে আমাদিগকে আসাম প্রদেশের শাসনাধীন করিতে পারেন বলিয়া রক্তচক্ষু দেখাইয়া যে শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এত দিনে তাহার সম্যক্ পরীক্ষা হইল।

বিধাতার ইচ্ছা ভিন্ন কোন বৃক্ষের একটি শুষ্ক পত্রও ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। বঙ্গভঙ্গ এবং ছিন্নবঙ্গের পুনঃসংযোজন ইহার কোনটিই বিধাতার ইচ্ছা ভিন্ন সংঘটিত হয় নাই, হইতে পারিত না, একথাও যেমন সত্য বলিয়া জানি এবং মানি, আবার এই বিরাট এবং বিস্ময়জনক ব্যাপারের কোন কিছুই নিরর্থক হয় নাই কিংবা হইতেছে না, তাহাও তেমনি জানি এবং মানি। এ ব্যাপারে রাজা প্রজা, স্বদেশী বিদেশী, হিন্দু মোসলমান, বাঙ্গালী ভারতবাসী, পূর্ব্ববঙ্গবাসী, পশ্চিমবঙ্গবাসী,—প্রত্যেকের এবং সকলেরই শিক্ষণীয় বহু বিষয় আছে। এবং সেইসকল অসামান্য শিক্ষাদানের মহদভিপ্রায়েই মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই কয় বৎসরে কত কাণ্ড সংঘটিত করিলেন। ভরসা করি, এই অনন্যসাধারণ অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারের ইতিহাস এবং শিক্ষা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কদাচ বিস্মৃত হইবেন না।

এ ব্যাপারের সূচনার মধ্যভাগে, এবং অধুনা এই উপসংহার কালেও অনেকে লর্ড কার্জ্জনকে নিন্দা করিয়া-ছেন। আমরা কিন্তু লর্ড কার্জ্জনকে কোন দোষ দিতে এখন আর ইচ্ছা করি না। লর্ড কার্জ্জন কেবল একটা উপলক্ষ্য মাত্র,—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা সাধনের একটা সামান্য উপকরণ বা ক্রীড়নক মাত্র, এ বিরাট বিশ্বরঙ্গমঞ্চের বিধিনির্দ্দিষ্ট পন্থানুসরণকারী তিনি একজন সামান্য পথিক কিংবা অভিনেতা মাত্র। রামায়ণে মুখরা মন্থরার যেরূপ অত্যাবশ্যকতা, মহাভারতে মাতুল শকুনির যতটুকু প্রয়ো-জনীয়তা, এই কলির একপঞ্চাশৎ শতাব্দীর বঙ্গভঙ্গরূপ

বিরাট ব্যাপারে লর্ড কার্জ্জনেরও সেইরূপ আবশ্যকতা ছিল। এবং সেজন্য স্বয়ং বিধাতা তাঁহাকে ক্ষেত্র ও যথোচিত বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তি দিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন আমাদের ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীদের হিতাকাঙ্ক্ষী না হইতে পারেন কিংবা নহেন, কিন্তু তিনি যে অনিচ্ছাতেও ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদের একজন অনন্যসাধারণ হিতকারী বন্ধু, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বঙ্গবিভাগের প্রচণ্ড আঘাতেই এ দেশের সকল স্তরের জনসমাজের মোহনিদ্রা অপসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্গবিভাগের পরই এদেশে নানাপ্রকারে নবজাগরণের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। বঙ্গবিভাগেই "বিদেশী বর্জ্জন" বয়কটের উৎপত্তি, বয়কটেই "স্বদেশীর" উদ্ভব, স্বদেশীতেই আবার এদেশে স্বদেশীয় বিদেশীয়—নানা বন্ধুরূপধারী ব্যক্তির স্বরূপ সুপ্রকাশিত সুব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের শত্রু মিত্র, ভাই বন্ধুর প্রকৃত পরিচয় পাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। এই বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবের পরই এদেশবাসী দেশমাতার সন্দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, দেশজননীর চিন্ময়ীরূপ দর্শন করিয়া জননীকে এতকাল পরে চিনিতে পারিয়া চরিতার্থ হইয়াছে, অমৃতের আস্বাদ ও অধিকার লাভের আশায় অস্থির হইয়াছে। সুতরাং আমাদের এমন শিক্ষাগুরু আর দ্বিতীয় পাই নাই, সহজে এমন আর মিলিবেও মনে হয় না। এমন সুহৃদকে কেহ ভুলিতে পারে কি?

এব্যাপারে পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকদিগের শিক্ষণীয় বিষয় কি কি আছে সে সম্বন্ধেই সর্ব্বাগ্রে কিছু আলোচনা করিব। বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিমাত্রেই বাঙ্গালী; কিন্তু নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুরশিদাবাদের বাঙ্গালীগণ খাস বাঙ্গালার অপর সকল জেলার লোককেই মনে মনে, অনেকে প্রকাশ্যেও, "বাঙ্গাল" বলিয়া চিরদিন উপহাস করিতেন। সুতরাং বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রঙ্গপুর, রাজসাহী প্রভৃতি পূর্ব্বোত্তরবঙ্গের সকল জেলার লোক, এমন কি খুলনা যশোহর প্রভৃতি মধ্যবঙ্গের বাঙ্গালীগণও পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের নিকট বাঙ্গাল বলিয়া চিরদিন ঘৃণিত, অবজ্ঞাত, উপহসিত হইতেন। বাঙ্গালেরা সরলবিশ্বাসী, অপরিণামদর্শী, কোপনস্বভাব, হঠকারী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া চতুর চটুল সমাজে নিন্দিত হইতেন। "বাঙ্গাল দেশ" আয়তন, লোকসংখ্যা, ধনসমৃদ্ধি, উর্ব্বরতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, নদনদীর প্রাচুর্য্য, ব্যবসাবাণিজ্যের সুখসুবিধা প্রভৃতি বহু বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা প্রভৃতির উত্তীর্ণ বালকের তালিকায় পূর্ব্বোত্তরবঙ্গের কৃতীছাত্রের সংখ্যাও সামান্য নহে। ক্রিয়াকর্ম্মে, দানশৌণ্ডতায় "বাঙ্গাল" দেশের তুলনা অন্যত্র দুর্লভ। বঙ্গদেশের গৌরবমণি বলিয়া বিক্রমপুর সর্ব্বত্র সুবিদিত। একদিন বাঙ্গালীর সুহৃদ লর্ড কার্জ্জন বিদ্বেষবিদগ্ধহৃদয়ে বাঙ্গালী জাতির বিষয়ে বলিতে গিয়া এই বিক্রমপুরের গৌরবের কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আনন্দমোহন, শিশিরকুমার, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, মনোমোহন, লালমোহন, শীতলাকান্ত, দুর্গামোহন, কালীমোহন, গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারকানাথ, মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ, বিজয়রত্ন, গুডিভ চক্রবর্ত্তী, প্রসন্নকুমার রায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র, আশুতোষ, অম্বিকাচরণ, চিত্তরঞ্জন, ব্রজেন্দ্রকিশোর, কৃষ্ণকুমার, শ্যামাকান্ত প্রভৃতির জন্মভূমি হইয়াও পূর্ব্বোত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের "ভ্রাতাদের" নিকট এতদিন নিন্দিত, ঘৃণিত ও উপহসিত হইয়া আসিতেছিল। দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি বঙ্গের সুরসিক নাট্যকারেরা অভিনয়ের মধ্যে রঙ্গরসের অবতারণা করিতে হইলেই একজন উড়িয়া কিংবা "বাঙ্গালের" আমদানি করিতেন। ইহা কি আত্মীয়তার চিহ্ন? না ইহা প্রেমের লক্ষণ? মুখে সৌভ্রাত্রের কথা এক আধবার বলিলেই প্রকৃত সৌভ্রাত্র সংস্থাপিত কিংবা সুরক্ষিত হইতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গকে বাদ দিলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ কত ক্ষুদ্র, কত দরিদ্র, কত শক্তিহীন, তাহা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই এই কয় বৎসরে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, কোন দ্রব্যের অভাব না হইলে অনেকে তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। পূর্ব্বোত্তরবঙ্গকে কিছু দিনের জন্য হারাইয়া ভরসাকরি পশ্চিমবঙ্গ অতঃপর তাহার প্রকৃত সমাদর করিতে শিখিলেন।

অপর দিকে পূর্ব্বোত্তরবঙ্গের বহু লোকেই পশ্চিমবঙ্গের লোকদিগকে মিথ্যাবাদী, খলস্বভাব, প্রতারক, ভ্রষ্টাচার, স্বার্থসর্ব্বস্ব, ধূর্ত্ত বলিয়াই মনে ভাবিতেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অক্ষয়কুমার, স্বর্ণময়ী, তারক প্রামাণিক, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় অসংখ্য নরনারীর কথা সুবিদিত থাকিলেও পূর্ব্বোত্তরবঙ্গের বহু লোকের নিকট পশ্চিমবঙ্গ ভয় অবিশ্বাস এবং ঘৃণারই আশ্রয়স্থল ছিল। ইহাও কখন সৌভ্রাত্রের লক্ষণ নহে। প্রেম কিংবা সৌভ্রাত্র কখনও এরূপ জলবায়ুতে জন্মিতে কিংবা প্রবর্দ্ধিত হইতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের সহিত এই কতিপয় বৎসর রাজাদেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ব্বোত্তরবঙ্গও নিজের দুঃখ, দৈন্য, দুর্ব্বলতা - অভাব অসুবিধার কথা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছে। বঙ্গসমাজ-দেহের পশ্চিমবঙ্গই যে শীর্ষস্থানীয়, তাহা দুর্দ্দিনে পড়িয়াই পূর্ব্বোত্তরবঙ্গ প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। চতুরতা যে সকল সময়েই নিন্দনীয় নহে, বুদ্ধিকৌশল যে মনুষ্যের বিধিদত্ত অত্যাবশ্যক অমূল্য বৈভব এবং বহু পরিমাণে সুখ ও সম্মানের সম্বর্দ্ধক, তাহা পূর্ব্বোত্তরবঙ্গ ভালমতে জানিতে পারিয়া আজ পশ্চিমবঙ্গকে অধিকতর প্রীতি ও অনুরাগের সহিত সম্বর্দ্ধনা করিতেছে। অপর দিকে অম্বিকাচরণ, আনন্দচন্দ্র এবং অনাথবন্ধু আজ তাই দেশের সর্ব্বত্র অদৃষ্টপূর্ব্ব আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইতেছেন। ভরসা করি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং মধ্যবঙ্গ অতঃপর সকল প্রকার ভেদবৈষম্য ও বিদ্বেষবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া, প্রত্যেকে এবং সকলে মিলিয়া জননীজন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিতে যত্নপরায়ণ হইবেন।

তারপর, এ ব্যাপারে হিন্দু ও মোসলমানের শিক্ষার কথাই সর্ব্বাগ্রে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। পশ্চিমবঙ্গের মোসলমানসমাজ পূর্ব্ববঙ্গের মোসলমানদিগকে হারাইয়া নিতান্ত দুর্ব্বল শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতি অল্প কএকদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের মোসলমানসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ বর্দ্ধমানে সম্মিলিত হইয়া যে ভাবে আপনাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গবিভাগ জন্য তাঁহাদের যে বিশেষ শক্তির অপচয় হইয়াছে এবং অসুবিধায় পড়িয়া তাঁহারা বিষাদিত ছিলেন তাহাই সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত-জনবহুল মোসলমানসমাজ কএকটি অল্পবুদ্ধি অদূরদর্শী নেতার স্বার্থপূর্ণ প্ররোচনায়, শুধু তাহাদের স্বধর্ম্মাশ্রিত জনমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্যের বলে এবং বৈদেশিক রাজপুরুষগণের সাহায্যে, হিন্দুগণের সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়াও, সুখ ও সম্মান সুবিধার সহিত জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারিবেন, দিন দিন অধিকতর উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন, এরূপ মনে ভাবিতেছিলেন। তাঁহাদের সে ধারণা যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ তাহা এতদিনে তাঁহারাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। কতকগুলি স্বার্থান্ধ দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় তাঁহারা কতই জল্পনা কল্পনা করিয়া দেখিলেন। পরমপ্রীতিভাজন প্রতিবেশী জ্যেষ্ঠসহোদরতুল্য হিন্দুগণের মনে নিদারুণ শেলাঘাত করিয়া, এমন কি কোন কোন স্থলে অমানুষিক পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়া সমগ্র দেশকে ভীত ও উদ্বেলিত করিতেও কোন কোন স্থানের অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মোসলমান পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু এত দিনে নানা পরীক্ষায় তাহারা আপনাদের ও হিন্দুদের—উভয় পক্ষের শক্তির সম্যক্ পরিচয়লাভ করিয়াছে। দেশের সামান্য অশিক্ষিত মোসলমানেরাও রহস্য এখন আপন আপন মনে অনুমান করিয়া লইয়া এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছে। হিন্দু সমাজকে নির্য্যাতন করিয়া কিংবা অসন্তুষ্ট রাখিয়া ত দূরের কথা, এমন কি উপেক্ষা করিয়াও এ দেশের মোসলমানেরা কেবলমাত্র বিদেশীয় রাজপুরুষগণের অত্যধিক অনুগ্রহে ও সাহায্যে কিংবা শুধু আত্মশক্তির বলে এ দেশে জয়ী হইতে পারিবেন না, এ কথা এখন সে সমাজের বহু ব্যক্তিই বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচার কিরূপ অত্যাবশ্যক, এ দেশের উচ্চস্তরের শিক্ষিত হিন্দুগণও এ ব্যাপারে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। অজ্ঞানতায় ও কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকাতেই ময়মনসিংহের মোসলমানদের মধ্যে "লাল ইস্তাহার" (The Red Pamphlet) তেমন ভীষণ আগুন জ্বালাইতে পারিয়াছিল। অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসমাজে বাস সসর্পগৃহে বাসের

ন্যায় কেমন ভীষণ এবং উদ্বেগকর পূর্ব্বোত্তরবঙ্গের হিন্দুগণ এই কয় বৎসরের কএকটী শোচনীয় বীভৎস ব্যাপারে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। মহামতি গোখলে মহোদয়ের প্রস্তাবিত সার্ব্বজনীন শিক্ষাবিষয়ক বিধি, ভরসা করি এসব কথা চিন্তা করিয়া ভারতের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিই সাদরে সমর্থন করিবেন। ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে সম্রাট মহোদয় যে প্রকার অনুরাগের নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিব। এবং আমাদের রাজভক্তি প্রকাশের এই এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে —আমাদের ছোট বড় ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকল শিক্ষিত লোকেরই উচিত দেশে অবাধ সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করা।

মহামতি সার সৈয়দ আহমদ সাহেব ভারতবর্ষকে একটী পরম সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত তুলনা করিয়া এদেশের হিন্দু এবং মোসলমান সমাজকে তাঁহার দুইটি নেত্রস্বরূপ অমূল্য নিধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যোগ্য কথাই বটে। ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মোসলমান, উভয়েরই একের মঙ্গলে অপরের মঙ্গল, একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, একের অবনতিতে অপরেরও অবনতি, একের সৌন্দর্য্যে, অপরের সৌন্দর্য্য, একের অনিষ্টে অপরের অনিষ্ট, একের অঙ্গহানিতে অপরের অঙ্গহানি, এমন কি জীবনাশঙ্কা। ভারতবর্ষে হিন্দুকে বাদ দিয়া মোসলমানের, কিংবা মোসলমানকে বাদ দিয়া হিন্দুর রাজনৈতিক কোন স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে না। তাই আজ মাননীয় মোসলমান সমাজপতি আগা খাঁ সাহেব অনাহূত হইয়াও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলকামনা করিয়া দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুরের নিকট পঞ্চ সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন, আবার তাই অপর দিকে দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর মোসলমান বিশ্ববিদ্যালয় ভাণ্ডারে বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। এ সবই নবযুগের সুসময়ের শুভ চিহ্ন। কোন কোন স্বার্থান্ধ নীচাশয় ব্যক্তি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া দুঃসহ হিংসা-বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে, হইবার কথাও বটে। কিন্তু স্বদেশহিতৈষী বুদ্ধিমান সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া অতিমাত্র প্রীত ও আনন্দিত হইয়াছেন, এবং ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞহৃদয়ে অসংখ্য অভিবাদন করিতেছেন।

এত দিন এদেশের নিম্নস্তরের অসংখ্য হিন্দু নরনারীর প্রতি উচ্চস্তরের হিন্দুগণের ব্যবহারও যে ন্যায়সঙ্গত হইতেছিল না, এবং তাহারা যে উচ্চস্তরের হিন্দুগণের পরমাত্মীয়, স্নেহ ও প্রীতিভাজন সুহৃদ—বিপদের বন্ধু, তাহাদের সুখসম্মান শান্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করা উচ্চস্তরের শক্তিশালী হিন্দুগণের যে অবশ্য কর্ত্তব্য,—এ সকল কথাও বঙ্গবিভাগের পরবর্ত্তী কয় বৎসরের নানা ব্যাপারে উচ্চস্তরের হিন্দুগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই আজ নানাস্থলে, সভাসমিতি ও সংবাদপত্রে তাহাদের সম্বন্ধে অন্ততঃ শ্রুতিমধুর নানা শুভ প্রস্তাব মধ্যে মধ্যে শ্রুত হইতেছে। তাহার ভাবী ফলও সমাজের পক্ষে শুভকর হইবে এরূপ আশা হইতেছে।

ছিন্নবঙ্গের পুনর্মিলনে সমগ্র ভারতবর্ষের লোকেরও শিক্ষার অনেক কথা আছে। ভারতে আজ ন্যায়ের জয়, সত্যের জয়, একতার জয়, একনিষ্ঠতার জয়, বিধিসঙ্গত আন্দোলনের জয়, প্রজা-শক্তির জয় দেখিয়া সকলেই বিস্মিত এবং পুলকিত হইয়াছেন। ভারতবাসী এ ব্যাপারের শিক্ষালাভ করিয়া এ সুফল দেখিয়া হৃদয়ে অতুলনীয় অননুভূতপূর্ব্ব বললাভ করিয়াছেন। এ শিক্ষার মূল্য সামান্য নহে। এতদিনে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির অস্তিত্ব প্রকৃত পক্ষে মহামহিমান্বিত প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ রাজেশ্বর কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল। একথা বলা বাহুল্য যে এতদ্দ্বারা রাজা কিংবা রাজজাতির মাহাত্ম্য এবং মহত্ত্ব কিছুমাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, বরং বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালী খুব শক্তিশালী জাতি, এমন কথা কোন বুদ্ধিমান ধর্ম্মভীরু বাঙ্গালী স্বপ্নেও মনে ভাবিতে পারেন না। ভগবান যেন অহংকারের এমন অতল সমুদ্রতলে নিমজ্জন হইতে বাঙ্গালীজাতিকে রক্ষা করেন। তবে বাঙ্গালীর বিন্দুমাত্রও শক্তি নাই, এমন মিথ্যা কথা বলিয়া যেসকল নীচাশয় লোক আমাদের উদয়োন্মুখী ক্ষুদ্র শক্তিকে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল করিতে চাহে, আমরা তাহাদিগকে আমাদের ঘোর শত্রু বলিয়াই মনে করি।

সর্ব্বদা মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করিতে করিতে তেমন সমৃদ্ধ শক্তিশালী লোককেও মানুষ জগতে অতি হীন ও নিস্তেজ করিয়া ফেলিতে পারে। স্বজাতীয়ের নিন্দাশ্রবণ এ কারণেই মহাপাপ বলিয়া লোকসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা বাঙ্গালীকে অন্তঃসারবিহীন, অপদার্থ, ভীরু, কাপুরুষ, স্বার্থ-সর্ব্বস্ব, তোষামোদ-পরায়ণ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া আনন্দবোধ করে, আমরা তাহাদিগকে ঘোর মিথ্যাবাদী এবং বাঙ্গালীজাতির শত্রু মনে করিয়া তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিতে ইচ্ছা করি না। সত্যের অনুরোধে একথা বলিলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না যে রাজার নিকট হইতে নিজেদের ন্যায্য অধিকার লাভ কবিতে বাঙ্গালীকে এই কয় বৎসর স্বীয় ক্ষুদ্র পুরুষকারের সাহায্যে অতি কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছে। ন্যায্য স্বত্ব রক্ষা করিতে হইলে কি প্রকার শক্তিক্ষয় ও সাধনা করিতে হয়, কি প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, কত গায়ের রক্ত জল করিতে হয়, কত অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে হয়, ভারতবাসী এ ব্যাপারে তাহার কতক পরিচয় পাইয়াছেন। কি সাধনা বলে ভগবানের কৃপাবারি বর্ষিত হইয়া দেশের স্তূপীকৃত মনস্তাপ, শত শত অত্যাচার অবিচারের দারুণ দাবানল প্রশমিত, দেশব্যাপী অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত হইল তাহা সকলেরই গভীরভাবে আলোচনার উপযুক্ত বিষয়। ভারতবাসী এ শিক্ষা কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

বিদেশীয় বণিককুলও এ ব্যাপারে সামান্য শিক্ষা লাভ করে নাই। ভারতবর্ষ তাঁহাদের কেমন অতুলনীয় দুর্লভ বিশাল বিপণিক্ষেত্র, কেমন অমূল্য কামধেনু, তাহা তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষীয় জনমণ্ডলীর ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হইলে বিদেশীয় বণিকবর্গের স্বার্থ নিমিষের মধ্যে কিপ্রকারে ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে পারে, এ ব্যাপারে তাঁহারা তাহার সুস্পষ্ট ভীষণ আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্যবসায়-বুদ্ধি এবং লোক-চরিত্রের রহস্য প্রভৃতির গূঢ় তত্ত্ব অবধারণে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা বহু গুণে অভিজ্ঞ, সুতরাং এ ব্যাপারে তাঁহারা যে কত কথা শিখিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, তাহা তাঁহারাই ভাল মতে বলিতে পারেন! সে অমোঘ শিক্ষাবলী তাঁহারা যে কস্মিনকালেও ভুলিবেন না, এ কথা নিশ্চয় রূপেই বলিতে পারি।

স্বদেশী বয়কট আন্দোলনে আমাদের স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে অনেক তথ্য—অনেক অমূল্যতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন। কিপ্রকারে স্বদেশী শিল্পের ও বাণিজ্যের সংরক্ষণ ও সমুন্নতি সাধিত হইতে পারে, স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির অন্তরায় বিঘ্ন বাধা কি, কে এবং কোথায় কিরূপে অনিষ্ট করিতেছে তাহাও বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে। আমাদের শক্তি, সুযোগ, বিঘ্নবাধা, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য প্রভৃতি নানা বিষয়েই এখন দেশের লোকের অভিজ্ঞতা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এত দিনে সমগ্র বঙ্গ পূর্ব্ববৎ এক এবং অখণ্ড হইতে চলিল। আর বিদেশী পণ্যদ্রব্যের প্রতি আমাদের বয়কট্ প্রযুক্ত হইবে না। কিন্তু তা বলিয়া স্বদেশীর অক্ষয় বট কদাচ বিলুপ্ত হইবে না, অথবা কেহ তাহাকে বিস্মৃতও হইবে না। অবশ্য আমরা অতঃপর আমাদের অতি প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য বাজারে স্বদেশজাত না পাইলে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে বিদেশী দ্রব্যও ক্রয় করিব কিন্তু তা বলিয়া "স্বদেশীকে" কেহ কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিব না, স্বদেশীকে সর্ব্বদাই গৌরবের সহিত সমাদর করিব। বন্দে মাতরং।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

রবীন্দ্র-মঙ্গল

১

হে মহান্! মহাপ্রাণ! বিশ্বপ্রেমে হে মহাপ্রেমিক!
হে রবীন্দ্র! উদয়ে তোমার
ঘুচিয়াছে এ বঙ্গের সূচীভেদ্য আঁধার অলীক;
জ্যোতিশ্ছটা খেলে চারিধার!
হের দেখ সারিসারি, জাগিয়াছে নরনারী;
আপনি প্রতিভা উষা লীলাময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী বালা,
তোমার শ্রীকণ্ঠে দেব পরায়েছে স্বয়ম্বর-মালা!

২

বসন্ত ছিলনা বঙ্গে ; হইত না বসন্ত-উৎসব ;
থাকি থাকি শ্যামা দিত শিস্ ;
মদ্না চন্দনা টিয়া করিত অস্ফুট কলরব ;
কপোত কূজিত অহর্নিশ !
বসন্তের প্রিয়পাখী, হে কোকিল, তুমি ডাকি,
বসন্তে আনিলে বঙ্গে !—পিকরাজ সারি সারি পিক
কুহরিছে কুঞ্জে কুঞ্জে ! কি উৎসব ! শিহরিছে দিক্ !

৩

কোন ভক্ত দিল বাণী-কমকণ্ঠে যূথিকার মালা ;
অলক্তে রঞ্জিল কেহ পদ ;
কোন ভক্ত দিল মার দুই ভুজে কাঁকণ উজালা ;
তবু মার ব্যর্থ মনোরথ !
আনি রক্ত শতদল, পারিজাত, নীলোৎপল,
তুমি যবে হে পূজারি, সাজাইলে মায়ের শ্রীঅঙ্গ,
উছলিল অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের কি লীলাতরঙ্গ !

৪

ছিল না, ছিল না এই পুণ্যকুঞ্জে উদ্বেল আনন্দ ;
বাজিত গো ঢোল আর কাঁসি ,
ভাব-গোপী-বৃন্দ মাঝে আসি তুমি, ঘুচাইয়া ধন্দ,
ফুকারিয়া বাজাইলে বাঁশী !
হে কাব্যের বংশীধর, শুনি সেই সুধাস্বর,
কবিতা-কালিন্দী মরি লীলারঙ্গে বহিল উজান !
ভাব-গোপী-বৃন্দ-হৃদে বহিল গো আনন্দ-তুফান !

৫

বহুদিন হে পূজারী, মন্দিরের দ্বার ছিল রুদ্ধ ;
তুমি আসি খুলিলে কপাট ;
আরম্ভিলা মহাপূজা কি আগ্রহে, হ'য়ে শুদ্ধ বুদ্ধ !
কি উৎসাহে ভাতিল ললাট !
লভি সে অপূর্ব্ব পূজা, সুপ্রসন্না শ্বেতভুজা,
দিলা তোমা কুহকিনী বীণা তাঁর, আনন্দ-ঝরণা,
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যার সারা বিশ্ব বিস্ময়ে মগনা !

৬

কুষ্ঠরোগগ্রস্তা মরি কোন এক অপূর্ব্ব সুন্দরী,
না পেয়ে পতির আলিঙ্গন,
থাকে যথা ম্রিয়মাণ, কাঁদে যথা গুমরি গুমরি,
বঙ্গভাষা করিত ক্রন্দন !
কোন্ মন্ত্রৌষধি দিয়া, অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া,
কোন্ রসায়ন-রসে, বৈদ্যরাজ, নবধন্বন্তরী,
করিলে এ সুন্দরীরে মরি মরি অনিন্দ্যসুন্দরী !

৭

হে বরেণ্য মহাকবি ! তাই মুগ্ধ সারাবঙ্গ আজি
রচিয়াছে স্বর্ণ সিংহাসন !
বাজিছে মঙ্গল শঙ্খ ! সাজাইয়া অর্ঘ্য পুষ্পরাজি,
চারিধারে পূজা-আয়োজন !
চারিধারে হুলুধ্বনি, আনন্দের রণরণি ;
রাজ-অভিষেক-বাদ্য বাজিতেছে হৃদয়-তোরণে ;
বোস বোস রাজেশ্বর, এ ভক্তের প্রাণ-সিংহাসনে !

৮

ধর শিরে হে নৃপতি ! যশের এ মুকুট উজ্জ্বল ;
পর কণ্ঠে মালিকা মধুর !
আজি একি মহোৎসব ! সারাবঙ্গ আনন্দে চঞ্চল,
কলকণ্ঠে ধরিয়াছে সুর !
সূর্য্যকান্ত মণি সম, মধ্যমণি অনুপম
তুমি আজি কি ভাস্বর !—ইন্দ্রনীলে, মুকুতা-ভূষণে,
ঝলকিছে চমকিছে সভা আজি রতনে রতনে ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ।

আলোচনা

ঋগ্বেদের একটি সূক্ত ।

[৩ অষ্টক (৪র্থ মণ্ডল), ৫৮ সূক্ত]

মাঘ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ৪।৫৮ সূক্তের প্রথম তিন ঋকের তিনটি নূতন অর্থ করিয়াছেন এবং ৪ ও ৫ ঋকের ৺রমেশ বাবুর অর্থ ঠিক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত অর্থ তিনটি যদি কেহ দোষযুক্ত মনে করে, তবে তাহাকে মন্তব্য লিখিবার জন্য বিজয়বাবু আহ্বান করিয়াছেন।

আমি এই ৫টি এবং অন্যান্য ঋকের অর্থ অন্যরূপ বুঝিয়াছি, নিম্নে ৫টি ঋকের অর্থ লিখিলাম—

সমুদ্রাদূর্ম্মির্মধুমান্ উদারদুপাংশুনাসমমৃতত্বমানট্।

ঘৃতস্য নাম গুহ্য যদস্তি জিহ্বা দেবানামমৃতস্য নাভিঃ ॥ ১

রমেশ বাবুর অর্থ—সমুদ্র হইতে মধুমান্ উর্ম্মি উদ্ভূত হয়। মনুষ্য কিরণ দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ঘৃতের যে গোপনীয় নাম আছে, উহা দেবগণের জিহ্বা এবং অমৃতের নাভি।

বিজয় বাবুর অর্থ—মধুযুক্ত ঘৃত সমুদ্র হইতে উর্ম্মি উঠিবার মত গোরুর পালান হইতে উদ্ভূত হয়; এবং উদ্ভূত হইবার সময়, উর্ম্মিতে যেমন কিরণ লাগে, তেমনি উহা মন্ত্র লাগিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। ঘৃতের যে গুহ্য জিহ্বা আছে, তাহাই দেবতাদের জিহ্বা; এবং উহা দ্বারা দেবতারা বাঁধা পড়েন।

আমার অর্থ—সমুদ্র হইতে যে মধুময় ঊর্দ্ধে গমনশীল (দীপ্তি) উদ্ভূত হয়, (তাহা) কিরণ দ্বারা সম্যক প্রকারে অমৃতত্ব বিস্তার করিয়া গমন করে। (এই) দীপ্তির জিহ্বা বা শিখার যে গুহা নাম আছে (তাহা) জ্যোতিষ্কদিগের ও কালের নাভি।

রমেশ বাবু ও বিজয়বাবুর অর্থ স্পষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের অর্থ দ্বারা ঋকের উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। সমুদ্র হইতে উর্ম্মি উদ্ভূত হয়, সত্য, কিন্তু তাহা মধুযুক্ত হয় না। গোরুর পালান হইতেও মধুযুক্ত ঘৃত সমুদ্রে উর্ম্মি উঠিবার মত উঠে না ইহা সকলেই জানেন। মনুষ্যঅর্থজ্ঞাপক কোন শব্দও এই ঋকে নাই। উদ্ভূত হইবার সময় মন্ত্র লাগিয়া ঘৃত অমৃতত্ব লাভ করে না, ঘৃতের জিহ্বাও নাই, সে জিহ্বা দ্বারা দেবতারা বাঁধাও পড়েন না। এরূপ অর্থ করিলে এই ঋকের সার্থকতা বুঝা যায় না।

এখানে উর্ম্মি অর্থ "ঊর্দ্ধে উত্থানশীল" হইবে। ঘৃত অর্থ "দীপ্তি" হইবে। দেবানাং অর্থ "জ্যোতিষ্কগণ।" উপাংশু অর্থ কিরণ। সমুদ্রাৎ অর্থ সায়ণের "তৎ লক্ষণাৎ গবাম্ উধসঃ" ঠিক নহে, সমুদ্রই হইবে।

বয়ংনামপ্রব্রবামাঘৃতস্যাস্মিন্যজ্ঞে ধারয়ামানমোভিঃ।

উপব্রহ্মাশৃণবচ্ছস্যমানং চতুঃ শৃঙ্গেঽবমীদ্গৌর এতৎ ॥ ২

রমেশ বাবুর অর্থ—আমরা ঘৃতের নাম স্তব করিব, এই যজ্ঞে নমস্কার দ্বারা উহা ধারণ করিব। ব্রহ্মণস্পতি এই স্তব শ্রবণ করুন। শৃঙ্গচতুষ্টয়বিশিষ্ট, গৌরবর্ণ দেবতা এই জগৎ নির্ব্বাহ করিতেছেন।

বিজয় বাবুর অর্থ—আমরা ঘৃতের নাম করি, এবং নমস্কার করিয়া উহা যজ্ঞের জন্য ধারণ করি। যাঁহাতে মন্ত্র বাস করেন, সেই মন্ত্রাধিষ্ঠিত ব্রহ্মাকে স্তব করি; তিনি শ্রবণ করেন। চতুর্দ্দিকে যাঁহার প্রভুত্ব, সেই গৌরবর্ণ দেব এইসকল পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছেন।

আমার অর্থ—আমরা এই দীপ্তির নাম করিব। এই যজ্ঞে অর্থাৎ কার্য্যে ইঁহাকে নমস্কার দ্বারা ধারণ করিব। স্তূয়মান ব্রহ্মসদৃশ ইনি শ্রবণ করুন। চারিটি-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট গৌরবর্ণ দেব এইসমস্ত পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছেন।

সায়ণ চারিটি শৃঙ্গকে বেদচতুষ্টয় বলিয়াছেন। শৃঙ্গ অর্থ মন্দিরের চূড়া, পর্ব্বতের শৃঙ্গ বা শিখর এবং প্রাধান্য বা প্রভুত্ব হয়, গোরুর শিংও হয়। এখানে শৃঙ্গ অর্থ স্থান বুঝিতে হইবে। উপব্রহ্মা অর্থ উপসদৃশ—ব্রহ্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম সদৃশ।

চত্বারিশৃঙ্গা ত্রয়ো অস্যপাদা দ্বেশীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য।

ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্যান্ আবিবেশ ॥ ৩

রমেশ বাবুর অর্থ—ইহার চারিটি শৃঙ্গ। ইহার তিনটি পাদ, দুইটি মস্তক, সাতটি হস্ত। ইনি অভীষ্টবর্ষী, ইনি তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া অত্যন্ত শব্দ করিতেছেন। মহতী দেবতা মর্ত্ত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

বিজয় বাবুর অর্থ—চারিদিক ইহার শাসন; ইনি ত্রিপাদে ত্রিসন্ধ্যা সৃষ্টি করেন, অহোরাত্রি ইহার দুইটি শির, সপ্ত কিরণ ইহার সপ্ত হস্ত, ইনি পৃথিবী ব্যোম এবং স্বর্গে বদ্ধ হইয়া আহুতি প্রার্থনায় শব্দ করিতেছেন। দেবশ্রেষ্ঠ পৃথিবীর লোকদিগের নিকট প্রবেশ করিতেছেন।

আমার অর্থ—ইঁহার চারিটি শৃঙ্গ, তিন পদ, দুই মস্তক, সাত হাত। তিন স্থানে বদ্ধ অভীষ্টবর্ষী মহান্ দেব শব্দ করিতে করিতে মর্ত্ত্যদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

এখানে, চারিটি শৃঙ্গ অর্থ—উত্তরায়নান্ত শৃঙ্গ, দক্ষিণায়ণারম্ভ শৃঙ্গ এবং দুই বিষুব শৃঙ্গ। বিষ্ণুপুরাণে তিনটি শৃঙ্গ ধরা হইয়াছে যথা—

যঃ শ্বেতস্যোত্তরঃ শৈলঃ শৃঙ্গবানিতি বিশ্রুতঃ।

ত্রীণি তস্য তু শৃঙ্গাণি যৈরসৌ শৃঙ্গবান্ স্মৃতঃ ॥ ৬৮

দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চৈব মধ্যং বৈষুবতং তথা।

শরদ্বসন্তয়োর্ম্মধ্যে তদ্ভানুঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৬৯

"শ্বেতবর্ষের উত্তরদিকে শৃঙ্গবান নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহার তিনটি শৃঙ্গ আছে; এই সকল শৃঙ্গের অস্তিত্বে এই পর্ব্বত শৃঙ্গবান নামে খ্যাত হইয়াছে। একটি শৃঙ্গ দক্ষিণে একটি উত্তরে এবং অপরটি মধ্যে; এই মধ্য শৃঙ্গটিই বৈষুবত। সূর্য্য শরৎ এবং বসন্তকালের মধ্যে সেই বৈষুবত শৃঙ্গে গমন করেন।" সূর্য্য প্রতিবৎসর একবার শরতকালে এবং একবার বসন্তকালে বিষুব রেখায় বা বৈষুবত শৃঙ্গে গমন করে, তজ্জন্য দুইটি বৈষুবত শৃঙ্গ ধরিয়া ঋকদ্রষ্টা ঋষি "চারিটি শৃঙ্গ" বলিয়াছেন। তিন পাদ অর্থ তিনটি গতি; সূর্য্য কর্কটক্রান্তি, বিষুবরেখা ও মকরক্রান্তিতে যায়, ইহাই তাহার তিন পদ। দুই মস্তক যথা—(১) উত্তরায়ণান্ত বিন্দু (২) দক্ষিণায়নান্ত বিন্দু। সপ্ত হস্ত অর্থাৎ সাতটি ঋতু। এই ঋক দৃষ্ট হইবার সময় এক বৎসরে তের মাস ও সাত ঋতু গণিত হইত। দীর্ঘতমা ঋষি ১ মণ্ডলের ১৬৭ সূক্তে বলিয়াছেন—

সাকংজানাং সপ্তথমাহুরেকজং ষলিদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।

তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রেরেজন্তেবিকৃতানিরূপশঃ ॥ ১৫

অর্থাৎ "(আদিত্যের) সহজন্মা (ঋতু) গণের মধ্যে সপ্তম কেবল একক; অন্য ছয় (ঋতু) যুগ্ম, গমনশীল ও দেব হইতে উৎপন্ন। এই (ঋতুগণ) সকলের ইষ্ট, স্থানভেদে পৃথক পৃথক স্থাপিত, এবং রূপভেদে বিবিধ-আকৃতি-বিশিষ্ট। উহারা আপনার অধিষ্ঠাতার জন্য পুনঃ পুনঃ ঘুরিতেছে," (রমেশবাবু)। বৈদিক কালে এক সময় সাত ঋতু গণিত হইত। এই ঋতু গণনা দ্বারা এই সূক্তটির সময় নির্ণয় করা যায়। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে ভয়ে গণনা দিলাম না। ত্রিধাবদ্ধ—অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি, বিষুবরেখা ও মকরক্রান্তিতে আবদ্ধ। সূর্য্য এই তিন স্থানের বাহিরে যাইতে পারে না।

ত্রিধাহিতং পণিভির্গুহ্যমানং গবির্দেবাসোঘৃতমম্ববিন্দন্।

ইন্দ্র একং সূর্য্য একং জজান বেনাদেকং স্বধয়ানিষ্টতক্ষুঃ ॥ ৪

রমেশ বাবুর অর্থ—পণিগণ, গো সমূহে তিন প্রকার দীপ্ত পদার্থ গোপনে নিহিত করিয়াছিল। দেবগণ তাহা লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র একটিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সূর্য্য একটিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। দেবগণ বেন হইতে অন্নদ্বারা আর একটি পদার্থ নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।

আমার অর্থ—অন্ধকার দ্বারা গুপ্ত কিরণে জ্যোতিষ্কগণ তিন প্রকারে হিতজনক দীপ্তি লাভ করিয়াছিল। এক ইন্দ্র অর্থাৎ সহস্রচক্ষুবিশিষ্ট রাত্রি, এক সূর্য্য (প্রভাতে) উৎপন্ন করিয়াছিল। গতি হইতে পিতৃলোকের এক ভোজ্যবস্তু অর্থাৎ চন্দ্রের জ্যোতি নিষ্পন্ন করিয়াছিল।

এখানে পণি অর্থ "অন্ধকার", গবি অর্থ "কিরণ বা রশ্মি", স্বধা অর্থ পিতৃলোকের ভোজ্যবস্তু। বেন অর্থ গতি।

এতা অর্ষন্ত্যিহৃদ্যাৎ সমুদ্রাচ্ছতব্রজা রিপুণানাবচক্ষে।
ঘৃতস্যধারা অভিচাকশীমিহিরণ্যয়োবেতসোমধ্য আসাম্ ॥ ৫

রমেশ বাবুর অর্থ—অপরিমিত-গতি-বিশিষ্ট এই জল হৃদয়প্রীতিকর অন্তরীক্ষ হইতে অধোদেশে পতিত হইতেছে। রিপু তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, সেইসকল ঘৃতধারা আমি দেখিতে পাইতেছি, ইঁহাদের মধ্যে হিরণ্ময় বেতসকে অর্থাৎ অগ্নিকে দেখিতে পাইতেছি।

আমার অর্থ—এই শতদিকে গমনশীল (দীপ্তি) অন্তরীক্ষ হইতে বাঞ্ছিত স্থানে গমন করিতেছে, অজ্ঞগণ দেখিতে পাইতেছে না। আমি ঐ দীপ্তির সাদৃশ্য দেখিতেছি (এবং) গমনশীল দীপ্তি মধ্যে হৃতবস্তু (অর্থাৎ সূর্য্যকে) দেখিতে পাইতেছি।

এখানে "শতব্রজা" অর্থ সায়ণের "অপরিমিত গতি" নহে, গৃহও নহে। শতদিকে গমনশীল অর্থাৎ সকল দিকেই যাহার গতি। হৃদ্যাৎ অর্থ বাঞ্ছিত স্থানে। রিপুণা অর্থ অজ্ঞগণ। হিরণ্য অর্থ হৃতবস্তু।

মন্তব্য—এই কয়েকটি ঋকে সূর্য্যের বিষয় লিখিত হইয়াছে। সমুদ্র হইতে উত্থিত এবং কিরণ দ্বারা পদার্থ সমূহে অমৃতত্ব প্রদান করে অর্থাৎ পালন করে। এই দীপ্তের জিহ্বার গুহ্যনাম আছে। সূর্য্যই এই গুহ্যনাম এবং জিহ্বা, কারণ সূর্য্য পৃথিবীর রস পান করিয়া মূল দীপ্তির জিহ্বার কার্য্য করে। এই সূর্য্যই জ্যোতিষ্কদিগের ও কালের নাভি। সূর্য্য সৌরজগৎ ও রাশিচক্রের নাভি। রাশিচক্র দ্বারা কালের পরিমাণ হয় সুতরাং সূর্য্য কালেরও নাভি। সূর্য্য উদয় হইল, এখন আমরা ইঁহাকে নমস্কার করিয়া দিনের কার্য্য করাইয়া লইব। চারিস্থানে-গতিবিশিষ্ট সূর্য্য এইসমস্ত পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছেন। বৎসররূপ যজ্ঞে সূর্য্য একবার উত্তরায়ণান্ত স্থানে, একবার দক্ষিণায়নান্ত স্থানে ও দুইবার বিষুবরেখায়, এইরূপে চারিস্থানে গমন করেন। ইহার এই গতিতে চারিটিস্থান ভ্রমণ করা হয়। ইনি কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি ও বিষুবরেখা এই তিন স্থানে ত্রিপাদ গমন করেন। দুই অয়নান্ত বিন্দু ইহার দুই মস্তক। সাত হাত অর্থ সাত ঋতু ইহাতে তেরটি মাস হয়। সূর্য্য কর্কটক্রান্তি, বিষুবরেখা ও মকরক্রান্তি এই তিন স্থানেই আবদ্ধ থাকে, তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। এ হেন সূর্য্যদেব উদয় হইয়া সমুদ্র হইতে উঠিয়া মর্ত্ত্যধামে প্রবেশ করিতেছেন। সন্ধ্যার সময় যখন ইনি অন্ধকার দ্বারা গুপ্ত হন অর্থাৎ অস্ত যান, তখন জ্যোতিষ্কগণ তিন প্রকারে এই গুপ্ত দীপ্তি লাভ করে। আকাশে নক্ষত্রগণ তখন জন্মে অর্থাৎ দীপ্তি পাইয়া ফুটিয়া উঠে, প্রভাতে সূর্য্য জন্মে অর্থাৎ অন্ধকার ভেদ করিয়া উদয় হয় এবং গতিবিশিষ্ট ঐ দীপ্তি হইতে চন্দ্র জ্যোতি পায়। চন্দ্রের জ্যোতির হ্রাস বৃদ্ধি আছে, তাই গতিবিশিষ্ট দীপ্তি হইতে জ্যোতি পায় বলা হইয়াছে। এই শতদিকে গমনশীল দীপ্তিযুক্ত সূর্য্য অন্তরীক্ষ হইতে বাঞ্ছিত স্থানে অর্থাৎ অপর আকাশে গমন করিতেছে। অজ্ঞগণ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। আমি ঐ দীপ্তির সাদৃশ্য দেখিতেছি। গ্রহ চন্দ্র ইত্যাদিতে এবং তৎসাহায্যে সূর্য্যকে (অন্ধকার দ্বারা হৃত হইলেও) দেখিতে পাইতেছি।

সমুদ্রতট হইতে সূর্য্যোদয় দেখিয়া এই ঋক রচিত হইয়াছে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

৺সীতানাথ ঘোষ।

মাঘ মাসের প্রবাসীতে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি' নামক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক ৺সীতানাথ ঘোষ মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (প্রবাসী, ১১শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৩৮৮)। ৺সীতানাথ বাবু, যশোহরের অন্তর্গত রায়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি ব্যতীত তিনি "Medical Magnetism" নামক একখানি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পুস্তকখানিতে, আত্মপরিচয় দিবার সময়, তিনি নিজেকে "Founder of Electropathy,—Magnetic System of Treatment in India" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তক যখন যন্ত্রস্থ, তখনই তিনি দেহত্যাগ করেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় সীতানাথ বাবুর ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন, "The subject of the proper position of the head of a man in the bed which has at present engaged the attention of eminent electricians has been discussed at length by Babu Sitanath Ghosh and he has proved by reasoning based solely upon experiments the futility of the theory laid down by Dr. Baron Von Richenbach of Germany". ৺সীতানাথ বাবুর গ্রন্থের উদ্দেশ্য উদ্ধৃত লাইন কয়টী হইতে বোধগম্য হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র বাবু প্রবাসীতে যে "নূতন যন্ত্রের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই যন্ত্র তাঁহার বাড়ীতে দুইটী আছে, দুঃখের বিষয় কোনটীই ভাল অবস্থায় নাই।

বারান্তরে আমরা ৺সীতানাথ বাবুর বিস্তৃত জীবনী পাঠাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

পৌষ-সংক্রান্তি।

উৎসবের ব্যাপকতা।

সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী পৌষ সংক্রান্তি উৎসবের স্থানবিশেষের বিবরণ সহ সেকালের পল্লী-কবির ছড়াগুলি "প্রবাসী"তে লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত উৎসবের ব্যাপকতা এবং ঐ ছড়াগুলি সংগ্রহের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাস্তবিকই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মাঘমাসের প্রবাসীতে আরও কয়েকটি স্থানের "ছড়া" সহ উৎসব-বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয় বিবৃত করিয়া তৎসংক্রান্ত ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা দেখিয়াছেন, ইহা প্রশংসনীয়।

ত্রিপুরা, ময়মনসিং ও শ্রীহট্টের পল্লী মধ্যেও ঐ উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে, "উত্তরায়ণ" সংক্রান্তি আসিতেছে একথা বলিলেই প্রায় সকলে পৌষ-সংক্রান্তির উৎসবই বুঝিয়া থাকে। পৌষ-সংক্রান্তি দিনে অরুণোদয়ের প্রাক্কালেই দলে দলে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা স্নান করিয়া উচ্চ কণ্ঠে সুর তুলিয়া বার বার নিম্নলিখিত ছড়াগুলি বলিতে থাকে।

যে না বোলে হরি হরি
তার গলায় যমের দড়ি
হরি বোল হরি
রাম তুলসী গঙ্গাজল
সর্ব্ব লোকে হরি বোল।

তৎপর দলে দলে সংকীর্ত্তন হইতে থাকে, এদিকে মহিলাগণ নানা প্রকারে পিষ্টক ও মিষ্টান্ন ঘরে ঘরে প্রস্তুত করিতে থাকেন। আহারাদির পর মুক্ত মাঠে নানাপ্রকারের ক্রীড়া হইয়া সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সংকীর্ত্তন হয়। এরূপে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হইয়া থাকে।

এতদঞ্চলে ঐ দিনে হিন্দু বালিকাগণ "মাঘ মণ্ডল" নামে একটি ব্রত গ্রহণ করিয়া সমগ্র মাঘমাস কাকধ্বনিতে স্নান করে, অরুণোদয় হইলে পর পুষ্পসজ্জিত দূর্ব্বাগুচ্ছ ("মুটা") লইয়া পুকুরঘাটে সূর্য্যাভিমুখে জলসিঞ্চন করিতে করিতে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি সুর করিয়া বলিতে থাকে—

লো লো সুরুযাই
লো ডুবের পাণি,
লিখিয়া লো পুকিয়া লো
সাত বোল পাণি,
সাত বোল পাণি নারে
এক বোল সোনা,
এক বোল সোনা নারে
লাড়িয়ার পিত্তল,
ধেক্যা দিয়া বাইর কর
বাড়ীর ভিত্তর,
বাড়ীর ভিত্তর নারে
হাটু গুটু পাণি
তাত্তে দিয়া আইলাম
সূর্য্যাইরে সাত ঝৈল পাণি।

জল দেওয়া শেষ হইলে নানা ফুলের নাম করিয়া ছড়া কাটে, যেমন—

গেন্দা ফুল্‌রে সকল ফুলের রাজা তুমি
ডাল মেলিয়া দেও॥

আবার নানা ধান্যের নাম করিয়া ছড়া কাটে—

"আমুন ধান্যের বড় বড় ছড়া
লো লো সূর্য্যাই ফটিক ছড়া, ইত্যাদি।

পুকুর ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় ছড়া কাটে,—

সুরুয উঠে রঙ্গে হৈয়া — বামুন ঘরের পিড়া চাইয়া,
বামুন ঘরের বৌ খুন্দতি — মাগ্যা আন্‌লাম চাউলের কচি,
চাউলের কচি শাইলের ভাত — সূর্য্যে না খায় শুধা ভাত,
সুরুয ভাত খাও আইয়া — কাপড় বান্ধাইয়া দিমু,
সুরুয ভাত খাও আইয়া — —রঙ্গা ডোড়া দিয়া।

তদনন্তর অনশনে তণ্ডুলচূর্ণ, আবির প্রভৃতি নানা বর্ণের চূর্ণ দ্বারা প্রাঙ্গনে বঙ্কিমচন্দ্র-সমন্বিত সূর্য্যমণ্ডল, ধান্যবৃক্ষ, বস্ত্রালঙ্কার, যৌতক প্রভৃতি অঙ্কন করিয়া পরে বর্ণিত ছড়াগুলি দ্বারা "ব্রত পুজিয়া" থাকে।

মাঘ মণ্ডল — সোনার কুণ্ডল,
বাপ রাজা — ভাই প্রজা
মা পাটেশ্বরী — আপনি বিদ্যাধরী,
থাল পাট — ভৃঙ্গারের পাণি
জয়ে জয়ে — আয় রাণি,
চান্দ পুজি চন্দনে — সুরুয পুজি বন্দনে,
চান্দ পুজ্যা ঘরে যায় — সুরুয পুজ্যা দুধ ভাত খায়,
উত্তল ঘোড়া নকল ঘোড়া — ষোল বোনের ষোল ঘোড়া,
তেল কলসী হাতে — ঘি কলসী মাথে
পরথম পুতে করে কায — পরথম বৌ ভোগে রাজ,
মুই পুজ্যা আইলাম — শ্রী কৈলাশ।

মামায় দিল পুষ্করণী
ভাইগ্নায় দিল পার
সোওয়া পক্ষে পাণি খায়
দেখরে সংসার।
দোলায় আইলাম দোলায় গেলাম
মার বাড়ীত গিয়া ঘি ভাত খাইলাম্
উঠ উঠ ললিতা সোহাগের ঝলিতা
ঘিরৃত হাত কর্পূর মাত,
পুজিলাম শ্রী কৈলাশ।

এ ঘরে কে জাগে — নীলাবতী তারা জাগে
জাগে তারা— — মাগে বর
খুজ্যা আন্‌লাম্ — পুতের বর,
শান্তা শান্তি — রটে ভাতস্তি।

নিরক্ষর গ্রাম্য কবি যে এ ব্রতের আবিষ্কর্ত্তা ঐ ছড়াগুলিই তাহার প্রমাণ।

শ্রীশশিভূষণ দত্ত।

বালবিধবা ও ব্রহ্মচর্য্য।

বিগত মাঘ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভামিনী দাস মহাশয়া "বিধবার কাজ ও ব্রহ্মচর্য্য" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলাম। অনেক দিন হইতে বিষয়টি আমারও চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া এ সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু ধারণা হইয়াছে, আজ তাহারই কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিলে অসঙ্গত হইবে না মনে করিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এ বিষয়টি যত বড় আমার মনে হয় দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার তুলনায় ইহার আলোচনা অত্যন্ত কম। কদাচিৎ যদিও দুই চারিটি কথা আলোচিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রায়ই তাহাতে গভীরতা এবং আন্তরিকতার অভাব দৃষ্ট হয়। যদি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা লিখিতে হয় তবে সর্ব্বপ্রথমে ইহাকে যতখানি সম্ভব হৃদয় দিয়া বুঝিতে ও অনুভব করিতে হইবে। মোটামুটি যাহা চোখে লাগে তাহাই দেখিয়া দেখা শেষ করিলে আমরা ইহাকে কিছুই বুঝিতে পারিব না। গোড়ায় ব্যাধি কোথায় না ধরিতে পারিলে ঔষধের ব্যবস্থায় সুফল লাভের আশা কোথায়?

কেহ কেহ মত করেন যে বালিকা বিধবা হইবামাত্র তাহাকে এমন শিক্ষা দেওয়া দরকার যাহাতে সে বুঝিতে পারে ভগবান তাহাকে অন্তরূপে জীবন যাপন করিতে পাঠাইয়াছেন, সংসারের সুখে তাহার কামনা রাখা অনুচিত। কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখি তবে কি ঐরূপ শিক্ষা লওয়া এবং ঐরূপ ধারণা করিয়া তোলা অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না?

প্রথমে দেখিতে হইবে আমাদের দেশের কুমারীদের অবস্থা কিরূপ, এবং বিবাহের প্রথা কিরূপ। আমাদের ঘরে কন্যাটির বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবামাত্র তাহাকে বিবাহের কথা ঘর-সংসারের কথা শুনাইয়া শুনাইয়া আত্মীয় স্বজন তাহার মনে একমাত্র সংসারকেই উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়া দেন। ফল এই হয় যে তাহারা তখন হইতে একমাত্র সংসারকেই একান্ত করিয়া জানে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিন্তা এবং মন উহার চারিপাশেই পাক খাইয়া বেড়ায়। তাহার পর কোন ক্রমে ১০৷১১ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই সে শুনিতে পায় অমুক দিনে তাহার বিবাহ। এ সম্বন্ধে তাহার কোন ইচ্ছা বা মতের দরকার নাই।

আত্মীয় স্বজন একটি অপরিচিত বালককে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, খেলাঘরের পুত্তলিকাগুলির মত তাহার জ্ঞানের এবং ইচ্ছার অগোচরে তাহার বিবাহ শেষ হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্তে তাহার কুমারী-জীবন অবসান হইয়া অকালে বধূজীবনের আরম্ভ হইল। স্বামীর সহিত মনোমিলন বা প্রণয় ত দূরের কথা—পরিচয় হইতে না হইতেই একদিন সে খবর পাইল সে বিধবা হইয়াছে, আজ হইতে সে ভাগ্যহীনা হইয়া রহিল। কিন্তু ভাগ্য যে তাহার কবে আসিল সে কথাটি সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পরদিন হইতে যদি তাহাকে শুনিতে হয় তাহাকে ব্রহ্মচারিণী হইতে হইবে, পরহিতে জীবন দান করিতে হইবে, তবে ঐ কথাগুলি কি তাহার পক্ষে বিভীষিকার মত হইয়া উঠে না।

এতদিন যাহাকে দিনরাত্রি পাখীর মতন শিখান হইল যে তোমাকে ঘর সংসার করিতে হইবে, সন্তান প্রতিপালন করিতে হইবে, আজ এক মুহূর্ত্তে যদি তাহাকে সন্ন্যাসিনী সাজিতে আদেশ করা যায়, তবে কথাগুলি যতই মহৎ এবং সদিচ্ছাপ্রণোদিত হউক না কেন ফল কিছুই হয় না।

আমি এমন কতকগুলি বালিকা জানি, যাহাদের আত্মীয় স্বজন তাহাদের বৈধব্য ঘটিবার পরে তাহাদিগকে উক্তরূপে ব্রহ্মচর্য্য এবং বিশ্বজনীন প্রেম শিক্ষা দিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। দরকার বুঝিয়া সুর ফিরাইলে তাহা হৃদয় স্পর্শ করে এমন আমার মনে হয় না।

ব্রহ্মচারিণী বিশ্বপ্রেমিকা সেবাব্রতধারিণী হওয়া কি সহজ কথা? সৌভাগ্যক্রমে একএকজনের প্রকৃতিতে স্বতঃই এই ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। আর, যদি কোন অবস্থায় পড়িয়া মানুষ ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে পারে সে কেবলমাত্র প্রেমের ক্ষেত্রে! ব্রহ্মচর্য্য সেই সমস্ত বিধবাদের পক্ষেই সহজ যাঁহারা পতির সহিত যুক্তাত্মা হইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা যথার্থ প্রেম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাই স্বতঃ ব্রহ্মচারিণী থাকেন, কোন কৃত্রিম উপায় তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যের জন্য প্রয়োজন হয় না।

আমি বলিতে চাহিতেছি না—শিক্ষার দ্বারা কোন ফল হয় না। ইহাই আমার বক্তব্য যে শিক্ষার উহাই উত্তম পন্থা নহে। কন্যাদিগকে যদি বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিতা করা যায় তবেই কতকটা ভাল ফলের আশা করা যায়, অন্ততঃ সংযমের শক্তি ত্যাগের শক্তি কিছু না কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, নহিলে একটি ক্ষুদ্রমন অপরিণত অন্তঃকরণের বঞ্চিতাকে হঠাৎ অত হিতোপদেশ দিতে গেলে তাহার ফল ব্যর্থতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

আরো একটি কথা আছে, ব্রহ্মচর্য্য শিখাইবে কে? শিক্ষক কোথায়? বড় বড় কথা যাঁহারা শিখাইবেন যদি দেখা যায় তাঁহাদের নিজের চরিত্রে সংযমের একান্ত অভাব তবে তাহাদের কথায় কি কেহ আস্থা স্থাপন করিতে পারে? স্বতঃই মনে হয় এ একটা খেলা চলিতেছে। মানুষের শূন্যমন পূর্ণ করিতে হইলে নিজেকেও যে পূর্ণ করিতে হয়। আমাদের সংসারে আজ সংযমের এবং ব্রহ্মচর্য্যের একান্ত অভাব হইয়াছে, ইহার মধ্যে ব্রহ্মচারিণী গড়িতে হইলে যাঁহারা গড়িবেন আগে তাঁহাদিগকে সংযমী হইতে হইবে। নহিলে পিতা, ভ্রাতা, কন্যা, ভগ্নীকে মুখে উপদেশ দিবেন ব্রহ্মচারিণী হও, কিন্তু নিজেরা ৪০ বৎসর অতীত হইলেও স্ত্রী-বিয়োগে সংসার রক্ষার অছিলায় দ্বিতীয়বার পত্নীগ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন না, চোখের উপর নিত্য ইহা দেখিয়া কাহার আর ঐসমস্ত শিক্ষকের কথায় শ্রদ্ধা থাকে?

পক্ষান্তরে, যাঁহারা সংসারের সুখকে অস্থায়ী এবং নশ্বর বলিয়া বিধবাদিগকে উহা তুচ্ছ করিতে বলেন তাঁহারা কি ভাবিয়া দেখেন না যে সংসারের সুখকে যতই কেন নশ্বর বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু সংসার করিবার উদ্দেশ্য ত সুখভোগ নহে। সংসার যেমন চরিত্রের বিকাশলাভের সুন্দর ক্ষেত্র এবং সহজ পন্থা এমন আর কয়টি আছে? এই সংসারেই নারীর নারীত্ব ফুটিয়া ওঠে, এখানেই সে পত্নীত্বে অভিষিক্ত হয়, এখানেই সে মাতৃত্বের আস্বাদন লাভ করে। সন্তান লাভ করিয়া নারীহৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় ভাবরাশির অভ্যুদয় হয় সে কি ছোট কথা? যে স্বর্গীয় স্নেহ, যে অকৃত্রিম বাৎসল্যের অমৃতধারা সে আপনার মধ্যে লাভ করে সে কি সুন্দর পবিত্র এবং প্রয়োজনীয় নহে? তাহার মন সরস, চিত্ত স্নেহপূর্ণ, দৃষ্টি করুণ হইয়া যায় ইহা কি উপেক্ষার যোগ্য? স্বামীর প্রণয়ও কি তাহাকে কম মহত্ব দান করে? প্রেমই নারীকে ধৈর্য্যশালিনী, শান্তহৃদয়া ও আত্মবিসর্জ্জনক্ষমা করিয়া তোলে, তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। আমরা কি বলিয়া বালবিধবাদিগকে এইগুলি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতে পারি?

কেহ কেহবা ইচ্ছা প্রকাশ করেন পাশ্চাত্য দেশের কুমারীদের দ্বারা যেরূপ ভাল ভাল কাজ অনুষ্ঠিত হয়, আমাদের দেশের বালবিধবাগুলিকেও শিক্ষা দিয়া ঐরূপ কার্য্যে প্রণোদিত করিতে হইবে। কিন্তু আমি বুঝি না তাহারা একটা কথা কেমন করিয়া না ভাবিয়া থাকিতে পারেন? মানুষের কাজের সঙ্গে যে তাহার ইচ্ছার একটি প্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যোগ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের কুমারীরা আপন ইচ্ছায়ই কুমারী থাকেন এবং দেশের ও দশের জন্য আপনাকে দান করেন। কিন্তু যদি নির্ব্বিচারে কতকগুলি চিহ্নিত ব্যক্তিকে লইয়া ঐ উদ্দেশ্যে আমরা একটি দল বাঁধিয়া তুলিতে চেষ্টা করি তবে তাহাতে ফল কতটুকু হইবে? এবং তাহাতে সত্য কতটুকু থাকিবে? কোন রকমে চলনসই করিয়া তোলা ত অত বড় মহৎ কর্ম্মের উপযুক্ত হয় না। আর বাল্যকালের নানা অবস্থার ভিতর দিয়া এবং প্রকৃতির তারতম্যে একএকটি মানুষ একএকটি পথের উপযুক্ত হয়। যে হয়ত সংসারের পথে গেলে আপনাকে সার্থক করিয়া লইতে পারিত, অন্যপথে তাহাকে জোর করিয়া চালাইতে গেলে সে ব্যর্থ হইয়া যায়। বিধাতা বিচিত্র মানুষকে বিচিত্র পথের জন্য সৃষ্টি করেন, আমরা যদি নির্ব্বিচারে সেই বিচিত্রতাকে লুপ্ত করিয়া সকলকে এক পথে চালাইতে চাই, তবে কি তাহা অপরাধ এবং অন্যায় হইবে না?

এদিকে কিন্তু যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর দেরী করা চলে না, একটা সত্য এবং মঙ্গলপূর্ণ বিধানের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। অকালমৃত্যুর জন্য দেশে বালবিধবা ধরিতেছে না। এদিকে সংসারের এমন অবস্থা হইয়াছে যে বিধবাদের জন্য আর তাহাতে তিলমাত্র স্থান নাই। পিতৃগৃহে, শ্বশুরগৃহে সর্ব্বত্রই তাহারা অবমানিত, লাঞ্ছিত, এবং অধিকারহীনা। বিধবা হইবার পরে বিধবা যেন সকলের আরামের জন্যই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। তাহার নিকট কাজ আদায়ই সকলের একমাত্র লক্ষ্য থাকে। পিতামাতা থাকিলে সে কথঞ্চিৎ প্রাণ বাঁচাইয়া চলিতে পারে, নহিলে তাহার আর সান্ত্বনার স্থান দেখিতে পাই না। "সে অলক্ষণা, সে ভাগ্যহীনা, বাঁচিয়া তাহার লাভ নাই।" এই সমস্ত কথা প্রতিনিয়ত শুনিয়া শুনিয়া সে নিজেকে আর বহন করিতে পারে না। যাহার কোন অবলম্বন নাই, জীবনে কোন উদ্দেশ্য নাই, যে আনন্দহীন আশাশূন্য, তাহার জীবন কেমন করিয়া কাটে একথা যদি ভাবিয়া দেখিতাম, ইহা যদি অনুভব করিতাম, তাহা হইলে দিন আর অত আরামে কাটাইতে পারিতাম না। একটি দুইটি জীবন নহে লক্ষ লক্ষ লোক যে-দেশে এমনি করিয়া প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে সে দেশের মঙ্গল কোথায়? কতজন আত্মহত্যা করিতেছে, কতজন ভালবাসার প্রলোভনে সর্ব্বস্ব হারাইতেছে, দেশে সমাজে পাপ ধরে না, তবু কাহারো চৈতন্য নাই। পিতা, ভ্রাতা অসঙ্কোচে ভ্রূণহত্যার উদ্‌যোগ করিবে তথাপি কোন ভাল পথের কথা মনে আনিতে চাহিবে না। এমন পাপ, এত অপরাধ ভগবান বেশীদিন সহ্য করেন না। যাঁহাদের মন আছে শক্তি আছে, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে পথ করিবার সময় আসিয়াছে।

আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে দেখিতে পাই ইহার একটি মাত্র পথ আছে। সে হইতেছে আমাদের দেশের স্ত্রীলোককে 'মানুষের অধিকার' দান করা। জ্ঞান বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হইবার সুযোগ, ইহা না পাইলে মানুষ মানুষই হইতে পারে না। পরিণত বয়সে ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত যে বিবাহ তাহাই সকলের পক্ষে বিবাহপদবাচ্য। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকরা এমন কি অপরাধ করেন যে তাঁহারা বিবাহ কি তাহা না বুঝিয়াই বিবাহিতা হইতে বাধ্য হন? পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধেও কেন না তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিবে? যে স্বামীর প্রণয় লাভ করিতে পারিয়াছে সে আপন ইচ্ছায়ই চিরদিন ব্রহ্মচারিণী থাকিবে। যে

বালিকা এখনও পুতুল খেলিয়া বেড়ায় তাহাকেও যে জোর করিয়া তথাকথিত ব্রহ্মচারিণী করিয়া তুলিতে হইবে, ইহার মত জবরদস্তি আমি ত আর কোথাও দেখি না। অনেকে মনে করেন এবং বলিয়া থাকেন পুনর্ব্বিবাহের প্রচলন হইলে দেশে সতী থাকিবে না। এমন সতী থাকিবার দরকার কি? যে উপায় নাই বলিয়া সতী, যে জ্ঞানহীন সংস্কারের দ্বারা সতী, তাহার সতীত্বের মূল্য কি? তাহার সতীত্ব অভাবাত্মক ধর্ম্মমাত্র।

একদিনে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে এমন আশা করি না। সংস্কারের জাল মানুষের মন এমন করিয়া আবৃত করিয়া আছে যে সহজ যে পিতৃস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ তাহাও প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া আছে। তাঁহারা সহস্র অন্যায় প্রতিনিমেষে অনুষ্ঠিত দেখিবেন তথাপি প্রতিকারের জন্য একটি অঙ্গুলি উত্তোলিত করিবেন না। মৃতআচারবদ্ধ সংস্কারের পায়ে মনুষ্যত্ব সহৃদয়তা সমস্তই বিসর্জ্জন করিয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক, সমস্ত শক্তি লইয়া যদি মানুষ চেষ্টা করে তবে দুর্গতি যত বড়ই হউক, সংস্কার যতই কঠিন থাক্, কেন না তাহার কবল হইতে দেশ ও জনসমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে? মহৎ কর্ম্মে ভগবান সহায়। ইচ্ছা থাকিলে শক্তিও তিনিই দিয়া থাকেন।

দেশ যে এতগুলি নারীশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে ইহা কি কম ক্ষতির কথা? শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা নারীজাতিকে সবল ও উন্নত না করিতে পারিলে দেশের পুরুষেরাই বা মানুষ হইবেন কি করিয়া? দেশের মঙ্গল চাহিলে সত্য ভাবে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের কর্ম্মক্ষেত্রও বিস্তৃত করিতে হইবে, ইচ্ছামত পুনর্ব্বিবাহে অধিকার দিতে হইবে। ইচ্ছা এবং জ্ঞানের দ্বারা যে বিবাহ তাহাই প্রচলিত করিতে হইবে। যতদিন এই সমস্তগুলির প্রত্যেকটি কার্য্যে পরিণত না করা হইবে ততদিন মঙ্গলের আশা দেখি না।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

নবীন-সন্ন্যাসী

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

বেলা দেড়প্রহর অতীত হইয়াছে। ভদ্রেশ্বর হইতে ফরাসডাঙ্গা যাইবার গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথে মোহিত একাকী ধীরে ধীরে চলিতেছিল। ধীরে ধীরে, কারণ দেহে তাহার আর সামর্থ্য নাই। পা ফাটিয়া বেদনা হইয়াছে। গত কল্য হইতে সে অভুক্ত। আজ দুই সপ্তাহ গৃহের বাহির হইয়াছে, যে দুই দিন সে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার বাবুর সহিত ছিল, সেই দুই দিন মাত্র তাহার নিয়মিত আহার জুটিয়াছিল। তাহার পর হইতে অন্নের সাক্ষাৎ তাহার অদৃষ্টে বড় ঘটে নাই। কোনও দিন কেবল ফলমূলমাত্র খাইয়া কাটিয়াছে—কোনও দিন কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন। সে যদি মুখ ফুটিয়া লোকের কাছে চাহিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার এ অনশনক্লেশ সহিতে হইত না। কিন্তু ভিক্ষা করিতে সে একান্ত অক্ষম। তাহার কাশী যাইবার অভিলাষ শুনিয়া ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার বাবু রেলভাড়া দিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু সে দান গ্রহণ করিতে মোহিতের কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। পদব্রজে সে এতদূর আসিয়াছে। তাহার স্কন্ধে সেই ঝুলি, বামহস্তে সেই লোটাটি, বগলে সেই মৃগচর্ম্মখানি, তাহার গৈরিকবস্ত্র ও উত্তরীয় এখন অত্যন্ত মলিন—চুলগুলি ধূলিধূসরিত চক্ষু কোটরান্তর্গত।

রাস্তার প্রান্ত দিয়া, গাছের ছায়ায় ছায়ায় মোহিত চলিয়াছে। পথে লোকজন কম। মাঝে মাঝে দুই চারি জন চাষী লোক যাতায়াত করিতেছে। রৌদ্রতাপ যত বৃদ্ধি হইতেছে, মোহিতের গতিবেগও তত হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আর দেড়ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে ফরাসডাঙ্গা। সেখানে পৌঁছিলে যদি কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে কিছু খাইতে দেয়, তবে সে খাইবে। সেই কথাই বারম্বার তাহার মনে তোলাপাড়া করিতেছে। চলিতে চলিতে ক্রমে পিপাসায় তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল—তথাপি সে ধীরে ধীরে চলিয়াছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে, পথের ধারে একটা পাকা সাঁকো পাইল। বড় শ্রান্তি অনুভব করিয়া তাহারই উপর মোহিত বসিল।—প্রথমে ভাবিয়াছিল, মিনিট পাঁচেকের বেশী বিলম্ব করিবে না—কিন্তু দশ মিনিট, পনেরো মিনিট হইয়া গেল, উঠিতে আর ইচ্ছা করে না। পা যেখানে ফাটিয়াছিল দেখিল সেখান দিয়া রক্ত পড়িতেছে।

বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল—"এখন বোধ হয় সাড়ে দশটা কি পৌনে এগারোটা হইয়াছে; যদি বাড়ীতে থাকিতাম, এতক্ষণ ঝি আসিয়া বলিত, 'ছোট বাবু, ভাতবাড়া হয়েছে, আসুন।' আসনে গিয়া বসিতাম। সম্মুখে চর্ব্ব্য, চোষ্য উপাদেয় নানাবিধ খাদ্যসম্ভার।"—কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আকাশকুসুম চিন্তা করিতেছে, এমন সময় কে যেন করুণস্বরে তাহার কানে কানে বলিল—"হায় অন্ন!—হায় মোহিত!"—সে তখন চমকিয়া, যেন জাগিয়া উঠিল। নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া, নিজের উপর বড় বিরক্ত হইয়া, সেস্থান হইতে উঠিয়া পড়িল। আবার কষ্টে পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে। ফরাসডাঙ্গা আর অধিকদূর নহে—অর্দ্ধক্রোশেরও কম হইবে। নগর-প্রান্তবর্ত্তী দুই একখানা উচ্চ ইষ্টকালয় দেখা যাইতেছে। কিন্তু পিপাসায় মোহিত বড় কাতর। আর সে পারে না। নিকটেই গঙ্গা। রাস্তা হইতে নামিয়া মোহিত গঙ্গার দিকে গেল। তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেখানটা শ্মশানঘাট। অনেকগুলা ভাঙ্গা কলসী এখানে ওখানে গড়াগড়ি যাইতেছে। স্থানে স্থানে চিতাচিহ্নও বিদ্যমান। বাঁশের খুঁটির উপর একটা চালা বাঁধা রহিয়াছে সেইখানে গিয়া মোহিত উপবেশন করিল। একটু শ্রান্তি দূর হইলে জলপান করিবে।

বসিয়া বসিয়া সে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে ভাবী অন্নচিন্তাই প্রধান—কিছুতেই সে-চিন্তাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। ফরাসডাঙ্গায় গিয়া প্রবেশ করিলে, তাহার বুভুক্ষিত মুখ দেখিয়া, কেহ কি আহার করিতে আহ্বান করিবে না? –হায় মোহিত!—হায় অন্ন!—কলিতে জীবের যে অন্নগত প্রাণ,–অন্ন বিনা যে গতি নাই!

আজ এখনও আহ্নিক পূজা কিছুই হয় নাই। ঝুলি ও উত্তরীয় সেই চালায় রাখিয়া মোহিত স্নানার্থ জলে নামিল। স্নানান্তে আহ্নিক পূজা করিয়া তবে সে জল পান করিবে। গঙ্গার স্বচ্ছ জল—আর ত কিছুই নাই।

আহ্নিক সারিয়া, জলপান করিয়া, সিক্ত বস্ত্র শুকাইতে দিয়া মৃগচর্ম্মখানি পাতিয়া সেই চালায় মোহিত বসিল। ঝুলি হইতে বেদান্ত-রামায়ণ খানি বাহির করিয়া দশম স্কন্ধটি পাঠ করিতে লাগিল। ক্রমে এই শ্লোকটিতে আসিয়া পৌঁছিল—

সন্ন্যাসমাশ্রয়তি যো হি বিনৈব কর্ম্ম
যোগং স চেহ লভতে খলু দুঃখমেব।
যঃ কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠতি বা মুনিঃ সন্
স ব্রহ্ম বিন্দতি পরং ন চিরেণ মর্ত্ত্যঃ॥

—যে কর্ম্মযোগ-বিরহিত হইয়া সন্ন্যাসকে আশ্রয় করে সে এখানে দুঃখই প্রাপ্ত হয়। যে মননশীল হইয়া কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে সেই মনুষ্যের অচিরে ব্রহ্মলাভ হয়।

এই শ্লোকটি মোহিত পূর্ব্বে যে পাঠ করে নাই এমন নহে—কিন্তু এখন এটিকে সে যেন নূতন ভাবে উপলব্ধি করিল। পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল—আমি যে জীবন অবলম্বন করিয়াছি তাহা ত একান্ত কর্ম্মহীন—সুতরাং দুঃখই আমার পাইতে হইবে। শুধু যে অন্নের দুঃখ—আধিভৌতিক দুঃখ, তাহা নয়। আমি যে শাস্ত্র-চর্চ্চা ও ভগবচ্চিন্তা অবাধে করিতে পাইব বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি—এই দুই সপ্তাহকাল তাহার কি করিতে পারিয়াছি? গৃহে থাকিতে আমি দুইদিনে যাহা করিতে পারিতাম—এ দুই সপ্তাহে সেটুকুও পারি নাই। আমার দেহ যেমন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে—আমার হৃদয় মনও যেন তেমনি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

মোহিত গ্রন্থখানি খুলিয়া আবার পাঠ করিতে লাগিল, কিন্তু শাস্ত্রার্থ মনে ভাল করিয়া প্রবেশ করে না। ক্ষুধায় দেহ অবসন্ন—মাথা ঝিম ঝিম করিতেছে। বসিয়া থাকাও যেন কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। মোহিত তখন সেই মৃগচর্ম্মখানির উপর শয়ন করিল এবং অচিরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নিদ্রাযোগে কেবল সে অন্নের স্বপ্ন—নানা বিচিত্র অবস্থায়, বিচিত্র স্থানে বিচিত্র প্রকার অন্ন সে আহার করিতেছে—এই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। এইরূপে দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া মোহিত দেখিল, সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। উঠিয়া বসিয়া সে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে অনুচ্চস্বরে—ধীরে ধীরে পূর্ব্বশ্রুত নিম্নলিখিত হিন্দী গানটি গাহিতে লাগিল—

যব দাঁত ন থে, তব দুধ দিয়েও;
যব দাঁত দিয়েও, ক্যা অন্ন ন দেহৈ?
যো জলমে থলমে পশুপচ্ছিনকো
সুধ লেত, সো তেরিহু লেহৈ।
কাহেকো শোচ করৈ মন মূরখ?
শোচ করে কছু হাঁথ ন আইহৈ।
জানকো দেত, অজানকো দেত,
জহানকো দেত—সো তোহুকো দেহৈ।

সম্মুখে তরঙ্গময়ী গঙ্গা কলকল্লোলে বহিয়া যাইতেছেন।

দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে অসংখ্য বৃক্ষে বসিয়া অসংখ্য পক্ষী কূজন করিতেছে। তাহার মধ্যে একমাত্র মনুষ্যকণ্ঠস্বরে ভক্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া ফুটিয়া উঠিলেন। মোহিতের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

গান শেষ হইলে কিয়ৎক্ষণ গঙ্গার দিকে চাহিয়া মোহিত বসিয়া রহিল। তাহার পর চক্ষু মুছিয়া ভাবিতে লাগিল —"খৃষ্টানদের প্রার্থনায় আছে, Give us this day our daily bread—প্রভু, অদ্য আমাদের দৈনিক আহার দিও। পূর্ব্বে বলিতাম—খৃষ্টানদের এ প্রার্থনাটুকু বড় আধিভৌতিক রকমের- প্রভু আমায় ভক্তি দিও, মুক্তি দিও, না বলিয়া, প্রভু আমায় অন্ন দিও!—কিন্তু অন্ন যে ঈশ্বরের কত বড় দান তাহা আজ বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অন্ন বিনা উপায় নাই। অন্নই জীবের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রার্থনীয়।"

মোহিত তখন উঠিয়া, জিনিষপত্র লইয়া, আবার ধীরে ধীরে ফরাসডাঙ্গা অভিমুখে অগ্রসর হইল। অৰ্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতে অৰ্দ্ধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। দূর হইতে যে অট্টালিকাগুলি দেখা গিয়াছিল,- সেগুলি নগরোপান্তে ধনীদিগের বাগানবাড়ী। সেগুলি এখন বন্ধ। মোহিত যত অগ্রসর হইতে লাগিল, পথে লোকসমাগম ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কেহ কেহ বা তাহাকে প্রণাম করিতেছে।

সূর্য্য যখন পাটে বসিয়াছেন, মোহিতের মাথাটা বড় ঘুরিয়া উঠিল। চোখে যেন সে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মনে হইল, যেন এখনি পড়িয়া যাইবে। নিকটেই প্রশস্ত বারান্দাযুক্ত একখানি বাড়ী ছিল, মোহিত উঠিয়া সেই বারান্দায় ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতেও পারিল না। প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল।

ইহার কয়েক মিনিট পরে, বাড়ীর মধ্যে হইতে একজন পনেরো ষোল এবং একজন অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক বালক, মালকোঁচা দিয়া কাপড় পরা, দুই খানি বাইসিক্ল হাতে লইয়া বাহির হইল। মোহিতকে উক্ত অবস্থায় পতিত দেখিয়া বাইসিক্ল ছাড়িয়া তাহারা উভয়েই সেখানে গেল। দেখিল, লোকটির চক্ষু মুদ্রিত—নিশ্বাস বহিতেছে। এ অসময়ে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া পথের ধারে এরূপ ভাবে বারান্দায় ঘুমাইয়া পড়িবে, ইহা বালকগণের একটু আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইল। তাহারা ভীতচিত্তে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। একজন বলিল—"মূর্চ্ছা যায়নি ত?" অপর বালক বলিল—"হয় ত কোন ব্যারাম হয়েছে। বাবাকে খবর দাও গে।" পথচারী একজন লোক উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল—"গাঁজার মাত্রা বেশী হয়ে গেছে—গাঁজার মাত্রা বেশী হয়ে গেছে।"—কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একজন বালক গিয়া তাহার পিতাকে ডাকিয়া আনিল।

যে লোকটি আসিলেন, তাঁহার আকার খর্ব্ব, শ্যামবর্ণ—বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ বৎসর। মাথায় টাক, চক্ষে সোনার চশমা, হস্তে একখানি পুস্তক। তিনি আসিয়া মোহিতের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—বক্ষে হাত দিয়া দেখিলেন। শেষে বলিলেন—"না, কোনও ব্যারাম হয়নি—কিন্তু নাড়ী বড় ক্ষীণ। বোধ হয় ক্ষিধেতে এমন হয়েছে।"—বলিয়া আবার তাহার বক্ষে হাত রাখিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় মোহিত নেত্রোন্মীলন করিয়া তাঁহার পানে চাহিল।

বাবুটি বলিলেন—"তুমি কে?"

ক্ষীণস্বরে উত্তর হইল—"আমি সন্ন্যাসী।"

"তোমার কি হয়েছে?"

কোনও উত্তর নাই। বাবুটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কিছু খাবে?"

ক্ষীণতার স্বরে উত্তর হইল—"খাব।"

"কদিন খাওনি?"

"দু দিন।"

"বুঝেছি।"—বলিয়া বাবুটি, পুত্রদ্বয়ের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া মোহিতকে বৈঠকখানার ভিতরে লইয়া গেলেন। ভিতরে অনেকগুলি ঔষধের আলমারি সাজান রহিয়াছে—ইহা একটি ডাক্তারখানা। বাবুটি এখানকার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার।

মোহিতকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া, সুরাসারের চুল্লী জ্বালিয়া, একটা পাত্রে খানিকটা জল ও খানিকটা বিলাতী চিকেন্ ব্রথ গরম করিয়া লইলেন। তাহাতে

কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি মিশাইয়া, মোহিতকে পাঁচ ছয় চামচ পান করাইয়া দিলেন। মোহিতের মাথা চেয়ারের বাজুতে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। এই পথ্যসেবনের দুই মিনিট পরেই সে সিধা হইয়া বসিল। ডাক্তার বাবু আবার তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন—"কেমন আছ?"

"ভাল।"

"একটু দুধ খাবে?"

"খাব।"

আধপোয়া দুধ গরম করিয়া আনিবার জন্য আদেশ দিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ততক্ষণ এই বাকী ঔষধটুকু খেয়ে ফেল।"—বলিয়া পাত্রটি তিনি মোহিতের মুখে ধরিলেন। মোহিত সেটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে? শোবে?"

"শোব।"

"এস।"—বলিয়া ডাক্তার বাবু হাত ধরিয়া উঠাইয়া তাহাকে পাশের কামরায় লইয়া গেলেন। সেখানে তক্তাপোষের উপর চাদর পাতা ছিল। দুই তিনটি তাকিয়া বালিসও ছিল। মোহিতকে শোয়াইয়া দিয়া তিনি নিকটে চেয়ার লইয়া বসিলেন।

মোহিত বলিল—"আজ আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "দুদিন কিছু খাও নি?"

"কিছু না। পরশু সন্ধ্যাবেলা দুধ আর সন্দেশ খেয়েছিলাম।"

ডাক্তার বাবু মোহিতের দিকে অর্দ্ধমিনিটকাল স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া রাজপথের দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাহার পর আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"আশ্চর্য্য কথা! নিজেদের আমরা হিন্দু হিন্দু বলে বড় জাঁক করে থাকি। এত বড় একটা সহরের মধ্যে, যেখানে পঞ্চাশ হাজার হিন্দুর বসতি—একজন সাধু সন্ন্যাসী অনাহারে মারা যাচ্ছিল। আমরা বক্তৃতা করবার সময় হিন্দু, আর মুষ্টিভিক্ষা দেবার বেলায় সাহেব হয়ে যাই।"

মোহিত বলিল—"কারু দোষ নাই। আমি কারু কাছে চাইনি।"

বাবুটি মোহিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"না চাইলে কি দিতে নেই?" এমন সময় দুধ আসিয়া পৌঁছিল। মোহিত সেটুকু পান করিয়া আরও সুস্থ হইল।

বাবু বলিলেন—"আধ ঘণ্টা পরে, আর একটু দুধ খেতে হবে। তারপর ঘণ্টা দুই আর কিছু না। রাত্রে চারটি ভাত খাবে?—চারটি মাছের ঝোল ভাত?"

"মাছ আমি খাইনে।"

বাবুটি হাসিয়া বলিলেন—"তাও ত বটে। চারটি গরম গরম আলোচালের ভাত, গাওয়া ঘি দিয়ে—একটু ঝালের ঝোল—দুঘণ্টা পরে খেও এখন। আজ তোমায় ছাড়ছিনে—রাত্রে এখানে থাকতে হবে। কাল তখন খাওয়া দাওয়া করে যেও।"

মোহিতের চক্ষু দিয়া কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল।

সে রাত্রে আহারাদির পর শয়ন করিয়া, অনেকক্ষণ অবধি মোহিত নিদ্রা যাইতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে পথে সে পদার্পণ করিয়াছে, সেটা তাহার পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ নহে। এক সময় সে মনে করিত বটে, সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসী হইতে না পারিলে সাধনভজনের বিঘ্ন হয়, আত্মচিন্তার অখণ্ড অবসর পাওয়া যায় না। কিন্তু এ দুই সপ্তাহের অভিজ্ঞতায় সে বেশ হৃদয়ঙ্গম ক'রিতে পারিয়াছে, তাহা ভ্রম। সংসারে থাকিয়া সে যে পরিমাণ সাধনভজন ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে সক্ষম হইত—গৃহত্যাগী হইয়া অবধি তাহার এক শতাংশও সে করিতে পারে নাই। গৃহত্যাগ করিয়া অবধি অন্নচিন্তা এবং আশ্রয়চিন্তাই তাহার মনে একাধিপত্য করিয়াছে।

এই দুই সপ্তাহে প্রতিদিনকার, প্রতি দণ্ডের ঘটনা সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। নিশীথ-নিস্তব্ধতার মধ্যে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার বাবুর উপাসনাবিভোর সেই শান্ত ছবিখানি মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন বটে, গৃহীর কি মনস্থির হয়?—কিন্তু গৃহত্যাগী মোহিত কোনও দিন কি তেমন করিয়া উপাসনা করিতে পারিয়াছে? ভাবিল, সে ভদ্রলোকটি যদি তাঁহার পত্নীর প্রতি অত গভীর প্রণয়ানুভব না করিতেন, তাহা হইলে কি তিনি অমন একান্ত মনে ভগবানকে ডাকিতে পারিতেন? তিনি ত নাস্তিকই ছিলেন,—প্রেম

তাঁহাকে আস্তিকতায়, ভগবদ্ভক্তির উচ্চলোকে উত্থিত করিয়া দিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রের স্বপ্ন—চিনি তাহার হাতখানি ধরিয়া তাহাকে বলিতেছে—"এস"—তাহাও মনে পড়িল। সেই যে গুরুদাস বাবুর বাড়ীতে, পশ্চাতের বারান্দায় বসিয়া রাত্রি তিনটা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ভগবানকে ডাকিয়াছিল, সেই তাহার জীবনের প্রথম ঐকান্তিক উপাসনা। কই—তাহার পূর্ব্বে কখনও ত মোহিত অমন একাগ্রভাবে ভগবানকে ডাকিতে পারে নাই! এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মোহিত স্থির করিল—সংসারবন্ধনের মধ্যে থাকিয়াই ঈশ্বরকে নিকটে পাওয়া যায়। একবার মনে হইল—ঈশ্বরের এ প্রকার উপাসনা ত সকাম উপাসনা—ইহা ত শ্রেষ্ঠতম উপাসনা নহে। কিন্তু তখনি আবার ভাবিল—শুষ্ক নিরুপাসনার চেয়ে সকাম উপাসনা ত ভাল; পঙ্কিলজলযুক্ত নদী যে প্রদেশে বহিয়াছে—সে প্রদেশ মরুভূমির চেয়ে ত ভাল। সুতরাং মোহিত স্থির করিল, সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া কল্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কিন্তু ফিরিবে কি করিয়া? পাথেয় নাই যে।

তখন ডিস্পেন্সারির ঘড়িতে একটা বাজিল। মোহিত ভাবিল, পাথেয় নাই—কিন্তু ঈশ্বর কি তাহার উপায় করিবেন না? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে সেই ডিস্পেন্সারিতেই বসিয়া অকস্মাৎ একজন সতীর্থের সহিত মোহিতের সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকট টাকা ধার করিয়া, গৃহস্থোপযোগী পরিচ্ছদে পুনর্ব্বার সজ্জিত হইয়া, বৈকালের গাড়ীতে মোহিত কল্যাণপুর যাত্রা করিল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃহস্পতির দশা।

আজ আবার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। আজ গদাই পালকে কল্যাণপুর যাইতে হইবে। আজ রাত্রে বাক্স খুলিয়া হরিদাসীকে দেখাইতে হইবে, মা কালীর কৃপায় টাকা চতুগুর্ণ হইয়াছে।

প্রভাতে উঠিয়া গদাই পাল কাছারির কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চৌকিদার আসিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া গদাই দেখিল, থানার দারোগা তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে—জরুরি কার্য্য।

গদাই তৎক্ষণাৎ কাছারি বন্ধ করিয়া অশ্বারোহণে থানায় গমন করিল। দারোগা শেফায়েৎ হোসেন তক্তপোষে বসিয়া টিনের বাক্স সম্মুখে রাখিয়া কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছিল। গদাইকে দেখিয়া বলিল—"এস পালজি—বস।"

গদাই উপবেশন করিয়া বলিল—"অসময়ে স্মরণ করেছেন যে?"

"বলছি—তামাক খাও।"—বলিয়া একখানি বাতিল সরকারী লেফাফা এবং কলিকাটি গদাই পালের হস্তে দিয়া পুনরায় কাগজ পত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইল।

গদাই কলিকার নিম্নাংশ লেফাফার ছিন্নমুখে ভরিয়া বাম হস্তে সেটি বেশ করিয়া মুঠা করিয়া ধরিল। পরে লেফাফার একটি কোণে সামান্য ছিদ্র করিয়া, তাহাতে মুখ দিয়া সুখে ধূমপান করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট কাল পরে দারোগা সাহেব কাগজ হইতে মুখ তুলিল। গদাই কলিকাটি আলবোলায় বসাইয়া দিল। দারোগা বলিল—"পরশু যে রমণ ঘোষের মোকদ্দমার তারিখ।"

গদাই বলিল—"সাক্ষী টাক্ষী সব ঠিক আছে ত?"

"কৈ আর ঠিক আছে? ফরিয়াদীকেই যে পাওয়া যাচ্ছে না।"

গদাই বিস্মিত হইয়া বলিল—"কি রকম?"

"আর সমস্ত সাক্ষী শেখান পড়ান সব ঠিকঠাক। কাল কেনারামকে ডাকতে দুবার লোক পাঠিয়েছিলাম—লোক ফিরে এসে বল্লে সে বাড়ী নেই। কোথায় গেছে তাও বাড়ীর লোক কেউ বলতে পারে না। আজ আবার ভোরে চৌকিদার পাঠিয়েছিলাম, তোমার নামে চিঠিও তার হাতে দিয়েছিলাম। বলা ছিল, কেনারামকে যদি না পায় তা হলে তোমাকে চিঠি দেবে। সে পায়ে হেঁটে আসছে—এখনও পৌঁছয়নি। তোমায় চিঠি যখন দিয়েছে, তাই থেকেই বুঝতে পারছি আজও কেনারামের দেখা পায়নি। বেটা পালাল নাকি?"

গদাই উত্তেজিত স্বরে বলিল—"দেখা পায়নি ? বলেন কি ? আজ ভোরেই যে তাকে পুকুরঘাটে আমি দেখেছি! বেটা নিশ্চয়ই বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে আছে। হারামজাদা বেটা!"

দারোগা বলিল—"সেই ত ভাবনার কথা হয়েছে কিনা পালজি!"

"কেন ? ভাবনা কি ? আমার সঙ্গে দুজন কনেষ্টবল দিন, আমি এক্ষণি গিয়ে তাকে ধরিয়ে দিচ্ছি।"

"ধরিয়ে যেন দিলে। কিন্তু অনিচ্ছুক ফরিয়াদীকে নিয়ে কি মোকদ্দমা হয় ?"

"রমণ ঘোষেরা ওকে হাত করেনি ত ?"

আলবোলায় দুই চারি টান টানিয়া দারোগা বলিল—"না, তা বোধ হয় না। যেদিন খানাতল্লাসী করি, সেই দিন থেকেই ও একটু দোমনা। সে দিন যখন ঐ বাসন-গুলো খড়ের পাঁজা থেকে বেরুল,—তারপর রমণ ঘোষকে একটু শাসন করতেই—বেশী কিছু নয়, গালমন্দ দিয়ে কেবল একটা চড় মেরেছিলাম—ও অমনি বলে উঠল দারোগা সাহেব, এনাকে ছেড়ে দাও—ও বাসন আমার নয়। আমি যাই ২১১ ধারার ভয় দেখালাম, বল্লাম মিথ্যে মোকদ্দমা আনার অপরাধে তোকেই জেলে দেব, তখন বেটা পথে আসে। তাই ভাবছি, আদালতে গিয়ে শেষে সকলই পণ্ড না করে দেয়।"

গদাই বলিল—"পণ্ড করে দেবে! এত বড় তার আস্পর্দ্ধা! যদি তা করে তা হলে জুতিয়ে তার পিঠের খাল খিঁচে দেব না ?"

"কিছু করতে হবে না। তক্ষণি বাছাধন আদালত থেকেই ২১১ ধারায় সোপর্দ্দ হয়ে যাবেন। - এখন তাকে বাপু বাছা বলে কোন রকমে কাজ হাঁসিল করতে পারলেই ভাল।"

গদাই কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া বলিল—"তবে অনুমতি করুন, এখন উঠি। আমি গিয়ে তাকে বলে কয়ে পাঠিয়ে দিই।"

গদাই পাল দরিয়াপুরে ফিরিয়া আসিয়া স্বয়ং কেনারামের বাড়ী গেল। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর, কেনারামের বালক পুত্র বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—তাহার পিতা অদ্য প্রভাতেই গ্রামান্তরে গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে এবং কবে আসিবে তাহা সে কিছুই বলিতে পারে না।

গাদাই ভাবিল, কেনারাম নিশ্চয়ই বাড়ীর মধ্যে কোথাও লুকাইয়া আছে। তাই সে অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল—

"তাই ত গয়লাবৌ!—এ যে বড় বিপদ হল। পরশু খুলনায় মোকর্দ্দমা—কেনারাম হল ফরিয়াদী—আর আজ সে কোথায় চলে গেল!—শিখবে পড়বে কখন ? উকীলের জেরায় যে খান খান হয়ে যাবে। বড় বড় হুঁসিয়ার সাক্ষী—রীতিমত তালিম না পেলে তারাই আদালতে টেকে না—কেনারাম ত কোন ছার। কোথায় গেল, কবে আসবে, বলেও গেল না ? এমন ত মুখ্যু দেখিনি। কাল খাওয়া দাওয়া করে দুপুর একটার মধ্যে বেরুতে হবে তবে ত খুলনায় ঠিক সময় পৌছতে পারবে। হাজির যদি না হতে পারে তা হলে হাকিম তার নামে তক্ষণি ওয়ারিণ বার করে দেবে। - সদর থেকে সেপাই জমাদার এসে হাতে হাতকড়ি দিয়ে মারতে মারতে ধরে নিয়ে যাবে যে! মহারাণীর সমন অমান্য করা সোজা কথা ? এসে যদি তাকে না পায়, তোমাদের হাল গরু ঘটি বাটি সব কোরক করে নেবে। গেলি গেলি না হয় বলে যা যে কোথায় যাচ্ছিস্—লোক দৌড়ে গিয়ে ডেকে আনতে পারে। • সাক্ষী দিতে হবে তার ভয়টা কিসের ? সাক্ষী কি বিশ্ব বাঙ্গালায় কেউ আর কখনও দেয়নি, তুই প্রথম দিচ্ছিস্ ? জজ মাজিষ্টররা বাঘ না ভালুক, তোকে খেয়ে ফেলবে ? যা হোক, সে বাড়ী এলেই আমার কাছে ধূলোপায়ে তাকে পাঠিয়ে দিও—নইলে তার সমূহ বিপদ—সমূহ বিপদ!"

এই কথাগুলি বলিয়া গজেন্দ্রগমনে গদাই কাছারিতে ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে বিশ্বাস, কেনারাম যেখানে লুকাইয়া আছে সেখানে বসিয়া সমস্ত কথাই শুনিতে পাইয়াছে। ভয়ে দিশাহারা হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে নিশ্চয়ই কাছারিতে আসিবে এবং বলিবে আমি এই মাত্র অমুক স্থান হইতে বাড়ী ফিরিলাম।

স্নানাহার করিয়াই গদাই কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিল

কিন্তু কেনারামের আগমন প্রতীক্ষায় তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। অপরাহ্নে উঠিয়া গোরুর গাড়ী করিয়া কল্যাণপুর যাত্রা করিল। কাছারিতে বলিয়া গেল কেনারাম যদি আসে তবে তৎক্ষণাৎ লোক সঙ্গে তাহাকে যেন দারোগার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গদাই পালের গাড়ী কল্যাণপুর প্রবেশ করিল। দীঘির কোণে পৌঁছিবামাত্র দেখিতে পাইল, হরিদাসী জলের কলসী কাঁখে করিয়া উঠিয়া আসিতেছে। দুজনে চোখে চোখে বার্ত্তাবিনিময় হইয়া গেল।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া, গাড়োয়ানকে দিয়া গদাই অঙ্গন ও গৃহাদি কতকটা পরিষ্কার করাইয়া লইল। দীঘি হইতে দুই কলসী জল আনাইয়া লইল। গাড়োয়ান তখন জলখাবারের পয়সা লইয়া, গাড়ী সেইখানে রাখিয়া, গোরু দুইটাকে খুলিয়া লইয়া, তাহার কোনও আত্মীয়ের বাড়ী রাত্রির মত আতিথ্যগ্রহণ করিতে গেল। গদাই বলিয়া দিল, কল্য প্রাতেই আবার যাত্রা করিতে হইবে।

রাত্রি ক্রমে নয়টা বাজিল। দরিয়াপুর হইতে লুচী প্রভৃতি আনিয়াছিল, তাহার দ্বারাই রাত্রিভোজন সমাধা করিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে হুঁকা হাতে করিয়া গদাই বসিয়া আছে।

অল্পক্ষণ পরেই সদর দরজার শিকল ঝম্ ঝম্ করিয়া উঠিল।

গদাই উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া বলিল—"হরিদাসী—এস।"

প্রবেশ করিয়া, দরজায় খিল দিয়া হরিদাসী বলিল—"তোমার কি আক্কেল! দরজাটা খুলে রাখতে হয় না? শিকল ঝম্ ঝম্ করলাম—কেউ যদি শুনতে পেয়ে থাকে?"

গদাই বলিল—"এত সকালে তুমি আসবে তা কি জানি হরিদাসী? আমি ভেবেছি রাত্রি দশটার কম তুমি আসতে পারবে না। আজ এত সকালে তুমি ছুটি পেলে কি ভাগ্যি?"

হরিদাসী বারান্দায় উঠিয়া বলিল—"আমার ত এখন অষ্টপ্রহরই ছুটি। গিন্নী যে পশ্চিম গেছেন।"

"পশ্চিম গেছেন? কবে গেলেন?"

"কাল রাত্রে গেছেন। শোননি বুঝি? বাবুর যে বড় ব্যারাম। বস্তিনাথ থেকে তার এসেছিল। ছোট বাবু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম গেলেন।"

"বাবুর কি ব্যারাম হয়েছে কিছু শুনেছ?"

"জ্বরবিকার।"

"ছোট বাবু কোথা গিয়েছিলেন না? এলেন কবে?"

"কাল সকালবেলাই এসে পৌঁছেছিলেন। দুপুর বেলা তার এল, রাত্রে রওয়ানা হলেন।"

"তাইত!—বড় ভাবনার কথা হল।"

"ভাবনার কথা নয় আবার? বাবা বস্তিনাথের কৃপায় বাবু শীগ্‌গির ভাল হয়ে দেশে ফিরে আসুন। কাল থেকে বাড়ীসুদ্ধ কারু মনে সুখ নেই।"

"তাইত—বড় ভাবনার কথা হল যে!"—বলিয়া গদাই কিয়ৎক্ষণ মৌন হইয়া অধোবদনে রহিল। তাহার ভাবনাটা হরিদাসীর হইতে ভিন্নজাতীয়। তাহার আশঙ্কা হইতেছে, মোহিত সম্বন্ধে বাবুর কাছে যে মিথ্যা অভিযোগগুলি সে সৃজন করিয়াছে, সেগুলি ধরা না পড়িয়া যায়। অবশেষে একটি ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ভগবান যা করবেন তাই হবে। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই।"

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে বসিয়া রহিল। ক্রমে গদাধরের মনে হইল, ইহা ত ঠিক হইতেছে না। টাকা চতুর্গুণ হইয়াছে দেখিলে হরিদাসীও নিজের কিছু টাকা আজ বাক্সে দিবে—এই আশা করা যাইতেছে। কিন্তু মন এমন ভারি হইয়া থাকিলে নাও দিতে পারে। একটু হাসিখুসীর হাওয়ায় মনটা বেশ হাল্কা থাকিলেই কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। একটু কৌশল করিতে হইতেছে। বলিল—"হরিদাসী, তুমি কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ হয়ে এসেছ ত?"

"হ্যাঁ। এখন বাক্স খোলা হবে?"

"রোসো, আগে দশটা বাজুক। একটু গভীর রাত্রি না হলে মা কালীর ডাকিনী যোগিনীরা বেরোয় না। আমরা ততক্ষণ সময় নষ্ট না করে, মা কালীর চরণামৃত একটু একটু খাই এস। আজ যদি মা কালী আমাদের পানে মুখ তুলে চান—তা হলে আর আমাদের পায় কে? বিয়ে করে দুজনে টাকার বস্তার উপর বসে থাকব। আমি কাপড় ছেড়ে চরণামৃতটুকু নিয়ে আসি।"

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া গদাই তাহার সেই লাল চেলি খানি পরিধান করিল। তাহার পর একটা বোতল বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ তরলপদার্থের অর্দ্ধাংশ পরিমাণ একটা তাম্র কমণ্ডলুতে ঢালিয়া বাহির হইয়া আসিল! বসিয়া বলিল—"যাও ত হরিদাসী, ঘরের মধ্যে জলচৌকির উপর পাথরবাটি আছে, দুটো নিয়ে এস।"

হরিদাসী পাথরবাটি আনিয়া একটা নিজে লইল একটা গদাইকে দিল। বলিল—"ও চরণামৃত কোথা পেলে?"

কমণ্ডলুটির প্রতি ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া গদাই বলিল—"এ এসেছে অনেকদূর থেকে। কামরূপ কামিখ্যে থেকে একজন সাধু এনেছিল, আমায় খানিকটে দিয়েছে।"—বলিয়া নিজের বাটি পূর্ণ করিয়া, হরিদাসীর বাটি অর্দ্ধেকটা ভরিয়া দিল।

নিজের পাত্রটি নিঃশেষে পান করিয়া গদাই বলিল—"জয় মা কালী বলে খেয়ে ফেল।"

হরিদাসী পাত্রটি মুখের কাছে লইয়া গিয়া বলিল—"ওমা!—এযে দুর্গন্ধ!"

গদাই বলিল—"চুপ চুপ ক্ষেপি! ও কথা বলতে আছে? দুর্গন্ধ নয়—সুগন্ধ, সুগন্ধ। কামিখ্যে মার প্রতিমার নীচে কুণ্ড আছে কিনা,—সেই কুণ্ড থেকে ও চরণামৃত তুলে আনা। সেখানে রাশি রাশি ফুল বিল্বিপত্র রাতদিন পড়ছে কি না—সেই ফুল বিল্বিপত্র পচে পচে ও রকম-সুগন্ধ হয়েছে। বাঁ হাতে নাকটি টিপে, ডানহাতে ধরে ঢুক করে খেয়ে ফেল।"

হরিদাসী উপদেশানুসারে পান করিয়া, বাটি নামাইয়া রাখিয়া, নাক মুখ শিটকাইয়া বলিল—"মাগো—কি সুগন্ধ! ছি ছি—রাম রাম!"

গদাই নিজে আর একপাত্র ঢালিয়া বলিল—"ওকি হরিদাসী? ছি ছি—রাম রাম বলতে আছে? কার চরণামৃত জান? স্বয়ং মা কামরূপ কামিখ্যে দেবীর চরণামৃত। তুমি বল্লে ছি ছি? জিভ্যে খসে যাবে যে!—তাঁর চেয়ে জাগ্রত কালী কলিতে আর আছে না কি?"—বলিয়া গদাই পাত্রটি ধরিয়া চুমুক দিল। তাহার পর কোঁচার খুঁট গলায় জড়াইয়া, যুগ্মকরে প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"হে মা কামরূপ কামিখ্যে কালী, হরিদাসীর অপরাধ নিও না মা। ও নিতান্ত ছেলে মানুষ, অজ্ঞান, অল্পবুদ্ধি। ওর কথা ধরতে নেই মা। মাফ কর মা, দোহাই মা, সাত দোহাই তোমার।"

গদাধরের আচরণ দেখিয়া হরিদাসী কতকটা ভয়ে কতকটা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, গদাই নিজে এক পাত্র ঢালিয়া, হরিদাস র বাটি বারো আনা রকম পূর্ণ করিয়া দিল। হরিদাসী বলিল—"আর না, আর আমি খেতে পারব না।"

গদাই বলিল—"খাও—না খেলে অপরাধ হবে। প্রথম বার খেয়ে তুমি নাক শিটকেছ—ছি ছি বলেছ। তাতেই তোমার ভয়ানক পাপ হয়েছে। টাকাগুলো চারগুণ না হয়ে একেবারে উড়ে না গেলে হয়। তা হলে আমাদের বিয়েও হয়েছে—আমরা বড়লোকও হয়েছি!—খাও—খেয়ে বল আঃ মার চরণামৃত খেয়ে প্রাণটা শীতল হল।"

হরিদাসী তখন সেটুকু কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া বলিল—"আঃ—মার চরণামৃত খেয়ে প্রাণটা শীতল হল। বলি হেঁগা, 'ঝাঁঝ' বলতে আছে?"

গদাই নিজের পাত্রটি পান করিয়া বলিল—"আছে।"

"আচ্ছা, এত ঝাঁঝ কেন?"

গদাই হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ—মা কামিখ্যে কালীর চরণামৃতে ঝাঁঝ হবে না ত কি তোমার এই সব মেঠো কালী ঘেটো কালী কাঠ-কুড়ুনি কালীর চরণামৃতে ঝাঁঝ হবে? ঝাঁঝ যাকে বলছ সেটা আসলে মা কালীর শক্তি—ব্রহ্মতেজ।"

হরিদাসী বলিল—"খুব তেজ কিন্তু। আমার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠেছে।"

"হবে না? কামরূপের কামিখ্যে কালীই হলেন সব চেয়ে জাগ্রত দেবতা। তার নীচেই কালীঘাটের কালী। তুমি কখনও কালীঘাটে যাওনি ত?"

"নাঃ।"—হরিদাসীর চক্ষু এখন উজ্জ্বল—নাসিকা স্ফীত—নিশ্বাস প্রবল।

গদাই অত্যন্ত ভাবসিক্ত হইয়া বলিল—"আচ্ছা আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক্—তারপর তোমায় কালীঘাটের কালী, কামিখ্যে কালী, সব দেখিয়ে আনব।"

হরিদাসী বলিল—"আমাদের বিঃ—বিয়ে কঃ—কবে—হবে?"

হরিদাসীর কথা জড়াইয়া আসিয়াছে দেখিয়া গদাই ভাবিল, ঔষধ ধরিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া বলিল—"মা কালীর যদি দয়া হয় তবে বিয়ের আর ভাবনা কি হরিদাসী? আজ যদি দেখি আমার সে পঞ্চাশ টাকা দুশো টাকা হয়েছে তা হলে মাসখানেকের পরেই বিয়ে হবে। আজ হ'ল গিয়ে ২৪শে অগ্রহায়ণ—এ মাসে আর দিন নেই। পৌষমাসে ত হিঁদুর বিয়ে হবারই যো নেই। মাঘমাস পড়তেই শুভকর্ম্ম সেরে ফেলা যাবে।"

"কক্‌ঃ—কলকাতায় যেতে হবে? কালীঘাটের কালী আমায় দেখাবে?"

"দেখাব বৈকি। কালী দেখাব—চিড়িয়াখানা দেখাব—যাদুঘর দেখাব। একদিন থিয়েটার শুনতে নিয়ে যাব।"—বলিয়া গদাই নিজের জন্য আর এক পাত্র ঢালিল। তাহা দেখিয়া হরিদাসী বলিল "আ—আমাকেও দা—দাও।"

গদাই বলিল—"না, তোমার আর খেয়ে কাজ নেই। তুমি মেয়ে মানুষ বই ত নয়, বেশী ব্রহ্মতেজ সহ্য করতে পারবে না।"

হরিদাসী বলিল—"একটুখানি।"

গদাই হাসিয়া তাহার বাটিতে অল্প একটু ঢালিয়া দিল। হরিদাসী সেটুকু পান করিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া বলিল—"মায়ের চঃ—চর্ণ খেয়ে প্রাণটা শীতল্ল।"

গদাই তখন তাহাদের বিবাহ এবং ভাবী সুখসম্পদের চিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতে লাগিল। তাহাকে আর চাকরি করিতে হইবে না। মন্ত্রবলে টাকা বাড়াইয়া বাড়াইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে। কলিকাতায় একখানা এবং কাশীতে একখানা বাড়ী নির্ম্মাণ করিবে। গদাই বলিল দ্বিতল—হরিদাসী বলিল ত্রিতল না হইলে মানাইবে না। এরূপ কথোপকথনে দশটা বাজিল।

গদাই বলিল—"আর দেরী করা নয়। আসন পেতে ধুনোটুনো জেলে দাও।"

হরিদাসী উঠিয়া টলিতে টলিতে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিল। গদাই তখন কাঠের বাক্সটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল—"ঈশ্‌—বড্ড ভারি হয়েছে।"

"দেখি?"—বলিয়া হরিদাসী বাক্সটি নিজহস্তে লইয়া দুইবার ঝাঁকানি দিল। ভিতরে টাকা ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

গদাই আসনে বসিয়া, বাক্সটি সম্মুখে রাখিয়া লাল-সূতার বন্ধনের উপর একশত আট বার মন্ত্র জপ করিল। পরে বলিল—"হরিদাসী—বাক্স খুলে ফেল।"

আঁচল হইতে চাবি বাহির করিয়া হরিদাসী তালা খুলিল। গদাই টাকা গণিয়া থাকে থাকে সাজাইতে লাগিল। অবশেষে দেখা গেল ঠিক ২০৮৲ হইয়াছে। গদাই আনন্দে যুগ্মহস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিল—"জয় মা কালী। এমনি দয়া যেন চিরদিন থাকে মা।"

হরিদাসীকে তাহার আটটি টাকা গণিয়া দিয়া বাকী-গুলি গদাই ভিতরে গিয়া সিন্দুকে তুলিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আর একটা ঘলঘসের শিকড় তুলে ফেল হরিদাসী। ত্রিশ টাকা মাইনে পেয়েছিলাম তার পনেরটি খরচ করেছি, পনেরটি আছে। আগেকার সেই দশ ছিল। পঁচিশটি টাকা আবার রাখি, একশো হবে এখন। সবসুদ্ধ তিনশো হলে আমাদের বিয়েটা খুব ধুমধাম করেই হতে পারবে।"

প্রদীপ লইয়া গদাই হরিদাসীর সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গনের প্রান্তে গেল। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে শিকড় তোলা হইল। গদাই ২৫৲ বাক্সে রাখিলে হরিদাসী বলিল—"দেখ, আমারও কিছু টাকা রাখলে হয় না?"

"বেশ ত। গিয়ে নিয়ে এস।"

"সঙ্গেই কিছু এনেছি—সামান্য।"

সামান্য শুনিয়া গদাইয়ের মনটি ছোট হইয়া গেল। বলিল—"আচ্ছা—যা এনেছ দাও।"

হরিদাসী কোমর হইতে একটি থলিয়া বাহির করিয়া পঞ্চাশটি টাকা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিয়া বলিল—"আমা-রও দুশো হবে?"

"নিশ্চয়—নিজের চোখেই ত দেখলে।"—বলিয়া গদাই বাক্স বন্ধ করিতে উদ্যত হইল।

হরিদাসী বলিল—"দাঁড়াও—দাঁড়াও—আরও কিছু দিলে হয় না?"

গদাই কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"তোমার ইচ্ছে। যত দেবে ততই বাড়বে।"

হরিদাসী বলিল—"আগে ভেবেছিলাম, প্রথমবার পঞ্চাশ টাকা দিয়েই দেখি। কিন্তু পরীক্ষা ত হয়েই গেল, দেরী করে আর কি হবে? —আরও একশো"—বলিয়া কোমরের মধ্যে হইতে একটি বৃহত্তর থলি বাহির করিয়া ঢালিয়া দিল। গদাই টাকাগুলি গণিয়া বাক্সে ভরিয়া ডালা বন্ধ করিবার উপক্রম করিল।

হরিদাসী বলিল—"থাম-থাম। এখন বন্ধ কোরো না। আচ্ছা, একখানা নোট যদি রাখা যায় ত চারখানা হবে?"

গদাই মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিল—"হতেই হবে। মা কালীর হুকুম। নোট কি বলছ, যদি একটা খোলামকুচি এতে রেখে দাও ত চারটে খোলামকুচি হয়ে যাবে।"

হরিদাসী তখন আঁচলের গিরে খুলিয়া খানকতক নোট গদাইয়ের হাতে দিল। গদাই গণিয়া দেখিল, দশখানা আছে-দশটাকার করিয়া। হরিদাসী বলিল—"দেড়শো আর এই একশো—আড়াইশো। আমার হাজার টাকা হবে ত?"

"না হয়ে যায় কোথা? এবার বাক্স বন্ধ করি?"

"কর।"

"দেখ ভেবে চিন্তে। আর কিছু রাখতে হয়ত রাখ।"

"আর কিছু সঙ্গে নেই।"

"গিনি টিনি?"

"না। অন্যবারে দেখা যাবে।"

গদাই বাক্স বন্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিল। শেষে হরিদাসী বলিল—"রাত্রি হয়েছে, এখন আসি। আবার কবে আসবে?"

"একমাস পরে চতুর্দ্দশীর রাত্রে ত আবার আসবই। মাঝেও দুই একবার আসতে পারি।"

"বেশ করে মন্তর পোড়ো। হাজারটি টাকা আমার পাওয়া চাই।" বলিয়া হরিদাসী প্রস্থান করিল।

গদাই খিল দিয়া আসিয়া আর এক পাত্র "চরণামৃত" পান করিল। শয্যায় শয়ন করিয়া আপন মনে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল—"একদমে আড়াইশো টাকা লাভ। গদাধরের বৃহস্পতির দশা চলছে। একজন ভাল দৈবজ্ঞ পেলে জিজ্ঞাসা করি, এ দশা আমার আর কতদিন থাকবে।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বসন্ত মহল্লা

গুরু সেবন কর নমস্কার।
আজ হামারে মঙ্গল চার॥
আজ হামারে গৃহ আনন্দ।
চিন্ত লথি ভেট গোবিন্দ॥
আজ হামারে গৃহ বসন্ত।
গুন গাই প্রভু তুম বিয়ন্ত॥
আজ হামাবে বনে ফাগ।
প্রভু সঙ্গি মিল খেলন লাগ॥
হোলি কিনি, সন্ত সেব।
রঙ্গ লাগা আত লাল দেব॥
মন তন মঁলিও অতি অনূপ।
সুখ নাহিন ছাওন ধূপ॥
সগলি ঋতু হয়েয়া গোবে।
সদ বসন্ত গুরু মিল দেবে॥
বৃক্ষ জমিও হায় পারজাত।
ফুল লাগে ফল রতন ভাত॥
তৃপ্ত অঘানে হর গুন গায়।
জন নানক, হর হর হর ধ্যায়॥

—গুরু অর্জ্জুন দেব।

—(হে মন) পরেমেশ্বরে সেবা ও নমস্কার কর। আজ আমার মঙ্গল উৎসব, আজ আমার গৃহে আনন্দ, চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ ভজনা কর। আজ আমার গৃহে বসন্ত (হে মন) তুমি অনন্ত হইয়া প্রভুর গুণগান কর। হোলি কি?—সন্ত সেবা। (ভক্তি রূপ) বিশুদ্ধ লাল রঙ্গে রঙ্গিন কর (সে রঙ্গে মলিনতা জন্মে না) মন ও দেহ অতি অনূপ হইয়াছে, সুখ রৌদ্রাচ্ছাদিত হয় না। সমস্ত ঋতু হরিৎবর্ণ ধারণ করিয়াছে। পরমেশ্বরের সহিত মিলনই সদাবসন্ত। (মনে) এক পারিজাত বৃক্ষ জন্মিয়াছে যাহার ফুল রত্নের

মত প্রতীয়মান হয়। (মন) তৃপ্ত হইয়া ঈশ্বরের গুণ গান করে। নানক পরম ঈশ্বরের ধ্যান করে।

রবীন্দ্র সেন।

পুস্তক-পরিচয়

মহাজন-সখা—

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। ১৩১৮। ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ক পুস্তক। ইহাতে আলোচিত হইয়াছে ব্যবসায়ীর *কর্ত্তব্য; বিবিধ ব্যবসায়; রেলওয়ের সংবাদ; কোন প্রকার জিনিষ কোন স্থানে ভালো ও সস্তা পাওয়া যায়; কোন স্থানে কি কি* জিনিষের ব্যবসায় চলে। ব্যবসাদারেরা ইহাতে অনেক সংবাদ ও উপদেশ সংগৃহীত পাইবেন।

নিবেদন—

শ্রীরজনীকান্ত মিত্র, বি, এ, কর্ত্তৃক পঠিত বক্তৃতা। প্রকাশক কমলা প্রেস, খুলনা। মূল্য ৵০ আনা। ১৩১৮। চন্দ্রকুমার নাগের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে তাঁহার বংশধরের গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে কায়স্থগণের নব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একতাবন্ধনের চেষ্টাকে সাধুবাদ করিয়াছেন এবং এই চেষ্টার বিরুদ্ধচারী ব্রাহ্মণদিগকে সমাজহিতের জন্য সমাজকে উন্নত ও সংহত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। উভয় জাতি এখন জ্ঞানে বিদ্যায় আচারে অনুষ্ঠানে প্রায় সমতুল্য। এখন উভয় জাতি একটা রফা করিয়া সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিলে উভয় জাতিরই মঙ্গল

মুদ্রারাক্ষস।

"সত্য, সুন্দর, মঙ্গল"—

ভিক্টর কুজ্যাঁ প্রণীত ফরাসী গ্রন্থ হইতে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত। ৩৬৯ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ভিক্টর কুজ্যাঁ (Victor Cousin)—ফরাসী দেশীয় একজন খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "Du vrai, du beau, du bien"—"সত্য, সুন্দর, মঙ্গল"। এই গ্রন্থ অতি প্রাঞ্জল এবং উপাদেয়। ১৮৫৩ সালে ইহা ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয় কিন্তু এই অনূদিত গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পাঠকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন।

গ্রন্থের অবতরণিকা হইতে কুজ্যাঁর দার্শনিক মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

কুজ্যাঁর দর্শনে তিনটি বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রণালী, তাঁহার প্রণালী-প্রসূত কার্য্যফল বা সিদ্ধান্ত এবং ইতিহাসে বিশেষতঃ দর্শনের ইতিহাসে ঐ প্রণালী ও সিদ্ধান্তের প্রয়োগ। তাঁহার প্রণীত দর্শন সাধারণতঃ সমন্বয়বাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা গৌণভাবে সমন্বয়াত্মক। সমন্বয়বাদ একটা বিশেষ মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে নিষ্ফল হয়। কুজ্যাঁ নিজেই বলিয়াছেন, সেরূপ সমন্বয়বাদকে প্রকৃত সমন্বয়বাদ বলা যায় না, উহা দর্শনের একটা নিষ্ফল ও অন্ধ সংগ্রহ মাত্র। সমন্বয়বাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা বিশেষ দর্শনপদ্ধতি আবশ্যক। তাঁহার মতে পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত ও ঐতিহাসিক দর্শন—ইহারা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ।

পর্য্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তনির্ণয়—ইহাই তাঁহার দার্শনিক প্রণালী। কুজ্যাঁ বলেন এই পর্য্যবেক্ষণপ্রণালীই দর্শনের প্রকৃত প্রণালী। আমাদের আত্মচৈতন্য—যাহাতে অনুভবসিদ্ধ সমস্ত মানসিক ব্যাপার প্রকাশ পায়—সেই আত্মচৈতন্যক্ষেত্রে এই প্রণালী বিশেষরূপে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এই প্রণালীর প্রয়োগফলেই মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি। কি তত্ত্ববিদ্যা কি মনোবিজ্ঞান, কি ইতিহাস দর্শন, সমস্তেরই প্রকৃত পত্তনভূমি মানসিক পর্য্যবেক্ষণ। কুজ্যাঁ বলেন, আত্মচৈতন্যে অনুভূত প্রত্যক্ষ তথ্যগুলি হইতেই বৈধ অনুমানের দ্বারা দার্শনিক সত্যে উপনীত হওয়া যায়। মানসিক পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা, অন্তঃকরণের এই তিনটি তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। ইন্দ্রিয়বোধ, স্বৈচ্ছিকক্রিয়া বা স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা (Reason)। এই তিনটি ব্যাপার বিভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত হইলেও আত্ম-চৈতন্যে উহাদের পৃথক সত্তা নাই। ইন্দ্রিয়বোধ বা ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয় অবশ্যম্ভাবী। উহাদের ক্রিয়া আমাদের নিজের উপর আরোপ করিতে পারি না। প্রজ্ঞার বিষয়গুলিও এইরূপ অবশ্যম্ভাবী (Necessary)। ইন্দ্রিয়বোধের ন্যায় প্রজ্ঞাও আমাদের ইচ্ছাসম্ভূত নহে। আত্ম-চৈতন্যের দৃষ্টিতে, আমাদের স্বেচ্ছামূলক ক্রিয়াগুলিই ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। ইচ্ছাবৃত্তিই আমার অন্তরস্থ "ব্যক্তি," আমার "আমি।" এই "আমি"ই আমাদের মানসিক জগতের কেন্দ্র, উহাকে ছাড়িয়া চৈতন্য অসম্ভব। আমাদের সমস্ত চৈতন্য প্রজ্ঞার আলোকেই আলোকিত। এই প্রজ্ঞা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে, ইন্দ্রিয়-বোধকে উপলব্ধি করে, ইচ্ছাবৃত্তিকে উপলব্ধি করে। অতএব উক্ত তিন অবিচ্ছেদ্য মূল উপাদান লইয়াই আমাদের চৈতন্য। কিন্তু প্রজ্ঞাই আমাদের জ্ঞানের—এমন কি আত্মচৈতন্যেরও অব্যবহিত পত্তনভূমি।

প্রজ্ঞা সম্বন্ধীয় মতবাদটিই কুজ্যাঁর দর্শনতন্ত্রের একটি মুখ্য বিশেষত্ব। তাঁহার মতে, মানসিক পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা আমরা যে প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করি, সেই চৈতন্যগত প্রজ্ঞার প্রকৃতি নির্ব্বিশেষ, অর্থাৎ অব্যক্তিগত। আমরা উহার প্রবর্ত্তক নহি। উহার প্রকৃতি ব্যক্তিত্বধর্ম্মের ঠিক বিপরীত। উহা অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক। জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বগুলি মনোবিজ্ঞান-ক্ষেত্রে স্বীকার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহা বিশেষ রূপে প্রতিপাদন করা আবশ্যক যে এই তত্ত্বগুলি সম্পূর্ণরূপে অব্যক্তিগত বা ব্যক্তিত্ব নিরপেক্ষ। কাণ্ট তাঁহার মানসিক বৃত্তিসমূহের বিশ্লেষণে এই কথাটির উল্লেখ করেন নাই। কুজ্যাঁর বিশ্বাস চৈতন্যপর্য্যবেক্ষণ-পদ্ধতির সাহায্যে, এই মুখ্য তত্ত্বটি দর্শনে সন্নিবেশ করিয়া তিনি দর্শনের পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। স্বেচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন স্বাধীন আত্মার সম্বন্ধসূত্রেই প্রজ্ঞা বিষয়ীস্থানীয় বা ব্যক্তিস্থানীয়। কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বিশেষ। ইহা বিশ্বমানবের অন্তর্ভূত কোন আত্মারই নিজস্ব নহে; এমন কি বিশ্বমানবেরও নিজস্ব নহে। যথাযথরূপে বলিতে গেলে, বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবই প্রজ্ঞার নিজস্ব; কেননা, প্রজ্ঞার নিয়মগুলি ব্যতীত, উভয়েরই উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সেই নিয়মগুলি কি? কুজ্যাঁর মতে, প্রজ্ঞার দুইটি মুখ্য নিয়ম; এক কার্য্যকারণের নিয়ম; আর এক বস্তুসত্তার নিয়ম। এই দুই নিয়ম হইতে অন্য নিয়মগুলি প্রবাহিত হয়। এই দুই নিয়ম হইতে, আমরা একটি ব্যক্তিগত সত্তায় আসিয়া স্বাধীন আত্মসত্তায় আসিয়া উপনীত হই। এবং অন্যদিকে অব্যক্তিগত "আমি-না"-তে আসিয়া, বিশ্বপ্রকৃতিতে আসিয়া, একটি শক্তিজগতে আসিয়া উপনীত হই। মনোযোগের ক্রিয়া ও ঐচ্ছিকক্রিয়ার হেতু বা মূলপ্রবর্ত্তক যেরূপ আমরা নিজেকে মনে করি সেইরূপ, ইন্দ্রিয়বোধসমূহের হেতু আমার বাহিরে অবস্থিত এরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। তাই এই বাহ্য জগতের অস্তিত্ব আমার নিজের অস্তিত্বেরই ন্যায় বাস্তব ও নিশ্চিত বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয়।

কিন্তু এই "আমি" ও "আমি-না" এই দুই শক্তি; পরস্পরের সম্বন্ধে সসীম—উভয়ই উভয়ের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই দুই শক্তির সসীমতা হইতে আমরা একটি পরম কারণের ধারণায়—অসীমের ধারণায় উপনীত হই। এই কারণটি আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, এবং এই কারণে উপনীত হইয়া আমাদের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয়। এই কারণই ঈশ্বর। তিনি বিশ্বমানবের সহিত, বাহ্য জগতের সহিত, এই কারণসূত্রে আবদ্ধ। যে হিসাবে তিনি ঐকান্তিক কারণ, সেই হিসাবেই তিনি ঐকান্তিক বস্তু। কিন্তু সৃষ্টি করিবার শক্তি তাঁহার স্বরূপগত, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তিনি সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারেন না।

ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ মত দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বিশ্বব্রহ্মবাদী বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহার উত্তরে এইরূপ বলেন,—"বাহ্যজগতের নিয়মাবলীকে ঈশ্বরের সহিত একীভূত করা, জগৎকে ঈশ্বরে পরিণত করা ইহাই প্রকৃত বিশ্বব্রহ্মবাদ। কিন্তু আমি, আত্মা ও বাহ্যজগৎ এই সসীমকারণদ্বয়ের পার্থক্য এবং উভয়ের সহিত অসীমকারণের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই দুই সসীম-কারণ অসীমকারণের বিকার বা প্রকার-ভেদ মাত্র, এইরূপ স্পিনোজার মত; কিন্তু আমার মত তাহা নহে। আমি বরং এই কথা বলি, উহারা স্বাধীন শক্তি, উহাদের ক্রিয়াশক্তি উহাদের আপনাদের মধ্যেই নিহিত। স্বাধীন সসীম সত্তার সম্বন্ধে এইটুকু ধারণাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তবে আমার মতে, এই দুই সসীম সত্তা সেই পরমকারণ-প্রসূত কার্য্য; উহারা পরমকারণের সহিত কার্য্যসম্বন্ধে আবদ্ধ। আমি যে ঈশ্বরের কথা বলি, সে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মবাদের ঈশ্বর নহেন, অথবা Eleatics সম্প্রদায় যেরূপ ঈশ্বরের ঐকান্তিক একতা প্রতিপাদন করিয়া বলেন যে, ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির বা বস্তুত্বের কোনপ্রকার সংস্রব থাকা অসম্ভব আমার ঈশ্বর সেরূপ ঈশ্বরও নহেন। আমি যে ঈশ্বরের প্রতিপাদন করি, সে ঈশ্বর ক্রিয়াশীল, সৃজনশীল, তাঁহার সৃজনশীলতা অবশ্যম্ভাবী। স্পিনোজা ও ইলিয়াকটিক্‌সদের ঈশ্বর বস্তু মাত্র। এইরূপ ঈশ্বরকে কোন অর্থেই কারণ বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের ক্রিয়া বা সৃষ্টিকার্য্য যদি তাঁহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে ত তিনি অবশ্যম্ভাবিতার অধীন। ইহার উত্তরে আমি বলি, প্রকৃত পক্ষে এই অধীনতা অধীনতাই নহে। ইহা স্বাধীনতার উচ্চতম রূপ। ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীনতা। ইহা চিন্তা-নিরপেক্ষ বা অচিন্তিত ক্রিয়াশীলতা। তাঁহার ক্রিয়া, প্রকৃতি ও ধর্ম্মবুদ্ধির সংগ্রাম হইতে উৎপন্ন নহে। তিনি অসীমভাবে স্বাধীন। মানুষের বিশুদ্ধতম স্বতঃপ্রবর্ত্তিত ক্রিয়াও ঐশ্বরিক স্বাধীনতার ছায়া মাত্র। ঈশ্বর স্বাধীনভাবে কার্য্য করেন, কিন্তু সে ইচ্ছা যদৃচ্ছাসম্ভূত নহে; অথবা অন্যরূপ কার্য্য করিলেও করিতে পারিতাম—এইরূপ বিকল্প-বুদ্ধিও তাঁহার কার্য্যে নাই। আমাদের ন্যায় তিনি চিন্তা করিয়া, কিংবা আমাদের ন্যায় ইচ্ছা করিয়া তিনি কাজ করেন না। তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়া, ইচ্ছাজনিত আয়াস ও কষ্ট হইতে যেরূপ বর্জ্জিত, অবশ্যম্ভাবিতার যান্ত্রিক ক্রিয়া হইতেও সেইরূপ বর্জ্জিত। আমাদের উপনিষদে ঠিক এই কথাই আছে। উপনিষদ বলেন—"স্বাভবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া", অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান বল ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ।

তাঁহার মতবাদের উপর উপনিষদের কিছু প্রভাব ছিল কিনা ঠিক বলা যায় না। তবে ভারতীয় দর্শনাদির প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাঁহার নিম্নলিখিত বাক্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়:— "ভারতের পুরাকীর্ত্তিস্বরূপ কাব্য দর্শনাদি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে এত তত্ত্ব এত গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করা যায় এবং য়ুরোপীয় প্রতিভা যেখানে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে সেই সব সিদ্ধান্তের সূক্ষ্মতার সহিত তুলনা করিয়া এতটা তফাৎ মনে হয় যে, আমরা প্রাচ্য প্রতিভার সম্মুখে নতজানু হইতে বাধ্য হই, এবং দেখিতে পাই এই মানবজাতির আদিম নিবাসই উচ্চতম দর্শনের জন্মভূমি।"

তাঁহার সমন্বয়বাদের অর্থ এই যে, তিনি মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি দর্শনের ইতিহাসে প্রয়োগ করিয়াছেন। চৈতন্যোপলব্ধ তথ্যসকলের সহিত; সকল প্রকার দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদগুলি মিলাইয়া, তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই:—প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দর্শনে যেসকল মানসিক ব্যাপার ও তত্ত্বের কথা আছে তাহা সত্য হইলেও, চৈতন্যে যে কেবল ঐগুলিই অবস্থিত এরূপ বলা যায় না; কিন্তু তাহাদের মতে, কেবল ঐগুলিই চৈতন্যকে অধিকার করিয়া আছে, সুতরাং প্রত্যেক দর্শন একেবারে মিথ্যা নহে, পরন্তু অসম্পূর্ণ। এই দর্শনগুলিকে সম্মিলিত করিলে, চৈতন্যের সমগ্রতার অনুরূপ একটি সমগ্র দর্শন সংগঠিত হইতে পারে। কেহ কেহ অজ্ঞানবশত মনে করেন, এই ভাবে দর্শন রচিত হইলে কতকগুলি দার্শনিক মতবাদের সংমিশ্রণ মাত্র হইবে, তাহার অধিক নহে। প্রত্যেক দর্শনের মধ্যে যাহা মিথ্যা, যাহা কিছু অসম্পূর্ণ তাহা বাদ দিয়া, তাহার সত্যাংশকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়া এইরূপ দর্শনের দ্বারা, একটী অখণ্ড সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

কুজ্যাঁর একজন ঘোরতর প্রতিপক্ষ সার উইলিয়ম হ্যামিলটন কুজ্যাঁর সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন;—"ভিক্টর কুজ্যাঁ একজন সুগভীর ও মৌলিক তত্ত্বদর্শী, একজন প্রাঞ্জলতাগুণবিশিষ্ট বাগ্‌বিভবসম্পন্ন সুলেখক; কি প্রাচীন, কি অর্ব্বাচীন উভয়কালের বিদ্যাতেই সুপণ্ডিত। দেশ, কাল, সম্প্রদায় ও ব্যবসায়গত সকল প্রকার অন্ধ সংস্কার হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত এইরূপ একজন দার্শনিক; এবং যাহার সমুন্নত সমন্বয়বাদ, সর্ব্বত্র সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, অতীব বিরুদ্ধপক্ষীয় দর্শনের মধ্যেও সত্যের অখণ্ডতার সন্ধান পাইয়াছে।" মূল গ্রন্থে একটী উপক্রমণিকা, ১৭টী অধ্যায় এবং একটী পরিশিষ্ট। কিন্তু এই বাঙ্গালা গ্রন্থে ১৪টী অধ্যায় দেওয়া হইয়াছে। অনাবশ্যক বোধেই বোধ হয় ২।১টী অধ্যায় অনুবাদ করা হয় নাই এবং একটী স্থলে দুইটী অধ্যায়কে অনুবাদে এক অধ্যায় করা হইয়াছে। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়:—প্রথম খণ্ডে সত্য:—(১) সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বের সত্তা; (২) সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূল তত্ত্বের উৎপত্তি নির্ণয়; (৩) সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বসমূহের প্রকৃত মূল্য; (৪) ঈশ্বর মূল তত্ত্বের মূল তত্ত্ব; (৫) যোগবাদের গুহ্যতত্ত্ব। দ্বিতীয় খণ্ডে সুন্দর:—(১) মানবমনে সৌন্দর্য্যজ্ঞান; (২) বাহ্য পদার্থের মধ্যে সুন্দর; (৩) শিল্পকলা; (৪) শিল্পকলার ভেদ নির্ণয়। তৃতীয় খণ্ডে মঙ্গল:—(১) মঙ্গল; (২) স্বার্থের নীতি; (৩) অন্যান্য অসম্পূর্ণ নীতিবাদ; (৪) ধর্ম্মনীতির প্রকৃত মূলতত্ত্ব; (৫) আপনার প্রতি এবং অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য।

গ্রন্থকার অনুবাদ সব স্থলে বিশদ করিতে পারেন নাই। যেমন:— "সামগ্রিক অবস্থা (concrete) হইতে সূক্ষ্মসার অবস্থায় (abstract) স্থূলতথ্য হইতে সূক্ষ্মতত্ত্বে কিরূপে উপনীত হওয়া যায়? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সেই প্রক্রিয়ার দ্বারা উপনীত হওয়া যায়—যাহাকে সার-নিষ্কর্ষণ বলে, কেবলীকরণ—abstraction প্রত্যাহৃত বলে।" ওয়াইট সাহেবের ইংরাজী গ্রন্থে এই অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে—How can we go from the concrete to the abstract? Evidently by that well-known operation which is called abstraction.

আর একটা স্থল এই:—"আরিষ্টটল্ যে বলেন বিশেষ পদার্থ সমূহের মধ্যে সার্ব্বভৌমতত্ত্ব অবস্থিতি করে, একথা অযৌক্তিক নহে। কেননা সার্ব্বভৌমতত্ত্বকে ছাড়িয়া বিশেষ পদার্থ থাকিতেই পারে না।" ওয়াইট সাহেবের অনুবাদ:—He is quite right in maintaining that universals are in particular things, for particular things could not be without universals.

"তাহা যদি হয় তবে সত্য বাস্তবতায় পরিণত একটা সূক্ষ্মভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে"—ওয়াইট সাহেবের অনুবাদ:—Truth is, then, only a realized abstraction.

"বিশেষ বিশেষ সুখজনক অনুভূতি সমূহ যখন সামান্যে পরিণত হয় তখন তাহা 'উপযোগী' এই নাম ধারণ করে।" ওয়াইটের অনুবাদ:—The agreeable generalized is the useful.

"এই মূল তত্ত্বগুলি ঈশ্বরের উপাধি ভিন্ন আর কিছুই নহে।" ইংরাজী অনুবাদ:—These absolutes are nothing else than the attributes of God. "সার সত্য সার সত্তারই উপাধি"—Absolute truth is an attribute of absolute being.—উপাধি এবং attribute এক কথা নহে।

"উদার-চেতা মনুষ্যমাত্রই স্বার্থের নীতিকে পরিহার করিয়া ভাবের নীতিকে আশ্রয় করে।" "ভাবের নীতি" কথাটা বুঝা যাইতেছে না। ইহার ইংরাজী—Against the ethics of interest, all generous souls take refuge in the ethics of sentiment.

অনুবাদ যে ২।১টা স্থলে দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে এজন্য অনুবাদকই যে একমাত্র দায়ী তাহা নহে। বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ণতা ইহার অন্যতম এবং প্রধান কারণ। একেত বিষয় অতি জটিল—তাহার উপর বাঙ্গালা ভাষায় দার্শনিক শব্দের বড়ই অভাব। কিছু লিখিতে হইলেই নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়। এ অবস্থায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ লেখা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু গ্রন্থকার গ্রন্থকে সরল করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তবে পাদটীকায় কিংবা একটী পরিশিষ্টে দার্শনিক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা থাকিলে পাঠকগণের বিশেষ সুবিধা হইত। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এই সমুদয় অভাব বিদূরিত হইবে।

মোটের উপর গ্রন্থ সুন্দর হইয়াছে; ইহা পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি দার্শনিক পাঠকগণ ইহার এক খণ্ড ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করিবেন।

মার্কাস্ অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা—

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং শ্রীযুক্ত লালবিহারী বড়াল (বড়ালপাড়া, হুগলী) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৯৫ (১৬ পেজী ছয় ফর্ম্মা)। কাপড়ে বাঁধান, মূল্য ১৲ এক টাকা।

রোমসম্রাট মার্কাস্ অরিলিয়াস্ একজন ধর্ম্মপরায়ণ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার "আত্মচিন্তা" একখানা অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইউরোপের বিভিন্নভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষাতে ইহার একাধিক অনুবাদ আছে। ইহাদের মধ্যে George Longএর অনুবাদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহাদিগকে লং সাহেবের অনুবাদ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। (পুস্তকের নাম—The Thoughts of Marcus Aurelius Antoninus. Bill and Sons. Price 1*s*, 2*s*, 3*s*. 6*d* & 6*s*)। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না তাঁহারা এই বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়াও সম্রাটের 'আত্মচিন্তার' আভাস পাইবেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ করেন নাই; কতকগুলি চিন্তার ভাব লইয়া তিনি এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা সম্রাটের দুই একটী চিন্তার অনুবাদ দিতেছি:—

One man, when he has done a service to another, is ready to set it down to his account as a favour conferred. Another is not ready to do this, but still in his own mind he thinks of the man as his debtor, and he knows what he has done. A third in a manner does not even know what he has done, but he is like a vine which has produced grapes, and seeks for nothing more after it has once produced its proper fruit. As a horse when he has run, a dog when he has tracked the game, a bee when it has made the honey, so a man when he has done a good act, does not call out for others to come and see, but he goes on to another act, as a vine goes on to produce again the grapes in season. Must a man then be one of these, who in a manner act thus without observing it? Yes. (Long's translation).

বাঙ্গালা গ্রন্থে ইহারই ভাব এইরূপ দেওয়া হইয়াছে:—

"উপকার করিয়া কেহ কেহ প্রতিদানস্বরূপ তোমার নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা চাহিয়া থাকে; কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা বিনীত; তাহারা তোমার যে উপকার করে, তাহা মনে করিয়া রাখে এবং তুমি যে তাহার নিকট ঋণী কতকটা সেইভাবে তোমাকে দেখে। আর এক প্রকৃতির লোক আছে, তাহারা উপকার করে অথচ জানেনা যে তাহারা উপকার করিতেছে। উহারা কতকটা দ্রাক্ষালতার মত। দ্রাক্ষালতা ফল ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট; গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর ধারণ করে অথচ তাহার জন্য ধন্যবাদ প্রত্যাশা করে না। একটা শিকারী কুকুর যখন ভাল করিয়া তাহার কাজ করে কিংবা যখন কোন মৌমাছি একটু মধু সঞ্চয় করে তখন তাহারা কোন সোর-সরাবৎ (!) করে না। যাহারা উপকার করিয়া সে কথা কিছু মনে করে না, তাহাদিগেরই আচরণ আমাদের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।"

সম্রাট্ অপর স্থলে লিখিয়াছেন:—

"What more dost thou want when thou hast done a man a service? Art thou not content that thou hast done something conformable to thy nature and dost thou seek to be paid for it? Just as if the eye demanded a recompense for seeing or the feet for walking" (Long's translation).

বাঙ্গালা গ্রন্থে ইহার ভাবার্থ দেওয়া হয় নাই।

গ্রন্থ সুরচিত; ছাপা, কাগজ বাঁধাই—সবই অতি সুন্দর। দুইখানি হাফটোন ছবি আছে। এই প্রকার গ্রন্থের বহুল প্রচলন আবশ্যক। কিন্তু গ্রন্থকে অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য করা হইয়াছে। প্রকাশক মহাশয় যদি দুই কি তিন আনা মূল্যের একখানা অবাঁধান সংস্করণ প্রকাশিত করেন তাহা হইলে পাঠকগণের যথেষ্ট উপকার করা হইবে।

সাধনা বা ঈশ্বরদর্শনোপায়—

শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর সংযোগী ব্রহ্মচারী প্রণীত। ১৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸০।

গ্রন্থকার অবতরণিকাতে নিজেই নিজ গ্রন্থের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস তিনি সবই জানেন, সবই বুঝেন এবং সবই বুঝাইতে পারেন।

শিক্ষাবিজ্ঞান তৃতীয় বিভাগ ; শিক্ষাপ্রণালী—

[প্রথম খণ্ড] ভাষাশিক্ষা। গ্রন্থকার শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্.এ, অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ, কলিকাতা। ১১৯ পৃষ্ঠা ; মূল্য ॥৵০।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়—শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা (৪৮ পৃষ্ঠা)। এই অংশ আমরা ১৯১০ সালের অক্টোবর মাসের Modern Reviewতে সমালোচনা করিয়াছিলাম। গ্রন্থে আরও নয়টী অধ্যায় আছে। আলোচ্য বিষয় :—ভাবের প্রকৃতি ; ভাব ও ভাষা ; ভাষা-শিক্ষাপ্রণালী ; ভাষা-বৈচিত্র্য ; সংস্কৃত ভাষার বিশেষত্ব ; ইংরাজী ভাষার বিশেষত্ব ; ভাষা শিক্ষার ক্রমবিভাগ ; ইংরাজী শিক্ষা ; সংস্কৃত শিক্ষা।

প্রত্যেক অধ্যায়ই সুলিখিত এবং গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। শিক্ষকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন।

বঙ্গভাষায় শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তকের বড়ই অসদ্ভাব। এই অভাব মোচনে ব্রতী হইয়া বিনয় বাবু দেশের মহোপকার সাধন করিতেছেন ; এজন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

শান্তিপথ ও ধ্যানযোগ—

দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীসেবানন্দ স্বামিকর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ২৪৯। মূল্য ৸০ আনা। পুস্তক পাইবার ঠিকানা—ম্যানেজার, কাশীযোগাশ্রম, বেনারেস্ সিটি।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিষয়ে গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"মোহ, দৌর্ব্বল্য ও অবিদ্যাবরণ ভেদ করিয়া বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত হওয়াই জীবের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। এই বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত অবস্থা লাভ করিলে জীব অবিদ্যাবরণ ও মোহবিহীন হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করে। তখন জীব স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চিরসুখী ও কৃতার্থ হয়। কৈবল্য-স্বরূপ ভূমা ব্রহ্মলাভ করিয়া জীব চিরশান্তিতে অবস্থিত হয়।

"সেই মহীয়সী ব্রহ্মাবস্থা লাভের উপায়—কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ।

"এই তত্ত্ব উপনিষৎ, গীতা ও পাতঞ্জল আদি আর্য-গ্রন্থে সম্যক্‌রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতির সারস্বরূপ উপনিষৎ ও গীতা এবং পতঞ্জলি কৃত যোগশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া "শান্তিপথ ও ধ্যানযোগ" লিখিত হইল। পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত উপনিষত্তত্ত্ব বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে গীতা ও পাতঞ্জল প্রোক্ত নিষ্কাম-কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি আদির তত্ত্ব সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে।"

গ্রন্থের বিষয় এই :—(১) অবতরণিকা (তুমি কে?)। (২) জীবনের চিত্র ও আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসা। (৩) ঋষিগণের সিদ্ধিলাভ ও আর্য্যধর্ম্মের প্রচার। (৪) উপনিষদের উপদেশ, আত্মতত্ত্ব, জীবের বন্ধন ও বিমুক্তি। (৫) উপনিষদের উপদেশ, কৈবল্য লাভের উপায় ও জীবনের চরম লক্ষ্য। (৬) উপনিষদের উপদেশ, অভ্যাসযোগ ও সাধনের সহায়। (৭) জন্মপ্রবাহ বা সংসারস্রোত। (৮) নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ। (৯) ধ্যানযোগ। (১০) অষ্টাঙ্গযোগ। (১১) ঈশ্বর প্রণিধান ও ভক্তিযোগ। (১২) ভক্তের নির্ভরশীলতা। (১৩) জন্মমৃত্যুর অবসান ও মুক্তি। (১৪) ভগবৎ সঙ্গীত।

গ্রন্থের বিষয় অতি সুন্দর এবং গ্রন্থও সুলিখিত। পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা।

সান্টনিবাসী ফ্লেচরের লেখায় এইরূপ একটি মত প্রকাশিত হইয়াছে যে কোন মানুষ যদি কোন জাতির সমুদয় কথা ও কাহিনী ও গান রচনা করিতে পান, তাহা হইলে উহার আইনগুলি কে প্রণয়ন করে, তাহার খোঁজ লইবার তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। সোজা কথায় ইহার মানে এই যে লোকপ্রিয় সাহিত্য জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় ভবিষ্যৎ যেমন করিয়া গঠিত ও নির্দ্ধারিত করিতে পারে, আইনে তাহা পারে না। ফ্লেচারের মতটিতে কবিমাহাত্ম্য সুন্দর ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত জাতীয় চরিত্রকে যে ভাবে গড়িয়াছে, কোন্ শাসনকর্ত্তা নিজের প্রভাব সেইপ্রকারে, তেমন স্থায়ী ভাবে, বিস্তার করিতে পারিয়াছেন? সুতরাং কবির সম্মান স্বাভাবিক, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। অনেক স্থলে কবির জীবদ্দশায় সম্মানলাভ ঘটে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালে অনেক কবি জীবিত-কালেই বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছেন। তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। নরওয়ে দেশের বিখ্যাত কবি ইব্‌সেন্ যখন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করেন, তখন তাঁহার স্বদেশবাসীরা ত তাঁহাকে অসামান্য সম্মান* প্রদর্শন করিয়াই ছিল ; অধিকন্তু পৃথিবীর নানা-দেশ হইতে তাঁহার নিকট উপহার এবং সাদর অভিনন্দন প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার পর বৎসর নরওয়ের রাজ-ধানী ক্রিষ্টিয়ানিয়ায় তাঁহার এক সুবৃহৎ ধাতব মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।* মাছিমারা কেরানীকে সকলে উপহাসই করিয়া থাকেন ; সুতরাং আশাকরি অন্ধ অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া নরওয়ের উদাহরণ হইতে কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত

* On the occasion of his seventieth birthday (1898) Ibsen was the recipient of the highest honours from his own country and of congratulations and gifts from all parts of the world. A colossal bronze statue of him was erected outside the new National Theatre, Christiania, in September, 1899.—*The Encyclopaedia Britannica*, Eleventh Edition.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করিবেন না যে, ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইলে কোন কবিকে তাঁহার জীবিতকালে সম্মান প্রদর্শন কর্ত্তব্য নহে।

বর্ত্তমান বৎসর বৈশাখ মাসে কবি রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া একান্ন বৎসরে পদার্পণ করেন। তদুপলক্ষে বোলপুরে তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সবান্ধবে তাঁহার জন্মোৎসব করেন এবং তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করেন। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদের এমন আদানপ্রদান আমরা কখনও দেখি নাই। তৎপরে গত ১৪ই মাঘ কলিকাতা টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে বাঙ্গালী জাতির এক সভায় কবির সম্বর্দ্ধনা হয়। টাউনহলে এই উপলক্ষে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে যাহারা অল্পমাত্র বিলম্বে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিম্বা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সভাস্থলে আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। সাধুতা ও উন্নত চরিত্রের জন্য যাঁহারা সুপরিচিত, যাঁহারা জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাহারা সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী, যাহারা চিত্রে সঙ্গীতে বাণীর বরলাভ করিয়াছেন, যাহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও জ্ঞানানুশীলনে নিরত, যাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার প্রদীপ এখনও নিবিতে দেন নাই, যাহারা ব্যবহারাজীবের কার্য্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, যাহারা রাজনীতিকুশল, যাঁহারা বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যে বঙ্গের নবযুগের প্রবর্ত্তক, যাঁহারা আভিজাত্যে ও ঐশ্বর্য্যে বঙ্গের অগ্রণী, তাঁহাদের স্ব স্ব শ্রেণীর প্রতিনিধিকল্প বহুকৃতী পুরুষ ও মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গ-মাতার কন্যাগণও কবিকে প্রীতিভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হন নাই। গৃহধর্ম্মে নারীর সহকারিতা ব্যতিরেকে আর্য্যের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয় না। সমাজধর্ম্মেও যে এই নিয়ম অনুসৃত হইতেছে, ইহা অতি সুলক্ষণ। জাতীয় কবির সম্বর্দ্ধনা ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই মত পবিত্র। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন বঙ্গের যুবকগণ। তাঁহাদের উৎসাহদীপ্ত মুখশ্রী হলের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছিল। শ্রেষ্ঠ কবিরা আমাদিগকে আশার বাণী শুনান, সেই স্বপ্নলোকের কথা বলেন, যাহা ক্রমাগত মানুষের অন্তরে ও বাহিরে বাস্তবে পরিণত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে বাস্তব হইয়া যাইতেছে না। সুতরাং, আশা ও উৎসাহ যাঁহাদের প্রাণ, স্বপ্নলোকে বিচরণ যাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ, সেই তরুণবয়স্কেরা যে হাজারে হাজারে বঙ্গের কবিশিরোমণির সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

টাউনহলের সভা ভিন্ন আরও একদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ, এবং একদিন সম্বর্দ্ধনা কমিটির সভ্যগণ সান্ধ্য সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথকে প্রীতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; তিনি যে জীবিত বাঙ্গালী লেখকগণের মধ্যে প্রথম স্থানীয় ইহাও অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর, পক্ষপাতশূন্য সমুদয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর, বিশ্বাস; যাঁহারা তাঁহার গ্রন্থাবলী নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের, এবং বহুভাষাভিজ্ঞ কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তির, মত এই যে তিনি বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের মধ্যে আসন পাইবার যোগ্য। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের যে বিভাগে হাত দিয়াছেন, তাহাকেই অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও তাহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন,—তাহা তাঁহার প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বিশ্বসঙ্গীত শুনিয়াছেন; তাহার গদ্যরচনায় ও কবিতায় তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই। নয়নগোচর রূপের জগৎ, সৌন্দর্য্যের জগৎ অনেক কবি, অনেক বাঙ্গালী কবি, দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন,—তিনি এ বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা কম শক্তিশালী নহেন; কিন্তু ধ্বনির জগতের রূপ তাঁহার মত করিয়া অনুভব করিতে ও নিপুণতার সহিত অন্যকে অনুভব করাইতে অল্প লোকেই পারিয়াছে। শিক্ষা, সাধনা, শোক তাঁহাকে বিশ্বনাথের বাণী শুনিতে সমর্থ করিয়াছে। তাঁহার নানা রচনার মধ্য দিয়া তিনি পরব্রহ্মের প্রেরণায় আমাদিগকে বিশ্বনিয়মের ও বিশ্বনিয়ন্তার সহিত যোগ স্থাপন করিতে আহ্বান করিতেছেন।

মানবপ্রাণের নিগূঢ় মর্ম্মস্থলে পৌছিতে তাঁহার মত

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বৰ্দ্ধনা-সামগ্রী—
গজদন্তফলকে উৎকীর্ণ অভিনন্দন, রজত অর্ঘ্যপাত্র, স্বর্ণপদ্ম উপায়ন ও স্বর্ণসূত্রের মালা।

আর কোন্ বঙ্গীয় লেখক পারিয়াছেন? মানবের বাহ্য আচরণের আন্তরিক কারণ কে এমন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন? তাঁহার হস্তে বঙ্গসাহিত্য জাতীয় সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বসাহিত্যের সমশ্রেণীস্থ হইয়াছে। যে সকল আদর্শ, ভাব ও চিন্তার স্পর্শ, প্রভাব ও শক্তি বিশ্বমানবকে উন্নতির জন্য, নব আলোকের জন্য, নব জীবনের জন্য, চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহার রচনার মধ্যে অনুভব করিতেছে।

বাঙ্গলা ভাষায় যদি কেবল তাঁহারই রচনা থাকিত, তাহা হইলেও উহা বিদেশীদের শিখিবার যোগ্য হইত। কিন্তু তিনি কেবল সাহিত্যিক নহেন। তিনি ওস্তাদ্ না হইলেও, সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা লক্ষিত হয়। তিনি যে কেবল ভগবদ্‌ভক্তি ও অন্যান্য নানা-বিষয়ক বহুসংখ্যক অতি উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছেন, তাহা নয়; তিনি যে কেবল সুকণ্ঠে হৃদয়বীণার সহিত মিলাইয়া নানাভাবের গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বহু বৎসর ধরিয়া মুগ্ধ করিয়া আসিতেছেন, তাহা নহে; তিনি নূতন নূতন গানে নূতন নূতন সুর দিয়া নিজ বিশুদ্ধসঙ্গীতদক্ষতা দ্বারা অনেক সময় ওস্তাদ্‌দিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কবিতা ও নাটক পাঠে ও আবৃত্তিতে এবং সভাস্থলে লিখিত বক্তৃতা পাঠে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা লক্ষিত হয়। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ দেন, এবং না লিখিয়া মুখে মুখে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার বাগ্মিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্বরচিত নাটকের তিনি যেরূপ অভিনয় করেন, তাহাতে তাঁহাকে অসাধারণ অভিনেতা বলিয়াই মনে হয়।

তাঁহার রচিত স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশভক্তি বিষয়ক গানগুলি অতীব প্রাণস্পর্শী। তৎসমুদয় শ্রোতৃবর্গকে জন্মভূমিকে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে শিক্ষা দেয়, মাতৃভূমিকে হৃদয়মন্দিরে আরাধ্যাদেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখায়। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস এরূপ যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে বীররসের সঞ্চার করিতে হইলেই ভারতবাসী কোন না কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে মনকে উত্তেজিত না করিয়া বীরত্বব্যঞ্জক গান রচনা করা সহজ হয় না। কিন্তু এরূপ গান, সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রীতিকর বা উৎসাহবর্দ্ধক হইতে পারে না। তদ্দ্বারা সম্প্রদায়বিশেষ ক্ষণিক উত্তেজনা, উৎসাহ ও তৃপ্তি লাভ করিলেও তাহা জাতিগঠনের উপায় হইতে পারে না। এই ভাবের বীররসাত্মক গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন নাই। তাহা না করিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া বীরত্ব-সঞ্চারী কোন গানই যে তিনি রচনা করেন নাই, তাহা নহে। বীরত্বের প্রধান উপাদান কি কি? সাহস, নির্ভীকতা, অপরের জন্য আত্মোৎসর্গ, স্বদেশবাসীর বা মানবের মহত্ত্বসম্ভাবনায় দৃঢ় বিশ্বাস, সকলের পক্ষে স্বাধীনতার সম্ভাবনায় বিশ্বাস, সর্ব্বদেশে মানবপ্রকৃতির অদম্যতায় বিশ্বাস, সত্যন্যায়করুণার জয়ে বিশ্বাস, বিশ্ব-নিয়ন্তার মঙ্গল বিধানে বিশ্বাস। এই সব উপাদান তাঁহার "স্বদেশী" গানগুলিতে প্রচুর পরিমাণে আছে, "কথা ও কাহিনী"তে আছে। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে," এ শিক্ষা তাঁহার মত আর কে দিয়াছে; বাহিরের শৃঙ্খল যত দৃঢ় করিবার চেষ্টা হয়, আভ্যন্তরীণ বন্ধন তত টুটিয়া যায়, এ শিক্ষা তাঁহার মত আর কে দিয়াছে? তাঁহার রচনাবলীর অসামান্য সুষমা ও সংযতভাব, তৎসমুদয়ে বাহ্য ডাক হাঁক আস্ফালনের বাক্যের বীরত্বোচ্ছ্বাসের অভাব আমাদিগকে অনেক সময় ভুলাইয়া দেয় যে তন্মধ্যে কিরূপ শান্ত সংযত আত্মসংবৃত অটল বীরত্বের উপাদান আছে।

তাঁহার স্বদেশপ্রেমে সংকীর্ণতা, অতীতগৌরবের অতিপূজা, কিম্বা বিদেশ ও বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা নাই। ভারতবর্ষের বিশেষত্বে এবং বিধিনির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যে ও ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু অন্যান্য দেশেরও যে এইরূপ বিশেষত্ব, বিশেষকার্য্য এবং ভবিষ্যৎ আছে, তাহা তিনি কোথাও অস্বীকার করেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে তিনি অবজ্ঞা করেন না, অনাবশ্যকও মনে করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশ সকলের একটা নিকৃষ্ট নকল মাত্র হয়, কিংবা উৎকৃষ্ট নকলও হয়, ইহা তিনি চান না। পশ্চিমের নিকট হইতে আমরা লইব, পশ্চিমও আমাদের নিকট হইতে লইবে। ভিক্ষুকের মত, পৈত্রিকসম্পত্তিবিহীন অনাথ বালকের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হপসিং কোম্পানি কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মত আমরা পশ্চিমের রাজপ্রাসাদের দ্বারস্থ হইব না। আমাদেরও প্রকৃতিতে সর্ব্ববিধ মহত্ত্ব, সর্ব্ববিধ সাফল্য, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের বীজ নিহিত আছে; পশ্চিমের উত্তেজনায়, পশ্চিমের আলোড়নে, পশ্চিমের উত্তাপে, পশ্চিমের নবশিক্ষাবারিসেচনে, ঐ সব বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে হইবে। অসাড় আমরা প্রাণবান্ পশ্চিমের সংস্পর্শে চেতনা পাইব। অন্ধকার গৃহের বদ্ধ বাতাসে আমরা ছিলাম; পশ্চিম আমাদিগকে বাহিরের আলো ও বাতাস, বাহিরের ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, বাহিরের জনতার সহিত ঠেলাঠেলির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। এখন হাত পা ও মনটা একটু স্বাভাবিক ও সতেজ হউক। পশ্চিম উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই। উহার আবির্ভাব আমাদেরই আভ্যন্তরীণ ব্যাধির ফল ও বাহ্যলক্ষণ। জোর করিয়া পশ্চিমকে গলাধাক্কা দিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা। আমরা মানুষ হইলে, সুস্থপ্রকৃতি হইলে, স্বদেশকে বাস্তবিক স্ব দেশ করিতে পারিলে, ভাবে, চিন্তায়, জ্ঞানে, কার্য্যে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগকে স্বদেশী করিতে পারিলে; শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য্যে স্বদেশী চেষ্টায় স্বদেশকে বরেণ্য করিতে পারিলে, আপনা আপনি পশ্চিমের প্রভুত্ব খসিয়া পড়িবে।

সুতরাং তাঁহার রাজনীতি আবেদন নিবেদন ততটা নহে, যতটা স্বদেশবাসী প্রত্যেকের ও স্বদেশী সমাজের আভ্যন্তরীণ সুস্থতাসম্পাদন ও শক্তিবর্দ্ধন। ভিতরে যে প্রবৃত্তির, স্বার্থের, ভয়ের, অজ্ঞানতার, কুপ্রথার দাস, বাহিরে সে স্বাধীন হইতে পারে না। অতএব জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের পথ আগে ভিতরেই অন্বেষণ করা চাই। এই জন্য রাজনীতিক্ষেত্রের রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম্মাচার্য্য রবীন্দ্রনাথ অভিন্ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের-ছাপমারা-আমাদের অনেক সময়ে এইরূপ মনে হ য়া আরামদায়ক যে আর কিছুতে না হউক, ইংরাজী-বহিপড়া-বিদ্যাতে এবং ইংরাজীরচনায় তিনি আমাদের সমকক্ষ নহেন; কারণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি পাইবার চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং পানও নাই এবং ইংরাজী লিখিবার চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে মিশিলেই বুঝা যায় যে আমাদের মত বিদ্বৎখ্যাতি বিশিষ্ট বহুব্যক্তি অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী বহি পড়িয়াছেন ও এখনও পড়েন। আর, এম্-এ-পাশ-করা খুব বেশী লোকেই যে তাঁহার চেয়ে ভাল ইংরাজী লিখিতে পারেন, তাহাও ত দেখিতেছি না। অনেকে শুধু পড়েন, কিন্তু তিনি যত পড়েন, তদপেক্ষা চিন্তা করেন অধিক। সুতরাং উদরিকে ও মল্লে যে প্রভেদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থকীটে ও তাঁহার মত লোকে সেই প্রভেদ। জগতে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাবের গতি কিরূপ ক্ষিপ্র, কোন্ মুখী, তাহা আমরা অনেকে জানি না, কিন্তু সে খবর তিনি রাখেন। আর্য্য পিতামহগণ দর্শনে তত্ত্ববিদ্যায় শেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন, ইহা বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান না। তিনি দেখিতেছেন, দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার জমিদারীর আবাদ পাশ্চাত্যেরাই করিতেছে, আমরা কেবল বংশগৌরব লইয়াই ব্যস্ত। সেই হেতু এই বয়সে তিনি পৃথিবীর জ্ঞানবীর জার্ম্মান জাতির ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সেই হেতু আবার ভ্রমণ দ্বারা পাশ্চাত্য জাতির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া নূতন আলোকে নূতন বাতাসে নবশক্তি লাভের প্রয়াসী হইতেছেন।

তিনি শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন শিক্ষার আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে তিনি ইহার প্রাণ বলিয়া চিনিয়া লইয়াছেন। এই আধ্যাত্মিকতা কতকগুলি বাহ্য জীবনহীন অনুষ্ঠান, বা সমাজবিমুখ সন্ন্যাস নহে। ইহা দেহমনের পবিত্রতা ও সুস্থতা দ্বারা প্রাণে, সমাজে, প্রকৃতিতে ব্রহ্মের সংস্পর্শলাভ। কৃচ্ছ্রসাধন ব্রহ্মচর্য্য নহে। পবিত্রতা যেমন ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণ, আনন্দ তেমনই ইহার হৃদয়। কঠোর শাসন চরিত্রগঠনের ব্রহ্মাস্ত্র নয়। আনন্দের সহিত শিক্ষা, মানবপ্রকৃতির স্বভাবসুস্থতায় বিশ্বাস, চরিত্রগঠনের প্রকৃত উপায়। সুস্থ প্রকৃতি বিলাস চায় না, জঘন্য আমোদ চায় না। পৌরুষেই তাহার আনন্দ। প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর প্রাণ রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শরীরী হইয়াছে।

অনেকে বয়োবৃদ্ধিসহকারে সামাজিক কুপ্রথাদি বিষয়ে রক্ষণশীল হয়েন; রবীন্দ্রনাথ মতে ও আচরণে যাহা কিছু ভাল তদ্বিষয়ে রক্ষণশীল কিন্তু যাহা অনিষ্টকর তদ্বিষয়ে

সংস্কারপ্রয়াসী। এবং এইভাব বয়োবৃদ্ধি সহকারে বাড়িয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বৈচিত্র্যময় ও নানাজাতীয়; তিনি নিজেও বিচিত্রকর্ম্মা। তিনি নিজে তাঁহার রচনাবলী ও কার্য্য অপেক্ষা মহৎ। তাঁহার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যায় না। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য বাঙ্গালী আরও অধিক আয়োজন করিলেও অতিরিক্ত হইত না। যাহা হইয়াছে, তাহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ।

ঢাকায় নূতন বিশ্ববিদ্যালয়।

ইংরাজ ও অন্যান্য স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কতকগুলি অধিকার নিজ পৌরুষ দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছেন। সুতরাং কোন রাজপুরুষ সেই অধিকার লোপ করিতে চেষ্টা করেন না, করিলে ঐ সকল জাতি জোরের সহিত কৈফিয়ৎ চান ও পান। আমরা তদ্রূপ কোন অধিকার অর্জ্জন করি নাই। সেরূপ অধিকার আমাদিগকে কেহ দেয়ও নাই। সুতরাং রাষ্ট্রীয় মূল নিয়ম (Constitution) ভঙ্গ হইল বলিয়া আমরা কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু কিরূপ হইলে ভাল হইত তাহা অবশ্য আমরা বলিতে পারি;—তাহা কেহ শুনুক বা না শুনুক। আমাদের এই কথাগুলির মধ্যে বিন্দুমাত্রও বীররস নাই, কথাগুলি মোটেই গরম নয়, বড় ঠাণ্ডা। কিন্তু শূন্যগর্ভ চীৎকারে ও আস্ফালনে যে বড় লজ্জা বোধ হয়।

রাজধানী দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হইল। অথচ আমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না। আমাদের বিশ্বাস যে রাজধানী স্থানান্তরিত করার কোন প্রয়োজন ছিল না। উহাতে অকারণ বহুকোটি অর্থের অপব্যয় হইবে মাত্র। তবে, মানুষের ভালমন্দ সব কাজ হইতেই বিধাতা শুভফল উৎপাদন করেন। সে হিসাবে দিল্লীতে রাজধানী যাওয়ায় ভবিষ্যতে মঙ্গল হইতেও পারে। যাহা হউক, সেটা আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা কেবল বলিতেছিলাম এই যে দেশবাসীদের মতামতকে মোটেই আমল না দিয়া, তাহা জানিবার চেষ্টা না করিয়া, রাষ্ট্রীয় কোন কাজ করা ভাল নয়। বড়লাটের এই ভাবের আর একটি কা[জ] দেশবাসীর চিত্তকে আন্দোলিত ও বিক্ষুব্ধ করিতেছে। তা[হা] পূর্ব্ববঙ্গের জন্য এক স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ও একজ[ন] স্বতন্ত্র শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব। এই দুটি জিনি[ষ] পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায় প্রার্থন[া] করে নাই, এবং এ পর্য্যন্ত উক্ত দুই সম্প্রদায়ের মত যতট[া] প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সম্প্রদায়ই একযো[গে] বা অধিকাংশের মতে এই দুটি কল্যাণকর মনে ক[রে] নাই। বড়লাট তাঁহার প্রস্তাবিত এই দুটি কা[জ] সম্বন্ধে দেশের কাহারও মত জানিতে চান নাই; এম[ন] কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতও চান নাই। এইরূপ ভাবে কেবল নিজের মত অনুসারে কাজ করা সুসভ[্য] দেশসকলের উন্নতশাসনপ্রণালীর অনুমোদিত রীতি নহে।

দিল্লীতে রাজধানী সরাইয়া লইবার যেসকল কার[ণ] প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং উহার যেসকল সুফলের সম্ভাবনা সরকারী কাগজপত্রে দেখান হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি এই যে বড়লাট নিজের জন্য দিল্লীর চারিপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ গড়িয়া লইবেন, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে তাঁহাদের প্রদেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহে স্বাতন্ত্র্য দিবেন, কেবল কুশাসন ও অত্যাচার হইলে তিনি বাধা দিবেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে—মিলিতবঙ্গ একজন সকৌন্সিল গবর্ণরের দ্বারা শাসিত হইতে আর দুইমাসও বাকী নাই; ১লা এপ্রিল হইতে লর্ড কারমাইকেল বঙ্গদেশ শাসন করিবেন; তিনি আসিতে না আসিতে বঙ্গদেশে একটি অতিরিক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি অতিরিক্ত শিক্ষাবিভাগ স্থাপনরূপ গুরুতর কাজ দুইটি করিয়া ফেলায় তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইতেছে না কি? এ কিরূপ স্বাতন্ত্র্য (autonomy)? শিক্ষাকার্য্যের ব্যয় এই যে দ্বিগুণিত করা হইবে, ইহাতে যদি অসুবিধা হয়, তবে সে অসুবিধা ত তাঁহাকেই ভোগ করিতে হইবে? ইহাতে যদি কোন কারণে দেশে অসন্তোষ ও অশান্তি হয়, তবে তাহা নিবারণ ত তাঁহাকেই করিতে হইবে? এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন। কাগজে দেখা যাইতেছে যে তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্যও এখন হইতে নিযুক্ত হইয়া যাইতেছেন। তন্মধ্যে

একজন পূর্ব্ববঙ্গের শক্ত শাসনের ভক্ত ও অন্যতম প্রবর্ত্তক, একজন কলিকাতার বক্‌রীদ দাঙ্গার সময় এক সম্প্রদায়ের লোকের বিরাগভাজন হইয়াছেন, এবং একজন হিন্দু-মুসলমানের দলাদলিতে বিশেষভাবে কোন এক পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহাদের সহযোগিতায় ও সাহায্যে বঙ্গদেশ শাসনের এক নূতন পালা আরম্ভ করিতে হইবে, তাঁহাদের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে লর্ড কারমাইকেলকে কিছু বলিবার সুযোগ পর্য্যন্ত না দেওয়া কিরূপ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (Provincial autonomy) তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ।

তাহার পর ব্যয়ের দিক্‌টা দেখা যাক্। বঙ্গ বিভাগের পূর্ব্বে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুর এই চারি প্রদেশের জন্য একজন শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। বঙ্গ বিভাগের পর (আসাম সহিত লইয়া) দুই জন হইয়াছিলেন। এখন প্রদেশগুলির নূতন ব্যবস্থায় বঙ্গের জন্য দুই, বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুরের জন্য এক, এবং আসামের জন্য এক, এই চারিজন উচ্চবেতনভোগী শিক্ষাকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের একটা করিয়া নূতন আফিস্‌ও হইবে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবরের পূর্ব্বে একজন শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুর এই চারি প্রদেশের শিক্ষাকার্য্য কলিকাতায় বসিয়া চালাইতেন। এখন সেই কর্ম্মচারীই কলিকাতায় বসিয়া বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী মাত্র এই দুটি বিভাগের কাজ করিবেন, এবং আর একজন ঢাকায় বসিয়া ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের কাজ চালাইবেন। অথচ এই সাতবৎসরে পাঠশালা স্কুল কলেজ ও ছাত্রের সংখ্যা ৩।৪ গুণ বাড়িয়াছে, ইহা কেহই বলিতে পারিবেন না। আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে প্রজার পক্ষ হইতে শিক্ষার জন্য বেশী অর্থ-ব্যয়ের আবেদন হইলেই রাজপুরুষগণ বলেন, টাকা নাই। এহেন যে অবহেলিত শিক্ষাকার্য্য তাহার জন্যও দেখিতেছি গবর্ণমেণ্ট ব্যয় অনেক বাড়াইতেছেন। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে? অনেকে বলিতে পারেন, সম্রাট যে বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়াইতে বলিয়াছেন, তাহা হইতেই এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ঐ টাকা হইতে অধিক সংখ্যক ছাত্রের শিক্ষা পাইবার সম্ভাবনা অল্প। উহার অধিকাংশ উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের কেরাণী প্রভৃতির বেতনেই খরচ হইবে। গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষার জন্য এত ব্যয় বাড়াইতেছেন, শিক্ষাবিস্তারই যে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা প্রজাবর্গকে প্রমাণসহ বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি শিক্ষাবিস্তারে গবর্ণমেণ্টের এতই উৎসাহ থাকে, তাহা হইলে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ ও পূর্ব্ববঙ্গে ছাত্র সংখ্যা এবং কোথাও কোথাও পাঠশালার সংখ্যা কমিয়া গেল কেন? যে দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা এত বেশী, তথায়, ছাত্রসংখ্যা কমিতেছে, অথচ শিক্ষাদানকার্য্যে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ বাড়িয়া চলিতেছে, এই দুইটি ঘটনার ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য বিধান করা রাজপুরুষগণের কর্ত্তব্য।

বড় লাটের প্রস্তাব দুটির যথাযথ সমালোচনা করা সম্ভব নহে; কারণ, তিনি, বিশ্ববিদ্যালয়টি কিরূপ হইবে, পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রেরা উহার অধীনস্থ কলেজস্কুলগুলিতেই পড়িতে বাধ্য হইবে কি না, ইত্যাদি, এবং তথাকার সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাকর্ম্মচারী সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন, না, বঙ্গের শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষের অধীন হইবেন, এসব বিষয়ে জন-সাধারণকে কিছুই জানান নাই। তথাপি অনুমান করিয়া, এবং সম্ভবতঃ সরকারের তরফ হইতে যেসকল কথা বলা হইতেছে, তাহা অবলম্বন করিয়া কিছু বলা যাইতে পারে।

আমরা প্রথমেই বলিয়া রাখি যে দেশে বহুসংখ্যক শিক্ষাদায়ক বিশ্ববিদ্যালয় হয়, ইহা আমরা অবাঞ্ছনীয় মনে করি না। কিন্তু বর্ত্তমানে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টি আছে, তাহার ক্ষতি করিয়া, বা তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় অভাব পূর্ণ না করিয়া, বঙ্গদেশে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়, ইহা আমরা চাই না। কারণ দেখিতেছি, অর্থাভাবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের কাজ করিতে পারি-তেছেন না। এম্‌-এ পড়াইবার জন্য বেশী কলেজ নাই, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ও তজ্জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এম্‌,-এস্‌, সি, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কেবল প্রেসিডেন্সী কলেজে অতি অল্প ছাত্র লওয়া হয়। অথচ প্রবেশিকা পরীক্ষার পর শত শত ছাত্র কলেজগুলির বিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্ত্তি

হয়; তন্মধ্যে কেবল মুষ্টিমেয় ছাত্র এম্, এস্, সি, হইবার উপযুক্ত, ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাভাবে এম্, এস্‌সির বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছেন না। অন্ততঃ ৫০ জন করিয়া ছাত্র যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানমন্দিরে পদার্থবিদ্যা রসায়ন আদি শিখিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, তবে গবর্ণমেণ্ট আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিলে শোভা পায়। গবর্ণমেণ্টের যদি এতই আর্থিক সচ্ছলতা, তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব পূর্ণ হয় না কেন? পূর্ব্ববঙ্গের লোকেই যদি আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা দিতে পারেন, তবে তাঁহারা ঢাকা কলেজে বা অন্য কোন প্রাদেশিক কলেজে হাজার হাজার টাকা দিয়া এম্-এ, ও এম্, এস্‌সি, পড়াইবার যথেষ্ট আয়োজন ও বন্দোবস্ত করেন না কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার নামের একটি মোহর খোদাইয়া উহার ছাপ পূর্ব্ববঙ্গের কলেজগুলির গায়ে মারিয়া দিলেই ঐগুলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষার স্থান হইয়া উঠিবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের গুণেই দশ বিশটা কলেজ ২।১ মাসে বা বৎসরে গজাইয়া উঠিবে না।

বড়লাট শুভ উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং নূতন শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু বড়লাট ত স্বহস্তে সমুদয় কাজ করিবেন না, সমস্ত বন্দোবস্তও করিবেন না। আইন ভাল হইলেও সুবিচারক জজের অভাবে যেমন অবিচার হয়, এস্থলেও তেমনি পূর্ব্ববঙ্গের কর্ম্মচারীদের প্রকৃতির গুণে বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকার্য্যে ও শিক্ষাবিভাগে এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা গিয়াছে :—

(১) ইস্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়ান অপেক্ষা তাহার সংখ্যা কমাইবার উদ্যোগ। যেমন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, সিরাজগঞ্জের একটি ইস্কুল, লৌহজংঘের একটি ইস্কুল, বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, ইত্যাদির সম্বন্ধে রাজকর্ম্মচারীদের ব্যবহার।

(২) স্কুল কলেজ ও ছাত্রদের সম্বন্ধে অনাবশ্যক কঠোর শাসন, এবং ছাত্রদিগকে অত্যন্ত অধিক সন্দেহের চক্ষে দেখা।

(৩) ক। বাঙ্গালা ভাষাকে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন উপভাষায় বিভক্ত করিয়া তাহাতে গ্রন্থ লিখাইবার চেষ্টা।

(৩) খ। পূর্ব্ববঙ্গে যেসকল বহি ছাপান হয় নাই, তাহা যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গে পঠিত না হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন। এই দুই উপায়ে বঙ্গসাহিত্যকে বিভক্ত করায় উহার ব্যাপ্তি ও শক্তি হ্রাসের সম্ভাবনা।

(৩) গ। রাজকর্ম্মচারীদের অনুগৃহীত সংবাদ ও মাসিক পত্রের তালিকা প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে অনেক উৎকৃষ্ট কাগজের প্রচার বন্ধ করিবার চেষ্টা।

(৪) পূর্ব্ববঙ্গে মোটের উপর শিক্ষালয় ও ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস।

বড়লাট এরূপ কোন উপায় করিতে পারিবেন কি যাহাতে এইসকল শিক্ষোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী কার্য্য, ভাব ও লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া তাহার বিপরীত কার্য্য, ভাব ও লক্ষণের আবির্ভাব হয়?

ঢাকায় নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হইবার পূর্ব্বেই দেখা যাইতেছে যে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ও একটি উৎকৃষ্ট মিশনরী কলেজে পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্র ভর্ত্তি করা হয় নাই। শিক্ষালাভ সম্বন্ধে এইরূপে ছাত্রদের স্বাধীনতা লোপ বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হইলে এই স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ বলিতেছেন, ইংলণ্ডে স্কটলণ্ডে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে; অতএব বঙ্গে কেন হইবে না? কিন্তু ঐ সব দেশে কোন কাউন্টি বা নগরের ছেলে কোন বিশেষ কলেজে পড়িতে পাইবে না, এরূপ নিয়ম আছে কি? আমি যে কলেজটিকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মনে করি, সেখানে আমি পড়িব; অন্যে তাহাতে কেন বাধা দিবে? এরূপ বাধা দিলে আমরা যদি মনে করি, যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের যুবকগণের মিশামিশি বন্ধ করা ও পূর্ব্ববঙ্গের যুবকদের পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের প্রভাবের মধ্যে আসা নিবারণ করা, রাজপুরুষদের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে সেটা কি নিতান্তই অযৌক্তিক বা অন্যায় হয়?

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সপক্ষে কয়েকটি প্রধান যুক্তি পরীক্ষা করা দরকার।

কলিকাতার প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবার বোধ হয়

৯০০০ ছাত্র উপস্থিত হইবে। এত ছাত্রের পরীক্ষা করিতে গেলে প্রত্যেক বিষয়ে অনেক পরীক্ষকের প্রয়োজন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষকের যোগ্যতার মাপকাঠি ভিন্ন হওয়ায় সকল ছাত্রের পরীক্ষা একভাবে হয় না। সমান যোগ্যতা বিশিষ্ট দুই জন ছাত্র ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষকের হাতে পড়িয়া, কেহ পাশ কেহ ফেল হয়। ইহা হইতে পারে এবং কখন কখন হয়। কিন্তু ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় করিলেও ইহার প্রতিকার হইবে না। কারণ সেখানেও প্রায় ৩০০০ প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী হইবে। তজ্জন্য প্রত্যেক বিষয়ে অন্যূন চারি জন পরীক্ষক নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদেরও মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন হইবে। বাস্তবিক একই পরীক্ষক দিনের পর দিন হয় বেশী কড়া বা কম কড়া হন, ইহা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকের কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। তবে একজনের হাতে মাপকাঠি কতকটা ঠিক্ থাকে বটে। অতএব, আলোচ্য দোষের পরিহার হইতে পারে কেবল এক উপায়ে;—এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন যাহাতে কোন পরীক্ষায় ৭।৮ শত অপেক্ষা বেশী ছাত্র উপস্থিত না হয়; কারণ তাহা হইলে প্রত্যেক বিষয়ে কেবল একজন পরীক্ষকই যথেষ্ট হইবে।

আমরা ১১ বৎসর ধরিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য দেখিয়াছি। তথায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কলিকাতা অপেক্ষা অনেক কম। তথাপি পরীক্ষাকার্য্যে তথায় কলিকাতার মতও সমমান রক্ষিত হয় না। পরীক্ষার্থী কম হইলেই পরীক্ষা ভাল হইবে, ইহা মনে করা ভুল। কলিকাতাতেই যখন দেড় হাজার দুই হাজার প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী হইত, এখন তদপেক্ষা পরীক্ষা কার্য্য অধিক সন্তোষজনকরূপে নির্ব্বাহিত হয়।

কলিকাতার নৈতিক হাওয়া ভাল নয়, অতএব ছাত্রদের অন্য স্থানে যাওয়া ভাল। যাঁহারা ছাত্রদিগকে বেশ্যাকলুষিত থিয়েটারে যাইতে বাধা দেন না, কিন্তু কংগ্রেস্ দেখিলে শাস্তি দেন, তাঁহাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না। যাহা হউক, কলিকাতা অপেক্ষা ঢাকার নীতি ভাল ইহার প্রমাণ আবশ্যক। এবং কলিকাতার ছাত্রাবাসগুলি পরিদর্শনের ও তৎসমুদয় সুনিয়মের অধীন করিবার চেষ্টা করিলে অনেক সুফল হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, কলিকাতায় মন্দ সংসর্গ যেমন আছে, তেমন এখানে সৎসংসর্গও যত ভাল হইতে পারে, বঙ্গের আর কোথাও ততটা হইতে পারে না।

কলিকাতায় বাড়ীঘরও অন্যান্য সহর অপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। এখন আরও বেশী পাওয়া যাইবে। তা ছাড়া, যদি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় করিবার এবং নূতন কলেজ করিবার টাকা যুটে, তাহা হইলে কলিকাতায় যথেষ্টসংখ্যক ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের টাকা কেন যুটিবে না?

(৩) কলিকাতা ছাত্রদের বাড়ী হইতে অনেক দূর। কিন্তু ঢাকাই কি সব পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছাত্রদের জন্মস্থান? পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান ঢাকা অপেক্ষা কলিকাতার নিকট। যাঁহাদের পক্ষে ঢাকা নিকটতর, তাঁহারা ঢাকা যান না কেন? কেহ ত বাধা দেয় না। যদি বল, ঢাকার কলেজগুলি কলিকাতার কলেজগুলির মত ভাল নয়; তাহা হইলে সেখানে ত স্বভাবতই ছেলেরা কম যাইবে। তাহাদিগকে বাধ্য কর কেন? যদি বল যে সেগুলি ভাল, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পীঠস্থান বলিয়াই সেখানে সব ছেলে ছুটিয়া আসে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হইলে সেখানেও সকলে যাইবে; তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেখানে ত একটি গবর্ণমেণ্ট কলেজ ও একটি বেসরকারী কলেজ আছে; উভয়ই পূর্ণ। এখন কলিকাতায় যেসব পূর্ব্ববঙ্গের ছেলে পড়ে, তাঁহাদের সকলের যায়গা কোথায় হইবে? ঢাকা সহরে একাধিক গবর্ণমেণ্ট কলেজ হইবে না। মিশনারী ও বেসরকারী কলেজ না হয় ধরুন কালক্রমে আরও দুইটা হইল; তাহাতেই কি সকল ছাত্রের স্থান কুলাইবে? কলিকাতার শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া যে খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে, ঢাকার তাহা হইতে বিলম্ব হইবে। বাধ্য না করিলে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ছেলেই কলিকাতায় আসিবে। এরূপ স্থলে বাধ্য করা কি উচিত হইবে? যদি বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত ছাত্র কলেজে পড়িতে পারে, এত কলেজও চাই। তত কলেজ এখন নাই। যথেষ্ট সংখ্যক নূতন কলেজ কে স্থাপন করিবে? গবর্ণমেণ্ট না জনসাধারণ? কেহই করিবেন বলিয়া সম্ভব বোধ হইতেছে না। যদি করেন, তাহা হইলে

এখন করিতেছেন না কেন ? আমাদের মনে হয় যে এইরূপে কলেজ স্থাপন করিলেই অনেক ছাত্র কলিকাতায় আসিবে না। কারণ, দেখা যাইতেছে যে কলিকাতায় কলেজগুলিতে স্থানাভাব হওয়ায় নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ব্যতীত মফঃস্বলের আর সকল স্থানের কলেজে ছাত্রের অভাব নাই। এখানে কেবল একটি কথা উঠিতে পারে। তাহা এই যে পূর্ব্ববঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যেমন সরকারী বেসরকারী সমুদয় কলেজকে সম্পূর্ণরূপে নিজকরতলগত করিতে চান, সে প্রয়াস বহু পরিমাণে সিদ্ধ হইলেও, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রভুত্ব থাকায় তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় হইলে, পূর্ব্ববঙ্গের রাজপুরুষদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি, তাহা এতদ্দ্বারা সিদ্ধ না হইয়া বিফল হইবে। কারণ অতিরিক্ত পরাধীনতা ও কঠোর শাসনে মনুষ্যত্বের লোপ হয়।

কলিকাতার কলেজগুলির এক এক ক্লাসে ১৫০ বা ততোধিক ছাত্র থাকায় ভাল পড়ান হয় না, অধ্যাপকগণ প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন না, অধ্যাপকও ছাত্রের মনের ও হৃদয়ের সংস্পর্শ হয় না। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হইলে এ বিষয়ে উন্নতি হইবে। ইহা সত্য কথা যে কলিকাতায় শিক্ষার অবস্থা এইরূপই বটে। কিন্তু সংসারে সব কাজই মাঝামাঝি রকমে রফা করিয়া চালাইতে হয়। জীবনের কোন কাজই ঠিক্ আদর্শ অবস্থাতে নাই। এখন দেখিতে হইবে, যে, দেশে উচ্চ শিক্ষা একেবারে বন্ধ না করিয়া কিম্বা অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া শিক্ষার আদর্শের দিকে কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ নিরক্ষরের, অজ্ঞের দেশ। এদেশে শিক্ষার প্রচার যাহাতে একটুও কম হয় এমন কিছু করা উচিত নয়। কলিকাতার কলেজগুলিতে অনেক ছাত্র শিক্ষা পায়। তাহা উৎকৃষ্ট রকমের না হইলেও শিক্ষা নামের যোগ্য; নিরক্ষরতা, নিরেট মূর্খতা অপেক্ষা উহা ভাল। গবর্ণমেণ্ট নিজব্যয়ে এতগুলি কলেজ চালান না, চালাইবেন না, দেশের লোকও প্রভূত সম্পত্তিদান করিয়া ইহাদের অর্থাভাব দূর করিতেছেন না। বহুসংখ্যক ছাত্র অল্প অল্প বেতন দিয়া এই সকল কলেজ চালাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এখন নূতন নিয়ম করিয়া কলেজ চালান এত ব্যয়সাধ্য করিয়াছেন যে খুব বেশী ছাত্র না হইলে এই সব কলেজ উঠিয়া যাইত; এবং এখনও ছাত্র কমিয়া গেলে উঠিয়া যাইতে পারে। সুতরাং কলেজগুলি রাখিতে হইলে হয় ছাত্রাধিক্যরূপ দোষ সহ্য করিতে হইবে, নয় গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর অর্থ সাহায্য করিতে হইবে, নয় দেশের ধনী লোকদিগকে এইরূপ সাহায্য করিতে হইবে, নয় ছাত্রদিগের নিকট অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিতহারে বেতন লইতে হইবে। কিন্তু শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ যে মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রগণ তাহারাই শিক্ষায় বঞ্চিত হইবে। অতএব এই সকল কথা মনে রাখিয়া শিক্ষাসমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইলে এক এক শ্রেণীতে ২০।২৫ টির বেশী ছাত্র রাখা চলে না। ইহা অভিজ্ঞ শিক্ষক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ১৫০এর পরিবর্ত্তে ২৫ যদি প্রতি শ্রেণীর ঊর্দ্ধ সংখ্যা করা যায়, তাহা হইলে কলিকাতায় ৮টি কলেজের যায়গায় আরও অন্ততঃ ৪০টি কলেজ করিতে হইবে; কারণ কোন কোন কলেজে এক এক শ্রেণীর ২।৩টি বিভাগ আছে। পূর্ব্ব বা পশ্চিম বঙ্গে এতগুলি কলেজ কে স্থাপন করিবেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ? যদি প্রতি ক্লাসে ৫০টি করিয়া ছাত্র রাখা যায়, তাহা হইলেও কলিকাতার বর্ত্তমান কলেজগুলি ব্যতীত আরও ১৬টি কলেজ স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই বা কে করিবে ? তা ছাড়া মফঃস্বলের অনেক কলেজেও প্রতি শ্রেণীতে ২৫এর, ৫০এর অধিক ছাত্র আছে। সুতরাং সেগুলিকেও আদর্শ কলেজ করিতে হইলে, স্থান বিশেষে একটি দুটি করিয়া কলেজ বাড়াইতে হইবে। এই সব কলেজ কে স্থাপন করিবে ? আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখা খুব দরকার, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কার্য্যতঃ কতদূর আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা যায়, তাহা বিস্মৃত না হওয়া আরও দরকার। উৎকৃষ্ট পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন বেশ ভাল, কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষের সময় লোকে হা অন্ন, হা অন্ন করে, তখন জনকতক লোককে ঐরূপ আদর্শ আহার দিয়া বাকী লোককে উপবাসী রাখা কোন বুদ্ধিমান্ বা সহৃদয় লোক শ্রেয়ঃ মনে করেন না। কারণ তাহার ফল বড় শোচনীয়। জ্ঞানাভাবে আমাদের দশা

শোচনীয় হইয়াছে। এখন আদর্শ শিক্ষার নাম করিয়া শিক্ষা-দুর্ভিক্ষ ঘটান কাহারও কর্ত্তব্য হইবে না।

যত দিন পূর্ব্ববঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক কলেজ না হইবে, ততদিন অনেক ছাত্র কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে যাইবেই যাইবে। দেশের প্রকৃত অভাব হইতেছে আরও শিক্ষালয়, এবং উৎকৃষ্টতর শিক্ষালয়। তাহার পরিবর্ত্তে আর একটি পরীক্ষার যন্ত্র এবং পরিদর্শন ও শাসনযন্ত্র দিলে কি হইবে? না হয় ধরিলাম পরীক্ষা, পরিদর্শন ও শাসন এখনকার চেয়ে ভালই হইল। কিন্তু আরও শিক্ষা যে চাই, তাহার কি উপায় হইল? শিক্ষা-বিস্তারে আরও যে উৎসাহ চাই, তাহার কি হইল? ঈসপের কথামালার সেই ঘোটক বেচারা সহিসকে বলিয়াছিল, ভাই, অঙ্গমার্জ্জন ও অঙ্গমর্দ্দন একটু কমাইয়া তুমি যদি আরও কিছু দানা আমাকে দিতে তাহা হইলে তাহাতে আমার উপকার হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই আর একজন কলেজ ইন্‌স্পেকটর রাখিলে সমুদয় কলেজ আরও ভাল করিয়া পরিদর্শন ও শাসন করাইতে পারেন। তজ্জন্য আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয় না।

আর যদি ঢাকায় একটি শিক্ষাদায়ক বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়, তাহা হইলে কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, কি দোষ করিল? কলিকাতা এখনও নামে মাত্র শিক্ষাদায়ক, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট ঢাকায় যে টাকা ফেলিতে যাইতেছেন, তাহাতে তথায় একটি চলনসই রকমের শিক্ষাদায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ও হইবে না, কিন্তু কলিকাতায় সেই টাকা ব্যয় করিলে অন্ততঃ বিজ্ঞান-শিক্ষার বন্দোবস্তটা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় কিয়ৎপরিমাণে করিতে পারিবেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়কে যষ্টিবিহীন পঙ্গু করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া অন্যত্র যষ্টির বন্দোবস্ত করার চেষ্টা কি ভাল? তাহাতে ফল এই হইবে যে ঢাকা বা কলিকাতা কেহই চলৎশক্তিবিশিষ্ট হইবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যতদিন না ঢাকায় ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য সহরে যথেষ্ট সংখ্যক উৎকৃষ্ট কলেজ হইবে, ততদিন ঐ অঞ্চলের ছাত্রেরা কলিকাতায় ও পশ্চিম বঙ্গে আসিবেই। তাহা হইলে, কলিকাতার ছাত্রাধিক্য কমান কেমন করিয়া ঘটিবে? সুতরাং ছাত্রাবাস ও কলেজক্লাসগুলির অবস্থাই বা কেমন করিয়া ভাল হইবে? আর যদি পূর্ব্ববঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট কলেজ হয়, তাহা হইলে ত আপনাআপনিই কলিকাতার কলেজে ও ছাত্রাবাসে ছেলে কমিয়া যাইবে; তখন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় করার কি প্রয়োজন থাকিবে?

যদি গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করেন যে পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেরা কলিকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গে পড়িতে পারিবে না, তাহা হইলে অনেক ছেলে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহা কি বাঞ্ছনীয়? অথবা গবর্ণমেণ্ট পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ব্যতিরেকে কেহ পূর্ব্ববঙ্গে চাকরী পাইবে না, সেখানকার বি. এল্. ভিন্ন কেহ পূর্ব্ববঙ্গে ওকালতী করিতে পারিবে না। এরূপ নিয়ম করিলে সুতরাং ঐ অঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের পুত্রগণের শিক্ষার ও পরে চাকরী প্রাপ্তির সুবিধার জন্য তাহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গে বদলী করা চলিবে না। তদ্ভিন্ন, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় ও পুস্তক, এবং পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষাবিভাগদ্বয়ের শিক্ষাপ্রণালী ও পাঠ্যপুস্তকাদি, পৃথক্ হওয়ায়, পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের, অধ্যাপক, শিক্ষক, এবং পরিদর্শক কর্ম্মচারীরা বঙ্গের ঐ ঐ বিভাগেই আবদ্ধ থাকিবেন। বদলী হইলে কাজের অসুবিধা হইবে। এই প্রকারে উকীল, ডেপুটী, মুনসেফ আদি, এবং অধ্যাপকাদি পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের স্বস্ব গণ্ডীতে থাকিলে বঙ্গদেশ নামে অখণ্ড হইলেও কার্য্যতঃ দ্বিখণ্ডিত হইবে কি না, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন।

যদি ধরা যায় যে আর একটা বিশ্ববিদ্যালয় না করিলে কলিকাতার অবস্থা ভাল হইবে না, তাহা হইলে বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় যে ৬টা কলেজ আছে, তাহাদিগকে লইয়া বেহার বিশ্ববিদ্যালয় হউক না? কুচবেহার দেশীয় রাজ্য; উহার কলেজ কলিকাতার সঙ্গে থাকিতেই ইচ্ছা করিবে। তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের ৭টি কলেজ থাকে। ছয় আর সাতে খুব বেশী তফাৎ নহে। তদ্ভিন্ন, বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় বঙ্গদেশ অপেক্ষা বিস্তর স্বাস্থ্যকর, বিরলবসতি স্থান আছে; তথাকার

ভূর্গভস্থ খনিজ সম্পদও বঙ্গ অপেক্ষা বেশী। ঐ প্রদেশগুলি নূতন স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্টেরও অধীনে আসিল। সুতরাং তৎসমুদয়ে পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা শীঘ্র লোকসংখ্যা বাড়িবে, ধন বাড়িবে, কলেজও বাড়িবে। ঐ সব স্বাস্থ্যকর স্থানে বহুসংখ্যক কলেজ স্থাপন অস্বাস্থ্যকর বঙ্গে কলেজ বাড়ান অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়ও বটে। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা, বেহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সর্ব্বাংশেই শ্রেয়ঃ। আরও দুইটি কারণে ইহা বাঞ্ছনীয়ঃ—(১) বেহারের লোকেরা একমত হইয়া ইহা চাহিতেছে; বঙ্গের হিন্দুমুসলমান কোন সম্প্রদায়ই একমত হইয়া ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় চাহিতেছে না। (২) বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার ভাষাগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার অন্তর্গত প্রধান প্রদেশ বঙ্গের ভাষা হইতে পৃথক্। একভাষাভাষী বঙ্গে ২টি বিশ্ববিদ্যালয় করিয়া ভাষাবিভাগ ও সাহিত্যবিভাগের আতঙ্ক উপস্থিত না করিয়া ভিন্নভাষাভাষীদের পৃথক্ করিয়া দেওয়াই ত উচিত। এত সকল কারণ সত্ত্বেও যদি গবর্ণমেণ্ট ঢাকাকেই অনুগ্রহ করেন, (গবর্ণমেণ্টের সমর্থকদের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে বলিতে হয়) যদি গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীকেই দুটা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা "সম্মানিত" করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে শিক্ষার উৎকর্ষ বিধান জন্য নহে, পরন্তু (সর্ব্বজনঅনুমেয়) রাজনৈতিক কারণে সরকার বাহাদুর বাঙ্গালীর প্রেমপাশ কাটাইতে পারিতেছেন না।

অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া, শিক্ষাবিষয়েই পূর্ব্ববঙ্গ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাহা সংক্ষেপে দেখাইতেছি। কলকাতায় আসিতে না পাইলে তাঁহারা প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কলেজে পড়িতে পাইবেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইবেন না। জাপান ইউরোপ আমেরিকায় শিক্ষালাভার্থ গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি পাইবেন না। তদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক ডফ্‌বৃত্তি, ঈশানবৃত্তি, উড্রোবৃত্তি, প্রভৃতি বৃত্তি, পুরস্কার, ও পদক পাইবেন না। ঢাকায় এইরূপ বৃত্তি আদি স্থাপিত হইতে বহু বিলম্ব আছে। ঢাকায় সদ্য সদ্য মেডিক্যাল কলেজ এবং এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইতেছে না। কলিকাতা ও শিবপুরের এই দুই কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত। ইহাঁরা নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকিতে ঢাকার ছাত্র লইবেন না, লওয়া উচিতও হইবে না। এখনই অনেক ছাত্র মেডিক্যাল কলেজে যায়গা পায় না। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গবাসীর চিকিৎসা ও এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার পথ কতকটা সংকীর্ণ হইয়া যাইবে; সমস্ত বঙ্গের শিক্ষিতসমাজের প্রতিনিধিরা চেষ্টা করা সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রজাপক্ষের মত দুর্ব্বল। ঢাকায় উহার অস্তিত্বমাত্রও না থাকিবার কথা। সুতরাং ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধার কথা কর্ত্তৃপক্ষের ভাল করিয়া কর্ণগোচরই বা কে করিবে তাহা বিবেচনা করিতেই বা কে বাধ্য করিবে?

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থক একজন বলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীণ্ডিকেটে পূর্ব্ববঙ্গের কোন প্রতিনিধি নাই; এই কারণেও ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত। এই ত্রুটি ত সহজেই দূর হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট, আবশ্যক হইলে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া, সীণ্ডিকেটে পূর্ব্ববঙ্গের কলেজগুলির প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারেন।

যাহা হউক যে বিষয়ে আমাদের হাত নাই, তাহা লইয়া অধিক লেখা পণ্ডশ্রম। তার চেয়ে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগ যদি হয়ই, তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহাই সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা ভাল। (১) বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য যাহাতে অবিভক্ত থাকে, তাহার দিকে সতত সজাগ দৃষ্টি রাখা। (২) পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের হৃদয় মনের সংস্পর্শ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার চেষ্টা করা। (৩) তরুণবয়স্কেরা যাহাতে সমস্ত বঙ্গের সহিত পরিচিত হয়, তাহার উপায় করা। (৪) স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন যাহাতে সহজ হয়, তাহার উপায় করা। (ওকালতী স্বাধীনবৃত্তি নহে)। (৫) সরকারী শিক্ষাবিভাগের ও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহিত যতটা সম্ভব সম্পর্কবিবর্জ্জিতভাবে শিক্ষালাভের উপায় করিয়া দেওয়া। (৬) পূর্ব্ববঙ্গের যুবকদের মনুষ্যত্ব হ্রাসের সম্ভাবনা ঘটিলে যাহাতে তাহা কমিয়া না যায়, তাহার উপায় চিন্তা করা।

উপায়গুলি নির্দ্দেশ করা খুব সহজ, কিন্তু কার্য্যে

পরিণত করা কঠিন। কিন্তু তা বলিয়া, এগুলি ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

চীনে সাধারণতন্ত্র।

চীনসম্রাটের দরবার হইতে এক অনুশাসনপত্র বাহির করিয়া তাহাতে প্রধান মন্ত্রী য়ুআন-শিহ্-কাইকে এই আদেশ করা হইয়াছে যে দক্ষিণচীনের সাধারণতন্ত্রের

চীনসম্রাট হ্সুআন টু—পঞ্চম বর্ষীয় বালক।

সহযোগিতায় সমস্ত চীন সাম্রাজ্যে এক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। চীনসম্রাট হ্সুআন টুং একটি পাঁচ বৎসরের শিশু। তাঁহার নামে যে সব আদেশ বাহির হয়, তাহা চীনের শাসনকর্ত্তা মাঞ্চু-অভিজাতবর্গেরই কার্য্য।
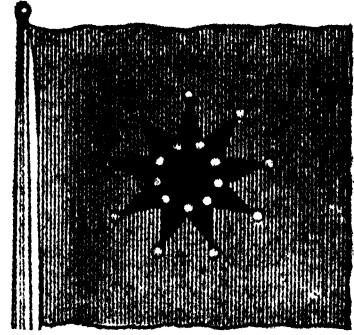
চীন সাধারণতন্ত্রের পতাকা।

পূর্ব্বোক্ত অনুশাসনদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে তাঁহারা আর সাধারণতন্ত্রস্থাপনে বাধা দিবেন না। এখন চীনে সুশৃঙ্খল কোন শাসন-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়া সাধারণ-তন্ত্রের পতাকা স্থায়ী ভাবে চীন-আকাশে উড্ডীন হইলেই মঙ্গল।

ডাক্তার শ্রীমতী চ্যাং চু চুন্।

যুদ্ধের সময় যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও পীড়িতদের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করেন, তাহাদিগকে লোহিত

ডাক্তার শ্রীমতী চ্যাং চু চুন্।

ক্রুশ সমিতি (Red Cross Society) বলে। চীনদেশে যাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে চীন মহিলা ডাক্তার চ্যাং চু চুন লোহিত ক্রুশসমিতি স্থাপন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মত কার্য্য করিয়াছেন।

উইলিয়ম্ মর্গ্যান যুস্টার।

উইলিয়ম্ মর্গ্যান যুস্টার একজন আমেরিকাবাসী। তিনি পারস্যের প্রধান খাজাঞ্চী নিযুক্ত হইয়া তথাকার রাজস্ব বিভাগ সুশৃঙ্খল করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা হইলে রুশিয়ার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়না বলিয়া

উইলিয়ম্ মর্গ্যান্ যুস্টার।

রুশিয়া তাহাতে বাধা দিয়া এরূপ ব্যাপার ঘটাইয়া তুলে যে যুস্টারকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। যুস্টার সাহেব এখন রুশিয়াকে ত দোষ দিতেছেনই, অধিকন্তু বলিতেছেন যে পারস্যের স্বাধীনতা ও সমগ্রতা রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের যাহা করা উচিত ছিল, ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী তাহা করেন নাই। এই বিষয়ে ইংলণ্ডের অনেক উদারনৈতিক কাগজ বৈদেশিক মন্ত্রীকে দোষ দিয়াছেন।

রাজকুমারী ইন্দিরা-রাজা।

বড়োদার গাইকবাড়ের কন্যা রাজকুমারী ইন্দিরা-রাজার সহিত গোয়ালিয়রের মহারাজার বিবাহ সম্বন্ধ

রাজকুমারী—ইন্দিরা-রাজা।

স্থির হইয়াছিল। এই বিবাহ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হইল। তাহার অর্থ বোধ হয় এই যে উহা আর হইবে না। না হইলেই ভাল। কারণ গোয়ালিয়রের মহারাজার আরো এক পত্নী জীবিত আছেন। তাঁহার সন্তান না হওয়ায় আবার বড়োদা-রাজকুমারীকে বিবাহ করিতেছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরার এরূপ কাহারও সহিত বিবাহ হওয়াই বাঞ্ছনীয় যিনি তাঁহাকেই একমাত্র পত্নী করিবেন।

রাজধানী ও প্রাদেশিক সীমা পরিবর্ত্তন।

দিল্লীতে রাজধানী যাওয়ায় যে অকারণ বিস্তর অর্থব্যয় হইবে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্য দিকেও ব্যয়বৃদ্ধি অতিশয় অধিক হইবে। বঙ্গব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুর ও আসামের জন্য একজন ছোটলাট ও একজন চীফ্‌কমিশনার ছিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের পর ঐ ভূভাগের জন্য দুজন ছোটলাট হইয়াছিলেন, তাহাতে

অনেক ব্যয় বাড়িয়াছিল। এখন আবার যে পরিবর্ত্তন হইল, তাহাতে আরও ব্যয় বাড়িবে। কারণ এখন ঐ প্রদেশগুলির জন্যই একজন গবর্ণর, একজন ছোটলাট ও একজন চীফ্‌কমিশনর নিযুক্ত হইবেন, অথচ আয় প্রায় তাহাই আছে। এত ব্যয়ের পরিবর্ত্তে যদি দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিও আমরা না পাই (কারণ রাজনৈতিক নূতন কোনও অধিকার ত আমরা পাইলাম না) তাহা হইলে আমাদের কেবল লোক্‌সানই হইল মনে করিতে হইবে।

বেহার-ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা প্রদেশে অনেক খনি আছে, অনেক বসতিশূন্য ভূখণ্ড আছে। সুতরাং উহার ক্রমিক ধনবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকারে উহার বর্দ্ধিত ব্যয় বর্দ্ধিত আয়ের দ্বারা সঙ্কুলান হইয়া যাইবে। বঙ্গে এক রাণীগঞ্জ অঞ্চলে ভিন্ন আর খনি নাই। বসতিবিহীন যায়গাও নাই। বঙ্গের আয়বৃদ্ধি সহজে হইবে না।

কলিকাতার ইংরাজবণিকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, শুনা যাইতেছে, বড়লাট প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে ৩।৪ সপ্তাহ কলিকাতায় থাকিবেন। কলিকাতা হইতে যখন রাজধানী উঠিয়া গেল, এখানে যখন কোন রাজকার্য্য হইবে না, তখন কেবল নাচ গান ভোজের জন্য একমাসকাল এখানে কাটান কর্ত্তব্য নহে। কারণ কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ব্যয় আছে, এখানে বড়লাটের জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদ রক্ষার ব্যয় আছে ও আমোদ প্রমোদের ব্যয় আছে। অনর্থক প্রজার এতগুলি টাকা খরচ করা ভাল হইবে না।

গুজরাতে দুর্ভিক্ষ।

দিল্লী দরবারের হুজুকে গুজরাতের শোচনীয় দুর্ভিক্ষের সংবাদ চাপা পড়িয়াছিল। এখন ক্রমশঃ তাহা লোকের কর্ণগোচর হইতেছে। এই দুর্ভিক্ষে মানুষ ও গবাদি পশু উভয়েই কষ্ট পাইতেছে। শস্য, ঘাস, জল, তিনেরই অভাব ঘটিয়াছে। অভাব মোচনের যথেষ্ট বন্দোবস্ত না হইলে মনুষ্য ও গবাদি অনেক পশু মারা যাইবে। সরকারী দুর্ভিক্ষ নিবারণ চেষ্টা হইতেছে। বেসরকারী চেষ্টাও কিছু কিছু হইতেছে, কারণ সরকারী দান নানা কারণে সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্ববিধ অভাব মোচন করিতে পারে না। এসময়ে ধনী নির্ধন সকলেরই অর্থদান করা কর্ত্তব্য। সকলে নিজ নিজ দেয় নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন :—শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দেবধর, সার্ভেণ্ট্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, পুনা (Mr. G. K. Devadhar, Servants of India Society, Poona)।

বঙ্গের সীমা।

সম্রাট যখন দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন এবং অন্যান্য পরিবর্ত্তন ঘোষণা করেন, তখন সেই ঘোষণায় এই কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল, "with such administrative changes and redistribution of boundaries as our Governor-General in Council, with the approval of our Secretary of State for India in Council, may, in due course, determine." যদি প্রাদেশিক সীমার কোন পরিবর্ত্তন করা সম্রাটের বা তাঁহার মন্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছাবহির্ভূত হইত, তাহা হইলে এ কথাগুলি ঘোষণায় ব্যবহার করা হইত না। ঘোষণায় এ কথাগুলি থাকায় কাজে কাজেই দেশের লোকদের মনে একটা আশা জন্মিয়াছিল। সেই আশার গতি যেদিকে গিয়াছে, তাহাও রাজধানী ও প্রাদেশিক সীমা পরিবর্ত্তনাদি বিষয়ক কাগজপত্রে ব্যবহৃত ভাষার অনুসরণ করিয়াছে। কারণ, তাহাতে লেখা আছে যে অখণ্ড বঙ্গ গঠিত হইবে, five Bengali-speaking divisions, পাঁচটি বঙ্গভাষী ডিবিজন, লইয়া; তাহাতে, Behar for the Beharis, বেহার বেহারীদের জন্য, এই দাবী সমর্থিত হইয়াছে; তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, The Oriyas, like the Beharis, have little in common with the Bengalis, বেহারীদের ন্যায় ওড়িয়াদেরও সহিত বাঙ্গালীদের কোন বিষয়ে অভিন্নতা নাই, অতএব তাহাদের দেশ বাঙ্গলার সহিত যুক্ত না করাই ধার্য্য হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে (১) সীমাপরিবর্ত্তন সম্রাট্ ও তাঁহার মন্ত্রীদের অনভিপ্রেত ছিল না, (২) ভাষারা এক শাসনাধীন হয়, বড়লাট এই নীতি

ভাল মনে করেন, (৩) যাহাদের যে দেশ তাহাতে তাহাদেরই বেশী অধিকার, তিনি এই নীতিরও সমর্থন করেন, এবং, (৪) যাহাদের সঙ্গে যাহাদের কোন বিষয়ে অভিন্নতা নাই, তাহাদের এক শাসনাধীনতা তিনি অবশ্যপ্রয়োজনীয় মনে করেন না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, বহুসংখ্যক বাঙ্গালীকে বেহার ও আসামের সঙ্গে রাখা হইতেছে; তাহারা দরখাস্ত করা সত্ত্বেও তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করা হইতেছে না। শ্রীহট্ট, মানভূম, ধলভূম, রাজমহল, প্রভৃতি স্থানবাসী এইসকল লোকেরা উপনিবেশিক প্রবাসী বাঙ্গালী নয়, তাহারা বহুশতাব্দী ধরিয়া পুরুষানুক্রমে ঐ সকল স্থানে বাস করিতেছে। সংখ্যাবাহুল্যে এবং ধনেজ্ঞানে তাহারাই ঐ সকল স্থানের প্রধান অধিবাসী। সরকারী মানচিত্রে ঐ সকল স্থানের যাহাই নাম হউক না, উহারা বাঙ্গালা দেশেরই অংশ। তাহা হইলে, কেন প্রাকৃতিক-বঙ্গের ঐ স্থানগুলি সরকারী-বঙ্গের অন্তর্ভূত হইবে না? ওড়িয়া বাঙ্গালী হইতে ভিন্ন বলিয়া যদি উড়িষ্যাকে বাঙ্গলার সংশ্লিষ্ট করা হইল না, তাহা হইলে বাঙ্গালী বেহারী হইতে, বাঙ্গালী আসামী হইতে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, কেন কতকগুলি বাঙ্গালীকে বেহারীর সহিত, কতকগুলিকে আসামীর সহিত যুক্ত করা হইল? এইরূপ করিয়া সম্রাটের মুখে আশার আভাস দেওয়াইয়া, বড়লাটের কাগজপত্রের ভাষা দ্বারা আশা জন্মাইয়া, নিরাশ করা উচিত হয় নাই।

ইহাতে শিক্ষা ও শাসনকার্য্যেরও অসুবিধা হইবে। যদি মানভূম, ধলভূম, রাজমহল, প্রভৃতি স্থান বেহারে না রাখিয়া বাঙ্গলায় রাখা হইত তাহা হইলে বেহার ও ছোট-নাগপুরে আদালতের ভাষা, ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের শিক্ষণীয় ভাষা কেবল হিন্দী রাখিলেই হইত। বিদ্যালয়ের ভাষাও প্রধানতঃ হিন্দী রাখিলেই হইত। এখন কিন্তু বাঙ্গলাও রাখিতে হইবে, অথচ হিন্দীর প্রাধান্য বশতঃ বঙ্গভাষী স্থানগুলি শিক্ষা ও শাসন উভয় বিষয়েই যথেষ্ট মনোযোগ ও উৎসাহ পাইবে না, এবং নানা অসুবিধায় পড়িবে।

শুনা যাইতেছে যে নূতন সরকারী-বঙ্গে স্বাস্থ্যকর স্থানের অভাব বশতঃ ইংরাজ ও বাঙ্গালী মোটা মাহিনার রাজকর্ম্মচারীরা বঙ্গে চাকরী করা অপেক্ষা বেহারাদি-স্থানে করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছেন। ইহাতে আমাদের বেশী ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কারণ বঙ্গদেশ শাসনের জন্য কতকগুলি কর্ম্মচারী ত চাই। তজ্জন্য যথেষ্ট ইংরাজ না পাওয়া গেলে বাঙ্গালী নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। কতকগুলি ইংরেজকেও থাকিতেই হইবে। এ পর্য্যন্ত বঙ্গের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রভূত চেষ্টা করেন নাই। যে সকল ইংরাজ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ আদিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ বঙ্গেই কাটাইতে হইবে, তাহাদের গরজে যদি এদিকে সরকার বাহাদুরের শুভদৃষ্টি পড়ে, ত তাহা মন্দ হইবে না। কেবল স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বে-সরকারী আমাদের পক্ষে গিরিডি আদি স্বাস্থ্যকর স্থান বঙ্গে থাকাও যা, বেহারে থাকাও তা। কারণ আমরা উভয়ক্ষেত্রেই তথায় স্বাস্থ্যলাভের জন্য যাইতে ও বসবাস করিতে পারি। সমুদয় স্বাস্থ্যকর স্থানগুলি বঙ্গের বাহিরে চলিয়া গেলে কিন্তু এক বিষয়ে ভবিষ্যতে আমাদের বড় অসুবিধা হইবে। চিন্তাশীল লোকেরা ইহা এখনই অনুভব করিতেছেন, এবং পরে ইহা সর্ব্বসাধারণেও বুঝিতে পারিবেন, যে, বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েদের শিক্ষার স্থান যত বেশী সংখ্যক স্বাস্থ্যকর স্থানে হয় ততই মঙ্গল। বাস্তবিক এরূপ স্থানে শিক্ষালয় স্থাপন করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় অবনতির বিশেষ সম্ভাবনা। ভারতপ্রবাসী ইংরাজেরা, সাধ্যপক্ষে, শিক্ষার জন্য, পুত্রকন্যাদিগকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রেরা ভারতের দার্জিলিং আদি পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যকর সহরস্থিত শিক্ষালয়ে সন্তানদিগকে প্রেরণ করেন। বঙ্গের অন্তর্গত থাকিলে স্বাস্থ্যকর স্থান সকলে বাঙ্গালীদের পক্ষে শিক্ষালয় স্থাপন ও চালান যত সহজ, ঐ সকল স্থান বঙ্গের বাহিরে হইলে তদপেক্ষা অনেক কঠিন। কারণ রাজশক্তি অনুকূল না হইলে, শিক্ষালয় রাখা সহজ নয়, প্রতিকূল হইলে রাখাই যায় না।* রাজশক্তি বঙ্গে বাঙ্গালীর সাহায্য করিতে যতটা বাধ্য, অন্যত্র ততটা নহে।

উদ্যোগী লোকেরা সকল অবস্থার মধ্য হইতেই মঙ্গল-

---

* এখানে প্রসঙ্গতঃ আমরা দার্জিলিংস্থিত মহারাণী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহাতে বালিকারা বাস করিয়া শিক্ষা পাইতে পারে। ইহার সম্পাদক ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার মহাশয়কে, নর্থ ভিউ, দার্জিলিং, ঠিকানায় পত্র লিখিলে, সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

সাধনের প্রেরণা ও উপায় লাভ করিতে পারেন। যদি কল্পনা করা যায় যে এরূপ নিয়ম কখনও হয় যে বঙ্গবাসী বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে বসবাস করিতে যাইতে পারিবে না, তাহা হইলে তাহাও অমিশ্র অনিষ্টের কারণ হইবে না। কারণ আজ কাল দেখা যায়, জমিদারেরা নিজ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আড্ডা করায় গ্রামগুলি অযত্নে মারা যাইতেছে। তাঁহারা গ্রামে থাকিয়া গ্রামের উন্নতি করিলে দেশের কিছু শ্রী ফিরে। তদ্রূপ সচ্ছল অবস্থার অবসরবিশিষ্ট বাঙ্গালী মাত্রেই যদি বঙ্গের বাহিরে স্বাস্থ্যকর স্থানে না গিয়া বঙ্গেই থাকিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে দেশের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহাদের অধিক দৃষ্টি পড়িতে পারে। তাহার ফলও ভাল হইতে পারে।

বাঙ্গালীর কয়েকটি সময়োচিত কর্ত্তব্য।

ভারতের রাজধানী দিল্লী চলিয়া গেল। এখন যাহারা উত্তর-ভারতের সহিত, তন্নিবাসী লোকজনদের সহিত, তথাকার সভ্যতার সহিত, যোগ রাখিতে না পারিবে, তাহারা নিতান্তই মফঃস্বলের লোক হইয়া যাইবে। অতএব আমাদের এখন হিন্দী-উর্দ্দু ও ফারসী শিখিয়া এই যোগ স্থাপনের চেষ্টা ভাল করিয়া করা উচিত।

দিল্লীতে ও উত্তর-ভারতে বাঙ্গালী-মতের প্রভাব অনুভূত হওয়া উচিত। এক সময়ে উত্তর-ভারতের দেশী ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রায় সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। এখনও অনেকে আছেন। কিন্তু দিল্লীতে প্রধান দেশী ইংরাজী দৈনিক যাঁহাদের হাতে থাকিবে, তাঁহাদের হাতে কম একটা শক্তি থাকিবে না। অতএব বাঙ্গালীদের যথেষ্ট মূলধন দিয়া তথায় একটি ইংরাজী দৈনিক অতি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

দিল্লীতে এখনই অনেক বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী আছেন। অতঃপর সংখ্যা আরও বাড়িবে। তাঁহাদের সকলেরই সেখানে বাড়ী করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তথায় কালক্রমে একটি প্রভাবশালী বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারিবে। বৎসরের সকল মাস বা অধিকাংশ মাস যে স্থানে থাকিতে হয়, তথায় চিরকাল কেবল বাড়ীভাড়া দেওয়া অতিব্যয়

এই বাঙ্গালী বসতির জন্য একটি উৎকৃষ্ট বালক-বিদ্যালয় এবং একটি উৎকৃষ্ট বালিকাবিদ্যালয় থাকা উচিত। ইহাতে অবাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীও লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য শিক্ষণীয় করা উচিত।

এই বাঙ্গালী বসতির জন্য একটি উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার থাকা কর্ত্তব্য। ইহা স্থাপনে কালবিলম্ব করা উচিত নয়। ছোট রকমের যাহা আছে, তাহা বাড়াইয়া তুলা উচিত।

এই বাঙ্গালী বসতির পক্ষ হইতে একটি উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা মাসিকপত্র বাহির হওয়া উচিত। ইহার জন্য বাঙ্গলা কাগজের সাধারণ লেখকদিগকে বিরক্ত না করিয়া ও তাঁহাদের চর্ব্বিতচর্ব্বণপূর্ণ লেখা না লইয়া, ইহাতে উত্তর-ভারতের সভ্যতা, রীতি নীতি, ধর্ম্মসম্প্রদায়, ভাষা, সাহিত্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্প, প্রভৃতির বৃত্তান্ত লিখিত হওয়া উচিত।

দিল্লীর অপরাপর কলেজ স্কুলে যথাসম্ভব অধিক বাঙ্গালী অধ্যাপক ও শিক্ষকের চাকরী পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

বাঙ্গালীর হৃদয় মস্তিষ্ক ও চেষ্টায় যে সকল উৎকৃষ্ট ফল ফলিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির নমুনা ভারতরাজধানী দিল্লীতে থাকা দরকার। তাহা হইলে বাঙ্গালী দ্বারা ভারতের যাহা উপকার হইতে পারে, তাহা ভাল করিয়া হইতে পারিবে। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজকে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি মনে করি। অতএব দিল্লীতে একটি ব্রহ্মোপাসনা-মন্দির থাকা উচিত। রামকৃষ্ণসেবা-শ্রমগুলিকে বাঙ্গালীর একটি শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া মনে করি। তদ্রূপ একটি জিনিষও দিল্লীতে থাকা উচিত। এইরূপ স্ব স্ব মতানুসারে বাঙ্গালীরা অনেক ভাল কাজ দিল্লীতে করিতে পারেন।

কলিকাতা হইতে রাজধানী উঠিয়া যাওয়ায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রধান লোকদের সহিত বাঙ্গালীর মিশিবার সুযোগ কিছু কমিবে। আমাদের ভ্রমণের মাত্রা বাড়াইয়া এই অভাব পূরণ করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, অন্যান্য প্রদেশের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসের চর্চা

আমাদের আরও করা উচিত। অন্যান্য প্রদেশের প্রাচীন ও আধুনিক মহৎলোকদের বিষয় আমাদের আরও আলোচনা করা উচিত। অন্যান্য প্রদেশের রীতিনীতি, সভ্যতা, সাহিত্য, শিল্প, প্রভৃতির জ্ঞান আমাদের খুব কম; তাহা বাড়ান কর্ত্তব্য।

চিত্র-পরিচয়

ও দেবযানী।

মহাভারতোক্ত কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান অবলম্বনে এই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কচ সুরগুরু বৃহস্পতির পুত্র; দেবযানী অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা। দেবাসুরের যুদ্ধকালে শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা হত অসুরদিগকে জীবন দান করিতেন; কিন্তু ঐ বিদ্যা বৃহস্পতি জানিতেন না বলিয়া মৃত দেবতাদিগকে তিনি পুনর্জীবিত করিতে পারিতেছিলেন না। ইহার দ্বারা দেবতাদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল, এবং সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করা দেবতাদের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। কিন্তু শক্রপুরীতে গিয়া শত্রুর নিকট হইতে কে এই দুর্লভ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিবার দুঃসাহস করিবে দেবতাদের এই সমস্যা উপস্থিত হইল। বৃহস্পতির তরুণ পুত্র কচ এই অসাধ্যসাধন করিতে সেচ্ছায় প্রস্তুত হইয়া শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে যাত্রা করিল। দেবযানীর সহিত কচের প্রথম সাক্ষাতেই দেবযানী সেই তরুণ দেবতার রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে; এবং তাহারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বাধ্য হইয়া শুক্রাচার্য্য কচকে ছাত্ররূপে নিজ আশ্রমে গ্রহণ করেন। অসুরেরা যখন জানিতে পারিল যে কচ বৃহস্পতির পুত্র, সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখিয়া লইতে আসিয়াছে, তখন তাহারা তাহাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু কচ দেবযানীর বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া শুক্রাচার্য্যেরও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, এজন্য অসুরেরা প্রকাশ্যে তাহাকে হত্যা করিতে সাহস করিতেছিল না। কচ বনে গুরুর গোচারণে গেলে তাহারা বারংবার তাহাকে হত্যা করিয়া কখনো বা নদীস্রোতে ভাসাইয়া দিল, কোনো বার বা বন্য হিংস্র পশুকে খাওয়াইয়া দিল: কিন্তু প্রত্যেক বারই দেবযানীর অনুরোধে বাধ্য হইয়া শুক্রাচার্য্য তাহাকে মন্ত্র পড়িয়া আহ্বান করিবা মাত্র সে জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন অসুরেরা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার দেহ চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত শুক্রাচার্য্যকে খাওয়াইয়া দিল। দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য তাহাকে ডাকিতে উদ্যত হইলে কচ বলিল—গুরুদেব আপনি আমাকে আহ্বান করিবেন না, আমাকে আহ্বান করিলে আমাকে আপনার উদর বিদীর্ণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে হইবে।—দেবযানী কিন্তু কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে, সে পিতাকে ধরিয়া বসিল যে যেমন করিয়া হোক কচকে বাঁচাইতেই হইবে। তখন শুক্রাচার্য্য বাধ্য হইয়া কচকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখাইয়া পরে তাহাকে জীবিত করিলেন। কচ তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া শুক্রাচার্য্যকে জীবন দান করিল। এইরূপে কচের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তখন কচ গুরুর নিকট বিদায় লইয়া স্বর্গধামে যাইতে উদ্যত হইল। দেবযানী যখন দেখিল যে কচ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তখন সে উপযাচিকা হইয়া কচের নিকট নিজের প্রণয় নিবেদন করিয়া তাহাকে গমনে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিল। কচ উত্তরে বলিল সুখ এখানে কিন্তু কর্ত্তব্য স্বর্গে; সুখহীন স্বর্গেই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন দেবযানী কচকে শাপ দিল যে সে ঐ সঞ্জীবনী বিদ্যার ভারবাহী মাত্র হইয়া থাকিবে, পরকে শিখাইবে কিন্তু নিজে প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

এই বিদায়ের দৃশ্যটি চিত্রে পরিকল্পিত হইয়াছে। সহস্র বৎসরের সাধনাক্লিষ্ট, দেবযানীর বিচ্ছেদকাতর, কচ, অভিমানিনী দেবযানীর নিকট বিদায় লইতেছে। এই ভাবটি চিত্রে পরিস্ফুট দেখা যাইতেছে।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের বিদায়-অভিশাপ নামক কাব্যে বর্ণিত এই কবিত্বময় উপাখ্যানের সহিত এই চিত্রখানি মিলাইয়া দেখিলে পাঠক যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন।

কষ্টিপাথর

মানসী (কার্ত্তিক)

বঙ্গসাহিত্য, ১৩১৭ সাল।—শ্রীসারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের রিপোর্ট।

এ বৎসর অধিক সংখ্যক সাহিত্যিকবিয়োগ ঘটিয়াছে—চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রজনীকান্ত সেন, শিশিরকুমার ঘোষ, দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, ধীরেন্দ্রনাথ পাল, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যাপারে সাহিত্যসেবার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ন্যায়ান্যায় আশঙ্কায় সঙ্কুচিত থাকায় সহজ সরল সাহিত্যরসস্রোতের অকুণ্ঠিত গতি পদে পদে বাধা পাইয়াছে। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে উভয় বিভাগের সাহিত্যের ভাষার তারতম্য বড় বেশি ছিল না, যাহা ছিল তাহাও কমিয়া আসিতেছিল। আধুনিক রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে, পূর্ব্ববঙ্গে দ্বিতীয় শিক্ষাপরিষৎ স্থাপনে ভাষার যথেষ্ট ক্ষতি হইবার আশঙ্কা হইয়াছে। তবে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় একই আছে (কিন্তু এখন তাহাও দ্বিধা বিভক্ত হইবার আশঙ্কা হইয়াছে)। বঙ্গবাসিগণ একত্র থাকিতে কৃতসঙ্কল্প থাকিলে এবং ভাষার একতা রাখিতে যত্নবান হইলে সাহিত্যের কোনো ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা

নাই। ১৩১৭ সালে বঙ্গসাহিত্যের বহুবিভাগেই ভালো ভালো গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। জীবনচরিত বিভাগে মুসলমান সাধুফকীরদিগের, মুসলমান খলিফাদিগের ও ভারতের শিক্ষিত মহিলাদিগের জীবনী হিন্দু-মুসলমান লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। যথা মুন্সী হামিদ আলির মোসলেম 'কর্ম্মবীর-চরিতমালা, হরিদেব শাস্ত্রীর 'ভারতের শিক্ষিত মহিলা,' 'চৈনিক ঋষি সি'। সৈয়দ শরাফৎ আলির 'হজরৎ মহম্মদের জীবনচরিত'. এ বৎসরকার জীবনচরিত বিভাগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। 'আবু বকর' নামক গ্রন্থও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৌলভি সেখ আব্দুল জব্বারের 'আদর্শ রমণী', নগেন্দ্রবাবুর 'রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত' সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ, দেবেন্দ্রনাথ দাসের 'পাগলের কথা', গুরুদাস বর্ম্মণের 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরিত', শ্রীবঙ্কবিহারী করের 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত' প্রভৃতি পুস্তক কয়খানিও বেশ হইয়াছে। নাটকশ্রেণীতে প্রকাশিত প্রহসনগুলির মধ্যে তৃপ্তিপ্রদ রচনা নাই। নাটকের মধ্যে রবীন্দ্র বাবুর 'রাজা' একখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপাদেয় গ্রন্থ। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শঙ্করাচার্য্য', শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান', শ্রীযুত ভবনাথ সরকারের 'বিধিলিপি', শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের দীনবন্ধু', শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদের 'বাঙ্গালার মসনদ', এবং শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্তের 'রণমই' উল্লেখযোগ্য। বীরেন্দ্রনাথ রায় সুপ্রসিদ্ধ মুসলমানী সন্ন্যাসিনী উম্-অল্-খয়ের রাবেয়ার জীবনচরিত অবলম্বনে 'রাবেয়া' নামে একখানি নাটক লিখিয়াছেন। উপন্যাস বিভাগে নাম করিবার মতো ভালো গ্রন্থ বেশী প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়ের 'নরদেবী বা মায়া', দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'রাণীভবানী', ও 'রাজা রামকৃষ্ণ', দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'শ্মশান' মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রমথনাথ তর্কভূষণের 'মণিভদ্র' উপাদেয় উপন্যাস। ছোট ছোট গল্প সংগ্রহের মধ্যে অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর 'ভক্তের জয়', জলধর সেনের 'পুরাতন পঞ্জিকা', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেশী ও বিলাতী', সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্ররেখা,' চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুষ্পপাত্র', ও ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘরের কথা' উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস-শ্রেণীতে কেদার বাবুর ঢাকার বিবরণ, ভবানন্দ সিংহের পূর্ণিয়া জেলার প্রাচীন ইতিহাস, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস', মধুসূদনাথ মল্লিকের 'নদীয়াকাহিনী', যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের রাজা সীতারাম রায় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণের ইতিহাস, কুমার মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তীর বীরভূম রাজবংশের ইতিহাস, দুর্গাদাস লাহিড়ীর পৃথিবীর ইতিহাস ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের আনুকূল্যে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ইতিহাস রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীযুত মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের 'হিন্দু রাজনীতি' ও কামিনীকুমার ঘটকের 'কুলবোধিনী' উল্লেখযোগ্য। দুর্গাচরণ সান্যাল 'ভাষাবিজ্ঞান' নামে একখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। সমাজতত্ত্ব বিভাগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সমাজতত্ত্ব, ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাতিভেদ' প্রকাশিত হইয়াছে। কায়স্থ, বৈদ্য, সুবর্ণবণিক, মাহিষ্য, নমশূদ্র, কপালী, সূত্রধর প্রভৃতি আপনাপন জাতির উন্নতিকল্পে নানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। জ্যোতিষ বিভাগে শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামীর 'শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত' ও ন্যায়শাস্ত্র বিভাগে শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহের 'তর্কবিজ্ঞান' উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মতত্ত্ববিভাগে শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সনাতনী', আশুতোষ দেবের 'মনুষ্য ইহলোকে ও পরলোকে,' ভাগবতদাসের 'বেদান্তের আমি', ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের 'আশ্রম চতুষ্টয়', কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'উপনিষদের উপদেশ', ক্ষিতিমোহন সেনের 'কবীর', সীতানাথ তত্ত্বভূষণের 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', ভুবনমোহন শর্ম্মার 'পুরাণদর্শনস্তত্ত্রের উপক্রমণিকা,' রমেশচন্দ্র সংহিতা সরস্বতীর 'ঋগ্বেদসংহিতার পদ্যে বঙ্গানুবাদ' উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলী শ্রেণীভুক্ত হইয়া কুমার শরৎকুমার রায় ও লালগোলার রাজার আনুকূল্যে ভারতের সকল ধর্ম্মের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। 'মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ' প্রকাশিত হইয়াছে, 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও শ্রীভাষ্য' অনুবাদ হইতেছে। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'উপনিষদসংগ্রহ' সানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। পুস্তিকা হিসাবে হেমেন্দ্রনাথ সিংহের 'আমি,' 'জীবন' ও 'হৃদয় ও মনের ভাষা' উল্লেখযোগ্য। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীমন্ত সওদাগর' উল্লেখযোগ্য। কাব্য বিভাগে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' উৎকৃষ্ট গীতি-পুস্তক। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের 'শঙ্খ,' রজনীকান্ত সেনের 'আনন্দময়ী', 'অভয়া', ও 'বিশ্রাম', যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'রেখা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তীর্থরেণু' কোষকাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট রচনা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি বহুভাষার সৎকবির বহু খণ্ড কবিতার সুন্দর অনুবাদ। সুখরঞ্জন রায়ের 'শুক্রা' সুখপাঠ্য কাব্য। সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ হইতে দ্বিজ কমললোচনের 'চণ্ডিকাবিজয়', বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল', ভাগবতাচার্য্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী', নিত্যগোপাল গোস্বামী সংকলিত 'কৃষ্ণকমল-গীতিকাব্য-গ্রন্থাবলী', দ্বিজ বংশীদাসের 'পদ্মাপুরাণ', দ্বিজ রামপ্রসাদের 'কৃষ্ণলীলামৃত' ও 'মীরা বাইয়ের কড়চা', প্রকাশিত হইয়াছে। কোরান শরীফের এক উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বসু প্রবর্ত্তিত বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ, জৈমিনী ভারতের অনুবাদ, খগেন্দ্র শাস্ত্রীর সটীক অনুবাদ শ্রীমদ্ভাগবত ক্রমশ প্রকাশিত হইয়াছে। উড়িয়া কবি কর্ণের সুবৃহৎ ছয় পালা সত্যনারায়ণ পাঁচালী, এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত কয়েকজন বিভিন্ন কবির রচিত সত্যনারায়ণ পাঁচালী প্রকাশিত হইয়াছে। ভ্রমণ-বিবরণ বিভাগে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাপান', মন্মথনাথ ঘোষের 'জাপানপ্রবাস', ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিকের 'বিলাতভ্রমণ', আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সেতুবন্ধযাত্রা', গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা হইতে আসাম', প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রনাথ দর্পণ', ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর 'ভারতভ্রমণ', প্রভাতচন্দ্র দোবের 'দার্জ্জিলিং' বহুচিত্রবিশিষ্ট, নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ সুখপাঠ্য পুস্তক। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের 'জেলের খাতা' এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের উপাদেয় গ্রন্থ। স্বাস্থ্য-বিভাগে ডাঃ চুনীলাল বসুর 'খাদ্য', ডাঃ কালী-প্রসন্ন সিংহের 'আমিষ ও নিরামিষ ভোজন', যোগেন্দ্রমোহন ঘোষের 'ব্রহ্মচর্য্য', উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসা বিভাগে অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'বৃহৎ পশু চিকিৎসা' ও চারুচন্দ্র ঘোষের 'বেরিবেরি' উল্লেখযোগ্য। শিল্প ও ব্যবসায় বিভাগে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'ব্যবসায়ী', শীতলচন্দ্র দত্তের 'শিল্পবান্ধব', আদরযোগ্য। ভাষার পুষ্টি ও বঙ্গভাষার সাহায্যে অন্যান্য ভাষাশিক্ষার জন্য মুন্সী মহম্মদ হোসেন বঙ্গভাষায় প্রাথমিক উর্দ্দু ব্যাকরণ এবং মৌলভী আব্দুল গনি 'বঙ্গআরবী ব্যাকরণ' ও ঠাকুর রাধামোহন দেববর্ম্মা 'ত্রৈপুর কথামালা' রচনা করিয়াছেন। সঙ্গীত বিভাগে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত 'গোপাল উড়ের টপ্পা', এবং প্রাচীন কবির গান, পদাবলী, কীর্ত্তন, ঢপ, তর্জ্জা, জারির গান, সারীর গান, ভাদু ও ঝুমুর গান প্রভৃতি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সখারাম গণেশ দেউস্কর কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ধ্বংসোন্মুখ বঙ্গীয় হিন্দুজাতি নামক পুস্তিকার প্রতিবাদ রূপে 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ' নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মূর্ত্তিপূজা'; কুমার আনন্দকৃষ্ণ দেবের 'দুর্গাপূজায় বলি ও জীববলি,' ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আলাপ' সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য পুস্তক। শ্রীযুক্ত-রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা 'মায়াপুরী'; ধনঞ্জয়

মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' সমালোচনা ; বিনয়কুমার সরকারের 'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা'. প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বহু ভাষার কথোপকথন শিক্ষার জন্য প্রভাতচন্দ্র মজুমদার 'হরবোলা' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে ইংরেজি, হিন্দী, ব্রহ্মী, চীন, তামিল, তেলেগু, ও বাংলা ভাষার ছোট ছোট বাক্য রচনার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। রসাত্মক রচনার মধ্যে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফোয়ারা' ও আশুতোষ মিত্রের 'জ্যাঠামহাশয়' উপভোগ্য। শিশুপাঠ্য সাহিত্যের মধ্যে ললিত বাবুর 'ছড়া ও গল্প', অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'চণ্ডী', মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঝুমঝুমি', যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রকাশিত লঙ্কাকাণ্ড, সাবিত্রীসত্যবান, শকুন্তলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মাসিক সাহিত্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাগজের নাম করা হইয়াছে। শিশুশিক্ষার উপযোগী পত্রিকাগুলির মধ্যে 'মুকুল' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তৎপরে সাপ্তাহিক পত্র।

তত্ত্ববোধিনী (মাঘ)—

ধর্ম্মশিক্ষা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত অতি উপাদেয় রচনা। সঙ্কিপ্ত সারসঙ্কলন করা কঠিন ও আমাদের স্থানাভাব। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা 'লজ্জৎ-ই-জান' উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (মাঘ)—

শ্রীবীরেশ্বর সেনের 'বাঙ্গালা ভাষা' বহু চিন্তনীয় উপাদেয় কথায় পূর্ণ। বঙ্গভাষার প্রকৃতি ও গঠনপ্রণালী ও বর্ণমালা, বানান ও উচ্চারণ, লিখন ও কথোপকথন, ও ভাষা প্রয়োগের বিশুদ্ধি ও অশুদ্ধি বিচক্ষণতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য এই— বাংলা ভাষার প্রকৃতি কিছু ভারি অর্থাৎ বহু স্বরযুক্ত, এজন্য স্বল্পস্বরযুক্ত বিদেশী শব্দ বাংলা শব্দের বদলে শীঘ্রই চলিত হইয়া যায়। বাংলায় ক্রিয়াপদের অভাব। ইংরেজি participle adjective এবং সংস্কৃতের শতৃশানচ-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদের অনুরূপ পদ বাংলায় নাই। ইংরাজিতে যৎ শব্দ দিয়া যে বড় বড় বিশেষণবাক্য রচিত হয় বাংলায় সেরূপ হয় না। বাংলায় নির্দ্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দের অত্যন্ত অভাব অনুভূত হয়। বাষট্টিতম, ত্রিপ্পান্নতম, পঞ্চান্নতম চালাইলে সে অভাব দূর হইতে পারে। ভগ্নাংশ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবার উপায় এখনো ঠিক করা যায় নাই। বাংলা বাক্যের শেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় ইহা স্বাভাবিকতার পরিপন্থী। বাংলা বর্ণমালা সম্পূর্ণ নহে। খাট, বার, কোন, মত প্রভৃতি শব্দ অকারান্ত হইলে এক অর্থ ও হলন্ত হইলে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এজন্য অধুনা কোনো কোনো লেখক উভয় শব্দকে পৃথক করিবার জন্য অকারান্ত শব্দে ওকার যোগ করেন। লেখকের মতে ইহা অনাবশ্যক। বাংলায় অনেক ভুল শব্দ খ্যাতনামা লেখকগণও লিখিয়া থাকেন ; তাহা সমালোচনা দ্বারা রোধ করা উচিত। প্রাদেশিক ভাষায় প্রবন্ধ রচনাও উচিত নহে। এমন কি কথোপকথন পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরী ভাষায় করা উচিত।

কিন্তু আমরা জানি সকল দেশেরই লিখিত ভাষা কোনো না কোনো প্রদেশের ভাষা ; তাহা না হইয়া উহা কৃত্রিম মনগড়া ভাষা হইলে তাহা জীবিত ভাষা হয় না। এইরূপে Classic সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের ভাষারূপে বেশিদিন টিঁকিতে পারিল না। বাংলার লিখিত ভাষার আদর্শ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ছিল ঢাকার প্রাদেশিক ভাষা, পরে কৃষ্ণনগর শান্তিপুরের ভাষা আদর্শ হয়। এক্ষণে কলিকাতা বঙ্গের কেন্দ্র, এবং পশ্চিমবঙ্গের ভাষা স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ প্রকাশে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা অপেক্ষা যোগ্যতর ; যে ভাষার মধ্যে প্রকাশের শক্তি যত অধিক থাকে তাহাই দেশের লিখিত ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। কলিকাতার আশেপাশের ভাষা অপেক্ষা অন্য প্রদেশের ভাষার সে গুণ অধিক থাকিলে সেখানকার ভাষা নিশ্চয়ই প্রাধান্য লাভ করিবে। লেখ্য ভাষাকে গতি ও বেগ দিতে হইলে তাহাকে কথ্য ভাষার সঙ্গে যোগ রাখিতেই হইবে। নতুবা অচিরে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

ওকারান্ত করিয়া শব্দ লেখা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ প্রবাসীতে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে অকারান্ত ও হসন্ত উচ্চারণে কোনো কোনো শব্দের অর্থ-তারতম্য হয় ; কিন্তু অর্থ দেখিয়া উচ্চারণ ঠিক করিতে কতক্ষণ? আমাদের মতে সেই অল্পক্ষণেরই দ্বিধা পাঠের গতিভঙ্গ করিয়া ছন্দ নষ্ট করে। ইহা নিবারণের জন্যই দ্ব্যর্থবাচক শব্দের দ্বি-রূপ স্বীকার করাই আমাদের মত।

—সংকলক।

---

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
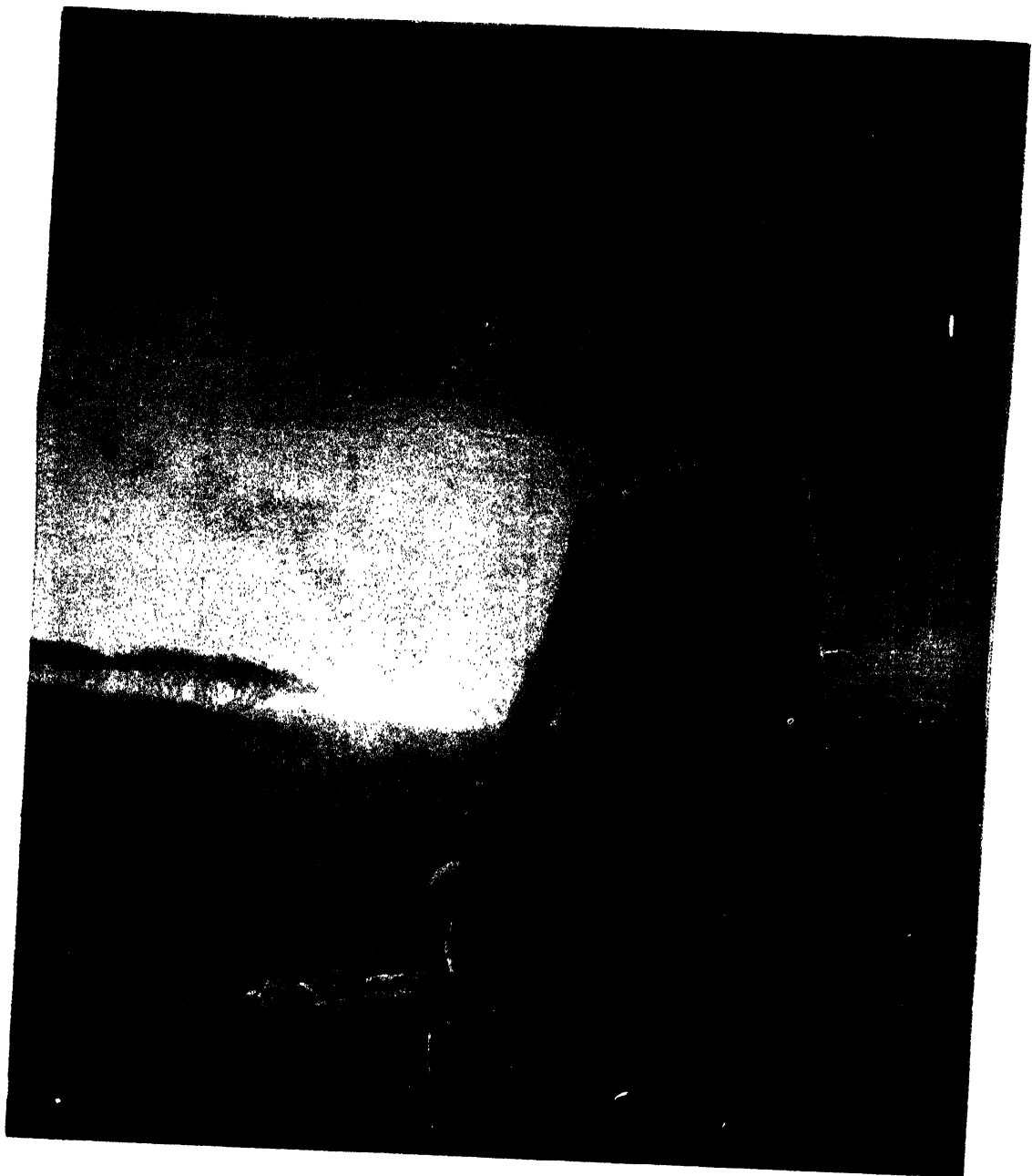
গৃহহারা জননী।

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত তৈলচিত্র হইতে তাঁহার অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

Three colour Blocks by U. Ray and Sons.

Kuntaline Press, Calcutta.

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১১শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩১৮

৬ষ্ঠ সংখ্যা

জীবনস্মৃতি

ভারতী।

মোটের উপর এই সময়টা আমার পক্ষে একটা উন্মত্ততার সময় ছিল। কতদিন ইচ্ছা করিয়াই না ঘুমাইয়া রাত কাটাইয়াছি। তাহার যে কোনো প্রয়োজন ছিল তাহা নহে কিন্তু বোধকরি রাত্রে ঘুমানোটাই সহজ ব্যাপার বলিয়াই সেটা উল্টাইয়া দিবার প্রবৃত্তি হইত। আমাদের ইস্কুলঘরের ক্ষীণ আলোতে নির্জ্জন ঘরে বই পড়িতাম; দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে পনেরো মিনিট অন্তর ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিত—প্রহরগুলা যেন একে একে নিলাম হইয়া যাইতেছে; চিৎপুর রোডে নিমতলা ঘাটের যাত্রীদের কণ্ঠ হইতে ক্ষণে ক্ষণে "হরিবোল" ধ্বনিত হইয়া উঠিত। কত গ্রীষ্মের গভীর রাত্রে, তেতালার ছাদে সারিসারি টবের বড় বড় গাছগুলির ছায়াপাতের দ্বারা বিচিত্র চাঁদের আলোতে একলা প্রেতের মত বিনা-কারণে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।

কেহ যদি মনে করেন এ সমস্তই কেবল কবিয়ানা, তাহা হইলে ভুল করিবেন। পৃথিবীর একটা বয়স ছিল যখন তাহার ঘন ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নিউচ্ছ্বাসের বয়স। এখনকার প্রবীন পৃথিবীতেও মাঝে মাঝে সেরূপ চাপল্যের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যায়; কিন্তু প্রথম বয়সে যখন তাহার আবরণ এত কঠিন ছিল না এবং ভিতরকার বাষ্প ছিল অনেক বেশি তখন সদাসর্ব্বদাই অভাবনীয় উৎপাতের তাণ্ডব চলিত। তরুণ বয়সের আরম্ভে এও সেইরকমের একটা কাণ্ড। যে সব উপকরণে জীবনগড়া হয়, যতক্ষণ গড়াটা বেশ পাকা না হয় ততক্ষণ সেই উপকরণগুলাই হাঙ্গামা করিতে থাকে।

এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই আরএকটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্ব্বেই আমি অল্প বয়সের স্পর্দ্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।

এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই "কবিকাহিনী" নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্ত্তিটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিতেছে ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্যকার সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও

ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিষটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয় কারণ ইহা শুনিতে খুব বড় এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ, তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য্য। এই বাল্যরচনাগুলি পাঠ করিবার সময় যখন সঙ্কোচ অনুভব করি তখন মনে আশঙ্কা হয় যে, বড় বয়সের লেখার মধ্যেও নিশ্চয় এইরূপ অতিপ্রয়াসের বিকৃতি ও অসত্যতা অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্নভাবে অনেক রহিয়া গেছে। বড় কথাকে খুব বড় গলায় বলিতে গিয়া নিঃসন্দেহই অনেক সময়ে তাহার শান্তি ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছি। নিশ্চয়ই অনেক সময়ে বলিবার বিষয়টাকে ছাপাইয়া নিজের কণ্ঠটাই সমুচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই ফাঁকিটা কালের নিকটে একদিন ধরা পড়িবেই।

এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থআকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভাল করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করিনা—কিন্তু তখন আমার মনে যে ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনোমতেই বলা যায় না। দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বইলেখকের কাছে নহে, বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায় সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেলফ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

যে বয়সে ভারতীতে লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম সে বয়সের লেখা প্রকাশযোগ্য হইতেই পারে না। বালককালে লেখা ছাপাইবার বালাই অনেক—বয়ঃপ্রাপ্ত অব[স্থার] জন্য অনুতাপ সঞ্চয় করিবার এমন উপায় আর ন[াই]। কিন্তু তাহার একটা সুবিধা আছে; ছাপার অক্ষরে নি[জের] লেখা দেখিবার প্রবল মোহ অল্পবয়সের উপর দি[য়াই] কাটিয়া যায়। আমার লেখা কে কে পড়িল, কে [কী] বলিল, ইহা লইয়া অস্থির হইয়া উঠা—লেখার কো[ন] খানটাতে দুটো ছাপার ভুল হইয়াছে এবং তাহাতে ক[রিয়া] পাঠকদের কাছে লেখার সৌন্দর্য্য কতটা মাটি হইয়া[ছে] ইহাই লইয়া কণ্টকবিদ্ধ হইতে থাকা—এই সমস্ত লে[খা] প্রকাশের ব্যাধিগুলা বাল্যবয়সে সারিয়া দিয়া অপেক্ষা[কৃত] সুস্থচিত্তে লিখিবার অবকাশ পাওয়া যায়। নিজের ছা[পা] লেখাটাকে সকলের কাছে নাচাইয়া বেড়াইবার মুগ্ধ অব[স্থা] হইতে যতশীঘ্র নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

তরুণ বাংলা সাহিত্যের এমন একটা বিস্তার ও প্রভ[াব] হয় নাই যাহাতে সেই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রচনাবি[ধি] লেখকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে। লিখিতে লিখি[তে] ক্রমশ নিজের ভিতর হইতেই এই সংযমটিকে উদ্ভাবি[ত] করিয়া লইতে হয়। এইজন্য দীর্ঘকাল বহুতর আবর্জ্জনা[কে] জন্ম দেওয়া অনিবার্য্য। কাঁচা বয়সে অল্পসম্বলে অদ্ভু[ত] কীর্ত্তি করিতে না পারিলে মন স্থির হয় না, কাজেই ভঙ্গি[মার] আতিশয্য, এবং প্রতিপদেই নিজের স্বাভাবি[ক] শক্তিকে ও সেই সঙ্গে সত্যকে সৌন্দর্য্যকে বহুদূরে লঙ্ঘ[ন] করিয়া যাইবার প্রয়াস রচনার মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই অবস্থা হইতে প্রকৃতিস্থ হওয়া, নিজের যতটুকু ক্ষম[তা] ততটুকুর প্রতি আস্থালাভ করা কালক্রমেই ঘটিয়া থাকে।

যাহাই হৌক্ ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলা[র] অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হই[য়া] আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে—উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতা[র] জন্য লজ্জা।

যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জ[া] বোধ হয় বটে কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহে[র] বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে কালটা ত ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও

সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনই ব্যর্থ হইবে না।

আমেদাবাদ।

ভারতী যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন আমাকে তিনি বিলাতে লইয়া যাইবেন। পিতৃদেব যখন সম্মতি দিলেন তখন আমার ভাগ্যবিধাতার এই আরেকটি অযাচিত বদান্যতায় আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম।

বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদে লইয়া গেলেন। তখন তিনি সেখানে জজ্ ছিলেন। আমার বৌঠাকরুণ এবং ছেলেরা তখন ইংলণ্ডে—সুতরাং বাড়ি একপ্রকার জনশূন্য ছিল।

শাহিবাগে জজের বাসা। ইহা বাদ্শাহি আমলের প্রাসাদ, বাদশাহের জন্যই নির্ম্মিত। এই প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা সাবরমতী নদী তাহার বালুশয্যায় একপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদীতীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে একটি প্রকাণ্ড খোলা ছাদ। মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ থাকিত না—শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যাহ্নকূজন শোনা যাইত। তখন আমি যেন একটা অকারণ কৌতূহলে শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একটি বড় ঘরের দেয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে, বড় বড় অক্ষরে ছাপা, অনেকছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থটিও তখন আমার পক্ষে এই রাজপ্রাসাদেরই মত নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বারবার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না, তাহা নহে—কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কূজনের মতই ছিল। লাইব্রেরিতে আর একখানি বই ছিল সেটি ডাক্তার হেবর্লিন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ। এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।

এই শাহিবাগপ্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোট ঘরে আমার আশ্রম ছিল। কেবল একটি চাকভরা বোল্তার দল আমার এই ঘরের অংশী। রাত্রে আমি সেই নির্জ্জন ঘরে শুইতাম—এক একদিন অন্ধকারে দুই একটা বোল্তা চাক হইতে আমার বিছানার উপর আসিয়া পড়িত—যখন পাশ ফিরিতাম তখন তাহারাও প্রীত হইত না এবং আমার পক্ষেও তাহা তীক্ষ্ণভাবে অপ্রীতিকর হইত। শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীরদিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্ব্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে "বলি ও আমার গোলাপবালা" গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।

ইংরেজিতে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্তদিন ডিক্সনারি লইয়া নানা ইংরেজি বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্পস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ-একরকম চলিয়া যাইত। এই অভ্যাসের ভাল মন্দ দুইপ্রকার ফলই আমি আজপর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি।

বিলাত।

এইরূপে আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে মাসছয়েক কাটাইয়া আমরা বিলাতে যাত্রা করিলাম। অশুভক্ষণে বিলাতযাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই।

এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্যবয়সের বাহাদুরী। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতসবাজি করিবার এই প্রয়াস। শ্রদ্ধা করিবার, গ্রহণ করিবার, প্রবেশ লাভ করিবার শক্তিই যে সকলের চেয়ে মহৎ শক্তি, এবং বিনয়ের দ্বারাই যে সকলের চেয়ে বড় করিয়া অধিকার বিস্তার করা যায় কাঁচাবয়সে একথা মন বুঝিতে চায় না। ভাললাগা, প্রশংসাকরা যেন একটা পরাভব, সে যেন দুর্ব্বলতা—এইজন্য কেবলি খোঁচা দিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার এই চেষ্টা আমার কাছে আজ হাস্যকর হইতে পারিত যদি ইহার ঔদ্ধত্য ও অসরলতা আমার কাছে কষ্টকর না হইত।

ছেলেবেলা হইতে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। এমন সময়ে হঠাৎ সতেরো বছর বয়সে বিলাতের জনসমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়া পড়িলে খুব একচোট হাবুডুবু খাইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আমার মেজবৌঠাকরুণ তখন ছেলেদের লইয়া ব্রাইটনে বাস করিতেছিলেন—তাঁহার আশ্রয়ে গিয়া বিদেশের প্রথম ধাক্কাটা আর গায়ে লাগিল না।

তখন শীত আসিয়া পড়িয়াছে। একদিন রাত্রে ঘরে বসিয়া আগুনের ধারে গল্প করিতেছি, ছেলেরা উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিল বরফ পড়িতেছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম, কনকনে শীত, আকাশে শুভ্র জ্যোৎস্না এবং পৃথিবী শাদা বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। চিরদিন পৃথিবীর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি এ সে মূর্ত্তিই নয়—এ যেন একটা স্বপ্ন, যেন আর কিছু—সমস্ত কাছের জিনিষ যেন দূরে গিয়া পড়িয়াছে—শুভ্রকায় নিশ্চল তপস্বী যেন ধ্যানের আবরণে আবৃত। অকস্মাৎ ঘরের বাহির হইয়াই এমন আশ্চর্য্য বিরাট সৌন্দর্য্য আর কখনো দেখি নাই।

বৌঠাকুরাণীর যত্নে এবং ছেলেদের বিচিত্র উৎপাত উপদ্রবের আনন্দে দিন বেশ কাটিতে লাগিল। ছেলেরা আমার অদ্ভুত ইংরেজি উচ্চারণে ভারি আমোদ বোধ করিল। তাহাদের আর সকল রকম খেলায় আমার কোনো বাধা ছিল না, কেবল তাহাদের এই আমোদটাতে আমি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারিতাম না। "Warm" শব্দে a-র উচ্চারণ o-র মত এবং "Worm" শব্দের o-র উচ্চারণ a-র মত এটা যে কোনোমতেই সহজ-জ্ঞানে জানিবার বিষয় নহে সেটা আমি শিশুদিগকে বুঝাইব কি করিয়া? মন্দভাগ্য আমি, তাহাদের হাসিটা আমার উপর দিয়াই গেল, কিন্তু হাসিটা সম্পূর্ণ পাওনা ছিল ইংরাজি উচ্চারণবিধির। এই দুটি ছোট ছেলের মন ভোলাইবার, তাহাদিগকে হাসাইবার, আমোদ দিবার নানাপ্রকার উপায় আমি প্রতিদিন উদ্ভাবন করিতাম। ছেলে ভোলাইবার সেই উদ্ভাবনী শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন তাহার পরে আরো অনেকবার ঘটিয়াছে—এখনো সে প্রয়োজন যায় নাই। কিন্তু সে শক্তির আর সে অজস্র প্রাচুর্য্য অনুভব করি না। শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল—দানের আয়োজন তাই এমন বিচিত্র-ভাবে পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রের এপারের ঘর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের ওপারের ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য ত আমি যাত্রা করি নাই। কথা ছিল পড়াশুনা করিব, ব্যারিষ্টর হইয়া দেশে ফিরিব। তাই একদিন ব্রাইটনে একটি পাব্লিক স্কুলে আমি ভর্ত্তি হইলাম। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রথমেই আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, বাহবা, তোমার মাথাটা ত চমৎকার! (What a splendid head you have!) এই ছোট কথাটা যে আমার মনে আছে তাহার কারণ এই যে, বাড়িতে আমার দর্পহরণ করিবার জন্য যাঁহার প্রবল অধ্যবসায় ছিল—তিনি বিশেষ করিয়া আমাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে আমার ললাট এবং মুখশ্রী পৃথিবীর অন্য অনেকের সহিত তুলনায় কোনোমতে মধ্যমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আশা করি এটাকে পাঠকেরা আমার গুণ বলিয়াই ধরিবেন যে আমি তাঁহার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলাম এবং আমার সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তার নানাপ্রকার কার্পণ্যে দুঃখ অনুভব করিয়া নীরব হইয়া থাকিতাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার মতের সঙ্গে বিলাতবাসীর মতের দুটো একটা বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে

পাইয়া অনেকবার আমি গম্ভীর হইয়া ভাবিয়াছি হয় ত উভয় দেশের বিচারের প্রণালী ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ব্রাইটনের এই স্কুলের একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম—ছাত্রেরা আমার সঙ্গে কিছুমাত্র রূঢ় ব্যবহার করে নাই। অনেক সময়ে তাহারা আমার পকেটের মধ্যে কমলালেবু আপেল প্রভৃতি ফল গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশী বলিয়াই আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ আচরণ ইহাই আমার বিশ্বাস।

এ ইস্কুলেও আমার বেশি দিন পড়া চলিল না—সেটা ইস্কুলের দোষ নয়। তখন তারক পালিত মহাশয় ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি বুঝিলেন এমন করিয়া আমার কিছু হইবে না। তিনি মেজদাদাকে বলিয়া আমাকে লণ্ডনে আনিয়া প্রথমে একটা বাসায় একলা ছাড়িয়া দিলেন। সে বাসাটা ছিল রিজেণ্ট উদ্যানের সম্মুখেই। তখন ঘোরতর শীত। সম্মুখের বাগানের গাছগুলায় একটিও পাতা নাই—বরফে ঢাকা আঁকাবাঁকা রোগা ডালগুলা লইয়া তাহারা সারি-সারি আকাশের দিকে তাকাইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে—দেখিয়া আমার হাড়গুলার মধ্যে পর্য্যন্ত যেন শীত করিতে থাকিত। নবাগত প্রবাসীর পক্ষে শীতের লণ্ডনের মত এমন নির্ম্মম স্থান আর কোথাও নাই। কাছাকাছির মধ্যে পরিচিত কেহ নাই, রাস্তাঘাট ভাল করিয়া চিনি না। একলা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিবার দিন আবার আমার জীবনে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাহির তখন মনোরম নহে, তাহার ললাটে ভ্রূকুটি; আকাশের রং ঘোলা, আলোক মৃতব্যক্তির চক্ষুতারার মত দীপ্তিহীন, দশদিক্ আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়াছে, জগতের মধ্যে উদার আহ্বান নাই। ঘরের মধ্যে আসবাব প্রায় কিছুই ছিল না দৈবক্রমে কি কারণে একটা হার্ম্মোনিয়ম ছিল। দিন যখন সকালসকাল অন্ধকার হইয়া আসিত তখন সেই যন্ত্রটা লইয়া আপন মনে বাজাইতাম। কখনো কখনো ভারতবর্ষীয় কেহ কেহ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্পই ছিল। কিন্তু যখন বিদায় লইয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া যাইতেন আমার ইচ্ছা করিত কোট ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া আবার ঘরে আনিয়া বসাই।

এই বাসায় থাকিবার সময় একজন আমাকে লাটিন শিখাইতে আসিতেন। লোকটি অত্যন্ত রোগা—গায়ের কাপড় জীর্ণপ্রায়—শীতকালের নগ্ন গাছগুলার মতই তিনি যেন আপনাকে শীতের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেন না। তাঁহার বয়স কত ঠিক জানি না কিন্তু তিনি যে আপন বয়সের চেয়ে বুড়া হইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। এক একদিন আমাকে পড়াইবার সময় তিনি যেন কথা খুঁজিয়া পাইতেন না, লজ্জিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পরিবারের সকল লোকে তাঁহাকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া জানিত। একটা মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিতেন পৃথিবীতে এক একটা যুগে একই সময়ে ভিন্নভিন্ন দেশের মানবসমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে; অবশ্য সভ্যতার তারতম্যঅনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে কিন্তু হাওয়াটা একই। পরস্পরের দেখাদেখি যে একই ভাব ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে, যেখানে দেখাদেখি নাই সেখানেও অন্যথা হয় না। এই মতটিকে প্রমাণ করিবার জন্য তিনি কেবলি তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন ও লিখিতেছেন। এদিকে ঘরে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই। তাঁহার মেয়েরা তাঁহার মতের প্রতি শ্রদ্ধামাত্র করে না এবং সম্ভবত এই পাগলামির জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা ভৎসনা করিয়া থাকে। এক একদিন তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা যাইত—ভাল কোনোএকটা প্রমাণ পাইয়াছেন, লেখা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমি সেদিন সেইবিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার উৎসাহে আরো উৎসাহসঞ্চার করিতাম, আবার এক-একদিন তিনি বড় বিমর্ষ হইয়া আসিতেন—যেন, যে ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আর বহন করিতে পারিতেছেন না—সেদিন পড়ানোর পদে পদে বাধা ঘটিত—চোখ দুটো কোন্ শূন্যের দিকে তাকাইয়া থাকিত—মনটাকে কোনোমতেই প্রথমপাঠ্য লাটিন ব্যাকরণের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিতেন না। এই ভাবের ভারে ও লেখার দায়ে অবনত অনশনক্লিষ্ট লোকটিকে দেখিলে আমার বড়ই বেদনা বোধ হইত। যদিও বেশ বুঝিতে-

ছিলাম ইঁহার দ্বারা আমার পড়ার সাহায্য প্রায় কিছুই হইবে না—তবুও কোনোমতেই ইঁহাকে বিদায় করিতে আমার মন সরিল না। যে কয়দিন সে বাসায় ছিলাম এমনি করিয়া লাটিন পড়িবার ছল করিয়াই কাটিল। বিদায় লইবার সময় যখন তাঁহার বেতন চুকাইতে গেলাম তিনি করুণস্বরে আমাকে কহিলেন—আমি কেবল তোমার সময় নষ্ট করিয়াছি, আমি ত কোনো কাজই করি নাই, আমি তোমার কাছ হইতে বেতন লইতে পারিব না। আমি তাঁহাকে অনেক কষ্টে বেতন লইতে রাজি করিয়াছিলাম। আমার সেই লাটিনশিক্ষক যদিচ তাঁহার মতকে আমার সমক্ষে প্রমাণ সহ উপস্থিত করেন নাই তবু তাঁহার সে কথা আমি এ পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করি না। এখনো আমার এই বিশ্বাস যে, সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে—তাহার এক জায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

এখান হইতে পালিত মহাশয় আমাকে বার্কার নামক একজন শিক্ষকের বাসায় লইয়া গেলেন। ইনি বাড়িতে ছাত্রদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ইঁহার ঘরে ইঁহার ভালমানুষ স্ত্রীটি ছাড়া অত্যল্পমাত্রও রম্য জিনিষ কিছুই ছিল না। এমন শিক্ষকের ছাত্র যে কেন জোটে তাহা বুঝিতে পারি, কারণ ছাত্রবেচারাদের নিজের পছন্দ প্রয়োগ করিবার সুযোগ ঘটেনা—কিন্তু এমন মানুষেরও স্ত্রী মেলে কেমন করিয়া সে কথা ভাবিলে মন ব্যথিত হইয়া উঠে। বার্কারজায়ার সান্ত্বনার সামগ্রী ছিল একটি কুকুর—কিন্তু স্ত্রীকে যখন বার্কার দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিতেন তখন পীড়া দিতেন সেই কুকুরকে। সুতরাং এই কুকুরকে অবলম্বন করিয়া মিসেস্ বার্কার আপনার বেদনার ক্ষেত্রকে আরো খানিকটা বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এমন সময় বৌঠাকুরাণী যখন ডেভনশিয়রে টর্কিনগর হইতে ডাক দিলেন তখন আনন্দের সঙ্গে সেখানে দৌড় দিলাম। সেখানে পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুলবিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায় আমার দুইটি লীলাচঞ্চল শিশু সঙ্গীকে লইয়া কি আনন্দে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না। দুই চক্ষু যখন মুগ্ধ, মন আনন্দে অভিষিক্ত, এবং অবকাশে পূর্ণ দিনগুলি নিষ্কণ্টক সুখের বোঝা লইয়া প্রত্যহ অনন্তের নিস্তব্ধ নীলাকাশসমুদ্রে দেখা দিতেছে তখনো কেন যে মনের মধ্যে কবিতা লেখার তাগিদ আসিতেছে না এই কথা চিন্তা করিয়া এক একদিন মনে আঘাত পাইয়াছি। তাই একদিন খাতাহাতে ছাতামাথায় নীল সাগরের শৈলবেলায় কবির কর্ত্তব্য পালন করিতে গেলাম। জায়গাটি সুন্দর বাছিয়াছিলাম—কারণ, সেটা ত ছন্দও নহে ভাবও নহে। একটি সমুচ্চ শিলাতট চিরআগ্রহের মত সমুদ্রের অভিমুখে শূন্যে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে;—সম্মুখের ফেনরেখাঙ্কিত তরল নীলিমার দোলার উপর দিনের আকাশ দোল খাইয়া তরঙ্গের কলগানে হাসিমুখে ঘুমাইতেছে—পশ্চাতে সারিবাঁধা পাইনের সুগন্ধি ছায়াখানি বনলক্ষ্মীর আলস্যস্খলিত আঁচলটির মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই শিলাসনে বসিয়া "মগ্নতরী" নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেইখানেই সমুদ্রের জলে সেটাকে মগ্ন করিয়া দিয়া আসিলে আজ হয়ত বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারিতাম যে, সে জিনিষটা বেশ ভালই হইয়াছিল। কিন্তু সে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো সে সশরীরে সাক্ষ্য দিবার জন্য বর্ত্তমান। গ্রন্থাবলী হইতে যদিও সে নির্ব্বাসিত তবু সপিনা জারি করিলে তাহার ঠিকানা পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে না।

কিন্তু কর্ত্তব্যের পেয়াদা নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। আবার তাগিদ আসিল—আবার লণ্ডনে ফিরিয়া গেলাম। এবারে ডাক্তার স্কট্ নামে একজন ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটিল। একদিন সন্ধ্যার সময় বাক্স তোরঙ্গ লইয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়িতে কেবল পক্ককেশ ডাক্তার, তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহাদের বড় মেয়েটি আছেন। ছোট দুই জন মেয়ে ভারতবর্ষী অতিথির আগমনআশঙ্কায় অভিভূত হইয়া কোনো আত্মীয়ের বাড়ি পলায়ন করিয়াছেন। বোধ করি যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন আমার দ্বারা কোনো সাংঘাতিক বিপদের আশু সম্ভাবনা নাই তখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইঁহাদের ঘরের লোকের মত হইয়া গেলাম। মিসেস্ স্কট্ আমাকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ

মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।

এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করিয়াছি—মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে আমাদের দেশে পতিভক্তির একটি বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস্ স্কটের আমি ত বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে চাকরবাকরদের উপসর্গ নাই, প্রায় সব কাজই নিজের হাতে করিতে হয়, এইজন্য স্বামীর প্রত্যেক ছোটখাটো কাজটিও মিসেস্ স্কট নিজের হাতে করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্বামী কাজ করিয়া ঘরে ফিরিবেন, তাহার পূর্ব্বেই আগুনের ধারে তিনি স্বামীর আরামকেদারা ও তাঁহার পশমের জুতা জোড়াটি স্বহস্তে গুছাইয়া রাখিতেন। ডাক্তার স্কটের কি ভাল লাগে আর না লাগে, কোন্ ব্যবহার তাঁহার কাছে প্রিয় বা অপ্রিয় সে কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার স্ত্রী ভুলিতেন না। প্রাতঃকালে একজন মাত্র দাসীকে লইয়া নিজে উপরের তলা হইতে নীচের রান্নাঘর, সিঁড়ি এবং দরজার গায়ের পিতলের কাজগুলিকে পর্য্যন্ত ধুইয়া মাজিয়া তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়া দিতেন। ইহার পরে লোকলৌকিকতার নানা কর্ত্তব্য ত আছেই। গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গান বাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন; অবকাশের কালে আমোদ প্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গৃহিণীর কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ।

মেয়েদের লইয়া একএকদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে টেবিল চালা হইত। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটা টিপাইয়ে হাত লাগাইয়া থাকিতাম, আর টিপাইটা ঘরময় উন্মত্তের মত দাপাদাপি করিয়া বেড়াইত। ক্রমে এমন হইল আমরা যাহাতে হাত দিই তাহাই নড়িতে থাকে। মিসেস স্কটের এটা যে খুব ভাল লাগিত তাহা নহে। তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া একএকবার মাথা নাড়িয়া বলিতেন, আমার মনে হয় এটা ঠিক বৈধ হইতেছে না। কিন্তু তবু তিনি আমাদের এই ছেলেমানুষিকাণ্ডে জোর করিয়া বাধা দিতেন না, এই অনাচার সহ্য করিয়া যাইতেন। একদিন ডাক্তার স্কটের লম্বা টুপি লইয়া সেটার উপর হাত রাখিয়া যখন চালিতে গেলাম তিনি ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, না, না, ও টুপি চালাইতে পারিবে না। তাঁহার স্বামীর মাথার টুপিতে মুহূর্ত্তের জন্য সয়তানের সংস্রব ঘটে ইহা তিনি সহিতে পারিলেন না।

এই সমস্তের মধ্যে একটি জিনিষ দেখিতে পাইতাম, সেটি স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি। তাঁহার সেই আত্ম-বিসর্জ্জনপর মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাহাদের প্রেম আপন বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই সেখানে তাহা আপনিই পূজায় আসিয়া ঠেকে। যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর, যেখানে আমোদ-প্রমোদেই দিনরাত্রিকে আবিল করিয়া রাখে সেখানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে; সেখানে স্ত্রীপ্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।

কয়েক মাস এখানে কাটিয়া গেল। মেজদাদাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিতে হইবে। সে প্রস্তাবে আমি খুসি হইয়া উঠিলাম। দেশের আলোক দেশের আকাশ আমাকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল। বিদায়গ্রহণকালে মিসেস্ স্কট আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে?—লণ্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই—এই ডাক্তার-পরিবারের কেহ বা পরলোকে কেহ বা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার কোনো সংবাদই জানি না কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

একবার শীতের সময় আমি টন্‌ব্রিজ্ ওয়েল্‌স্ সহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই, বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোনো কথা বলিল না, কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য আমার মুখের

দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছু দূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মহাশয় আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন" বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। এই ঘটনাটি হয়ত আমার মনে থাকিত না কিন্তু ইহার অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধ করি টর্কি ষ্টেসনে প্রথম যখন পৌঁছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকাগাড়িতে তুলিয়া দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনি জাতীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্দ্ধক্রাউন ছিল সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্ব্বোধ বিদেশী ঠাহরাইয়া আরো কিছু দাবী করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, আপনি বোধ করি, পেনি মনে করিয়া আমাকে অর্দ্ধক্রাউন দিয়াছেন।

যত দিন ইংলণ্ডে ছিলাম কেহ আমাকে বঞ্চনা করে নাই তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাখিবার বিষয় নহে এবং তাহাকে বড় করিয়া দেখিলে অবিচার করা হইবে। আমার মনে এই কথাটা খুব লাগিয়াছে যে যাহারা নিজে বিশ্বাস নষ্ট করে না তাহারাই অন্যকে বিশ্বাস করে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশী অপরিচিত, যখন খুসি ফাঁকি দিয়া দৌড় মারিতে পারি—তবু সেখানে দোকানে বাজারে কেহ আমাদিগকে কিছু সন্দেহ করে নাই।

যত দিন বিলাতে ছিলাম, সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি প্রহসন আমার প্রবাসবাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া ছিল। ভারতবর্ষের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্ম্মচারীর বিধবা স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি স্নেহ করিয়া আমাকে রুবি বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুউপলক্ষে তাঁহার ভারতবর্ষীয় এক বন্ধু ইংরেজিতে একটি বিলাপগান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভাষানৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই কবিতাটি বেহাগরাগিণীতে গাহিতে হইবে এমন একটা উল্লেখ ছিল। আমাকে একদিন তিনি ধরিলেন এই গানটা তুমি বেহাগ রাগিণীতে গাহিয়া আমাকে শুনাও। আমি নিতান্ত ভালমানুষী করিয়া তাঁহার কথাটা রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই অদ্ভুত কবিতার সঙ্গে বেহাগ সুরের সম্মিলনটা যে কিরূপ হাস্যকর হইয়াছিল তাহা আমিছাড়া বুঝিবার দ্বিতীয় কোনো লোক সেখানে উপস্থিত ছিল না। মহিলাটি ভারতবর্ষীয় সুরে তাঁহার স্বামীর শোকগাথা শুনিয়া খুব খুসি হইলেন। আমি মনে করিলাম এইখানেই পালা শেষ হইল—কিন্তু হইল না।

সেই বিধবা রমণীর সঙ্গে নিমন্ত্রণসভায় প্রায়ই আমার দেখা হইত। আহারান্তে বৈঠকখানাঘরে যখন নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্রে সমবেত হইতেন তখন তিনি আমাকে সেই বেহাগ গান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। অন্য সকলে ভাবিতেন ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের একটা বুঝি আশ্চর্য্য নমুনা শুনিতে পাইবেন—তাঁহারা সকলে মিলিয়া সানুনয় অনুরোধে যোগ দিতেন, মহিলাটির পকেট হইতে সেই ছাপান কাগজ খানি বাহির হইত—আমার কর্ণমূল রক্তিম আভা ধারণ করিত। নতশিরে লজ্জিতকণ্ঠে গান ধরিতাম স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম এই শোকগাথার ফল আমার পক্ষে ছাড়া আর কাহারো পক্ষে যথেষ্ট শোচনীয় হইত না। গানের শেষে চাপা হাসির মধ্য হইতে শুনিতে পাইতাম "Thank you very much. How interesting!" তখন শীতের মধ্যেও আমার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইবার উপক্রম করিত। এই ভদ্রলোকের মৃত্যু আমার পক্ষে যে এতবড় একটা দুর্ঘটনা হইয়া উঠিবে তাহা আমার জন্মকালে বা তাঁহার মৃত্যুকালে কে মনে করিতে পারিত!

তাহার পরে আমি যখন ডাক্তার স্কটের বাড়িতে থাকিয়া লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে পড়া আরম্ভ করিলাম তখন কিছুদিন সেই মহিলাটির সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। লণ্ডনের বাহিরে কিছু দূরে তাঁহার বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে যাইবার জন্য তিনি প্রায় আমাকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিতেন। আমি শোকগাথার ভয়ে কোনোমতেই রাজি হইতাম না। অবশেষে একদিন তাঁহার সানুনয় একটি

টেলিগ্রাম পাইলাম। টেলিগ্রাম যখন পাইলাম তখন কলেজে যাইতেছি। এদিকে তখন কলিকাতায় ফিরিবার সময়ও আসন্ন হইয়াছে। মনে করিলাম এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বিধবার অনুরোধটা পালন করিয়া যাইব।

কলেজ হইতে বাড়ি না গিয়া একেবারে ষ্টেশনে গেলাম। সেদিন বড় দুর্যোগ। খুব শীত, বরফ পড়িতেছে, কুয়াশায় আকাশ আচ্ছন্ন। যেখানে যাইতে হইবে সেই ষ্টেসনেই এ লাইনের শেষ গম্যস্থান—তাই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। কখন গাড়ি হইতে নামিতে হইবে তাহা সন্ধান লইবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

দেখিলাম ষ্টেশনগুলি সব ডানদিকে আসিতেছে। তাই ডানদিকের জানলা ঘেঁষিয়া বসিয়া গাড়ির দীপালোকে একটা বই পড়িতে লাগিলাম। সকালসকাল সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে—বাহিরে কিছুই দেখা যায় না। লণ্ডন হইতে যে কয়জন যাত্রী আসিয়াছিল তাহারা নিজ নিজ গম্যস্থানে একে একে নামিয়া গেল।

গন্তব্য ষ্টেশনের পূর্ব্বষ্টেশন ছাড়িয়া গাড়ি চলিল। এক জায়গায় একবার গাড়ি থামিল। জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম সমস্ত অন্ধকার। লোকজন নাই, আলো নাই, প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম নাই, কিছুই নাই। ভিতরে যাহারা থাকে তাহারাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানা হইতে বঞ্চিত—রেলগাড়ি কেন যে অস্থানে অসময়ে থামিয়া বসিয়া থাকে রেলের আরোহীদের তাহা বুঝিবার উপায় নাই অতএব পুনরায় পড়ায় মন দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি পিছু হটিতে লাগিল—মনে ঠিক করিলাম রেলগাড়ির চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করা মিথ্যা। কিন্তু যখন দেখিলাম যে-ষ্টেশনটি ছাড়িয়া গিয়াছিলাম সেই ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল তখন উদাসীন থাকা আমার পক্ষে কঠিন হইল। ষ্টেশনের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম অমুক ষ্টেশন কখন পাওয়া যাইবে? সে কহিল সেইখান হইতেই ত এগাড়ি এইমাত্র আসিয়াছে। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাইতেছে? সে কহিল, লণ্ডনে। বুঝিলাম এ গাড়ি খেয়াগাড়ি, পারাপার করে। ব্যতিব্যস্ত হইয়া হঠাৎ সেই খানে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরের গাড়ি কখন্ পাওয়া যাইবে? সে কহিল, আজ রাত্রে নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম কাছাকাছির মধ্যে সরাই কোথাও আছে? সে বলিল, পাঁচ মাইলের মধ্যে না।

প্রাতে দশটার সময় আহার করিয়া বাহির হইয়াছি ইতিমধ্যে জলস্পর্শ করি নাই। কিন্তু বৈরাগ্য ছাড়া যখন দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে তখন নিবৃত্তিই সব চেয়ে সোজা। মোটা ওভারকোটের বোতাম গলা পর্য্যন্ত আঁটিয়া ষ্টেশনের দীপস্তম্ভের নীচে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম। বইটা ছিল স্পেন্সরের Data of Ethics, সেটি তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত্যন্তর যখন নাই তখন এই জাতীয় বই মনোযোগ দিয়া পড়িবার এমন পরিপূর্ণ অবকাশ আর জুটিবে না এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

কিছুকাল পরে পোর্টার আসিয়া কহিল, আজ একটি স্পেশাল আছে—আধঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। শুনিয়া মনে এত স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল যে তাহার পর হইতে Data of Ethics-এ মনোযোগ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

সাতটার সময় যেখানে পৌঁছিবার কথা সেখানে পৌঁছিতে সাড়ে নয়টা হইল। গৃহকর্ত্রী কহিলেন, একি রুবি, ব্যাপারখানা কি? আমি আমার আশ্চর্য্য ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি খুব যে সগর্ব্বে বলিলাম তাহা নয়।

তখন সেখানকার নিমন্ত্রিতগণ ডিনার শেষ করিয়াছেন। আমার মনে ধারণা ছিল যে, আমার অপরাধ যখন স্বেচ্ছাকৃত নহে তখন গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে না—বিশেষতঃ রমণী যখন বিধানকর্ত্রী। কিন্তু উচ্চপদস্থ ভারত-কর্ম্মচারীর বিধবা স্ত্রী আমাকে বলিলেন—এস রুবি, এক পেয়ালা চা খাইবে।

আমি কোনোদিন চা খাই না কিন্তু জঠরানল নির্ব্বাপনের পক্ষে পেয়ালা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে মনে করিয়া গোটাদুয়েক চক্রাকার বিস্কুটের সঙ্গে সেই কড়া চা গিলিয়া ফেলিলাম। বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া দেখিলাম অনেকগুলি প্রাচীনা নারীর সমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন সুন্দরী যুবতী ছিলেন তিনি আমেরিকান এবং তিনি গৃহস্বামিনীর যুবক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহের

পূর্ব্বে পূর্ব্বরাগের পালা উদ্‌যাপন করিতেছেন। ঘরের গৃহিণী বলিলেন, এবার তবে নৃত্য সুরু করা যাক্। আমার নৃত্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না, এবং শরীরমনের অবস্থাও নৃত্যের অনুকূল ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত ভালমানুষ যাহারা জগতে তাহারা অসাধ্যসাধন করে। সেই কারণে, যদিচ এই নৃত্যসভাটি সেই যুবকযুবতীর জন্যই আহূত তথাপি দশঘণ্টা উপবাসের পর দুইখণ্ড বিস্কুট খাইয়া তিনকালউত্তীর্ণ প্রাচীন রমণীদের সঙ্গে নৃত্য করিলাম।

এইখানেই দুঃখের অবধি হইল না। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রুবি আজ তুমি রাত্রিযাপন করিবে কোথায়? এ প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি হতবুদ্ধি হইয়া যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, তিনি কহিলেন, রাত্রি দ্বিপ্রহরে এখানকার সরাই বন্ধ হইয়া যায় অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এখনি তোমার সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য। সৌজন্যের একেবারে অভাব ছিল না—সরাই আমাকে নিজে খুঁজিয়া লইতে হয় নাই। লণ্ঠন ধরিয়া একজন ভৃত্য আমাকে সরাইয়ে পৌঁছাইয়া দিল।

মনে করিলাম, হয়ত শাপে বর হইল—হয়ত এখানে আহারের ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম আমিষ হউক, নিরামিষ হউক, তাজা হউক, বাসি হউক কিছু খাইতে পাইব কি? তাহারা কহিল মদ্য যত চাও পাইবে খাদ্য নয়। তখন ভাবিলাম নিদ্রাদেবীর হৃদয় কোমল তিনি আহার না দিন বিস্মৃতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার জগৎজোড়া অঙ্কেও তিনি সে রাত্রে আমাকে স্থান দিলেন না। বেলেপাথরের মেজেওয়ালা ঘর ঠাণ্ডা কন্‌কন্ করিতেছে; একটি পুরাতন খাট ও একটি জীর্ণ মুখধুইবার টেবিল ঘরের আসবাব।

সকাল বেলায় গৃহস্বামিনী প্রাতরাশ খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজি দস্তুরে যাহাকে ঠাণ্ডা খানা বলে তাহারই আয়োজন। অর্থাৎ গতরাত্রির ভোজের অবশেষ আজ ঠাণ্ডা অবস্থায় খাওয়া গেল। ইহারই অতি যৎসামান্য কিছু অংশ যদি উষ্ণ বা কবোষ্ণ আকারে কাল পাওয়া যাইত তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারো কোনো গুরুতর ক্ষতি হইত না—অথচ আমার নৃত্যটা ডাঙায়-তোলা কইমাছের নৃত্যের মত শোকাবহ হইতে পারিত না।

আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, যাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি তিনি অসুস্থ শয্যাগত। তাঁহার শয়নগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে গাহিতে হইবে। সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। রুদ্ধদ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গৃহিণী কহিলেন, ঐ ঘরে তিনি আছেন। আমি সেই অদৃশ্য রহস্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগ রাগিণীতে গাহিলাম, তাহার পর রোগিণীর অবস্থা কি হইল সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পাই নাই।

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া দুই তিন দিন বিছানায় পড়িয়া নিরঙ্কুশ ভালমানুষীর প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ডাক্তারের মেয়েরা কহিলেন, দোহাই তোমার, এই নিমন্ত্রণব্যাপারকে আমাদের দেশের আতিথ্যের নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিয়ো না। এ তোমাদের ভারতবর্ষের নিমকের গুণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সর্দ্দার সার চিনুভাই মাধবলাল, নাইট, সি, আই, ই

উপরে যাঁহার নাম প্রদত্ত হইল তিনি একজন কর্ম্মবীর এবং বিদ্যানুরাগী পুরুষ। এমন পরোপকারী ব্যক্তিও অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

সার চিনুভাই মাধবলাল আহম্মদাবাদে জনৈক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির গৃহে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহের নাম স্বর্গীয় রানছোড়লাল ছোটলাল, সি, আই, ই। গুজরাতে তুলার ব্যবসায়ে তিনিই অগ্রণী ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম আহম্মদাবাদে সূতার কল স্থাপন করেন। চিনুভাইয়ের জন্মবর্ষে উহা স্থাপিত হয়। কি শুভলগ্নে এই কল স্থাপিত হইল! দেখিতে দেখিতে তদ্রূপ পঞ্চাশটি কল স্থাপিত হইয়া গেল। রানছোড়লাল এবং তাঁহার পুত্র মাধবলাল আহম্মদাবাদ নগরের উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। উক্ত নগরের উন্নতিকল্পে

সর্দ্দার সার চিনুভাই মাধবলাল, নাইট, সি-আই-ই।

অপর কেহই এমন যত্ন করেন নাই। অধুনা আহম্মদাবাদ বাণিজ্যের জন্য ভারতের বিখ্যাত নগরী মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। মহানুভব রানছোড়লাল ও মাধবলালের মৃত্যুর পর তাঁহাদের বংশোজ্জলকারী স্বল্পবয়স্ক চিনুভাই পূর্ব্বানুবর্ত্তিগণের পদানুসরণ করিয়াছিলেন।

চিনুভাই সমৃদ্ধিশালী বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার বিদ্যার্জ্জনের কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। ধনীগৃহে সাধারণতঃ বীণাপাণির সমাদর ঘটে না। কিন্তু চিনুভাই বিদ্যাশিক্ষায় অবহেলা করেন নাই। তিনি আহম্মদাবাদ (উচ্চ) ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় (Matriculation) উত্তীর্ণ হন। অবশেষে দুই বৎসর আর্ট কলেজে (Arts College) অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার পিতামহের কর্ত্তৃত্বাধীনে 'আহম্মদাবাদ সূতা প্রস্তুত এবং বয়ন কলে' বাণিজ্য সংক্রান্ত শিক্ষা পাইতে থাকেন। এই স্থানে তিনি ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি-বিধায়ক বহু শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে তিনি একজন কর্ম্মবীর হইয়া উঠেন। এবং ইহা হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সূত্রপাত হয়।

সার চিনুভাইয়ের পিতামহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখনও তিনি স্বল্পবয়স্ক। এই সঙ্কট সময়ে আহম্মদাবাদে বাণিজ্যাদির ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। সুতরাং তাঁহাকে সংসারে দণ্ডায়মান হইতে হইলে বিষম প্রতিযোগিতায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে হইবে, সে কথা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি শৈশব হইতেই বৈষয়িকবিদ্যা শিক্ষা দ্বারা নিপুণতা লাভ করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রতিযোগিতা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ফলে তিনি তাহাতে শীঘ্রই সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিলেন। তাঁহাকে সেই সময় হইতে কলের কর্ত্তা, বণিক এবং মিউনীসিপাল সভার সভ্য এই তিন কার্য্যে কালক্ষেপ করিতে হইত। তিনি এই তিনটি বিষয়েই নিপুণতার সহিত কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। লোকসমাজে তাঁহার প্রতিপত্তিও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

আহম্মদাবাদে তাঁহার পিতামহ সর্ব্বপ্রথম সূতার কল (Cotton Mills) প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম মিশরদেশীয় তুলা আনাইয়া ১০০ নম্বরের সূতা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। এই সূতা সূক্ষ্ম এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এক্ষণে সার চিনুভাইয়ের অধীনে সুচারুরূপে দুইটি কল চলিতেছে। সুবন্দোবস্ত এবং সুন্দর নিয়মাদির দ্বারা চালিত কল ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। এই কলে এক লক্ষ চরকার কল ও দুই হাজার তাঁতের কল আছে। দুইটি কলে পাঁচ হাজার মজুর খাটিয়া থাকে।

তাঁহার পিতার নামে আহম্মদাবাদে একটি Science Institute বা বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করেন। তিনি উক্ত বিদ্যামন্দিরে ছ' লক্ষ টাকা দান করেন। ইহাই সার চিনুভাইয়ের সর্ব্বোচ্চ দান। উক্ত দানের জন্য তাঁহাকে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত প্রশংসা করেন। তিনি রানছোড়লাল ছোটলাল শিল্পবিদ্যালয়ের (Runchodlal

Chhotalal Technical Institute) জন্য তিন লক্ষ টাকা দান করিয়া তদীয় পিতামহের 'শিল্পব্যবসায়ীর অগ্রণী' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল তাঁহার দেশে এবং আহম্মদাবাদ নগরে দান করিয়াছেন তাহা নহে। সার চিনুভাইয়ের দান সুদূর হরিদ্বার, বারাণসী এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইয়াছে। স্কুল এবং কলেজাদিতে নিয়মিত বৃত্তি এবং দান দ্বারা বহু বিদ্যালয় তিনি পোষণ করিতেছেন। তাঁহার পিতামহের নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় (High School) স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে তিনি পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তারের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। রেবাবাই জুবিলী হাঁসপাতালের সরঞ্জাম এবং ব্যয়াদি নির্ব্বাহার্থ দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

সার চিনুভাই বিগত পাঁচ বৎসর ধরিয়া আহম্মদাবাদ কলওয়ালাগণের সমিতির নেতৃত্ব (Chairman of the Ahmedabad Millowners' Association) করিয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অসংখ্য কার্য্যে এবং যৌথকারবারে (Joint Stock Concerns) সংশ্লিষ্ট আছেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আহম্মদাবাদ মিউনীসিপালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যমশীলতা এবং পরোপকারিতায় তদ্দেশবাসিগণ সবিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

চিনুভাইয়ের লোকহিতৈষণার জন্য ভারত রাজ-সরকার ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্মানসূচক প্রথমশ্রেণীর সর্দ্দার পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি দেশের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর এবং শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য প্রযত্নশীল বলিয়া গভর্ণমেণ্ট ভারতেশ্বরের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহাকে নাইট (Knight) উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

অর্থ অনেকেরই আছে এবং বহু লোকে বিপুল অর্থ উপার্জ্জনও করিতেছে। কিন্তু ক'জন লোকে সেই অর্থের সৎব্যয় করিয়া থাকে। সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয়িত হউক এমন ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকেই সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করেন না। মহানুভব সার চিনুভাই একাধারে ধনী, শিক্ষিত, পরোপকারী এবং বিদ্যোৎসাহী পুরুষ। তাঁহার দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ধনীরই অনুকরণীয়। তিনি বলবান এবং চরিত্রবান ব্যক্তি।

শ্রীগণপতি রায়।

চীনব্রহ্মসীমান্তের অসভ্য জাতি

২। কাচিন জাতির কথা।

মৎপ্রণীত "চীনদেশে সন্তান-চুরি" নামক গ্রন্থে কাচিন জাতির বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছিলাম কিন্তু এস্থলে সেই জাতির বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ করিব।

ব্রহ্মদেশের সীমান্ত প্রদেশস্থ ভামো সহরের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দিকের পর্ব্বতেই, কাথা ও মিচিনা জেলায় এবং টাপেইং নদীর উত্তর ও উত্তর পূর্ব্বস্থ চীন-সীমান্তে অবস্থিত শৈলশ্রেণীতে এই দুর্দ্ধর্ষ অসভ্য কাচিন জাতির বাস। অনেক পর্য্যটক মনে করেন যে নাগা ও মিশমী জাতীয় লোকদিগের সঙ্গে এই জাতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয় এবং ইহারা তাহাদের জ্ঞাতি। শুনা যায় টাপেইং নদীর উত্তর-পূর্ব্বে প্রায় এক মাসের পথ লইয়া ইহাদের বসতি। এই জাতির অনেক শাখা প্রশাখা আছে। তাহাদের মধ্যে চিন-প, কাকু, লেনা ও কাউলি প্রভৃতির কথাই উল্লেখযোগ্য।

কাচিন জাতির মধ্যে স্বায়ত্বশাসন প্রচলিত আছে। এই স্বায়ত্বশাসনকে self-government within the empire বলা যাইতে পারে। ইহারা বংশানুক্রমিক সুভা দ্বারা শাসিত হয়। প্রত্যেক সুভার একজন করিয়া সহকারী আছে। তাহাকে পমাইন্ বলে। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে যত বিবাদ বিসম্বাদ সমস্তই এই সুভাগণ বা মোড়লগণ বিচার করিয়া মীমাংসা করিয়া থাকে। সুভার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার পিতৃপদের অধিকারী। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাব হইলে অন্য পুত্রদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ সেই সে পদ পায়। কোন সুভার পুত্রাভাব হইলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুভার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাচিন জাতির অনেক শাখার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রই পিতার সম্পত্তির অধিকারী। জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করে।

কাচিন রমণী—ভামো।

কোন ভ্রমণকারী এবং সওদাগর ভ্রমণকালে যে জাতির এলাকায় উপস্থিত হয় সেই জাতির সুভা তাহাদের জন্য দায়ী। এবং সেই সুভা একজন করিয়া পথদর্শক বা গাইড্ তাহাদের সঙ্গে দিয়া অন্য সুভার এলাকায় পৌঁছাইয়া দিলে তাহার দায়িত্ব যায়। পূর্ব্বে প্রত্যেক খচ্চরের জন্য চারি আনা মাশুল ইহারা আপন আপন এলাকায় আদায় করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরেজ অধিকৃত স্থানে এবং চীন-ব্রহ্মের সওদাগরী রাস্তায় সে নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে।

কাচিনগণ চীন সাম্রাজ্যের অধীনই থাকুক বা ব্রহ্মরাজ্যের অধীনই হউক তাহাদের অধীনতা এতদিন নাম মাত্র ছিল। কোন গবর্ণমেণ্টই ইহাদের সুশাসনে রাখিতে পারেন নাই। সুযোগ পাইলেই ইহারা পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুটপাট করিত এবং সময় সময় নরহত্যাও করিত। সময়ে সময়ে ইহারা সমতল প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া গ্রাম লুণ্ঠন করিত ও গৃহাদি অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত করিয়া দিত। কোন গবর্ণমেণ্টকেই ইহারা নিয়মমত কর দিত না। বর্ম্মা ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার অল্প পূর্ব্বে কাচিনগণ ভামোসহর লুট করিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তাগণকে বাঁধিয়া লইয়া সহরে আগুন জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের রাজা মিন্ডনমিন্ এই কাচিন সুভাদিগকে বশ করিবার জন্য পন্‌সী ও পন্‌লিনের সুভাদিগকে "পাপাদা রাজা"(Papada Raja) উপাধি দিয়া স্বর্ণছত্র উপহার দিয়াছিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকেও ইহারা প্রথমত নিয়মমত কর দিত না। সময় সময় রসদবিভাগের সেপাইদিগকে আক্রমণ করিত। ইহাদিগকে বশে আনিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক কৌশল করিয়াছেন। প্রতি বৎসর শীতকালে এইসকল সীমান্ত জেলা হইতে এক একজন পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে এক শত পাঞ্জাবী সেপাই ও ডাক্তার গিয়া এক এক কাচিন পাহাড়ে ডেরা ফেলিয়া চারি পাঁচ মাস তথায় অবস্থিতি করিয়া বল ও কৌশল দ্বারা কর আদায় করিত। অবাধ্যদিগকে ধরিয়া আনিয়া জেলে পুরিত। প্রতি বৎসর এই প্রকার কঠোর শাসন করায় ইহারা এখন শান্ত হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের অতি প্রিয় হইয়াছে। তামোজেলার কাচিনগণ দ্বারা মিলিটারি পুলিশের কএকটা দল গঠন করা হইয়াছে। সেপাইয়ের উর্দ্দি পরিধান করিলে ইহাদিগকে গুর্খা সেপাইর মত দেখায়। ইংরেজ অধিকারে কাচিন পর্ব্বতে ভ্রমণ এখন নিরাপদ হইয়াছে এবং সেই দেখাদেখি চীন গবর্ণমেণ্টেরও ইহাদের উপর শাসন অনেক কড়া হইয়াছে।

সম্প্রতি চীন রাজ্যের অধীন শান সুভার এলাকার নিকট একটী বাজারে কাচিনগণ ব্রহ্মদেশী লবণ বিক্রয় করিতেছিল। এই বিদেশী লবণ চীনে বিক্রয় করা আইনবিরুদ্ধ। চীনাপুলিশ এই লবণ বিক্রয়ে বাধা দেওয়ায় কাচিন ও পুলিশে বিবাদ হয়; পুলিশ বন্দুক দ্বারা কএকজন কাচিনকে আহত করে; তাহাতে বাজারের সমস্ত কাচিন পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশের পক্ষে মাত্র একজন কর্ম্মচারি ও আটজন কনষ্টবল ছিল।. সকলকেই কাচিনগণ হত্যা করে এবং পুলিশকর্ম্মচারির মাথা ও হৃৎপিণ্ড কাচিনেরা লইয়া যায়। এই সংবাদ পাইয়া এখানকার জেনারাল ও মেজিষ্ট্রেটগণ সহস্রাধিক সৈন্য লইয়া কাচিনদিগের গ্রামগুলি আক্রমণ করেন। কাচিনেরা বিষাক্ত

কাচিন পুরুষ - অশাসিত থাকুপ্রদেশ।

তীর দ্বারা ও বারুদভরা বন্দুক দ্বারা অনেক চীন সৈন্য হত ও আহত করে। বহু গ্রামের লোক একত্র সমবেত হইয়া যুদ্ধ করে। কিন্তু অবশেষে কার্ত্তুজ বন্দুকের গুলির নিকট পরাস্ত হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করে। চীন সৈন্যগণ গ্রামগুলি জ্বালাইয়া দেয়। পরে সন্ধির প্রস্তাব হওয়ায় কাচিনদিগের প্রধান সর্দ্দারগণকে অর্থ সমর্পণ করিতে হয়। তাহারা টেঙ্গিয়ে আনীত হইয়া বিচারে তাহাদের শিরশ্ছেদের হুকুম হইয়াছে। কিন্তু শেষ মীমাংসা ইউনানফুর গবর্ণর জেনেরালের আদেশাধীন আছে।

প্রত্যেক সুভার একাধিক দাসদাসী থাকে। এই-সকল দাসদাসীর অধিকাংশই বাল্যকালে অপহৃত। সময় সময় বয়স্কদিগকেও ইহারা বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করে। এই সম্বন্ধে একটী কৌতুকপ্রদ ঘটনার বিষয় ডাক্তার এণ্ডারসন তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ভাবার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ১৮৬৮ খৃঃ ডাক্তার এণ্ডারসন কর্ণেল স্পাডেনের সঙ্গে, ব্রহ্মদেশ হইতে মোমিনে (Teng-yueh) বাণিজ্যাভি-যান কালে ভামো সহরে কিছুদিন অবস্থান করেন। সেই সময়ে তাঁহাদের দোভাষী সহরের বাহিরে এক কাচিন আড্ডায় কাচিন-বেশধারী একজন ভারতবাসীকে দেখিতে পায়। এবং সেই ব্যক্তি উক্ত দোভাষীকে বলিয়াছিল যে, সে "কালা" বা বিদেশী, এবং সাহেব-দিগের আগমনের বার্ত্তা শুনিয়া সে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাসনা প্রকাশ করে। সাহেবদিগের নিকট উপস্থিত হইলে সে হিন্দী, বর্ম্মা ও কাচিন ভাষায় এক খিচুড়ি করিয়া তাঁহাদিগকে কহিল যে "আমি ভারতবাসী, আমার বাড়ী মেদিনীপুর জেলায়। আমরা দশজন লোকে বাণিজ্য ব্যবসায় করিবার জন্য ব্রহ্মদেশে আসিয়াছিলাম। টংগু সহরে কিছুদিন থাকিয়া পরে মাণ্ডালে হইয়া আমরা ভামো পৌছি। একদিন আমি ও আমার এক সঙ্গী ডেরায় থাকিয়া রন্ধনাদি করিতেছিলাম, এবং আমাদের অপর সঙ্গিগণ জঙ্গলে কাষ্ঠ আহরণ করিতে গিয়াছিল। ইতিমধ্যে একদল কাচিন হঠাৎ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া গেল। আমি বন্দী হইয়া চলিলাম। আমার সঙ্গীর কি দশা হইল জানি না। আমাকে কাচিনেরা এক কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধিল। পা কাঠের সঙ্গে বাঁধিয়া স্কন্ধদেশের সঙ্গে দড়ি কসিয়া বাঁধিয়া দুই মাস যাবত কয়েদ করিয়া রাখে। পরে যখন আমি অঙ্গীকার করি যে পলাইব না এবং তাহাদের দাস হইয়া থাকিব, তখন আমার বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়। ইহার কিছুদিন পরে সেই গ্রামখানি অপর এক শত্রুপক্ষীয় কাচিনদল লুট করায়, আমি ও আমার মালিক এক জঙ্গলে লুকাইয়া থকিয়া, পরে অপর এক গ্রামে উপস্থিত হইলে, আমার প্রভু আমাকে অপর এক কাচিনের নিকট একটী মহিষের বিনিময়ে বিক্রয় করে। এখানে আমার বর্ত্তমান মনিব আমার প্রতি দয়ালু ব্যবহার করে। এবং তিন বৎসর পর আমাকে এক কাচিন রমণীর সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিল। আমার নাম দীন মহম্মদ। আমি দশ বৎসর যাবত এই কাচিনগণের দাস হইয়াছি এবং মাতৃভাষা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি।" দীন মহম্মদ সাহেবদিগের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা

করায় সাহেবগণ তাহাকে অভিযানের রক্ষক সেপাইগণের নিকট পাঠান। তাহারা তাহাকে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করাইয়া স্নান করাইয়া পরিষ্কার করিয়া সাহেবদিগের ঘোড়ার সহিসী কার্য্যে নিযুক্ত করে। সে দোভাষীর কার্য্যও করিত। তাহার কাচিন মনিব পরে সাহেবদিগের নিকট ক্ষতিপূরণের প্রার্থনা করিয়াছিল।

প্রতি কাচিন গৃহস্থ সুভাকে বৎসরে এক টুকরি চাউল কর স্বরূপ দিয়া থাকে। যখন গ্রামে কোন মহিষাদি বলি দেওয়া হয়, সুভা তাহার সিকি অংশ পায়। তাহা ভিন্ন খচ্চর রাখিয়া তাহার ভাড়া পায়। এবং পূর্ব্বে ভ্রমণকারিগণের নিকট হইতে কর আদায় করিত। ডাক্তার এণ্ডারসন কাচিনজাতির সহিত স্কটলণ্ডের হাইল্যাণ্ডারদিগের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে—

"Save in this respect it was impossible to help being reminded of Scottish Highland clans of the olden time, many were the points of resemblance that occured in the customs and indeed characters of these mountaineers, though to avert all possible indignation, I have hastened to add that no parallel is intended to be drawn, specially as regards their morals or social life."

গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী।

পর্ব্বতের উপর যথায় জলস্রোত বর্ত্তমান থাকে এমন একটী স্থান তাহারা গৃহনির্ম্মাণের জন্য মনোনীত করিয়া প্রায় একমাইল ব্যাপিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া একটী গ্রামের পত্তন করে। এক এক গ্রামে সাত আট ঘর লোকের বেশী সচরাচর দেখা যায় না। গৃহগুলি স্থান-বিশেষে ৩০।৪০ হাত হইতে ৫০।৬০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা এবং প্রস্থে ১২ হাত হইতে ২০।২৫ হাত হইয়া থাকে। গৃহ-গুলি দৈর্ঘ্য প্রস্থের হিসাবে অনুচ্চ। ঘরের মটকা প্রায় ১০।১২ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। বাঁশের বেড়া ও বাঁশের মাচার মেজে এবং ছাউনি খড়ের। এই গৃহগুলি দেখিতে কেল্লার বারাকের আকৃতি। ইহার পার্শ্বে কোন দরজা নাই, আলম্ব ভাবে দুই প্রান্তে দুইটী দরজা। সম্মুখের দরজা অতিথি অভ্যাগতগণের বসিবার স্থান এবং পশ্চাতের দরজা স্ত্রীলোকদিগের জন্য। গৃহখানি নয় কক্ষে বিভক্ত; তাহার মধ্যে কয়েকটী আত্মীয় পরিবার বাস করিতে পারে। সদর দরজার সম্মুখে বারাণ্ডার মত স্থানে সকলে বসিয়া সুরাপান ইত্যাদি করে। এবং তাহাতে শূকরের মাথা, মহিষের মাথা, হরিণের মাথা প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখিয়া তাহার শোভা বৃদ্ধি করা হয়। ঘরের নিম্নে শূকর প্রভৃতি রাখিয়া থাকে।

কৃষিকার্য্য।

কাচিনগণ পাহাড়ের গায়ের ছোট বড় গাছ কাটিয়া কোদালির সাহায্যে জমি আবাদ করিয়া শস্য বপন করে। ক্ষেত্র কর্ষণে লাঙ্গল ব্যবহার করে। পর্ব্বতের ঢালু গাত্রে কোদালি দ্বারা থাকে থাকে কাটিয়া নিম্নাভিমুখে ক্ষেত্রসকল এমন ভাবে প্রস্তুত করে যে, তাহা দেখিতে থিয়েটারের গ্যালারির মত হয় এবং প্রয়োজন হইলে নালার জল ফিরাইয়া আনিয়া সেই ক্ষেত্রে চালিত করিলে, জল উপরের থাক পূর্ণ করিয়া ক্রমে নিম্নের থাকে পতিত হইয়া ভূমি সিক্ত করিয়া চাষের উপযুক্ত করে। চীনারাও এই প্রণালীতে পর্ব্বতগাত্রে ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া থাকে। কাচিনগণ ধান, ভুট্টা, আফিং, তামাক ও তুলার চাষ করে। আফিং চাষ আসাম হইতে না চীন দেশ হইতে কাচিন পাহাড়ে আমদানি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কাচিন পাহাড়ে নানা ফল পাওয়া যায় যথা—পেয়ারা, কলা, ডালিম, পিচ্, আনারস ও জাম প্রভৃতি। কৃষি কার্য্যে ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকগণই অধিক কার্য্য করে।

কাচিনগণের আকৃতি ও প্রকৃতি।

এই জাতীয় লোকের বিভিন্ন শাখাবিশেষে পরস্পরের আকৃতির কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়। চিন-প জাতীয় কাচিনগণের খর্ব্বাকৃতি, গোল বদন, অনুন্নত কপোলদেশ, এবং অত্যন্ত উন্নত গণ্ডদেশ। নাসিকা প্রশস্ত এবং তির্য্যক চক্ষুদ্বয়। বর্দ্ধিত ওষ্ঠদ্বয় এবং বর্গক্ষেত্রাকৃতি থুতি। চুল ও চক্ষুর বর্ণ কৃষ্ণ। ইহারা উচ্চে ৫ ফুট হইতে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। শরীর সুগঠিত, পদদ্বয় শরীরের অনুসারে খর্ব্ব। ব্রহ্ম-দেশের অন্তর্গত কারেন (Karen) জাতির সহিত এই জাতির আকৃতি প্রকৃতি ও ভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কাচিনেরা দ্রুতগামী। ইহাদের শরীরের বর্ণ মলিন

কাচিন রমণীর মোটবহা ঝুড়ি—ভামো জেলা।

আজকালকার কাচিনগণের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আসিতেছে।

পরিচ্ছদ।

কাচিন পুরুষগণ মাথায় লাল বা শ্বেতবর্ণের কাপড়ের পাগড়ী বাঁধে, গায়ে নীলবর্ণের কোট দেয়, পাজামা পরে এবং পায়ে পটি বাঁধে। কানের নতিতে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে বড় বড় মোটা চুরুট, বা বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া গুঁজিয়া রাখে। গোঁপ দাড়ি ইহাদের প্রায়ই নাই। বালক বৃদ্ধ সকলের সঙ্গে একখানি জাতীয় দা বা তরবারি। তাহা অর্দ্ধমুক্ত কাঠের খাপে বেতের বৃত্তদ্বারা সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ স্কন্ধে ঝুলাইয়া দেয় এবং বাম স্কন্ধে একটী সূচীকার্য্যযুক্ত নীল ও লাল রং বিশিষ্ট থলি ঝুলাইয়া রাখে। সেই থলি বা ঝোলার মধ্যে সুরাপানের বাঁশের চুঙ্গি, আফিং সেবনের সরঞ্জাম, পানের ডিবা ও পয়সা কড়ি ইত্যাদি রাখিয়া থাকে। হাঁটুর নিম্নে পায়ের গোছায় কৃষ্ণবর্ণের বেতের বৃত্তসকল পরিধান করে। সর্ব্বদা পান চিবাইয়া মুখ লাল করিয়া রাখে। যেমন ইহাদের স্কন্ধে তরবারি তেমনি হাতে একগাছি বল্লম প্রায় সকলেরই থাকে। পুরুষের মাথায়ও দীর্ঘ কেশ। তাহা পাকাইয়া চূড়ার মত করিয়া মাথার মধ্যস্থলে রাখে। চীনদেশী কাচিনগণের অনেকে চীনাদিগের অনুকরণে মাথায় বেণী রাখে। অত্যন্ত গরিব কাচিনগণ সহরে যাইবার কালে পৃষ্ঠে একটী ঝুড়ি ঝুলাইয়া তাহার মধ্যে নানা দ্রব্য, এমন কি ভাতের হাঁড়িটী পর্য্যন্ত, লইয়া যায়। সেই ঝুড়িগুলি আমাদিগের দেশের মাছধরা পোলোর মত। ঐ ঝুড়ির প্রশস্ত প্রান্তে অর্দ্ধবৃত্তাকার ছিদ্রযুক্ত কাষ্ঠফলক দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহা কপালদেশে সংলগ্ন করিয়া ঝুড়িটী পৃষ্ঠের উপর ঝুলাইয়া অবনতভাবে সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া চলিতে থাকে। যাহারা ভুটিয়া প্রভৃতি পাহাড়ীগণের ভারবহনের

কটাশে। রমণীগণের বর্ণ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। অতি ভারি বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া কাচিন রমণীগণ পর্ব্বতগাত্রে অনায়াসে উঠা নামা করে। কাচিনগণ অতি দুরন্তপ্রকৃতির লোক। চুরি ডাকাইতি ও নরহত্যা ইহাদের নিত্যকার্য্য ছিল। ইহারা শিকারে বেশ পটু, ধনুর্ব্বাণ চালাইতে সিদ্ধহস্ত। ইহারা সমরপ্রিয় হইলেও চোরাযুদ্ধ বেশী ভালবাসে। গড়পড়তায় কাচিনেরা নির্ব্বোধ নহে, তাহাদের বেশ বুদ্ধি আছে। ভামোয় দুই জন বাঙ্গালী ওভারসীয়ার একদিন কথাপ্রসঙ্গে কোন্ জাতীয় কুলি কি প্রকার কার্য্য করে তাহার আলোচনাকালে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা সরকারী কার্য্যে রাস্তাদি প্রস্তুত করিতে নানা জাতীয় কুলি খাটাইয়া থাকেন, তাহার মাঝে হিন্দুস্থানী কুলিগুলি বড় নির্ব্বোধ, কোন একটা বিষয় কএকবার দেখাইলেও বুঝিতে পারে না, কিন্তু কাচিনগুলি খুব ভাল, তাহাদের কোন বিষয় একবার দেখাইলেই সে কার্য্য তাহারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। কাচিনগণ কথায় কথায় উত্তেজিত হইলেই অমনি দা উত্তোলন করিয়া আঘাত করিতে উদ্যত হয়। ইহারা বড় ময়লা-স্বভাব। জন্মে কখনও স্নান করে না, মাথায় তেল দেয় না বা মাথা আঁচড়ায় না। স্ত্রীলোকগণের মাথার লম্বা চুল জটা বাঁধিয়া যায়। পা দুখানি ময়লাতে ফাটিয়া যায়। তবে

কাচিন রমণীর পরিচ্ছদ।

অবস্থাপন্ন লোকে বন্দুকের নলের মত মোটা এবং ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ রূপার চুঙ্গি পূরিয়া রাখিয়া সেই চুঙ্গির অগ্রভাগে লাল বনাতের ঝালর ঝুলায়। গরিব স্ত্রীলোকগণ লাল কাপড়ের পলিতা, বৃক্ষের ডাল বা ফুল গুঁজিয়া রাখে। গলায় পুঁতির মালা এবং অবস্থাপন্ন লোকে রূপার হাঁসুলি পরে। ইহা ভিন্ন কাচিন রমণীগণের আর এক অলঙ্কার আছে, তাহা এক কি দুই ডজন বড় বড় বেতের বৃত্ত, কোমরে ধারণ করে। ঐ বৃত্তসকল এত ঢিলা যে পথে চলিতে হইলে এক হাত দ্বারা তাহা না ধরিলে চলিতে পারে না। পথে চলিতে প্রায় সকলেই পৃষ্ঠে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ঝুড়ি ঝুলাইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া চলে এবং অনেকে পথে চলিতে চলিতে টাকু দ্বারা দুই হাতে সূতা পাকাইতে পাকাইতে চলে। উপরে যে কাচিন পোষাকের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল, তাহা ব্রহ্মদেশের কাচিনগণের মধ্যে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যাহারা মিলিটারি পুলিসের সেপাই তাহারা বুট ও কোট পেণ্টালুন ধরিয়াছে। এবং অনেকে সাদা কাপড়ের ইজার, কোট ও পাগড়ি ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। রমণীগণ যাহারা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে তাহারা বর্ম্মিণীগণের মত লুঙ্গি, জামা ও পোয়া বা রুমাল ব্যবহার ধরিয়াছে। আমেরিকার মিশনরি পাদ্রিগণ কাচিনগণের মধ্যে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন। পরিচ্ছদে আমরা কাচিন বা সান হইতে উন্নত নহি। কাচিনদিগের মাথায় পাগড়ী, গায় কোট, পরণে পায়জামা এবং পায়ে পট্টি। আর আমাদিগের পল্লীগ্রামের কৃষকদিগের এক ধুতি আর এক গামছা! ইহাদের কাহারও দেওয়ান দরবারে যাইতে হইলে বড় জোর এক চাদর। পল্লীগ্রামের গরিব ভদ্র-লোকের পোষাক কি? নগ্ন শির, নগ্ন দেহ, নগ্ন পদ, পরণে

ঝুড়ি দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

কাচিন রমণীগণের মাথায় নীল বর্ণের কাপড়ের প্রায় এক কি দেড় ফুট উচ্চ পাগড়ী। গায়ে নীল বর্ণের মোটা কাপড়ের কোট। সেই কোটের সম্মুখে, পশ্চাতে এবং আস্তিনে লাল বনাতের টুকরা কড়ি ও রূপার ঠোস্ প্রভৃতি সূচী দ্বারা গাঁথিয়া রাখিয়া তাহার শোভা বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। পরিধানে প্রায় চারিহস্ত পরি-মাণ লম্বা এবং দেড় হস্ত পরিমাণ পরিসর বিশিষ্ট একখণ্ড বস্ত্র। তাহা লাল ও নীল বর্ণের মোটা সতরঞ্চের মত। তাহার বুননে অতি কৌশল প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং সূচীর কার্য্য দ্বারা তাহার মূল্য ও সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই বস্ত্রখানি তাহাদের হাঁটুর নিম্নে পড়ে না। কারণ পা পর্য্যন্ত পড়িলে পাহাড়ে জঙ্গলে চলিতে কষ্ট হয়। ইহারাও পুরুষের মত পায়ে পট্টি বাঁধে এবং হাঁটুর নিম্নে পায়ের গোছায় বেতের বৃত্তসকল পরে। শান পুরুষরমণীগণও এই বৃত্তসকল পায়ের গোছায় পরিয়া থাকে। বোধহয় কোন অপদেবতার কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই বা ইহারা এই অলঙ্কার ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকগণেরও কানের নতিতে বৃহৎ ছিদ্র, তাহার মধ্যে

এক ধুতি এবং কোমরে এক চাদর বাঁধা। অল্প লোকের গায়েই জামা দেখা যায়। জুতার ব্যবহারও পল্লীগ্রামে তথৈবচ। স্ত্রীলোকের পোষাকও সেই প্রকার, এক ধুতি বা সাড়ি—পরণে, গায়ে এবং মাথায়! তবে সহরের কথা স্বতন্ত্র। আমরা যে হ্যাট, প্যাণ্ট ও জুতা পরি এবং ইংলিশকোট গায়ে দেই, সে কি আমাদের জাতীয় সভ্যতার ফল, না, বিলাতী অনুকরণে? কাচিনগণও ক্রমে আমাদের মত সাহেবী পোষাকে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে।

স্ত্রীলোকের অবস্থা ও কর্ত্তব্য।

কাচিন স্ত্রীলোকের অবস্থা পুরুষ অপেক্ষা হীন। পুরুষগণ তাহাদিগকে পশুর মত ব্যবহার করে। যত কঠিন কার্য্য ইহাদিগকে করিতে হয়। ক্ষেত্রে কার্য্য, বস্ত্রবয়ন, কাষ্ঠ আহরণ, জল আনয়ন, পশু রক্ষণ, গৃহনির্ম্মাণ, চাউল প্রস্তুত প্রভৃতি সমস্তই ইহাদিগকে করিতে হয়। বর্ম্মা বা ইউরোপীয়গণের মত ইহাদের স্ত্রীপুরুষে একত্র আহারের নিয়ম নাই। কাচিন স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে আমাদিগের স্ত্রীলোকের অবস্থার বিষয় তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে উভয়েরই অবস্থা সমান বলিতে হয়। উভয়কেই কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। স্ত্রীনির্য্যাতন উভয়ের মধ্যেই আছে। তবে পৃষ্ঠে ঝুড়িবহন বা ক্ষেত্রকার্য্য আমাদিগের দেশী স্ত্রীলোককে প্রায় করিতে হয় না বটে, কিন্তু তেমনি আমাদিগের স্ত্রীলোকগণ গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং কাচিন স্ত্রীলোকগণ সে দায় হইতে মুক্ত। তাহারা প্রাণ ভরিয়া খোলা হাওয়া সেবন করিয়া স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভোগ করে, তাহাদের দেহ সবল ও মন আনন্দপূর্ণ হয়।

কাচিন রমণীগণ "সেরু" নামক এক সুরা প্রস্তুত করে। একপ্রকার উদ্ভিজ্জকে মূলসহ শুষ্ক করিয়া আদা, লঙ্কা ও চাউল সহ চূর্ণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া পিষ্টকাকার করিয়া ছেঁড়া মাদুর দ্বারা জড়াইয়া রাখে। পরে কলার সঙ্গে চাউলের গুঁড়া মাখিয়া একবেলা রাখিয়া দেয়। তাহার পর ইহাকে জলে পাক করে এবং ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ঔষধযুক্ত পিষ্টক ছাড়িয়া দেয়। ইহা ঠাণ্ডা হইলে একটী কলসীর মধ্যে একসপ্তাহকাল পাতা দ্বারা ঢাকিয়া রাখে। উহাতে গাঁজলা উঠিলে (Fermentation) একটী মেটে জালার মধ্যে উহা রক্ষিত হয়। বিশ দিন যাবৎ এই প্রকার রাখিলে উহা পানের উপযোগী হয়। এবং ইহা যত পুরাতন হয় ততই সুস্বাদু ও প্রীতিকর পানীয় হয়। ইহা নাকি ইংরেজী বিয়ার অপেক্ষা সুস্বাদু ও বলকারক। দারজিলিংএর লেপচাগণ, ব্রহ্মদেশের কারেনগণ, এবং নাগাগণও নাকি এই প্রণালীতে সুরা প্রস্তুত করে। নাগাদিগের "মোড্" এবং কামডি ও সিংপোদিগের "সাহু" নামক সুরার সঙ্গে ইহার বেশ তুলনা করা যায়।

কাচিন রমণীগণ তাঁতে উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করে। অবশ্য তাহা তাহাদেরই উপযোগী।

বিবাহ-প্রণালী।

কোন কোন স্থানের লিছুগণের বিবাহপ্রথার সঙ্গে কাচিনগণের বিবাহপ্রথার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাল্য বিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। কেবল যুবতীর সঙ্গে কোন যুবকের বিবাহ মনোনীত হইলে প্রথমতঃ কোন দৈবজ্ঞকে ভাবী স্ত্রীপুরুষের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন দৈবজ্ঞ নানা প্রকার ভঙ্গী ও প্রক্রিয়ার দ্বারা দৈববাণী প্রকাশ করিয়া যাহা যাহা বলে তাহার দ্বারা বিবাহ হইতেও পারে, রহিত হইতেও পারে। বিবাহ হইলে দৈববাণী অনুসারে ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয়। ইহার পর কন্যার পিতামাতা বিবাহে যে যৌতুক গ্রহণের প্রস্তাব করে তাহা যদি বরপক্ষ হইতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বরের বাটী হইতে দুই জন লোক কিছু উপহার সহ কন্যার বাটীতে গিয়া বিবাহের দিন ধার্য্য করে। বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে বরপক্ষ হইতে পাঁচজন যুবকযুবতী কন্যার গ্রামে বিবাহের দিন উপস্থিত হইয়া নিকটে কোন বাড়ীতে দিবাভাগে অবস্থিতি করে। সন্ধ্যা হইলে বরের গ্রাম হইতে আগত অপরিচিত একটী যুবক গোপনে কন্যার বাড়ীতে গিয়া তাহার পিতামাতার অগোচরে তাহাকে

ডাকিয়া আনে এবং বলে যে আমরা তোমাকে লইতে আসিয়াছি। কন্যা তাহাতে রাজি হইয়া তাহাদের সঙ্গে রাত্রিকালে বরের গ্রামে গিয়া পৌঁছে। পরদিন কন্যার গ্রাম হইতে একদল যুবক কন্যাকে তল্লাস করিবার ছলে বরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে যে তাহাদের একটী কন্যা গত রাত্রে অপহৃত হইয়াছে। তাহারা তাহার অনুসন্ধানে আসিয়াছে। বরের বাটীর নিকট এক চন্দ্রাতপের নিম্নে কন্যাকে লুক্কায়িত ভাবে ইতিপূর্ব্বে রাখা হয়। বরপক্ষের লোক কন্যার পক্ষের যুবকদিগকে আহ্বান করিয়া বলে যে "দেখত এই কি তোমাদের অপহৃতা কন্যা? যদি হয় তবে তোমরা ইচ্ছা করিলে ইহাকে লইয়া যাইতে পার।" তখন কন্যাপক্ষের লোকে বলে যে "হাঁ এই আমাদের কন্যা। আচ্ছা এ যেখানে আছে সেইখানেই ইহাকে থাকিতে দাও।"

ইহার পর একটী মহিষ বলি দেওয়া হয় এবং যৌতুকের দ্রব্যসকল কন্যাকর্ত্তার বাটীতে প্রেরিত হয়। অবস্থাপন্ন লোক হইলে শ্বশুর-শাশুড়ীদিগকে একটী দাসী, দশটী মহিষ, দশ গাছা বল্লম, দশ খানি দা, দশ খণ্ড রৌপ্য, একখানি কাঁশা, দুই প্রস্ত পোষাক, একটী বন্দুক ও একটী লৌহ রন্ধনপাত্র দিতে হয়। ইতিমধ্যে একটী মোরগ বলি দিয়া তাহার রক্ত চন্দ্রাতপ হইতে বরের শয়নগৃহ পর্য্যন্ত ছিটাইয়া ভুত প্রেত হইতে পথটী নিরাপদ করে। সেরু, নানা প্রকার মাংস, শুষ্ক মৎস, ডিম্ব ও ভাত প্রভৃতি দ্বারা বাস্তুপুরুষদিগকে পূজা দেয়। তৎপর ডোম্‌সা বা পুরোহিত কর্ত্তৃক চালিত হইয়া কন্যা বরের গৃহে প্রবেশ করে। তখন উভয়ে উভয়কে সুরাপান করিতে দিয়া উভয়ের প্রদত্ত সুরা উভয়ে পান করিবার পর এক ভোজনের আয়োজন করে। স্তূপাকার ভাতের চতুর্দ্দিকে বসিয়া বর কন্যা ও অপর সকলে শূকরের মাংস, মহিষের মাংস, হরিণের মাংস ও সুরা প্রভৃতি সহযোগে সেই অন্নরাশি উদরস্থ করিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করে। অনেক বিবাহে ঢোল ও সানাই বাজান হয়। অনেক বিবাহেই পানাহার অতিরিক্ত পরিমাণে করিয়া শেষে হুড়াহুড়ি মারামারি করিয়া বিবাহের শেষ হয়।

বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে গুরুতর অপরাধ। ইহাতে এমন শত্রুতা হয় যে এক পক্ষ অপর পক্ষের গ্রাম আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করে। ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার খুব কম। বিবাহিত স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের উভয়ের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলে কোন অপরাধ হয় না। স্বামী মারা গেলে বিধবা রমণী তাহার ভাসুর বা দেবরের পত্নীরূপে পরিণত হয়। কোন অবিবাহিত যুবতীর চরিত্র স্খলন হইলে যে পুরুষের সঙ্গে এই ঘটনা হয়, তাহাকে জোর করিয়া বিবাহ করিতে বাধ্য করা হয়। যদি কোন কুমারীর সন্তান হওয়ার পর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই সন্তানের পিতাকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এক ভোজ দিতে হয়, কন্যার পিতামাতাকে একটী দাসী, একটী মহিষ, একখানি দা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দিতে হয়। ইহা না দিতে পারিলে সেই ব্যক্তি নিজে দাসরূপে বিক্রীত হইতে বাধ্য হয়। এইসকল নিয়ম পূর্ব্বে খুব বাঁধাবাঁধি ছিল কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে।

জন্মমৃত্যু।

কোন সন্তান হইলে বাস্তুপুরুষ বা গৃহদেবতাদিগকে পূজা দেওয়া হয়। সেই দেবতার বেদীর উপর শূকরের মাংস, শুষ্ক মৎস্য, আদা, সুরা ও ভাত রাখিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ ভোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ ও প্রার্থনা করিয়া থাকে। একটী মহিষ বলি দিয়া তাহার একতৃতীয়াংশ ডুমশাকে, একতৃতীয়াংশ খাঁড়াইত বা বলিদানকারী ও পাচককে এবং একতৃতীয়াংশ বাটীর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠকে দেওয়া হয়। এবং গ্রামস্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন ও পান করান হয়। সকলে সুরাপানে মত্ত হইলে এক বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে "অমুকের ছেলে বা মেয়ের নাম রহিল অমুক।"

কোন কাচিনের মৃত্যু হইলে বন্দুক আওয়াজ করিয়া তাহার মৃত্যু ঘোষণা করা হয়। এই সংবাদ পাইয়া সকলে মৃত ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য যায়। একটী গাছের গুঁড়ি খুদিয়া মৃতব্যক্তির শবাধার প্রস্তুত করে। মৃতদেহের লিঙ্গভেদে স্ত্রী কি পুরুষে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান

করাইয়া তাহার মুখের মধ্যে একখণ্ড রূপা রাখিয়া দেয়। এই রৌপ্যখণ্ড মৃতব্যক্তির ভবনদী বা বৈতরণী নদী পার হইবার খেয়ার কড়ি। যে বৃক্ষটী কাটিয়া শবাধার প্রস্তুত করিবে তাহার নিম্নে একটী মোরগ বাঁধিয়া রাখে। পতনোন্মুখ বৃক্ষের চাপে মোরগটী হত হইলে তাহাকে কাটিয়া রক্ত ছিটান হয় এবং তাহার মাংস, শূকরের মাংস, সুরা প্রভৃতি ভাত সহ শবাধারে শবের পার্শ্বে রাখিয়া পরকালের জন্য অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়। একটী শূকর হত্যা করিয়া সকল লোককে সুরা সহযোগে পান ভোজন করাইয়া মৃত সৎকারের আয়োজন করে। বাঁশের বেড়া দ্বারা বৃত্ত প্রস্তুত করিয়া আলম্ব একটা চূড়া সদৃশ নির্ম্মাণ করতঃ তাহা একটী বাঁশে সংবদ্ধ করা হয়, তাহাতে নিশান ঝুলাইয়া দেয়, এবং বলিপ্রদত্ত শূকরের মাথা সেই বাঁশের খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখে। বাটীর আঙ্গিনার মধ্যে বাঁশের বেড়া দিয়া তাহার মধ্যে শবাধার রাখিয়া দেয়। সমাধির নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে বন্দুক আওয়াজ করিতে করিতে শবাধার বহন করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যায়। তাহার পর তিন ফুট পরিমাণ গর্ত্তের মধ্যে শবটী প্রোথিত করে। শোককারিগণ ঘরে ফিরিয়া হাত পা ধুইলে ডুমশা একগুচ্ছ ঘাস হাতে লইয়া তাহা সেরুতে ভিজাইয়া সকলের গাত্রে ছিটাইয়া দেয় (যেমন আমাদিগের পুরোহিত একগুচ্ছ দূর্ব্বা লইয়া শান্তি-জল ছিটাইয়া আশীর্ব্বাদ করে) এবং ইহাদের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে একটা মোরগ কাটিয়া রাখা হয়, তাহার রক্তও সকলের গায়ে ছিটাইয়া দেয় এবং তাহা দ্বারা মৃতব্যক্তির আত্মার মঙ্গলকামনা করিয়া থাকে। সেই দিন সকলে পানাহার করিতে বিরত হয়। পরদিন আর একটা শূকর বলি দিয়া তাহার মাংস সেরু সহ সকলকে ভোজন করাইয়া মৃত ব্যক্তির আত্মার সন্তোষের জন্য নৃত্য গীত (Death Dance) হয়। রাত্রি পর্য্যন্ত এই নৃত্য চলে। পরদিন একটা মহিষ বলি দিয়া পানাহার ও নৃত্য গীত করিয়া বিকালবেলা কবরস্থানে গিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে পরিখা খনন করে। পূর্ব্বোক্ত বাঁশের বৃত্তযুক্ত চূড়াকৃতি জিনিষসহ খুঁটিটা প্রোথিত করে, এবং অপর একটী খুঁটিতে বলিপ্রদত্ত মহিষের মাথাটা বাঁধিয়া রাখিয়া দেয়।

যাহাদের গুলিতে বা অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইয়া থাকে তাহাদিগের দেহ মাদুরে জড়াইয়া এক জঙ্গল মধ্যে প্রোথিত করে এবং তাহার উপর একখানি ছাপরা প্রস্তুত করে। তাহা মৃতব্যক্তির আত্মার বাসের জন্য। সেই ছাপরাখানায় একখানি দা ও তাহার ঝুলি এবং একটী ঝুড়ি রক্ষিত হয়। ইহাদিগের বিশ্বাস যে মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মা ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, এবং সেই আত্মা পুনরায় মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিতে পাবে।

যেসকল ব্যক্তি বসন্তরোগে এবং যেসকল স্ত্রীলোক সন্তান হইয়া মারা যায়, তাহাদের মৃতদেহ সৎকারের জন্য কোন উৎসব হয় না। গর্ভাবস্থায় কোন রমণীর মৃত্যু হইলে তাহাদিগকে ডাইন্ মনে করিয়া থাকে। ইহারা লোকের নিদ্রিতাবস্থায় বা জাগ্রৎ অবস্থায় লোকের রক্ত শোষণ করিতে পারে মনে করিয়া অল্পবয়স্ক লোকেরা ভয়ে গৃহ হইতে পলায়ন করে। তখন দৈবজ্ঞের স্মরণ লওয়া হয়। এবং তাহার দ্বারা অবধারিত হয় যে, কোন্ জন্তু এই সয়তানকে গ্রাস করিতে পারে এবং কোন জন্তু দ্বারা ইহা দেহান্তরে জন্মগ্রহণ করিতে পারে। দৈবজ্ঞের নির্দ্দেশানুযায়ী প্রথমোক্ত জন্তুকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস শবের পার্শ্বে রাখা হয় এবং শেষোক্ত জন্তুটিকে ফাঁসি দিয়া বৃক্ষের ডালে ঝুলাইয়া রাখে। পরে শবটীকে কবর দেওয়া হয়। এই কবরের মধ্যে মৃতব্যক্তির সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার প্রোথিত করে। এবং মৃত রমণীর অন্যান্য সম্পত্তি অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। অনেক স্থলে কবর দিবার সময় এক নুড়া আগুন তাহার মুখে দেয়। এই অবস্থায় চীনারাও মৃতদেহটীকে কবর না দিয়া দাহন করে। কোন কোন শাখার কাচিনগণের মধ্যে এই নিয়ম আছে যে সন্তান প্রসবের এক মাস মধ্যে স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হইলে তাহার দেহ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করে। এবং জীবিত সন্তানটীকেও এই বলিয়া সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করে যে "নে তোর সন্তান তুই লইয়া যা।" কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যদি কোন ব্যক্তি সেই সন্তানটীকে লইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে আর হতভাগ্য নির্দ্দোষী শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে না। যে ব্যক্তি তাহা চাহিয়া লইয়াছে সে তাহারই সন্তানরূপে প্রতিপালিত

হয়। সন্তানের পিতা মাতার তাহাতে কোন দাবি থাকে না।

ধর্ম্ম।

যেমন আমাদিগের তেত্রিশ কোটি দেবতা, ইহাদের দেবতার সংখ্যা তত হইবে না। ইহাদের দেবতাগণকে নাট বলে। পূজাপ্রণালী দেখিয়া বোধ হয় ইহাদের যে পূজাই হউক না কেন তাহা আধ্যাত্মিক পূজা নহে, সমস্তই বাহ্যিক এবং তামসিক। আমাদিগের যেমন দেবতাগণের মধ্যে বড় ছোট আছেন ইহাদের নাটগণের মধ্যেও বড় ছোট আছেন। নাটসকল প্রবল শক্তিশালী এবং তাঁহারা অনিষ্ট বা মঙ্গল করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাদের পূজা করে নচেৎ নহে। ছোজা বা স্বর্গ পুণ্যবান ব্যাক্তির জন্য এবং মারাই বা নরক পাপীর জন্য। ইহারা পরজন্ম বিশ্বাস করে। কি অভিপ্রায়ে কোন নাট বা দেবতা পূজা করিয়া থাকে তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উপাস্য দেবদেবীর নাম।

১। ঙকা (Ngka) ধরিত্রীদেবী—শস্য বপনের সময়, ও খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের সময়, এই দেবীকে তাহারা পূজা করিয়া থাকে। গ্রামস্থ লোকে একত্র হইয়া এই উৎসবে যোগ দেয়। মহিষ, শূকর, ও কুক্কুটের মাংস, শুষ্ক মাংস এবং সেরু দ্বারা পূজা করা হইয়া থাকে। এই উৎসবের পর চারিদিন যাবত সকল প্রকার কার্য্য বন্ধ থাকে।

২। নামশ্যাং বা মুনসান নাট—পল্লীরক্ষক দেবতা—ইহাঁরা স্ত্রীপুরুষ। গ্রামের পূর্ব্বভাগ পুরুষ এবং পশ্চিমভাগ স্ত্রীদেবতার রক্ষার ভার। কোন মহা যুদ্ধ বিগ্রহ এবং কোন নূতন গ্রামের পত্তন কালে এই দেবদেবীর পূজা দেওয়া হয়। গ্রাম্য মোড়ল বা সুভা কর্ত্তৃক গ্রামবাসীগণ সহ এই পূজার আয়োজন হইয়া থাকে। পূজার উপকরণ, গো, মহিষ, শূকর, শুষ্ক মাংস, মদ্য ও অন্যান্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি।

৩। মুসেন নাট বা দেবগণের রাজা—ইহাঁরাও পতি পত্নী দুই জন। কোন একজন একাকী এই দেবদেবীর পূজা করিতে পারে না। গ্রামের সুভা গ্রামবাসী সহ একত্রে পূজার উৎসব করিয়া থাকে। ক্ষেত্র কর্ষণ, শস্য বপন, শস্য কর্ত্তন এবং এক নূতন গ্রামের পত্তন দিতে হইলে ইহাদের পূজা দেওয়া হয়। এই পূজায়ও গো মহিষ, শূকর, মোরগ, মদ্য প্রভৃতির প্রয়োজন হয়।

৪। চান্ নাট সূর্য্যদেব—ইনিও পত্নী সহ বর্ত্তমান। ক্ষেত্র কর্ষণ ও শস্য বপনের সময় ইঁহাদিগকে পূজা দেওয়া হয়। পূজার উপকরণ,—ডিম্ব, অন্ন, ব্যঞ্জন, সুরা ইত্যাদি। অধিকন্তু এই পূজায় পুরুষের বস্ত্রালঙ্কার দেওয়া হয়।

৫। সাদা নাট—চন্দ্র। পূজার উপকরণ—গো মহিষাদি। তাহা বাদে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার এবং বাঁশের চুঙ্গির চারি চুঙ্গি সেরু পূজায় দেওয়া হয়। অন্নব্যঞ্জন, ডিম্ব ইত্যাদিও দিতে হয়।

৬। নিম্ফয় বা পম্প-উই—বায়ুর দেবতা বা পবন। যুদ্ধকালে, বাণিজ্যযাত্রাকালে, রোগ ব্যাধি হইলে ইঁহাকে পূজা দেওয়া হয়। পূজার উপকরণ—গো, মহিষ, বরাহ, কুক্কুট ইত্যাদি। রৌপ্য, বস্ত্র প্রভৃতিও দিয়া থাকে।

৭। নিংগান ওয়া—ব্রহ্মা—বোধ হয় অগ্নিভয়ের জন্য ইঁহার পূজা করে। এই দেবতার পূজায় রুটী, পুষ্প, রেশমীবস্ত্র, আটটী বাঁশের চুঙ্গি পূর্ণ সুরা এবং আংটী উপহার দেওয়া হয়।

৮। বুমনাট—পর্ব্বতের দেবতা। কোন রোগের প্রাবল্য হইলে, জঙ্গল কাটিবার সময় এবং কৃষিকার্য্যের সময় ইহাঁকে পূজা দেওয়া হয়। পূজার উপকরণ—গো মহিষ ও শূকর বলিদান প্রভৃতি।

৯। মুম-সুপ—লক্ষ্মীদেবী (Rice God)। ধান্য ফসলের শুভকামনায়, এবং কোন রোগের উপশমের জন্য ইহাঁকে পূজা দেওয়া হয়। পূজার উপকরণ চন্দ্রের পূজার ন্যায়।

১০। চেগানাট—ক্ষেত্র ও উদ্যানরক্ষক দেবতা। ক্ষেত্রের শস্য ও উদ্যান রক্ষার জন্য ইঁহাকে পূজা দেওয়া হয়। গো ও মহিষ বলি দিয়া তাহার চামড়া পোড়ান হয় এবং মাংস পাক করিয়া ভোগ দিয়া থাকে। তামাকু এ পূজায় লাগে। এই দেবতার কোপে চক্ষুরোগ ও চর্ম্মরোগ হইতে পারে।

১১। ওয়ারুমনাট—বৈদ্যনাথ। বসন্ত ও কলেরা প্রভৃতি রোগ হইলে এই দেবতার পূজা করে। আমাদিগের কিন্তু এই দুই রোগের দুই ভিন্ন দেবতা যথা শীতলা ও ওলাদেবী। পূজার উপকরণ পূর্ব্ববৎ গো মহিষাদি বলিদান প্রভৃতি।

১২। থাকু থানাম—গঙ্গা দেবী। কোন ব্যক্তি জলে ডুবিয়া মরিলে বা কোন কোন ব্যাধিতে এই দেবীর পূজা করা হইয়া থাকে। পূজার উপকরণ—যোড় মহিষ, যোড় শূকর এবং যোড় মোরগ বলিদান ইত্যাদি।

১৩। ছেতাঁউ নাম—বনদেবতা। যুদ্ধাদি ও রোগ হইলে ইহার পূজা করিয়া থাকে। শূকর ও ছাগবলি এই পূজার উপকরণ।

১৪। ঙখু (Ngkhoo) নাট—গৃহদেবতা বা বাস্তুপুরুষ। রোগাদি এবং এক এলাকা ছাড়িয়া অন্য এলাকায় বসতির জন্য ইহাকে পূজা করে। পূজার উপকরণ নবান্ন ও মহিষাদি। আমাদিগের অগ্রহায়ণ ও পৌষে বাস্তুপূজা ও নবান্ন করা হইয়া থাকে।

১৫। ঙুং নাট—গৃহবহির্ভাগ-রক্ষাকারী দেবতা। কোন ব্যক্তি যুদ্ধে হত হইলে, সাপ, বাঘ দ্বারা হত হইলে এবং জলে ডুবিয়া বা বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া মরিলে ইঁহার পূজা করে।

১৬। মো-নাট—স্বর্গ বা আকাশের দেবতা। ইঁহারা চারি ভাই, মংলাম, ঞ্রীবান, সীন-লাপ, মউসিইং এবং এক ভগ্নী বাঁউকয়। এই শেষোক্ত দেবী বজ্রের দেবী। এই স্বর্গীয় দেবতাগণ কাচিনগণের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা। ব্যবসায়ে লাভবান হইলে, যুদ্ধে জয়ী হইলে, সন্তান কামনায় এবং নূতন গ্রাম পত্তনে ইঁহাদের পূজা করে। গো, মহিষ, বরাহ, কুক্কুট প্রভৃতি বলিদান এবং ডিম্ব অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতির দ্বারা পূজা করে।

১৭। লেছা নাট বা ভূত। যেসকল ব্যক্তি দায়ের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের প্রেতাত্মা বা ভূত লোকের নানা রোগ জন্মাইতে পারে। এই জন্য ইহাকে পূজা করে। পূজার উপকরণ মহিষাদি বলি প্রদান। একটী টুকরিতে অন্নব্যঞ্জন সুরা প্রভৃতি রাখিয়া পথে স্থাপন করিয়া দিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করে, এবং ঐ ভোগ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করে।

১৮। নিডাং নাট—গর্ভস্থ ভ্রূণ সহ মৃত্যু হইলে সে যে ভূত হয় তাহার নাম নিডাং। পূজা পূর্ব্ববৎ।

১৯। ফিলুমুন—(witch) ডাইন। পূজা পূর্ব্ববৎ।

ইহা ভিন্ন আরো অনেক প্রকার নাট আছে। তাহাদিগের নাম দিতে গেলে তালিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

ভাষা।

কাচিনদিগের কোন লিখিত ভাষা ছিল না। ব্রহ্মদেশের কাচিনদিগকে আমেরিকান ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের পাদ্রিগণ খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এবং স্কুলে পড়াইয়া অনেককে সভ্য করিয়াছেন। ভামোর প্রসিদ্ধ পাদ্রি রবার্ট সাহেব কাচিনগণের লিখিত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশী ভাষার অক্ষর ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই ভাষায় পুস্তকাদি লিখিত হইয়াছে। কাচিন বালকবালিকা যুবকযুবতীগণ ইংরেজি ও বর্ম্মা ভাষা শিখিতেছে। তাহাদের ভাষায় অনেকগুলি শব্দের শেষে একটা দীর্ঘ ঈকার টান দিয়া কথা বলে যেমন একটী কথা "নাং গডে-ছা-ঈ' অর্থাৎ তুমি কোথায় যাইতেছ।

টেঙ্গিয়ে, চীন। শ্রীরামলাল সরকার।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি)

৫

আধুনিক যুগের সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর হিন্দুসমাজ।—সভ্যতার বিকাশ।—উজ্জয়িনী ও কানৌজ:—হিয়েন সিয়াংএর বর্ণনা। সমাজের অবনতি।—রীতিনীতির কলুষিত অবস্থা।—মহাকাব্যাদির ও মৃচ্ছকটিকের বর্ণিত প্রেম, কালিদাস ও ভবভূতি কর্ত্তৃক বর্ণিত প্রেম।—বিলাসিতা।—ভোগসুখ।—নিষ্ঠুরতা।—ইন্দ্রজাল।—মালতী মাধব।

ধর্ম্ম ও শিল্পকলার ক্রমবিকাশ হইতে সমাজের ক্রমবিকাশ বিচার করা যাইতে পারে। যদি অশোকের সাম্রাজ্যকালকে রাষ্ট্রিক উন্নতির চরমসীমা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে বিক্রমাদিত্যের যুগ পর্য্যন্ত সভ্যতা বরাবর উন্নতির পথে চলিয়াছে।

ক্রমে সভ্যতার কেন্দ্র স্থানচ্যুত হয়। অসভ্যদিগের অভিযানের আশঙ্কায় নিত্য অবস্থিত যে হিন্দুস্থান, সেই

হিন্দুস্থানের পরিবর্ত্তে মালবের শৈলমালা—পাটলিপুত্রের পরিবর্ত্তে উজ্জয়িনী—সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইল।

প্রেমদূতের গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"হে উত্তরগামি মেঘ, তোমার সোজা পথ হইতে একটু ফিরিয়া উজ্জয়িনীতে গমন কর, যে উজ্জয়িনী উন্নত প্রাসাদে ও রূপসী ললনায় পরিপূর্ণ ......যে উজ্জয়িনী, কীর্ত্তিকলাপ ও প্রেমকাহিনীর জন্য প্রসিদ্ধ। মুগ্ধ কবিগণ সেই সমস্ত কাহিনী তাহাদের কবিতায় চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন ... ... উজ্জয়িনী, যথায় প্রভাত-অনিল মৃদুমন্দ বহমান, বনভূমি বিহঙ্গের মধুর গীতে মুখরিত, কুসুমের সুরভি-সম্পদ অরুণের নিকট উন্মুক্ত, যেখানে গ্রীষ্ম-যামিনীতে পরিশ্রান্ত রমণীগণ নদীশীকর-চুম্বিত শীতল বায়ু সেবন করিয়া স্বকীয় ক্লান্তিহরণের চেষ্টা করে ... ... সেই উজ্জয়িনী, যেখানে গৃহ সকল পুষ্পসৌরভে আমোদিত, দ্বারদেশে অলক্তরাগরঞ্জিত পদপংক্তির চিহ্নে চিহ্নিত, কুন্তলের সুগন্ধে চারিদিক আচ্ছন্ন, এবং অলিন্দের উপর ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নিয়ত নৃত্য করে। সেই উজ্জয়িনী যেখানে দেহের উপভোগ্য সমস্ত সুখ এবং আত্মার উপভোগ্য সমস্ত আনন্দ বিরাজমান্।"

নাটক ও আখ্যায়িকাতেও উজ্জয়িনীর বর্ণনা আছে। যে যুগে পাটুলীপুত্রকে দৈত্যনির্ম্মিত একটি অপূর্ব্ব পুরী বলিয়া মনে করিত, সেই যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্যতার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। অতুল ধনরত্নের অধিকারী বণিকেরা সামান্যভাবে জীবন যাপন করিত এবং মুক্তহস্তে দান করিত। হীরক, মুক্তা, পান্না, নীলকান্তমণি, সোনা রূপার কাজ, বুটার কাজ ও সুগন্ধ—এই সমস্তের জন্য উজ্জয়িনীর বিপণি সমূহের সবিশেষ খ্যাতি ছিল।(১)

বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যসনাসক্তির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শৌণ্ডিকালয়, জুয়ার আড্ডা, বেশ্যালয়। রাজ-প্রাসাদ বেশ্যার প্রাসাদকে জিতিতে পারে নাই। (২)

(১) ম্যাগাস্থিনিস (McCrindleএর অনুবাদ) "ভারতের ভূগর্ভ নানাপ্রকার ধাতুর শিরায় পরিব্যাপ্ত; উহার মধ্যে অনেক স্বর্ণ রৌপ্যের, তাম্রের, এমন কি, টিনের খনিও প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (ষষ্ঠ শতাব্দী, D. H. Kernএর অনুবাদ Journal of the R. A. S., New Series VII) হীরক, নীলকান্তমণি মরকতমণি সংইস্ত মণি, পান্না, Amethyste, (বেগুনিয়াবর্ণের মণি) গোদন্তমণি, পদ্মরাগমণি—এই সকল রত্নের উল্লেখ আছে।

তখন শ্রমজাত শিল্পের উন্নত অবস্থা। ধাতুর ঢালাই কাজে ভারতবাসিদিগের খুব দক্ষতা ছিল। ইহার দৃষ্টান্ত, পুরাতন দিল্লিতে ধব রাজার লৌহস্তম্ভ (বোধ হয় খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দীর)।

(২) উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধাবস্থা বেশীদিন টেকে নাই বলিয়া মনে হয়। হিউএন-সিয়াং উজ্জয়িনীর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—"রাজধানীর পরিধি ৩০ 'লীগ'। লোকবসতি খুব ঘন, লোকেরাও বেশ ঐশ্বর্য্যশালী। অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার আছে, সমস্তই ধ্বংশাবশেষ; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকগুলি হিন্দু-মন্দিরও আছে। রাজা জাতিতে ব্রাহ্মণ।"

উজ্জয়িনীর পরে,—বেহার-প্রদেশস্থ নলন্দার বিশ্ব-বিদ্যালয়, ধর্ম্মের পীঠস্থান বারাণসী, এবং যাহার অধিপতি উত্তরস্থ সমস্ত রাজ্যের চক্রবর্ত্তী-রাজা ছিলেন সেই কনৌজ—এইগুলি উল্লেখযোগ্য। হিউএন্-সিয়াং বলেন,—দ্বিতীয় শিলাদিত্যের রাজদরবার খুব জমকাল ধরণের ছিল। কি ব্রাহ্মণ কি বৌদ্ধ—সকলের প্রতিই রাজার সমদৃষ্টি ছিল।

চীন দেশীয় পর্য্যটক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"নদীর পশ্চিম তটে, রাজা একশত ফুট উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পথের ধারে ধারে মণ্ডপগৃহ ও চতুষ্ক-সমূহ। সেখানে নহবৎ বাজে ... ... একটা বৃহৎ হস্ত, হস্তীর বহুমূল্য সাজসজ্জার উপর দণ্ডায়মান বুদ্ধের একটি স্বর্ণ-প্রতিমা। বামে, "চক্র" দেবতার বেশে, একটা ছত্র ধারণ করিয়া শিলাদিত্য চলিয়াছেন; দক্ষিণে, রাজকুমার, একটি চামর ধারণ করিয়া ব্রহ্মার বেশে চলিয়া-ছেন। বর্ম্মাবৃত ৫০০ হস্তী প্রত্যেক রাজার পশ্চাতে চলিয়াছে, এবং শত শত অন্য হস্তী তুরী ভেরী প্রভৃতি বাদ্যভাণ্ড লইয়া বুদ্ধ-প্রতিমার অগ্রে চলিয়াছে। যাত্রা-পথে শিলাদিত্য, মুক্তা, বহুমূল্য দ্রব্যাদি, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত পুষ্প ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন।" (৩)

(৩) সি-য়ু-কি, V (Beal I, ২১৮-২১৯)—বহুকাল হইতেই ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যামন্দির ছিল; সেখানে ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ ও দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হইত; বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের অনেক স্থলে এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখনকার টোলের ন্যায় এইসকল গৃহ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত; সেখানে একজন আচার্য্য, আপনার আত্মীয় স্বজন ও শিষ্যদিগকে জড় করিতেন; অনেক সময়ে শ্রমণেরা উপবনে ও তপোবনে অধ্যাপনার কাজ করিত। যখন সভ্যতার উন্নতি হইল এবং নগরগুলির শ্রীবৃদ্ধি হইল, তখনই বিশ্ববিদ্যালয়সকল স্থাপিত হইল। ছয় শতাব্দী ধরিয়া নলন্দা ভারতীয় অক্‌স্‌ফোর্ড রূপে বিরাজমান ছিল। যে সময়ে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের মধ্যে তীব্র বিবাদ চলিতেছিল, সেই পঞ্চম ও অষ্টম শতাব্দীতে নলন্দা খুব 'সরগরম' হইয়া উঠিয়াছিল। প্রসিদ্ধ তর্কবাগীশেরা সেখানে যাইত; তাহাদের সঙ্গে কতকগুলি অশ্বারোহী রক্ষক থাকিত, বাদ্যকর থাকিত, পতাকা-ধারী থাকিত; বিদ্যা ফাটিয়া না বাহির হয়, এই জন্য কোন কোন পণ্ডিত একটা লৌহ-চক্রের দ্বারা ললাটদেশ বেষ্টন করিতেন; কাহারও বা একটা সিংহাসন থাকিত; সরস্বতী দেবীর পদতলে প্রসিদ্ধ দার্শনিকেরা প্রণত হইয়া আছে—এই ভাবের খোদাই কাজে সিংহাসনের পায়াগুলি বিভূষিত হইত। রাজারা বিলাস-সুখ ছাড়িয়া তাহাদের তর্কবিতর্ক শুনিতে যাইতেন। কখন কখন এই সকল বাদবিতণ্ডা অনেক দিন ধরিয়া চলিত। লোকেরা পরাজিত ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে কর্দ্দমের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। নলন্দা একটি বৌদ্ধবিহার—কিংবা আরও ঠিক্ করিয়া বলিতে গেলে, অক্স-ফোর্ডের ন্যায় কতকগুলি বিহার-সমন্বিতা নগরী। গয়া হইতে অধিক দূর নহে—পাট্‌নার দক্ষিণে, উহার কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। একটি প্রাচীর দ্বারা নগরটি বেষ্টিত; উহার পত্তনভূমি এখনও দৃষ্ট হয়। উত্তুঙ্গ সিংহদ্বারগুলি পিরামিড্ আকৃতি। হিউয়েন-সিয়াং যিনি নলন্দায় অতিথিরূপে ছিলেন—তিনি প্রস্তরময় কীর্ত্তিস্তম্ভাদির উল্লেখ করেন, পবিত্র সরোবর প্রভৃতির উল্লেখ করেন। কিন্তু ভূমি খনন করিয়া বিশেষ কোন ফল যে হয় নাই তাহার কারণ—বোধহয় অধিকাংশ ইমারৎ কাঠের ছিল।—সি-য়ু-কি IX দ্রষ্টব্য।

সপ্তম শতাব্দীর শেষ হইতে, রাষ্ট্রবিপ্লব ও গৃহ-যুদ্ধের ফলে, অবনতিগ্রস্ত হিন্দুসমাজের ধ্বংস আরম্ভ হয়। যখন বাহ্যতঃ খুব উন্নতির অবস্থা, এমন কি তখনও, হিন্দুজাতি যে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, নাটক ও আখ্যায়িকাতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। মহাকাব্যের নায়কেরা—এমন কি, যাঁরা মৃদুতার জন্য প্রখ্যাত, সেই রাম ও যুধিষ্ঠিরও হীনবীর্য্য ছিলেন না।

তখন হইতে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ই অল্প কথাতেই মূর্চ্ছা যাইত। ক্ষণিক আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ বা একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে, একজন মিত্রকে আঘাত করিত, অথবা একজন শত্রুকে উপহারে উপহারে আচ্ছন্ন করিত। সকল শ্রেণীর মধ্যেই, অতিমাত্র বিলাসিতা, অসংযত বদান্যতা এবং সেই সঙ্গে নীচ অর্থলিপ্সাও পরিলক্ষিত হয়। আত্মশক্তি ও পৌরুষের ভাব বিন্দুমাত্র নাই; দেখা যায়, বিচারালয়ের সম্মুখে, নির্দ্দোষ ব্যক্তি আপনাকে দোষী বলিয়া স্বীকার করিতেছে। সে বলিতেছে ;—ইহা আমার অদৃষ্টের ফল। এতদূর কাপুরুষতা যে, দুঃখের দীর্ঘ দীর্ঘ বর্ণনা সত্ত্বেও, সকল নাটকই সুখে পর্য্যবসিত হইয়াছে : বাস্তব ঘটনার দারুণ দৃশ্য কাহারও সহ্য হয় না ; সাহসহীন

বহু পূর্ব্ব হইতেই বারাণসী ভারতের ধর্ম্মসংক্রান্ত রাজধানী হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার সেইখানেই আরম্ভ হয়। বোধহয় শেষ-শতাব্দীর শেষভাগেই নগরটি শিবের নামে উৎসর্গীকৃত হয়।

হিউয়েন-সিয়াং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভে, ভারতীয় নগরগুলির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"নগর ও গ্রামগুলি, উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। রাস্তা ও গলি আঁকা-বাঁকা। রাস্তার ভূমি অপরিষ্কার। দোকানগুলি বিশেষ-বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত। মাংসবিক্রেতা, মৎস্যবিক্রেতা, নর্ত্তকী, জল্লাদ, চামার—ইহারা নগরের বাহিরে বাস করে। যাতায়াত করিবার সময়, ইহারা রাস্তার বাঁদিক দিয়া চলে। তাহাদের গৃহের প্রাচীর নীচু, এবং তাহাদের গৃহগুলি লইয়াই নগরের উপকণ্ঠ। নগরের প্রাচীরগুলি সাধারণতঃ ইষ্টক-নির্ম্মিত, প্রাচীরের চূড়াগুলি কাঠের কিংবা বাঁশের। বাড়ীগুলিতে বারাণ্ডা আছে, বলভী (Belvedere) আছে—এই সকল বারাণ্ডা ও বলভী কাঠনির্ম্মিত, বাড়াগুলি চুন ও খাপ্‌রার দ্বারা আচ্ছাদিত। বাড়ীর ছাদ খাপ্‌রার, কাঠের, খড়ের কিংবা শুক্‌নো গাছের ডালের। ভারত-বাসীরা মাদুরের উপর উপবেশন করে, মাদুরের উপর নিদ্রা যায়... তাহাদের পরিচ্ছদ কাটা-ছাঁটা কিংবা শেলাইকরা নহে। উহারা সাদা রং-ই পছন্দ করে। পুরুষেরা কোমরে গ্রন্থি দিয়া কাপড় পরে, ও কাপড়ের প্রান্তভাগ দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়া লইয়া যায়। রমণীদের পরিচ্ছদ, স্কন্ধ আচ্ছাদিত করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। ভারতবাসীরা মস্তকের চূড়াদেশ একটা সূতা দিয়া বন্ধন করে—বাকী কেশ আলুলায়িত ভাবে থাকে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ গোঁফ কামায়।"

দুর্ভাগ্যাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে দেবতারা নামিয়া আসেন।

উত্তর-যুগের নাটকীয় নায়কগুলি আরও দুর্ব্বলচরিত্র। কালিদাসের একটি নাটকে, রাজা তাঁহার গৃহের একজন পরিচারিকার প্রেমে আসক্ত হইলেন ; রাণী পাছে কুপিত হন এই ভয়ে, তিনি তাঁহার প্রিয়তমার দর্শনলাভের জন্য "ছেলেমানুষি" ধরণের কতই ফিকির ফন্দি করিতে লাগিলেন। দুই তিন শতাব্দী আবও পরে, ঐ একই বিষয়ের পুনর্ব্বার অবতারণা করা হইয়াছে ; কেবল আখ্যান-বস্তুর জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থকার রাজার চরিত্র এইরূপ চিত্রিত করিয়াছেন :—

রাজপ্রাসাদের উদ্যানে রাজা তাঁহার প্রণয়িনী সাগরিকার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। সাগরিকা, মহিষীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিবার কথা। ইতিমধ্যে স্বয়ং মহিষীই সেই সংকেত-স্থানে আসিয়া উপস্থিত :—

রাজা (সাগরিকা মনে করিয়া)

ও তব বদন-চাঁদ, এ চাঁদের মুখ-কান্তি
সরবস্ব করেছে হরণ।
প্রতীকার তরে তাই উর্দ্ধবাহু নিশানাথ
শৈল পরে করে আরোহণ॥

* * *

রাণী। (সরোষে অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া) মহারাজ, সত্যই আমি সাগরিকা, সাগরিকার চিন্তায় উন্মত্ত হয়ে তুমি এখন সকলই সাগরিকাময় দেখ্‌চ।

* * *

রাজা। আমি অপ্রতিভ লাজে, চরণে মস্তক পাতি'
লাক্ষাজাত তাম্ররাগ মুছাইব এখনি যতনে,
কোপ-রাহু-গ্রাসে তাম্র তব মুখ-চন্দ্র-ভাতি
তাহাও হরিতে পারি, যদি চাও করুণ নয়নে।

(পদতলে পতন)

রাণী। (হস্তদ্বারা নিবারণ করিয়া) ওকি মহারাজ—ওঠ ওঠ, সে অতি নির্লজ্জ যে হৃদয়ের ভাব জেনেও আবার রাগ করে ; নাথ তুমি সুখে থাক, আমি চল্লেম। (প্রস্থান)

রাণীর বেশ ধারণ করিয়া সাগরিকা প্রবেশ করিল। ইতিপূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল সাগরিকা তাহার কিছুই জানে না। কিন্তু এই বিষাদ-ব্যাধিগ্রস্তা বিকৃতভাবাপন্না রমণী সহসা বলিয়া উঠিল :—

..."অপমানিতা হয়ে আর জীবন ধারণ করব না" এই বলিয়া, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য মাধবীলতার ফাঁস গলায় পরিল।

রাজা ইহা দেখিয়া দৌড়িয়া আসিলেন :—

* * *

রাজা। ক্ষান্ত হও দুঃসাহসে,—এ নহে উচিত
লতা-পাশ কণ্ঠ হতে ত্যজহ ত্বরিত;
শোনো ওগো প্রাণেশ্বরি, তব কণ্ঠে পাশ হেরি'
যায় বুঝি এ মোর জীবন
ক্ষণ তরে মোর কণ্ঠে তব বাহুপাশ দিয়া
কর মোর মৃত্যু নিবারণ ॥

* * *

সাগরিকা। মহারাজ, এ মিথ্যা আদর দেখিয়ে কাজ কি? তোমার প্রাণাধিকা মহিষীর কাছেই বা আপনাকে কেন আবার অপরাধী করবে বল দেখি।

রাজা। দেখ সাগরিকা, তুমি যা বল্‌চ তা ঠিক্ নয়। কেন না,—
শ্বাস-প্রশ্বাসের ভরে কাঁপিলে সে বক্ষদেশ
কাঁপি গো অমনি,
মৌনী যদি দেখি তাঁরে, সবিনয় প্রিয়ভাষে
তুষি যে তখনি;
ভ্রূভঙ্গ দেখিলে মুখে, অমনি হয় যে তাঁর
চরণে পতন,
রাখিতে মহিষী-মান স্বভাবত করি তাঁর
শুশ্রূষা যতন।
প্রণয়-বন্ধন হেতু যেই অনুরাগ মোর
হয়েছে বর্দ্ধিত
সেই সে প্রকৃত প্রেম একমাত্র তোমা-পরে
করেছি স্থাপিত।

রাণী। (সহসা প্রবেশ করিয়া) মহারাজ! এ কথা তোমারি যোগ্য বটে!

রাজা। দেবি, আমাকে অকারণ কেন তিরস্কার করচ? বেশ-সাদৃশ্যে প্রতারিত হয়ে, তোমাকে মনে করেই এখানে এসেছিলেম, আমাকে ক্ষমা কর। (চরণে পতন)

কোন ওজর আপত্তি না শুনিয়া রাণী, সাগরিকা ও বিদূষককে বন্ধন করিলেন।

* * *

সাগরিকা। (স্বগত) হায়! আমি কি পাপিষ্ঠা, ইচ্ছাসুখে মরতেও পেলেম না।

বিদূষক। মহারাজ! দেবীর আদেশে বন্ধন-দশায় পড়েছি—এই অনাথ ব্রাহ্মণকে যেন মনে থাকে।

রাজা। দীর্ঘকাল রোষ হেতু দেবীর বদনে
নাহি আর সে মধুর মৃদুস্নিগ্ধ হাসি,
সাগরিকা ত্রস্তা অতি দেবীর তর্জ্জনে
বসন্তকে লয়ে গেল বাঁধি' গলে ফাঁসি।
সবারি বেদনা প্রাণে বারি মুখে চাই।
ক্ষণকাল তরে হৃদে শান্তি নাহি পাই ॥

তবে আর এখানে থেকে কি ফল, এখন অন্তঃপুরেই যাই; দেখি, দেবীকে যদি আবার প্রসন্ন করতে পারি। (৪)

এইসকল দুর্ব্বল ও রুগ্ন প্রকৃতিতে, বিলাসিতার পূর্ণ প্রাদুর্ভাব। নাটক ও আখ্যান সমূহে এইসকল প্রেমের ভাব রূপান্তরে প্রকাশ পায়।

মহাভারতে নারী, পুরুষের সঙ্গিনীরূপে চিত্রিত হইয়াছে। মহাভারতের নারী স্বভাবত দুশ্চরিত্রা নহে, তাহাকে সর্ব্বদা চোখে-চোখে রাখিতে হয় না। দ্রৌপদী যখন কুরুদিগের দাসী হইলেন, তখনও তাঁহার উপর পাণ্ডবদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল। রমণীর প্রতি মানুষের মত ব্যবহার করিলে, রমণীরও মনুষ্যোচিত সাহস হয়, রমণীও আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারে। সাবিত্রীকথার ন্যায় মর্ম্মস্পর্শী আখ্যান আর কোথাও নাই: সত্যবানের অনুরাগিণী সাবিত্রী জানিত, ঐ বৎসরেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে, ইহা জানিয়াও সত্যবানকে বিবাহ করিল। সাবিত্রী কখনও তাহার মনোবেদনা প্রকাশ করে নাই। যে দিনে মৃত্যু হইবে সেই দিনেই সাবিত্রী সত্যবানের সহিত বনে গমন করিল। যুবক সত্যবান ক্লান্ত হইয়া সাবিত্রীর কোলে মাথা রাখিল। রক্তবসন-পরিহিত এক দেবতা আবির্ভূত হইলেন। তিনি মৃত্যুর দেবতা যম। যম সত্যবানের আত্মাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। সাবিত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে যমের অনুসরণ করিল। অবশেষে তাহার বিলাপক্রন্দনে, যমের দয়া হইল। মৃত্যু যাহার নিয়তি ছিল, সেই সত্যবানকে যম ছাড়িয়া দিলেন। সাবিত্রীর কোলে শয়ান সত্যবান, মহানিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। তখন আকাশে তারা দেখিয়া সত্যবান বলিয়া উঠিল:—

"এতক্ষণ কেন আমাকে ঘুমাইতে দিয়াছিলে?"—"তাহাতে কি আসিয়া যায়? তুমি যখন নিদ্রা যাইতেছিলে, আমি তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলাম।"

আবার দময়ন্তী যখন সুপুরুষ নলকে পুনঃপ্রাপ্ত হইল, তখন নল বামনাকারে পরিণত; দময়ন্তী দিব্য দৃষ্টির দ্বারা চিনিতে পারিয়া, তখনও সেই বিকৃতাকার নায়ককে পূর্ব্ববৎ ভাল বাসিল।

রামায়ণে রমণীর উপর একটু সন্দেহ-দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল: সীতা রাবণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বয়ং রামেরই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। রামায়ণে রমণীর স্বাধীনতা কম, সুতরাং মহত্ত্বও কম। কিন্তু নারী-প্রেমের মহত্ত্ব ও বিশুদ্ধতা তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল।

পরে, উচ্চবর্ণের মধ্যে, রমণী নিতান্ত সন্দেহের পাত্রী হইয়া পড়িল। রমণী শিশুর ন্যায় নির্ব্বোধ ও চরিত্রহীনা

(৪) রত্নাবলী,—দ্বিতীয় শিলাদিত্য কিংবা তাঁহার আশ্রিত কোন কবি কর্ত্তৃক রচিত। তৃতীয় অঙ্কের শেষ ভাগ।

সুতরাং তাহাকে অবরোধে রুদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। তখন পুরুষেরা বেশ্যার প্রেমে আসক্ত হইল। বেশ্যা ধনশালিনী, শিষ্টাচারসম্পন্না, ও বিদ্যাবতী, সুতরাং অনেক স্থলে পুরুষের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। বসন্তসেনা একজন নর্ত্তকী মাত্র, তথাপি তাহার মনোভাব, তাহার কথাবার্ত্তা মহত্ত্বব্যঞ্জক। চারুদত্ত তাহার প্রতি আসক্ত—রূপলালসার জন্য ততটা নয় যতটা তার গুণ-গরিমার জন্য। ঘটনাক্রমে সে চারুদত্তের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়।

বসন্তসেনা মনে মনে ভাবিল :—

"এঁর বাক্যালাপ কি পরিপাটী ও মধুর। কিন্তু আজ এখানে এরূপভাবে এসে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়।"

তারপর দিন, একজন শ্রমজীবী, সাহায্যপ্রার্থনার জন্য বসন্তসেনার গৃহে প্রবেশ করিল। সে বলিল,—সে এমন একব্যক্তির সেবক ছিল যাহার মহানুভবতা, যাহার বদান্যতা—উজ্জয়িনীর অলঙ্কার।

দাসী। ঠাকরণের যিনি মনের মানুষ ছিলেন, তাঁরই গুণ চুরি করে' না জানি কে এখন উজ্জয়িনী নগর অলঙ্কৃত করচেন?

বসন্তসেনা। ওলো তুই ঠিক্ বলেছিস—আমিও তাই মনে মনে ভাবছিলেম।

দাসী। তারপর মশায়, তারপর?

সংবাহক। ঠাকরণ, তিনি করুণার বশবর্ত্তী হয়ে দান করে' দান করে' ... ...

বসন্ত। তাঁর ধন নিঃশেষ হয়ে গেল।

সংবাহক। না বল্‌তে বল্‌তেই আপনি কি করে' জান্‌তে পারলেন?

বসন্তসেনা। এ আর জান্‌তে কি। ধন ঐশ্বর্য্য দুর্ল্লভ বস্তু। যে পুষ্করিণীর জল কেউ পান করে না, তাতেই অনেক জল থাকে।

দাসী। মশায় তাঁর নামটি কি?

সংবাহক। ঠাকরণ, সেই ধরণীচন্দ্রের নাম কে না জানে? তাঁর বণিক্‌পটিতে বাস। তাঁর লোকপূজ্য নাম চারুদত্ত।

বসন্ত। তাঁরই কোন আত্মীয়ের এই গৃহ। ওলো! এঁকে বস্‌তে আসন দে। তাল পাখা নিয়ে আয়। ওঁর অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে।

* * * * *

সংবাহক। সম্প্রতি ঠাকরণ আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন শুনে, আড্ডাধারী ও জুয়ারী দুজনেই আমার সন্ধানে এসেছে দেখ্‌ছি।

বসন্ত। দেখ্ মদনিকা, বাসা গাছটি ভেঙ্গে গেলে পাখীরাও ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। ওলো, তুই যা, "উনি দিলেন" এই কথা বলে' সেই আড্ডাধারী ও জুয়ারীকে এই হাতের গহনাটা দিয়ে আয়।"(৫)

নৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। তখন প্রেম ইন্দ্রিয়-সুখ ছাড়া আর কিছুই নহে। কালিদাস যে প্রেমের কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা স্থূল ধরণের। যখন রাজা শকুন্তলাকে দেখিলেন, তখন তিনি তাহার মদালস নেত্র, তাহার সুকোমল ওষ্ঠাধর, তাহার চঞ্চল গঠনাদি এই সকল বিষয়েরই প্রশংসা করিয়াছিলেন।

তাহার পর শত বর্ষ চলিয়া গেছে; এখন ভবভূতির একজন নায়িকা যেরূপে আপনার প্রেমাসক্ত হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন তাহা দৈহিক বিবরণে পূর্ণ।

আর দুই এক শতাব্দী পরে, "কামসূত্রের" আবির্ভাব। যে জাতির সমস্ত অন্তঃসার নিঃশেষিত হইয়াছে, সেইরূপ জাতিই ঐ নির্লজ্জ গ্রন্থের বর্ণিত ইন্দ্রিয়সুখে আমোদ পাইতে পারে।

❁

বিলাসিতার আর সমস্ত উপাদান, প্রণয়-বিলাসের অনুসঙ্গী: যথা, সুগন্ধ, পুষ্প, কোমল বসন, শীতল পানীয়, সুরা; সমস্ত বিলাসসামগ্রী:—যথা, রত্নালঙ্কার, জরির পরিচ্ছদ। প্রাসাদ, উপবন, পঙ্কজ-সমাচ্ছন্ন সরোবর। হস্তী, বানর, সকল জাতীয় পক্ষী। পরিচারক ও দাসবৃন্দ।

এই সুমার্জ্জিত সভ্যসমাজে, ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। হত্যাকাণ্ড, প্রাণদণ্ড, রাজার অত্যাচার, রাজপুরুষদিগের অত্যাচার, সচিবদিগের অত্যাচার। তা ছাড়া শোচনীয় বিশ্বাস-প্রবণতা। সরলচিত্ত চীন পর্য্যটকেরা শুক্ল ইন্দ্রজালের কথাই জানে।(৬) কিন্তু তন্ত্রে কৃষ্ণ ইন্দ্রজালের উপদেশ আছে। এবং সেই সকল উপদেশ অনুসারে কিরূপ অনুষ্ঠান হইত, তাহা নাটকাদিতে অবগত হওয়া যায়। ভবভূতীর কোন নাটকের প্রধান দৃশ্য—একটি শ্মশানভূমি। মাধব দেখিলেন, মালতী তাঁহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত। নিয়তির সহিত যুদ্ধ করেন এরূপ তাঁহার বলবীর্য্য নাই,—তিনি শ্মশানের আশ্রয় লইলেন। রাত্রিকাল। প্রবল ঝটিকা। বেতাল ভৈরব ভূত প্রেত মাধবকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাহারা তাঁহাকে আশ্রয় দিবে, যদি তিনি একখণ্ড মাংস তাহাদিগকে বিক্রয় করেন···এমন সময় হঠাৎ একটা বিলাপ ধ্বনি··মালতীর কণ্ঠস্বর! মালতী তাহার গৃহের ছাদে শুইয়া ছিল। একজন কাপালিক তাহাকে উঠাইয়া শ্মশানে লইয়া গেল। সেখানে ভয়ানক বীভৎস দৃশ্য। সেখানে কাপালিক তাহার শিষ্যের সাহায্যে

(৫) মৃচ্ছকটিক—দ্বিতীয় অঙ্ক।

(৬) সি-য়ু-কি VII দ্রষ্টব্য।

মালতীকে কালীর নিকট বলি দিবার জন্য উদ্যত। সৌভাগ্যক্রমে মাধব সেই সময় মালতীকে রক্ষা করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল, এবং সৈন্যগণ শ্মশানভূমি বেষ্টন করিল। ঐন্দ্রজালিকদিগের প্রাণদণ্ড হইল।(৭)

এই যুগের ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

অশোকের সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ভারত শতাধিক অংশে বিভক্ত হইল। শকেরা পঞ্জাবে,—এমন কি যমুনার অববাহিকাতেও প্রতিষ্ঠিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম রূপান্তরিত হইয়া সমস্ত এসিয়াখণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইল এবং ভারত হইতে অন্তর্হিত হইল। যে শাখাজাতি গাঙ্গেয়-অধিত্যকায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই জাতি হইতে একটা সভ্যতা প্রসূত হইল,—যাহা ভারতীয় সভ্যতা নামে অভিহিত হইতে পারে। কেন না সমস্ত ভারতই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, জাতিভেদের প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিল, সাহিত্যিক শ্রেণীর মধ্যে সংস্কৃতের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, পুরাণের সহিত মহাকাব্য সমস্ত ভারতেই প্রবেশলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই সভ্যতা ক্রমে কলুষিত হইয়া পড়িল। অষ্টম শতাব্দীতে ইহার পূর্ণ অবনতি। ভারতের সমস্ত প্রান্ত-প্রদেশে, শকজাতির অভিনব জনসঙ্ঘ, হুন ও আফ্‌গান, এই মনে করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল যে, অরাজকতা তাহাদিগের হস্তে ভারতকে বিনা যুদ্ধেই সমর্পণ করিবে।(৮)

(৭) মালতীমাধব—পঞ্চম অঙ্ক।

(৮) যেসকল প্রমাণ-লেখ্যের দ্বারা, প্রথম অষ্ট শতাব্দীর ইতিহাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে, তাহা অপেক্ষাকৃত বহুসংখ্যক, কিন্তু অধিকাংশই অত্যন্ত গোলমেলে ধরণের। পুরাণে অনেকগুলি রাজবংশের বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু যেহেতু সকল পুরাণেই—এমন কি খুব আধুনিক কাল পর্য্যন্ত—নূতন সংযোজনা ও পরিবর্ত্তনের হস্তচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্য উহাদের নির্দ্দেশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। পক্ষান্তরে, যদিও অনেকগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণ-লিপি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তৎসমস্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় রাজবংশসংক্রান্ত। তারপর এখন বাকি—উৎকীর্ণ-লিপিগুলির কাল নির্দ্ধারণ করা। ভারতবাসীদিগের দুইটি প্রধান যুগ:—শক-যুগ যাহা ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং সংবৎ যাহা আমাদের আধুনিক যুগের ৫৭ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। এই যুগ বিক্রমাদিত্যের যুগ বলিয়া মিথ্যা অভিহিত হইয়া থাকে। যে বিক্রমাদিত্য রাজা সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন, তাঁহাকে খ্রীষ্টাব্দের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত করা হইয়াছে। সংবৎ মালব দেশের প্রাচীন যুগ বলিয়া মনে হয়; উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধি যখন এই প্রদেশকে ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময়ে এই যুগের গণনা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

গুপ্ত রাজাদিগের যুগ ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান রাজবংশের বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

মগধরাজ্যে, মৌর্য্যবংশ (চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ) খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩১৬ অব্দ হইতে প্রথম শতাব্দীর কিয়দংশ পর্য্যন্ত; তাহার পর অপ্রামাণিক দুই রাজবংশ—সুঙ্গবংশ ও কণ্বংশ,—আধুনিকযুগের প্রারম্ভে। তাহার পর দাক্ষিণাত্যের এক রাজবংশ—অন্ধ্র বংশ। আড়াই শতাব্দী তাঁহাদের রাজত্বকাল।

কনৌজের গুপ্তবংশ। Corpus inscriptionum Indicarum নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে M. Fleet প্রাচীন তাম্রশাসন সংক্রান্ত কাহিনী ও উৎকীর্ণ-লিপিসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই কাহিনী ও লিপিগুলি ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—এই কাল ব্যবধানের অন্তর্গত। বর্ত্তভারতের অধিকাংশ এবং প্রায়দ্বীপ ভারতেরও একাংশ যাহার অন্তর্ভুক্ত সেই গুপ্তদের সাম্রাজ্য কৃষ্ণ-হূনগণ কর্ত্তৃক পঞ্চ শতাব্দীর শেষভাগে বিধ্বস্ত হয়। পঞ্জাব ও কাশ্মীরের রাজা মিহিরকুল সম্ভবত শ্বেত-হূন্-জাতীয়। তিনি বোধহয় ৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে—৪৬৬ অব্দ হইতে মিহিরকুলের পিতা তোরামান লোকপীড়ন ও দেশজয় আরম্ভ করেন। মিহিরকুলের সঙ্গে মিহিরকুলের সাম্রাজ্য শেষ হইল। কিন্তু শুক্ল-হূনেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইল, হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিল, এবং ভারতীয় সভ্যতার রূপান্তরীকরণে কতকটা সাহায্য করিল। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে সে বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। শক কিংবা শ্বেত-হূনদিগের বিজেতা বলিয়া যিনি প্রথিত, জ্যোতির্বেত্তা বরাহমিহিরের (৫০৫—৫৮৭) শব্দকোষকার অমর সিংহের, প্রখ্যাত কালিদাসের, বৈয়াকরণ বররুচি প্রভৃতির যিনি আশ্রয়দাতা সেই বিক্রমাদিত্য ষষ্ঠশতাব্দীতে রাজত্ব করেন।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর, উত্তরভারত একাধিপত্য প্রাপ্ত হইল। অনেক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার আবির্ভাব হইল:—শিলাদিত্য (৫৫০—৫৮০) এবং দ্বিতীয় শিলাদিত্য (৬০৭ অব্দের কাছাকাছি)। হিউএন্-সিয়াংএর ভারতভ্রমণকালে দ্বিতীয় শিলাদিত্য রাজা ছিলেন। প্রায় ৬৫২ অব্দে শিলাদিত্যের মৃত্যু হয়। তার ৫০ বৎসর পরে, তাঁহার উত্তরাধিকারী যশোবর্ম্মন কাশ্মীরের রাজা কর্ত্তৃক পরাভূত হয়েন। তখন হইতে আবার ভারত-আক্রমণ আরম্ভ হইল। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে, মধ্য-এসিয়ার জনসংঘ কর্ত্তৃক উত্তর-ভারত বিজিত হইল। দুই শতাব্দী ধরিয়া ভারত তাহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। উহারা সেই সময়ে হিন্দু-সভ্যতা আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করে।

উপসংহার।

দুই সহস্র বৎসরব্যাপী ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অনুশীলন করিয়া আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি এক্ষণে তাহাই ব্যক্ত করিতেছি। গুরুত্বের হিসাবে ইহার মধ্যে দুইটি তথ্য সর্ব্বপ্রধান।

প্রথমতঃ বর্ণভেদ প্রণালীর সংগঠন। বর্ণভেদপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারত, জাতীয় একতা ও সামাজিক একতার সমস্যা সমাধান করিয়াছিল। যে সমাধানে জাতিগত প্রকৃতি ও জাতির মর্ম্ম ভাবটি প্রকাশ পায়, তাহাই

প্রত্যেক জাতির পক্ষে এইরূপ সমস্যার প্রকৃত সমাধান। গ্রীস ও রোমের যেরূপ নগর (city) ও দাসপ্রথা, চীনের যেরূপ পিতৃশাসনপ্রথা, ভারতের সেইরূপ বর্ণভেদপ্রথা; বস্তুতঃ,—দেশের জলবায়ু, দেশের আয়তন, লোকসংখ্যার পরিমাণ, শাখাজাতির বৈচিত্র্য—এই সমস্ত কারণে, অন্য কোন প্রকার সামাজিক প্রণালী ভারতের পক্ষে তখন অসম্ভব ছিল। আজিকার ন্যায় প্রাচীন ভারতে বর্ণভেদের সংখ্যাও তত বেশী ছিল না, বাঁধা-বাঁধিও ততটা ছিল না। কিন্তু এখন যেসকল বর্ণ আছে তখনও সেইসকল বর্ণ বিদ্যমান ছিল।

আপেক্ষিক উচ্চনীচতার ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত, একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শ্রেণীবন্ধন প্রণালী,—সমস্ত শাখা-জাতিকে, দেশের সমস্ত লোককে, এমন-কি বিভিন্ন জাতিকেও একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল।

আমাদের যেরূপ "ব্যবসায়-সমবায়-মণ্ডলী" ও "অন্যোন্য-সাহায্য-সমিতি"—ইহাও তদনুরূপ। কোন কু-শাসিত রাজ্যে শাসন সম্বন্ধে যে কিছু ত্রুটি হইত, অন্যায় অত্যাচার হইত, গ্রাম্য-সমাজ তাহা পূরণ করিত, তাহার প্রতি-বিধান করিত। সমাজের ব্যবস্থাই রাজবিধির স্থান অধিকার করিত।

ধর্ম্ম ও সমাজ—এই দুয়ের একাকার হইয়া গিয়াছিল। কেননা, বর্ণের ব্যবস্থাগুলিকে ধর্ম্ম, "দশসংস্কারের" মর্য্যাদা প্রদান করিত; আবার কোন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই সঙ্গে একটা নূতন বর্ণও গড়িয়া উঠিত।

কিন্তু এই বর্ণভেদ প্রণালীর মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হইলে, আর্য্য-পরিবারের গঠনপ্রণালী, আর্য্যগণের পিতৃশাসনপ্রণালী, গৃহপূজা পদ্ধতি, পিতৃপূজাপদ্ধতি কিরূপ ছিল;—বিবাহ সম্বন্ধে, পিতৃগোত্রের প্রাধান্য সম্বন্ধে, স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে আর্য্যগণের কিরূপ ধারণা ছিল—এই-সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

বর্ণভেদপ্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুশীলন করিলেই বুঝিতে পারা যায়, বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ণভেদপ্রথা রহিত করিতে কেন সমর্থ হয় নাই। যে লোকচেষ্টা হইতে প্রথম সাম্রাজ্য, হিন্দুজাতি, ও হিন্দুসভ্যতা উৎপন্ন হয়, বৌদ্ধধর্ম্মই তাহার প্রাণ বলিলেও হয়। তথাপি, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলে, অরাজকতা ও গৃহবিবাদ নিশ্চয়ই উপস্থিত হইত। বর্ণভেদপ্রথা উচ্ছিন্ন হইলে, হিন্দুজাতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে,—ভারতের এইরূপ কতকগুলি জাতিই থাকিয়া যাইত, কিন্তু এইসকল জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতি, অসমান বুদ্ধি, উল্টাধরণের রুচি ও উল্টাধরণের অভাব। বল দেখি, এই অবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা, এই বর্ণভেদপ্রথার স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইত? হিন্দুধর্ম্ম, যেমন উচ্চতম বর্ণকে তেমনি নিম্নতম বর্ণকেও আশ্রয় দেয়। রাষ্ট্রিক হিসাবে আশ্রয় দেয়—রাজার অত্যাচার প্রতিরোধ করিয়া; সামাজিক হিসাবে নীচতম ব্যক্তিকেও আশ্রয় দেয়, তাহাকে সমশ্রেণীয় লোকের সমাজ প্রদান করিয়া। আর্থিক হিসাবে আশ্রয় দেয়, প্রত্যেক বর্ণের নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়কে, সেই বর্ণের একচেটিয়া করিয়া দিয়া। সে ব্যবসায়ে আর কোন বর্ণ—এমন কি ব্রাহ্মণ ও রাজাও হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্ম বর্ণভেদপ্রথা রহিত করিয়া শূদ্র ও অস্পৃশ্য জাতির উপর প্রকৃতরূপে জয়লাভ করে নাই; পরন্তু তাহাদিগকে বর্ণভেদপ্রথার অধীনে আনিয়া, তাহাদিগকে বর্ণের সামিলে আনিয়া, তাহাদিগকে বর্ণবিশেষের স্বত্ব ও বিশেষ অধিকার প্রদান করিয়াই তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়াছিল। যে ধর্ম্ম ব্যক্তিনিষ্ঠ ও আত্মপরায়ণ সেই বৌদ্ধধর্ম্ম কেবলমাত্র আত্মমুক্তিসাধনকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে উৎসর্গ করি-বার উদ্দেশে, মানুষকে সাংসারিক জীবনের,—সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্যসকল পরিহার করিতে উপদেশ দিয়াছে। এইরূপ উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করিয়া, একটা ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইতে পারে, কিন্তু সমাজ গঠিত হইতে পারে না। ইহার বিপরীতে, হিন্দুধর্ম্ম কোন একটা বিশেষ মতকে সমাজের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয় নাই; পরন্তু হিন্দুধর্ম্মের নীতি ও হিন্দুধর্ম্মের আচার—এই উভয় একত্র মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মনিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া বর্ণভেদপ্রথা রহিত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করে, কিন্তু, "সমাজের জন্য আপনাকে বলিদান করিতে হইবে"—এই মূলসূত্রের উপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত, সেই হিন্দুসমাজে বৌদ্ধধর্ম্ম তাই বেশীদিন তিষ্ঠিতে পারে নাই।

***

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আর একটি প্রধান তথ্য—

ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর আধিপত্য। বৈদিক সময়ে, ঋষিগণ আর্য্য-জাতিকে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করিতেন, আবার শান্তির সময়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহারও উপদেশ দিতেন। আরও কিছুকাল পরে, ঋষির বংশধর ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন প্রথার নামে, আর্য্যদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন এবং কুলধর্ম্মের পুরোহিতরূপে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে, বৌদ্ধধর্ম্মের আক্রমণে ও হিন্দুধর্ম্মের সংগঠনে, ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিতিক অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া, পণ্ডিত-শ্রেণীতে পরিণত হইল। তাহাতে তাহাদের প্রভাব আরও বর্দ্ধিত হইল, কেননা, তাহারাই কেবল সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলন করিত; এবং শাস্ত্র গ্রন্থসকল তাহাদের হস্তগত থাকায়, তাহারাই ব্যবস্থাসকল প্রণয়ন করিত, ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিত, এবং তাহারাই অসমর্থ রাজাদিগের নামে রাজ্যশাসন করিত।

কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না, এই যুগের সমাজ পুরোহিত-শাসিত সমাজ। বস্তুত তখন রাজাই একমাত্র প্রভু—রাজারই যথেচ্ছাচার প্রভুত্ব। তবে, প্রত্যেক বর্ণেরই কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ অধিকার ছিল। ব্রাহ্মণের বিশেষ-অধিকার সম্বন্ধে মনু অবগত ছিলেন, কিন্তু সমাজ অবগত ছিল না; কেননা, মৃচ্ছকটিক নাটকে দেখা যায়, একজন বেশ্যাকে হত্যা করিবার অভিযোগে একজন ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হয়। সকল নাটকেই রাজার বিদূষক একজন ব্রাহ্মণ—এমনকি, উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণের অসীম প্রভুত্ব; সে প্রভুত্ব আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই হিন্দুসমাজকে বিদলিত করিয়া ব্রাহ্মণকে বিদলিত করে।

অজ্ঞ রাজারা সন্দিগ্ধ মন্ত্রিগণ কর্তৃক প্রভুত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখে আসক্ত হইল। উত্তরাধিকারী লাভের আশায় তাহাদিগকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে হইল। ষড়যন্ত্র ও স্ত্রীলোকদিগের কুচক্র বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অষ্টম শতাব্দীতে, ভারতের সিংহাসন শকদিগের, দ্রাবিড়ীয়দিগের অথবা নীচবর্ণ দুঃসাহসিকদিগের হস্তগত হইল।

তখন আর ক্ষত্রিয় ছিল না, জাতকে বর্ণিত পরাক্রান্ত শেঠ, গহপতি, বণিক, শিল্পিকর প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর লোকেরাও অন্তর্হিত হইয়াছিল। বাল্যবিবাহ হইতে কতকগুলা অপভ্রংশ উৎপন্ন হইতে লাগিল। বর্ণগণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া, রাজা কর্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, অপরিমিত দানে উচ্ছন্ন হইয়া, বণিকের মধ্যে অনেকেই আবার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়িল; আর কতকগুলি লোক কামসূত্রে পরিকীর্ত্তিত লাম্পট্যসুখসম্ভোগে স্বকীয় বীর্য্য ক্ষয় করিতে লাগিল।

যখন এই সকল সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী বংশসমূহ বিলুপ্তপ্রায়, তখনও ব্রাহ্মণশ্রেণী টিকিয়াছিল; তাহার কারণ, ব্রাহ্মণেরা সংখ্যায় অধিক ছিল, তাহারা উপশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইতরসাধারণ হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হইত না। কালক্রমে, এই নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা নিঃশেষিত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের স্থান অধিকার করিল।

কিন্তু শোণিতসংস্রব নবীকৃত হইলেও, মর্ম্মভাবটি ঠিক্ তেমনিই রহিয়া গেল। ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, দর্শন ও বিজ্ঞানের গতিরোধ করিল। ধর্ম্মপদ্ধতি—রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক ও সামাজিক উন্নতির গতিরোধ করিল। কলাবিদ্যা সূত্রনিয়মের মধ্যে বদ্ধ হইল এবং সাহিত্য, পূর্ব্বেকার সরল ও উদার রচনার স্থানে, জটিল ধরণের ছন্দ ও কষ্টকল্পিত শ্লেষবাক্যসকল স্থাপন করিয়া ক্রমাগত একই রকমের বিষয় নির্ব্বাচন করিতে লাগিল। শিক্ষা কেবল স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি করিতে লাগিল, এবং স্মৃতিশক্তি কেবল শব্দরাশি প্রসব করিতে লাগিল। দার্শনিক শঙ্করের মৃত্যুর পরে (৭৮৮—৮১৮) ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে উল্লেখযোগ্য অল্প গ্রন্থই প্রসূত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ইতরসাধারণকে শিক্ষাদান করিতে নিষেধ করায়, তাহার সেই অহংকারই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবনতির অনিবার্য্য কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

***

ভারতীয় সভ্যতার এই প্রথম অবস্থায়,—আধুনিক বিজ্ঞান অবশ্য এমন একটি সামাজিক অবস্থার আভাস পাইবে, যে অবস্থায়, সামাজিক গঠন ও তাহার অবয়ব সমূহের স্বতন্ত্র ক্রিয়া—এই উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। স্পেন্সারের তুলনাটি যদি এই ক্ষেত্রে

প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, এই সমাজ এমন-একটি শরীর, যাহার পোষণ-যন্ত্রগুলি পরিপুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু যাহার স্নায়ু-তন্ত্র তখনও অসম্পূর্ণ। কীটের ন্যায়, এইরূপ শরীরের ছিন্ন অংশগুলি আবার পুনর্জীবিত হয় এবং স্বাধীনভাবে জীবন-ক্রিয়া সম্পাদন করে। বর্ণ-ভেদতন্ত্র, রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদানগুলিকে পাশা-পাশি আনিয়াছিল, উহাদিগকে মিশাইয়া ফেলিতে পারে নাই; উহা সম্মিলন মাত্র—সংমিশ্রণ নহে।(৯)

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৯) পরিবার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি, স্বত্বাধিকার, ভারতীয় পারিবারিক মণ্ডলী, উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা, পিতৃ-প্রভুত্ব, এই সমস্ত বিষয়ের অনুশীলন করিতে হইলে, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য; দ্বিতীয় খণ্ডে আমি সমাজের অবস্থা ব্যাখ্যা করিবার সঙ্গে সঙ্গে, যে সব প্রতিষ্ঠান সমাজকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, সেই সব প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশও প্রদর্শন করিয়াছি।

বসন্তে কাননরাণী

দাঁড়ায়েছে কাননরাণী নদীর তটে, আলোকে,
মূরছিছে ঢেউগুলি তার চরণতলে পুলকে।
ঝিকমিকান নয়নহরা,
কিসলয়ের বসন পরা,
পরশে তার শিউরে ধরা,—মঞ্জরী;—ফুল, মুকুলে।,
হরষ তাহার অশোক চাঁপায়, বাসনা তার বকুলে।

অঙ্গে তাহার উর্ণনাভের স্বর্ণ জালের ওড়না;
হাস্য, যেন রক্ত শিলায় কুন্দ ফুলের ঝরণা।
কল্পতরু সজ্জা দিয়ে,
থাক্‌লো শুধু লজ্জা নিয়ে।
অগুরুরস, মৃগমদের গন্ধ ছুটে তনুতে,
লক্ষ কোটি জোনাক জ্বলে নখের প্রতি অণুতে।

খঞ্জনেতে কটাক্ষ তার, চায় সে মৃগনয়ানে।
অঞ্জনেতে সুপ্ত অলি,—গুঞ্জন নাই বয়ানে।
দৃষ্টিতে তার সৃষ্টি করা,
ময়ূরবধূ,—নৃত্যপরা,
নিশ্বাসে তার বাতাস ভরা, ফুলের মধু রেণুতে
কয় সে কথা পাখীর গানে, গায় সে যে গান বেণুতে।

উল্লসিত বল্লীবিতান ঘুরছে ছায়া বিতরি,
ঝিল্লী নূপুর বাজে পায়ে আকাশ-বাতাস মুখরি।
শুক্‌নো পাতা মুরমুরিয়ে
পায়ে পায়ে যায় গুঁড়িয়ে,
ঢেলে মধু ঝরঝরিয়ে, আঁচল রহে লুটিতে
ঝুমকো লতার মেখলাটি খসে' পড়ে কটিতে।

ব্যাঘ্র চাটে পা দুখানি, সর্প পড়ে' চরণে।
করীকরভ করে সেবা কমল উপহরণে।
মুগ্ধ করি বীণার স্বরে
সিংহে আনে কেশর ধরে,'
তমাল ঝাউয়ের অন্ধকারে, ছড়িয়ে দিয়ে চিকুরে,
কাননরাণী দেখ্‌ছে বদন নদীজলের মুকুরে।

শ্রীকালিদাস রায়।

পিতৃস্মৃতি

(২)

পিতৃদেবের স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। একবার তাঁহার কাছে শুনিয়াছিলাম শিশু অবস্থায় মার কোলে শুইয়া তিনি ঝিনুকে করিয়া দুধ খাইতেছেন সে কথাও তাঁর অল্প অল্প মনে পড়ে। তাঁহার বালককালের একটি ঘটনা তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন,—"তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয় বৎসর হইবে। ঠাকুরঘরে গিয়া দেখি, ঘরে কেহই নাই, সিংহাসনের উপর শালগ্রাম ঠাকুর। আমি সেই শিলাটিকে আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া মাটিতে গড়াইয়া মনের আনন্দে খেলা করিতেছি—ওদিকে পূজারি ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখে যে, সিংহাসনে ঠাকুর নাই। ঠাকুর কে লইল বলিয়া মহা হুলস্থুল বাধিয়া গেছে; চারিদিকে খোঁজ্ খোঁজ্ করিতে করিতে একজন আসিয়া দেখে যে আমি তাহা লইয়া নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতেছি। বাড়ির মেয়েরা সব ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, দেবেন্দ্র এ কি সর্ব্বনাশ—ঠাকুরকে লইয়া খেলা! কি মহা বিপদই না জানি ঘটিবে! পুনর্ব্বার অভিষেক করিয়া ঠাকুরকে সিংহাসনে স্থাপিত করা হইল। তাহার

পরে যাহাতে আমার কোনো অনিষ্ট না হয় সেজন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ধুম পড়িয়া গেল।"

অল্পবয়সে পিতা একবার সরস্বতী পূজা করিয়াছিলেন। কি কারণে পিতামহ তখন বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। সেই পূজায় পিতা এত প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া সমারোহ করিয়াছিলেন যে সেই পার্ব্বণে সহরে গাঁদাফুল ও সন্দেশ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিমাও এত প্রকাণ্ড হইয়াছিল যে বিসর্জ্জনের সময় নানা কৌশলে তাহা বাড়ি হইতে বাহির করিতে হয়। শুনিয়াছি পূজায় এরূপ অতিরিক্ত ব্যয় পিতামহের সন্তোষজনক হয় নাই।

পিতামহের আমলে দুর্গোৎসব যেমন আমাদের বাড়ির সামাজিক আনন্দোৎসব ছিল এবং এই উৎসব যেমন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত, পিতার ইচ্ছা ছিল মাঘোৎসবকে তিনি সেইরূপ আমাদের বাড়ির অবারিত আনন্দ-সম্মিলনের মত করিয়া তুলিবেন। যখন তাঁহার হাতে এই উৎসবের ভার ছিল তখন মাঘমাসের প্রথমদিন হইতেই কাজকর্ম্ম আরম্ভ হইত; —ভৃত্যেরা কাপড় পাইত, পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজনদিগকে কাপড় দেওয়া হইত, কাঙ্গালীবিদায়েরও বিশেষ আয়োজন হইত। পূর্ব্বে পূজার সময়ে যেরূপ বৃহদাকারের মেঠাই তৈরি হইত এগারই মাঘেও সেইরূপ মেঠাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। সেই বড় বড় মেঠাইয়ের স্তূপ সকালবেলা হইতে বাহিরের ঘরে টেবিলের উপর সাজানো থাকিত; যাঁহার যখন ইচ্ছা খাইতেন — কোনো বাধা ছিল না। একবার উৎসবের দিন ব্রাহ্ম-সমাজগৃহে প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ করিয়া আসিয়া তাঁহার এক জামাতা এই মিষ্টান্নরাশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া "বাঃ, কেয়াবাৎহ্যায়" বলিয়া মনের উচ্ছ্বাস যেমনি প্রবল কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন, অমনি দেখিলেন সম্মুখে পিতা আসিয়া তাঁহার সেই আনন্দ-আবেগে হাস্য করিতেছেন। তিনি ত লজ্জায় মাটি হইয়া গেলেন। উৎসবের রাত্রিতেও আহারের আয়োজন অবারিত ছিল-- যে যখনই আসিত আহার করিতে বসিয়া যাইত।

পয়লা বৈশাখে বর্ষারম্ভের উপাসনার পর আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া গিনি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। সেদিন দুপুরবেলায় বাদামের কুল্‌পির বরফ তৈরি করাইয়া আমাদের জন্য পাঠাইয়া দিতেন, আমরা তাহা সকলে আনন্দে ভাগ করিয়া খাইতাম। ১লা বৈশাখে প্রথম অরুণোদয়ে প্রত্যূষের নির্ম্মল স্নিগ্ধতার মধ্যে মধুর গানে ও পিতৃদেবের হৃদয়গ্রাহী উপদেশে আমাদের সকলের মন আরাধনার ভক্তিরসে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত— আজ মনে হয় যেন সেই এক পবিত্র সত্যযুগ চলিয়া গিয়াছে।

যখন পিতা বক্রোটায় ছিলেন, তখন মনে আছে তিনি মাকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন--দেখ, ছোটকাকা আমাকে পত্র দিয়াছেন তুমি আর দেশ ছাড়িয়া কতদিন পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইবে—বাড়িতে আসিয়া বড়লোকের ছেলেদের মত দশ পাঁচটি মোসাহেব রাখিয়া পাঁচজনকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে দিনযাপন কর— আত্মীয় বন্ধু ছাড়িয়া তুমি একলাটি কি করিয়া জীবন কাটাইতেছ!--তাঁহার ছোটকাকা মনেও করিতে পারিতেন না, নিজের মন ভোলাইবার ও দিন কাটাইবার জন্য তাঁহাকে একমুহূর্ত্তকালও পাঁচজনের মুখাপেক্ষা করিতে হইত না।

পীড়ার সময় যখন তাঁহাকে ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছিল তখন একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "এ ডাক্তার আমার কি করিবে, আমার যিনি ডাক্তার তিনি সর্ব্বদা আমার কাছে কাছেই থাকেন। আমি যখন একবার কাশ্মীরে পাহাড়-ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলাম তখন আমার শরীর ভাল ছিল না। আমার প্রবাসের বন্ধুরা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বলিয়া গেলেন, এখন আপনার বাহির হওয়া উচিত হইবে না—আগে শরীর সুস্থ হউক তাহার পরে যেমন ইচ্ছা করিবেন। আমি তাঁহাদের কাহারও বারণ শুনিলাম না। ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছি, কোথায় যাইব এবং কোথায় থাকিব তাহার কোনো ঠিকানা নাই। চাকরদের বলিয়া দিলাম তোরা যেখানে পাস একটা কোনো আশ্রয় ঠিক করিয়া রাখ্। তাহারা একটা ভাঙাবাড়ি খালি পাইয়াছিল। সেখানে একটা খাটিয়া পড়িয়া ছিল তাহারই উপরে তাহারা আমার বিছানা করিয়া

রাখিয়াছিল। সেইখানে গিয়া আমি ত শুইয়া পড়িলাম। একে শরীর অসুস্থ, পথে কিছুই আহার করি নাই, তাহার পরে ঝাঁকানি; ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতায় আমাকে যেন একেবারে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। আমি খাটিয়ায় শুইয়া চোখ বুজিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল আমি যেন কাহার কোলের উপর শুইয়া আছি—আমার বড়ই আরাম। সকালে উঠিয়া চাকরদের বলিলাম, চেষ্টা করিয়া দেখ্ যদি কোথাও একটু দুধ পাওয়া যায়। তাহারা দুইজনে ঘটী লইয়া দুধের-সন্ধানে বাহির হইল। কিছুদূর যাইতেই দেখে একটা গাভী আসিতেছে। সেই গাভীটাকে একজন ধরিল ও আর একজন তাহার দুধ দুইয়া লইল। সেই দুধটুকু খাইয়া মনে হইল যেন আমার জীবন ফিরিয়া আসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আমি সারিয়া উঠিলাম এবং শরীরে বল পাইলাম। নিজের ঘরে গোরু পুষিলাম- সেই গোরু রোজ দশসের দুধ দিত। সেই দুধ ও তাহার ঘি মাখন খাইয়া এবং খুব করিয়া বেড়াইয়া আমি একেবারে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। সেখানে আমার ডাক্তার কবিরাজ কে ছিল! কেবা আমার এই দুধের পথ্য জোগাইয়া দিল!

পার্ক ষ্ট্রীটে যেদিন আমরা সকল ভাইবোনে মিলিয়া পিতার জন্মোৎসব করিতাম সেদিন আমাদের বড়ই আনন্দের দিন ছিল। সেদিন পরিবারের সকলেই একত্র হইতেন। তিনি মাঝখানে চৌকিতে বসিতেন আমরা সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতাম--বড়দাদা সময়োচিত কিছু একটা লিখিয়া পাঠ করিতেন, রবি গান করিত। তিনি ফুল বড় ভালবাসিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ফুলের তোড়া ফুলের সাজি আনিয়া উপহার দিত—আমরা ফুল দিয়া তাঁহার সমস্ত ঘরটি সাজাইয়া দিতাম। ছেলেমেয়ে জামাতা বধূ দৌহিত্র পৌত্র সকলে মিলিয়া তাঁহার কল্যাণকামনা করিতেছে এত বড় মঙ্গলের সাজিভরা আনন্দ-উপহার সুদীর্ঘজীবনের সন্ধ্যাকালে কয়জন লোকের ভাগ্যে ঘটে! আমাদের সেই আনন্দের দিন আর ফিরিয়া আসিবে না, সেই পবিত্র সৌম্য মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইব না!

শ্রীসৌদামিনী দেবী।

বসন্তের আহ্বান

১

বসন্ত-পরশে আজি সরস ভুবন।
দুলায়ে পল্লবদল,
লুটি' পুষ্প-পরিমল,
জাগাইছে বনানীরে দুরন্ত পবন।
জলে স্থলে নভস্তলে
পুলক উছলি' চলে,
প্রকৃতি চঞ্চল—লভি' নবীন যৌবন।
চূত-মুকুলের গন্ধে
মত্ত পিক, কুহুছন্দে
ধ্বনিছে কাননচ্ছায়ে বসন্তবোধন।

২

বসন্ত দাঁড়ায়ে দ্বারে করিছে আহ্বান:—
হেন শোভাময়ী ধরা
আনন্দ উচ্ছ্বাস-ভরা,
চারি ধারে এত আলো—এত হর্ষ-গান,
লয়ে শুধু আপনার
ক্ষুদ্র তুচ্ছ দুখভার
কে আজি গৃহের কোণে আছে ম্রিয়মাণ!
উচ্ছ্বসিত যবে সিন্ধু
স্থির কোথা নীর-বিন্দু!
নিখিল আনন্দ-স্রোতে মিশাও পরাণ।

৩

সুনীল আকাশতলে—বিশ্বের সভায়—
এস এ উৎসব মাঝে
তরুণ উজ্জ্বল সাজে,
লাবণ্যে ভরিয়া উঠি' লতিকার প্রায়।
ফুটে উঠ অনুপম
বসন্ত-কুসুম সম,
আনন্দ-কিরণ-স্পর্শে—নির্ম্মল শোভায়।
বিহগের সমতানে
গাহ আজি ফুল্লপ্রাণে,
প্লাবিত করিয়া দিক্ সঙ্গীত-সুধায়।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

প্রবাসী বাঙ্গালী

স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোয়ালিয়র প্রদেশবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে মণীন্দ্রনাথের নাম জানেন না এমন লোক অতি বিরল। ইঁহার পিতা ৺রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহী-বিদ্রোহের দশ বৎসর পূর্ব্বে, সহায়-সম্বল-হীন অবস্থায়, গোয়ালিয়রে নিজ সহোদরের বাসায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ক্রমে উপার্জ্জনের পথ করিয়া এই স্থানেই বসবাস আরম্ভ করেন। মণীন্দ্রনাথ ইঁহার মধ্যম পুত্র। তখন এখানে ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ সুবিধা না থাকায় মণীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে আগ্রায় পাঠাভ্যাস করেন। কিন্তু পিতা নিজের শারীরিক অসুস্থতা ও তজ্জনিত অক্ষমতা নিবন্ধন আপনার সহায়স্বরূপ মেধাবী মণীন্দ্রনাথকে পড়া ছাড়াইয়া নিজের কণ্ট্রাক্টারী কার্য্যে ব্রতী করাইলেন। তখন মণীন্দ্রনাথ মাত্র ষোড়শবর্ষীয় বালক। তাঁহার পিতা অচিরেই দেহত্যাগ করিলেন। এই বয়সে প্রকাণ্ড সংসার, কতকগুলি ভাই ভগ্নী ইত্যাদি এক রকম মণীন্দ্রনাথেরই ঘাড়ে পড়িল, অধিকন্তু পিতা মৃত্যুকালে অল্পবিস্তর ঋণও রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মণীন্দ্রনাথের তরুণবক্ষে অসাধারণ সাহস ছিল, তিনি একবিন্দুও দমিলেন না, অসহায়ের ভগবান সহায়—একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। ক্রমে মণীন্দ্রনাথের সবই হইল; এবং প্রভূত অর্থ-সম্পত্তি, প্রদেশ-ব্যাপী খ্যাতি-প্রতিপত্তি, অট্টালিকা বাড়ী ইত্যাদি পশ্চাতে রাখিয়া মণীন্দ্রনাথ আজ অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। বিগত আষাঢ় মাসে ৪৫ বৎসর বয়সে মণীন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে।

মণীন্দ্রনাথ আর নাই, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের সদ্‌গুণের কথা আজ বহু নর নারীর মনে জাগিতেছে, এবং যতদিন তাঁহারা জীবিত থাকিবেন ততদিন জাগিবে। ইতিপূর্ব্বে পশ্চিমে আসিয়া অনেক বাঙ্গালীই অর্থোপার্জ্জন ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, ইহাতে বড় কিছু বিশেষত্ব নাই। কিন্তু মণীন্দ্রনাথের এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জীবনে বেশ একটু বিশেষত্ব ছিল।

স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথমতঃ তাঁহার নৈতিক চরিত্র। অল্প বয়স হইতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, অটুট স্বাস্থ্য, যদৃচ্ছা অর্থোপার্জ্জন সত্ত্বেও মণীন্দ্রনাথ আজীবন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন; সমস্তদিন দুএকটী তাম্বূল ও দুচারটী চুরুটের বেশী সেবন করিতে মণীন্দ্রনাথকে কেহ কখনও দেখেন নাই। তারপর অক্লান্ত পরিশ্রম। রাত্রি ৪টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত অনাহারে অশ্রান্তভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া নিজের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন, কোন কোন সময়ে অনাহারেই হয়তো দিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এত পরিশ্রমের পর যখন বাড়ী আসিয়া গাড়ী হইতে নামিতেন, তখন সেই প্রশান্ত সেই প্রফুল্ল মুখ,—যেন গাড়ী করিয়া হাওয়া খাইয়া আসিলেন। চিত্তের এরূপ স্থিতিস্থাপকতা কয়জনে দৃষ্ট হয়? কোনও শারীরিক তীব্র যাতনাদায়ক পীড়ার সময়েও তাঁহার চিত্তের এই ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা আমরা দেখিয়াছি।

সর্ব্বোপরি তাঁহার দান ও অতিথিসেবা। কত দীন দুঃখীকে যে মণীন্দ্রনাথ মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছেন তাহার অন্ত নাই, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিত,

বাম হস্ত তাহা জানিতে পারিত না, পকেটে সর্ব্বদাই দুচার শত টাকা রাখিতেন। এমন দিন ছিল না যেদিন বাড়ীতে অতিথি নাই। ষ্টেসনে প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার গাড়ী উপস্থিত থাকিত, এবং বিদেশী বাঙ্গালী দেখিলেই সাদরে আপনার ভবনে আহ্বান করিয়া আনিতেন। মণীন্দ্রনাথের সাদর আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই এরূপ বাঙ্গালী পরিব্রাজক এখানে অল্পই আসিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে তাঁহার অমায়িকতা, স্নেহপরায়ণতা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতা। আপনার কার্য্যসংশ্লিষ্ট প্রবঞ্চক লোকের প্রবঞ্চনা-ব্যবহারের বিরুদ্ধে ভিন্ন তাঁহাকে কখনও কাহারও সহিত রূঢ় ব্যবহার করিতে কেহ দেখে নাই, ক্ষুদ্র কুলী হইতে উচ্চপদস্থ বন্ধু বান্ধব পর্য্যন্ত কাহারও মণীন্দ্রনাথের ব্যবহারের বিরুদ্ধে একদিনের তরেও কোনও অনুযোগ ছিল না। এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেকের সহিত সর্ব্বদাই সস্নেহে আলাপ করিতেন, অথচ প্রত্যেকে তাঁহাকে সম্মানমিশ্রিত ভয়ের চক্ষে দেখিত। মণীন্দ্রনাথের চক্ষে যেন সব কর্ত্তব্যেরই এক ওজন ছিল। তিনি বলিতেন, "একখানা পোষ্টকার্ডের জবাব দেওয়া বাকি থাকিলে রাত্রে আমার ঘুম হয় না।"

আর একটী কথা,—যদিও এদেশে জন্ম, এবং বঙ্গদেশের সহিত প্রায় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন, তথাপি মণীন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতেন না তিনি "বাঙ্গালীর ছেলে।" যাহাতে বাঙ্গালা দেশের আচার ব্যবহার সংসারে অটুট থাকে তৎপ্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল, বরাবর বাড়ীতে বাঙ্গালী মাষ্টার রাখিয়া বালকবালিকাদিগকে—এবং বিশেষ ভাবে বালিকাদিগকে—বাংলা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতেন, যদিও বাংলা না শিখিলে এখানে তিলার্দ্ধও ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি ছেলেরা আপোষে একটু হিন্দী কথা বলিলে তখনই ধমকাইতেন। এতৎপ্রদেশবাসী বাঙ্গালী-বিরল স্থানের বাঙ্গালীর মুখের বাংলা গ্রামোফোনে তুলিয়া বাঙ্গালা দেশের লোককে শুনাইবার উপযুক্ত।

শ্রীঅচলনন্দিনী দেবী।

স্বর্গীয় সর্ব্বেশ্বর মিত্র।

৺সর্ব্বেশ্বর মিত্র নদিয়া জিলার অন্তর্গত উখড়া পরগণাস্থিত বড়-জাগুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় প্রবাসেই অতিবাহিত হয়। একাদিক্রমে প্রায় ৩০ বৎসর কাল তিনি প্রয়াগে বাস করেন। তিনি সামান্য পদস্থিত হইলেও চরিত্রবলে নগরে সকলের নিকট পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। তিনি তথাকার হাইকোর্টের আফিসে চাকুরী করিতেন।

১৮৮২ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। পরে আর তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। বঙ্গবাসী ও সঞ্জীবনী পত্রদ্বয়ের তিনি নিয়মিত সংবাদদাতা ছিলেন। সংবাদপত্রের জন্য লিখিয়া অবসর পাইলে অসমর্থ বন্ধু-বান্ধবদিগের বালকদিগের পাঠাভ্যাসে সহায়তা করিতেন। কাহারও কাহারও বিদ্যালয়ের বেতন পর্য্যন্ত দিতেন। তদ্ব্যতীত বৎসরের পর বৎসর প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা কাল দীন ও দরিদ্রদিগকে সযত্নে চিকিৎসা করিতেন ও বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়া কাহাকে কাহাকেও তাহাদিগের দুরারোগ্য ব্যারাম হইতে আরোগ্য করিয়াছেন।

প্রয়াগের বাঙ্গালী বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের হিতকল্পে তিনি অনেক চেষ্টা করিতেন ও অর্থ দিয়া উক্ত বিদ্যালয়দ্বয়কে বিশেষ সাহায্যও করিতে দেখা গিয়াছে।

সর্ব্বেশ্বর বাবু একজন প্রকৃত আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার মিতব্যয়িতা ও সত্যপ্রিয়তা আদর্শ ও তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ও পবিত্র ছিল।

সামান্য কেরাণী হইয়াও মিতব্যয়িতাগুণে যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশ পরহিতার্থে উইল করিয়া দান করিয়া গিয়াছেন। উইলখানি পড়িলে তিনি যে একজন সহৃদয় বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ গণিতে বা ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকারীকে বাৎসরিক একটি স্বর্ণপদক দিবার জন্য ১৫০০৲ শত টাকা ও কলিকাতার মূক ও বধির বিদ্যালয়ে ৩০০৲ শত টাকা ও প্রয়াগের হিন্দু-অনাথাশ্রমে ৩০০৲ শত টাকা
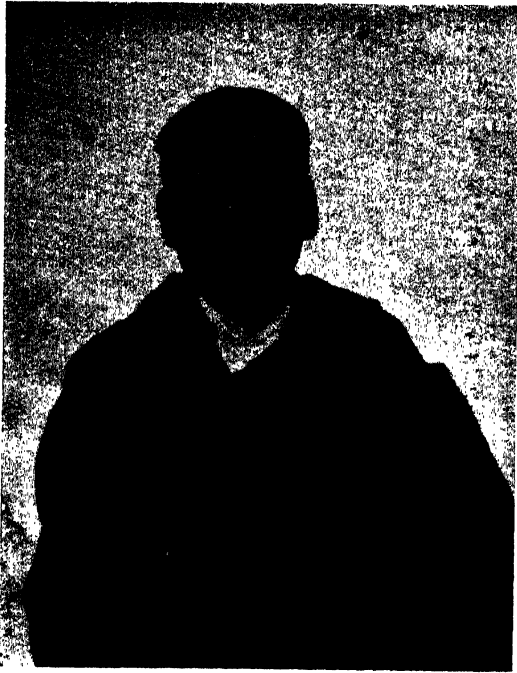
স্বর্গীয় সর্ব্বেশ্বর মিত্র।

দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রয়াগের অনাথ ও আতুরদিগকে কম্বল ও চাদর বিতরণ করিবার জন্য ও তাহাদিগকে একদিন ভোজন করাইবার জন্য অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। একটি আত্মীয় যুবকের লেখাপড়ার ব্যয়ের জন্য ৩০০৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন। এক কাশী-বাসিনী বিধবা ভগ্নীর সাহায্যার্থ ১০০৲ শত টাকা দিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বেশ্বর বাবু নিজ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য ও উইলের প্রোবেট লইবার জন্যও যথোচিত অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। এমন কি তাঁহার পীড়িতাবস্থায় যাঁহারা তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাঁহাদের প্রত্যেককে তিনি ২৫৲ টাকা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি একটি অসমর্থ বন্ধুর দুইটি কন্যার নিজ ব্যয়ে বিবাহ দিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বেশ্বর বাবুর ১৯১০ সালে ১৩ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিবস মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার উইল লইয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে মোকদ্দমা হওয়ায় এতাবৎকাল তাঁহার উইলের একজিকিউটর তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

ভারতীয় নাবিক

ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভারতীয় নাবিক-গণই সর্ব্বাপেক্ষা উপেক্ষিত হয় এবং অনেকেই তাহাদের সম্বন্ধে খুব কম খবর রাখেন। ইংরাজদিগের বাণিজ্যে ভার-তীয় নাবিকগণ অনেক সাহায্য করে, কিন্তু কি করিলে তাহাদিগের উন্নতি হয় সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও লক্ষ্য করেন না। "পি এণ্ড ও" এবং "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" কোম্পানীর জাহাজ সমূহ ভারতে আসা অবধি ভারতীয় নাবিকের আদর হইয়াছে এবং কখন কখন এমন দেখা যায় যে তাহাদিগের যে পরিমাণে খালাসীর আবশ্যক তাহারা সেই পরিমাণে পাইয়া উঠে না। খালাসিগণ সবই মুসলমান এবং তাহারা সাধারণতঃ বোম্বাই, কলিকাতা অথবা চট্টগ্রামের অধিবাসী। সময় সময় দুই একজন পশ্চিম অঞ্চলের লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় জাহাজের খালাসিগণ ও সারেঙ্গ একই জায়গার লোক। তাহারা ঐ সারেঙ্গের অধীনে এক সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করে এবং এইরূপে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করার সুবিধা পায় বলিয়া তাহারা ইউরোপীয় খালাসী অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। তাহারা কোনরূপ নেশার বশীভূত নহে। রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়, তুফান ইত্যাদি সকল অবস্থায়ই আদেশানুসারে কার্য্য করে এবং এ বিষয়ে তাহাদিগের সহযোগী ইউরোপীয় খালাসিগণ অপেক্ষা অনেক গুণে উন্নত। কিন্তু তাহাদিগের বিদ্যার অভাব, সেই কারণে তাহাদের উপযুক্ত চালকের আবশ্যক। উত্তম রূপে শিক্ষা দিলে তাহাদিগকে যে-কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যাক তাহারা তাহার উপযুক্ত হইতে পারে।

অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে শীতপ্রধান সাগরে ভারতীয় খালাসিগণ কাজ করিতে পারে না। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ তাহা হইলে তাহারা "পি এণ্ড ও" এবং "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" কোম্পানীর অধীনে ঐ সমস্ত সাগরে

কেমন করিয়া কাজ করিতেছে। ইঞ্জিনে, কয়লার ডিপুতে, ডেকে, স্যালুনে ও বাবুরচিখানায় অল্প খরচে উহাদিগের দ্বারা যেমন কাজ হয় ইউরোপীয় খালাসিগণের দ্বারা সেরূপ হয় না; কারণ তাহারা অনেক সময়ে নেশার বশীভূত থাকে ও অবাধ্যতার লক্ষণ প্রকাশ করে। এই কারণেই পি এণ্ড ও, বৃটিশ ইণ্ডিয়া, এন্‌কার, এলারম্যান, সিটী, বি বি, ক্ল্যান এবং অন্যান্য অনেক লাইনে ভারতীয় লস্করগণের এত আদর। প্রায় ৭৮০০০ হাজার খালাসী ইংরাজদিগের বাণিজ্য জাহাজে চাকরী করিতেছে। কিসে তাহাদের উন্নতি হয় সে বিষয় লক্ষ করা ব্রিটনদিগের কি কর্ত্তব্য কার্য্য নহে? ভাই, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, ঘর-বাড়ী সমস্ত ছাড়িয়া "সাত সমুদ্র তের নদী" পার হইয়া তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তথায় কি তাহাদের একটা আশ্রম থাকা উচিত নহে? অবশ্য ভিক্টোরিয়া ডক এবং টিলবারী ডকে এ সম্বন্ধে প্রথম উদ্যোগ দৃষ্ট হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে ইংলণ্ডের অন্যান্য প্রধান প্রধান বন্দরে তাহাদিগের জন্য আশ্রমস্থান নির্ম্মিত হইবে। যে সমস্ত খালাসি লণ্ডনে যায় তাহারা ডকের নিকটস্থ লণ্ডনের খারাপ জায়গাটুকু দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং সেই জন্য তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া বলে যে লণ্ডন কোন একটা জায়গাই না। যদি তাহাদের আশ্রমস্থান থাকে তবে তাহারা পরিচালক কিম্বা অন্য কোন লোকের সাহায্যে উপযুক্ত স্থানসমূহ দর্শন করিতে পারে এবং যে অবস্থায় ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছিল তদপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। ইংরাজেরা ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাহাদিগের জন্য বড় বড় বন্দরে আশ্রম নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য এবং এরূপ হইলে উভয়ের পক্ষেই লাভের বিষয় হইবে।

এইসমস্ত খালাসীর মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর, তজ্জন্য তাহাদিগের জীবনে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক ঘটনা ঘটিতেছে সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। এই কারণে আমাদিগের শিক্ষিত লোকের সমুদ্রের দিকে যাওয়ার কোন রকম ইচ্ছা নাই। যদি তাঁহারা ঐ দিকে চেষ্টা করেন তবে তাঁহাদিগের মধ্যে কি কেহই ক্যাপটেন্ ম্যারিয়টের মতন হইতে পারেন না এবং অন্যান্য শিক্ষিত যুবকদিগকে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত করিতে পারেন না? আশা করি আমাদিগের নব্য শিক্ষিত স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতৃগণ এই কার্য্যের দিকে অগ্রসর হইবেন, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা একটি শিক্ষিত নাবিক-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইবেন এবং পৃথিবীর যে-কোন দেশে যাইবেন সকলেই জানিতে পারিবে যে সাগরে চলিবার উপযুক্ত অন্তত দুই চারি জন লোকও ভারতবর্ষে আছে।

সার রিচার্ড টেম্পল্ বলিয়াছেন যে কালে যদি ইংরাজদিগের যুদ্ধজাহাজ সমূহে ভারতবর্ষীয় লোককে লওয়া হয় তবে বোম্বাই, কলিকাতা ও চট্টগ্রামের মুসলমানগণই ঐ কার্য্যের উপযুক্ত হইবে। এইসমস্ত খালাসিরাও মনে মনে গর্ব্ব করে যে তাহারা ইংরাজদিগের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন জাতির সমকক্ষ। দেশীয় খালাসি ও ইংরাজ খালাসিদিগকে এক জাহাজে পাশাপাশি হইয়া ভাই ভাই মত কাজ করিতে দেখিয়া মনে যে কত আহ্লাদ হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আইনানুসারে খালাসিদিগকে খাইতে পরিতে দেওয়া হয় বলিয়াই তাহারা নিজেদের অদৃষ্টের উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং কোন প্রকার অসন্তুষ্টতার লক্ষণ প্রকাশ করে না। ভারতবর্ষস্থ ইংরাজগণের ভারতবাসীর প্রতি ব্যবহার ও সাগর মধ্যস্থ ভারতীয় ও ইংরাজ খালাসীদিগের ভ্রাতৃভাব তুলনা করিলে কি পার্থক্য অনুভব করা যায় তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন। ভারতবাসীর যে সাহস বিক্রম আছে তাহা অনেক জাহাজডুবির সময় ভারতীয় নাবিকগণের দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে যদি তাহাদিগকে ভারত মহাসাগরে নৌসেনা বিভাগে নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে তাহারা প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতে পারিবে।

ইংলণ্ড ভিন্ন অন্যান্য দেশীয় বাণিজ্য জাহাজেও ভারতীয় খালাসিগণ কাজ করে এবং বিদেশীয় অনেক কোম্পানী এখন তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, কারণ ভারতীয় খালাসিগণ কার্য্যক্ষম এবং অল্প বেতনেই সন্তুষ্ট। আমাদের ভারতীয় লোকের চেষ্টায় তাহাদের জন্য বোম্বাই, কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুনে

আশ্রম প্রস্তুত করা উচিত। ইংলণ্ডে ডাক্তার পোলেন এবং মিঃ চ্যালিস্ এবিষয়ে খুব যত্ন করিতেছেন এবং আমরা আশা করি আমাদের স্বদেশবাসিগণ বৃদ্ধ ও পীড়িত নাবিকদিগের জন্য ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বন্দরে আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করিবেন। এই সম্বন্ধে আমরা ইংলণ্ডের নিকট হইতে অনেক শিখিতে পারি। ইংলণ্ডের প্রত্যেক বন্দরে ও অন্যান্য স্থানে অনেক সমিতি, আশ্রম প্রভৃতি আছে। তথায় বৃদ্ধ, পীড়িত ও বেকার অবস্থায় নাবিকেরা আশ্রয় পায় ও তাহাদের সন্তান সন্ততি এই সমস্ত সমিতি দ্বারা শিক্ষিত হয়। এই বন্দোবস্ত যে কি সুন্দর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহারা যেমন উপযুক্ত তেমনি তাহাদের বন্দোবস্ত; কারণ দূরদেশে ও সমুদ্রে ইংলণ্ডের মান মর্য্যাদা তাহাদেরই উপর নির্ভর করে। আমরা কি ইহা হইতে শিক্ষা করিতে পারি না এবং ভারতের এই উপযুক্ত লোকশ্রেণীর সুবিধার জন্য ঐরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারি না?

আশা করি, সকলেই এবিষয় সমর্থন করিবেন এবং যাহাতে ইহার প্রতীকার হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বদেশবাসীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও উন্নত হইবেন।

শ্রীরফিউদ্দিন আহাম্মদ।

জাতীয় জীবনে রামায়ণের প্রভাব

কোন্ যুগযুগান্তে কত শতাব্দী পূর্ব্বে তমসার পুণ্যতীরে কবিকরে যে বীণা বাজিয়াছিল তাহার সুমধুর তান আজিও ভারতবাসী নরনারীর হৃদয়ের অন্তস্থলে ধ্বনিত হইতেছে। প্রাচীন অযোধ্যা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে কিন্তু হিন্দু মাত্রের হৃদয়রাজ্যে রামায়ণের অযোধ্যা 'নিতুই নব' হইয়া চির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যত দিন হিন্দুর অস্তিত্ব আছে ততদিন রামায়ণের প্রভাব তাহার হৃদয়-রাজ্যে রাজত্ব করিবেই করিবে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেখাইব।

ছোটনাগপুরে ও বেহারে "ঘাটোয়ার" উপাধিধারী অনেক জমিদার আছেন, সাধারণতঃ ইহাদিগকে "টীকায়েত" ও "ঠাকুর" বলা হয়। টীকায়েতগণ যখন আপন জমিদারীর গদি প্রাপ্ত হন তখন "রাজ্যাভিষেক" ও "রাজটীকা" প্রদান রূপ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, ঠাকুরদিগের টীকা হয় না, তাঁহারা বাংলা দেশের জমিদারশ্রেণীর সমকক্ষ। ইহারা জাতিতে সকলেই "ঘাটোয়ার" বা "ঘাটোয়াল"।

ঘাটোয়ারগণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন এবং সেই গৌরবে রাজা দশরথের অনুকরণে সত্যরক্ষার জন্য ইঁহারা যেরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া থাকেন বর্ত্তমান যুগে উহা অতীব প্রশংসনীয়। একজন নয়, দুইজন নয়, ঘাটোয়ার জমিদার মাত্রই যদি কোনো বিষয় কার্য্যের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে একবার কথা দিয়াছেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনো প্রকার লাভালাভ ও ইষ্টানিষ্টের ঘাতপ্রতিঘাতে তিনি বিচলিত হইবেন না। ঘাটোয়ার জমিদারের মুখের কথাকে রেজিষ্টরী করা দলীল বলিয়া মানিয়া লইতে আমাদের কিছু মাত্র আশঙ্কা হয় না। যদি কথা রক্ষা করিলে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, অথবা না রক্ষা করিলে এক টাকার স্থলে শত টাকা লাভ হয়, ঘাটোয়ার কিছুতেই টলিবেন না। কেমন করিয়া সত্যভ্রষ্ট হইবেন, তিনি যে সূর্য্যবংশীয়? যে বংশের রাজা দশরথ সত্যরক্ষার জন্য প্রিয়তম পুত্র ও তৎসহ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সেই বংশসম্ভূত হইয়া কথার কি অন্যথা করা যায়? ঘাটোয়ার জমিদারগণ স্বভাবতঃ আপন কর্ম্মচারিগণের একান্ত বশীভূত কিন্তু সত্য কথা রক্ষার বেলায় কর্ম্মচারিগণ সহস্র চেষ্টা করিয়াও ঘাটোয়ারকে সত্য রক্ষা হইতে টলাইতে পারে না। যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ভাবে কর্ম্মচারিগণের প্রতিকূল আচরণে বাধা দেওয়া কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায় সে স্থলে ঘাটোয়ার জমিদার অন্যের অগোচরে আপনার বাক্য রক্ষা করিতে প্রযত্নপর হইয়া থাকেন। যখন কর্ম্মচারিগণ স্বার্থনাশের ভয় প্রদর্শন করেন তখন ঘাটোয়ার তুলসীদাসের রামায়ণ হইতে দুইটী ছত্র মাত্র আবৃত্তি করিয়া সকলকে নিরস্ত ও পরাস্ত করেন, যথা,—

"রঘুকুল-রীতি সদা চলি আ-ই।
প্রাণ যা-ই বরু বচন ন যা-ই॥"

অর্থাৎ "রঘুকুলের এই রীতি সর্ব্বদা চলিয়া আসিতেছে যে, বরং (বরু) প্রাণ যাইবে তথাপি বাক্য টলিবে না।"

দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে ঘাটোয়ারদিগের জাতীয় জীবনে রামায়ণের প্রভাব কিরূপ কার্য্য করিতেছে।

হাজারীবাগ জেলার অন্তর্গত ডোরণ্ডা (Doranda) নামে একটী গাদী (জমিদারী) আছে, টীকায়েত দলীপনারায়ণ সিংহ উহার ষোল আনা মালিক। এই জমিদারী যখন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীন ছিল তখন আমি বহু অন্বেষণ করিয়া উক্ত জমিদারীর অন্তর্গত কোনো স্থানে একটী অভ্রখনির আবিষ্কার করিয়াছিলাম, অল্পকাল মধ্যে উক্ত খনিটী একটী উৎকৃষ্ট খনি বলিয়া বিখ্যাত হইল। যখন ম্যানেজারের হাত হইতে জমিদারী টীকায়েতের হাতে আসিল তখন আমার পাট্টার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইতে দুই বৎসর বাকি ছিল। ভবিষ্যৎ বন্দোবস্তের সময় যাহাতে এই খনিটী হস্তগত হয় এইজন্য অনেক বিখ্যাত ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি লালায়িত হইলেন। কিন্তু উপরোক্ত টীকায়েত মহাশয় আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে এইরূপ কথা দিয়াছিলেন যে নূতন বন্দোবস্তের সময় বার্ষিক ২৫০৲ আড়াইশত টাকা খাজনায় তিনি সাত বৎসরের জন্য আমাকেই পুনরায় পাট্টা দিবেন। এদিকে আমার প্রতিপক্ষগণের মধ্যে কেহ কেহ বার্ষিক দেড় হাজার টাকা খাজনা দিতে প্রস্তুত হইলেন এবং সে সময়ের বাঙ্গালী ম্যানেজার নানা কারণে আমার ঘোর বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন, প্রলোভনও বড় সামান্য নয়, যাঁহার বাৎসরিক আয় বিশহাজার টাকার অধিক নহে তাঁহার পক্ষে বার্ষিক ১২৫০৲ সাড়েবারশত টাকা আয় বৃদ্ধি সামান্য বৃদ্ধি নহে, তাহাতে কর্ম্মচারিগণও তাঁহার স্বার্থেরই পক্ষপাতী, এ অবস্থায় বাক্য রক্ষা করা সহজসাধ্য নহে, কিন্তু এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া ঘাটোয়ার টীকায়েত কি করিলেন? একদিন সমস্ত কর্ম্মচারিগণের অগোচরে একটীমাত্র বিশ্বস্ত লোক সঙ্গে লইয়া টীকায়েত দলীপনারায়ণ সিংহ প্রায় ৪০ চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রাম হইতে গিরিডি আসিয়া বার্ষিক আড়াইশত টাকা খাজনায় সাতবৎসরের জন্য পাট্টা লিখিয়া রেজিষ্টরী করিয়া আমাকে দিয়া গেলেন! এই কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার কিছুদিন পরে তাঁহার ম্যানেজার ও আমার প্রতিপক্ষগণ সংবাদ জানিতে পারিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেন। আমি টীকায়েত সাহেবকে ধন্যবাদ করিলাম কিন্তু তাঁহার পক্ষ হইতে এই উত্তর পাইলাম যে যখন কথা দেওয়া হইয়াছে তখন কি করিয়া সে কথা ফিরাইবেন? কেননা,—

"রঘুকুল রীতি সদা চলি আ-ই।
প্রাণ যা-ই বরু বচন ন যা-ই॥"

গোবিন্দপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺ক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন আমাকে বলিলেন যে, তিনি যখন ঝরিয়ার রাজার ম্যানেজার ছিলেন সেই সময়ে একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী উকীল রাজার নিকট কয়েক শত বিঘা কয়লার জমি চাহিয়াছিলেন, রাজাও একরূপ কথা দিয়াছিলেন কিন্তু ইহার পরে কলিকাতার কোনো এক প্রসিদ্ধ কোম্পানী উক্ত জমির বন্দোবস্তের জন্য রাজাকে দুই লক্ষের অধিক টাকা সেলামী দিতে চাহিলেন। বলিতে গেলে এই দুই লক্ষ টাকাই রাজার অতিরিক্ত লাভ হইত। কিন্তু ক্ষিতিবাবু যখন রাজাকে (রাজা ঘাটোয়ার) এই কথা জানাইলেন তখন রাজা অম্লান বদনে বলিলেন যে, "ও জমিন্ ত অমুক বাবুকো হো গিয়া" অর্থাৎ সে জমি ত অমুক বাবুর হইয়া গিয়াছে। যদিও লেখাপড়া বা পাকাপাকি কথাবার্ত্তা হয় নাই তবু ইচ্ছা ত প্রকাশ করা হইয়াছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় অন্য প্রলোভন অবশ্যই পরিত্যাজ্য, কেননা,—

"রঘুকুল-রীতি সদা চলি আ-ই।
প্রাণ যা-ই বরু বচন ন যা-ই॥"

আর একজন টীকায়েত কোনো মহাজনের নিকট অনেক টাকা ধারিতেন, যখন তাঁহার জমিদারী এন্‌কম্বার্ড এষ্টেটের ম্যানেজারের হাতে গেল তখন উক্ত ঋণের অধিকাংশ অসত্য এবং সুদ অত্যন্ত অধিক প্রমাণিত হওয়ায় মহাজন বহু সহস্র টাকা পাইতে পারিলেন না। ১৫ বৎসর পরে জমিদারী যখন টীকায়েতের হাতে আসিল তিনি সেই মহাজনের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিলেন। যে ঋণ তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং যাহা পরিশোধ করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন, রাজবিধি তাঁহাকে সেই ঋণ হইতে মুক্তি দিলে কি হইবে, তিনি ত সত্যভ্রষ্ট হইতে পারেন না, কেননা,—

"রঘুকুল-রীতি সদা চলি আ-ই।
প্রাণ যা-ই বরু বচন ন যা-ই।"

এখানকার (গিরিডির) সর্ব্বজন-শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু মহাশয় কুড়ি বৎসরের অধিককাল ছোট-নাগপুরের বিভিন্ন জমিদারের মধ্যে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিলেন ঘাটোয়ারদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অতীব সত্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলিলেন যে তিনি যখন গাদী শ্রীরামপুরের ঘাটোয়ার রাজার ম্যানেজার ছিলেন সেই সময় রাজা কোনো একব্যক্তির ভূসম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া তাহাকে কিছু বেশী টাকা ধার দিবেন এইরূপ কথা দিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যে তাহার সম্পত্তির মূল্য অতি সামান্য, তদ্দারা ঋণের সামান্য অংশও পরিশোধ হইতে পারে না। যখন তিনকড়িবাবু রাজাকে এইকথা জানাইলেন তখন রাজা বলিলেন, "দেনেই হোগা, হাম বাত্ দিয়া," অর্থাৎ দিতেই হইবে কারণ আমি কথা দিয়াছি। টাকা দেওয়া হইল, তখন তিনকড়িবাবু রাজাকে বলিলেন "ভবিষ্যতে কাহাকেও 'বাত দেওয়ার' পূর্ব্বে আমাকে জানিতে দিলে ভাল হয়।" তিনকড়িবাবু জানিতেন যে ঘাটোয়ার জমিদার একবার কথা দিলে তাহা আর ফিরান যাইবে না, কেননা—

"রঘুকুল-রীতি সদা চলি আ-ই।
প্রাণ যা-ই বরু বচন ন যা-ই॥"

ক্ষুদ্র বৃহৎ এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বার বৎসরের অধিককাল আমি এদেশের ঘাটোয়ার জমিদারগণের কথার উপর নির্ভর করিয়া যেসকল কার্য্য করিয়াছি তজ্জন্য কখনো আমাকে প্রবঞ্চিত হইতে হয় নাই। যিনি ঘাটোয়ার জমিদারদিগের সঙ্গে বিষয়কার্য্যোপলক্ষে মিশিয়াছেন তিনিই অসঙ্কোচে বলিবেন যে ইঁহাদের মুখের কথা রেজেষ্টরী করা দলীল। এই দুর্নীতির দিনে ইহা কতবড় গৌরবের, কতবড় সৌভাগ্যের কথা!

ধন্য কবিগুরু বাল্মীকি, তোমার বীণার অক্ষয়ধ্বনি! ধন্য রাজা দশরথ, তোমার সর্ব্বস্বত্যাগে সত্যপালন! আজি শত শত বৎসর পরেও জাতীয় জীবনে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত ও সেই সত্যপালন-লীলা অভিনীত হইতেছে, আর এইসকল পার্ব্বত্য প্রদেশে বনজঙ্গলপূর্ণ পল্লীগ্রামে তুলসীদাসের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া লোকেরা সগৌরবে উচ্চকণ্ঠে গাহিতেছে,—

"রঘুকুল-রীতি সদা চলি আ-ই।
প্রাণ যা-ই বরু বচন ন যা-ই॥"

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

উদ্ভিদের যাদুকর

আমাদের দেশের পুরাণে প্রসিদ্ধি আছে যে, বিশ্বামিত্র তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ নূতন ফল শস্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা সত্য কি কল্পনা তাহা এখন প্রমাণ করিবার কোনো উপায় নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে আজকাল প্রমাণ হইয়া গেছে যে সৃষ্টিকার্য্য পরমেশ্বরেরই একচেটিয়া শক্তি নহে— তাঁহার অসীম বিভূতির প্রসাদভোগী মানুষও স্বীয় ধীশক্তির বলে নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে। জৈব পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া জড় পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকের কর্ম্মশালায় প্রস্তুত হইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার আভাস সুস্পষ্ট ভাবেই দিয়াছে ও দিতেছে।

উদ্ভিদজগতে নূতন সৃষ্টি করিয়া যিনি অমর হইয়াছেন তাঁহার নাম লুথার বারবাঙ্ক। ইনি আমেরিকাবাসী। মানুষের সাধারণ শক্তি এত সীমাবদ্ধ যে কাহারও কর্ম্ম, চিন্তা, শক্তি অসাধারণ দেখিলেই অপরে তাহাকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থাকে; তাহার অতিপ্রাকৃত শক্তি সয়তানের খেলা বলিয়া ভীত হয়। প্রাচীনকালে যখন মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান অনুন্নত ও চিত্ত অনুদার ছিল তখন এই সব নূতন ও অদ্ভুত-কর্ম্মাদিগকে প্রাণ দিয়া জবাবদিহি করিতে হইত। আজকাল মানুষ একটু সভ্য একটু উন্নত একটু উদার হইয়াছে তাই এখন আর নূতনত্ব প্রবর্ত্তককে প্রাণে মারে না, কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্র মানিতেও চাহে না। লুথার বারবাঙ্ক যখন উদ্ভিদজগতে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রচার করিয়াছিলেন তখন লোকে তাঁহাকে পাগল ঠাহরাইয়াছিল—তাঁহার মত এখন বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া সর্ব্বজগতে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে।

লুথার বারবাঙ্ক—উদ্ভিদের যাদুকর।

বারবাঙ্ক অতি শৈশবেই মাতার উদ্যানে আলুর ক্ষেত্রের পাট করিয়া যে আলু উৎপন্ন করিয়াছিলেন তাহাই আজও মার্কিনমুলুকের আদর্শ আলু হইয়া আছে। কিন্তু তখন বালকের হিতৈষী মাত্রেই ছেলেটাকে আলুর ক্ষেতে সময় নষ্ট করিতে দেখিয়া নিতান্তই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

তিনি সর্ব্বপ্রথমে যখন একপ্রকার জাম জাতীয় ফল সৃষ্টি করিলেন, তখন ফলতত্ত্ববিদেরা তাহা জাল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু যখন বারবাঙ্ক নূতন ফলের বীজ তাহাদিগকে দিলেন এবং তাহারা নিজে সেই বীজ আজ্জাইয়া দেখিল যে তাহা হইতে সত্বর বৃক্ষ ও ফল সমুৎপন্ন হয় তখন তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু সেই ফল স্বাদহীন দেখিয়া তাহারা প্রচার করিল যে এ ফল কোনো কর্ম্মের নয়, এমন কি বিষাক্ত। কিন্তু তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তার নির্দ্দেশ মতো বীজবপন ও বৃক্ষপালন করিল তাহাদের বৃক্ষে অতি সুস্বাদু ফল ফলিয়া অল্প দিনেই বারবাঙ্কের খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। নিউ-ইয়র্ক বোটানিক্যাল গার্ডেনে ইহার পরীক্ষা হইয়া যখন সুফল পাওয়া গেল তখন তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক এই ফলের বীজ লইয়া চাষ আরম্ভ করিয়া দিল।

লুথার বারবাঙ্ক নিন্দা প্রশংসায় অটল থাকিয়া নিজ সাধনায় অক্লান্ত ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি দেশের সাধারণ ক্ষুদ্রাকার ডেজি ফুলকে পাট করিয়া করিয়া এবং বীজ নির্ব্বাচন দ্বারা একটি সুন্দর ও বৃহৎ পুষ্পে পরিণত করিয়াছেন। ইহার জন্য অসাধারণ ধৈর্য্য শ্রম ও পর্য্যবেক্ষণ সহকারে তাঁহাকে বহু দিন চেষ্টা করিতে হইয়াছে। ডেজি ফুল মাঠে ঘাটে আপনা হইতেই হয়; ফুলগুলির রং হলদেটে, পাপড়িগুলি বি-সম, এবং আকার ছোট। বারবাঙ্কের ইচ্ছা হইল ইহাকে বড়, সুশুভ্র, সুসম-দল পুষ্পে পরিণত করিতে হইবে। তিনি ঘাটে মাঠে ঘুরিয়া অনুসন্ধানে ও পর্য্যবেক্ষণে সব চেয়ে ভালো ফুল-ওয়ালা গাছ সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র একটি কেয়ারি করিলেন; তাহাদের মধ্যে যে গাছটিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুল হইল কেবলমাত্র তাহারই বীজ রাখিয়া বাকিগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং স্বীয় ক্ষেত্রে সেই বীজ রোপণ করিলেন। এইরূপ বৎসরের পর বৎসর শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাচন দ্বারাও দেখিলেন যে সে বংশে সুপুষ্প হইল না। তখন তিনি আমেরিকার মেঠো ডেজির সহিত জাপানী ও ইংরেজি সুন্দর সুশুভ্র ডেজির সঙ্করতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একজাতীয় পুষ্পে অপর জাতীয় পুষ্পপরাগ নিষেক করিয়া যে বীজ হইতে লাগিল তাহাই আবার নির্ব্বাচন করিয়া করিয়া আট বৎসর পরে তিনি অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন।

পুষ্পপ্রিয় বারবাঙ্ক একদিন বেড়াইতে গিয়া হঠাৎ দেখিলেন যে আফিং ফুলের শাদা পাপড়ির মধ্যে কোথাও কোথাও একটি একটি লাল রেখা পাপড়ির অভ্যন্তর পর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট আছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল উৎকর্ষ বিধান দ্বারা এই রক্তরেখাটিকে বিস্তৃত করিয়া সমগ্র ফুলটিকেই রক্তবর্ণ করিয়া তোলা যাইতে পারে। যথা চিন্তা তথা কাজ—তাঁহার হাতে কয়েক পুরুষ পরেই আফিং ফুল দিব্য টকটকে লাল হইয়া উঠিল। এক্ষণে তিনি নীল রঙের আফিং ফুল তৈরি করিতে চেষ্টা

করিতেছেন। তিনি ভারতবর্ষীয় আফিং ফুলের সহিত আমেরিকার ও আইসল্যাণ্ডের আফিং ফুলের সঙ্করতা সম্পাদন করিয়া সাড়ে তিন ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট শাদা, হলদে ও কমলা রঙের আফিং ফুল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই ফুল সারা বৎসর প্রত্যহই গাছে ফুটিয়া থাকে। এই সঙ্কর ফুলের বীজ হয় না; মূলের সহিত গাছের ডাল কাটিয়া কলমের চারা করিতে হয়। এই সকল সঙ্কর আফিং গাছের আকার তাহাদের সাধারণ আদিম জনক-বৃক্ষের ন্যায় ক্ষীণ ও পত্রবিরল নহে - ইহাদের পত্রবিস্তার ১৪ হইতে ১৮ ইঞ্চি, এবং পত্রের আকার কোনো দুটি গাছের একরকম নয় - কোনোটির পত্র টেপারির মতো, কোনোটির সরিষার মতো, কোনোটা শালগম বা ওল-কপির মতো, কোনোটার পত্র বা প্রিমরোজ, থিস্‌ল্‌ বা ক্যালেণ্ডাইনের মতো।

তিনি তিন ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট এমারিলিস পুষ্পের আকার এক ফুট করিয়া তুলিয়াছেন; এবং লিলি জাতীয় একপ্রকার ফুলকে পুষ্ট করিয়া এক ফুট ও সঙ্কুচিত করিয়া দুই ইঞ্চি করিয়াছেন। অনেক গন্ধহীন ফুলে অপর ফুলের গন্ধ নিষেক করিয়া সেই সব নির্গন্ধ ফুল সুগন্ধ করিয়াছেন; এবং অনেক গাছের ডাল ঢাকিয়া ফুল ফুটাইতেছেন।

তিনি কুল ও খুবানি ফলের সঙ্করতা দ্বারা এক অপূর্ব্ব ফলের সৃষ্টি করিয়া নাম রাখিয়াছেন প্লামকট, কারণ ইহা প্লাম ও আপ্রিকটের যোগে সৃষ্ট। এই ফলের খোসা গাঢ় বেগুনে ও মকমল-কোমল, শস্য উজ্জ্বল লাল, গন্ধ কুল ও খোবানির মিশ্রণ, স্বাদ অম্লমধুর। ইহা দ্বারা জ্যাম জেলি অতি উপাদেয় হয়; রন্ধনেও রুচিকর।

বারবাঙ্ক টেপারি জাতীয় দুটি ফলের সঙ্করতায় প্রাইমাস বেরি সৃষ্টি করিয়াছেন। এক ফলের পুষ্পপরাগ অন্য ফলের পুষ্পে নিষেক করিয়া করিয়া কয়েক বৎসরেই এই নূতন ফল সৃষ্টি হইয়াছে। হিমালয় প্রদেশের সুস্বাদু কালোজামের চারা হইতে আট ফুট উচ্চ ও ১৫০ বর্গ ফুট বিস্তৃত এক গাছে তিনি শাদাজাম ফলাইতেছেন। রেউচিনি তিনি সারা বৎসর ধরিয়া ফলাইতেছেন এবং তাহা এখন আর কেবলমাত্র বিরেচক ঔষধ নাই, তাহা সুস্বাদু সুখাদ্য হইয়া উঠিয়াছে। ক্লাইমাক্স নামক কুল,
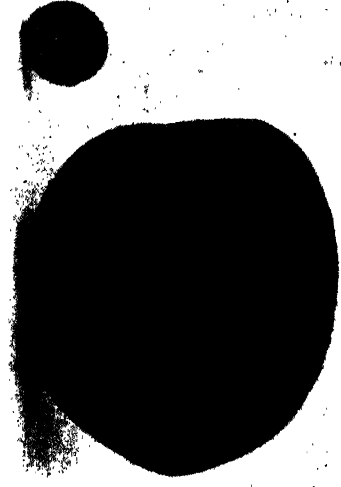
স্বাভাবিক ফল ও লুথার বারবাঙ্ক কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট ফল।

নাসপাতির গন্ধযুক্ত কুল, বীজ-শূন্য কুল, তাঁহার অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সৃষ্টি। লতা-সঞ্জাত বিহি বা কাঁস ফল ও আনারসের সঙ্কর হইতে যে ফল সৃষ্ট হইয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য—বিহি এখন ফলিতেছে গাছে এবং স্বাদ হইয়াছে আনারসের।

বারবাঙ্ক মনসা সীজের বিবিধ জাতির সঙ্করতা সাধন করিয়া তাহাকে কণ্টকশূন্য ও পশুর খাদ্য করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া তুলিয়াছেন। উহাতে একপ্রকার ফল ধরিতেছে, তাহা আবার মনুষ্যের খাদ্যের উপযোগী হইয়াছে। ভারতবর্ষে সীজের কাঁটাগাছ যেখানে সেখানে জন্মে। বারবাঙ্কের এই উদ্ভাবন আমাদের দেশে কেহ প্রয়োগ করিলে আমাদের অনাহার-ক্লিষ্ট গোমহিষ ছাগমেষ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া যায়।

বারবাঙ্ক একপ্রকার বাদাম সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বীজ হইতে গাছ হইয়া ফল ধরিতে ৮।১০ মাসের বেশি সময় লাগে না।

তিনি ফলের ফুলের গাছগুলিকেও এমন দৃঢ়, কষ্টসহ, ও জীবনীশক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন যে অতিগ্রীষ্ম বা অতি-শীতেও তাহাদের পুষ্প ফল প্রসবে বাধা হয় না। তাঁহার সৃষ্ট আবলুশ গাছ হইতে জগতের শ্রেষ্ঠ পুষ্ট স্থূল কঠিন আবলুশকাঠ পাওয়া যাইতেছে; তাহার বাজার-দর

হাজার ফুট কাঠ ১৮০০ হইতে ২১০০ টাকা পর্য্যন্ত। এই কাঠে মেহগিনির ন্যায় পালিশ হয়। গাছগুলিও সুশ্রী; পথের দুধারে বৃক্ষবীথি করিবার জন্য বিশেষ সমাদৃত। ইহার ফলও সুস্বাদু সুগন্ধ।

বারবাঙ্ক নিজের বেক্ষণাগারের সন্নিহিত ক্ষেত্রে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে বিবিধ ফল ফুল, কেজো অকেজো নির্ব্বিশেষে, লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন এবং নিত্য নূতন সৃষ্টি করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতেছেন। বারবাঙ্ক নবাবিষ্কৃত পরাগ নিষেকের যন্ত্রপাতি কিছুই ব্যবহার করেন না; একটা ঘড়ির কাচ, একটা উষ্ট্রলোমের নরম তুলি ও নিজের আঙুলের সাহায্যেই এক গাছের পুষ্পপরাগ লইয়া অন্য গাছের পুষ্পকেশরে লাগাইয়া দেন। এই কর্ম্মে নূতন ব্রতীর জন্য তিনি একটু বেশি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেন—একটি রেকাব পরাগ সংগ্রহের জন্য, নরম তুলি পরাগ নিষেকের জন্য, ছোট অণুবীক্ষণ, ছোট সন্না, ও একখানি ধারালো ছুরী। যখন দুটি ফুলের সঙ্করতা সাধন করিতে হয় তখন একটি ফুলের পরাগকোষ ও অপর ফুলের গর্ভকেশর কাটিয়া বাদ দিতে হয়; ইহাতে উভয় ফুলই বন্ধ্যা হইয়া থাকে; পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে যখন একের গর্ভকেশর আঠালো হইয়া গর্ভধারণের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে তখন নরম তুলিতে অপর ফুলের পরাগ তুলিয়া নিষেক করিলেই পুষ্প বীজ ধারণ করে। এইরূপে যে যে বৃক্ষের পুষ্পে পরাগনিষেক দ্বারা গর্ভসঞ্চার করা হয় তাহাতে এক একটি চিহ্ন দিয়া অন্য গাছের ফুলে পরাগ নিষেক করিতে হয়। তৎপরে সেই নবোৎপন্ন বীজ পুষ্ট হইলে সংগ্রহ করিয়া আজ্জাইতে হয় এবং তাহার অঙ্কুর হইতে চারা পর্য্যন্ত নিত্য নিয়ত পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির করিতে হয় সেগুলি যেমনটি চাই তেমনটি হইতেছে কি না; যেগুলিকে মনের মতো না বোধ হইবে সেগুলিকে নির্ম্মমভাবে নষ্ট করিয়া কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ নমুনা পালন করিতে থাকিলেই অবশেষে অভীষ্ট লাভ নিশ্চয় হইয়া উঠে। অনেক সময় প্রকৃতির খেয়ালে এক করিতে গিয়া আর একরকম গড়িয়া উঠে; কিন্তু তাহাও যখন অদ্ভুত ও অনাসৃষ্টি তখন তাহাও বর্জ্জনীয় নহে; সুতরাং তারা নষ্ট করিবার আগে বিশেষ চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। ইচ্ছামতো ফল লাভের পরও কয়েক বৎসর সতর্কতার সহিত সেই নবজাত বৃক্ষটির বংশ পালন করিতে হয়; এবং কয়েক বংশপরম্পরায় সেই নবজাত বিশেষত্ব তাহাদের প্রকৃতিগত হইয়া গেলে আর বিগড়াইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। নতুবা নবজাত বৃক্ষ তাহার আদিম পুরুষের স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করে, কারণ জগতে সকলেরই স্বভাব রক্ষণশীল; আবার পরিবর্ত্তন একবার স্বভাবগত হইয়া গেলে আর কোনো গোল থাকে না।

বারবাঙ্ক একই উপায়ে কার্য্য করেন না। তিনি কখনো বা শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাচন দ্বারা এবং কখনো বা সঙ্করতা সম্পাদন দ্বারা অভীষ্ট আদায় করেন। নির্ব্বাচনের জন্য তাঁহাকে সুদূর সুদুর্গম নানা দেশ হইতেই নমুনা সংগ্রহ করিতে হয়।

ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে বারবাঙ্ক অতিপ্রাকৃত কিছুই করিতেছেন না। প্রকৃতি যাহা ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে হাজার বৎসরে গড়িয়া তুলে তিনি তাহাই জোরজবরদস্তিতে প্রকৃতিকে দিয়া চটপট সারিয়া লইতেছেন। জগতের এই বিচিত্র ফলপুষ্প জীবজন্তু সমস্তই প্রকৃতির নির্ব্বাচন ও সঙ্করতার ফল। এমন কি অবস্থার পরিবর্ত্তনে একই বংশে প্রকৃতি এমন পরিবর্ত্তন ঘটায় যে উত্তর বংশকে পূর্ব্ব বংশের সহিত এক বলিয়া চেনা যায় না। এক দেশের গাছ অন্য দেশে গেলে ক্রমশ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে; জমি, সার, পাটের তারতম্যে উৎপন্ন ফল ফুল শস্য বিভিন্ন প্রকারের হয়। যে কাজ অগোচরে অল্পে অল্পে হয় তাহাই ধরিয়া সুস্পষ্ট করিয়া তোলাই বৈজ্ঞানিকের বিশেষত্ব। সুতরাং বারবাঙ্কের কার্য্য যাদুকরের ন্যায় দেখাইলেও তাহা অস্বাভাবিক নহে—নিষ্ঠা ও একাগ্র অধ্যবসায়ে যিনি চেষ্টা করিবেন তিনিই এরূপ করিতে পারিবেন। বারবাঙ্ককে কত নিষ্ফলতা অতিক্রম করিয়া চলিতে হইতেছে। কত ফলের সঙ্কর ফল উৎপাদন করিতে গিয়া তাঁহাকে ব্যর্থ হইতে হইয়াছে—হয় ত ফুল হইয়াছে, তাহাও হাজার রকমের হাজারটা, ফল হয় নাই; ফল হইয়াছে ত বিস্বাদ, স্বাদহীন; আখরোট হইল ত তাহার খোসা এত পাতলা যে পাখীর ঠোঁটের আঘাতে ভাঙিয়া যায়, তারপর

আবার বংশপরম্পরায় নির্ব্বাচন ও সঙ্করতাসম্পাদন দ্বারা তাহার আবরণ স্থূল দৃঢ় করিতে হইল। তামাকের সহিত গাঁজার মিলন ঘটাইতে গিয়া যে গাছ হইল তাহার কাণ্ড এমন কোমল ও মূল এত শিথিল যে সে গাছ পত্রপ্রাচুর্য্যে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। কোনো নূতন গাছ হয় ত অল্পজীবী হয়; অনেক সময় সঙ্কর বৃক্ষ বংশরক্ষার চেষ্টাতেই মারা পড়ে, সে জন্য ফল পাওয়া প্রায়ই দুষ্কর হয়; বাঁচিয়া থাকিলেও ফলে বীজ হয় না, কলম করিয়া বংশ রক্ষা করিতে হয়।

এমন অদ্ভুতকর্ম্মা বারবাঙ্ক আমেরিকার মতো টাকার দেশে থাকিয়াও আজ ধনী নহেন। তিনি অর্থচেষ্টা করিলে মহাধনী হইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি অনন্যমনা হইয়া বিজ্ঞানের সেবায় তপস্যা করিতেছেন। তাঁহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চিন্তিত হইতে না হয় এজন্য দেশবাসী সকলে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। বারবাঙ্ক অতি অমায়িক প্রকৃতির সাদাসিধা সজ্জন।

অদ্বৈত

(কাশী—কেদার ঘাট)

থেমে গেছে আরতির রোল, মন্দীভূত ক্রমে জনরব,
স্তিমিত দীপের মালা; ধ্যান পূজা সারি কাশীবাসী সব
গেল গৃহে; দক্ষিণের ঘাটে শ্মশানেতে স্ফুলিঙ্গ নিশ্বসি
নিভে এল দীপ্ত চিতানল; নিশীথের দ্রুতগামী মসী
পরপার বনরেখা ত্যজি শস্যক্ষেত্র শুভ্র বালুচর,
নদীবক্ষ পার হ'য়ে আসি আচ্ছাদিল দিক দিগন্তর।
জলস্থল জনপদ ঘাট চরাচর ক্রমে একাকার!
শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-রূপময়ী অচেতনা স্পন্দ নাই আর!
বিশ্বের অস্তিত্ব অবভাস নাহি কোথা প্রকাশিত ক্ষীণ,
অন্তহীন অন্ধকার শুধু, শূন্য শুধু আলম্বনহীন!
মথি সেই ঘন অন্ধকার, প্রপূরিত করি সেই ব্যোম,
বাজে এক "আছি" "আছি" রব, নিনাদিত শুধু এক ওম্!

শ্রীনিরুপমা দেবী।

হর্ষচরিতে ঐতিহাসিক উপাদান

সংস্কৃত-গদ্য সাহিত্যে বাণভট্টের স্থান সকল লেখকগণের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। তাঁহার অপূর্ব্ব-রচনা-কৌশল "কাদম্বরী" নামক গদ্য কাব্যের প্রতি ছত্রে দেদীপ্যমান। এক একটি সমাসে কত ভাবই পুঞ্জীভূত হইয়াছে। দিবসের বিভিন্ন সময়ের সমুজ্জ্বল বর্ণনা, রাজপ্রাসাদ ও গন্ধর্ব্বলোকের অনুপম চিত্র, শত শত হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল সৈন্যশ্রেণী, ধ্বজ-ছত্র-চামর-শোভিত রাজমহিমার অলৌকিক নিদর্শন অতীতের অন্ধকারময় যবনিকার অন্তরাল হইতে কবি বাণভট্টের হস্তধৃত আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা বাণভট্টের আর একখানি গদ্যকাব্যের প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

এই গদ্যকাব্যের নাম "হর্ষ চরিত"। ইতিহাসে সুপ্রথিত হর্ষবর্দ্ধনই ইহার নায়ক। ইঁহারই সভায় বাণভট্ট স্বীয় কবি-প্রতিভার বিকাশ দেখাইয়াছেন। ঐতিহাসিক প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া ধরিতে গেলে অবশ্য হর্ষচরিতের প্রত্যেক বর্ণনা সুষ্ঠু বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। কারণ কবি ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই। কাব্য-সৌন্দর্য্যের উন্মেষ করিতে যেমন একটি মহান্ অবলম্বনের প্রয়োজন হয়, বাণভট্টও হর্ষদেবকেই সেই অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সংস্পর্শে স্বীয় অতুলনীয় তুলিকায় বিবিধ চিত্রের বিকাশ করিয়াছেন। তথাপি এই গ্রন্থের বহুস্থান হইতে সমসাময়িক বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। আমরা একে একে তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

হর্ষচরিতের প্রারম্ভে কতিপয় শ্লোক বিদ্যমান আছে। এই কয়টি শ্লোকে মঙ্গলাচরণার্থ নমস্কার, খল-নিন্দা ও কবি-প্রশংসা করা হইয়াছে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে হর্ষচরিতের ন্যায় গ্রন্থকে আখ্যায়িকা নাম প্রদত্ত হয়। কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থ কথা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণ সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

"কথায়াং সরসং বস্তু গদ্যৈরেব বিনির্ম্মিতম্।
কচিদত্র ভবেদার্য্যা কচিদ্বক্ত্রাপবক্ত্রকে॥

আদৌ পদ্যৈর্নমস্কারঃ খলাদেবৃত্তকীর্ত্তনম্।"
"আখ্যায়িকা কথাবৎ স্যাৎ কবের্বংশানুকীর্ত্তনম্।
অস্যামন্যকবীনাং চ বৃত্তং পদ্যং কচিৎ কচিৎ॥
কথাংশানাং ব্যবচ্ছেদ আশ্বাস ইতি কথ্যতে।
আর্য্যাবক্ত্রাপবক্ত্রাণাং ছন্দসা যেন কেনচিৎ॥
অন্যাপদেশেনাশ্বাসমুখে ভাব্যর্থসূচনম্।"

—[সাহিত্য-দর্পণ—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

অর্থাৎ "কথাগ্রন্থে সরস কাহিনী গদ্যে রচিত হইবে। আর্য্যা প্রভৃতি ছন্দে রচিত পদ্যও কোথাও কোথাও থাকিবে। গ্রন্থারম্ভে পদ্যে নমস্কার ও খল-চরিত বর্ণিত হইবে।" "আখ্যায়িকা কথার ন্যায়ই হইবে। ইহাতে কবির বংশ বর্ণনা থাকিবে। অন্যান্য কবিগণের কাহিনী ও কবিতাও কোথাও কোথাও থাকিবে। গ্রন্থখানির বিভাগগুলি 'আশ্বাস' নামে কথিত হইবে। এই আশ্বাসের প্রারম্ভে, পরে যে ঘটনা ঘটিবে তাহা বুঝা যায়, এমন আর্য্যা প্রভৃতি ছন্দে রচিত দ্ব্যর্থ শ্লোক থাকিবে।"

সংস্কৃত আখ্যায়িকার এই লক্ষণ হর্ষচরিতে বিদ্যমান। তবে হর্ষচরিতের পরিচ্ছেদগুলি "আশ্বাস" নামে কথিত না হইয়া "উচ্ছ্বাস" রূপে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভের শ্লোকগুলির অধিকাংশ ও উচ্ছ্বাসের প্রথমে বিহিত শ্লোকগুলি শ্লেষ-পূর্ণ। এই দ্ব্যর্থ-শ্লোক রচনা বাণভট্টের অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচায়ক। গদ্যের মধ্যেও বহুস্থলে তিনি শ্লেষ অবলম্বন করিয়াছেন।

এখন আমরা এই শ্লোকগুলি হইতে কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাই তাহার আলোচনা করিব। প্রথমে শিব ও দুর্গাকে নমস্কার করিয়া কবি বাণভট্ট ব্যাসকে নমস্কার করিয়াছেন। এই ব্যাস মহাভারত-রচয়িতা তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন, যথা "চক্রে পুণ্যং সরস্বত্যা যো বর্ষমিব ভারতম্"। তাহার পর কুকবি-নিন্দা। তাহার পর তিনি চৌর নামক কবির উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বিবিধ বর্ণ বিভিন্নরূপে রচনা করিয়াছেন ও ইহার রচনা মধ্যে 'শ্রী' 'লক্ষ্মী' প্রভৃতি কাব্যের মঙ্গলজনক শব্দ-সকল গুপ্তভাবে বিদ্যমান আছে। সংস্কৃত কবিগণ প্রায়ই শ্রী বা লক্ষ্মী শব্দ প্রয়োগে কাব্যের মঙ্গলজনক আরম্ভ ও অবসান করেন। কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের প্রথম শ্লোকের "শ্রিয়ঃ কুরূণামধিপস্য পালনীম্" এই প্রথম পংক্তি ও প্রতি সর্গের শেষ শ্লোকে 'লক্ষ্মী' শব্দ বিদ্যমান। শিশুপালবধ কাব্যের প্রথম শ্লোকের "শ্রিয়ঃ পতিঃ শ্রীমতি শাসিতুং জগৎ" এই প্রথম পংক্তি ও প্রতি সর্গের শেষে 'শ্রী' শব্দ আছে। চৌরকবির এই প্রশংসায় বুঝা যায় তিনি একজন শব্দ-প্রয়োগ-নিপুণ কবি ছিলেন। তৎপরে বাণ 'সুবন্ধু' কবির উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি 'বাসবদত্তা' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত আখ্যায়িকা-রচয়িতা। ইহা শ্লেষ অলঙ্কার-পূর্ণ ও ইহাতে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বাসবদত্তার উপাখ্যান লইয়া ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাঙ্গলা বাসবদত্তা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তৎপরে 'হরিচন্দ্র' কবির গদ্য রচনা প্রশংসিত হইয়াছে। ইহার নামের পূর্ব্বে বাণভট্ট 'ভট্টার' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা পূজার্থে প্রযুক্ত। এই 'হরিচন্দ্র' কে ছিলেন তাহা নির্ণেয়। কবি হরিচন্দ্র প্রণীত 'ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয়কাব্যম্' গ্রন্থে ধর্ম্মনাথ নামক কোন রাজার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যকর্ত্তা হরিচন্দ্র ও গদ্য-রচয়িতা হরিচন্দ্র পৃথক্ ব্যক্তি কি না তাহা বিচার্য্য। তৎপরে 'সাতবাহন' কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি 'গাথা-সপ্তশতী' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ঐতিহাসিকগণ ইঁহাকে 'হাল' নাম দান করেন। বিশ্বকোষে 'প্রাকৃত' শব্দে ইনি হাল শাতকর্ণী বলিয়া উল্লিখিত। অনুমিত হইয়াছে ইনি একজন অন্ধ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত ছিলেন। সাতবাহনের পর "প্রবরসেন" বাণভট্ট কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন। ইনি "সেতুবন্ধ" নামক কাব্য প্রাকৃত ভাষায় প্রণয়ন করেন। সেই কাব্যের উল্লেখও বাণ করিয়াছেন—যথা—"সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা।" তাহার পর নাটক-রচয়িতা 'ভাস' নামক কবির নাম পাওয়া যায়। ইঁহার নাটকাবলী এক্ষণে বিলুপ্ত, কিন্তু মহাকবি কালিদাসও ইঁহার নাম স্বীয় 'মালবিকাগ্নিমিত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা "প্রথিত-যশসাং ভাস-সৌমিল্লক-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং বহুমানঃ।" ইহার অর্থ এই "বিখ্যাত ভাস, সৌমিল্লক প্রভৃতির রচনায় অনাদর করিয়া নূতন লেখক কালিদাসের প্রতি আদর কেন?" ইহা দ্বারা 'ভাস' কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বিখ্যাত

নাটক-কার ছিলেন ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তাহার পর মহাকবি কালিদাস। ইঁহার সবিশেষ পরিচয় পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। কালিদাসের পর 'বৃহৎকথা' নামক গ্রন্থের রচয়িতার প্রশংসা পাই। কাহারও কাহারও মতে ইনি পূর্ব্বোক্ত সাতবাহনের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার নাম গুণাঢ্য। ইনি গল্পসমূহ রচনা করেন। বোধ হয় পরবর্ত্তী শ্লোকে আখ্যায়িকার রচয়িতা বলিয়া "আঢ্যরাজকৃতোৎসাহৈর্হৃদয়স্থৈঃ স্মৃতৈরপি" এই পংক্তিতে বাণভট্ট নিজ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিবরকে সম্মাননা করিয়াছেন।

এই কয়জন কবির নামোল্লেখ করাতে আমরা এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত জানিতে পারি যে ইঁহারা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালের (৬০৬-৬৪৮ খৃষ্টাব্দ) পূর্ব্বেই বিদ্যমান ছিলেন। এই উপাদান অবলম্বনে প্রত্যেক কবির যথার্থ কাল নির্ণয় করা উচিত।

বাণভট্টের সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন রচনা-রীতি অবলম্বিত হইত তাহার পরিচয় নিম্নলিখিত শ্লোকে পাওয়া যায়—

"শ্লেষপ্রায়মুদীচ্যেষু প্রতীচ্যেষ্বর্থমাত্রকম্।
উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরঃ॥"

অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশে শ্লেষ বা দ্ব্যর্থঘটিতরচনা, পশ্চিম-প্রদেশে অর্থের গভীরতাযুক্ত রচনা, দাক্ষিণাত্যে উৎপ্রেক্ষা-বহুল রচনা, ও গৌড়দেশে (পূর্ব্বদিকে) শব্দাড়ম্বরের ঘটা আদৃত।

সকল দেশের রচনা-রীতি একপ্রকার নয়। গৌড়-বাসিগণ যে আড়ম্বরপূর্ণ শব্দ ব্যবহার ভালবাসিতেন, তাহা অলঙ্কার-শাস্ত্র হইতেও অবগত হওয়া যায়। সমাসযুক্ত ওজোগুণবহুল রচনারীতি শেষে "গৌড়ী রীতি" এই নাম গ্রহণ করিয়াছিল। যথা—

"ওজঃপ্রকাশকৈর্বর্ণৈর্বন্ধ আড়ম্বরঃ পুনঃ।
সমাসবহুলা গৌড়ী"......
—[সাহিত্য-দর্পণ—৯ম পরিচ্ছেদ]

"ওজঃকান্তিকরম্বিতসকলোদ্ধতপদবিরাজিতাং বৃত্তিম্।
বিভ্রাণা রীতিস্তু গৌড়ীয়া র তিরাম্নাতা॥"
—[বিদ্যাধর কৃত একাবলী—৫ উন্মেষ।

প্রাচীন অলঙ্কার-সূত্রকার বামন লিখিয়াছেন "ওজঃকান্তি-মতী গৌড়ীয়া। ১।২।১২।"

"সমস্তাত্যুৎকটপদামোজঃকান্তিগুণান্বিতাম্।
গৌড়ীয়ামিতি গায়ন্তি রীতিং নীতিবিচক্ষণাঃ॥"

কাব্যপ্রকাশকার মম্মটও ইহাকে পরুষা বৃত্তি বলিয়াছেন যথা "ওজঃপ্রকাশকৈস্তৈস্তু পরুষা" ইত্যাদি। ভোজরাজ স্বীয় সরস্বতীকণ্ঠাভরণে লিখিয়াছেন -

"সমস্তাত্যুদ্ভটপদামোজঃকান্তিগুণান্বিতাম্।
গৌড়ীয়েতি বিজানন্তি রীতিং রীতিবিচক্ষণাঃ॥" [২য় পরিচ্ছেদ।

গৌড়ীরীতি সম্বন্ধে এত বিস্তৃত আলোচনা করিলাম তাহার কারণ এই যে ইহা বাঙ্গালীর একটি স্বাভাবিক আগ্রহের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই যে উৎকট-পদ-বিন্যাস, শব্দের বিকট প্রয়োগ, ইহা কি সেই প্রাচীন কাল হইতে এখনও বঙ্গবাসীর উপর আধিপত্য করিতেছে? তাই কি, শব্দচ্ছটা বাঙ্গালীর এত প্রিয়?

এক্ষণে আমরা মূলগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় দিব। হর্ষদেবের জয়শব্দোচ্চারণ করিয়া বাণভট্ট গ্রন্থ আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কবি নিজ বংশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বাৎস গোত্রীয়। সেই হেতু বৎস নামক গোত্রগুরুর উৎপত্তি সম্বন্ধে এক আখ্যায়িকা দিয়াছেন। প্রথম উচ্ছ্বাসে বর্ণিত সেই আখ্যায়িকা এই—

একদা ব্রহ্মলোকে মহর্ষি দুর্বাসা বিকৃতস্বরে সামগান করাতে দেবী সরস্বতী ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্রোধের অবতার দুর্বাসা তাঁহাকে "মর্ত্ত্যলোকে গমন কর" এই শাপ প্রদান করেন। ব্রহ্মা সরস্বতীকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন যে সাবিত্রীও সরস্বতীর সহিত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইবেন ও পুত্রমুখ দর্শনে সরস্বতীর শাপ মোচন হইবে।

পরে সাবিত্রী ও সরস্বতী ভূতলে আসিয়া সোণনদতীরে লতামণ্ডপে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন মহর্ষি চ্যবন ও শর্য্যাতকন্যা সুকন্যার পুত্র দধীচ সেই স্থলে উপনীত হইলেন। সরস্বতী ও দধীচের চিত্ত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। পরে দধীচের কিঙ্করী মালতীর দৌত্যে দধীচ ও সরস্বতীর মিলন হইল। তাহার ফলে সরস্বতীর গর্ভে এক তনয়ের উৎপত্তি হইল। পুত্র জন্মগ্রহণ করিতেই সরস্বতীর শাপ মোচন হইল। তিনি সাবিত্রীর সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। দধীচও নিজ পুত্রকে ভ্রাতৃপত্নী অক্ষমালার হস্তে সমর্পণ করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। যে দিন সরস্বতীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়,

অক্ষমালাও সেই দিন এক পুত্র প্রসব করেন। এই উভয় পুত্রই অক্ষমালা কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত হইল। সরস্বতীর পুত্র সারস্বত ও অক্ষমালার পুত্র বৎস নামে প্রথিত হইলেন। সারস্বত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতৃতুল্য বৎসকেও সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দিলেন ও বৎসের বিবাহ দিয়া প্রীতিকূট নামক নগরে বাস করাইলেন। নিজে তপস্যার্থ পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। এই বৎসই বাৎসায়নগণের পূর্ব্ব পুরুষ।

ইহার পর বাৎসায়নগণের বহু পুরুষ জন্মগ্রহণ করিল। বহুবৎসর পরে কুবের নামক ব্রাহ্মণ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। এইখান হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা আরম্ভ হইল। এই কুবের সম্বন্ধে 'কাদম্বরী'তে কথিত হইয়াছে :—

"বভূব বাৎস্যায়নবংশসম্ভবো
দ্বিজো জগদ্গীতগুণোঽগ্রণীঃ সতাম্।
অনেকগুপ্তার্চ্চিতপাদপঙ্কজঃ
কুবেরনামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ॥"

এখানে কবি বলিতেছেন কুবের অনেক গুপ্ত কর্ত্তৃক সেবিত হইয়াছিলেন। ইহাতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুপ্তবংশই এখানে উল্লিখিত হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ইঁহারা রাজত্ব করেন। চন্দ্রগুপ্ত (ইনি মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত হইতে পৃথক্), সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত প্রভৃতি রাজগণ এই বংশসম্ভূত।

কুবেরের চার পুত্র ছিল, অচ্যুত, ঈশান, হর ও পাশুপত। পাশুপতের অর্থপতি নামে এক পুত্র জন্মে। কাদম্বরীতেও অর্থপতির উল্লেখ আছে। এই অর্থপতির একাদশ পুত্র জন্মে—তাঁহাদের নাম ভৃগু, হংস, শুচি, কবি, মহীদত্ত, ধর্ম্ম, জাতবেদা, চিত্রভানু, ত্র্যক্ষ, অহিদত্ত ও বিরূপ।

চিত্রভানু রাজদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রাজদেবীর গর্ভে কবিচূড়ামণি বাণ জন্মগ্রহণ করেন।

বাণ বাল্যকালেই মাতৃহীন হন; যখন তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর তখন তাঁহার পিতাও পরলোক গমন করেন। বাণ তাহার পর দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করেন। ঐ সময়ে বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষা করেন। এই সময়কার বাণের জীবন উচ্ছৃঙ্খল ছিল ইহাও পরের ঘটনা হইতে অনুমিত হয়। এইখানে প্রথম উচ্ছ্বাসের সমাপ্তি হইল।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে হর্ষদেবের কৃষ্ণ নামক ভ্রাতা বাণকে আহ্বান করিবার জন্য মেখলক নামে এক দূত প্রেরণ করেন। তখন বাণ দেশভ্রমণানন্তর নিজ জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বাণ ঐ দূতের সহিত নিজ জন্মভূমি প্রীতিকূট হইতে মল্লটগ্রামে গমন করিলেন। সেখানে জগৎপতি নামে বাণের এক বন্ধু ছিলেন। পরদিন বনগ্রামে গমন করিয়া নিশাযাপন করিলেন। পরদিন হর্ষদেবের রাজভবনদ্বারে উপনীত হইলেন।

এখানে আমরা বলিয়া রাখি হর্ষবর্দ্ধনের পিতা থানেশ্বর নগরীতে রাজধানী করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন।

হর্ষদেব বাণকে বিশেষ সমাদর করিলেন না। পার্শ্ববর্ত্তী মালবরাজপুত্রকে বলিলেন "মহানয়ং ভুজঙ্গঃ" (এ একটি বিট)। বাণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া আত্মপক্ষে কিছু বলিলেন। প্রথম সাক্ষাৎ এইরূপই হইল। পরে বাণ সেই-খানে বাস করিতে লাগিলেন। কালে হর্ষবর্দ্ধন বাণের যথার্থ স্বভাবের পরিচয় পাইয়া তাঁহার উপযুক্ত সমাদর করিলেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাসে আমরা দেখিতে পাই বাণ নিজ জন্মভূমিতে আসিয়াছেন। রাজপ্রসাদপ্রাপ্ত বাণকে সকল জ্ঞাতিগণ বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন। বাণের চারি পিতৃব্যপুত্র ছিল। তাহাদের নাম গণপতি, অধিপতি, তারাপতি ও শ্যামল। এই শ্যামল বাণকে হর্ষদেবের চরিত বর্ণনা করিতে বলিলেন। বাণও হর্ষচরিত বর্ণন আরম্ভ করিলেন।

কবির পরিচয় এইখানে সমাপ্ত হইল। বাণের অনুচর বন্ধুবর্গের এক তালিকা হর্ষচরিত প্রথম উচ্ছ্বাসে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সে সময়ে ভিন্নকার্য্য-অবলম্বনকারী জনগণের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে উপাখ্যানের অনুসরণ করিব।

শ্রীকণ্ঠ জনপদে পুষ্পভূতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ভৈরবাচার্য্য নামক এক শৈবমন্ত্রসাধকের নিকট হইতে অট্টহাস নামক অসি প্রাপ্ত হন। এই ভৈরবাচার্য্য একদা কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে শ্মশানে কোন মন্ত্রে সিদ্ধ হইবার

জন্য ইচ্ছুক হইয়া রাজা পুষ্পভূতি ও অন্যান্য তিনজনকে চারিদিকে রক্ষকরূপে স্থাপিত করিলেন। সেই সময়ে শ্রীকণ্ঠ নামক নাগরাজ ভূমি বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইল। পুষ্পভূতি ভীষণ যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করিলেন। লক্ষ্মীদেবী রাজার সাহস দেখিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। রাজা "ভৈরবাচার্য্যের সিদ্ধি হউক" এই বর চাহিলেন। লক্ষ্মী সেই বর দিয়া রাজাকে বলিলেন "তোমার বংশে হর্ষ নামে অতি বিখ্যাত এক নৃপ প্রাদুর্ভূত হইবে।" ভৈরবাচার্য্য সিদ্ধ হইয়া বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাসে পুষ্পভূতি হইতে প্রবৃত্ত রাজবংশে প্রভাকরবর্দ্ধন নামে রাজা উৎপন্ন হইলেন বর্ণিত হইয়াছে। এইখান হইতে আবার ঐতিহাসিক ঘটনা আরম্ভ হইল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইনি রাজ্য আরম্ভ করেন। ইঁহার পত্নীর নাম যশোবতী। তাঁহার গর্ভে রাজার রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নামে দুই পুত্র ও রাজ্যশ্রী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। হর্ষবর্দ্ধনের জন্মদিন বাণ এইরূপ দিয়াছেন —"প্রাপ্তে জ্যৈষ্ঠামূলীয়ে মাসি বহুলাসু বহুলপক্ষ দ্বাদশ্যাং ব্যতীতে প্রদোষ সময়ে সমারুরুক্ষতি ক্ষপাযৌবনে সহসৈবান্তঃপুরে সমুদপাদি কোলাহল শ্রীজনস্য।" ইহাতে আমরা হর্ষবর্দ্ধনের জন্মদিন জানিতে পারিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষ দ্বাদশী তিথিতে কৃত্তিকা নক্ষত্রে সন্ধ্যা অতীত হইলে রাত্রির তরুণ অবস্থায় হর্ষবর্দ্ধনের জন্ম হয়। মালবরাজপুত্রদ্বয় কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত ও যশোবতীর ভ্রাতৃপুত্র ভণ্ডি ইঁহারা রাজকুমারদ্বয়ের অনুচর হইলেন।

ক্রমে রাজ্যশ্রী যৌবনে উপনীত হইলে মৌখরবংশসম্ভূত অনন্তবর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। গ্রহবর্ম্মা রাজ্যশ্রীকে লইয়া নিজ রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাসের প্রারম্ভে দেখিতে পাই প্রভাকরবর্দ্ধন জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে হূণগণকে জয় করিতে প্রেরণ করিতেছেন। বারম্বার যাহাদের উপদ্রবে তখনকার রাজগণ উৎপীড়িত হইতেন ইহারা সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হূণ। হর্ষবর্দ্ধনও কিয়দ্দূর ভ্রাতার সহিত গিয়া মৃগয়াব্যপদেশে হিমালয়ের প্রান্তভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হর্ষবর্দ্ধন এই সময় সংবাদ পাইলেন তাঁহার পিতার দাহজ্বর উপস্থিত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানী অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া পিতার অন্তিম অবস্থা অবলোকন করিলেন। দেবী যশোবতী স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। (ঐতিহাসিকের ইহা প্রয়োজনীয়)। প্রভাকরবর্দ্ধনও সেই দাহজ্বরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে পিতৃবিয়োগ-সংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্দ্ধন রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তিনি হর্ষবর্দ্ধনকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। নিজে অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় তাঁহাদের ভগিনী রাজ্যশ্রীর সংবাদক নামক অনুচর আসিয়া সংবাদ দিল "রাজ্যশ্রীর পতি গ্রহবর্ম্মা মালবরাজ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন ও রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জ দুর্গে বন্দিনী হইয়াছেন।" এই সংবাদে রাজ্যবর্দ্ধন পুনর্ব্বার অস্ত্রগ্রহণ করিয়া মালবরাজকে যথোচিত শাস্তি দিতে সসৈন্যে নির্গত হইলেন। হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

একদা কুন্তলক নামক রাজ্যবর্দ্ধনের অনুচর আসিয়া সংবাদ দিল "রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজকে জয় করিয়া গৌড়ে গিয়াছিলেন। গৌড়ের রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছে।"

পাঠকগণ মনে রাখিবেন ইনি শশাঙ্ক নামক গৌড়াধিপতি। ইঁহার চরিত্র অবলম্বনে "গৌড়বহ" নামক প্রাকৃতকাব্য রচিত হইয়াছে। বাক্‌পতি ইহার রচয়িতা। রাজতরঙ্গিণীতে এই বাক্‌পতির নামের উল্লেখ আছে যথা,—

"কবি বাক্‌পতিরাজ ভবভূত্যাদি-সেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্‌॥"

যশোবর্ম্মা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক বিজিত হন।

এখন আমরা উপাখ্যানের অনুসরণ করি। হর্ষবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এই গৌড়াধিপকে পরাস্ত করিতে না পারিলে তিনি অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিবেন। চারিদিক হইতে সৈন্যসমাবেশ হইতে লাগিল।

সপ্তম উচ্ছ্বাসে যাত্রাকালীন পথিমধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর কুমার কর্ত্তৃক প্রেরিত হংসবেগ নামক দূত হর্ষবর্দ্ধনের নিকট উপস্থিত হইল। এই রাজার ঐতিহাসিক বিবরণ অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" হইতে উদ্ধৃত হইল :—

"বাণকৃত হর্ষচরিতে লিখিত আছে, হর্ষবর্দ্ধন প্রাগজ্যোতিষে অর্থাৎ কামরূপে উপস্থিত হইয়া অবশেষে তদীয় রাজা ভাস্করবর্ম্মার সহিত মিত্রতা করেন।......চীন দেশীয় তীর্থযাত্রীর ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিও কামরূপের অধীশ্বর ভাস্করবর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

এই চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হোয়েন সাং। অক্ষয়কুমার নিম্নলিখিত অংশটি Elphinstone's History of India, edited by E. B. Cowell, 1866, p. 294 হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"Hiouen Thsang......thence proceeds eastward to Kamarupa (Assam)......Its king was a Brahman, named Bhaskaravarma, and he bore the title of Kumara; although not a follower of Buddha he received Hiouen Thsang with kindness and treated him with every mark of respect."

হর্ষচরিতে এই রাজার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম পাওয়া যায়। নরক নামে প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। তাঁহার বংশে ভগদত্ত প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপুরাণে নরকের ও মহাভারতে ভগদত্তের উল্লেখ আছে)। সেই বংশে ভূতিবর্ম্মা উৎপন্ন হন। তাঁহার পর যথাক্রমে চন্দ্রমুখবর্ম্মা স্থিতিবর্ম্মা ও সুস্থিরবর্ম্মা রাজা করেন। এই সুস্থিরবর্ম্মা শ্যামাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ভাস্করবর্ম্মার জন্ম হয়। ইনি কুমার নামেও কথিত।

এখন আমরা মূল আখ্যায়িকা অবলম্বন করি। হর্ষবর্দ্ধনের নিকট ভণ্ডি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন "আমি মালবরাজের সৈন্য ও অর্থ আনিয়াছি। কুশস্থল অধিকৃত হইলে রাজ্যশ্রী বন্ধন হইতে পলাইয়া বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।" হর্ষবর্দ্ধন ভণ্ডিকে গৌড়াধিপ বধের জন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং ভগিনীর সন্ধানে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম উচ্ছ্বাস এইখানে আরম্ভ হইল। বিন্ধ্যারণ্যে গ্রহবর্ম্মার বাল্যসুহৃদ্ দিবাকরমিত্র নামক এক বৌদ্ধ-ভিক্ষু ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই সময় এক শিষ্য আসিয়া বলিল "এক রমণী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছে।" হর্ষবর্দ্ধন ও দিবাকরমিত্র যাইয়া দেখিলেন—সেই রাজ্যশ্রী। তাঁহারা তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

এই পর্য্যন্ত গ্রন্থে উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এইখানে গ্রন্থ শেষ হইল। হর্ষবর্দ্ধনের শেষ ইতিহাস ইহাতে আর নাই।

শেষ উচ্ছ্বাসে নাগার্জ্জুনের উল্লেখ আছে। ইনি মহাযান-প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন কিনা বিচার্য্য।

মূল ঘটনার ঐতিহাসিক উপাদান বিবৃত হইল। এতদ্-ব্যতীত গ্রন্থ হইতে সেই সময়কার আচার-ব্যবহার অবগত হওয়া যায়। সেসমস্ত অন্য একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল। আমরা এখন গ্রন্থে যে যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে তাহার সংখ্যা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে বহু রাজার রাজ্যচ্যুতি ও মৃত্যু কিরূপে ঘটিয়াছিল তাহার কাহিনী বর্ণিত আছে। ইহার মধ্যে বৃহদ্রথ, পুষ্পমিত্র, শেষ সুঙ্গরাজ, কাণ্ববংশীয় প্রথম রাজা বসুদেব ও চন্দ্রগুপ্ত সুপ্রথিত। অন্যান্য রাজগণের কালনির্ণয়ের ভার ঐতিহাসিকগণের উপর দিলাম। উপাখ্যানগুলি এই :—

১। পদ্মাবতী নগরে নাগ-বংশোৎপন্ন নাগসেন নামক নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তাঁহার মন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিল। সেই মন্ত্রীকে বিনাশ করিবার মন্ত্রণা করিবার সময় গৃহমধ্যে এক সারিকা ছিল। সেই সারিকা সমস্ত বাক্য মন্ত্রীর নিকট আবৃত্তি করাতে মন্ত্রী নাগসেনকে নিহত করেন।

২। শ্রাবস্তীরাজ শ্রুতবর্ম্মার গুপ্তকাহিনী শুকপক্ষি-মুখোচ্চারিত হওয়াতে লক্ষ্মীনাশ হইয়াছিল।

এই দুই উপাখ্যানে মন্ত্রণা গোপনে করা উচিত, এমন কি পক্ষী প্রভৃতিও সেখানে না থাকে এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শুক ও সারিকার এইরূপ বাক্য বর্ণনার ক্ষমতা রত্নাবলী নাটিকায়, অমরুশতক প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

৩। মৃত্তিকাবতী নগরে স্বর্ণচূড় নামক রাজা ছিলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাঁহার শয়নকক্ষে রক্ষক-রূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিন রাজা স্বপ্নে গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া ফেলেন। তাহাতেই সেই রক্ষক তাহাকে হত্যা করিয়াছিল।

৪। যবনরাজকে কোন শত্রু হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সেই শত্রু একজন চামরধারিণীকে যবনরাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। একদিন যবনরাজের কোন বন্ধু শত্রুর কার্য্য জানিতে পারিয়া পত্র দ্বারা তাঁহাকে সকল অবগত করায়। যবনরাজ নিজেই পত্র পাঠ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার কিরীটের মণিতে হস্তধৃত পত্রের অক্ষর প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। স্বর্ণচামর-ধারিণী তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল।

৫। বিদূরথ রাজা মথুরার রাজা বৃহদ্রথকে লোভ দেখাইয়াছিলেন যে কৃষ্ণপক্ষে রাত্রিকালে কোন প্রদেশ খনন করিলে গুপ্তধন প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোভবশতঃ বৃহদ্রথ খননিযুক্ত হইলে বিদূরথের সৈন্যগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল।

৬। বৎসরাজ শুনিলেন এক মাতঙ্গ অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাকে ধৃত করিবার জন্য কয়েকজন অনুচর লইয়া অরণ্যে গমন করেন। সেই হস্তীটি শিল্পীনির্ম্মিত। তাহার অভ্যন্তরে মহাসেনের সৈন্য সকল লুক্কায়িত ছিল। তাহারা সহসা নির্গত হইয়া বৎসরাজকে বন্দী করিয়াছিল।

এই বৎসরাজের নাম. উদয়ন। কথাসরিৎসাগরে ইঁহার উল্লেখ আছে। মেঘদূতে ও রত্নাবলীতেও ইঁহার কাহিনী বিদ্যমান। পাঠকগণ এই কৃত্রিম হস্তীর উপাখ্যানের সহিত হোমরকৃত ইলিয়দের কাষ্ঠঘোটকের তুলনা করিবেন।

৭। অগ্নিমিত্রের পুত্র সুমিত্র নাট্যানুরাগী ছিলেন। নটজনে তাঁহার অসীম বিশ্বাস ছিল। মিত্রদেব নটবেশ পরিগ্রহ করিয়া সুমিত্রকে হত্যা করেন।

৮। অশ্মকরাজ শরভ বীণাবাদ্যানুরক্ত ছিলেন। তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার নিকট বীণা শিখিবে এই বলিয়া ছাত্রের বেশে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা বীণাদণ্ডের মধ্যে অসি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সহসা সেই অসি লইয়া শরভের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিল।

৯। অনার্য্য পুষ্পমিত্র মৌর্য্যরাজ বৃহদ্রথকে বলিলেন আজ সৈন্য পরিদর্শন হইবে। অসংখ্য সৈন্য উপস্থিত হইলে পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথকে বধ করেন।

এই পুষ্পমিত্র মিত্রবংশ বা সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৪ পূঃ খৃঃ এই বংশ স্থাপিত হয়। পুষ্পমিত্রের পর নয়জন রাজা রাজত্ব করেন। শেষ রাজা বসুদেব কর্ত্তৃক হত হন। সে কাহিনী ১২ সংখ্যক উপাখ্যানে দ্রষ্টব্য। মৌর্য্যবংশের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক প্রভৃতি সুপ্রথিত। ৩২১ পূঃ খৃঃ এই বংশের রাজ্য আরম্ভ হয়।

১০। চণ্ডীপতি আশ্চর্য্য বস্তু বড় ভালবাসিতেন। তিনি যুদ্ধে যবনগণকে বন্দী করিয়াছিলেন। তাহারা বলিল শূন্যমার্গে চলিতে পারে এমন যান আমরা নির্ম্মাণ করিতে পারি। চণ্ডীপতির আদেশে তাহারা যান নির্ম্মাণ করিল ও চণ্ডীপতিকে সেই যানে বসাইয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার নির্ণয় হইল না।

প্রচীনকালে ব্যোমযান বা আকাশগামী যন্ত্র নির্ম্মাণ প্রচলিত ছিল তাহার বিবিধ প্রমাণ আছে। "প্রবাসী" ১৩১৮ কার্ত্তিকের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত "প্রাচ্য প্রাচীন যন্ত্রবিদ্যা ও পাশ্চাত্য নব্য যন্ত্রবিজ্ঞান" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১১। শিশুনারবংশীয় কাকবর্ণ নগর প্রান্তে নিহত হইয়াছিলেন।

এই শিশুনার প্রাচীন শিশুনাগবংশ কি না বিবেচ্য। শিশুনাগবংশ খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল।

১২। মহিলানুরক্ত সুঙ্গকে অমাত্য বসুদেব মহিষী-বেশ-ধরিণী দেবভূতিদাসীদুহিতার দ্বারা হত্যা করাইয়াছিলেন।

ইনি শেষ সুঙ্গ বা মিত্ররাজ। ইঁহার পর বসুদেব কাণ্ববংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার সময় ৭২ পূঃ খৃঃ।

১৩। বিন্ধ্যরাজ-মন্ত্রিগণ মগধরাজকে হত্যা করিবার জন্য গোধন-পর্ব্বতে এক সুরঙ্গ কাটিয়াছিলেন। সেইখান হইতে রমণীগণের মণিনূপুরধ্বনি উত্থিত হইত। মগধরাজ মনে করিলেন ইহা অসুরপুরীর কোন প্রদেশ। তিনি সুরঙ্গে প্রবেশ করিয়া যাইতে যাইতে বিন্ধ্যরাজের জনপদে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি নিহত হইয়াছিলেন।

১৪। উজ্জয়িনী নগরীতে মহাকালোৎসব-প্রসঙ্গে প্রদ্যোতের কনিষ্ঠ পৌণকি কুমারসেন মহামাংসবিক্রয়

করিতে যাইয়া তালজঙ্ঘ নামক বেতাল কর্তৃক নিহত হন।

এই মহামাংস-বিক্রয় ব্যাপার ভবভূতিকৃত মালতী-মাধব প্রকরণেও বর্ণিত হইয়াছে।

১৫। বিদেহ রাজ্যে একদল চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বহু লোকের পীড়ার উপশম করিল। বিদেহরাজপুত্র গণপতি তাহাদের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি জানিতেন না যে ইহারা ছদ্মবেশী শত্রু। বৈদ্যগণ কূট ঔষধ প্রয়োগে তাঁহার রাজ-যক্ষ্মা রোগ উৎপাদন করিয়াছিল।

১৬। কলিঙ্গের অধিপতি ভদ্রসেন স্ত্রীগণকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা বীরসেন মহিষীর গৃহে লুকায়িত ছিলেন। গোপনে তিনি ভদ্রসেনকে নিহত করেন।

১৭। করূষরাজ দধ্র এক পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার অপর পুত্র মাতৃশয্যার তলদেশে লুক্কায়িত থাকে। পরে নিশীথে পিতাকে হত্যা করে।

১৮। শূদ্রকরাজার প্রেরিত দূত চকোরাধিপতি চন্দ্রকেতুকে উৎসারকবেশ ধরিয়া মন্ত্রিগণের সমক্ষেই বধ করিয়াছিল।

১৯। চামুণ্ডীপতি পুষ্কর মৃগয়াসক্ত ছিলেন। তাঁহার শত্রুসৈন্যগণ দীর্ঘ নলবনে লুকায়িত ছিল। ইহারা চম্পা-নগরীর সৈন্য। যখন পুষ্কর গণ্ডার-শিকার করিতেছিলেন তখন ইহারা সহসা নির্গত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল।

২০। মৌখরি ক্ষত্রবর্ম্মা বন্দিগণের স্তুতি ভালবাসিতেন। শত্রুগণ একদল বন্দী প্রেরণ করিয়াছিল। তাহারা জয়-গীতি গাহিতে গাহিতে ক্ষত্রবর্ম্মাকে বধ করিয়াছিল।

২১। শত্রুপুরে চন্দ্রগুপ্ত স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া শকরাজকে হত্যা করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের ভ্রাতৃজায়া ধ্রুবদেবীকে শকপতি প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাতেই ছদ্মবেশে চন্দ্রগুপ্ত উহাকে বধ করেন।

ইনি কোন্ চন্দ্রগুপ্ত তাহা নির্ণেয়। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, অথবা গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, অথবা অন্যকোন নরপতি তাহা স্থির করা উচিত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকগণকে জয় করেন ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

২২। সুপ্রভা স্বীয় পুত্রকে রাজা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিষ-লিপ্ত লাজের দ্বারা কাশীরাজ মহাসেনকে হত্যা করিয়াছিলেন।

মনুসংহিতায় কুল্লুকটীকায়ও ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। ২৫ সংখ্যক উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

২৩। রত্নযুক্ত তীক্ষ্ণপ্রান্ত মুকুরাঘাতে অযোধ্যাধিপতি জারূথকে হত্যা করিয়াছিল।

২৪। দেবরের প্রতি অনুরাগিণী দেবকী সুহ্মদেশের রাজা দেবসেনকে কর্ণের ইন্দীবর বিষলিপ্ত করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

২৫। সপত্নীর প্রতি অনুরক্ত বৈরন্তী-রাজ রন্তিদেবকে মহিষী বিষযুক্ত নূপুরের আঘাতে হত্যা করিয়াছিল।

কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার টীকায় লিখিয়াছেন "বিষপ্রদিগ্ধেন চ নূপুরেণ দেবী বিরক্তা কিল কাশিরাজম্।" কেহ কেহ লাজ অর্থে নূপুর বলেন। তাহা হইলে ইহা ২২ উপাখ্যানের সমর্থক। এখানে আমরা বিষাক্ত নূপুর প্রয়োগের উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিলাম।

২৬। বৃষ্ণিবংশসম্ভূত বিদূরথ বিন্দুমতী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। বিন্দুমতী কেশপাশের মধ্যে শস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

কুল্লুকভট্টের টীকায় ইহারও উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—"শস্ত্রেণ বেণী বিনিগূহিতেন বিদূরথং বৈ মহিষী জঘান।"

২৭। সৌবীর বীরসেনকে বিষাক্ত মেখলা দ্বারা হংসবতী হত্যা করিয়াছিল।

২৮। পৌরবী পৌরবরাজ সোমককে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিষাক্ত মদ্য প্রস্তুত করে। পরে নিজে মুখে ঔষধলেপন করিয়া সেই মদ্য এক গণ্ডূষ গ্রহণ করে। সোমক সেই গণ্ডূষ পান করাতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

এখন ইহা বিবেচ্য ইহার সকলগুলিই সত্য ঘটনা কি কতকগুলি কাল্পনিক ও কতকগুলি সত্য। যখন কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে ও বিভিন্ন প্রাচীন রাজ্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তখন ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে গবেষণা করিবেন।

এইসকল উপাখ্যানে প্রাচীনকালের রাজগণের সঙ্কটাপন্ন জীবন বুঝিতে পারা যায়। যখন যে বংশ প্রবল হইত সেই বংশই রাজ্য করিত। রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা স্বামিহত্যা প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হইত। কেবল আরঙ্গজেবই এ বিষয়ে ধরা পড়িয়াছেন তাহা নয়। চাণক্য নন্দরাজকে হত্যা করিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য স্থাপন করেন; অশোক নিজ ভ্রাতা সুসীমকে দূরীভূত করেন; সেনাপতি পুষ্পমিত্র মৌর্য্যরাজ্যের উচ্ছেদ করিয়া মিত্র বা সুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠা করেন; মন্ত্রী বসুদেব মিত্রবংশ ধ্বংস করিয়া কাণ্বংশ স্থাপিত করেন; এইরূপ বিপ্লব প্রাচীন ইতিহাসে সুস্পষ্ট ভাবে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করি। কবি চৌর, সুবন্ধু, হরিচন্দ্র, সাতবাহন, প্রবরসেন, ভাস, কালিদাস, ও গুণাঢ্যের উল্লেখ, মহাকবি বাণভট্টের জীবনের আভাস ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয়, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রভাকরবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের কাহিনী, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভাস্করবর্ম্মা বা কুমারের পরিচয়, কাহিনীর মধ্যে বহু নৃপগণের উল্লেখ প্রভৃতিতে সহজেই প্রতিভাত হয় যে হর্ষচরিতে বহু ঐতিহাসিক উপাদান প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে। সে সময়কার রীতি-নীতির পরিচয় পৃথক-প্রবন্ধ-সাপেক্ষ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

নবীন-সন্ন্যাসী

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

পীড়িত।

দেওঘরে পৌছিয়া গোপীকান্ত বাবু যতীন্দ্রনাথেরই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সহরের বহির্ভাগে বৃহৎ দ্বিতল রক্তবর্ণ অট্টালিকা—চারি পার্শ্বে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর নানা জাতীয় ফুলের বাগান। স্থানটি সুরম্য। দেখিয়া গোপীকান্ত বাবুর বড়ই পছন্দ হইল।

প্রথম কয়েক দিবস প্রভাতে ও বৈকালে উভয়ে দুই তিন ঘণ্টা করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যতীন্দ্র বাবুর নিরহঙ্কার সরল সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে গোপীকান্ত বাবু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। পাঁচ ছয় দিন অতীত হইলে গোপীকান্তবাবু একদিন বলিলেন "যতীন্দ্র বাবু, চলুন আজ একটু সকালে সকালে বেরিয়ে একটা বাসা ঠিক করে ফেলি।"

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"বাসা? বাসা কেন?"

গোপী বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আপনার উপর আর কতদিন উপদ্রব করব?"

"আমি ত উপদ্রবের মত কিছুই অনুভব করছিনে। আপনাকে সাথী পেয়ে পরম আনন্দেই আছি। তবে, আপনার হয়ত এখানে অসুবিধে হচ্ছে?"

"আমার অসুবিধে কিছুমাত্র হয়নি।"

"আপনি ঠিক আন্তরিক কথাটি বলছেন কি? না, ভদ্রতার খাতিরে বলছেন? দেখুন, আমার মনে যেমনটি হয় বাইরে ঠিক সেই রকমটি প্রকাশ করে বলি। যদি এখানে আপনার বসবাসের কোনও রকম অসুবিধে হয়ে থাকে তবে অনুগ্রহ করে বলুন—সে অসুবিধেটুকু দূর করতে আমরা চেষ্টা করব। যদি অক্ষম হই তাহলে আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে আপনার জন্যে আলাদা বাসা ঠিক করে দেব।"

গোপীকান্ত বাবু বলিলেন—"না যতীন বাবু, আমি আন্তরিক কথাই বলছি, আমার এখানে একতিলও অসুবিধে হয়নি। আপনারা আমাকে আত্মীয়ের অধিক করে যত্ন করছেন। আমার মনে হয় আপনাদেরই আমি নানা অসুবিধায় ফেলেছি।"

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাদের কিছু অসুবিধেতে ফেলেন নি। বরং আপনি থাকাতে আমার অনেক ভরসা আছে। মামা ঠিকই বলেছিলেন, বিদেশে ছেলেপিলে নিয়ে রয়েছি, একদিন যদি আমার অসুখ করে তাহলে আমার স্ত্রী মহা মুস্কিলে পড়ে যাবেন।"

গোপী বাবু হাসিয়া বলিলেন—"ঐটে আমার সুবিধে আছে। স্ত্রী না থাকাতে মুস্কিলে পড়বার কেউ নেই।"

যতীন্দ্র বাবু কিয়ৎক্ষণ গোপী বাবুর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"আপনি কি বিপত্নীক?"

"না।"—গোপী বাবু আর কিছু বলিলেন না—যতীন্দ্র বাবুও জিজ্ঞাসা করিলেন না। যতীন্দ্র বাবু এটা লক্ষ্য করিয়াছেন, বাড়ীর কথা, আত্মীয়স্বজনের প্রসঙ্গমাত্র উঠিলেই গোপী বাবু নীরব হন। সেই জন্য তিনি ওসকল বিষয়ে গোপী বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। বলা বাহুল্য তিনি গোপী বাবুকে যশোহর জেলার রাধামোহন গোস্বামী বলিয়াই জানেন। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই জ্ঞাত নহেন।

বাসা পরিবর্ত্তনের আর কোনও প্রসঙ্গ উঠিল না। দশ দিন কাটিলে, একাদশ দিবসে হঠাৎ গোপী বাবুর জ্বর হইল। অল্পে অল্পে সারিয়া যাইবে ভাবিয়া প্রথম দিন চিকিৎসাদির কোনও ব্যবস্থা হইল না।

পরদিবস জ্বর প্রবলতর হইল। স্থানীয় ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন উহা বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া জ্বর ভিন্ন কিছুই নহে।

কিন্তু তৎপরদিবস ডাক্তার বাবুর রোগনির্ণয় ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইল। জ্বরটা বিকারে দাঁড়াইল। গোপী বাবু অজ্ঞান।

যতীন্দ্র বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া যথাসাধ্য রোগীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু ভীত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন "লক্ষণ ভাল নয়। এঁর আত্মীয় স্বজনকে আসতে টেলিগ্রাম করে দিন।"

যতীন্দ্র বাবু মহা চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। রোগীর আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছে কিছুই তিনি জানেন না। এ অবস্থায় বিদেশে যদি মৃত্যু ঘটে তবে সেটা বড়ই পরিতাপের কারণ হইবে। আশা করিতে লাগিলেন, যদি দিনের মধ্যে একটিবারও জ্ঞান হয় তবে আত্মীয়স্বজনের নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

কিন্তু সে সুযোগ হইল না। সন্ধ্যা আগতপ্রায়—রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দই দেখা যাইতে লাগিল। যতীন্দ্র বাবুর স্ত্রী দুইটি শিশুসন্তান লইয়া ব্যস্ত—রোগীর কাছে তিনি অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন না। যতীন্দ্র বাবু একাকীই অধিকাংশ সময় পরিচর্য্যা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অবস্থা দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—"দেখ, ওঁর ঐ টিনের বাক্সটার ভিতর পুরোণো চিঠিপত্র নিশ্চয়ই আছে। খুলে দেখ না—আত্মীয় স্বজনের নাম ঠিকানা তাতে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।"

যতীন্দ্র বাবু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন—"সেটা কি উচিত হবে?"

গৃহিণী বলিলেন "এখন এই বিপদের সময় উচিত অনুচিতের অত সূক্ষ্মবিচার করলে চলবে কেন? ঈশ্বর না করুন, যদি কোন ভালমন্দ হয় ওঁর আত্মীয় স্বজন হয় ত ভাববেন আমরা ওঁর যথেষ্ট সেবা যত্ন করিনি—ভাল করে চিকিৎসা করাইনি-তাই এমন হয়েছে। দেখ তুমি বাক্স খুলে—তাতে কিছু অন্যায় হবে না।"

যতীন্দ্র বাবু স্ত্রীর যুক্তিই গ্রহণ করিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে গোপী বাবুর একটা জামার পকেটে চাবি পাওয়া গেল। বাক্স খুলিয়া যতীন্দ্র বাবু দেখিলেন, ভিতরে পাঁচখানা চিঠি রহিয়াছে। ঘরে যথেষ্ট আলোক না থাকাতে সেগুলি লইয়া পড়িবার জন্য তিনি বাহিরের বারান্দায় গিয়া বসিলেন।

বাহির হইতে যে চিঠিখানি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট বলিয়া বোধ হইল, প্রথমেই সেইখানি খুলিলেন। সেখানিতে যদি আবশ্যকীয় সংবাদ পাওয়া যায় তাহা হইলে অন্য চিঠিগুলি খুলিবার প্রয়োজন হইবে না।

এখানি হুগলিতে প্রাপ্ত প্রথম পত্র। পাঠ করিয়া যতীন্দ্র বাবু বুঝিলেন, ইনি কল্যাণপুর হইতে আসিয়াছেন এবং তথাকার জমিদার। রমণ ঘোষ থানায় নালিশ করিতে গিয়াছিল—সেখানে অকৃতকার্য্য হইয়া রমণ ঘোষ খুলনায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ করিতে গিয়াছে। তাহা হইলে কল্যাণপুর খুলনা জেলায়। স্ত্রীলোক-ঘটিত মোকর্দ্দমা—খুলনা হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির হইতে পারে—সুতরাং আপাততঃ হুজুরের দেশে আসার আবশ্যক নাই। সুতরাং ইনিই ওয়ারেণ্টের ভয়ে পলাতক। পত্র-শেষে স্বাক্ষর শ্রীগদাধর পাল। রমণ ঘোষ ফরিয়াদী—কোন্ রমণ ঘোষ? তাঁহাদের প্রজা হাজিপুরের সেই রমণ ঘোষ নয় ত? সেওত খুলনা জেলায় তাহার মামার বাড়ীতে গিয়া বাস করিয়াছে। গদাধরচন্দ্র পাল!—সেই জালিয়াৎ গদাই পাল নহে ত?

যতীন্দ্র বাবু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আর একখানি ছোট পত্র খুলিলেন। এখানি পুলিশ কর্ত্তৃক রমণ

ঘোষ গ্রেপ্তার হইবার পর গদাই পালের লিখিত পত্র। ইহা পাঠ করিয়া যতীন্দ্র বাবু বুঝিতে পারিলেন, গদাই পালই চক্রান্ত করিয়া, পুলিশকে ঘুষ দিয়া, মিথ্যা মোকর্দ্দমায় রমণ ঘোষকে চালান দেওয়াইয়াছে। এই সেই রমণ ঘোষ এবং এই সেই গদাই পাল -- এ ধারণা এখন যতীন্দ্র বাবুর মনে বদ্ধমূল হইল। তখন স্মরণ হইল, রমণ ঘোষ তাঁহাকে বলিয়াছিল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের জমিদারীতে সে বাস করে। ইনি ত গোস্বামী—হয়ত এটা তাঁহার ছদ্ম নাম। আবশ্যকীয় সংবাদ ইহাতেও না পাইয়া, এবার যতীন্দ্র বাবু বড় পত্রখানি খুলিলেন।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে অন্ধকার হইয়া আসিল। ভৃত্য আসিয়া, পার্শ্বে একটি ছোট টেবিল রাখিয়া তাহার উপর বাতি দিয়া গেল। পত্রখানি দুইবার পাঠ করিয়া যতীন্দ্র বাবু ঘটনাসূত্রগুলি আয়ত্ত করিয়া লইলেন আবশ্যকীয় সংবাদও প্রাপ্ত হইলেন। পরে অন্য দুইখানি পত্রও খুলিয়া পাঠ করিলেন। গদাই পাল মিথ্যা মোকর্দ্দমায় রমণ ঘোষকে জড়াইয়াছে ইহাতে রাগে তাঁহার শরীর জ্বলিতে লাগিল। গদাই যে বৈরনির্য্যাতনের অভিপ্রায়েই এ কার্য্য করিয়াছে তাহাতে যতীন্দ্র বাবুর সন্দেহ মাত্র রহিল না। ভাবিলেন, সে গরীব, হয়ত অর্থাভাবে নিজের মোকর্দ্দমার ভাল করিয়া তদ্বিরও করিতে পারিবে না -- নির্দ্দোষী হইয়াও জেলে যাইবে। তাহার উদ্ধারের উপায় যতীন্দ্র বাবু তখনই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গদাই পালের শেষ পত্র পড়িয়া জানিতে পারিলেন, ২রা পৌষ রমণ ঘোষের মোকর্দ্দমার দিন স্থির আছে। আজ ২৯শে অগ্রহায়ণ। ইতিমধ্যে একটা কিছু উপায় করিবেন স্থির করিয়া তিনি ভিতরে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ মোহিতকে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন --

তোমার ভ্রাতা এখানে সাংঘাতিক পীড়িত, শীঘ্র এস।

যতীন্দ্রনাথ বসু।

লালকুঠী, দেওঘর।

* * * *

দুইদিন পরে সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে মোহিত তাহার ভ্রাতৃজায়াকে লইয়া দেওঘর ষ্টেশনে রেলগাড়ী হইতে নামিল। সারাদিন উপবাস, তাহার উপর দারুণ দুশ্চিন্তা, উভয়ের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে একজন ঝি এবং একজন খানসামা, কুলীর মাথায় জিনিষ পত্র দিয়া ফটক পার হইবামাত্র বিস্তর পাণ্ডা আসিয়া ইহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। অনেক কষ্টে তাহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া, একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া, লালকুঠী যাইবার জন্য মোহিত গাড়োয়ানকে আদেশ করিল।

গাড়ী ছাড়িলে সুলোচনা বলিলেন—"ঠাকুরপো।"—তাঁহার কণ্ঠস্বর অশ্রুকম্পিত।

"কি বউদিদি?"

"টেলিগ্রামে কি লেখা ছিল?"

এই কথাটি সুলোচনা ইতিপূর্ব্বে আরও দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। মোহিত উত্তর দিয়াছে। অন্য সময় হইলে হয়ত সে বিরক্ত হইত—কিন্তু এখন অবস্থা বুঝিয়া স্নেহগর্ভস্বরে পুনরায় টেলিগ্রামের কথাগুলি আবৃত্তি করিল।

বউদিদি বলিলেন—"কি ব্যারাম কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তোমার কি অনুমান হয়?"

"কি করে বলব বউদিদি!—যাহোক, আর ত বেশী দেরী নেই -- এখনি জানতে পারব।"

দুই মিনিট কাল নীরব থাকিয়া, সুলোচনা কাঁদিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো দেখতে পাব ত?"

মোহিত বলিল—"ঈশ্বর কি করেন দেখি বউদিদি। তিনি যা করবেন তাই হবে।"

পূর্ব্ববৎ কম্পিত অশ্রুসিক্ত স্বরে সুলোচনা বলিলেন—"আমি সারা পথ দুর্গানাম জপ করতে করতে এসেছি। মা দুর্গা কি আমার মুখ রাখবেন না?"

মোহিত নীরবে দুই বিন্দু অশ্রুমোচন করিল। সেও একান্তমনে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন গিয়া দাদাকে ভাল দেখিতে পায়।

এইরূপে কুড়ি মিনিট কাল অতীত হইলে গাড়ী থামিয়া গেল। জানালার ফাঁক দিয়া মোহিত দেখিল বৃহৎ বাগান-যুক্ত একটি রক্তবর্ণ অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। গাড়োয়ান দরজা খুলিয়া বলিল—"বাবু, এই লালকুঠী।"

অবতরণ করিয়া, ফটক খুলিয়া মোহিত ভিতরে প্রবেশ

করিল। সম্মুখের বারান্দায় গিয়া দেখিল একজন ভৃত্য বাতি জ্বালিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—"এইখানে যতীন্দ্র বাবু থাকেন?"

বলিতে বলিতে পাশের কামরা হইতে যতীন্দ্র বাবু বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—"কোথা থেকে আসছেন?"

"কল্যাণপুর থেকে। আমার নাম শ্রীমোহিতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"মোহিত বাবু—আসুন আসুন। আমিই আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম।"

"দাদা কেমন আছেন?"

"আজ অপেক্ষাকৃত একটু ভাল।"

"কি হয়েছে?"

"জ্বরবিকার।—গাড়ীতে আর কে আছেন?"

"আমার বউদিদি।"

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন—"ওরে কেষ্টা, গাড়োয়ানকে বল্ গাড়ী ভিতরে এনে অন্দরের দরজায় লাগায়।"—কেষ্টা চাকর বলিতে গেল—পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোহিত গিয়া বউদিদিকে বলিল—"দাদা আজ অনেকটা ভাল আছেন, ভয় নেই।"

ফিরিয়া আসিয়া মোহিত জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা কৈ?"

"আসুন।"—বলিয়া মোহিতকে লইয়া যতীন্দ্রবাবু একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন গোপীবাবু নিদ্রিত। নিকটস্থ চেয়ারখানিতে মোহিত উপবেশন করিল, যতীন্দ্রবাবু পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সেই অল্প শব্দে গোপীবাবু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন—"কে?"

"দাদা—আমি—মোহিত। কেমন আছেন দাদা?"—বলিয়া মোহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া, অগ্রজের পদযুগলে হস্তার্পণ করিয়া স্বীয় ললাট স্পর্শ করিল।

"ভাল আছি। আর কে এসেছে?"

"বউদিদি এসেছেন।"

"কৈ?"

সঙ্গে সঙ্গে অপর দ্বার দিয়া সুলোচনা প্রবেশ করিয়া, গলবস্ত্র হইয়া স্বামীর পদযুগলে নিজ মস্তক রাখিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। মোহিত উঠিয়া বাহিরে গেল।

তখন সুলোচনা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া স্বামীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"কেমন আছ?"

"ভাল আছি। তোমাকে দেখেই আমার অর্দ্ধেক ব্যারাম ভাল হয়ে গেল।"—গোপীবাবুরও চোখে জল আসিতে লাগিল।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

রহস্যভেদ।

এক সপ্তাহ পরে গোপীবাবু পথ্য পাইলেন। মোহিতের উপর সংসারের ভার দিয়া, সেই দিন অপরাহ্নের ট্রেনে যতীনবাবু কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

আরও এক সপ্তাহ কাটিল। যতীন্দ্রবাবু ফিরিয়া আসিলেন।

প্রাভাতিক চা পানাদির পর গোপীবাবু ও যতীন্দ্রবাবু সম্মুখের বারান্দায় দুইখানি ঈজিচেয়ার পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। গোপীবাবু ধূমপান করিতেছেন—যতীন্দ্রবাবু, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আগত, এক সপ্তাহের ডাক খুলিয়া দেখিতেছেন। সুলোচনাকে লইয়া মোহিত বৈদ্যনাথ দেবের দর্শনে গিয়াছে।

যতীন্দ্রবাবুর ডাক দেখা শেষ হইলে গোপীবাবু তাঁহাকে বলিলেন—"যতীন্দ্রবাবু, আমার অসুখের সময় আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তা আমি ইহজন্মে ভুলতে পারব না। আপনি না থাকলে একা আমি এ বিদেশে বিঘোরে মারা যেতাম।"

যতীন্দ্রবাবু বিনয়সূচক প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে বাধা দিয়া গোপীবাবু বলিলেন—"না না—ও কথা বলবেন না। আপনি আমার যা সেবা শুশ্রূষা করেছেন, আমার ভাই সে রকম করতে পারত কি না সন্দেহ। বউমা যে রকম করেছেন তাতে মনে হয় আর জন্মে উনি আমার মা ছিলেন। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার বড় খটকা ঠেকেছে, যতীনবাবু। আমি আপনাদের কাছে নিজেকে রাধামোহন গোস্বামী বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। আমি কে, আমার বাড়ী কোথা, আমার কে আছে, কিছুই প্রকাশ করিনি। আপনি কি রকম করে আমার পরিচয় জানতে পারলেন?—দেখুন, মোহিত আসা অবধিই এ প্রশ্ন আমার

মনে উঠেছে। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জাতেও বটে—সে কদিন আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা কবার অবসর অভাবেও বটে, আপনাকে এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পারি নি।"

যতীন্দ্রবাবু বাগানের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"গোপীবাবু—এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার ইচ্ছা আমারও বারম্বার হয়েছিল—কিন্তু আমিও লজ্জায় পারিনি। আমার দ্বারা একটা বড় অপরাধ হয়ে গেছে। সে জন্যে আপনার কাছে আমার ক্ষমাভিক্ষা করবার আছে।"

অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত গোপীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলুন দেখি?"

যতীনবাবু তখন, গোপীবাবুর তাৎকালিক অবস্থা এবং তাঁহাদের বিষম-সমস্যা বর্ণনা করিয়া, কিরূপ অনন্যগতি হইয়া বাক্স হইতে চিঠি বাহির করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, সমুদায় বলিলেন। শেষে বলিলেন—"সেই চিঠিগুলি পড়ে' আপনার প্রকৃত নাম পরিচয়, আপনার ভাইয়ের নাম, কি কারণে আঁপনি নাম গোপন করে পশ্চিমে এসেছেন, সমস্তই জানতে পারলাম। আর জানতে পারলাম, আপনি একজন ভয়ানক বদমায়েসের হাতে পড়ে গেছেন।"

গোপীবাবু বলিলেন—"কি রকম?"

"ঐযে আপনার গদাই পালটি—ও একটি ভয়ানক লোক। ও পূর্ব্বে আমাদেরই এষ্টেটে ছিল। আপনার ওখানে কেন গিয়ে ও জুটেছে—আপনার সঙ্গে কি কি দাগাবাজি ও করেছে—পরে অনুসন্ধানে সমস্তই আমি জানতে পেরেছি।"

আরাম কেদারায় উচ্চ হইয়া বসিয়া গোপীবাবু রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন—"ব্যাপারখানা কি?"

যতীন্দ্রবাবু তখন গদাই পালের পূর্ব্ব ইতিহাস এবং রমণ ঘোষ ঘটিত ব্যাপারটুকু বর্ণনা করিয়া বলিলেন—

"আপনার চিঠি পড়েই আমার মনে হয়েছিল, রমণ ঘোষকে মিথ্যা মোকর্দ্দমায় ফাঁসাবার যে কারণ গদাই আপনাকে লিখেছে, খুব সম্ভবতঃ তা অলীক—নিজের শত্রু দমন করবার অভিপ্রায়েই ওকাষ সে করেছে। যেদিন সন্ধ্যাবেলা মোহিত বাবুকে টেলিগ্রাম করলাম, তারপর দিনই খুলনার একজন জমিদার—আমার পুরাণো বন্ধু—মোক্ষদাচরণ বাবুকে রেজিষ্ট্রী করে ১০০৲ পাঠিয়ে দিই আর লিখি যে ২রা পৌষ তারিখে রমণ ঘোষের নামে ৪১১ ধারার মোকর্দ্দমা আছে, সে আমার পুরাণো প্রজা, তার তরফে ভাল ভাল উকীল মোক্তার নিযুক্ত করে যেন রীতিমত তদ্বির করা হয় আর আমি সময় পেলেই নিজে খুলনায় আসছি। সে চিঠির উত্তর পাই মোহিত বাবু তখন এখানে—২রা পৌষ তারিখে ফরিয়াদী উপস্থিত না হওয়ায় তার নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে—দশদিন পরে মোকর্দ্দমার তারিখ পড়েছে। আপনি যেদিন পথ্য করলেন, সেদিন আমি যে কলকাতা রওয়ানা হলাম, সে খুলনা যাব বলেই। যেদিন তারিখ ছিল সে দিনও মোকর্দ্দমা ওঠেনি কেনারাম ফরিয়াদী উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু সেদিন ডেপুটির অসুস্থতার জন্যে ফের মোকর্দ্দমা মুলতুবি হয়েছে। ২২শে পৌষ আবার তারিখ। খুলনায় মোক্ষদা বাবুর বাড়ীতে অতিথি হয়ে আমি চার দিন ছিলাম। কতক নিজে, কতক গোপন চর নিযুক্ত করে অনেক বিষয় অনুসন্ধান করে এসেছি। জানতে পেরেছি শুধু গদাই পালের বদমায়েসিতেই নাহক আপনি এত লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন—বিস্তর টাকা সে আপনাকে ঠকিয়েও নিয়েছে।"

গোপীবাবু বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া বলিলেন—"বলেন কি! কি জানতে পেরেছেন?"

"আপনাকে গদাই পাল লিখেছিল, গঙ্গামণিকে নিয়ে রমণ ঘোষ খুলনায় আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছিল, ক্ষুদিরাম মজুমদার মোক্তারকে নিযুক্ত করে নালিশও করেছিল কিন্তু তা ডিসমিস হয়ে যায়।"

"লিখেছিল ত।"

"ক্ষুদিরাম মজুমদার বলে কোন মোক্তারই খুলনায় নেই—কখনও ছিল না। খুলনায় নেই, খুলনার কোন সবডিবিজনেও নেই। আর, গত তিন মাসের মধ্যে গঙ্গামণি বলে কোন লোক খুলনায় কারু নামে কোনও নালিশ দায়েরও করেনি—তা ডিসমিসও হয়নি। আমার নিযুক্ত মোক্তার ইন্‌চার্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নালিশী দরখাস্তের রেজিষ্টার বই তন্ন তন্ন করে দেখে এসে আমায় একথা বলেছে।"

গোপীবাবু ত্রস্তভাবে বলিলেন—"মোক্তারকে আপনি কি বলেছিলেন ?"

যতীনবাবু হাসিয়া বলিলেন—"ভয় নেই। আপনার নাম করিনি। কি রকমের মোকর্দ্দমা তাও বলিনি। যা কিছু অনুসন্ধান করেছি, কারু কাছেই আপনার নাম কিম্বা ব্যাপারটা প্রকাশ করিনি। মোক্তারকে শুধু বলেছিলাম—রেজিষ্টার বই থেকে দেখে এস গত তিন মাসের মধ্যে গঙ্গামণি বলে কোনও স্ত্রীলোক কারু নামে কোনও নালিশ দায়ের করেছিল কি না, যদি করে থাকে তবে সে কোন্ ধারার মোকর্দ্দমা এবং তার ফলাফলই বা কি হয়েছে।"

ইহা শুনিয়া গোপীবাবু আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন—"আর কি জানতে পেরেছেন ?"

"গদাই পাল আপনার কাছে বলেছে রমণ ঘোষ আর আপনার ভাই মোহিত দুজনে মিলে সে স্ত্রীলোকটাকে বাগানবাড়ী থেকে উদ্ধার করেছে—একথা সর্ব্বৈব মিথ্যে। রমণ ঘোষ আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছে, কেনারামের সঙ্গে কোন পুরুষেই তার কোন সম্বন্ধ নেই, মোকর্দ্দমার পূর্ব্বে তার নামও কখনও শোনেনি, গঙ্গামণির নামও কখনও শোনেনি।"

গোপীবাবু বলিলেন—"তাই ত আমি ভাবছিলাম, রমণ ঘোষ যদি কেনারামের অত বন্ধু—ভাই সম্পর্ক—তা হলে কেনারাম কেন রমণের নামে মিথ্যে মোকর্দ্দমা আনতে রাজি হল। গদাই লিখেছিল, দুশো টাকায় কেনারামকে বশীভূত করে থানায় নালিশ করিয়েছে।"

যতীন বাবু হাসিয়া বলিলেন—"সে দুশো টাকা গদাধরের গর্ভেই গিয়েছে। একে ঘুষ দেব তাকে ঘুষ দেব বলে ও কি কম টাকাটা আপনার খেয়েছে! হ্যাঁ—কি বলছিলাম ?—রমণ ঘোষ বল্লে, একজন উকীলের ছেলে শিশিরকুমার বাবু, কালীপূজোর কয়েক দিন পূর্ব্বে তার হাতে মোহিতের জন্যে একখানি চিঠি দিয়েছিল, আর মুখেও বলে দিয়েছিল কালীপূজোর দিন খুলনায় হিন্দুসভা হবে, সেই সভায় মোহিতকে নিশ্চয় যেন সে সঙ্গে করে আনে। আপনাদের বাড়ী গিয়ে সেই চিঠি সে মোহিতকে দিয়েছিল—পরদিন সন্ধেবেলা আবার এসে জবাব নিয়ে গিয়েছিল। কালীপূজোর পূর্ব্বদিন সকালবেলায় সে খুলনা রওয়ানা হয়। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা শিশিরকুমার বাবুর হাতে মোহিতের চিঠি দিয়েছে—এ কথা শিশির আমায় নিজে বলেছে। পরদিন—অর্থাৎ কালীপূজোর দিন সকাল-বেলা মোহিত এসে পৌঁছল—রমণ ঘোষ বেলা ৮টার সময় তাঁর সঙ্গে শিশিরকুমারের বাড়ীতে দেখা করতে এসেছিল। এ কথাও শিশির বাবু বল্লেন। রাত্রের মধ্যে খুলনা থেকে কল্যাণপুরে গিয়ে গঙ্গামণিকে উদ্ধার করা আবার সকাল-বেলা খুলনায় ফিরে আসা রমণ ঘোষের পক্ষে কি সম্ভব ?"

গোপী বাবু বলিলেন—"একবারেই অসম্ভব।"

"আরও দেখুন—গদাই যে লিখেছিল, কালীপূজোর পরদিন প্রত্যূষে থানায় গিয়ে সে দেখে রমণ ঘোষ স্ত্রীলোকটাকে নিয়ে নালিশ করবার জন্যে বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে—সে কথাও মিথ্যা। কারণ শিশির বাবু বল্লেন—তাঁর বাপ উকীল বাবুটিও বল্লেন—কালী-পূজোর পরও দু তিন দিন তাঁরা রমণকে তাঁদেরই বাসায় দেখেছেন।"

গোপীকান্ত বাবু গালে হাত দিয়া হতবুদ্ধি হইয়া প্রায় পাঁচ মিনিটকাল বসিয়া রহিলেন। যতীন্দ্র বাবু সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিলেন।

অবশেষে গোপী বাবু বলিলেন—"সে স্ত্রীলোকটার কি হল কিছু খবর পেয়েছেন ?"

"আমি দরিয়াপুরে একজন গুপ্তচর পাঠিয়েছিলাম। সে এসে বল্লে, গ্রামে প্রকাশ, কেনারামের ভাজ গঙ্গামণি দু তিন মাস তার বাপের বাড়ীতে গিয়েছিল, কালীপূজোর দিন ফিরে এসেছে।"

শুনিয়া গোপী বাবু মনে মনে অত্যন্ত আরাম অনুভব করিলেন। ভাবিলেন—যাক্—তাঁহার বদনামটা প্রচার হয় নাই। কিন্তু গঙ্গামণি যে কি করিয়া পলাইল এবং সব কথা প্রকাশই বা করিল না কেন, ইহা তাঁহার পক্ষে এক সমস্যায় দাঁড়াইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্থির করিলেন—নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য গদাই পালই নিশ্চয় তাহাকে কোনও উপায়ে মুক্ত করিয়া দিয়াছে—এবং লজ্জা ঢাকিবার জন্য স্ত্রীলোকটা আসল কথা গোপন রাখিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে গোপীবাবু বলিলেন—"রমণ ঘোষের মোকর্দ্দমার অবস্থা কি রকম ?"

"অবস্থা কিছু মন্দ নয়। রমণ ঘোষের উঠানে যে খড়ের পাঁজা থেকে বাসন বেরিয়েছে, সেই পাঁজার কাছে দেওয়াল খানিকটে ভাঙ্গা। বাইরে থেকে কেউ অনায়াসেই সেখানে গিয়ে বাসন লুকিয়ে রাখতে পারে। আমি উকীলের পরামর্শ নিয়েছি, তাঁরা বলেন এই কারণেই রমণ ঘোষের খালাস হওয়া উচিত। তবে কি জানেন, ফৌজদারী মোকর্দ্দমা, শেষ ফল কি দাঁড়ায় কিছুই বলা যায় না। কেনারামও শুনলাম মিথ্যে সাক্ষী দিতে খুব নারাজ। সাক্ষী দেবার ভয়েই প্রথমবার পালিয়েছিল। আমার বিবেচনায়, তার উপর একটু চাপ দিয়ে সমস্ত সত্য কথা বলতে তাকে বাধ্য করা উচিত। তা হলে রমণ ঘোষও খালাস পাবে আর গদাই পালও ফৌজদারী সোপর্দ্দ হবে। জেল না হলে গদাই পালের উপযুক্ত শাস্তি হবে না।"

"কেনারাম সত্য কথা বল্লে সে নিজে বিপদে পড়বে না ?"

"তা ত পড়বেই কিন্তু হাকিম নিশ্চয়ই তার অপরাধ লঘু বিবেচনা করবে। সত্য কথা বলেছে বলে অল্প স্বল্প দণ্ডের উপর দিয়েই যাবে।"

"সে রাজি হবে কি ?"

"আপনি তার জমিদার। আপনি নিজে যদি তার উপর একটু চাপ দেন,—তবে হয়ত সত্য বলবে। অন্ততঃ আমাদের চেষ্টা করে দেখা খুবই উচিত।"

"তা বেশ। আমি চেষ্টা করব। যে দিন আপনার সুবিধা হয় বলুন—কল্যাণপুরে যাওয়া যাক্"—

যতীন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"না, কল্যাণপুরে ত হবে না। মোকর্দ্দমার তারিখ ২২শে পৌষ। আমরা দুজনে গিয়ে মোক্ষদাবাবুর বাসাতে উঠব। তারিখের আগের দিন রাত্রে তাকে ডাকিয়ে সমস্ত ঠিকঠাক করতে হবে—সেই বাসায় রাত্রে তাকে রেখে আদালতে পরদিন হাজির করে দেওয়া। বেশী আগে থাকতে ঠিক করলে, কত লোক আবার তাকে কত রকম পরামর্শ দেবে—ভয় দেখাবে—সব ঘুলিয়ে যাবে।"

সেই পরামর্শই স্থির রহিল।

গোপীবাবু তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভ্রাতার প্রতি এতদিন তিনি অন্যায় সন্দেহ করিয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক মোহিত এই সন্দেহের কথা জানিতে পারে নাই, ইহাই মঙ্গল। রোগের সময় মোহিতের অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষায় ইতিমধ্যে তাহার প্রতি গোপীবাবু প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এখন এই অন্যায় অবিচারের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল। ইহার পর হইতে মোহিতের সহিত ব্যবহারেও সে ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। মোহিত একটু বিস্মিত হইল; সুলোচনাও দেবরের প্রতি স্বামীর এই ভাব পরিবর্ত্তনে মনে মনে অত্যন্ত আরাম পাইলেন।

১৯শে পৌষ গোপীবাবুকে লইয়া যতীন্দ্রবাবু খুলনা যাত্রা করিলেন।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মের জয়।

সন্ধ্যা হইয়াছে। মোক্ষদা বাবুর গৃহের একটি কক্ষে, গোপী বাবু ও যতীন্দ্র বাবু উপবিষ্ট। একজন লোক গিয়া বাজারের হোটেল হইতে কেনারামকে ডাকিয়া আনিল।

কেনারাম নিজ জমিদারকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া ভীত হইয়া প্রণাম করিল।

যতীন্দ্র বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"কেনারাম, আমরা সকল কথা জানতে পেরেছি। বাসন চুরির কথা সমস্ত মিথ্যে।"

কেনারাম একবার গোপী বাবুর পানে একবার যতীন্দ্র বাবুর পানে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"আপনি কে হুজুর ?"

গোপী বাবু বলিলেন—"ইনি হুগলি জেলার একজন বড় জমিদার—আমার বন্ধু। তুই যার নামে মিথ্যে নালিশ করেছিস, সেই রমণ ঘোষ আগে এঁরই প্রজা ছিল। ইনি রমণ ঘোষকে খালাস করে নেবার জন্যে এসেছেন। কেন তুই এ মিথ্যে মোকর্দ্দমা করলি ?"

কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া, হাত দুটি জোড় করিয়া কেনারাম বলিল—"মিথ্যে কি করে হজুর ?"

গোপী বাবু ক্রোধে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—"হারামজাদা পাজি !"—

যতীন্দ্র বাবু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"গোপী বাবু রাগ করবেন না। আমার হাতেই ওকে ছেড়ে দিন। আমি ওকে বুঝিয়ে বলছি।—হ্যাঁরে কেনারাম, তুই আমাদের কাছে ছাপাবি? আমরা যে সবই জানতে পেরেছি। তোদের নায়েব গদাই পালের পরামর্শ মতই তুই এ কায করেছিস। কাঁসারি সাক্ষী দেবে বলে তুই আগে থাকতে বাসন মেরামৎ করিয়েছিলি। নিজে ঘরে সিঁধ খুঁড়ে রেখেছিলি। তুই থানায় গিয়ে দারোগাকে বাসন দিয়ে এসেছিলি। দারোগার লোক রাত্রে গিয়ে রমণ ঘোষের ভাঙ্গা পাঁচিল ডিঙিয়ে খড়ের পাঁজায় লুকিয়ে রেখে এসেছিল। কেমন, এ সব কথা সত্যি না মিথ্যে?"

শুনিয়া কেনারাম একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। গোপী বাবুর পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—"হুজুর, আমি নির্ব্বোধ মুখ্যু গয়লা। আমার কোন দোষ নেই। ঐ গদাই পালই যত নষ্টের গোড়া। জেলের ভয় দেখিয়ে আমাকে এ কায করিয়েছে। আমার কোন দোষ নেই হুজুর—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি। আমায় মাফ্ করা হোক্।"

গোপীবাবু বলিলেন—"তোকে মাফ্ করতে পারি—যদি তুই কাল আদালতে সব সত্যি কথা বলিস।"

কেনারাম উঠিয়া দাঁড়াইল। করযোড়ে বলিল—"যদি সত্যি কথা বলি—তবে আমার দশা কি হবে হুজুর?"

যতীন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন—"হ্যাঁরে—তোর কি পাপ পুণ্যের ভয় নেই? আহা রমণ ঘোষ বেচারি কোন দোষের দোষী নয়—কখনও কারু মন্দ করেনি। মেহনৎ কোরে শরীর খাটিয়ে কাচ্ছাবাচ্ছাগুলি পোষে। জেলে গেলে তাকে পাথর ভাঙ্গতে হবে, ঘানি টানতে হবে। কদিন বাঁচবে বল দেখি? যদি জেলে সে মরে যায় তবে নরহত্যার পাপ তোকে লাগবে না কি? তুইও কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করিস্, সে পাপ কি তোর সইবে কেনারাম? তুই-ই কি অমর? একদিন তোকে মরতে হবে না? যমের বাড়ী নিয়ে গিয়ে তোর মাথায় যে তারা লোহার ডাঙ্গস্ মারতে থাকবে!"

কেনারাম অধোমুখ হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে মুখ তুলিয়া বলিল—"যা হবার তা হয়ে গেছে হুজুর। এখন কি করতে বলেন?"

যতীনবাবু বলিলেন—"কাল আদালতে সমস্ত সত্যি কথা বলবি।"

"হ্যাঁ বাবু—দারোগা বলে তা হলে আমারই জেল হয়ে যাবে।"

"সম্ভব।"

"তা হলে আমি কি করে বলি?"

গোপীবাবু বলিয়া উঠিলেন—"পাজি বেটা! নিজের জেলের এত ভয় আর অন্য একজনকে স্বচ্ছন্দে জেলে দিতে যাচ্ছিস? মিথ্যে সাক্ষী যদি দিস তবে তোর ভিটে মাটী উচ্ছন্ন করব জানিস হারামজাদা?"

যতীনবাবু বলিলেন—"থাক্ থাক্—রাগ করবেন না গোপীকান্ত বাবু। ও যদি মিথ্যে সাক্ষীই দেয় তা হলেই কি নিস্তার পাবে? শোন্ কেনারাম যা বলি বেশ করে বুঝে দেখ, তোকে প্রবঞ্চনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তা যদি হত, তা হলে বলতাম—নাঃ—তোর আবার কিসের জন্যে জেল হবে—তোর কিচ্ছু হবে না। তা ত বলছি নে। সত্যি কথা বল্লে, মিথ্যা নালিশ করার অপরাধে খুব সম্ভব তোর কিছু সাজা হবে। যদি মিথ্যে সাক্ষী দিস, তা হলেই কি পার পাবি? খুলনার যত বড় বড় উকীল, সকলকেই আমরা রমণ ঘোষের পক্ষে নিযুক্ত করেছি। তারা যখন তোকে জেরা করতে উঠবে, তখন বাপের নাম ভুলে যাবি তা জানিস? জেরায় টুকরো টুকরো হয়ে যাবি। তোর মিথ্যে কথা কতক্ষণ টিকবে? ওরা সাক্ষীর পেটে ডুবুরি নামিয়ে কথা বের করে ফেলে। বড় বড় বিদ্বান ভদ্রলোকই জেরার চোটে অস্থির হয়ে যায়—তুই ত মুখ্যু গয়লার ছেলে। ফল এই হবে—মোকর্দ্দমা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে যাবে—রমণ ঘোষ খালাস পাবে—উল্টে তোর নামে একদফা মিথ্যে নালিশ করার একদফা মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার—এই দুই দফা মোকর্দ্দমা চলবে। কত টাকা তোর আছে?—সে সময় কজন উকীল-মোক্তার তুই দিতে পারবি বল দিকিন?"

কেনারাম দেখিল, বাবু যাহা বলিতেছেন তাহা বড় মিথ্যা নয়। যদি তাহার উপর মোকর্দ্দমা চলে,

একজন উকীল দিতেই তাহার হাল গোরু বিক্রয় হইয়া যাইবে।

নিতান্ত ভীত হইয়া কেনারাম বলিল—"তা হুজুর —আমার কত দিন জেল হবে?"

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"তোর মোকর্দ্দমা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে গেলে, অন্ততঃপক্ষে মিথ্যে নালিশ করার জন্যে এক-বছর, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে একবছর—এই দুই বছর জেল হবে।"

"আর, যদি আমি সত্যি কথা বলি?"

"যদি সত্যি বলিস, তাহলে হাকিমের নিশ্চয়ই দয়া হবে। সব অবস্থা হাকিম যখন শুনবে—তখন বুঝতে পারবে—তুই দোষ করেছিস বটে কিন্তু অন্য লোকের কুমন্ত্রণায় করেছিস। একমাস কি দুমাস কি বড় জোর তিনমাস তোর জেল হবে—এর বেশী নয়।"

"আজ্ঞে তিনমাস যদি আমার জেল হয়—এ তিনমাস আমার ছেলেপিলে খাবে কি?"

গোপী বাবু বলিলেন—"শোন কেনারাম। যদি সব সত্যি কথা বলে তোর জেল হয়—তবে যতদিন তুই জেলে থাকবি—আমি মাসে মাসে তোর ছেলেপিলের খোরাকীর জন্যে ৫০৲ করে দেব। তোর জমি চাষবাস করাবার বন্দোবস্ত নিজে থেকে করে দেব—তা ছাড়া তোর এ বছরের হালবকেয়া খাজনা মাফ্। আর, যদি মিথ্যে সাক্ষী দিস, আমার এলাকায় আর থাকতে পাবি নে।"

কেনারাম নীরবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বলিল—"আমার নামে যখন মোকর্দ্দমা চলবে হুজুর—আমি উকীল দিতে পাব কোথা?"

"আচ্ছা যা—সে ভারও আমার। এখন বল্—সত্যি কথা বলবি কি না?"

"আজ্ঞে হুজুরের হুকুম কি আমি কোনও দিন অমান্য করেছি। আপনিই আমার বাপ আপনিই আমার মা। আমি আদালতে সত্যি কথাই বলব। কিন্তু হুজুর, একটা অনুরোধ আছে।"

"কি?"

"আমার জেল হলে হুজুর এই যে মাসে ৫০৲ আমার ছেলেপিলের খোরাকীর হুকুম করলেন, সে টাকাটা জেল থেকে বেরিয়ে এসেই আমি নেব। ঘরে যা ধান চাল আছে, তাতে কোন রকমে আমার ছেলেপিলের খাওয়া পরা চলে যাবে। টাকা যদি হুজুর আমার ইস্তিরীকে পাঠিয়ে দেন, তাহলে তক্ষণি সে স্যাকরা ডেকে গয়না গড়াতে দেবে, আমি পাব না। তার চেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসে আমি টাকাটা হুজুরের কাছ থেকে নিয়ে একজোড়া বলদ কিনব। আমার ইস্তিরী বড় বজ্জাৎ হুজুর—তার হাতে টাকা দেবেন না।"

এই কথা শুনিয়া যতীন্দ্রবাবুর অধরের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। গোপীকান্ত বলিলেন—"আচ্ছা তাই হবে।"

কেনারাম রাত্রে সেখানেই রহিল।

পরদিন আদালতে সাক্ষ্যমঞ্চে উঠিয়া, কেনারাম আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত সত্যভাবে বর্ণনা করিল। কোর্টবাবু পুলিসের তরফ হইতে তাহাকে জেরা করিতে উঠিলেন। গত রাত্রে ডাকিয়া পাঠান, গোপীবাবু ও যতীনবাবুর সঙ্গে যেসকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল জেরায় কেনারাম সমস্তই স্বীকার করিল। ইহাতে তাহার প্রতি ডেপুটিবাবুর বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।

ডেপুটী বাবু রমণ ঘোষের উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"এই গদাই পাল আসামীকে ফাঁসাইবার জন্য চেষ্টিত কেন?"

উকীল, যতীনবাবুর নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন, সমস্ত বলিলেন।

হাকিম তখন দারোগার সাক্ষ্য লইলেন। তাহার জেরায় প্রকাশ হইল, যে খড়ের পাঁজা হইতে বাসন বাহির হইয়াছে, সে স্থানের প্রাচীর ভগ্ন—বাহিরের লোক অনায়াসেই সেখান দিয়া প্রবেশ করিতে পারে।

আর কাহারও সাক্ষ্য না লইয়া ডেপুটিবাবু রমণ ঘোষকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিলেন। উকীলকে বলিলেন—"যতীনবাবু কোথা?—তাঁহার সাক্ষ্য লইয়া কেনারাম ও গদাই পালের উপর ২১১ ধারায় মোকর্দ্দমা চালাইতে চাহি।"

যতীনবাবু উঠিয়া, হলফ করিয়া, গদাই পাল ও রমণ ঘোষ ঘটিত সমস্ত ব্যাপার বলিলেন। হাকিম তখন উভয়ের বিরুদ্ধে প্রসিডিং লিপিবদ্ধ করিয়া কেনারামকে হাজতে

দিলেন এবং গদাই পালের নামে ওয়ারেন্ট বাহির করিলেন।

আদালত হইতে বাহির হইয়া রমণ ঘোষ একবার যতীনবাবুর একবার গোপীবাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। বলিল—আপনাদের দুজনের কৃপায় আজ আমার পুনর্জ্জন্ম হল। আপনারা না থাকলে আজ আমার কি হত!"

লোকে বলাবলি করিতে লাগিল—"কলিকালেও ধর্ম্মের জয় হইয়াছে।"

পরম আনন্দে কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে মোক্ষদাবাবুর বাটীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রমণ ঘোষও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যতীন্দ্রবাবুকে লইয়া গোপীবাবু সেই রাত্রেই কল্যাণপুর যাত্রা করিলেন। সেখানে একদিন অবস্থিতি করিয়া উভয়ে আবার দেওঘর যাইবেন।

কিন্তু কল্যাণপুরে পৌছিয়া ইহাঁদের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। গোপী বাবু দেওঘর হইতে একখানি পত্র পাইলেন—সুলোচনা লিখিয়াছেন। পত্রখানি এই—

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

প্রণামান্তে নিবেদন—

অভিন্নহৃদয়েষু, অদ্য প্রাতে ঠাকুরপো তোমার পত্র পাইয়াছেন। তুমি নিরাপদে খুলনায় পৌছিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম।

আজ তোমায় একটি শুভ সংবাদ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি এ পত্র লিখিতেছি—আমায় কি পুরস্কার দিবে বল। তোমার ভাইটিকে বিবাহ করিতে রাজি করিয়াছি। তোমরা যেদিন যাত্রা কর, সেইদিন বৈকালে রামকমল বাবুর বাটীর মেয়েরা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন দেখিয়া গিয়াছ। গত কল্য যতীন্দ্র বাবুর স্ত্রী ও আমি তাঁহাদের বাটীতে গিয়াছিলাম। রামকমল বাবুর একটি বিবাহযোগ্যা সুন্দরী মেয়ে আছে। রামকমল বাবুর স্ত্রী আমায় বিশেষ করিয়া ধরিয়া বলেন, "এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার দেবরের বিবাহ দাও।" আমি বলি, "তাহা হইলে ত বড় সুখের হইত কিন্তু আমার দেবর যে বিবাহ করিতে চাহেন না।" তথাপি রামকমল বাবুর স্ত্রী অনেক জিদ করাতে, মোহিতকে আবার অনুরোধ করিয়া দেখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসি। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরপোর কাছে কথাটা পাড়িলাম। অনেক তর্ক বিতর্ক অনুনয় বিনয়ের পর ঠাকুরপো বলিলেন—"যদি তোমরা আমার বিবাহ দিবার জন্য এতই উৎসুক হইয়া থাক, তবে ওখানে নয়, অন্য একস্থানে হইলে আমি বিবাহ করিতে পারি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কোন স্থান?" ঠাকুরপো বলিলেন, "খুলনার নিকট সাগরদীঘি নামক একটি গ্রাম আছে। গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথাকার জমিদার। পূর্ব্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, এখন তিনি পেন্সন লইয়া নিজ জমিদারী দেখিতেছেন। তাঁহার একটি মেয়ে আছে, নাম সরোজিনী—লোকে তাহাকে চিনি বলিয়া ডাকে। সেই মেয়েটির সঙ্গে হইলে আমি বিবাহ করিতে পারি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহাদের মত হইবে ত?" ঠাকুরপো বলিলেন, "গত শ্যামাপূজার পর দুই সপ্তাহ আমি তাঁহাদের বাটীতে ছিলাম। চিনির ভাই প্রমথনাথ আমার সহপাঠী বন্ধু। সে সময় চিনির মা বিবাহের প্রস্তাবও করিয়াছিলেন কিন্তু তখন আমি রাজি হই নাই।"

মেয়েটি নাকি বড় লক্ষ্মী ও খুব সুন্দরী। সুতরাং আমার ইচ্ছা, এখানে ফিরিবার পূর্ব্বে তুমি গিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া, পাকাপাকি কথা কহিয়া আসিও। পার ত যতীন বাবুকেও সঙ্গে লইও। যত শীঘ্র হয় বিবাহের দিনস্থির করিয়া ফেলিও, কারণ বিলম্বে ঠাকুরপোর মত আবার যদি পরিবর্ত্তন হইয়া যায় তবেই মুস্কিল।

আমরা ভাল আছি। যতীন বাবুর স্ত্রী ভাল আছেন—তাঁহার ছেলেমেয়েরাও ভাল আছে। তুমি কবে এখানে ফিরিবে লিখিও। মেয়েটিকে দেখিতে যাওয়া সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিলম্ব করিবে না। মাঘমাসে যদি বিবাহের ভাল দিন থাকে তবে তাহাই স্থির করিয়া আসিও।

সেবিকা

শ্রীমতী সুলোচনা দেবী।

পত্র পাঠ করিয়া গোপীবাবুর মুখে আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন—"ওহে যতীন, আজ ত আমাদের যাওয়া হতে পারে না।"

"কেন?"

"এই দেখ"—বলিয়া সুলোচনার পত্রখানি তিনি যতীন্দ্রবাবুর হস্তে দিলেন।

পাঠ করিয়া যতীন্দ্রবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"বেশ ত, আমিও যাব। কাল ভোরেই রওয়ানা হওয়া যাক্ চলুন।"

তখনই পাল্কী বেহারা ডাকিতে লোক ছুটিল। যথা সময়ে উভয়ে সাগরদীঘিতে পৌঁছিলেন। বহু সম্মানে গুরুদাসবাবু ইহাঁদের অভ্যর্থনা করিলেন। কন্যা দেখিয়া গোপীবাবু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল ২৪শে মাঘ।

দ্বাপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

শেষ কথা।

কেনারামের সাক্ষীরা দরিয়াপুরে পৌঁছিবামাত্র সকল কথা প্রচার হইয়া পড়িল। গদাই পালের কাছেও এ সংবাদ পৌঁছিল। শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। নিজের টাকা কড়ি যাহা ছিল তাহা পেটকাপড়ে বাঁধিয়া সে তৎক্ষণাৎ থানার দিকে ঘোড়া ছুটাইল।

অর্দ্ধ পথে গিয়া গদাই ভাবিল—আমি করিতেছি কি! ওয়ারেণ্ট ত দারোগার কাছেই আসিবে—হয় ত এতক্ষণ আসিয়াছে। আমি গেলেই ত দারোগা আমায় গেরেপ্তার করিবে। ২১১ ধারার মোকর্দ্দমা—জামিনও নাই। আমায় কল্য বন্দীভাবে খুলনায় পাঠাইয়া দিবে—সেখানে যদি ম্যাজিষ্ট্রেট জামিনের হুকুমও দেয়—তবে আমার জামিন হইবে কে? আমি বরং নিজেই খুলনায় গিয়া উকীল লইয়া জামিনের দরখাস্ত সহ হাজির হই। যদি কেহ জামিন হইতে না চাহে—জামিনের পরিমাণ টাকা জমা করিয়া দিব। কিন্তু যদি বেশী টাকার জামিনের হুকুম হয়? পাঁচ শত কি হাজার? অত টাকা ত সঙ্গে নাই। যাই, কল্যাণপুরে আমার বাসা হইতে পোঁতা টাকা তুলিয়া লইয়া যাই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া গদাই পাল ঘোড়ার মুখ ফিরাইল—কল্যাণপুরের দিকে অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে চলিল, কারণ এক প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে কল্যাণপুরে প্রবেশ করা তাহার অভিপ্রেত নহে।

কিছুদূর গিয়া আবার ভাবিল, যদি থানার লোক ওয়ারেণ্ট লইয়া আমায় গেরেপ্তার করিতে দরিয়াপুর যায়, এবং সেখানে না পাইয়া যদি কল্যাণপুরে আসে?—তাহা হইলে ত বাসা হইতে বাহির হইবার সময় টাকা কড়ি সুদ্ধ ধরা পড়িয়া যাইব! তাহার অপেক্ষা একটু অন্ধকার হইলেই কল্যাণপুরে পৌঁছিয়া, টাকা কড়ি লইয়া, সরিয়া পড়া ভাল। সুতরাং গদাই আবার ঘোড়া ছুটাইল।

রাত্রি আটটা বাজিয়াছে। শয়নঘরের মেঝের ঈশান কোণে গদাই পালের অসদুপার্জ্জিত টাকাগুলি পোঁতা ছিল। সেইমাত্র গদাই সেগুলি খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। দ্বার অর্গলবদ্ধ। হঠাৎ বাহিরে কে করাঘাত করিতে লাগিল।

গদাই বলিল—"কেও?"

"শীঘ্র খোল।"—গদাই চিনিল, হরিদাসীর কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি বিছানাটা টানিয়া রুমালের উপর ঢাকা দিয়া, দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল—"হরিদাসী এখন যাও।"

"কেন যাব?"

"আজ আমার শরীর ভাল নেই যাও। কাল এস এখন।"

বিদ্রূপের স্বরে হরিদাসী বলিল—"ঈস্!—ভারি দয়া যে, কাল এস এখন! খোল বলছি, নইলে আমি গোলমাল করব—লোক ডাকব। আমি তোমার গুণ সব জানতে পেরেছি। খোল।"

গদাই দেখিল, না খুলিলে হরিদাসী এখনি গোলযোগ বাধাইবে। সুতরাং প্রদীপটা হাতে করিয়া আনিয়া, দরজা খুলিয়া বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু হরিদাসী তাহাকে ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিছানার কাছে গিয়া বসিল—"এ কি।"

"কি আবার? বিছানা।"

"কি খুঁড়ছিলে?"

"খুঁড়ব আবার কি?"

"নাঃ—খুঁড়ব আবার কি! আমি দোরের ফাঁক দিয়ে প্রায় দেখিনি?"—বলিয়া হরিদাসী সজোরে বিছানা টানিয়া সরাইয়া ফেলিল। মুখে সরা বাঁধা একটা হাঁড়ি বাহির হইল। গদাই "কর কি? কর কি?" বলিতে বলিতে

হরিদাসী হাঁড়ির মুখের সরা খুলিয়া ফেলিল। টাকা ও নোটে তাহার অর্দ্ধেকটা ভরা রহিয়াছে দেখা গেল।

হরিদাসী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"দাও আমার ২৫০৲ গুণে দাও।"

"তোমার টাকা ত সেই বাক্সতে আছে।

"তা থাকুক—তুমি তাই থেকে নিও। আমার ২৫০৲ এই থেকে দাও।"

গদাই তখন অত্যন্ত প্রেমবিগলিতভাবে বলিল—"এ টাকা কি দেবার যো আছে হরিদাসী—এ যে সরকারী টাকা। এখনি এ টাকা নিয়ে গিয়ে খাজাঞ্চি মশায়ের কাছে জমা দিতে হবে। তোমার সে বাক্স দরিয়াপুরে আছে—যদি বল, কাল এনে দেব। তোমার টাকা নিও।"

হরিদাসী বলিল—"যাও যাও ন্যাকামি রাখ। কাল উনি আমায় টাকা এনে দেবেন। তোমার নামে ওয়ারিন বেরিয়েছে আমি প্রায় জানিনে!—তুমি এসেছ টাকা কড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে বলে। বাবুরা বলাবলি করছিলেন, ওয়ারিনের নাম শুনে গদাই ফেরার না হয় —সে কথা আমি জানালার বাহিরে দাঁড়িয়ে প্রায় শুনিনি কি না! তখনি আমি মনে জানি, পালাবার আগে তুমি নিশ্চয় নিজের জিনিষ পত্তর নিতে আসবে। আমি তোমার জন্যে ওৎপেতে বসে ছিলাম। বাইরের দরজায় খিল দিয়ে রেখেছিলে, ফাঁক দিয়ে চুলের কাঁটা ঢুকিয়ে খিল সরিয়ে সরিয়ে দরজা খুলেছি। যে চুলোয় ইচ্ছে সে চুলোয় যাও—আমার ২৫০৲ দিয়ে যাও। এক্ষণি দাও—নইলে আমি খুন কল্লে গো মেরে ফেল্লে গো বলে এমন চেঁচাব যে পাড়াসুদ্ধ লোক ছুটে আসবে। গোণ টাকা।"

গদাই দেখিল, দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পাপকে বিদায় না করিতে পারিলে নিজের পলায়নেও বিলম্ব হইয়া যাইবে। সুতরাং গাদাই টাকা গণিয়া গণিয়া হরিদাসীর আঁচলে দিতে লাগিল।

হরিদাসী বলিল—"আমার নোট চাই।"

গদাই কাতরভাবে বলিল—"টাকাই নাও হরিদাসী। নোটগুলো থাকলে নিয়ে আমার পালাবার সুবিধে হবে। ভারি টাকা নিয়ে আমি কোথা যাব?"

"আচ্ছা, টাকাই দাও।"

গদাই ২৪০৲ হরিদাসীকে দিয়া বলিল—"এই হল ২০০৲ এখন যাও। যদি পুলিস এসে পড়ে আমাকেও ধরবে তোমাকেও ধরবে।"

"সাবধানে পালিও, যেন ধরে না ফেলে"—বলিয়া হরিদাসী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

গদাই তখন ভাবিল—"কি করি?—খুলনায় গিয়ে হাজিরই হই—না ফেরার হই? যদি সাজা দেয়, ছটি বছরের কম ত নয়। এ বয়সে কি আর পাথর ভাঙ্গতে পারব? এখনও প্রায় হাজার টাকা রয়েছে। তাই নিয়ে গয়া কাশী মথুরা বৃন্দাবন কোথাও গিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে একটা দোকান টোকান খুলি। সেই ভাল। বুড়ো বয়সে আর পাথর ভাঙ্গতে পারব না। আশ্চর্য্য কথা, এটা কিন্তু আমার মনেই হয়নি। ভাগ্যিস্ হরিদাসী বল্লে। এতলোককে বুদ্ধি দিই—নিজের বেলাই বুদ্ধি লোপ হয়ে গিয়েছিল! খুব সময়ে এসেছিলে হরিদাসী—তোমায় ঋণ জন্মে ভুলতে পারব না।"

গদাই তখন টাকাকড়িগুলি গুছাইয়া লইয়া, ঘোড়াটা সেইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া, অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল। পুলিস্ অদ্যাবধি তাহার কোন সন্ধান পায় নাই।

যথা সময়ে কেনারামের বিচার হইল। সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া দয়ালু হাকিম মাত্র ছয় সপ্তাহ কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন।

শুভদিনে শুভলগ্নে চিনির সহিত মোহিতের বিবাহ হইয়া গেল। এই উপলক্ষ্যে গুরুদাস বাবুর গৃহে বহু কুটুম্বের সমাগম হইয়াছিল। বাসরঘরে তরুণীরা অর্দ্ধরাত্রি অবধি গান গাহিয়া, অবশেষে মোহিতকে গাহিবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

মোহিত বলিল—"যদি কনে একটি গান গায়, তবেই আমি গাব।" তরুণীরা চিনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "কি লো, তোর বর গাইলে তুই একটি গান গাবি?" চিনি ঘোমটার মধ্যে হইতে অস্ফুটস্বরে বলিল—"গাব।" তাহাকে জন্মে কেহ কখনও গান গাহিতে শোনে নাই। সকলেই ভাবিতে লাগিল, চিনি কি রকম গান গাহে দেখা যাইবে। মোহিত, যথাবিদ্যা, গাহিল। অবশেষে

চিনির প্রতিশ্রুতিপালনের সময় আসিলে, সে উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে তাহার গ্রামোফোনটি তুলিয়া আনিয়া বলিল—"এইটি আমার প্রতিনিধি—একে যত গান গাইতে বলবে, গাইবে।"

চিনির বুদ্ধি দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। "প্রতিনিধি" তখন রাগিণীর পর রাগিণী বর্ষণ করিয়া সভায় আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিল।

সমাপ্ত।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ফরমোজা দ্বীপের কাপালিক

আদিম মনুষ্যের অসভ্য অবস্থার আভাস জগৎ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। মধ্য আফ্রিকায় এবং ফর্ম্মোজা দ্বীপে আদিম মানবের রূপ এখন পর্য্যন্ত যে অপরিবর্ত্তিত আছে তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য। আফ্রিকা একটি দুর্গম ও বিস্তৃত মহাদেশ—সেখানে সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া মানুষের থাকা সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু ফর্ম্মোজা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ—সুসভ্য চীন সাম্রাজ্যের সন্নিহিত, ভারতীয় বৌদ্ধ অভিযানের পথে অবস্থিত এবং অধুনা জাপান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত—এখানে অধিবাসী-দিগের আদিম ভাব রক্ষা করা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।

ফর্ম্মোজা দ্বীপের অধিবাসীরা আদিম মানবের পর্ণ-কুটীরে বাস করে, নির্ব্বিকার উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করে, গোটা গাছ খুদিয়া ডোঙা গড়িয়া সমুদ্রে বেড়ায় এবং নিষ্ঠুর রক্তলোলুপ স্বভাবের পরিচয় দেয়। নরকপাল সংগ্রহ করা ইহাদের সাংঘাতিক বাতিক; সুতরাং ইহাদিগের সাক্ষাৎ নিতান্তই ভয়ানক। এবং এ পর্য্যন্ত যাহারা ঐ দ্বীপে পদার্পণ করিয়াছে তাহারা হয় নিজেদের মাথা দিয়াছে কিংবা মাথা বাঁচাইবার দারুণ দুর্ভাবনায় সর্ব্বদাই সশস্ত্র হইয়া থাকিয়াছে। সশস্ত্র সৈনিকেরাও এই অসভ্যদিগের আক্রমণ নিতান্ত ভয়ের কারণ বলিয়াই মনে করে।
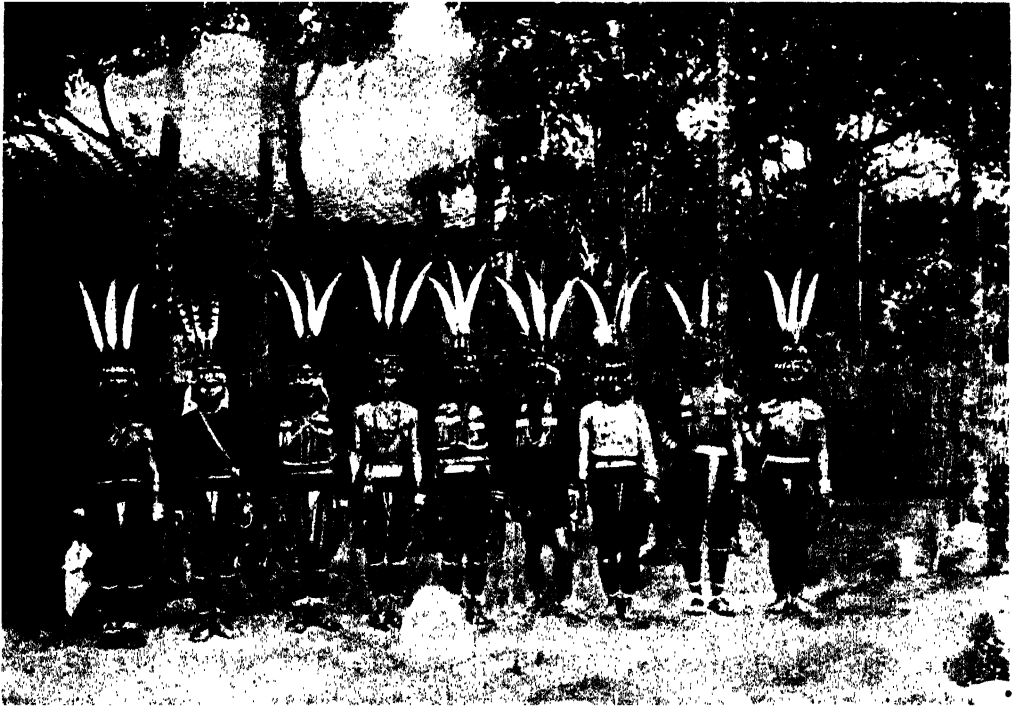
ফরমোজা দ্বীপের অসভ্য অধিবাসীর যুদ্ধসজ্জা।

১৮৯৫ সালে জাপান চীনের কাছ হইতে এই দ্বীপ

ফরমোজানদিগের ডোঙা।

দখল করা অবধি এই অসভ্যদিগকে বশীভূত ও সভ্য করিবার অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু অসভ্যেরা সভ্যতা এক নূতন উপদ্রব মনে করিয়া জাপানীদের সকল শুভ চেষ্টা পণ্ড করিয়া দিতেছে এবং এমন কি প্রাণান্তকর যুদ্ধেও উভয় পক্ষের একটা শেষ মীমাংসা হইয়া যাইতেছে না। ফরমোজার জনসংখ্যা একলক্ষ, নয়টি জাতিতে বিভক্ত হইয়া আটশ গ্রামে বাস করে। উহাদের মধ্যে উত্তর দেশের অধিবাসীরাই অধিকতর, দুৰ্দ্ধর্ষ ও মাথা কাটার বাতিকটা তাহাদেরই বেশীমাত্রায়।

ফরমোজার অধিবাসীরা মহামানবের মালয়-শাখাভুক্ত; কিন্তু তাহাদের মুখাবয়ব অনেকটা অসভ্যদশায় পতিত চীনাদের মতো। কোনো কোনো জাতির স্বভাব অনেকটা কোমল ও নমনীয়, তাহারা ক্রমশ সভ্যভব্য ভাবে নিয়ম-শাসনের বশীভূত হইতেছে; ইহা হইতে বোধহয় যে উহারা মিশ্রজাতি হওয়াই সম্ভব।

ফরমোজানদিগের নরকপাল সংগ্রহের বাতিকের দুটি কারণ—প্রথম শত্রুনিপাত, এবং দ্বিতীয় কপালসংখ্যার দ্বারা নিজের প্রাধান্য মর্য্যাদা ও সম্মানের বৃদ্ধি। যে যত অধিক সংখ্যক নরকপাল সংগ্রহ করিতে পারে সে তত মাতব্বর বলিয়া গণ্য হয়; যে হতভাগা নরকপাল সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহাকে কোনো যুবতী পতিত্বে বরণ করে না, কারণ সে তাহার পরিবার রক্ষার উপযুক্ত ক্ষমতার পরিচয়ও কিছুই দেখায় নাই। এই কাপুরুষতার লজ্জা দূর করিবার ও সুন্দরীর চিত্তহরণ করিবার একমাত্র উপায় কপালসংগ্রহ, এজন্য যুবকেরা সদাসর্ব্বদা কপাল-সংগ্রহের চেষ্টায় থাকে, এবং মাথা কাটিবার সুযোগ পাইলে সে প্রলোভন সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। প্রত্যুষে উঠিয়া যুবকেরা বনের মধ্যে, ঝোপের ধারে ওত পাতিয়া শিকারের সন্ধান করে; হয় ত অপেক্ষায় সমস্ত দিন কাটিয়া যায়; তারপর সন্ধ্যাকালে কৃষক বা কৃষকগৃহিণী ক্ষেত্রকর্ম্ম করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে দেখিয়া শিকারী তাহার সাংঘাতিক বাণে তাহাকে বিদ্ধ করে এবং আনন্দে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে গিয়া পতিত কৃষকের স্পন্দ্যমান উষ্ণ দেহ হইতে মাথাটি কাটিয়া উল্লাসগর্ব্বে নাচিতে নাচিতে আপন
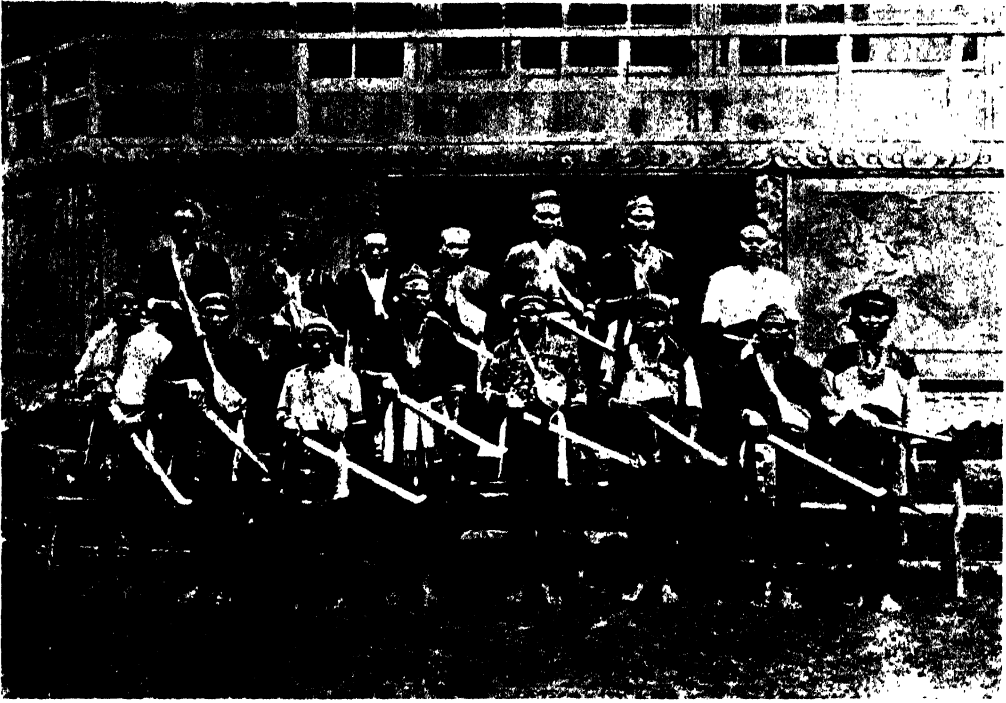
ফরমোজা দ্বীপের অধিবাসী—অসভ্যদশায় পতিত চীনাদের অনুরূপ

ফরমোজানদিগের নরকপাল সংগ্রহ।

দলে ফিরিয়া যায়। হত ব্যক্তি যদি শিশুর জননী হয় তাহা হইলে শিকারীর আর আনন্দের সীমা থাকে না, এক ঢিলে দুই পাখী শিকার খুব সৌভাগ্য ও শুভজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং এরূপ শিকারীকে সমস্ত গ্রাম বিকট চীৎকার করিয়া অভিনন্দিত করে। এইরূপে এই দ্বীপের কত উপনিবেশী, কত পুলিশ প্রহরী, কত সৈন্য তাহাদের অসতর্ক মুহূর্ত্তে নিজেদের মাথা দিয়া বাসিন্দাদের গৌরব বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে।

ফরমোজানদিগের উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান
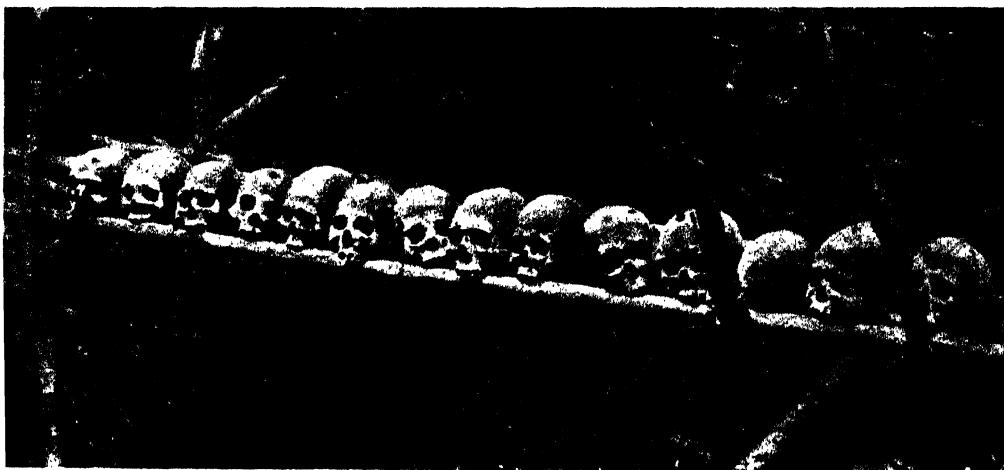
ফরমোজানদিগের নরকপাল সংগ্রহ।

কখনো কখনো দিনান্তের শিকারের পর মস্তকগুলি একত্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য ও চীৎকারে উৎসব শেষ হয়। তারপর বাঁশের বা কাঠের সাঙার উপর সেই সকল করোটি সাজাইয়া রাখা হয়, কিংবা ঘরের আড়ার সঙ্গে মালা করিয়া ঝুলাইয়া গৃহশোভা বর্দ্ধিত করা হয়।

মাঝে মাঝে জাপানী সৈন্যেরা এইসকল মরিয়া জাতির একএকটা গ্রামে জোরজবরদস্তি করিয়া প্রবেশ

ফরমোজানদিগের নরকপাল সংগ্রহ।

করিয়া দেখিতে পায় হয় ত তাহাদের কত সঙ্গীর শুষ্ক মস্তক গ্রামের ঘরে ঘরে সাজানো রহিয়াছে। তখন তাহাদের মনের ভাব যেমন হয় তাহা তাহারাই জানে। যদি কখনো কখনো তাহারাও বন্ধুভাব ভুলিয়া মাথার বদলে মাথা কাটে তবে তাহাদিগকে অধিক দোষ দেওয়া যায় না।

জাপানী গবর্মেণ্ট অসভ্যদিগকে সুসভ্য, দুর্দ্ধর্ষদিগকে বিতাড়িত, এবং গ্রামসীমায় আবদ্ধ রাখিয়া উপনিবেশী-দিগকে রক্ষা করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। জাপানী সৈন্য ও পুলিশ ক্রমশ গ্রামের পর গ্রাম দখল করিয়া দণ্ড ও মৈত্রী দ্বারা শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদিগকে সুশাসিত করা আর মশার ঝাঁক সংযত করা একই প্রকারের দুঃসাধ্য ব্যাপার। শুধু যে তাহাদের পর্ব্বতগৃহে তাহাদিগকে আক্রমণ করা কঠিন তাহা নহে, আক্রমণকারীদিগকে অতর্কিত ফাঁদে ফেলিয়া তাহারা অনায়াসে সকলকে বধ করে। খুব উঁচু পাহাড়ের উপর হইতে তাহারা আক্রমণকারীদিগকে বধ করিতে থাকে; যেসকল আক্রমণকারী প্রাণ বাঁচাইয়া বহু কষ্টে পর্ব্বতে উঠিতে পারে, তাহারা গিয়া দেখে
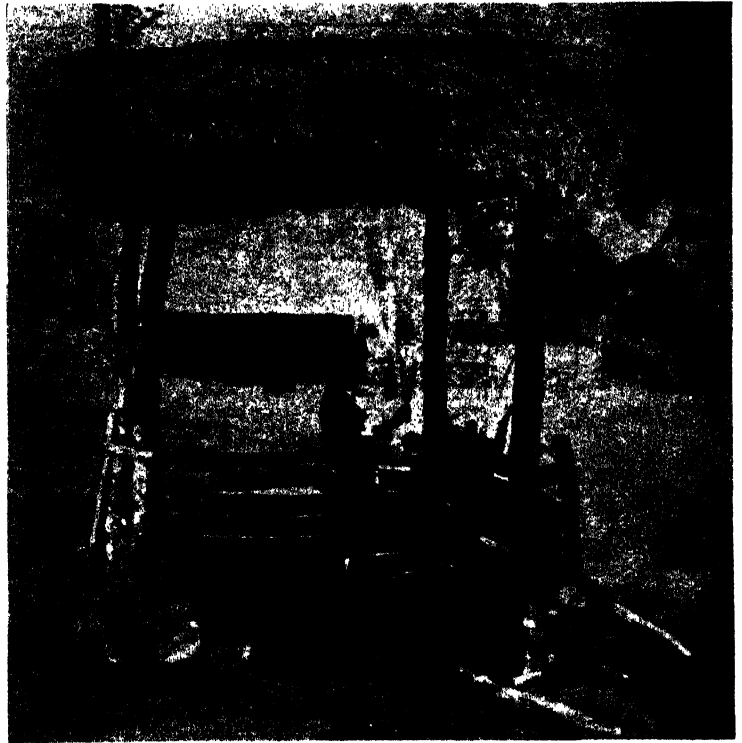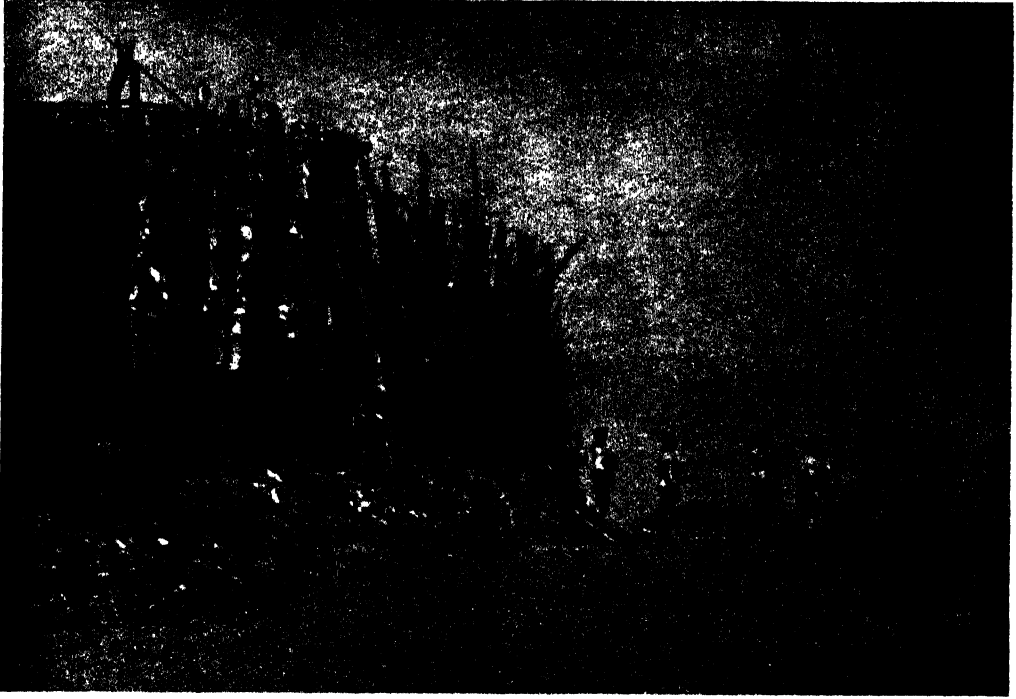
ফরমোজা দ্বীপে জাপানী পুলিসের ঘাঁটি।

ফরমোজা দ্বীপে জাপানী পুলিস অসভ্যদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সেখানে একটিও জনমানব নাই, সব কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে।

অবশেষে জাপানীরা হতাশ হইয়া নিরীহ ও দুর্দ্ধর্ষ জাতির গ্রামসীমা তাড়িৎপূর্ণ সকণ্টক তারের বেড়া দিয়া ঘিরিয়াছে। এবং মধ্যে মধ্যে পাহারার ঘাঁটি রাখিয়াছে। অসভ্যেরা আসিতেছে দেখিলেই ঘাঁটিদার ঢাকপিটিয়া সকল ঘাঁটিকে সতর্ক করিয়া দেয় এবং পুলিসসৈন্য একত্র হইয়া সীমা রক্ষা করে। এত সতর্কতা সত্ত্বেও অসভ্যেরা ঘাঁটিদারের দৃষ্টি এড়াইয়া মাথা সংগ্রহ করিয়া বিজয়গর্ব্বে ফিরিয়া যায়। প্রত্যেক বৎসরই উপনিবেশীর হতের সংখ্যা শতের কোটায় গিয়া পৌঁছে।

জাপানীরা ইচ্ছা করিলে এই অসভ্যদিগকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া দ্বীপটি নিজেদের উপনিবেশ করিয়া লইতে পারে; কিন্তু তাহারা এখন পর্য্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত ধনজন নষ্ট করিয়া উহাদিগকে সুসভ্য করিয়া তুলিতেই চেষ্টা করিতেছে।

যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিতেছে তাহাদিগকে জাপানীরা মাছধরা ও কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে। কিন্তু একবার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে বলিয়া চিরকাল তাহাদিগকেও বিশ্বাস করা নিরাপদ হইতেছে না; বশীভূতদিগকে শান্ত সীমানার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার পর বাহির হইতে অসভ্যেরা আক্রমণ করিলে কখনো কখনো বশীভূত অসভ্যেরাও বিদ্রোহী হইয়া শত্রুর সহিত যোগ দিয়া বিষম অনর্থ ঘটায়। এই বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহ দমন করা কঠিন ব্যাপার হইলেও জাপানী পুলিশসৈন্য বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত শান্তি সংস্থাপন করিতেছে।

অসভ্য-অধ্যুষিত দ্বীপাংশ মূল্যবান কাঠ ও খনিজ পদার্থে পূর্ণ। কর্পূরবৃক্ষ সেখানে প্রচুর জন্মে। এই সকল সামগ্রী বিপদ মাথায় করিয়াও জাপানী ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত হইয়াছে।

গত বৎসর কতকগুলি অসভ্যকে ধরিয়া জাপানের রাজধানী তোকিয়ো নগরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—উদ্দেশ্য সভ্যতার আদর্শ ও উপকারিতা দেখাইয়া তাহাদিগকে স্বজাতীয়ের নিকট সভ্যতার উকিল করিয়া তোলা।

কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই—তাহারা মোটর গাড়ীকে একপ্রকার জীবিত জন্তু, ট্রামগাড়ীকে ইন্দ্রজালের ব্যাপার সাব্যস্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে।

প্রেমভিক্ষা

যে বেণু বাজায়ে রবি
　খোলে দ্বার কমল-হিয়ার,
সে বে', বা' ায়ে সখা
　ে'াল মোর মরম-দুয়ার।

আঁধারের লালা শেষ
　যেন আজ দেখিবারে পাই,
আলোর রাগিণী দিয়ে
　পরিপূর্ণ কর সব ঠাঁই।

আনন্দ—আনন্দ সব,
　মুক্তিভরা যত অণুরেণু,
বুঝাও, বুঝাও, সখা,
　বাজাইয়ে তব প্রেমবেণু।

শ্রীকুমুদনাথ লাহড়ী।

আলোচনা

প্রদেশ বিভাগের ব্যবস্থা ও বাঙ্গালীর অবস্থা।

সম্রাটের শুভাগমন উপলক্ষে সম্রাট দিল্লিতে যে-সকল প্রসাদ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গবাসী খোকারা তো নৃত্য করিয়াছেন। এখন একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতে হইবে যে বাঙ্গালী কোথায় গেল। বাঙ্গালীর ইংরাজি ভাষায় লিখিত সাময়িক পত্রাদিতে তো কোন বিশেষ কথা দেখি না—কেবল সিলেট ও পুর্ণিয়া ও ভাগলপুর ইত্যাদি কেন বঙ্গে থাকিবে না তাহারি চেষ্টা।

এই যে একটা বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া তিনটা করা হইল, আর পচা কলিকাতা হইতে দিল্লির পাঁদাড়ে এত বড় ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী এক কলমে নাড়া হই', আর ঢাকা বেচারীর ফুলশয্যা হইতে না হইতে নূতন বিবাহ-বাড়ীতে ভূতের নৃত্য হইতে চলিল, ইহার টাকাটা যোগাইবে কে?

বেহারীরা, না হয় ধরিয়া লইলাম, বলিয়াছিল যে আমাদের বাঙ্গালীদের সঙ্গে থাকা হইবে না, ছোটনাগপুরের আদিমনিবাসীরা ও উড়িষ্যার অধিবাসীরা কোন্ কালে চাহিয়াছিল যে কলিকাতা আর আমাদের ভালো লাগিতেছে না—বাঙ্গালীগুলার চেয়ে বেহারীদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেশী? কথাটা একটু খরচপত্রের দিক হইতে ভাবিলে বাঙ্গালীর ক্ষতি ভিন্ন কাহার যে কি সুবিধা হইল তাহা বোঝা ভার।

যদি নিতান্তই বেহারটাকে স্বতন্ত্র করিতেই হয় তো আসাম ও পার্ব্বত্য প্রদেশ বঙ্গের সঙ্গে গবর্ণরের অধীনে থাকিলে কি ক্ষতি ছিল? অন্ততঃ আসামটা থাকিলেই ভাল হইত না? না হয় উত্তর-পূর্ব্ব সীমানা ও বর্ম্মা সামানার জন্য একজন চিফ কমিশনর হইলেই হইত যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমানায় একজন আছে।

আর বেহারীরা লেফটেণ্ট গবর্ণর বা গবর্ণর যাহা যা'হা চাহিয়াছিল তাহা দিয়া ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা বঙ্গের সঙ্গে রাখিলেই ভাল হইত না? এ দুই প্রদেশ যে বঙ্গের সঙ্গে চার পাঁচ শত বৎসর ছিল। বেহারীদের বড় গায়ের জ্বালা—বেশ। কিন্তু তাহাদের কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া একেবারে এতটা দানও আশ্চর্য্য শৌণ্ডতা।

ঘোষণা হইল যে বড় লাট স্বয়ং রাজধানী ও তৎসম্পৃক্ত কতক প্রদেশের শাসনকার্য্য করিবেন। বেশ—খানিকটা প্রদেশ—যেমন জেলা দিল্লি, গুড়গাঁও, পানিপত, অম্বালা, সিমলা ও মিরট, বুলন্দ-সহর, সাহারণপুর, দেরাদুন—এইটুকু পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ হইতে লইয়া বড়লাটের নিজ শাসনাধীন করা হউক—যেমন স্কুলের মধ্যে মডেল (Model) স্কুল, কালেজের মধ্যে প্রেসিডেন্সী ও মিওর সেণ্ট্রেল ও লাহোর গভর্মেণ্ট কালেজ—সেইরূপ বড় লাট Model Government এই ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশটীতে না হয় দেখাইবেন। তাহা হইলে বেনারস ডিবিজনের কয়টী জেলা বেহারীদের দিলে ভালো হইত—কারণ বেনারস ডিবিজন ভাষাতে ও জমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বেহারে বেশ মিশ খাইতে পারে।

যদি বল যুক্তপ্রদেশ ছোট হইয়া যাইবে, তা হইবে না—কারণ বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশে ৫২টী জেলা আছে।—আর সেই যে মধ্যপ্রদেশটা কেবল চিরদুর্ভিক্ষাক্রান্ত তাহারও বেশ গতি হইতে পারিত আর ব্যয়ও সংক্ষেপ হইত। মধ্যপ্রদেশে (C. P) দুই রকম ভাষা প্রচলিত। উত্তর অংশে হিন্দি ও দক্ষিণ অংশে মারাঠী। উত্তর অংশটা যুক্তপ্রদেশে দিলে যুক্তপ্রদেশ যে বড় সেই বড় থাকিয়া যাইত। আর মারাঠী অংশ বোম্বাইকে দিলে বোম্বাই বেশী বড় হইত না—আরো সিন্ধু প্রদেশটা পঞ্জাবে দেওয়া উচিত কারণ পঞ্জাবের দিল্লি ডিবিজনের কয়টী জেলা যদি স্বয়ং বড় লাটের অধীনে যায় তো পঞ্জাবের সিন্ধু প্রদেশ পাওয়া উচিত।

এইরূপ করিলে মধ্যপ্রদেশে আর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি না রাখিলেও চলে ও অনেক ব্যয়সংক্ষেপ হয়।

মান্দ্রাজের গঞ্জাম প্রদেশ যে কেন উড়িষ্যার সামিল হয় না তাহা তো বলিতে পারি না। একটা জেলা গেলে মান্দ্রাজ ছোট হইবে না - বরং বোম্বাইয়ের চেয়েও অনেক বড় থাকিয়া যাইবে।

কেবল সিভিল সর্ব্বিশের লাভালাভ দেখিতে গিয়া এই যৎপরোনাস্তি ব্যয়সাধ্য ব্যবচ্ছেদ পূর্ব্বেও হইয়াছিল এখনো হইল। তবে বলা যায় না, ক্রমশঃ যদি বর্ত্তমান বড়লাটের চৈতন্য হয় আর ব্যয়সংক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। নতুবা আমরা বাঙ্গালী এখন ত বিশেষ উল্লাসের কারণ দেখি না।

যেসকল উপায় সম্পাদক মহাশয় ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে বাঙ্গালীর সত্বরকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা পাঠে অতীব তৃপ্ত হইলাম--আমি আর দুই একটী উহাতে যোগ করিতে চাহি।—যমুনা নদীর পশ্চিম পারে বা পূর্ব্ব পারে যাহাতে কেবল বাঙ্গালীর এক এক জায়গায় উপনিবেশ হয় তাহার চেষ্টা এখনি করা উচিত। ফলের বাগান, ফুলের বাগান, দুধ দইয়ের কারখানা, যেমন কলিকাতার

সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আছে তেমনি, এখনই বাঙ্গালীরা উদ্যোগ করিয়া করুন—তাহাতে লাভ ও উপনিবেশস্থাপন দুইই হইবে।

এ বিষয়ে চিন্তাপ্রসূত আন্দোলন ও কার্য্যে অগ্রসর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মিরাট। শ্রীকালীপদ বসু।

পৌষ-সংক্রান্তি।

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী গত পৌষমাসের প্রবাসীতে "পৌষ-সংক্রান্তি" লিখিয়া বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার পল্লীগুলির ছোট ছোট উৎসবের একতার সংবাদ সংগ্রহের পথপ্রদর্শিকা হইয়াছেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদের যোগ্যা। পরে মাঘ ও ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতেও উহা প্রকাশিত হইয়াছে। এ চেষ্টা আমাদের দেশের পক্ষে বাস্তবিকই শুভ। পাবনা ও রাজসাহীর পল্লীগুলিতেও ঐ উৎসব আছে। পৌষ মাসের প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ পৌষমাস কৃষক বালকেরা প্রতি সন্ধ্যায় প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী নিম্নলিখিত ছড়াগুলি গাহিয়া বেড়ায়। বালকদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাহার হস্তে বংশদণ্ডের অগ্রভাগে সোলার ফুল বাঁধা থাকে এবং ছড়াগুলির প্রত্যেক চরণ সে প্রথমে গাহিয়া যায়। কয়েকটী ছড়া নিম্নে দিতেছি—

ছত্তর ছত্তর সোনারায়ের চেলা আলো এক বছর আন্তর।
সোনারায়ের চেলা দেখে যে করিবে হেলা
তার দুই পায়ে দুই গোদ্ বারাবে চখে বারাবে ঢ্যালা।
সোনারায়ের চেলা দেখে যে করিবে হেলা
তার কোলের ছেলে কারে নিয়া দিবে যম জ্বালা।

সাজ্ না গোঠে রাখাল ভাই চল মাঠে যাই,
ডাক্ দে রে তোর ছিদাম বলাই কানু প্রাণের ভাই—বল,
সোনারায় উঠিয়া বলে মাণিকপিড় রে ভাই,
গোয়ালা নগরে চল দেখা করে যাই—বল,
সাজ না গোঠে রাখাল ভাই চল মাঠে যাই—
ডাক দে রে তোর ছিদাম বলাই কানু প্রাণের ভাই—বল।

এই প্রকার প্রত্যেক পদের সঙ্গে—"সাজ্ না গোঠে রাখাল ভাই" ইত্যাদি হইবে।

সোনারায় সোনারায় মুখে চাপ দাড়ি
হেলিতে দুলিতে গ্যালা গোয়ালজির বাড়ী,
গোয়ালজি, গোয়ালজি, দধি আছে ভাঁড়ে?
ঘোষ নাই, বাথানে গ্যাছে দধি নাই ভাঁড়ে।
সুবুদ্ধি গোয়ালার নারী কুবুদ্ধি ঘটিল,
ছিকার উপর দধি থুয়া পিড়কে ফাঁকি দিল।
যম, যম, বলে রে পিড জিগির ছাড়িল
শয়নেতে ছিল কানু কাঁদিয়া উঠিল।
ঘরে মরে গোয়ালা, বাথানে মরে গাই
লাখে লাখে মরে ধেনু লেখা জোখা নাই।
কাঁদে রে গোয়ালার নারী হাতে নিয়া নোটা
ধেনুর বদলে ক্যান না মরিল ব্যাটা!
কাঁদে রে গোয়ালার নারী হাতে নিয়া দাও
ধেনুর বদলে ক্যান না মরিল মাও।
আগে যদি জানি বাছা তুমি এমন পিড়
আগে দিতাম দধি, দুগ্ধ, পাছে দিতাম খির।
সোনাপিড় উঠিয়া বলে মাণিকপিড় রে ভাই,—
গোয়ালা-নগরে চল দৃষ্টি দিয়া যাই।
সোনার ছাট দিয়া ফ্যালাল বারি
সাতদিনকার মরা ধেনু পারে নোড়ামুড়ি।

"নোড়ামুড়ি" অর্থ দৌড়াদৌড়ি। এই প্রকার অনেক রকম ছড়া আছে যথা—

পিড়রে কদম্বের আছুর, কাঁদেরে গোয়ালার নারী হারায়ে বাছুর,
তার মাঝে এক কন্যা যুবা দেখি ভাল, একসের দুগ্ধ আইনে
ব্রাহ্মণে বিলাল।
পিড়রে কদম্বের আছুর, কাঁদেরে গোয়ালার নারী হারায়ে বাছুর!
তার মাঝে এক কন্যা যুবা দেখি ভাল, এক তোলা সোনা আইনা
পিড়কে বিলাল।

এই প্রকার ছড়া অনেক আছে কিন্তু অধিক লেখা বাহুল্য মনে করিয়া এই খানেই ক্ষান্ত হইলাম। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে ছড়াগুলিও ভিন্ন প্রকারের হয়। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন বালকেরা সকল বাড়ী হইতে প্রাপ্য সংগ্রহ করে এবং সংক্রান্তির দিন উহারা মাঠের মধ্যে আহারাদি আমোদে সমস্ত দিন অতিবাহিত করে। ঐ দিন হিন্দু বালক ও যুবকেরা মাঠের মধ্যে 'বাস্তু-পূজা' করিয়া আহারাদি আমোদপ্রমোদে কাটায়। ঐ দিন ভোরে বালকেরা নিজ নিজ বাড়ীর গরুগুলিকে স্নান করাইয়া কপালে তৈল সিন্দুর দিয়া পরে পিষ্টক আহার করায়। মহিলারা ভোরে স্নান করিয়া প্রাঙ্গনগুলি আলিপনাদ্বারা সজ্জিত করে ও নানাপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে। সন্ধ্যায় গ্রামবাসীদিগকে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে পিষ্টক খাইতে হয়। ঐ সঙ্গে মেয়েদের পিষ্টক-প্রস্তুত-প্রণালী ও আলিপনার সমালোচনা হয়। দুঃখের বিষয় আজিকালি এই গানের প্রথা যেন কমিয়া যাইতেছে। পরস্পরের বাড়ীতে আহারাদির প্রথা ত প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে।

শ্রীজগৎমোহিনী দেবী।

প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য:—এই প্রকার ছড়া আর অল্পদিন পরেই লুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং উহা সংগ্রহ করিবার এই সময়। যিনি যতদুর পারেন ইহা সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকিলে এইগুলি সংরক্ষণের উপায় করা হইবে।

পৌষ-সংক্রান্তি ও নবান্ন।

(১)

বরিশালে পৌষ-সংক্রান্তি-উৎসব বাস্তুপূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং সংক্রান্তির প্রায় এক পক্ষ পূর্ব্ব হইতেই ইহার আয়োজন-চেষ্টা চলিতে থাকে। এই উৎসব অধিকাংশস্থলেই সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এবং বয়োধর্ম্মনির্ব্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান, বাল-বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে গ্রামের জনসাধারণ দলবদ্ধ হইয়া প্রত্যহ রাত্রিযোগে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ছড়া গাহিয়া বেড়ায় এবং উৎসবের মূল বাস্তুদেবতার পূজার জন্য চাউল ভিক্ষা করে। এই ভিক্ষালব্ধ আয়ের দ্বারা সংক্রান্তি-উৎসব ও বাস্তুপূজা সম্পন্ন হয়। কোন কোন স্থলে বাস্তুপূজার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা 'নলিয়া পূজা' নামে অপর একটী উৎসবেরও অনুষ্ঠান এবং তদুপলক্ষে নানাবিধ অগ্নিক্রীড়া হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত উভয়বিধ অনুষ্ঠানই জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ আমোদপ্রদ উৎসব—এই উৎসব উপভোগের জন্য ইহারা উৎকণ্ঠিত চিত্তে পৌষ মাসের অভ্যুদয় প্রতীক্ষা করে।

আকৃতি দর্শনে বাস্তুকে ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর দেবতা বলিয়াই মনে হয়, বাস্তুভিটার মালিকের প্রধান অবলম্বন লক্ষ্মীদেবীর সহিতও ইঁহার সম্পর্ক আছে। তাই এই উৎসবের ছড়ার মধ্যে লক্ষ্মীর প্রসাদ ধনবিভবের উল্লেখ ও ব্যাঘ্র-প্রভৃতির বর্ণনা বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। এই উৎসব উপলক্ষে বরিশাল-অঞ্চলে প্রধানতঃ নিম্নোদ্ধৃত ছড়া দুইটী গীত হইয়া থাকে :—

(ক)

"আইলাম লো শরণে।
লক্ষ্মীদেবীর বরণে ॥
লক্ষ্মীদেবী দিলেন বর।
ধানে চাউলে ভরুক্ ঘর ॥
ধান না দিয়া দিলেন কড়ি।
কড়ি হৈল সোনার লড়ি (১) ॥
সোনার লড়ি রূপার মালা।
মাঝখাটালে (২) টাকার ছালা ॥
একটী টাকা পাইরে।
বাণ্যা (৩) বাড়ী যাইরে ॥
বাণ্যা বাড়ী ধূপের মোচা (৪)।
টাকা ভাঙ্গাইলাম নুন (৫) পয়সা ॥
নুন পয়সা কত ধন।
কুলাই (৬) রে দেবতা কত ধন ॥
(কোরাস্)—ঠাকুর কুলাই ভোঁ ॥"

(খ)

"হাট্যা চলরে। ধ্রু ॥
হাট্যা চল পাঁচিল পাড় ॥
ঝপৎ গিরিরে। ধ্রু ॥
ঝপৎ (১) গিরি সজাগ হয়।
সজাগ হয়্যা না করে রব ॥
সুন্দৈর (২) বনে রে। ধ্রু ॥
সুন্দৈর বনে বাঘের ছাও (৩)।
হাম্বুর হুম্বুর করে রব ॥
(বার বাঘের বর্ণনা)
য্যাক্ বাঘরে। ধ্রু ॥
য্যাক্ বাঘ চৈতা।
বাওন (৪) মার্যা নিলো পৈতা ॥
য্যাক্ বাঘের গলায় দড়ি।
হারা (৫) আট (৬) লড়ালড়ি ॥
য্যাক্ বাঘের কপালে সিন্দুর ॥
* * (৭) বাত্যা (৮) ইন্দুর ॥
আর য্যাক্ বাঘ হৈ চৈ।
গোয়াল মার্যা খাইল দৈ ॥
আর য্যাক্ বাঘ-ছোপার (১) আড়ে
লাফ দিয়া পড়ে ধোপার ঘাড়ে ॥
আর য্যাক্ বাঘের গলায় ব্যাত।
* * * * ॥
আর য্যাক্ বাঘ হিজল গাছে।
* * * * ॥
আর য্যাক্ বাঘ বাপের-পুতে।
* * * * ॥
আর য্যাক্ বাঘ রাইঙ্গা।
কাড় (২) ফ্যালাইলো ভাইঙ্গা ॥
আর য্যাক্ বাঘের হাতে মিঠা।
মোরে য্যাক্খান চিতৈ (৩) পিঠা ॥
আর য্যাক্ বাঘ কাল্যা।
গাঙ্গের (৪) মারে জাল্যা (৫) ॥
আর য্যাক্ বাঘের মাথা ফাটা ॥
ধান দেবারে কত কাঠা ॥
বার বাঘের লেখা পড়ি।
চাউল দেও এক বুড়ি ॥
(কোরাস্)—ঠাকুর কুলাই ভোঁ।"

অনেক সময় গায়কগণ এই ছড়ার সঙ্গে নূতন পদের বাঁধুনী দিয়া গৃহস্থকে ঠাট্টা বিদ্রূপও করিয়া থাকে। ঐরূপ দুই একটী নূতন পদও এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"আর য্যাক্ বাঘ অমুক রায়।
জোতা পায় দিয়া বাহে যায় ॥" (জোতা—জুতা)
"আর এক বাঘ অমুকের মায়।
মায়্যা হৈয়া চসমা দ্যায় ॥" (মায়্যা—মেয়ে লোক)
ইত্যাদি ইত্যাদি।

পৌষ-সংক্রান্তির-উৎসব-উপলক্ষে 'চিতৈ পিঠা' খাওয়া বরিশালের ভদ্রেতর, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মধ্যে প্রচলিত। পিঠা খাইবার পূর্ব্বে বাস্তুদেবতার নামে উহা প্রত্যেক গৃহের কোণে কোণে পুতিয়া রাখার নিয়ম।

(২)

পৌষ-সংক্রান্তির ন্যায় নবান্ন উপলক্ষেও বরিশালে প্রত্যেক গৃহে গৃহে আর একটী সাধারণ-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। নবান্নের দিন রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বালক বালিকাগণ বহির্বাটীতে দাঁড়াইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে নিম্নলিখিত ছড়াটী আবৃত্তি করিতে থাকে :—

দাঁড় কাউয়ারে (১) আহ্বান কর্য়া,
পাঁতি কাউয়ারে বলি দিয়া,
কোঁ কোঁ কোঁ,
আজ কৈলাম (২) মোগো (৩) বাড়ী শুবো নবান্নো (৪) ॥

(১) লড়ি—যষ্টি। (২) খাটাল—খড়োঘরের মধ্যাংশ, উহার একদিকে 'পাঁচদুয়ার', অন্যদিকে 'বীরখাটাল' বেড়া বা খুঁটী দ্বারা পৃথক করা থাকে। (৩) বাণ্যা—বেনে। মোচা—থলে, পুলিন্দাবিশেষ। (৫) নুন—(বোধ হয় সংস্কৃত ন্যূনং হইতে উৎপন্ন) কেবল। (৬) কুলাই—বাস্তুদেবতার নাম।

(১) ঝপৎ—বোধ হয় 'ধবল', অন্যথা অর্থহীন। (২) সুন্দৈর—সুন্দর। (৩) ছাও—ছা, ছানা। (৪) বাওন—বামুন। (৫) হারা—সমস্ত। (৬) আট—হাট। (৭)* চিহ্নিত অংশগুলি অশ্লীল বলিয়া লুপ্ত করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী অংশেও এইরূপ কতকটা স্থূল অশ্লীল বলিয়া উদ্ধৃত করা হইল না। (৮) বাত্যা—নেংটী।

(১) ছোপা—ঝাড়। (২) কাড়—গৃহের অভ্যন্তরস্থ উচ্চ মাচা বিশেষ। (৩) চিতৈ—চাউলের 'গোলা' দ্বারা প্রস্তুত একরূপ গোলাকার পিঠা। পৌষ সংক্রান্তির দিন প্রাতে সকলের এই পিঠা খাওয়ার নিয়ম। (৪) গাঙ্গ—নদী। (৫) জাল্যা—জেলে।

(১) কাউয়া—কাক। (২) কৈলাম—কিন্তু। (৩) মোগো—মোদের। (৪) শুবো নবান্ন—শুভ নবান্ন।

আইয়ো (১) যাইয়ো কাক বলি (২) লইয়ো,
আত (৩) বর‍্যা(৪) সন্দেশ দিমু (৫)—
পেট্‌টী বর‍্যা খাইয়ো ॥

নবান্নের দিন ভোরে উপরি-উক্ত ছড়ার সুরে পল্লীর সমস্ত গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। নিম্নশ্রেণীর ন্যায় ভদ্রশ্রেণীর মধ্যেও এই উৎসবের বিশেষ প্রচলন আছে। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

পৌষসংক্রান্তি।

তণ্ডুল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের কৃষকশিশুগণ পৌষমাসের সন্ধ্যাকালে দ্বারে দ্বারে যেসকল ছড়া গাহিয়া বেড়ায়, তাহারই একটী ছড়া প্রেরণ করিতেছি। বাল্যকালে যখন ফরিদপুরে ছিলাম তখন এই ছড়াটী ঐ সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের কৃষকবালকগণ কর্ত্তৃক বহুবার গীত হইতে শুনিয়াছিলাম। ছড়াটী কোনও সত্যঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল অথচ নামগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে আমাদের এইরূপ বিশ্বাস। ছড়াটী এই :—

ভক্তিভরে শুন সবে করি নিবাদন, (১)
মহিম বাবুর গুণির (২) কথা শুন বিবারণ (৩)
মহিম বাবু ছান (৪) করেন শানবান্ধা ঘাটে, (৫)
হ্যান্‌কালে (৬) চাপরাসী আইসে (৭) রসিদ (৮) দিলেন হাতে।
হাতে দিলিরে (৯) হাতকড়া পায়ে দিলেন বেড়ি,
(মহিম বাবুরে) ঠেল্‌তি ঠেল্‌তি নৈয়া চল্‌ল (১০)
ফইরাদ পুরির বাড়ী (১১)
মহিম বাবু ডাইকা (১২) বলেন ওসমান রে ভাই,
গাড়ী ভইরা (১৩) আনরে টাকা খালাস হইয়া যাই।
গাড়ী ভইরা আন্‌ল টাকা খালাস নারে পাইল,
ঠেল্‌তি ঠেল্‌তি মহিম বাবুরে ম্যাদে নিয়া চল্‌ল।
মহিম বাবুর মায় (১৪) কান্দে হাতে নিয়া দৈ—
তোমরা সবে আইলা আমার সোনার মহিম কৈ।
মহিম বাবুর বুনি (১৫) কান্দে রাজপথে দাঁড়াইয়া—
আর বুঝি আইল না দাদা ফুলকোচা ঢুলাইয়া (১৬),
মহিম বাবুর বউ কান্দে পালঙ্কে শুইয়া—
আর বুঝি আইল না স্বামী সীতাসিন্দুর (১৭) নৈয়া ;
খোপে কান্দে খোপ কবুতর, জলে কান্দে হাঁস,
বারবারি-দরজায় (১৮) কান্দে সোনার গুলাইল্‌ বাঁশ (১৯)।

(১) আইয়ো—আসিও। (২) কাকবলি—নবান্ন কার্য্যে অনুষ্ঠান বিশেষ ; নবান্ন খাওয়ার পূর্ব্বে (কাককে 'বলি' পিণ্ডাদি সহিত চাউল জল) দেওয়ার নিয়ম। আত—হাত। (৪) বর‍্যা—ভরিয়া। (৫) দিমু—দিব।

(১) নিবাদন—নিবেদন। (২) গুণির—গুণের। (৩) বিবারণ—বিবরণ। (৪) ছান—স্নান। (৫) শানবান্ধা ঘাট—ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট। (৬) হ্যান্‌ কালে—হেন কালে। (৭) আইসে—আসিয়া। (৮) রসিদ—গ্রেপ্তারী পরওয়ানা (warrant of arrest)। (৯) দিলিরে—দিলেন বা দিল্‌। (১০) ঠেল্‌তি ঠেল্‌তি নৈয়া চল্‌ল—ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া চলিল। (১১) ফইরাদ পুরির বাড়ী—ফরিদপুর সহরে। (১২) ডাইকা—ডাকিয়া। (১৩) ভইরা—ভরিয়া। (১৪) মায়—মাতা। (১৫) বুনি—ভগিনী। (১৬) ঢুলাইয়া—ঝুলাইয়া। (১৭) সীতাসিন্দুর—সীঁথির সিন্দুর। (১৮) বারবারি-দরজায়—বাহির বাড়ীর দরজায়। (১৯) গুলাইল বাঁশ—পক্ষী মারিবার উদ্দেশ্যে বংশনির্ম্মিত অস্ত্রবিশেষ, গুলতি বন্দুক।

এই ছড়াটী আমাদের কর্ণে এতই মধুর লাগিত যে একবার শুনিয়া আমাদের অনেকেরই তৃপ্তি হইত না। তাই আমরা পয়সার প্রলোভন দেখাইয়া বালকদিগের দ্বারা পুনর্ব্বার উহার আবৃত্তি করাইয়া লইতাম। তাহাদিগের রচিত এইরূপ আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ছড়া আছে, তন্মধ্যে "অজানিত দেশ" "সোনার হারের বিবাহ" প্রভৃতি অতিশয় সুললিত। বীরভূম অঞ্চলের ছড়াও মনোরম। ঐ সহরের একটী ছড়ার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

(সাধের) ইংরেজ বল্‌ব কি তোরে,
যত রাজ্যের লাইন এনে রাস্তা বান্ধালে,
ইংরেজ বল্‌ব কি।
ইংরেজের বুদ্ধি বড় করলে আপিসখানা,
যত লোকে টিকিট কিনে করে আনাগোনা,
ইংরেজ বল্‌ব কি ;
ইংরেজের বুদ্ধি বড় করলে ডাক্তারখানা,
জনে জনের হাত দেখিয়ে দেয় সাগুদানা,
ইংরেজ বল্‌ব কি ইত্যাদি।

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত।

অধম ও উত্তম

(সাদী)

কুকুর আসিয়া এমন কামড়
দিল পথিকের পায়,—
কামড়ের চোটে বিষদাঁত ফুটে
বিষ লেগে গেল তায়।
ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা
বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার তারি সাথে হায়
জাগে শিয়রের আগে ;
বাপেরে সে বলে ভর্ৎসনা ছলে
কপালে রাখিয়া হাত,
"তুমি কেন বাবা ছেড়ে দিলে তারে ?
তোমার কি নেই দাঁত ?"
কষ্টে হাসিয়া আর্ত্ত কহিল
"তুইরে হাসালি মোরে,
দাঁত আছে ব'লে কুকুরের পায়
দংশি কেমন ক'রে ?
কুকুরের কাজ কুকুর ক'রেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তা' ব'লে কুকুরে কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়।"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কষ্টিপাথর

ভারতী (ফাল্গুন)—

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

শঙ্করের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ শ্রুতিমূলক এবং স্ত্রীশূদ্রাদি বেদপাঠে অনধিকারী। শ্রুতিতে এরূপ কোনো নিষেধ নাই; ইহা লোকাচার মাত্র। তথাপি শঙ্করের মতে শূদ্রের বেদপাঠ তথা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার নাই, যেহেতু তাহার উপনয়ন নাই. শূদ্রের উপনয়ন নাই কেন? যেহেতু সে শূদ্র। এবং উপনয়নের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার নিমিত্ত-নৈমিত্তিক কোনো সম্বন্ধের কথাও শঙ্কর বলেন না। অথচ সত্যকাম, বিদুর প্রভৃতি শূদ্র, এবং গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি রমণীর ব্রহ্মজ্ঞান সুবিদিত। প্রচলিত সংস্কারের দাসত্ব হইতে শঙ্করও মুক্ত হইতে পারেন নাই। এরূপ শূদ্রবিদ্বেষ গোরাদের কালাবিদ্বেষ অপেক্ষাও ঘৃণার্হ।

কবীর—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

এই প্রবন্ধে কবীরের জন্মমৃত্যু ও জীবনকাহিনীর সহিত তাঁহার ধর্ম্মমতও কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি খুব সম্ভব কোনো ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। কারণ কবীরের পুত্রকন্যার নাম লেখা হইয়াছে কমল ও কমলী। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদের নাম ছিল কমাল ও কমালী। এ দুটি ফারসী শব্দ—অর্থ, পূর্ণ, perfect। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন স্বাধীন ভাবে অনুসন্ধান করিয়া কবীরের যেসকল বাণী সম্পাদন করিতেছেন তাহার সংবাদ রাখিলে লেখক এই ভুল করিতেন না।

কবীর ১৪২১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। ওয়েষ্টকোট সাহেবের মতে কবীরের জন্ম ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে। কবীর এমনি উদারমতাবলম্বী যে তিনি হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন তাহা বলা কঠিন। তিনি ভগবানকে রাম নামেই ডাকিয়া গিয়াছেন। (কিন্তু সে রাম অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্র নহেন।) কবীর রামানন্দকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। কেহ বলেন লুইয়া তাঁহার স্ত্রী, কেহ বলেন শিষ্যা ছিলেন; এবং কমাল ও কমালী তাঁহাদের জাত সন্তান নহেন, পালিত সন্তান মাত্র। কবীর জাতিভেদ মানিতেন না। কবীর হিন্দী সাহিত্যের জন্মদাতা। কবীরপন্থীগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাহ্যানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, ইহাই তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনের বিশেষত্ব।

খাদ্যের অভিব্যক্তি—শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

স্তন্যপায়ী জীব তিনশ্রেণীর—(১) মাংসাশী, যাহারা অল্পের মধ্যে অধিক সারাল খাদ্য পাওয়া বলিষ্ঠ ও সাহসী হয়। (২) উদ্ভিজ্জভোজী যাহারা প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা বলে সাহসে বুদ্ধিতে ক্ষিপ্রতায় নিকৃষ্ট; (৩) ফলভুক্; ইহারাও অল্প আয়তনের খাদ্যে অধিক সার পায় বলিয়া মাংসল, ক্ষিপ্র, চতুর। ইহাদের পাকযন্ত্র মাংসাশীর তুলনায় বড়, কিন্তু উদ্ভিজ্জাশীর তুলনায় অনেক ছোট। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে প্রাণী যত সারাল ও পরিমাণে কম আহার্য্য খায় তাহারা তত মাংসল, বলিষ্ঠ ও চতুর হয়। বানর হইতে মানুষের সভ্যতার অনুক্রম আলোচনা করিলে, দেখা যায় যে খাদ্যের পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই আয়তনে কম ও সারে বেশী এইরূপ ভাবেই হইয়াছে। এজন্য উদ্ভিজ্জাশীকে সহজেই মাংসজাতীয় খাদ্য আহার করিতে শিখানো যাইতে পারে; কিন্তু প্রাণীভুকদিগকে উদ্ভিজ্জাশী করা যায় না। আমাদের জাতির আহার (১) উদ্ভিজ্জপ্রধান বলিয়া পরিমাণে বেশি, সারে কম; (২) মাংসপেশী গড়িবার পক্ষে অনুপযোগী; (৩) আহারে রন্ধনে অর্দ্ধেকাংশ অপচয় হয়। এই সব কারণে দেশের লোক এমন অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল। আহারের সংস্কার করা জাতীয় জীবনের জন্যই আমাদের আবশ্যক হইয়াছে।

ধর্ম্মের নবযুগ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংসারের ব্যবহারে প্রতিদিন আমরা ছোট ছোট সীমার মধ্যে আপনাকে রুদ্ধ করিয়া থাকি। এই জন্যই দিনের মধ্যে অন্তত একবার করিয়াও নিজেকে অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিবার উপদেশ আছে। অন্তত একবার করিয়াও এ কথা বুঝিতে হইবে যে কোনো ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডই আমার চিরকালের দেশ নহে, সমস্ত ভূর্ভুবঃস্বঃ আমার বিরাট আশ্রয়; আমার ধীশক্তি আমার চৈতন্য কোনো একটা কলের জিনিষের মতো আমার মধ্যেই উৎপন্ন ও আমার মধ্যেই বদ্ধ নহে, জগদ্ব্যাপী ও জগতের অতীত অনন্ত চৈতন্য হইতেই তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে আমার মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে। এই রূপে নিজের ধর্ম্মকেও সামাজিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, সংস্কার, প্রভৃতি সমস্ত সংকীর্ণ আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে। ধর্ম্ম সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষের। বিজ্ঞানের সাহায্যে এই বৃহৎ বিশ্বগোষ্ঠীর গোপন কুলজিখানি সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তখনি ধরা পড়িয়া যায় যে যিনি আপনাকে যত বড় কুলীন বলিয়াই মনে করুন না কেন, গোত্র সকলেরই এক, জড়ে জীবে সর্ব্বত্রই একের সঙ্গে আরের যোগ। সত্যের বিচারসভায় জগৎজুড়িয়া সাক্ষীর তলব পড়িয়াছে, আজ একের সংবাদ আরের মুখে না পাইলে প্রমাণ সংশয়াপন্ন হইতেছে। আধুনিক পৃথিবীতে মানব এমন একটি ধর্ম্ম চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতি দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হোক যে ধর্ম্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। বিদ্যায় ও বাণিজ্যে মানুষের সর্ব্বত্র অধিকার, কেবল মাত্র ধর্ম্মেই কি মানুষ এমনি চিরন্তনরূপে বিভক্ত যে সেখানে পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের কোনো পথ নাই? সেখানে মানুষের ভক্তির আশ্রয় স্বতন্ত্র, মুক্তির পথ পৃথক পূজার মন্ত্র পৃথক? এমন কি, নানা জাতির লোক পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধের নাম করিয়া নিদারুণ নরহত্যার ব্যাপারেও গৌরবের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, কেবল মাত্র ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই মানুষ দেশবিদেশ স্বজাতি বিজাতি বিচার করিয়া আপন পূজাসনের পার্শ্বে পরস্পরকে আহ্বান করিতে পারিবে না? এই সর্ব্বগত সত্যকে একদিন পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন, অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন, তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না।' মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের এই মহোচ্চ আদর্শ আমাদের দেশেরই আশ্চর্য্য উদার ব্রহ্মোপলব্ধির ফল। উপনিষদের ঋষিরা দেখিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানং অনন্তং, তাই ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে দেশকালপাত্রগত সংস্কারের লেশমাত্র বাষ্প কোথাও নাই, সেখানে পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তি, তাহা মানুষের জ্ঞানভক্তিকর্ম্মকে পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করিতে

পারে। ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা আমরা বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তিনি যে রসস্বরূপ তাহা কেবলমাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই। নবযুগের এবং চিরযুগের ধর্ম্মের রসস্বরূপকে মানবাত্মার মধ্যে দেখিবার জন্য মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। একথা যেন আমরা একদিনের জন্যও না ভুলি যে আমার পূজা সমস্ত মানুষেরই পূজার অঙ্গ; আমার অন্তর বাহিরের গোচর অগোচর যে পাপ তাহা সকল মানুষেরই মুক্তির অন্তরায়, আমার নিজের নিজত্বের চেয়ে যে বড় মহত্ত্ব আমার আছে আমার সমস্ত পাপ তাহাকেই স্পর্শ করে, এই জন্যই পাপ এত নিদারুণ। অতএব নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্ব্বমানবের ধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে, সংশয়কে দূর করিতে হইবে। চেতনার যে দিন, তাহা বেদনার দিন, সেজন্য কাপুরুষের মতো নিরানন্দ হইলে চলিবে না; আজ আর লোকভয়কে ধর্ম্মভয়ের স্থানে বরণ করিলে চলিবে না; আজ চলিবার দিন, ত্যাগের দিন আসিয়াছে, আজ অনেক দিনের অনেক প্রিয়বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া চলিতে হইবে, ভূমার পথে নিখিলমানবের বিজয়যাত্রায় সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করিতে হইবে। বিশ্বেশ্বর আমাদিগকে বলদান করুন।

অভিভাষণ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অকালে যাহার উদয় তাহার সম্বন্ধে মনের আশঙ্কা ঘুচিতে চায় না। আপনাদের কাছে যে সমাদর লাভ করিয়াছি, সে একটি অকালের ফল—এই জন্যই ভয় হয় কখন সে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে। বাঁচিয়া থাকিতেই যদি কবি সম্মান লাভ করেন তবে সে সমস্তটাই কবির হাতে গিয়া পড়ে না, কবির সঙ্গে সঙ্গে যে একটি অহং লাগিয়া থাকে সকলতাতেই সে আপনার ভাগ বসাইতে চায়। অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় চোর। এই জন্যই মনু সম্মান পরিহারের বিধি দিয়াছেন। আমার বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে, এখন বনে যাইবার, ত্যাগ করিবার দিন। এই সময়ে ঈশ্বর যদি আমাকে সম্মান জুটাইয়া দেন তবে নিশ্চয় বুঝিব সে কেবল ত্যাগ শিক্ষারই জন্য; এ বোঝা সেখানেই নামাইতে হইবে যেখানে আমার মাথা নত করিবার স্থান; এ সম্মানকে আমার অহঙ্কারের উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া অপমানিত করিব না। আমাদের এই অল্পায়ুর দেশে পঞ্চাশ পারের মানুষকে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কবি ত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রনীতিবিৎ নহে। কবিত্ব মানুষের প্রথম বিকাশের লাবণ্যপ্রভাত। সম্মুখে জীবনের বিস্তার যখন আপনার সীমাকে এখনও খুঁজিয়া পায় নাই, আশা যখন পরম রহস্যময়ী,—তখনি কবিত্বের গান নব নব সুরে জাগিয়া উঠে। অবশ্য, এই রহস্যের সৌন্দর্য্যটি যে কেবল প্রভাতেরই সামগ্রী তাহা নহে, আয়ু অবসানের দিনান্ত কালেও অনন্ত জীবনের পরম রহস্যের জ্যোতির্ম্ময় আভাস আপনার গভীরতর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। কিন্তু সেই রহস্যের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য গানের কলোচ্ছ্বাসকে নীরব করিয়াই দেয়। সুতরাং কবির বয়সের মূল্য কি? অতএব বার্দ্ধক্যের আরম্ভে যে আদর লাভ করিলাম তাহা তরুণের প্রাপ্য—তাহা শ্রদ্ধা বা ভক্তি নহে, তাহা হৃদয়ের প্রীতি। মহত্ত্বের হিসাব করিয়া আমরা মানুষকে ভক্তি করি, যোগ্যতার হিসাব করিয়া শ্রদ্ধা করি, কিন্তু প্রীতির কোনো হিসাব কিতাব নাই। যে মানুষ প্রেম দান করিতে পারে ক্ষমতা তাহারই, যে মানুষ প্রেম লাভ করে তাহার কেবল সৌভাগ্য। প্রেমের একটি মহত্ত্ব আছে। আমরা যে জিনিষটার দাম দিই তাহার ত্রুটি সহিতে পারি না, কোথাও ফুটা বা দাগ দেখিলে দাম ফিরাইয়া লইতে চাই; যখন মজুরী দিই তখন কাজের ভুলচুকের জন্য জরিমানা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রেম অনেক সহ্য করে, অনেক ক্ষমা করে; আঘাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করে। আমি কারুকরের মতো সংহত অথচ মূল্যবান গহনা গড়িয়া দিতে পারি নাই; যাহা দিয়াছি তাহার দামের চেয়ে ভার বেশি; কিন্তু যেমন একদিকে চিরকালটা আছে তেমনি আর একদিকে ক্ষণকালটাও আছে। সেই ক্ষণকালের প্রয়োজনে, ক্ষণকালের উৎসবে, এমন কি, ক্ষণকালের অনাবশ্যক ফেলাছড়ার ব্যাপারেও যাহা জোগান দেওয়া গেছে তাহা একেবারে নিষ্ফল নহে। অদ্যকার সম্বর্দ্ধনার মধ্যে সেই ক্ষণকালের হিসাব নিকাশ যে আছে তাহা আমি নিজেকে ভুলিতে দিব না। ক্ষণকালের ব্যবসায়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক ফাঁকি চলে; আমার সুদীর্ঘ কালের সাহিত্য-কারবারেও তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু একটি কথা আমার নিজের পক্ষে বলিবার আছে—সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। সেইজন্য আমার যশের ভোজে আজ সমাপনের বেলায় যে মধুর জুটিয়াছে বরাবর এ রসের আয়োজন ছিল না। এইজন্য আজিকার সম্মান দুর্লভ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি। যে সমাজে মানুষ নিজের সত্য আদর্শকে বজায় রাখিয়া শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে সেই সমাজই যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন; ইহাতে যে ব্যক্তি মান পায় সেও সম্মানিত হয়, আর যিনি মান দেন তাঁহারও সম্মান বৃদ্ধি হয়। সম্মান যেখানে মহৎ ও সত্য, সেখানে নম্রতায় আপনি মন নত হয়। আজ এই সম্মান আমি দেশের আশীর্ব্বাদের মতো মাথায় করিয়া লইলাম—ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে, আমার অহঙ্কারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না। (সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে আনন্দ-সম্মিলনে কথিত অভিভাষণ।)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (ফাল্গুন)—

পিতার বোধ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যা প্রাণের জিনিষ তাকে প্রথার জিনিষ করে তোলা বড় লোকসান। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার আপনার মধ্যে আপনার যে দাহন তাই প্রাণক্রিয়া। এই রকম মননক্রিয়াতেও নানাপ্রকার ক্ষয়ের মধ্যে দিয়েই চিন্তাকে জাগাতে হয়, প্রতি মুহূর্ত্তেই নিজেকে নিজের কাছে দান করতে হয়; সেই দানের সম্পূর্ণতার উপরেই আমাদের প্রকাশের সম্পূর্ণতা। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন যে দান তা শুধু বাইরের মানুষ পেতে পারে, ভিতরের মানুষটির কাছে তা পৌঁছয় না। শ্রদ্ধার দান দিতে পারিনে বলে আমরা সুখ পেতে পারি আনন্দ পাইনে; মানুষ বল্লে যতখানি বোঝায় তা ব্যক্ত হয়ে ওঠে না কিন্তু সত্যকে আমরা হাজার অস্বীকার করলেও সত্যকে বিনাশ করতে পারিনে। আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটি আশ্রয়ের জন্যে যে পথ চেয়ে বসে আছে তার ত ভুল নেই। তার সামনে আমরা বারবার অহংটিকে টেনে নিয়ে গিয়ে হাজির করে দিচ্ছি, কিন্তু যে বুদ্বুদটি যখনি ফেটে যাচ্ছে তাতে তখনি আমার আমিরই ক্ষয় হচ্ছে, সংসারের দীর্ঘনিশ্বাসের লেশমাত্র তপ্ত হাওয়া যে গায়ে এসে লাগছে তাতে একেবারে তার সত্তাকেই গিয়ে ঘা দিচ্ছে। এ ত আশ্রয় করা নয়, এ যে বহন করা। যে মানুষটি অনন্তের যাত্রী সে অহংএর এ ভার বইবে কেন? সে এমন জনকে চায় যাঁর উপর সে ভর দিতে পারবে, যাঁর ভার তাকে বইতে হবে না। তার পক্ষে মাভৈঃ বাণী—পিতা নোঽসি—পিতা তুমিই আছ। আমার জীবনের এবং জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ করে আছে। এই বোধটিকে সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে পেতে হবে। "আমি আছি" আমার এই অভ্যাসের বোধকে "তুমি আছ" এই বোধ দিয়ে দূর করতে হবে। এই চাওয়া অতি বড় চাওয়া, এই প্রার্থনাকে সত্য করে তুলতে জীবনের

সাধনাকে বড় করে তুলতে হবে। সত্যে মঙ্গলে দয়ায় সৌন্দর্য্যে আনন্দে নির্ম্মলতায় সমস্ত ঘন হয়ে সর্ব্বত্র ভরে রয়েছেন আমার পিতা। তিনি পর্য্যাপ্ত দানে আপনাকে বিতরণ করচেন ঐ এতটুকু একটুখানি আমির জন্যে। তবু সে সমস্ত অনন্তের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলছে—আমি। এই আমার পিতার বোধ যখন জাগে তখন নমস্কারের মধুর রসে সমস্ত জীবন একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যয়। নমস্তেহস্তু—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি—এই পারাই চরম পারা, এই পারাতেই জীবনের সকল পারা শেষ হয়ে যায়। সমস্ত যাত্রার অবসানে নদী যেমন আপনাকে দিয়ে সমুদ্রকে এসে নমস্কার করে, তেমনি একটি পরিপূর্ণ নমস্কারে পিতার মধ্যে আমিকে যেন শেষ করে দিতে পারি। এ যেন কেবল অভ্যস্ত ভাবে মাথা নীচু করা না হয়। যিনি আমাদের সকলের পিতা তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে মনে মনে যদি জাতিবিচার, বিদ্যা-বিচার, সম্প্রদায়বিচার করি তবে সেখানে নমস্কারকে কলুষিত করে আপনার অহংটাকেই এগিয়ে দি। রাজাকে নমস্কার করলে লাভ আছে, সমাজকে নমস্কার করলে সুবিধা আছে, পিতাকে নমস্কার কেবল মাত্র ভিতরের নিত্য সত্য মানুষটিকে সত্যরূপে জানবার জন্যে, সমাজ ও সংস্কারের সঙ্কীর্ণ দীনতা হতে উদ্ধার পাবার জন্যে। আমাদের সেই নমস্কার সত্য হোক, অহং শান্ত হোক, ভেদবুদ্ধি দূর হোক, পিতার বোধ পূর্ণ হোক, বিশ্বভুবনে সন্তানের প্রণামের সঙ্গে পিতার বিগলিত আনন্দধারা সম্মিলিত হোক! নমস্তেহস্তু!

ভারত-মহিলা (ফাল্গুন)—

স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায়—অধ্যাপক শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ দে।

স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায় কতকগুলি কারণে ঘটে, তাহার মধ্যে প্রধান মনে হয়—(১) বালক ও বালিকার প্রতি যত্নের তারতম্য:—আমরা মনে করি যে বালককে লেখাপড়া শেখানো অবশ্যকর্ত্তব্য, কারণ তাহাকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে, কিন্তু মেয়েরা ত আর টাকা রোজগার করিবে না অতএব বালিকার শিক্ষা সখের জিনিষ, হইলে ভালো, না হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র অর্থ উপার্জ্জন নহে, উহার প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ও বিকাশ; সুতরাং বিদ্যাশিক্ষা স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। শিক্ষার জন্য বালকদিগকে যেরূপ যত্ন করা হয়, অমনোযোগীকে তাড়না দ্বারা যেরূপে পাঠে নিযুক্ত করা হয়, বালিকাদিগের বেলা সেরূপ করা হয় না, কারণ আমরা মনে করি বালিকার পড়া সখের। কিন্তু বালিকার শিক্ষার কাল অল্প বলিয়া তাহারই শিক্ষার জন্য আরো অধিক যত্ন করা উচিত। (২) অবসরের অভাবে বালিকারা স্কুলে যাইতে এবং বিবাহিতা রমণীরা বিদ্যাচর্চ্চা করিতে পারেন না। পুরুষ অর্থ আনিয়া দিয়াই খালাস; যাবতীয় গৃহকর্ম্ম স্ত্রীলোকদিগকেই করিতে ও দেখিতে হয়। ইহার ফলে পুরুষ অবসর কালে নব নব বিষয়ের সহিত পরিচিত হইয়া জ্ঞানে চিন্তায় অগ্রসর হইতেছে কিন্তু নারী অচল জড় হইয়াই আছে। স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য তাহাদেরও কিছু অবসর থাকা দরকার। এই অবসর কয়েক প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে (ক) দাস দাসী নিয়োগ এবং কেবলমাত্র পুরুষদের সুবিধার দিকে না চাহিয়া স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই সুবিধা হয় এমন ভাবে দাসদাসীর কার্য্য বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। (খ) গৃহকর্ম্ম সংক্ষেপ ও সুশৃঙ্খল করিলে অবসর পাওয়া যাইতে পারে। পুরুষদিগের প্রত্যেকের সুবিধা ও খেয়াল মত আহার যোগাইতে রমণীদিগকে রন্ধনশালাতেই অনাবশ্যক সময় অপব্যয় করিতে হয়; এ বিষয়ে পুরুষদিগের লক্ষ্য থাকা উচিত। (গ) গৃহকর্ম্মে পুরুষের সাহায্য পাইলে রমণী অবসর পাইতে পারে। বালিকার ন্যায় বালকেও যদি মাতার সেবা ও সাহায্য করে, বয়স্ক পুরুষেরা যদি স্ত্রী কন্যা ভগ্নীর সহায়তা করে, তবে গৃহিণীদিগের অবসর লাভ সহজ হয়। (ঘ) সংযত বংশবৃদ্ধি দ্বারা স্ত্রীলোক অবসর পাইতে পারে। (৩) বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়; বিবাহের পূর্ব্বে শিক্ষার সময় বেশি পাওয়া যায় না; বিবাহ হইলে সত্বর সন্তানজননী হইয়াও তাহাদের আর অবসর থাকে না। বিশেষত বালিকাকে শিক্ষিত করিয়া তোলা পিতামাতার কর্ত্তব্য; বিবাহের পর শিক্ষিত করা হইবে ইহা কল্পনা করা সহজ, কার্য্যে পরিণত করা কঠিন। এই সকল অন্তরায় দূর করিবার উপায় মনে হয়—(১) শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই স্ত্রীশিক্ষার জন্য উদ্যমশীল ও উৎসাহশীল হওয়া আবশ্যক। রোগীকে রোগমুক্ত করিবার জন্য যেমন আমরণ চেষ্টা করিতে হয়, অশিক্ষিতকে বিদ্যার স্বাদ বুঝাইবার জন্য সেইরূপ অবিরল অক্লান্ত চেষ্টার প্রয়োজন। স্ত্রীকন্যার বেশভূষার জন্য অর্থব্যয় না করিয়া তাহাদের জ্ঞানোন্নতির জন্য অর্থব্যয় করা কর্ত্তব্য। আত্মীয়ার কুশল সংবাদের সহিত জ্ঞানোন্নতির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে রমণীরা বিদ্যার মর্য্যাদা বুঝিতে পারে। (২) সামাজিক অনুষ্ঠান বা পূজা পার্ব্বণে বস্ত্র ও খাদ্য উপহারের পরিবর্ত্তে সংগ্রন্থ উপহার প্রদান করিলে অশিক্ষিতদিগকে শিক্ষার মাহাত্ম্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। (৩) প্রতিকূল পরিবারে অর্দ্ধশিক্ষিতা নারীকে উৎসাহ দান। (৪) বিবাহব্যয় সঙ্কোচ করিয়া কন্যার শিক্ষার্থ ব্যয় বৃদ্ধি আবশ্যক। (৫). শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতিজ্ঞা করা উচিত অজ্ঞ বালিকা বিবাহ করিব না, তাহা হইলে পিতামাতা কন্যাদিগকে শিক্ষা দিতে বাধ্য হইবেন। শ্বশুর শাশুড়ী যেমন পাশ-করা জামাই চান, তেমনি তাঁহাদেরও শিক্ষিতা বধূ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করা উচিত। (৬) বালিকার জন্য মাতার স্বার্থত্যাগ ও চেষ্টা যত্ন আবশ্যক।

বঙ্গদর্শন (মাঘ)—

সাদা ও কালা - শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

লোকের বিশ্বাস যে রক্তের একতার উপরই জাতির একতা নির্ভর করে। এবং শ্বেতজাতি চিরদিন কৃষ্ণকায়দিগের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে ও জগতের সভ্যতা শ্বেতজাতিদিগেরই বুদ্ধির ফল। কিন্তু ইতিহাস ও বিজ্ঞান এ কথায় আর বিশ্বাস রাখিতে দিতেছে না। জগতের আদিম সভ্যতার জন্মভূমি মিশর, বেবিলোন, আসিরিয়া শ্বেতকায়ের দেশ ছিল না; গ্রীক-রোমান সভ্যতাও ঠিক শ্বেতকায়ের উদ্ভাবন নহে; ভারতের আর্য্যসভ্যতা আদিম দ্রাবিড় সভ্যতার নিকট ঋণী, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান ও পরলোকবাদ দ্রাবিড়-দিগের নিকট পাওয়া। আধুনিককালেও জাপান, চীন, প্রভৃতি আসিয়াবাসী জাতি এবং কাফ্রি প্রভৃতি কৃষ্ণজাতির উন্নতি আর শাদার প্রাধান্য টিকিতে দিতেছে না। এই গেল ইতিহাসের সাক্ষ্য। বিজ্ঞান সাক্ষ্য দিতেছে যে নরকরোটির গঠন হইতে প্রমাণ হইতেছে যে কোনো জাতির রক্ত অমিশ্র নাই। অতএব বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় একতা রক্তের একতা নহে, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার একতা। মানুষের শরীরটাই সর্ব্বপ্রধান সম্পদ নহে, এই কথা মনে রাখিলে হিন্দু মুসলমানে মিলিয়া এক মহাজাতি সংগঠনের পক্ষে বহু বাধা তিরোহিত হইয়া যাইবে।

লজ্জা—শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

চাণক্য লজ্জাকে নারীর ভূষণ বলিয়াছেন, রমণীর লজ্জার আদর সভ্য-অসভ্য-নির্ব্বিশেষে মানবসমাজে দেখা যায়। কবিগণ ব্রীড়াময়ী নারীর চিত্র অঙ্কিত করিতে যত্নশীল। হৃদয়ে লজ্জার উদয় অনেক

কারণে হয়, তন্মধ্যে প্রণয়ের লজ্জাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী এবং তাহা আবার পুরুষ অপেক্ষা রমণীতে রমণীয়। লজ্জার আকর্ষণী শক্তি প্রণয়ের প্রধান অবলম্বন, হৃদয়ের কঠিন বন্ধন। নির্লজ্জতার নিকট প্রণয় তিষ্ঠিতে পারে না; লজ্জাহীন রূপ ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করিতে পারে, কিন্তু হৃদয় তৃপ্ত করে না, অল্পেই প্রত্যাহার-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। লজ্জাসঙ্কুচিতা উর্ব্বশী পুরূরবার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, লজ্জাবিরহিতা উর্ব্বশী অর্জ্জুনের নিকট প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিল। কালিদাস কুমারসম্ভবে শকুন্তলায় লজ্জার মনোজ্ঞ চিত্র আঁকিয়াছেন। হ্যাভলক্ এলিস (Havelock Ellis) তাঁহার Psychology of Sex নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লজ্জার (modesty) গুণকীর্ত্তন করিয়া দেখাইয়াছেন যে যৌনসম্মিলনের প্রধান সহায় এই লজ্জা। সেক্সপীয়র বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের সঙ্কোচ তাহার নির্লজ্জতা অপেক্ষা বেশী ভয়ানক। চণ্ডী গ্রন্থে চণ্ডীকে বলা হইয়াছে—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা!" দার্শনিকদিগের মতে লজ্জা, ব্রীড়া, সংকোচ (Shame, modesty, shyness) এক পর্য্যায়ভুক্ত। সার সি. বেল বেঙ্গার্স (Sir C. Bell Bengers) বলেন লজ্জা মনুষ্যসৃষ্টির কাল হইতে মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত। ডারউইন সে কথা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মানুষকে লজ্জা করিতে শিখিতে হইয়াছে। হ্যাভলক এলিসও ডারউনের মতাবলম্বী—অথচ তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে অতি অসভ্য মানবজাতি, এমন কি পশুপক্ষীর মধ্যেও লজ্জা আছে। ডারউইন পশুর লজ্জা প্রকাশের শক্তি স্বীকার করেন নাই, কালিদাসও না। বোধ হয় লজ্জা মনুষ্যসৃষ্টির সহজাত, সামাজিক অবস্থায় যৌনসম্মিলনের সুবিধার জন্য তাহার পরিপুষ্টি হইয়াছে। লজ্জার উৎপত্তি সম্বন্ধে ডারউইনের মত (Expressions of Emotions in Man and Animals) এই যে, নিজের সম্বন্ধে অপরের মতামত বিশেষতঃ নিন্দার সম্ভাবনার উপর মনোযোগী হওয়াই লজ্জা উৎপত্তির কারণ; কাহারও কোনও অঙ্গের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি লজ্জার উদ্রেক করে, এবং এই কারণে পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে স্ত্রীলোক সঙ্কুচিত হয়। হ্যাভলক এলিস বলেন ভয় লজ্জার উৎপাদক, ভয় হেতু গোপনের চেষ্টাই লজ্জা। এবং লজ্জা বিশেষ করিয়া ভীরু রমণীরই নিজস্ব বৃত্তি। কিন্তু পণ্ডিতা মাদাম সেলিক রেণুজ বলেন যে লজ্জা প্রধানতঃ পুরুষের বৃত্তি, কৃত্রিম উপায়ে রমণীতে সঞ্চারিত হইয়াছে। লজ্জা যাহারই নিজস্ব বৃত্তি হোক, এখন কৃত্রিম উপায়ে বাল্যাবধি রমণীতেই উহার বিকাশ করা হইতেছে এবং তাহার ফলে প্রণয়ের সূক্ষ্ম বিভেদ ও বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট হইয়া মনুষ্যকে কবিত্বময় ও বিবাহাদি সামাজিক প্রথার প্রচলন করিয়াছে। গ্রুজ (Groos) বলেন যে স্ত্রীলোকের ব্রীড়াসংকোচ না থাকিলে পুরুষের নিজ সদ্‌গুণ দ্বারা সেই সংকোচ জয় করিবার প্রবৃত্তি আসিত না। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে স্ত্রীলোকদের উপর জোর করিয়া সতীত্ব রক্ষার ভার অর্পণ করাই লজ্জা উৎপত্তির কারণ। চার্লস্ লেটুর্ণ বলেন (The Evolution of Marriage) লজ্জা মানব-ধর্ম্ম, পশুতে ইহার নিতান্ত অসদ্ভাব; যদিও পশুদের মধ্যে বংশ-রক্ষার ইচ্ছা তাহাদিগকে প্রণয় ব্যাপারের অনুরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত করে তথাপি উহা প্রণয় বা লজ্জা নহে; মানুষের পক্ষেও ইহা কৃত্রিম,—শাসনের ভয় হইতে রমণীর সতীত্বরক্ষার প্রযত্ন লজ্জার উৎপাদক। এই মতের সপক্ষে মহাভারতের দীর্ঘতমা ও উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতুর উপাখ্যান উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরাকালে স্ত্রীলোকেরা যখন অনাবৃত ছিল তখন নিশ্চয় তাহাদের লজ্জা এখনকার ন্যায় পুষ্টি প্রাপ্ত হয় নাই। উদ্দালকের পুত্রের মনে নিজ জননীর ব্যবহারে যে ঘৃণার উদয় হইয়াছিল তাহাই বিবাহপ্রথার প্রবর্ত্তক এবং শ্বেতকেতু যখন নিজের মনের ঘৃণা রমণীগণের মনে সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছিলেন তখনই তাহাদের মনে লজ্জার বীজ বপন করা হইয়াছিল—ইহাই পুরাণের মত। বৈজ্ঞানিক মতেও ঘৃণা লজ্জা জন্মিবার অন্যতম কারণ। এইসকল উদ্ধৃত মত হইতে অনুমান হয় যে লজ্জার দুইটি কারণ—একটি অনাদিকালাগত ও অপরটি সামাজিকতাপ্রসূত। সামাজিক লজ্জার কারণ সমাজভেদে বিভিন্ন ও বিচিত্র। লজ্জা যে মনস্তত্ত্বের একটি বিচিত্র সমস্যা তাহা ডারউইন ও এলিস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ নগ্নত্ব, গুণ্ঠন ও লজ্জার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—লজ্জা বাহ্যঅবস্থা-নিরপেক্ষ মানসিক ব্যাপার। মানুষ সব ত্যাগ করিতে পারে, লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না; সেই জন্য লজ্জা ত্যাগ সব চেয়ে বড় ত্যাগ—লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অর্থেই ইহা সত্য।

বৈরাগ্য

(নোগুচি)

বিরাগের হাওয়া লেগেছে আমায়,
কুহেলি-কুহকে ঘিরেছে মোরে;
সমাধি-ভূমির সমাধান-বাণী
আমারে ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঘোরে।

নিবাত নি-বাক্ ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফিরি
নীরব আঁধার জড়াই বুকে,
যেথা কোলাহল চির-সমাহিত
আমি সে নিভৃতে বেড়াই সুখে।

আব্ছায়া-ঘেরা ভোরের বাসরে
ঘুরি ফিরি একা কৌতূহলে,—
যেথা বিস্মৃত লভে বিশ্রাম
ধ্বংসের বুকে ধূলির তলে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জন্মদুঃখী

একাদশ পরিচ্ছেদ

আবার মুলতুবি

আজকাল মায়ের ভয়ে বাড়ীতে সিলার টুঁ শব্দ করিবার জো নাই; কারখানায়, তবু, বেচারা পাঁচজনের সঙ্গে কথা কহিয়া বাঁচে।

এখন সে ক্রিষ্টোফা জোসেফাদের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা বেড়াইতে পায় না। বেড়ানোর আমোদ অন্যরূপে মিটায়। সিলা উহাদের সান্ধ্য কাহিনীর বর্ণনা শোনে। দুধের সাধ ঘোলেই মেটে।

ক্রিষ্টোফার কী বর্ণনাশক্তি! সে তুচ্ছ জিনিষকেও বলিবার গুণে মনোরম করিয়া তোলে। নাচের কথা, ভোজের কথা, চড়ইভাতির কথা, বড়লোকের ছেলেদের উদারতার কথা সে এমন গুছাইয়া রংদার করিয়া বলিতে পারে, যে, শুনিলেই মানুষের লোভ হয়। ক্রিষ্টোফার বর্ণনার গুণে তুচ্ছবিষয় রূপকথার মত চমৎকার হইয়া ওঠে। সিলা বাড়ী গিয়াও মনে মনে ঐসব কথারই আলোচনা করে।

সম্প্রতি সিলার নিজের জীবনেও উপন্যাসের হাওয়া লাগিয়াছে; সে যখনই বার্ব্বারার দোকানে, কোনো জিনিসের প্রয়োজনে যায়, তখনই লাড্‌ভিগ্ ভীর্গ্যাঙের চুরুট ধরাইবার দরকার হয়; সেও সঙ্গে সঙ্গে বার্ব্বারার দোকানে ঢোকে। এ কথা কিন্তু সিলা নিকোলাকে বলে নাই।

এই সে দিনও যখন উহাকে দেখিয়া সিলা তাড়াতাড়ি দোকান হইতে চলিয়া আসিতেছিল তখন উহাকেই লক্ষ্য করিয়া লাড্‌ভিগ্ বলে "আমি কি এতই ভয়ঙ্কর? ও গো কৃষ্ণনয়না সুন্দরী আমায় দেখে তুমি পালাও কেন? হাঃ হাঃ হাঃ। কালো চোখ কি ঢেকে রাখ্‌বার জিনিষ? হাঃ হাঃ হাঃ!"

ইদানীং সিলার এইসমস্ত কথা নিতান্ত মন্দ লাগিত না। লাড্‌ভিগের "পটু-চাটু-শতৈঃ" উহার মন একেবারে অনুকূল না হইলেও প্রতিকূলতার মাত্রা যে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। লাড্‌ভিগের আবির্ভাব এখন উহার চক্ষে অন্ধ-কারা-রুদ্ধ বন্দীর পক্ষে সূর্য্যালোকের মত সুন্দর।

বাহিরের আচরণে কোনো বৈলক্ষণ্য লক্ষিত না হইলেও আকারে সিলা দিন দিন আরো যেন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার ডাগর চোখ ড্যাবডেবে হইয়া উঠিল। হল্‌ম্যান্‌গৃহিণীর কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। সিলা যে কলের খাটুনি খাটিয়াও বাড়ীর প্রায় সমস্ত কাজের ভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছে ইহাতেই সে সুখী।

আজকাল কালেভদ্রে নিকোলার সঙ্গে দেখা হইলে সিলা নিজের সুখহীন জীবনের কথা বলিতে বলিতে একেবারে বিমর্ষ হইয়া যায়। যেসব তুচ্ছ ব্যাপারে সকল মেয়েরই স্বাধীনতা আছে—সুধু তাহারই নাই—সেইসব কথা বলিতে বলিতে বেচারা কাঁদিয়া ফেলে। ছেলেবেলা হইতে উহাকে চোখ্‌রাঙানির চোটে দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। এখন তো কলে কুলি, বাড়ীতে চাকরাণীর অধম।

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে সিলার চিন্তাস্রোত সহসা ভিন্ন পথে চলিতে আরম্ভ করিত। নিজের ঘর সংসার হইলে সে যে কত সুখী হইবে, নিকোলার সঙ্গে ছুটির দিনে কত জায়গায় বেড়াইবে, কত নাচিবে, কত গাহিবে, তাহারই আলোচনায় একেবারে মাতিয়া উঠিত। উৎসাহে তাহার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

আবার, একটু পরেই বেচারা কেমন যেন বিষণ্ণ, বিমর্ষ।

নিকোলা দেখিল এখন ঘাড় গুঁজিয়া একমনে হাড়ভাঙা খাটুনি ছাড়া সিলাকে উদ্ধার করিবার অন্য উপায় নাই। খাটিয়া খুটিয়া সাম্‌নের শীতের শেষ নাগাদ সে এক শত ডলার জমাইতে পারিবে। হায়! তাহার পূর্ব্বে সিলার মলিন মুখে হাসি ফুটিবে না।

* * * *

জর্জ্জিনা বলিয়া একটি মেয়ে সিলাদের পাশের বাড়ীতে থাকে। সে জুতার সাজ সেলাই করে। হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর মতে মেয়েটি ভারি শিষ্ট শান্ত। সুতরাং সিলা উহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার হুকুম পাইল। এমন কি একটা রবিবার উহার সঙ্গে শহরে বেড়াইতে যাইবারও হুকুম হইয়া গেল। সিলার আর আনন্দের সীমা নাই। খাঁচার পাখী যেমন করিয়া মুক্তির দিনের পথ চাহিয়া থাকে সিলা সেইরূপ ঔৎসুক্যে রবিবারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রবিবার আসিল। সে দিন সিলার মনে হইল 'সুপ্' রন্ধন বুঝি আর শেষ হইবে না। তাহার পর আবার

জর্জ্জিনার জন্য অপেক্ষা। উহার আর সাজগোজ ফুরায় না।

শেষে পোষ্ট আফিসের পুলিন্দার মত আঁটা সাঁটা অবস্থায়, চুলে চর্ব্বি লেপিয়া জর্জ্জিনা বাহির হইল। সিলা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উহার হাতের ভিতর হাত গলাইয়া দিয়া বুনো ঘোড়ার মত বাহির হইয়া পড়িল। উহারা আজ শহরে চলিয়াছে। কী আমোদ! কী আমোদ!

সময়ে পৌছিতে না পারিলে কোম্পানী বাগানের 'ব্যাণ্ড' শুনিতে পাইবে না বলিয়া সিলা জর্জ্জিনাকে একরকম টানিতে টানিতে যথাসাধ্য বেগে চলিতেছিল।

পথে এবং পার্কে লোকের মেলা। বড়লোকের মেয়েরা ভাল ভাল পোষাক পরিয়া বেড়াইতে আসিয়াছে। গোলাপী ফিতা! শুভ্র ওড়না! সুন্দর টুপি! তাই দেখিতেই সিলা ও জর্জ্জিনার অর্দ্ধেক সময় কাটিয়া গেল।

রবিবার পবিত্রবার এবং বিশেষ করিয়া ভজনার দিন বলিয়া প্রত্যেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাই আজ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। সিলার এই দৃশ্য ভারি অদ্ভুত মনে হইতেছিল। আজ ছুটির দিন, ছুটির দিনে এত গাম্ভীর্য্য তাহার চক্ষে ভারি বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। শেষে দুইজনে মিলিয়া বাগানের বাহির হইয়া কেল্লার চতুর্দ্দিকে এক চক্র ঘুরিয়া আসিল। কেল্লার সান্ত্রী হাঁকিল, "Relieve guard!" অপরাহ্ণের ক্লান্ত হাওয়ায় মনে হইল লোকটা উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিতেছে। দূরে নিস্পন্দ রৌদ্রে নদীর উপর দিয়া নৌকা চলিতেছিল।

উহারা এখানে দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছুই না পাইয়া জেটির দিকে চলিল। সেখানেও সেই রবিবাসরীয় নিস্তব্ধতা।

বাজারে কয়েকটা নিষ্কর্ম্মা লোক পরস্পরের ঘড়ি লইয়া অতি সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। উহারা পরস্পরে ঘড়ি বদল করিবে। এ এক খেলা! অদৃষ্ট পরীক্ষার খেলা! বদ্‌লাইবার আগে তাই ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতেছে।

গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিতেছে, সান্ধ্য উপাসনার আর বিলম্ব নাই।

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া উহারা বাড়ী ফেরাই মনস্থ করিল। হঠাৎ একটা মোড় ফিরিয়া, কেল্লার ঘেরা ঘাটে জাহাজের আনাগোনা ও লোকের ভিড় দেখিয়া, সিলা বলিল "চল জাহাজে করে ওপার থেকে বেড়িয়ে আসি, পথে পথে আর ধূলো খেতে পারি নে।" জর্জ্জিনা বলিল "নাঃ, ভারি লোকের ভিড়, আর বেলাও গিয়েছে। দেরী হলে তোমার মা আবার রাগ করবেন।"

"এই বুঝি তোমার বেড়ান? বেড়িয়ে খুসী হয়েছ?... চল না, দিব্যি জাহাজের সামনের দিকে বসে একটু হওয়া খেয়ে আসা যাক্। চল, চল।"

জর্জ্জিনা অগত্যা স্বীকার করিল।

ওপারে যে জায়গায় জাহাজ লাগিয়াছে সেটা একটা দ্বীপের মত। জাহাজ হইতে নামিয়া সিলা ও জর্জ্জিনা দেখিল সাম্‌নে একটা জায়গায় মেলা বসিয়াছে, নানা রকম তামাসা চলিতেছে। একটা তাঁবুর ভিতরে নাচের তালে বাজনা বাজিতেছে। ভিতরে হাসির শব্দ, গল্পের গুঞ্জন। বাজনা শুনিয়া সিলা সেইখানে দাঁড়াইতেছিল, কিন্তু জর্জ্জিনা উহাকে দাঁড়াইতে দিল না; সে বলিল "ছিঃ, কোনো গেরস্তর মেয়ে ওখানে দাঁড়ায় না, চলে এস।"

সিলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জর্জ্জিনার পিছনে পিছনে চলিল। কিন্তু উহার মন পড়িয়া রহিল ঐ তাঁবুর প্রান্তে। নাচের তালে বাজ্‌না বাজিতেছিল, আর সেই তালে তালে সিলার সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারাও আনন্দে নৃত্য করিতেছিল।

খানিক দূরে গিয়া তখনো উহারা তাঁবু ছাড়াইয়া যায় নাই—সঙ্গীত-মুগ্ধ সিলা পুনর্ব্বার তাঁবুর বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। এবারে জর্জ্জিনা একেবারে রাগিয়া উঠিল। সে বলিল "থাক তুমি একলা; আমি চল্লুম এখুনি। নিজের মান সম্ভ্রমের জ্ঞান নেই?... তোমার না থাকে আমার তো আছে, আমি এখানে দাঁড়াতে পারব না।"

তফাতে দাঁড়াইয়া একটু বাজ্‌না শুনিলে কি করিয়া যে মানের হানি হয় বা রং চটিয়া যায়, সিলা তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। আর যদি দেখিবে না শুনিবে না তবে বেড়াইতে আসিবারই বা দরকার কি ছিল? আর এতক্ষণ তো ঘুরিয়া বেড়ানো হইল, ভদ্র রকমের আমোদের তো সন্ধান পাওয়া গেল না!

জর্জ্জিনা যখন কিছুতেই বাগ্ মানিল না তখন বাধ্য হইয়া সিলা জাহাজেই ফিরিল।

যখন বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পায়ে ফোস্কা, গায়ে মাথায় ধূলা, শরীর অবসন্ন, মন অতৃপ্ত।

মায়ের কাছে ভ্রমণের বিবরণ বলিতে বলিতে চেয়ারের উপরেই সিলা ঢুলিয়া পড়িল। তাঁবুর ভিতরকার বাজ্‌নার তাল এখনো তাহার মাথার ভিতরে ঘুরিতেছে। সে স্বপ্নে দেখিল যেন সে এক নাচের মজ্‌লিসে নিমন্ত্রিত।

* * * *

শরতের শেষে যাহারা পয়সা বাঁচাইবার জন্য বাড়ীতে আগুন পোহায় না তাহারা সন্ধ্যাবেলায় বার্ব্বারার দোকানে আসিয়া জোটে। গল্পগুজবও হয়, বিনি পয়সায় চা খাওয়ারও মানা নাই।

আজকাল কিন্তু বার্ব্বারার মেজাজ ঠিক আগেকার মত মোলায়েম নাই। মাঝে মাঝে সে চটিতে সুরু করিয়াছে। তাহার চা-বিতরণের মধ্যেও কার্পণ্যের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। আজকাল সে কোনো দিন কৃপণ, কোনো দিন দাতা। ইহার নিগূঢ় কারণ আছে; চিনির মহাজন, ময়দার মহাজন চাওয়ালা তেলওয়ালা সবাই আবার টাকার তাগিদ্ দিয়াছে। ফুটা বাক্সের যে অবস্থা তাহাতে তো একজন মহাজনেরও দেনা শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সময় দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়, কালবাদে পরশু মহাজনের লোক আসিবে। উপায়? সে দুই এক জায়গায় ধারের চেষ্টা করিল, সেদিকেও সুবিধা হইল না। তাই তো! উপায়? দোকানপাঠ শেষে গুটাইতে হইবে না তো!

নিকোলাকে বার্ব্বারা সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছিল 'উপায়?'.

নিকোলা যে ইহার কোনো সদুপায় ঠাওরাইতে পারিয়াছে তাহা তো তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হয় না।

বার্ব্বারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; বলিল "যা দেখ্‌তে পাচ্ছি তাতে সব মালপত্র আদালতে উঠিয়ে নিয়ে নীলাম করবে, আর কি। শেষে আটত্রিশ ডলারের জন্যে এত পয়সা খরচ, এত দিনের পরিশ্রম সব জলে যাবে!"

ইহার পরে বার্ব্বারা যে কী বলিবে, তাহা নিকোলার পক্ষে আন্দাজ করা শক্ত নয়। সে বুঝিল, যে, সে একটু সহানুভূতি দেখাইলেই বার্ব্বারা আবার তাহারই ঘাড় ভাঙিয়া টাকা আদায় করিবে। অথচ, বার্ব্বারার যে রকম হিসাবের জ্ঞান, ব্যবসায়বুদ্ধি, তাহাতে বারম্বার টাকা ঢালিলেও দোকানের যে কোনো কালে উন্নতি হইবে সে আশাও দুরাশা। ওদিকে নিকোলা এত কষ্ট করিয়া যে উদ্দেশ্যে টাকা জমাইয়াছে সে উদ্দেশ্যও বিফল হইতে দেওয়া যায় না। আরও দিন পিছাইলে, সিলাকে কষ্টের মধ্যে শান্ত করিয়া রাখা মুস্কিল হইবে।

নিকোলা নীরবে আগুনের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

নিকোলা কোনো জবাব দিল না দেখিয়া বার্ব্বারা কাঁদিতে আরম্ভ করিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ভেবেছিলুম, ছেলে রোজগার করতে শিখ্‌ল, আমার দুঃখু ঘুচ্‌বে; আর কিছু না হ'ক অন্তত সময়ে অসময়ে আর পরের দরজায় হাত পাত্‌তে হবে না।"

"তুমি তো জান মা, কেন দিতে পাচ্ছিনে, তুমি তো সব জান। আর তা' ছাড়া তোমার ও দোকানে কোনো দিন সুবিধা হবে বলে তো আমার বোধ হয় না। তার চেয়ে সময় থাক্‌তে ছেড়ে দেওয়াই বোধ হয়, ভাল। দোকানে এ পর্য্যন্ত কি এক পয়সা লাভ হ'য়েছে?"

বার্ব্বারা চটিয়া গেল, সে বলিল "তা কি করতে হ'বে? বুড়ো গরুর মতন কোর্ব্বানি করব নাকি? আমি দোকান তুলে দিয়ে দেউলে হ'ব আর লোকে টিট্‌কারী দেবে এই যদি তোমার মনের কথা হয়,—তো সেইটেই না হয় খুলে বলে ফেল।···তুমি এ বেশ জেন, যে, তুমি টাকা না দিলেও আমার দোকান বন্ধ হবে না, আমিও দেউলে হব না। বেঁচে থাক লাড্‌ভিগ্—টাকার ভাবনা কি? একবার মুখের কথা খসালে হয়।···আর, বার বার যে তোমার জন্যে আমি দুঃখু সইব একথা তুমি মনেও ভেব না। একবার তোমার জন্যে আমি কৌসুলী সাহেবের বাড়ীর অমন সুখের চাকরী হারিয়েছি, আবার?···অবাক হ'য়ে গেলে যে? লাড্‌ভিগ্‌কে মারপিট ক'রে আমার চাক্‌রীর দফা নিশ্চিন্তি ক'রে এখন একেবারে হাবা হ'লেন। নইলে আমার চাকরী কি যেত?···আজ একটা বিপদে পড়েছি তাই

টাকা চেয়েছি, তাও ধার চেয়েছি; তবুও দিতে পারলেন না, ওঁর আরেক জনের জন্যে টাকার দরকার।...শুধু তাই? লাড্‌ভিগ্‌ আমার ছেলের মত—তার কাছে টাকা ধার নেব তাও তুমি নিতে দেবে না। এ যে তোমার কী একগুঁয়েমি তা বুঝতে পারিনে।...আর আমি তোমার মান অপমানের ভাবনা ভেবে চল্‌ছিনে; সে ভাব্‌তে গেলে আমার চল্‌বে না।...তোমার কাছে সাহায্য চাইলুম্‌, তুমি সাহায্য করতে পারলে না; ভাল, যে পারে তার কাছেই যাব। দোকান বন্ধ হওয়া মানে ডান হাত বন্ধ হওয়া; সে তো আর মুখের কথা নয়,...কাজেই বাধ্য হয়ে যেতে হবে।...ভাগ্যিস্‌, এ ব্যাপারটা এই সপ্তাহে পড়েছে, নইলে সাম্‌নের হপ্তায় লাড্‌ভিগ্‌ আবার কোথায় হাওয়া খেতে যাবে। সে সময়ে এম্‌নিধারা বিপদে পড়লেই হয়েছিল আর কি!"

নিকোলার ঠোঁট কাঁপিতেছিল, সে জামার আস্তীন্‌ দিয়া ইহারি মধ্যে দুই তিন বার কপালের ঘাম মুছিয়াছে। বার্ব্বারা থামিলে, সে ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল—

"পাবে, পাবে; টাকা আমিই দেবো।"

বিবাহের মাম্‌লা আবার মুল্‌তুবি! ক্ষোভে নিকোলার চোখ দিয়া জল আসিতেছিল।

নিকোলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বার্ব্বারার কথা আজ তাহার বুকে বাজিয়াছে। নিকোলাই যে বার্ব্বারার সকল দুঃখের মূল এ কথাতে সে 'হতভম্ব' হইয়া গিয়াছে।

এই তো, বিবাহের সম্ভাবনা তিন মাসের মত পিছাইয়া গেল। আবার যদি বার্ব্বারা টাকা চায়? নিকোলা হতাশ হইয়া পড়িল।

হপ্তার শেষে রোজগারের টাকা বাক্সে রাখিতে রাখিতে উহার কেবলি মনে হইতেছিল,—"মিথ্যা সঞ্চয়; যে কোনো দিন খুসী, বার্ব্বারা ইহা নিঃশেষে গ্রাস করিতে পারে। অবশ্য সে অধিকার তাহার আছে, একদিন নিকোলাও বার্ব্বারার রোজগারের টাকায় জীবন ধারণ করিয়াছে।... তবু!...তবু আর কি?

তারপর বার্ব্বারা নিকোলার মাতা, অথচ পিতৃনামের গৌরবে গর্ব্ব অনুভব করিবার অবসরটুকুও সে নিকোলাকে দিতে পারে নাই, এজন্য সেই তো জগতের চক্ষে অপরাধী; নিকোলাকে সে স্তন্য পর্য্যন্ত দেয় নাই। এখন সেই তাহার উপার্জ্জনের টাকা দাবী করিতেছে। সেই তাহার জীবনের সুখ, হৃদয়ের শান্তি গ্রাস করিতে বসিয়াছে।

নিকোলা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জীবন এখন তিক্ত।

সে কি সিলার আশা ছাড়িয়া দিবে? অসম্ভব, নিকোলার একখানা হাড় থাকিতে তো নয়।

মানবজন্ম যখন লাভ করিয়াছে তখন মানুষের মত মাথা তুলিয়াই সে চলিবে। এজন্য যদি দেহ হইতে মাথাটা বিচ্যুত হইয়া পড়ে তাহাতেও নিকোলা প্রস্তুত।

বার্ব্বারার দোকানের জন্য সে আর এক পয়সাও খরচ করিবে না। বার্ব্বারা খাইতে না পায় নিকোলার কাছে আসুক, বার্ব্বারার ভরণপোষণের ভার নিকোলার। কিন্তু দোকানের জন্য আর এক পয়সাও না।

ভবিষ্যতের বিষয়ে এইরূপ একটা নিষ্পত্তি করিয়া নিকোলার মাথা অনেকটা খোলোসা হইয়া গেল।

এবার বিবাহ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু আর এমনটা ঘটিতে দেওয়া হইবে না। কারণ, সে নিকোলা, সহরের একটা সেরা কারখানার সেরা কারিকর,—সর্দ্দার; তাহার যে কথা সেই কাজ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উৎসবে ব্যসন।

শীত প্রায় ফুরাইল। ফেব্রুয়ারির মেলা সুরু হইয়াছে। ঢাক বাজিতেছে, বাজীকর চেঁচাইতেছে, লটারির চাকা ঘুরিতেছে। অবিশ্রান্ত লোকের চলাচলে রাস্তার বরফ গুঁড়া হইয়া দোবারা চিনির মত হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্যগীত, তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আমোদের অন্বেষণ।

আমোদের ঢেউ মজুর-পাড়া পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে; সমস্ত শহরটা এখন উৎসবময়।

মাপের গেলাসে মাপিয়া যাহারা আমোদ করিতে চায় এবং লোকনিন্দার ভয়ে মেলায় যাইতে সাহস করে না তাহাদের অব্যক্ত ঔৎসুক্যের সীমা পরিসীমা নাই। আর যাহারা নিন্দার ভয় করে না, কাহারো তোয়াক্কা রাখে না,

তাহারা দলে দলে ফুর্ত্তি করিয়া মেলার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মেলায় বল্ নাচের ব্যবস্থা আছে, খাবারের দোকান আছে, রঙীন লণ্ঠনের আলো আছে, প্রলুব্ধ করিবার হাজারো জিনিস সেখানে বর্ত্তমান।

মেলা বসিবার দ্বিতীয় দিনেই ক্রিষ্টোফ' আসিয়া হাজির। ভারি সুখবর! একজন লোক উহাকে এবং সিলাকে বিনা পয়সায় মেলা দেখাইবে বলিয়াছে। তাহার নাম কিন্তু ক্রিষ্টোফা কিছুতেই ফাঁস করিবে না। সে টিকিটেরও দাম দিবে আবার কেকেরও দাম দিবে। ভারি মজা!

সিলা এপর্য্যন্ত কখনো মেলা দেখে নাই। বাহির হইতে ভিড়ের সঙ্গে মিলিয়া উঁকিঝুঁকি মারিয়াছে মাত্র। এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিতেও উহার মন সরিতেছে না, আবার যাইতেও সাহসে কুলায় না।

সিলা বাড়ী আসিয়া মায়ের মুখে শুনিল আণ্টনিরা মেলায় একখানা ঘর ভাড়া লইয়াছে, দোকান খুলিবে। সেখানে কেনা বেচার ভার সিলার মায়েরই উপর। অবশ্য আণ্টনিরা উহাকে এজন্য পয়সা দিবে। সুতরাং মেলার কয়দিন রাত্রে সিলাকে একলাই বাড়ী আগ্‌লাইয়া থাকিতে হইবে।

আনন্দে সিলার মন নৃত্য করিয়া উঠিল। এইবার তো সে ইচ্ছা করিলেই ক্রিষ্টোফার সঙ্গে যাইতে পারে।

সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে এতটা সুবিধা পাইয়া তাহার মনে কেমন যেন আশঙ্কা হইতেছিল।

সেইদিন বৈকালে সিলা যখন লোকের বাড়ী হইতে ময়লা কাপড় লইয়া ঘরে ফিরিতেছে সেই সময়ে কে একজন পুরুষ মানুষ উহার গা ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল। সিলা চমকিয়া ফিরিয়া দেখে লাড্‌ভিগ্। তবে সে ফিরিয়াছে! সিলা আর উহার দিকে চাহিতে পারিল না, লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু একবার যেটুকু দেখিয়া লইয়াছে তাহাতেই সিলা অনুভব করিয়াছে যে লাড্‌ভিগের দৃষ্টি উহারি উপর নিবদ্ধ। এবং উহাকেই লক্ষ্য করিয়া সে মৃদুমন্দ হাসিতেছিল।

সেই দামী চুরুটের মোলায়েম গন্ধ! সেই ক্রিষ্টোফাবর্ণিত উপন্যাসের নায়কের মত দামী পোষাকের 'খুশ খাশ্' শব্দ! সিলা মোটেই ভুল করে নাই। এতক্ষণে! টিকিটের টাকা এবং কেকের পয়সা যে কে দিবে এতক্ষণে তাহা বোঝা গেল।

ত্রস্ত পাখীর মত উহার স্পন্দিত হৃদয় উহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

বাড়ী আসিয়া সে আর্শীতে নিজের মুখ দেখিল। সত্যই কি উহার কালো চোখ এত সুন্দর?

পরের দিন, নিকোলা সিলার জন্য একটি আয়নাদার সেলাইয়ের বাক্স কিনিয়া উহারি সন্ধানে সন্ধ্যার ঝোঁকে বাহির হইয়া পড়িল। তখন সবে গ্যাস জ্বালা হইতেছে।

বাক্সের কলখানি তাহার নিজের তৈরী। বাক্সের ভিতরে সরু সুতা, মোটা সুতা, ছুঁচের কৌটা, কাঁচি, আঙুল-ত্রাণ। নিকোলা বাক্সর উপর দুইখানি কেক রাখিয়া বেশ করিয়া রুমালের মধ্যে জড়াইয়া বাঁধিয়া লইল। হঠাৎ দেখিলে কারিগরদের হাতিয়ারের থলি বলিয়াই ভ্রম হয়।

সিলাদের ঘরের কানাচে নিকোলা আজ কতবারই ঘুরিল। ঘরে আলো নাই, কাহারো সাড়াশব্দ নাই। ব্যাপার কি?

বেচারা সেলাইয়ের বাক্সটি হাতে করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সিলার দেখা নাই।

গলিতে একটা মাত্র গ্যাস্‌পোষ্ট। সেইখানটাতেই একটু আলো, বাকীটা একরূপ অন্ধকার।

এইবার গলিতে কে আসিতেছে! নিশ্চয় সিলা। নিকোলা তাড়াতাড়ি তাহার দিকেই চলিল।

না, না, এ যে জেকবিনা! নিকোলা উহাকে জিজ্ঞাসা করিল "হল্‌ম্যান্-গিন্নি কি আজ ঘরে নেই?"

"না, মেলায় গেছে।" কথাটা শুনিয়া, নিকোলা, নির্জ্জনে সিলার দেখা পাইবে ভাবিয়া, মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

নিকোলা যে সিলার সন্ধানেই আসিয়াছে জেকবিনা তাহা জানিত; সে মেলায় যাইবার টিকিট পায় নাই, সেজন্য সে সিলার সৌভাগ্যে একটু ঈর্ষান্বিতও হইয়াছিল;

সুতরাং সে নিকোলাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল "বেড়ালও বাড়ীছাড়া হয়েছে ইঁদুরেরও কুঁদুনি সুরু হয়েছে। সিলাও কি আর ঘরে আছে। সে গেছে মেলায় আমোদ করতে।"

"সিলা? সিলা মেলায়!"

"কেন যাবে না? তার এখন ভাবনা কি? তার টিকিটের পয়সা দেবার মানুষ হয়েছে।"

"কে বলে এমন কথা?"

"এই আমি; আমি ক্রিষ্টোফাকে আর তাকে স্বচক্ষে যেতে দেখেছি।...আর তা'ছাড়া ক্রিষ্টোফা আমায় নিজেই বলেছে, যে ওদের দুজনকে মেলায় নিয়ে যাবে সে ইচ্ছে কল্লে দশ জনকেও নিয়ে যেতে পারে। তবে, বোধ হয়, ওরা মেলায় যাবে না গির্জ্জায় যাবে।" জেকবিনা রঙ্গচ্ছলে চোখ মট্‌কাইল।

"কী বাজে বক্‌ছ? সাবধানে কথাবার্ত্তা কইতে শেখ নি?"

"হাঃ হাঃ! লোকটি তোমার নিতান্ত অচেনা নয়; বলতে গেলে আপনার জন। আমরা তোমার মায়ের মুখেই শুনেছি। মাস কয়েক আগে সে তোমার মায়ের হ'য়ে চিনির মহাজনের দেনা শোধ করেছে।"

নিকোলা আর শুনিতে পারিল না। বার্ব্বারা উহারও রক্ত শোষণ করিয়াছে আবার উহাকে লুকাইয়া লাড্‌ভিগের কাছেও হাত পাতিয়াছে। বার্ব্বারা আর নিকোলার মা নয়। সে কোনো দিন নিকোলাকে ভালবাসে না, সে যাহাকে স্নেহ করে সে—লাড্‌ভিগ।

"লাড্‌ভিগ্ ভীর্গ্যাং! সেই হতভাগা আমার মাকে পর ক'রে দিয়েছে, আবার সিলাকেও পর ক'রে দিতে চায়?"

নিকোলা আর দাঁড়াইতে পারিল না। সে বাক্স হাতে করিয়া মেলার দিকে ছুটিল।

যাইতে যাইতে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল;—ভাবিল "ক্রিষ্টোফা হয় তো মুখফোঁড় জেকবিনার সঙ্গে বেড়াতে চায় না, তাই তাকে রাগাবার জন্যে ঐ কথা বলে গেছে। হিঃ হিঃ হিঃ—এ নিশ্চয় সিলার মৎলব।...আমি যে ওদের মৎলব ধ'রে ফেলেছি এ কথা কিন্তু সিলাকে বল্‌তে হ'চ্ছে। দেখা হলেই বল্‌ব।"

নিকোলার মাথাটা অল্পক্ষণের জন্য যেন অনেকটা পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল।

"আচ্ছা একবার ঘুরেই আসা যাক্; হয়তো ওরা মেলার ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে থেকে আলো দেখ্‌ছে।...দেখেই আসা যাক্।"

নিকোলা মেলার পথেই চলিল।

লোকে লোকারণ্য। বাঁশী বাজিতেছে, ঢাক বাজিতেছে, আমোদের সীমা নাই।

হঠাৎ নিকোলার মন আবার দমিয়া গেল।

প্রবল বাতাসে এক এক দিকের লণ্ঠনগুলি এক একবার করিয়া স্তিমিত হইতেছে আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

নিকোলা ভিড়ের ভিতর অতি কষ্টে একখানি চেনা মুখের সন্ধান করিতেছিল। নাঃ, সে ভিড়ের মধ্যে নিশ্চয়ই নাই। তবে কি নিকোলা ভিতরটাও খুঁজিয়া দেখিবে? নিশ্চয়!

নিকোলা ঠেলিতে ঠেলিতে একেবারে ফটকের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

"ঐ! ঐ মেয়েটি। না, ও যে ক্রিষ্টোফা। সিলা কই?"

"ওহে কর্ত্তা! তুমি কি নাচ-তামাসা দেখ্‌বার টিকিট নেবে? না, শুধু মেলায় বেড়াবার টিকিট নেবে?"

নিকোলা হিসাব করিয়া দেখিল, তাহার পকেটে যে পয়সা আছে তাহাতে দুই রকম হইবে না; অগত্যা সে শুধু মেলায় ঢুকিবার টিকিটই লইল।

মেলায় ঢুকিয়া নিকোলা দেখিল একদিকে একটা কলের নাগর-দোলা, লোকে পরিপূর্ণ। আর একদিকে একটা তাঁবুর ভিতর হইতে বামাকণ্ঠের সুর ভাসিয়া আসিতেছে, মধ্যে মধ্যে প্রবল করতালি ও বাহবা। নিকোলা সমস্ত বাগান ঘুরিল; কোথায় বা সিলা আর কোথায় বা ক্রিষ্টোফা! মাঝে মাঝে দুই একজন শীতার্ত্ত লোক, ফানুসের পাশে পোকার মত, সঙ্গীতমুখর তাঁবুগুলার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের পকেটের অবস্থা বোধ হয় নিকোলার মত।

সহসা, নিকোলার সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিবার উপক্রম করিল। সে নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তবু, দ্বিধা সত্ত্বেও এক এক পা করিয়া সে একটা

জানালার রুদ্ধ সাসির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে আলো জ্বলিতেছে, নৃত্য চলিতেছে। কিন্তু ভালো করিয়া দেখা যাইতেছে না; সাসির ভিতরপিঠ ঘামিয়া ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে।

এই সময় সাসির একটা জায়গায় ঘাম গড়াইয়া পড়িল।

"ঐ যে ক্রিষ্টোফা! সিলা কোথায়? ··আঃ! জিজ্ঞাসা করা যায় কি ক'রে?"

এইবার নিকোলা একজন পুরুষ মানুষের ওভারকোট-পরা মূর্ত্তি দেখিতে পাইল; তাহার হাতে ছড়ি, মাথায় হালফ্যাসানের টুপি, মুখে চুরুট। এ যে লাড্‌ভিগ্! ও কথা কয় কাহার সঙ্গে? ঐ যা! সরিয়া গেল! বোধ হয় নাচিতেছে। কিন্তু কাহার সঙ্গে? কাহার সঙ্গে?

সাসির ঘাম এইবার দুই তিন জায়গায় গড়াইয়া পড়িল। লাড্‌ভিগের বুকে মুখ রাখিয়া উহার সঙ্গে ও কে ও—কে নাচে?

ব্যস্! নিকোলা যথেষ্ট দেখিয়াছে। পরমুহূর্ত্তেই প্রচণ্ড-বেগে সে একেবারে নৃত্যশালার দরজায় গিয়া হাজির।

দরজা মুহুর্মুহু খুলিতেছে এবং মুহুর্মুহু বন্ধ হইতেছে। লোকের আনাগোনা অবিশ্রান্ত।

নিকোলা সকলকে ঠেলিয়া একেবারে গার্ডের সম্মুখে। গার্ড বলিল "টিকিট?" নিকোলা উত্তর দিল না।

"টিকিট কই? টিকিট?" নিকোলা জোর করিয়া দরজার ফাঁকে মাথা গলাইতে গেল। একজন পাহারা-ওয়ালা উহাকে বাধা দিতে যাইতেছিল, সহসা উহার ভয়ঙ্কর চাহনি দেখিয়া পিছাইয়া পড়িল।

দরজার ফাঁক দিয়া নিকোলা আবার সিলাকে দেখিল। লাড্‌ভিগের সঙ্গে সে বাহিরের দিকেই আসিতেছে।

লাড্‌ভিগ্ অত্যন্ত অহঙ্কারে সোজা হইয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছে। লোকটা এম্‌নি করিয়া সিলার মাথা খাইতে বসিয়াছে, অথচ দেখিলে মনে হয় যেন সকল মলিনতার ঊর্দ্ধে।

সহসা একটা কলরব উঠিল "নিকাল দেও! নিকাল দেও!"

নিকোলা এবার ঠিক ঢুকিত কিন্তু পুলিশের লোক এবং নাচঘরের লোক একত্র মিলিয়া উহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল। একজন পাহারাওয়ালা উহাকে ধরিয়া রহিল। ঠিক্ এই সময়ে সিলা ও লাড্‌ভিগ্ বাহির হইয়া চায়ের দোকানের দিকে যাইতেছিল।

একঝটকায় পাহারাওয়ালার হাত ছাড়াইয়া নিকোলা একেবারে উহাদের ঘাড়ে গিয়া পড়িল।

সিলা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল; নিকোলা উহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া একেবারে লাড্‌ভিগের সম্মুখে মুখোমুখি করিয়া দাঁড়াইল।

লাড্‌ভিগের মুখ একেবারে পাংশু; সহসা পাঠ্যাবস্থার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনিতে পারিয়া অবজ্ঞায় তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল।

"এই পাজী! বদ্‌মায়েস! গুণ্ডা!" বলিয়া লাড্‌ভিগ শপাং করিয়া নিকোলার মুখে এক ঘা চাবুক মারিয়া বসিল। নিকোলাও অমনি এমনি জোরে উহার বুকে এক ঘুষি দিল যে মাংস কাটিয়া জামার বোতাম বসিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া উহাদের মাঝখানে পড়িল। ভিড় জমিয়া গেল।

"কামারের কুকুর! পাক্‌ড়ো উস্‌কো পাক্‌ড়ো! পুলিশ! পুলিশ!"

পুলিশ আসিয়া নিকোলাকে ধরিল। লাড্‌ভিগ্‌ও নিজেকে নিরাপদ বিবেচনা করিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল "যাও, এইবার হাজতে গিয়ে পচ; তুমি না হ'লেও সিলার বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলবে, আর, তার মেলায় ফুর্ত্তি করবারও কোনো বাধাই হবে না।"

লাড্‌ভিগের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে পুনর্ব্বার পুলিশের হাত ছিনাইয়া নিকোলা বিদ্যুতের বেগে ছুটিয়া গিয়া একহাতে লাড্‌ভিগের জামা ধরিল এবং "এ জীবনে আর তোকে ও কথা মুখে আন্‌তে হ'বে না" বলিয়া আর এক হাতে সজোরে সেই সেলাইয়ের বাক্সটা উহার মাথার উপর আছড়াইয়া ফেলিল।

লাড্‌ভিগ্ ঘুরিয়া বরফের উপর পড়িয়া গেল।

"খুন! খুন!" বলিয়া বহু লোক একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল। কেহ বলিল "ডাক্তারকে খবর দাও। এখানে ডাক্তার নেই?"

ওদিকে তিনটা তাঁবুতে নাচের তালে বাজনা বাজিতেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মূর্চ্ছিত লাড্‌ভিগ্‌কে হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল এবং নিকোলার হাতে হাতকড়ি পড়িল।

ইহার পর যখন উহাকে হাজতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল তখন সেই অল্পবয়স্কা মেয়েটি আসিয়া উহাকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া ধরিল। অনেকে টিট্‌কারী দিল; ছেলের দল হো হো করিয়া চেঁচাইতে সুরু করিল।

সিলা কারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "তোমরা ওকে নিয়ে যেয়ো না গো, ওকে তোমরা নিয়ে যেয়ো না।...নিকোলা, নিকোলা, তুমি ওদের বুঝিয়ে দাও এ দোষ আমার—এ আমার অপরাধ। এর জন্যে তোমায় কেন হাজতে নিয়ে যাচ্ছে?"

সিলা কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই অবসরে হাজতের গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পিছনে পিছনে সিলাও চলিল। তাহার গায়ের কাপড় কোথায় পড়িয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই।

গাড়ী থানায় ঢুকিল, নিকোলা বন্দী হইল; সিলা স্বচক্ষে সমস্ত দেখিল; আটক করিতে পারিল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, সিলা সেই থানার দরজায় ধর্না দিয়া আছে। কনেষ্টবল কতবার চলিয়া যাইতে বলিয়াছে, সে শোনে নাই।

শেষে, বসিয়া বসিয়া হতাশ হইয়া সে উঠিল। উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল; কোন্‌দিকে যে যাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। মাঝে মাঝে দাঁড়াইতেছে, আবার চলিতেছে।

ঝরণার উপরকার পুলের উপর আসিয়া সিলা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। কী অন্ধকার! কী গর্জ্জন! পুলের উপর সিলা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইল এই অন্ধতমসাবৃত গর্জ্জনের সঙ্গে সে যেন কোন্ গভীর সূত্রে সংবদ্ধ।

সমস্ত রাত সে অবসন্ন ভাবে পড়িয়া রহিল, তাহার বুকে যেন পাষাণের ভার। নিকোলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

নিকোলার হাতে যে হাতকড়ি পড়িয়াছে একথা কিছুতেই তাহার মন হইতে সরিল না। তাহার চোখের সাম্‌নে সেই হাতকড়ি! সিলার মনে হইল তাহার মাথা খারাপ হইতে বসিয়াছে। সে বুঝি পাগল হইবে! আবার, সে ভাবিল নিকোলা বোধ হয় এখন সিলার নাম কানে শুনিলেও বিরক্ত হয়; ছি ছি, সিলা কী কুকাজই করিয়াছে। সে শুধু নিজের আমোদের কথাই ভাবিয়াছে,—আর যে লোকটা তাহার সুখের জন্য, তাহাকে সৎপথে রাখিবার জন্য, দিন রাত পরিশ্রম করিয়াছে, হাতুড়ি পিটিয়াছে, সমস্ত আমোদ বর্জ্জন করিয়া সুখের সংসার পাতিবার আশায় একটি একটি করিয়া পয়সা জমাইয়াছে, হায়! তাহার সুখ দুঃখের কথা সিলা একবারও ভাবে নাই। যাহার জন্য সে এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে সেই সিলার দুর্ব্বুদ্ধির দোষে নিকোলা আজ হাজতে।

ভাবিতে ভাবিতে সকাল হইয়া গেল, সিলা সেই পুলের ধারেই বসিয়া রহিল। এখনো তাহার মাথার মধ্যে গত রাত্রের দুর্ঘটনার ছবি ক্রমাগত ঘুরিতেছে। দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া গেল। গ্যাস জ্বালিতে দেখিয়া সিলার চমক ভাঙিল। সে উঠিয়া বরাবর থানার দিকে চলিল। থানায় পৌঁছিয়া প্রথমতঃ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে উহার সাহস হইল না। ক্রমে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল। তখন সে সাহসে ভর করিয়া ইন্‌স্পেক্টরের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

"কি চাও?"

"নিকোলার খবর।"

"নিকোলা? কোন্ নিকোলা?"

"সেই কাল রাত্রে যে এসেছে।"

"সেই খুনের আসামীটা? তাকে কেন? তুমি তার কে হও? বোন্?"

"না।"

"ও!...তা' তার খবর আর কি শুন্‌বে? তার জীবনের আশা নেই; কাল যাকে সে ঘায়েল্ করেছে তার দফা নিকেশ হ'য়ে গেছে, আজ বেলা দু'পরের সময় সে মারা গেছে; আসামীকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হ'য়েছে।"

সিলা, থানা হইতে বাহির হইয়া কেমন করিয়া কখন যে পুলের উপর হাজির হইল, তাহা উহার খেয়াল ছিল না। বরফ পড়িতেছে তবুও বেচারীর হুঁস্ নাই।

এই তো—এই তো তাহার বিশ্রামের স্থান।

নিকোলার হাতে হাতকড়ি, সে না জানি কতই কাঁদিতেছে, কতই ডাকিতেছে; সিলা আর তাহার কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না।

সিলার চোখে অন্ধকার, কানে শুধু প্রপাতের আহ্বান।

*　　*　　*　　*

পরদিন সকালে দেখা গেল, পুলের নীচে নদীর ধারে বরফের ভিতর হইতে স্ত্রী-পরিচ্ছদের একটা টুকরা দেখা যাইতেছে। অভাগিনী সিলা! সে স্রোতের জলেও বিস্মৃতিলাভ করিতে পারে নাই, কিনারায় কঠিন বরফের উপর পড়িয়া উহার মাথার খুলি একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে।

*　　*　　*　　*

ডাক্তারের পরীক্ষায় সাব্যস্ত হইল মাথার আঘাতই লাড্‌ভিগ্ ভীর্গ্যাণ্ডের মৃত্যুর কারণ। মাথার খুলি ভাঙিয়া মস্তিষ্কের ভিতর হাড়ের কুচি ঢুকিয়া গিয়াছে।

মোকর্দ্দমার দিন নিকোলাকে আদালতে হাজির করা হইল। সে ইহার মধ্যেই সিলার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছে। এখন আর তাহার জীবনে স্পৃহা নাই। হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন তুমি ওকে খুন করলে?" নিকোলা বলিল "ইচ্ছা করেই খুন করেছি, ইচ্ছা করেই প্রাণে মেরেছি। যদি ওর একটা প্রাণ না হ'য়ে সাতটা প্রাণ হ'ত তা হ'লেও ওকে বাঁচতে দিতুম না।"

নিকোলার এইরকম চোটপাট্ জবাবে হাকিম সুদ্ধ উহার প্রতি বিরূপ হইয়া বসিলেন।

বাপের নাম জিজ্ঞাসা করায় নিকোলা বলিল "বাপের খবর জানিনে; সে সৌভাগ্য এজীবনে হয়নি; মায়ের নাম বার্ব্বারা; লোকে বলে সেই আমার মা। যে হতভাগা আমার ইহজীবনের সমস্ত সুখ হরণ ক'রেছে, পূর্ব্বে সেই আমায় মাতৃস্তন্যেও বঞ্চিত করেছিল।" এই সময়ে ভিড়ের ভিতরে একজন স্থূলকায় প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পুলিশের সাক্ষ্যে ইহাও প্রকাশ হইল, যে, বর্ত্তমান আসামী একবার একটি বালিকার নিকট হইতে টাকা ভুলাইয়া লইবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়, পরে প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করে। এতদ্ভিন্ন পাঠ্যাবস্থায় লাড্‌ভিগের সঙ্গে মারামারি এবং অল্পদিন পূর্ব্বে কারখানার মিস্ত্রি ওলাফ্‌কে হাতুড়ি দেখাইয়া শাসানোর কথাও ছাপা রহিল না।

হাকিমের রায়ে নিকোলার যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা হইল। "স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে এইরূপ খুন চাপা কতকটা স্বাভাবিক বিধায় ফাঁসীর হুকুম দেওয়া গেল না।"

*　　*　　*　　*

দীর্ঘ মেয়াদের কয়েদীদিগকে যে পথ দিয়া কয়েদখানায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল তাহারি অদূরে সৈন্যেরা চাঁদ্‌মারিতে লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতেছিল।

কয়েদখানার দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড ছিদ্রপথে কয়েদীরা একে একে প্রবেশ করিতেছে। যে লোকটা সকলের পিছনে ছিল সে শিকলে টান পড়িলেও একবার দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দূরে পাইনের বন সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, প্রপাতের জল যেন আনন্দে উছলিয়া পড়িতেছে। কয়েদীটা মুগ্ধের মত চাহিয়া আছে।

"তুই এখন পালাতে পার্‌লে বাঁচিস্, না? কি বলিস্ নিকোলা?"

"মানুষের স্বভাবই তাই।"

"বেশ তো, ভাল মানুষের মত থাক, চাই কি এক আধ বছর মাফ হ'তেও পারে। আর কটা বছর বইতো নয়, দেখ্ দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যাবে।

নিকোলা অসহিষ্ণুর মত উগ্রভাবে মাথা নাড়িল, এবং বলিল "উঁহুঁ! একবার বেরুলে কি হ'বে? আবার ফিরে আস্‌তে হবে। আমার আজন্ম এই রকম। আমি দেখ্‌ছি, হয় জগৎটাকে কয়েদ ক'রে রাখ্‌তে হবে, না হয় আমায় আট্‌কাতে হবে। ভেবে দেখ্‌লুম ওটা একজনের উপর দিয়েই যাওয়া ভাল।"

নিকোলা আর দাঁড়াইল না, উহার হাতের বেড়ী,

পায়ের শিকল গতির চাঞ্চল্যে পুনর্ব্বার মুখর হইয়া উঠিল, শিকল বাজিতে লাগিল ঝম্ ঝম্ ঝম্।*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমাপ্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মার্কস্ অরিলিয়সের আত্মচিন্তার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; কিন্তু তাহা ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ এবং সমগ্র লাটিন গ্রন্থের অনুবাদ নহে। মূল লাটিন হইতে সমগ্র গ্রন্থখানি অনুবাদিত হইতেছে। মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণের অনুবাদক অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ এই অনুবাদ করিতেছেন। অতএব অনুবাদ মূলের অনুরূপ হইবে, আশা করা যায়। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

বড়লাট তাঁহার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে মানভূমের লোকেরা নৃতত্ত্ববিজ্ঞান অনুসারে (ethnologically) বঙ্গের লোকদিগের হইতে স্বতন্ত্র। ইহা তাঁহার একটি মস্ত ভ্রম। মানভূমের ও বঙ্গের অন্তঃপাতী বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলার লোকেরা ঠিক্ একই রকমের। মানভূমে যেরূপ অসভ্য আদিমনিবাসী লোক আছে, এইসব জেলাতেও তদ্রূপ আছে; মানভূমের মত তাহারা সংখ্যায় ও অনুপাতে তত বেশী নয়, এই যা প্রভেদ।

নৃতত্ত্ব বা ethnologyর কথাটা তুলাও অপ্রাসঙ্গিক। সে হিসাবে প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হইবে, একথা ত পূর্ব্বে সরকারী কোন কাগজপত্রে বলা হয় নাই। ভাষা অনুসারে বঙ্গের পুনর্গঠনের কথাই বলা হইয়াছিল। নতুবা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী প্রভৃতি জাতিরা বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, প্রভৃতিতেও নাই, তাহাদের সদৃশ কোন জাতিও নাই। এই বলিয়া ত উত্তরবঙ্গকেও পৃথক্ রাখা চলিত। বাস্তবিক যখন মানুষের ভাল যুক্তির অভাব হয়, তখন অপ্রাসঙ্গিক কথা উথাপন ভিন্ন আর অন্য উপায় থাকে না। এইরূপে নৃতত্ত্বের যুক্তিটা খণ্ডিত হইলে ভূতত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব, প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যার সাহায্য লইয়া বলা যাইতে পারে যে মানভূমের ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ এবং খনিজপদার্থনিচয় বিবেচনা করিলে উহার সহিত মধ্যভারতেরই সম্পর্ক অধিক বোধ হয়। যাহা হউক, এসব কথা তুলিয়া বিপদ্ বাড়াইবার দরকার নাই। কেন না, সত্য সত্যই কোন রাজপুরুষ হয়ত ভবিষ্যতে বলিতে পারেন, "ভাল কথা মনে পড়াইয়া দিয়াছ; মানভূমকে মধ্যভারতের সঙ্গে যোগ করাই উচিত।"

এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে আমাদের সম্মুখে আর এক সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে বোধ হয়। ঢাকায় স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব হওয়ায় আমরা বলিতেছি, যে, তাহা না করিয়া বেহারে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় করা হউক। ফলে যাহা ঘটিবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়—ঢাকাতেও বিশ্ববিদ্যালয় হইবে, বেহারেও হইবে। তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে কিনা, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন।

ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশ নূতন করিয়া যে ভাবে গঠিত হইতে যাইতেছে, তাহাতে আপাতত শিক্ষিত বাঙ্গালীর আর্থিক ক্ষতি ক্রমশ বাড়িতে থাকিবে। রাজধানী দিল্লীতে যাওয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্টের নূতন দেশী কর্ম্মচারী অতঃপর যত নিযুক্ত হইবে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে; বাঙ্গালী মোটেই নিযুক্ত হইবে না, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কারণ, আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, প্রভৃতি কখনও বঙ্গের সামিল না থাকা সত্ত্বেও এখনও তথায় বাঙ্গালী নিযুক্ত হইতেছে। বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা বঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র হওয়ায় ঐসকল প্রদেশের নূতন কর্ম্মচারীদের মধ্যেও বাঙ্গালীর সংখ্যা কম হইবে। উকীলের সংখ্যাও ক্রমশঃ কম হইবে, বিশেষতঃ, বেহারে স্বতন্ত্র হাইকোর্ট হইলে; এবং তাহা, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, হইবেই। সুতরাং দেখা

---

* নরওয়ের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক Jonas Lie রচিত Livsslaven নামক উপন্যাসের ইংরেজি তর্জ্জমার বঙ্গানুবাদ।

যাইতেছে যে চাকরী ও ওকালতীজীবী শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপার্জ্জনক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া আসিল। ইহা বুঝিয়া আগে হইতে নূতনতর জীবিকার দিকে মন দেওয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতে যে অসুবিধা হইবে তাহা লইয়া অন্য প্রদেশবাসীদের সঙ্গে মনোমালিন্য জন্মান, আমাদের পক্ষে অন্যায় ও নিষ্ফল হইবে। গবর্ণমেণ্টের উপর রাগ করিয়াও কোন লাভ নাই। নিজের পথ নিজেই দেখিয়া লওয়া উচিত।

উপার্জ্জনের উপায় ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে বাঙ্গালীর অদূরদর্শিতা হয় ত অবশ্যম্ভাবী ছিল; যখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকে ইংরাজী তত বেশী শিখে নাই, আমরা শিখিয়াছিলাম, তখন চাকরী এবং তজ্জনিত আয় ও ক্ষমতা, এবং ওকালতী হাতের কাছে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া বোধ হয় অন্য কোন জাতিরও বুদ্ধিতে আসিত না। কিন্তু কারণ বা অবস্থা যাহাই হউক, অদূরদর্শিতা অদূরদর্শিতা ভিন্ন আর কিছু নহে। এখন যে অসুবিধা ঘটিতে যাইতেছে, তাহা প্রাদেশিক পুনর্গঠন না হইলেও ঘটিত; হয় ত আরও একটু বিলম্বে ঘটিত, এইমাত্র প্রভেদ। কেননা, শিক্ষিত বাঙ্গালীর সুবিধার জন্য অন্য প্রদেশের লোকেরা চিরদিন শিক্ষায় দ্বিতীয়স্থানীয় থাকিবে, ইহা সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

বাস্তবিক, যাহা নিতান্তই সরকারী ভাঙ্গাগড়ার বন্দোবস্ত ও অনুগ্রহ সাপেক্ষ তাহার উপর এতটা নির্ভর করিয়া থাকা কখনও ঠিক্ হয় নাই।

অপরদিকে মাড়োয়ারী, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মান্দ্রাজী, প্রভৃতি "অশিক্ষিত" ব্যাপারী লোকদের বুদ্ধি দেখ। তাহারা এক কলিকাতা সহর হইতে যত টাকা লইয়া যাইতেছে, বঙ্গের বাহিরে সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত বাঙ্গালী রাজভৃত্য ও উকীল তাহা উপার্জ্জন করে না। আর, উক্ত অবাঙ্গালী ব্যবসাদারদের রোজগার প্রাদেশিক পুনর্গঠনের উপর মোটেই নির্ভর করে না। কলিকাতাকে রাজধানী বল আর না বল, মাড়োয়ারীর ব্যবসা কে মাটী করিবে? আর যদি কলিকাতায় বিক্রী কিছু মন্দা পড়ে, দিল্লীতে দোকান খুলিতেও কোন নিষেধ নাই। মানভূম বঙ্গেই থাক্, আর ছোট-নাগপুরেই থাক্, তথাকার মাড়োয়ারী দোকানদার ও মহাজনদের অন্ন মারে কে?

কেহ মনে করিবেন না আমরা কেবল বড় বড় ব্যবসাদারদের কথাই বলিতেছি। কলিকাতায় ত পান-ওয়ালা, সরবৎওয়ালা, সোডা বরফওয়ালা, মুদি ও ময়রার মধ্যে হিন্দীভাষী খুবই বেশী। মফঃস্বলেও এইরূপ দেখা যাইতেছে। তা ছাড়া বঙ্গের সর্ব্বত্র বড় বড় রেলের ও সরকারী ইমারতাদির ঠিকাদারদের মধ্যে কচ্ছী, সিন্ধী, প্রভৃতি প্রায়ই দেখা যায়। রাজমিস্ত্রী, কুলি, প্রভৃতির ত কথাই নাই।

বঙ্গের কেবল শিক্ষিত লোকেরা ভারতবর্ষের অন্য-প্রদেশে গিয়া রোজগার করে। কিন্তু অন্য প্রদেশের অশিক্ষিত লোকেরাও এইরূপে উপার্জ্জন করে। লক্ষ লক্ষ বেহারী, হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া, চাপরাসী, দারোয়ান, রাঁধুনী, গৃহভৃত্য, ও কুলীর কাজ করিয়া বঙ্গদেশে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিতেছে। ভিন্ন প্রদেশীয় ঝি ও পাচিকা কলিকাতায় বিস্তর আছে। বঙ্গের ছুতার মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি অন্য প্রদেশ হইতে আসিতেছে। ধানের ক্ষেতে ধানকাটিবার মজুর এখন আর শুধু বাঙ্গালী নয়। কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের এই নদী-খাল-বিল বহুল বঙ্গদেশে নৌকার মাঝিরা এখন আর শুধু বাঙ্গালী নয়। তাহাদের মধ্যে এখন অনেকে বেহারী ও হিন্দুস্থানী। তবে কি উভচর বাঙ্গালী মাঝিদের বংশ হ্রাস হইতেছে? না তাহারা অন্যপ্রদেশের মাঝিদের সঙ্গে জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হইতেছে? সে দিন নৈহাটী হইতে গঙ্গা পার হইয়া চুঁচুড়ায় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনীতে গেলাম। যাইবার সময় খোট্টা মাঝি পার করিল, আসিবার সময় বাঙ্গালী।

বাস্তবিক দেশের শ্রমজীবী লোকেরাই দেশের অস্থিমজ্জা ও মেরুদণ্ড। তাহাদের অধোগতি ও হ্রাস হইলে জনকতক জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, অধ্যাপক, হাকিম, শিক্ষক ও কেরাণী আদি লইয়া কখনও একটা শক্তিশালী জাতি গঠিত হইতে পারে না। আমাদের শ্রমজীবীদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যখন হইতে সেন্সস্ দ্বারা লোকসংখ্যা গণিত হইতেছে, তখন হইতে

আরম্ভ করিয়া আমাদের দেখা উচিত যে বঙ্গের শ্রমজীবীদের, চাষী, কারিকর, দিনমজুর ও ব্যবসায়ী জাতিদের সংখ্যা কিরূপ বাড়িতেছে বা কমিতেছে। বাঙ্গালী তেলি, চাষা, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, কাঁসারি, শাঁখারি, সেক্‌রা, ছুতার, রাজমিস্ত্রী, লোহার, তাঁতি, যুগী, প্রভৃতি, বাঙ্গালী নমশূদ্র, বাগ্‌দি, বাউরী, পোদ, ডোম, হাড়ি, মুচি, প্রভৃতি সংখ্যায় বাড়িতেছে না কমিতেছে? যদি বাড়িতেছে, তাহা হইলে অন্য প্রদেশের লোকেরা আসিয়া তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র দখল করায় তাহাদের কি দশা হইতেছে? প্রতিকারই বা কি? যদি কমিতেছে, ত, কেন কমিতেছে? এবং প্রতিকার কি?

কতকগুলি চাকরী লইয়া অন্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে আমাদের ঈর্ষাবিদ্বেষ জন্মিবে, অথচ বঙ্গের রত্নখনিরূপ যে শিল্পবাণিজ্য চাষমজুরী তাহা অন্য প্রদেশের লোকে নিঃশব্দে দলে দলে আসিয়া লুটিবে, ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আর কি হইতে পারে? অথচ বুদ্ধি স্বাস্থ্য ও চরিত্রবল থাকিলে বাঙ্গালী না করিতে পারে, সংসারে এমন কোন কাজ আছে বলিয়া আমরা মোটেই বিশ্বাস করি না। বুদ্ধি বাঙ্গালীর আছে, চরিত্রবলে অন্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা আমরা হীন নহি। চরিত্রবল বৃদ্ধি সম্পূর্ণ চেষ্টাসাপেক্ষ। স্বাস্থ্যে বাঙ্গালী হীন, কিন্তু সকল বাঙ্গালী বা সকল জেলার বাঙ্গালী হীন নহে। যাঁহারা হীন, তাঁহারাও সমবেত ভাবে বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে চেষ্টা করিলে উন্নতি করিতে পারেন।

বঙ্গীয় শ্রমজীবী এবং কারিকরশ্রেণী ও জাতিদের বিষয়ে সেন্সস্‌ রিপোর্ট এবং অন্যান্য সরকারী রিপোর্ট হইতে সংখ্যা ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাদির উত্তর সম্বলিত প্রবন্ধ লিখিলে বড় ভাল হয়। কেহ যদি লিখিয়া পাঠান ত আমরা প্রকাশোপযোগী হইলে আহ্লাদের সহিত অবিলম্বে মুদ্রিত করিব। অন্য সম্পাদকেরাও এরূপ প্রবন্ধ আগ্রহের সহিত ছাপিবেন।

প্রধানতঃ লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গত মাসে কলিকাতায় সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর একটি শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা-সভা বসিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য হিন্দুদের মধ্যে কি প্রকারে শিক্ষাবিস্তার হয়, তাহার বিবেচনা করা। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি জাতির হিন্দুরা শিক্ষাবিষয়ে অগ্রসর। কিন্তু শ্রমজীবী ও কারিকর শ্রেণীর নানাজাতির হিন্দুগণের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার একান্ত প্রয়োজন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁহার সহযোগীদিগের মত এই যে এই শিক্ষাবিস্তার কার্য্য প্রধানতঃ ঐ ঐ জাতির লোকদের নিজের চেষ্টা দ্বারাই করাইতে হইবে। এই মতের মধ্যে সর্ব্ববিধ উন্নতির একটি গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। হীনদশাগ্রস্ত মানুষের নিজের প্রাণে উন্নতির ইচ্ছা জাগাইয়া দেওয়া এবং সেই উন্নতি যে-সে করিতে পারে এই বিশ্বাস তাহার মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। ইহা যদি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসে। সে কাজ বাহিরের সাহায্যের দ্বারা হইতে পারে। অতএব প্রারম্ভিক দুরূহ কাজটি যে উদ্যোক্তাদিগের চোখে পড়িয়াছে, ইহা আশার বিষয়।

কিন্তু এক এক শ্রেণীর শিক্ষাকার্য্য সেই সেই শ্রেণীর লোকের দ্বারা সাধন করিবার চেষ্টায় অসুবিধা এবং আশঙ্কাও আছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। অসুবিধা এই যে, এক এক শ্রেণীর স্বতন্ত্র চেষ্টায় অনেক সময় একটা ছোট কাজও হয় না, সমবেত চেষ্টায় তাহা হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, একটি গ্রামে কেবল কৈবর্ত্তদের চেষ্টা ও সাহায্যে একটি পাঠশালা স্থাপন দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইতে পারে; কিন্তু তথাকার কুমার, কামার, তাঁতি প্রভৃতির সহযোগে উহা সুসাধ্য হইতে পারে। অনিষ্টের আশঙ্কা এই যে, এরূপ শ্রেণীগত চেষ্টায়, একদিকে যেমন উৎসাহের আধিক্য দেখা যায়, অপর দিকে তেমনি, মানুষের হিতেচ্ছা ও সহানুভূতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে; সমুদয় দেশবাসীর সমবেত উন্নতি-চেষ্টায় এক এক শ্রেণী উদাসীন হইয়া পড়ে। ইহাতে দেশব্যাপী চেষ্টা ও কাজে শৈথিল্য আসে এবং মহাজাতি গঠনে অন্তরায় ঘটে। এরূপ অনিষ্ট আমাদের কল্পনা ও অনুমান প্রসূত নহে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে

এইরূপ শ্রেণীগত স্বতন্ত্র শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা বহু বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা হইতে যে পূর্ব্বোক্তরূপ সংকীর্ণতা এবং দেশব্যাপী হিতচেষ্টায় শৈথিল্য জন্মিয়াছে, তাহা আমরা এলাহাবাদে ১২।১৩ বৎসর থাকিয়া লক্ষ্য করিয়াছি। যাহা হউক, এরূপ আশঙ্কাসত্ত্বেও, হীনদশা-গ্রস্ত জাতিসকলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হইলে তাহা সুখের বিষয় হইবে।

বক্ষ্যমাণ আলোচনা-সভায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তাও উল্লিখিত হইয়াছিল। বাস্তবিক, অনুন্নত দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। যেমন সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তেমনি এইসকল শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার বড় কম। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যেমন মুসলমান-দিগকে শিক্ষিত করিতে বিশেষ চেষ্টার আবশ্যকতা স্বীকার করেন, তেমনি এই সব শ্রেণীর হিন্দুদিগকে শিক্ষিত করিবার বিশেষ চেষ্টা যে সরকারী কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং এই বিষয়ে যাহাতে গবর্ণমেণ্টের নজর পড়ে তাহার উপায় করিলে সভা ধন্যবাদার্হ হইবেন।

এই অর্থে এবং এই পর্য্যন্ত আমরা সরকারী সাহায্যের আবশ্যকতা স্বীকার করি। কিন্তু দেশবাসীর নিজের চেষ্টার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য জড়ান দুই কারণে অবাঞ্ছনীয় মনে করি। অপরের সাহায্য-প্রত্যাশা হইলেই মানুষ নিজের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে, পূর্ণ উদ্যোগ ও যত্ন করিতে, বিমুখ হয়। ইহা আমাদের মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে বা কার্য্যের সফলতার পক্ষে, কোন দিক্ দিয়াই ভাল নহে। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যে রকম এক আনা বা এক পয়সা সাহায্য করেন, সেই কার্য্যে, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে পুরা ষোল আনা কর্তৃত্ব করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। কাজটির প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে এই কর্তৃত্ব অনুভূত না হইলেও তাহার মজ্জাস্থলে ইহা থাকিবেই। এরূপ কর্তৃত্ব আমাদের স্বতন্ত্র শক্তির বিকাশ এবং কার্য্যের সফলতার পক্ষে হানিকর। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইলে আমরা ঠিক্ যে প্রণালীতে, সকল পুস্তকের সাহায্যে, যেরূপ শিক্ষকের দ্বারা যে সকল বিষয় শিক্ষা দিতে চাই, তাহা করিতে পারি না। অতএব আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট নিজ কর্ত্তব্য স্বতন্ত্রভাবে করুন, দেশবাসীরা নিজ কর্ত্তব্য স্বতন্ত্রভাবে করুন। রাজপুরুষগণ সহযোগিতা Co-operation) সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। ইহা প্রকৃত সহযোগিতার দাবী হইলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহারা যাহাকে সহযোগিতা মনে করেন, তাহা আমাদের দুর্ব্বলতার জন্য অধস্তনের বশ্যতা ও বাধ্যতা (subordination) হইয়া দাঁড়ায়।

শ্রীমতী সরলা দেবীর প্রতিষ্ঠিত ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের উদ্যোগে কলিকাতায় অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা ধীরে ধীরে প্রসার-লাভ করিতেছে। ইহার প্রথম বৎসরের (১৯১১ সালের) রিপোর্ট হইতে দেখা যায়—

গত জানুয়ারী মাস হইতে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের উদ্ভাবনা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা লাহোর, করাচী, হায়দরাবাদ (সিন্ধ), এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে খোলা হইয়াছে। আর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা উদ্যোগী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কাজ চালাইতেছেন। এ বৎসর বোম্বাই, মান্দ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষের নগর সকলে মহামণ্ডলের শাখা স্থাপন করিবার সংকল্প হইতেছে।

গত জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ১০।১২টী মিটিং ডাকিয়া বঙ্গ-মহিলাদের নিকট উহার উদ্দেশ্য প্রচার করা হয়। অনেক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকই উহাতে সাগ্রহে যোগদান করিয়া-ছেন। গত এপ্রেল মাস হইতে কলিকাতায় শিক্ষা বিস্তার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে ৬ জন শিক্ষয়িত্রী লইয়া ১৮টী বয়স্থা বালিকাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল। এখন সমিতি ১৬টী শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে ৫৩টী বাড়ীতে ৯৭টী প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিতেছে। কিন্তু এই অন্তঃপুর শিক্ষার কাজে আমাদের প্রথম অন্তরায় অবরোধ প্রথা। শিক্ষয়িত্রীগণ অনভ্যাসবশতঃ একলা ও চলিয়া যাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন। প্রথম মাসে সমিতি ১ খানা গাড়ীতেই কাজ চালাইয়া-ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ অনেক ঘর বৃদ্ধি হওয়াতে প্রতি মাসে ২ খানা গাড়ী ও এখন তিনখানা ভাড়া লওয়া হইতেছে, তথাপি সমিতি সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ চালাইতে পারিতেছে না। কারণ গাড়ী শিক্ষয়িত্রীদিগকে বাড়ী বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইয়া যায়। উহাতে তাঁহাদের অনর্থক সময় নষ্ট হয়, মহামণ্ডলেরও ক্ষতি হইয়া থাকে।

কলিকাতার শাখা সমিতিতে ৩৬৫ তিন শত পঁয়ষটি জন মেম্বর হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় ত্রিশ জন মহিলা বৎসরে ১০৲ টাকা চাঁদা দিয়া পেট্রণ হইয়াছেন। কিন্তু এই কলিকাতা নগরে ৪ লক্ষ লোকের বাস, ইহার মধ্যে ২ লক্ষ পুরুষ বাদ দিলেও প্রায় ২ লক্ষ স্ত্রীলোক অধিবাসিনী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ ৫০,০০০ হাজার এমন শিক্ষিতা কি অল্প শিক্ষিতা স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা সহজেই এই মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন। কিন্তু

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা নিজের গৃহ ও নিজের সংসার ব্যতীত আর কোন কাজের জন্য উৎসাহিত হয় না। সে কারণে কাজের লোকের বড়ই অভাব। আর অর্থাভাবের তো কথাই নাই। নিম্নলিখিত হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে যে এপ্রেল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নয় মাস কাজ করায় স্ত্রী-মহামণ্ডল সমিতির প্রায় ৬৫০৲ টাকা ঋণ হইয়াছে। উল্লিখিত ৫০,০০০ হাজার রমণীর মধ্যে এই বৎসরে যদি ১০০০ মহিলাও সমিতির মেম্বর হইতেন তবে ঋণ না হইয়া সমিতির হাতে বরং কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হইত। এই সকল অভাবের জন্য আমরা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এত বড় একটা প্রয়োজনীয় মহৎ কাজে সমবেত চেষ্টা ও উদ্যম ব্যতীত সফল হওয়া বড়ই কঠিন।

যদিও অর্থাভাব ও কাজ করিবার লোক অভাবে স্ত্রী মহামণ্ডল সমিতির কলিকাতার শাখা তেমন বিস্তৃত হইতে পারে নাই, কিন্তু এই অল্প সময় কাজ করিয়া সমিতি সম্যকরূপে এইটুকু বুঝিতে পারিতেছে যে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা আজকাল অনেকেই অনুভব করিতেছেন। এ দেশে বিবাহের পরে বা ১০।১২ বৎসর বয়স হইলেই যে বালিকাদের লেখা পড়া শিক্ষা শেষ হইয়া যায় তাহার অনিষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হওয়াতে অনেকেই কন্যাবধূদিগকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। সামান্য অক্ষর-পরিচিতা, অল্পবুদ্ধি অমার্জ্জিত-রুচি বালিকারা যে "বটতলার চটি" বহি লইয়া আলস্যে দিন কাটায় ও তাহা লইয়া সমবয়স্কাদের সহিত আলোচনা দ্বারা নিজেকে একজন বিদুষী মনে করিয়া গর্ব্বিতা হইয়া উঠিতেছে ইহা অভিভাবকগণের কষ্টের কারণ হওয়াতে সুশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়া তাঁহারা বিবাহের পরেও বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা বজায় রাখিতে ইচ্ছুক আছেন। কিন্তু মিশনরি খৃষ্টান স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই চুপ করিয়া ছিলেন। এখন ভারত-স্ত্রী-মণ্ডল সমিতি অন্তঃপুর শিক্ষার কার্য্যভার গ্রহণ মাত্রেই সকলে আগ্রহ ভরে তাঁহাদের নিকট শিক্ষয়িত্রী গ্রহণ করিতেছেন। এই জন্য আশা ও উৎসাহের সহিত সমিতি দ্বিতীয় বৎসর কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে।

সমিতির প্রত্যেক মেম্বর যদি এ বৎসর ২।১ জন সভ্য সংগ্রহ করিয়া স্ত্রী-মহামণ্ডলের জন্য বল সঞ্চয় করেন - স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ভদ্র মহোদয়গণ যদি সমিতিকে সজীব রাখিতে যত্নবান হন,—তাহলে সুশিক্ষার ফল সকলেই ঘরে ঘরে অনুভব করিতে পারিবেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল সমিতির উদ্দেশ্য এই যে সমগ্র ভারতরমণী নিজেদের উন্নতির জন্য নিজেরাই একটু চেষ্টা করেন।

আমাদের মহিলারা যে এত বড় একটি কাজে হাত দিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে যেমন গৌরবের বিষয়, আমাদের পক্ষে তেমনি লজ্জার কথা। আমরা যে পুরুষ নই, ইহা তাহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পুরুষ স্ত্রীলোককে কৃপা বা অবজ্ঞাভরে "অবলা" নাম দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বাড়ীর মেয়েদের জ্ঞানদান করিবার মত বল, ততটুকু উদ্যোগ ও শক্তি আমাদের হইল না। সুতরাং, আমরা পুরুষ না হইয়া কাপুরুষ হওয়ায়, "অবলা"-রাই এই মহৎকার্য্যে হাত দিয়াছেন, এবং কতকটা সফল-প্রযত্নও হইয়াছেন। এখন পুরুষদের লজ্জানিবারণের একমাত্র উপায় এই আছে, যে, তাঁহারাও এইরূপ কাজ করুন, এবং ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের এই কার্য্যে আর্থিক সাহায্য করুন।

যেসকল মহিলা এই মহামণ্ডলের সভ্য হইয়াছেন, তন্মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই মহিলা আছেন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সিটি কলেজে একটি সভা করিয়া অন্তঃপুরস্ত্রীশিক্ষার জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহের সূত্রপাত করা হয়। এইরূপ স্থির হয় যে যাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিতে স্বীকৃত হইবেন, তাঁহাদিগকে এক একখানি সংগ্রহপত্র দেওয়া হইবে। তাহাতে ১৬ জনের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নাম ও দানের পরিমাণ লিখিতে হইবে। এইরূপে ১৬টি ঘর পূর্ণ হইলে ঐ সংগ্রহপত্র ও অর্থ প্রবাসী-সম্পাদককে দিতে হইবে। তিনি সমুদয় সংগৃহীত অর্থ মহামণ্ডলের কলিকাতা শাখার সম্পাদিকা শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়াকে দিবেন। তদনুসারে ৯ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহা নীচে লিখিত হইল :—

সিটি কলেজের সভায় প্রাপ্ত –/০ ; শ্রীপূর্ণচন্দ্রসাহা—৫৷৷০ ; অরুণচন্দ্র সেন—১৲ ; মুক্তিদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—১০১৫ ; যদুলাল সেন গুপ্ত—২৲ ; অনাথকৃষ্ণ শীল—১৲ ; মন্মথনাথ রায়—৯৲ ; রমেশচন্দ্র ঘোষ—১৲ ; হেমচন্দ্র মজুমদার—৸০ ; লোকেন্দ্রকুমার গুপ্ত—৩৷৷০ ; জীবনপ্রদীপ মুখোপাধ্যায়—২৷৷/০ ; সুধাময় চট্টোপাধ্যায়—১৷৷৵১৫ ; বীরেন্দ্রনাথ দেব—৪৷৴০ ; চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১৲ ; প্রেমাঙ্কুর দে—৩৸৶০ ; সুরেন্দ্রনাথ দে—১৷০ ; প্রভাকর কুমার—২৲ ; অজিতকুমার দত্ত—৷৷/১০ ; অমরনাথ ভট্টাচার্য্য—২৷৷/০ ; অমলচন্দ্র বসু—৬৷০ ; প্রমোদেন্দু ঘোষ—৬৸০ ; ৫১ সংখ্যক পত্র—৷/১০ ; জ্ঞানাঙ্কুর দে—২৷১০ ; সোমেন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মা—৩/০ ; সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—৸/০ ; জীবনরতন ধর—১৲ ; নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—১৷৷০ ; ৬৭ সংখ্যক পত্র—১৴০ ; ৬৯ সংখ্যক পত্র—১৲ ; ৭০ সংখ্যক পত্র—৷৶০।

আশা করি যাঁহারা এক একখানি সংগ্রহপত্র পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার আর একখানি করিয়া সংগ্রহপত্র প্রবাসী-কার্য্যালয় হইতে লইবেন ; এবং যাঁহারা এখনও তাঁহাদের গৃহীত সংগ্রহপত্র পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও সে বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন। দানের কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই, উহা এক পয়সাও হইতে পারে, ১৲ টাকাও হইতে পারে, হাজার টাকাও হইতে পারে। যদি কেহ ১ মাসে কিছু অর্থ দেন, পরমাসে তাহা অপেক্ষা কম বা বেশী দিতে পারেন, কিম্বা না দিতেও পারেন ; কোন বিষয়েই বাধ্যবাধকতা নাই।

আজকাল বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ছোট বড় অনেক সহরে নানা কাজ সম্পন্ন হইতেছে। সহরের রাস্তা ও ঘরবাড়ী আলোকিত হইতেছে, সহরের ট্রাম চলিতেছে, সহরের ছাপাখানায় ছাপার কাজ হইতেছে, সহরের ময়দার কলে গম পেষা হইতেছে, ইত্যাদি। কিন্তু এই যে বৈদ্যুতিক শক্তি তারের দ্বারা চালিত হইয়া কয়েক মাইল ব্যাপী এক একটি সহরে কাজ করিতেছে, তাহার জন্মস্থান এক একটি কেন্দ্রে, এক একটি পাউয়ার ষ্টেশনে। সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাড়িতশক্তি জন্মান হইতেছে। মানুষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনেও শক্তির কার্য্য আমরা দেখিতে পাই। এই শক্তিরও কেন্দ্র ও উৎপত্তি-স্থান আছে, রূপকভাবে বলা যাইতে পারে। আমাদের বাংলা দেশের এই কেন্দ্র কোথায়? বঙ্গে সাহিত্যের কেন্দ্র কলিকাতা, শিক্ষার কেন্দ্র কলিকাতা, রাষ্ট্রীয় চিন্তার কেন্দ্র কলিকাতা, এমন কি আধ্যাত্মিক প্রভাবের কেন্দ্রও কলিকাতা। একই দেশে একাধিক এরূপ কেন্দ্র থাকায় দোষ নাই ; কিন্তু কেন্দ্রগুলির প্রভাব যদি পরস্পর বিরোধী হয়, কিম্বা কোনটিই যথেষ্ট শক্তিশালী না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনাই অধিক।

আমরা এরূপ মনে করি না যে কলিকাতা কোন সময়ে যথেষ্ট শক্তিশালী কেন্দ্র হইয়াছিল, বা এখন যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়াছে। সুতরাং উহাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করা আমাদের কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশে অপর কেন্দ্রের প্রভাবের বিরোধী না হইলেও, এই কারণে, উহার উদ্ভব আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। আর যদি ঐ অপর কেন্দ্রের প্রভাব কলিকাতার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে ত আমাদের পক্ষে উহা কখনই কল্যাণের কারণ হইতে পারে না।

অপর নানা কারণের মধ্যে এই এক কারণে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বাঙ্গালীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ হইয়াছিল। উহা রহিত হইবে বলিয়া সে আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু ঢাকায় আবার নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ও নূতন শিক্ষা-পরিচালকের প্রস্তাব হওয়ায়, আশঙ্কার পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। কলিকাতা শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হইত, যদি ঢাকার প্রভাব ঐ ঐ বিষয়ে কলিকাতার বিরুদ্ধে যাইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কিছুই বলিতাম না। কিন্তু আমরা ভয়ের যথেষ্ট কারণ দেখিতেছি।

আমাদের এইরূপ মনে হইতেছে যে ঢাকায় বিশ্ব-বিদ্যালয় হইবে, ঢাকায় স্বতন্ত্র শিক্ষাপরিচালক নিযুক্ত হইবেন, বেহারে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইবে, বেহারের জন্য স্বতন্ত্র হাইকোর্ট হইবে। সুতরাং নানাদিক দিয়া কলিকাতার খর্ব্ব হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন বিষয়ে কলিকাতা বহু বৎসর হইতে শুধু বঙ্গের নয়, সমগ্র ভারত-বর্ষের নেতা ছিল, এখনও আছে। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোকদের স্বাতন্ত্র্য যদি তাহাতে নষ্ট হইতেছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন, তাহা হইলে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু বঙ্গের নেতৃত্ব হইতে কলিকাতাকে চ্যুত করা কাহারও পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইতে পারে না, ঢাকার পক্ষেও না ; বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতেছি যে পূর্ব্ববঙ্গের বহু সন্তান কলিকাতায় নেতৃত্ব করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শিক্ষা, সাহিত্য, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে কলিকাতার প্রাধান্য রাখিতে হইবে। ইহা বঙ্গের মানসিক রন্ধনশালা ; এখানে মানসিক খাদ্যের অনটন হইতে দেওয়া চলিবে না। সুতরাং এই সহরের ইস্কুল, কলেজ, সভা-সমিতি, ধর্ম্মমন্দির, লাইব্রেরি, পরিষদ, ম্যুজিয়ম, প্রভৃতি গুলির পরিপোষণ ও শক্তিবর্দ্ধন আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। সরকারী ইস্কুল কলেজ লাইব্রেরি, ম্যুজিয়ম প্রভৃতির উপর

আমাদের হাত নাই। সুতরাং সেগুলি সম্বন্ধে আমরা কিছু লিব না। কিন্তু সেগুলিতে আমাদের শিক্ষালাভের ও মানুষ হইবার যে সকল উপায় ও উপকরণ আছে, তাহার সাহায্যে আমাদের উন্নতিলাভ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সরকারী ইস্কুল কলেজে ছাত্রের অভাব হয় না। কিন্তু সরকারী প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাগারগুলিতে ছাত্রগণের যতদূর উৎসাহ ও একাগ্রতার সহিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, পূর্ব্বে কেহ তাহা করিত না; এখন কিছুদিন হইতে কিয়ৎপরিমাণে আগ্রহ দেখা যাইতেছে, কিন্তু এখনও উহা যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয় না। ম্যুজিয়মের সাহায্যে ভূতত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব পুরাজীবতত্ত্ব, প্রভৃতি নানা বিদ্যা অধীত হইতে পারে; তদ্বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। আলিপুরের প্রাণিশালার সাহায্যে কয়জন প্রাণিবিদ্যার চর্চ্চা করে? শিবপুরের কোম্পানীর বাগানের সাহায্যেই বা কয়জন উদ্ভিদ্‌বিদ্যার চর্চ্চা করে? ইম্পারিয়্যাল লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, প্রভৃতির সাহায্যে নানা বিদ্যার চর্চ্চা করিবার লোকের যথেষ্ট অভাব আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সরকারী জিনিষগুলিরও যথেষ্ট ব্যবহার আমরা করিতেছি না।

বেসরকারী ইস্কুল কলেজগুলির উন্নতি আমরা চেষ্টা না করিলে হইতে পারে না। কখনও কোন দেশে কেবল ছাত্রদত্ত বেতন দ্বারা কোন শিক্ষালয় আদর্শস্থানীয় হয় নাই, হইতে পারে না। অতএব ধনী, নির্ধন সকলেরই আমাদের বেসরকারী শিক্ষালয়গুলির সাধ্যানুসারে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বদ্ধ কোন স্কুল কলেজ ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়, প্রত্যেক শিক্ষালয়ের আয় সম্পূর্ণরূপে তাহারই জন্য খরচ করা হয়। সুতরাং এখন দান চাহিতেও যেমন কলেজের কর্তৃপক্ষের কোন সঙ্কোচ বোধ হইবে না, দান করিতেও তেমনি কাহারও দ্বিধা বোধ করা উচিত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পৃক্ত বেসরকারী শিক্ষালয়গুলির মত জাতীয় বিদ্যালয়ও আমাদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের উপযুক্ত। এরূপ আশা আছে যে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদেশে উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত ইহার অনেক ছাত্র অধ্যাপকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। ছাত্র দিয়া ও অর্থ দিয়া, এবং সুপরামর্শ দিয়া ইহার সাহায্য করা শিক্ষিত লোকদের কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আমাদের একটি নিজস্ব জিনিষ। ইহার প্রভূত উন্নতি হইতে পারে, এবং ইহার দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইতে পারে। বাঙ্গালী যেমন একধর্ম্মাবলম্বী বা একশ্রেণীভুক্ত নহে, বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্যও তেমনি কোন এক ধর্ম্মাবলম্বীর বা কোনও সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়। সাহিত্য-পরিষদও তদ্রূপ অসম্প্রদায়িক জিনিষ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও, সভার অধিবেশনের দিন ও সময় সম্বন্ধেও, ইহার সকল কাজ এরূপ ভাবে চালান উচিত, যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকে ইহাতে অবাধে যোগ দিতে পারেন। তাহা হইলে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অনিবার্য্য হইবে।

একটি একটি করিয়া সমুদয় বিষয়ের উল্লেখ করিবার সময় ও স্থান নাই। সুতরাং আর ২।১টি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করি। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে, কলিকাতার দেশীয়-পরিচালিত একটি দৈনিকও বেশ ভাল নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য কোন কোন সহরের দেশীয় পরিচালিত কোন কোন দৈনিক অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল। বাঙ্গালীর মধ্যে সুলেখক, বুদ্ধিমান্, রাষ্ট্রীয় নানা তত্ত্ববিদ্ লোকের অভাব নাই। তবে আমাদের দৈনিকগুলির এ দুর্দ্দশা কেন? অতিরিক্ত আত্মাদরের জন্য, কৃপণতার জন্য, না উদ্যোগের অভাবে?

রাজনৈতিক সভার মধ্যে বৃটিশ ইণ্ডিয়ানের অস্তিত্ব এখন থাকিয়াও নাই। ভারতসভাও অর্দ্ধমৃত। রাজনৈতিক বিষয়ে দেশের লোকের শিক্ষার জন্য ভারতসভা কিছুই করেন না, মাঝে মাঝে ২।১টা আবেদন মাত্র করেন। ইহার একটি সুন্দর লাইব্রেরি থাকা উচিত। তাহাতে প্রধান প্রধান সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ফাইল, নানাতথ্যপূর্ণ বার্ষিক গ্রন্থ সমূহ (Annuals), রাজনৈতিক পুরাতন ও নূতন সমুদয় পুস্তিকা (Tracts and Pamphlets), সরকারী সমুদয় গেজেটের ফাইল এবং বার্ষিক রিপোর্ট সমূহ, পার্লেমেণ্টের ব্লু বুক সকল প্রভৃতি রাখা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এখানে কংগ্রেসের সমুদয় রিপোর্ট, এমন কি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধীয় সমুদয়

আবেদন ও কাগজপত্রও, নাই। বোম্বাইয়ের প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশনের লাইব্রেরি এ বিষয়ে আমাদের আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত।

কলিকাতায় একটি সমাজ-সংস্কার সমিতি আছে বলিয়া বৎসরের মধ্যে একদিন শুনা যায়। অথচ কলিকাতা বা বঙ্গদেশ সামাজিক বিষয়ে ভূস্বর্গ, ইহা কেহ বলিতে পারিবেন না। কাজ করিবার লোকের অভাবে, অর্থের অভাবে, ব্রাহ্মসমাজের কাজ অতি ক্ষীণভাবে চলিতেছে; অথচ ব্রাহ্মেরা সকলেই বা অধিকাংশই ভিক্ষুক, বা ব্রাহ্ম-সমাজে বিদ্যা-বুদ্ধি-চরিত্র-আধ্যাত্মিকতাদি হিসাবে যোগ্য লোক বিরল, তাহা বলিবার যো নাই। অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা বলিব না, কারণ তাহাদের আভ্যন্তরীণ সংবাদ জানি না।

সকলেরই সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে।

বাহিরের কি পরিবর্ত্তন হইল, বাহিরের কি ভাঙাগড়া হইল, বাহিরের কি সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলাম, তজ্জন্য পরিতাপ করা নির্ব্বুদ্ধিতা। বাহিরের সুযোগ সাহায্য, পরকীয় সুযোগ সাহায্য, যাহা পাওয়া যায়, তাহা লওয়া অকর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকা, বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে আপনাকে গত্যন্তরবিহীন মনে করা মানুষের ধর্ম্ম নহে। বাঙ্গলার মাটী, জল ও বাতাসে, বাঙ্গলার প্রাকৃতিক সংস্থানে, নদী পর্ব্বতে, সমুদ্রে, বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে ও চরিত্রে, যাহা আছে, তাহারই সাহায্যে আমরা সর্ব্ববিধ শক্তি, মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্য আয়ত্তাধীন করিতে পারি। যদি তুমি ইহা বিশ্বাস না কর, শ্রেয় তোমার জন্য নয়; যদি তুমি ইহা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে জানিও সকল শ্রেয়ের উৎস তোমারই মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

গত মাসে চুঁচুড়ায় পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। অক্ষয় বাবু প্রধান ও প্রাচীন স্থানীয় সাহিত্যসেবক। তাঁহার নির্ব্বাচন ঠিকই হইয়াছিল। মহারাজা সাহিত্যিক না হইলেও, সাহিত্যের ও সাহিত্যিকদের বন্ধু এবং উৎসাহদাতা। সুতরাং তাঁহার নির্ব্বাচনও অনুমোদনের অযোগ্য নহে।

এবার কি কারণে জানি না, সম্মিলনে লোক কম হইয়াছিল; ময়মনসিংহের তুলনায় বড়ই কম হইয়াছিল।

অক্ষয় বাবু তাঁহার অভিভাষণে হুগলী জেলার পুরাতত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত করেন। চুঁচুড়া পূর্ব্বে যে কিরূপ স্বাস্থ্যকর ও উৎসব-আনন্দময় স্থান ছিল তাহা বর্ণন করেন।

"এই চুঁচুড়া একদিন আমোদ আহ্লাদের প্রস্রবণ ছিল; ফোয়ারা উঠিত, তুবড়িতে শতদল পদ্ম ফুল ঝরিয়া পড়িত। আমাদের দেখা ব্যাপার বলিব, শুনা কথা তুলিব না। ভগবচ্চন্দ্র বিশারদের যে ব্যাকরণ আমরা পড়িয়াছিলাম, যাহা এখন প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রী হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে বিরাজ করিতেছে, তাহাতে ক্ষুদ্র বাক্যরচনার দৃষ্টান্ত স্থলে লেখা ছিল,—

'হুগলি চুঁচুড়া বর্দ্ধমান,
সুখে বাস করিবার স্থান।'

বাস্তবিক তখন তাহাই ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কোমল-প্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জজ দ্বারকানাথ মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রভৃতি মহাত্মগণ বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে এই স্থানে আসিতেন ও থাকিতেন। ডভটন ও লামার্টিনিয়ারের ইংরাজ ছাত্রগণ অধ্যাপকগণ সহ দীর্ঘ অবকাশ-কাল এই খানে যাপন করিতেন। চুঁচুড়া অতি স্বাস্থ্যকর সুন্দর স্থান বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিতেন এবং বিশ্বাসমত কার্য্য করিতেন।"

"পূজা-পার্ব্বণে চুঁচুড়ার উৎসব নগরে ধরিত না, সুরধুনী-তীরে লোকে লোকারণ্য হইত।" "আমাদের যখন পূর্ণযৌবন, চুঁচুড়া তখন সাহিত্যের আনন্দ-কানন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁহার সুরধুনীতীরস্থ বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের সুতিকা-গৃহে অধিষ্ঠিত। নিকটেই প্রগাঢ় পণ্ডিত পূজনীয় ভূদেব নামের সার্থককারী ভূদেব বাবু প্রতিষ্ঠিত।" নিকটে কাব্যসমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য, স্বনামখ্যাত রামগতি ন্যায়রত্ন, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, নাটককার নিমাইশীল, থাকিতেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে আসিতেন। এখন ম্যালেরিয়ায় হুগলীজেলা ও চুঁচুড়া উভয়েরই দুর্গতি হইয়াছে, লোকসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে।

"লোকবলই বল; লোক কমাতে দেশ জঙ্গলময় হইয়াছে। গ্রামের পুষ্করিণী আদির বহুদিন সংস্কার না হওয়ায় সেইগুলি 'জলহরি' হইয়াছে। আমরা এই সভাতলে প্রসাদ-বিষাদের লীলা খেলা দেখিতেছি আর আমাদের তিন চারি ক্রোশের মধ্যে দুঃস্থ পল্লীবাসীরা এক কলসী পানীয় জলের জন্য তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতেছে। আমি কল্পনাবলে

এইসকল বলিতেছি না, বোধ করি সভায় কেহ না কেহ উপস্থিত আছেন, যিনি আমার কথা সমর্থন করিবেন। আমি আজ ছত্রিশ বৎসর এই কাঁদুনি গাহিতেছি, কিন্তু দেশের কষ্ট দেশের লোকে আজিও বুঝিতে পারিলেন না, তা বিদেশী রাজা বুঝিবেন কি করিয়া; আমরা চাই রাজনৈতিক অধিকার, চাই সাহিত্যের বিস্তার, আমরা চাই শিক্ষা-প্রচার, কিন্তু স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় আমাদের সকল শ্রমই যে পণ্ড হইতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।"

"করজোড়ে মিনতি করিতেছি, আপনারা একবার বঙ্গের দুর্দ্দশার দিকে লক্ষ্য করুন, বুঝিয়া দেখুন—পাঁচদিকে পাঁচ মন করিয়া, আসল-দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রায় সমগ্র বঙ্গ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে 'উৎসন্ন' যাইতে বসিয়াছে। এই যে বাঙ্গালার মরণজীবনের কথাটা যে কেবল ধানভানিতে শিবের গীত, অর্থাৎ সাহিত্য সম্মিলনে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক কথা, তাহা নহে। মনে প্রফুল্লতা হৃদয়ে আনন্দ না থাকিলে, সাহিত্য জন্মে না, বাড়ে না, থাকিতে পারে না। দেহ সুস্থ না হইলে মনে প্রফুল্লতা হৃদয়ে আনন্দ থাকে না। সুতরাং দেহ সুস্থ না হইলে সাহিত্য হয় না, দাঁড়ায় না, থাকে না। অতএব আমি যে সাহিত্যসেবিগণকে স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দান করিতে বলিতেছি, সে কথা অপ্রাসঙ্গিক কি করিয়া?"

অতঃপর অক্ষয় বাবু বুঝাইয়া বলেন যে "সাহিত্য বা রস-রচনা শিখিতে হয়।" ইহা স্বভাবলব্ধ নহে।

"যাঁহারা ইংরাজিসাহিত্যে কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ছয়মাস কাল একটু মন দিয়া ছয়সাত খানি পুরাতন গ্রন্থ ও ছয়সাত খানি আধুনিক গ্রন্থ পাঠ করিলে এবং সাধারণ লোকের কথাবার্ত্তায় মন দিলে উত্তম বাঙ্গালা শিখিতে পারিবেন। না হয়, কয়েকখানির নাম করিয়া দিতেছি,—কৃত্তিবাস, চৈতন্যভাগবত, কবিকঙ্কণ, কাশীরাম, শিবায়ন, ধর্ম্ম-মঙ্গল, ভারতচন্দ্র আর মদনমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, মনোমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র। কেবল গ্রন্থপাঠে বা ব্যাকরণ-শিক্ষায় চলিত ভাষা শিক্ষা করা যায় না। সেইজন্য বলিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করিতে হইবে।"

অতঃপর তিনি লোকশিক্ষার জন্য সহজ ভাষায় লিখিবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। "স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের 'সুলভ' সহজ ভাষার সুন্দর দৃষ্টান্ত। লোক-শিক্ষার উপযোগী ভাষা তখনই দেখিয়াছিলাম,· · · ।"

"বাস্তবিক আমাদের দ্বারা লোকশিক্ষার কোন সরঞ্জাম, আয়োজন এ পর্য্যন্ত হয় নাই। রামেন্দ্রসুন্দর এক সময়ে আমার সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন, কিন্তু 'বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে,' তিনি জ্ঞানবলে গরীয়ান্, সুতরাং আমার গুরু। এই সম্মিলনের জন্য তিনি অনেকবার আমাকে লোকশিক্ষামন্ত্রে দীক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্র ফুঁকিলেন। আমি শুষ্ক সাহিত্যসেবী হইয়াও লোকমধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার একান্ত কামনা করি। সাহিত্য অপচিত হইয়া বিজ্ঞান উপচিত হউক, এমন কামনা করি না। সাধারণজনগণমধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তৃতিলাভ করুক, এটি আমার একান্ত ইচ্ছা। রামেন্দ্রসুন্দরের মন্ত্রদানের পূর্ব্বে হইতেই এই ইচ্ছা আমি আমাদের সভ্যমণ্ডলী-মধ্যে আগ্রহে প্রচার করিয়াছি।"

"সাহিত্য-পরিষৎ সৎসাহিত্যের প্রচারে ব্রতী হইয়াও ব্রত পালনে শিথিলযত্ন হওয়াতে আমি ম্রিয়মাণ। আজি দশ বৎসর হইল যখন সাহিত্য-পরিষৎ সৎসাহিত্য-প্রচারের ঘোষণা দিলেন, তখন আমি রোগে শোকে মুহ্যমান্; তবু তখন আমি যখনই মোহ কাটাইয়া চারিদিকে কর্ণপাত করিতাম, তখনই পরিষদের ঘোষণার স্বরলহরীতে মহা আনন্দিত হইতাম। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের আঠার বৎসর বয়সেও যখন আমরা কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস প্রভৃতি কোন শিক্ষাদাতার কাব্য পাইলাম না, তখন সেই হর্ষে এখন আমার নিয়তই বিষাদ আসিতেছে।"

"সকল কথাই ত শুনিলেন, এখন উপায়? উপায় কি তাহারও যথাসাধ্য আভাস দিতেছি। উপায়—এই বার্ষিকী সাহিত্য-সম্মিলনী ও ইহার জননী চিরস্থায়িনী সাহিত্য-পরিষৎকে অপেক্ষাকৃত সংযতা এবং অধিকতর কার্য্যকরী করিতে হইবে। পিতামাতার বার্ষিকী ক্রিয়ার মত কিঞ্চিৎ মন্ত্র বা প্রবন্ধ পাঠ করিলে সাহিত্যের শ্রাদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সাহিত্যের সেবা হয় না। গুরু পুরোহিতের উপর ভার দিয়া নিত্য নৈমিত্তিক দেবকার্য্যে যেরূপ পারত্রিক ফল পাইতেছি, পুরোহিত ত্রিবেদী এবং উপপুরোহিত মুস্তফার উপর সাহিত্য-পরিষদের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া আমরা ঐহিক ফলও সেইরূপ পাইব। এইরূপ করিয়া, একটি বৃহৎ ভবন দেখাইয়া, আর কতকগুলি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক ভাঙ্গা-ফুটা পাথরের সামগ্রী বা কীটদষ্ট পুরাতন পুস্তক দেখাইয়া আর কতদিন চলিবে? সাহিত্য-পরিষদের প্রকৃত সাহিত্যসেবার উপাদান-সংগ্রহে অবহেলার অভিযোগ চারিদিকে ঘোষিত হইতেছে। কলঙ্ক আমাদের —সাহিত্যসেবীদিগের। আমরা, বিশেষ আমার মত অনেকে, কার্য্যে উদাসীন থাকিয়া ভোগের সময় সমাসীন হইতে চাই। তাহা কি কখন হয়? সকলে মিলিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

"আজি যেমন আপনাদের শারীর ও মানসিক সম্মিলন হইয়াছে, এরূপ প্রতিনিয়ত হওয়া সম্ভবপর নহে। শারীর সম্মিলন সর্ব্বদা সম্ভব নহে, কিন্তু মানসিক সম্মিলন আমাদিগকে এখন হইতেই করিতে হইবে। এই দুই দিনের মধ্যে একটা সময় স্থির করুন, সেই সময়ে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করুন—কিসে আমরা সাহিত্যপরিষৎকে অধিকতর কার্য্যকরী করিতে পারি। ইহাই হউক আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রস্তাব।

"প্রস্তাব করিয়া, প্রশ্ন করিয়া, উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া এই বিষয়ে একটি স্থূল মীমাংসা করুন। সকলে এক মনে এক ধ্যানে সেই মীমাংসা গাঁথিয়া লউন। সেই গাঁথনিই হউক আমাদের মানস-মিলনের বন্ধনী। যাঁহার যতটুকু সাধ্য, কাঠবিড়ালের বিপুল সেতুবন্ধনে সাহায্যের ন্যায়, তিনি সেইটুকু সাহায্য করুন। মনে মনে স্থির করুন যে, যিনি যখন কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন, কোন কার্য্য থাকুক বা না থাকুক, তিনি একবার সাহিত্য-পরিষদে প্রবেশ করিবেনই করিবেন। সাহিত্য-পরিষৎ প্রভাত হইতে খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হউক, রাত্রিকর কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে একজনকে প্রভাতচর, একজনকে মধ্যন্দিনচর করুন। সাহিত্যপরিষৎ এখন কলিকাতার চাকরীজীবী লইয়া চলিতেছে। তাহাতে যাহা কার্য্য হইয়াছে, তাহা বিপুল। কিন্তু আরও অধিকতর কার্য্য না হইলে মান থাকিবে না, মুখ থাকিবে না। থাকুক মান, থাকুক মুখ প্রকৃত কার্য্য করিতে হইবে। পল্লীবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইবে; সাহিত্যপরিষৎকে সহরে জিনিষ করিয়া রাখিলে চলিবে না। অতবড় দিগ্‌গজ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সহরে হইয়াছিল বলিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ফল হইয়াছে কোন রাজনৈতিক সভারই আর পূর্ব্বতন বৃটিশ ইণ্ডিয়ানের মত গৌরব নাই। বৃটিশ ইণ্ডিয়ানেরও বড় বাড়ী, গাড়ীজুড়ি, লাইব্রেরী, চিত্র সজ্জিত সুপ্রশস্ত দেওয়াল, তাহাদের পিছনেও বড়লোক আছেন, কিন্তু তবু ত অধঃপতন হইল। তাহা দেখিয়া আমাদের শিখিতে হইবে—পল্লীবাসী সাহিত্য-সেবীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা। আমার কথা আমার মত করিয়া সকলে ভাবিবেন এমন কোন কথা নাই, তবে এইসকল কথার

আলোচনা ও মীমাংসা এই পঞ্চম অধিবেশনেই হওয়া চাই। কেবল প্রবন্ধপাঠে, সঙ্গীতনাটে ও বৈজ্ঞানিক বিতর্কে দিবসত্রয় নষ্ট করিলে আমাদের অসারতা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

"উপসংহারে আমি আপনাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বঙ্গের স্বাস্থ্য ভঙ্গের দিকে এবং সুকুমার সাহিত্যচর্চ্চার দিকে ও বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার শ্রীসাধন জন্য উদ্যুক্ত হইতে করজোড়ে কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করিতেছি।

"বাণীর বিহারক্ষেত্রে আমাদের জাতিভেদ, জাতিভেদ কিছুই নাই। মা আমার যেমন বাল্মীকি বেদব্যাসকে আপনার পাদপীঠের নিকটে রাখিয়াছেন, হোমর-বর্জ্জিলকেও সেইরূপ স্থান দিয়াছেন; কালিদাস সেক্সপিয়র মায়ের সেবায় সমানে কৃতার্থ হইতেন। মায়ের একদিকে যেমন বৈষ্ণব-কবিগণ, অন্যদিকে সেইরূপ হাফিজ ও সাদী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মা আমার অনন্তরূপিণী; কখন সালঙ্কারা, কখন নিরাভরণা। মা আথেন্সে অথেনী, ভারতে ভারতী, বঙ্গে বঙ্গময়ী। মায়ের যেমন জাতিবিচার নাই, আমরাও সেইরূপ আজি যেমন মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্য বিলাপ করিতেছি মীর মোসারেফ হোসেনের জন্য সেইরূপ গভীর দুঃখে আত্মহারা হইয়াছি। মীর মোসারেফ হোসেনকে আমি কখন দেখি নাই; তাঁহার "বিষাদ সিন্ধু" আমাকে বিচলিত করিয়াছিল। বড় আশা করিয়াছিলাম এই সম্মিলনে তাঁহাকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিব। শেষ সময়ে শুনিলাম, তিনি এখন বিহেস্তবিহারী। যাঁহারা কখন মুর্শিদাবাদের মহরমের সময় মর্শিয়াগীতি শুনিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন মহরমের আখ্যান-কাব্য 'বিষাদসিন্ধু" কিরূপ প্লাবনী করুণারসে টল টল করিতেছে। আর সেই সিন্ধুর ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু লিখিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে।"

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের অভিভাষণেও হুগলীজেলার প্রত্নতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছিল। তিনি ইহার এবং বঙ্গের অন্যান্য অংশের প্রাচীন সাহিত্যিকদের কথাও বলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যের যে যে বিভাগ এখনও পরিপুষ্টিলাভ করে নাই, তাহার উল্লেখ করেন।

"বঙ্গের সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণের সম্মুখে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা সাহিত্য-সম্মিলনের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হউন। আজকাল বঙ্গীয় সম্পাদক সমাজে সাম্প্রদায়িকতার একটা প্রচ্ছন্ন বিভীষিকা দেখা যাইতেছে।"

"সাহিত্যই মানবের একমাত্র বিভব। যে জাতির এই বিভব নাই সে জাতি মনুষ্য নামের উপযোগী নয়। এই বিভব যে জাতির যত অধিক, সে জাতি তত উন্নত ও সভ্য। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের যত উন্নতি হয়, তাহার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব। সাহিত্য জাতীয় জীবনের দর্পণস্বরূপ। কোন লেখকের লেখনী কিরূপ স্রোত অবলম্বন করিয়া কোন পথে ধাবিত হইয়াছিল, তাহার চিত্র সাহিত্যে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যের প্রকৃতি-গঠনে দেশের অবস্থা প্রভৃত পরিমাণে কার্য্য করিয়া থাকে। স্বাধীন দেশে সাহিত্য উড্ডীন বিহঙ্গের মত মুক্তপক্ষে বিচরণ করে; তাহার প্রতি পক্ষবিক্ষেপে দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ প্রতিভাত হয়। তাহার গতি সর্ব্বদাই অপ্রতিহত। কিন্তু পরাধীন দেশের পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখা যায়। পরাধীন দেশে সাহিত্যের গতি চিরদিনই সবাধ; তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন শৃঙ্খলিত; সুতরাং তাহাতে জাতীয়জীবনের প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত হয় না। এরূপ স্থলে রাজশাসনের ব্যবস্থানুসারেই অনেক সময় সাহিত্যের প্রকৃতি গঠিত হইয়া থাকে। কল্পনার অবাধ লীলা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় ভাল নাটক বা উপন্যাস প্রস্তুত হইতে পারে না। প্রায়ই অনুবাদের সঙ্কীর্ণ সীমায় নিবদ্ধ থাকিতে হয়; অথবা কল্পনার লীলা দেখাইতে যাইয়া লেখকের প্রতিভা শিশিরসিক্ত শতদলসদৃশ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মপ্রধান দেশে অধিকাংশ লেখক ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধে পুস্তক পূর্ণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে পরাধীন দেশে জীবনসংগ্রামের প্রখরতায় অনেক সময় সৎসাহিত্যের আবির্ভাব হইতে পারে না। লেখক প্রতিভাশালী হইলেও প্রায়ই নিজে একটা স্বাধীন পথ অবলম্বন করিতে না পারিয়া অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত অনেক স্থলে দেশের রুচি অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।"

বঙ্গদুহিতা শ্রীমতী সত্যবালা দেবী আমেরিকায় গিয়া কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে দক্ষতা দেখাইয়া যশলাভ করিয়াছেন। মহীসুরের ইণ্ডিয়ান্ ম্যুজিক্যাল জর্নেলে তাঁহার বংশাদির পরিচয় বাহির হইয়াছে, তিনি কামাখ্যানাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক জমিদারের পৌত্রী। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বেলুড়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি এই কন্যাকে সুশিক্ষিত করেন। কন্যার ৮ বৎসর বয়সের সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি

শ্রীমতী সত্যবালা দেবী।

সমুদয় হিন্দুতীর্থে ভ্রমণ করেন। কন্যা ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেথুন স্কুলে পড়েন। সংগীত ও ধর্ম্মতত্ত্বে তিনি সুশিক্ষা লাভ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় শাস্ত্রীদের নিকট সংস্কৃতে লিখিত প্রাচীন সংগীত রত্নাকর ও সংগীত-পারিজাত পাঠ করেন, এবং কাশীর পণ্ডিত দুর্গাশঙ্কর শাস্ত্রীর নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করেন ও বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিতে

শিখেন। তিনি বীণাবাদনে সুদক্ষা। বীণাবাদন বড়ই কঠিন। বার বৎসরের কম সময়ে ইহা আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, হিন্দী, ফারসী, তামিল ও ইংরাজী জানেন।

সম্প্রতি বঙ্গের অনেকগুলি সাহিত্যিকের দেহান্ত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একজন সুপরিজ্ঞাত নাটককার ও অভিনেতা ছিলেন। আমরা তাঁহার কোন নাটক পড়ি নাই, বাঙ্গালা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোন থিয়েটারেও কখন যাই নাই। এইজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।

মনোমোহন বসু মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ নাটককার ছিলেন। আমরা বাল্যকালে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে বাঁকুড়া সহরে প্রাপ্তবয়স্ক ভদ্রলোক ও যুবকদের দ্বারা তাঁহার সতীনাটক, প্রণয়পরীক্ষা নাটক এবং নলদময়ন্তী নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম। তখন বেশ ভাল লাগিয়াছিল। বসু মহাশয়ের দুইভাগ পদ্যমালা সুন্দর শিশুপাঠ্য কবিতা-পুস্তক। ইহার অনেক কবিতা শিশুদের ও শিশুজননীদের কণ্ঠে বিহার করে।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মানবতত্ত্ব নামক গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য বহিও আছে। তিনি কয়েকখানি সাময়িক পত্র স্থাপন ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বোধ হয় একখানিও এখন বর্ত্তমান নাই।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একজন প্রধান প্রচারক ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত, কেশব চন্দ্র সেনের জীবনচরিত, ধর্ম্মতত্ত্ব নামক পাক্ষিক পত্র সম্পাদন প্রভৃতি দ্বারা পরিচিত। সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার গীতার সমন্বয়ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর আদরের যোগ্য।

বারেন্দ্র সাহাদিগকে ১৯০১ সালের সেন্সসে শুঁড়ি বলিয়া গণ্য করায় তাঁহারা ক্ষুব্ধ হয়েন। তাঁহারা বহুসংখ্যক খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের মত সংগ্রহ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে, তাঁহারা বৈশ্য, শুঁড়ি নহেন। মদ প্রস্তুত ও বিক্রী করা অতি নীচকাজ ও পাপকাজ (ঔষধার্থ ব্যতীত)। তাঁহারা সদাচারী, এরূপ কাজ করেন না, এবং শুঁড়িদের সঙ্গে সংস্রবও রাখেন না। অতএব তাঁহাদিগকে বৈশ্য বলিয়া গণ্য করিয়া ভদ্রশ্রেণীর লোক মনে করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

গতমাসে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী সভ্যদের সমুদয় প্রস্তাবই নামঞ্জুর হয়। এইরূপ হইবারই কথা। যাহারা বহুপরিশ্রম করিয়া, এইরূপ ফল হইবে পূর্ব্ব হইতে জানিয়াও এইসকল প্রস্তাবের সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু "গবর্ণমেণ্ট নামঞ্জুর করিয়াছেন, অতএব আমরা আর কি করিব?" এইরূপ ভাবিয়া ঔদাস্য অবলম্বন করিলে আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না। অবশ্য বেসরকারী সভ্যগণ কোন কোন প্রস্তাব পুনঃপুনঃ উপস্থিত করিবেন। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়, আমাদের স্বতন্ত্র কর্ত্তব্যও কিছু আছে। কোন কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা কিছুই করিতে পারি না। যেমন, ভারতবর্ষের রেললাইনগুলিতে বিদেশী মাল যেরূপ ভাড়ায় চালান হয়, দেশী ঠিক সেই শ্রেণীর মালের জন্য তাহা অপেক্ষা বেশী ভাড়া লওয়া হয়। ইহাতে ভারতীয় শিল্পের উন্নতির পথ অনেকটা রুদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু ইহার প্রতিকার গবর্ণমেণ্ট না করিলে আমরা কিছু করিতে পারি না। পক্ষান্তরে অন্য কোন কোন প্রস্তাব আছে, যাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আমরাও স্বতন্ত্রভাবে কিছু করিতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দু মুসলমান সমুদয় উপস্থিত বেসরকারী সভ্য যে প্রস্তাবটির সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত গোখলে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ করিয়া বিদেশে ভারতবর্ষীয় কুলি চালান বন্ধ করা হউক। প্রতারণাপূর্ব্বক অনেক কুলিকে চালান দেওয়া হয়, অনেক কুলির উপর, পূর্ব্বে নিগ্রোদাসের উপর যেরূপ অত্যাচার হইত, তদ্রূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে আত্মহত্যা করে, অনেক ভারতনারী নেটাল উপনিবেশে

বার্ষিক ৪৫৲ টাকা ট্যাক্‌স্ দিতে না পরিয়া সতীত্বে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়। গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত গোথ্‌লের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমরা দেশে কলকারখানা বাড়াইয়া অনেক কুলিকে কাজ দিতে পারি। দেশে দরিদ্র নিরক্ষর লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিয়া কুলি-শ্রেণীর লোকদিগকে প্রবঞ্চক কুলি-আড়কাঠীর কৌশল ভেদ করিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ করিতে পারি। যেখানে যেখানে বিদেশে কুলি পাঠাইবার ডিপো আছে, সেখানে আড়কাঠীদের কাজের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের কুকার্য্যের সংখ্যা কমাইতে পারি। এরূপ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবকের দল গঠিত হইতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ যাহাতে আইনসঙ্গত হয়, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন, তাহা পাশ হওয়া দূরে থাক্‌, সিলেক্ট-কমিটি দ্বারা বিবেচিতও হইল না। ইহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের অন্যতম যুক্তি এই যে দেশের অধিকাংশ লোক ইহার সপক্ষে নহে! গবর্ণমেণ্ট যখন সংবাদপত্র আইন প্রভৃতি পাস্ করেন, তখন দেশের অধিকাংশ লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ত প্রকাশ করেনই না, ভ্রূক্ষেপও করেন না। ভারতগবর্ণমেণ্ট সুবিধামত নিজেচ্ছাচারী ও লোকেচ্ছাচারী হন।

পুস্তক-পরিচয়

পালিপ্রকাশ—

(অর্থাৎ প্রবেশক, পালিপাঠাবলী ও শব্দকোষ সহ পালিব্যাকরণ)। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রণীত। পৃষ্ঠা—১৲+১০৬+৩৪৭। মূল্য ২৸০; বাধান ৩৲ তিন টাকা।

গ্রন্থের ১০৬ পৃষ্ঠাব্যাপী 'প্রবেশক' গভীর গবেষণা পূর্ণ। 'পালি' শব্দের উৎপত্তি লইয়া গ্রন্থকার অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে "পঙ্‌তি শব্দ হইতেই পালি হইয়াছে।" কিন্তু তিনি যেসমুদয় যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। তাহার পর 'পালি' এবং অপরাপর প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি লইয়া বিচার। এখানেও গ্রন্থকার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা, অত্যন্ত সমীচীন।

ব্যাকরণ অংশ ২৬২ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ইহাতে ৫টী অধ্যায়:—

১। সাধারণ কল্প। এই অংশে পালি শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে।
২। সন্ধি কল্প।
৩। নাম কল্প (শব্দরূপ)।
৪। আখ্যাত কল্প (ধাতুরূপ)।
৫। সঙ্কীর্ণ কল্প (অব্যয়, কৃদন্ত তদ্ধিতাদি)।

তাহারপর পালিপাঠাবলী (২৬৫ পৃঃ হইতে ৩০৭ পৃঃ পর্য্যন্ত) এবং শব্দকোষ অর্থাৎ পালিশব্দের অনুরূপ সংস্কৃত শব্দ (৩১১ পৃঃ হইতে ৩৩৩ পৃঃ পর্য্যন্ত)। সর্ব্বশেষে সূচী।

শাস্ত্রী মহাশয় 'পালিপ্রকাশ' প্রকাশিত করিয়া আমাদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রতি অধ্যায়েই পালির সহিত সংস্কৃতের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, ইহাতে গ্রন্থের মূল্য অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। এমন সুন্দর গ্রন্থ ইংরাজী ভাষাতেও বিরল। এখন আর কেহ বলিতে পারিবেন না যে ব্যাকরণের অভাবে পালিভাষা পড়া হইতেছে না।

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"পালির কারক সমাস প্রভৃতি অনেক বিষয় ঠিক সংস্কৃতের মত। এইজন্য তৎসমুদয় এই পুস্তকে সবিস্তর আলোচিত হয় নাই; যাহা বিশেষ বিশেষ আছে, তাহাই কেবল সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে পাঠক অনায়াসে তাহা সংস্কৃতের আদর্শে জানিয়া লইতে পারিবেন।" কিন্তু ইহাতে অনেক পাঠকের অনেক অসুবিধা হইবে। সকলেই যে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হইয়া পালিভাষা অধ্যয়ন করিবেন তাহা আশা করা যায় না। এই শ্রেণীর পাঠকদিগের জন্য কারক সমাস স্ত্রী-প্রত্যয়াদি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আশা করি গ্রন্থকার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এই অভাবটী পূর্ণ করিবেন।

মৌনীবাবা—

শ্রীমতী নিঝরিণী ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর, পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা। ১০৬ পৃষ্ঠা; মূল্য ।৹ আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—এস্, কে, লাহিড়ী, কলিকাতা, এবং ঢাকা, গ্রন্থপ্রকাশক।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! যদি প্রকৃত সাধু দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকে, এই ভোগবিলাসের যুগেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই যদি বিশ্বাস, বৈরাগ্য এবং তপস্যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে চাহেন, একবার 'মৌনীবাবা'র জীবনচরিত পাঠ করুন। ইঁহার জীবনচরিত পাঠ করিলে নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয় এবং নির্জ্জীব প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। শ্রীমতী নিঝরিণী ঘোষ এই মহাত্মার জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া আমাদিগের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন; এজন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। গ্রন্থকর্ত্রী ভক্তিভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—কিন্তু ইহাতে ঘটনাবলী অনুমাত্রও অতিরঞ্জিত হয় নাই। গ্রন্থের ভাষা সরস, প্রাঞ্জল এবং ধর্ম্মভাবোদ্দীপক।

আমরা মৌনীবাবার জীবনচরিত পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি এবং গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষায় বলিতে পারি "এই ইহসর্ব্বস্বতার দিনে এরূপ আত্মবিলোপের দৃষ্টান্ত কল্যাণ সাধন করিবে।"

এই পুণ্যশ্লোক মহাত্মার মধুময় জীবনচরিত স্থানাভাবে এবার প্রকাশিত হইল না। আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত করিব। এই প্রবন্ধ শ্রীমতী নিঝরিণীর গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ছাপা এবং কাগজ—উভয়ই সুন্দর।

জীবন-ধর্ম্ম—

প্রথম ভাগ (ভবানীপুর সম্মিলন সমাজে বিবৃত উপদেশাবলী)। লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত (১১০-১-১ রসারোড্ নর্থ, ভবানীপুর) পৃঃ ৭৬; মূল্য মুদ্রিত হয় নাই।

গ্রন্থে এই সমুদয় বিষয় বিবৃত হইয়াছে :—

(১ম) দেহ, গৃহ ও বাহ্যবস্তু; (২) মানবমন—জ্ঞান; (৩) মানব-হৃদয়—প্রেম; (৪) মানবাত্মা—আধ্যাত্মিকতা; (৫) জীবন্ত মণ্ডলী।

ধর্ম্মশিক্ষার্থিগণ এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

রচনা-সোপান—

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত। প্রকাশক এস্, কে, নাথ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। ডিমাই অষ্টাংশিত ১১৮ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য এক টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের সাহায্যের জন্য ইহাতে বাংলাভাষার পদপ্রকরণ (বাংলা শব্দের রূপ ও প্রকৃতি, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থ শব্দ প্রভৃতি), বাক্যপ্রকরণ, অনুচ্ছেদ-প্রকরণ, অমৌলিক রচনাপ্রকরণ (অর্থাৎ পরের রচনার ব্যাখ্যা ইত্যাদি) মৌলিক রচনাপ্রকরণ, পত্রলিখন প্রকরণ প্রভৃতি অতি বিচক্ষণতার সহিত বহুল উদাহরণ দ্বারা বিবৃত ও বিশদ করা হইয়াছে। রচনা-শিক্ষা সম্বন্ধে এমন একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহা ছাত্রদিগের বিশেষ সহায় হইবে আশা করি। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি বাহ্য অবয়বও পরিপাটী।

আদর্শ লিপিমালা—

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত। শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ২২৮ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য এক টাকা। ইহাতে দলিলপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পত্রলিখনের নমুনা পর্য্যন্ত আছে। এই নমুনায় প্রাচীন রীতি হইতে আধুনিক রীতি পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, চিঠি মনের বিশেষ অবস্থার বিশেষ অভিব্যক্তি; তাহা নমুনা দেখিয়া শিখিয়া লিখিবার সামগ্রী নহে। অধিকন্তু যেসকল নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাও অতি সাধারণ রকমের, বিশেষত্ববর্জ্জিত। অনেক খ্যাতনামা লোকের চিঠি সংগৃহীত হইয়াছে, এই হিসাবে ইহার মূল্য আছে; কিন্তু সবগুলি সাহিত্যরসে অভিষিক্ত বা পত্র-লিখনরীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া মনে হইল না। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে অন্যান্য চিঠিগুলিও কল্পিত নহে, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের লেখা। একখানি চিঠিতে ভাগিনেয়ী মামাকে চিঠি লিখিতে পাঠ লিখিয়াছে "প্রাণের মামা।" এরকম লিপিরচনার আদর্শ ভদ্রসংসার হইতে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আশীর্ব্বাদ—

শ্রীরেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১২৯ পৃষ্ঠা। ৬ খানি ছবি সুদ্ধ সমস্ত বই তিন রঙে ছাপা। রেশমী কাপড়ে বাঁধা; সোনায় মণ্ডিত। মূল্য এক টাকা। এত আয়োজন ও ব্যয় সত্ত্বেও বইখানি সুদৃশ্য হইয়াছে বলা যায় না; তবে যাহারা জাঁকজমক ভালবাসে তাহাদের পছন্দ হইবে। চিত্রগুলি বাংলা বইয়ের মামুলি ধরণের আড়ষ্ট ভাবহীন; সতীরাণী নামক চিত্রখানি অর্থশূন্য। বইখানি নবোঢ়াদিগের উপহারের উপযুক্ত করিয়া রচনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। লেখক গদ্যে পদ্যে নানা উপাখ্যান ও উপদেশ দ্বারা বধূর কর্ত্তব্য ও সতীধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনাও উদ্ধৃত হইয়াছে। লেখকের রচনা সরল এবং চলনসই। এবং পুস্তকখানি উদ্দেশ্যের উপযোগী। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা ও আবশ্যকতা স্বীকার করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"যে শিক্ষায় নারীকে বিলাসিনী, কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিহীনা এবং উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তোলে আমরা সেরূপ শিক্ষার পক্ষপাতী নহি।" যেন সেরূপ শিক্ষার পক্ষপাতী কোনো জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন লোক হইতে পারে। এইরূপ অকারণ বিজ্ঞতা লেখকও প্রকাশ করিয়াছেন। "যাহারা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী তাহারা প্রায়ই লজ্জার বিরোধী। স্ত্রীলোকের লজ্জা নষ্ট করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন। ইহা যে কতদূর ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ তাহা বলিয়া উঠা যায় না।" লেখক বোধ হয় জানেন না যে লজ্জা একটি মানসিক অবস্থা; তাহা নষ্ট করিতে হইলে মানব-প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন ঘটানো আবশ্যক। মানসিক অবস্থার বাহ্যিক আতিশয্য যাহা—দেড়হাত ঘোমটা টানিয়া ব্যাঘ্রঝম্পে পলায়ন প্রভৃতি—তাহাই সংস্কারকদিগের নিন্দনীয়, পরন্তু আসল লজ্জার শালীনতা সহৃদয় মাত্রেরই নিকট নারীপ্রকৃতির আবশ্যক ও শোভন উপাদান বলিয়া স্বীকৃত ও সমাদৃত।

জীবন-শিক্ষা—

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ প্রণীত ও শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কাশী। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ১৯৯ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। ভারতবাসী ব্রাহ্মণাদি আর্য্যজাতি কেন অল্পায়ু ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে তাহারই কারণ ও প্রতিকার এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। শাস্ত্র মতে কলিতে পরমায়ুর পরিমাণ ১০০ হইতে ১২০ বৎসর। গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে এবং জন্মান্তরীণ পাপের ফলে এবং ইহ জন্মের শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ অনাচারের ফলে রোগ হইতে আর্য্য অল্পায়ু হইতেছে। যেসকল অনার্য্য ও ম্লেচ্ছ আচার অনার্য্য ও ম্লেচ্ছকে সুস্থ ও দীর্ঘায়ু করে তাহাই আর্য্য কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে তাহার অল্পায়ু ঘটায়, যেহেতু আর্য্য ধাতে অনার্য্য বা ম্লেচ্ছ আচার সহে না। মদ্যাদি-মিশ্রিত বিদেশী ঔষধ রোগ উপশম না করিয়া বরং স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা (শাস্ত্রবচন উপেক্ষা করিয়া) কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াও এক কারণ। নীচ সংসর্গ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতিও অল্পায়ু হওয়ার কারণ। শাস্ত্রে পরপূর্ব্বা স্ত্রীকে বিবাহ করিবার বিধি আছে; কেবলমাত্র যুবতী স্ত্রীকেই বিবাহ করিবার বিধি আছে; বিধবার বিবাহেও নিষেধ নাই; বরও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তবে বিবাহ করিবে এই শাস্ত্রবিধি; কন্যার মনোনীত পাত্রেই বিবাহ হওয়া বিধি, অতএব কন্যা কখনো বাল্যাবস্থায় বিবাহিত হইতে পারে না। কিন্তু এই সকলের বিপরীত শাস্ত্রবচনও পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে; ঋষিসিদ্ধান্ত আমাদের বুঝা দুষ্কর অতএব চোখ বুজিয়া তাহা পালন করাই উচিত; না করিলেই অল্পায়ু হইতে হইবে। কিরূপ কন্যা বিবাহ করিবে তাহারও লক্ষণ শাস্ত্র খুলিয়া তবে নির্ণয় করিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরা সকল কথা উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রপাঠে অনধিকার। ইহার প্রতীপকার্য্য করিলেই সর্ব্বনাশ কারণ ইহা বিধির অনভিপ্রায়। যে গৃহে নারী অনাচার-পরায়ণা সেসকল গৃহ ত উচ্ছন্ন যাইবেই। স্ত্রীপুরুষের দৈহিক গঠন যখন স্বতন্ত্র তখন তাহাদের অবস্থা ও ব্যবস্থা স্বতন্ত্র রকম রাখিতে হইবে। লোকে "লক্ষ্মী মেয়ে" বলে "সরস্বতী মেয়ে" যখন বলে না তখন মেয়ের লেখাপড়া শিক্ষা অনধিকারচর্চ্চা। হিন্দু গায়ে মৃত্তিকা না মাখিয়া সাবান মাখে ইহা আয়ুক্ষয়কর; বিশেষত গৃহলক্ষ্মীদের পক্ষে। রাত্রে গাছতলায় যাইবে না, গাছে ভূত থাকে বলিয়া প্রবাদ, অঙ্গারক নামক গ্যাস বায়ুরই অংশ অতএব তাহা ভূত ত নিশ্চয়ই। তান্ত্রিক বীজমন্ত্র 'লং' 'হ্রীং' প্রভৃতি জপ, প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। অবাঙ্মনস-গোচর নিরাকার পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা তমোগুণবহুল কলিযুগের সাধকের সাধ্যাতীত; সেই জন্য তন্ত্রোক্ত বিবর্ত্তিত মূর্ত্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্মের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মপরব্রহ্ম লাভ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; তাহা এক জন্মে না হয় পঞ্চাশ জন্মে হইবে। আহারের সহিত ধর্ম্মের পোষ্যপোষক সম্বন্ধ—তাহা মদ্য ও দুগ্ধ পান

রাই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। কলের জল ইত্যাদি চন্দ্রসূর্য্যবায়ুর দৃষ্ট এবং ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট, সুতরাং অস্বাস্থ্যকর। দোকানের পচা ও ভেজাল দ্যে অস্বাস্থ্যকর। টেবিলে বসিয়া খাইবে না যেহেতু তাহা শাস্ত্র নষিদ্ধ। গোসেবা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের কারণ গোরর সর্ব্বাঙ্গ দেবতার অংশ, গোবরে লক্ষ্মী ও মূত্রে গঙ্গা বাস করেন। গোরুর সংসর্গে ও মলমূত্রের গন্ধে বৃষ্টাদি রোগও আরাম হয় বায়ু বিশুদ্ধ হয়। গোরুর মলমূত্র বিদেশী ফিনাইল অপেক্ষা সহস্রগুণে উপকারী মল মূত্রের সদগন্ধের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। মৃত গোরুর পচা দুর্গন্ধে গ্রামের দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ হয় এ জন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে যে ব্যক্তি মৃত গাভীর পচা দুর্গন্ধ পাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত বা আচ্ছাদন করে, যমের আদেশে দূতেরা তাহার নাসাচ্ছেদন করে। তবে গোমাংস যে হিন্দুর নিকট কেন অপবিত্র তাহা কিন্তু গ্রন্থকার বলেন নাই। নিজের ব্যবহৃত বস্ত্রে শারীরিক তাড়িত অনুবিদ্ধ থাকে শনিবার প্রভৃতি নিষিদ্ধবারে বস্ত্রাদি রজকগৃহে দিলে রজকের দৈহিক তাড়িত মিশ্রিত হইয়া আর্য্য হিন্দুর বস্ত্র অস্বাস্থ্যকর হইতে পারে।

এইরূপ বহুবিধ শাস্ত্রীয় বচন বৈজ্ঞানিক কারণ দ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এইরূপ গন্থ কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে ভয়ানক, হয় বৈজ্ঞানিক যুক্তি না হয় শাস্ত্রীয় যুক্তির অর্থ বুঝা যায় কিন্তু দুইকে এক সঙ্গে মিশ্রিত করার অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। শাস্ত্রবচন যখন স্বাধীন বুদ্ধির চেয়ে হীন বলিয়া মনে হয় তখনই তাহার সাহায্যের জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির ছদ্মবেশের শরণ লইতে হয়। এবং সাধারণ পাঠক শাস্ত্রের দোহাইকে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে দেখিয়া আর চিন্তা করিয়া দেখিবার কষ্ট স্বীকার করে না। গ্রন্থকার আধুনিক যুগকে কেন যে যুগ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কেন জিজ্ঞাসা করাই কিন্তু আমরা মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায় বলিয়া মনে করি। যাহাই হউক পুস্তকখানিতে অনেক ভালো ও চিন্তা করিয়া দেখিবার কথাও আছে।

ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার—প্রথম খণ্ড

শ্রীসৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২০৫ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য নির্দ্দেশ নাই। এই খণ্ডে ময়মনসিংহ পরগণার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারগণের বংশগত বিবরণ ধারাবাহিকরূপে লিখিত হইয়াছে। বংশাবলীর নাম, ইতিহাস কিম্বদন্তী সংকার্য্য ও বিশেষ অনুষ্ঠান প্রভৃতি ১৬টি অধ্যায়ে শৃঙ্খলা ও গবেষণার সহিত বিবৃত হইয়াছে। অনেক প্রাচীন দলিল চিঠি প্রভৃতির প্রতিলিপি দ্বারা উক্তিসকল সমর্থিত ও বিশদীকৃত হইয়াছে। এই গন্থ সম্পর্কীয় জমিদার বংশের নিকট ত সমাদৃত হইবেই ইতিহাস জিজ্ঞাসু কৌতূহলী পাঠকের নিকটও ইহা সুখপাঠ্য ও বঙ্গের ইতিহাসের উপাদান বলিয়া সমাদৃত হইবার যোগ্য।

ভূগোলবিজ্ঞান—

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক আলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১০২ পৃষ্ঠা মানচিত্র, চিত্র প্রভৃতি সমন্বিত। মূল্য অনুল্লিখিত। এখানি পঞ্চম ও ষষ্ঠমানের পাঠ্যনির্দ্দেশ অনুযায়ী লিখিত। ইহাতে সাধারণ ভূগোলতত্ত্ব, ভূগোলবিজ্ঞান প্রাকৃতিক ভূগোল, ঐতিহাসিক ভূগোল নৈসর্গিক অবস্থার বশে দেশ ও দেশবাসীর প্রকৃতি বিচার প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় শৃঙ্খলার সহিত সহজ ভাষায় চিত্র, নক্সা, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাত্র শিক্ষক এবং সৌখীন পাঠকের তুল্য উপযোগী এবং সুখপাঠ্য। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে, ইহাই ইহার গুণপনার প্রমাণ।

জাতীয় শিক্ষা—

শ্রীজগচ্চন্দ্র পাল প্রণীত। শ্রীনবীনচন্দ্র লোধ কর্ত্তৃক হবিগঞ্জ হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ৮ অং ৩৬ পৃষ্ঠা মূল্য ।০ আনা। ইহাতে জাতীয় শিক্ষা কি তাহার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা কি, জাতীয় শিক্ষার বিশেষত্ব ও ভবিষ্যৎ জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা, ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে দেশী বিদেশী মহানুভব ব্যক্তিদিগের অভিমত দ্বারা সমর্থিত হইয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষার নামে যাঁহাদের একটা আতঙ্ক বা ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহারা ইহা পাঠ করিলে নিজে উপকৃত হইবেন এবং দেশেরও কল্যাণের কারণ হইয়া ধন্য হইতে পারিবেন।

পুরাণদর্শনসূত্র উপক্রমণিকা—

শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মা কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ৩২নং পাঁড়েঘাট, কাশীধাম। এই গ্রন্থে ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ মিবাররাজ বাপ্পাদিত্যের কল্পিত নাম, এবং শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণেরই পাঁচ ছয় পুরুষ অধস্তন বংশধর। এইকথা প্রমাণ করিবার জন্য ইতিহাস ও পুরাণ যথেষ্ট আলোড়িত হইয়াছে। এবং সর্ব্বশেষে উক্ত হইয়াছে যে গলায় পৈতে ঝলানো রীতি' নিতান্ত আধুনিক, উহা বিষ্ণু পুরাণ, অমরকোষ প্রভৃতি রচনার পরকালিক।

বনফুল—

শ্রীহরনারায়ণ সেন প্রণীত। মূল্য দুই আনা। পদ্যপুস্তক। লেখক শিলচর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয়শ্রেণীর ছাত্র কবিতাগুলি ঈশ্বর-সম্বোধনে রচিত। কবিতার ছন্দ পদে পদে ভঙ্গ হইয়াছে। এবং ভাব বহু খ্যাতনামা কবির নিকট ঋণী

হরিবোল—

শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ গুহ পাত্র প্রণীত। ১৫৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হেরাল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ১২ অং ১২ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ১৲ টাকা। ইহাতে পুরাণ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রবচন ও স্বকীয় রচনা দ্বারা হরিনাম রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ ভজনার আবশ্যকতা, উপকারিতা ও উপযোগিতা গদ্যে পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। গন্থে শৃঙ্খলা ও একটি কেন্দ্রভাবের নিতান্ত অভাব এই গ্রন্থের ক্রেতারা বিনা মূল্যে উপহার পাইবেন—

গীতিপুঞ্জবিংশতি—

ইহাতে ২৫টি কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, শ্যামা, শিব প্রভৃতি বিষয়ক গান আছে।

ধ্রুব—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক আলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা। ছবি লেখা ও প্রচ্ছদপট সমস্ত তিন রঙে জাঁকজমকে ছাপা কিন্তু সুদৃশ্য নয়নরঞ্জন নহে। রচনারীতি কাঁচা অথচ লেখার ভঙ্গীটি বিজ্ঞ মুরুব্বিয়ানা ধরণের, অর্থাৎ বাংলা রচনার প্রাচীন শব্দাড়ম্বর পূর্ণ রীতি ও আধুনিক সরল রীতি লেখকের রচনায় মিশাইয়া গিয়াছে অথচ উভয়ে সুসমঞ্জস হয় নাই। ইহার সাহিত্যিক গুণ বিশেষ কিছু না থাকিলেও ইহা শিশুর মন ভুলাইতে পারিবে এবং ইহা সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত। উপাখ্যানের বিষয়টিও চিরদিন মনোহর; তবে গ্রন্থকার পৌরাণিক উপাখ্যানের সহিত নিজের কল্পনাও মিশাইয়াছেন, তাহাতে উপাখ্যানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় নাই

হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি—

কাছাড়ের শেষ ভূপতি গোবিন্দচন্দ্র প্রণীত সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত এই দণ্ডবিধিখানি গোহাটি বঙ্গসাহিত্যা-নুশীলনী সভা প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উপকার করিয়াছেন। বঙ্গের একটি স্বাধীন রাজ্যের দণ্ডবিধি কেমন ছিল; শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গপ্রান্তে লিখিত ভাষা কেমন আধুনিক বাংলারই প্রায় অনুরূপ ছিল তাহার পরিচয় সকল বাঙালীরই প্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য হেড়ম্ব বা কাছাড় রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস স্থানীয় পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি স্থাপত্যচিত্র, শিলালিপি-চিত্র, হস্তলিপি-চিত্র, প্রভৃতি দ্বারা বিচক্ষণতার সহিত ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভীম-পত্নী হিড়িম্বা বা তৎপুত্র হিড়িম্ব হইতে এই রাজ্যের নাম; পরে উহা কচ্ছ প্রদেশ হইতে কাছাড় হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। আমরা নমুনা স্বরূপ দণ্ডবিধির একটি preamble বা হেতুবাদ ও একটি ধারা উদ্ধৃত করিতেছি—

"জানা কর্ত্তব্য কোন কোন ব্যক্তিকে চৌর বলা যায় তাহা নিরূপণের নিমিত্ত এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণি ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখে জারী করিলেন।

"চোরের সহিত সর্ব্বদা সংসর্গ করে যে কিম্বা যাহার পাশ চোরকর্ম্মের খনিত্রাদি অস্ত্র থাকে ও যাহার পাশ চোরিত দ্রব্য পাওয়া জায় সেই চৌর হয়। এই এই চিহ্ন দ্বারা চোরকে অবধারণ করিয়া রাজাকে সপ্রমাণ দ্রব্যস্বামীকে দ্রব্য দেওয়াইয়া চোরকে যথাশাস্ত্র দণ্ড করিবেন।"

ইত্যাদি রূপ বহু কৌতুককর বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অশোক—

শ্রীচারুচন্দ্র বসু প্রণীত। প্রকাশক সিটি বুক সোসাইটি। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ৩৪৩+১৪+৸৶০। ৭ খানি চিত্র যুক্ত, তন্মধ্যে ১ খানি প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি অশোকের প্রতিকৃতি, রঙিন। মহারাজচক্রবর্ত্তী অশোক বৌদ্ধ তথা ভারতের ইতিহাসের বিশিষ্ট মহাপুরুষ। তাঁহার ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য নানা দেশে বহু মনীষী অশেষ গবেষণার সহিত বহু চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। চারু বাবু সেইসকল চেষ্টার ফল সংগ্রহ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে[ন]। সুতরাং এই পুস্তক প্রামাণ্য ইতিহাস রূপে গণ্য হইবার যোগ্য। [এ]ই পুস্তকে অশোক সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী, ইতিহাস, স্তম্ভলিপি, শিলালি[পি], স্থাপত্য, সাহিত্য, সমস্তই আলোচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। অশো[কের] গৌরবান্বিত ঘটনাবহুল বিচিত্র ইতিহাস দেশপ্রেমিক ও ইতিহা[স] জিজ্ঞাসু মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। চারু বাবু এই মহাপুরু[ষের] ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত উপকরণ বিশেষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা বি[ভিন্ন] গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া বাঙালী পাঠকের সহজপ্রাপ্য করিয়া [দিয়া] বাঙালী পাঠককে ঋণী ও বাংলা সাহিত্যকে ধনী করিয়াছেন। [এই] গ্রন্থের সমাদর হইবে আশা করি।

মুদ্রারাক্ষস।

কাব্যরচনা

গগনে রচেছে কাব্য
দীপ্তিময়ী তারাগুলি;
সাগরে রচেছে কাব্য
উর্ম্মিমালা ফুলি' ফুলি';
প্রান্তরে রচেছে কাব্য
শষ্প, তরুলতা আর;
গৃহে কাব্য রচিয়াছে
শিশু ও জননী তা'র!

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।